# উপন্যাসসমগ্র
১

# উপন্যাস সমগ্র

## ১

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৯৬

অ

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
৩২ বিডন রো
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
অক্ষর লেজার
১০ বৃন্দাবন বোস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা-৭০০ ০০৪

"রা-স্বা"

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
পাদপদ্মে বিনম্র প্রণামপূর্বক
নিবেদন

# নিবেদন

নিজের পুরনো লেখা ফিরে পড়া একটু ক্লান্তিকর। কিন্তু কখনও কখনও সংশোধন বা সম্পাদনার জন্য যখন বাধ্যতামূলকভাবে পড়ে দেখতে যাই তখন কাহিনী, শৈলী, ছাপার ত্রুটির চেয়েও বেশি হয়ে ওঠে নানা স্মৃতি— যা সেই লেখার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সুখস্মৃতি নয়, অনেক অপমান, ব্যর্থতা, গ্লানি আর কষ্টের আখ্যানও বয়ে আসে সেই সঙ্গে। কোনও লক্ষ্যে পৌঁছনোর তাড়াহুড়ো নেই আমার, কোনও উচ্চতার শিখরদেশ স্পর্শেরও সাধ নেই। শুধু প্রবহমান থাকাই যথেষ্ট। সবচেয়ে ভয় পাই আয়ুষ্কালের মধ্যে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হওয়াকে।

১৯৬৭ সালে ঘুণপোকা প্রকাশের পিছনে বিচিত্র একটু ঘটনা আছে। প্রায় আট-দশ বছর টানা নিয়মিত দেশ, আনন্দবাজার এবং অন্য পত্রপত্রিকায় ছোট গল্প লিখে গেলেও উপন্যাস লিখতে কেউ বলেনি তখনও। ছেষট্টির শেষে বা সাতষট্টির শুরুতে একদিন দেশ সম্পাদক সাগরদা (সাগরময় ঘোষ) আমাকে ডেকে বললেন, সামনের দেশ পুজোসংখ্যায় তুমি এবং বরেনের (বরেন গঙ্গোপাধ্যায়) মধ্যে একজন উপন্যাস লিখবে। কে লিখবে তা তোমরা দু'জনে মিলে কথা বলে ঠিক করে নাও।

বলাই বাহুল্য, প্রস্তাবটি আমার মনঃপূত হয়নি। যদিও বুঝতে পারছিলাম, সাগরদা দু'জনের কাউকেই বোধহয় অখুশি করতে চাইছিলেন না। আমি সাগরদাকে কিছু বলিনি, ঘাড় নেড়ে চলে আসি। পরের রোববার সুতৃপ্তির আড্ডায় গিয়ে সোজা বরেনকে বলি, এবার তোকে দেশে উপন্যাস লিখতে হবে, তৈরি হ। বরেন সঙ্গে সঙ্গে বলল, অসম্ভব। আমার বাড়ির কিছু ঝামেলা আছে, এবার আমি লিখতে পারব না।

সাতষট্টি সালে আমারও ব্যক্তিগত একটি গুরুতর অসুবিধে ছিল। জীবনে প্রথম উপন্যাস লেখার মতো মানসিক অবস্থাই নয়। দু'জনের মধ্যে তাই কিছুদিন টানা-হ্যাঁচড়া চলল। দেখা গেল বরেনের এবং আমার দু'জনের পক্ষেই সে-বছর উপন্যাস লেখায় প্রবল বাস্তব বাধা আছে। বরেনের অসুবিধে আমার চেয়েও গুরুতর।

নিতান্ত অনিচ্ছের সঙ্গে এবং অত্যন্ত আলগা মন নিয়ে আমি লেখা শুরু করেছিলাম। চূড়ান্ত অনভিজ্ঞতা তো ছিলই, সঙ্গে ছিল আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং নূতন ক্ষেত্রে প্রথম বিচরণের ভয়। ষাট সত্তর আশি পাতা একসঙ্গে লিখিনি তো কখনও! দু'-চার লাইন লিখে থামি, ভাবি, আবার দু'-চার লাইন লিখি। দু'-চার পাতা এগিয়ে লেখা থেমে যায়। পড়ে মনে হয়, এমাঃ, ছিঃ ছিঃ, এরকম জঘন্য লেখা কেউ কি পড়বে? কিন্তু ফেরার উপায় নেই, দ্বিধাজড়িত কলম কয়েকপাতা এগোনোর পর একটু গতিসঞ্চয় করেছিল মনে আছে। মাস দুয়েকের চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছিলাম। নাম খুঁজে পাচ্ছিলাম না, অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের "সত্যানুসরণ" নামে যে ছোট্ট বইটি সর্বদা আমার কাছে থাকে তার ভিতরেই অকস্মাৎ নামটি পেয়ে যাই। উপন্যাস শেষ করে লেখার তৃপ্তি পাইনি, শুধু কাঁধ থেকে দায় নেমে যাওয়ার স্বস্তি ছিল।

আমার জীবনের প্রথম উপন্যাসটি কেমন হল? দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর কোনও বিস্ফোরণ তো দূরের কথা, একটা কালিপটকার আওয়াজও হল না, বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই কোনও মন্তব্যই করেনি, চেনাজানা মানুষরাও খুব নিরুত্তাপ, শুধু আমার ভাবী স্ত্রী জনান্তিকে বিস্তর প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তখন এই অপদার্থ লোকটির সবকিছুই ভাল দেখেন, কাজেই তাঁর মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে 'ঘুণপোকা'র মূল্যায়ন করি কী করে? অবশ্য বন্ধু অতীন আমার পিঠ

চাপড়ে দিয়েছিল, সব মিলিয়ে জনা চার-পাঁচেকের মুখে কিছু কুণ্ঠিত সাধুবাদ পাই বটে কিন্তু বুঝতে পারি আমার প্রথম উপন্যাস তেমন কোনও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি, তবে এতে আমার অভ্যাস ছিল। লেখা শুরুর পর থেকে আমি সাধুবাদ, পাঠক-পাঠিকার চিঠিপত্র বা অনুকূল সমালোচনা খুব কমই পেয়েছি। আমার এও ভয় ছিল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে এই ব্যর্থতার দরুন হয়তো সম্পাদকরা একদিন আমাকে বর্জন করবেন।

জীবনে আমার ব্যর্থতার দিকটা একটু বেশি ভারী। লেখাপড়ায় তেমন কিছু ছিলাম না। নিজের চেষ্টায় কালীঘাট ওরিয়েন্টাল একাডেমির মতো একটি অখ্যাত নিম্নমানের স্কুলে অতিশয় অশ্রাব্য বেতনে একটি শিক্ষকতার চাকরি করা ছাড়া আমার মূলধন কী-ই বা ছিল। ধরেই নিয়েছিলাম, ঘুণপোকার পরে আর উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ দুরাশা মাত্র।

আনন্দ পাবলিশার্স উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশে আগ্রহী হবেন কি না সে-বিষয়েও আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। আমাকে রীতিমতো অবাক করে দিয়ে তাঁরা গ্রন্থটি অবশ্য প্রকাশ করেন। আমি বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি— আমার প্রথম উপন্যাস ঠাকুরকে উৎসর্গ করি। তার কারণ, ঠাকুরের বয়স তখন আশি ছুঁই ছুঁই, শরীর ভগ্নপ্রায়। মনে হয়েছিল, আমার অতিপ্রিয় এই মানুষটিকে যদি আর গ্রন্থ উৎসর্গ করার সুযোগ না পাই! আমার মা আর বাবা তখনও তেমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নন, তাঁদের জন্য সময় আছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়াতে আমার মা-বাবাও কিন্তু খুশিই হয়েছিলেন।

বড্ড সংকোচ হয় বলে কখনও কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারি না, আমার অমুক লেখাটি আপনি পড়েছেন কি না বা কেমন লেগেছে। কেউ নিজে থেকে বললে শুনি। আগ বাড়িয়ে কাউকে নিজের বই উপহার দেওয়াও আমার হয় না, বড্ড বাধো-বাধো ঠেকে। মনে হয়, উনি কি আমার লেখা পড়তে আগ্রহী? যদি না হন তবে তো ওঁর ওপর একটা দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

ঘুণপোকা প্রকাশের পর হঠাৎ একদিন সাগরদা তাঁর অফিসের ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিন-চার মাস তাঁর কোনও মন্তব্য ছিল না। হঠাৎ সেদিন তিনি আমার উপন্যাসখানির প্রভূত প্রশংসা করে বললেন, এবার দেশের জন্য একটা ধারাবাহিক লেখো। খুব তাড়াতাড়ি।

তখন বিয়ে করেছি। কলকাতায় বাসা করার সাধ্য ছিল না বলে বালি স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে সমবায় পল্লিতে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা এবং আমার যথারীতি হাঁড়ির হাল।

চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা নেই, বাড়িওলার পরিত্যক্ত একটা ভাঙা খাটে আমরা শুই। এক মাইল ঠেঙিয়ে গিয়ে বালি স্টেশন থেকে ভিড়ের ট্রেন ধরি, হাওড়া থেকে ভিড়ের বাসে কালীঘাট, যাতায়াতেই অনেক সময় চলে যায়। তার মধ্যেই পারাপার লেখা চলতে থাকে, শরীরবোধ লুপ্ত হয়ে যায়। সারাদিন পারাপারের বিভিন্ন চরিত্র আর ঘটনাবলীর মধ্যে ঝুম হয়ে থাকে মাথা। দেশে ধারাবাহিক প্রকাশের সময়ও এই উপন্যাস তেমন কোনও তরঙ্গ তোলেনি। এক বন্ধুপত্নী বলে পাঠিয়েছিলেন, শীর্ষেন্দুকে উপন্যাসটা বন্ধ করতে বলো, কিচ্ছু হচ্ছে না।

কী হয়েছে না হয়েছে তা আজও বলতে পারি না, লেখা ভাল হল না মন্দ হল তা বিচার করার আমি কে? আমার বরাবরের লড়াই তো আমার নিজেরই সঙ্গে। যা বলতে চাই, যেমনভাবে বলতে চাই তা পারলাম কি না। ওই লড়াইটাই মারাত্মক, প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠক ফেলে দিল, না বুকে তুলে নিল তা বড় কথা নয়। আমি আমার নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে লিখতে পেরেছি কি না সেটাই আমার সমস্যা। যতক্ষণ লেখাটা আমার হাতে থাকে ততক্ষণই তা আমার নিজের জিনিস, প্রকাশ পাওয়ার পর আর আমার থাকে না তা।

'পারাপার' খুব বৃহৎ আকারের উপন্যাস নয়, উপন্যাস লেখার প্রাথমিক প্রয়াসের সেটা দ্বিতীয় ফসল, বই হয়ে বেরোনোর পর দ্বিতীয়বার পড়ার ইচ্ছে হয়নি, তাই বিস্তর মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়েছিল, এতদিন পর আমার ছেলে সম্রাটের চেষ্টায় যথাসাধ্য সংস্কার করা গেল।

'উজান' উপন্যাসটি লিখেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। রমাপদ চৌধুরীর আমন্ত্রণে। তখন মেয়ে ছোট, হামা দেয়, বালি স্টেশনের কাছেই বাসা করেছি তখন। টেবিল চেয়ার নেই বলে মেঝেতে বসে একটা সুটকেসের ওপর কাগজ সাজিয়ে বসে লিখি, আমার মেয়ে তখন আমার সঙ্গ চায়, আমাকেই পুতুল বানিয়ে খেলে। আর আমিও উজান পেরিয়ে চলে যাই আমার শৈশবে,

আমার শৈশবকালেরই উন্মোচন ওই উজান। 'ঘুণপোকা' ও 'পারাপার' তেমন বিক্রি হয়নি। এই তৃতীয় উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রথম বেরোয় বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। পরবর্তীকালে আনন্দ পাবলিশার্স এটির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেছিল।

আমার ছোট ভাইয়ের জন্ম হয়েছিল আমার জন্মের দশ বছর পর। ভাই জন্মানোর খবরে আমার সে কী উল্লাস! ভাইকে আমি খুবই ভালবাসি। আর সেই ভালবাসারই সঞ্চার ঘটেছিল 'রঙিন সাঁকো' উপন্যাসটিতে। এটিও ওই বালিতেই লেখা। ভালবাসার কথা লিখতে, বলতে বা ভাবতে গেলে আমি বড় দ্রবীভূত হয়ে যাই। আবেগ মথিত করে আমাকে। বাবার চাকরি রেলে, বদলি-বহুল সেই চাকরির টানে বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দু'দিন পরপর ডেরাডান্ডা তুলে স্থানান্তরে যেতে হয়। তার ওপর স্বাধীনতা এবং দেশভাগজনিত কারণে আমাদের লেখাপড়ার বারোটা বাজছিল। উনিশশো পঞ্চাশ সাল নাগাদ আমাকে পাঠানো হয় কুচবিহারের স্কুল হস্টেলে। সেই থেকে শুরু আমার দীর্ঘ মেস-হস্টেল-বোর্ডিং-এর জীবন, বরাবর মায়ের সঙ্গে থাকার অভ্যাস আমার। মাকে ছেড়ে দূরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারতাম না।

শুধু মা নয়। যে দিদি আমার কাছে নানা নির্যাতন সয়েও আমার বইপত্র, খাতা পেনসিল গুছিয়ে রাখত, যে দুটো খুদে ভাইবোন ছিল আমার ভীষণ প্রিয় আর অনুগত, তাদের ছেড়ে দূরে যাওয়া ছিল বেজায় শক্ত।

দূরে দূরে থেকে আমার ভিতরে পরিবার পরিজনের প্রতি এক অবোধ প্রবল ভালবাসার জন্ম হয়। এই আকুলতাকে আমি নানাভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি আমার লেখায়। তবু মনে হয় আমার ভাষাজ্ঞানের অভাবে, আমার প্রকাশভঙ্গির ব্যর্থতায় আজও বুঝি সবাইকে আমার ভিতরকার ভালবাসার কথাটা বোঝাতেই পারিনি। মাত্র কয়েক বছর আগে আমার বাবার যখন পরিণত বয়সে দেহান্ত হয় তখন তাঁর শেষকৃত্য করার সময়ে শিলিগুড়ি শ্মশানে বাবার শিয়রে বসে তাঁর মাথাটা বুকে নিয়ে শিশুর মতো শুধু বলে গেছি, আমি তোমাকে কত ভালবাসতাম তা কি বুঝতে পেরেছ বাবা? কখনও বুঝেছ? এই একই কথা আজও বিদেহী মাকে কতবার জিজ্ঞেস করি।

আমার অকথিত ভালবাসার কথা কি বোঝে, বুঝতে পারে এই পৃথিবী, এই কলকাতা, এই দেশ? ভাষা দিয়ে সব কি প্রকাশ করা যায়? এক বুক ভালবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়াই, কাঙালের মতো চাই আমার বউ, ছেলে, মেয়ে সেই ভালবাসার তরঙ্গ টের পাক। টের পাক চারদিককার মানুষজন, ঘরের চড়াইপাখিরা, টের পাক স্থাবর অস্থাবর যতকিছু। এমনও হয়েছে, ভাষাহীন বোবার মতো বসে থেকেছি দিনের পর দিন, কলমের কালি গেছে শুকিয়ে। লেখা হয়নি। উপযুক্ত ভাষার অভাবে কত কথা জানানোই গেল না মানুষকে।

'ফেরা' উপন্যাসটি ওই বালি স্টেশনের কাছে ভাড়াটে বাসায় বসে লেখা। অভাব অনটন খিদে— এসব সহ্য করে। দুঃখ কষ্ট যে মানুষের কত বড় বন্ধু তা আজ কবুল করতে সাধ যায়। খিদে চেপে থেকেই তো তৎপর হয়েছে শরীর-মন। অভাব-দারিদ্র্য মনটাকে রেখেছিল চনমনে। মানুষ যখন সহজেই অপমান করেছে তখনই ভিতরে ভিতরে লড়াই জেগেছে। 'ফেরা'র অতনু খানিকটা হয়তো আমিই। খানিকটা, সবটা নয়। এই উপন্যাস যখন লেখা তখন নকশাল আন্দোলন চলছে, লাশ পড়ছে, আমার স্কুলে বোমা পড়ছে, আগুন লাগানো হয়েছে দুবার, আমাদের ছাত্ররা প্রায়ই ফেরার হয়ে যাচ্ছে আন্দোলনের শরিক হয়ে। পরীক্ষা ভণ্ডুল হচ্ছে।

'বৃষ্টির ঘ্রাণ' উপন্যাসটা বোধহয় কোনও সিনেমা পত্রিকার জন্য লেখা। ছোট আকারে। ডি. এম লাইব্রেরি যখন উপন্যাস ছাপতে চাইল তখন কয়েকদিন টানা লিখে উপন্যাসটা শেষ করি, মনে আছে, চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন গৌতম রায়। সম্প্রতি অর্থাৎ প্রথম বাংলা মুদ্রণের প্রায় ত্রিশ বছর পর এটির ইংরিজি অনুবাদ বেরিয়েছে। নকশাল আন্দোলনের রেশ এই উপন্যাসেও আছে। আর আছে এক খরার কথা। আছে জীবনযুদ্ধে হতমান এক মুষ্টিযোদ্ধার কথা।

কৃত্তিবাস পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্য উনিশশো তিয়াত্তরে বা চুয়াত্তরে একটি উপন্যাস চেয়েছিলেন সম্পাদক সুনীল, 'বাসস্টপে কেউ নেই' লিখেছি কৃত্তিবাসের জন্য। এটিও— যতদূর মনে আছে— প্রকাশ করেন ডি. এম লাইব্রেরি।

উনিশশো তিয়াত্তরে আমাকে আনন্দ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। পুরস্কার পাওয়ার পর সাগরদা আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। জরুরি গলায় বললেন, এবছর দেশ শারদীয়ায় তোমাকে উপন্যাস লিখতে হবে। হ্যাঁ, আর শোনো, অন্য কোনও পত্রিকায় কিন্তু উপন্যাস লিখবে না।

মনে আছে, খুব মন দিয়ে লিখেছিলাম একটি প্রেমের উপন্যাস। 'দিন যায়'। হয়তো তেমন সাদামাটা প্রেম নয়, একটু জটিল। তা বলে কষ্ট করে লেখা এই উপন্যাসটিকে এতটা পাশ কাটানো কি বাঙালি পাঠকদের উচিত হল? বইটি বাজারে টিকে আছে বটে, কিন্তু গত বত্রিশ বছর সে মোটেই সমাদর পেল না।

যাক গে, এইসব নানা স্মৃতির সুতোয় একটা ধারাবাহিকতা ধরা আছে। আমার এবং আমার রচনাগুলির। লেখায় যোগ্যতার অভাব থাকলেও যত্নের অভাব ছিল না, এটুকুই যা আমার বলার কথা।

# সূচি

ঘুণপোকা

## ।। এক ।।

সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের চাকরিটা জুন মাসে ছেড়ে দিল শ্যাম।

চাকরি ছাড়ার কারণটা তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। তার ড্রইংয়ে একটা ভুল থাকায় উপরওয়ালা হরি মজুমদার জনান্তিকে বলেছিলেন, বাস্টার্ড। মজুমদার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গালাগাল দেয়। তা ছাড়া এতকাল শ্যাম হরি মজুমদারের অনেক হাবভাব, কথাবার্তা নকল করে আসছিল। মাঝে মাঝে বেয়ারা এবং দু'-একজন শিক্ষানবিশ ড্রাফটস্ম্যানকে সে মজুমদারের মার্কামারা গালাগালগুলো একই ভঙ্গিতে এবং সুরে উপহার দিয়েছে। এবং এমনকী তার এ রকম বিশ্বাস এসে যাচ্ছিল যে, পুরনো এইসব গালাগালগুলো বহু ব্যবহারে শক্তিহীন হয়ে গেছে, এগুলোর আর তেমন জোর বা তেজ নেই। আরও কিছু নতুন রকমের গালাগাল আবিষ্কৃত না হলে আর চলছে না।

তবু মজুমদারের কথাটা কানে এলে দু'-এক দিন একটু ভাবল শ্যাম। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে 'টাই'-এর 'নট' নিয়ে নাড়াচাড়া করল, বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে অর্থহীনভাবে চেয়ে রইল, আড্ডা না মেরে ঘরে শুয়ে রইল সন্ধেবেলায়। মন-খারাপ তবু ছাড়ল না তাকে। সে নিজেকে বোঝাল যে গালাগালটা আসলে কিছুই না। মজুমদার শব্দের অর্থ ভেবে গাল দেয় না, সে শুধু ওইসব শব্দ উচ্চারণ করে রাগ প্রকাশ করে মাত্র। শ্যাম নিজেও তো কতবার কতজনকে ও রকম গাল দিয়েছে; যা নিজেই সে লোককে দিয়েছে তা ফিরে পেতে আপত্তি হবে কেন? আর, এ-চাকরি কিছু দিনের মধ্যেই সোনার ডিম পাড়বে। ইতিমধ্যেই সে বাজার ঘুরে ফ্রিজিডেয়ার, রেডিয়োগ্রাম এবং পুরনো ছোট্ট মোটরগাড়ির দাম জানবার চেষ্টা করেছে, বড়লোকদের নিরিবিলি পাড়ায় দুই বা তিন ঘরের ছিমছাম একটা ফ্ল্যাটের সন্ধানেও ছিল সে। তবু বড় অসহায় বোধ করল শ্যাম। চাকরি ছাড়ার কথা সে ভাবতেও পারে না, কারণ এতদিনে এ-চাকরি তাকে উচ্চাশাসম্পন্ন করে তুলেছে।

তবু আস্তে আস্তে শ্যামের ক্লান্তি বেড়ে চলল। শিস্ দিয়ে রাস্তায় হাঁটা, রবিবারে শ্যাম্পু, ছুটির দুপুরে ঘুম—এ-সবের ভেতর আর তেমন আনন্দ নেই। মাঝে মাঝে যে-সব বড় রেস্তরাঁ বা বার-এ সে সময় কাটাত সে-সব জায়গায় যেতেও তার অনিচ্ছা দেখা দিল। অবসর সময়ে ভয়ংকর অবসাদ আর মাথাধরা নিয়ে সে ঘরেই শুয়ে থাকতে লাগল। রাতেও ভাল ঘুম হয় না। দু'দিন সে মাঝরাতে উঠে স্নান করল, তারপর সিগারেটের পর সিগারেট জ্বেলে সারাটা শেষরাত ঘরময় পায়চারি করে বেড়াল। সে খুব ভাবপ্রবণ ছিল না কোনও দিন, গভীর চিন্তাও তার অপছন্দ ছিল, হুল্লোড় ছাড়া বাঁচা যায় না এমন বিশ্বাসই সে এতকাল পুষে এসেছে। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারল একটি গালাগাল থেকে একটি ভূত বেরিয়ে এসে তার মাথাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর-একটা বদ-অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল তার—কেবলই সে আয়নায় মুখ দেখে। দাড়ি কামানোর ছোট্ট হাত-আয়নাটা সে প্রায় সারাক্ষণ কাছে রাখে। বার বার মুখ দেখে। একদিন সে সবিস্ময়ে আয়নায় লক্ষ করল যে, তার ঠোঁট নড়ছে। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনল যে, সে বে-খেয়ালে আপনমনে উচ্চারণ করে চলেছে, বাসটার্ড! বাস্টার্ড! খুব ভয় পেয়ে গেল শ্যাম, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো।

অবশেষে জুন মাসের এক ভয়ংকর গ্রীষ্মের মাঝরাতে উঠে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে সে তার ইস্তফা-পত্রটি লিখে ফেলল। আর-একটা চিঠি লিখল মাকে... আমার চাকরি গিয়াছে। আমার উপর আর খুব ভরসা করিও না। অন্তত আরও দু'-তিন মাস তোমাদের কষ্ট করিয়া চালাইতে হইবে...। ইত্যাদি। চিঠি লিখবার পর সেই রাতে তার গভীর ঘুম হল।

শৌখিন জিনিসপত্রের মধ্যে তার ঘরে ছিল ভাড়া-করা একটা ওয়ার্ডরোব আর একটা বুক-কেস।

রূপশ্রী ফার্নিচার্স থেকে লোক এসে একদিন ঠেলাগাড়িতে তুলে সেগুলো নিয়ে গেল। মেঝের ওপর স্তূপাকৃতি বই, ওয়ার্ডরোব আর বুক-কেসের দুটো চৌকো দাগ থেকে চোখ তুলে ঘরটাকে বেশ বড় বলে মনে হল তার। অনেক সুস্থ বোধ করল সে। ভারমুক্ত। হিসেব করে দেখল ফার্ম থেকে সে প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে টাকা পাবে তাতে ঘরটা আরও কিছু দিন রাখা যাবে। দক্ষিণ-খোলা সুন্দর ঘরটি তার, সঙ্গে স্নান-ঘর।

সুতির জামাকাপড় পরা অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছিল শ্যাম। তার বেশির ভাগই টেরিলিন, ট্রপিকাল বা সিল্কের শার্ট-প্যান্ট। বিদেশি টাইও ছিল কয়েকটা। ট্রাঙ্ক আর সুটকেস খুলে সেগুলোর দিকে কৌতুকের চোখে চেয়ে দেখল সে। এখন আর এ-সব পরার মানে হয় না। খুঁজেপেতে সে ট্রাঙ্কের তলা থেকে পুরনো কয়েকটা সুতির শার্টপ্যান্ট বের করল। প্যান্টের ঘের আঠারো ইঞ্চি, শার্টের কলার অনাধুনিক। সেগুলো পরে নিজেকে বেঢপ মনে হচ্ছিল তার। হাসি চেপে সে সেই পোশাকে চাকরি খুঁজতে বেরোল।

চাকরি? হ্যাঁ, হতে পারে। তার মতো অভিজ্ঞ, অথচ তরুণ লোকের চাকরি আটকাবে না। তবে, একটু দেরি হবে। আর হ্যাঁ, সে হরি মজুমদারের ফার্ম ছাড়ল কেন? কোনও গোলমাল হয়েছিল? কী ধরনের গোলমাল! অত বড় ইঞ্জিনিয়ার, শেল-ডিজাইনে যার জুড়ি নেই! তা ছাড়া দেশি ফার্ম দেশের অহংকার! অমন লোকটাকে ছাড়ল কেন সে?

ক্রমে শ্যাম বুঝল এইসব ফার্মগুলোতে নালী ঘায়ের মতো মজুমদারের খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। মাস তিনেক পর আবার সামান্য ক্লান্তি ও মাথাধরা পেয়ে বসল তাকে। একদিন ভিড়ের এক চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে বিকেলের মরা আলোর দিকে চেয়ে সে বিড়বিড় করে বলল, আমি শেষ হয়ে গেছি। পরমুহূর্তেই চমকে উঠে সে দ্রুত এলোপাথাড়ি হাঁটতে লাগল।

আর-একদিন সে হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে ডান হাতের চকচকে একটা সুন্দর ব্লেড কণ্ঠনালীর ওপর রাখল। সামান্য একটু চাপ দিল। বড় আরাম! কিছুক্ষণ পর সরু রক্তের কয়েকটা রেখা তার গেঞ্জির ওপর নেমে বুক ভাসিয়ে দিল। ব্লেডটা ছুড়ে ফেলে সে হেসে আপনমনে বলল, ধ্যুৎ, বড্ড নাটুকে। তারপর তোয়ালে দিয়ে গলা মুছে ডেটল লাগাল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রাস্তায় জীবন্ত মানুষজন চলাফেরা করছে। ক্ষতের ওপর ভেজা তুলো চেপে সে চোখ বুজল। আঃ! বড় আরাম!

তার দু'টি শৌখিনতা ছিল। টেলিফোন করা, আর সকালে রোজ দাড়ি কামানো। অফিসে তার টেবিলে যখন নিজস্ব টেলিফোন থাকত তখন সে একটু অবসর পেলেই প্রায় অকারণে একে-ওকে-তাকে ফোন করত। কতজনকে যে সে তার ফোনের নম্বর দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। টেলিফোনে লোকের গলা শুনতে, আর টেলিফোনের জন্যই তৈরি করা কৃত্রিম গলায় কথা বলতে তার ভাল লাগত। চাকরি যাওয়ার ছ' মাসের মধ্যে সে টেলিফোন করল মাত্র দু'টি। প্রথমটা করল কলেজ স্ট্রিট ওয়াই এম সি এ থেকে তার অফিসে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা কবে পাওয়া যাবে তা জানতে। দ্বিতীয়টা করল শিয়ালদার স্বয়ংক্রিয় বুথ থেকে ইতুকে, যার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় দক্ষিণ কলকাতার এক রেস্তরাঁয়, এবং যাকে কয়েকবারই সে তার শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মেলামেশাটা, যা ঠিক প্রেম নয়, তা বিয়েতে একটা রফায় পৌঁছুতে পারত। তাদের এ রকম কথাবার্তা হল।

শ্যাম, ইতু! কেমন আছ?

ইতু, ভাল না। তোমার দেখা নেই দু' মাস!

আমার খোঁজ করেছিলে?

হ্যাঁ, অফিসে প্রায় মাস দুই আগে টেলিফোন করেছিলুম।

ওরা কী বলল?

বলল, তোমাকে...তোমাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম একটু ভেবে বলল, কথাটা ঠিক নয়। আমিই ছেড়ে দিয়েছি।

কেন?

হি কল্‌ড মি নেমস্‌।
হু?
দি বস, দি বাস্টার্ড।
ইতু একটু চুপ থেকে বলল, এত দিন কী করছিলে? চাকরির খোঁজ!
হুঁ।
কিছু পেলে? বেটার কিছু?
নন্‌ন্নাঃ।
এখন কী করবে?
শ্যাম মৃদু হাসল, ভাবছি বিয়ে করলে কেমন হয়। ইট্‌স্‌ হাই টাইম।
বেশ তো! কাকে?
তুমি রাজি আছ?
হুঁউ। এক্ষুনি। বলতে বলতে ইতুর গলায় খুব আবেগ এসে গেল, মহীয়সী মহিলার মতো শোনাল তার গলা, শ্যাম, আমিও ছোটখাটো একটা চাকরি করি, তা ছাড়া আমার কিছু গয়না আছে। আমাদের দু'জনের...

শুনতে শুনতে শ্যাম খুব ধীরে ধীরে কান থেকে ফোনটা নামিয়ে আনল, তারপর ঘুমন্ত বাচ্চাকে মা যেভাবে শোওয়ায় সেইরকম সন্তর্পণে ক্র্যাডেলে রেখে দিল ফোনটা।

আজকাল প্রায়ই শ্যামের মুখে দাড়ি বেড়ে যায়। সেই চাপা চিবুক, গভীর খাঁজওয়ালা সুন্দর থুতনি, ঝকঝকে মুখে সামান্য নিষ্ঠুরতা—যা তাকে আকর্ষণীয় করে তুলত, তা মাত্র কয়েক দিনের না-কামানো দাড়ির তলায় চাপা পড়ে যায়। বড় নিরীহ ও অসহায় দেখায় তাকে। কার্যকারণসূত্র জানে না শ্যাম, তবু তার মনে হয় দাড়ি কামানো না থাকলে চোখ দুটোকেও কেমন যেন একটু ঘোলাটে আর অনুজ্জ্বল দেখায়।

সময় কাটে না বলে শ্যাম মাঝে মাঝে বাসে উঠে টার্মিনাস থেকে টার্মিনাস পর্যন্ত ঘুরে আসে। সুন্দর সময় কেটে যায়। একদিন বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারের বাসে উঠেছিল শ্যাম। ভবানীপুরে বাস বিকল হল। বিরক্ত না হয়ে শ্যাম ধীরে সুস্থে নেমে পড়ল। ঘড়িতে সময় দেখল, আড়াইটে। সামনেই একটা ফাঁকা সিনেমা হল। ছবির নামটাও পড়ল না শ্যাম, বাইরের আঁকা ছবিগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না, টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল। নিশ্চিত ফ্লপ ছবি, লোকে দেখছে না। আধো অন্ধকার হলের ভিতরে পা দিতেই একটি টর্চের আলো আর একটা ভুতুড়ে হাত এগিয়ে আসে। নিশ্চিন্ত মনে টিকিটটা লোকটার হাতে গুঁজে দেয় শ্যাম, তারপর তার পিছু পিছু চলতে থাকে। সিট দেখিয়ে লোকটা ফিরে যাচ্ছিল, শ্যাম ডাকল, মানুমামা না? টর্চ হাতে লোকটা চমকে ফিরে তাকাল, আরে! শ্যাম! এই সিনেমা হলেই যে মানুমামা কাজ করে তা শ্যাম বার বারই ভুলে যায়। মনে পড়ে, বেশ কিছুদিন আগে সে বৃন্দা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে এখানে ছবি দেখতে এসেছিল একদিন, মানুমামার কথা তার খেয়াল ছিল না। সেদিনও মানুমামা সিট দেখিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধিমান মানুমামা সেদিন তাকে চিনবার বা তার সঙ্গে কথা বলবার কোনও চেষ্টা করেনি। তবু সারাক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল শ্যাম। বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল আর কোনওদিন এই হলে আসবে না। কিন্তু এখন এবার সে আধো অন্ধকারে টর্চ-হাতে মানুমামার দিকে সহজ চোখে তাকিয়ে হেসে বলল, কেমন আছ মামু? তারপর কী ভেবে হঠাৎ অনভ্যাসজনিত দ্বিধা ত্যাগ করে নিচু হয়ে মানুমামাকে প্রণাম করল। অন্তত বিশজন লোক এই দৃশ্য দেখল। খুশি হয়ে মানুমামা বলল, তোকে চেনাই যায় না, রোগা হয়ে গেছিস, গালে একগাল দাড়ি, কী হয়েছে? অমায়িক একটু হাসল শ্যাম, তারপর অবলীলায় বলল, গারদ থেকে বেরোলুম। মানুমামা চমকে ওঠে, কী গারদ? শ্যাম আস্তে করে বলে, পাগলা। মানুমামা একটু ইতস্তত করে, চাকরিটা? শ্যাম বলে, গেছে। মানুমামা দরজার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, তুই বোস। আমি পরে এসে কথা বলে যাব। শ্যাম বসল, এবং আপনমনে হাসল। মিথ্যেটুকুর জন্য সামান্য ঘেন্না হচ্ছিল তার, তবু কে জানে হয়তো মানুমামা খুশিই হল। আত্মীয়স্বজনদের সে বরাবর এড়িয়ে চলে, তারাও তাকে ঘাঁটায় না। তার কোনও অমঙ্গল ঘটলে এরা কেউ কেউ খুশি হতে পারে। ইন্টারভালের পর হল অন্ধকার হয়ে গেল, সে একসময়ে চমকে উঠে টের পেল তার ডান

হাতে কে যেন একটা ভরতি ঠোঙা গুঁজে দিচ্ছে। চেয়ে দেখল মানুমামা, বাদাম-চানাচুরের ঠোঙাটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে সিটের পাশেই প্যাসেজে উবু হয়ে বসে হাসছে। সে তাকাতেই বলল, আমার বড় ছেলে বিশুটাকে একদিন তোর কাছে পাঠাব। ওর সঙ্গে আমাদের বাসায় চলে আসবি। আমাদের গড়িয়ায় মস্ত বড় এক তান্ত্রিক আছেন, সব অসুখ সারিয়ে দেন, তোকে দেখিয়ে দেব। শ্যাম মৃদু হেসে বলল, দেখা যাবে। মানুমামা ভূতের মতোই হলের অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল। শ্যাম গালের দাড়িতে হাত বোলায়। তার জামাকাপড় নোংরা, চোখ ঘোলাটে। কে জানে হয়তো তার দুর্দশা দেখে মানুমামা খুশি হয়নি। কাজেই মানুমামার ভুলটা ভেঙে দেওয়া দরকার মনে করে সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকারে আন্দাজে 'মামু—উ' বলে ডাক দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার কাঁধের ওপর একখানা ভারী হাত এসে পড়ল, আস্তে, দাদা! সামান্য হাসির শব্দ। ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা গলাও শোনা গেল, মামাকে পরে খুঁজবেন, এখন ছবি দেখুন। শ্যাম আস্তে করে বলল, শালা! তারপর চুপ করে অর্থহীন চোখে ছবি দেখতে লাগল। ভেবে দেখল, এখন মামুর ভুল ভাঙতে গেলে আরও গোলমাল হয়ে যাবে। আরও ভেবে দেখল যে, কয়েকদিনের মধ্যেই তার অনেক আত্মীয়স্বজন জেনে যাবে যে, সে পাগল হয়ে গেছে বা গিয়েছিল! অন্ধকারে আপনমনে নিঃশব্দে হাসল শ্যাম, তারপর সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

চাকরি যাওয়ার পর থেকে যে পাইস হোটেলে দু'বেলা খাচ্ছিল শ্যাম, সেখানে সুবোধ মিত্রের সঙ্গে আলাপ। একদিন রাতে মুখোমুখি খেতে বসে মিত্র বলল, কী মশাই, সংসার-টংসার ছাড়ার মতলব আছে নাকি? দাড়িফাড়ি না কামালে যে বড় উদাসীন দেখায় আপনাকে!

শ্যাম মৃদু হাসে, সংসার কোথায় যে ছাড়ব?

মিত্র বলে, কেন, আপনার তো মা-বাবা আছেন! তাঁদের জন্য এবার একটি ডবকা দেখে দাসী এনে ফেলুন।

সে তো আপনিও আনতে পারতেন।

মিত্রকে হঠাৎ খুব গম্ভীর দেখাল। একটু চুপ করে থেকে শ্বাস ছেড়ে বলল, আমার জীবনে একটা ট্রাজেডি আছে মশাই। বলে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিত্র মৃদু হেসে গলা নামিয়ে বলল, আমার মশাই, একটা লাভ অ্যাফেয়ার ছিল। সে মেয়েটা তার বিয়ের পর অনেক কেঁদেকেটে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যেন বিয়ে না করি। তখন সেন্টিমেন্টের বয়স, তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। কিন্তু এখন...মিত্র শ্বাস ছেড়ে বলল, এখন ভাবি কী-সব বোকামি! এ-সব প্রতিজ্ঞার কোনও দাম নেই, কী বলেন?

শ্যাম মোলায়েম গলায় বলে, দূর দূর...

মিত্র নিশ্চিন্ত গলায় বলে, কী জানি মশাই, এখনও কেমন যেন খচখচ করে মনের মধ্যে—

শ্যাম বিস্মিত গলায় বলে, শব্দ হয়?

অ্যাঁ? অন্যমনস্ক মিত্র কথাটা খেয়াল করল না।

শ্যাম মাথা নেড়ে বলল, কিছু না।

হঠাৎ আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে মিত্র বলল, আমার বয়স তেত্রিশ। আমরা মশাই ময়মনসিংহের মিত্র। ঝাড়া হাত পা, একটি বোন ছিল, কাঁচড়াপাড়ায় বিয়ে দিয়েছি, ছোটভাই সাহারাণপুরে ফিটার, ভাল ফুটবল খেলত। ছিলুম মা আর আমি। তা মা মারা গেলে একটি চাকর রেখে চালাচ্ছিলুম, সে চুরি করতে শুরু করায় তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে এই হোটেলে জুটেছি, কিন্তু এখন মশাই পেটে সইছে না। তা ছাড়া মা মরে গিয়ে বাসাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে... বলে একটু দুঃখের হাসি হাসল মিত্র, আমার মশাই দাবি-দাওয়া নেই। একটু দেখবেন তো...

এত কথা শুনছিল না শ্যাম। মিত্রের বয়সের কথায় তার মন আটকে ছিল। মিত্রের বয়স তেত্রিশ! তার সন্দেহ হল যে, বিয়ের লোভে মিত্র অন্তত সাত-আট বছর বয়স কমিয়ে বলছে।

মিত্রের এঁটো ডান হাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে এসেছিল। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘেন্নায় লাফিয়ে

উঠল শ্যাম, বলল, দেখব। তারপর আঁচাতে গিয়ে বেসিনের ওপর আয়নায় নিজের মুখখানা এক পলকে দেখে নিল সে। তেলতেল করছে তার মুখ, অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি, অনেক দিন তেল বা শ্যাম্পু না দেওয়া রুক্ষ চুলে তাকে পাগলাটে দেখায়। হাত-আয়নায় রোজ সে মুখ দেখে, কিন্তু এই বড় আয়নায় তাকে অন্য রকম দেখায়। তার মনে হয়, তার দু' চোখে এক ধরনের পরিবর্তন এসে যাচ্ছে।

আঁচিয়ে এসে মৌরি মুখে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ডিসেম্বরের শীতরাত্রির ফুটপাথে সে কয়েকটা ঘুমন্ত ঘেয়ো কুকুরকে ডিঙিয়ে গেল, পেরিয়ে গেল গাড়ি-বারান্দার তলায় শুয়ে থাকা জড়োসড়ো কয়েকটা ভিখিরিকে, যেতে যেতে বাড়ির দেয়ালগুলোতে হাত রেখে শিস দিল সে। সামনেই একটা পার্ক—শীত আর ঘন কুয়াশায় জমে আছে। রেলিং টপকে সে ভিতরে ঢুকল। বেঞ্চিগুলি ফাঁকা পড়ে আছে। শ্যাম বসে সিগারেট ধরায়। পায়ের স্যান্ডেল ঘাসের শিশিরে ভিজে গেছে, পা বেয়ে শিরশির করে উঠে আসছে শীত, কুয়াশায় দম-চাপা ভাব আর কাঠ কিংবা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ। শ্যাম নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে, ঘড়ির দিকে তাকায় না, তার মন গুনগুন করে ওঠে—উদাসীন, বড় উদাসীন দেখায় তোমাকে শ্যাম!

আকাশে তারা না, মেঘ না, কিছুই দেখা যায় না। শুধু ধোঁয়ার মতো কুয়াশা তাকে ঘিরে ধরে। বহুদূর দিয়ে মন্থর বিষণ্ণ ট্রাম চলে যাওয়ার শব্দ হয়, টুপ-টাপ করে অন্ধকারে কোথাও গাছের পাতা কি শিশির ঝরে পড়ে। দূরে কোনও ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আভা লেগে কুয়াশা সামান্য হলদে হয়ে আছে, এত ক্ষীণ সেই আলো যে, তাতে শ্যামের ছায়াও পড়ে না। শ্যামের মনে হয়, জীবনের সবচেয়ে সুসময় এইটাই যা সে পেরিয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখলে এখন তার মন উচ্চাশার হাত থেকে মুক্ত। তার চাকরি যাওয়ার পর ছ' মাস কেটে গেছে। হাতের জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে ক্রমে। তবু তার কোনও উদ্বেগ নেই। কোনও দুশ্চিন্তাই সে বোধ করছে না। তার পরনে ধুতি-শার্ট আর কবেকার পুরনো একটা এন্ডির চাদর। ছ' মাস আগে এ-পোশাকে বেরোনোর কথা তার কল্পনায়ও আসত না। দুপুরে তার অফিসে ছিল বাঁধা লাঞ্চ, রাত্রে খাওয়ার স্থিরতা ছিল না—তার কোম্পানির মক্কেলদেরই কেউ না কেউ তাকে বড় হোটেলগুলিতে নিয়ে যেত। না, সে সৎ ছিল না, এখনও তার সততার প্রতি কোনও মোহ নেই। ইচ্ছে করলে এবং প্রয়োজন হলে এখনও সে যে-কোনও কাজ করতে পারে, যে-কোনও পাপও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখন আর তার ইচ্ছাগুলির কোনও জোর নেই, না আছে কোনও স্পষ্ট প্রয়োজনবোধ। কী করে, কখন কবে তার উচ্চাশাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কীভাবেই বা কেটে গেছে উদ্বেগ তা সে টেরও পায়নি। নিজেকে বড় উদাসীন মনে হয় তার। হঠাৎ সুবোধ মিত্রের কথা মনে পড়লে সে 'আঃ' শব্দ করে অন্ধকারেই আপনমনে হেসে উঠল। চল্লিশে এসে মিত্র কাঙালের মতো বিয়ের কথা পাড়ছে এলোপাথাড়ি, পাইস হোটেলে মুখোমুখি খেতে বসে। ইচ্ছে করে মিত্রের কাছে গিয়ে সে তার প্রেমের কাহিনীগুলি শুনিয়ে আসে। হ্যাঁ মশাই, সে-সব মেয়ের কথা আপনি ভাবতে পারবেন না। বৃন্দাকে প্রথম দেখি পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তরাঁয়, সঙ্গে ভালমানুষ গোছের একটি প্রেমিক ছেলে। দু'বার, ঠিক দু'বার সে তাকিয়েছিল আমার দিকে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—যে দিক থেকে আমার মুখশ্রী সবচেয়ে ভাল দেখায়, সেই দিকটাই ফেরানো ছিল তার দিকে; হ্যাঁ মশাই, বাঁ দিক থেকেই আমাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। আমি তারপর সোজা উঠে গেলুম তাদের টেবিলের কাছে, বৃন্দার দিকে চোখ রেখে আমি ছেলেটার দিকে হাত বাড়ালুম—দেশলাইটা। বিরক্তির সঙ্গেই বোধহয় ছেলেটি দেশলাই এগিয়ে দিলে। অপ্রয়োজনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমি বৃন্দার দিকে চেয়ে একটু হেসেছিলুম। সেই হাসি আমি শিখেছিলুম কলকাতার সবচেয়ে সেরা বদমাশদের কাছ থেকে। অনেক বার ও রেস্তরাঁ ঘুরে তা আমাকে শিখতে হয়েছিল। তার পরদিন বৃন্দা সেই রেস্তরাঁয় এসেছিল একা। কী করে সে তার প্রেমিক সঙ্গীটিকে কাটিয়ে এসেছিল তা আমি আজও জানি না। হ্যাঁ মশাই, তারপর বৃন্দাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পেরেছিলুম। কিংবা মাধবীর কথা ধরা যাক—যাকে আমি প্রথম দেখি এক ফিল্ম ক্লাবের শোতে। যার নীল রঙের প্লিমাউথ গাড়িটাকে আমার ভাড়াটে ট্যাক্সি বাঘের মতো তাড়া করেছিল। তারপর মাধবীকেও একদিন—হ্যাঁ মশাই, তারপর মাধবীও একদিন বলেছিল—দিন দিন তুমি কী হয়ে যাচ্ছ শ্যাম, তুমি ইতরের মতো তাকাতে শিখেছ—বলতে বলতে সে তার নরম মেরুদণ্ড পিছনে হেলিয়ে ভেঙে দিয়েছিল সবুজ ডিভানে। তবু বলি, আমার মন ছিল হাঁসের শরীর। আমার শরীরের ভিতরে

ছিল বিশুদ্ধ বাতাস, আর উজ্জ্বল রক্ত। কোনও দিন কখনও কোনও মেয়ের জন্য আমি হাঁটু ভেঙে প্রার্থনায় বসিনি। বলিনি—দয়া করে আমাকে ভালবাসো। কেননা তার দরকার ছিল না। শুধু ওই মেয়েটি, ওই আটপৌরে ইতু কোনও দিনই বিয়ে করার কথা ভুলতে পারল না। যেমন পারেননি আপনি। কেমন সেই মেয়ে যার প্রেমে আপনি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত টিকে গেলেন। প্রেমের নামে আমি মশাই শিস দিই, আমার চোখ ইতর হয়ে যায়, আমার ঠোঁটে ফুটে ওঠে সেই হাসি। আমি প্রেম ওইরকম বুঝি মশাই। আমার কেবল ভয় ওই আটপৌরে মেয়েদের, চার দিন কথা বলার পর যারা পাঁচ দিনের দিন মিনমিন করে বলে, বাবা বলছিল, ছেলেটাকে একবার নিয়ে আসিস তো খুকি, দেখব। হ্যাঁগো মিত্তিরমশাই, আপনার জুলিয়েটটি কেমন ছিল? ওই রকম আটপৌরে তো, শেষ পর্যন্ত দেখুন এত বয়সেও আপনাকে হাফ-সন্ন্যাসী করে রেখে গেছে! বিয়ে করবেন? তা আপনার কপালে ওইরকম আটপৌরেই জোটার সম্ভাবনা, যে আর-একজন সন্ন্যাসী বানিয়ে আপনার ঘর করতে আসবে নিশ্চিন্ত মুখে। তার সেই প্রেমিকের স্মৃতি তার চন্দনের হাতবাক্স বা গোপন চিঠির মতো, মাঝে মাঝে পানের বাটার সামনে বসে বা ছেলে মানুষ করতে করতে মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখবে। ঈশ্বর! আমার ভাগ্য ভাল যে, আমার শরীরের ভিতরে এখনও রয়েছে বিশুদ্ধ বাতাস, আর উজ্জ্বল রক্ত। কখনও কোনও মেয়ের জন্য আমি হাঁটু গেড়ে বসিনি প্রার্থনায়। আমার মন মশাই, হাঁসের শরীর। হ্যাঁ, চমৎকারভাবেই আমি এতকাল মেয়েদের ব্যবহার করে এসেছি। আঁচলের গেরোয় বাঁধা পড়িনি। আমি নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ। আজ আমার দুরবস্থা দেখে ভাববেন না। সেই তরমুজ বিক্রেতার কথা ভেবে দেখুন, যে বলেছিল, আমরা কি ভগবানের হাত থেকে কেবল ভালটাই গ্রহণ করব, মন্দটা নয়? তা আমার অবস্থা এমন কিছু খারাপও নয়। চাকরি নেই, কিন্তু যে-কোনও সময়ে চাকরি হয়ে যেতে পারে। দরকার একটু ঘোরাঘুরির উৎসাহ। দাড়িটা যদি কামাই, ছ' মাস আগেকার প্যান্ট-শার্ট-টাই যদি গায়ে দিই, আর চোখের সেই অভ্যস্ত চাউনি আর হাসিটা যদি দু'-একদিন অভ্যেস করে নিই, তবে অল্পদিনেই আবার আমার চারদিকে চাঁদের জেল্লা লেগে যাবে। হায়, শুধু কেবল কেন যেন উৎসাহ পাই না আর! আঃ, আমার হাই উঠছে।

বাস্তবিক শ্যামের হাই উঠছিল। কুয়াশা আরও একটু ঘন হয়েছে। তার শীত করতে থাকে। দূরে কোথাও ফুটপাথে পাহারাওলার লাঠি ঠোকার আওয়াজ হচ্ছে। ঘড়ি এই আলো-আঁধারিতে দেখা যায় না, সে সময় আন্দাজ করার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না। কুকুর কাঁদছে, শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ কণ্ঠের একটু গান। শ্যাম উঠে পড়ল।

সেই রাত্রে শ্যাম ছোট হাত-আয়নায় তার মুখখানা পবিত্র গ্রন্থের মতো পাঠ করল রাত জেগে জেগে। উদাসীন! বড় কি উদাসীন দেখায় আমাকে! ভাবতে ভাবতে শ্যাম হেসে উঠল। গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। তারপর অতর্কিতে ঘুমিয়ে পড়ল আলো না নিভিয়ে।

শীত এসে গেছে। কলকাতার স্বল্পস্থায়ী শীত। বাতাসে শৌখিন ঠান্ডা ভাব। রোজ সকালে অল্প কুয়াশা হয়, রোদের রং থাকে লাল। আগে যখন সাড়ে আটটায় অফিসে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়তে হত, সেই তখনকার পুরনো অভ্যাসমতোই সকালে ঘুম ভেঙে যায় শ্যামের। ভোরের জানালার দিকে সে এক পলক চেয়ে দেখে, তারপর আবার চোখ বুজে বালিশ আঁকড়ে ধরে, চোখের ওপর লেপ টেনে আলো ঢেকে দেয়। শরীরের ভিতরে জ্বরভাব, শীত আর সামান্য মাথাধরা নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। শরীর তাজা রাখার জন্য সে আগে ভোরে উঠে সামান্য ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম করত, কয়েকটা বেন্ডিং, আর তিন-চারটে আসন। সে-কথা ভাবতেই এখন ক্লান্তিতে হাই ওঠে তার। চোখ বুজে সে পুরনো শ্যামকে দেখতে পায়। দেখে, সে মেঝেতে ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ডন মারছে, কখনও নিচু হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, কখনও বা বাতাসে ঘুষি ছুড়তে ছুড়তে অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে তাড়া করে ফিরছে ঘরময়। সেই ঘুষিতে একবার রূপশ্রী ফার্নিচার্সের ওয়ার্ডরোবটার একটা পাল্লা চোট খেয়েছিল, আর দেয়ালের দুর্বল একটা জায়গার চুনবালি খসে পড়েছিল বলে বড় খুশি হয়েছিল শ্যাম। পুরনো সেই শ্যামের শরীর নিয়ে এইসব অর্থহীন নাড়াচাড়া মনে করে সে হাসে, তারপর দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শোয়। শরীরের ওপর বড় মায়া ছিল শ্যামের, সবসময়ে নিজেকে সে চোখে চোখে রাখত। সে খুব সতর্কভাবে রাস্তা পার হত, সুন্দর ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠত কিংবা নামত, সুন্দর ভঙ্গিতে টেলিফোন

তুলে নিত কানে— সবকিছুতেই তখন বড় মনোযোগ ছিল তার। যেন কখনও কোনও সময়েই তাকে কুৎসিত না দেখায়।

লেপের ভিতরে একটা খোঁদল তৈরি করে শুয়ে থাকে শ্যাম। আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে যায়। খোঁদলের ভিতর তার নিশ্বাস আর গায়ের তাপ জমে ওঠে। মুখের ঢাকা সরালে চোখে আলো এসে লাগে। এরকম অবস্থায় একসময়ে তাকে বিছানা ছাড়তেই হয়। উঠে সে স্নান করে নেয়, সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় পায়চারি করে। মাঝে মাঝে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে। ঘরেই রয়েছে তার চায়ের সরঞ্জাম— কেরোসিন স্টোভ, কেটলি, চা, চিনি, দুধের কৌটো। চাকরির সময়ে সে সকালের সামান্য অবসরেই চা তৈরি করত, ডিম সিদ্ধ করে খেয়ে নিত। এখন আর তার অত সময় নেই। গত কয়েক মাসে কৌটোর চায়ে ছাতা ধরেছে বোধহয়, হয়তো পচে গেছে টিনের দুধ— সে খুলে দেখেনি। এখন ইংরিজি খবরের কাগজখানা মেঝেয় পায়ের নীচে লুটোপুটি খায়, আগে সেখানার কদর ছিল—সকালে আগাপাশতলা চোখ বুলোত, রাত্রে ফিরে কখনও কখনও ভাল করে খুঁটিয়ে পড়ত।

বেলা আর-একটু বাড়লে সে হোটেলের দিকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সোজা চলে যায় দুপুরের ফাঁকা কোনও বাস বা ট্রাম টার্মিনাসে বা স্টপে। চেনাশোনা লোকের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। হলেও শ্যাম এড়িয়ে যেতে পারে। তার গালে দাড়ি, চুল বড় বড়, এবং ভাগ্যক্রমে সে অনেকটা রোগা আর কালো হয়ে গেছে, হাঁটাচলার ভঙ্গিও পালটে ফেলেছে অনেকটা, তা ছাড়া সে ভেবেচিন্তে একটা রোদ-চশমা কিনে নিয়েছে। সব মিলিয়ে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক তার ছদ্মবেশ। এই আড়াল থেকে সে মাঝে মাঝে দু'-একজন চেনা মানুষকে অসতর্ক অবস্থায় দেখে নেয়। একদিন মাধুকে দেখল শ্যাম। দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে মাধু, চর্বিতে থলথল করছে শরীর, এই শীতেও ঘামছে। ঘামে আর চর্বিতে নাকের ভারী চশমাটা পিছলে নেমে এসেছে অনেকটা। পায়ের একটা স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, সেই ছেঁড়া চটি হাতে নিয়ে খুবই বিপন্ন আর চিন্তিত মুখে ট্রামের সিটে বসে আছে মাধু। আরও লক্ষ করল শ্যাম— মাধুর গায়ে নতুন মটকার পাঞ্জাবি, ধোয়া ধুতি পরনে, কাঁধে শাল আর শালের নীচে শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগ। বছরখানেক আগে যখন দেখা হত, তখন বাইরে মফস্‌সলের কোথাও মাস্টারি করত মাধু, তখন ওর মায়ের ক্যান্সার, প্রায়ই কলকাতায় ছোটাছুটি করতে হত। শ্যামকে কতবার বলেছে মাধু— আমাকে কলকাতায় একটা চাকরি জুটিয়ে দে শ্যাম, মফস্‌সলে লাইফ নেই। তা ছাড়া আমার মায়ের ক্যান্সার...। বিশুষ্ক আর উদ্‌ভ্রান্ত দেখাত মাধুকে, শ্যামের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে পারত না, চাকরবাকরের মতো ব্যবহার করত। মৃদু হেসে তাই মাধুকে এড়িয়ে যেত শ্যাম। ভিড়ের ভিতরে রড ধরে দাঁড়িয়ে বিকেলের ট্রামে মাধুকে ভাল করে লক্ষ করছিল শ্যাম। মাধুকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল— শুধু স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া চটিটার জন্যেই যা একটু চিন্তিত বোধ হয়। ধার দিয়ে শ্যামের মনে থাকে না, ধার নিয়েও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাধুর কাছে তার পঁচিশটা টাকা পাওনা আছে। মনে হচ্ছে মাধুর অবস্থা এখন ভালই। মাধুর কাছে টাকাটা চেয়ে বসলে কেমন হয়? ভাবতেই হাসিতে তার গা শিরশির করে উঠল। একট্রাম ভিড়ের মধ্যে বেশ গলা ছেড়েই টাকাটার কথা বলা যাবে। ভেবে ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে সামান্য এগিয়ে গিয়েছিল শ্যাম, হঠাৎ মাঝপথে থেমে সে নিশ্বাসের সঙ্গে গালাগাল দিল— শালা হারামি, বিট্রেয়ার। কেন না মাধুর পাশে জানালার ধার ঘেঁষে বসে আছে সুন্দর কটকি ছাপের শাড়ি-পরা অল্পবয়সি একটি বউ—মাধুর বউ সন্দেহ নেই। ভিড়ে এতক্ষণ বউটি আড়াল ছিল। জানালার কাঠে কনুইয়ের ভর, হাতের চেটোয় রেখেছে মুখ, সে মুখ জানালার দিকে ফেরানো। শ্যাম গলা বাড়িয়ে দেখছিল। খেয়াল ছিল না, তার খোঁচা দাড়ির ঘষা লাগল মোটামতো একটা লোকের ঘাড়ে। লোকটা মুখ ফিরিয়ে নীরবে চোখ দিয়ে একটা ধমক দিলে শ্যাম সামান্য পিছিয়ে আসে। বস্তুত মাধুর মা যে আর বেঁচে নেই তা মাধুর তৃপ্ত মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। আর ওই বউটা বোধহয় মাধুর মায়ের শেষ ইচ্ছে। ছেলের বউ না দেখে মরবেন না এরকম একটা বায়না ধরেছিলেন বলেই বোধহয় মাধু তাড়াহুড়ো করে বিয়েটা করে ফেলেছে। নইলে ওর যা রোজগার তাতে বিয়ে করার কথা নয়। অবশ্য মা মরে গিয়ে থাকলে এখন মাধুর খরচ কিছুটা বাঁচছে। কে জানে, হয়তো মা মরে যাবে হিসেব করেই সামান্য ঝুঁকি নিয়ে বিয়েটা করেছে ও। শ্যাম আবার মনে মনে বলল, শালা বিট্রেয়ার। অকারণেই মাধুর ওপর তার রাগ হচ্ছিল। ঠান্ডা মাথায় সে

ভেবে দেখল এখন মাধুকে দু'ভাবে বিপদে ফেলা যায়। সোজা ওর কাছে গিয়ে বলা যায়, আরে মাধু!

ভীষণ চমকে উঠে তাকে দেখে অস্বস্তির হাসি হাসবে মাধু, শ্যাম! ইস, তোকে চেনাই যায় না! তারপর...?

তুই একটু মুটিয়েছিস। বলেই হেসে চোখের ইঙ্গিত করবে শ্যাম, বউটিকে দেখিয়ে ভ্রূ নাচাবে, কে?

এঃ হেঃ, তোকে খবর দিইনি বুঝি! এ হচ্ছে মাধুরী, আমার বউ। তারপর প্রায় জলে পড়ে গিয়ে বউয়ের দিকে মুখ নামিয়ে বলবে, মাধুরী, এই শ্যাম, আমার বন্ধু। এর কথা—, তারপর শ্যামের দিকে ফিরে বলবে, তোর অফিসে কিন্তু খবর দিতে গিয়েছিলুম। ওরা বলল তোর চাকরি গেছে।

ব্যস, ওটুকুতেই শ্যাম ওকে অপমান করার যথেষ্ট কারণ পেয়ে যাবে। সকলের সামনে ও তার চাকরি যাওয়ার কথা কেন বলল? তখন সে মৃদু হেসে বলবে, হ্যাঁ, গেছে। বড় কষ্টে আছি ভাই। তারপর গলা সামান্য খাটো করবে শ্যাম এমনভাবে, যেন বউটি এবং কাছাকাছি কয়েকজন শুনতে পায়, মাধু, তোর কাছে যে টাকাটা পাওনা আছে—

মাধু, বিপন্ন মুখে, কোনটা বল তো!

ওই যে রে শালা, গত শীতে এক রাতে মাল খাবি বলে নিয়েছিলি! মনে নেই? বলতে বলতে শ্যাম লক্ষ করবে বউটি নড়ে উঠল একটু।

মাধু ভীষণ ভয় পেয়ে বলবে, আমি?

হ্যাঁ রে শালা, এক শনিবার, তুই রেসের মাঠে পঁয়ষট্টি টাকা হেরে গেলি! পবননন্দন আর টিটানির ওপর ডাবল ধরেছিলি— মনে নেই! তারপর খালাসিটোলা—

জীবনে মদ খেয়েছে মাধু— এমন মনে হয় না। তবু শ্যাম জানে এ-সব কথা চাপা দেওয়ার জন্যেই কাষ্ঠহাসি হেসে মাধু বলবে, ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যাম, কী রোগা হয়ে গেছিস! একদিন আয় না, কলকাতাতেই বাসা করেছি এখন, এখানেই চাকরি।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম বলবে, যাব। ঠিকানাটা—?

বিমর্ষ মুখে মাধু ঠিকানা বলে যাবে, বলবে, টুইশ্যানির জ্বালায় ঘরে থাকা যায় না রে ছুটির দিনে আসিস। আগে খবর দিবি, নইলে সিনেমা-টিনেমায় হয়তো গেলুম—

বস্তুত ঠিকানা দিয়ে মাধু আর-এক ধরনের বিপদে পড়বে। মৃদু বিষের মতো সেই বিপদ। কেননা মাধু দেখেছে কেমন কৃতিত্বের সঙ্গে অনায়াসে মেয়েদের ব্যবহার করে শ্যাম! তা ছাড়া শ্যামের না আছে বাছবিচার, না আছে ধর্মবোধ। ঠিকানা দিয়ে তার সেই ভয় হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বউটি ঠিকঠাক সতী হলেও কোনও লাভ নেই। বউকে বিশ্বাস করবে এমন মনের জোর মাধুর কোথায়?

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠল শ্যাম। কাছাকাছি লোকেরা তার দিকে চেয়ে দেখল। মাধু নেমে গেল কালীঘাটে, গোয়ালন্দের স্টিমারের মতো ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এক হাতে সসংকোচে ধরে থাকা ছেঁড়া চটি, পিছনে বউ। তার দিকে ফিরেও তাকাল না। বউটির ঘোমটাব পাড় শ্যামের থুতনি ছুঁয়ে গেল। নেমে দাঁড়াতে একটু গলা বাড়িয়ে দেখল শ্যাম— বউটা মাধুর সমান লম্বা। স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে ট্রাম, এ সময়ে শ্যামের মনে হল, একটা কিছু করলে হত। তার সামান্য আফসোস হচ্ছিল। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেই মোটা লোকটা। শ্যামের ইচ্ছে হচ্ছিল তার ঘাড়ে আর-একবার দাড়ি ঘষে দেয়। তারপর একসময়ে সে মনে মনে মাধুকে মুক্তি দিয়ে বলল, তুই আরও সুখী হয়ে যা মাধু, তুই আরও মোটা হয়ে যা। তোকে পঁচিশ টাকা ছেড়ে দিলুম। আশীর্বাদ করছি, তোকে যেন বেশি হাঁটতে না হয়, যেন কাছাকাছিই তুই একটা মুচি পেয়ে যাস। মনে মনে এই কথা বলে খুব তৃপ্তি পেল শ্যাম।

আর-একদিন হঠাৎ ডবলডেকারে কলেজে স্ট্রিট পেরিয়ে যেতে যেতে দোতলা থেকে শ্যাম একঝলক দেখতে পেল আরপুলি লেনের মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মিনু দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে একটা শেয়াল রঙের পুলওভার, পরনে কালো চাপা একটা প্যান্ট, পায়ে হকিবুট। বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত, একটা হাঁটু ভাঁজ করা— পা পিছনের দেয়ালে তোলা, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মিনু। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু শ্যাম জানে মুহূর্তেই ওই ভঙ্গি মিনু বদলে ফেলতে পারে, শরীরের ভাঁজ খুলে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার কালো লম্বা চেহারাটা লকলক করে ওঠে। একঝলক

মিনুকে ওইভাবে দেখে শ্যামের মন 'মিনু' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। নামবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল। তারপর দেখল বাসে বেজায় ভিড়, নামতে নামতে সে আরও দুটো স্টপ ছাড়িয়ে যাবে। অরপর পিছু হঠে এসেও যে মিনুকে ওইখানে পাওয়া যাবেই তার কোনও স্থিরতা নেই। তা ছাড়া, দেখা হলেও সবসময়ে লাভ হয় না। হাতে কাজ থাকলে তাকে চিনবেই না মিনু। অল্প একটু হেসে হয়তো বলবে, 'আরে শ্যাম! কেমন আছিস?' তারপর ঘুম-ঘুম স্বপ্নের মতো উদাসীন চোখে তার দিকে চেয়ে থাকবে খানিকক্ষণ, বলবে 'আঃ শ্যাম, আজ তুই কেটে পড়, আমার কাজ আছে।' 'কী কাজ!' মাথায় সামান্য আঙুল চালিয়ে ঠান্ডা গলায় বলবে মিনু, 'ঝামেলা হবে এক্ষুনি। তুই কেটে পড়।' এ-সব কথা যখন বলে মিনু তখন তার গলার স্বরে এক ধরনের চমক লক্ষ করেছে শ্যাম। হঠাৎ মনে হয় মিনুর গলায় মাইক্রোফোন লাগানো আছে। স্বর খুব উঁচু নয়, তবু মনে হয় তা খুব গভীর কুয়োর ভিতর থেকে আসছে। ওই স্বর শুনে যে-কোনও লোকের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠতে পারে।

মিনুর সঙ্গে একবার দেখা বছর আট-দশ আগে। তখন শ্যাম ছোট্ট একটা কোম্পানিতে দু'শো টাকার একটা সামান্য কাজ করে। এক তারিখে মাইনে পেয়ে সে ভিড়ের বাসের দরজায় ঝুলে ফিরছিল। কালীঘাটের স্টপে বাস থেমে ছাড়ার মুহূর্তে শ্যাম অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। বাস ছেড়ে দিল। কিন্তু শ্যাম টের পেল ভিড়ের মধ্যে লোহার মতো শক্ত একখানা হাতের পাঞ্জা তার কনুইয়ের ওপর চেপে ধরেছে। পরমুহূর্তেই সেই হাতখানা তাকে বাসের হাতল থেকে ছিঁড়ে আনল। কার মাথায় শ্যামের দাঁত ঠুকে গেল, আর একখানা কনুই লাগল বুকে। দরজার লোকেরা চেঁচিয়ে উঠেছিল, বাসটা থামতে থামতেও থামল না। বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় শূন্যে হাত তুলে টাল খেয়ে ঘুরে ফুটপাথে আছড়ে পড়ে যাচ্ছিল শ্যাম। কিন্তু যে তাকে ধরেছিল সে তাকে পড়ে যেতে দিল না। দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যথায় চোখে জল এসে গিয়েছিল শ্যামের, মাথার ভিতরে ধোঁয়াটে ভাব। তাই সে কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না যে, কে তাকে টেনে নামিয়েছে। তারপর অবশেষে সে মিনুকে দেখতে পেল। শীতকালে মিনুর সেই মার্কামারা পোশাক—শেয়াল রঙের পুলওভার আর কালো চাপা প্যান্ট। মিনু হাসছে। দু'-একজন চলতি লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই মিনু তার হাত ধরে একটু দূরে নিয়ে গেল।

মুখোমুখি দাঁড়ালে মিনু তার দীর্ঘ লোহার রডের মতো শক্ত ডান হাতখানা বাড়িয়ে শ্যামের কাঁধে আলতোভাবে রেখে নিঃশব্দে হাসল, তোর লেগেছে শ্যাম? শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, না। আবার নিঃশব্দে হেসে ডান হাতখানা খুব ধীরে ধীরে তার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় দু' পা মাটিতে পুঁতে দাঁড়িয়ে আছে, একটুও নড়ানো যাবে না। এমনিতে মিনুর চোখ সুন্দর— টানা, ভাসা ভাসা। চোখের পাতায় অর্ধেক ঢাকা আধ-ঘুমন্ত চোখে উদাসীন বিরাগ নিয়ে চার দিকে চেয়ে দেখে। কিন্তু যখন কখনও হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর মিনু তাকায়, তখন এক পলকে ওর চেহারা পালটে যায়। দয়াহীন, নিষ্ঠুর মিনুকে তখন আর চেনা যায় না। অল্প ভ্রূ কোঁচকানোর ভিতর দিয়ে মিনু প্রায় ম্যাজিক দেখাতে পারে। শ্যাম তখন ভাল ছেলে। তাই সামান্য অস্বস্তি নিয়ে মিনুর সেই শান্ত, আধখোলা, আধ-ঘুমন্ত চোখের দিকে চেয়ে রইল। সে স্পষ্টই বোঝাতে চেয়েছিল— আমি খুশি হইনি...তোকে দেখে খুশি হইনি মিনু।

অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে শ্যামের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মিনু বলল, আজ এক তারিখ, তোর কাছে আজ অনেক টাকা আছে, না? শ্যাম বুঝতে পারছিল ছেলেবেলার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যই যে মিনু তাকে বাস থেকে টেনে নামিয়েছে তা নয়। মিনুর সঙ্গে দেখা হলে শ্যাম যে খুশি হয় না তা বোধহয় মিনু জানে। বস্তুত তাদের আর বন্ধু বলা যায় না। শ্যাম তাই মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। অকারণেই একটা ভয় পেয়ে বসছিল তাকে। বিকেলের রাস্তায় অনেক লোক রয়েছে তাদের চার পাশে, তবু শ্যামের নিজেকে বড় একলা মনে হচ্ছিল। মিনুকে কী ভীষণ ঢ্যাঙা আর কালো দেখাচ্ছে! শ্যাম মিনুর মুখের দিকে চোখ রেখে অল্প মাথা নেড়ে বলল, আজ মাইনে পেয়েছি।

মিনু দু' পকেটে হাত রেখে কাঁধ দুটো অল্প তুলে আবার নিঃশব্দে হাসল, জানতুম। তাই তোকে ও-বাসটায় যেতে দিলুম না। বাসটা গরম ছিল। 'গরম' কথাটার অর্থ শ্যাম যে একেবারে বোঝে না তা

নয়। তবু চুপ করে চেয়ে রইল। মিনু সস্নেহে হেসে বলল, ও বাসে যে ছোকরারা ছিল তারা আমার চেনা, ওদের হাত খুব পরিষ্কার, তুই টেরও পেতিস না। শুনে শ্যাম চকিতে তার পকেট দেখবার জন্য হাত বাড়াতেই মিনু হাত তুলে হাসল, ভয় নেই। সব ঠিক আছে। আমি দেখে নিয়েছি। মিনুর অলস, নিস্তেজ উদ্দেশ্যহীন চোখের দিকে চেয়ে শ্যাম হেসে ফেলল, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি! কী চোখ তোর! বস্তুত তখন শ্যামকে দেখছিল না মিনু, কিছুই দেখছিল না। তবু শ্যাম বুঝেছিল মিনু কতদূর দেখে, কতদূর দেখতে পায়। মিনু হাসে, ফিকে নিঃশব্দ হাসি। সে-হাসিতে কোনও ইচ্ছে বা প্রাণ নেই। শ্যাম হঠাৎ টের পাচ্ছিল, যদিও তার টাকা ক'টা মিনুর জন্যই আজ বেঁচে গেল, তবু তার ভিতরে এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ জাগছে না। মিনুকে সত্যিই আর ভালবাসে না বলে শ্যাম মনে মনে লজ্জা পেল। এ উচিত নয়, এ রকম হওয়া উচিত নয়। এই বিশ্রী ঠান্ডা সম্পর্ক কাটিয়ে দেওয়ার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলল, মিনু, চা খাবি? চল, তোর সঙ্গে অনেককাল কথাবার্তা হয় না।

শ্যামের কথা শুনছিল না মিনু। সে হঠাৎ শ্যামকে ভুলে গিয়ে উপেক্ষা করে চকিতে ঝলসানো চোখে ডাইনে বাঁয়ে আর পিছু ফিরে কী যেন বিদ্যুৎগতিতে দেখে নিল। পরমুহূর্তেই আবার অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাসল মিনু, পুলওভারটা টেনে কোমরের চওড়া বেল্টের যে সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল তা ঢেকে দিল। বলল, আমি একা নই শ্যাম, আমার সঙ্গে লোক আছে। শ্যামের বুকের ভিতরে আবার গুরগুর শব্দ হচ্ছিল। মিনুর পিছনে হলদে রঙের গির্জা বাড়ি, সামনেই বাস-স্টপে লোকের ভিড়, একটু সামনে একটা পার্ক— শীতের নিষ্পত্র গাছে কাক বসে আছে, ধুলো-ময়লা মাখা ক্লান্ত মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোথায় রয়েছে মিনুর লোকেরা, তা ভেবেও পেল না শ্যাম। সে জিজ্ঞেস করল, কোথায় তোর লোক? মিনু আবার হাসে, ভিড়েব মধ্যে মিশে আছে, তুই দেখতে পাবি না। তার চেয়ে চল, তোকে এগিয়ে দিই, একটা ঠান্ডা বাসে উঠে চলে যাবি। শ্যাম বুঝতে পারছিল মিনুর একটা আলাদা সমাজ আছে, যেখানে সে শ্যামের মতো নীতিপরায়ণ লোকদের একেবারেই পাত্তা দেয় না। সেখানে সে মিনুর কাছে শিশু। ছেলেবেলায় মিনুর সঙ্গে তার কত গোপন কথার অংশীদারী ছিল। আর এতদিনে তার এবং এই প্রায়-অচেনা মিনুরও আরও কত গোপন কথা তৈরি হয়ে গেছে, যার খবর কেউই আর রাখে না। তবু শ্যাম চলে যেতে পারছিল না। তার মনে হল মিনুকে আরও কিছু ভাল কথা বলা দরকার যাতে মিনুর ভাল হয়। সে বলল, মিনু, তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। মিনু ভ্রূ কুঁচকে বলে, কী কথা! শ্যাম বিকারহীন গলায় বলে, আছে। মিনু ওর দু'টি চোখের গভীর পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। একদিন তোর বাসায় যাব। মাংস রাঁধব দু'জনে। তারপর সারা দুপুর তোর কথা শোনা যাবে। শ্যাম মিনুকে দেখছিল না, সে লক্ষ করল অদূরে রাস্তার মোড়ে গির্জার বাইরে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক পাশাপাশি। তারা একবারও মিনু বা তার দিকে তাকাল না, নিঃশব্দে যেন হাওয়ার ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে ওইখানে দাঁড়াল। তারা সিগারেট ধরিয়ে উদাসীন চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। তাদের পরনে সাধারণ ধুতি আর শার্ট, শার্টের হাতা গোটানো। হঠাৎ দেখে কিছুই মনে হয় না, সাধারণ চেহারার দুটি লোক। কিন্তু কেন যেন ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি বা তাকানোর নিস্পৃহতা দেখে শ্যামের মনে হয়— এরা বড় নিষ্ঠুর। মিনুর সঙ্গে এদের কোথাও মিল আছে। ওদের ওই অলস ভঙ্গি লোককে দেখানোর জন্য। আসলে কোনও কোনও কাজে ওরা ভয়ংকর রকমের নিপুণ। হঠাৎ শ্যাম মিনুর দিকে চেয়ে হাসল, তোর সঙ্গে ক'জন লোক মিনু? ওই দু'জন তো! বলে আঙুল তুলে লোক দু'টোকে দেখায় শ্যাম। তড়িৎগতিতে মিনু তার দীর্ঘ শক্ত হাতে শ্যামের হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে বলে, আঙুল দেখাস না। সামান্য চঞ্চল দেখায় মিনুকে, তবু সে মুখে হাসি টেনে বলে. ওই দু'জন। আরও চারজন আছে। তোর বেশ চোখ আছে শ্যাম! কিন্তু এবার তুই বাড়ি যা। শ্যাম সামান্য মজা পেয়ে হেসে উঠে বলল, দাঁড়া, মিনু। তারপর যেন মিনুর দেওয়া কোনও ধাঁধার উত্তর খুঁজছে ঠিক এভাবে সাবধানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলে, আরও চারজনকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব। মিনু শক্ত হাতে তার কাঁধ ধরে বলল, তোকে খুঁজতে হবে না, আমার সঙ্গে একটু হেঁটে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে তার দিকে পিছু ফিরে মিনু হেঁটে যেতে লাগল দীর্ঘ শ্লথ পায়ে। শ্যাম পিছু নিল। দু'-চার পা হেঁটেই মিনু দাঁড়াল, পিছু ফিরে শ্যামকে বলল, দ্যাখ। শ্যাম মিনুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কোথায়! মিনু মাথা হেলিয়ে রাস্তার ওপারে ফুটপাথটা দেখিয়ে বলল, ও পাশে চায়ের দোকানটার সামনে দ্যাখ দু'টো ছেলে দাঁড়িয়ে

আছে, একজন বেঁটে, গায়ে সুরকি রঙের পুলওভার, প্যান্টের পকেটে হাত, অন্যজন লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান, গায়ে গোল-গলা গেঞ্জি, পরনে আমার মতো কালো প্যান্ট। শ্যাম আস্তে আস্তে বুঝতে পারে বিশেষ কারও জন্যে এই ফাঁদ পাতা হয়েছে। তার হাত পা অবশ হয়ে আসে, তবু প্রাণপণে নিজের গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, আর দু'জন? মিনু লম্বা মাপা পায়ে সরে গেল, এদিকে আয়। যেভাবে লোকে নিজের ঘরবাড়ি নতুন অতিথিকে দেখায় তেমন স্বাভাবিক ভঙ্গি তার। পার্কটার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মিনু দেখাল পার্কের গায়ে একটা গলি। নিঃশব্দে আবার হাসে মিনু, যাকে ধরা হচ্ছে আজ সে ওই গলিতে থাকে। গলির মুখে দ্যাখ একটা ট্যাক্সি, মিটার ডাউন করা। পিছনের সিটে একজন, তাকে এখান থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না। গভীর শ্বাস টেনে শ্যাম বলে, আর একজন? মিনু মাথা নাড়ে, আর একজন এখানে নেই, সে আমাদের মক্কেলকে নিয়ে আসতে গেছে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনবে। শ্যামের মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগে, থরথর করে কাঁপে তার পা। মনে হয় এইখানে এই ভিড়ের মধ্যে মিনু অলক্ষ্যে এক স্টেজ খাড়া করেছে, যেখানে এক্ষুনি একটা নাটক হবে; কিংবা নাটকও নয়, কেননা মিনুর এইসব ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু সত্যিকারের রক্তপাত ঘটে যায়। তবু কাষ্ঠ-হাসি হেসে সে বলে, মিনু, তোরা কাকে ধরছিস? মিনু হাসে না আর; তার ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো, তীব্র চোখ, তবু তাকে এই মুহূর্তে খুব ভয়ংকর দেখায় না। যেন বা খানিকটা অসহায়ের মতো ঠোঁট উলটে বলে, কী জানি! তাকে চিনিও না। শ্যাম যেন আপন মনেই নিজেকে প্রশ্ন করে, তবে? মিনু তার কপালের ওপর একটা চুলের ঘুরলি আঙুলে জড়ায়, কেমন অন্যমনস্ক এবং আবার উদাসীন দেখায় তাকে। কিছুক্ষণ পরে সে শ্যামের দিকে চেয়ে বলে, বাড়ি যা শ্যাম। আবার দেখা হবে। শ্যাম কোনও কথা না বলে মিনুর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকে, কিছুদূর গিয়ে কেমন চমকে সে ফিরে তাকায়, মিনু তার দিকে চেয়ে আছে। অস্বস্তির চোখ। শ্যাম ফিরে আসে আবার, মিনু, এই দু'জন তোর বন্ধু? যেন বা সে প্রশ্ন করতে চায়—এই দু'জন মিনুর কেমন বন্ধু, যেমন বন্ধু সে একদিন মিনুর ছিল! মিনু সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে দেখে, তারপর মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। শ্যামের কেমন বমি বমি করছিল, সব কিছু ভাল করে লক্ষ করার মতো মনের অবস্থা ছিল না, তবু সে লক্ষ করল মিনুর মুখে-চোখে একটা অসহায় দ্বিধার ভাব। শ্যাম মাথা নেড়ে মিনুকে জানাল যে, সে বুঝতে পেরেছে। তারপর বলল, আচ্ছা মিনু, চলি। মিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, আচ্ছা। শ্যাম বলে, তা হলে একদিন আসছিস তো! ছুটির দিনে আসিস। মিনু মাথা নাড়ে আবার, হ্যাঁ। তারপর হেসে ঠাট্টার ছলে বলে, যদি তত দিন থাকি। এই কথাটুকুই যেন ধাক্কা দিয়ে শ্যামকে মিনুর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। সে দ্রুত বাস-স্টপের দিকে হাঁটতে থাকে। পিছু ফিরে আর তাকায় না।

গির্জার রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে সেই রকম উদাসীন ভঙ্গিতেই লোক দু'টো দাঁড়িয়ে আছে। তারা দু'জনেই অবহেলার চোখে শ্যামকে এক পলক দেখে নেয়। শ্যাম তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বাস-স্টপে এসে দাঁড়ায় গা-ঘেঁষা এক পাল লোকের ভিড়ের মধ্যে। শীত নেই তেমন, তবু শ্যামের হাত-পা-ঘাড়ে কেমন ঠান্ডা লাগছিল। বুকের ভিতরে সেই দুড়দুড় শব্দ— কে যেন দৌড়ে যাচ্ছে, কে যেন পালিয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরে। তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। তখন মাঝে মাঝে শ্যামের এ রকম হত। বুক কাঁপা তার পুরনো রোগ। বাস-স্টপের ভিড়, পিছনে দোকানের আলো, ডান দিকে বাঁ দিকে কয়েকটা ম্যাড়ম্যাড়ে গাছ— সবকিছুই বড় নিষ্প্রাণ। এই তো একটু আগে সে অফিস থেকে বেরিয়েছে, ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠেছে, তারপর মিনু তাকে টেনে নামাল—ততক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন হাতে পায়ে জড়ানো শীত, কাঁপা বুক আর অনিশ্চিত একটা উদ্বেগের ভিতর দাঁড়িয়ে থেকে তার হঠাৎ মনে হচ্ছিল, বাস্তবিক এ-শহর তার চেনা নয়। যেমন তার চেনা নয় তার ছেলেবেলার বন্ধু মিনু কিংবা তার দু'জন সঙ্গী।

মিনুর জন্যেই সেদিনকার বিকেলটা তার বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। বাসে উঠবার পরও সে সতর্ক হবার চেষ্টা করেনি। হ্যান্ডেল ধরে ঝুলছিল, টের পাচ্ছিল তাকে ঘিরে অনেক হাত, কোনটার কোন উদ্দেশ্য তা বুঝবার চেষ্টাও করেনি সে।

তারপর অনেক দিন ভিড়ের ভিতরে সন্ত্রস্ত চোখে সে চেয়ে থেকেছে। মনে হয়েছে, এদের ভিতরে রুক্ষ চেহারার দয়াহীন কিছু লোক গা ঢাকা দিয়ে ধারালো কঠিন চোখে তাকে লক্ষ রাখছে। দৌড় দৌড়— বুকের ভিতরে সেই শব্দ শোনা যেত। যেন অদূরেই কোথাও মিনুর সেই ছয়জন সঙ্গী

বাতাসের সঙ্গে মিশে নিঃশব্দে অপেক্ষায় আছে। অথচ সে জানত যে, এ-ভয় অকারণ। বস্তুত এতই নিরীহ, নিরামিষ তার জীবন যে, সে কারও ভয়ংকর কোনও ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখে না। তবে কী কারণে তার ওপর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সেই ভিতু অথচ দয়ালু শ্যামের সঙ্গে কারও কোনও দিনই আর দেখা হবে না। মনে পড়তেই শ্যাম নিজেও মৃদু একটু হাসল, স্টেটবাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে ভিড়ের মধ্যে যেন সেই শ্যামকে হেঁটে যেতে দেখল, দেখল শ্যাম মোড়ের ভিখিরির বাটিতে ফেলে দিচ্ছে একটা-দুটো পয়সা, ঠনঠনে পেরিয়ে যাওয়ার সময় সবার অলক্ষ্যে একটু মাথা নিচু করে দ্রুত একবার হাত দু'টো জোড় করেই সরিয়ে নিচ্ছে, কিংবা বাসের দরজায় ধরা পড়েছে পকেটমার— সেই ভিড় থেকে দ্রুত পায়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ গলির মধ্যে। ভাবতে ভাবতে শ্যাম মৃদু হেসে মনে মনে বলল, ওঃ শ্যাম দি কাইন্ডহার্টেড!

অনেককাল মিনুর সঙ্গে আর দেখা হয় না। কারণ, ক্রমে ক্রমে শ্যামের চাকরি গেল পালটে, তার চলাফেরা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল কয়েকটা বাছাই করা রাস্তায়, অফিস-রেস্তরাঁ-বার কিংবা দক্ষিণের ভাল পাড়ায় তার ছোট্ট একটেরে ঘরটা— এইটুকুর মধ্যেই সুখে আটকে ছিল শ্যাম। আর মিনু ঘুরে বেড়ায় নোংরা গলিঘুঁজি, চোরা চায়ের দোকান, চোলাই কিংবা জুয়ার আড্ডায়, পারুল কিংবা চাঁপার ঘরে। কাছাকাছিই ছিল তারা; তবু দু'টো আলাদা শহরে। একটার ভিতরে আর-একটা কিংবা আরও অনেকগুলো কলকাতা পোরা আছে। তারা দু'জনেই যে এক শহরে বাস করে, তা নয়। যেমন স্টেটবাসের ডান ধারে বসে সে একরকম দেখছে, বাঁ ধারে বসলে দেখাত অন্য রকম, পাঁচতলার ছাদ থেকে যেমন দেখা যায়, ম্যানহোলের ভিতর থেকে মাথা তুলে দেখলে তেমন নয়। আসলে দিকের তফাত, উঁচু কিংবা নিচু থেকে দেখার তফাত, এক-এক রকম কলকাতা অন্য রকমের কলকাতার ভিতরে ঢুকে আছে। তার ইচ্ছে করছিল এখন গিয়ে একবার মিনুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার কাঁধে চাপড় মেরে বলে, আঃ হাঃ মিনু! কেমন আছিস গুরু? তারপর গলা নামিয়ে বলে, আমাকে দলে নিবি গুরু? দেখিস শালা, আমি দু' হাতে চালাব মেশিন কিংবা পাঞ্চ, তলপেটে ছোরা ঢোকাব যেন মাখনে, দেখে নিস গুরু কেমন পকাপক চলে সোডার বোতল! তারপর গিয়ে বসে গোপন আস্তানায় চায়ের দোকানের পিছনে অন্ধকার অলিগলির মধ্যে, যেখানে ভয়ংকর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার ঝোলে দেয়ালে, আর ভোমা নীলমাছি উড়বার শব্দ। সমানে সমানে মিনুর মুখোমুখি বসে অন্তরঙ্গ সুরে মিনুকে বলতে ইচ্ছে করে, কী চলবে গুরু? ঝিট্ না অ্যান্টিক? শ্যাম জানে এ-ভাষা বুঝে নেবে মিনু, কেননা এ মিনুদেরই ভাষা— ঝিট্ মানে গাঁজা, আর অ্যান্টিক হচ্ছে চোলাই। নেশা জমে এলে আস্তে আস্তে মাথা নাড়বে শ্যাম, না গুরু, তুই ঢস্‌কে গেছিস। তোর বয়স শুরু হয়ে গেছে। আমার চেয়ে তুই বছর ছয়েকের বড়, আমার এখন বত্রিশ বোধহয়। তা হলে তোর—। যাকগে শালা, এখন কী চলছে তোর? ছিনতাই, না এক-দু'শোর কেপমারি? বোর্ডে খেড়িয়েছিস? চাঁপার ঝাঁপিতে কত গেছে রে শালা! ওরা তো ক্যাশমেমো দেয় না, দিলে ক' হাজারে দাঁড়াত গুরু? ভাবিস না, ভাবিস না মিনু, আমি তোর দিনকাল ফিরিয়ে আনব। উঠতি ছোকরার মতো আমার রক্ত গরম, বুড়োর মতো ঠান্ডা মাথা, গোয়েন্দার মতো চোখ! যে-কোনওভাবে বাঁচতে বা যে-কোনওভাবে মরতে আমি তৈরি— আঃ গুরু, কী বলব তোকে, একটা উইক পয়েন্টে আমি মার খেয়ে গেছি জোর, মা-বাপ তোলা একটা গালাগাল আমি সইতে পারলুম না—

পাশের লোকটি সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলল, কিছু বলছেন?

ভয়ংকর চমকে উঠল শ্যাম। বুঝতে পারল, সে বে-খেয়ালে হঠাৎ কথা বলে উঠেছিল। বাসের সামনের বা পিছনের সিটের দু'-একজন তার দিকে ফিরে দেখল। বিবেকানন্দ রোডের কাছে ভিড় ঠেলে নেমে গেল শ্যাম।

## ॥ দুই ॥

খুব সকালবেলা দরজায় ধাক্কা শুনে ঘুম ভাঙল শ্যামের। উঠে দরজা খুলে দেখল, ইতু।

ইতু!

শ্যাম!

এক ঝলক সাদার মধ্যে ইতু দাঁড়িয়ে আছে। তার শাড়ি সাদা, ব্লাউজ সাদা, হাতের ব্যাগটি সাদা, এমনকী তার কপালেও শ্বেত চন্দনের টিপ। শ্যামের ঘুম-জড়ানো চোখে সেই সাদা রং কট কট করে লাগে। চোখ পিট পিট করে সে হেসে বলল, হাতের বীণাটি কোথায় রেখে এলে!

জানালা দিয়ে ঘরে আসছে রোদ, তার আভায় ইতুকে সুন্দর এবং গম্ভীর দেখায়। ইতু দরজার চৌকাঠ ডিঙোয় না, ওপাশ থেকেই বলে, তোমার ঘরটা একটু গুছিয়ে নাও, শ্যাম। এই বিশ্রী ঘরে কোনও ভদ্রমহিলা আসতে পারে না।

শ্যাম তাড়াতাড়ি তার বসবার চেয়ারটা একটু টেনে আনে ঘরের মাঝখানে, পা দিয়ে সরিয়ে দেয় কয়েকখানা বই, বিছানার লেপটা জড়ো করে রাখে পায়ের দিকে, বলে, তুমি আসবে জানলে আগে থেকেই গুছিয়ে রাখতুম। চেয়ারটা দেখিয়ে বলে, বোসো ইতু।

ইতু চেয়ারে বসে না। হাতের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে বিছানায়, তারপর বালিশ টেনে নিয়ে কনুইয়ের ভর রেখে আধশোয়া হয়। বলে, মুখটুখ যা ধোয়ার ধুয়ে এসো, আমি আজ সারাদিন থাকব এখানে।

শ্যাম হাসে।

ভ্রূ কুঁচকে ইতু বলে, তুমি টেলিফোনে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে শ্যাম?

শ্যাম মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

আমি রাজি হয়েছিলুম?

শ্যাম আবার মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

আর কথার মাঝখানে তুমি টেলিফোন রেখে দিয়েছিলে?

শ্যাম লাজুক গলায় বলে, হুঁ।

সামান্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইতু, তুমি কী চাও?

কথা না বলে শ্যাম তাক থেকে তার টুথব্রাশ তুলে নেয়। বাথরুমের দরজায় পা দিয়ে বলে, বোসো ইতু, আমি তোমাকে চা করে খাওয়াব। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

বাথরুমে ঢুকে সে খানিকক্ষণ শূন্য চোখে সামনের সাদা দেয়ালটার দিকে চেয়ে থাকে। সারা শরীরে এখন গভীর আলস্য, কোনওখানে এতটুকু উত্তেজনা নেই, আশ্চর্য! সে কল খুলে ঠান্ডা জলের মধ্যে হাত রাখে, হাসে, মনোযোগ দিয়ে জল পড়ার কলকল শব্দ শোনে কিছুক্ষণ, তারপর মন্থর হাতে পেস্টের টিউব খুলতে থাকে।

আধঘণ্টা পর বেরিয়ে এসে সে নীরবে স্টোভ জ্বালে, এতকাল ব্যবহার-না-করা চিনির কৌটো নামায় তাক থেকে। জমানো দুধের কৌটোয় ঝাঁকানি দিয়ে দেখে, তারপর কৌটোর ফুটোয় চোখ রেখে ভিতরটা দেখে নিয়ে ইতুর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নাড়ে, চা হবে না। দুধ শুকিয়ে গেছে।

কী শুকিয়ে গেছে?

শ্যাম কৌটো দেখিয়ে বলে, দুধ।

ইতু সামান্য হাসে, দি মিল্ক অব হিউম্যান কাইন্ডনেস?

খুব জোরে হেসে উঠতে গিয়েও হাসে না শ্যাম, শুধু স্মিতমুখে বলে, আঃ! ইতু, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে।

তোমাকে চা করতে হবে না শ্যাম। তুমি আমার কাছে এসো।

শ্যাম কৌটোটা মেঝের ওপর খটাস করে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে জানালার দিকে সরে যেতে থাকে।

এসো শ্যাম। শান্ত গলায় ইতু বলে।

শ্যাম জানালার চৌকাঠে হাত রেখে রোদে পিঠ আর ইতুর দিকে মুখ রেখে দাঁড়ায়। হেসে বলে, ইতু, তোমাকে খুব পবিত্র দেখাচ্ছে।

আমি তা জানি।

আরও কিছুক্ষণ তোমাকে পবিত্র দেখাক। তারপর—

ইতু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, তারপর কী?

শ্যাম মৃদু হাসে, তারপর সারাদিন তো তুমি থাকবেই!

ইতু মাথা নাড়ে, না। দি মর্নিং শোজ দি ডে। কাছে এসো শ্যাম। আমি তোমার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চাই।

শ্যাম মৃদু ম্লান হাসি হাসে, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে ইতু।

কাছে এসো শ্যাম। তোমাকে একবার ছুঁলেই আমি বুঝতে পারব তোমার কী হয়েছে।

যেন নিজের ছেলেকে কাছে ডাকছে এমনি মায়ের মতো আদুরে শোনায় ইতুর গলা। চোখে মুখে বলতে চাইছে, তোমার সব দুষ্টুমি ধরে ফেলেছি।

শ্যাম কাছে আসে না, জানালার কাছ থেকেই বলে, কী করে বুঝলে!

কাছে এসো, আমাকে ছুঁতে দাও। তারপর দ্যাখো বলতে পারি কি না!

শ্যাম ধীরে ধীরে দু'পা এগোয়, হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ছোঁও।

ইতুর হাত এগিয়ে আসতেই শ্যাম হাত সরিয়ে নিয়ে অন্যখানে রেখে বলে, ছোঁও।

আঃ শ্যাম! বলতে বলতে ইতু হাত বাড়ায়।

শ্যাম হাত সরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে বাড়িয়ে বলে, এবার ছোঁও।

কী হচ্ছে? বলে ঠোঁটে হাসি চেপে উঠবার উপক্রম করে ইতু।

উঠো না ইতু। শ্যাম এক পা এগিয়ে আসে, বলে, ছোঁও।

হাতের নাগালে শ্যামকে পেয়ে ইতু আবার বসে পড়ে, তারপর ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ শ্যামের শার্টটা ধরার চেষ্টা করে।

তড়িৎগতিতে লঘু পায়ে সরে যায় শ্যাম, হাসে, ধরবে? তারপর জানালার আরও কাছে সরে গিয়ে বলে, ধরো তো দেখি?

আঃ শ্যাম! কাছে এসো।

তুমি এসো ইতু। শ্যাম গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তোমার ভয় কী শ্যাম! তুমি অনেক মেয়েকে ছুঁয়েছো। তুমি পাকা লম্পট।

শ্যাম মাথা নাড়ে, ঠিক।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ইতু, ভয় কী শ্যাম!

ইতু কাছে আসে, তার কাঁধের দিকে হাত বাড়ায়। শ্যাম মৃদু হাসিমুখে আস্তে আস্তে নুইয়ে দেয় কাঁধ। ইতু ফিসফিস করে বলে, ভয় কী শ্যাম! ভয় কী!

ইতুর হাত নরমভাবে কাঁধের ওপর নেমে আসছে, এক্ষুনি ছুঁয়ে ফেলবে তাকে, শ্যাম আরও নিচু হয়, তারপর পিছল গতিতে ইতুর হাতের তলা থেকে সরে যায় ঘরের মাঝখানে। ইতুর হাত খানিকটা শূন্য থেকে ধপ করে নেমে আসে, দু'টো কাচের চুড়ির ঝনাৎ শব্দ হয়। সে ঘুরে ভ্রূ কুঁচকে শ্যামের দিকে তাকায়।

ধরো তো দেখি! শ্যাম হাসে। ইতুর দিকে খেলার ছলে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ছোঁও তো দেখি!

কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু হাসে ইতু। বলে, তুমি খেলতে চাও?

শ্যাম মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

ঠিক আছে। ইতু পলকের মধ্যে তার শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নেয়, ছুঁতে পারলে আমার জিত!

জিত!

শ্যাম দরজা বন্ধ করে দেয়।

মুখোমুখি দু'জন একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ইতুর শরীর ভারী হয়ে গেছে অনেক। কোমরে আঁচল জড়ানোর পর এখন দেখা যাচ্ছে তার তলপেটে চর্বির একটু ঢিবি। হাতে গলায় মাংসের খাঁজ। তবু শ্যাম জানে, ইতু নাচ শিখত। তাই সে সতর্ক হয়।

ইতু সোজা এগোয় না, হালকা পায়ে দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে ঘুরে আসতে থাকে। হাসে। শ্যাম চটুল পায়ে উলটো দিকে ঘুরে যায়, বলে, বাক্ আপ, ইতু।

ইতু হাসে। ঘুরতে থাকে। শ্যাম ঘুরতে থাকে। ঘরের সবকিছুই শ্যামের চেনা। দরজার দিকে গেলে তার ডান ধারে চৌকি, মাঝখানে চেয়ার, বাঁ ধারে স্টোভ জ্বলছে। জানালার দিকে গেলে ঠিক উলটো। এক ধারে স্তূপ হয়ে থাকা বই। একটা মোটা বই মেঝের ভিতরে এগিয়ে আছে। শ্যাম বইটা পেরিয়ে যায়, চৌকির পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে সরে যায়, চেয়ারটায় একবার হাত রাখে। ডান ধারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে বিদ্যুৎগতিতে সোজা এগিয়ে আসে। সাপের ছোবলের মতো তার হাত ছুটে আসে শ্যামের বুকের দিকে। অল্পের জন্য এড়িয়ে যায় শ্যাম, লাফিয়ে উঠে যায় চৌকিতে, দরজার দিকে লাফ দিয়ে নামে। হাসে। বাঁ দিকে ঘুরতে থাকে। ইতু হাসে। বাঁ দিকে ঘুরতে থাকে।

ইতু দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ, এই, কী হচ্ছে ছেলেমানুষি!

শ্যাম দাঁড়ায়, দূর থেকে বলে, ছুঁতে পারলে তোমার জিত।

আমি জিত চাই না। তুমি কাছে এসো।

খেলার নিয়ম ভেঙো না ইতু। শ্যাম বলে, খেলে জেতো।

ইতু বিছানায় বসে পা নাচায়, আচ্ছা, ছুঁতে চাই না তোমাকে।

শ্যাম দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতু ঠোঁট টিপে হাসে, অন্য দিকে চোখ রাখে, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এগিয়ে আসে। শ্যাম চমকে সরে যেতে গিয়ে কষ্টে স্টোভটার ওপর পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়। জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে সরে যায়, বলে, আঃ ইতু, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে। তোমার উন্নতির আর দেরি নেই।

সিগারেটটা পড়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, ইতু সেই জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারে। বিছানায় পড়লে শ্যাম সেটাকে তুলে নিয়ে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ।

ইতু বেপরোয়াভাবে চেয়ারটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, কপালের ওপর থেকে কুঁচো চুল সরায়, সোজা এগিয়ে আসে। শ্যাম নিচু হয়ে তার পাশ দিয়ে, খুব কাছে দিয়ে উলটো দিকে চলে যায়, বলে, ঠান্ডা মাথায় খেলো, রেগে গেলে শুধু ঘুরে মরতে হবে।

ইতু সে-কথা শোনে না। সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে। অন্ধের মতো সে পর পর চেয়ার চৌকি এবং দেয়ালে ধাক্কা খায়, মেঝের মোটা বইটাতে হোঁচট খেয়ে সামলে যায়। রাগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপে। তার মুখ লাল হয়ে আসে, মুখে ঘাম চিকমিক করে ওঠে।

অল্প একটু উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম। খেলা তাকে পেয়ে বসে। হালকা গলায় সে বলে, খেলো ইতু, খেলো। তোমাকে এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

বিছানার কাছে ইতু একটু থেমে যায়। হাত-ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারে শ্যামের দিকে। শ্যাম মাথা নিচু করলে সেটা দেয়ালে লাগে, তারপর সোজা নেমে এসে স্টোভের ওপর থেকে কেটলিটা উলটে দেয়। দপ করে স্টোভের আগুন ওপরে ওঠে, কেটলির জল মেঝে ভাসিয়ে দিতে থাকে। শ্যাম তার চেনা ঘরের নিরাপদ কোণে সরে যায়।

ইতু একটানে চেয়ারটাকে সরিয়ে দেয়, মেঝের গরম জল লাফ দিয়ে পার হতে যায়। পুরো টাল সামলাতে পারে না। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁফায়, বলে, শ্যাম, আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না।

ইতুকে হঠাৎ খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। কোমরের আঁচল খুলে স্টোভের ওপর ঝুলছে।

শ্যাম বলে, থেমো না ইতু, খেলো। খেলে যাও। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে, এই তো আমি! ছোঁও!

শ্যাম হাসে, দূরে সরে যায়, লাফ দিয়ে ওঠে চৌকির ওপর, এসো ইতু, খেলো, নইলে এক্ষুনি আবার আমি ঝিমিয়ে পড়ব।

ইতু তবু দাঁড়িয়ে থাকে, বলে, আমি আর পারছি না, শ্যাম।

পারবে। শ্যাম হাসে, ঠান্ডা হয়ে বসে থেকে কী লাভ! খেলো।

ইতু শ্লথ পায়ে এগোয়। শ্যাম সরে সরে যায়। তারপর চেয়ারটার চার দিকে তারা ঘুরপাক খায়। বড় বড় শ্বাসের শব্দে ভরে ওঠে ঘর। তবু শ্যাম হাসে, ইতুকে থামতে দেয় না। ইতু প্রাণপণে চেষ্টা করে। শ্যাম ঘুরে ঘুরে চৌকির ওপর ওঠে, জানালার ধারে চলে যায়, দেয়ালের দিকে সরে আসে, গরম জলের স্রোত লাফিয়ে পার হয়। লক্ষ করে, ইতু দু'হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো ঘুরছে, শ্যাম যেদিকে তার উলটো দিকে যাচ্ছে। শ্যাম শিস দিয়ে জানিয়ে দেয় সে কোন দিকে আছে।

শ্যাম হাসে, শ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে, খেলো ইতু, খেলো। তোমাকে একটু ভাল লাগতে দাও। আমার শরীর গরম হচ্ছে না ইতু, বহুকাল ধরে আমি ঠান্ডা হয়ে আছি। খেলো ইতু, খেলে আমাকে ছোঁও। তারপর তোমার জিত।... আঃ ইতু, তুমি মোটা হয়ে গেছ একটু, পেটে চর্বি জমছে, বয়সও হয়ে এল। সময় থাকতে থাকতে খেলে নাও... বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে খেলে নাও... মরে যাওয়ার আগে খেলে নাও...সবকিছু সহজে পেতে নেই, পাওয়া উচিত নয়.. এতকাল তোমাকে বড় সহজেই পেয়ে যেতুম, তাই তুমি আমাকে সবচেয়ে কম লাভবান করেছ।... আঃ হাঃ ইতু, ওদিকে নয়, আমি জানালার কাছে সরে এসেছি... আঃ ইতু, পড়ে যেয়ো না, খেলা মাটি হবে...অত সহজে হাল ছেড়ে দিয়ো না... থেমো না... থামলেই তুমি দুয়ো...থামলেই তুমি বুড়ো... থামলেই তুমি মাটির ঢেলা...ঘোরো, ঘুরতে থাকো... ঘুরতে ঘুরতে ছায়া হয়ে যাও ইতু,... মায়াবিনী হয়ে যাও... রহস্যময়ী হয়ে যাও... দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাও... আমি যেন ভিখিরির মতো তোমাকে কামনা করি... আমি যেন হাঁটু গেড়ে বসি তোমার জন্য... আমি যেন তোমার জন্য পাগল হতে পারি... আঃ হাঃ ইতু, তুমি স্টোভের বড় কাছে গেছ... ধীর হয়ে গেছে তোমার পা... আবার তোমার আঁচল খুলে দুলছে আগুনের ওপর... ওঃ ইতু!

বড় হতাশ হয় শ্যাম। থেমে যায়। দাঁড়িয়ে দেখে, ইতুর আঁচল দপ করে জ্বলে উঠল।

ওঃ শ্যাম! হাঁফাতে হাঁফাতে কেঁদে ওঠে ইতু, আমি কী করব শ্যাম!

ইতু তার আঁচল আলগা করে ধরে শ্যামের দিকে আসতে থাকে। শ্যাম সরে যায়।

ওঃ শ্যাম!

শ্যাম মাথা নাড়ে, আমি খেলার নিয়ম ভাঙি না ইতু।

কী করব শ্যাম!

শ্যাম বিছানা থেকে লেপটা তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়ে বলে, এটা দিয়ে চাপা দাও।

ইতু মেঝেতে উবু হয়ে বসে। লেপ চাপা দিয়ে আগুন নেভায়। আঁচলটা সবে ধরেছিল, নেভাতে কষ্ট হয় না। শ্যাম দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে ইতু। শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। তারপর পোড়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে শ্যামের বিছানায় এসে বসে। হাঁফায়।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে বিছানায় ছুড়ে দেয় শ্যাম। ইতু চমকে ওঠে। তারপর যেন ঘুম এবং স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় ইতু। দরজার কাছে গিয়ে একটু থামে, বলে, তোমার বিছানাটা স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাম, রোদে দিয়ো।

শ্যাম মাথা নাড়ে, আচ্ছা।

তুমি অনেক দিন দাড়ি কামাওনি।

শ্যাম মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ।

শ্যাম হাসে, হ্যাঁ।

চলি শ্যাম।

আচ্ছা।

শ্যাম দেখে, ছোট্ট প্যাসেজটা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে ইতু। পিঠে পোড়া আঁচল। একবার তার ইচ্ছে হয় ইতুকে ডেকে বলে, কাপড়টা ফিরিয়ে পরে যাও। পরমুহূর্তেই ভাবে, থাক। কেননা তার মনে হয়, ইতুকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

॥ তিন ॥

আপনি খেলোয়াড় ছিলেন?

হ্যাঁ।

কী খেলতেন আপনি?

চেয়ারে সামান্য শব্দ করে উঠে দাঁড়ায় শ্যাম, ব্যাগাটেলি আর ক্যারাম।

লোকটা তাড়াতাড়ি নিজের চশমায় হাত দিয়ে টেবিলের কাগজপত্রের দিকে তাকায়, কই! এখানে লিখেছেন ক্রিকেট আর ফুটবল।

শ্যাম টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলে, দেন হোয়াই ডু ইউ আসক!

লোকটা অবাক চোখে শ্যামকে একটু দেখে নিয়ে বলে, ওঃ! আচ্ছা, আপনি বসুন।

শ্যাম আবার বসে পড়ে। তার গাল গলা ভয়ংকর চুলকোচ্ছিল, অনেক দিন পর গালে ক্ষুর পড়ায় দাড়ির গোড়া ফুলে উঠেছে। সে গালে হাত বোলাতে থাকে। লম্বা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে তিনজন। এ পাশে শ্যাম একা। দু'ধারে দু'জনের দিকে তাকায় না শ্যাম। মাঝখানে তার মুখোমুখি অল্পবয়সি যে লোকটা বসে আছে তার দিকেই চেয়ে থাকে। লোকটা কাগজপত্র থেকে আবার মুখ তোলে এবং প্রশ্ন করে, কভার পয়েন্টটা কোন অঞ্চল তা ডায়াগ্রাম না দেখিয়ে শুধু মুখে বুঝিয়ে দিন তো!

শ্যাম টেবিলের নীচে সামান্য পা নাচায়; নির্বিকারভাবে বলে, ভুলে গেছি।

লোকটা আবার মুখ খোলে, কথা বেরোবার আগেই শ্যাম তাড়াতাড়ি বলে, আমি সিভিল ড্রাফটস্‌ম্যান, আমার খেলা দিয়ে আপনারা কী করবেন?

লোকটা হতাশভাবে চেয়ারের পিছনে ঠেস দেয়, মুখের ওপর আড়াআড়িভাবে তুলে ধরে একটা পেনসিল, তারপর চিন্তান্বিতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে।

এইবার ডান দিক থেকে ইংরিজিতে প্রশ্ন আসে, হু ইজ ডিন রাস্ক?

শ্যাম এতক্ষণে দেখে লোকটাকে। আধবুড়ো, মাথায় টাক, মোটা গোঁফ আর ঠান্ডা কূটনৈতিক হাসি তার মুখে।

শ্যাম মাথা ঠান্ডা রেখে বলে, আমি রিপোর্টার নই। তারপর কোলে রাখা ড্রইংয়ের ফাইলটা তুলে টেবিলে রাখে, তোমরা আমার ড্রইং দেখেছ।

লোকটা তেমনি ঠান্ডা হাসি হাসে, আমরা একজন আপ-টু-ডেট লোক চাই, শুধু ড্রাফটস্‌ম্যান নয়। তোমার কাগজপত্রে লেখা আছে সেইন্ট অ্যান্ড মিলারে তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চাকরি করতে, ড্রাফটস্‌ম্যানের নয়। প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্যাম দ্রুত চিন্তা করে যায়। কিছুই মনে পড়ে না তার। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। তবু সে মাথা ঠান্ডা রেখে বেপরোয়াভাবে বলে, তিনজন ডিন রাস্ক আছে। কোনজনের কথা জিজ্ঞেস করছ?

লোকটা সামান্য থমকে গিয়ে বলে, বাকি দু'জন কে?

শ্যাম চোখ বুজে আন্দাজে বানিয়ে বলে, একজন নিউজিল্যান্ডের ভলিবল খেলোয়াড়, অন্যজন অস্ট্রেলিয়ান কেমিস্ট।

লোকটা সামান্য দুলে ওঠে, অ্যান্ড দি থার্ড ওয়ান?

অসহায়ভাবে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে শ্যাম, তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমি জানি না। দি থার্ড ওয়ান মাস্ট বি আনইম্পর্ট্যান্ট।

কিন্তু তুমিই বলেছ তিনজন আছে। সুতরাং আর-একজন কে তা তোমার জানা উচিত।—কিন্তু তুমি জানো না!

শ্যাম মাথা নাড়ে, না। তারপর আস্তে আস্তে বলে, ডিন রাস্ক নামে কেউ আছে কি না আমি জানি না, যেমন ডিন রাস্কও জানেন না শ্যাম চক্রবর্তী বলে কেউ আছে কি না। ইট ইজ মিউচুয়্যাল ইগনোর‍্যান্স স্যার!

তারপর আর কোনও শব্দ হয় না। অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। শ্যাম তিনজনকেই নীরবে লক্ষ করে। বাঁ দিকে কালো রোগা মাঝবয়সি মাদ্রাজি ভদ্রলোক বোধহয় কম দামি অফিসার, সারাক্ষণ লোকটি তার ওপরওয়ালাদের সামনে মাথা নিচু করে আছে, একটিও কথা বলেনি। সামনে মুখোমুখি-বসা অল্পবয়সি বাঙালি লোকটি ছটফটে, অহংকারী, খুব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যেতে চায়। অনেকটা তার মতো। ডান দিকের আধবুড়ো লোকটিই সবচেয়ে শান্ত। মুখে হাসি, তবু পাথরের মতো অনড় মুখ, একটিও পেশি নড়ে না। বোঝা যায় না কোন দেশি লোক। আস্তে আস্তে শ্যামের হাই উঠতে থাকে, শরীর এলিয়ে আসে। শ্যাম জানে এরা কুকুরের মতো সতর্ক, খরগোশের মতো উৎকর্ণ লোক পছন্দ করে। তবু সে সাবধান হয় না। মাথা এলিয়ে দেয় চেয়ারের পেছনে, হাই তোলে, চোখ রগড়ায়।

মুখোমুখি বসা লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে বলে, আচ্ছা, আপনি আসতে পারেন।

শ্যাম ধীরে সুস্থে ওঠে, দরজার দিকে এগোয়। তারপর মাঝপথে সে দাঁড়িয়ে পড়ে—দরজাটা ডান দিকে সরে গেছে। একটু ইতস্তত করে শ্যাম, তারপর ডান দিকে ঘুরে এগোতে চেষ্টা করে। তারপরই বুঝতে পারে বৃথা চেষ্টা, দরজাটা চক্রাকারে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। বড় অদ্ভুত। সে আবার দাঁড়ায়। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে চোখ বুজে কয়েক পা হাঁটে। চোখ খুলে দেখে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে আছে। ও-পাশের তিনজন সকৌতুকে তাকে দেখছে। সামান্য লজ্জা বোধ করে শ্যাম। তিনজনের দিকে চেয়ে একটু হেসে অনাবশ্যক কথা বলে, আমার ড্রইং আপনারা দেখেছেন, আমার কাগজপত্রও, আমাকেও। এখন জিজ্ঞেস করি এ-চাকরিটা কি আমার হতে পারে? বলতে বলতে সে এক-পা এক-পা করে পিছু হটে যায়। মাঝখানের আর বাঁ দিকের লোক দু'জন কথা বলে না, সম্ভবত তার অবস্থা দেখে অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়। ডান দিকের আধবুড়ো লোকটা স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, শান্ত গলায় বলে, সাইকোলজিক্যালি ইউ আর আনফিট ফর দি জব।

পিছনে হাত বাড়িয়ে শ্যাম দরজার গোল হাতলটা হাতে পায়, তারপর 'ইয়াঃ' বলে হেসে ওঠে। ইচ্ছে করে এগিয়ে গিয়ে সে লোকটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, আমি জানতুম তুমিই এদের মধ্যে সবচেয়ে পাকা। আমি হলে তোমাকেই নিয়ে নিতুম আমার কোম্পানিতে।

ঝট করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে শ্যাম। রুমালে মুখ মোছে। খোলা বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে শ্যাম। এবার তার দিক ঠিক থাকে, পা ফেলতে গোলমাল হয় না। বস্তুত চাকরিটা হল না বলে সে খুব স্বস্তি বোধ করতে থাকে, তার চোখেমুখে হাওয়া লাগে।

বস্তুত সে বুঝতে পারে, তার আর কিছুই করবার নেই।

## ॥ চার ॥

তেইশে ডিসেম্বর শ্যাম তার একত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে যাচ্ছিল। সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই তার খেয়াল হয়েছিল—আজ আমার জন্মদিন। তখনও বিছানা ছাড়েনি শ্যাম, চোখে আধো ঘুম, লেপের ওম-এর ভিতর থেকে সে অনেকবার গুনগুন করল, আহা! আজ আমার জন্মদিন! এতকাল সে জন্মদিনকে হিসেবের মধ্যে আনত না. তার ধারণা ছিল ওতে স্পিড কমে যায়। ধরো, তুমি সিঁড়ি ভেঙে উঠছ কিংবা নামছ, লিফটের দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে বাড়িয়েছ হাত, জুতোর ফিতে খুলতে বা বাঁধতে যাচ্ছ, চুমু খেতে বাড়িয়েছ ঠোঁট, দাড়ি কাটতে গিয়ে হয়তো মাত্র জুলপির নীচে বসিয়েছ ক্ষুর—অমনি বয়স হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়লে আস্তে শিথিল হয়ে যায় হাত-পা, মন এলিয়ে পড়ে, হাই উঠতে থাকে। অনাবশ্যকভাবে মনে হয়—কী হবে আর এইসব করে? কিছুই তো আর থাকে না শেষ পর্যন্ত। শ্যামের জন্মদিনে তাই কোনও বছরেই কোনও উৎসব নেই, তেইশে ডিসেম্বরের কথা তার খেয়ালই থাকে না।

রোজকার চেয়ে একটু দেরি করে বিছানা ছাড়ল শ্যাম। হাতমুখ ধুয়ে আয়নায় মুখ দেখে শ্যাম।

আজকাল তাকে অনেকটা সাধু-সন্তের মতো দেখায়। চুল বেড়ে গিয়ে ঘাড়ের কাছে বাবরির পাক খেতে শুরু করেছে। আয়না হাতে শ্যাম এসে জানালায় দাঁড়াল। দক্ষিণের জানালায় রোদ পড়ে আছে। সামনেই একটা আমগাছ—কয়েকটা পাতার ছায়ায় একটা মাকড়সার জালে এখনও শিশিরের জল আটকে আছে। তার হাতের আয়না থেকে রোদ ঠিকরে জালটার ওপর পড়তেই শ্যাম আয়না ঘুরিয়ে নিল। তড়িৎগতিতে আলোটা গিয়ে পড়ল উলটো দিকের বাড়ির তিনতলার একটা জানালায়। সামান্য কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে দেখল শ্যাম—একটা অয়েল পেইন্টিঙের ওপর পড়েছে আলোটা—বুড়ো একটি মুখ, ঠোঁটে সকৌতুক হাসি। ভ্রূ কুঁচকে শ্যাম আপনমনে বলল, 'ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার!' তারপর আলো ঘুরিয়ে নিল। লাল দরজাওলা একটা গ্যারেজের সামনে ডাস্টবিনের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তিনটে কুকুরছানা, তাদের ওপর আলো ফেলল শ্যাম। কিন্তু খোলা রাস্তায় যথেষ্ট রোদ রয়েছে, তাই আলোটা জমল না। সে একটু ঝুঁকে ছায়া খুঁজতে থাকে। ছেলেবেলায় আলো-ফেলার খেলা অনেক খেলেছে শ্যাম। এখন বয়স হয়ে গেছে। আজ একত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে সে। ভেবে সামান্য হাসল শ্যাম। যেমন হাসি ছিল তার ক্লাস সিক্সে বা সেভেনে। গলা বাড়িয়ে দেখল বাঁ দিকের মোড় পেরিয়ে শ্লথগতিতে আসছে রিকশা, তাতে গিটার হাতে একটি মেয়ে। সতর্ক হাতে আয়না সামনে নিল শ্যাম। কে জানে আলো ফেললে মেয়েটা রিকশা থামিয়ে দোতলায় উঠে আসবে কি না, লাজুক হেসে বলবে কি না— ডাকছিলেন, তাই এলুম! শ্যাম জাফরানি শাড়ি পরা, ব্যাগ হাতে আর-একটি মেয়েকেও ছেড়ে দিল— মেয়েটা অনেক দূর পর্যন্ত সোজা হেঁটে চলে গেল। শ্যাম আলোটাকে কয়েকবার দত্তবাড়ির দেয়ালে নাচিয়ে দিল, দেয়াল-ঘেরা লন—তাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কাক, সিঁড়ির নীচের ফুটো থেকে বেরিয়ে এসে একটা সাদা বেড়াল ডন দিচ্ছে। বেড়ালের মুখে শ্যাম আলো ফেলল, কোনও ফল হল না, মুখ ঘুরিয়ে রাজরানির মতো অবহেলায় বেড়ালটা সিঁড়ি ভেঙে দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। শ্যাম আলো ঘুরিয়ে দিতে একটা কাক উড়ে গেল। লনের ও-পাশে দূরের একটা বাড়ির জানালায় অসাবধানে আলো পড়তেই চিকমিক করে উঠল কয়েকটা সাজিয়ে রাখা পেয়ালা পিরিচ। শ্যাম আলো ফেলতে ফেলতে ক্রমে আলোটার নড়াচড়ার ওপর কর্তৃত্ব খুঁজে পাচ্ছিল। মিত্তিরদের বুড়ো বাপ বাজার করে ফিরছে, পিছনে চাকর— শ্যাম দু'জনকেই ছেড়ে দেয়। খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে একটা ট্যাক্সি—জানালায় একটা অবাঙালি বাচ্চা ছেলে, শ্যাম ঝট করে তার মুখে ফেলে আলো, তারপর ট্যাক্সির গতির সঙ্গে তাল রেখে আলোটা স্থির রাখে একটুক্ষণ। বাচ্চাটা তার দিকে তাকায়, হাতে চোখ আড়াল করে, খানিকটা দূরে গিয়ে হঠাৎ জিভ ভেঙিয়ে চলে যায়। তারপর আলো ফেলতে তার ক্লান্তি লাগে। সে একটা গোরু, একটা বুড়ি আর একটা সিনেমার পোস্টারে নায়িকার মুখে পর পর আলো ফেলে। তারপর আয়নাটা রেখে দেওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে চলে আসছিল শ্যাম। ঠিক এ-সময়ে সে শুনতে পেল একটা মোটর-সাইকেলের আওয়াজ, ডান দিকের মোড়ের ও-পাশ থেকে আসছে। দ্রুত তার হাত-পায়ের পেশি শক্ত হয়ে ওঠে। অনেক দিন ধরে সেই কবে থেকে যেন মোটর সাইক্লিস্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার। দ্রুত জানালার কাছে ঘুরে আসে সে। মোটর-সাইকেলটা এক্ষুনি মোড়ে এসে বাঁক নেবে— মোড়টা তেমাথা। শ্যাম লক্ষ করে, বড় রাস্তার ওপর একটা গোরু ধীরে রাস্তা পার হচ্ছে। মোড়ের থেকে মোটর সাইকেলের মুখ আর লোকটার কালো মাথা দেখা যেতেই শ্যামের আয়নার আলো ঠিকরে পড়ল মুখে— ঠিক মুখে। ঝড়ের মতো শব্দ তুলে বাঁক নিচ্ছিল মোটর-সাইকেল, শ্যাম এক পলকের জন্য দেখল লোকটা তার আলো থেকে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে কাত হল। তারপর আর কিছু দেখার ছিল না, শুধু গোরুটার ভয়ংকর লাফিয়ে ওঠা ছাড়া। তড়িৎগতিতে শ্যাম মেঝেতে বসে পড়ল, শুনতে পেল রাস্তার ওপর মোটর সাইকেলটার আছড়ে পড়ার ধাতব কঠিন শব্দ। সে হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছ থেকে ঘরের মধ্যে চলে এল। আয়নাটা বিছানায় ছুড়ে দিয়ে দ্রুত দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তার ভিড়টাকে এড়িয়ে গেল সে। লোকজন জড়ো হচ্ছিল দ্রুত। শ্যাম তাদের পাড়া ছাড়িয়ে গেল। খুব সুন্দর রোদ আজ, তেমন খুব শীতও। খুঁজেপেতে সে একটা নিরিবিলি চায়ের দোকান বের করল। খুবই ওঁছা দোকান। কোণের দিকে একটা জায়গা দখল করে বসে পড়ল। কেন যে মোটর-সাইক্লিস্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার— তা ঠিক মনে পড়ছিল না শ্যামের। মনে করতে গিয়ে মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে উঠল। মেঝেয় গড়াচ্ছিল খবরের কাগজ। সে নিচু

হয়ে কুড়িয়ে নিল। অনেক দিন খবরের কাগজ পড়া হয় না। অন্যমনস্ক থাকার জন্যে সে খবরের কাগজে মাথা গুঁজে দিল। দিয়েই দেখল খেলার পাতা। একজন খেলোয়াড় কাল থেকে আটানব্বই রানে নট আউট আছে। বেচারা! সারারাত নিশ্চিত ওর ঘুম হয়নি! কম রানে আউট হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত। তবু আরও দুই রান, মাত্র আর দুটো ভয়ংকর বিভীষিকার মতো রান— বাইশ আর বাইশ চুয়াল্লিশ গজ মাত্র! শ্যামের ইচ্ছে হল লোকটার জন্য এক্ষুনি চুয়াল্লিশ গজ একটা ছুট দিয়ে আসে। অতটুকুর জন্য সারারাত না-ঘুমোনো, খাওয়ার অনিচ্ছা, মহিলার প্রতি শীতল আচরণ— সবই সম্ভব। বেচারা লোকটা! ওই দুটো রান না হলে...! না হলে কী যে হবে ভেবে শ্যাম খুবই অসহায়ভাবে চার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। মনে হল দৈব ছাড়া কোনও উপায় নেই। ওই দুটো রান যে হবেই কোনও মানুষ তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সামান্য অস্থির বোধ করে শ্যাম। সে খবরের কাগজটা ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। দাম দিয়ে দেয়। তারপর খোলা রাস্তায় রোদ আর বাতাসের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এলোমেলো হেঁটে যায় এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তা।

তারপর দুপুরবেলা সে তার পাইস হোটেলে নিজের সম্মানে নিজেকেই একটা ভোজ দিল। মাংসের হাড় ভাঙল মড় মড় করে, দই খেল চেটেপুটে। সুবোধ মিত্র সকাল ন'টায় খেয়ে অফিসে যায়। দেখা হল না। কিন্তু ভেবে রাখল শ্যাম, রাত্রে দেখা হলে মিত্রকে সে খাইয়ে দেবে। আজ মৌরি নিল না শ্যাম, বাইরে এসে দোকান থেকে পান খেল একটা, আর কিনে নিল খুব দামি এক প্যাকেট সিগারেট। ভিখিরিদের দেওয়ার জন্য পুরো একটি আধুলি খুচরো করে নিয়ে পকেটে রাখল। বস্তুত এখন মাসের শেষ, কিন্তু তার কোনও চিন্তাই নেই। ব্যাঙ্কে এখনও আড়াই হাজারের মতো মজুত আছে। ইচ্ছে করলে মাসের যে-কোনও দিনকে মাস পয়লার বিকেলের মতো সুসময় করে তোলা যায়। একত্রিশের জন্মদিনে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হচ্ছিল তার। তার এমনও মনে হচ্ছিল যে, আজকের দিনটা বোধহয় ভালই কেটে যাবে। পরমুহূর্তেই মনে মনে নিজেকে শাসন করল সে। ভবিষ্যৎ-চিন্তাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। অতীত চিন্তাও। কাজেই সে সকালের কথা ভুলে গেল, বিকেলের কথাও আর ভাবল না। খর রোদ আর উত্তুরে বাতাসের চমৎকার এই দুপুরের মধ্যেই মজে গেল তার মন। খ্রিসমাসের আর দেরি নেই। দোকানে লাল শালুতে লেখা 'হ্যাপি খ্রিসমাস'। শো কেসে সাজানো কেক, তুলা দিয়ে তৈরি তুষারক্ষেত্র আর বুড়ো সান্টা ক্লস। সামনেই একটা রুটির ভ্যান, পিছনের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত খোপে খোপে সাজানো রুটি। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীতে বড় সুসময় এসে গেছে। এবার বোধহয় মাঠে মাঠে ফসল ফলেছে খুব, চাষাদের গৃহিণীরা হয়েছে সন্তানবতী। সরকারি বিজ্ঞপ্তি চলে গেছে গ্রামে গ্রামে, 'আরও সন্তান উৎপাদন করো গো মা-জননীরা। জমিন পতিত রেখো না গো বাপ-সকল, সুসন্তানে ভরে দাও দেশ। আমাদের কারখানায় বাড়ছে উৎপাদন, আমাদের কৃষিতে বাড়ছে উৎপাদন, আমাদের খনিতে বাড়ছে উৎপাদন। এত ভোগ করার লোক কই গো? খাওয়ার লোক নেই বলে আমরা ইলিশের ঝাঁককে সমুদ্রে চলে যেতে দিলুম, বাছুরে খেয়ে শেষ করতে পারে না বলে আমাদের দুগ্ধবতী গোরুগুলির বাঁট ফুলে দুধ খসে পড়ছে মাটিতে, ভরভরন্ত পাকা ফসলের ক্ষেতে আমরা ছেড়ে দিয়েছি মোষের পাল, আবাদের মৌচাক থেকে চুঁইয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মধু। মা-জননীরা লোকজনে ভরে দাও দেশ। সুসন্তান দাও গো, বাপ-সকল!' মুখে সামান্য হাসি, গায়ে শীতের স্বাস্থ্যকর রোদ আর ভরা পেটে শ্যাম আস্তে আস্তে হাঁটছিল। অতীতের কোনও মুখ মনে পড়ে না, ভবিষ্যতের কোনও চিন্তা মনে আসে না। বড় তৃপ্ত এবং স্নিগ্ধ লাগছিল নিজেকে। ফুটপাথে ডাকবাক্সের পিছনে ছেঁড়া কাঁথার সংসার থেকে একটা ভিখিরির ছানা হামা দিয়ে ফুটপাথের মাঝামাঝি চলে এসেছে। শ্যাম এক লাফে তাকে ডিঙিয়ে গেল। একজন হকার ধীর-গম্ভীর স্বরে তাকে উদ্দেশ করে হাঁকল, 'গেঞ্জি...!' ভীষণ চমকে উঠল শ্যাম। তারপর দ্রুত পেরিয়ে গেল গেঞ্জিওয়ালাকে। আর-একটু হলেই অতীতের কথা মনে পড়ে যেত। সে সামনেই মোড়ের মাথায় বাঁক নিল। ফাঁকা রাস্তা। ঢিমেতালে ক্লান্ত একটি লোক ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। শ্যাম টপ করে চোখ বুজে ফেলে। অমনি চোখের ওপর ছবি ফুটে ওঠে। সারি সারি সব দোকান, সৎ দোকানিরা পবিত্র চোখ নিয়ে বসে আছে। শালীন ও সুন্দরী যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, শান্ত ও সুন্দর শিশুরা হেঁটে যাচ্ছে, নির্লোভ, বিনয়ী ও স্বাস্থ্যবান যুবা পুরুষ দ্রুত চলেছে কাজে, কর্মঠ ও বিজ্ঞ বুড়োরা সকৌতুক চোখে

বারান্দায় বা ব্যালকনিতে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে সুন্দর অবসরের জীবন। সর্বত্রই অদৃশ্য বিজ্ঞাপন— বেঁচে থাকুন। আপনার জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান।

হাইড্র্যান্টের জলে শ্যামের ডান পা ছপ করে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল। চোখ চেয়ে হাসল শ্যাম। সামান্য ক্লান্তি লাগছিল তার। অনভ্যাসের বেশি খাবার তার পাকস্থলীতে ডেলা পাকিয়ে উঠছে। তবু ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হল না তার। হাঁটতে হাঁটতে সে আবার বড় রাস্তায় চলে এল। চৌরঙ্গির দিকে গেলে মন্দ হয় না, খ্রিসমাস ইভে ওই দিকটাই জমজমাট। বাস-স্টপে ঘ্যান-ঘ্যান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা নানা বয়সের ভিখিরি, কালো চশমাপরা এক মহিলা রুমালে মুখ চেপে চোখ ফিরিয়ে বাসের পথ চেয়ে আছে, রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'টেরিলিন'-পরা দুই ছোকরা। বাস এসে গেল। সামান্য ভিড় ঠেলে নামা-ওঠার মধ্যে যে ধাক্কাধাক্কি তাতে গা ছেড়ে দিল শ্যাম। তারপর বাসের হাতল ধরার ঠিক আগের মুহূর্তে পকেটের যাবতীয় খুচরো পয়সা মুঠো করে তুলে ফেলে দিল রাস্তায়। রিনরিন ঠিনঠিন সেই শব্দ কয়েক মুহূর্তের জন্য রাস্তার অন্য শব্দকে ডুবিয়ে দিল। সেই শব্দের এত জোর যে চমকে উঠল আশপাশের লোকজন, নামতে বা উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল অনেকে। হাসি চেপে শ্যাম দেখল ফুটবোর্ডের ওপর একজন বুড়ো বাসের হাতল ছেড়ে দিয়ে টাল খেতে খেতে ভীষণ সন্দেহে নিজের তিনটে পকেট হাতড়ে দেখছে। পয়সা! আরে! পয়সা পড়ল কার! এরকম একটা চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল; ভিড়ের মধ্যে পানকৌড়ির মতো ডুব দিল দুটো লোক। শ্যাম নিশ্চিন্তে উঠে গেল বাসে। কন্ডাক্টর ঘণ্টির দড়ি টেনে রেখে দিল, তারপর একটু ইতস্তত করে দ্রুত বাজিয়ে দিল ঘণ্টি, চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে!' ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল শ্যাম, বাস-স্টপের ভিখিরিদের মধ্যে ছোটখাটো একটা দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। কিছু লোক জমে গেছে ইতিমধ্যেই। মুখ ফিরিয়ে শ্যাম বাসের ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল। তারপর রড ধরে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ফেলল। সামান্য ভাত-ঘুম পেয়ে বসছিল তাকে।

এলগিন রোড পেরিয়ে সে বসবার জায়গা পেল। থিয়েটার রোডের কাছাকাছি কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলে পকেটে হাত দিয়ে সামান্য থমকে গেল শ্যাম। একটিও খুচরো পয়সা নেই। বুক-পকেটে দুটো দশ টাকার নোট। একটা বাড়িয়ে দিয়ে শ্যাম কন্ডাক্টরের দিকে তাকাল। ঝাঁকড়া চুলওলা কর্কশ চেহারার লোক, মুখে শিরা-উপশিরা জেগে আছে। মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটা বলল, খুচরো দিন। বাসটা একটা স্টপে ধরল। শ্যাম লোকটার চোখে স্থির চোখ রেখে বলল, নেই। কন্ডাক্টর হাতের টিকিটে 'টিরিক' করে করে আঙুল দিয়ে শব্দ তুলল, পিছনে তাকিয়ে পার্টনারকে পুরুষ গলায় বলল, বলবে ভাই! তারপর দ্রুত হাতে ঘণ্টির শব্দ তুলে শ্যামের দিকে চেয়ে বলল, খুচরো নেই? শ্যাম মাথা নাড়ে—নেই। আবার সেই হাতের টিকিটে 'টিরিক' শব্দ, বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকায় লোকটা, নোটের ভাঙানি হবে না। শ্যাম স্থির-দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তা হলে? লোকটা অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, তা হলে আর কী! এমনিই চলুন। বলতে বলতে লোকটা ভিড়ের ভিতর ঢুকে যায়, নেপথ্য থেকে তার গলা শোনা যায়, অনেকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে, বাসে বড় নোটের ভাঙানি পাওয়া যায় না। মুহূর্তেই চোখে-মুখে রক্ত ছুটে এল শ্যামের, রাগে আর অপমানে শরীর কেঁপে উঠল তার। ইচ্ছে হল লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে সবাইকে বলে, ভাইসব, একটু আগে গড়িয়াহাটার মোড়ে আমি মুঠো-ভরতি খুচরো পয়সা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছি...। কিন্তু বস্তুত তা করল না শ্যাম। শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। কন্ডাক্টর পিছন ফিরে ওদিককার টিকিট নিচ্ছে, শ্যাম তার পিঠে খোঁচা দিয়ে বলল, আমি নেমে যাচ্ছি। লোকটা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল, একটুও দুঃখিত না হয়ে বলল, আপনার ইচ্ছে। বাসসুদ্ধ লোক দেখছিল শ্যামকে। উকিলের মতো কালো পোশাকপরা বুড়ো একটা লোক শ্যামের রাস্তা আটকে বলল, দাঁড়ান, আমি দেখছি। আমার কাছে থাকতে পারে। বলেই লোকটা হাতের ফোলিও ব্যাগ এগিয়ে দেয় শ্যামের দিকে, এটা ধরুন। আমার ভিতরের পকেটে আছে কি না দেখি। শ্যাম বিনীতভাবে তার ব্যাগটা ধরল হাত বাড়িয়ে। লোকটা চলন্ত বাসে দোল খেতে খেতে তার গলাবন্ধ কোটের তিনটে বোতাম খোলে, তারপর রহস্যময় অন্দরমহলে হাত চালিয়ে বের করে আনে একটা প্রকাণ্ড নোট-বই। লোকটা পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে শ্যাম লোকটার কাঁধ চেপে ধরে রাখে, পিছন থেকে একজন দয়ালু হিন্দুস্থানিও লোকটার পিঠে নিজের কাঁধ ঠেকা দেয়। লোকটা তার নোট-বই

খুলতেই একগাদা খুচরো কাগজ ঝরে পড়ে। 'আহাঃ' বলে বুড়ো তখন নিচু হয়ে কাগজ কুড়োয়, শ্যাম আর হিন্দুস্থানিটা তাকে ধরে রাখে। দাঁড়িয়ে এবার সতর্কভাবে অনেক কাগজপত্রের ভিতর থেকে টাকা বের করে লোকটা গুনে-গেঁথে শ্যামের হাতে দেয়। প্রথমে ফোলিও ব্যাগটা, তারপর দশ টাকার নোট তার হাতে দেয় শ্যাম, তারপর একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে, পরোপকার করতে পারায় বুড়োর মুখেও সামান্য হাসি দেখা দেয়। শ্যাম ধীরেসুস্থে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে, পিছন ফিরে আর তাকায় না। কন্ডাক্টরের কর্কশ গলা শোনা যায়, 'কী হল? ভাড়াটা—?' শ্যাম উত্তর দেয় না। ভাড়া দেওয়ার কোনও ইচ্ছেই সে বোধ করে না। তাই নিজেই ঘন্টির দড়ি টেনে বাস থামায় স্টপে, তারপর নামবার আগে নিজেই ছাড়বার ঘণ্টি দিয়ে দেয়, ময়দানের কাছে নেমে পড়ে। চলন্ত বাস থেকে সামান্য গোলমাল তার কানে আসে, সে কান ফিরিয়ে নেয়। হাসিমুখে মাঠের টলটলে রোদের মধ্যে নেমে যায়।

একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে অনির্দিষ্ট দিকে ছুড়ে মারে শ্যাম। ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে নিয়ে চিবোয়, খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। সে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না, কী কারণে, কেন মোটর-সাইক্লিস্টদের ওপর তার একটা পুরনো, পোষা রাগ আছে। ভ্রূ সামান্য কুঁচকে ওঠে তার। পকেট হাতড়ে সে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। পেটের ভিতরে গাঁজিয়ে উঠেছে দুপুরের খাবার, তার সামান্য বুকজ্বালা করে। দেশলাই জ্বালতে গিয়ে সে লক্ষ করল তার আঙুল অল্প অল্প কাঁপছে। গত কয়েক মাসে তার শরীর শুকিয়ে গেছে অনেক। এককালে প্রতি মাসের চার তারিখে ওজন নেওয়া তার বাতিক ছিল, তখন দিনের মধ্যে কয়েকবারই তার নিজেকে রোগা কিংবা মোটা বলে মনে হত। বহুকাল ওজন নেওয়া হয়নি আর। তবু সে জানে ওজন অনেক কমে গেছে। অনেক দুশ্চিন্তা ও মেদ ঝরে গেছে তার।

খুশি মনেই শ্যাম মাঠের মধ্যে অনেক দূর হেঁটে যায়। এলোমেলো হাওয়ায় তার তেল-না-দেওয়া রুক্ষ চুল উড়ে আসে কপালের ওপর। আঙুল দিতেই চুলের জট টের পাওয়া যায়, চিরুনি বসালে চোখে জল আসে। শ্যাম সাদা পোশাক-পরা একদল ক্রিকেট খেলোয়াড়কে অন্যমনস্কভাবে পেরিয়ে গেল। পাতা-পোড়ানোর মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় হঠাৎ। তারপর মাঠ-ভরা রোদ্দুরের ভিতরে সে ইচ্ছেমতো হাঁটতে থাকে, যেদিকে খুশি চলে যায়। বাঁ দিকে সাদা শূন্যতায় ধু-ধু করছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ডান ধারে বহুদূরে দেখা যায় হাঁটু মুড়ে গঙ্গার কোল জুড়ে আছে হাওড়ার পোল, ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ জীর্ণ স্তম্ভটির মতো বিবর্ণ নিঃসঙ্গ অক্টরলোনি মনুমেন্ট। তারপর একসময়ে তার আর দিক ঠিক থাকে না। সে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে দেখে হাওড়ার পোল তার বাঁ দিকে চলে গেছে, ডান দিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আবার কয়েক পা হেঁটে সে ডাইনে-বাঁয়ে কোনওটাকেই খুঁজে পায় না। কখনও সে সামনে পিছনে, কখনও বাঁয়ে ডাইনে, কখনও ডাইনে বাঁয়ে ওই দু'টিকে দেখতে থাকে। মাঠের মধ্যে এত দূরে চলে এসেছে সে যে, দূরের রাস্তায় লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। প্রকাণ্ড মাঠ ভূতগ্রস্তের মতো ঝিমঝিম করছে রোদে, ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে নিয়ে খেলছে বাতাস, আর পাতা-পোড়ানোর মিষ্টি গন্ধ। তার শিরা-উপশিরায় রক্তের গতি ক্রমে ঝিমিয়ে আসছে সে টের পায়। সে কোনওক্রমে একটা গাছের ছায়ার দিকে হেঁটে যেতে থাকে। গাছটা কেবলই সরে যায় ডাইনে বাঁয়ে, দূরে সরে যায়। হাঁপিয়ে ওঠে শ্যাম। সামান্য অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তারপর আবার সে চেষ্টা করতে থাকে। গাছটার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, চোখ বুজে এবং চোখ খুলে সে গাছটার ছায়ায় পৌঁছুতে চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ লেগে যায়। এবং একসময়ে সে গাছটার কাছে পৌঁছে যায়। আপনমনে মৃদু কৃতিত্বের হাসি হাসে শ্যাম, তারপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। প্রকাণ্ড খোলা উদোম আকাশ হঠাৎ নেমে আসে তার চেতনার ওপর। ক্রমে চোখ থেকে আলো মুছে যায়। অসহায় শ্যাম হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে চায় ঘাস-মাটি, গাছের ছায়া, কিন্তু টের পায়, তার জাগরণের তটভূমি অতিক্রম করে আসছে ঘুমের ঢেউ। তাকে নিয়ে যেতে থাকে। শেষবারের মতো এক ঝলক চেয়ে দেখে শ্যাম, হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে হয় তার জাগরণ কিংবা ঘুম কোনওটাই তার ইচ্ছাধীন নয়। ভয়ংকর শক্তিমান কেউ তাকে তার ইচ্ছামতো চালিয়ে নিচ্ছে, কাঠি ছুঁইয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছে ঘুম, কাঠি ছুঁইয়ে জাগাচ্ছে। এই রোদ, এই মাঠ, এই ঘাস কিংবা গাছের ছায়া, অথবা ওই ন্যাংটো উদোম আকাশের মধ্যেই কোথাও রয়েছে সে। শেষ চেষ্টায় সে খুঁজে দেখে প্রাণপণে, তারপর ধপ করে তার চেতনাহীন মাথা নরম ঘাস-মাটির মধ্যে ঘুমে ডুবে যায়।

মোটর-সাইকেলের ভীষণ শব্দে চমকে ঘুম ভেঙে গেল শ্যামের। শিউরে উঠে বসল সে। তড়িৎগতিতে তাকিয়ে দেখল চার দিকে। তারপর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল আওয়াজ। সে স্পষ্ট টের পেল শব্দটা আসছে তার মাথার ভিতর থেকে। সার্কাসে কিংবা শিয়ালদার রথের মেলায় জালে-ঘেরা গোল খাঁচার মধ্যে মৃত্যুকূপের সেই খেলায় যেভাবে মোটর-সাইকেল ঘুরতে ঘুরতে ওঠে কিংবা নামে, চক্কর দেয়, ঠিক অবিকল সেই রকমভাবে একটা মোটর-সাইকেল এতক্ষণ তার মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেল। সে জেগে উঠতেই সেই শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গভীর নিস্তব্ধতার ভিতরে মিলিয়ে গেল। তারপর নিজের হৃৎপিণ্ডের ধক ধক শব্দ শুনতে পেল সে। কিছুক্ষণ সে ভীষণ বোকার মতো, গাড়লের মতো তার চতুর্দিকে অন্ধকার মাঠ, আর কুয়াশায় ভরা শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল। মনে হয় নিশিরাতের পরি তাকে উড়িয়ে এনেছে, শুইয়ে দিয়ে গেছে এই মাঠের মধ্যে। তারা নিয়ে গেছে তার স্মৃতি, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ-চিন্তা। এখন আর নিজের নাম মনে পড়ে না, পরিচয় মনে পড়ে না। হিম পড়ে ভিজে গেছে তার ধুতি আর চাদর, স্যাঁতস্যাঁত করছে স্যান্ডেল। উত্তরের বাতাস লাগে হঠাৎ, হি-হি ঠান্ডায় সে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ খেয়াল হয়, ডান হাতের মুঠোয় ধরা দশ টাকার ভাঙানো নোট। মনে পড়ে যায়, বাস-ভাড়া দেওয়া হয়নি। মনে পড়ে যায়, আজ তার একত্রিশের জন্মদিন। মনে পড়ে যায় যে, সে শ্যাম।

উঠে পড়ে শ্যাম। ধীরেসুস্থে অন্ধকার মাঠ পার হয়। ঘাসে হিম জমে আছে— শিশিরে ভিজে পায়ের পাতা থেকে কিলবিল করে শীত উঠে আসে শরীরে। বাস-রাস্তায় এসে সে বাস ধরল। সারা রাস্তায় সে কিছুতেই ভেবে পেল না, কেন সে ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল! কেন সে বাসের ভাড়া দেয়নি! কেন সে খুচরো ছিটিয়ে দিয়েছিল রাস্তায়! কেন সে আয়নার আলো ফেলেছিল একজন মোটর-সাইক্লিস্টের মুখে।

॥ পাঁচ ॥

পাইস হোটেলের দরজায় সুবোধ মিত্রের সঙ্গে দেখা। মিত্র হইহই করে ওঠে, সাড়ে সাতটায় আপনি এখানে! আমি তো মাত্র বিকেলের থার্ড কাপ চা চালিয়ে গেলুম, দশটায় খেতে আসব। চলুন মশাই, বলে মিত্র শ্যামের হাত ধরে, এক্ষুনি রাতের খাওয়া শেষ করলে মাঝরাতে খিদে পাবে। চলুন—

এতক্ষণের শীতভাব কেটে যায় শ্যামের। শরীরের উত্তাপ ফিরে আসে। মনে পড়ে, সারা দিন সে কথা বলেছে খুব কম। হিসেব করে দেখল, সকাল থেকে সে কথা বলেছে মাত্র চারটি লোকের সঙ্গে— প্রথম, চায়ের দোকানের বয়, তারপর হোটেলের ছোকরা চাকরকে মাংস আর দই দিতে বলেছিল, পানের দোকানদারের কাছে চেয়েছিল সিগারেট আর পান, কন্ডাক্টরকে বলেছিল খুচরো নেই, আর, আমি নেমে যাচ্ছি।

সে হেসে মিত্রকে বলল, নিয়ে চললেন কোথায়!

কাছেই আমার আস্তানা মশাই। চলুন, দেখে আসবেন।

অনুগতের মতো শ্যাম মিত্রর সঙ্গে হাঁটতে থাকে, কেননা, এখন যে-কোনও সঙ্গই তার কাছে প্রিয় বলে মনে হয়। সে মিত্রর দিকে চেয়ে দেখে, এবং পাশ থেকে মিত্রর প্রোফাইল দেখে তার এমন ধারণা হতে থাকে যে, মিত্রর বয়স খুব বেশি নাও হতে পারে।

যেতে যেতে মিত্র লন্ড্রি থেকে কাপড় নিল, মুদির দোকান থেকে নিল বাতাসা, ফুলের দোকান থেকে গ্যাঁদাফুল নিল কলাপাতায় মুড়ে। এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে একটানা কথা বলে যাচ্ছিল মিত্র, আপনি মশাই ক্রিমিনাল! (শ্যামের শীত করে ওঠে।) আমি ভেবেছিলুম আপনি বেকার। আজ হোটেলের ম্যানেজারের কাছে শুনলুম, বেশ ভাল একটা চাকরি করতেন আপনি— অফিসার। ডিরেক্টারের বদমাইসি ধরে দিয়েছিলেন বলে আপনার চাকরি গেছে। হাঃ... হাঃ... সত্যি নাকি! (শ্যাম মৃদু হাসে) তা আপনি মশাই, এখনও বেশ আদর্শ-ফাদর্শ মেনে চলেন দেখছি!... তা আমারও ছিল মশাই— ওই আদর্শ যাকে বলে। রাজযোগ আর লাইফ ডিভাইন আমার নিত্যপাঠ্য ছিল, কণ্ঠস্থ ছিল গীতাখানা। কিন্তু মশাই...

(মিত্রর সঙ্গে শ্যামও দুঃখিতচিত্তে মাথা নাড়ে— হয় না।) ও হয় না। কী বলব, সাধনমার্গে আমি খানিকটা উঠেও ছিলুম। শেষ দিকে ধ্যানে বসলে গা শিরশির করত, শরীর হালকা বোধ হত, আর জ্যোতি-ফ্যোতিও খানিকটা দেখতে পেতুম। বয়স!... না, তখন আর বয়স এমনকী, কুড়ি-টুড়ি হবে। মেরুদণ্ড শালগাছের মতো সোজা রেখে হাঁটতুম, বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়াতুম বিবেকানন্দের মতো, আপনমনে বিড়বিড় করতুম—মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স...হাঃ হাঃ...! সেই সময়ে, আমার কুড়ি-একুশ বছর বয়সে, রাস্তা-ঘাটে ঘরে-ছাদে, ক্যালেন্ডারের ছবিতে, সিনেমার পোস্টারে, স্মৃতিতে-স্বপ্নে এত মেয়েছেলে ছিল না মশাই! আর এখন দেখুন, হুড়মুড় করে কোথা থেকে এল এত মেয়েছেলে, ভরে গেল দেশ! বলতে বলতে কেমন ফ্যাকাশে দেখাল মিত্রকে, বিহ্বল চোখে সে একবার চার দিকে চেয়ে দেখল।

শ্যাম লক্ষ করে, মিত্রর বাঁ বগলে লন্ড্রিতে ধোয়ানো কাপড়, বাঁ হাতে বাতাসার ঠোঙা, ডান হাতে কলাপাতায় মোড়া ফুল। এখন যদি হঠাৎ মিত্রর ঘাড় কি নাক চুলকে ওঠে, তা হলে হয়তো মিত্র শ্যামকেই বলবে, দিন তো মশাই আমার ঘাড়টা (কি নাকটা) একটু চুলকে! ভাবতেই শ্যাম খুব বিনয়ের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বলল, আপনার ফুলটা আমার হাতে দিন।

মিত্র ঘাড় নাড়ে, না, না। এ আমার নিত্যকর্ম মশাই, মা কাঠের সিংহাসনে একটা ঠাকুর বসিয়েছিলেন, মরবার সময় মিনমিন করে বললেন, ঠাকুরকে একটু ফুল-বাতাসা দিস। আমিও রোজ দিয়ে যাই। চার-ছ' আনায় হয়ে যায় ব্যাপারটা। নইলে মশাই, ঠাকুর-দেবতায় আমার আর তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। ভগবান-টগবান আছে বলে মনে হয় আপনার? বলে উৎসুক চোখে মিত্র শ্যামের দিকে তাকায়, তারপর নিজেই বলে, আছে বোধহয় কিছু একটা, কিন্তু...

বলতে বলতে গলির শেষে মিত্রর ঘরের সামনে পৌঁছে যায় তারা। মিত্র তালা খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালায়, বলে, এই আমার আস্তানা।

দেয়ালে অনেক ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো, গোটা তিনেক ক্যালেন্ডার, ইজিচেয়ার, টেবিল আর এখানে-ওখানে স্তূপীকৃত বইপত্র। জ্যোতিষবিদ্যার দু'টো পত্রিকা বিছানায় ওলটানো। টেবিলের রবিঠাকুরের ছবিতে একটা মালা পরানো, সামনে ধূপকাঠির স্ট্যান্ড। বিস্তর ধুলো জমেছে সর্বত্র। ঘরের জানালা মাত্র একটি, ভিতরের দিকে আর-একটা দরজা। মিত্র বাঁ হাতে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে ডান হাতে দরজাটার ছিটকিনি নামিয়ে বলে, ভিতরটা দেখবেন নাকি!

শ্যাম বলে, থাক।

মিত্র শ্বাস ছাড়ে, কিচেন আছে একটা। ঘুপচি একটা স্টোররুম, ফ্যামিলির কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু সব লক্ষ্মীছাড়া।

মিত্র দ্রুত ধুতি-শার্ট পালটে লুঙ্গি পরে নিল, এক লহমায় ভিতরে গিয়ে চোখে-মুখে, হাতে-পায়ে জল দিয়ে এল, তারপর টেবিলের সামনে একটা আসন পেতে মেঝেতে বসে শ্যামকে হাত দেখিয়ে একটু অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল। শ্যাম লক্ষ করে, টেবিলের নীচে ঘুপচির ভিতরে একটা কাঠের ছোট্ট পালঙ্ক। সেখানে রয়েছে পিতলের গোপাল, মাটির কালী, রামকৃষ্ণ আর সারদামণির ছবি, এক দিকে আলাদা একটি পিতলের সিংহাসনে চকচক করছে শিবলিঙ্গ। ছোট থালায় গ্লাসে জল আর বাতাসা সাজিয়ে দিল মিত্র, ফুল ভাগ করে দিল সব দেবতাকে, তারপর চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড বসে রইল।

মিত্র উঠে দাঁড়াতেই শ্যাম বলে, কী মন্ত্র বললেন?

বললুম, ঠাকুর খাও। মা ওই মন্ত্রই বলতেন। বলে মিত্র হালকা চালে হাসে, কিছু না মশাই, এ স্রেফ অভ্যাস। অনেক দিন ভুল করে একবার দেওয়া বাতাসা আবার দিয়েছি, জ্বরজারি হলে বিছানায় শুয়ে বলি, ঠাকুর খাও। ঠাকুর তখন কী খায় কে জানে! তবে প্রসাদি বাতাসা আমি জমিয়ে রাখি কৌটোয়। বিকেলে মুড়ির সঙ্গে চলে যায়—হাঃ হাঃ...

মিত্র যত্নে রবিঠাকুরের ছবির সামনে ধূপকাঠি জ্বেলে দিল। শ্যাম লক্ষ করে, ছবির গলায় মালাটা তরতাজা। বোধহয় সকালে কেনা। সে বলে, ও মালাটা কেন?

মিত্র লাজুক একটু হাসে, এটাও অভ্যাস বলতে পারেন। তবে— বলে একটু দ্বিধা করে মিত্র, আপনাকে বলেছিলুম যে, ঠাকুরদেবতায় আমার আর ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু কোথাও কোথাও কিছু

একটা আছে মশাই... রবিঠাকুর...রবিঠাকুর...বলতে বলতে মিত্র আবার লাজুক একটু হাসে, সে একটা ব্যাপার আছে মশাই, আপনি ঠিক বুঝবেন না।

কেন?

মিত্র চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, আসলে রবিঠাকুরকে আমি খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করি।

সে তো অনেকেই করে। শ্যাম হাসে।

না, ঠিক সে-রকম নয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমি যাই না কখনও, শান্তিনিকেতন দেখিনি, রবিঠাকুরের কবিতাও আমি খুব একটা পড়িনি, কেবল বাংলা সিলেকশনে যা ছিল তাই, আর দু'-একটা ছুটকোছাটকা। পুরো কবিতা একটাও মুখস্থ নেই, তবে দু'-একটা লাইন যদি বলতে বলেন তো বলতে পারি, যেমন— রমণীর মন সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন। কিংবা, ওগো বধূ সুন্দরী...হাঃ হাঃ...না মশাই, ঠিক আপনারা যে-চোখে দেখেন, সে-চোখে নয়। রবিঠাকুর আমার কাছে অন্য রকম— একেবারে অন্য রকম। আলাদা।

মিত্র এসে শ্যামের পাশে চৌকিতে বসে, গলা সামান্য নামিয়ে বলে, বিপদে পড়লেই আমি রবিঠাকুরকে ডাকি, মশাই। মিত্রর মুখ-চোখ সামান্য গম্ভীর দেখায়। বলে, ছেলেবেলা থেকেই মশাই, আমার এই অভ্যাস। ভাল মনে পড়ে না, সেই কবে ছেলেবেলায় একবার মাথায় টিকটিকি পড়েছিল বলে ভয়ে আমি দৌড় দিয়েছিলুম, দড়াম করে ধাক্কা খেয়েছিলাম বাবার পড়াশুনোর টেবিলে, কেঁদে উঠতে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর রবিঠাকুরের ওই ছবি—মালা পরানো, সামনে ধূপকাঠি জ্বলছে, আমি কেঁদে বললুম, রবিঠাকুর, আমার মাথায় টিকটিকি...তুমি তাড়িয়ে দাও। আমার ঘন চুলের ভিতর থেকে তক্ষুনি টিকটিকির বাচ্চাটা ছিটকে পড়ল টেবিলে, তারপর দেয়াল বেয়ে উঠে গেল। আমি শিউরে উঠলুম। হাসবেন না মশাই, আমার মনে হয়েছিল, ছবির রবিঠাকুরের চোখে-মুখে একটু হাসি ঝিকমিকিয়ে গেল। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিল, পালিয়ে গেলুম। তারপর ক্রমে আমি বুঝতে পারলুম, আমি গোপনে একটা আলাদা রবিঠাকুরকে পেয়ে গেছি। সে আমার গোপন কথার মতো, মায়ের কাছে গায়ের জ্বর লুকিয়ে রাখার মতো করে আমি সকলের কাছ থেকে রবিঠাকুরকে আলাদা করে নিলুম, রাত্তিরে একা অন্ধকার ঘর পেরোতে পারছি না, ডাকলুম— রবিঠাকুর, আমি অন্ধকার পেরোতে পারছি না, পার করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে মনে হত খুব আপনজনের মতো কেউ আমার হাত ধরল, আমি গটমট করে পেরিয়ে যেতুম ঘর। ঘুড়ি ধরা নিয়ে একবার খালাসিপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট লাগলে আমি মার খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম— ঠাকুর, রবিঠাকুর, আমাকে এরা মারছে, তুমি আমাকে নিয়ে যাও। শুনে থমকে গিয়ে ছেলেগুলো হেসে গড়িয়ে পড়ল—রবিঠাকুর নিয়ে যাবে কী রে, ছেলেটা। তাদের হাসির ফাঁকে গলে গিয়ে আমি টেনে দৌড় মেরেছিলুম। আমি কতবার আমাদের ফুলবাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি রবিঠাকুরের সঙ্গে, চলে গেছি বহু দূরের নীলকুঠিতে ফল খেতে, রেল ব্রিজ হেঁটে পার হয়ে চলে গেছি শম্ভুগঞ্জের মেলায়, মাঝিদের ফাঁকি দিয়ে পাট-বোঝাই দু'দাড়া নৌকোর গাঁটরির ফাঁকে বসে চলে গেছি অচেনা গঞ্জে। লোকে ভাবত, একা একা গেছে সুবোধ। কিন্তু তা নয়, আমার সঙ্গে সবসময়েই থাকত রবিঠাকুর—ওই অত লম্বা, মাথায় কালো ঠোঙার মতো টুপি, গায়ে জোব্বা আর দুধ-সাদা দাড়িওলা রবিঠাকুর সবসময়ে থাকত আমার সঙ্গে, একটু কুঁজো হয়ে নরম একখানা প্রকাণ্ড হাতে ধরে থাকত আমার হাত। আমি নিশ্চিন্তে চলে যেতুম যেখানে সেখানে, পথ-হারানোর ভয় থাকত না, জানতুম রবিঠাকুর ঠিক পৌঁছে দেবে, ঝড়ে-জলে জোব্বার আড়ালে ঘিরে রাখবে আমাকে, ঘুমের আগে শুনিয়ে দেবে রূপকথার গল্প। মা, দিদি বা ঠাকুরমার কাছে কতবার শুনেছি, ভূতের ভয় পেলে বুকে রামনাম লিখিস। সন্ধেবেলা চার তারা না দেখে ঘরে ঢুকিস না। রাত্রে সাপের নাম করলে তিনবার আস্তিক মুনির নাম নিস। আমি সে-সব মানতুম না। আমি গোপনে রবিঠাকুরকে বলতুম, এরা তো জানে না যে, আমার তুমি আছ! তারপর খুব হাসতুম দু'জনে। আমাদের দু'জনের ছিল বাদবাকি সকলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। না, সবসময়ে নয়, সবকিছু চাইলেই যে পাওয়া যেত তা নয়। একবার একটা ছেলে আমাদের পোষা দাঁড়ের তোতা পাখিকে ঢিল মেরেছিল বলে আমি চেঁচিয়ে বলেছিলুম, রবিঠাকুর, ওর চোখ দুটো কানা করে দাও। তার ফলে দু'দিন বাদে আমার চোখ উঠল। আর-একবার আমি আমার ছোট বোনের কাছে জাঁক করে বলেছিলুম যে, আমি রাত দশটার সময় একা একা ছাদে বেড়িয়ে আসতে পারি। সে

বলল, ইল্লি! সঙ্গে সঙ্গে আমি বললুম, বাজি! সে তার জমানো পয়সা বাজি ধরলে। একদিন রাত দশটায় আমি হাসতে হাসতে ছাদে চলে গেলুম। কিন্তু নামবার সময় আমাদের পোষা বেড়ালের গায়ে পা পড়তে বেড়ালটা আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিল। সে রাতে রবিঠাকুর আর কথা বলেনি আমার সঙ্গে; কেননা—কেন আমি জেনেশুনে বাজি ধরেছিলুম! কেন আমি ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিলুম আমার ছোট বোনটার টিফিন-না-খাওয়া, পুঁতির-মালা-না-কেনা কষ্টে জমানো পয়সা! হ্যাঁ মশাই, যতক্ষণ আমি পবিত্র ও শুদ্ধ থাকতুম, ততক্ষণই রবিঠাকুর থাকত আমার সঙ্গে। ঝড়ে-জলে, আলোয়-অন্ধকারে, ঘরে কিংবা দূরে—সবসময়ে ওই অত লম্বা, মাথায় কালো টুপি, জোব্বা পরা দাড়িওলা লোকটা সব কাজ ফেলে আমার সঙ্গে থাকত।

ক্রমে মিত্রর চোখে চিকচিক করে ওঠে জল, না মশাই, আপনাদের রক্তমাংসের রবিঠাকুরকে আমি চোখে দেখিনি। আপনার কি মনে হয় আমার রবিঠাকুরের সঙ্গে আপনাদের রবিঠাকুরের কোনও মিল আছে?

শ্যাম মাথা নাড়ে, না।

আঃ! ঠিক তাই। আসলে আমিই ঠিক আসল রবিঠাকুরকে পেয়েছিলুম মশাই। কিন্তু রাখতে পারলুম না। ক্রমে বয়স বাড়তে লাগল, গালে এল ব্রণ, ঘুমে এল অবৈধ স্বপ্ন, চলায় ফেরায় এল সতর্কতা। আমার ভিতরে মশাই পাপ ঢুকে যেতে লাগল। তখন রবিঠাকুরের কবিতা পড়ি স্কুলে, মানে বই থেকে অর্থ দেখে নিই। কিন্তু কেবলই মনে হয় আমি যাকে চিনতুম এ সে নয়। একদিন আমি আমাদের বাগানের কোণে শিমুলগাছতলায় বসে ঘাসের ডাঁটি দাঁতে কামড়ে আস্তে ডাকলুম, রবিঠাকুর! কোনও সাড়া এল না। আবার ডাকলুম। সাড়া এল না। এল না তো এলই না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ডাকলুম। সকালে উঠে ডাকলুম, ছাদে গিয়ে মাঠে গিয়ে নৌকোয় চড়ে ডাকলুম। আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাকলুম, নদীর জলের দিকে চেয়ে ডাকলুম...তারপর বসলুম আমার গোপন কান্না কাঁদতে। গেল আমার রবিঠাকুর, গেল আমার সাহস, শুদ্ধতা, গেল আমার শৈশব; বুকের শব্দে বিসর্জনের বাজনা শুনলুম।

মিত্রর চোখ বেয়ে, গাল বেয়ে নেমে এল জল, ঘুমের মধ্যে মায়ের কোল থেকে যেভাবে সরে যায় বাচ্চা ছেলে! তারপর থেকেই আমার জীবন একটা ট্র্যাজেডি মশাই...

বলতে বলতে আস্তে ফুঁপিয়ে ওঠে মিত্র, হাঁটু মুড়ে মুখ গুঁজে দেয়, কাঁদতে থাকে। একটা ঘোরের মধ্যে শ্যাম এগিয়ে গিয়ে মিত্রর কাছ ঘেঁষে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, এলোমেলোভাবে বলতে চেষ্টা করে, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি...

শ্যাম মিত্রর অস্ফুট কথা শুনতে পাচ্ছিল, রবিঠাকুর ছাড়া আর আমার কিছু নেই—নেই। এখন আমাকে কে আবার দেবে সেই রবিঠাকুর? কে দেবে?

গভীর দুঃখে শ্যাম মাথা নাড়ে, ঠিক।

মুখ না তুলেই মিত্র বলে, সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন!

কী?

আমার আর ভালবাসা নেই।

ভালবাসা নেই? শ্যাম অবুঝের মতো প্রশ্ন করে।

নেই। আমি আর কোনও দিনই কোনও কিছুকেই তেমন করে ভালবাসতে পারলুম না। বলেই মিত্র গভীরতর কান্নায় ডুবে যেতে লাগল।

মিত্রকে কাঁদতে দিয়ে শ্যাম ধীর, নিঃশব্দ পায়ে উঠে এল। বেরিয়ে এল রাস্তায়। অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ে বের করল পকেট থেকে। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে খস শব্দে হঠাৎ মনে পড়ে যে, আজ একত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে গেল। মিত্রকে খাওয়ানোর কথা ছিল আজ। হল না। সামান্য একটু হেসে শ্যাম হাঁটতে থাকে।

গলির মুখে নির্জন রাস্তায় হঠাৎ একটা খুব লম্বা লোক শ্যামের উলটো দিক থেকে হেঁটে আসে। চমকে যায় শ্যাম—মিনু না! না, মিনু না, অন্য লোক, অনেকটা মিনুর মতো দেখতে।

দোতলার সিঁড়িতে সাদা একটা বেড়াল বলের মতো গোল হয়ে শুয়ে ছিল। শ্যাম অন্য মনে লাথি ছুড়ল, 'ফ্যাঁস' করে লাফিয়ে ওঠে বেড়ালটা, নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে উঠে যায় সিঁড়ির মাথায়,

সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যামের দিকে তাকিয়ে থাকে। শ্যাম দাঁড়িয়ে থাকে, বেড়ালটার দিকে চেয়ে দেখে— ভয়ংকর ঘেন্নায় রাগে বেড়ালটার দু'চোখ জ্বলছে। শ্যাম টের পায়, তার সামনের বাতাস বিদ্বেষে বিষিয়ে আছে। সিঁড়ি ভাঙতে পা তোলে শ্যাম, কিন্তু এগোতে পারে না। বেড়ালটা স্থির চোখে তাকে দেখে। হঠাৎ সে শুনতে পায়, তাকে ফেলে রেখে তারই পায়ের শব্দ সামনের সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে আস্তে হেসে ফেলে শ্যাম। না, সব ঠিক আছে। সে নিজেই উঠছে সিঁড়ি ভেঙে! শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য সে নিজের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

অনেক রাতেও শ্যাম তার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে ঘন কুয়াশা, গাছপালা স্থির। একটা ল্যাম্পপোস্টের একটু পাথুরে আলোর ভিতর দিয়ে ল্যাঙ ল্যাঙ করে একটা ঘেয়ো কুকুর চলে যায়। দূরে পুলিশের বুটের শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে শূন্য রাস্তায়।

শ্যাম তার সকালে কেনা প্যাকেটের শেষ সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে।

দেশলাই জ্বালবার খস শব্দে ভীষণ চমকে ওঠে সে। তার মাথার ভিতরে টলমল করে ওঠে ঘোলা জল। শূন্য চোখে কুয়াশার দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়—মাই গু—উ—ডনেস! টু-ডে কিলড এ ম্যান!

॥ ছয় ॥

লোকটা যে মরেছেই, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অনেকেই দেখেছে ব্যাপারটা, পাড়ায় একটু খোঁজ-খবর করলেই সঠিক খবরটা জানা যেতে পারে। তবু সামান্য দ্বিধায় পড়ল শ্যাম, কেননা, সে যে জানালায় দাঁড়িয়ে আয়নার আলো ফেলছিল এটাও অনেকের পক্ষে দেখে থাকা সম্ভব।

সকালে উঠে তাই শ্যাম প্রথমে খবরের কাগজটা দেখল। না, তাতে কোনও মোটর-সাইক্লিস্টের মৃত্যুর খবর নেই। একজন সাইক্লিস্টের সঙ্গে একটি টেম্পো ভ্যানের ধাক্কা লেগেছিল চিৎপুরে, একটি বাচ্চা ছেলে মারা গেছে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে রাস্তা পার হতে গিয়ে লরির চাপায়, একজন অজ্ঞাতনামা (৪০) লোক বাস থেকে পড়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে, আর-একজন...না, কোনও মোটর-সাইক্লিস্ট নয়। কাল কলকাতায় কোনও মোটর-সাইক্লিস্টেরই মৃত্যু হয়নি।

বড় হতাশ হল শ্যাম। এখন এই লোকটা, এই মোটর-সাইক্লিস্ট লোকটা যদি মরে না গিয়ে থাকে, তবে হয়তো তার হাত-পা একটু কেটেকুটে গেছে, কিংবা ভেঙেছে কয়েকটা হাড়গোড়। সে ক্ষেত্রে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার পর লোকটা অনায়াসে তার জানালাটা খুঁজে বার করতে পারে, এবং তারপর তাকেও। তখন একদিন না একদিন অকারণে আয়নার আলো ফেলার জন্য তাকে একটা অচেনা লোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। শ্যাম জানে লোকটা আইনগতভাবে কিছুই করতে পারে না। তবে লোকটা খুব লম্বা চওড়া এবং নিষ্ঠুর হতে পারে। না, তাকে ভাল করে দেখেনি শ্যাম শুধু আয়নার আলো তার মুখে ফেলে জানালার নীচে বসে পড়েছিল। কেন আলো ফেলেছিল তা শ্যামের জানা নেই, তবু শ্যাম মাত্র এইটুকুই বলতে পারে।

না মশাই, আপনার ওপর আমার কোনও রাগ ছিল না। আপনাকে আমি চিনতুমই না। অনেক দিন ধরে আমার হাতে কোনও কাজ নেই, জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে, আর ক্রমে ক্রমে আমি কেমন ঠান্ডা মেরে আসছি। কাজেই শরীর-মন গরম রাখার জন্য, ঝিমিয়ে পড়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সারাদিন আমাকে নানা খেলা তৈরি করে নিতে হয়। এই সবকিছুই মশাই একটি কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। যদি একটা মা-বাপ তোলা গালাগাল আমি সহ্য করতে পারতুম তা হলে আমি আজও থাকতুম সেই শ্যাম— যে টেলিফোন তুলে নেওয়া থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, এই সব কাজই খুব সুন্দর এবং ভদ্রভাবে করত, যে সারাদিন কেবল নিজের কথাই ভেবে যেত এবং তা হলে এই আলো-ফেলার খেলা তাকে খেলতে হত না এবং আপনিও নিরাপদে তেমাথায় মোড় ঘুরতে পারতেন—

শ্যামের এইসব যুক্তি যে লোকটা শ্যামের মতো করেই বুঝবে তার কোনও মানে নেই। সে-ক্ষেত্রে লোকটা শ্যামের দিকে দু'-এক পা এগিয়ে আসতে পারে। তখন কী করা উচিত তাও

শ্যাম ভেবে দেখল। সে-ক্ষেত্রে হাতের কাছে কিছু অস্ত্রশস্ত্র থাকা দরকার, দেয়ালে থাকা দরকার একটা পালিয়ে যাওয়ার গুপ্ত দরজা, আর জানালা দিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য একটা দড়ির সিঁড়ি। কিংবা, ইতুর সঙ্গে যে ছোঁয়াছুঁয়ির খেলাটা খেলেছিল শ্যাম, সেই খেলাটাও তখন খেলা যেতে পারে। কিংবা সুবোধ মিত্রকে গিয়ে বলা যেতে পারে 'এক জায়গায় বেশি দিন থাকা ঠিক নয় মশাই, আসুন আমরা ঘর বদল করে ফেলি।'

শ্যাম সামান্য উত্তেজনা বোধ করতে থাকে। সে দ্রুত তার ঘরের চার দিক ঘুরে ঘুরে দেখে নেয়। একটা মাত্র দরজা, তারপর অপরিসর প্যাসেজ, সিঁড়ি। জানালার কাছে এসে দেখে, প্রায় বারো-চোদ্দো ফুট নীচে শান বাঁধানো ফুটপাথ। ফিরে আবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখে শ্যাম। চিন্তায় তার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। ডান দিকের দেয়ালে বাথরুমের পলকা দরজা। নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হয় না শ্যামের। কোনওখানেই নেই লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা, বা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ। লোকটা যদি খুব গায়ের জোরওয়ালা লোক হয়, যদি খুব লম্বা-চওড়া, নিষ্ঠুর হয়, তা হলে আত্মরক্ষার জন্য শ্যামকে একটু প্রস্তুত থাকতে হবে। ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় শ্যাম ঘরের ভিতরে অদৃশ্য এবং অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের তাড়া খেয়ে এদিক-ওদিক দ্রুত সরে গেল। লাফ মেরে উঠল চৌকিতে, কয়েক পাক ঘুরল, বাতাসে ঘুঁষি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে গেল, ঘুঁষি মারল দেয়ালে— যেমন ঘুঁষি খেয়ে একবার রূপশ্রী ফার্নিচার্সের ওয়ার্ডরোবের পাল্লাটা চোট খেয়েছিল, আর দেয়ালের একটা দুর্বল অংশের চুনবালি পড়েছিল খসে।

তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে শ্যাম আপনমনে বলল, না মশাই, আপনার ওপর আমার কোনও রাগ নেই। ছিলও না। বলতে বলতে বাতাসে হাত এগিয়ে দিল শ্যাম খুব বিনীতভাবে, অদৃশ্য এবং অনুপস্থিত লোকটার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল, তারপর বলল, চা খাবেন?...হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন, বিছানাতেই বসুন, কিংবা— বলতে বলতে শ্যাম ঘরের একমাত্র চেয়ারটাকে জানালার কাছে টেনে আনল, কিংবা এই চেয়ারটায় বসুন, রোদে পিঠ দিয়ে। চমৎকার আরাম লাগবে, তারপর আমি আপনাকে দেব গরম-গরম এক কাপ চা—

বলতে বলতে শ্যাম সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়ায়, না, আপনাকে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না। যদিও আপনার মুখটা একটু কেটেকুটে গেছে, একটা হাতে এখনও ব্যান্ডেজ, তবুও আপনাকে বেশ বীরের মতোই দেখাচ্ছে— অনেকটা যুদ্ধফেরত সোলজারের মতোই। আপনি কি বিবাহিত? না? তা হলে আরও ভাল, এই অবস্থাতে আপনি মেয়েদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতে পারবেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বীরপুরুষ ছেলেদের দেখাই পায় না, যে পুরুষ তারা দেখে সে-সব ছোকরারা মিনমিন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েদের স্কুল-কলেজের আশেপাশে, যাতায়াতের রাস্তায়, পিছু নিচ্ছে কিছুদূর পর্যন্ত, ভুল বানানে লিখছে প্রেমপত্র, পরিচয় হলে নিয়ে যাচ্ছে বড়জোর লেক বা ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায় বা পার্কে; তারপর সেখানে বসে...থাকগে! আসল কথা, আহত পুরুষ মেয়েরা পছন্দ করে। তা ছাড়া, আপনাকে ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দেয়নি, আপনি টেম্পো বা ঠেলাগাড়ির ধাক্কা খাননি, রাস্তার হামেশা হাঙ্গামায় বেমক্কা ইঁটের টুকরো এসে পড়েনি আপনার গায়ে। আপনি খানাখন্দেও পড়ে যাননি। আপনি আহত হয়েছেন মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায়। ব্যাপারটার মধ্যে একটু বীরত্বের গন্ধ আছে না? বলতেই চোখে ছবি ভেসে ওঠে— একটু অহংকারী, সাহসী ছুটন্ত এক পুরুষ দুটো ছড়ানো হাতে বুনো ঘোড়ার ঝুঁটির মতো ধরে-থাকা মোটর-সাইকেলের কাঁপা হাতল, বুক চিতিয়ে, পা বাঁকিয়ে বসে থাকার সেই উগ্র ভঙ্গি, হাওয়ায় উড়ছে চুল, শার্টের কলার এলোমেলো, দাঁতে টিপে রাখা একরোখা একটু হাসি...চমৎকার নয়! ছেলেবেলা থেকেই মোটর-সাইক্লিস্টদের আমি ওই চোখে দেখে আসছি। বলতে কী, আমার জীবনের একসময়ে একমাত্র লক্ষ্য ছিল বেপরোয়া একজন মোটর-সাইক্লিস্ট হয়ে যাওয়া—আর কিছু নয়— কেবল খুব ছুটন্ত একটা মোটর-সাইকেলে ওইভাবে বসে থাকা। সেই কারণেই আমার সতেরো-আঠারো বছর বয়সে প্রথম কলকাতায় এসে আমি সার্জেন্ট দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কোমরে ধূসর রঙের পিস্তল, মাথায় কালো টুপি আর ওই লাল মোটর-সাইকেল! সার্জেন্ট দেখলে আমি রাস্তার সুন্দরী মেয়েদের লক্ষই করতুম না...

চেয়ারে অদৃশ্য লোকটা নড়ে ওঠে যেন।

শ্যাম সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে বলে, না মশাই, আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু বলছি না, এ-কথা সত্যিই যে খেলার জন্যও আপনার মুখে আয়নার আলো ফেলা ঠিক হয়নি...কিন্তু দেখুন, আমারও কিছু করার নেই। বড় অসময় চলছে...সকাল থেকেই দিন লম্বা হতে শুরু করে, সন্ধে থেকেই রাত অফুরান মনে হয়। কিছুই ঘটে না, বস্তুত কিছুই ঘটে না। দিনে দু'বার চিঠির বাক্স খুলি; আমি...পাখির বাসার মতো ছোট্ট চিঠির বাক্স খুলতে গিয়ে প্রতিবার মনে হয়— দরজা খুললেই লাফিয়ে পড়বে একটা খরগোশের বাচ্চা, কিংবা হাত দিলেই পাওয়া যাবে গোলাপি কাগজে মোড়া কোনও উপহার, কিংবা অচেনা মেয়ের লেখা ভালবাসার চিঠি। কিছুই ঘটে না, বস্তুত কিছু ঘটে না।...সকালে উঠে মনে হয় আজ কেউ আসবে— খুব অচেনা রহস্যময় কেউ—যাকে দেখে মনে হবে চেনা, অথচ চেনা যাবে না, এবং যে যাওয়ার সময় কিছু রহস্য রেখে যাবে; ঘুমোবার সময়ে মনে হয় আজ স্বপ্নের ভিতরে আমি পেয়ে যাব কোনও দৈব শিকড়বাকড়, ক্যানসারের ওষুধ কিংবা গুপ্তধনের সন্ধান; কুয়াশার রাস্তায় হাঁটবার সময়ে, মনে হয়, কুয়াশা কেটে গেলেই দেখতে পাব আমি হঠাৎ অচেনা বিদেশে পৌঁছে গেছি, যেখানে খাওয়ার লোক নেই বলে ইলিশের ঝাঁক চলে যাচ্ছে সমুদ্রে, গোরুর বাঁট থেকে খসে পড়ছে দুধ, চাক থেকে মধু চুঁইয়ে মাটি যাচ্ছে ভিজে, যেখানে সৎ ব্যবসায়ীরা দোকান সাজিয়ে বসে আছে— যেখানে সারা দেশে এক দাম, যেখানে শান্ত ধার্মিক মানুষেরা ধীর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারা বছর যেখানে চলেছে উৎসব...

শ্যাম চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়ায়, মাথা নাড়ে— কিছুই ঘটে না! বস্তুত কিছুই ঘটে না!

তারপর শ্যাম বিনীতভাবে অদৃশ্য অনুপস্থিত লোকটাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, আচ্ছা, আবার দেখা হবে...

ঘরের মাঝখানে আবার ফিরে আসে শ্যাম, বিষণ্ণভাবে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ 'ইয়াঃ' বলে চমকে হেসে ওঠে। সিগারেট ধরিয়ে আবার খবরের কাগজটা তুলে নেয়, গুনগুন করে বলে, মাই গু—উ—ড—নেস, আই কুডনট কিল দ্যা ম্যান।

ঘরের চারি দিকে অন্যমনে চেয়ে দেখে শ্যাম— নাঃ, বস্তুত কোথাও নেই লুকিয়ে থাকবার জায়গা, কিংবা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ।

দুপুরে বেরোনোর সময় শ্যাম তিনটে চিঠি পেল।

জীবনবিমার প্রিমিয়ামের চিঠি, খামের উপর দু'হাতে আড়াল করা প্রদীপের ছবি। আপনার জীবন মূল্যবান। ইলেকট্রিকের বিল, আর পাকিস্তানের কালচে খামে বাবার চিঠি। কোনওটাই ভাল করে পড়ে দেখে না শ্যাম। বাবার চিঠির দিকে চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-আধটা লাইন চোখে পড়ে— সঞ্চয়ী না হইলে ভবিষ্যতে নিরুপায় হইবা...এতদূর হইতে আমরা তোমার জন্য আর কী করিতে পারি, ভরসা একমাত্র দয়াল ঠাকুর...চাকুরীর বন্দোবস্ত হইল কিনা সত্বর জানাইবা...সোনাকাকা ও রাঙাপিসির খোঁজখবর লইও, অভাবের সময়ে আত্মীয়স্বজন...আশু গাঙ্গুলীর সহিত দেখা করিও। সে আমার বাল্যবন্ধু, হাওড়ায় তিনটা লোহার কারখানা, ডোভার লেনে চারিতলা বাড়ি, গাড়ি...জমিজমা আর কিনিতে ভরসা হয় না, অসময় পড়িয়াছে...সময় থাকিতে হিন্দুস্থানে না যাওয়া অবিবেচকের কাজ হইয়াছে...এখানে গঙ্গা নাই, বড় দুঃখ...ধনভাইয়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, সমারোহ হয় নাই, হিন্দুস্থান হইতে তাঁহার ছেলেরা আসিতে পারে নাই, জ্ঞাতিরা মুখাগ্নি করিয়াছে...বড় ভয় হয়...তোমার মায়ের অবস্থা পূর্ববৎ শয্যাশায়ী, পুলিনের বউ আসিয়া রান্নাবান্নার কাজ করিয়া দিয়া যায়...তোমার মা ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে তোমার নাম ধরিয়া ডাকেন...ওখানে জিনিসপত্রের দাম...চালের দাম যাহা শুনি, তাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়...বাঙালির ছেলে, দু'বেলা ভাত না খাইলে শরীর থাকে না...সাবধানে থাকিও...এখন ঠাকুর ভরসা...তোমাকে সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে নিশ্চিন্তে চোখ বুজিতাম।

দশ বছর আগে বাবা শেষবার এসেছিল কলকাতায়, শেয়ালদায় আনতে গিয়েছিল শ্যাম। দেখল, যেন একটা অচেনা লোক, একটু কুঁজো, কালো রোগা চেহারা। প্রণাম করতেই পিঠে হাত রেখেছিল বাবা, কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপেছিল, মনু কেমন আছ? যে কয়দিন ছিল, বাবা একটুও স্থির থাকেনি। কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, বৈঁচীগ্রাম, সোদপুর কিংবা ডায়মন্ড হারবার ঘুরে বেড়িয়েছিল আত্মীয়দের বাড়ি

বাড়ি। তাকে ডেকে বলত, মনু চিন্যা রাখ। আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিগুষ্ঠি চিন্যা রাখতে হয়, বিপদে আপদে আপনা রক্তের মানুষ কামে লাগে। এদিকে জমিজমার খোঁজ করেছিল, সম্পত্তি বিনিময়ের চেষ্টাও হয়েছিল একটু, তারপর বলেছিল, আমাগো আর আহন হইব না। ভাল লাগে না রে মনু, এই দ্যাশ বড় রুঠা! পাকিস্তান উঠে যাবে কি না সে খোঁজখবরও একটু নিয়েছিল বাবা। মা পাঠিয়েছিল আমসত্ত্ব, গোকুল পিঠে আর নতুন কাপড়। মাসখানেক পরে বনগাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত বাবাকে এগিয়ে দিয়ে এসেছিল শ্যাম। মনু, ভাল থাইকো— এই কথা বলে বাবা এদেশের সীমা ডিঙিয়ে গেল।

এখন, এই যে লোকটা তাকে চিঠি লেখে, তার ভালমন্দের খবর নেয়— এ লোকটা কে! বাবা? কীরকম বাবা! তার মুখ মনে পড়ে না, ভিনদেশি এক অচেনা লোক, ভিটের মায়া ছেড়ে আসতে পারেনি— এ লোকটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? শ্যামের বাক্সে বাবা-মা'র একটা জোড়ের ফটো আছে। পিছনে রাজবাড়ির সিন্ ফেলা, পাশে টব, সুতির ডোরাকাটা একটা কোট গায়ে, ধুতি আর পাম্প-শু পরা গ্রাম্য লোকটা বুক চিতিয়ে বসে আছে, পাশে ধোয়া পাট-ভাঙা জংলা-পেড়ে শাড়ি-পরা মা— জবুথবু, ছোট্ট একটুখানি মানুষ, ক্যামেরার লেনসের দিকে কৌতূহলী চোখ। বিশ্বাস হতে চায় না যে এঁরা শ্যামের মা-বাবা, এঁরাই তার জন্মের কারণ। এঁরাও তো জানেন না শ্যাম কে, কিংবা কোথা থেকে এল!

না, বহুকাল আর সেই ছবি বের করে দেখে না শ্যাম, আগে মায়ের জন্য কাঁদত, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে কিংবা নতুন চাকরিতে যাওয়ার সময়ে প্রণাম করে যেত ওই ছবি। তারপর আস্তে আস্তে কর্পূরের গন্ধের মতো মন থেকে মুছে গেছে ওই দু'টি মুখ। মনে পড়ে না, আর তেমন করে মনে পড়ে না। কেবল মাঝে মাঝে হরিধ্বনি দিয়ে যখন মড়া নিয়ে যায়, তখন চমকে উঠে মনে পড়ে কুয়োতলা, ঘাটে যাওয়ার মেঠো পথ, করমচার গাছ, পগারে লাফিয়ে পড়ছে ব্যাঙ; মনে পড়ে, প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে উত্তরের ঘরের দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো কোলে করে মা বসে আছে— মুখের চামড়ায় নেমেছে শিকড়বাকড়, কথা বলতে গেলে মাথা কাঁপে—সামনের অন্ধকার, এক-আকাশ অস্পষ্ট নক্ষত্র, আর রক্তের মধ্যে অতি দুর্বোধ্য মৃত্যুর হিম অনুভব করতে করতে অসহায় মা বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছে—'মনু, মনু রে, অ মনু মনু...মনু, মনু রে, অ মনু...'

মনে মনে শ্যাম প্রশ্ন করে, তুমি আমার কে? তোমরা কারা? না, আমি তোমাদের চিনি না। তারপর চমকে ওঠে সে, অস্থির হয়ে আবার বিড়বিড় করে বলে, তোমরা ভাল থেকো। বেঁচে থেকো। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। আমি খুব ভাল আছি। দেখো, একদিন খুব সুসময় এসে যাবে। ভাল জমিতে আমরা তুলব ঘড়বাড়ি, তৈরি করব বাগান, মাছ ছেড়ে দেব পুকুরে, ছাড়া জমিতে বসিয়ে দেব জ্ঞাতিদের ঘর, এক-আধজন বোষ্টম, আর ধোপা-নাপিত। দূর বিদেশ থেকে আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব, আমি নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসব সুদিন...। সেই কবে ছেলেবেলায় শোনা ঘুমপাড়ানি গান গুনগুন করে শ্যাম, মায়রে দিলাম ডবল শাঁখা, ভাই করাইলাম বিয়া, বাপরে দিলাম সোনার মটুক, তীর্থ কর গিয়া...

## ॥ সাত ॥

ঠিক দুপুরবেলা গড়িয়াহাটার মোড় থেকে একটা লোকের পিছু নিল শ্যাম। অকারণে। লোকটা কালো, হাড়গিলে রোগা চেহারা, অত্যন্ত কর্কশ তার মুখ, সেই মুখে মোটা গোঁফ, চোখে গগলস; পরনে টেরিকটনের গাঢ় রঙের চাপা চোঙা প্যান্ট. গায়ে ঝকঝকে ক্রিম রঙের সিল্ক শার্ট, হাতে ফোলিও ব্যাগ। চমৎকার ঝকমকে পোশাকের ভিতরে কালো হাড়গিলে লোকটাকে বেমানান এবং আরও কুচ্ছিত দেখাচ্ছিল— যেন কারও জামাকাপড় চুরি করে এনে পরেছে।

লোকটা বাটার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ জুতো দেখল. তারপর শ্লথ গতিতে হেঁটে গেল মোড় পর্যন্ত, সিগারেটের দোকান থেকে কিনে নিল এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট, কাপড়ের দোকানের ডামির দিকে চেয়ে একটু হাসল আপনমনে, একটা কানা ভিখিরিকে তাড়া দিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল

একটি সুন্দরী মেয়ের চলে-যাওয়া। তারপর ধীর গতিতে রাস্তা পার হয়ে ট্রাম-স্টপের দিকে চলে যাচ্ছিল লোকটা।

আগাগোড়া লোকটাকে লক্ষ করছিল শ্যাম। মনে হয় খুব সহজ শান্ত ও ভদ্র জীবন যাপন করে না লোকটা। চার দিকে ওর সতর্ক চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে ও-ধরনের লোকই ভদ্রলোকদের পকেট হাতড়ে দেখে, কিংবা নিদেন সবার অলক্ষ্যে মেয়েদের নরম বুক ছুঁয়ে সরে যায়। একটা কিছু এ-ধরনের কাজ করবেই লোকটা। শ্যাম নিশ্চিত। সামান্য উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম, লোকটাকে চোখে চোখে রাখে, পিছু নিয়ে এসে ট্রাম-স্টপে দাঁড়ায়। লোকটা সবুজ রুমাল বের করে অকারণে ঘাড় গলা মোছে, স্টপে দাঁড়ানো মেয়েদের লক্ষ করে— চোখেমুখে চিকমিক করে ওঠে কামনা-বাসনা। কিন্তু কিছুই করে না লোকটা।

ট্রামে উঠেও লোকটা খুবই ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকে— মেয়েদের কাছে ঘেঁষে না, ভদ্রলোকদের পকেটের দিকে তাকায় না।

এন্ডির চাদরের ভিতরে শ্যামের হাত মুঠো পাকিয়ে যায়, সে মনে মনে বলে, এবার একটা কিছু করো হে, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। ভয় কী! ওই যে মোটা মতো লোকটা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, ঘাড়ের চুল পুলিশদের মতো করে ছাঁটা, লক্ষ করে দ্যাখো লোকটা ঢুলছে। ওর বুক-পকেট থেকে মুখ বের করে আছে একটা খাম। ওটা তুলে নাও। কিংবা ওই যে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল, পরনে মভ রঙের শাড়ি, মাথায় বিড়ে-খোঁপা, ওর চোখ-মুখ দ্যাখো— সুন্দর নয়, কিন্তু বাঘিনীর মতো কামুকা— জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা ওর স্বভাব— ওর গায়ে তুমি নিশ্চিন্তে হাত দিতে পারো— কিছুই হবে না। ভয় কী?

কিন্তু লোকটা খুব ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একটু কুঁজো হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তাঘাট দেখবার চেষ্টা করে। শ্যাম হতাশ হতে থাকে। এমন পাকা বদমাশের মতো চেহারা তোমার!— শ্যাম বলতে থাকে. তুমি শুধু চোখ দিয়ে যে-কোনও মেয়েকে গর্ভবতী করে দিতে পারো, শুধু চোখের ইশারায় তুমি তুলে নিতে পারো আমাদের পকেটের মনিব্যাগ। দেখাও। সেই ম্যাজিক দেখাও। ভয় কী হে! বাক আপ্! চিয়ারিও!

তবুও লোকটা দাঁড়িয়েই থাকে। তার অন্যমনস্ক চোখেমুখে নরম এক ধরনের কবিত্বের ভাব ফুটে ওঠে। খুব হতাশ হয়ে শ্যাম লক্ষ করে যায়।

তবু শ্যাম পিছু ছাড়ল না।

লোকটা গ্র্যান্ড হোটেলের উলটো দিকে নেমে পড়ে। তারপর রাস্তা পার হয়ে বড় রাস্তা ধরেই অনেক দূর হেঁটে যায়। সুরেন ব্যানার্জি রোডে ঢুকে পড়ে। একটু দূরে থেকে শ্যাম হাঁটতে থাকে। লোকটা একবার ঘাড় ঘোরাতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসির চেষ্টা করে শ্যাম, হাসি দিয়েই বোঝাতে চায়— ভয় পেয়ো না, আমি শুধু দেখতে চাই যে, তুমি একটা কিছু করো। তুমি করিতকর্মা লোক— কিছু করো হে! বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ধরব না বা ধরিয়ে দেব না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি।

লোকটার ভ্রূ সামান্য কুঁচকে ওঠে। তারপর মুখ ফিরিয়ে সে হাঁটতে থাকে। এলোমেলো রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে হেঁটে যায়। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে শ্যামকে লক্ষ করে। খুবই উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম। তারপর অবশেষে লোকটা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কাছে এসে একটা বড় বাড়ির মধ্যে সোজা গট গট করে হেঁটে গেল। লোকটা ভয় পেয়ে গেছে— ভাবে শ্যাম। আবার তার শরীরে শীতভাব ফিরে আসে। হতাশ বোধ হয়।

শূন্য মনে খানিকটা ঘুরে বেড়ায় শ্যাম। তারপর একটা ফাঁকা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ে। শান্তভাবে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকে। তার সামনে এক কাপ গরম চা জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।

পাশের টেবিল থেকে একজোড়া সিন্ধি ব্যবসায়ী উঠে গেল, অন্য ধারে এসে বসল চর্বির পাহাড় গলায় থাক থাক গলকম্বলওয়ালা এক পাঞ্জাবি। ঘুম ঘুম চোখে একবার শ্যামকে চেয়ে দেখল।

বাইরে ছায়াহীন রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তায়, ওধারের বাড়ির আলসে থেকে পিছলে পড়ে পাখা মেলে দিল একটা পায়রা, ঠুক ঠুক করে হেঁটে গেল দু'টি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে।

উঠে পড়ে শ্যাম। কাউন্টারে দাম দিয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, ঠিক সে সময়ে দরজার চৌকাঠে তার মুখের ওপর একটা ছায়া এসে পড়ে। বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে ওঠে শ্যামের হৃৎপিণ্ড— সেই লোকটা! পিছনে ঝকমক করছে রোদ, লোকটার মুখ তাই অন্ধকার দেখায়। হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে শ্যাম এক পা পিছু হটে আসে। লোকটা এক পা এগিয়ে আসে, শ্যাম!

না, সে লোকটা নয়। পরনে নেভি ব্লু সুট, গলায় বো, সুন্দর চেহারার ফরসা একটা লোক শ্যামের সামনে দাঁড়ায়।

অরুণ! যেন ডুবে যাচ্ছিল শ্যাম, এমন ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে অরুণের একখানা হাত চেপে ধরে সে, আঃ, অরুণ!

ইসস! তোকে চেনাই যায় না!

তুই! শ্যাম অরুণকে ভাল করে দেখে, তুই খুব সুন্দর হয়ে গেছিস।

দূর! মৃদু হাসে অরুণ, অ্যালকোহলিক ফ্যাট। তোর কী খবর?

ভাল। শ্যাম মাথা নাড়ে।

কিন্তু তোকে ভাল দেখাচ্ছে না। দাড়ি-ফাড়ি দিয়ে চেহারাটা কী যে বানিয়েছিস! বলতে বলতে শ্যামের হাত ধরে টেনে নেয় অরুণ। দু'জনে মুখোমুখি বসে। বসেই অরুণ বলে, শুনেছি ঝগড়া করে চাকরি ছেড়েছিস!

শ্যাম নিঃশব্দে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

অথচ তুই কী ভীষণ ড্যাশিং পুশিং ছিলি! কত ওপরে উঠে যাওয়ার কথা ছিল তোর। আর কী দশা করেছিস নিজের।

শ্যাম চুপ করে থাকে।

শালার বস আমারও ছিল তেরিয়া, তাই বাঁচার জন্য একদিন তার কালো-কুচ্ছিত মেয়েটাকে নিয়ে লম্বা দিলুম। লোকটা চেঁচামেচি করল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনেও নিল।...দুটো লিফট পেলুম পর পর।...একটা দুঃখ ভাই, ছেলেবেলা থেকেই একটা সুন্দর বউয়ের শখ ছিল আমার। সেটা হল না। বলতে বলতে মৃদু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে অরুণ, তবে পুষিয়ে নেব, দেখিস। ফেব্রুয়ারিতে চললুম আমেরিকা...বউকে রেখে যাচ্ছি তার বাপের বাড়িতে...

চেয়ে থাকে শ্যাম। অরুণকে খুব ফরসা দেখাচ্ছে। সাহেবি পোশাকের জন্য নয়, রং ফরসা বলেও নয়, শ্যাম লক্ষ করে দেখে, চোখে-মুখে কেমন এক ধরনের বিদেশি ছায়া পড়েছে অরুণের। হঠাৎ তাকে খুব দূর বিদেশের অচেনা লোক বলে মনে হয়।

চা শেষ করে উঠে পড়ে দু'জনে।

কোথায় যাবি? রাস্তায় এসে অরুণ জিজ্ঞেস করে।

শ্যাম মাথা নাড়ে, জানি না।

দূর শালা! অরুণ হাসে, তুই কেমন ম্যান্দা মেরে গেছিস! আমার সঙ্গে চ...

কোথায়? খুব নিস্তেজভাবে বলে শ্যাম।

চোখ নাচিয়ে অরুণ হাসে, ভাল জায়গা। সাহেবের অফিস। সুন্দরী রিসেপশনিস্টের মুখোমুখি বসে থাকবি। ভিসার ব্যাপারে এক মার্কিন সাহেবকে ধরা-করার ব্যাপার আছে—আধঘণ্টার কাজ। চ—

রাস্তায় একটা ছোকরা জুতো-পালিশওয়ালাকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নিল অরুণ। ঝুঁকে পালিশওয়ালাকে বলল, দ্যাখ জুতোয় তোর মুখ দেখা যাচ্ছে?

ছেলেটা ঝুঁকে মুখ তুলে হাসল, জি হাঁ।

তব ঠিক হ্যায়। বলে অরুণ পয়সা দিয়ে দেয়। হাঁটতে থাকে।

নিজের ভিতরে এক অদ্ভুত শীতলতা অনুভব করে শ্যাম। যেন সব কাজ, আনন্দ এবং উৎসাহ থেকে অবসর নেওয়া হয়ে গেছে। এখন চলেছে তার অবসরের ধীরগতি জীবন। শরীরের মধ্যে যেন বিকেল হয়ে এল। এখন সেই সময়, যখন তার অফুরান ছুটি, আর সে তার ব্যালকনিতে ইজিচেয়ারে বসে রাস্তার চলমান দৃশ্য দেখে যাবে, কোনও দৃশ্যের মধ্যে আর রাখবে না নিজেকে। চটপটে

অরুণের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে তাই তার কষ্ট হচ্ছিল, হাঁফ ধরে গেলে সে বলল, আঃ অরুণ, আস্তে হাঁট।

কয়েক পা এগিয়ে-থাকা অরুণ পিছু ফিরে চায়, তুই শালা মেদিয়ে গেছিস। কোথায় সেই চটপটে লেফট আউট! কোথায় তোর কুইক রিফ্লেক্স! হা হা করে খোলা রাস্তাতেই হাসে অরুণ, তুই কি বুড়ো?

না। মাথা নাড়ে শ্যাম, আমার কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। মনে মনে সে গুনগুন করে, থেমে গেলেই তুমি দুয়ো...থেমে গেলেই তুমি বুড়ো... থেমে গেলেই তুমি মাটির ঢেলা...কাকে কবে কোথায় যেন বলেছিল শ্যাম!

চমৎকার সাজানো-গোছানো রিসেপশন রুমে তাকে বসিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল অরুণ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেই ঘরে গদির সোফায় বসে রইল শ্যাম, তার আশেপাশে আরও কয়েকজন লোক, রিসেপশন কাউন্টারের ওধারে একটি মেয়ে টেলিফোন আর ভিজিটর নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। ঠিকই বলেছিল অরুণ— মেয়েটি বড় সুন্দর। কাঁধ থেকে দীর্ঘ দু'খানা শূন্য সাদা হাত মদরঙের কাঠের পালিশে ছায়া ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—টেলিফোনের চাবির বোর্ড থেকে খোলা কাগজে, নোট-বইয়ে। গাঢ় বেগুনি রঙের ব্লাউজ, গাঢ় বেগুনি তার শাড়ি, ফাঁপানো চুল ঘাড়ের নীচে আলগা একটা ফিতের গিঁট দিয়ে বাঁধা। মুখের ধাঁচ গোল, কপাল-ঢাকা চুল, ছোট্ট একটু সিঁথি। ফুটফুট করছে তার মুখ-চোখ।—সেই মুখ-চোখ কথা বলছে নিঃশব্দে— আমি খুব বেঁচে আছি। দেখো, রাতে আমি নিঃসাড় ঘুমিয়েছি। জানো, আমার এখনও বয়স হয়নি! আমার কোনও অসুখ নেই! আমি ভোরে স্নান করি, ডুব দিয়ে! আমি তোমাদের অচেনা।

আর তার একটু অনিশ্চিত চোখ আর নগ্ন দু'টি হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্লান্তিহীন টেলিফোনের চাবি থেকে নোট-বই, খোলা কাগজ এবং আবার টেলিফোনে। দু'টি কাজের হাত তার— স্বয়ংক্রিয়। তবু শ্যাম দেখে, যেন পিয়ানোর চাবি ছুঁয়ে যাচ্ছে।

শ্যামের আশেপাশে যারা বসে ছিল, তারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও কাজে এসেছে, তাই একটু পরে পরে প্রত্যেকেরই ডাক এল। ভিতর থেকে, এবং এইভাবে আস্তে আস্তে তার আশপাশ খালি হয়ে গেল। একসময়ে দেখল শ্যাম যে, সে একা বসে আছে। আর রিসেপশনের মেয়েটি তার অত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাকে লক্ষ করছে।

খুব অবাক হয়ে শ্যাম টের পায়, তার বুকের মধ্যে রেলগাড়ির সেই স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার শব্দ— ধীর থেকে দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। সামান্য তেষ্টা পাচ্ছিল তার। পকেটে হাত দিয়ে দেখল সিগারেট নেই। কাচের দরজা ঠেলে দু'টি চটপটে মার্কিন ভদ্রলোক ঘরে আসে, কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়, নিচু স্বরে কী একটু রসিকতা করে। মেয়েটি হেসে তার সপ্রতিভ চোখেমুখে জবাব দিয়ে দেয়। আবার শূন্য হয়ে যায় ঘর। কিছু একটা লিখে রাখতে গিয়ে কোনও ভুল ধরা পড়ায় মেয়েটি জিভ কেটে পরিষ্কার বাংলায় বলে 'এঃ মা!' চকিতে একপলক শ্যামকে লক্ষ করে চোখ নামিয়ে নেয়। টেলিফোন শব্দ করে উঠলে অবলীলায় টেলিফোন তুলে নিয়ে তুখোড় ইংরিজিতে বলে ও৹. বোস...মিস্টার বোস!...ইয়েস মিস্টার বোস...হিয়ার হি ইজ.. থ্যাঙ্ক ইউ। আবার চকিতে চোখাচো[illegible] যায়।

আস্তে আস্তে অস্বস্তি পেয়ে বসে শ্যামকে। সে এই প্রথম টের পায় অনেক দিন হয়ে গেল সে আর নিজেকে সাজায় না। অযত্নের বাগানের মতো বন্য হয়ে গেছে তার শরীর, পুরনো পুথিপত্রের মতো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে চোখের চাউনি। এন্ডির চাদরের তলায় তার স্খলিত হাত আর পেট থেকে বুক পর্যন্ত সন্তর্পণে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখে— না, কোনওখানে নেই সেই পুরনো শ্যাম। বস্তুত তার মনে হয় এই-যে লোকটা সে— এন্ডির চাদর গায়ে গালে দাড়ি, ভিতরে অস্থির এক রেলগাড়ির পুল পেরিয়ে যাওয়ার গুম গুম শব্দ— একে কোনওকালে কখনও চিনত না শ্যাম। ওই মেয়েটির সামনে ধরা-পড়া অসহায় এক অচেনা লোক বসে আছে।

কী ভাবছ তুমি? আমি বাইরের দুপুরের রোদ এড়াতে কৌশলে তোমাদের এই ঠান্ডা সুন্দর ঘরে ঢুকে বে-আইনিভাবে বসে আছি? কিংবা আমি বদমাশ, তোমাকে সুন্দর দেখে তোমার মুখোমুখি বসে আছি,

সময়মতো হয়তো বা পিছু নেব? কিংবা আমি যে চোর-জোচ্চোর মতলববাজ নই, সে-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত হতে পারছ না? শ্যাম মনে মনে এইসব কথা বলে মেয়েটিকে। যেন বা একা একটি ঘরে সুন্দরী মেয়েটির মুখোমুখি তাকে বসিয়ে রেখে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

সে সহ্য করতে পারে না। সামনের টেবিলে রাখা এক স্তূপ পত্রপত্রিকা থেকে একটা ছবির কাগজ তুলে নিয়ে তার ওপর মুখ নিচু করে রাখে। সিগারেট নেই— সে-কথা ভুলে গিয়ে পকেটের দিকে হাত বাড়াতেই চটাস করে শব্দে— হাত পা কেঁপে ওঠে তার।

এইসব ছোটখাটো অথচ গুরুতর ঘটনা ঘটে যেতে থাকলে শ্যাম প্রাণপণে চেষ্টা করে মেয়েটার দিকে আর না-তাকানোর। কিন্তু তারপর একটা সময় এল যখন আর ভিজিটর আসছিল না, টেলিফোনেও আর কোনও শব্দ নেই, শূন্য ঘরে মেয়েটি ও সে দুরন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে ছিল।

তারপর টেলিফোনের ক্র্যাডল থেকে রিসিভার তোলার শব্দ, তারপর দ্রুত ডায়াল করবার মিষ্টি শব্দ হচ্ছিল। তখন মেয়েটি ব্যস্ত আছে ভেবে সন্তর্পণে একবার চোখ তুলেই ভয়ংকর চমকে উঠল শ্যাম। মেয়েটি বাঁ হাতে টেলিফোনটা কানের কাছে ধরে রেখেছে, ডান হাতে সামনের রিসেপশন কাউন্টারে একটা হলুদ পেনসিল ধরে আছে, কিন্তু সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে শ্যামের দিকে। চোখে পড়তেই সে পেনসিলটা রেখে দ্রুত তার ডান হাত তুলে মাউথপিসটা চাপা দিল, পরমুহূর্তে সে পাখির মতো তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলায় সোজা তাকে প্রশ্ন করল, হুম ডু ইউ ওয়ান্ট, প্লিজ?

মাথার ভিতরে হঠাৎ ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। কাকে চাই! আমি কাকে চাই! তীব্র আবেগে থরথর করে শ্যামের হাত-পা কেঁপে ওঠে। মুহূর্তেই ভুলে পেয়ে বসে তাকে। মনে পড়ে না কাকে চাই, কিছুতেই তার মনে পড়ে না। শুধু মনে হয় এতক্ষণ এইখানে—এই সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘরে সুন্দর মেয়েটির মুখোমুখি বেমানান বসে থেকে সে এদের শৌখিন সুন্দর কোনও আবহাওয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছিল— বাস্তবিক সে কেন এখানে বসে আছে? কেন বসে আছে?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শ্যাম। তার গলা আটকে আসছিল। শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না, সে কাউকেই চায় না। সে কারও জন্য বসে নেই। এখানে তার কোনও কাজ নেই।

দরজার দিকে কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম। দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয়ে শিউরে ওঠে তার গা। লক্ষ করে, হাঁটবার সময়ে দরজাটা সরে যাচ্ছে। বাঁ থেকে ডাইনে। আবার বাঁয়ে। বড় অদ্ভুত! শ্যাম দ্রুত চোখ বুজে ফেলে। আবার হেঁটে যায় কয়েক পা। চোখ খুলে দেখে সে কাউন্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ভ্রূ সামান্য তুলে তাকে দেখছে। যেন প্রশ্ন করতে চায়— তুমি কে?

আমি কে! স্মৃতিহীন নির্বোধ শিশুর মতো শ্যাম অবাক চোখে অচেনা চার দিকে চেয়ে দেখে। বড় অসহায়ের মতো হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ারের হাতল কিংবা একটা টেবিলের কিনারা খোঁজে সে। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে, সে বিড়বিড় করে বলে, প্রশ্ন কোরো না আমি কে! আমি জানি না। বৃষ্টির জলের মতো দুঃখে তার বুক ভরে ওঠে—আমি জানি না আমি কেন গাছ হয়ে জন্মাইনি! জানি না আমি মাছ হয়ে জন্মালেই বা কী ক্ষতি ছিল!

চেয়ার থেকে ধীরে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি, লে' মি হেলপ ইউ!

বুকের ভিতরে আর্তস্বরে কথা বলে শ্যাম, না। আমাকে ছুঁয়ো না। মুখে কথা ফোটে না, তাই সে কেবল মাথা নাড়ে— না। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছু হেঁটে যায় শ্যাম। কাচের পাল্লায় হাত রাখে। সাদা মুখে ঘাবড়ে যাওয়া মেয়েটি তার দিকে চেয়ে থাকে।

পাল্লা ঠেলে রোদ আর লোকজনের ভিতরে বেরিয়ে আসে শ্যাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়েও সে বিড়বিড় করে বলে, প্রশ্ন কোরো না আমি কে! আমি জানি না।

তারপর শ্যাম হঠাৎ 'ইয়াঃ' বলে হেসে ওঠে। মাথা নাড়ে— না, কোনওখানেই নেই লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা, কিংবা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ। সব জায়গাতেই তার জন্য অপেক্ষা করছে ওই প্রশ্ন, তুমি কে!

না, শ্যাম জানে না। শ্যাম সত্যিই জানে না।

অনেকক্ষণ বাদে তার ফেরানো পিঠে হাত রাখল অরুণ, কী ব্যাপার! বাইরে কেন?

এমনিতেই! শ্যাম ম্লান হাসে।

ভিতরে তোকে খুঁজে না পেয়ে চমকে গিয়েছিলুম! শেষে রিসেপশনের মেয়েটি দেখিয়ে দিল যে, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস। বলে সুন্দর ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি দাঁতে কামড়ে ধরল অরুণ, দেখলি!

কী?

অরুণ বড় চোখে তাকায়, তোমাকে আমি চিনি না শালা! আমি ইচ্ছে করেই দেরি করছিলুম, ঠিক জানতুম তোর এক্স-রে আই, এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেখে নিবি! তবে এটা তেমন নয়, বুঝলি! মিস দত্ত আরও হট! এ নতুন। বলতে বলতে চিকমিক করে ওঠে অরুণ, আলাপ করবি? আমার সঙ্গে কয়েকদিনের যাতায়াতেই খুব খাতির। নাম— লীলা ভট্টাচার্য। করবি আলাপ?

না। শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে— না।

শ্যাম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দরজার কাচের পাল্লা দিয়ে রাস্তা থেকেও মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির কৌতূহলী চোখ আবার তার চোখে পড়ল। শ্যাম ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

কী হল তোর শ্যাম! জিভ দিয়ে চিকচিক একটা শব্দ করে অরুণ।

কী জানি! হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম বলল, কোনওখানে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে আমার।

ভ্রূ কুঁচকে অরুণ বলে, কী রকম!

হাইস্কুলে পড়ার সময় মেয়ে দেখলে যেমন হত, অনেকটা সে-রকম নার্ভাস বোধ করছিলুম। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল আমি কাউকে চাই কি না। অমনি মনে হল ওখানে বসে থেকে আমি অন্যায় করছি, চোরের মতো উঠে এলুম। অথচ এর চেয়েও কত তুখোড় কেতাওয়ালা জায়গায় আমি অনায়াসে গেছি সেদিনও, কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে এরকম মেয়েদের বলেছি 'হেল্লো'...

জিজ্ঞাসার চোখে শ্যামের দিকে তাকায় অরুণ।

গোলমাল হয়ে গেছে। শ্যাম মাথা নাড়ে, অনেক দিন বাদে আমি টের পেলুম যে, আমি প্রেমে পড়ে যেতে পারি।

লীলার?

না। লীলা বলে নয়। যে-কোনও মেয়ের। আশ্চর্য! এতকাল যখন বৃন্দা মাধবী কিংবা ইতুর সঙ্গে ঘুরেছি, শুয়েছি এক বিছানায়, আগাপাশতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ভাল লাগার মতো কিছু পাওয়া যায় কি না. তখনও আমার বুকের মধ্যে রেলগাড়ির শব্দ হয়নি কখনও। মনে হয়নি যে, এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে আর। মনে হয়, কোনও কিছুই বাকি রাখিনি বলে আমার ঠিক তৃপ্তি কখনও হয়নি। বুকের কাছে কোথাও একটা দুঃখ চাপ বেঁধে আছে।

কী-সব বলছিস রে?

ঠিক বলছি। শ্যাম মাথা নিচু রেখে বলে, কে যেন বলেছিল, ঈশ্বরজ্ঞান না হলে মেয়েদের ঠিকমতো চেনা যায় না! কে বলেছিল বল তো!

কী জানি! ঠোঁট ওলটায় অরুণ, রামকৃষ্ণ-ফৃষ্ণ কেউ হবে!

হবে।

একটু চিন্তিতভাবে মৃদু হাসে অরুণ, এক লীলা ভটচাযই তোকে ঈশ্বরজ্ঞান দিয়ে দিল আধ ঘণ্টায়!

না। শ্যাম হাসে, আমি শুধু এটুকু বুঝলুম যে, আমার ভিতরে এখনও এত আশ্চর্য রেলগাড়ির শব্দ আছে, আর আছে অতৃপ্তি। মনে হয় মেয়েরাই আমাকে ঠকিয়েছে সবচেয়ে বেশি। সবকিছু নিয়েও আসল রহস্যটুকু আঁচলে বেঁধে নিয়ে গেছে। কিংবা কী জানি, হয়তো সে-রহস্যও আমার সামনে খোলা চিঠির মতো মেলে-ধরা ছিল। আমি ধরতে পারিনি। তাই মেয়েটা যখন প্রশ্ন করল আমি কাউকে চাই কি না তখন হঠাৎ নিজেকে ভিখিরি বলে মনে হল, মনে হল আমার নাম-পরিচয় নেই। আমি এত তুচ্ছ ইনসিগনিফিক্যান্ট যে, আমার জন্ম না-হলেও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলুম না, আমি গাছ হয়ে কেন জন্মাইনি, আমি কেন হইনি জলের মাছ?

ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল অরুণ, শ্যাম!

কথা বলিস না অরুণ। শ্যাম আস্তে বলল, আমি নিজেকে এতকাল ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট ভেবে এসেছি। আমার সবকিছুই খুব সহজে পাওয়ার কথা— আমি ভেবেছিলুম। শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে, যা

পেয়েছিলুম তা ভুল। আমাকে এতকাল সবাই ঠকিয়ে এসেছে। নইলে কেন আমার বুকের ভিতরে এখনও রেলগাড়ির শব্দ? আমি কেন মাঝে মাঝে দরজা খুঁজে পাই না? গাছের ছায়া খুঁজে পাই না? কোথায় ভুল হচ্ছে? এতকাল তো আমার সব দরজাই ছিল চেনা, সহজে খুলেছি...হঠাৎ ভালবাসার জন্য আবার আমার হাঁটু গেড়ে বসতে ইচ্ছে করছে।

চোখ কপালে তোলে অরুণ, কী ব্যাপার বল তো!

ক্লান্তভাবে হাসে শ্যাম, কিছু না।

ধুস শালা! অরুণ হো হো করে হাসে, হাসতে হাসতে নিজের পেটের দিকে আঙুল দেখায়, সবকিছুর মূলে ওই পেট! বায়ু থেকেই তোর সবকিছু হচ্ছে। রোজ রাতে ইসবগুলের ভূষি খাবি, সকালে উঠে গরমজলে লেবুর রস। আমি যখন ব্যাচেলর ছিলুম তখন আমার পেটের কমপ্লেনই ছিল এগারো রকমের...লীলা ভটচাযকে আমি বলে রাখব যে, তুই সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের এক্স-ছোটসাহেব। ভাল খেলোয়াড়— উভয়ার্থে। বলে রাখব যে, তুই দাড়ি না কামিয়ে এন্ডির চাদর গায়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, ভুল করে যেন তোকে ছেড়ে না দেয়।...

এসপ্ল্যানেডে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাত তুলে 'হেঃ ট্যাক্সি...' বলে ট্যাক্সি দাঁড় করায় অরুণ। শ্যামকে বলে, চ তোকে পৌঁছে দি।

হাই তোলে শ্যাম, বলে, নাঃ। বাসায় ফেরার তাড়া নেই। আমি একটু ঘুরে-ফিরে যাব। তুই যা।

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার আগে অরুণ নিচু গলায় বলল, যদি মনে ধরে থাকে তো লেগে যা। আমি দেখব।...চাকরির জন্য ভাবিস না শ্যাম, আমার শ্বশুরের ফার্ম, আমি যাওয়ার আগে বুড়োকে পগিয়ে যাব, তোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বলতে বলতে ভীষণ বদমাশের মতো হাসে অরুণ, শরীরটা কেমন দেখছিস আমার? ভাল না?

আঃ ফাইন! শ্যাম হাসে।

ফর অ্যামেরিকা, দি ল্যান্ড অব ফ্রি সেক্স! দেখিস, ষাট বছর বয়সেও আমি শরীর রেখে দেব। চিয়ারিও...

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে হাত দেখায় অরুণ। বিদেশি এক অরুণ, যাকে ঠিক ঠিক চেনে না শ্যাম, অথচ চেনা বলে মনে হয়!

শূন্য মনে হেঁটে যায় শ্যাম। তার মাথার মধ্যে ভ্রমরের শব্দের মতো দূরাগত এক মোটর-সাইকেলের আওয়াজ ঘুরে বেড়ায়। অস্থির বোধ করে সে। খ্রিসমাসের জন্য সাজানো দোকানপাট, রঙিন কাগজের শেকল, বুড়ো সান্টা ক্লস আর নকল পাইন গাছ চোখের পাশ দিয়ে সরে যায়। হ্যান্ডবিলে বিজ্ঞাপন বিলি করছে একটা লোক, শ্যামের হাতেও সে একটা কাগজ গুঁজে দেয়। তাতে ইংরিজিতে বড় হরফে লেখা, আপনার বিপদ কেটে গেছে...তারপর একটা ওষুধের গুণ-বর্ণনা। মৃদু হেসে কাগজটা দুমড়ে ফেলে দেয় শ্যাম। মনে মনে গুনগুন করে শ্যাম, আঃ আমার বিপদ কেটে গেছে! বিপদ আর নেই!

## ॥ আট ॥

ফিরবার সময়ে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামের জানালার ধার ঘেঁষে বসা একটা লোক মাথা নিচু করে তাকে আদাব দিল। পরনে পায়জামা, লক্ষ্ণৌ-এর কাজ করা পাঞ্জাবি আর মাথায় মোটা সুতোয় বোনা নেট-এর একটা গোল টুপি, যা মাথার সঙ্গে চেপে বসেছে। চোখে সুর্মা। ইরফান!

ইরফান! কেমন আছ!

শ্যাম ট্রামে উঠতেই লোকটা খুব বিনয়ের সঙ্গে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিল, বসুন চক্রবর্তীবাবু।

শ্যাম বসল না, ইরফানের কাঁধে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে বলল, আরে তুমি বোসো। বোসো।

ইরফান মৃদু হেসে বলে, আপনি বসুন, আমি পার্ক স্ট্রিটে নেমে যাব।

শ্যাম ক্লান্তভাবে বসে হেসে বলল, কী খবর?

ইরফানের মুখে আবার সেই বিনয়ের হাসি, আজকাল আসেন না আর!

না, অনেককাল শ্যাম আর যায় না রাজাবাজারের ইরফানের কাছে। যাওয়ার দরকার হয় না। আগে প্রতি মাসে যেতে হত। আড়াইশো টাকা জমা দিলে ইরফান তার ঢাকার এক আত্মীয়কে চিঠি লিখে দিত— "আমাদের দক্ষিণের বাগানে এবার খুব আম হইয়াছে। বানিখাড়ার কমলাক্ষ চক্রবর্তীকে দুইশত আম পাঠাইয়া দিবেন।" আর বাবা ঠিকঠাক দুই শ' টাকা পেয়ে যেত ওখানে।

কাজ-কারবার কেমন! শ্যাম জিজ্ঞেস করে।

মন্দা। হুন্ডি ধরে ফেলেছে। নিচু গলায় বলে ইরফান। হাসে, এখন কারবার সাহাবাবুদের হাতে আর ঢাকার মাড়োয়ারি।

কোনও কথাই ভাল করে শুনছিল না শ্যাম। একটা অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রাম, হু হু করে হাওয়া লাগে। শ্যাম বয়স্ক ইরফানের সুর্মা-টানা সঙের চোখের মতো চোখে চোখ রেখে চেয়ে থাকে। ভদ্রতার হাসি হাসে।

পার্ক স্ট্রিটে নেমে গেল ইরফান। নামার আগে হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলল. যদি পাকিস্তানে যাওয়ার দরকার পড়ে তো বলবেন। হাতে ভাল এজেন্ট আছে, বর্ডার পার করে দেবে, আবার দশদিনের মাথায় ফিরিয়ে আনবে। কোনও ভয়-ডর নেই। বলবেন।

পার্ক স্ট্রিটে নেমে গেল ইরফান। যাওয়ার সময়ে আবার আদাব দিল রাস্তা থেকে।

ইরফান নেমে গেলে হঠাৎ শ্যামের মনে পড়ল যে. লোকটা মুসলমান। মনে পড়ল যে, সে হিন্দু। আশ্চর্য! সে যে হিন্দু এ-কথাটা অনেক দিন হয় তার খেয়ালই ছিল না। মনে পড়েনি—আমি হিন্দু। মনে পড়তেই শ্যাম সামান্য হেসে ওঠে—আশ্চর্য, আমি হিন্দু! কেমন হিন্দু আমি! হিন্দু হয়ে আমি কেমন আছি!

অনেক ভেবেও শ্যাম শব্দটার কোনও অর্থ খুঁজে পেল না। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, সে হিন্দু। সে ভারতীয়। কিংবা সে বাঙালি। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, সে কমলাক্ষ চক্রবর্তীর ছেলে, সাকিন—বানিখাড়া, ঢাকা জেলা। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, শ্যাম চক্রবর্তী নামে কেউ সেইন্ট মিলারের প্রাক্তন ছোটসাহেব, কিংবা...ক্লাবের এককালের লেফট আউট! অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, এইসব নাম-পরিচয়ের মধ্যে সে বাঁধা আছে। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, এইসব নাম-পরিচয়ের বাইরে তার আর কোনও অস্তিত্ব নেই!

কুয়াশার ভিতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ট্রাম, ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয়। শ্যাম জানালার কাঠে মাথা হেলিয়ে দেয়। তারপর ক্রমে লক্ষ্য ভুলে গিয়ে তার ট্রামগাড়ি অচেনা অজানায় পাড়ি দেয়। চারদিকে চাঁদ আর কুয়াশার মায়া, হু হু করে কেঁদে ওঠে প্রকাণ্ড নিষ্ফলা মাঠ, গাছের ভুতুড়ে ছায়া পাথরের মতো জমে আছে।

টিকিট!

বিরক্ত শ্যাম হাত তুলে কন্ডাক্টরকে সরে যেতে বলে। কন্ডাক্টর সরে যায়।

মায়াবী ট্রামগাড়ি চেনা পথ ছেড়ে দিয়ে বেঁকে যায়, ঘুরে যায় অচেনায়। গাছপালা ডেকে ওঠে, এসো শ্যাম! বাতাস ফিস ফিস করে বলে, এসো শ্যাম! তারপর তাকে ছুঁয়ে আনন্দে বাতাস ছুটে যায় গভীরতর রাজ্যের ভিতরে; পাহাড়ে, গুহায়, নদী কিংবা সমুদ্রের ওপর দিয়ে সুগন্ধের মতো ভেসে যায় সুসংবাদ— শ্যাম, আমাদের শ্যাম! মাটিতে পা রাখতেই মায়ের মতো মাটি ডেকে ওঠে, শ্যাম! পাখির চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের মতো শিশির জমে আছে ঘাসে। কালকাসুন্দির ঝোপে, কুলবড়ই গাছের তলায়, কুয়োর পাড়ে আতাবনে বাদুড়ের মতো ঝুলছে অন্ধকার, চকমক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোনাকি পোকা। নোনাপুকুরের আঁশটে গন্ধ পায় শ্যাম, শাপলার গায়ের গন্ধ, নিথর রাতকে চমকে দিয়ে জলে ঘাই দেয় বড় মাছ, তারপর শান্ত জলের নীচে পরিদের গভীর রাজ্যে চলে যায় তার অতিকায় নিঃশব্দ গতিময় ছায়া।

দূরে গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপর উড়োজাহাজের বিষণ্ন শব্দ। শ্যাম অন্যমনে সাড়া দেয়, যাই।

ময়দানের পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে মাত্র কয়েক পলকের জন্য স্বপ্নের সেই দেশ শ্যামের চেতনাকে ছুঁয়ে গেল।

ক্লান্ত শ্যাম ট্রাম থেকে নেমে ধীর পায়ে পেরিয়ে গেল গড়িয়াহাটার মোড়। তার গা ঘেঁষে বুড়ো গেঞ্জিওয়ালা উলটো দিকে হেঁটে যায়, ধীর গম্ভীর স্বরে হাঁকে, গেঞ্জি...!

কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম, তারপর শোনে হতাশ এক গেঞ্জিওয়ালা স্বর টেনে চলেছে—গেঞ্জি...! দূরে চলে যাচ্ছে সেই ডাক। মাথার ভিতরে হঠাৎ আবার টলমল করে ওঠে ঘোলা জল, কিন্তু মনে পড়ে না, মনে পড়ে না—

আবার কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ে, অস্ফুট গলায় বলে ওঠে, সোনাকাকা!

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে উজিয়ে আসতে চেষ্টা করে শ্যাম। কিন্তু ততক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে গেঞ্জিওয়ালার ওই ডাক। শ্যাম মাথা নেড়ে আপনমনে বলে, আঃ, সোনাকাকা!

তার মনের মধ্যে বুড়ো মুখ তুলে ছানি-পড়া চোখে বে-ভুল চেয়ে থাকে সোনাকাকা, অঃ মনু! মাথা নেড়ে বলে, মনু রে!

তার কাঁধে হাত রাখে শ্যাম, সোনাকাকা, বাইচ্যা থাইকো। আরও কিছুদিন বাইচ্যা থাইকো।

বিড় বিড় করে কথা বলে শ্যাম, আমি নিয়ে আসব সুদিন। অপেক্ষা করো।

হোটেলে মিত্রর সঙ্গে দেখা হলে মিত্র চোখ কপালে তুলে বলল, আজ একটা কাণ্ড হয়ে গেল মশাই, ভালবাসার ব্যাপার, খুব ইন্টারেস্টিং...

শ্যাম ভ্রূ তুলে হাসল, বটে!

মিত্র ঝুঁকে বলল, মেয়েটা কুমারী থেকে এক লাফে বিধবা হয়ে গেছে। ডবল প্রমোশন।...মাঝখানে মাসখানেক আসেনি, আজ এল, পরনে সাদা থান, হাতে চুড়ি নেই, কানে দুল, গলায় হার নেই, মুখ-চোখ থমথম করছে। আমরা তো প্রথমে কিছু জিজ্ঞেসই করতে পারি না, এ ওর মুখ চাই—এই সেদিনকার কুমারী মেয়ে, বিয়ে হয়নি, হঠাৎ এ কী? জিজ্ঞেস করতেই প্রথমে কেঁদে ভাসাল, বলল, আমি বিধবা। আমার স্বামী মারা গেছে।...কিন্তু বিয়ে হল কবে? জিজ্ঞেস করলে কেবল মাথা নেড়ে বলে, হয়েছিল।...কিন্তু কবে? অনেক কষ্টে তারপর মুখ ফুটল মেয়ের, বিয়ে হয়নি, কিন্তু হয়ে যেত। আমি মনে মনে ওকে স্বামী বলে জানতুম, আর কেউ কখনও কোনও দিন আমার স্বামী হবে না...শুনলুম ছোকরা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে মশাই...

বলতে বলতে মিত্র গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ, বলল, অদ্ভুত ব্যাপার মশাই, এই ভালবাসা! কী বলেন?

শ্যাম হাসে। হঠাৎ তার মাথার ভিতরে আস্তে জেগে ওঠে ভ্রমরের শব্দের মতো মোটর সাইকেলের আওয়াজ। অ্যাকসিডেন্ট! কীরকম অ্যাকসিডেন্ট?

মিত্র অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, কী জানি, আজকাল লোকে বলে ভালবাসা-টাসা আর নেই. সব অ্যাডজাস্টমেন্ট! আমারও সেইরকম বিশ্বাস এসে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ আজ পুরনো ঘায়ে খোঁচা লেগেছে মশাই! খুব মজা করলুম বটে অফিসে ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু মনটা ভার হয়ে আছে। ভিতরে ভিতরে একটা হেমারেজ টের পাচ্ছি।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে এসে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দু'জনে। চলে যাওয়ার আগে মিত্র হঠাৎ বলল, দেখুন, আমাকেও কীরকম বিধবা করে রেখে গেছে একজন। পুরুষ বলে থানটা পরিনি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে...না মশাই, হাসবেন না, কিন্তু এক-একদিন নিরালা ঘরে বসে খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে শ্যাম টের পেল রাস্তা দিয়ে একজন হকার 'গেঞ্জি' হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছে।

এত রাতে? মনে হতেই লেপ সরিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল শ্যাম। বাঁ দিকে চেয়ে দেখল—রাস্তা শূন্য। ডান দিকে চেয়ে দেখল—রাস্তা শূন্য। তবু বহু দূর দূর থেকে দূরে রাতের গভীরে চলে যাচ্ছে ওই ডাক—গেঞ্জি...গেঞ্জি...

সোনাকাকা! নিজের কান চেপে অভিভূত শ্যাম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখল শ্যাম। নিথর কালপুরুষ, ছায়াপথ, নক্ষত্রমণ্ডলী। আর সেই হিম আকাশে, নক্ষত্রে, তারা থেকে তারায়, ছায়াপথ পেরিয়ে রোগা, বুড়ো, প্রায়-অন্ধ সোনাকাকা ফেরি করতে করতে চলে যাচ্ছে তার সওদা—গেঞ্জি...গেঞ্জি...!

॥ নয় ॥

তেইশ ডিসেম্বর মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি আজ হাসপাতালে মারা গেছেন—এ-রকম একটা খবর পর পর কিছুদিন পত্রিকায় খুঁজে দেখল শ্যাম। নেই। নেই। অথচ প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে দুর্ঘটনার খবর থাকে। কতভাবে যে মরে যাচ্ছে মানুষ ইঁদুর আরশোলা কিংবা রোজ জল-না-পাওয়া চারাগাছের মতো তা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এইভাবে মরে মরে যদি পৃথিবীর ভিড় কমে যায়! যদি আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে আসে পৃথিবী! ভাবতেই শ্যামের চোখে-মুখে আনন্দে রক্তোচ্ছ্বাসের ঝাপটা এসে লাগে। তখন বড় সুন্দর হবে এই শহর, আরও রহস্যময়ী হবে পৃথিবী। তখন সব মানুষই হয়ে যাবে সব মানুষের চেনা পরিচিত আত্মজন। ভালবাসায় ভরে উঠবে পৃথিবী। থাকবে না প্রতিযোগিতা, আক্রমণ লোপ পাবে, তখন মানুষের ভাষা থেকে লুপ্ত হবে গালাগাল, অশ্লীল কিংবা কঠিন শব্দ। তখন দূরের মহাদেশ নিয়ে রূপকথার গল্প জমবে খুব। তখন আরও পাখি, প্রজাপতি ও উদ্ভিদের জন্ম হবে পৃথিবীতে। পরিষ্কার সুগন্ধি বাতাস বয়ে যাবে। তখন পাওয়া যাবে দূরের শব্দ কিংবা গন্ধ, আর নিজেকে পাওয়া যাবে হাতের মুঠিতে। অল্প কিছু লোকের ভিতর থেকে সহজেই বেছে নেওয়া যাবে কয়েকটি বন্ধু, কিংবা নিজের স্ত্রীকে, আলাদা করে চেনা যাবে ভাঁড় কিংবা শয়তানকে, এখনকার মতো সব গোলমেলে মনে হবে না।

কিংবা যদি আরও নির্জন হয়ে যায় পৃথিবী! যদি ক্রমে ক্রমে জনশূন্য হয়ে যায় শহর, প্রান্তর, মহাদেশ! সমস্ত পৃথিবীতে আর একটিও মানুষ বেঁচে নেই একমাত্র শ্যাম ছাড়া!

ভাবতে ভাবতে শ্যাম ঘরের মেঝেয় ছড়ানো সিগারেটের টুকরোর ওপর পা ফেলে দ্রুত পায়চারি করে, লাথি মেরে সরিয়ে দেয় একটা বই, জ্বরো রুগির মতো নিজের লম্বা জট-পাকানো চুল চেপে ধরে 'উঃ' বলে হেসে ওঠে, আয়না তুলে ধরে নিজের খেপাটে অচেনা মুখের সামনে। হ্যাঁ, তখন? মানুষের তৈরি কলকারখানাগুলি গভীর ঘাসের সবুজে ডুবে যাবে, রেল-ইঞ্জিনগুলি জং ধরে আস্তে আস্তে মিশে যাবে মাটিতে, জাহাজ গলে জল হয়ে যাবে, এরোপ্লেনের গা জড়িয়ে উঠবে মাধবীলতা, উঁচু উঁচু বাড়িগুলির মাথায় জাতীয় পতাকার মতো উড়বে অশ্বত্থের পাতা, আমাদের কাঠের আসবাবগুলি আবার উদ্ভিদ হয়ে যাবে। একটি মানুষের জন্য থাকবে একটি সূর্য, একটি চাঁদ, এক-আকাশ নক্ষত্র, একটি পৃথিবীময় জল-স্থল-শূন্যময় খোলা জায়গা।

নিজেকেই বিড় বিড় করে প্রশ্ন করে শ্যাম। নিজেই উত্তর দেয়।

তখন কি তোমার খুব একা লাগবে না শ্যাম?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে, না।

তখন কাউকেই কি তোমার দরকার হবে না শ্যাম! মায়ের মতো কেউ, কিংবা বৃন্দা, মাধবী, ইতুর মতো কেউ? শিশু-সন্তানের মতো কেউ? ভাইয়ের মতো কেউ?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে, না।

যদি তুমি তখন কথা বলতে ভুলে যাও! যদি ভুলে যাও গান গাইতে। কিংবা ভুলে যাও ভাষার ব্যবহার! রতিক্রিয়া ভুলে যাবে? চিঠি লেখা? তোমাকে প্রশংসা করার লোক থাকবে না? এমন কেউ থাকবে না যে তোমাকে সুন্দর দেখে? তোমার কাছে থেকে দূরে যাওয়ার কেউ থাকবে না? থাকবে না কাছে আসার কেউ?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে, না।

তারপর শ্যাম আস্তে হেসে ওঠে। আয়নায় নিজের মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে একটি ধাঁধা জিজ্ঞেস করে—

বলো তো এমন একা কে? জল স্থল শূন্যময় যার অখণ্ড পরিসর! যে আত্মজনহীন! যার নেই দূরে যাওয়ার বা কাছে আসার কেউ? কে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, শ্যাম?

শ্যাম বিড় বিড় করে বলে, আমি।

আবার খবরের কাগজ তুলে নেয় শ্যাম। হতাশভাবে মাথা নাড়ে। না, লোকটা মরেনি। হয়তো কিছু হয়নি লোকটার। সে হয়তো আড়াল থেকে শ্যামকে লক্ষ করে যাচ্ছে, অপেক্ষা করছে একটি মুহূর্তের— যখন শ্যাম কোনও রাস্তার বাঁকে মোড় নেবে, তখন তার হাতের আয়নায় রোদ ঝলসে উঠে পড়বে শ্যামের মুখে।

না, লোকটা মরেনি। শ্যাম নিশ্চিত। সে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাস্তাটা ভাল করে দেখে নেয়। ওই তো চেনা পেট-মোটা বেঁটে লাল ডাক-বাক্সটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, ল্যাম্পপোস্টে লাগানো চৌকো বাক্সের গায়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন, চেনা লাল হলুদ সাদা কয়েকটা বাড়ি, দত্তদের বাগানে খেলছে কাক আর সিঁড়িতে শুয়ে আছে পাঁচটা বেড়াল, দুটো ট্যাক্সি গেল পর পর, পিছনে মন্থরগতি এক ঠেলাওয়ালা, একটি-দুটি মেয়ে আর কয়েকজন শান্ত নিরীহ চেহারার লোক, সকালের রোদ চারদিকে ফসলের মতো ফলে আছে। কোনওখানেই সন্দেহের কিছু নেই, তবু শ্যাম টের পায়, এই সব কিছুর আড়াল থেকে দু'টি চোখ তাকে চোখে চোখে রাখছে।

কেমন সেই লোক যার মুখে শ্যাম আলো ফেলেছিল? মিনুর মতোই নিষ্ঠুর কেউ কি? তার মুখ দেখেনি শ্যাম, লক্ষ করেনি তার গায়ের রং, জানে না সে কতটা লম্বা কিংবা তার বাড়িতে কে কে আছে, কে জানে সে সুবোধ মিত্রর অফিসের সেই কুমারী বিধবা মেয়েটির প্রেমিক কি না। কিংবা কে বলতে পারে যে লোকটা মিনু নয়! বিধবা নয় তার সঙ্গীদের একজন!

শ্যাম মনে মনে বলে, তবু পৃথিবী থেকে লোকজন ঢের কমে যাওয়া ভাল। আরও শালিক আরও চড়াই আরও উদ্ভিদের, আরও ভালবাসা, রহস্য ও স্বপ্নের বড় প্রয়োজন আমাদের।

একদিন এসপ্ল্যানেডের খোলা রাস্তায় হঠাৎ অসময়ে বৃষ্টি নামল। অকালে। গোপনে মেঘ জমেছিল আকাশে, শ্যাম টের পায়নি। হঠাৎ খেয়াল করল তার চার পাশে হরিণের খুরের শব্দ। চরাচর জুড়ে ছুটে আসছে অজস্র অসংখ্য হরিণ। হাওয়ার সামান্য গতিতে ছুটে যাচ্ছে তার চারপাশ দিয়ে।

শ্যাম ছুটে গিয়ে দাঁড়াল একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় এক পাল লোকের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে। ময়লা, ভ্যাপসা গন্ধওয়ালা রুমালটা পকেট থেকে বের করে বহুদিন পর কাজে লাগাল শ্যাম, চুল আর দাড়িতে জল মুছে নিল। ঠান্ডা হাওয়ায় বড় শীত করে উঠল তার। সে ভিড়ের ভিতরে একজন মোটাসোটা লোক খুঁজে দেখল যার পিছনে দাঁড়ানো যায়। নেই। পকেটে হাত দিল সিগারেটের জন্য। নেই। আর্কেডের তলায় খুঁজল একটা সিগারেটের দোকান। পেয়ে গেল। মন্থর পায়ে ভিড় ঠেলে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াতেই ভয়ংকর চমকে গেল শ্যাম। প্রায় চার ফুট চওড়া একটা দোকান-জোড়া আয়না—অজস্র মাথা ও মুখের ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছে, সে নিজের সম্পূর্ণ অচেনা ভিখিরির মতো কাঙাল মুখ দেখতে পাচ্ছিল, আর দেখল পিছনের ভিড় থেকে একটি আধো-চেনা মুখ ঘাড় ঘুরিয়ে সামান্য কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। একটি মেয়ে। সিগারেটের জন্য খুচরো পয়সা-ধরা বাড়ানো হাত থেমে রইল, শ্যামের বুকের ভিতরটায় হঠাৎ শূন্যতার মধ্যে চমকে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড, রেলগাড়ির আওয়াজ শুরু হয়ে যায়।

মুখ ফিরিয়ে শ্যাম মেয়েটির দিকে তাকাতেই মেয়েটি কৌশলে অন্যমনস্কতার ভান করে সরিয়ে নিল চোখ, তারপর খুব সাবধানে, যেন বিশ্রী না দেখায় এমনভাবে, ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বয়ঃসন্ধির সময়ের মতো লাজুক হয়ে গেল তার হাত-পা। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল।

চেনে শ্যাম। মেয়েটিকে সে চেনে। কিন্তু কোথায় দেখেছিল ওই অসম্ভব সুন্দর মুখ! ওই কপাল-ঢাকা চুল, গোল মুখ, মুখে নিঃশব্দ কথা— জানো আমি খুব বেঁচে আছি! আমার এখনও বয়স হয়নি। আমার কাছে অদেখা পৃথিবী অনেক বড় রয়ে গেছে দেখা-পৃথিবীর চেয়ে।

ওই মুখ কোথায় দেখেছিল শ্যাম? কবে? মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। কোথায়?

পিছন থেকে কেবল মেয়েটির একটু দীর্ঘ বাঁকা ঘাড় দেখা যাচ্ছিল। সে পরেছে হালকা নীল রঙের শাড়ি, মেটে সিঁদুরের রঙের যার পাড়, কাশ্মীরি একটা স্কার্ফ গলায় জড়ানো। হাত দু'টি বুকের ওপর

মুড়ে রাখা, পিছন থেকে ভাল বোঝা যায় না, হয়তো সে বুকের ওপর কিছু একটা চেপে ধরে আছে। হয়তো তার ব্যাগটা। বোঝা যায় যে সে একা।

একটু লালচে আভার চুলের বড় খোঁপা তার, যার ওপর কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জলে বজ্র-বিদ্যুৎ আর অহংকার ফুটে আছে নিঃশব্দে।

আর-একবার তার মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করে শ্যামের। কিন্তু মেয়েটি মুখ ফেরায় না। যেন অদৃশ্য কোনও থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমনি অলস এবং অবহেলায় ভঙ্গি তার।

খুচরো পয়সাগুলি আস্তে আস্তে পকেটে রেখে দেয় শ্যাম। মৃদু হেসে সে বিড় বিড় করে বলে, তোমাকে এমন কোথাও দেখেছি যেখানে তোমাকে মানায় না। তাই তোমাকে মনে করতে আমার কষ্ট হচ্ছে! কিন্তু দাঁড়াও, আগে ভাল করে তোমাকে দেখতে দাও—

কিন্তু কাছে যেতে সাহস হয় না শ্যামের। সে ভিড়ের ভিতরে গা-ঢাকা দেয়, একটু কুঁজো হয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে, অর্ধ চক্রাকারে ঘুরে যেতে থাকে মেয়েটির সামনের দিকে, নিজেকে মেয়েটির কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রাখার চেষ্টা করে। ভিড়ের মধ্যে বিরক্ত মানুষেরা তার দিকে চেয়ে দেখে। শ্যাম গ্রাহ্য করে না।

বুড়ো এক পাঞ্জাবির পা মাড়িয়ে দেয় শ্যাম, বাচ্চা একটা ছেলের পিঠে হাত রেখে তাকে সরিয়ে দেয়, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল দু'টি ছেলে, তাদের ঠেলে মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যায় সে। তার মুখ বাঁ দিকে ঘোরানো, চোখ লক্ষ্যবস্তুর ওপর স্থির। ক্রমে তার চার পাশে মানুষেরা ছায়ার মতো অলীক হয়ে আসে, যেন আর কারও কোনও অস্তিত্ব নেই। শুধু ক্রমে ক্রমে মেয়েটির ছোট কানের ইয়ারিং থেকে গালের ডৌল, একটু চাপা নাক, ঠোঁট, ক্রমে গোল সম্পূর্ণ মুখটি চলে আসে তার চোখের নাগালে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ফুটপাথের ধারে চলে এসেছিল শ্যাম। তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃষ্টির জলকণা, হু-হু বাতাস তার এন্ডির চাদর নিশানের মতো ওড়াতে থাকে। কনকন করে ওঠে কান। শ্যাম গ্রাহ্যও করে না। একটা চোর-বেড়ালের মতো সে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে দূরগামী হরিণের পায়ের শব্দের মতো বৃষ্টির শব্দ হয়ে যেতে থাকে।

মেয়েটির গা ঘেঁষে চলে যায় কয়েকটি পুরুষ। হাত-পা রি-রি করে ওঠে শ্যামের। কী সাহস! আবার অনেক দিন পর শ্যামের মনে হয় যে, বহুদিন হয়ে গেল সে আর নিজেকে সাজায় না। তার গালে রুক্ষ দাড়ি, মাথায় লম্বা জটার মতো জড়িয়ে থাকা এলোমেলো চুল, গায়ে ময়লা এন্ডির চাদর। সে অনেক রোগা, লাবণ্যহীন আর দুর্বল হয়ে গেছে। তার আর সেই সাহস নেই সহজেই যে-কোনও মেয়ের কাছাকাছি চলে যাওয়ার। কোথায় গেল সেই ভেলার মতো ভাসমান হালকা মন! সেই খেলার ছল! এখন তার বুকের মধ্যে সেই রেলগাড়ির স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আর পুল পেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। সে নিজের বুকে হাত রাখে। না, এই অচেনা রহস্যময় শ্যামকে চেনে না শ্যাম। তার শরীরের ভিতরে, মনের ভিতরে ডেকে উঠছে মেঘ, চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, আর সমস্ত চেতনা জুড়ে নেমে আসছে অদ্ভুত এক নিঃশব্দ বৃষ্টি। বুক ভরে ওঠে। ভরে ওঠে ভালবাসায়। ছোঁয়া যায় না। এখন আর শরীর ছোঁয়া যায় না। কাঁটা দেয়।

মেয়েটির চোখে হঠাৎ চোখ পড়ে যায় শ্যামের, ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি তাকে এক পলক দেখে, তারপর অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নেয়। সামান্য এক-আধ পা সরে যায়, একটু ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যাম আবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় ফুটপাথের ধার ঘেঁষে, আবার মেয়েটির মুখোমুখি হয়। মেয়েটির চোখ আবার তার চোখের ওপর ঘুরে যায়। সামান্য নড়ে ওঠে মেয়েটি, শীতে কিংবা ভয়ে সামান্য কেঁপে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে নেয়। অসহায়ের মতো হঠাৎ চারদিকে চেয়ে দেখে। বিরক্তিতে কামড়ে ধরে ঠোঁট, মাটিতে পা ঘষে নেয় রাগে।

হঠাৎ শ্যামের খেয়াল হয় যে, তার চারপাশে কথাবার্তার শব্দ থেমে গেছে। অনেকেই লক্ষ করছে তাকে। কথা থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অনেক লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ সরিয়ে দেখে নিচ্ছে মেয়েটিকে। তাদের চোখে-মুখে কৌতুক। ভীষণ চমকে ওঠে শ্যাম, তার হাত-পা কেঁপে ওঠে। সে নিজের দিকে চেয়ে দেখে—কী করেছে সে। এতক্ষণ সে কী করেছে।

চকিতে শ্যাম মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার নাকে মুখে ছুটে আসে রক্তের গরম ঝাপটা। অপমানে কেঁপে ওঠে তার শরীর। দ্রুত সে ফুটপাথ ছেড়ে বৃষ্টির রাস্তায় নেমে পড়ে। হেঁটে যেতে থাকে।

তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ। চারদিকে অজস্র অসংখ্য ধাবমান অদৃশ্য হরিণের পায়ের শব্দ। যতদূর চোখ যায়, বাষ্পাকার জলকণায় আধো-অন্ধকারে রাস্তাঘাট, ময়দান আদিগন্ত রহস্যময় হয়ে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে নিরুপদ্রবে হেঁটে যায় শ্যাম। তার মাথা গাল দাড়ি বেয়ে নেমে আসে কেঁচোর মতো হিম জলের কয়েকটা রেখা। শীতে তার শরীর কাঁপে। তবু সে টের পায় তার ভিতরে উষ্ণ রক্তস্রোত, বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল, মাথার মধ্যে যন্ত্রণার মতো একটি প্রশ্ন, তুমি কে? তুমি কে?

হঠাৎ মনে পড়ে যায় শ্যামের। দু'টি সাদা সুন্দর হাত টেলিফোন থেকে নোট-বইয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মদরঙের কাঠের পালিশে ছায়া ফেলে। লীলা!

'ইয়াঃ' বলে হেসে ওঠে শ্যাম। লীলাই! হায় ঈশ্বর! তোমার জন্যই আমি বৃষ্টির মধ্যে খোলা রাস্তায় নেমে এলুম! গায়ে তুলে নিলুম-শীত!

হঠাৎ দু'টি হাত ওপরে তুলে পাগলের মতো আপনমনে আবার হাসে শ্যাম, ঠিক আছে, তোমার জিত।

অনেক দিন পর নিজেকে একটু জীবন্ত বলে মনে হয় শ্যামের। সে শুনতে পায় তার শরীরের মধ্যে কারখানা চলার মতো শব্দ করে চলেছে কলকবজা। সে বড় বেঁচে আছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে আধো ঘুমের ভিতরে সে তার বালিশের কাছে একটা নাম বলে রাখল। বালিশে নাক ঘষল। হাসল। লীলা! আঃ—হাঃ!

## ॥ দশ ॥

নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোনও চেষ্টাই করল না শ্যাম। খোলা রাস্তায় রোদের মধ্যে সে দাঁড়াল থামে ঠেস দিয়ে। অদূরে কাচের শার্শি লাগানো দরজাটা। চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে নিল শ্যাম। প্রথমে ভাল দেখা গেল না, বেলা তিনটের খর রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল সে। তারপর ছায়ামূর্তির মতো আবছা লীলাকে দেখা গেল মদরঙের কাউন্টারের ওপাশে। প্রথমে চেনা গেল না লীলাকে। তার মুখ-চোখ ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল, লীলার পিছনের দেয়ালে একটা ফ্লুরেসেন্ট আলো জ্বলছে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা গেল সেই দু'টি সুরে বাঁধা হাত, স্বয়ংক্রিয়, কাজ করে যাচ্ছে। কপাল থেকে চূর্ণ চুল সরিয়ে দিচ্ছে লীলা, ডান হাতে তুলে নিচ্ছে পেনসিল, বাঁ হাতে টেলিফোন, রিসিভার কানে চেপে কাত হয়ে শুনছে কিংবা একটু ক্লান্ত দীর্ঘ মিষ্টি স্বরে বলছে 'হেঃ...ল্লো...' দু'টি চোখে সামান্য ঘুম-পাওয়া ভাব। ভ্রূ তুলে কথা বলছে তার নানা অতিথির সঙ্গে, হেসে ঠাট্টার উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। তবু কিছুতেই তাকে এই পৃথিবীতে ব্যবহৃত মেয়ে বলে মনে হয় না শ্যামের, মনে হয় না যে, সে খাওয়া-পরার জন্য, উন্নতির জন্য, সঞ্চয়ের জন্য কাজ করছে। মনে হয় না একটি নাম কিংবা পরিচয়ে বাঁধা আছে সে!

শ্যাম সরল একটা গাছের মতো সামান্য একটু পিছনে হেলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। মুখে মৃদু হাসি। তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছায়ার মতো অলীক লোকজন—যাদের কোনও অস্তিত্ব নেই, যেন ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাকাপড়। চারদিকের কোনও শব্দও পায় না শ্যাম—যেন সে এক নিঝুম ঠান্ডা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের কাচের দরজাটা ঠেলে লোকজন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু কারও মুখই ভাল করে দেখে না শ্যাম। দু'টি ভিখিরি ঘ্যান ঘ্যান করল শ্যামের সামনে, তারা মেয়ে না পুরুষ তাও দেখল না শ্যাম, পকেট থেকে পয়সা তুলে দিয়ে দিল, কী দিল বা কত তা খেয়াল করল না। একবারও ঘড়ি দেখল না শ্যাম, ক'টা বাজে—এ-প্রশ্ন তার কাছে অপার্থিব মনে হল। সে শুধু টের পাচ্ছিল যে, শুধু দু' পায়ের জোরে সে এখানে দাঁড়িয়ে নেই, আর তার ভিতরে জন্ম নেওয়ার আগে শিশুর মতো কোনও বোধ কেঁপে উঠছে। এন্ডির চাদরের তলায় তার সমস্ত শরীর শক্ত, লোহার মতো কঠিন হয়ে আছে সমস্ত পেশি, মাঝে মাঝে তার চোয়ালের হাড় ঢিবির মতো ফুলে উঠছে। আর ক্রমান্বয়ে বুকের

ভিতরে নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে অদৃশ্য বৃষ্টিপাত, আর হরিণ দৌড়ে যাওয়ার শব্দ। সে টের পায় সে বড় বেঁচে আছে।

লীলা কাজ করে যাচ্ছে। কেবলই কাজ করে যাচ্ছে। নড়ে যাচ্ছে তার দু'টি কাজের হাত, তার ঠোঁট কেবলই কথা বলে যাচ্ছে। কোনও কথাই বুঝতে পারে না শ্যাম, তবু যেন বুঝতে পারে। হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কী বলছ। তুমি দূর-দূরান্তের লোককে বলতে চাইছ—দেখো, আমি কত বেঁচে আছি। দেখো, আমার এখনও বয়স হয়নি। আমার কাছে এখনও বড় রহস্যময় এই জীবন। আমি ভালবাসতে শিখেছি...!

মাঝে মাঝে তার সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক চোখ রাস্তার ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল। হয়তো সে এক পলক দেখে নিল একটা লোকের কালো কোট, একটা গাছের একটু পাতা, দুই-একটি কাক, একটা দেয়ালে সাঁটা মিছিলের আহ্বান।

শ্যাম অপেক্ষা করে রইল। এই ভিড়ের রাস্তায়, এত কিছুর মধ্যে তুমি আমার দিকে একবারও লক্ষ করবে কি!

শ্যাম টের পাচ্ছিল, আস্তে আস্তে আলো মরে আসছে। অন্ধকার হয়ে গেলে লীলা আর তাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তখন উজ্জ্বল ঘরের মধ্যে লীলাকে আরও স্পষ্ট দেখা যাবে। শ্যাম মুখে মৃদু হাসি আর ঋজু শক্ত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়েই রইল। হয়তো কিছুই ঘটবে না। হয়তো বিস্ফোরণের মতো কিছু ঘটবে। শ্যাম জানে না।

লীলার মুখ আড়াল করে একটি লোক কাউন্টারে ঝুঁকে দাঁড়াল একটুক্ষণ। সরে গেল। লম্বা একটা লোক শ্যামের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল, কয়েক পলক আবার আড়ালে পড়ল লীলার মুখ। বিরক্তিতে আট ফুট লম্বা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল শ্যামের। সেই ইচ্ছে টের পেয়েই বোধহয় লোকটা তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। সামান্য চমকে উঠল শ্যাম—মিনু না? পরমুহূর্তেই লোকটাকে ভুলে গিয়ে লীলার ওপর চোখ রাখল। লীলার চারদিকে ক্রমে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়ছে, নিঃশব্দে শ্যামের চারদিকে নেমে আসছে অন্ধকার।

আর-একটু হলেই অন্ধকার সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিত শ্যামকে। এ সময়ে লীলা নোট টুকে রাখতে গিয়ে বাধা পেয়ে বাঁ হাতে টেলিফোন নিয়ে মুখ তুলতেই তার চোখ শ্যামের ওপর আটকে গেল। পলকে পাথর হয়ে গেল লীলা, মুখ সামান্য ফাঁক করে সে চেয়ে রইল, চিৎকার করে ওঠার আগের মতো ভয়ে তার ডান হাত উঠে এল মুখের কাছে, যেন সে এক্ষুনি লোক জড়ো করে ফেলবে। কয়েকটি ভয়ংকর মুহূর্ত ধরে সে শ্যামের ছায়ার মতো মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। তারপর শ্লথ হয়ে নেমে গেল তার হাত, কাউন্টারের ওপর সেই হলুদ পেনসিল চেপে ধরল প্রাণপণে, চোখ বুজে সে দাঁতে দাঁত চেপে টেলিফোনে কথা বলে গেল।

একটুও নড়ল না শ্যাম। সে মৃদু হাসল। শরীরের ভিতরে চালু কারখানার শব্দ। সে বড় বেঁচে আছে! বুকে হাত রাখে শ্যাম। একটি রহস্যময় রেলগাড়ি বহু দূরের এক অচেনা পুল পেরিয়ে যাচ্ছে।

লীলার হাতে আর সাবলীলতা ছিল না। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সে টেলিফোন রেখে দিল, ঝুঁকে পড়ল কাউন্টারের ওপর। জোর করে নামিয়ে রাখা মুখ, ঘাড়ের তেজি বাঁকের ওপর অহংকার আর অবহেলা ফুটে আছে। শ্যাম লক্ষ করল। তার দুঃখ হচ্ছিল যে, সে আজও নিজেকে সাজায়নি। সাজলে আজ লীলা তাকে চিনতই না। গালে রুক্ষ দাড়ি, গায়ে এন্ডির চাদর, ধুতি আর স্যান্ডেল পরা এই চেহারা তার নিয়তির মতো, লীলার কাছে তাকে এভাবেই আসতে হবে, শ্যাম জানে। নইলে লীলা তাকে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবে, পেনসিল চেপে ধরবে না প্রাণপণে, চোখ বুজে ফেলবে না, নামিয়ে নেবে না মুখ, শ্যাম জানে।

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল লীলার ভঙ্গি। কিন্তু তার অলস ভাব রইল না, সে আর হাসল না এবং আর একবারও তাকাল না শ্যামের দিকে। সে শুধু মাঝে মাঝে আড়চোখে দরজাটা দেখে নিচ্ছিল বোধহয় এই ভয়ে যে, শ্যাম যে-কোনও সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তে পারে।

শ্যাম মৃদু হাসে। দাঁড়িয়েই থাকে। মাঝে মাঝে শুধু শরীরের ভর এ পা থেকে ও পায়ে সরিয়ে নেয়।

অন্ধকার হয়ে এল। শ্যামের মাথার উপর টুক করে জ্বলে উঠল রাস্তার আলো। শ্যামের সামনে

দাঁড়িয়ে একটা বেঁটে লোক, সে একটা দামি চোরাই কলম, কিনবে কি না তা বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল। শ্যাম মাথা নাড়ল। না। বস্তুত কলম শব্দটাই সে ধরতে পারল না।

ক্রমশ সে বুঝতে পারছিল তার চার ধারে লোকজনের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে, অফিস-ছুটির ভিড়। এবার অনেকেই তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হবে। কে জানে এদের মধ্যে সেদিন বৃষ্টির বিকেলের দু'-একজন লোক আছে কি না, যারা তাকে আর লীলাকে চিনতে পারবে! মৃদু হাসল শ্যাম। তবু দাঁড়িয়েই রইল।

সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, আস্তে আস্তে হাতের কাজ শেষ করে ফেলল লীলা। গুছিয়ে রাখল তার কাগজ। তারপর চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিধা। এবার সে বেরিয়ে আসবে। সে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ঝলমল করে উঠল তার হলুদ শাড়ি, শাড়ির সবুজ পাড়, সবুজ ব্লাউজ, উঁচু চেয়ার থেকে নামতেই তাকে ছোটখাটো দেখাচ্ছিল। সে ক্লান্ত ভঙ্গিতে কপালের চুল সরিয়ে কাউন্টারের ভিতর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ পরে কাচের দরজা ঠেলে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এল রাস্তায়। শ্যাম দেখল তার সঙ্গে খাকি পোশাক পরা পিয়ন গাছের একজন লোক রয়েছে। সতর্কতা। লোকটা লীলার পাশাপাশি হেঁটে গেল। পিছু নিল শ্যাম। একটু দূরে থেকে দেখল বড় দ্রুত হাঁটছে তারা। লোকটাই একটা ট্যাক্সির সামনে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করাল। একবারও ফিরে তাকাল না লীলা। চকিতে ট্যাক্সির ভিতরের অন্ধকারে ঢুকে গেল। এত দ্রুত ঘটল এ-সব ঘটনা যে, শ্যাম তার ঘোর কাটিয়ে উঠতে না-পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখল। দাঁড়িয়েই রইল। মুখে সেই মৃদু হাসি, সমস্ত শরীরে শক্ত ঋজুভাব।

রাতে খাওয়ার সময় আবার মুখোমুখি মিত্রর সঙ্গে দেখা। বলল, অটোমেশন এসে যাচ্ছে মশাই। আমাদের অপশন দিচ্ছে, সময়ের আগেই অবসর নিয়ে নিন, কোম্পানি কমপেনসেশন দেবে মোটা টাকার। তা ভাবছি এবার বসেই পড়ি মশাই, এত খাটাখাটনি যে কার জন্য তা বুঝতেই পারি না।

শ্যাম অন্যমনস্কভাবে হাসে।

পনেরো বছরের ওপর চাকরি হয়ে গেল—বয়সের কথাটা বোধহয় খেয়াল ছিল না মিত্রর, তাই বলেই চকিতে একটু হাসল, সার্টিফিকেটে যা-ই থাক মশাই, আমার প্রায় চল্লিশ এখন, কিন্তু এখনই কেমন বুড়ো বুড়ো লাগে নিজেকে। অফিসে যতক্ষণ কাজকর্মে থাকি ততক্ষণ মনে হয় বাইরে বোধহয় খুব আলো-বাতাস, হইহল্লা আনন্দের মচ্ছব চলছে, আবার বাইরে এসে সময় কাটতে চায় না। আগে ফুটবল খেলা দেখার ঝোঁক ছিল, একটু-আধটু তাস-দাবা খেলতুম, এখন আর তাও পরিশ্রম বলে মনে হয়। বইপত্রও ঘাঁটি না কতদিন! মাঝে মাঝে শুধু জ্যোতিষের বই খুলে নিজের হাত দেখি আর হাসি। বলতে বলতেই একটু ঝুঁকে পড়ল মিত্র, সামান্য চাপা গলায় বলল, বিশ্বাস করুন মশাই, আমার হাতে অনেক ভাল সাইন ছিল, সুন্দর সান লাইন আর বৃহস্পতির মাউন্ট—বলতে বলতে মিত্র তার এঁটো ডান হাতটাই প্লেটের কানায় একটু চেঁছে নিয়ে খুলে দেখাল—দেখুন না!

শ্যাম দেখল মিত্রর এবড়োখেবড়ো হাত, ভোঁতা নখ আর মাছের ঝোল লাগা কালচে একটা হাতের চেটো। বলল, বাঃ!

মিত্র হাসে, হাতের জন্যই কনফিডেন্স ছিল আমার, ভেবেছিলুম এর জোরে বেরিয়ে যাব। তা ছাড়া দেখুন, কূর্মপৃষ্ঠের মতো আমার লাইন অব হেড। শুক্রস্থান ভাল। হাতে প্রেমের চিহ্ন আছে—লাভ ম্যারেজ। কিন্তু ঠোঁট উলটে হাসল মিত্র, কিছুতেই কিছু হয় না মশাই! চল্লিশে আমি রিটায়ারমেন্টের কথা ভাবছি! ছুটি নিয়ে গ্রামে-টামে চলে যাব, খুলব একটা পোলট্রি, ডিম মুরগি বেচব। কী বলেন?

শ্যাম হাসে।

মিত্র মাথা নাড়ে, কিংবা রমতা যোগীও হয়ে যেতে পারি। ঠিক নেই। কেদারবদ্রী কাশীধাম ঘুরে ঘুরে বেড়াব। বড় ইচ্ছে ছিল মশাই, ঘুরে বেড়াবার, কিন্তু কেমন যেন মন হয়নি, হাওড়া ব্রিজ পেরোবার কথা হলেই আলিস্যি ধরে, কতকাল যে রেলগাড়িতে চড়িনি!

বাইরে এসেও শ্যামের সঙ্গ ছাড়ল না মিত্র। বলল, চলুন, অনেককাল পর আজ মনটা হালকা আছে, একটু ঘুরে বেড়াই রাস্তায়। খাওয়ার পর হাঁটা ভাল।

হাঁটতে হাঁটতে মিত্র কথা বলে, জীবনটাকে দেখতে হলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে হয় মশাই। ঘরে থাকলেই কেবল ভার-ভার ভয়-ভয় লাগে, কেবলই ট্রাঙ্ক-বাক্সে হাত বুলোই, জানালা দরজা নেড়ে দেখি, অকাজের চিন্তায় বুকে গর্ত খুঁড়ে ফেলি। অথচ আমার ভাবনার কিছু নেই—ঝাড়া হাত-পা, ভাই চাকরিতে, বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, বুড়ো বাপ-মা নেই, কিন্তু ওই একটুখানি একখানা ঘরই আমাকে মেরে রেখেছে মশাই, ওইটুকুরই বড় মায়া! বড় করে শ্বাস ছাড়ে মিত্র, ভাল করে চাদর জড়ায় গায়ে। বলে, ইচ্ছে ছিল ঘরটাকে অমন অনাবাদী ফেলে রাখব না...হাঃ হাঃ...ফুলে-ফুলে ভরে তুলব!

গোল পার্ক থেকে গড়িয়াহাটার দিকে ফিরে আসে দু'জন। পাশাপাশি হাঁটে। মিত্রই কথা বলে যায়, অটোমেশন এসে গেল, যন্ত্রপাতির হাতে কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এবার আয়েসি মানুষদের ছুটি। এতদিনে বুঝি মশাই, কাজকর্ম আসলে যন্ত্রপাতিরই, মানুষের নয়।

শ্যাম হাসে। অন্যমনে হাঁটে।

বিধবাতেও আমার আপত্তি ছিল না মশাই, আমি শুধু শান্তশিষ্ট একজনকে চেয়েছিলুম, বয়স জাত রূপ কোনওটাই আমার দেখার ছিল না। কিন্তু কেবল মুখ ফুটে কাউকেই বলতে পারলুম না। বড় লজ্জা করে। একটু বেশি বয়সেই বিয়ের কথা ভেবেছিলুম, বয়স থাকার সময়ে ভাবতুম কেবল তার কথা, যে আমাকে দিব্যি দিয়ে নিজে সরে পড়েছে।...আয়ুটা বড় লম্বা, কী বলেন?...তা ঠিক বয়সে যখন বিয়ে করিনি, এই বয়সে আর লোককে নিজের বিয়ের কথা কী করে বলা যায়!...বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত কোথায় যেন আটকে যায়। বলতে পারি না। লজ্জা করে।

গড়িয়াহাটার কাছে মিত্রকে ছেড়ে দিল শ্যাম। মিত্রকে একই সঙ্গে খুশি আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও পিছু হটে এল মিত্র, বলল, আমাকে খুব অসহায় মনে করবেন না মশাই, আমি নিরস্ত্র নই। অনেক দিন থেকে নিজেকে সশস্ত্র রেখেছি আমি...হাঃ হাঃ...সময় থাকতেই জোগাড় করে রেখেছি পরিমাণ মতো ঘুমের ওষুধ...সতেরোটা ট্যাবলেট আছে আমার, হ্যাঁ মশাই, সতেরোটা! মায়ের ছিল না-ঘুমোনোর অসুখ, তখন থেকে চুরি করে জমিয়ে রাখা...জানতুম একদিন না একদিন কাজে লাগতে পারে...মাঝে মাঝে শিশিটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখি...হাতে নিলেই মশাই, কেমন একটু জোর পাই, মনে বল-ভরসা এসে যায়, আর ভয় লাগে না...হাঃ হাঃ...

তারপর গলা নামিয়ে বলল, দরকার হলে বলবেন। যা ট্যাবলেট আছে তাতে দু'জনের ঢের হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে আরও এক-আধজনকে বলে দেখবেন। অনেকেই রাজি হবে। আমি ফ্রি দেব...হাঃ হাঃ...

শ্যাম মৃদু হেসে বলল, নেব। আমার দরকার হবে।

আচ্ছা, বলে গম্ভীর মুখে মিত্র চলে গেল।

দূর থেকে শ্যাম দেখল খয়েরি তুস চাদর গায়ে মাতাল একটা ভল্লুকের মতো মিত্র আলো-ছায়ায় হেঁটে যাচ্ছে তার জমিয়ে রাখা সতেরোটা ঘুমের বড়ির দিকে। তাকে পিছু ডাকতে ইচ্ছে হয় না। তাকে শ্যাম চলে যেতে দিল।

## ॥ এগারো ॥

ঠিক দুপুরবেলায় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্যাম। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখল—শেষ সিগারেট। সেটা ধরিয়ে নিয়ে প্যাকেটটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বাঁ পায়ে নিখুঁত একটা শট করল সে। প্যাকেটটা রেলিং টপকে গিয়ে দেয়ালে লেগে পড়ল সিঁড়ির বাঁক ঘুরবার চাতালে, শ্যাম আপনমনে হাসল—গো-ও-ও-ল! রেলিঙে ঝুঁকে ভারসাম্য রাখল, তারপর মসৃণ রেলিঙে হাত ছুঁইয়ে তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল। পায়ে করে আবার সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নেয় সে। তারপর পায়ে পায়ে সেটাকে নিয়ে খেলতে খেলতে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে—ইন আউট...ইন আউট...ইন

আউট—আপনমনে বলে সে। অনেক স্মৃতি অনেক কথা ও দৃশ্য, ভাঙা শব্দ বুকের ভিতরে, মাথার ভিতরে ঝিলমিল করে ওঠে তার। কচ্ছপের পিঠের মতো এক ঢাল সবুজ মাঠ, একটা সাদা বল, আর সে ছুটছে আর ছুটছে...সামান্য হাসে সে, শ্বাস টানে, তারপর আবার নামতে থাকে।

বড় রাস্তায় এসে এসপ্ল্যানেডের বাস ধরল শ্যাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াল শ্যাম। চোখের রোদ-চশমা খুলে নিল। মৃদু হাসল।

আবছা দেখা যেতে লাগল লীলার অবয়ব। তারপর জলের গভীর থেকে যেভাবে আস্তে আস্তে মাছ উঠে আসে জলের ওপরে, তেমনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল সেই দু'খানি সাদা ব্যস্ত হাত, গোল সুন্দর মুখখানা, কপাল-ঢাকা চুল। আজ তার সাদা ব্লাউজ। মাথায় উঁচু করে বাঁধা মস্ত খোঁপা।

দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। চমকে উঠল না লীলা, মুখ ফাঁক হয়ে গেল না। বরং জুড়ে গেল ঠোঁটে ঠোঁট, ভ্রূ কুঁচকে উঠল, দৃঢ় হয়ে গেল চোয়ালের হাড়। এক পলক দেখা হতেই সে তার চোখ সরিয়ে নিল। ব্যস্ত হয়ে গেল কাজে।

শ্যাম জানত এরকমই হবে। এরকমই হয়। মৃদু হেসে সে দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমে অলীক এক আবছায়ার মধ্যে চলে যেতে লাগল তার চারপাশ, পথ-চলতি লোকজন, লুপ্ত হয়ে গেল সময়ের বোধ। আর কেবলই রেলগাড়ির শব্দ, হরিণের খুরের আওয়াজ. নিঃশব্দ এক বৃষ্টিপাতে ভরে আসে তার বুক, শরীরের ভিতরে ধীর গম্ভীর মেঘ ডেকে ওঠে।

চোয়াড়ে চেহারার একটা লোক লীলার সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার পরনে গাঢ় গরম প্যান্ট, গায়ে সাদা সোয়েটার। লোকটা খুব ভদ্রভাবে হাসছে, কিন্তু তার মতলব শ্যাম পরিষ্কার বুঝতে পারে। সে নানা কথায় ভোলাচ্ছে লীলাকে। ওই তো লীলার মুখ-চোখ কোমল হয়ে এল, স্বপ্ন দেখার মতো অলস হয়ে এল চোখ, দু'টি ব্যস্ত হাত কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে আছে কাউন্টারের ওপর। লীলার ঠোঁটে চাপা আনন্দের হাসি! বোধহয় ঘরে আর কেউ নেই, কিছুক্ষণের অবসর পেয়ে গেছে লীলা। টেলিফোনটাও বোধহয় বাজছে না, কিংবা বাজলেও উত্তর দিচ্ছে না লীলা।

লোকটাকে শ্যামের চেনা মনে হয়। অনেকক্ষণ সে দেখে। সেই লোকটা কি, শ্যাম যার পিছু নিয়েছিল! লোকটা, ওই বদমাশ লোকটা এখানে কেন তা বুঝল না শ্যাম, সে শুধু মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল—কথা বোলো না। ওর সঙ্গে কথা বোলো না। কী কথা ওর সাথে? মুখ ফিরিয়ে নাও, কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ো। অনেকক্ষণ ধরে তোমার টেলিফোন বেজে যাচ্ছে, উত্তর দাও। বাইরে সন্ধে হয়ে এল, তুমি কাজ সেরে নাও। ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলো, আচ্ছা, আপনি এখন আসুন...! কিংবা আরও কোনও কর্কশ কথা বলো লীলা, ওকে বের করে দাও। কিংবা আমাকে চোখের ইশারায় ডাকো, আমি ভিতরে গিয়ে ওকে বের করে আনছি। আমি ওকে চিনি, ও ভিড়ের মধ্যে লোকের পকেট হাতড়ে দেখে, মেয়েদের বুক ছুঁয়ে আসে ওর লোভী হাত। কথা বোলো না আর। লীলা, চুপ করো। কী কথা ওর সাথে! তুমি কি জানো না যে, একজন তোমাকে দেখছে?

বোধহয় টেলিফোন বাজল। লীলা একটু হেলে কানে চেপে ধরল টেলিফোন, ডান হাতে সে হলুদ পেনসিলটা ঠুকতে লাগল ডেস্কের ওপর, তবু লোকটার দিকে চেয়ে আছে সে, মৃদু হাসছে। লোকটা সোয়েটারটা দু' হাত দিয়ে একটু টেনে নামায়, ডেস্কের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ায় টেলিফোনটার দিকে। লীলা মাথা নাড়ে, পিছনে একটু হেলে সরে যায়। হাসে।

ওরা খেলছে—শ্যাম টের পায়। সমস্ত শরীর রি-রি করে ওঠে শ্যামের। আত্মবিস্মৃতি ঘটে যেতে থাকে। কী সাহস ওই লোকটার! কেবল কাছে দাঁড়িয়ে থেকে, কেবল কথা বলে বা কেবল চোখের দৃষ্টিতে ও নষ্ট করে দিচ্ছে লীলার পবিত্রতা।

আর লীলা জানে যে শ্যাম তাকে দেখছে। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কিংবা কে জানে, লীলা তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে কি না!

এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যায় শ্যাম। কী করছে তা বুঝতে পারে না। দরজার খুব কাছে এসে সে দাঁড়ায়। কাচের পাল্লায় তার লম্বা, শীর্ণ, এলোমেলো পোশাক পরা চেহারার ছায়া ভেসে ওঠে। তার নিশ্বাসের ভাপ লেগে আবছা হয়ে যায় খানিকটা কাচ। তীব্র চোখে সে ভিতরের দিকে চেয়ে থাকে।

টেলিফোন রেখে সোজা হয়ে বসেই হঠাৎ শিউরে ওঠে লীলা, চিৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখে

হাত চাপা দেয়, অসহায় দু'টি চোখ বিশাল হয়ে যায়। চোয়াড়ে চেহারার লোকটা বিদ্যুদ্‌বেগে চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যাম দেখে, তার দু'টো হাত মুঠো পাকানো, কিন্তু হতভম্বের মতো শ্যামের দিকে চেয়ে আছে।

শ্যাম মৃদু হাসে। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে আসে আবার। ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় নিশ্চিন্ত মনে। শান্তচোখে চেয়ে থাকে হতভম্ব বিব্রত লোকটার দিকে। চোখ দিয়েই বুঝিয়ে দেয়—সাবধান! আমি পাহারায় আছি।

লোকটা একটুক্ষণ তাকে দেখে, তারপর অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নেয়। লীলা মুখ নিচু করে বসে আছে। দু'জন স্যুট পরা সাহেব ভিতরে ঢুকে গেল। তারা লীলার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল। শ্যাম লক্ষ করে যে লীলার মুখ অল্প লাল, সে অনায়াসে হাসছে না আর, মাথা নেড়ে থমথমে মুখে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। ঘর খালি হয়ে গেল আবার। চোয়াড়ে চেহারার লোকটা লীলার দিকে ফিরে কী যেন জিজ্ঞেস করল। লীলা মাথা নাড়ল—না। চোখ নিচু করে রইল। লোকটার মুখে সামান্য হতাশা ফুটে উঠছে। শ্যাম দেখে। লোকটা একটু ইতস্তত করে, তারপর কাউন্টারের ওপরে রাখা ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে এসে লোকটা থমকে শ্যামের দিকে এক পলক তাকায়। শ্যাম গ্রাহ্য করে না। লোকটা বাঁ দিকে হেঁটে চলে গেল।

নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে থাকে শ্যাম। নড়ে না।

আস্তে আস্তে তার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। ঘরের মধ্যে লীলাকে উজ্জ্বল দেখায়। বাচ্চা মেয়ের মতো অভিমানী গম্ভীর তার মুখ। শ্যাম হাসে। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে—তোমাকে ওখানে মানায় না। এত ভিড়ের মধ্যে আর এত লোকজনের চোখের সামনে তোমাকে মানায় না। ভেবো না, আমি তোমার জন্যেই একদিন পৃথিবীকে খুব নির্জন করে দেব, চুপ করিয়ে দেব সবাইকে। গভীর শরবনের জঙ্গলে ডুবিয়ে দিয়ে যাব সমস্ত শহর।...কে ওই লোক যার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে? ওরকম হৃদয়হীন চেহারার লোক পৃথিবী থেকে যত কমে যায় তত ভাল। তুমি কখনও ওই লোকের সঙ্গে দূরে যেয়ো না।

কাজ শেষ হয়ে গেলে লীলা সতর্কভাবে একবার দরজার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর একটা টেলিফোন করল। পিছনে হেলান দিয়ে বসে রইল চুপচাপ। ঘরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করল অনেক লোক, শ্যাম তাদের লক্ষ করল না। লীলার বসে থাকার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল যে, সে কারও অপেক্ষায় আছে। মৃদু হাসল শ্যাম, কেননা সে জানে যে, তাতে লীলার কোনও লাভ নেই।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেউ এল না। লীলা উঠে ভিতরে গেল, আবার ঘুরে এল, কাউন্টারের উপর ঝুঁকে দরজার দিকে পিঠ করে কিছু একটা দেখার ভান করে অপেক্ষা করল। আবার অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে একটু হেঁটে বেড়াল। তারপর ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল লীলা। পিছনে আলো, তাই লীলাকে ছায়ার মতো দেখায়। কাচের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল লীলা। শ্যাম স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওই অন্ধকার মুখ থেকে দু'টি অদৃশ্য চোখ তাকে লক্ষ করছে, বলছে, কী চাও রাস্তার লোক? কী চাও অচেনা?

সে দু'টি প্রশ্নই শুনতে পায় যেন। অমনি কেঁপে ওঠে তার শরীর, ভুল পেয়ে বসে তাকে। সে বিড় বিড় করে বলে, আমি জানি না আমি কী চাই। আমি জানি না।

অস্থিরভাবে চোখ সরিয়ে নেয় শ্যাম। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে সে শুনতে পায় দূরের রাস্তায় বাঁক নিয়ে ছুটে আসছে একটা মোটর-সাইকেল. তারপর তার গতি ক[illegible]সে, ধীরে ধীরে মোটর-সাইকেলটা তার ঠিক পিছনে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ায়। নিথর হয়ে যায় শ্যাম। অবশ চোখে চেয়ে দেখে, তার পাশ দিয়ে চটপট পায়ে একটি ছেলে চলে গেল কাচের দরজাটার দিকে। চাপা কালো প্যান্ট আর সাদা পুল-ওভার পরা, ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল, একটু বেঁটে কিন্তু মজবুত চেহারার ছেলেটি দরজার দিকে হাত বাড়াতেই যেন মন্ত্রবলে দরজা খুলে গেল। সেই প্রথম দিন শোনা একটু তীক্ষ্ণ কিন্তু মিষ্টি গলাটি শুনতে পেল শ্যাম, এত দেরি! কখন টেলিফোন করে বসে আছি...

ছেলেটি হাসে, এই বিশ্রী ট্রাফিকে আসা যায়? ঘুরে আসতে হল, তাও ক্লিয়ার রাস্তা পেলুম না...কী ব্যাপার?

কই! কিছু না!

কিছু না?

না।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এল শ্যামের দিকেই। নড়ল না শ্যাম। লীলা ছেলেটির বাঁ পাশে ছিল, যে-পাশে শ্যাম। কয়েক পা হাঁটার মধ্যেই লীলা কৌশলে ছেলেটির ডান পাশে সরে গেল। তারপর তাকে পেরিয়ে গেল তারা। শ্যাম ঘাড় ঘোরাল না। শুনতে পেল স্টার্টারে লাথি মারার শব্দ, তারপর গুর গুর করে ডেকে উঠল মোটর-সাইকেল। দূরের দিকে ছুটে গেল। সরল একটি গাছের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসে পেট্রলের গন্ধের সঙ্গে আর-একটি মিষ্টি মৃদু গন্ধ, বোধহয় পাউডারের। আগে অনেক পাউডারের গন্ধ চেনা ছিল শ্যামের। এখন ভুলে গেছে, মৃদু হেসে সে মাথা নাড়ল—না, সে এ-গন্ধটা চেনে না।

তোমার কি অনেক প্রেমিক? ভাল, কিন্তু দেখো, একদিন পৃথিবী খুব নির্জন হয়ে যাবে। তখন তোমার লুকিয়ে থাকার নিরাপদ জায়গা থাকবে না, থাকবে না পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ।

ভিড়ের ভিতরে পথ করে ধীরে হাঁটছিল শ্যাম। হাঁটতে হাঁটতে বলছিল, আমি জানি না কী করে ভয় দেখাতে হয় চোয়াড়ে চেহারার বিশ্রী স্বভাবের লোকদের, আমি জানি কীভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয় মোটর-সাইক্লিস্টদের। তুমি কেন দেখিয়ে দাওনি আমাকে! কেন ছেলেটিকে বলোনি যে, এই লোকটার জন্যই আমি রাস্তায় একা বেরোতে পারছিলুম না! কিংবা তুমি সেই চোয়াড়ে চেহারার লোকটাকেও বলতে পারতে—আমাকে বাঁচাও।

হাঁটতে হাঁটতে অভিভূতের মতো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যাম। কেন? পিছন থেকে চলন্ত একটা লোক তার গায়ে ধাক্কা খায়। শ্যাম টাল খেয়ে হেসে ওঠে—কেন ধরিয়ে দাওনি আমাকে? তারপর আবার হেঁটে যায়।

বস্তুত পৃথিবী খুব নির্জন হয়েই গেছে। খুব জীবন্ত মানুষজন শ্যামের চোখে পড়ে না। ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাকাপড় হেঁটে যাচ্ছে, ট্যাক্সিডার্মি করা মুখ কিংবা শরীর তার চোখে পড়ে। এলোমেলো আলোয় পড়ছে চলন্ত ছায়া, ভেঙে যাচ্ছে। নানা রাস্তায় ঘুরে বেড়াল শ্যাম। একটিও চেনা মুখ চোখে পড়ে না, একটিও প্রিয় মুখ চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে হয়, একশো বছর একটানা ঘুমিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে সে আর কিছুই চিনতে পারছে না। একশো বছর ধরে পচে গলে ঝরে গেছে চেনা-পরিচয়, একশো বছর ধরে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে প্রিয় মুখগুলি। অল্প কুয়াশা জমে আছে চার দিকে, বেশি দূরে চোখ যায় না। মনে হয় কুয়াশা কেটে গেলেই দেখা যাবে বিদেশ। দেখা যাবে, লীলা একা নির্জন রাস্তার শেষে কাচের দরজার ওপাশে তার অপেক্ষায় আছে। তাকে দেখলেই দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে, তারপর তারা দু'জন পরিত্যক্ত জনহীন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে পরস্পরকে না-ছুঁয়ে। যে-কোনও বাড়িতেই তাদের জন্য সুন্দর বিছানা পাতা থাকবে, দোকানে দোকানে সাজানো থাকবে জিনিস, তারা একবার স্পর্শ করবে বলে গাছে গাছে ফুল ফুটে ফল ফলে থাকবে। তাদের দু'জনের উদ্দেশেই তখন রোদ বা বৃষ্টিপাত ঘটবে পৃথিবীতে।

না, শ্যাম মাথা নাড়ে। পৃথিবীতে এরকম কিছুই ঘটে না। সে জানে। তাই পৃথিবী এখনও তেমন সুন্দর নয়। এখনও এখানে রয়ে গেছে কিছু অহংকারী মোটর-সাইক্লিস্ট আর কিছু চোয়াড়ে লোক।

হোটেলে আজ মিত্রকে না দেখে সামান্য চমকে গেল শ্যাম। রোজ যে দেখা হয় তা নয়। তবু আজ খেতে বসে বড় একা লাগল শ্যামের। সামনের উলটো দিকের শূন্য চেয়ারটার দিকে চোরা চোখে চেয়ে দেখল অনেকবার। সামান্য সন্দেহে তার মন দুলে গেল। খাবারের তেমন কোনও স্পষ্ট স্বাদ পেল না শ্যাম। খেয়ে গেল।

হোটেলের ম্যানেজার লোকটার সঙ্গে কোনও দিনই প্রায় কথা বলে না শ্যাম। দরজার কাছে একটা খুদে টেবিল কোলে করে বসে থাকে বিনয়ী এবং মোটা থলথলে লোকটি, দু'টি ঢুলুঢুলু চোখ, দেখলে মনে হয়, সন্ধের দিকে এক-আধ ছিলিম গাঁজা খায় ম্যানেজার। কথা কম বলে, হাসে অনেক বেশি কিন্তু শব্দ হয় না, কখনও শ্যাম শোনেনি যে লোকটা ছোকরা চাকর কিংবা ঠাকুরকে চেঁচিয়ে বকছে। বস্তুত

বকাঝকা করার জন্য আলাদা একজন লোক রাখা আছে—সে-লোকটা চাকরদের ওপরওয়ালা। ম্যানেজার শুধু চুপচাপ বসে থাকে শান্তভাবে। শ্যাম লক্ষ করেছে, দিনে দিনে লোকটা আরও শান্ত হয়ে যাচ্ছে, নড়াচড়া কমে যাচ্ছে আরও। মুখের হাসিতে আরও বিনয় ও উদাসীনতা ফুটে উঠছে, মুখের কথা কমে গেছে অনেক। লোকটার মাথার ওপরে পিছনের দেয়ালে লোকটার মৃত বাবার একটা ছবি টাঙানো আছে, ছবির চারধারে একটা গত বছরের শুকনো বেলফুলের মালা। মাঝে মাঝে শ্যামের সন্দেহ হয় যে, হয়তো খুব শিগগিরই এ-লোকটাও তার ছেলেকে খুদে টেবিলের কাছে নিজের পুরনো জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে একলাফে উঠে যাবে ওপরের দেয়ালে তার বাবার ছবির পাশে। তারপর ওরকমই একটা শুকনো বেলফুলের মালা পরে ছবি হয়ে যাবে একদিন, খুব শিগগিরই! নয়তো যেখানে বসে আছে সেখানেই বসে থেকে আস্তে আস্তে একদিন সিমেন্ট কংক্রিটের মতোই জমে যাবে লোকটা—ঠান্ডা পাথর হয়ে যাবে, আর নড়বেই না কোনও দিন।

আজ বেরোবার মুখে শ্যাম খুদে টেবিলটার সামনে একটু দাঁড়াল। বাইরের দিকে চেয়ে দেখল, কুকুর—অনেক কুকুর বসে আছে। রোজ যেমন থাকে। অকারণে শ্যাম মৃদু হেসে বলল, আঃ, কুকুর! তারপর এক দুই তিন করে গুনে গেল। এগারোটা।

এত কুকুর! শ্যাম মৃদু হেসে শান্ত লোকটির দিকে তাকাল, এত কুকুরকে আপনি রোজ ভাত দেন?

দিই। বড় বিনয়ে হাসল লোকটি। চোখ বুজে গেল হাসিতে।

এগারোটা কুকুরকে? শ্যাম চোখ বড় করে তাকাল—আপনার খুব বেশি পুণ্য জমে যাচ্ছে! খুব তাড়াতাড়িই পুণ্য করে নিচ্ছেন আপনি, সময় থাকতেই!

বড় বিনয়ে লোকটি ঘাড় কাত করল, বলল, এগারোটার বেশি-কমও হয়।

হয়?

হয়। লোকটা বিষণ্ণ চোখে কুকুরগুলোর দিকে তাকাল, বলল, দিনে দিনে বাড়ছে। আরও বাড়বে।

কেন?

কেন! লোকটি চিন্তিত মুখে শ্যামের দিকে তাকাল, খাবার পাচ্ছে না কোথাও। দেশের যা অবস্থা, ক্রমে ক্রমে এখানে এসে জুটছে।

ঠিক। শ্যাম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে। বস্তুত দেশের খাদ্যাবস্থা বহুকাল হয় শ্যামের আর জানা নেই। তবু লোকটার এত কথা বলা শুনতে তার ভাল লাগছিল।

সব ক'টাই বাজে কুকুর নয়। লোকটা বলল, লক্ষ করে দেখুন, মাঝখানের সাদা কুকুরটা—ওর গায়ে অনেক বড় বড় লোম এখনও আছে, প্রকাণ্ড ঝোলানো কান, ওটা স্প্যানিয়েলের ক্রস-ব্রিড। আর ওই যে একটা ছাইরঙা, দেখলে আর বোঝা যায় না, ওটা বোসেদের কুকুর ছিল—অ্যালসেশিয়ান। গায়ে ঘা হয়ে পচে-টচে রাস্তার কুকুর হয়ে গেছে। খুঁজলে মশাই, ওদের মধ্যেও—বলতে বলতে হাসল লোকটি, একজন খদ্দেরকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তাকে পয়সা গুনে দিতে টেবিলের ওপরটা ডালার মতো তুলে ফেলল।

একটু অপেক্ষা করল শ্যাম, তারপর মুখ তুলতেই বলল, মিত্রকে দেখেননি আজ! সুবোধ মিত্রকে?

অমায়িক হাসল লোকটি; মাথা নাড়ল, না। এখনও আসেননি। বলে সস্নেহে কুকুরগুলির দিকে চেয়ে রইল। শ্যাম লক্ষ করল, কুকুরগুলি বড় স্নেহে এবং ভালবাসায় শান্ত লোকটির দিকে চেয়ে আছে।

আর কথা না বলে বেরিয়ে এল শ্যাম। সে কুকুরগুলির ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল, তারা একটু সরে পথ করে দিল। সন্দেহজনক স্প্যানিয়েলটির দিকে একবার আদরের হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিল শ্যাম। তাতেই খুশি হয়ে কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে দিল। ভিখিরি ব্যাটা—শ্যাম মনে মনে গাল দিল তাকে।

শ্যামের মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে একটা সন্দেহ। কাছেই সুবোধ মিত্রর বাসা। ইচ্ছে করলে একবার ঘুরে আসতে পারে শ্যাম। কিন্তু ইচ্ছে হয় না। যদি তেমন কোনও ঘটনাই ঘটে থাকে, তবে তার গিয়ে কী লাভ? বরং এখন গেলে পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক। ভাবতেই ভয়ংকর অলস লাগল শরীর। শ্যাম হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়াল। হাই তুলল। যদি ঘটনাটা ঘটেই থাকে তবে বলতেই হয় যে, মিত্র কথা রাখেনি। সতেরোটা ঘুমের বড়ির অর্ধেক বখরা শ্যামের পাওনা ছিল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যাম। তার ক'টা বড়ি পাওনা ছিল? হিসেব করলে ক'টা দাঁড়ায়! আটটা না ন'টা! অর্ধেক নেওয়ার কথা বলেছিল মিত্র, কিন্তু ঠিক ক'টা তা বলেনি। শ্যাম ভেবে দেখল, আর-একজনকে দলে নিলেও ঠিক ঠিক তিন ভাগ করা যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে বড় সমস্যায় পড়ে গেল শ্যাম। সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোল যে, ভাগ-বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যা বিশ্রী। তারপর আবার হাঁটতে লাগল।

পৃথিবী অনেক নির্জন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে আরও যাবে। আস্তে আস্তে তার একার হয়ে যাবে সবকিছু। মিত্রকে দিয়ে শুরু হল হয়তো বা। কিংবা ঠিক তা নয়—আরও আগে থেকে—

তার মাথার ভিতরে অমনি বগরী পাখির মতো গুরু গুরু করে ডেকে উঠল একটি প্রায়-ভুলে-যাওয়া মোটর-সাইকেলের আওয়াজ। মৃত্যুকূপে সেই খেলার মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে আবার নীচে নেমে যেতে লাগল। শ্যাম দ্রুত হাঁটতে থাকে।

## ॥ বারো ॥

হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসেছিল। তখন শ্যাম ছিল না। হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসে যাবে। তখন শ্যাম থাকবে না। কেমন ছিল সেই সুসময় কে জানে! কিংবা কে জানে কেমন হবে সেই সুসময়! শ্যাম জানে না। মাঝে মাঝে সে কেবল তার চারধারে দেখতে পায় সেইসব সুসময়ের অনেক চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। যেমন পাখির মুখ থেকে খসে পড়া ফসলের বীজ দেখে বোঝা যায় যে, কাছাকাছি এইখানে কোথাও ফসল ফলেছিল, যেমন আকাশের মেঘ দেখলে বোঝা যায় আমাদের বীজক্ষেত্রে বৃষ্টি হবে।

কিংবা কে জানে এইটাই সেই সবচেয়ে সুসময় কি না যা শ্যাম পেরিয়ে যাচ্ছে!

দুপুর রোদ মাথায় করে শ্যাম তার রোজকার পরিচিত থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এত আলোর মধ্যেও তার মনে হচ্ছিল যে, চারধারে ছায়ার মতো অলীক অনর্থক মানুষেরা অকাজে হেঁটে যাচ্ছে। সবকিছুই বস্তুত অবাস্তব, একমাত্র সামনের ওই কাচের দরজাটা ছাড়া। ওপাশে লীলা বসে আছে। ব্যস্ত কর্মঠ তার দু'টি সাদা সুন্দর হাত, অল্প গম্ভীর ও বিষণ্ণ তার মুখ। শ্যাম জানে লীলা এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসেনি। এখনও বড় দয়ালু ওর মন, আঘাত করার আগে তাকে সতর্ক হওয়ার সময় দিচ্ছে। শ্যাম জানে, খুব শিগগিরই একদিন রাস্তার লোকেরাই তাকে ঘিরে ধরবে, চোখ পাকিয়ে তাকে সরে পড়তে বলবে। শুধু যতদিন তা না ঘটবে ততদিনই বড় সুসময়। সবচেয়ে সুসময়।

তারপর একদিন হয়তো সে ইরফানের কাছে সোজা গিয়ে বলবে, আমি পাকিস্তানে চলে যাব। আমাকে সীমানা পার করে দাও।

কিংবা সে হয়তো ঘুরে ঘুরে কষ্টেসৃষ্টে জোগাড় করার চেষ্টা করবে সতেরোটা ঘুমের বড়ি— যা হাতে নিলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া যায়, বালিশের পাশে নিয়ে শুলে কেটে যায় ভয় কিংবা ভবিষ্যৎ-চিন্তা।

কী করবে তা ঠিক জানে না শ্যাম। কেবল মনে হয়, এখনই হয়তো সবচেয়ে সুসময়।

আজও লীলা কাচের দরজার সামনে এসে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিধা! কিংবা অপেক্ষা! তারপর শ্যামকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে দরজা খুলে লীলা রাস্তায় নেমে এল। একা। ধীর পায়ে হেঁটে যেতে লাগল।

প্রথমে কিছুক্ষণ এটা বিশ্বাস করল না শ্যাম। তারপর বুঝল মেয়েটা লীলাই, এবং সে একা হেঁটে যাচ্ছে। ধীর পায়ে।

নিঃশব্দে শ্যাম তার থামে হেলানো শরীর তুলে আনল। তার শরীর কাঁপতে থাকে, নানা রহস্যময় অনুভূতি তার ভিতরে খেলা করে যায়। তার খুব জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে, হাঁটু গেড়ে বসে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে। তুমি লীলা! তুমি কি লীলা! আমার সঙ্গে এক সমতলে তুমি হেঁটে যাচ্ছ! একা!

নিঃশব্দে বেড়ালের মতো পায়ে, গোয়েন্দার মতো সন্ধানী চোখে লীলাকে রেখে, ভিড়ের ভিতরে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে শ্যাম হাঁটে। হেঁটে যায়।

গাঢ় বাদামি জমির ওপর ফ্যাকাশে কলকা এবং আরও নানা জ্যামিতিক ছাপ দেওয়া একটা শাড়ি পরেছে লীলা, মোটা একটা বেণিতে বাঁধা তার চুল। পিছন থেকেও লীলাকে বড় পবিত্র দেখাচ্ছে। অলস মন্থরভাবে সে হাঁটছে, বাঁ হাতটা বুকের ওপর গোটানো—বোধ হয় সে তার সাদা ব্যাগটা বুকে চেপে ধরে আছে, গলায় জড়ানো কাশ্মীরি স্কার্ফের আঁচল উড়ছে হাওয়ায়।

রাস্তায় ভিড়, তবু ভিড়টাকে যথেষ্ট বলে মনে হয় না শ্যামের। তার এবং লীলার মধ্যে অনেকটা শূন্য জমি। লীলা ঘাড় ঘোরালেই চোখাচোখি হয়ে যেতে পারে। তার শূন্য বুকের ভিতরে লাফিয়ে ছুটছে হরিণ, শরীরের ভিতরে রহস্যময় মেঘ ডেকে ওঠে, বৃষ্টি নামে, কালো একটা রেলগাড়ি খুব লম্বা একটা পুল পেরোতে থাকে। যদি চোখাচোখি হয়—যদি চোখাচোখি হয়ে যায়! যদি কথা বলে লীলা! যদি প্রশ্ন করে, তুমি কে?

ভাবতেই জড়িয়ে আসে শ্যামের হাত-পা। খালি রাস্তায় সে হোঁচট খায়। হাসে। আবার হাঁটে। তা হলে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে যাবে, অদৃশ্য থেকে নেমে আসবে এক ঢল জলের প্লাবন, হয়তো বা কথা বলে উঠবে রাস্তাঘাট! আর তখন নিশ্চিত নিজের পরিচয় ভুলে যাবে শ্যাম, লীলার সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ-ভুলে-যাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো ভীত চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিড় বিড় করে বলবে—প্রশ্ন কোরো না আমি কে। আমি জানি না।

সামনের মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার অপেক্ষায় ভিড় জমে আছে। পুলিশের উত্তোলিত হাত চলন্ত গাড়িগুলো আটকে দিল। লীলা সামান্য থেমে আবার হাঁটে। রাস্তা পার হয়। ধীর মন্থর তার গতি—কোনওখানে যাওয়ার তাড়া বা লক্ষ্য নেই তার। চারধারে অর্থহীন অলীক ছায়ার মতো লোকজন। শ্যাম এদের কাউকেই চেনে না, জানে না এরা বাস্তবিক আছে কি না। এরাও কি তা জানে! শ্যাম এইসব ছায়া ভেদ করে হেঁটে যায়। বাস-স্টপ থেকে কারা যেন লীলাকে উদ্দেশ করে বলে, বাঃ বেশ। অমনি গরগর করে ওঠে শ্যাম, অন্ধের মতো রুখে ঘুরে দাঁড়ায়, ফিস ফিস করে চাপা হিংস্র গলায় বলে, সাবধান! আমি পাহারায় আছি। হাসে। আবার হাঁটতে থাকে। নিজেকে বড় জীবন্ত মনে হয় তার। শরীরের ভিতরে কলকারখানা চলার আওয়াজ। সুসময়...পৃথিবীতে এটাই বোধহয় সবচেয়ে সুসময় যা শ্যাম পেরিয়ে যাচ্ছে।

লীলার গতি ক্রমে আরও মন্থর হয়ে আসে। সে অন্যমনে ফুটপাথের আরও ধার ঘেঁষে যায়, মুখ ফিরিয়ে শো-কেসের জিনিস দেখতে দেখতে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে যায়, মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখে, তারপর পা পা করে হাঁটতে থাকে। লীলাকে যতটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ততটা সে নয়— শ্যাম জানে। লীলার শরীর সতর্ক, কান উদগ্রীব সে জানে যে, শ্যাম তার পিছনে আছে। খোলামেলা রাস্তায় একা অরক্ষিত লীলা। কে জানে লীলা তাকে নিঃশব্দে বলছে কিনা— কাছে এসো। ভাল করে দেখতে দাও তোমার মুখ। তোমরা কি হিন্দু? তোমরা কী গোত্র? তোমার নাম পরিচয় আমাকে বলো। তোমার বাড়ি-ঘরদোরের অবস্থা আমাকে বলো। তোমরা ক' ভাইবোন? আর তোমার চাকরি...?

এ-সবকিছুই খুব জরুরি প্রশ্ন। লীলার জানা দরকার। শ্যাম তাই মনে মনে উত্তর দিয়ে দেয়— শ্যাম চক্রবর্তী আমার নাম, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমরা শাণ্ডিল্য গোত্র, বিক্রমপুরের বানিখাড়া গ্রামে আমাদের বাড়ি...না আমার ভাই নেই, এক বোন, মুর্শিদাবাদে তার বিয়ে হয়েছিল, তারপর আর খবর জানি না...সেইন্ট অ্যান্ড মিলারে আমি ছিলুম ছোটসাহেব, ওপরওয়ালা বাস্টার্ড বলে গাল দেওয়ায় আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলুম...তবু সত্যি বলতে কী আমি জানি না আমি কে কিংবা আমি কীরকম...

লীলা আস্তে আস্তে হাঁটে, যে-কোনও দোকানের সামনে একটু দাঁড়ায়, শো-কেস দেখে নেয়, আবার হেঁটে যায়। সাহসী লোকেরা তার কাছ ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে।

ক্রমে লিন্ডসে স্ট্রিটের কাছে চলে এল তারা। রাস্তা ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসছে। রাস্তা পার হওয়ার আগে লীলা একবার ফিরে তাকায় অন্যমনে। অবহেলার চোখ— তাচ্ছিল্য ফুটে আছে। পরমুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নেয়। তবু বঁড়শির মতো সেই দু'টি চোখ শ্যামের বুকের মধ্যে গেঁথে যায়। তার শরীর

যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে। বুকের মধ্যে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস ফুলে ফেঁপে ওঠে। তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে।

নিঃশব্দে লীলা বলে ওঠে, কাছে এসো।

শ্যাম আপনমনে মাথা নাড়ে। না। আমি জানি কাছে যেতে চেষ্টা করলে চারদিকের বাড়িঘর কেঁপে উঠবে, মাঠ ময়দান থেকে শিকড় ছিঁড়ে ছুটে আসবে গাছপালা, বাতাস আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলবে, রক্ষা করো, রক্ষা করো; আমি জানি, এখানে নয়, অন্য কোনও সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের দেখা হওয়া ভাল। এখানে নয়— এত লোকজন আর এত ভিড়ের মধ্যে নয়। দেখো একদিন খুব শিগগিরই আমি পৃথিবীতে সুসময় এনে দেব।

সে লীলার নিঃশব্দ স্বর শুনতে পায়, কথা বলো।

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। এখনও নয়। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যই আমি আলাদা একটা ভাষা তৈরি করব, দেখো। সেই ভাষায় থাকবে না কোনও কঠিন, রূঢ় কিংবা অশ্লীল শব্দ, তাতে থাকবে না কোনও গালাগাল। এখনও মানুষের ভাষা তেমন সুন্দর নয়। এখনও তাদের জানা বহু শব্দ রয়ে গেছে— যা রহস্যময়, কিংবা যা রাগ ও বিদ্বেষের, যা অবহেলা কিংবা প্রত্যাখ্যানের। আগে তুমি সেই সব শব্দ ভুলে যাও, তারপর...

লীলা রাস্তা পার হল না। বাঁয়ে মোড় ঘুরল। কয়েক পা হেঁটে একটা খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল হঠাৎ। পিছনে ফিরে অন্যমনস্ক চোখে একবার চারদিক দেখে নিল। তারপর দরজার ভিতরে চলে গেল।

শ্যাম ধীরে ধীরে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভিতরে কেবল দেখা যাচ্ছে একটা সরু সিঁড়ি— স্টিমারের সিঁড়ির মতো সুন্দর, লোহার চকচকে পাত বসানো, মসৃণ রেলিং, খুব উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সিঁড়িতে লীলা নেই। উঠে গেছে। নতুন রঙের গন্ধ পাওয়া যায়, আর মৃদু খুব মৃদু পাউডারের গন্ধ।

এটা কি রেস্তরাঁ! শ্যাম কয়েক পা পিছিয়ে এসে দরজার ওপরে দেখল— রেস্তরাঁ। সাইন বোর্ডে নাম লেখা আছে। শ্যাম জানে এখানে লীলার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে। শ্যামের জানা দরকার লোকটা কে! সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কোনও মোটর-সাইকেল দাঁড় করানো আছে কি না। নেই।

কোনও দ্বিধাই বোধ করল না শ্যাম। আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

হলঘরের মতো প্রকাণ্ড একটা ঘর। এত উজ্জ্বল আলো জ্বলছে যে শ্যামের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পেয়ালা পিরিচ চামচ কিংবা টেবিলের কাচের চাদর থেকে ঠিকরে এসে আলো তার চোখে আলপিনের মতো বেঁধে। কিছুক্ষণ সে ভাল করে লীলাকে দেখতে পেল না। সে তার রুক্ষ চেহারা এবং এলোমেলো পোশাকে এই ঝকঝকে ঘরে বেমানান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর লীলাকে দেখতে পেল সে। প্রায় ফাঁকা রেস্তরাঁ। কয়েকটিই মাত্র লোক ছড়িয়ে বসেছে, একেবারে কোনও দূরের টেবিলে বসেছে লীলা, টেবিলের ওপর অল্প নোয়ানো কাঁধ, মুখ নিচু—যেন টেবিলের কাচে সে তার মুখের ছায়া দেখছে। না, লীলা একা নয়, তার মুখোমুখি উলটো দিকের চেয়ারে বসে আছে সুন্দর চেহারার একটি লোক।

অরুণ না! ভ্রূ কুঁচকে শ্যাম দেখে, তারপরে মৃদু হাসে। হ্যাঁ. অরুণই।

অরুণ তাকে প্রথম দেখতে পেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টো লাফিয়ে উঠল অরুণের, কপালে পড়ল ভাঁজ। মুখ সামান্য ফাঁক হয়ে রইল একটুক্ষণ; শ্যাম বুঝল না, কেন এরকম হল অরুণের! সে মৃদু হাসিমুখে চেয়ে রইল অরুণের দিকে।

সামান্য ফিসফিস করে অরুণ বলল, শ্যাম! অনেকক্ষণ পর হাসল, আয়। আশ্চর্য যে, লীলা তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

অরুণের ডাকটাকে গ্রাহ্য করল না শ্যাম। মাঝখানের তিনটে টেবিল সে বাদ দিয়ে বসল। একা। এক কাপ চায়ের কথা বলে দিল বুড়ো বেয়ারাকে।

আড়চোখে সব কিছু লক্ষ করে শ্যাম। অরুণের মুখ অল্প লাল। তাকে লাজুক আর ভিতু দেখাচ্ছে। খুবই আশ্চর্য হল শ্যাম। এরকম হওয়ার কথা ছিল না। তার নিজের অতীতের মতোই অরুণের চরিত্র — সে জানে। অন্য কোনও লোকের বদলে অরুণকে দেখে শ্যাম বরং স্বস্তি পায়। শ্যাম জানে যে, সে

যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অরুণের কাছ থেকে লীলার কোনও ভয় নেই। শ্যাম নিজে অরুণের চেয়ে অনেক পাকা লোক ছিল।

সে লক্ষ করল, অরুণ কথা বলছে না লীলার সঙ্গে। সে কাঁটা চামচ দিয়ে এক টুকরো আলুর বড়া মুখে পুরে ভয়ংকর জোরে উত্তেজিত ভাবে চিবোচ্ছে। ঝনন করে তার চামচ পিরিচের সঙ্গে ঠুকে শব্দ করে ওঠে। অকারণে রুমালে মুখ মোছে অরুণ, তার চোখ লীলার নোয়ানো মাথার ওপর দিয়ে সামনের দেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দর চেহারা আর সুন্দর পোশাকে অরুণের ওই ভাবভঙ্গি খুব বেমানান লাগে শ্যামের কাছে।

লীলা খুব ঠান্ডা এবং সহজ ভঙ্গিতে বসেছে এখন। নোয়ানো মাথা তুলে অরুণের দিকে চেয়ে দেখছে। তার মুখে একটু স্মিত কৌতুকের ভাব। হঠাৎ সে তার একটু তীক্ষ্ণ পাখির মতো মিষ্টি গলায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরে বলল, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন!

অরুণ সামান্য অস্থির অস্বস্তির হাসি হাসে, মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

আমি এসেছি।

খুব মৃদু গলায় অরুণ কিছু বলল। শ্যাম শুনতে পেল না। শুধু দেখল, অরুণের কথার উত্তরে লীলা শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না।

লীলাকে কেন এখানে ডেকে এনেছে অরুণ তা শ্যাম বোঝে। তবু লীলাকে খুব শান্ত ও দৃঢ় দেখায়— যেন লীলার সঙ্গে আছে কোনও সমর্থ লোক, যে লীলাকে আপদে রক্ষা করবে। লীলার চোখে-মুখে সেই প্রত্যয় দেখে শ্যাম। লক্ষ করে, অরুণ তার শুকনো ঠোঁট চাটছে, এবং বোকার মতো এড়িয়ে যাচ্ছে শ্যামের চোখ। শ্যাম মৃদু হাসে। তার সামনের টেবিলে রাখা এক কাপ চা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যেতে থাকে।

ওরা আর কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। লীলার সামনে রাখা খাবারের প্লেট পড়ে থাকে। শ্যাম একটু বিস্মিত হয়— লীলা কি জানে না যে শ্যাম তার খুব কাছেই বসে আছে!

লীলা জানে। একটু পরেই শ্যাম সেটা টের পায়।

বাঁ হাতে জলের গ্লাস ধরে ডান হাতে লীলা তার বেণিটা বুকের ওপর টেনে আনে। ওইভাবে কৌশলে ঘাড় কাত করে অরুণের অজান্তে লীলা হঠাৎ সোজা শ্যামের দিকে তাকায়। যেন লীলা একবারও ঘাড় না ঘুরিয়েই জানত শ্যাম কোথায় বসে আছে। তার চোখের ওপর লীলার চোখ ঝলমল করে ওঠে। আর সেই মুহূর্তে খুব চমকে উঠে শ্যাম দেখতে পায়, লীলা একটু হেসেই হাসিটা ঠোঁটে টিপে দিল, তার চোখ আঙুলের মতো একটু সংকেত করে দেখিয়ে দিল অরুণকে। নিঃশব্দে কয়েক পলকে এইসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। তারপরই স্বাভাবিকভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল লীলা।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারে শ্যাম। বুঝতে পারে আজ বিকেলে ইচ্ছে করে কেন একা ধীরে ধীরে এতদূর হেঁটে এল লীলা। লীলা জানত শ্যাম তার পিছু নেবে। তাই এতদূর কৌশলে তাকে টেনে এনেছে লীলা। লীলা ঘাড় না ঘুরিয়েও জানত যে, সে খুব কাছেই বসে আছে। লীলা জানে যে, যে-কোনও আপদে-বিপদে শ্যাম তাকে রক্ষা করবে। তাই সে কৌশলে শ্যামকে বলে দিল—এই লোকটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

নিজের ভিতরে শীতল এক নিষ্ঠুরতা অনুভব করে শ্যাম। দু'টি মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো শক্ত হয়ে যায় তার চোয়াল। সে অরুণের দিকে চেয়ে থাকে। তার রক্তে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। আর একটিমাত্র ইঙ্গিতের জন্য তার সমস্ত শরীর প্রস্তুত থাকে।

মৃদু স্বরে কথা বলে অরুণ। বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকায় লীলা। না। না, না। তারপর কিছুক্ষণ এরকম চলে। শান্তভাবে বসে থাকে শ্যাম। অপেক্ষা করে। তার মাথার ভিতরে ধীরে ধীরে আর সব বোধ লুপ্ত হয়ে যায়, শুধু কুয়াশার মতো জমে ওঠে রাগ।

শ্যাম দেখে, অরুণ বিল মিটিয়ে দিচ্ছে। টেবিলের ওপর থেকে সাদা হাতব্যাগ তুলে নিচ্ছে লীলা। ওরা উঠে দাঁড়াল। ওরা হেঁটে এল, সামনে লীলা। একবার— সেটাও ভুল হতে পারে— মাত্র একবার শ্যামের মনে হল, লীলার চোখ তার টেবিলের একটা কোণ ছুঁয়ে গেল।

অরুণ তার দিকে চেয়ে হাসল। সে হাসিতে কোনও ইচ্ছা বা প্রাণ নেই। সেই উঁচু ফিসফিস স্বরে বলল, শ্যাম! একটু দ্বিধায় দাঁড়াল, বলল, পরে কথা হবে।

লীলা ফিরে তাকাল না। তার দরকারও নেই। শ্যাম বোঝে।

সিঁড়ির চৌখুপিতে ওরা নেমে গেলে উঠে দাঁড়াল শ্যাম। তাড়াতাড়ি একটা ট্রে হাতে ছুটে এল বুড়ো বেয়ারা। বিরক্তিকরভাবে পথ আটকাল। পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পয়সা যতখানি হাতে পেল, তুলে এনে ঝনাৎ করে তার ট্রে-তে ফেলে দিল শ্যাম। তারপর আর ফিরেও তাকাল না।

নীচে নেমে এসে দেখল কোথাও কেউ নেই, তাড়াহুড়ো করে ওদের খুঁজল না শ্যাম। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে নিশ্চিন্ত মনে বাস ধরল।

হোটেলে ঢুকে ভূত দেখে আঁতকে উঠল শ্যাম। সুবোধ মিত্র! অনেককালের পুরনো বন্ধুর মতো হাসল মিত্র।

কাল আসেননি। শ্যাম জিজ্ঞেস করে।

না। মিত্র মাথা নাড়ে, কাল একটা বরযাত্রী গিয়েছিলুম।

শ্যাম উলটো দিকে মুখোমুখি বসে।

মিত্র বলল, কাল একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম মশাই। বরযাত্রী গিয়েছিলুম পুটিয়ারি পশ্চিম না দক্ষিণ ঠিক মনে নেই, টালিগঞ্জের খাল পেরিয়ে যেতে হয়। ও-সব গ্রাম-গঞ্জ ছিল কিছুকাল আগেও। কিন্তু গিয়ে শুনলুম ওটাও নাকি কলকাতা...হাঃ হাঃ— দু'দিন পরে আপনি যে-দিকেই যাবেন, যতদূর যাবেন, দেখবেন কলকাতা আর কলকাতা...কলকাতার শেষ নেই আর...লাফিয়ে লাফিয়ে শহর বেড়ে যাচ্ছে মশাই, গ্রাম-গঞ্জ খেত-খামার যা পাচ্ছে হাতের কাছে তাতেই স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছে— ক্যালকাট্টা!...হাঃ হাঃ...বাড়তে বাড়তে একদিন এই কলকাতাই না দুনিয়াময় হয়ে যায়!...হাঃ হাঃ...এতকাল কলকাতার মাঝখানে থেকে টেরও পাইনি যে, কলকাতা কেমন বেড়ে যাচ্ছে চারদিকে! এর পর আর কলকাতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও যাওয়া যাবে না মশাই, খুব অদ্ভুত ব্যাপার হবে, দেখবেন! তখন পাহাড়ে যাবেন তাও কলকাতায়, সমুদ্রে যাবেন তাও কলকাতায়; তখন কলকাতায় জন্মে সারাজীবন কলকাতাতেই ঘুরে মরবে লোক...হাঃ হাঃ...

খাওয়া হয়ে গেলে একসঙ্গে বেরোল দু'জন। শ্যাম গুনে দেখল আজ পনেরোটা কুকুর। সে হঠাৎ বলল, কুকুর খুব বেড়ে যাচ্ছে, দেখেছেন!

হ্যাঁ। মাথা নাড়ে মিত্র। হেসে বলে, আমাদের ম্যানেজার লোকটা খুব কুকুরভক্ত। তারপর একটু গলা নামিয়ে বলল, বোধহয় রোজ মহাভারত পড়ে...হাঃ হাঃ...

মিত্রকে গড়িয়াহাটায় ছেড়ে দিয়ে ঘরের দিকে ফিরল শ্যাম। দূর থেকেই দেখল বাসার সামনে রাস্তার ফুটপা'থে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তার টাইয়ের 'নট' ঢিলে হয়ে গেছে, রাস্তার মৃদু আলোতে তার মুখটা লাল আর চোখ দু'টো হতভম্ব দেখায়।

ওঃ শ্যাম! অরুণ সামান্য টলমলে পায়ে এগিয়ে আসে, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোকা-হাসি হাসে, তোর সঙ্গে কথা আছে...

শ্যাম তার হাত ছোঁয় না। দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকে দেখে। নিজের ভিতরে শীতল এক নিষ্ঠুরতাকে অনুভব করে সে। ঠান্ডা গলায় বলে, আয়।

হুইস্কির চেনা গন্ধ পায় শ্যাম। সামান্য অস্থির পায়ে অরুণ তার পিছনে হেঁটে আসে। আসতে আসতে কথা বলে, ওঃ, শ্যাম, আমার বড় কষ্ট রে। আমি আর পারছি না রে।

হুইস্কির চেনা গন্ধ— বহু দূর অতীত থেকে ওই গন্ধ ভেসে আসছে। স্বাদ ভুলে গেছে শ্যাম। ভাবতে ভাবতে সে সিঁড়ি ভাঙে। পিছনে অরুণ।

ঘরে ঢুকে অরুণ হাঁফায়, বিছানায় বসে পড়ে, তারপর বালিশ টেনে নিয়ে আধশোয়া হয়। তার সুটের ভাঁজ নষ্ট হচ্ছে, সেদিকে তবু খেয়াল করে না অরুণ। বলে, তুই দেখেছিস। তুই সব দেখে বুঝে নিয়েছিস শালা...তোকে আমি...বলতে বলতে আবার দৃষ্টি শূন্য হয়ে যায় অরুণের। হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

শ্যাম তার চেয়ার জানালার কাছে টেনে আনে, তার ওপর একখানা পা তুলে দিয়ে দাঁড়ায়। অরুণকে দেখে।

কী বলছিল তা ভুলে গিয়ে অরুণ বলল, ওঃ তোকে আমার শ্বশুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, না? তোর হয়ে যাবে শ্যাম, তুই ভাবিস না। আমি বাইরে যাওয়ার আগে তোকে বসিয়ে দিয়ে যাব। বোকার মতো অর্থহীন হাসি হাসে অরুণ, আমি অনেক কিছু পারি, জানিস! আমি শালা অনেক কিছু...ধীরে ধীরে চোখ বোজে অরুণ। বমি করার আগের মুহূর্তের মতো শরীর কেঁপে ওঠে তার, চোখ ঠিকরে ওঠে, মুখ লাল। আবার সামলে যায় অরুণ। হাঁফায়। বলে, তবু কী বলব, ওই বুড়োটাকে আমি ভয় পাই, ওই শালা বুড়ো আমার সবকিছু হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আছে, ইচ্ছে করলে ও আমায় বাঁদরনাচ নাচাতে পারে, শালা হারামির বাচ্চা...বলতে বলতে আবার বমির ভাব সামলে নেয় অরুণ— আমার পিছনে লোক লাগিয়েছে শালা, শাসিয়েছে দরকার হলে আমাকে গুণ্ডা দিয়ে মারবে...

কে! শ্যাম ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করে।

আমার বউয়ের বাপ। শালা শ্বশুর...শালা একটা সুন্দর মেয়ের জন্ম দিতে পারেনি মাইরি, তবু শালা শ্বশুর! আমার শ্বশুর!...তুই ভাবতে পারবি না শ্যাম, আমার বউটা কী কুচ্ছিত, ঘর অন্ধকার করে দেওয়ার চেহারা!...তবু আমাকে ইন টাইম ঘরে ফিরতে হবে শালা, না হলে আমি চরিত্রহীন!...আমার বউটাকে যদি তুই দেখতিস শ্যাম! ও যদি অ্যাডালটারি করতে চায় শেয়ালেও ছোঁবে না ওকে...বলতে বলতে বিছানা থেকে মুখ বের করে মাথা নামায় অরুণ। সমস্ত শরীরে হেঁচকি তোলার মতো কাঁপুনি। শ্যাম লক্ষ করে, ঘোলা জলের স্রোত অরুণের মুখ থেকে কলের জলের মতো ধারায় নেমে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার ঘরের মেঝে। মুহূর্তেই হুইস্কি আর টক বমির গন্ধে ঘর ভরে যায়। বিষিয়ে ওঠে বাতাস। শ্যাম তবু একটুও নড়ে না। পাথরের চাঙড়ের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থেকে অরুণকে লক্ষ করে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে অরুণ। কোনও দ্বিধা না করে শ্যামের বালিশ থেকে ময়লা তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মুখ মোছে, আবার সেটা বালিশে পেতে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারপর অধৈর্য ক্লান্ত একটা হাত বাড়িয়ে বলে, সিগারেট!

শ্যাম তার সস্তা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বিছানায় ছুড়ে দেয়। অনেক কষ্টে সিগারেট ধরায় অরুণ, আগুনের ফুলকি ঠিকরে পড়ে বিছানায়।

আমার শরীরে শালা চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু শালা আমাকে ইন টাইম ঘরে ফিরতে হবে, তারপর ওই কুচ্ছিত বউটা...মাইরি, একটু লাবণ্য নেই, ডায়েট কন্ট্রোল না করেও এমন হাড়গিলে...ওঃ অ্যামেরিকা...

বালিশে মাথা গুঁজে দেয় অরুণ। কিছুক্ষণ যেন স্বপ্নের ঘোরে একটু হাসে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তোলে আবার। অপরিচিতের চোখে শ্যামের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়, শ্যাম!

তারপর কথা ভুলে গিয়ে আবার হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

তুই জানিস না শ্যাম, আমার পিছনে লোক লেগে আছে। কিছুতেই সেই লোককে ধরতে পারছি না। আমার সব খবর সে দিয়ে দিচ্ছে শালা বুড়োকে। আমি রেস্তরাঁর পর রেস্তরাঁ পালটাচ্ছি, কত গলিঘুঁজিতে চলে যাচ্ছি মেয়েছেলে নিয়ে, কত অচেনা জায়গায় যাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই পালাতে পারছি না, লুকিয়ে থাকতে পারছি না। বুড়ো আমাকে দাঁড় করিয়ে আমার সারাদিনের সব গোপন রিপোর্ট আমাকেই শুনিয়ে দিচ্ছে।...মাইরি, তারপর চাকরবাকরের মতো ট্রিট করছে, বাচ্চা ছেলের মতো ধমকাচ্ছে...। কী করে যে খবর পাচ্ছে...

তারপর হঠাৎ হাসে অরুণ, দাঁড়া শালা, একবারই আমি শালা পালাব, ভিসাটা হাতে পাই, তারপর জেটইওর ওয়ে টু অ্যামেরিকা...ভোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ...

যে-হাতে এরোপ্লেনের ভঙ্গি করে দেখাল অরুণ, সেই হাতটাই হঠাৎ মুঠো পাকিয়ে চাপা গলায় বলল, কিন্তু কে খবর দিচ্ছে! আমি শালা কিছুতেই ধরতে পারছি না, কে!...রাস্তায় হাঁটি, রেস্তরাঁয় বসি, বারে যাই, কিন্তু সবসময়ে আমার ঘাড় সুড় সুড় করে, পিঠের চামড়ায় যেন কার চোখ টের পাই। সবসময়ে ভয়-ভয়, চিন্তা, টেনশন! কে খবর দিচ্ছে! কে!

বাতাসে শূন্য চোখে চেয়ে অরুণ জিজ্ঞেস করে, কে! তারপর আবার ককিয়ে ওঠে, তুই জানিস না

শ্যাম, অ্যামেরিকা যাওয়ার মাঝপথ থেকে ওই বুড়ো আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। ইচ্ছে করলে তছনছ করে দিতে পারে আমার ক্যারিয়ার, যখন খুশি ভয় দেখাতে পারে আমাকে...মেয়ের নামে তিনটে বাড়ি দিয়েছে শালা, দু'লাখ টাকা। আমি শালা বড়লোক। কিন্তু সব কেড়েকুড়ে নিতে পারে আবার। ইচ্ছে করলে...ইচ্ছে করলে আমাকে হাওয়া করে দিতে পারে...অথচ আমার শরীরে চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা সুন্দর মেয়ের জন্য...একটা সুন্দর কিছুর জন্য...আমি শালা...

আস্তে আস্তে চোখের জল ঝরে পড়ে অরুণের। কোনও শব্দ হয় না, শুধু ঠোঁট দু'টো কাঁপে। শ্যাম স্থির দাঁড়িয়ে দেখে। আস্তে আস্তে শ্যামের দিকে তাকায় অরুণ, ফোঁপানো গলায় বলে, তুই আজ আমাকে দেখেছিস!

শ্যাম মাথা নাড়ে। হ্যাঁ।

অরুণ বলে, তোকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলুম। বলে অস্বস্তির হাসি হাসল, অনেক দিন তোর খোঁজখবর রাখিনি, জানি না সত্যিই এখন কী করছিস। সেদিন তোর সঙ্গে দেখা হলে অনেক কথা বলে দিয়েছিলুম। আজ তাই হঠাৎ তোকে দেখে কেমন যেন মনে হল তুই-ই আমার শ্বশুরের সেই লোক। বলে হাসে অরুণ, তোকে পাকা মস্তানের মতো দেখাচ্ছিল।

উত্তর দেয় না শ্যাম। স্থির দাঁড়িয়ে অরুণকে দেখে।

আস্তে আস্তে অরুণের মুখ থেকে হাসি সরে যায়। ভিখিরির মতো গলায় সে বলে, আমি তোর জন্য সব করব শ্যাম। আমি অনেক কিছু পারি। আমি শালা পালাতে চাই। একবার যেতে পারলে আমি আর ফিরব না।...ওই কুচ্ছিত বউ, ওই হারামি বুড়ো আর এই ভিখিরির দেশ ছেড়ে পালাতে পারলে শালা...আবার আমি বড়লোক হয়ে যাব। বলে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকায় অরুণ, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে, আমার এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। এখনও আমার বয়স আছে...কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে শ্যাম, যদি তুই একবার ফোন তুলে বুড়োকে বলে দিস যে, আমি আজ লীলার সঙ্গে ছিলুম বিকেলে...

হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ওঠে বিদ্যুৎ। হরিণ দৌড়োয়। আর কালো একটা রেলগাড়ি লম্বা একটা রেল পুল পেরিয়ে যেতে থাকে।

ধীর শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করে, তুই লীলাকে কখনও ছুঁয়েছিস?

অ্যাঁ! বলে অরুণ অর্থহীন চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দুঃখে মাথা নাড়ে, না। তারপর বদমাশের মতো হাসে, সি ইজ ইন লাভ। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলেছিলুম, না? করবি আলাপ?

শ্যাম আবার বলে, আজ বিকেলে কী কী হয়েছিল?

নাথিং। হাসে অরুণ, আমরা ভাইবোনের মতো ছিলুম। বলে বড় করে শ্বাস ছাড়ে অরুণ, আজই প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বললুম, ভিড় ছেড়ে একটু নির্জনে চলো। বলল, না। বললুম, একটু ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াই চলো। বলল, না। জিজ্ঞেস করলুম, রাত্রে একা একা লাগে না? ভীষণ রেগে গেল— বলতে বলতে অরুণ হেঁচকি তুলে হেসে উঠল, আসলে মেয়েটা একেবারে বাচ্চা, আর নতুন। তার ওপর বোধ হয় এনগেজড। তবু আমি অম্বিকা হালদারের জামাই, আমাকে এড়াতে পারে না বলে এসেছিল— বলতে বলতে সামান্য অহঙ্কারী হয়ে গেল অরুণের মুখ-চোখ! হেসে বলল, দূর শালা, এর চেয়ে মিস দত্ত অনেক হট ছিল। কী বাটক মাইরি...

আস্তে আস্তে উঠে মেঝেতে নিজের বমির ওপর দাঁড়াল অরুণ। বলল, শ্যাম, আমার দিব্যি মাইরি, বুড়ো যদি জানতে পারে...তোর শালা চোখ বটে! কী করে খুঁজে খুঁজে ওই রেস্তরাঁয় বের করলি আমাকে? নাকি শালা তুই সারাদিন আমার পিছনে লেগেছিলি! অ্যাঁ?

শ্যাম চুপচাপ চেয়ে থাকে। না, তাকে আর কিছুই করতে হবে না। সে বুঝে যায় অরুণকে কষ্ট দেওয়ার ভার অরুণই নিয়েছে।

অরুণ তার বমির ওপর একবার পা হড়কায়, সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজার কাছে চলে যায়। হাত তোলে। হেসে বলে, টু অ্যামেরিকা...! চলে যায়। দরজা পর্যন্ত মেঝেতে তার বমিতে ভেজা পায়ের ছাপ পড়ে থাকে।

শ্যাম জানালা দিয়ে দেখে অরুণ রাস্তার ধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একখানা হাত শূন্যে তুলে অদৃশ্য ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করছে।

সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অরুণ ঠিক পৌঁছে যাবে— শ্যাম জানে। কাল সকালে আজকের কথা মনে থাকবে না অরুণের। প্রতিদিনই ওইভাবে আগের দিনের কথা ভুলে যেতে যেতে ঠিকঠাক মতোই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাবে অরুণ। ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে অর্থহীন হাসল শ্যাম।

অনেক দিন পর তার ইচ্ছে করল ঘরটাকে একটু সাজায়।

## ॥ তেরো ॥

হ্যাঁ। আজকের কাগজে খবরটা আছে। ঠিক বোঝা যায় না, তবু বোধহয় এটাই সেই খবর।

প্রথমে কিছুক্ষণ নিজের চোখ, বোধশক্তি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্বাস হয় না শ্যামের। তারপর আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারে ঘটনাটা বোধহয় ঘটে গেছে। সত্যিই। কিছুকাল আগে দক্ষিণ কলকাতায় এক মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত শ্রীগৌর ভৌমিক (৩২) গতকাল দুপুরবেলা শুকলাল কারনানি হাসপাতালে মারা গেছে। দুর্ঘটনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল না। মৃত্যুর দু' বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিল এবং তার একটি শিশুকন্যা আছে। আছে বাবা মা এবং তিন ভাইবোন। লোকটা খুব অখ্যাত ছিল না, রেডিয়োতে গান গাইত এবং তার দু'টি রেকর্ডও আছে। যদিও গান শোনেনি শ্যাম, এবং লোকটার নামও তার জানা ছিল না।

এই সেই লোক কি না কে জানে! শ্যাম জানে না। আস্তে আস্তে খবরের কাগজটা সে মাটিতে রেখে দিল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরায়। আজও সেই রকম রোদ, অবিকল তেইশে ডিসেম্বরের মতো। ওই সেই রাস্তার তে-মাথার বাঁক। লোকটা ডান দিকে মোড় ঘুরতে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় আছড়ে পড়েছিল। গৌর ভৌমিক! গান গাইত! একটি শিশু মেয়ে আছে তার! আছে বউ! আছে বাবা মা ভাইবোন! আশ্চর্য, এত সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা ছিল লোকটা! অথচ শ্যাম টেরও পায়নি। সে শুধু দেখেছিল একটা মোটর-সাইকেলের কালো ভোঁতা মুখ, আর অচেনা একটা মানুষের ছুটন্ত শরীর। কে জানত যে লোকটার অত পরিচয় আছে!

তবু এই সেই লোক কি না কে জানে! শ্যাম জানে না। যদি এই সেই লোক হয়ে থাকে তবে শ্যাম এ-জন্মের মতো বেঁচে গেল। কোনও দিনই অকারণে আয়নার আলো ফেলার জন্য কেউ তাকে দায়ী করবে না। সমস্ত প্রমাণ লোপ পেল, গোপন রইল কারণ। শুধু জানা গেল যে লোকটা মারা গেছে।

অনেক দিন হয় আর আয়না দেখেনি শ্যাম। তাকের ওপর থেকে আয়নাটা তুলে নিতে গিয়ে দেখল অনেক ধুলো জমে আছে। নিজের আবছা অলীক এক মুখচ্ছবির দিকে সে একটু তাকিয়ে রইল। বলল, আমি নই। তারপর মাথা নেড়ে নিজের প্রতিচ্ছবিকে বলল, তুমি! তুমি করেছিলে! তারপর হাসল শ্যাম।

না। তোমাকে চিনি না। শ্যাম বলল।

ময়লা এন্ডির চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল শ্যাম। সাবধানে তালা দিল ঘরে। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল। এসে বসল সেই ছোট্ট নির্জন চায়ের দোকানটায়। এক কাপ চা নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে সে বাচ্চা বয়টাকে ডেকে আর-এক কাপ চা দিতে বলল। চা দিয়ে গেলে সে চায়ের কাপটা উলটো দিকের শূন্য চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপর রাখে, ছাইদানিটা বসায় চায়ের কাপটার পাশে, একটা সিগারেট ধরিয়ে যত্নে রাখে ছাইদানিটার ওপর। বাচ্চা বয়টা চোখ গোল করে এই দৃশ্য দেখে, দোকানের বুড়ো মালিক তাকে লক্ষ করে, দু'টি ছোকরা খদ্দের কথা থামিয়ে চেয়ে থাকে। শ্যাম লক্ষও করে না তাদের। শূন্য চেয়ারটার সামনে টেবিলের ওপর নিঃশব্দে পুড়তে থাকে একটি আস্ত সিগারেট, ধোঁয়া উঠে উঠে ঠান্ডা হয়ে আসে এক কাপ চা। মনে মনে নত হয়ে কথা বলে শ্যাম, গৌর ভৌমিক, যদি পারো তবে আবার জন্ম নিয়ো। আমি জানি, আবার জন্ম নেওয়া বড় সহজ হবে না। শূন্য থেকে, জল থেকে, বাতাস থেকে, মাটি থেকে আবার নিজের শরীর সংগ্রহ করে আনা, এবং তারপরও আবার ভুল, কেবল ভুল জীবন যাপন করে যাওয়া...তবু বড় ইচ্ছে হয় আর-একবার, আরও-একবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে...গৌর ভৌমিক হয় না! যদি পারো আরও-একবার জন্ম নিয়ো, ততদিনে আমি পৃথিবীকে সুন্দর করে দেব, তুমি নিরাপদে পেরিয়ে যাবে, রাস্তার প্রতিটি বাঁক

ঝড়ের বেগে পার হবে...লীলার কোলে শিশু হয়ে এসো, আমি যত্নে তোমাকে বড় করে তুলব...

তারপর সে ওঠে। দু'কাপ চায়ের দাম দিয়ে দেয়। বেরিয়ে পড়ে। তুমি ছেলে ছিলে, তুমি স্বামী ছিলে, তুমি ছিলে বাবা। তুমি এত কিছু ছিলে কেউ জানতই না। আবার দেখো, তুমিই উড়ন্ত মোটর-সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না।...গৌর ভৌমিক, আমার ওপরওয়ালা বাসটার্ড বলে গাল না দিলে আমি কি চাকরি ছাড়তুম? চাকরি না ছাড়লে আমি খেলার ছলে তোমার মুখে ফেলতুম আয়নার আলো? দেখো, এ-সবকিছুই একটি রহস্যময় কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। তুমি কাকে দায়ী করবে? এই দু'হাত শূন্যে তুলে ধরে বলছি আমি দায়ী নই। আবার দেখো মাথা নিচু করে আমিই স্বীকার করছি, আমি দায়ী। তুমি কাকে দায়ী করবে? মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের ঘোরে আমি ডাক দিয়ে উঠি, শ্যাম! আবার নিজেই উত্তর দিই, যাই। নিজের সঙ্গে সব বোঝাপড়া আমার শেষ হয়নি। এখনও আমার ভিতরে রয়েছে একজন অচেনা শ্যাম।...না, পৃথিবী এখনও তেমন সুন্দর নয়, তবু আমি অপেক্ষায় আছি...জন্ম নাও, আর-একবার জন্ম নাও, আমাদের কাছে এসো...

অনেকক্ষণ ধরে ধীরে হেঁটে হেঁটে বিচিত্র সব রাস্তার ভিতর দিয়ে চলে গেল শ্যাম। কখনও মাথার ভিতরে, কখনও বুকের ভিতরে ভ্রমরের গুনগুন শব্দের মতো গভীর থেকে গভীরে চলে গেল একটি মোটর-সাইকেলের শব্দ। মাঝে মাঝে চমকে উঠল শ্যাম। নিজেকে ডেকে বলল, তুমিও...তুমিও উড়ন্ত মোটর-সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না...

না, তা নয়। শ্যাম জানে। সে শ্যাম চক্রবর্তী, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী, বিক্রমপুরের বানিখাড়া গ্রামে তার দেশ, সে ছিল সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের ছোটসাহেব। এ-সব কিছুর মধ্যে সে বাঁধা আছে। অথচ সে জানে না সে কে! কিংবা সে কীরকম!

## ॥ চোদ্দো ॥

তালু শুকনো। অল্প একটু মাথা ধরা আর সামান্য পিপাসা টের পাচ্ছিল শ্যাম। তার জ্বর আসছে। দুপুরে স্নান করার সময় তার গা শিরশির করছিল। তবু তার মনে হয়েছিল যে যথেষ্ট ঠান্ডা হচ্ছে না তার গা। শরীরেও অনেক ময়লা জমে আছে। তোয়ালে ঘষে সারা শরীরের ময়লা তোলার চেষ্টা করেছিল সে, তারপর অনেক জল ঢেলেছিল। তেল-না-দেওয়া রুক্ষ শরীর শীতে ফেটে-ফুটে গেছে, সেইসব ফাটা জায়গায় ঠান্ডা জল ঢুকে রি-রি করে কাঁপছিল সে। কান কনকন করে উঠল, ঠান্ডায় মাথা ধরে গেল, দাঁত ব্যথা করে উঠল। তবুও সে অনেক, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিল আজ। তারপর ময়লা এন্ডির চাদরটা গায়ে দিয়ে যখন সে হোটেলে বেরোচ্ছিল তখন থিরথির করে তার শরীর কাঁপছে, চোখে জ্বালা-জ্বালা ভাব এবং মনে সন্দেহ যে শরীর যথেষ্ট পরিষ্কার হয়নি। এখনও ময়লা রয়ে গেছে। আরও অনেকবার অনেকক্ষণ ধরে তার স্নান করা দরকার।

ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই সে টের পেল ঘূর্ণি ঝড়ের মতো শরীরের ভিতর থেকে বমি উলটে আসছে। টেবিলে ভর রেখে চিনেমাটির প্লেটের ওপর সে মুখ নিচু করে রইল অনেকক্ষণ। তার মুখ থেকে বেয়ে লালা নেমে যাচ্ছিল প্লেটের ওপর। কেউ দেখে ফেলার আগেই সে রুমালে ঢেকে নিল মুখ। তারপর মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। অস্পষ্ট গলায় আধঘুমন্ত ম্যানেজারকে বলল, খাবারটা কুকুরকে দিয়ে দেবেন।

কী হল?

শরীর ভাল নেই।

বেরিয়ে এসে পানের দোকান থেকে নুন, মশলা আর লেবুর রস দেওয়া একটা সোডা খেল সে, আর দু'টো মাথা ধরার বড়ি। জিভে কোনও স্বাদ নেই। তার জ্বর আসছে। হয়তো খুব অসুখ হবে তার। অনেক দিন সে তার শরীরের যত্ন নেয়নি, অনেক দিন ভাল করে লক্ষ করেনি নিজেকে। তাকে অন্যমনস্ক রেখে অনেক দিন ধরে তার শরীর অসুখ তৈরি করেছে। কে জানে, হয়তো এবার বহুকাল তাকে শুয়ে থাকতে হবে ঘরে কিংবা হাসপাতালে।

ধীরে ধীরে হাঁটছিল শ্যাম। অকারণে তার কেবল মনে হচ্ছিল, অসুখটা এসে পড়ার আগে কোনও একটা কাজ তার শেষ করার আছে। শরীর কাঁপছে তার। মনের ভিতরেও একটা তাড়াহুড়োর ভাব, যেন বৃষ্টি আসছে— তার আগেই উঠোন থেকে তুলে আনতে হবে রোদে দেওয়া কাপড়চোপড় কিংবা ডালের বড়ি। কিংবা ট্রেন ছাড়ার ঘন্টি বাজছে, সময় নেই, ছাড়ার আগেই তাই বিদায় দিতে আসা মানুষকে কয়েকটা জরুরি কথা বলে যাওয়া দরকার। আমার ঘরদোর সামলে রেখো, আমার পোষা পাখিকে দিয়ো দানা আর জল, দেখো যেন চুরি না হয়, আমি ফিরে আসার আগেই যেন বিদায় না নেয় আমার কোনও প্রিয়জন, আমার সুন্দর বাগানে যেন না ঢোকে গোরু-ছাগল, আমার নিজের হাতে লাগানো গাছগুলি যেন উড়ে না যায় বৈশাখের ঝড়ে।

এইসব অর্থহীন কথা সে বিড় বিড় করে বলছিল। ঠিক জানে না শ্যাম, কিন্তু কেবলই মনে হয় ও-রকমই জরুরি কিছু কথা কাউকে তার বলে নেওয়ার আছে। কাকে! ভেবেও পেল না শ্যাম। তার চারপাশে বেলুনের মতো শূন্যে মানুষেরা হাঁটছে— তার নিতান্তই অপরিচিত এইসব মানুষ। এদের কাউকে কি?

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। না।

শেষ দুপুরে যখন রোদে পাকা ধানের মতো রং ধরেছে তখন সে এসে তার চেনা থামটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কাচের দরজাটার মুখোমুখি। আস্তে আস্তে হাঁফাতে লাগল। চেয়ে দেখল হঠাৎ বড় ঘোলাটে হয়ে গেছে কাচ, ভিতরটা প্রায় দেখাই যায় না। বিরক্ত হল শ্যাম— এরা কাজে বড় ফাঁকি দেয়, কাচের পাল্লাটা রোজ ধোয়া-মোছা করা উচিত। তার ইচ্ছে করছিল, ভিতরে গিয়ে কথাটা ওপরওয়ালাদের বলে আসে, আপনাদের কাচের দরজাটা নোংরা হয়ে আছে। ওটাকে পরিষ্কার করে দিন।

কিন্তু শ্যাম নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। সে তার সমস্ত মন এবং হৃদয় দিয়ে কাচের সেই অস্বচ্ছতা ভেদ করার চেষ্টা করছিল।

চারদিকে ছায়ার মতো অলীক লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। কেউ টেরও পাচ্ছে না তাদের চেনা এই চতুর্দিক রাস্তাঘাট বাড়িঘর ভেদ করে একে একে হেঁটে আসছে মায়াবী হরিণেরা। তাদের মৃদু খুরের শব্দ বেজে যাচ্ছে। আর মেঘ ডেকে উঠছে শরীরের ভিতরে, বৃষ্টি নামছে, সেই বৃষ্টির জলের মতো ভালবাসায় টলটল করে ভরে আসছে বুক, বহু দূরে অচেনা এক রেল পুল পেরিয়ে যাচ্ছে কালো একটা রেলগাড়ি।

স্পষ্ট দেখতে পায় না শ্যাম, তার কেবল মনে হয় ভিড় থেকে খুব লম্বা কালো চেহারার একটা লোক বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। বড় নিষ্ঠুর তার মুখ, বড় দয়াহীন। সামান্য চমকে ওঠে শ্যাম— মিনু না!

লোকটা স্থির চোখে দেখে তাকে। তার ঠোঁট নড়ছে, কথা বলছে সে। স্পষ্ট বুঝতে পারে না শ্যাম, তার মনে হয় মিনু তাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কে? কী চাও?

আমি! শ্যাম প্রাণপণে বলে, মিনু! আমি শ্যাম! শ্যাম চক্রবর্তী, বানিখাড়া গ্রামের কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমার বাবা...আর তুই মিনু, নারায়ণগঞ্জের মিনু...না?

কাচের দরজাটা আড়াল করে লোকটা দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড দেখায় তার চেহারা, তার ঠোঁট আবার নড়ে উঠল। শ্যাম বুঝল মিনু বলছে, তোমাকে চিনি না। পরমুহূর্তেই ঝলসে উঠল লোকটার ডান হাত, শ্যাম দেখল সেই হাতে উকোর মতো দেখতে একটা লোহার পাঞ্চ। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল সেই হাতখানা। অসহায় শ্যাম তা আটকাবার কোনও চেষ্টাই করল না। কোথায় তার লাগল তা বুঝতে পারল না সে। শুধু টের পায় মসৃণ থামের গা বেয়ে তার অবশ শরীর ফুটপাথে নেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে উঠে বসবার চেষ্টা করে, দেখতে পায় দু'খানা খুঁটির মতো পায়ে লোকটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে উঠতেই হকি বুটের একটা লাথি এসে বসে গেল তার পেটে। পলকে সমস্ত শরীর থেকে বমি উলটে এল, কলকল করে তার বিস্বাদ জিভ অতিক্রম করে টক-তেতো জলের ধারা নামল। ভিজে গেল বুক। অদ্ভুত হালকা লাগল তার বুক— অনেক দিন ধরে এই বমিটা তার ভিতরে জমে ছিল। আবার উঠবার চেষ্টা করে শ্যাম। কিন্তু তাকে আর উঠতে হয় না। লোকটা বাঁ হাত বাড়িয়ে গলার কাছে তার চাদরটা

মুঠো করে ধরে, তারপর টেনে তুলে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। আবার ঝলসে ওঠে তার ডান হাত, হাতে উকোর মতো দেখতে সেই পাঞ্চ। হাতখানা ছুটে আসে। মৃদু হাসে শ্যাম। বাধা দেয় না। ঘুষির জোরে টলে ওঠে তার মাথা, ঝনন করে ঠুকে যায় পিছনের থামে। আশ্চর্য! শ্যামের বড় ভাল লাগল। টলে পড়তে পড়তে সে লোকটার চাদর-ধরা-হাতে আটকে থেকে বিড়বিড় করে, কেন মারছিস মিনু? কেন মারছিস! আমি এখানে এসে লীলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি বলে? নাকি অনেক দিন আগে আমি একজনের মুখে আয়নার আলো ফেলেছিলুম বলে?...আঃ, যে-কারণেই হোক...থামিস না মিনু...সাবাস!

সে শুনতে পায় মিনু বলছে, শুয়োরের বাচ্চা, বেজন্মা...

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। আমি শ্যাম চক্রবর্তী, কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমার বাবা, বিক্রমপুরে বানিখাড়া গ্রামে আমার দেশ...

সে দেখতে পায় পানা পুকুর, ঘাটে যাওয়ার পথ, কামরাঙা গাছ আর কুয়োপাড়ের আতাবনে চকচক করছে জোনাকি পোকা, আর প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো করে বসে মা হঠাৎ বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে মৃদু স্বরে ডাকছে, মনু...মনু রে... অ মনু...মনু।...

চারদিক থেকে ছুটে আসছে লোক। লম্বা কালো চেহারার মিনু আঙুল তুলে তাকে শাসাল। ঠিক বুঝতে পারল না শ্যাম, মিনু কী বলছে, তবু সে মাথা নেড়ে বলবার চেষ্টা করল, ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

মিনু কাউকে কোনও জবাবদিহি করল না, নীরবে শেষবার শ্যামকে দেখে নিয়ে ভিড় ঠেলে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

আবার আস্তে আস্তে মিনুর হাত থেকে ছাড়া-পাওয়া তার শরীর মাটির দিকে নেমে যাচ্ছিল। কেন মিনু তাকে মারল তা বুঝল না শ্যাম। বুঝবার দরকারও ছিল না। শরীর ভরে আসছে জ্বর, সে কোনও ব্যথা-বেদনা টের পায় না, তার কেবল ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। চেয়ে দেখে, অচেনা অলীক ছায়ার মতো মানুষেরা তাকে ঘিরে জড়ো হচ্ছে। সে বিড় বিড় করে বলে, সরে যাও, ওই কাচের দরজাটা আড়াল কোরো না।

আশ্চর্য! ভিড় ভেদ করে সে কাচের দরজাটা দেখতে পায়। ছায়ার মতো লীলা এসে কাচের গায়ে মুখ রেখে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারে শ্যাম, লীলা আজ তার অপেক্ষায় ছিল। শ্যামের প্রিয় ছিল বাসন্তী রং। সেই রঙেরই শাড়ি পরেছে লীলা, শান্ত বিষণ্ণ তার চোখ, সমস্ত শরীরে মা হওয়ার আগের নম্রতা ফুটে আছে। চাপা কান্নায় লীলার ঠোঁট কাঁপছে কেন, এত নিষ্ঠুর কেন তোমরা! ও লোকটা আমার কোনও ক্ষতি করেনি কোনও দিন...

হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ছুটতে থাকে হরিণের পাল...তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ, সরল ও সুন্দর চোখের হরিণেরা ছুটে আসে দিগ্বিদিক জুড়ে...মেঘের দুপুরে অচেনা এক রেল পুল পার হতে থাকে কালো রেলগাড়ি...বৃষ্টির জলে ভরে ওঠে বুক...

অস্বচ্ছ চোখে ভিড়ের মধ্যে এক-আধটা চেনা মুখ খুঁজে বেড়ায় শ্যাম—আঃ সোনাকাকা! রাঙাপিসি! মানুমামা! আমি মনু, আমি তোমাদের মনু...জন্ম নেওয়া বড় কষ্টকর, তবু তোমাদের জন্যই এই দেখো আমি আর-একবার জন্ম নিচ্ছি...ভালবাসা যে কত কষ্টের তা জানে আমার মা, তবু আমি সেই কষ্ট বুকে করে নিলুম...শিগগিরই আমি সুসময় নিয়ে আসছি পৃথিবীতে...অপেক্ষা করো...

বড় মায়ায়, বড় ভালবাসায় ধুলোমাটির মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় শ্যাম।

# পারাপার

হাসপাতাল থেকে ললিতকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাত্র দু'টি লোক এসেছিল। বাড়িওয়ালার ছেলে শম্ভু, আর বহুকালের অভিন্নহৃদয় সেই তুলসী। ইচ্ছে করেই আর কাউকে ছাড়া পাওয়ার তারিখটা জানায়নি ললিত, জানালে হয়তো আরও কেউ কেউ আসত। কিন্তু ললিত ভেবে দেখেছে, এ-সময়টায় খুব বেশি লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া ভাল নয়। যদিও ডাক্তার তাকে কিছুই স্পষ্ট করে বলেনি, তবু সে জানে এটা ঠিক আরোগ্য নয়, খুবই সাময়িক এই ভাল হয়ে যাওয়া। এটা নিয়ে একটুও আনন্দ করার কিছু নেই।

পেটের ভিতরের পুরনো ব্যথাটা আর নেই, তবু বিছানা থেকে লিফট পর্যন্ত হেঁটে আসতে পেটের অপারেশনের কাটা জায়গাটায় টান লাগার একটা ব্যথা সে টের পাচ্ছিল। আসল ব্যথাটার তুলনায় এ-ব্যথাটা কিছুই নয়, তাই সে তুলসী কিংবা শম্ভুর কাঁধে ভর দিল না, আস্তে আস্তে একাই হেঁটে এল। লিফটে নেমে রাস্তা পর্যন্ত আসতে তার কষ্ট হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল পেটের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা ছেঁড়া নাড়ি দোল খাচ্ছে, ওই নাড়িটায় বোধহয় তার শরীরের কোনও যন্ত্র ছিল, যেটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সে অনেকদিন ধরে ভেবে এসেছে যে, বাইরে এলে লোকজনের চলাচল, ট্রাম-বাস আর খোলা আলো-বাতাসের মধ্যে হঠাৎ খুব ভাল লাগবে। তার শরীর আর মন জুড়ে পুরনো চেনা কলকাতা ঝমঝম করে বাজনার মতো বেজে উঠবে।

বস্তুত সে-রকম কিছুই ঘটল না। পড়ন্ত বেলার সূর্যের আলো তার চোখে এসে লাগল। ট্রাম-বাস লোকজনের ভিড় নিয়ে কলকাতা বয়ে যাচ্ছে ঠিকই, এবং ঝমঝম বাজনার মতোই শব্দ হচ্ছে চার দিকে। কিন্তু সে অনুভব করল তার শরীর নিস্তব্ধ, মনেও কোনও চঞ্চলতা নেই। হাতে চোখ আড়াল করে সে দেখল রাস্তার ও-পারে বড় কলেজ-বাড়িটার গায়ে লাল কালিতে লেখা পোস্টার, টেলিফোনের তারে কাক বসে আছে, সেই পুরনো ময়লা ঘিঞ্জি কলকাতা।

তুলসী একটু এগিয়ে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ট্যাক্সির জন্য, সামান্য হাঁফ ধরে গিয়েছিল, আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্টও হচ্ছিল বলে ললিত শম্ভুর কাঁধে একটু ভর দিয়ে হেলে দাঁড়াল। যদিও এখন শরৎকাল, তবু সে খুব ঘামছিল এখন। শম্ভু একটা হাত বাড়িয়ে পিঠের দিক দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। ললিতের মনেই হচ্ছিল না যে দু' মাস সে ঘরে বন্দি ছিল দু' মাস সে এইসব রাস্তাঘাট দেখেনি; বরং তার মনে হচ্ছিল, আজ সকালেই সে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে। এত চেনা সবকিছু, এত একঘেয়ে।

একমাত্র মায়ের জন্যই গত দু' মাস যাবৎ একটা দুশ্চিন্তা ছিল ললিতের। দু' মাসে মা মাত্র কয়েকবার দেখতে এসেছে তাকে। গত দু' মাস সে তুলসী কিংবা শম্ভু আসামাত্রই মায়ের কথা জিজ্ঞেস করত। আজ ভুল হয়ে গেছে। আজকের দিনটা অন্য রকমের বলেই এই ভুল। তবু তুলসী যখন চলতি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে বলল, আয় রে ললিত, তখন হঠাৎ সে খেয়াল করে শম্ভুকে প্রশ্ন করল, মা কেমন আছে রে?

শম্ভু হাসল, ভালই।

ভালই। ললিত 'ভালই' কথাটা নিয়ে মনে মনে সামান্য নাড়াচাড়া করতে করতে ট্যাক্সিতে উঠল। না, মা ভাল নেই, ভাল থাকার কথাও নয়। লাম্বাগো আর বাতে পঙ্গু মা ভাল করে হাঁটাচলাও করতে পারে না, প্রায় সময়েই হামাগুড়ি দিয়ে কাজকর্ম করে। মাকে ভাল রাখার চেষ্টা কোনও দিন তেমন করে করেওনি ললিত। একা একা মা'র সারাদিন কাটে, ললিত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এখন ট্যাক্সির সিটে এলিয়ে পড়ে থেকে সে মনে মনে ভাবল এবার থেকে সে মায়ের কাছে কাছে বেশি করে থাকবে।

তুলসীর দিকে মুখ ফিরিয়ে ললিত বলল, তোর কাছে সিগারেট নেই রে?

আছে। বলে তুলসী পকেটে হাত দিল। তারপর থেমে বলল, খাবি?

দে না।

একটু ভাবল তুলসী, তারপর সস্তা সিগারেটের প্যাকেটটা আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বলল, খা, কী আর হবে! সেরে যখন গেছিস...

শেষ কথাটা অনাবশ্যক। তাকে শুনিয়ে বলা। সিগারেট ধরাতে গিয়ে মৃদু একটু হাসল ললিত। মুখে কিছু বলল না সে, কিন্তু মনে মনে বলল, ক্যানসার সারে না রে তুলসী, ক'মাস পর হয়তো তোকে আমার খাটে কাঁধ দিতে হবে।

সিগারেটের স্বাদ ভুল হয়ে গেছে। ধোঁয়াটা কর্কশ আর গন্ধটা বিদ্‌ঘুটে লাগছিল ললিতের। সে দেখল সামনের সিটে শম্ভু বসে সোজা রাস্তায় তাকিয়ে আছে, তুলসীর মুখও বাইরের দিকে ফেরানো। দু'জনেই খুব গম্ভীর, চিন্তিত। এই গুমোটটা ভেঙে দেওয়ার জন্যই ললিত শম্ভুকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে শম্ভু, তুই জিমনাশিয়ামে এখনও যাচ্ছিস? শ্রী-ফ্রি একটা কিছু পেলি?

শম্ভু মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল, কিছু বলল না।

একাই কথা বলছিল ললিত। তুলসীকে ডেকে বলল, দেখ তুলসী, এই গরিব দেশে শম্ভুটা একাই চারজনের খোরাকি টেনে নিচ্ছে। সরকারের উচিত জিমনাশিয়ামগুলি বন্ধ করে দেওয়া। শম্ভুটা ফ্যানভাত, পালং সেদ্ধ, লাল আটার রুটি কত কিছু বায়নাক্কা যে শুরু করে সকাল থেকে রাত অবধি যে, ওর স্বাস্থ্যের ধাক্কায় বাড়িসুদ্ধ লোক রোগা হয়ে গেল। ওরে শম্ভু, মাসিমা এখনও তোর খাওয়া নিয়ে খিটখিট করে?

শম্ভু হাসিমুখ ফিরিয়ে বলল, এখন আর করছে না কিছুদিন। আমি সার্জেন্টের চাকরিতে সিলেক্টেড হয়ে আছি ক'দিন হল। এখন খাওয়াচ্ছে খুব।

হাসল ললিত। শম্ভু বেশ বুদ্ধি করে উত্তর দিয়েছে। কথা টেনে নিয়ে ললিত বলল, সার্জেন্ট! সেই লাল মোটর সাইকেল আর কোমরে পিস্তল! দূর, ওটা একটা চাকরিই নয়।

কেন?

কলকাতার সার্জেন্টগুলো কেবল রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করে বেড়ায়, আর কোনও কাজ নেই।

খোলা গলায় শম্ভু হাসছিল। আর তখন তুলসী একটা হাত বাড়িয়ে ললিতের হাতে রেখে চাপ দিয়ে বলল, তুই এত কথা বলিস না ললিত।

কেন?

তুলসী চুপ করে রইল। ওর মুখের রসকষহীন চিন্তার ভাবটুকু আড়চোখে দেখল ললিত। ডাক্তার সম্ভবত ওকে কিছু বলেছে। কী বলেছে তা ললিত ওর মুখের ভাবটুকু থেকে সহজেই আন্দাজ করতে পারছিল। আজকালকার বাচ্চা ছেলেরাও এ-রোগের পরিণাম জানে। তুলসী তাই অত গম্ভীর। এমনই দুশ্চিন্তা ওর যে, এখন যে ললিতকে ভুলিয়ে রাখা দরকার সে-কথাও ওর খেয়াল নেই. নইলে নিজের মুখে অন্তত নকল একটা খুশির ভাব ওর ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে ট্রাফিকের লাল আলোয় তাদের ট্যাক্সি থামাল। সামনে-পিছনে দু'টো ডবলডেকার আর পাশে একটা লরি এসে দাঁড়ানোয় হঠাৎ ট্যাক্সিটাকে খুব ছোট্ট আর অসহায় বলে মনে হচ্ছিল ললিতের। চার পাশের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে তাদের ট্যাক্সির ভিতরটাকে মুহূর্তের মধ্যে গুমোট করে দিল। ললিত মুখ বের করে ট্রাফিকের আলোর দিকে চেয়ে ছিল। বরাবর তার সবচেয়ে প্রিয় হল মাঝখানের ক্ষণস্থায়ী হলুদ বাতিটি, ঝলসে উঠলে নিজের শরীরের ভিতরে একটা গভীর অনুভূতি সে টের পায়। অনেকদিন সে বাতিটি দেখেনি ললিত।

শম্ভু পাঞ্জাবি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলছিল সে যেন সামনের ডবলডেকারটাকে পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে। ললিত হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বলল, না রে শম্ভু, গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরাতে বল।

কেন?

একটু ঘুরেফিরে যাই। অনেকদিন কলকাতা ভাল করে দেখা হয়নি। সর্দারজি, বাঁয়ে ঘোরো...

ট্যাক্সি বাঁ দিকে ঘুরল।

শম্ভু বলল, দূর। মিটার উঠবে।

তুলসী মুখ ফিরিয়ে বলল, উঠুক।

শম্ভুর দোষ নেই। শম্ভু বরাবর ট্যাক্সিকে সোজা পথেই নিয়ে যেতে শিখেছে। প্রয়োজনেই তাদের ট্যাক্সিতে চড়া, তাই চড়েও শান্তি থাকে না, উগ্র চোখে চেয়ে সতর্ক থাকতে হয় যাতে ড্রাইভার এতটুকু ঘুরপথে না নিয়ে যেতে পারে। তাই ললিত তুলসীর দিকে চেয়ে একটু হাসল।

তুলসী বুঝল কি না বলা যায় না। শুধু আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবি?

প্রশ্নটা ললিত শুনতেই পেল না। তুলসীর দিকে তাকিয়ে সে তুলসীর কথাই ভাবছিল। তার সন্দেহ হচ্ছিল যে তুলসী বোধহয় আর তার সমবয়স্ক বন্ধু নেই। গত দু' মাসে সে হয়ে গেছে অন্য সম্পর্কের মানুষ। ললিতের বাপ-কাকার মতো কেউ যদি জীবিত থাকত তবে এখন এ-অবস্থায় তাদের মুখের ভাব বোধহয় অনেকটা তুলসীর মতোই হত। তার অজান্তে কখন যেন তুলসী তার অভিভাবক হয়ে গেছে, সন্দেহ হয়, পুরনো বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্কটা আর কোনও দিন ফিরে আসবে কি না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সখেদে তুলসীকে ডেকে বলে, তুলসী, তোকে কী বলে ডাকব এখন বল তো! কাকু না জেঠু?

তুলসী কলকাতার বাইরে একটা স্কুলে চাকরি করে। রোজ যাতায়াত করতে হয়। তা ছাড়া ললিত হাসপাতালে থাকার সময়েই মাসখানেক আগে তুলসীর বিয়ে হয়ে গেল। এত সব ব্যস্ততা, বিয়ে, রোজ স্কুলে যাতায়াত সব সামলেও প্রায় রোজই তুলসী তার কাছে এসেছে। মাঝে মাঝে দেখাশোনা করেছে মায়ের। হাসপাতালে থাকার সময়ে তুলসীই ছিল তার সবচেয়ে বড় সহায়। সম্ভবত সেই সময়েই আস্তে আস্তে তাদের সম্পর্কটা পালটে গেছে। বস্তুত এখন তুলসীর মুখ দেখে, ওকে একবার 'শালা' বলে ডাকতে, কিংবা ওর বউ নিয়ে একটু রসিকতা করতে ইচ্ছে থাকলেও লজ্জা করছিল ললিতের।

কোথায় যাবি? তুলসী আবার জিজ্ঞেস করে।

বেশি দূর না। গড়িয়াহাটা হয়ে লেকের ধার ঘেঁষে সাদার্ন ' ভেনিউ ধরে ফিরে যাব।

শম্ভু মুখ ফিরিয়ে বলল, মাসিমা বসে আছে কিন্তু আপনার জ যত তাড়াতাড়ি পারি নিয়ে আসব বলে তাঁকে দরজায় বসিয়ে রেখে এসেছি। আপনি না গেলে মাসিমা দরজা ছেড়ে নড়বেন না।

শম্ভুর ভাঙাচোরা চৌকো শক্ত শিরা-ওঠা তেলতেলে মুখটার দিকে অলস চোখে চেয়ে হঠাৎ ললিতের ইচ্ছে করছিল বলে, মা আমার জন্য চিরকাল বসে আছে অপেক্ষায়, আমার জন্মেরও আগে থেকে। এই দেরিটুকু মা'র সইবে।

কিন্তু কথাটা খুব দার্শনিক হয়ে যাবে, শম্ভু মোটেই বুঝতে পারবে না বলে ললিত বলল না। কেবল ম্লান হাসল একটু। তারপর চোখ বুজল। তার ইচ্ছেমতো ট্যাক্সি চলতে লাগল।

মাঝে মাঝে চোখ খুলে ললিত দেখছিল ভিড়ের গড়িয়াহাটা ছাড়িয়ে গেল তার গাড়ি, লেক পার হল হু হু হাওয়ায় উড়ে, তারপর বাঁক নিল বাঁয়ে, মাথার ওপর দিয়ে টালিগঞ্জের রেলপোল চলে গেল, আনোয়ার শা রোড হয়ে এসে থামল তাদের সরু গলির মধ্যে বাসার সামনে।

তুলসী নেমে দরজা খুলে ধরে রইল। সামান্য অস্বস্তি বোধ করে ললিত। শালা তুলসীটা তাকে বাদের খাতায় ধরে নিয়েছে। দৃষ্টিকটু রকমের ভদ্রতা করে যাচ্ছে ও। তাই মাটিতে পা দিয়ে ললিত ইচ্ছে করেই খুব জোরে ঝপাং শব্দে ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করল।

উলটো দিকের বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে-থাকা রায়বাবু মুখের সামনে থেকে বইটা নামিয়ে ঝুঁকে বললেন, আরে, ললিত!

ললিত হাসল।

উনি বললেন, তুমি তো একদম ভাল হয়ে গেছ। স্বাস্থ্য ফিরে গেছে তোমার।

ললিত আবার হাসল।

রায়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, বাঃ! চমৎকার!

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার শব্দে সামনের ঘরের দরজা খুলে গিয়েছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু একটু হাসলেন শম্ভুর মা, এলে ললিত?

ললিত হাসল। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সামনের ঘরটায় অনেকজন মেয়ে-বউ। আর সেই

ভিড়ের মধ্যে মায়ের চশমার ঘোলা কাচ দু'টো ঝকমক করে উঠল। পাড়া-পড়শিরা মাকে ঘিরে বসে আছে।

এখন সামান্য একটু লজ্জা করছিল ললিতের। সামনের ঘরটা শম্ভুদের। তাদের ঘরটা পিছনের দিকে। এখন এই অন্যের ঘরে একগাদা চেনা আধচেনা মেয়ে-বউয়ের সামনে মা তাকে পেয়ে কী যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না ললিত। হয়তো জড়িয়ে ধরে কাঁদবে, হয়তো বিলাপ করবে।

খুবই সংকোচের সঙ্গে সে দরজায় উঠে দাঁড়িয়ে রইল। শম্ভুর মা ডাকলেন, ভিতরে এসো ললিত।

ললিত ঢুকল না। ঘরের ভিতরে বাস্তবিক জায়গা নেই। সামনেই ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে মা বসে আছে। তার চারধারে মেঝেতে এবং চৌকিতে পাঁচ-সাতজন মা'র বয়সিই প্রবীণ মহিলা। এঁরা কেউ কেউ সধবা। ললিত জানে এঁরাই মা'র অবসরের সঙ্গী, নিঃসঙ্গতার সহায়। সে যখন বাড়িতে থাকে না তখন এঁরাই আসেন যেচে। ললিত তাই নিশ্চিন্ত থাকে। আজও এঁরা এসেছেন তাকে দেখতে। সে কেমন ভাল হয়ে ফিরে এল।

ললিত মাকে দেখল। এক পলকেই বোঝা যায় মা'র চেহারা অনেক পালটে গেছে। এমন নয় যে, মা আরও রোগা কিংবা বুড়ো হয়ে গেছে। তা নয়। কিন্তু হঠাৎ মনে হয় যেন মা আরও বোকা হয়ে গেছে। মুখটা সামান্য খোলা, ভ্যাবলা একটা বোধবুদ্ধিহীন দৃষ্টি তার চোখে। নীচের ঠোঁটটা আবেগে সামান্য কাঁপছে। মা তার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল। হঠাৎ ধক করে উঠল ললিতের বুক, মা কি কিছু বুঝতে পারছে।

রোগা দু'টো হাতে চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে মা উঠবার জন্য চেষ্টা করছিল। একবার কোথাও বসলে মা আর সহজে দাঁড়াতে পারে না, কোমরে রস জমে যায়। শম্ভুর মা মা'র পাশে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন, দেখুন দিদি, ললিত কেমন সুন্দর চেহারা নিয়ে ফিরেছে!

সকলেই তাকে দেখছিল। ললিত অনুভব করে সকলের চোখেমুখেই একটা নিশ্চিন্ত ভাব। সন্দেহ হয় এরা কেউ ললিতের অসুখটার বিষয়ে ভাল করে কিছু জানে না। মাকেও জানানো হয়নি। জানালেও মা সঠিক বুঝতে পারত কি না কে জানে! মা শুধু জানে যে, তার গুরুতর একটা কোনও অসুখ করেছিল, এখন সেরে গেছে।

চশমা খুলে মা তার থানের আঁচল তুলে চোখের জল মুছছিল। দৃশ্যটা অনেকবার দেখা ললিতের। অনেক ছোটখাটো কারণেও মাকে অনেকবার কাঁদতে দেখেছে ললিত, কোনও দিনই সে মা'র কান্না দেখে খুব বিচলিত হয়নি। আজ কিন্তু সে তার বুকের মধ্যে গুরগুর শব্দে হৃৎপিণ্ডের ডেকে ওঠার শব্দ শুনল।

মায়ের কাছে যা ললিত। করুণাভরা গলায় এ-কথা বললেন মিতুর ঠাকুমা। মিতু— যার বিয়ে হয়ে গেছে বড় বাড়িতে, যাকে এক সময়ে ললিতের বড় পছন্দ ছিল। মিতুর ঠাকুমা থেকে আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে সবাইকে দেখছিল ললিত। এঁরা কেউ মিতুর ঠাকুমা, কেউ মুনুর পিসিমা, কেউ বীরুর মা। এ-সব সম্পর্কের ওপরেই এঁদের পরিচয় বেঁচে আছে, নাম ধরে ডাকার কেউ নেই। বেশির ভাগই বুড়ো অথর্ব অসহায়। এঁরা প্রাণভরে লোককে আশীর্বাদ করে, অভিশাপ দেয়। কোনওটাই শেষ পর্যন্ত ফলে না। এই অসহায়দের দলে মাকেই সবচেয়ে বেশি অসহায় বলে আজ মনে হচ্ছিল ললিতের। সে ছাড়া তার মায়ের আর কেউ নেই, তারও নেই মা ছাড়া আর কেউ। সে আজ মায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে মনে মনে সামান্য অস্থির হয়ে পড়ল।

ঘরের ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না ললিতের। ঘরের আবহাওয়াটা কেমন বুড়োটে, গুমোট হয়ে আছে। তা ছাড়া বাইরে তুলসী দাঁড়িয়ে আছে।

মায়ের কান্নাটা যে দুঃখের ছিল না এটা বুঝতে একটু সময় লাগল ললিতের। সুখে কখনও সে মাকে এর আগে কাঁদতে দেখেনি।

কষ্টেসৃষ্টে নড়বড়ে শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল মা, ফোকলা তোবড়ানো মুখে অদ্ভুত একটু হেসে সকলের দিকে চেয়ে অনুমতি ভিক্ষে করল, ললিতকে ঘরে নিয়ে যাই?

ললিত বুঝল ওই চাওয়াটুকুর মধ্য দিয়েই সকলের কাছ থেকে ললিতের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষে করে নিল। সকলেই সহৃদযভাবে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল মাকে। মিতুর ঠাকুমা মুখ বাড়িয়ে বলল, এবার ললিতের একটা বিয়ে দাও গো, ললিতের মা!

ললিত মায়ের কাঠের মতো শুকনো দুর্বল একখানা হাত ধরে সিঁড়িটা সাবধানে নামিয়ে আনল। নামতে নামতে মা মুখ ঘুরিয়ে মিতুর ঠাকুমাকে বলল, তোমরা আশীর্বাদ করো বাছা। ছেলেকে তো তোমরা জানই, আমি বুড়ো অথর্ব হয়ে গেছি, চোখে ভাল দেখি না, তোমরাই বেছেগুছে পছন্দ করে দাও।

সকলেই সমস্বরে কথা বলে উঠল। হ্যাঁ, তারা ললিতকে জানে, হ্যাঁ এমন ছেলে! তারা দেখবে ললিতের জন্য একটি মেয়ে। কোনও চিন্তা নেই। মিতুর ঠাকুমা গলা বাড়িয়ে বলল, ললিতের পছন্দের কেউ আছে কি না খোঁজ নিয়ো গো ললিতের মা!

ললিতের মন বলল, ছিল। মিতু। তার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

তুলসীর দিকে একখানা হাত বাড়াল মা, আঃ তুলসী, ললিতকে ফিরিয়ে এনেছিস।

শম্ভুদের বাড়ির পিছন দিকে তাদের ঘর, সরু একটা গলির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ঘরের তালা খুলতে খুলতে মা বলল, দেখ তুলসী, সারাদিন ঘর ছেড়ে নড়বার উপায় নেই আমার। ললিতটা বাইরে বাইরে ঘোরে, আর এই লক্ষ্মীছাড়া ঘর আগলে আমার থাকা। কত কিছু আছে কলকাতায়, কালীঘাট, রামকৃষ্ণের মঠ, ভাগবত রামায়ণ পাঠ। সবাই যায়, কেবল আমারই কিছু হয় না। বসে থাকতে থাকতে দেখ আমায় বাতে ধরেছে। তোরা মেয়ে দেখ, আমি ললিতের বিয়ে দিই...

শরীরে এত কষ্ট মা'র তবু তাদের ছোট ঘরখানা ঝকমক করে, ললিতের তক্তপোশে ধবধবে চাদর পাতা।

ললিত সামান্য হাঁপাচ্ছিল। বিছানায় বসতে-না-বসতেই সে গড়িয়ে পড়ল। বলল, মা, এক গ্লাস জল দাও।

দিই বলে মা তবু তুলসীর সঙ্গে কথা বলে, তুই রোজ এসে ওকে বোঝাবি। কেন, মাস্টাররা কি বিয়ে করে না? তুই করিসনি?

খোলা জানালার ওপর সতেজ একটা পেয়ারার ডাল এসে পড়েছে। সিলিঙে ঘুরছে কোন আদ্যিকালের পুরনো ফ্যানটা। দেয়ালে সেই সূর্যাস্ত আর তিনটে ডিঙি নৌকোর ছবিওলা ক্যালেন্ডার। আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইল ললিত।

আর মাস কয়েক পরে এই ঘরের এই বিছানায় শুয়ে তার মৃত্যু হতে পারে।

মায়ের কথাগুলো আর বুঝতে পারছিল না ললিত। কেবল তার একঘেয়ে গলার স্বর তার কানে আসছিল। অনেক অনেকদিন পরে আজ তার হঠাৎ মনে হল এই স্বর তার বড় প্রিয়। এই রকম আরও কত কী প্রিয় ছিল ললিতের। তার কোনওটা হয়তো বা ওই জানালার ওপর হেলে-পড়া পেয়ারার ডাল, কিংবা ওই সূর্যাস্তের ছবিটির মতোই তুচ্ছ।

কাত হয়ে শুয়ে সে মায়ের মুখখানা দেখছিল। দাঁত-পড়া, তোবড়ানো একখানা মুখ। বুড়ি। মাঝে মাঝে আঁচলে নাক মুছে নেওয়ার মুদ্রাদোষ। এই তার মা।

জল চেয়েছিল ললিত, মা জল দিতে ভুলে গেল। আর-একবার চাইতে ইচ্ছে হল না তার। কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে সামান্য তন্দ্রা আর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গেল সে।

মা তুলসীর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল। একটানা, একই রকম স্বরে। সে-সব কথা আর ললিতের কানে ঢুকছিল না। চোখের পাতা ভারী হয়ে পরস্পর মিতুর ঠোঁটের মতো লেগে রইল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত চেতনাই সজাগ ছিল তার। সে ভেবে দেখছিল আর কয়েকটা দিন একতলার এই ছোট্ট ঘরে, বুড়ো পঙ্গু অক্ষম মায়ের সঙ্গে তার কেমন কাটবে। সম্ভবত খুবই একা লাগবে তার। মাঝে মাঝে প্রবীণ মুখশ্রী নিয়ে চিন্তিত তুলসী আসবে অভিভাবকের মতো, ললিতের ঠাট্টার উত্তরে মৃদু ম্লান হাসবে, আড্ডা জমবে না। মা তুলসীকে টেনে নিয়ে যাবে রান্নাঘরের চৌকাঠ অবধি, পিঁড়ি পেতে বসিয়ে দুঃখ আর আক্ষেপের কথা বলে যাবে। একা লাগবে ললিতের। হয়তো সে মাঝে মাঝে বেরোবে পাড়ায়, দু'-একটা বাড়ি থেকে মায়ের প্রবীণ সঙ্গিনীরা ললিতকে ডাকবে, এসো, ললিত। ঘরে বসিয়ে তাকে শোনাবে তারই মায়ের দুঃখের কথা, বলবে, এত বড় ফাঁড়াটা কেটে গেল, এবার দেরি না করে বিয়ে করো ললিত, জীবনের সব কাজগুলোই করণীয়। কোনওটাই ফেলনা নয়। এ-সবই ললিত জানে।

কিংবা হয়তো সে গলির নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখবে বাচ্চা মেয়েরা রাস্তায় ছক কেটে এক্কা-দোক্কা খেলছে। তাদের কারও বেণি ধরে একটু টেনে দিয়ে ললিত বলবে, কেমন আছিস রে টগর? কিংবা পাড়ার ঘরোয়া চায়ের দোকানটাতে যাওয়া যেতে পারে— যেখানে তার বয়সি পাড়ার কয়েকজন আড্ডা দেয়। তারা কেউই ললিতের বন্ধু নয়, পরিচিত। তবু তাদের সঙ্গেও একটু সময় কেটে যাবে। স্কুল থেকে ছুটি নেওয়া আছে, তবু আর-একটু ভাল বোধ করলে সে স্কুলের কাজও শুরু করতে পারে। হয়তো আগের মতোই বিশ্রী লাগবে তার, তবু সময় কেটে যাবে। সময় তো এখন আর খুব বেশি নয়!

সে মা আর তুলসীর অস্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিল। চায়ের কাপে চামচ নাড়ার শব্দ। মা তুলসীকে চা করে খাওয়াচ্ছে। ললিত তাকাল না। তার চোখের দু'টি ভারী পাতা পরস্পরের সঙ্গে লেগে রইল। এ-কথা ঠিক যে, দু' মাস বাদে এই ফিরে আসার মধ্যে এতটুকু আনন্দ নেই। কিন্তু যদি মিতু তার বউ হত, তা হলে! ভাবতেই তার আনন্দের একটা স্রোত ললিতের শরীরকে নাড়া দিয়ে গেল। মিতু হলে— মিতু হলে— কিন্তু মিতু তো হল না ললিতের।

হওয়ার কথাও ছিল না। মিতুদের বড় বাড়ি, গেটের ওপর বোগেনভেলিয়ার ঝাড়, গ্যারেজে ছোট্ট একটা গাড়ি। বড় হতাশ লাগত ললিতের। মাঝে মাঝে মিতুর সঙ্গে দেখা হত স্কুলের রাস্তায়, আর ললিতের মনে হত সে এর জন্য সবকিছু করতে পারে। সবকিছু। দরকার হলে একটা-দু'টো খুন, বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে এক-আধটা বাড়ি, হাজারটা মারমুখো লোকের মুখোমুখি পারে দাঁড়াতে। আশ্চর্য, কোনও দিনই মিতুর সঙ্গে তবু কথা বলা হয়নি। বড় ভাল ছেলে ছিল ললিত— ধীর, শান্ত, লাজুক আর ভিতু। মিতুর সঙ্গে কথা বলার মতো পাপ সে করেনি। কেবল মিতুকে দেখলে তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠত, মুখের জল যেত শুকিয়ে, আর সারাটা অবসর সময় সে মনে মনে মিতুর সঙ্গ ধরত, ডাকত, বউ, আমার বউ।

মা তখনও মাঝে মাঝে তার বিয়ের কথা বলত— সেই বছর সাতেক আগেও। সে উত্তর দিত না, অন্যমনস্কের মতো মিতুর কথা ভাবত। মিতু হলে— মিতু হলে—

সম্ভবত মা কিছু টের পেয়েছিল। কীভাবে পেয়েছিল তা ললিত জানে না। হয়তো কেউ মাকে বলেছিল সকাল সাড়ে দশটায় স্কুলে যাওয়ার পথে ললিত হাঁ করে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, রাতে ঘুমের মধ্যে কোনও দিন সে মিতুর নাম ধরে ডেকেছিল, কিংবা বলেছিল যে, সে মিতুকে ভালবাসে। তখন জ্বরবিকারের মতো একটা অবস্থায় কী যে করেছিল ললিত কে জানে!

যেমন করেই হোক মা টের পেয়েছিল। মা ললিতকে কিছুই বলেনি। কিন্তু একদিন যখন ললিত ঘরে ছিল না তখন মা মিতুকে ডেকে এনেছিল ঘরে।

সেই ডেকে-আনার ফল ভাল হয়নি। যা ছিল তার মনের ব্যাপার, যা ছিল তার একার তা সমস্ত পাড়ায় বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে গেল। মা মিতুকে কী বলেছিল, তা ললিত জানে না। শুধু এটুকু জানে যে, মিতু রাজি হয়নি।

বোধ হয় খুবই রেগে গিয়েছিল মিতু, মাকে অপমান করে বলেছিল, আমাকে এভাবে ডেকে আনা আপনার উচিত হয়নি। বাবা শুনলে খুব রেগে যাবে।

তার বোকা, ললিত-সর্বস্ব মা হয়তো বলেছিল, কিন্তু আমার ললিতকে দেখ, কেমন হয়ে যাচ্ছে আমার তরতাজা ছেলে। তুই রাজি হয়ে যা মিতু, আমি তোর বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলব।

শুনে মিতু হয়তো খুব রেগে গিয়েছিল। কেননা, ছেলেবেলা থেকেই সে জানে যে, সে বড় বাড়ির মেয়ে, বড় বাড়িতেই তার বিয়ে হবে। তার সেই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে এইভাবে তাকে চুরির চেষ্টা দেখে সে হয়তো মাটিতে পা ঠুকেছিল, এ আপনার অন্যায় মাসিমা, এটা খুব অন্যায়। আমার মা শুনলে ভয়ংকর বকবে যে, আপনি আমাকে বাড়িতে ডেকে এনে এইসব বিশ্রী কথা বলেছেন।

মা হয়তো তবু ভিখিরির মতো কাঙালপনা করেছিল, দেখিস মিতু, তোর সুখের সংসার হবে। ললিতের কুষ্ঠিতে আছে তিরিশের পর ওর ভোগসুখ, পয়সা হবে ওর দেখিস। তুই সুখে থাকবি, আমি তোদের সব দুঃখ টেনে নিয়ে চলে যাব। দেখিস, যাওয়ার সময় আমি একটুও দুঃখ রেখে যাব না। আমার আর বেশি দিন নেই রে।

কে জানে হয়তো এরপর মিতু কেঁদে ফেলেছিল। ডাইনি জটাইয়ের মতো এই বুড়িটা তাকে বশ করে ফেলছে এই ভয়ে হয়তো ককিয়ে উঠে বলেছিল, পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন মাসিমা! কিংবা তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বলেছিল, আপনি আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না মাসিমা। বাবাকে বলে দিলে আপনি মুশকিলে পড়বেন। আর, ঠাকুমাকেও বলে দেব যেন আপনার কাছে আর না আসেন।

সেইদিন মিতু চলে যাওয়ার পর মা ভয় পেয়েছিল। ললিত যদি জানতে পারে! রাতে ঘরে ফিরে এসে ললিত দেখেছিল দারুণ গরমেও মা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

কী হয়েছে মা?

আমার জ্বর হয়েছে ললিত। রান্না করা আছে, তুই নিয়ে থুয়ে খা।

গায়ে হাত দিয়ে ললিত বলল, কোথায় জ্বর!

হয়েছে রে। শরীরের মধ্যে কেমন কাঁপুনি। দুপুর থেকে পড়ে আছি।

সে-রাতে অনেক এলোমেলো কথা বলছিল মা, যার স্পষ্ট অর্থ ললিত ধরতে পারেনি। ললিত বকবে— এই ভাবনায় ভয়ে ভয়ে সে-রাতে মা'র সত্যিই জ্বর এসেছিল।

তন্দ্রা ভেঙে ললিত দেখল ঘরে কেউ নেই। তুলসী চলে গেছে।

আস্তে আস্তে উঠল ললিত। এখন শরীরটা অনেক ঝরঝরে লাগছে। একটু খিদে টের পাচ্ছিল সে। উঠে ললিত ভিতরের দরজায় গিয়ে দেখল পেয়ারাতলার ছোট্ট খুপরি রান্নাঘরটায় মা নিশ্চল হয়ে বসে আছে। একটু কুঁজো হয়ে কেমন ছেলেমানুষের মতো বসবার ভঙ্গি মা'র। যেন কোনও কিশোরীবেলার চিন্তায় বিভোর। আসলে এখন আর মাকে ললিতের পাকা মাথাওলা প্রবীণ মহিলা বলে মনে হয় না। সারাদিন কাঠকুড়ুনির মতো কুঁজো হয়ে হয়ে মা সারা ঘর ঘুরে বেড়ায়, খুঁজে খুঁজে ময়লা বের করে ঘর থেকে, বার বার সামান্য জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখে, বিছানার চাদর টান করে অকারণে, তারই ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ শূন্য হয়ে যায় চোখ, শিশুর মতো বোকা হয়ে যায় তোবড়ানো মুখ। যেন চার দিকের এই ঘড়বাড়ি, ছোটখাটো জিনিসপত্র, এই ছোট এক ঘরের সংসার— এর কোনও কিছুর অর্থই মা বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অবস্থায়ও মাকে লক্ষ করেছে। হাঁটু মুড়ে ছোটখাটো হয়ে গিয়ে মা ঘুমোয়, নিঃসাড় সেই ঘুম, আর মাঝে মাঝে সেই মুখে একটু একটু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। তখন মনে হয় মা স্বপ্ন দেখছে— সেই কিশোরীবেলার স্বপ্ন। এক দূর গঞ্জ কিংবা গাঁয়ের স্বপ্ন, যার সঙ্গে জেগে দেখা চারপাশের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মাইলের তফাত।

মা'র মন ভুলো হয়ে গেল। বিকেলে জল চেয়েছিল ললিত, মা'র জল দিতে ভুল হয়ে গেল। আর মাসকয়েক পর যদি ললিত মরে যায়, তবে তার এই শিশু মা'কে কে দেখবে!

মাকে ডাকল না ললিত। আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল। একা লাগছে। বড় বেশি একা।

## দুই

গলির মুখেই শম্ভু দাঁড়িয়ে ছিল। তুলসী বেরোতেই দেখা।

তুলসীদা, চললেন?

হুঁ।

তুলসী একটু লক্ষ করে দেখল, শম্ভুর ভোল পালটে গেছে। হাসপাতালে গিয়েছিল সাদামাটা একটা বুশ শার্ট আর সুতির প্যান্ট পরে। এখন চমৎকার একটা গাঢ় রঙের চাপা প্যান্ট তার পরনে, নীল রঙের টেরিলিনের শার্ট, হাতাদু'টো অনেক দূর গোটানো— দু'টো মাংসল হাত মুগুরের মতো ঝুলছে, বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়িটাকে এতটুকু দেখাচ্ছে। মুখটা একটু ফরসা দেখাচ্ছিল শম্ভুর, সম্ভবত বিকেলে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছে, একটু স্নো কিংবা পাউডারও দিয়ে থাকা সম্ভব। শম্ভুর মুখে একটা বোকা তৃপ্তির ভাব। চৌকো ভাঙাচোরা মুখ, আর মোটা দু'টো ঠোঁটে একটা চাপা নৃশংসতা রয়েছে। সেটুকু তুলসীর

ভুল দেখার দোষও হতে পারে। আসলে অতটা স্বাস্থ্যের জন্যই শম্ভুকে বোধহয় মাঝে মাঝে ভয়ংকর মনে হয়। শার্টের ওপর দিয়ে বুকের প্রকাণ্ড দুটো চৌকো পেশি ফুলে আছে, খুব সরু কোমর, ঘাড়টা মোষের ঘাড়ের মতো মোটা আর শক্ত। সেই তুলনায় মাথাটা ছোটই। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি ধরনের চুল শম্ভুর, সামনের দিকে ফাঁপিয়ে তুলে আঁচড়ানো। সাজগোজ সত্ত্বেও শম্ভুকে যতটা সুন্দর দেখাচ্ছে, তার চেয়েও বেশি মনে হচ্ছে ভয়ংকর।

আপনি তো ঢাকুরিয়ায় থাকেন, না?

তুলসী মাথা নাড়ল। শম্ভু তার সঙ্গ ধরে আস্তে আস্তে পাশাপাশি হাঁটছিল। বলল, কেমন বুঝলেন ললিতদার অবস্থা?

ভালই তো। আপাতত চিন্তা নেই।

ডাক্তাররা কী বলছে?

ওই যা বলে। যদি রিলাপ্স করে তবে মাস কয়েকের মধ্যে করবে।

করবে বলে আপনার মনে হয়?

তুলসী অসহায়ের মতো বলল, কী জানি!

শম্ভু দাঁতে আর জিভে একটা চিরিক শব্দ করল, ললিতদা এই বয়সে মরে-ফরে গেলে বড় বিশ্রী।

তুলসী চুপ করে রইল। শম্ভুর পাশাপাশি হাঁটতে তার নিজেকে বড় বেমানান লাগছিল। সে রোগা, কালো আর ছোট। বিয়ের পর কয়েক দিনে সামান্য একটু চেহারা ফিরেছে তুলসীর, রংটা বোধ হয় আগের চেয়ে খানিকটা উজ্জ্বল। তবু অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবান শম্ভুর কাছাকাছি হাঁটতে সে এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছিল।

গোপালের মনোহারি দোকানে হ্যাজাক জ্বলছে, কয়েকজন ছেলে-ছোকরা দাঁড়িয়ে। তুলসী শম্ভুকে বলল, দাঁড়াও, একটু সিগারেট কিনে নিই।

শম্ভু ঘাড় নেড়ে ছোকরাদের দলটার মধ্যে ভিড়ে গেল।

সিগারেট কিনতে কিনতে হঠাৎ চোখ তুলে তুলসী দেখে পাঞ্জাবি পরা রোগাটে চেহারার একটা লোক তাকে দেখছে। লোকটার মুখে-চোখে একটা অসহায়, ভয় পাওয়া বুড়োটে ভাব। সে চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই ভুল ভেঙে গেল তার। এরা এমন বিদঘুটে জায়গায় আয়না টাঙিয়ে রাখে।

ছোকরাদের দল থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে তুলসী জিজ্ঞেস করল, শম্ভু, তুমি যাবে নাকি?

শম্ভু ভীষণ ব্যস্ত এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলছিল। দল থেকে মাথা উঁচু করে বলল, এক মিনিট, তুলসীদা।

সম্ভবত পাড়ার কোনও গণ্ডগোল। শম্ভু এইসব ছেলেদের দলের মাথা, এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তুলসী অস্বস্তির সঙ্গে একটা সিগারেট ধরাল। দাঁড়িয়ে রইল শম্ভুর জন্য।

ললিতকে ফিরিয়ে আনা গেছে, অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও, এটা ভাবতে তুলসীর ভাল লাগছিল। এরপর ললিতের ভাগ্য। যত দূর করার তুলসী করেছে। অবশ্য তুলসী না করলেও কেউ-না-কেউ করতই। না করলেও ক্ষতি ছিল না। চিকিৎসা হাসপাতাল থেকেই হচ্ছিল, সে শুধু যেত ললিতের মনের জোরটা বজায় রাখতে, যাতে সে ভেঙে না পড়ে। কিন্তু ক্রমে তুলসী বুঝতে পেরেছিল বাড়তি মনোবলের কোনও দরকার ললিতের নেই। সে একরকম করে তার অসুখের ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল। তাকে তাই খুব বেশি গম্ভীর বা বিষণ্ণ দেখাত না। বরং তুলসী গেলে ঠাট্টা করত ললিত, কী রে শালা, তোকে গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? তোর ভাবী বউটা কি কুচ্ছিত? না কি, দাদা বের করে দিয়েছে তোকে বাড়ি থেকে বিয়ে দেবে না বলে? এ-কথা ঠিক যে, তুলসী কোনও দিনই খুব একটা হাসিখুশি হতে পারে না। তুলসী জানে যে, সে স্বভাবে গম্ভীর নয়। তার আসল অসুখ হল, সে বড় অল্পেই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়। ছোটখাটো হাজারটা দুশ্চিন্তা তুলসীর, হাজারটা ভয়। তার মন কখনও দুশ্চিন্তা থেকে ছাড় পায় না। কোনও দিন স্কুল কামাই গেলে সারা দিন তার চিন্তা হয় পরদিন হেডমাস্টার তাকে ডেকে অপমানকর কিছু বলবে কি না। এই চিন্তা এমনই পেয়ে বসে তাকে যে, সারাটা দিন সে চাপা উত্তেজনায় কাটায়, একা হলেই হেডমাস্টারের সঙ্গে একটা কল্পিত সংলাপ তৈরি করতে থাকে: 'কাল আসেননি তুলসীবাবু!' 'আজ্ঞে না।' 'কেন!' চাপা রাগ দেখিয়ে তুলসী বলবে. 'কাজ ছিল!' 'কাজ! কাজ থাকতে

পারে, কিন্তু গত তিন মাসে আপনার সাতটা ক্যাজুয়েল লিভ গেল, এর পরও তো মশাই নয় মাস রয়েছে, তখন আপনার কাজ থাকবে না? আর দেখুন, আপনি তো জানেন কম স্টাফে আমার স্কুল চালাতে হয়, এক-দু'জন করে রোজ অ্যাবসেন্ট থাকলে ক্লাসগুলো কাকে দিয়ে আমি চালাব! স্মরজিৎবাবু এসে বললেন যে, কাল সময়মতো ওঁর ভাত রান্না হয়নি বলে আসতে পারেননি, আপনি এসে আরও ধোঁয়াটে যুক্তি দিলেন— কাজ ছিল। এ-সব ছেলেমানুষি যুক্তি ছাত্রদের মুখে মানায়, আপনাদের নয়।' তুলসী হিংস্রভাবে বলবে, 'আমার পাওনা ছুটি আমি নিচ্ছি। আর আমার কী রকম কাজ ছিল কিংবা কাজ ছিল কি না এ-সব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনারও হাজারটা দোষ রয়েছে, সেগুলোকে কে দেখে?' 'কী রকম?' বলে হেডমাস্টার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বেন। তুলসী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলবে, 'আছে। গ্র্যান্টের টাকায় আপনি সায়েন্স ল্যাবরেটরি করলেন, কিন্তু আমরা সাত মাস টাকা পেলুম না, স্কুলে ছেলে নেই তবু আপনি তিনটে স্ট্রিমে স্কুল চালাচ্ছেন কারণ প্রতিটি স্ট্রিমের জন্য আপনি পঁচিশ টাকা করে অ্যালাওয়েন্স পান, তা ছাড়া স্কুলের শতকরা ষাট-সত্তরজন ছাত্র ডিফল্টার, তার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই, আপনি গার্জিয়ানদের খুশি রাখার জন্য কোনও স্টেপ নেন না...' ইত্যাদি। বস্তুত এ-সব ভাবতে ভাবতে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সারাটা দিন তার তেতো হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেডমাস্টার কোনও দিনই তাকে জিজ্ঞেস করে না যে কেন সে গতকাল স্কুলে আসেনি। বড় জোর হেডমাস্টার বলে, 'আপনি কাল আসেননি, না?' তুলসী ভীষণ সংকুচিত হয়ে বলে, 'আজ্ঞে না।' হেডমাস্টার খুব অবহেলার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়, 'ঠিক আছে।'

কিংবা কখনও তুলসী ভীষণ রকমের আজগুবি চিন্তার পাল্লায়ও পড়ে। একদিন সকালে দাদা-বউদির একটা ঝগড়া হয়ে গেল। দাদা গটমট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অফিসে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঘর থেকে বউদি চেঁচিয়ে বলল, 'ফিরে এসে দেখো আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছি।' কথাটা আধোকান্নার বিকৃত গলায় এমনভাবে বলেছিল বউদি যে তুলসীর মাথায় কথাটা লেগে গিয়েছিল। সারা দিন আর ব্যাপারটা খেয়াল ছিল না তুলসীর। কিন্তু স্কুল থেকে ফেরার পথে ট্রেনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে পড়ল তুলসী। এখন ফিরে গিয়ে যদি সত্যিই দেখে যে বউদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে তা হলে সে কী করবে? এ-সব অবস্থায় লোকে কী করে? সে আকাশপাতাল ভেবে দেখল, তার মুখের জল শুকিয়ে গেল, এবং অল্প সময়েই সে টের পেল যে, দুশ্চিন্তায় তার গাল বসে যাচ্ছে। হয়তো গিয়ে সে দেখবে বউদির ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, ডাকাডাকিতে খুলছে না। তখন দরজা ভাঙার আগে তাকে পাড়া-প্রতিবেশীদের ডেকে লোক জড়ো করতে হবে। তারপর দরজা ভাঙা, দড়ি কেটে মড়া নামানো, কিংবা হয়তো মড়া নামানোর আগেই পুলিশ ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়ার ঝামেলা, দাদাকে ফোন করা। মরবার পর বউদির চেহারা কেমন হবে কে জানে, সেটা দেখাও তো একটা নরক-যন্ত্রণা। বাচ্চাগুলোকে বউদি নিশ্চয়ই পাশের ঘরে বন্ধ করে রাখবে। বের করার পর ওদের কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে ভাবতে ভাবতে তুলসী শিউরে উঠল। এরপর পোস্টমর্টেম, ডেথ সার্টিফিকেট ইত্যাদি সব ঝামেলাই তাকে করতে হবে। মড়া উঠতে উঠতে বোধহয় পরদিন রাত হয়ে যাবে। এই শীতে মড়া পুড়িয়ে স্নান করা ইত্যাদিও ভীষণ ব্যাপার। তারপর সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে একা ঘরে শোয়া, অপঘাতে বউদির মৃত্যুর পর সেটাও একটা সমস্যা। এরপর বউ-অন্ত দাদা যদি সন্ন্যাসী হয়, কিংবা সব ছেড়েছুড়ে চলে যায় তা হলে তার গোটা তিনেক বাচ্চার ভারও সারা জীবনের জন্য পড়ল তুলসীর ঘাড়ে...। ভাবতে ভাবতে সমস্ত ব্যাপারটাকে চোখের সামনে এত সত্যের মতো দেখতে পাচ্ছিল তুলসী যে শীতেও তার ঘাম ছাড়তে লাগল। সে সেদিন অনেকক্ষণ আড্ডায় কাটাল, তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল, বাড়িতে ঢুকবার আগে অন্তত বার তিনেক বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করল। রাত বারোটায় চোরের মতো ঢুকে দেখল, ঘরে আলো জ্বেলে দাদা-বউদি আর দাদার বড় মেয়েটা শুকনো মুখে তুলসীর জন্য বসে আছে। তার দেরি দেখে সকলেই চিন্তিত।

বস্তুত তুলসী কখনওই সুখে থাকে না। নিশ্চিন্ত না থাকাটা তার নিয়তির মতো। হয়তো ট্রামে কিংবা বাসে জানালার ধারে প্রিয় সিটটিতে বসে সে যাচ্ছে, এমন সময় ধপ করে পাশে এসে বসল খুব কর্কশ চেহারার একটি লোক, কিংবা এমন কোনও লোক যার নাক কান চুলকোনোর মুদ্রাদোষ আছে, বা এমন কেউ যে বসেই তার পিঠের ওপর দিয়ে হাতটা সিটের পিছনে রেখে তার শরীরের দিকে হেলে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা কিংবা অস্বস্তি শুরু হয়ে যায় তুলসীর।—তার পাশে-বসা লোকটা কেমন। যদি এখন এ-লোকটার সঙ্গে তার কোনও কারণে লেগে যায়! যদি লোকটা তার পকেটে হাত দেয়, কিংবা যদি তার শরীরে আরও হেলান দিয়ে বসে? তা হলে কী করবে তুলসী? অমনি তার মন দু' ভাগ হয়ে গিয়ে পাশে-বসা লোকটার সঙ্গে কী রকম কথাবার্তা হতে পারে তার একটা খসড়া তৈরি করতে লেগে যায়।

এখন ললিতের কথা ভাবলেও নানা রকমের ভাবনা একটার সঙ্গে আর-একটা জড়িয়ে আসে। তুলসী ঠিক করে রেখেছে এখন থেকেই সে ললিতের মা'র জন্য একটা আশ্রমটাশ্রম খোঁজ করে রাখবে।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। শম্ভু ভিড় ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল, চলুন তুলসীদা, আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

চলো।

কয়েক পা হেঁটে হঠাৎ শম্ভু বললে, মা প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে চায়নি যে রোগটা ছোঁয়াচে নয়। মা'র ধারণা এরপর আর ও-ঘরের ভাড়াটে জুটবে না।

তুলসী অর্থটা ধরতে পারল। চুপ করে রইল সে।

শম্ভু একা একাই হাসল, মা'দের যে কী সব বাজে ধারণা থাকে!

তুলসী জানে হয়তো মাস কয়েক পর ললিতদের ঘরটা খালি হয়ে যাবে। কম ভাড়াতেই ললিতরা আছে। মাত্র পঁচিশ টাকা, বছর দশেক আগেকার ভাড়া। এখন ও-ঘরের ভাড়া অনায়াসে ষাট-সত্তর টাকা হবে। বাথরুম-টাথরুম আলাদা, কলে প্রায় সারা দিন জল। তুলসীর একবার ইচ্ছে হল শম্ভুকে জিজ্ঞেস করে, এবার তারা কত ভাড়ায় ঘরটা দেবে।

তারপরই মনে মনে সে নিজেকে ইতর বলে গাল দিয়ে সামলে গেল। ভাগ্যিস মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যায়নি! তা হলে সম্ভবত শম্ভু একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলত, কেন ললিতদা মরে গেলে আপনি নেবেন?

মনে মনে নিজের কাছেই একটা জবাবদিহি খাড়া করার চেষ্টায় খুব অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল তুলসী। এমন সময়ে তাকে চমকে দিয়ে শম্ভু বলল, বাসে অত ঘুরে যাবেন কেন তুলসীদা, আনোয়ার শা রোড ধরে রিকশায় চলে যান, দু'-চার আনা বেশি লাগবে।

আনোয়ার শা রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে তুলসী একটু ভাবল। রিকশায় বা বাসে যেতে তার ইচ্ছে করছিল না। যদিও শরীরটা ক্লান্ত, ট্রেন বাস ট্যাক্সিতে অনেকটা ঘুরেছে সে, এবং ঘরে মৃদুলা— তার বউ— তার অপেক্ষায় আছে, তবুও তার মনে হল নিজেকে একটু শাস্তি দেওয়া দরকার। ললিতদের ঘরটা শম্ভুরা এবার কতয় ভাড়া দেবে— এ-প্রশ্নটা তার মাথায় এল কেন? সে মুখে বলেনি ঠিকই, কিন্তু মনে কথাটা এসেছিল। মনের এই অসংযমটুকুর জন্য মাইল দুই হেঁটে যাওয়ার ছোট্ট একটু শাস্তি বোধহয় তার পক্ষে চমৎকার হবে।— না শম্ভু, আমি বরং এটুকু হেঁটেই চলে যাই।

শম্ভু হাসল, হাঁটবেন! সে তো ভালই, একটু এক্সারসাইজ হবে। শরীরটা তো বড় নাড়াচাড়া করেন না।

তুমি কোন দিকে? তুলসী জিজ্ঞেস করে।

একটু সিনেমায়-টিনেমায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর হবে না। পাড়ায় একটা গণ্ডগোল বেধে আছে, ফিরতে হবে।

কী গণ্ডগোল?

কেসটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোককে কাল রাতে কয়েকজন এসে খুব ঠেঙিয়ে গেছে। ভদ্রলোক একা থাকতেন, পাড়ার কারও সঙ্গে মিশতেন না, তবে মাঝেসাঝে একটা মেয়ে আসত বইখাতা হাতে। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মেয়ে-ঘটিত। একটু দেখতে হবে। বুঝতেই পারছেন পাড়ার ইজ্জত...বাইরের লোক এসে মেরে যাবে...বলে হাসল শম্ভু। আত্মপ্রত্যয়ের হাসি।

তুলসী বলল, তা হলে চলি।

ক'দিন আগে বর্ষা গেছে খুব। ভাঙাচোরা বিশ্রী রাস্তাটায় খোঁসপাঁচড়ার রসের মতো জল জমে

আছে। দু'ধারে কাঁচা ড্রেন বর্ষার জল পেয়ে পচে ফুলে আছে। মুসলমানদের বস্তি, দু'-একটা মসজিদ এবং কবর। তুলসী সাবধানে পা ফেলছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে। মৃদুলার জন্য আগ্রহ অনুভব করছিল তুলসী।

হাঁটতে হাঁটতে তুলসী ভাবছিল, এই হেঁটে যাওয়ার শাস্তিটুকু তার পাওয়া উচিত। মৃদুলার কাছে যেতেও একটু দেরি হবে। ভাল, এইটুকু দেরি হওয়া ভালই। ললিতদের ঘরটার ভাড়া এখন কত হবে এ-কথা মনে আনা তার উচিত হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ও-রকম বিশ্রী চিন্তা ইচ্ছে করে তুলসী করেনি। চিন্তাটা এসে গেল। তার মনের আশ্চর্য গতির কথা তুলসী ভাবছিল। নিজের মনের ওপর তার এতটুকু হাত নেই, মাঝে মাঝে সে অসহায়ের মতো টের পায় তার মন ইচ্ছেমতো জঘন্য কুৎসিত নানা রকম চিন্তা তৈরি করে যাচ্ছে। সে তখন নিজেকে প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করে— শয়তান আহাম্মক, অন্য কথা ভাবো। কিন্তু কিছুই সে করতে পারে না। নিজের এই কুৎসিত মনটার জন্য তুলসী বড় ভয়ে ভয়ে থাকে। বুঝতে পারে তার ভিতরে এক শয়তান আহাম্মক অহংকারী আমি রয়েছে যাকে বের করে দেওয়া উচিত।

মৃদুলা একদিন তাকে বলেছিল, এত তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল না, জানো?

তুলসী সামান্য অবাক হয়ে বলল, তা হলে হল কেন?

মৃদুলা হাসছিল, বলল, হয়ে গেল, কী আর করা যাবে!

বিছানায় শুয়ে ছিল তুলসী, উঠে বসল। বলল, এ-বিয়েতে তোমার ইচ্ছে ছিল না?

মৃদুলা হাসিমুখেই বলল, ইচ্ছে হয়তো ছিল না। কিন্তু হয়ে গিয়ে এখন ভাল লাগছে।

বলে মৃদুলা তাকে আদর করল অনেক। তুলসী গলে গেল, কিন্তু অস্বস্তিটা ছাড়ল না তাকে। পরের রাতে সে আবার কৌশলে কথাটা তুলল, তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার বাবা দিয়ে দিলেন। জোর করে! অ্যাঁ!

মৃদুলা অবাক হয়ে বলল, জোর করে নয়তো! আমি কি সে কথা বলেছি!

তবে!

তবে কী? বাবার নিজেরও ইচ্ছে ছিল না এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার। গান শিখতুম, লেখাপড়া করতুম— আমার বিয়ের ব্যাপারে কেউ ভাবছিলই না। কিন্তু তবু দেখো দুম করে বিয়ে দিয়ে দিতে হল।

শুনে তুলসীর বুক ধড়ফড় করে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, কেন?

মৃদুলা বলল, সে অনেক ব্যাপার। শুনলে তুমি খুশি হবে না।

তবু শুনি।

না।

মৃদুলা, লক্ষ্মী মেয়ে, বলো। না বললে আমার খুব খারাপ লাগবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও কিছু গোপন থাকা উচিত না, তাতে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়...

তুলসীর ব্যগ্রতা প্রকাশ হয়ে গেলে মৃদুলা হেসে বলল, তোমার ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

তবু বলো, লক্ষ্মী, পায়ে পড়ি।

ছিঃ। বলে মৃদুলা একটুক্ষণ তাকে ভাল করে দেখল, হাসল, তারপর বলল, তুমি ভীষণ উইক।

অনেক কাকুতি-মিনতির পর মৃদুলা বলতে রাজি হয়েছিল।

আমার পেছনে কিছু লোক লেগেছিল। তারা ঘুরঘুর করত।

কেন? তুলসী জিজ্ঞেস করেছিল।

কেন আবার! বোঝো না! মেয়ের পিছনে ছেলেরা কেন ঘুরঘুর করে!

হ্যাঁ, তুলসী বোঝে। তবু তার মন থেকে প্রশ্নটা গেল না। কেন কিছু লোক মৃদুলার পিছনে ঘুরঘুর করত? কেন? অ্যাঁ! কী তাদের অধিকার একটা মেয়ের পিছনে ঘুরঘুর করার। ভয়ংকর অন্যায় এটা, ভীষণ অন্যায়।

তারা কারা?

পাড়ারই ছেলে সব। তাদের মধ্যে একজন ছিল বিভু। লেখাপড়া শেখেনি, বাপ দুধ বিক্রি করত,

পয়সা ছিল অনেক। ছেলেটা প্রথম প্রথম আমাকে দেখে মাথা নিচু করত, অনেক দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেত। কখনও সখনও একটা সাইকেলে সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। কোনও দিন কথা বলার চেষ্টা করেনি। শুনেছিলুম ছেলেটা খুব ভাল সাইকেল চালায়, সাঁতার দেয়, ফুটবল খেলে। এ-সব কারণেই বোধ হয় লেখাপড়া হয়নি, শুনতুম এক নম্বরের বখা ছেলে। তাই আমাকে দেখে যখন পাশ কাটিয়ে যেত বা মাথা নিচু করত তখন আমার সন্দেহ হত যে, বোধ হয় এবার ছেলেটার মাথা ঘুরে গেছে। আর এ-সব ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে সিরিয়াস হলে মুশকিল। তারপর শোনো, কলেজে যাতায়াতের পথে প্রায়ই দেখা হত, কোনও দিন বা বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকত, সকালসন্ধে অসংখ্যবার আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেত। তারপর বোধ হয় একা কিছু করা যাচ্ছে না দেখে বন্ধুবান্ধবদের জুটিয়ে আনল। দেখতুম বাস-স্টপে এক দঙ্গল ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে বিভু। আমাকে দেখলেই চাপা গলায় ওর বন্ধুরা বলত, বিভু, তোরটা, তোরটা। আর কী সাহস দেখো, একদিন বাসে উঠেছি, ওমা, বাস আর ছাড়ে না, ড্রাইভার চেঁচিয়ে কাকে যেন সরে যেতে বলছিল। উঁকি দিয়ে দেখি ওই দলের একটা ছেলে রাস্তার মাঝখানে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে, মুখে বদমাইশির হাসি। কোনও কোনও দিন তিন-চারজনকে নিয়ে বাসে উঠত বিভু, কলেজ পর্যন্ত 'ফলো' করত। আমি ভয় পেয়ে গিয়ে মাকে বললুম, মা বলল, কী আর করবি বল, ওদের দিকে কখনও তাকাসনি। বুঝলুম মাকে বলে লাভ নেই, বাবাকেও বলতে ইচ্ছে করত না, কেন না বাবা তোমার মতোই ভিতু ভালমানুষ, এ-সব শুনে হয়তো খুব নার্ভাস হয়ে পড়বেন, আর বলা যায় না, ভিতুদের যা স্বভাব, হয়তো বলে বসবেন, ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়ে দিই মৃদুলা। আমি বাবাকে বললুম না, কিন্তু ওদের সাহস ক্রমে বাড়ছিল। সকালে সন্ধেবেলায় আমাদের বাসার সামনে আড্ডা দিত ভিড় করে দাঁড়িয়ে। আমার ছোট ভাই বাচ্চু রাস্তায় গেলে বলত, এই বিভুর শালা, কোথায় যাচ্ছিস? বাবা সন্ধেবেলায় বাইরের ঘরে বসে মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলতেন, একদিন একটা ছেলে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বলল, মেসোমশাই, আগুনটা একটু দেবেন? এইভাবে আমাদের ভয় পাইয়ে আর ঘাবড়ে দিয়ে তারপর একদিন ওরা কয়েকজন মুরুব্বি ছেলেকে বাবার কাছে পাঠাল বিভুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাড়তে। বাবা ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন, অবাক হয়ে বললেন, ওরা স্বজাতি নয়। ছেলেগুলো ফিরে গেল, কিন্তু তারপর একদিন বিভুর বন্ধুরা দল বেঁধে এল। বিশ্রী কালো কালো কর্কশ চেহারা, রংচঙে পোশাক, একজনও কথা বলতে জানে না। ওরা বলল, জাতফাত নিয়ে মাথা ঘামাবেন না মেসোমশাই, সব জাতই মানুষ। আর তা ছাড়া আপনি যে বামুন তার কোনও প্রমাণ আছে? পাকিস্তান থেকে এসে অনেকেই ও-রকম বামুন কপচায়। সব এফিডেভিড করা বামুন, আমরা জানি। আর শিক্ষিতা মেয়ে তো কী হয়েছে! বিভু স্পোর্টসম্যান, আজকাল স্পোর্টসম্যানদের লেখাপড়ার দরকার হয় না। তবু যদি বলেন তো বিভু আবার স্কুলে ভরতি হবে, তিন-চারটে মাস্টার রেখে ওকে আমরা পাশ করিয়ে দেব। এ-সব শুনে বাবা আর ভয়ে কথাই বলতে পারল না। পরদিনই আমাকে কলেজ-ফেরত ট্যাক্সিতে তুলে বাবা দমদমে পিসিমার বাড়িতে রেখে এল। কলেজে যাওয়া বন্ধ হল, বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করলেন। শুনতুম আমাদের বাড়িতে রাতে কিংবা দুপুরে ঢিল পড়ছে, আমাদের বাইরের ঘরের সিঁড়িতে গু ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে রাত্রিবেলা। এক মাসের মধ্যেই বাবা তোমার খবর আনলেন, বললেন— চমৎকার ছেলে, খুব সৎ আর নিষ্ঠাবান। ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল।

মৃদুলার কাছ থেকে এ-গল্প শোনার পর তুলসী স্বস্তি পেল না। মৃদুলা দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়। তার গালে ব্রণর দাগ, ঠোঁট পুরু, তবে চোখ দু'টো মৃদুলার সুন্দর। শ্যামবর্ণ মেয়েদের চোখ সুন্দর হলে ফরসা মেয়েদের চেয়ে তাদের আকর্ষণ বেশি হয়। সব সুন্দরই তো আর আকর্ষণ করার শক্তি রাখে না। মৃদুলা সুন্দর না হলেও সেই আকর্ষণশক্তি তার আছে বোধ হয়। তা ছাড়া মৃদুলার শরীরটাও রোগার ওপর বেশ মজবুত। উগ্র ধরনের সতেজ ভাব আছে তার শরীরে, আর মাথায় অনেক চুল। মৃদুলাকে ভাল করে লক্ষ করে বিষণ্ণভাবেই তুলসী বলেছিল, বুঝতে পারছি না তোমার পিছনে ছেলেটা এত ঘুরেছিল কেন!

সম্ভবত তুলসীর মনোভাব বুঝেই মৃদুলা উত্তর দিল, ও, আমার বুঝি কিছু নেই, না!

মৃদুলা হাসছিল। কিন্তু তুলসীর ভাল লাগেনি। সে কাঠ কাঠ গলায় বলল, সে-কথা বলছি না। তবে—

তবে কী তা তুলসী আজও জানে না। গত মাস দেড়েকে সে ভেবে বের করতে পারেনি যে,

ঘটনাটুকুর মধ্যে এমন কী ছিল যাতে মাঝে মাঝে তার মৃদুলার ওপর রাগ হচ্ছে। তার এমন কথাও মনে হয়েছে যে, মৃদুলার আকর্ষণশক্তি না থাকলেই ভাল ছিল। মনে হয়েছে যে, মেয়েদের বেশি আকর্ষণশক্তি থাকা বা উগ্র সুন্দরী হওয়াটা এক ধরনের অন্যায়। এখন সেই ছেলেটা— সেই বিভু যদি মৃদুলার খোঁজ পায়, যদি তাদের ঠিকানা খুঁজে বের করে তা হলে কী হবে। এত অল্পে সে মৃদুলাকে ছেড়ে দেবে বা ভুলে যাবে এটা সম্ভব নয়। যদিও তাদের বাসা বিভুর পাড়ায় নয়, তবু বেপরোয়া এবং মরিয়া বিভু এ-পর্যন্ত হানা দিতেই পারে। দিলে, শুধু রাতে বা দুপুরে বাড়িতে ঢিল মেরে এবং সিঁড়িতে গু ঢেলেই কি বিভু নিশ্চিন্ত থাকবে! তুলসীই এখন তার সবচেয়ে বড় বাধা, কাজেই তুলসীকে সরিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা কি তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! কাগজে রোজ ব্যর্থ প্রেমের সঙ্গে অ্যাসিড বালব্ আর ছোরামারা ইত্যাদি ঘটনার কথা চোখে পড়ে তার।

তাই আজকাল তুলসী বাড়ির বাইরে একটু অস্বস্তি বোধ করে একা, আগে পিছনে ভাল করে নজর রাখে, এবং সতর্কভাবে লোকজনকে লক্ষ করে। বস্তুত সে টের পায় মৃদুলার জন্যই তার শান্তি অনেকটা নষ্ট হয়ে গেল। আবার যখন সে ভাবে যে মৃদুলার জন্য একজন পাগল হয়েছিল, তখন আবার তার মৃদুলার প্রতি এক ধরনের পাগলাটে ভয়ংকর ভালবাসাও জেগে ওঠে।

বাড়ি ফিরে তুলসী দেখল ঘরগুলোর বাতি নেভানো, দাদা-বউদি আর বাচ্চারা বোধ হয় কেউ বাড়িতে নেই। সামনের ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপেই সে ভয়ংকর চমকে গেল। মৃদুলা মেঝেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

লাফিয়ে ওঠা হৃৎপিণ্ডকে সামলে তুলসী প্রশ্ন করল, কী হয়েছে, মৃদুলা?

স্খলিত গলায় মৃদুলা বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

## ॥ তিন ॥

সারা রাত ধরে ঝিরঝির বৃষ্টি হয়ে গেল কি? নাকি রান্নাঘরের টিনের চালের ওপর পেয়ারা গাছের ডালপালা নড়ার শব্দ! গাঢ় ঘুম হয়নি ললিতের— সারা রাত সে এক অবসন্ন আচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে ছিল। তার মধ্যে অস্বস্তিকর খ্যাপাটে সব স্বপ্ন দেখেছে সে।

রেলগাড়ির একটা কামরায় সে একা খুব দূরে কোথাও চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ টের পেল গাড়ি থেমে আসছে। বাইরে ধীরে গম্ভীর গলায় কেউ হেঁকে বলছে— যশিডিহ... যশিডিহ...। যেন তার জন্যই ওই ডাক, ওই নামোচ্চারণ। হঠাৎ খেয়াল হয় এইখানেই তার নামার কথা, এইখানেই তার যাত্রা শেষ, এই যশিডিতে। ত্বরিতে উঠল সে, লাফিয়ে নামল বাঙ্ক থেকে, সুটকেস টেনে নিয়ে অন্য হাতে দরজা খুলে সে দেখতে পেল গভীর অন্ধকার চরাচর, প্লাটফর্ম নেই, স্টেশনের বাতি নেই, লোকজন নেই। শুধু খুব লম্বা কালো পাথরের মতো চেহারার একটা দেহাতি লোক একটা মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্যেই। যন্ত্রের মতো ধীর গম্ভীর গলায় সে বলে যাচ্ছে— যশিডিহ... যশিডিহ...। তার মশালের আলো তার শরীরের মস্ত ছায়াকে নিয়ে দুলছে। মশালের আলো পড়েছে ধান-কেটে-নেওয়া খেতে, আলের ওপর বর্ষার ব্যাঙ ডাকছে, সেই ডাক শূন্য মাঠগুলিকে আরও বেশি শূন্য করে দিচ্ছে। এই অদ্ভুত যশিডিতে তার জন্যেই থেমেছে রেলগাড়ি। তাকে নেমে যেতে হবে। দুঃখে বুক ভেঙে যাচ্ছিল ললিতের— গাড়ির কামরায় কামরায় ঘুমন্ত সুখী লোকেরা টেরও পেল না যে, ললিতকে অন্ধকার শূন্য একটা মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে রেলগাড়িটা চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক যশিডি নামিয়ে নিচ্ছে তাকে চিরকালের মতো...

শেষরাত্রির দিকে ললিত ঘুমের মধ্যে যশিডির ডাক শুনতে শুনতে চমকে উঠল। যশিডি, না ললিত? তার নাম ধরে কেউ ডাকছে না?

ঘোর অন্ধকারে চোখ খুলল সে। গায়ে ঘাম। ঘরে একটা বদ্ধ হাওয়ার ভ্যাপসা গন্ধ। জেগে সে শুনতে পেল মা ডাকছে, ললিত, ও ললিত।

উঁ।

পাশ ফিরে শো। তোকে বোবায় ধরেছে।

স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল ললিত। বিছানায় একটা ঘেমো ভেজা-ভেজা ভাব, শরীর রাখতে ইচ্ছে হয় না। আস্তে সে উঠে বসল ঘোরের মধ্যে। মাকে জিজ্ঞেস করল, সারা রাত খুব বৃষ্টি হয়েছে, না মা?

দূর! বৃষ্টি কোথায়, আমি তো শুয়ে থেকেই জেগে আছি।

আচ্ছন্নতার মধ্যে বসে থেকে একটু চিন্তা করল ললিত। মনে হল সারা রাত যে বৃষ্টির শব্দটা সে শুনেছে সেটা বোধহয় বৃষ্টি নয়। মশারি তুলে বাইরে যেতে গিয়েও সে অপেক্ষা করল। না, আর কোনও শব্দ নেই। ভুলই। বুকের মধ্যে দুরদুর করে দ্রুত শব্দ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের— ঘুম ভেঙে হঠাৎ উঠে বসলে এ-রকম হয়, আবার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু আর শুল না ললিত, বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতড়ে আনল। দেশলাই জ্বালার শব্দে মা আবার জেগে উঠে বলল, ললিত উঠলি!

হুঁ।

শরীর কেমন লাগছে?

ভাল। তুমি ঘুমোও।

আমার আর ঘুম! মা বিড়বিড় করে কী একটু অস্পষ্ট কথা বলে পাশ ফিরল। মায়ের হাই তোলার শব্দ শুনল ললিত। ললিতের মনে হল মা এখন আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করবে। বুড়ো হয়ে গেলে মানুষের কথা বলার ঝোঁক বেড়ে যায়। তা ছাড়া এখন ললিতকে মায়ের অনেক কথা বলার আছে। সে-সব কথার অধিকাংশই আবোল-তাবোল, অর্থহীন— পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে ভুল হয়ে যায়, এক কথা থেকে পারম্পর্যহীন আর-এক কথা এসে পড়ে, কখনও ললিতের বিয়ে এবং ভবিষ্যৎ, চাকরি কিংবা রোগা হয়ে যাওয়া চেহারার কথা বলতে বলতে সম্পূর্ণ অবাস্তব জগতে চলে যায় মা, বলে, একটা বাড়ি করবি ললিত, পুরো চোদ্দো কাঠা জমির ঘেরওলা ছ'টা আম, চারটে কাঁঠাল, একটা ডুমুর, সজনে, দশটা সুপুরি আর দশটা নারকোল গাছ লাগাবি, পিছনে থাকবে কলার ঝাড়। কুঞ্জলতা আমার বড় পছন্দ, বুঝলি! বেড়ার গায়ে গায়ে লতিয়ে দেব। তুই তো সিম খেতে ভালবাসিস— একটু সিমের মাচান করবি, গোয়ালঘরের চালের ওপর লকলকিয়ে উঠবে লাউডগা...। ললিত জানে কোন সুদূর ছেলেবেলায় দেখা পুরনো ছবিটাকে মা আবার টেনে এনে দূর ভবিষ্যতের গায়ে টাঙিয়ে রাখছে। এইভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে মা, ধীর পায়ে মৃত্যুর দিকে। দীর্ঘ সব ঘুমহীন রাত জেগে ভাবতে ভাবতে মা'র মনে সব অতীত ভবিষ্যৎ গুলিয়ে ওঠে, জট পাকায়। বুদ্বুদের মতোই তখন মা'র মুখে কথা ভেসে ওঠে। কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যায় মা'র মন, আর তখন এইসব একা থাকা দীর্ঘ দিনরাত্রিগুলোকে আর-একটু সহনীয় মনে হয় মা'র।

এখন মায়ের কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল না ললিতের। মশারি-টশারি তুলে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের বাতাসে একটু হাঁফ ছাড়তে ইচ্ছে করছিল তার। ঘুমহীনতার জন্য তার শরীরে জ্বর জ্বর ভাব, মুখের ভিতরে আঠালো লালা, চোখের পাতায় আঁশের মতো জড়িয়ে আছে ঘুম। অবসন্ন লাগছিল তার। বাঁ হাতের তেলোয় সিগারেটের ছাই ঝাড়ছিল ললিত। গরম ছাই কখনও ছ্যাঁকা দিচ্ছে হাতে। সেটুকু এরকরকম ভালই লাগছিল তার। ওই ছ্যাঁকাগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, সে জেগে আছে, বেঁচে আছে। খুব সামান্যই এই অনুভূতিটুকু, নিতান্তই শারীরিক। তবু ললিত মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হাতের পায়ের চামড়ার খুব কাছাকাছি আগুনটা ধরে রাখছিল, চামড়া তেতে গেলে সরিয়ে নিচ্ছিল আগুন। খেলার মতোই, অথচ ঠিক খেলাও নয়। কেননা তার এই ছোট্ট খেলাটুকুর মধ্যেই কোথাও জীবনমৃত্যুর একটা প্রশ্নও জড়িয়ে ছিল। সিগারেটে টান দিলে মশারির ভিতরটুকু আলো হয়ে যাচ্ছিল। সেই লাল আভার ভৌতিক আলোয় মশাবির লম্বা সেলাইয়ের ধার ঘেঁষে ছোট্ট একটা ছারপোকাকে লক্ষ করল ললিত। তার বিছানায় বরাবরই ছারপোকা। মা চোখে দেখে না, তবু মাঝে মাঝে বিছানা বালিশ টেনে নিয়ে রোদে দেয়, গরম জলে ধুয়ে দেয় চৌকি। তবু ছারপোকাগুলো কখনও ঠিক নির্বংশ হয় না। কোথাও কোনও কোনায় ঘুপচিতে এক-আধটা থেকে যায়, সেই থেকেই আবার বংশ বিস্তার করে। চোখে পড়লে ললিত মারে। আজ সে সিগারেটের আগুন ছারপোকাটার কাছে নিয়ে গেল। তাপ পেয়ে পোকাটা দৌড় দেয়। ছেড়ে দিল ললিত। ওটা বেঁচে থাকলে ললিতের আর সামান্যই ক্ষতি হবে। বরং

পোকাটার প্রাণ দিয়ে সে ভালই করল। কে জানে এর ফলে তার আয়ু কিছুটা বেড়ে যাবে কি না। সব কর্মেরই তো ফল আছে।

সিগারেটের শেষ অংশটুকু ফেলে দেওয়ার জন্য ললিত উঠল। মা আবার নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। যতদূর নিঃশব্দে সম্ভব দরজা খুলে বাইরে এসে ললিত মুগ্ধ হয়ে গেল। এত ভোর সে বোধ হয় তার জ্ঞানবয়সে দেখেনি। আকাশভরা তারা, আর পুব দিকে আকাশের রং ময়ূরের গলার মতো রঙিন। সামান্য হিম পড়েছে। সেই হিম ধুয়ে দিয়েছে বাতাসকে। বাতাস এখন বড় পবিত্র, বড় উদার। শূন্য অলিগলি রাস্তাঘাট নিয়ে কলকাতা এখন প্রকাণ্ড হয়ে আছে। সবাই জেগে উঠলে কলকাতা আবার ঘিঞ্জি আর ছোট হয়ে যাবে।

দরজার সিঁড়িতেই বসল ললিত। চৌকাঠে হেলিয়ে রাখল ক্লান্ত মাথা। আস্তে আস্তে ঘুমের ঢল নেমে আসছিল শরীরে। সামনের আকাশ, আকাশ-ভরতি তারা, না-ওঠা সূর্যের কাছে বিড় বিড় করে প্রার্থনা করল যেন তার মৃত্যু এই রকম সুন্দর একটি শেষরাত্রির সময়ে ঘটে। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল বেলায়, যখন গলির দেয়ালের ওপর দিয়ে রোদ তার মাথা ছুঁয়েছে তখন মা তাকে ডেকে জাগাল। জেগে দেখল সামনে শম্ভু দাঁড়িয়ে আছে, পায়জামার ওপর আধময়লা শার্ট, হাতে বাজারের থলি। কিছুদিন হল ললিতের অসুখের প্রায় শুরু থেকেই শম্ভু তাদের বাজার করে দিচ্ছে।

শম্ভু চৌকো মুখে সরল হাসি হাসল, শরীর কেমন?

ললিত দেখল শম্ভু গেঞ্জি পরেনি, পাতলা বুক-খোলা শার্টের ওপর দিয়ে ওর শরীরের চমৎকার পেশিগুলো জেগে আছে। কখনও শরীরের চর্চা করেনি ললিত, যদিও মাঝে মাঝেই তার মনে হয় গায়ের জোরওয়ালা পুরুষ হতে পারলে বেশ হত। তার ছাত্রদের মধ্যে যারা খেলোয়াড় তারা মাথায় মোটা হলেও ললিতের প্রিয়। শম্ভুর শান্ত মুখ। চোখ আর কণ্ঠায় একটু কোমল ফোলা ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় রাতে ও সুন্দর ঘুমিয়েছে, ঝকমকে দাঁত দেখলে বোঝা যায় ওর লিভারের দোষ নেই। তবে এ-কথা নিশ্চিত যে শম্ভুর চিন্তাশক্তি কম, বুদ্ধি প্রখর নয়। শম্ভুর মুখোমুখি নিজেকে বেশ রুগ্‌ণ আর অসুস্থ বলে বোধ হচ্ছিল তার, হাই তুলে ললিত বলল, শেষ রাতে বাইরে এসে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

শেষ রাতে তো আমি রোজ উঠি। শম্ভু বলল, আপনি উঠেছেন জানলে ডাক দিয়ে যেতাম।

তুই ভোরে উঠে করিস কী?

দৌড়োই।

হাসল ললিত, শরীর ছাড়া শম্ভুটা কিছু বোঝে না। বলল, রোজ দৌড়োস! কতটা?

আনোয়ার শা রোড এক চক্কর দিয়ে আসি।

ললিত আচমকা প্রশ্ন করল, তোর লজ্জা করে না?

বড় অবাক হল শম্ভু, কেন, লজ্জা কীসের!

তোর পরনে কী থাকে?

এবার শব্দ করে হাসল শম্ভু, আপনি না এক্কেবারে— তারপর বলল, পরনে থাকে শর্টস, গায়ে গেঞ্জি, গলায় মাফলার আর পায়ে কেডস। আপনি একটু ভাল হয়ে নিন, আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। রোজ দৌড়ে দেখবেন শরীর খুব ফ্রি হয়ে যাবে।

দূর! ওই পোশাকে আমি বেরোতেই পারব না!

পোশাক আপনি যা খুশি পরুন না। দৌড়টাই আসল। দৌড়নো যায় এমন যে-কোনও পোশাক করবেন। বলতে বলতে শম্ভু গলির মধ্যেই উবু হয়ে বসল, আমি বলছি আপনি দৌড়ে দেখুন ললিতদা।

মৃদু হাসল ললিত, তারপর কী হবে!

তারপর আমি আপনাকে আসন করা শেখাব। আমাদের জিমনাশিয়ামের ট্রেনারের কাছে নিয়ে যাব। দেখবেন আপনার সব অসুখ সেরে যাবে। যোগব্যায়ামে শরীরকে যা খুশি করা যায়। আপনার কিছু হয়নি, দেখবেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে সারিয়ে দেব।

ঘরের ভিতর থেকে মা বলল, নিয়ে যাস তো শম্ভু, আমি ওকে রোজ রাত থাকতে তুলে দেব।

জোয়ান বয়সের ছেলে দেখ, রাতে নাকি ঘুম হয় না, সকাল আটটার আগে উঠতে পারে না, একটু বেশি ভালমন্দ খেলে সইতে পারে না। তুই নিয়ে যাস তো। না যায় তোর বন্ধুদের দল বেঁধে এনে জোর করে নিবি। দে তো ওর সব অসুখ সারিয়ে।

শম্ভুর গায়ে জোর আছে, আর আছে বোকার মতো খানিকটা বিশ্বাস। অল্প বুদ্ধিতে শম্ভু যেটুকু বোঝে সেটুকুকেই গোঁয়ারের মতো অনুসরণ করে। যুক্তি-তর্ক সম্ভব-অসম্ভবের কোনও বিচার নেই তার। ললিত সবই বোঝে। তবু এখন তার হঠাৎ শম্ভুর কথাটার ওপর নির্ভর করতে ইচ্ছে করছিল। যোগব্যায়ামে সব সেরে যায়। একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি ললিত। যদি সারে, যদি সেরেই যায়, যখন এ-রকম ভরসা একজন যে-কেউ জোরের সঙ্গে দিচ্ছে— তখন আশা করতে, বিশ্বাস করতে দোষ কী? যোগব্যায়ামের কতটুকু জানে ললিত? কে জানে ওই রহস্যময় সব পদ্ধতির ভিতরে কী রকম প্রাণশক্তির সন্ধান রয়েছে!

সে হেসে বলল, খুব শক্ত হলে কিন্তু পারব না রে! আমার ও-সব কোনওকালের অভ্যাস নেই।

শম্ভু তড়িৎগতিতে একটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল, বিশ্বাস করুন ললিতদা, একটুও শক্ত না। দম নেওয়া আর ছাড়া, খুব ধীরভাবে শরীরকে বাঁকানো— এটুকুই যা শক্ত। খুব সহজে অভ্যাস হয়ে যাবে দেখবেন। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কত রোগের রুগি আসে আমাদের জিমনাশিয়ামে— আরথ্রাইটিস, পোলিও, হার্টের অসুখ, আলসার...।

সব সেরে যাচ্ছে?

সব। কিন্তু জলদিবাজি করলে চলবে না। এ তো কেনাকাটার মতো সহজ ব্যাপার নয়। এ যোগ। করতে হবে ঠিকমতো, চলতে হবে ঠিকমতো, অনাচার করলে চলবে না। যেমন চলতে বলবে, তেমন চলবেন। চল্‌না ঠিক হওয়া চাই। শম্ভুর চোখ বিশ্বাসে ভক্তিতে চকচক করে উঠছিল, সমস্ত শরীরে চাপা আবেগে পেশির ঝড় খেলা করছে। বোকা শম্ভুর মুখখানা দেখে হঠাৎ ললিতের বুক ভরে উঠছিল। শম্ভু অন্য জায়গায় যেমনই হোক, নিজের ক্ষেত্রকে সে কিন্তু ঠিকঠাক জানে। সম্ভবত সেখানে শম্ভুর ভুল হয় না। শম্ভুর কথার ওপর আত্মসমর্পণ করার একটা তীব্র ইচ্ছা বোধ করছিল ললিত।

ললিতের মনে আর হাসিঠাট্টার ভাব ছিল না। তবু মুখে একটু ঠাট্টার ভাব বজায় রেখে সে প্রশ্ন করে, চল্‌না মানে কী রে?

শম্ভু ললিতের নাড়ির গতি বুঝতে পারছিল। তাই তার চোখমুখে ঐকান্তিক নিষ্ঠার ভাব ফুটে উঠেছে, চল্‌না মানে চালচলন। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া, অনিয়ম না করা, পরিষ্কার থাকা, সৎ চিন্তা এবং সৎ আচরণ করা— সব বলে দেওয়া হবে।

দূর! হতাশায় মুখ ফেরাল ললিত, ও-সব হবে না। আমি সিগারেট খাব না, রাত জাগব না, দুপুরে ঘুমোব না, আলসেমি করব না! ও-সব বিধবা আর সিদ্ধবাবারা পারে।

হাসল শম্ভু, পারবেন। পারতে হয়। বিপদে পড়লে মানুষ সব পারে।

কথাটা ধাক্কা দিল ললিতকে। সামান্য উত্তেজিত হল ললিত, বলল, আমি পারব না। এতকাল পারিনি। ধাতে সইবে না।

মা দরজার কাছে খুঁটি গেড়ে বসে সব শুনছিল। এবার বলল, এমনকী শক্ত! শম্ভু করছে না! ওর চেহারা দেখ, চোখ জুড়িয়ে যায়। আর তোর কেবল হাড্ডিগুড্ডি সার হচ্ছে। কত ফরসা ছিলি, আর কেমন রোদে-পোড়া চেহারা হয়েছে। খুব পারবি, আমি তোকে চালিয়ে নেব। তুই ওকে দলে নিয়ে নে শম্ভু।

শম্ভু ঘাড় নাড়ে। ললিতকে বলে, ঠিকমতো না চললে হয় না। আমার ক্রনিক ফ্যারিনজাইটিস সারছে না, দেখুন না গলায় মাফলার জড়িয়ে সকালে বেরোতে হয়। সর্দির অ্যালার্জি, চিংড়ি ইলিশ ডিম বারণ তবু খেয়ে ফেলি, অনেক সামলেও নানা রকম অনিয়ম হয়ে যায়। কিন্তু জানি রোগটা সারানো সহজ, ঠিক মতো চললেই সেরে যাবে। অসুখটা তেমন খারাপ নয় বলে গা করি না, কিন্তু আপনার তো তা নয়...

বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে শম্ভু উঠল। বলে গেল কাল আসবে, এসে তার জিমনাশিয়ামে নিয়ে যাবে ললিতকে। ললিত রাজি হল না, অত ভিড়ের মধ্যে খালি গায়ে আমি পারব না। প্রথম প্রথম তুই দেখিয়ে দে, একটু একটু বাসায় করি, তারপর যাব তোর জিমনাশিয়ামে।

গলির মুখে যখন শম্ভু বেরিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ ললিতের ইচ্ছে হল ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, আমার এ-বয়সে একটু দেরি হয়ে যায়নি তো! এখন কি কোনও ফল হবে? জিজ্ঞেস করল না লজ্জায়। কিন্তু ভাবতেই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। যদি ফল না হয়!

বেলা দশটা নাগাদ ললিত নাক টিপে, জোর করে বমির ভাব আটকে রেখে এক গ্লাস দুধ খেল। খড়িগোলা জলের মতো বিস্বাদ। এখন তাকে এইসবই খেতে হচ্ছে— দুধ, ফলের রস, দুধভাত, সেদ্ধভাত! ঝাল-মশলা দেওয়া তীব্র স্বাদের খাবারই ললিতের প্রিয় ছিল। জলো স্বাদের খাবার তার ভাল লাগত না। এখন খেতে হচ্ছে। মনে মনে ভেবে রেখেছে ললিত এ-সব নিয়ম-কানুন ঝেড়ে ফেলে সে স্বাভাবিক বেপরোয়াই হয়ে যাবে আবার, এখন আর ভয় কী? শম্ভু শিঙি মাছ এনে দিয়ে গেছে বাজার থেকে, আর কাঁচা পেঁপে। দুই-ই তার অখাদ্য।

মায়ের দোক্তার কৌটো থেকে সে বেছে বেছে কয়েকটা ভাজা মৌরি ধনে মুখে দিল। তারপর ধোয়া পায়জামা পরল একটা, ধীরে ধীরে গায়ে চড়াল পাঞ্জাবি। মা রান্নার মশলা নিতে ঘরে এসে তাকে দেখে বলল, কোথায় যাচ্ছিস!

স্কুল থেকে একটু ঘুরে আসি।

কোনও দরকার নেই। সদ্য হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছ, মাথা ঘুরেটুরে রাস্তায় পড়ে গেলে...

ঘরে থাকা এখন অসম্ভব। বাইরে টলটল করছে শরৎকালের মিঠে রোদ, রাস্তায় চলেছে লোকজন। এখন একবার হাঁফ ছাড়ার জন্য বাইরে যেতেই হবে ললিতকে। অনেক দিন মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে সে শুয়ে ছিল। তার শরীর দুর্বল— চলাফেরার উপযুক্ত নয়, কিন্তু তবু একবার সুস্থ মানুষের মতো ভিড়ের মধ্যে গিয়ে চলে ফিরে আসতে বড় ইচ্ছে করছে। মা বলছিল সে ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু ললিত নিজের শরীরের চামড়ায় একটা বিবর্ণ হলদে ভাব লক্ষ করে— ছায়ায় বেড়ে ওঠা গাছের রং যেমন হয়। তার সমস্ত শরীর রোদ-জল-মাটির জন্য ছটফট করছে, আবার স্কুল, চায়ের দোকানের আড্ডা, চা-সিগারেট, মেয়ে দেখা, দু'-একটা অশালীন শব্দ, সিনেমা-থিয়েটার, বিয়ের নিমন্ত্রণ, আরও কত কিছুর জন্য চনমন করছে মন। হঠাৎ মনে পড়ে কত তুচ্ছকেই সে কত ভালবেসেছিল। অসুখের আগে কখনও মনে হত না যে, সে বড় ভালভাবে বেঁচে আছে। কিন্তু এখন মনে হয় তখন সে কত ভালভাবে বেঁচে ছিল!

মায়ের কথার সহজ উত্তর দিল না ললিত। বলল, স্কুলে একটু টাকাপয়সার খোঁজ করা দরকার। ডি এ-টা বোধ হয় এসেছে। ট্যাক্সিতে চলে যাব। ক্লাস তো করছি না।

মা তবু গুনগুন করে কী সব বলছিল। কান দিল না ললিত। দরজার বাইরে এসে চেঁচিয়ে বলল, সদরটা বন্ধ করে দাও।

সহজভাবে হাঁটতে পারছিল ললিত। তবে একটু কুঁজো হয়ে, সোজা হলে পেটের কাটা জায়গায় টান পড়ে। পেটের মধ্যেকার সেই ভয়ংকর ব্যথাটা আর নেই— যে-ব্যথায় সে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেত। এক দিন ক্লাসঘরে, আরেক দিন ফুটপাথেও শুয়ে পড়তে হয়েছিল তাকে। কোনও কাণ্ডজ্ঞানই বজায় রাখা যেত না তখন। ও-রকম ব্যথা যে-কোনও লোকেরই শালীনতা-ভদ্রতাবোধ, বিচার এবং বুদ্ধির শক্তি, সমস্ত রকমের সংযম ও পৌরুষ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই ব্যথার জায়গায় এখন তার পেটে একটা নাড়ি দোল খায় যেন, আর মনে হয় পেটের মধ্যে অনেকটা ফাঁপা শূন্য জায়গা। যেন খানিকটা আকাশ ঢুকে গেছে।

অনেককালের চেনা পাড়ার ভিতর দিয়ে হাঁটছিল ললিত। সে গলির মুখে ডাকবাক্সটা পেরিয়ে গেল, করপোরেশনের জলের কলের গা ঘেঁষে গোপালদার মনোহারি দোকান, ডান দিকে একটা গ্যারেজের মধ্যে ক্লাবঘর, এখন তালাবন্ধ— মাঝে মাঝে বৃষ্টি বা দুর্যোগের দিনে বেরোতে না পারলে ললিত এইখানে এসে পাড়ার একটু বয়স্ক যুবকদের সঙ্গে তাস বা দাবা খেলেছে কখনও সখনও। ক্লাবঘর ছাড়ালে চৌধুরীদের বাগানের টানা লম্বা দেয়াল অনেকটা পর্যন্ত গেছে। দেয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি দেয় নারকেল সুপুরি আর জাম গাছের মাথা—এ-রকমই একটা বাগানওলা বাড়ির বড় শখ মা'র। ললিত যেন এ-রকম বাড়ি করে। মাত্র চোদ্দো-পনেরো কাঠা জমি— বেশি তো নয়! বাঁ দিকে একটা তালার

কারখানা। অনেক চেনা মুখ চোখে পড়ছে— এই যে ললিত, ভাল তো? হেসে ঘাড় নাড়ে ললিত। এরা বেশির ভাগই তার অসুখের খবর রাখে না, গত দু' মাস কেন দেখা হয়নি এই প্রশ্নও কারও মনে আসছে না। ভেবে দেখতে গেলে দু' মাস একটুও বেশি সময় নয়। তবু ললিতের মনে হচ্ছিল অনেক দিন বাদে, যেন প্রায় সেই ছেলেবেলার ছেড়ে যাওয়া কোনও জায়গায় সে আবার ফিরে এসেছে। তার মনে হচ্ছে চার দিকে বিপুল কোনও পরিবর্তন ঘটে গেছে, অথচ কিছুই চোখে পড়ছে না। হয়তো পরিবর্তনটাই খুব গভীর আর রহস্যময়, চোখে দেখা যায় না কিন্তু টের পাওয়া যায়। আজ সব কিছুই সে খুঁটিয়ে দেখছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে এতকাল তার নজরে পড়েনি যে সান্যালদের ছাদের ওপর একটা পায়রার বাসা আছে, লক্ষ করেনি ধোপাদের বস্তির পিছনে ছোট্ট একটা শিবমন্দিরের ত্রিশূল রাস্তা থেকেই দেখা যায়। এ-রকম ছোটখাটো আবিষ্কার করতে করতে বড় রাস্তার কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গেল ললিত। তারপর আর সে দাঁড়াতে পারছিল না। কিছুটা বা ব্যগ্রতায় সে প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুত হেঁটেছে, অনভ্যাসে তার পদক্ষেপ একটু বেচাল হচ্ছিল, আর সামান্য টলমল করছিল মাথা। এখন তার পা কাঁপছিল, সমস্ত শরীরে ঘাম, মাথার মধ্যে ঝিঁঝি পোকার ডাক, আর বমির ভাব বুক জুড়ে।

অল্প দূরেই দেখা যাচ্ছে গলির পথটা আনোয়ার শা রোডে শেষ হয়েছে। তেরাস্তায় তিন-চারটে রিকশা দাঁড়িয়ে। ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে একটা রিকশায় গা এলিয়ে দিতে পারত ললিত, পৌঁছে যেত ট্রাম-বাসের রাস্তায়। কিন্তু ললিত সে-চেষ্টা করল না। করলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তার শরীর ইতিমধ্যেই মাটির দিকে ঢলে পড়ছে। মুখের মধ্যে জলহীন শুকনো ভাব, জিভ চটচট করছে। শরীরে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরেকার মতো ঠান্ডা তাপহীনতা বোধ করছে সে, হাত পা দুর্বল হয়ে আসছে। চেনা একটা ছেলের মুখ নজরে পড়ল ললিতের। পাড়ার ছেলেই হবে, কিংবা হয়তো তার ছাত্রই। বখাটে চেহারা, হাতে সিগারেট। তাকেই হাতছানি দিয়ে ডাকল ললিত। সে কাছে আসতেই বলল, আমাকে একটা রিকশা ডেকে দেবে ভাই, আমি অসুস্থ, হাঁটতে পারছি না।

ছেলেটা সিগারেট লুকোয়নি, কিন্তু চটপটে পায়ে দৌড়ে গিয়ে তেরাস্তা থেকে গলির মধ্যে রিকশা নিয়ে এল। ললিতকে ধরে তুলে দিল রিকশায়। রিকশার ঢাকনা উঠিয়ে দিল। রিকশাওয়ালাকে বলে দিল, আস্তে চালিয়ে নিবি।

অতটুকু ছেলেকে ধন্যবাদ দিতে লজ্জা করছিল ললিতের। সে শুধু একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল। রিকশা চলতেই ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল চোখেমুখে। আস্তে আস্তে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছিল সব। চোখ চাইল ললিত— বাঁ ধারে খুপরি দোকানের সারি, নোংরা বাজার আর বস্তি, গত বর্ষার জল উপচে পড়ছে কাঁচা ড্রেনে, ডান ধারে রেলিং ঘেরা একটা পুরনো পুকুর, তার পাশে মসজিদ। বড় রাস্তায় এসে রিকশা ছেড়ে দিল ললিত। দেখল অফিসের ভিড়-বোঝাই বাসে-ট্রামে ওঠা অসম্ভব। এ-সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অসহায়ভাবে সে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে রইল। এই অসম্ভব রোগগ্রস্ত শরীরটার জন্য বড় ঘেন্না হচ্ছিল ললিতের। শরীর— তবু শরীর ছাড়া অস্তিত্ব নেই।

একটা ট্রাম তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল ধীরগতিতে। সেকেন্ড ক্লাস থেকে কে যেন ডাকল, ললিতদা!

অত ভিড়ের মধ্যে কাউকে চিনবার উপায় নেই। ললিত ট্রামটার দিকে চেয়ে রইল শুধু। লক্ষ করল ট্রামটা তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে দরজার ভিড় ঠেলে লাফিয়ে নামল একজন। দূর থেকেই তাকে দেখে হেসে হাত উঁচু করল, এগিয়ে এল তার দিকে। ভ্রূ কুঁচকে দেখছিল ললিত। লোকটার পরনে ঝকমকে টেরিলিনের প্যান্ট-শার্ট. হাতে ফোলিও ব্যাগ, গলায় টাইও ঝুলছে। কিন্তু এমনই গ্রাম্য তার হাবভাব, হাত পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলার বিশ্রী ভঙ্গি যে. পোশাকটাই মার খেয়ে গেছে। চিনতে পারছিল না ললিত। লোকটা যখন খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাসল তখন তার পান-খাওয়া কালো দাঁত, ডান গালে পানের ঢিবি, আর কপালে ছোট্ট একটু রক্তচন্দনের ফোঁটা দেখে চিনতে পারল— এ লক্ষ্মীকান্ত। কোনও দিনই তার সম্বন্ধে আর পাঁচজনের মতামতকে পরোয়া করে না লক্ষ্মীকান্ত। সে যে এখনও পোশাক-আশাক পরে রাস্তায় বেরোয় এটাই রাস্তার লোকের বাবার ভাগ্য।

ফোলিও ব্যাগটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে বাড়িয়ে ললিতের হাত ধরে রামঝাঁকানি দেয় লক্ষ্মীকান্ত, ললিতদা, কী কথা ছিল?

যেন পরশুদিনই কথাটা হয়েছে এমনই জিজ্ঞাসার ভঙ্গি তার। ললিত হাসল, কেমন আছ লক্ষ্মীকান্ত?

ভাল। বলে হাত ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত কাজের কথায় আসে, ললিতদা, কী কথা ছিল? অ্যাঁ?

ঠিক কী যে করে লক্ষ্মীকান্ত তা জানে না ললিত। তাকে একনজর দেখেই মনে হয় যে লোকটি খুব বিষয়ী, দালাল কিংবা ফড়ে। বস্তুত লক্ষ্মীকান্ত তাই। মোটাসোটা কালোকালো চেহারা তার, মাথায় একটু টাক— সম্ভবত আসল বয়সের তুলনায় তাকে বেশি বয়সেরই দেখায়। তবে তার আসল বয়সটাও অবশ্যই ললিতের চেয়ে অন্তত বছর পাঁচেকের বেশি। তবু বরাবরই লক্ষ্মীকান্ত ললিতকে দাদা বলে ডেকে আসছে, আর ললিত— যে-কোনও লোকের সঙ্গেই যার 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামতে অনেক সময় লাগে, সেও সেই প্রথম থেকেই লক্ষ্মীকান্তকে নাম ধরে ডেকে 'তুমি' বলে আসছে। এর জন্য লক্ষ্মীকান্তর স্বভাবটিই দায়ী— সকলের কাছে সবসময়েই সে বশংবদ, একনাগাড়ে নিজেকে উজাড় করে কথা বলে যায়, অন্যে বিরক্ত হচ্ছে কি না তা লক্ষও করে না। লক্ষ্মীকান্তর আত্মসচেতনতা নেই, বিষয়ী লোকের তা থাকলে চলেও না। কলকাতার বিস্তৃত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সে হচ্ছে খুঁটে-খাওয়া পাখি। বিশেষত তার অনেক রকমের দালালি, হাজারটা লোককে চরিয়ে খেতে হয়। তাই নিজেকে নিচু করে রাখা লক্ষ্মীকান্তর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কুড়ির ওপর বয়সের যে-কোনও লোককেই সে দাদা বলে ডাকে— ব্যবসার সম্পর্ক থাক আর না থাক। তাকে দেখে মনে হয় সে সম্মান বা সমাদর খুব কমই পায়, এবং পায় না বলে তার কোনও ক্ষোভও নেই। যে-কোনও লোকের সঙ্গেই মিশ খেতে গেলে ও-রকম ক্ষোভ না থাকাই ভাল। কবে, কীভাবে যে ললিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল তা আজ আর ললিতের মনে নেই, তবে লক্ষ্মীকান্ত পায়ের তলায় সরষে নিয়ে সারা শহরে চরকিবাজি খায় বলে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ললিতের দেখা হয়ে যায়, আর দেখা হলেই লক্ষ্মীকান্তর এক কথা— কী কথা ছিল দাদা? মনে নেই?

মনে আছে ললিতের। হাজার পাঁচেক টাকার একটা জীবনবিমা তাকে দিয়ে করাতে চাইছে সে। এবং চার বছর ধরে তার পিছনে লেগে আছে। জীবনবিমার উপকারিতা, বা না-করা যে সামাজিক অপরাধ— এ-সব নিয়ে খুব বেশি কিছু বলে না সে, তার আবেদন অন্য রকমের— যদি না করেন তবে আমার এজেন্সিটা চলে যাবে খুব ঝামেলায় পড়ে যাব দাদা। তারপর নিজের সংসার, অপদার্থ ছেলেমেয়ে, নিষ্ঠুর ভাইরা এবং একচোখা বাবার কথা অকপটে বলতে থাকে সে। আর মাঝে মাঝে বলে যে, এবার গভর্নমেন্টের সঙ্গে তার একটা মামলা লেগে যাবে। বালিগঞ্জের ভাল একটি পাড়ায় অনেকটা বেওয়ারিশ জমি দখল করে আছে লক্ষ্মীকান্ত। ওখানে জমির দাম পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা। জমিটা কেনেনি সে, খাজনাও বোধ হয় দেয় না। সামনে তার একটা মুদির দোকান আছে— যেটার দেখাশোনা করে তার বারো বছর বয়সের ছেলে। দোকানের গা ঘেঁষেই মাটি দিয়ে গেঁথে কালীর মন্দির বানিয়েছে সে— নিত্যপূজা হয়, বাগান করে গাছ লাগিয়েছে— যাতে সহজে উচ্ছেদ হতে না হয়। লক্ষ্মীকান্তর বাড়ি বাঁকুড়ায়, তবু রিফিউজি কার্ড করিয়ে রেখেছে সে। তার ধারণা তাকে তোলা বড় সহজে হবে না। তার বিশ্বাস আরও বছর দশেক ওখানে টিকে যেতে পারলে জমিটা তার হয়ে যাবে। এ-সবই ললিতের লক্ষ্মীকান্তর কাছেই শোনা। এত সব সত্ত্বেও লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গ খুব অপ্রিয় মনে হয় না ললিতের, দু' দণ্ড তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে। সম্ভবত এই গুণটুকুর জন্যই টিকে আছে সে, টিকে যাবে।

ললিত প্রসন্ন মুখে হেসে বলল, ব্যবসা কেমন?

ভাল কোথায়? আপনি গা করছেন না, কিন্তু এই ভাল সময় চলে যাচ্ছে। দেরি করলেই দেরি। চার বছর আগে করে রাখলে আজ আপনি চার বছর এগিয়ে যেতেন ম্যাচুয়ারিটিতে। চিন্তা করে দেখুন বিশ-পঁচিশ বছর পর এক থোকে অত টাকা...

বিশ-পঁচিশ বছর সময় বড় অলীক বলে মনে হয়। তবু হাসল ললিত, বলল, বিশ-পঁচিশ বছর পর টাকার দাম অনেক কমে যাবে লক্ষ্মীকান্ত, আজকের দাম পাওয়া যাবে না। ঠকা হয়ে যাবে!

হতাশ হল লক্ষ্মীকান্ত, বলল, আপনাদের কেবল ওই এক কথা। বিশ বছর লম্বা সময়, ততদিনে দাম কমে-বেড়ে কী হবে তা কি বলা যায়! হয়তো দেখলেন পাঁচ হাজারের দাম পাঁচ লাখে দাঁড়িয়েছে...

তা কি বলা যায়! তা ছাড়া দেখো লক্ষ্মীকান্ত, পাঁচ হাজার টাকার জন্য বিশ বছর হাঁ করে বসে থাকাও বড় কষ্টের। আমার অত ধৈর্য নেই।

বেঁচে থাকাটাই ধৈর্যের ব্যাপার ললিতদা। দেখুন না, আমি চার বছর ধরে আপনার পিছনে ঘুরছি, আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন...

ললিত হাসল, যদি ততদিন না বাঁচি লক্ষ্মীকান্ত, তবে আমার টাকাটা খাবে কে? বুড়ি মা ছাড়া আমার কে আছে?

লক্ষ্মীকান্ত জিব দিয়ে চকাস শব্দ করল, টাইয়ের ফ্ল্যাপ তুলে থুতনির কাছে একটু ঘাম মুছে নিল। তারপর সে কথা বলার জন্য মুখ খুলতেই ললিত বুঝতে পারল লক্ষ্মীকান্ত কী বলবে। সে তার ভাবী বউ এবং বাচ্চাকাচ্চার কথা তুলবে এবার, বলবে, এই বেলা বিয়ে করে ফেলুন, আমি মেয়ে দেখে দিচ্ছি। চমৎকার মেয়ে আছে আমার হাতে। যতদূর শুনেছে ললিত, লক্ষ্মীকান্ত ঘটকালিরও একটা সাইড-বিজনেস করে, মেয়ের বাপের কাছ থেকে পয়সা নেয়। তাই ললিত তাড়াতাড়ি বলল, আমার শরীর ভাল নেই লক্ষ্মীকান্ত, সদ্য একটা অপারেশন হয়েছে আমার। তুমি আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দাও দেখি।

দেখছি। বলে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল লক্ষ্মীকান্ত।

ট্যাক্সি পাওয়া খুব সহজ হল না। মোটা মানুষ লক্ষ্মীকান্ত তার থলথলে শরীর নিয়ে গাড়িঘোড়ার মধ্য দিয়ে কয়েকবার রাস্তার এপার-ওপার ছোটাছুটি করল, ভরতি ট্যাক্সিকেও হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করল বারকয়েক। অনেক দূর হেঁটে গেল, একবার ডান ধারে, একবার বাঁ ধারে। তার ব্যস্ততা এবং আগ্রহ দেখবার মতো। ললিত দেখছিল। সে ভেবে দেখল খুব স্বার্থেও সে নিজে কারও জন্য ট্যাক্সি ধরে দিতে এত ছোটাছুটি করত না। প্রাণ আছে লক্ষ্মীকান্তর, কিংবা কে জানে এটাও লক্ষ্মীকান্তর ব্যবসার অঙ্গ কি না। যে-কাউকে খুশি করতেই লক্ষ্মীকান্ত বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সবসময়ে যে তার প্রতিদান চায় তা নয় বোধ হয়। কেন না ললিতের দ্বারা যে তার খুব সুবিধে হবে না এটা লক্ষ্মীকান্ত নিশ্চিত বুঝে গেছে।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল অবশেষে। লক্ষ্মীকান্তই ধরে আনল।

একই দিকে যাবে বলে লক্ষ্মীকান্তও উঠল ট্যাক্সিতে। পাশাপাশি বসে ললিতের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, বে-খেয়ালে টাইয়ের ফ্ল্যাপ তুলে থুতনির ঘাম মুছল— বস্তুত ওই জায়গাটাই বোধ হয় বেশি ঘামে তার। ললিত ভেবে পেল না টাইটা আসলে লক্ষ্মীকান্তর পোশাকের অংশ, না কৌশলে থুতনির ঘাম মুছবার জন্যই ওটা বেঁধেছে সে!

লক্ষ্মীকান্ত আস্তে আস্তে কথা পাড়ছিল। সংসারও যে একটা ধর্ম এবং সেটা যে উপেক্ষা করার নয়— সেই পুরনো কথা।

ললিত বলল, তুমি কি আমাকে বিয়েটিয়ের কথা বলবে নাকি লক্ষ্মীকান্ত? বলে হাসল সে, তবে দেখো ইনশিওর করা কী ঝামেলার ব্যাপার! পাঁচ হাজার টাকার ওয়ারিসান খুঁজতে গিয়ে বিয়ে করা। তার চেয়ে এই বেশ আছি হে, শেষে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে...

স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ললিত। লক্ষ্মীকান্ত নেমে বলল, আর একদিন দেখা করব দাদা, এবার বাসায় যাব। ঠিকানা আমার কাছে আছে।

যেয়ো। ললিত হেসে বলল, কিন্তু আমার একটা শক্ত অসুখ করেছে, বোধহয় বেশি দিন বাঁচব না।

কী অসুখ? বলে সত্যিকারের উৎকণ্ঠা দেখাল লক্ষ্মীকান্ত।

ক্যানসার। বলে ললিত ভাল করে ওর মুখটা দেখছিল। আশ্চর্য হয়ে সে দেখল লক্ষ্মীকান্তর চোখে সত্যিকারের বিস্ময় ফুটল, ছোট হয়ে গেল মুখ।

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল সে, এত অল্প বয়সে, দাদা?

শুধু হাসল ললিত। কিছু বলার ছিল না।

আবার দেখা হবে লক্ষ্মীকান্ত। বলে পিছু ফিরল ললিত। দেখা হবে, না হলেও ক্ষতি নেই। ললিতের

ইচ্ছে হল একবার লক্ষ্মীকান্তকে ডেকে বলে— তোমাকে আমি পছন্দ করতুম, লক্ষ্মীকান্ত। পরমুহূর্তে সে সামলে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লক্ষ্মীকান্ত খুবই ধীরে পায়ে ট্রাম রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। একবার সেও ঘাড় ফেরাল। চোখাচোখি হয়ে যাওয়ার ভয়ে ত্বরিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় ললিত।

বড় রাস্তা থেকে গলির মধ্যে কয়েক পা এগোলেই তার স্কুল। পুরনো আমলের জমিদার বাড়ি— বাইরের দিকে বারান্দায় দু'টো পাথর বসানো মোটা থাম আর কাজ করা রেলিং। বাড়িটার কাছাকাছি আসতে-না-আসতেই শ'খানেক ছেলে ছুটে এল চার দিক থেকে মৌমাছির মতো। ঘিরে ধরল তাকে। চিৎকারে কানে তালা লেগে গেল ললিতের; 'স্যার...স্যার...স্যার' অজস্র প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছিল ললিত— কোথায় ছিলেন স্যার? কী হয়েছিল স্যার? কেমন আছেন স্যার?

এক পা-ও এগোনোর জো ছিল না আর। খোলা রাস্তার ওপরেই তার পায়ে টিপ টিপ করে প্রণাম শুরু হয়ে গেছে। পায়ের চামড়ায় কচি হাতগুলো খাবলে দিচ্ছে, ঘষা খাচ্ছে, কাড়াকাড়িতে নখের আঁচড় লাগছে। ধাক্কায় বেসামাল ললিত হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে টাল খাচ্ছিল। মনের কোনও চিন্তাশক্তি ছিল না ললিতের। আবেগে সে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। চোখের পাতা বুজে আসছিল তার— দুর্বল শরীর যে-কোনও সময়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে পারে, তবু বড় ভাল লাগছিল ললিতের। যেন চার দিক থেকে প্রাণ আর জীবন তাকে চেপে ধরেছে, হঠাৎ কোথাও তার যাওয়ার উপায় নেই, আর কোনও বহুদূরে নয়। সে দেখছিল যেন হাজার হাজার ছেলে তাকে ঘিরে ধরেছে।

ললিত জানে ছেলেদের কাছে সে কত প্রিয় ছিল। ক্লাসে অনেক দিন ফাঁকি দিয়েছে সে, পড়া ফেলে রেখে গল্প করেছে, কিংবা অকারণ টাস্ক দিয়ে বসিয়ে রেখেছে ছাত্রদের, তারপর আর সে টাস্ক দেখে দেয়নি। তবু ললিত স্যার ছেলেদের বড় প্রিয়, সবচেয়ে প্রিয়। তাই ছেলেদের হল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ অনুভব করল যে, সে বড় বেঁচে আছে। মনে মনে সে বলছিল, ধন্যবাদ, তোমাদের ধন্যবাদ।

তার অবস্থা দেখে মাস্টার মশাইরা অনেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন। ললিত শুনল উদ্ধববাবু চিৎকার করছেন, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, স্যারের অসুখ, ভয়ংকর অসুখ। সরে যা। দম নিতে দে... পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নড়া ধরে বেড়াল ছানার মতো সরিয়ে দিয়ে ধমকাচ্ছিলেন— আদরে মেরে ফেলবি রোগা মানুষটাকে! হট সব হটে যা...

দু'পাশ থেকে তার হাত ধরে উদ্ধববাবু আর পণ্ডিতমশাই তাকে কমনরুমে নিয়ে এলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে তাকে দেখে। মাথার ওপর ফ্যান চালিয়ে দেওয়া হল, বসতে দেওয়া হল জানালার কাছে সবচেয়ে সুন্দর জায়গার চেয়ারটিতে।

লোকের ভিড়ে নিজেকে আর অনুভব করতে পারছিল না ললিত। এত উত্তাপে আদরে উৎকণ্ঠায় সে গলে চার দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। ক্রমান্বয়ে হাসা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না, আর মাঝে মাঝে 'এখন কেমন আছেন?' এই সাধারণ প্রশ্নটির উত্তরে সে মাথা নেড়ে বলছিল, ভাল, বেশ ভাল। তাকে ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। অজস্র কথার শব্দ হচ্ছে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবু সুবোধবাবু ভাঁজকরা একটা খবরের কাগজ তার মাথার ওপর পাখার মতো নাড়ছিলেন।

ললিত দেখল জানালা বেয়ে উঠেছে ছেলেরা। শিকের ও-পাশে তাদের ঘিঞ্জি মুখ, দরজার চৌকাঠের ও-পাশ থেকে শরীর ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরে ঢোকা বারণ বলে। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা ভিড় সরাতে সরাতে চেঁচাচ্ছে। ললিত তার চেনা মুখগুলো দেখছিল...সাধন...অমিতাভ...নিশীথ দে... অরুণ বরুণ দুই ভাই... হাতকাটা পশুপতি... অনেকের নাম মনে নেই। সে দেখল কানু বেয়ারা ভিড় ঠেলে প্লেট ঢাকা এক গ্লাস জল নিয়ে তার দিকে আসছে— সেই কানু যে কোনও দিন ললিতের বশ মানেনি। সে সুনীল হালদারকে দেখতে পাচ্ছিল— যার কাছে গত দু' বছর ধরে তার পঁচিশটা টাকা পাওনা আছে। বেঁটেখাটো প্রতাপবাবুর হাসি-হাসি মুখটি ভিড় ঠেলে এগিয়ে আছে— কিছু দিন আগে তিনি ললিতের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন। সম্ভবত এখন বিয়েটা হয়নি বলে নিজের ভাগ্যকে তিনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন। তবু সকলের প্রতিই একধরনের কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিল ললিত।

তার মনে হচ্ছিল এ-রকমভাবে সকলেই যদি চায়, সকলেই যদি ভালবাসায় বেঁধে রাখে তাকে, তবে কে তাকে নিয়ে যাবে জীবন থেকে! কী করে মরবে ললিত!

পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা বাজছিল। দশটা পঞ্চান্ন। জানালা থেকে টুপটাপ করে খসে পড়ছে কচি মুখগুলি, তার চারধারের চাপ ভিড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। স্কুল বসবে। ঘণ্টা বাজছে।... স্কুলের ঘণ্টা তার বড় চেনা। তবু হঠাৎ মনে পড়ে বিষাদময় সেই ঘণ্টার শব্দ— বড় স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার আগে যেমন বাজে। ভিড় আলগা হয়ে যাচ্ছে চার দিকে... ললিতের অস্তিত্ব থেকে খসে যাচ্ছে চেনা, প্রিয় মানুষেরা... ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই।

॥ চার ॥

রাত্রিটা খুব ছোট ছিল। খুব ছোট-ভোরের ঘুমে সে স্বপ্ন দেখছিল, চন্দনের গন্ধওলা সাবানের ফেনার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আছে সে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চোখ খুলেই সে দেখতে পেল দুধের মতো সাদা সুন্দর বুকে দুটি স্তন, সরু একটি সোনার চেন স্তনের ওপর দিয়ে ঝুলে তার কপালে লেগে আছে। রিণি, তার বউ।

সঞ্জয় হাসল। এক হাতে আলতোভাবে তার মাথা বুকে চেপে রেখে অন্য হাতে মাথার চুলের মধ্যে বিলি কাটছে রিণি। রিণি— রিন্তি— রিন্তু— তার বউ— তার সোহাগী। সঞ্জয় চোখ বোজে আবার। পাতলা একটা চাদরের তলায় দু'জনেরই খালি গা। শরীরের ওম ঘন হয়ে আছে রিণির— শরতের সকালের মৃদু হিম থেকে তাকে ঘিরে আছে। মাথাটা আরও ভাল করে রিণির বুকে তুলে দেয় সঞ্জয়, সারা রাতে মাথা-রাখা উষ্ণ বালিশের স্বাদ একঘেয়ে হয়ে গেছে। রাতে গায়ে পাউডার মেখেছে রিণি। চন্দনের গন্ধ।

মাথাটা আবার বালিশের ওপর ঠেলে দিল রিণি, ওঠো, উঠে পড়ো।

সঞ্জয় গুনগুন করে, রিন্তু মিন্তু সিন্তু নিন্তু!

সুগন্ধ চুলের গোছা তার মুখের ওপর ফেলে নিচু হয় রিণি, হয়ে বলে, আর বাকি রইল কী? কিন্তু কিন্তু? ওঠো, উঠে পড়ো।

কখন থেকে আদর করছ আমাকে?

অনেকক্ষণ।

জাগাওনি কেন?

ঠিক সময়ে জাগিয়েছি।

দুই বালিশের ফাঁকে রাখা সঞ্জয়ের হাতঘড়ি বের করে এনে দেখে রিণি, ছ'টা দশ।

ঠিক সময়! ঠিক সময়! সঞ্জয় কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হল, কী করে বুঝলে ঠিক সময়! কীসের ঠিক সময়! কেন ঠিক সময়!

আঃ! অত জানি না। ছ'টা এগারো-বারো হয়ে গেল।

ঠিক সময় ছ'টা দশ! বলতে বলতে সঞ্জয় আবার বালিশে মাথা রেখে গড়ায়, ঠিক সময় ছ'টা এগারো বারো তেরো। আদরের ঠিক সময়, বিছানা ছাড়ার ঠিক ঠিক সময়, চায়ের ঠিক সময়, কাগজের ঠিক সময়...

পাগল!

পাগলামির ঠিক সময়।

সারাদিন তুমি অত কাজের, কিন্তু সকালে ভীষণ কুঁড়ে।

কুঁড়েমির আজিকে সময়... সময়! না অবসর?

দেখো, পিকলুটার বোধ হয় জ্বর।

জ্বর?

মনে হচ্ছে। সারা রাত জ্বালিয়েছে। সকালে আবার ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। তোমার যা ঘুম, টেরও পাওনি।

রিণির ওধারে অয়েল ক্লথের ওপর পাতা পিকলুর বিছানা। তাদের ছেলে। বয়স সাত মাস। হাতের

ভর দিয়ে উঠল সঞ্জয়, রিণির শরীরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত পিকলুর গা দেখে বলল, দূর! জ্বর কোথায়! গা ঠান্ডা।

কী জানি। মনে তো হচ্ছে। রাতে কয়েকবার কেশেছিল তো!

সঞ্জয়ের হাত গায়ে লাগতে পিকলুর ঘুমন্ত ঠোঁট ফুলল, ফোঁপানির শব্দ হল একটু। সঞ্জয় হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, শ্রীমান ক্রন্দন। তারপর বাউল সুরে গুনগুন করল, আপনজনরে চিনলি না রে মন, বাঁচবি ক্যামোনে? বাউল সঞ্জয় বলে...

ও কী কথা! ধমক দেয় রিণি, বিশ্রী!

কেন! গান! সঞ্জয় বাউলের রচনা।

ছাই গান। রিণি পিকলুর বুকের ওপর আলতো হাত রেখে আস্তে করে বলল, ও বাঁচবে। বাঁচবার জন্যই এসেছে।

মেঝের ওপর খবরের কাগজ পড়ে ছিল। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে আনল সঞ্জয়, রিণির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখো তো প্রথম পৃষ্ঠায় কী কী খবর আছে।

তুমি দেখো।

কাগজ না দেখে, চোখ বুজেই সঞ্জয় বলতে লাগল, প্রথম হেডিং একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, প্লেন ক্র্যাশ, খনিতে ধস, একটু ছোট হেডিং— হাঙ্গামায় চারজন খুন, বিস্ফোরণে কয়েকজন হতাহত, রাহাজানি, ডাকাতি, ভিয়েতনামে বোমার শিলাবৃষ্টি...

চুপ করো।

চোখ চেয়ে হাসল সঞ্জয়, এরপরও আশা হয় বাঁচবে?

আঃ।

বেশ শক্ত ব্যাপার। রিন্তু-মিন্তু, পিকলুর পক্ষে ব্যাপারটা বেশ শক্ত হবে। আরও খারাপ দিন আসছে।

তার কথায় কান দিল না রিণি। সে ঝুঁকে পড়ে পিকলুর কপালে নিজের গাল ঠেকিয়ে জ্বর বুঝবার চেষ্টা করছিল।

শ্রীমতী বাতিক। কাগজটা ফেলে দিয়ে সঞ্জয় বলল।

বলে বিছানা ছাড়ল সে। মেঝের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তার শরীর থেকে ঘুমের আর আলসেমির জড়তা ঝরে গেল। এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস— বিশ্রাম বা কুঁড়েমি থেকে চট করে আবার কাজের মধ্যে চলে আসা। বিছানা ছাড়ার পরও আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে বা ঘুমের আমেজকে বজায় রাখতে গিয়ে সে সময় নষ্ট করে না। সে অনেকটাই ঘড়ির অনুশাসন মেনে-চলা মানুষ। কাজের লোক। সবসময়ে নিজেকে যে-কোনও কাজের জন্য তৈরি রাখা তার প্রিয় অভ্যাস। তাতে মানুষ অহংকারী না হয়েও নিজেকে গুরুত্ব দিতে শেখে। সে শিখেছে। অবশ্য এ-ব্যাপারে সে খুব কড়াকড়ি করে না— যতটা করলে দৃষ্টিকটু দেখায় বা অন্যে অস্বস্তি বোধ করে। কাজের সঙ্গে মজাও তার প্রিয়। মন হালকা না থাকলে সে কাজ করতে পারে না। মেঘলা আকাশ, গোমড়া মুখ, গভীর চিন্তা তার অপছন্দ।

চমৎকার দিন। ঝলমল করছে রোদ। শরৎকাল। পুজো-পুজো ভাব। আপন মনে হাসল সঞ্জয়। চমৎকার দিন... বেশ দিন... হালকা দিন... উড়ে যাব... উড়ে যাই...

বাথরুমের র‍্যাক থেকে টুথব্রাশ তুলে নিয়ে সঞ্জয় দেখল ব্রাশটা পুরনো হয়ে গেছে। বদলাবার সময়। সে ব্রাশটার সঙ্গে কথা বলছিল— সুপ্রভাত শ্রীযুক্ত ব্রাশ, আপনার শরীরটা তো ভাল দেখছি না। বুড়ো হয়ে গেছেন। এটাই বিশ্রামের ঠিক সময়। বিশ্রাম? সেও কি আপনার কপালে আছে? হয় আমার জুতোর র‍্যাকেস, নয়তো রিণির গয়না পরিষ্কার করার কাজে আপনাকে লাগতে হবে। জীবনটা এ-রকমই মশাই, যতক্ষণ কাজ আদায় হয় কেউ ছেড়ে দেয় না।... শ্রীমতী পেস্ট, আপনি একেবারে যুবতী, তবু বুড়ো ব্রাশটার ঘর করতে হচ্ছে! চিন্তা নেই, শিগগিরই আসছেন নতুন বর— ঝকঝকে নতুন...

বাথরুমের আয়নায় তার ছায়া পড়েছিল। সেদিকে চেয়ে হাসল সঞ্জয়— পুরনো বন্ধু সঞ্জয়, আহা বড় দুঃখে ছিল লোকটা। কেবল ধৈর্য অধ্যবসায় আর দুশ্চিন্তাহীন মন ছিল বলে বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। এখন মজায় আছে।

*চোখ টিপল সঞ্জয়, ফিস ফিস করে বলল, কী টু-পাইস হচ্ছে?*

হচ্ছে তো। বলে হাসল। তারপরই মেঘের ছায়ার মতো একটু ম্লানতা এসে গেল তার মুখে। তার মুখের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পেস্টের ফেনা। অমানুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে। দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে সে একটু হাসল, অস্ফুট গলায় প্রশ্ন করল, ভাল আছ তো, সঞ্জয়?

বোধ হয় ভালই আছে সে। ভাল থাকা এক-এক রকমের। যদি অতীতের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে সে ভালই আছে। মন সে-কথা মানছে কি? না, মানছে না। তাতে কিছু আসে যায় না। যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী তার ভাল থাকা উচিত। সততা, কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা তিনটেই তার ছিল। যা মানুষকে সফলতা এনে দেয়। সফলতা, সুখের মৃদু উত্তাপ, নিরাপত্তা। ঝকঝকে সুন্দর বাথরুমটার নানা জায়গায় চোখ রাখল সে। আয়নার তাকের ওপর শ্যাম্পুর শিশি, ও-ডি কোলান, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই, রুপোর মতো চকমকে র‍্যাকে পরিষ্কার তোয়ালে, দুধের মতো সাদা বেসিন, কমোড, চৌবাচ্চার পাশে  তাকের ওপর রাখা শীতকালের জন্য জল গরম করার যন্ত্র। চমৎকার নয়! বছর দুয়েক আগে সে হিন্দুস্থান পার্কের এই আধুনিক ফ্ল্যাটখানা ভাড়া নিয়েছিল। দেড় ঘরের ফ্ল্যাট, তিনশো  টাকা। খুব বেশি কি? বেশি না, মোটামুটি ভাল থাকার পক্ষে বেশি না মোটেই। যে কেউ স্বীকার করবে। আবার হাসল সঞ্জয়। প্রচুর ফেনায় তার ঠোঁট দু'টোই ঢেকে গেছে, প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে তার হাঁ-মুখকে। অনেকটা বাঘের মতো, না? বাঘের মুখ কি এ-রকম হয়? হবেও বা। অনেক কাল বাঘ-টাঘ আর দেখেনি সঞ্জয়।

সততা, কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা। তিনটেই ছিল তার। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে বাঁ হাতের দু'টো আঙুল তুলে দেখাল, অস্ফুট গলায় বলল, এখন দু'টো আছে! শেষ দু'টো! কিংবা কে জানে শেষটাও আছে কি না! তবে দু'টোই বাদ দাও হে, ধরো একটাই আছে। কর্মক্ষমতা। শেষ পর্যন্ত যদি এটাও থাকে তবে ভাগ্য ভাল... হারাধনের দশটি ছেলের যা হয়েছিল... মনে নেই।

মুখ ধুয়ে সে গুনগুন করে গান গায়, সুখে আছি, সুখে আছি...

ঠিক সাড়ে আটটায় খাবার খায় সে। সাজিয়ে দেয় রিণি। মুড়মুড়ে টোস্ট আর মাখন, ডিমসেদ্ধ, কোকো মেশানো এক গ্লাস দুধ। ব্যস। দুপুরে অফিসেও শুকনো লাঞ্চ সারে সে— রুটি মাংস কিংবা টোস্ট ডিম-সবজিসেদ্ধ-কলা-কফি। দিনে ভাত খায় না সে। অনেককালের অভ্যাস— প্রায় সেই প্রথম যৌবনের কিংবা শেষ কৈশোরের। যখন সে বোস অ্যান্ড কোম্পানিকে নিজের হাতে তৈরি করছে। নানু বোসের সেই কোম্পানি।

খাওয়ার জায়গাটা ছোট্ট। একটা মাঝারি টেবিল পাতায় জায়গাটা জুড়ে গেছে। এক পাশে গ্রিল দেওয়া, গ্রিলের ও-পাশে বাগান। নীচের তলার ফ্ল্যাট বলে ঘর থেকে বাগানের কিছু গাছপালা দেখা যায়। গ্রিল ঘেঁষে একটি গন্ধরাজের গাছ। যতক্ষণ খায় সঞ্জয় ততক্ষণ বারবার গাছপালাগুলোর দিকে চেয়ে থাকে, রোদ বৃষ্টি কিংবা কুয়াশার খেলা দেখে। আজ চমৎকার রোদ, না-ঠান্ডা না-গরম একটি দিন। আজ উড়ে যাব...উড়ে যাই...

মনের মধ্যে আজকাল মাঝে মাঝে ম্লান মেঘের ছায়া আনাগোনা করে। কখনও একটু ক্লান্তি। বয়স হয়ে যাচ্ছে? দুধের গ্লাস নামিয়ে রেখে সঞ্জয় বলল, বয়স হয়ে যাচ্ছে।

সে-কথার উত্তর না দিয়ে রিণি বলল, মনে করে একটা লিপস্টিক এনো তো! আর পিকলুর জন্য একটা বিলিতি ফিডার।

লিপস্টিক, কোন শেড?

রোজি ড্রিম।

রোজি ড্রিম! রোজি ড্রিম... গোলাপি স্বপ্ন... গো লা পি স্বপ্ন... স্ব প্না লি গোলাপ...

কী হচ্ছে আবার!

নামটা একদম খাপ খায় না।

খাপ খায় না কেন?

গোলাপি স্বপ্ন একদম মেলে না আমার সঙ্গে। বাজে নাম।

হোক বাজে। আমার পছন্দ!

আচ্ছা, শ্রীমতী জিদ, ইচ্ছে মতো সাজো। তোমারে সাজাবো যতনে...। তোমারে, না তোমাকে? আজকাল বড় ভুল হয়ে যায়, বুঝেছ! বয়স হয়ে যাচ্ছে।

বুঝেছি, দাদামশাই।

হাসল সঞ্জয়। পিকলুকে আদর করে বলল, বিলিতি ফিডার চাই! ব্যাটা নবাবপুত্তুর।

আজ উড়ে যাব। চমৎকার দিন, সুন্দর দিন আজ। রিণির লিপস্টিকটার কী যেন রং! গোলাপি স্বপ্ন! গোলাপি স্বপ্নের মতো দিন। সাজতে বড় ভালবাসে রিণি, এখনও। সব কিছুই তার বিলিতি হওয়া চাই। বিলেতের ছোট জামা, বিলেতের লিপস্টিক। শোওয়ার আগে রিণি দাঁত মাজে, গায়ে পাউডার দেয়। ভুল হয় না। বিকেল-বিকেল খোঁপা বাঁধে— নতুন নতুন সব খোঁপা— তাতে বিনুনি নেই, ফিতে নেই। চোখের পাতায় ম্যাস্কারা লাগায়, ভ্রূ-তে পেনসিল। কার জন্য এত সাজগোজ, রিণি? কারও প্রেমে পড়োনি তো? দেখো ডুবিয়ো না। রমেনটার তাই হয়েছিল। বেচারা। কোথায় যে চলে গেল তারপর ময়মনসিংহের সেই জমিদারের ছেলেটা। যাকগে। আজ চমৎকার দিন রিণি, সুন্দর দিন। এই বেলা সাজগোজ করে নাও। বয়স হয়ে যাওয়ার আগে, পিকলু বড় হওয়ার আগে, পিকলুর আর সব ভাইবোনেরা এসে পড়ার আগে, তারপর ওদের দিন, পিকলুদের আর তাদের প্রণয়িনী বা স্ত্রীদের, যদি অবশ্য পিকলুরা ততদিন বাঁচে, যদি যুদ্ধটুদ্ধ আর না হয়, যদি দেশটা আরও পচে না যায়। তোমাদের আমি সুখে রেখেছি তো! রাখিনি? আমার তিনটে জিনিস ছিল— সততা, কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা। প্রথম আর শেষটা পকেটমার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, খুঁজে পাচ্ছি না। কর্মক্ষমতাটা আছে এখনও। কিন্তু সে আর ক'দিন? বয়স হচ্ছে, বয়স হলে মানুষের কিছু সদ্‌গুণ ঝরে যায়, বদলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। তোমাদের জন্য আমি দু'টো জিনিস দিয়ে দিয়েছি।

হ্যাঁ, অনেক দিন পর্যন্ত আমার তিনটে গুণই ছিল। ছেলেবেলা থেকে। যখন আমি চায়ের দোকানের বাচ্চা বয়, কিংবা মোটরসারাইয়ের কারখানার ছোকরা কারিগর, তারপর হন্যে হয়ে ঘোরা। না, তখনও চুরি করিনি, মিথ্যে কথা বলিনি— ভয় করত। ধর্মভয়? হবেও বা। নানু বোস আমাকে তুলে নিল একদিন। নিজে নিজে তখন অর্ডার সাপ্লাইয়ের চেষ্টা করছি, নানু বোস ছিল সরকারি পারচেজ-এ— দু' হাতে পয়সা মারছে। আমাকে দু'-একটা অর্ডার দিত পয়সা না নিয়ে, দয়া করেই। তারপর একদিন আমাকে ডেকে বলল, এভাবে পারবেন না। আপনি সৎ লোক, খাটিয়ে লোক আছেন। আমার সঙ্গে হাত মেলান। কোম্পানি করছি রঙ্গিনী বোসের নামে— আমার বউ। সরকারি চাকরি, বুঝতেই পারছেন। নিজের নামে করতে পারি না। সব আপনি দেখবেন, টাকা আমার। ভাববার কিছু নেই।

ভাববার কিছু ছিল না। নানু বোসের কোম্পানি খুললুম আমি। বোস অ্যান্ড কোম্পানি। প্রথম দেড় মাস একটিও অর্ডার নেই। সারা দিন শুধু ঘোরা আর ঘোরা। নানু বোসের নিজের দেওয়া সরকারি অর্ডারগুলো বাদ দিলে বিজনেস ছিল পুরো ঝুল। মাইনে নিতে আমার লজ্জা করত। মাস ছয়েক পুরোটাই ক্ষয়ক্ষতিতে গেল। চাঁদনিতে অফিসঘর— তার ভাড়া, বেয়ারার মাইনে, ভাগের টেলিফোনের বিল, তা ছাড়া থোক টাকা আটকে ছিল স্টিলের আলমারি, টাইপরাইটার টেবিল চেয়ার ইত্যাদিতে। ভয় করত— যদি না পারি! নানু বোস ভরসা দিল— মাছের চোকলার মতো টাকা আছে আমার। আপনি চিন্তা করবেন না, চালিয়ে যান। আঃ রিণি, কী যেন তোমার লিপস্টিকটার নাম। গোলাপি স্বপ্ন, না স্বপ্নালি গোলাপ! ঠিক আছে, মনে থাকবে। তোমার চেহারাটা ভাল। যদি চেহারাটা ভাল না হত তা হলে লিপস্টিক কতদূর কী করতে পারত। ব্যবসাতেও তাই। ব্যবসা টাকায় দাঁড়ায় না ততটা, যতটা দাঁড়ায় চরিত্রে। নানু বোসের কোম্পানি তাই দাঁড়াল। আমার তিনটে জিনিস ছিল— তিনটে জিনিস— মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপুড় করে কড়ির ঢল নেমে এল নানু বোসের ঘরে। সম্ভবত তার ইচ্ছে ছিল বউয়ের ব্যবসা দেখিয়ে কিছু কালো টাকা সাদা করবে, কিন্তু লাভ দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনে কৌতূহল এল, আর সন্দেহ। ইচ্ছে করলে আমি কি নানু বোসের লাল কোম্পানিকে সাদা করে দিতে পারতুম না? আজকের সুন্দর দিনটার নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, মাস-মাইনে ছাড়া আমি কিছুই নিইনি। সেই আমার প্রথম যৌবনের সময়টায় আমি বোস অ্যান্ড কোম্পানির জন্য উর্ধ্বশ্বাস— মেয়েদের ভাল করে লক্ষ করিনি, আকাশ গাছপালা বা প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্য দেখার জন্য দাঁড়াইনি, হাসি ঠাট্টাও কম করেছি। তাতে লাভ হয়নি। কোম্পানি বড় হয়েছে বলে নতুন কিছু

লোক নিল নানু বোস, আর নতুন লোকেরা ছিল তারই আত্মীয়— একজন ভাইপো, অন্যজন শালা। তারপর ক্রমে ক্রমে...কিন্তু তাতেও খুব একটা ক্ষতি হয়নি, কী বলো রিন্তি-মিন্তি- সিন্তি-নিন্তি! বোস কোম্পানি থেকে আমাকে ছাড়িয়ে দিলেও আমার কিন্তু তিনটে জিনিস ঠিকই ছিল— তিনটে জিনিস আর হাসি-ঠাট্টা করার মতো মনের জোর। অফিস আর কোম্পানিগুলো চিনত আমাকে— এই সঞ্জয় সেন, সৎ নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী। না, এ আমাদের কখনও ফাঁকি দেয়নি।.. একটু কষ্ট হল কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। এবার চাকরিতে, ম্যাকগুইয়ের অ্যান্ড কোং। এক বছর পর পঞ্চাশ টাকা বেশি মাইনেয় জোহানসন অ্যান্ড দালাল— আমার এখনকার কোম্পানিতে। দু' বছর সততা নিষ্ঠা আর উদ্যমে চাকরি করার পর আমাকে দেওয়া হল পারচেজ-এ, জুনিয়ার অফিসার। কোম্পানির জন্য মালপত্র কিনবার আংশিক ভার। অর্ডারে আমার সই থাকে। মাইনে বেশি না। কিন্তু পাকা কাঁঠালের মতো অবস্থা আমার, চার দিকে মাছি ভন ভন করে। কোম্পানি জানত পয়সা খেয়ে পারচেজের লোকেরা কোম্পানিকে বেচে দিচ্ছে। তাই আমার মতো একজন লোককে তাদের দরকার ছিল এখানে। তখনও আমার তিনটে জিনিস ঠিক ঠিক ছিল, আমি দু' হাতে লোভ ঠেকাতে লাগলুম। আমার রিনরিন, রিন্তি-নিন্তি, এটা দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ জেতার চেয়ে কিছু কম শক্ত ছিল না। ভয় পেয়ে আমি ওপরওয়ালার কাছে দরবার করলুম— আমাকে আমার পুরনো সেকশন এস্টিমেশনে ফিরিয়ে নাও। ওপরওয়ালা প্রথমে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, তারপর হাসল— তোমার অসুবিধেটা আমরা জানি। তবু কাজ করে যাও। আর দেখো, কোম্পানির ক্ষতি না করে তুমি যদি পয়সাওয়ালা হতে চাও হও। তাতে ক্ষতি নেই, আমরা তবু তোমাকে সৎ, নিষ্ঠাবান আর কাজের লোক বলেই জানব। আমরা জানি যে আমরা তোমাকে মাত্র চার শ' টাকা মাইনে দিই, যা এই বাজারে একেবারেই যথেষ্ট নয়। আমরা ইনকনসিডারেট নই। ভাগ্য ফেরাবার এটাই তো বয়স, ঠিক বয়স তোমার।

আমার সেই দার্শনিক ওপরওয়ালা আসলে আমার ওপর ডাকাতি করতে চেয়েছিল। মূল্যবান তিনটে জিনিস ছিল আমার। আঁকড়ে ধরার মতো, জীবন দেওয়ার মতো। আসলে আমার সেই ওপরওয়ালা জ্ঞানী লোকটি জানত, পারচেজে সৎ লোকের থাকাটা সেই লোকের পক্ষে বিপজ্জনক। অন্যেরা তার সম্বন্ধে অস্বস্তি আর সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে ক্রমান্বয়ে। সেটা অনেক দূর গড়াতে পারে।

আমি টিকে গেলুম পারচেজে। দু' বছর আগে তুমি এলে। বড় মজার ব্যাপার হয়েছিল। তোমার বাবা অর্ডার নিতে এলেন— ফরসা রোগা মানুষ, চোখা নাক আর কৌতুকে মিটমিট করছে চোখ। দূরদর্শী লোক, তিনি কোম্পানিকে জানেন, আর আমার চাকরি আর পজিশনের গুরুত্ব বুঝলেন। হয়তো ভাবলেন— ছোকরার এক-আধটা গুণ কেড়ে নিলে ধাঁ করে উন্নতি করে ফেলবে। কিন্তু সেজন্য তিনি উপদেশ দিলেন না, ভিড়িয়ে দিলেন তাঁর সুন্দর মেয়েটিকে, বিয়েরও দেরি করলেন না। এবং সম্ভবত তারপর মনে মনে হাসলেন।

আমার রিণি, এ-কথা ঠিক যে আমার টাকার দরকার ছিল। বিয়ের জন্য, বাসার জন্য, নতুন ঘরকন্নার জন্য। আমার যে অপদার্থ দাদাটা ব্যাঙ্কে পিয়নের কাজ করত তার কাছে আশ্রিত ছিল আমার বিধবা মা আর অন্ধ একটা বোন। মাস-মাইনের অনেকটাই তাদের দিতে হত। আমি থাকতুম মেসে। টাকা জমাইনি বলে হঠাৎ টাকার দরকারে একটু ঘাবড়ে গেলুম। ধার করা যেত। করেওছিলুম। ধার দিল মহাজনেরা, যারা কোম্পানিকে মাল বিক্রি করত। সেই ধার আর শোধ দেওয়া হল না।...রিণি, আমার রিন্তি, আমি কাকে দায়ী করব? যদি বলি তুমি দায়ী তা হলে দায় এড়ানো হল, যুদ্ধ জেতা হল না। আমি দায় এড়াতে চাই না। আসলে বয়স। বয়স হলে মানুষের দু'-একটা সদগুণ ঝরে যায়, বদলে অভিজ্ঞতা বাড়ে। ভেবো না যে ব্যাপারটা হঠাৎ হয়ে গেল। হঠাৎ হয় না এ-সব, হলে মানুষ সামলেও যায়। আমার মন তৈরি হয়েই ছিল, কেবল একটা অভ্যাসজনিত লজ্জা বাধা হচ্ছিল এত দিন। যখন আমি ভাবছিলুম যে আমার তিনটে জিনিসই ঠিকঠাক রয়ে গেছে, তখন বস্তুত আমার ছিল মাত্র দু'টি জিনিস, আমি তা ভাবতেও ভয় পেতুম বলে ভাবতুম না। হারাধনের তিনটি ছেলে... আঃ হা, রইল বাকি দুই। না? কী যেন তোমার লিপস্টিকের নামটা। গোলাপি স্বপ্ন, না? দেখো, ঠিক মনে রেখেছি। আনব, ঠিক আনব। ভুল হবে না। আর পিকলুর জন্য বিলিতি ফিডার। আমি সব আনব একে একে— যা যা চাই। যেমন

এনেছি রেফ্রিজারেটার, রেডিয়োগ্রাম, স্টিলের আলমারি। কে বলবে যে এ-সব আমার দরকার নেই? কে বলবে যে ভালভাবে থাকা উচিত নয়? কে বলবে তোমার ছেলেকে দিশি ফিডার এনে দাও, বউকে বলো যেন লিপস্টিকের বদলে পান খায়?... যতদিন আমার অটুট তিনটে জিনিস ছিল ততদিন আমি কি খুব ভাল ছিলুম? আর এখন নেই বলে খারাপ? মনের ঐশ্বর্য একে একে ত্যাগ করছি বলে আমাকে যদি সন্ন্যাসী বলা যায় তা হলে কি তুমি হাসবে? অত বড় তিন-তিনটে গুণ ঐশ্বর্যের মতো ছিল আমার, সেগুলি ছেড়ে দেওয়া কি কিছু কম ত্যাগের ব্যাপার? চমৎকার দিন আজ, সুন্দর দিন, পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে আমার ট্যাক্সি... উড়ে যাই। এখন চাকরি ছাড়াও আমার নিজের কোম্পানি আছে, আমার সেই অপদার্থ দাদা সেখানে আমার পার্টনার, সেই কোম্পানি থেকে অফিসার হয়ে আমি মাল কিনি...রিণি, মাঝে মাঝে বড় অবাক হতে হয় যে আমার বেচা জিনিস আমিই কিনছি। বোধ হয় জীবনের সর্বত্রই এ-রকম, না? কে জানে! সুন্দর একটি উজ্জ্বল দিনের মধ্য দিয়ে আমি উড়ে যাচ্ছি... উড়ে যাই...

অফিসে দুপুরের দিকে একটা টেলিফোন পেল সঞ্জয়। ফোন তুলে 'হ্যালো' বলে শুনলে ও-পাশে মৃদু ভিতু ধরনের একটা গলা, বলছে, সঞ্জয়, তুই কি সঞ্জয়? আমি সঞ্জয় সেনকে চাইছি।

সঞ্জয় বলছি।

আমি ললিত।

ললিত! বলে স্তব্ধ হয়ে রইল সঞ্জয়।

হ্যাঁ। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি।

সঞ্জয় সামান্য চমকে-ওঠার ভাবটা সামলে নিয়ে হাসল, উঁচু গলায় বলল, ললিত, ভাই, কেমন আছিস এখন? দ্যাখ, হাসপাতালে সেই যে একদিন তোকে দেখতে গিয়েছিলুম, তারপর আর যাওয়াই হয়নি, এমন বিশ্রী চাকরি। ইস ললিত, কবে বেরোলি জানতেই পারলুম না, একটা খবর দিলি না কেন?

এই তো দিচ্ছি। আসল খবর হচ্ছে এখন গোনাগুনতি দিন হাতে আছে। সময় বেশি নেই। তোদের সঙ্গে একটু দেখা হওয়া ভাল।

ফালতু কথা ছাড়। কোথা থেকে ফোন করছিস?

স্কুল থেকে।

শোন, তুই স্কুলে থাক একটু, আমি অফিস থেকে কাট মারছি, ট্যাক্সি করে গিয়ে তোকে তুলে নেব।

তারপর?

তারপর হবে একটা কিছু। সেলিব্রেশন।

ললিত হাসল, তার দরকার নেই। তুই বরং বিকেলে আয়। তুলসীও আসবে। আমি বাসায় থাকব। শরীরটা খুব ভাল নেই রে।

আচ্ছা।

ফোন রেখে দিল সঞ্জয়। একটু বসে রইল চুপচাপ। হঠাৎ লক্ষ করল টেবিলের কাচের ওপর রাখা তার হাতের আঙুলগুলো সামান্য কাঁপছে।

॥ পাঁচ ॥

ললিত প্রথম ফোন করল মানস নামে একটি ছেলেকে তার অফিসে। বড়পিসির পাশের বাসায় থাকে ছেলেটি। ললিত যে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছে সে-খবরটা পিসিকে দিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় ফোন করল আদিত্যকে। তাকে পাওয়া গেল না। কোনও দিন পাওয়া যায়ও না। বরাবর তার পাশের টেবিলের কালীনাথ উঠে এসে ফোন ধরে, আর সেই একই কথা বলে, না, উনি তো টেবিলে নেই, সকাল থেকেই দেখছি না।...না, না, এসেছেন দেখছি, এসেই তারপর... আপনার নামটা বলুন, বলে দেব।

আজও নাম বলল ললিত।

কালীনাথ পরিচয়ের হাসি হাসল, ওঃ হোঃ, আপনি! অনেক দিন আর ফোন করেননি তো আদিত্যবাবুকে। কেমন আছেন?

ইতস্তত না করেই ললিত বলল, ভাল। আপনি?

এই চলছে।

ওকে বলবেন যেন বিকেলে আমার বাসায় আসে।

বিকেলে! একটু চিন্তিত শোনাল কালীনাথের গলা, আমাদের একটা মিটিং আছে আজ, ময়দানে। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলে দেব।

আদিত্য কি মিটিংয়ে যাচ্ছে?

কালীনাথ হাসে, যেতে চায় না তো কখনও। আজ জোর করে নিয়ে যেতুম। আপনাদের কি জরুরি দরকার?

ললিত একটু ভেবে বলল, খুব জরুরি নয়। আমার একটা অসুখ হয়েছিল, আদিত্য জানে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি, একটু খবরটা দেবেন। দেখা হলে ভাল হত, কিন্তু সে কাল হলেও হবে।

আপনার কী অসুখ হয়েছিল?

ও পেটের একটা ব্যাপার।

পেট! পেট নিয়ে আমিও ভুগছি। আমারটা ক্রনিক। আপনার কী হয়েছিল?

আমারটাও ক্রনিক। সারবে না মনে হচ্ছে।

আলসার?

ও-রকমই। আচ্ছা, আদিত্যকে বলবেন।

আচ্ছা। বাংলাদেশটা মশাই পেটের জন্য গেল। আপনি একটা কাজ করবেন, বুঝবেন। কাঁচা পেঁপে আর থানকুনির ঝোল খাবেন রোজ, আর সকালে উঠে এক গ্লাস জলে আস্ত একটা কাগজি লেবুর রস, জলটা খুব খাবেন। কলের জল নয় কিন্তু, কলকাতার কলের জল পয়জন, টিউবওয়েলের জল খাবেন, বুঝলেন!

আচ্ছা। বলে ফোন রাখল ললিত। কালীনাথের ছোটখাটো রোগা ক্ষয়া কালো চেহারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল সে। তার ওপর কালীনাথ একটা ঝকঝকে রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমের চশমা পরে, আর বারো মাস ধুতি আর সাদা শার্ট। রোল্ডগোল্ডের ফ্রেমের চশমা পরলে যে-কোনও লোকেরই দু'-দশ বছর বয়স বেড়ে যায়। আর ওই সাদা পোশাক বারো মাস! ভয়ংকর একঘেয়ে। কালীনাথের সঙ্গে রোজ অনেকক্ষণ কাটাতে হলে যে-কোনও লোকেরই মানসিক ক্লান্তি আসতে পারে। কে জানে আদিত্য কালীনাথের পাশের টেবিলে বসতে হয় বলেই টেবিল-ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায় কিনা! তা ছাড়া তার পেটের অসুখের গল্পগুলোও আদিত্যর সহ্য না হওয়ারই কথা।

তৃতীয় ফোনটা ললিত করল সঞ্জয়কে।

ফোন রেখে আপনমনে একটু হাসল ললিত। সঞ্জয়! তার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী আর সচ্ছল সঞ্জয়। সবচেয়ে কম লেখাপড়া জানা। সেটা অবশ্য বোঝা যায় না, তুখোড় ইংরিজি বলতে পারে সে, হালফিল দুনিয়ার খবর রাখে। আর আছে একরোখা স্বভাব। অনেক দিন আগে একবার তারা পাঁচ-সাতজন বন্ধু ফুটবলের একটা চ্যারিটি খেলা দেখতে গিয়েছিল। পরের দিন খেলা, তারা আগের দিন রাতে খাওয়ার পর গিয়ে লাইন দিয়েছিল। রাতে বৃষ্টিতে ভিজেছিল তারা, দুটো ছাতা আর দুটো গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে ওপরে চাদর টাঙিয়ে তার তলায় বসে টর্চ জ্বেলে তাস খেলেছিল, অশ্লীল গল্প করেছিল, গান গেয়েছিল। তখনও তাদের আগে মাত্র কুড়িজনের মতো লোক ছিল লাইনে, সারা রাতে তাদের সঙ্গেও হয়েছিল বন্ধুত্ব আর পরস্পরের সিগারেট কিংবা জলের বোতলের জল খাওয়া-খাওয়ি। পরদিন বেলা বাড়ছিল আর সামনের লাইনের লোকসংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কীভাবে যে বেড়ে যাচ্ছিল! কুড়ির জায়গায় যখন প্রায় তিনশো লোকের পিছনে পড়ে গেল তারা তখন বুঝতে পারল সামনের লোকেরা জায়গা বিক্রি করছে। আট আনায় এক টাকায়। ক্রমে সে রেটও বাড়ছিল। যারা জায়গা বিক্রি করছে তাদের ফোটো আগের দিন তুলে নিয়ে গেছে খবরের কাগজের লোকেরা,

নাম পরিচয় লিখে নিয়ে গেছে। কাগজে ছাপবে— এঁরা কত বড় ধৈর্যশীল। বস্তুত ধৈর্যটা যে কেন তা কেউ জানে না। ধৈর্য টাকা এনে দেয়। সঞ্জয়কেও দিয়েছে। ঘোড়সওয়ার পুলিশ যখন এল তখন তাদের একটা লাইনের জায়গায় চার-পাঁচটা লাইন তৈরি হয়ে গেছে, কোনটা আসল কে বলবে। সেই সব লাইন ভেঙে একটা লাইন করার জন্য পুলিশ ঘোড়া চালাল, আর তখন কোথা থেকে যে কোথায় চলে গেল তারা! ধু ধু দূরে সরে গেল মাঠে ঢোকার গেট, হাজার লোক এসে গেল তাদের সামনে। ফিরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না, লাভও নয়। কিন্তু সঞ্জয় কেবল তার না-খাওয়া না-ঘুমোনো চোয়াড়ে মুখ শক্ত রেখে বলল, তোরা যা, আমি খেলার শেষে ফিরব। তাই ফিরেছিল সঞ্জয়, খেলা দেখেই। কী করে যে কে জানে। জিজ্ঞেস করলে সে শুধু বলেছিল— কেউ কখনও দয়া করে আমাকে কিছু দেয়নি। তা ঠিক! ললিত জানে। ধৈর্য, সম্ভবত ধৈর্যই সঞ্জয়কে সবই দিয়েছে, আর ওই লেগে থাকার ক্ষমতা। একটা সময় ছিল, বা এক-একটা সময় আসে যখন সঞ্জয়কে নিজের থেকে নিচু মনে হয় ললিতের— সেটা ওর লেখাপড়ার অভাবের জন্যই। মনে হয় চেষ্টা করলে, সামান্য একটু উদ্যোগী হলেই ও-রকম বা ওর চেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যেত।

কিন্তু যাওয়া যায়নি। এম এ পাশ করার পর সহজেই স্কুলের চাকরিটা পাওয়া গেল। আপাতত এটাই করা যাক, যতদিন বড় সুযোগ না আসছে— এ-কথা ভেবে চাকরি নিল ললিত। তারপর সাত বছর রয়ে গেল স্কুলে, বড় সুযোগ আর এল না। না, ভেবে দেখলে কোনও দিনই খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না ললিতের, সেই ছেলেবেলা থেকেই নয়। পরীক্ষার খাতায় পাশ নম্বর ওঠার মতো লেখা হয়ে গেলে তার আর লিখতে ইচ্ছে করেনি কোনও দিন। অনর্থক মনে হত। তাই এই স্কুল ছেড়ে পড়াটাও তার বরাবর পণ্ডশ্রম মনে হয়েছে। অনেক ছুটি, স্ট্রাইক, ফাঁকি এবং কামাইয়ের স্বাদ পেয়ে ক্রমে আরও অলস, উদ্যমহীন এবং আড্ডাবাজ হয়ে গেছে সে, দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কী করে লোকে চাকরি করে তা ভাবতেও সে শিউরে ওঠে। তাই মাঝে মাঝে সঞ্জয়ের শ্রমটাকেও পণ্ডশ্রম মনে হয় ললিতের। কিন্তু কখনও রাস্তার শো-কেসে দামি জিনিস দেখলে, কিংবা বন্ধুরা খুব দূরে বেড়াতে যাচ্ছে শুনলে, বা মা মাঝে মাঝে তাকে বাড়ি তৈরি করার কথা বললে তার মনে হয়— টাকা থাকলে মন্দ হত না। অনেক অপব্যয় অন্তত কবা যেত। কিংবা সমাজের খুব উঁচু একটা জায়গায় পৌঁছুলে ক্ষতি কী ছিল। সে মাঝে মাঝে ভেবে দেখে, কখনও কিছু হওয়ার জন্য সে চেষ্টা করেনি, কিন্তু চেষ্টা করলে সে কি পারত?

আপনমনে মাথা নাড়ল ললিত। না, পারত না। বড় হওয়ার অনেক ঝামেলা। নির্ঝঞ্ঝাটে সে বেশ আছে। তা ছাড়া ভেবে দেখলে এ-রকমই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। সে আর-একটু পয়সাওলা হলে, এমনকী অধ্যাপক হলেও সম্ভবত এতদিনে সে বিয়েটিয়ে করে ফেলত। কে জানে, বাচ্চাও হত হয়তো। তখন?

স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার মুখে অঙ্কের সতীশ হালদার ধরল তাকে। একটা ফর্ম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একটা লটারির টিকিট কিনুন।

ললিত হাসল, কত প্রাইজ?

এক লাখ দশ হাজার।

দ্যুৎ ওটুকুতে আমার কী হবে?

অন্তত সিগারেটের খরচটা চলে যাবে তো? মাত্র তো একটা টাকার টিকিট। লিখুন।

এটা সতীশ হালদারের সাইড বিজনেস, বোধহয় কুড়ি টিকিটে টাকা ছয়েক লাভ থাকে তার। ললিত অবহেলায় তার নাম লিখল।

সতীশ হালদার ফর্মটা নিয়ে নম্-ডিপ্লুমটা দেখে হাসল, কোনও মেয়ের নাম?

হ্যাঁ।

বেশ ঘরোয়া নাম। মিনু!

টাকাটা পেলে মিনুকেই দিয়ে দেওয়া যাবে। না, পুরোটা মিনুকে নয়। অর্ধেকটা মা'র। তারপর ভেবে দেখল ললিত দূর! অর্ধেক দিয়েই বা মিনু কী করবে; তার অনেক আছে, হয়তো নেবেই না তার লটারির টাকা। সে সতীশ হালদারকে ডেকে বলল, নামটা পালটাব।

কী লিখবেন?

একটু ভেবে ললিত বলল, ধৈর্য। পেশেন্স।

সতীশ হালদার লিখে নিল। তারপর হেসে বলল, লোকে নাম নিয়ে ভাবে। আসলে নামে কিছু যায় আসে না। যে-কোনও নামেই পাওয়া যায়, ভাগ্যে থাকলে।

চলে আসতে আসতে হঠাৎ ললিতের মনে হল সতীশ হালদার তার অসুখের খবর জানে তো! জানলে ললিতকে এ-রকম টিকিট বিক্রি করাটা কি ঠিক হয়েছে তার?

দুপুরে খাওয়ার পর মাকে ডেকে ললিত বলল, আমি যখন থাকি না তখন তুমি সারা দুপুর কী করো মা?

কী আর! এই এ-বাড়ি ও-বাড়ি সে-বাড়ি একটু যাই, কি ওরাই আসে আমার বাড়ি, লুডো কি তাস টাস একটু খেলা হয়, পাঁচটা কথা এসে পড়ে। কোনও দিন হয়তো বা একটু ঘুমোই।

তুমি খুব আড্ডাবাজ, না?

কেমন ছেলের মা, একটু হব না?

ও! তা হলে তোমার কাছ থেকেই আড্ডার স্বভাবটা পেয়েছি আমি! বাবার কাছ থেকে নয়।

মা হাসে, তোদের বংশই আড্ডাবাজদের বংশ। বসে খেতে পারলে আব কিছু করতে চাইবে না। ভাশুরঠাকুরকেও দেখতুম...

পুরনো কথা এসে পড়ার আগেই ললিত বলল, তোমার লুডোটা বের করো তো! পর পর কয়েক গেম হারিয়ে দিই তোমাকে!

খেলবি! একটু অবাক হয় মা।

হুঁ। মা, তুমি কি এ-পাড়ার লুডো-চ্যাম্পিয়ন?

শিশুর মতো হাসে মা, আমার হাতে খুব দান পড়ে, জানিস!

সত্যি! তবে আজ তোমার চ্যাম্পিয়নি কেড়ে নিই, এসো।

সে তোকে আমি এমনি দিলুম।

সে হবে না। খেলে দাও, দয়া করে না।

পাগলা। বলে মা মেঝেতে শতরঞ্জি বিছায়, লুডোর ছক পাতে। আঁচলে ভারী চশমাটা মুছে নেয়। বলে, তুই একটু শুয়ে থাকলে পারতিস, রোদ্দুরে অত ঘোরাঘুরি করে এলি!

সে-কথায় কান না দিয়ে ললিত কাঠের ছোট্ট চালুনিটার মধ্যে খটাখট শব্দে ছক্কাটাকে নাড়ে। দান ফেলে বলে, দেখো মা, ছক্কা!

ইস! চোখে দেখি না ভেবেছিস। পাঞ্জা!

তবে আর একবার দান দাও, এটা ট্রায়াল।

নে।

চালতে গিয়ে হাসে ললিত, নেব কেন! আমি কি উইক খেলোয়াড় নাকি!

মার একটা পোয়া পড়ল। হেসে গড়াল ললিত, এই তোমার ভাল দানেব হাত।

ললিতের অবশেষে ছয় পড়ল। পর পর দু'বার। দেখে মা'র মুখ শুকিয়ে গেল, দেখিস, সাবধানে চালিস, তিন ছক্কা না হয়। হলে পচা।

আবার ছয় পড়ল। তিন ছক্কা। মা একটু ঝুঁকে বলল, পাঞ্জা, না? দুই ছয় পাঁচ তা হলে।

ললিত মাথা নাড়ে, না। তিন ছক্কা। পচা। তুমি দেখেও দেখছ না।

মা রাগ করে, ভাল করে চাল। চালুনিটা অত জোরে নাড়িস কেন? অলক্ষুণে অভ্যাস!

ললিতের এবার পোয়া পড়ল। মা একটুও খুশি হল না।

তুমি চালো এবার। বলে চালুনি এগিয়ে দিল ললিত।

মা'র পড়ল ছয়। দুই ছয়। দম বন্ধ করে দেখছিল ললিত। তিন ছয় না হয়। না, দুই ছয় তিন। মার দু'টো গুটি বেরিয়ে গেল। 'বাক আপ' বলে চেঁচাল ললিত, এগিয়ে যাও মা, এগিয়ে যাও।

মা হাসে, তুই ভাল করে চাল। আমি ফাঁকা মাঠে এগিয়ে কী করব তুই সামনে থাকলে।

আহা, সারা খেলায় আমার যদি ছয় না পড়ে আর!

দূর, তাই হয় নাকি!

হবে না কেন! এটা তো চান্সের ব্যাপার, না-ও পড়তে পারে।

তা হয় না। ছয় পড়বেই। ঠিক করে চাল।

পড়বেই! ছয় পড়বেই! গুনগুন করল ললিত। দেখল তার দানে পড়েছে দুই।

মা'র দানের হাত সত্যিই ভাল। অনিচ্ছায় চালছিল মা তবু ছক্কা-পাঞ্জার ছড়াছড়ি হতে লাগল। ললিত বলল, তোমার কপট পাশা— না কপট লুডো মা! তুমি মন্ত্র করে রেখেছ।

মা হাসে। খেলা এগোয়। পাঁচ-ছয়-তিন-দুই-চার-পোয়া।

মা'র একটা চাল দেখে ললিত চেঁচাল, তিনের মুখে আমার গুটিটা খাও মা।

ইস! মা মৃদু হাসে, ললিতের গুটি না খেয়ে অন্য গুটি চালে মা, বলে, গুটি খাব কেন! আমি আমার পাকা গুটি ঘরে তুলব।

হতাশায় ললিত দু' হাত ওপরে তুলে বলে, এই তুমি পাকা খেলুড়ি? খাওয়ার গুটি খাচ্ছ না।

নিজের গুটি পাকাতে পারলে অন্যের গুটি কে খায়!

আমি কিন্তু খাব। ছাড়ব না।

খা না! খেতেই তো দিচ্ছি। তুই এগিয়ে যা তোর তো দানই পড়ছে না। ভাল করে চাল দেখি!

ললিতের গুটি খাওয়ার ঘরে পেয়েও এড়িয়ে যাচ্ছে মা, অন্য গুটি চালছে। নিজের গুটি এগিয়ে দিচ্ছে ললিতের গুটির মুখে মুখে। আমার গুটি খা ললিত, তুই এগিয়ে যা। তুই সামনে না থাকলে ফাঁকা মাঠ। ধু-ধু মাঠ। আমি কার দিকে এগোব, কোন ঘরের দিকে!

খেলা তাই জমে না। হেলা-ফেলা করেও মা-ই এগিয়ে যায়। ললিত পিছনে পড়ে। হাসে। বলে, খেলা জমছে না, মা।

তোর দান আমি চেলে দিই ললিত? আমার দানের হাত ভাল।

দূর। তাই হয় নাকি! খেলা খেলাই, যার দান তার দান। তুমি ফেললে দান তোমার হয়ে গেল।

মা লজ্জা পেয়ে হাসে। যখন মা'র বয়স আরও কম ছিল তখন মা মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গাইত। রামপ্রসাদি। সে-সব গানের এক-আধটা ললিতের প্রিয় ছিল। সে তার মা'র মুখে শোনা প্রিয় একটা লাইন গুনগুন করছিল, মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা মা, ডিক্রি হবে এক সওয়ালে...

একটি-দু'টি করে পাড়ার বুড়িরা দরজায় দেখা দিতে লাগল, কী হচ্ছে গো, ললিতের মা!...ওমা, তুই যে আজকাল বড় লক্ষ্মী হয়েছিস ললিত!...মায়ে পুতে খেলা, জবর খেলা গো, হারজিত আছে, না নেই?

ললিত ঝুঁকে মা'র কানে কানে বলে, মা, তুমি হচ্ছ এ-পাড়ার সব বুড়িদের মধ্যে হিরো। হিরো-বুড়ি। তোমাকে না দেখে দেখো সব দলে দলে আসছে।

ঘরে বুড়িদের জটলা হয়ে গেল। মাঝপথে খেলা ভেঙে উঠে পড়ল ললিত, বলল, এবার তোমরা খেলো, মা।

তুইও বোস না।

আমি একটু খোলা হাওয়ায় যাই।

কোথায় যাবি আবার! দুপুর রোদ এখন।

গলির মধ্যেই। একটু পায়চারি করি।

অন্য বুড়িরা কাছে থাকলে মা'র সামনে সিগারেট খায় না ললিত। তার ধারণা তাতে মাকে অপমান করা হয়। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বালিশের খাঁজ থেকে তুলে নিয়ে সে গলিতে বেরিয়ে আসে। দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখে ছয়-সাতজনের ভিড়ের মধ্যে মা বসে আছে। হিরো-বুড়ি। তোমার দলে তুমি হিরো মা, আমার দলে আমি কিন্তু হিরো নই। বাক আপ মা, আপনমনে হাসল ললিত। তুমি এগিয়ে যাও তো! দেখি কেমন আমাকে ছাড়া পারো।

ঘন ছায়ায় ঠান্ডা হয়ে আছে গলিটা। গলির মুখেই তেজি রোদ। ছুরির মতো ধারালো হয়ে আছে রোদ ও ছায়ার সীমারেখাটুকু। সেই রেখাটার ধারে দাঁড়াল ললিত। চোখ বুজে ভাবল সে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রহ্মপুত্র নদী— তাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে যা বয়ে যেত। না, দেশের কথা তেমন মনে নেই ললিতের। সে তখন ছোট, মা তখন এত বুড়ি নয়, আর বাবা বেঁচে আছে তখনও। মনে পড়ে সে

তখন সাঁতরে গাঙ পার হত, গাছে উঠত। আশ্চর্যের বিষয়, কলকাতায় এসে তার কোনও দিন গঙ্গায় নামতে তেমন তীব্র ইচ্ছে হয়নি। দেশগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই যে যেন তার সাঁতার আর গাছে-ওঠাও ফেলে এসেছে অনেক দূরে, ভিন দেশে। সেইখানে ফিরে গেলে আবার এক বার ফিরে পাওয়া যেতে পারে সেই সাঁতার কিংবা সেই কাঠবেড়ালির মতো গাছ-বাওয়া! দেশ ভাগের পর একদিন দূরের স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য শেষ রাতে তারা গ্রাম ছেড়ে এল। খুব বেশি কিছু মনে নেই ললিতের, শুধু মনে আছে ঘুমচোখে শেষরাতের অন্ধকারে পা ফেলতে গিয়ে সে তাদের উঠোনে বিষ-পিঁপড়ের ঘর ভেঙেছিল। বিদ্যুৎ চমকের মতো তার পায়ের পাতা থেকে উরু পর্যন্ত উঠে এসেছিল পিঁপড়ের কামড়। বিষ-যন্ত্রণা। চিৎকার করে কেঁদেছিল সে, আর বাবা চাপা গলায় কাকুতি মিনতি করে বলছিল 'চুপ কর ললিত, চুপ কর।' আর হাত ধরে জোরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে। তখনও ঘুমচোখ, মাথায় স্বপ্নের বাসা, দিকহীন শেষরাতের আবছা অন্ধকারে বাবার হাত ধরে কোন পথে কোথায় যে যাচ্ছিল ললিত!

ক্রমে ক্রমে আর সবকিছুই আবছা হয়ে গেছে। এখন আর ঠিকঠাক সব মনে পড়ে না। কেবল মনে আছে পায়ের পাতা থেকে উরু পর্যন্ত সেই বিষ-পিঁপড়ের কামড়। সেই বিষ-যন্ত্রণা। এত স্পষ্ট যে আজও হঠাৎ মনে পড়লে তার ভিতরকার এক ছোট্ট ললিত যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে ওঠে। ওই উঠোনে কত দাপিয়ে বেড়িয়েছে ললিত। কোনও দিন পিঁপড়ের ঘর নজরে পড়েনি। সেদিন তবে তাদের চেনা উঠোনে কোথা থেকে এসেছিল সেই পিঁপড়ের বাসা? কোথা থেকে?

কে জানে?

মা কেবল গল্প করে। নদী, নৌকো আর গাছগাছালির গল্প। মাছ, ধান আর পিঠে-পায়েসের গল্প। একঘেয়ে, তবু মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে ললিত। মায়ের গলায় জল-মাটির নোনা আর সোঁদা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। তবু সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে সেই পিঁপড়ের কামড়, শেষরাত্রির আবছায়া ঘুম ও স্বপ্নের মধ্যে এক অলৌকিক নিরুদ্দেশ যাত্রা।

## ॥ ছয় ॥

সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি, মোড় পেরিয়ে আদিত্যকে আসতে দেখল ললিত। ব্যাটা অফিস কেটে এসেছে। ওর পিছনে কালো মতো একটা মেয়ে আসছিল। প্রথমে ললিত ভেবেছিল যে পথ-চলতি মেয়ে। কিন্তু কাছে আসতে বোঝা গেল সে আদিত্যর সঙ্গে আসছে।

এই যে লোলিটা। বলে হাসল আদিত্য। রোগা-ফরসা আদিত্য, ঝাঁকড়া চুল— মোটা ঠোঁটের আদিত্য, বেঠিক পোশাকের আদিত্য। কলকাতার বনেদি ঘুঘু ওদের পরিবার, বাগবাজারে ওদের প্রকাণ্ড একটা বাড়ি আছে যার ভিতর-মহলে যাওয়া এখনও বারণ, আর ওর বাবার এখনও একজন রক্ষিতা আছে শোভাবাজারে, যাকে আদিত্য এবং তার ভাইরা রাঙা-মা না কী-যেন-মা বলে ডাকে। বাইরের চাকরি-বাকরি, আড্ডা সেরে বাড়িতে ঢুকলেই ওরা দেড়শো বছরের পুরনো একটা জগতের মধ্যে চলে যায়, যেখানে এখনও রয়েছে দেড়শো বছরের পুরনো বাসন-কোসন, বিছানা, সেজবাতি, আলমারি, পুতুল এবং আচরণ।

আয়। বলে একটু বিব্রত মুখে হাসল ললিত, বলল, ঘরে এক দঙ্গল বুড়ির ভিড়। কোথায় যে তোদের বসাব!

আদিত্য মেয়েটার দিকে ফিরে বলল, এই হচ্ছে ললিত। কাঠ বাঙাল। তারপর ললিতের দিকে ফিরে বলল, বুঝলি লোলিটা, সতীর এক মেসোমশাইয়ের ক্যান্সার হয়েছিল। অপারেশনের পর বেঁচে গেছে!

ললিত হাসল, তাই নাকি!

মেয়েটিকে এক পলকেই দেখে নিল ললিত। সম্ভবত আদিত্যর প্রেমিকা। কালোর মধ্যে মিষ্টি মুখখানা, সুন্দর বড় একজোড়া চোখ। দেখে মনে হয় প্রাণে দয়ামায়া আছে, হৃদয় আছে। চালু নয় খুব। কিন্তু রোগা নরম ধরনের শরীরটিতে মা-মা ভাব। একনজরেই ভাল লাগে। আদিত্যর কপাল ভালই। কিন্তু মেয়েটার?

ললিত মৃদু গলায় বলল, চলুন, আপনাকে আমার মা'র কাছে নিয়ে যাই। আমরা দুই বন্ধু গলিতে দাঁড়িয়ে গল্প করব।

আদিত্য বাধা দিল, তুই ওকে লজ্জা পাস না ললিত। মাইরি, তোর যা লজ্জা! পরিচয় করে নে, এ হচ্ছে শাশ্বতী ব্যানার্জি, আমি সংক্ষেপে সতী বলে ডাকি। আমাদের শিগগিরই বিয়ে হবে। কালীনাথের কাছে তোর ফোনের খবর পেয়েই কলেজে গিয়ে ওকে ধরলুম। তোর কথা ওকে অনেক বলেছি, তাই বললুম, চলো দেখে আসবে, আর তোমার মেসোমশাইয়ের গল্পটাও শুনিয়ে দিয়ে আসবে ওকে। ব্যাটা সাহস পাবে তা হলে।

ললিত আবার মেয়েটিকে বলল, ঘরে চলুন।

মেয়েটি দ্বিধায় পড়ে বলল, থাক না, আমি বরং এইখানেই দাঁড়িয়ে গল্প করি।

আদিত্য বলল, সেই ভাল। মাসিমা একা থাকলে কথা ছিল না। কিন্তু পাড়ার বুড়িদের চোখ কটকট করবে। মাসিমাকে পরে বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবে হয়তো। থাকগে। ললিত মাইরি তুই হাসপাতালে থেকে একটু লালটু হয়েছিস।

তুই তো এক দিনও যাসনি দেখতে হাসপাতালে!

মাইরি, তুই রাগ করেছিস? আমার ভাই কোনওকালে হাসপাতাল-টাতাল সহ্য হয় না, ওষুধের গন্ধ, মড়া-ফড়া, রোগের জীবাণু সব মিলিয়ে কেমন গা গুলোয়, বমি পায়, মাথা ধরে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হয় কেমন একটা ভয় ঢুকে যায় মাইরি, মনে হয় আমিও মরে যাব। রাতে ঘুম হয় না। আমাদের সাতপুরুষের কেউ হাসপাতালে যায়নি, বাড়ির বাঁধা ডাক্তারের হাতে মরেছে। তুই তো জানিস।

ললিত হাসল, ঠিক আছে, তোকে ফাঁড়া কাটাতে হবে না। ললিত মেয়েটিকে বলল, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি গায়ে একটা জামা দিয়ে আসি। পাড়ায় একটা চায়ের দোকান আছে। বাজে দোকান। সেখানে বসেই একটু গল্প করা যাবে। কেমন!

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

ঘরে ঢুকে যখন জামা নিচ্ছিল ললিত তখন মা বলল, বেরোচ্ছিস?

না। চায়ের দোকানে যাচ্ছি।

কেবল চা আর চা।

বেরিয়ে এল ললিত।

গণেশের দোকান। বাইরের দিকে কাচের বাক্সে ছানার মিষ্টি সাজিয়ে রাখে, ভিতরে ঘিঞ্জি জায়গায় একখানা বেঞ্চি আর লম্বা একটা টেবিল, অনেকটা স্কুলের হাইডেস্কের মতো। সকাল বিকেল পাড়ার বখাটে ছেলেরা আড্ডা দেয় এখানে। দুপুর বলে কেউ নেই। গণেশ তার শিয়রে কাঠের ক্যাশ বাক্স তার মুখের ওপর মাছির জন্য আধময়লা গামছা ফেলে রেখে ঘুমোচ্ছিল। ডাকতে যাচ্ছিল ললিত, আদিত্য বাধা দিয়ে বলল, দে না ঘুমোতে বেচারাকে। আমরা নিরিবিলিতে গল্পগাছা করি, ও যখন উঠবে, উঠবে।

শাশ্বতী মৃদু গলায় বলল, সেই ভাল।

তিনজনে পাশাপাশি বসল। মাঝখানে আদিত্য; দু' পাশে শাশ্বতী আর ললিত।

আদিত্য বলল, দ্যাখ, মাইরি, আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। জীবনে একটা মাত্র প্রেম করলুম, তাও বাঙাল মেয়ের সঙ্গে।

বাঙাল! ললিত ঝুঁকে শাশ্বতীর দিকে তাকাল, কোথায় বাড়ি ছিল আপনাদের?

যশোরে, কপোতাক্ষতীরে।

কপোতাক্ষতীরে!

শাশ্বতী হাসল, সাগরদাঁড়ি থেকে আমাদের গ্রাম খুব দূরে ছিল না। আমি অবশ্য দেশ দেখিনি, আমার জন্ম কলকাতায়, দেশ ভাগের পরে। তবু লোককে বলার সময়ে বলি আমরা মাইকেল মধুসূদনের প্রতিবেশী ছিলাম।

আদিত্য করুণ মুখে বলল, হ্যাঁ দ্যাখ, শাশ্বতী পুরোপুরি বাঙালও নয়, কলকাতার লোকেদের চেয়েও ভাল কলকাতার কথা বলে, ওর বাড়ির লোকেরাও তাই, কিন্তু আমার বাড়ির লোকেরা কিচ্ছু বুঝবে না। বাঙালের গন্ধ পেলেই কুরুক্ষেত্র লেগে যাবে। মাইরি দ্যাখ, আমার বেশির ভাগ বন্ধু বাঙাল, তুই, তুলসী,

সঞ্জয় আরও অনেক, নিজের পাড়ায় আমার বন্ধু নেই, তবু দ্যাখ বিয়ের সময়ে বাড়ি থেকে ঠিক করবে আর-এক ঘুণধরা বনেদি পরিবারের মেয়ে— যার গায়ে রোদ লাগেনি।

কী করবি এখন! হেসে ললিত বলে।

আমি আলাদা হয়ে যাচ্ছি বাড়ি থেকে। বলে আদিত্য শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে হাসল, বুঝলি লোলিটা, সতী বলেছে যে, ও আমাদের পরিবারে ঢুকে একটা বিপ্লব ঘটাবে। মা'কে ট্যাক্সি করে নিয়ে সিনেমায় যাবে। বাবাকে ষোলো ইঞ্চি ঘেরের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরিয়ে নিয়ে যাবে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে— । মাইরি, সতী, তোমার আয়ুটা গণৎকার দিয়ে দেখানো উচিত। আমি ও-সব রিস্ক-এর মধ্যে নেই। আমি আলাদা বাসা করছি।

ললিতের ইচ্ছে হল একবার জিজ্ঞেস করে যে, তা হলে কী করে ওদের চলবে! আদিত্য চাকরি করে সরকারের, বড় কেরানি। তবু ললিত জানে চাকরিটা ওর কিছু নয়, ওর আসল অস্তিত্ব ওর বাগবাজারের বাড়ি আর বাবার ব্যবসা। নিজের বাড়িকে যতই গাল দিক আদিত্য, তবু ললিত জানে ওই বাড়ি আছে বলেই আদিত্যকে অনেক কিছুই সইতে হচ্ছে না, ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে বাইরের পৃথিবীর নানা রকমের মার সে সইতে পারবে কি! ভাবল ললিত, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। সুখী ছেলে আদিত্য, খুব পুরু বিছানায় শোয়, কেওড়া দেওয়া জল খায়, শ্বেতপাথরের ওপর হাঁটে।

আদিত্য শাশ্বতীকে বলছিল, আমার বাবা এক্কেবারে খ্যাপা, বুঝলে! বাবা না মাইরি, একটা লোককে কামড়ে দিয়েছিল। বলে ফিরে ললিতের দিকে চেয়ে বলল, তুই তো জানিস! সেই শরিকের ঝগড়া, বাবার জ্যাঠতুতো ভাই আমাদের অন্তুকাকুকে বাবা দিনেদুপুরে কামড়ে দিল...

গল্প বলার এমনই একটা বৈঠকি চাল আছে আদিত্যর যে, যে-কোনও গল্পকেই সে সকলের শোনার মতো করে তোলে। আর-একটা গুণ— ও নিজের কিছুই গোপন রাখে না। সব বলে দেয়, মনে যা আসে সব।

গল্পটা বলতেই যাচ্ছিল আদিত্য, শাশ্বতী নিচু গলায় ওকে কিছু বলল। আদিত্য— ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বলে ললিতের দিকে চেয়ে বলল, দ্যাখ মাইরি নিজের সমস্যা নিয়ে এমন মেতে আছি, তোর খোঁজই নেওয়া হচ্ছে না।

ললিত জিজ্ঞেস করল, তোরা কবে বিয়ে করছিস?

দেখি। শিগগিরই করব। তুই একটা বাসা খোঁজ— বলেই আবার সামলে গেল আদিত্য, তোর তো আবার অসুখ— শালা, এ-বয়সে কোথা থেকে বাগালি রোগটাকে! মাইরি, পারিস তুই মানুষকে চমকে দিতে! তারপর গলা নিচু করে বলল, হ্যাঁরে লোলিটা, মরে-ফরে যাবি না তো! মাইরি, মরিস না, ভীষণ ভেঙে পড়ব রে, শালা আর বাঁচতেই ইচ্ছে করবে না। কথা দে—

কী কথা।

মরবি না।

ললিত হাসল প্রাণ খুলে। তারপর বলল, এখন আর কিছু দিতেই আপত্তি নেই। যা, দিলাম তোকে কথা।

দিলি! তা হলে মরবি না। বরং সতীর কাছে ওর মেসোমশাইয়ের গল্পটা শুনে নে।

শাশ্বতী ঝুঁকে ললিতের দিকে চেয়ে বলল, আমার মেসোমশাইয়ের গল্পটা কিন্তু সত্যি। উনি এখনও বেঁচে আছেন, চাকরি করছেন।

তাই নাকি! ললিত হাসল।

শাশ্বতী গলায় যথেষ্ট দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করে বলল, দেখবেন, আপনি সেরে যাবেন।

হঠাৎ ললিত খুব নিষ্ঠুরের মতো শাশ্বতীকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে হেসে বলল, আপনারা তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলুন। আমি যেন দেখে যেতে পারি।

বলেই দেখল শাশ্বতীর মুখ ম্লান হয়ে গেল। আদিত্য তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, শালা যমের জান লিয়ে লিব, দেখে লিস।

বিকেলের মুখে মুখে ওরা উঠল। তুলসী আর সঞ্জয় আসবে, কিন্তু সে-খবর আদিত্যকে দিল না ললিত। তা হলে আদিত্য থাকতে চাইবে। না, ওরা বরং এখন ময়দান বা গঙ্গার ধারে বা দোকানে গিয়ে

বসুক, কিংবা হাঁটুক রাস্তার সুন্দর দোকানের আলোগুলোর ভিতর দিয়ে। কথা বলুক। শাশ্বতীকে তার কাছে এনে ভাল করেনি আদিত্য। সুন্দর মেয়েটা এমন একজনকে দেখে গেল, যে আর কিছুদিন পরে মারা যাবে। হয়তো এখন নানা দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে সে দুঃখিতচিত্তে ললিতের কথা ভাববে। সভয়ে প্রতীক্ষা করবে আদিত্যর কাছে একদিন তার মৃত্যুসংবাদ শোনার। ললিত বোধ হয় আজ মেয়েটার বিকেল মাটি করে দিল, হয়ে রইল রাতে ওর মাথা ধরার বা কম খাওয়ার কারণ।

যশোরে কপোতাক্ষের তীরে ছিল ওর বাড়ি। সাগরদাঁড়ি থেকে খুব দূরে নয়। গলির মুখে দাঁড়িয়ে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে সে কবিতাখানা মনে আনবার চেষ্টা করছিল— দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে...কবিতাটা কতবার ক্লাসে পড়িয়েছে ললিত। আশ্চর্য, তবু মুখস্থ হয়নি!

## ॥ সাত ॥

সারা সকাল মৃদুলাকে একা পাওয়া গেল না। বাইরের ঘরে বাচ্চাদের পড়াচ্ছে একটি অল্প বয়সের কলেজের ছাত্রী। মাঝখানের ঘরটাতে বিছানায় খবরের কাগজ বিছিয়ে সারা সকাল দাদা বসে আছে। ভিতরের ছোট্ট বারান্দায় রান্নার জায়গা— সেখানে বউদি। বাসাটা জুড়েই দাদার সংসার। সে আর মৃদুলা দু'টো ফালতু লোক বাস করছে এখানে— এ-রকমই মনে হয় তুলসীর।

বারান্দার কোণে বসে চা খাচ্ছিল তুলসী, আর একটা চোর-বেড়ালের মতো আড়চোখে চেয়ে দেখছিল— ধপধপে সাদা পরিষ্কার একটা লালপাড়ের শাড়ি পরে মৃদুলা খুব নরম হয়ে বসে পিতলের গামলা কাত করে চাল-ধোয়া জল হাতের আঁজলায় ছেঁকে নিচ্ছে। সকালে চুল আঁচড়ে সিঁদুর পরেছে সে— নোয়ানো মাথায় লাল ধুলোর পথের মতো অনেক দূর চলে গেছে রেখাটি— শান্ত শরীর মায়ের মতো নিষ্কাম হয়ে আছে সকালের আলোয়।

সকালের দিকেই সুন্দর সুন্দর কথা মনে আসে তুলসীর। কিন্তু মৃদুলাকে বলা হয় না। সারা দিন পর যখন রাতে মৃদুলাকে একা পায়, তখন তুলসীর মাথার ভিতরটা হিজিবিজি হয়ে যায়, একটাও তেমন সুন্দর কথা মনে পড়ে না। তখন মনে হয় সারা দিন ধরে জরাজীর্ণ এক পৃথিবীর ধুলো-ময়লা গায়ে মেখে সে বিছানায় এসে বসেছে। তখন কেবল ব্যর্থতা আর অপমানগুলি মনে পড়ে— হেডমাস্টার কেমন অবহেলার সঙ্গে কথা বলেছিল, শিবকালী ঘোষ করেছিল বদ একটা রসিকতা, ক্লাস টেন-এর লম্বা কালো মতো একটা ছেলে সারা ক্লাস 'বেঞ্চে ছারপোকা সার' এই কথা বলে আর ইয়ারকি দিয়ে তাকে জ্বালিয়েছিল; কিংবা মনে পড়ে, ট্রেনে একটা অচেনা লোক ভিড়ের মধ্যে তার দিকে কেমন স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তাই তখন সুন্দর কথাগুলি মনে পড়ে না কিছুতেই। কেবল সকালবেলাতে তার মন স্মৃতিশূন্য থাকে— ফাঁকা ঘরে পাখির মতো উড়ে আসে চমৎকার সব কথা। কিন্তু মৃদুলাকে একা পাওয়া যায় না।

সকালবেলার সুন্দর কথাগুলো মৃদুলাকে বলা হয় না। ওদিকে বয়স বেড়ে যায়।

দাদার সংসারে অনেককাল থাকা হয়ে গেল তার। চুয়াল্লিশ সালে বাবা মারা গেল, তার সাড়ে তিন বছর পর মা, তারপর থেকে দিন শেষে বাসায় ফেরার সময়ে কোনও দিন তার মনে হয়নি— বাসায় ফিরছি। এখন মাঝে মাঝে তার নিজের বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে। নিজের বাসা— যেখানে সকালবেলা সুন্দর কথাগুলো সে অনর্গল শোনাবে মৃদুলাকে, সেখানে সকালে মাস্টারনি এসে বাচ্চাদের পড়াবে বলে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরের বিছানা ছাড়তে হবে না, যতক্ষণ খুশি উদোম হয়ে শুয়ে থাকবে তুলসী, ইচ্ছে হলে সারা ঘর ঘুরে চোর-চোর খেলবে মৃদুলার সঙ্গে, কিংবা চেঁচিয়ে বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি।

কত কিছুই ইচ্ছে করে তুলসীর। হয় না। চা শেষ করে একটু বিষণ্ণ অন্যমনস্ক মনে তুলসী বাজারে বেরোল। কয়েক দিন আগে স্কুলে বেরোবার সময়ে মৃদুলাকে একটু একা পেয়েছিল সে। মৃদুলা বাইরের ঘরে মাস্টারনির এঁটো চায়ের কাপ নিতে এসেছিল— সেই সময়ে দরজার আড়ালে টেনে নিয়ে এক পলকে মৃদুলাকে একটা চুমু খেয়েছিল সে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই দু' ঘরের মাঝখানের দরজার পরদা সরিয়ে বড় ভাইঝিটা ব্যাপার-স্যাপার দেখে ফেলল। ব্যাপারটা হঠাৎ হয়ে-যাওয়া কিনা কে জানে। বড়

ভাইঝি পিতু বারো বছর বয়সেই ঝানু পেকে গেছে— ফ্রকের তলা থেকে ঠেলে উঠছে বুক, চোখে চিকন কাজ দেখা যাচ্ছে তার, ছাদ থেকে পশ্চিমে ঘোষালদের যে ছাড়া জমিটা দেখা যায় সেখানে এক দঙ্গল ছেলের আড্ডা— তারা ঘুড়ি ওড়ায়, সিগারেট ফোঁকে, বদ মতলবে ভাঙা ইটের টুকরো জড়ো করে— ছাদের আলসে থেকে পশ্চিমে পিতুকে অনেকবার সন্ধেবেলায় ঝুঁকে থাকতে দেখেছে তুলসী। তা ছাড়া মৃদুলার কাছে শুনেছে যে, পিতু গোপনে মৃদুলার সুটকেস হাঁটকায়— খুঁজে দেখে কাকা কাকিমাকে গোপনে কিছু শাড়ি-টাড়ি দিল কি না। তা ছাড়া মৃদুলাকে মাঝে মাঝে নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করে, রাত্রিবেলা তোমাদের ঘরে অত শব্দ হয় কেন? কাজেই পিতুর মতো পাকা মেয়ে সেদিন— সেই চুমু খাওয়ার দিন যে কাকা-কাকিমার ব্যাপারটা দেখার জন্য ওত পেতে ছিল না— তা কে বলতে পারে!

যেদিন ললিতকে হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছে দিল তুলসী সেদিন হঠাৎ তার শম্ভুকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, এবার ললিতরা না থাকলে ওদের বাসাটা শম্ভুরা কতয় ভাড়া দেবে। এ-রকম নৃশংস চিন্তা কেন তার মাথায় এসেছিল তা সে বুঝতে পারেনি তখন। পরে ভেবেছে যে, আসলে সেটা ছিল তার অবচেতন মনেরই ব্যাপার। আর খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, সেদিনই বাসায় ফিরে সে দেখল, দাদা বউদি বাচ্চারা কেউ বাসায় নেই, অন্ধকার বাসায় বাইরেব ঘরের মেঝেয় বসে মৃদুলা কাঁদছে। তুলসী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? মৃদুলা বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তুলসী জিজ্ঞেস করল, কী কথা? মৃদুলা বলল, তুমি আলাদা বাসা করো। আমি এখানে থাকব না। ভীষণ চমকে গেল তুলসী, বাসা। বাসা কেন? মৃদুলা গলায় ঝাঁঝ দিয়ে বলল, এখানে আমি মানিয়ে গুছিয়ে থাকতে পারছি না। আমি চিরকাল লেখাপড়া শিখেছি, গান গেয়েছি, তাই ঘরের কাজ শিখিনি— সেটা কি খুব দোষের? আমার হাতে রুটি ফোলে না, পিরিচ ভাঙে, ঘর ঝাঁট দিলে কোন কোনায় ময়লা থেকে যায়— তাই আমি অলক্ষ্মী? দরকার হলে দিদি শিখিয়ে নিক— বড়রা নেয় না? তা না করে দিদি সকলের কাছে আমার অকাজের কথা বলে বেড়ায়। আবার দেখ, দ্বিরাগমনে বাপের বাড়ি না গিয়ে পিসির বাড়ি গিয়েছিলাম বলেও কথা উঠেছে। দিদির কোন এক ভাই যেন আমাদের পাড়ায় থাকে, সে বোধ হয় বিভুর ব্যাপারটা কিছু বলেছে দিদিকে, তাই দিদি আজকাল শুনিয়ে শুনিয়ে বলে— আজকালকার মেয়েদের ফ্রক না ছাড়তেই ভালবাসা— পিরিতের কাপ্তানরা সব রাস্তায় ঘাটে বসে থাকে— এখন বাপের বাড়ি যাওয়ার পথ বন্ধ, লজ্জায় মরে যাই। এই সব নোংরা কথা। তুমিই বলো, আমার দোষ ছিল? তা ছাড়া দিদির নিজের মেয়ে কী? ওই পিতু! স্কুল-রাস্তায় পিতুর জন্য কাপ্তানরা দাঁড়িয়ে থাকে না? ওর বইয়ের বাক্স খুঁজলে চিঠি পাওয়া যাবে না? অত বড় মেয়ে ফ্রক পরে বুক দেখিয়ে বেড়ায়, হুট হাট সিনেমায় যাচ্ছে, ফাংশন দেখে রাত করে ফিরছে— দিদি দেখেও দেখে না। তারপর দেখ পরশুদিন দুপুরে খাওয়ার পর বাথরুমে গিয়ে বমি করেছি সন্ধেবেলা সেটা দাদাকে শুনিয়ে দিদি বলল, দেখো বিয়ের মাস থেকেই বেঁধে গেল, একটুও আঁট নেই— বেহায়া আর কাকে বলে! কেন বলবে ও-কথা? আমি কি আঁটকুড়ি যে আমার বাচ্চা হবে না? আজ আমার বাবা এসেছিল, দিদি তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, মেয়েদের গান-বাজনা, লেখাপড়া শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে না; ও-সব বড়লোকে বড়লোকে চলে। আমাদের সাধারণ ঘরে লক্ষ্মীরই কদর বেশি, সরস্বতীর তেমন নয়। ঘুরিয়ে বলা, কিন্তু বাবা তো বোকা নয়, তাই আমাকে আড়ালে ডেকে বকে গেল— কাজকর্ম করবি। তুলসীর বাবা-মা নেই, দাদা-বউদিই ওর বাপ-মার মতো— ওঁরা যেমন চালায় তেমনই চলবি। আমি বাবাকে কিছু বললুম না, কিন্তু বলো— দুঃখ হয় না? বাবা কোনও দিন আমাকে বকে না, জানো? তাই আজ বিকেল থেকে আমি কাঁদছি। তা ছাড়া দেখো, আজকাল দিদি আমাকে একা রেখে দুপুরে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বেড়াতে চলে যায়, বলে, এতকাল আমি ঘর আগলে থেকেছি, এবার তুমি আগলাও— আমি একটু হাঁফ ছেড়ে আসি। তুমিই বলো, এ বয়সের নতুন বউকে একা রেখে যাওয়া কি ঠিক? দুপুরের কলকাতা ডেঞ্জারাস নয়? কত ঠগ, জোচ্চোর, খুনে এখানে ফিরিওয়ালার সাজ পরে আসে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি সেজে আসে, ডাকপিয়ন হয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। তা ছাড়া কে জানে বিভুর দলবল এখনও তক্কে তক্কে আছে কি না! তুমি সন্ধের আগে ফের না, কখনও বা বন্ধুর অসুখ দেখতে যাও, একা একা আমার ভয় করে। আমি এখানে থাকব না। তুমি বাসা না করলে ঠিক বাপের বাড়ি চলে যাব। বাবা আজ

বলে গেল, এখনও বিভুর দলবল বাসায় ঢিল ছোড়ে, বেয়ারিং ডাকে বেনামা চিঠি দিয়ে শাসায়— গেলে হয়তো অ্যাসিড বালব ছুড়বে, ছোরা বসাবে, বোমা মারবে, কিংবা জোর করে টেনে নিয়ে যাবে...

অত কথা একসঙ্গে সঠিক বুঝতে পারেনি তুলসী। বুঝবার দরকারও ছিল না। তুলসী জানে বাংলাদেশে সেই পুরনো আমল আর নেই, যখন দু'টো আহ্লাদি বেড়ালের মতো দাঁত নখ লুকিয়ে মা আর জেঠিমা এক পাতে গন্ধলেবুর পাতা দিয়ে মেখে পান্তাভাত খেতে বসত। মেয়েতে মেয়েতে কোনও দিনই ঠিক ঠিক ভাব হয় না, পুরুষদের যেমন হয়। তবু কী করে যেন মা আর জেঠিমা কেউ কাউকে সহ্য না করেও বিশ বছর একসঙ্গে ছিল। তবু বাংলাদেশে সেই পুরনো আমল আর নেই, মানুষের সহ্যশক্তি অনেক কমে গেছে। তুলসী অন্য কথা ভাবে। স্কুল থেকে সে নিয়মিত বেতন পায় না, ছাত্ররা গ্রামের গেরস্থ কিংবা চাষার ছেলে, নিয়মিত মাইনে দেয় না, যা দেয় তাই তারা সবাই ভাগ করে নেয়— কোনও মাসে পঞ্চাশ, কোনও মাসে ষাট। ন' মাসে ছ' মাসে সরকারি সাহায্যের টাকা আসে। তাই তার অভাবের মাসগুলো দাদাই চালিয়ে নেয়। আলাদা বাসা করলে কীভাবে চলবে? তা ছাড়া মৃদুলাকে আলাদা বাসায় ফেলে রেখে কী করে অত দূরে যাবে তুলসী! যখন দুপুরের কলকাতা ভয়ংকর! যখন বিভুর দলবল হাল ছাড়েনি।

শান্ত মনে সকালের ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে বাজারে যাচ্ছিল তুলসী। মাথার মধ্যে এ-সব হিজিবিজি চিন্তা ঘুলিয়ে উঠতে লাগল।

সকালে প্রায়দিনই বাজারে একটা মোটাসোটা আধবুড়ো লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখে তুলসী। বড় নিরীহ, ভিতু-চেহারা— দেখলেই মায়া হয়। লোকটা বিষণ্ণ চোখে চার দিকে দেখতে দেখতে যায়, এ-দোকান সে-দোকানে একটু দরদস্তুর করে, কেনে খুব অল্পই, কিন্তু বাজারের চত্বরে অনেকক্ষণ তাকে থাকতে দেখেছে তুলসী। কোনও দিনই খুব খেয়াল করে দেখে না। আজ দেখল, নাকফুল কানফুলের মতো ছোট ছোট ফুলকপি নিয়ে যে বেচুনি মেয়েছেলেটা অহংকারে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, তারই মুখোমুখি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কোনও দরকার ছিল না, কেবলমাত্র মাথায় হিজিবিজি চিন্তাগুলোকে তাড়ানোর জন্যই তুলসী হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে একটু হেসে লোকটাকে বলল, ফুলকপি নিলেন?

তার দিকে চেয়ে একটু ম্লান হাসল লোকটা. না। বাবার কথা ভাবছিলাম। বাবা বড় ভালবাসতেন।

ওঃ হোঃ— বলে বুঝদারের মতো হাসল তুলসী।

আমি ফুলকপি খাই না। তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে লোকটা লাজুক গলায় বলল, বাবা খেয়ে যেতে পারেনি। সেদিন এই ফুলকপি, মুলো দিয়ে মটবের ডাল, বেগুন ভাজা রান্না হয়েছিল দুপুরবেলায়। ছুটির দিন ছিল, সারা সকাল বিছানায় পুরনো প্রবাসী পড়েছে লোকটা, তারপর বোধ হয় ঢুলুনি এসেছিল একটু। স্নান-খাওয়ার জন্য ডাকতে এসে মা দেখল, লোকটা ঘুমোচ্ছে যেন— খোলা প্রবাসীর ওপর যত্নে রাখা চশমা-জোড়া, দু' পায়ে আঁকড়ে-ধরা কোলবালিশ, নাকের ওপর জমে আছে সেই চিরকালের ঘামের ফোঁটা— তবু লোকটা নেই।

আহাঃ— তুলসী বলল।

বাপ মা'র মতো জন হয় না। লোকটা ধীর শান্ত গলায় বলে, আমার বাবা লোকটা ছিল গরিবজন, ছোট দোকানের দোকানদার, এক-আধদিন ভাল-মন্দ খেতে পেত— বেঁচে থাকতে কোনও দিন মান্যগণ্য করতাম না। কিন্তু এখন! এখন কেবল সেই খোলা প্রবাসীর ওপর ডাঁটি-ভাঙা চশমা-জোড়া মনে পড়ে— বড় আশায় আশায় আমার দিকে চেয়ে আছে। বলতে বলতে লোকটা তুলসীর দিকে অন্যমনে তাকায়, কিন্তু তুলসীকে বোধ হয় সঠিক দেখে না, ম্লান একটু হেসে বলে, বাবা মরে যাওয়ার অনেক পরে আমি বাপ হয়েছিলাম। একটাই ছেলে ছিল আমার অসৎ, বখা, গুণ্ডা। অতি আদরে বাঁদর। সামলাতে পারতাম না। তখন বুঝতে পারতাম তেমনই এক গরিব বাপ আমি, ছোট চাকরি করে খাই, ঘরে বাইরে কেউ কোথাও পাত্তা দেয় না, লোকের নজরে পড়ি না— এমনই ছোট। তখন যেন বাবার সেই ডাঁটি-ভাঙা চশমা-জোড়াই আমার চোখে— জুল জুল করে চেয়ে থাকি, আশায় আশায়। তখন বুঝি বাপ হওয়া কেমন, বাপ কেমন জন। ছেলেটা মিশত বদ, দাঙ্গাবাজ, হারামজাদ ছেলেদের সঙ্গে। উনিশ বছর বয়সে হাতে বোমা ফেটে মারা গেল। অত বড় শরীরটার আর কিছুই ছিল না।

আঃ— তুলসী বলে।

না, আমি আর ফুলকপি, মটরের ডাল, মুলো, বেগুন খাই না, ছেলেটা ভালবাসত মাছ মাংস ডিম, ঝাল লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন, এঁচোড়ের ডালনা— আমরা সে-সব ছেড়ে দিয়েছি। আমরা বুড়োবুড়ি এখন আর সত্যিই কোনও খাবারের স্বাদ পাই না। লোকটা আবার একটু ম্লান হাসে— বাজার করতে বড় ভালবাসতাম। মা-বাপ, বউ-ছেলে— এদের কার কোনটা স্বাদের জিনিস তা মনে করে, খুঁজে-পেতে, দরদস্তুর করে সেরেক-এ চার-আট আনা কমিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কত আনন্দ ছিল। বাজারও ছিল অন্য রকম। এখন দেখুন বেশি দাম, কম ওজনের বাটখারা, দোকানদারদের তিরিক্ষি মেজাজ, গায়ে গায়ে ব্যস্ত খদ্দেরের ভিড়— বাজারে আর সেই আনন্দ নেই। তবু আসি। চল্লিশ বছর ধরে বাজার করে আসছি— সকালবেলায় এইখানে এই যে এক ঢল সবুজ দেখা যায়, এর বড় নেশা। তাজা তরিতরকারি, শাকপাতা, ঝকঝকে মাছ— ঘুরে ঘুরে দেখি— কত কথা মনে পড়ে যায়! মাঝেমধ্যে দর করি, একটু কিনি, কিনি না। শেষ বাজারে বেছে-গুছে সেইসব জিনিস একটু করে নিয়ে যাই, যা আমার বাপ পছন্দ করত না, ছেলে খেত না।

মাছ-বাজারের সামনে লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিল তুলসী, বলল, আবার দেখা হবে।

লোকটা একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসে, কত কথা বলে ফেললাম! হ্যাঁ, দেখা হবে। তবে বেশিদিন আর না। চাকরির আর কয়েকটা বছর, তারপর গাঁয়ের দিকে চলে যাব। আমরা আসলে গ্রামেরই লোক মশাই, সাধারণ লোক।

লোকটা তুলসীর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, তারপর 'আচ্ছা...' বলে উদাসীন চোখ ফিরিয়ে নিল। সবজি বাজারের ভিতর দিয়ে ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে চলে গেল। তুলসী দেখল, লোকটার ডান হাতে সাদা শূন্য বাজারের থলিটা হাওয়ায় লটপট করছে।

ব্যাপারটা কিছুই না, তবু বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা শান্টিং ইঞ্জিন হঠাৎ গুপ করে ধাক্কা মারে। এখনও বাপ হয়নি তুলসী— কিন্তু মৃদুলার পেটে বাচ্চা এসেছে। অন্যমনস্কভাবে কেনাকাটা করছিল তুলসী, আর দু'-তিনটি কথা তার মাথার মধ্যে মাছির মতো ঘুরেফিরে বসতে লাগল। বাপ কেমন জন...গরিব বাপ আমি সাধারণ মানুষ...আসলে আমরা গ্রামেরই লোক। কথাগুলোর মধ্যে কিছু একটা আছে— যা সে স্পষ্ট ধরতে পারছিল না। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল তুলসী। তারপর হঠাৎ লোকটার শেষ কথাটা ভেবে তার মনে হল— গ্রাম! গ্রামে চলে গেলে কেমন হয়! ভাবতেই যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করে তুলসী, মাথার হিজিবিজি কেটে যায়। এতকাল গ্রামে গিয়ে বসবাস করার কথা তার মনেও হয়নি; বরং সে বৃথা তিন বছর ধরে কলকাতায় চাকরি খুঁজেছে। পায়নি। অথচ গ্রামের সেই ভাঙাচোরা স্কুলটাই এতকাল ধরে খাওয়াচ্ছে তাকে— তবে সে কেন কলকাতার কাছে ভিখিরিপনা করবে?

লোকটাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলেই মনে হল তুলসীর। গ্রামে গেলেই এখন সব দিক দিয়ে ভাল হয় তার। লোকটা অত কথার মধ্যে ওই কথাটারই ইঙ্গিত দিয়ে গেল না? সেখানে মৃদুলা নিরাপদ, বাসাভাড়া কম— ভালই থাকবে সে। ভাবতে ভাবতে সে স্পষ্ট দেখতে পেল— সে যেন গ্রামীণ গৃহস্থ-তুলসী, চারধারে ধানের মরাই, সবজিখেত, পোষা গোরু-ছাগল।

এ-কথা ঠিক যে, কলকাতাতেই তার জান পোঁতা আছে। এখানেই চায়ের দোকানে, বন্ধুদের আড্ডায় কেটেছে তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। একটা বড় কলকাতা আছে— যার পার্ক স্ট্রিটে রেস্টুরেন্ট, ক্যামাক স্ট্রিটে বাড়ি, কিংবা গ্রান্ড হোটেল, সে কলকাতাকে চেনে না তুলসী। সে চেনে জগার দোকান, কফি হাউস, নাইট শোর সিনেমা, মেয়েছেলে দেখা, বেকার ঘুরে বেড়ানো কিংবা সময় নষ্ট করার কলকাতাকে। তবু কলকাতার আত্মাই তার বুকের মধ্যে ধকধক করছে। গ্রামে চাকরি করতে যায় তুলসী, গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কথা বলে, গাঁয়ের ছেলেদের পড়ায়, আর সবসময়ে তার মনে হয় 'আমি এদের চেয়ে উঁচুদরের লোক'। কেন মনে হয় ও রকম কথা কে জানে! হয়তো কলকাতায় বাস করলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে ও রকম অহংকার তৈরি হয়ে যায়। আর অহংকারী হওয়া মানেই নিজেকে না জানা, অন্যকেও না জানা। এখন ওই ঈশ্বর-প্রেরিত লোকটার কথারই প্রতিধ্বনি সে তার মনের মধ্যে শুনতে পায়। এক গরিব জন আমি— সাধারণ মানুষ। কোটি কোটি মানুষের একজন মাত্র।

দেশ-গ্রামের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ— কলকাতা সেই নাড়ির বন্ধন ছিঁড়ে রেখেছে বহুকাল ধরে। এবার গ্রামেই চলে যাবে তুলসী।

বাজার থেকে ফিরে সারা সকাল মৃদুলাকে এই কথাটা বলার সুযোগ খুঁজল তুলসী। পেল না।

স্কুলে যাওয়ার পথে রেল গাড়ির কামরায় সে মানুষজনের দিকে চেয়ে রইল। গাড়ির মেঝেয় বসে দু'টো লোক পোনামাছের চারা-ভরতি-জলের হাঁড়িতে থাবড়া দিতে দিতে চলেছে, খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে কয়েকজন ব্যাপারী, দুই বেঞ্চের মাঝখানে গামছা বিছিয়ে ব্রিজ খেলছে তারা, গাড়িতে উঠে হাঁকডাক শুরু করেছিল; একজন চিরুনি অন্যজন হাতকাটা তেলের ফিরিঅলা— বিক্রিবাটা মন্দা দেখে এখন তারা নিবিড় হয়ে বসে গল্প করছে। সাধারণ মানুষ সব, দুঃখী মানুষ। এদেরই একজন সে। ভাবতে ভাবতে আনন্দে শিউরে উঠল তুলসী। কলকাতায় থাকতে থাকতে এতদিন এ-কথাটা তার মনেই হয়নি। তার মনে পড়ল কতবার রাস্তায়-ঘাটে মানুষজন তার কাছ থেকে বিড়ি-সিগারেট ধরাতে আগুন চেয়ে নিয়েছে, কত লোক জিজ্ঞেস করেছে ঘড়িতে ক'টা বাজল, কত লোক দুঃখের কথা বলতে চেয়েছে তাকে। তুলসী ভাল করে তাদের মুখও দেখেনি। কলকাতায় থাকারই মুদ্রাদোষ ওটা। হ্যাঁ, এবার গ্রামীণ-গৃহস্থ হয়ে যাবে সে, খেত-খামার করবে, ও-গ্রাম সে-গ্রামের লোকেদের চিনে বেড়াবে, খালি পায়ে হাঁটবে মাটির ওপর।

স্টেশন থেকে স্কুলে যাওয়ার দু'টো রাস্তা। একটা জাতীয় সড়ক— সেটা ঘুরপথ। আর একটা ধানখেতের মধ্য দিয়ে— আলপথ। আলপথেই যায় তুলসী। মাইল খানেক রাস্তা। অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল সে। হঠাৎ দেখতে পেল সামনে একটা পতিত জমির ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে একটা লোক আলের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। হাঁটুর ওপর কাপড়, খালি গা, মাথায় গামছা জড়ানো। কাছাকাছি হতেই লোকটা তুলসীর দিকে চেয়ে হঠাৎ হাত তুলে জমিনটার দিকে দেখিয়ে বলল, ওই যে দেখেন।

তুলসী দাঁড়িয়ে পড়ল, কী?

ওই যে! লোকটা আঙুল দিয়ে দেখালে, দেখছেন?

তুলসী দেখল। এবড়ো-খেবড়ো জমি, মাটির ঢেলা, আর ঘাসের মধ্যে প্রথমটায় ভাল দেখা যায়নি, তারপরই দেখা গেল জমির ঠিক মাঝখান দিয়ে কোনাকুনি সাপটা চলে যাচ্ছে। ছাইরঙা শরীর, রোদে চকচক করছে গায়ের আঁশ— একটা বড় মাটির ঢিবি— সাপটা ঢেউ খেলে পেরিয়ে যাচ্ছে। গতি দেখলে মনে হয় একটু আগে এই আলপথটাই পার হয়ে গেছে।

গা ঘিনঘিন করে উঠল তুলসীর, বলল, কী সাপ?

লোকটা হাঁফাচ্ছিল, সাধুভাষায় বলল, বিষ ধরে মশাই, গোখরো। এটা অপরাধী সাপ, ও-চলন দেখলেই আমি চিনতে পারি। এইমাত্র কাউকে কেটে এল...ওই দেখুন, চলনটা দেখুন...দেখছেন? হুঁ, অপরাধী সাপ মশাই।

ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে আর-একটা ঘাসের আড়ালে চলে যাচ্ছিল অপরাধী সাপ। বাতাস কাটার একটা হায়-হায় শব্দ করছে। চলনটা ঠিক বুঝল না তুলসী, তবু তার মনে হল সাপটা চোরের মতো পালাচ্ছে— কোনও দিকেই ওর নজর নেই। আলপথ পার হয়ে ধান খেতের পাশ দিয়ে ক্ষীণ মসৃণ একটি জলধারার মতো নেমে গেল সাপটা— পিছনে শূন্য জমিটাকে ভীতিকর করে রেখে দিয়ে গেল। লোকটা সাপটার গতি নিরীক্ষণ করে বলল, শালা নদীর দিকে যাচ্ছে। নদী পার হয়ে গেলেই ফতে। রুগিকে বাঁচায় কে! ওর চলন আমি চিনি মশাই।... বলতে বলতে লোকটা উলটো দিকের খেতের মধ্যে নেমে পড়ল, মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, আশপাশের গাঁয়ে কোথাও কেটে এসেছে শালা! যদি নগেন ওঝাকে সময়মতো ধরতে পারি...বলে দৌড়তে থাকল লোকটা। কচি ধান গাছের ওপর দিয়ে তার বেপরোয়া মাথাটা মাতালের মতো টলতে টলতে দূরে চলে যাচ্ছিল।

ওঁক করে একটা বমির ভাব উঠে এল তুলসীর পেট থেকে। গা পাকিয়ে উঠল, শিরশির করে ওঠে হাত-পা। গা ঘিনঘিন করে। সামনের দিকে ধুতির অংশটা হাতে তুলে প্রথমে কয়েক পা দৌড়য় তুলসী, তারপর জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। সাপটা পশ্চিম ধারে গেল— ও দিকে নদী মাইল দুই দূর। লোকটা বলছিল সাপ নদী পার হলে রুগি বাঁচবে না— সত্যি কি! সাপটা নদী পার হওয়ার আগে লোকটা ওঝাকে পাবে কি না কে জানে।

স্কুলের কমন-রুমে পৌঁছতে হাঁফ ধরে গেল তার। হাতের প্লাস্টিকের ফোলিও-ব্যাগটা টেবিলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, সাপ!

সবাই তার দিকে তাকাল, কোথায় সাপ?

তুলসী হাঁফাতে হাঁফাতেই সেই লোকটাকে নকল করে বলল, বিষধর সাপ মশাই, গোখরো। অপরাধী সাপ চেনেন কেউ?

হ্যাঁ, অনেকেই চেনে।

কোথায় দেখলেন। কাকে ঠুকে এল?

তুলসী ঘটনাটা বলতেই গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সবাই চেনে নগেন ওঝাকে— তুলসী বুঝতে পারছিল। যে-লোকটা সাপটাকে দেখিয়েছিল সেও সকলেরই চেনা— রাজেন। তারপর যা হয়— আস্তে আস্তে সাপের গল্প শুরু হয়ে গেল। প্রতি পিরিয়ডের ফাঁকে ফাঁকে এসে তুলসী কমনরুমে সাপের গল্প শুনে যাচ্ছিল। বিচিত্র গল্প সব বিচিত্র সব সাপের। বেনাচিতি, কেউটে, গোখরো, দাঁড়াস, লাউডগা, জিংলাপোড়া। থার্ড পিরিয়ডের লেজারে এসে সায়েন্স-এর মাস্টার আদ্যিকালের বি এস-সি বুড়ো হরনাথ ঘোষালের গল্পটা শুনল। ঘোষাল বিজ্ঞান পড়তে পড়তে প্রথম যৌবনে ধর্ম-টর্মের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। সেই সময়ে তারা দুই বন্ধু একসঙ্গে পইতে পুড়িয়েছিল একটা পাঁজিতে আগুন জ্বেলে, সেই আগুনে। ঘোষালের বাড়িতে এটা নিয়ে বিরাট হইচই হল, তার গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী বাপ তাকে বেরও করে দিল ঘর থেকে, কিন্তু ঘোষাল পইতে নিতে রাজি হল না। এক বন্ধুর বাড়ির কাছারি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল ঘোষাল, সেখানেই থাকতে লাগল। বিজ্ঞান ছাড়া জগতের অন্য কোনও রহস্যকেই সে তখন স্বীকার করত না, প্রবল মনোবল ছিল তার— সে অটল রইল। সে সময়ে একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে ঘোষাল টের পেল তার বুকের ওপর বেশ ভারী একটা ওজন— বাঁ কাঁধ থেকে বুক জুড়ে ডান দিকের কোমর পর্যন্ত পিছল, ঠাণ্ডা, ভারী কী এক বস্তু আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। তন্দ্রার ভাব ছুটে যেতেই লাফিয়ে উঠল ঘোষাল। সাপটা ততক্ষণে নেমে গেছে প্রায়। কেবল লেজের শেষ অংশটা তখন ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে তার কোমর থেকে। টর্চ জ্বেলে এই দৃশ্য দেখল সে— প্রকাণ্ড জাত-গোখরো তার শরীর সাপটে ছিল এতক্ষণ। যদিও সাপটা তখনও তার কোনও ক্ষতি করেনি, তবু ভয় পেয়ে চিৎকার করে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। কাছারি-ঘরটায় লোক শুত অনেক। তারা উঠে বাতি-টাতি জ্বেলে মেরে ফেলল সাপটাকে। কিন্তু তারপর থেকেই— ঘোষাল বলল, আমার বাঁ কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত কেবল একটা শিরশিরে ভাব— গা ঘিনঘিন্ করে, কিচ্ছু খেতে পারি না, উলটে চলে আসে প্রথম পোয়াতির মতো, রাতে ঘুম হয় না— নিজের গা থেকে নোংরা আঁশটে গন্ধ নাকে আসে। সবসময়ে ভয়-ভয় ভাব। আমার আত্মবিশ্বাস কমে যেতে লাগল। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র— যুক্তিবাদী, তা ছাড়া আমি গাঁয়ের ছেলে— সাপের গতিবিধি আমি জানি। তবু দেখুন দিনরাত আমার মনে হত নরক থেকে, নোংরা জঘন্য বিশ্বাসঘাতক হীন একটা প্রাণী এসে আমাকে ছুঁয়ে গেছে— শত স্নানেও নিজেকে পবিত্র লাগত না। আর মশাই, সারাদিন ধরে বাঁ কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত এই যে জায়গাটা যেখান দিয়ে গিয়েছিল সেই জঘন্য জীব— সেই জায়গাটায় সারাদিন শিরশির ঝিরঝির একটা অবশ ভাব। ডাক্তার এসে মনের শক্তির জন্য ওষুধ দিল, কিছু হল না। আস্তে আস্তে পৃথিবীটা আমার কাছে নিরানন্দ বিষাদময় হয়ে যাচ্ছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে চার দিকে চাই, লোকের কথা বুঝতে পারি না, কাউকে কিছু বোঝাতেও পারি না। ওঝা গুণিনরা এসে ঝাড়ফুঁক করে গেল অনেক। কিছু হল না। তারপরই একদিন আমাদের কুলগুরুকে নিয়ে বাবা হাজির হলেন, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে গলায় পইতে পরিয়ে দিলেন। তখন হঠাৎ খেয়াল হল পইতে যেখানে থাকে আমাদের— বুকের ওপর কাঁধ থেকে আড়াআড়ি, ঠিক সেই জায়গা দিয়েই গিয়েছিল সাপটা। ওই কথাটা মনে হতেই অসুখ অর্ধেকটা সেরে গেল। তারপর শুরু করলাম গায়ত্রী জপ— সারাদিন জপ করি— চোখ বুজে বিভোর হয়ে জপ করি। আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে এলাম আমি। অবিশ্বাস-টবিশ্বাস কোথায় উড়ে গেল আমার!

এটা কি সাপের গল্প হল? কে একজন বলল, এ তো পইতের মহিমা-কীর্তন। আর এর সাপটাও যে প্রতীক!

একজ্যাক্টলি, হরেনবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, একজ্যাক্টলি। পূর্বপুরুষদের বহুকালের তপস্যায় এবং আচরণে অর্জিত ধর্মীয় সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করলে অবিশ্বাস, বঞ্চনা এবং মহাভীতি আমাদের আলিঙ্গন করে। তবু দেখুন আমি সত্যিই কিন্তু পঞ্জিকায় আগুন জ্বেলে পইতে পুড়িয়েছিলাম, আর আমার বুকের ওপর দিয়ে সাপও হেঁটেছিল— দুটোই সত্যি।

টিফিনেই খবর চলে এল, পুবপাড়ায় সত্যিই একজনকে সাপে কামড়েছে।

সিক্সথ পিরিয়ডে ক্লাস সেভেনে ক্লাস নিচ্ছিল তুলসী। ক্লাসের মাঝামাঝি সময়ে দেখতে পেল পিছনের বেঞ্চের ছেলেরা পাশের জানালা দিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে আছে। ওদের মধ্যে খুব উত্তেজনা। কী রে? বলে হাঁক দিতেই একটা ছেলে বলল, স্যার নগেন ওঝা যাচ্ছে, কাউকে বোধ হয় সাপে কেটেছে। শুনে জানালার কাছে এসে দেখল তুলসী— মাঠের মধ্যে দু'-চারটে লোক আগে চলেছে, পিছনে খুব লম্বা, মিশমিশে কালো একটা লোক— পরনে লাল ডগডগে কাপড়, লাল ফতুয়া। লোকটা যেন অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে হেঁটে চলেছে, এমনই ধ্যানমগ্ন তার ভঙ্গি। দেখলে মনে হয় একটা অপ্রাকৃত আবহাওয়া লোকটাকে ঘিরে আছে। নগেন ওঝার সঙ্গে খালি-গায়ে রাজেনকেও দেখতে পেল তুলসী। ওরা গেল পুবপাড়ার দিকে। নগেন ওঝাকে দেখার পর ক্লাস আর বাগে থাকছিল না। ছেলেরা গুনগুন শুরু করে দিল। পুবপাড়ার দিকে যে-বাড়িতে সাপে কামড়েছে সে-বাড়িতে গিয়ে এখন তুক করবে নগেন ওঝা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে কুমারীদের হাত থেকে ভিক্ষে নেবে— সেই চালের ভাত রান্না করবে একজন কুমারী— সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে। নগেন ওঝার অনেক তুক। ছেলেরা তাই আর ক্লাসে থাকতে চাইছে না।

নগেন ওঝার জন্যেই কিনা কে জানে সিক্সথ পিরিয়ডের পর ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল। পুবপাড়ার দিকে ছুটতে লাগল ছেলের পাল।

তুলসী কমন-রুমে এসে শুনল, তখনও সাপের গল্প হচ্ছে। হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। তিনটে সাতচল্লিশের ট্রেনটা পাওয়া যেতে পারে। টেবিল থেকে প্লাস্টিকের পোর্টফোলিও ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ফেরার সময়ে আলপথ ধরল না সে, সুন্দর জাতীয় সড়ক দিয়ে ঘুরপথে গেল স্টেশনের দিকে। হঠাৎ তার খেয়াল হল— রাজেন বলেছিল সাপটা নদীর দিকে যাচ্ছে, নদী পেরোতে পারলেই ফতে। কে জানে সাপটা অবশেষে নদী পেরোতে পেরেছিল কি না!

না, নদী পেরোতে পারেনি সে। তখন ধানগাছের গোড়ায় গোড়ায় গত বর্ষার জল, সাপটা তাই উঁচু-নিচু আলপথের ওপর উঠে এল। একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল, অনেকটা পথ সে পার হয়ে এসেছে। সামনের দিকে চেয়ে দেখল, অনেকটা পথ এখনও বাকি। কিন্তু সে কোথায় চলেছে তা তার সঠিক জানা ছিল না। খোলা জায়গার ওপর দিয়ে চলছিল সে। সামনেই আলপথের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল নিয়তি-নির্ভর কয়েকজন মানুষ, সাপটা ঘাসের মধ্যে শরীর নামিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করল একটু। সামনেই অনেকটা পতিত জমি। মানুষগুলি সরে গেলে সাপটা আস্তে আস্তে নেমে এল জমিতে। খোঁটায় বাঁধা একটা গোরু চরছে। তার পিছনের পায়ের কাছ দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। গোরুটার পায়ে পোকা বসেছিল, পা নাড়তে গিয়ে সাপটাকে দেখল সে, স্থির হয়ে রইল। যেখান দিয়েই সে যাচ্ছিল সেখানেই স্থির হয়ে যাচ্ছিল ঘাস, তৃণ, থেমে যাচ্ছিল পোকামাকড় ব্যাঙের শব্দ। কোনও দিকেই তার মনোযোগ ছিল না। অনেক বয়স হয়ে গেছে তার— বুড়ো একটা সাপ সে। ক্লান্ত। তবু জাতীয় সড়কের পাশে ঢালু জমি বেয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে এল ওপরে। রোদে চকচক করছে কালো চওড়া রাস্তা। লরি যাচ্ছে, সাইকেল চলেছে। তার চোখের খুব কাছ দিয়ে চলে গেল গোরুর গাড়ির চাকা। এখানে বিপদ— সে বুঝতে পারল। আবার মুখ ঘুরিয়ে নেমে এল নিচু নাবাল জমিতে। জাতীয় সড়কের সমান্তরাল অনেক দূর চলে গেল সে, তারপর কালভার্টের তলা দিয়ে ও পারে যাওয়ার পথ পেল। জলের পাশ দিয়ে আলগা পাথরগুলোর ওপর সে তার শরীরে ঢেউ তুলে পেরিয়ে গেল। একবার জলে জিভ ছুঁইয়ে নিল। নদীর ঠান্ডা সুগন্ধ বাতাস সে টের পায়। তবু নদী এখনও অনেকটাই দূরে। পিড়িক করে একটা শব্দ হয়। কে? তীব্র ফণা তুলে সে ঘুরে দেখে। চড়ুই। আবার মাথা নামিয়ে নেয়— ক্লান্তভাবে চলে। বয়স হয়ে গেছে। পৃথিবীতে তার আয়ুষ্কাল কখনও খুব নিরাপদ ছিল না— বিনা বাধায় কোনও খাদ্য পায়নি সে, নির্ভয় হৃদয়ে কোথাও বাস করেনি, তার চলা মানে কেবলই পালানো। এবার তার দীর্ঘ শরীর আস্তে আস্তে

অসাড় হয়ে আসছে। নদীর ধারে এসে সে থেমে যায়। মুখ তুলে দেখে— স্রোত, স্রোতের ওপারে আবার দীর্ঘ পথ। কোথায় পৌঁছবে সে। জলের ধারে সে নেমে আসে, লম্বা ঘাসের বন হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। সে সেইখানে আরামদায়ক কুণ্ডলী পাকিয়ে নেয়। ঘুমিয়ে পড়ে। শব্দ! সে চোখ খোলে। ব্যাঙ লাফিয়ে গেল। সে দিন দুয়েক কিছুই খায়নি। খিদে টের পায়। আবার শরীর খুলে নেয়। শরীর চলতে থাকে। ঘুরে ফিরে জাতীয় সড়কের কাছেই চলে আসে আবার। উঁচু ঢালু জমিটার ওপরে উঠে দেখে— কালো চওড়া রাস্তা, লরি যাচ্ছে। সে আবার নামতে থাকে। একটা ব্যাঙ লাফিয়ে গর্তের মধ্যে পিছনের অংশটা ঢুকিয়ে দিল, তারপর তাড়াতাড়ি ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তার মোটা শরীর— সহজে ঢুকছিল না। সকৌতুকে সাপটা এই দৃশ্য দেখল। বোকা ব্যাঙটা। সে তার শরীর বুক পর্যন্ত শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে আনল। বোকা ব্যাঙটা প্রচণ্ড চেষ্টা করছিল ঢুকে যেতে— সাপটা আস্তে তার মাথার ওপর নেমে এল। মুখে তুলে নিল তাকে। 'কঁ— ক্' করে কেঁপে উঠল ব্যাঙটা। তার সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি লাগল। বুড়ো হয়ে গেছে সে, বড় ক্লান্ত। ঝাঁকুনিটা তার ভাল লাগল না। 'কঁ— ক্' আবার পা ছোড়ে ব্যাঙটা। ঝাঁকুনি লাগে। ক্লান্ত বোধ করে সে। ব্যাঙটার শরীর মোটা— থলথলে— তার সমস্ত মুখ ঠেসে বন্ধ করে রেখেছে। সে অপেক্ষা করে। ক্লান্তি লাগে বড়। ব্যাঙটা আবার কেঁপে ওঠে। তার শরীর অসাড় হয়ে আসে। সে দেখতে পায় জাতীয় সড়কের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে। সে টের পেল তার বুকের নীচে দুর দুর করে কাঁপছে মাটি— লরি চলে যাচ্ছে পথ বেয়ে। সে অনেক পথ ঘুরেছে সারা জীবন। তার ক্লান্তি লাগে। চোখ বুজে আসে। ব্যাঙের প্রকাণ্ড শরীরটা চোয়ালে আর-একবার চেপে ধরতে চেষ্টা করে— পারে না। আলগা হয়ে আসে মুখ। দুর্বল লাগে। ব্যাঙটা চেপে বসে আছে তার মুখে। মোটা প্রকাণ্ড ব্যাঙটা। সে হাঁফিয়ে যায়। ঝাঁকুনি লাগে। আবার ঝাঁকুনি। না, আর কোনও চেষ্টাই করতে পারে না সে। আস্তে আস্তে তার স্থবির শরীর অসাড় হয়ে আসে, চোখ চেয়ে সে একবার তার দীর্ঘ জীবনের একটা অর্থ বুঝবার ক্ষীণ চেষ্টা করে। তারপরই হঠাৎ তার শ্বাস রোধ করে ব্যাঙটা ঠেলে আসে মুখের ভিতরে। চোখ অন্ধকার হয়ে যায় তার। তখনও মুখে তার আধমরা ব্যাঙ— তার মৃত শরীরটা ঢালু বেয়ে সামান্য গড়িয়ে যায়। তারপর একটা ছোট্ট পাথরে আটকে দড়ির মতো ঝুলতে থাকে।

জাতীয় সড়ক ধরে যেতে যেতে তুলসী শুনল সাপের ব্যাঙ ধরার আওয়াজ। সে খুব তাড়াতাড়ি জায়গাটা পেরিয়ে গেল।

## ॥ আট ॥

রাস্তায় পায়চারি করতে করতে ললিত দেখল তার মাথার ওপর মশার ঝাঁক। মুখ তুলে 'উম্-ম-ম্-ম্' শব্দ করছিল সে, মশার বৃত্তটা আস্তে আস্তে নেমে আসছিল, মাথার ওপর নাকে কানে চোখে পিড়পিড় করছিল।

ফরসা প্রকাণ্ড চেহারার বুড়ো লোকটি রায়বাবু— বারান্দার ইজিচেয়ারে আধশোয়া, ডান হাতে বই, মলাটের ওপর দিয়ে দেখা যায় তাঁর চশমাজোড়া, হাতের বইটি সরিয়ে ললিতকে লক্ষ করলেন, কী ললিত?

ললিত হাসে, মশা।

হ্যাঁ, বড্ড মশা। আমার বাঁ দিকটায় কামড়ায়— খুব চালাক মশা।

বাঁ হাত নড়ে না, বাঁ পা নড়ে না, বাঁ চোখের পাতা পড়ে না, লোকটার বাঁ দিকটা জড়। করোনারির দু'টো আক্রমণ গেছে, এখন তৃতীয়টার অপেক্ষা। দুপুরে খাওয়া ছেঁচোপানের রস বাঁ দিকের কষ বেয়ে ফতুয়াটার বুক ভাসিয়েছে। ছোরা-খাওয়া কিংবা গুলিবিদ্ধ একজন মানুষ যেন। হাতের বইয়ের মলাটে ছবিটা দেখে ললিত বড় অবাক হল। অবিকল একই রকম একটা ছবি— জাহাজের ডেক-এর ওপর গুলি খেয়ে এই রকম রক্তাক্ত বুকে মরে যাচ্ছে একটা লোক, অদূরে রিভলভার হাতে মুখোশ-টুপি-ওভারকোট পরা একজন। বারান্দার রেলিঙের ও-পাশে রায়বাবুর তখন অবিকল গুলি-খাওয়া লোকটার চেহারা।

কী বই ওটা?

রায়বাবু মলাটটা উলটে দেখে নিয়ে বললেন, দস্যু ওয়াং ও ঐতিহাসিক হীরা।

ললিত হাসে।

তুমি আমাকে বই এনে দিয়ো ললিত।

দেব।

দিয়ো, এখন আর কেউ বই এনে দেয় না।

গল্প মনে থাকে না, খেই হারিয়ে যায়।

একবারের দেওয়া বই দু'বার তিনবার দিয়ে দেখেছে ললিত— লোকটা নির্বিচারে আবার পড়ে যায়। রায়বাবুকে বই দেওয়া সোজা।

তুমি কেমন?

ভাল।

অসুখটা কী যেন?

ওই পেটের একটা ব্যাপার।

পেট! রায়বাবু চিন্তিতভাবে তাকিয়ে রইলেন।

ক্লাবঘরটা বন্ধ। জলের কলে অনেক লোক আর মেয়েছেলে। শম্ভুদের ছাড়া জমিটায় লাটাইয়ে হাত্তা দিতে দিতে পিছিয়ে যাচ্ছে একটি ছেলে। ক্লাবঘরের দরজা পর্যন্ত যায় ললিত, আবার ফেরে। মিত্রদের দোতলার জানালা খোলা— একটা পালঙ্কের কোণ, স্ট্যান্ডে টাঙানো মশারি আর দেয়ালে ছবি দেখা যায়। গণেশের দোকানে ক্যালেন্ডারে এক দুর্দান্ত যুবতী হাওয়ায় নড়ছে— তার পরনে নিকারবোকারই হবে বোধ হয়। রায়বাবুর মাথার ওপরকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিরুনি থেকে ছাড়ানো চুলের দলা থুথু দিয়ে বাইরে ছুড়ে ঘরে গেল নমিতা। এই সব ছবি ভেঙেচুরে অলক্ষ্যে একটা জাহাজ চলছে। জাহাজ ঢেউ খায়। জাহাজ দোলে। দস্যু ফেরারি ওয়াং তার সামুদ্রিক দূরবিন তুলে চেয়ে থাকে। বিশাল সমুদ্র, মহান আকাশ। দস্যু ওয়াং ফিরেও দেখে না। কোথায় কোন মুলুকে কার কাছে গচ্ছিত রয়েছে সেই ঐতিহাসিক হীরা! পাপী ওয়াং সমুদ্র পার হয়, দ্রুতগামী মোটরে চলে যায়, দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, নিরপরাধ লোককে খুন করে, বিদেশি বন্দরে রহস্যময় রেস্তরাঁয় চিহ্নিত লোকের সঙ্গে সাংকেতিক কথাবার্তা বলে। জমজম করে তার জীবন।

গল্পটা জানে না ললিত। দরকারও নেই! তবু টের পায় জাহাজ চলেছে। জাহাজ ঢেউ খায়। জাহাজ দোলে। দস্যু ফেরারি ওয়াং তার সামুদ্রিক দূরবিন তুলে চেয়ে থাকে। রায়বাবুর ডান দিকটা বই পড়ে উত্তেজিত হয়, বাঁ দিকটা স্থির থাকে। সংসারী মানুষের মতোই।

ললিত হাসে।

ওই যাচ্ছে অবিনাশ।— পরনে ময়লা পায়জামা আর শার্ট, হাতে কাগজ-ঠাসা ডায়েরি, রোগা ছোট্ট চেহারা। উদভ্রান্ত মুখচোখ।

ললিত অবিনাশকে ডাকে!

আরে ললিত! কী খবর?

কোথায় চলেছ অবিনাশ?

সাড়ে ছ'টায় একটা মিটিং আছে। দেরি হয়ে গেছে। চলি।

ললিত হাসে। বরাবর অবিনাশের মিটিং থাকে রোজ। দেখা হলেই সেই এক কথা— একটা মিটিং আছে। দেরি হয়ে গেল। চলি ভাই। অবিনাশের চাকরি নেই, বাইরে থেকে অনেকগুলো কারখানার ট্রেড-ইউনিয়ন চালায়, পার্টি থেকে পায় পঁচাত্তর টাকা। উদভ্রান্ত দেখায় তাকে। তার পার্টি কী বলতে বা করতে চায়, তা বোধহয় সঠিক জানে না অবিনাশ। ভাসাভাসা যেটুকু জানে সেটুকুকেই সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। মিটিঙে যায়, কিন্তু সেখানে সকলের সব কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না! তবু উত্তেজিত হয়ে ফিরে আসে। কী চাও অবিনাশ? মানুষের মুক্তি। কী ভাবে মুক্তি আসবে? সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র কাকে বলে? অবিনাশ থতিয়ে যায়— সমাজতন্ত্র! হ্যাঁ, সমাজতন্ত্র...তার মানে সকলের জন্য সকলের হয়ে ওঠা, ক্ষুধা থেকে মুক্তি, অভাব থেকে মুক্তি, শ্রেণীবৈষম্য থেকে মুক্তি এইরকম কত কী বলে যায়

অবিনাশ। মোটা সব বই নিয়ে নাড়াচাড়া কবে, হাতে নিয়ে বসে থাকে— কিন্তু সঠিক বুঝতে পারে না। তবু মনে হয়— এর মধ্যে একটা কিছু আছে। একটা কিছু— যা এইসব বই কিংবা মিটিঙের মতো নীরস নয়। কিংবা কে জানে সত্যিই মিটিংগুলো অবিনাশের কাছে নীরস কি না। কোনও দিনই কেউ অবিনাশকে পাত্তা দেয়নি, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে তাকে। আশৈশব ওই রোগা চেহারা, আর বুদ্ধির অভাব তাকে মূল্যবান হতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু ওই সব মিটিংগুলোতে সে কথা বলার সুযোগ পায়, তার দলের নেতাদের কাছাকাছি যেতে পারে, একটা ধর্মঘটের কারণ হয়ে ওঠে সে, একটা মিছিলের সবার আগের লোকটি হয়ে এগিয়ে যেতে পারে। তখন নিজের মহত্ত্বকে টের পায় অবিনাশ। হ্যাঁ, বোধহয় সমাজতন্ত্রের মানে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবার হাত থেকে মুক্তি।

সন্ধের মুখে বাসায় ঢুকে ললিত দেখল— মরা-মরা তুলসী গাছটার গোড়ায় প্রদীপ জ্বেলে মা প্রাণপণে শঙ্খে আওয়াজ তুলবার চেষ্টা করছে গাল ফুলিয়ে, কিন্তু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। শাঁখের শব্দ হচ্ছে না। তাকে দেখে মা বলল, দেখ তো, একটু ফুঁ দিয়ে, পারিস কি না। আমার আর আজকাল হয় না।

মায়ের এঁটো শাঁখটা মুখে তুলল ললিত। দু'-তিনবার চেষ্টা করল সে, পেটের সেই জায়গাটায় শক্ত একটা ডেলা পাকিয়ে উঠল। তবু ছাড়ল না, খুব কষ্ট করে তিন-তিনবার ভোঁ বাজিয়ে দিল সে।

কত দিন পর শাঁখ বাজল এ-বাসায়। বলে মা শাঁখ ধুয়ে ঘরে নিয়ে গেল।

সন্ধেবেলা শম্ভুদের ছাদে উঠল ললিত। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল খুব। কিন্তু ছাদে সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল— কয়েক মুহূর্তেই জুড়িয়ে গেল শরীর। একটা চাদর নিয়ে গিয়েছিল ললিত। সেইটে পেতে কিছুক্ষণ শুয়ে নিঝুম আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আজকের আকাশে সপ্তর্ষি ছিল, ছায়াপথ ছিল না। ছায়াপথই ললিতের বেশি প্রিয়। ধূলারাশির মতো আকীর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জ বিপুল একটি অনির্দিষ্ট পথের মতো পড়ে থাকে— ওখানে রোজ ঝড় ওঠে, ঝড়ো হাওয়ায় নক্ষত্রের গুঁড়ো উড়ে সমস্ত আকাশ ছড়ায়। আজ ছায়াপথ ছিল না। ললিত সপ্তর্ষি দেখছিল। সপ্তর্ষির চেহারা শান্ত। প্রশ্নচিহ্নের মতো। ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের সীমায় বসে আছেন সাতজন শান্ত-সমাহিত ঋষি। কিন্তু এর চেয়ে বিছের উপমাটাই বোধ হয় ভাল। সপ্তর্ষিকে আসলে একটা বিছের মতোই দেখায়। ললিতের মনে পড়ল— তার রাশি বৃশ্চিক। বৃশ্চিকের শেষ জীবন খুব সুখের হয় না। শেষ জীবন পর্যন্ত অবশ্য পৌঁছনো গেল না। ললিত চেয়ে রইল। টের পেল সপ্তর্ষির আলো এসে তার গায়ে পড়েছে, স্নেহে লেহন করছে তাকে। তার রাশিচক্র বলছে— এইসব গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে, চাঁদ কিংবা সূর্যের সঙ্গে তার রহস্যময় যোগাযোগ রয়েছে। তার বিশ্বাস হয় না। বরাবরই সে এ-সব বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। এখনও সে চায় না মৃত্যুর পরে কোনও চেতনাকে, কিংবা চায় না আরও একবার জন্ম নিতে। কেবল ইচ্ছে করে চার পাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝখানে আকাশ জুড়ে শুয়ে থাকতে। মহান একটি ঘুম— তার বেশি কিছু না। ছেলেবেলায় খেলার শেষে ফাঁকা মাঠে শুয়ে থেকে কত দিন আকাশ দেখেছে সে। দেখতে দেখতে কোন শূন্যতায় সে পৌঁছে যেত। পার্থিব কোনও কিছুই আর মনে থাকত না, বিপুল আকাশ-চেতনা আচ্ছন্ন করে রাখত তাকে, শূন্যের বিষণ্ণতায় ডুবে থাকত। সে-কথা মনে করে আজ একটু হাসল ললিত। তখন আকাশে থাকতেন দেবতারা, মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতেন। আজ তাঁরা কেউ নেই— না মনে, না আকাশে তবু আজও কিছুক্ষণ সপ্তর্ষির অদৃশ্য আলো সে তার শরীর আর চেতনায় অনুভব করল। আকাশ থেকে মহৎ এক বিষণ্ণতা হনহন করে হেঁটে আসছে তার দিকে— টের পেল। কিন্তু আচ্ছন্ন হল না। আজ তার চারপাশের বিষণ্ণতা বয়স-হওয়া ললিতকে শক্ত মুঠিতে ধরেছে, আকাশের বিষণ্ণতা আজ আর তেমন একটা কিছু নয়।

উঠে পড়ল ললিত। ছাদের রেলিঙের ধার ঘেঁষে বেড়াতে লাগল।

দেখতে পেল বড় রাস্তার দিক থেকে ছোট্ট সাদা একটা মোটর গাড়ি আস্তে আস্তে এসে তাদের গলির মুখে থামল— আবার পিছন ফিরে মুখ ঘোরাল, আবার পিছিয়ে এসে থামল। মুখ ঝুঁকিয়ে ললিত দেখল গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের সিট থেকে সঞ্জয় নামছে। সঞ্জয়ের গাড়ি দেখে একটু অবাক হল ললিত— এত তাড়াতাড়ি ওর গাড়ি হয়ে গেল!

ললিত ছাদ থেকেই উঁচু গলায় বলল, সঞ্জয়, ঘরে যা। আমি আসছি।

সঞ্জয় ওপর দিকে তাকাল, রাস্তার আলো থেকে হাতে চোখ আড়াল করে ললিতকে দেখাব চেষ্টা করে বলল, তুই ওপরে? আমিও আসব?

ছাদটা শম্ভুদের। এখানে বাইরের লোক সঞ্জয়কে আনা ঠিক হবে না। তাই ললিত বলল, না, তুই ভিতরে যা।

ললিত নীচে এসে দেখল, সঞ্জয় তখনও গলির মুখে দাঁড়িয়ে, চেন-এ বাঁধা গাড়ির চাবিটা বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে। তাকে দেখে হাসে সঞ্জয়, ক' দিনের নোটিস রে! নাকি জামিনে খালাস আছিস, সময় ফুরোলে ধরে নিয়ে যাবে।

ললিত হাসে, শালা, পাষণ্ড!

বাহবা! টেলিফোনে তোর গলা শুনে ভেবেছিলুম যে, এসে শুনব তুই বিছানায় পড়ে চিনচিন করে 'বিদায় দে মা' গাইছিস। তা তো নয়, এই তো দিব্যি মুখ ফুটছে।

চোখের ইঙ্গিতে গাড়িটা দেখিয়ে ললিত বলল, তোর?

পোষা কুকুরের গায়ে লোকে যেমন আদরের থাপ্পড় দেয়, তেমনই গাড়িটার গায়ে একটা থাপ্পড় দিয়ে সঞ্জয় বলে, না রে। এখনও আমার নয়, তবে মনে হচ্ছে আমার হয়ে যাবে।

কী রকম!

এক মাড়োয়ারি পার্টির গাড়ি। নতুন, মাত্র হাজার ছয়েক মাইল চলেছে। পাঁচ হাজার টাকায় দিয়ে দেবে। আজ বিকেলে এসে কয়েক দিন ট্রায়ালে রাখতে দিয়ে গেল।

জলের দর।

তুই বুঝবি না রে, অন্য দিকে পুষিয়ে না নিলে জলের দরে দেয়! পুষিয়ে নিচ্ছে। কেনা-বেচার ব্যাপার তুই কী বুঝবি বে?

তুই উন্নতি করে ফেললি।

সঞ্জয় হাসে, উন্নতির এখনই কী দেখলি? রচনা বইতে পড়েছিলুম, 'এক কোটি টাকা পাইলে আমি সব ভাত গুড় দিয়া খাইব।' এখনও গুড় দিয়ে সব ভাত খাওয়া হয়নি। গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হবে, মেয়েমানুষ পুষব, গ্রীষ্ম কাটাতে যাব সুইজারল্যান্ড। দেখিস, গরিবের রোগেও আমি মরব না। আমাশা, শোথ, উদুরি— দূর দূর। মরতে হয় তো মরব ক্যান্সার কিংবা সেরিব্র্যাল স্ট্রোকে— ভিয়েনা কি আমেরিকার নার্সিং হোমে। শম্ভুনাথ, নীলরতনের জেনারেল বেডে নয়। বুঝলি বে!

তোর শেষ দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

দেখে যা কাইন্ডলি, তোর মাস্টারির চাকরির কাজে লাগবে। ছাত্রদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে পারবি, অধ্যবসায়ের পরিণাম।

জুতো ছেড়ে ঘরে ঢোকার কথা সঞ্জয় এখনও ভোলেনি। ললিত দেখল ঘরে ঢোকার আগে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কুঁজো হয়ে সঞ্জয় জুতো ছাড়ছে।

ললিত বলে, জুতো নিয়েই আয় না!

দূর! মাসিমার ঠাকুর দেবতারা ঘর ছেড়ে পালাবে না?

ঘরে ঢুকেই সঞ্জয় চেঁচাল, মাসিমা, ও মাসিমা!

রান্নাঘর থেকে মা'র ক্ষীণ গলা শোনা গেল, কে রে! সঞ্জয়! কতকাল আসিস না!

সঞ্জয় ঘরে বসল না, সোজা চলে গেল মোজা-পায়ে রান্নাঘরের দরজায়। ললিত শুনল, সঞ্জয় চেঁচিয়ে বলছে, আপনি একটুও বুড়ো হননি তো মাসিমা। তারপর নিচু গলায় গুনগুন করে কথা বলতে লাগল মা'র সঙ্গে।

ছাদের সিঁড়ি দিয়ে বড় তাড়াতাড়ি নেমেছে ললিত। শরীর অবশ লাগছে। বিছানায় বসে আধশোয়া হল সে।

সঞ্জয় রান্নাঘর থেকে এসে চৌকিতে বসে বলল, তুলসী-মড়াটা কোথায়! সেটারও তো আজ আসার কথা। আর, আদিত্য?

আদিত্য আসবে না। ওর কাজ আছে। তুলসী আসবে ঠিক।

হেগে মরুক গে আদিত্য। তুলসীটা আসুক, আজ ওকে রগড়াব।

কেন?

ও মড়াটা দিন দিন আরও মরে যাচ্ছে। কী একটা বউ যে হয়েছে ওর ত্রি-ভুবনসুন্দরী, বুকের মধ্যে সেই বউয়ের দোলমঞ্চ নিয়ে ব্যাটা ঘুরে বেড়ায়। কিছুদিন আগে মাস্টারদের অবস্থান ধর্মঘটে গিয়েছিল এসপ্ল্যানেড ইস্টে, সেখান থেকে এসেছিল আমার অফিসে। যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ— কোথায় পুরনো দিনের পাইজ্যামি বদমাইশির কথা বলব— তা না কেবল বউয়ের কথা, শালা এমন বেহায়া, বলে কিনা— বিয়ে করে অনাস্বাদিতপূর্ব সুখে ডুবে আছি, বউ বড় সুখী করেছে আমাকে— ঠিক ওই রকম বইয়ের ভাষাতেই বলেছিল। অফিস না হলে পাছায় একটা লাথ কষাতুম। এদিকে দেখ, বলছে সুখে আছে অথচ চোখে মুখে মরকুটে ভাব, কাঠ-কাঠ হাসি, চোখ ম্যাট ম্যাট করছে। অনেক ধানাই পানাই করে বলল, সঞ্জয়, তোর হাতে ভাল গুণ্ডা আছে? চমকে উঠে বললুম, কেন রে! বললে, একটা লোককে একটু টিট করতে হবে। জিজ্ঞেস করলুম, কে! কিছুতেই বলে না। বললুম, গুণ্ডাই যদি লাগাবি, তবে আমাকে লাগা, জানিস তো আমি কেমন হারমাদ ছিলুম, এখনও ওটা আমার সাইড-বিজনেস। শুনে এলোমেলো কী-সব বলল, বুঝলাম না। চা-ফা খেয়ে বিরস মুখে চলে গেল। মাইরি, ও শালাকে আজ আমি রগড়াব, তুই দেখিস। ওর উইক পয়েন্ট আমি বের করেছি।

ললিত হাসছিল, কী সেটা!

ওর বউ।

হবেও বা। ললিত ঠিক জানে না। নিজের ব্যথা-বেদনা-ব্যাধি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, কাউকেই এ ক'দিন ভাল করে লক্ষ করা হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ল–– তুলসীর বউকে এখনও দেখাই হয়নি। এককালে পরস্পরে বিয়ে নিয়ে কত জল্পনাকল্পনা ছিল তাদের। ঠিক ছিল তুলসীর বিয়ে হবে খুব দূরে কোথাও— নাগপুর কানপুর বা ও-রকম দূরে, তারা দল বেঁধে বরযাত্রী যাবে। আর ললিতের বিয়ে হবে এমন জায়গায়, যেখানে যেতে নৌকো লাগে। সঞ্জয়েরটা ঠিক ছিল বিলেতে, মেমসাহেবের দিকেই বরাবর ঝোঁক সঞ্জয়ের, তাই ওর বিয়েতে এরোপ্লেনের বন্দোবস্তই ঠিক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তুলসীর বিয়েতে যাওয়াই হল না— হারামজাদা বিচ্ছিরি একটা সময় বেছে বিয়ে করল।

সঞ্জয় বলল, আদিত্য এলে আজ তুলসীর পেছনে লাগাতুম। জিরাফের মতো লম্বা গলা উঁচু-নিচু করে, চোখ বুজে দু' হাতের কাঁচকলা নেড়ে গাইত 'তুলসী গাছেতে, কুকুর মোতে-তে-এ।' শালাটা এল না কেন? কী এনগেজমেন্ট ওর?

বলতেই যাচ্ছিল ললিত। ইতস্তত করে সতর্ক হয়ে গেল; শাশ্বতীর কথাটা মুখে এল না। বোঝা যাচ্ছে আদিত্য আর শাশ্বতীর ব্যাপারটা এখনও সঞ্জয় জানে না। তাই, ওই নরম সুন্দর শ্যামলা মেয়েটিকে সঞ্জয়ের পালিশ-করা মুখের সামনে এগিয়ে দিতে মায়া হল তার। বললেই সঞ্জয়ের মুখ ছুটবে।

বলল, কী জানি!

জানিস না?

না।

সাড়ে সাতটায় বিষণ্ণ মুখে তুলসী এল। ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই সঞ্জয় ওর পিছনে লাগল— আয় তুলসী, আমরা বউ বদল করে ফেলি। আমারটা আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে, তোরটা তোর কাছে। পালটে ফেলি।

তুলসী মৃদু হাসে, আমারটা পুরনো হয়নি। কোনও দিন হবেও না।

সঞ্জয় ললিতের দিকে তাকায়, শুনছিস ললিত?

তারপর গলা নামিয়ে বলে, পুরনো না হলেই বা, তোরটা তো কুচ্ছিত! আমার মতো সুন্দর বউ? একে সুন্দর, তার ওপর যা সাজগোজ করে থাকে না। বলতে বলতে হঠাৎ জিভ কাটল সঞ্জয়, যাঃ মাইরি, একদম ভুল হয়ে গেছে।

ললিত বলে, কী?

সাজগোজের কথায় মনে পড়ল, রিনি লিপস্টিক নিয়ে যেতে বলেছিল। গোলাপি স্বপ্ন না কী যেন নাম! ইয়াঃ, রোজি ড্রিম। ভুল হয়ে গেল রে! বলতে বলতে ঘড়ি দেখল সঞ্জয়, নাঃ, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে, বেরোতে বেরোতে আটটা হয়ে যাবে। দোকান খোলা পাব না।

তুলসী বলে, তুই কেটে পড় না।

আমি কেটে পড়লে খুব সুবিধে, না? পিছনে লাগার কেউ থাকবে না, তুমি ললিতের মুখোমুখি দাবা-খেলুড়ির মতো মুখ নিয়ে বসে থাকবে! তা ছাড়া, বউয়ের লিপস্টিকের অজুহাতে কেটে পড়লে তোরা আমার নিন্দে করবি না? বলবি— দেখ, ওই সঞ্জয়টা লেখাপড়া শেখেনি, চায়ের দোকানে বয়গিরি করত— আর এখন শালা বউয়ের লিপস্টিক কেনার জন্য অসুস্থ বন্ধুকে ছেড়ে চলে গেল। শালা আদেখলা, চালবাজ। বলবি না?

বললেই বা! তুই কার তোয়াক্কা করিস! তুলসী বলে।

ঠিক। আমি কারও তোয়াক্কা করি না। একমাত্র বয়স ছাড়া। সঞ্জয় বলে, বয়স! বুঝলি! এই যে লিপস্টিকের কথা ভুল হয়ে গেল, এই গেঁতো অলস আরামপ্রিয় হয়ে যাচ্ছি— চুরিটুরি করছি— টাকাপয়সা ভাল লাগছে— এ-সবের মূলে ওই বয়স। বাইরে গলির মুখে একটা সাদা গাড়ি দেখে এলি না তুলসী? ওটা আমার। হিংসে হচ্ছে না?

দূর। তুলসী ঠোঁট ওলটায়।

হলে ভাল লাগত, বুঝলি! আজকাল লোকে হিংসে করলে ভাল লাগে। আরও দেখ, এখন আর অনিশ্চয়তা নেই, ছোটাছুটি নেই, বসে বসে টাকা এসে যায়। আমার স্পিড কমে যাচ্ছে। জবুথবু হয়ে যাচ্ছি। শরীরে চর্বি ঠেকাতে পারছি না। কেবল মনে হয় বয়স হয়ে যাচ্ছে।

আর কী, এবার বুড়ি বেশ্যার মতো কপালে ফোঁটা কাটো, আর হরিনাম নাও। তুলসী বলে, ব্যাটা পাপিষ্ঠ!

সঞ্জয় হাসে, তুই বুঝবি না রে, তুই হচ্ছিস প্রলেটারিয়েট— ল্যাংটা মানুষ, বউকে একখানা গয়না দিতে তোর কোমর বেঁকে যায়। আমি তোর চেয়ে একটু বেশি দেখি।

তোর চেয়ে আমি মহৎ। তুই তো কোম্পানিকে ফাঁক করছিস।

সঞ্জয় হেসে তুলসীর পিঠে হাত বোলায়, ঠিক রে ল্যাংটাভোলা, ঠিক। তুই সুখী মহৎ, কারণ তোর অভাব তো এইটুকু— না? ঠিক, তুই মহৎ। কারণ, তুই ক'টা ভাল বাড়িতে ঢুকেছিস? ক'টা ভাল আসবাবপত্র দেখেছিস! সত্যিকারের দামি গাড়িতে চড়েছিস কোনও দিন? না, দেখেছিস তেমন সুন্দরী মেয়েছেলে? ভাল খাবার কী খেয়েছিস আজ পর্যন্ত— বাঙালি-বিয়ের নেমন্তন্ন ছাড়া?

তুলসী চিড়বিড়িয়ে ওঠে, তাতে কী?

তাতেই তুই মহৎ! কারণ, তুই বেশি দেখিসনি। আমি দেখি। শালা কত টাকা, কত খাবার, কত সুন্দরী মেয়েছেলে দুনিয়াভর, কত গাড়ি-বাড়ি,— এত ভোগ করার ক্ষমতাই নেই আমার। এই তো মাত্র পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের আয়ু— এতে কী হয়? কিছু না। দুনিয়া ফিনিশ করতে হলে লাখবার জন্মাতে হবে। বুঝলি রে ল্যাংটা মানুষ, কেন বয়সের কথা ভাবি!

ললিত হাসছিল। সঞ্জয় তার দিকে ফিরে বলল, তুলসীকে খ্যাপানোর জন্য বলছি বটে, কিন্তু আমার মধ্যে সত্যিই কী একটা হচ্ছে। আজ সকালে হঠাৎ রমেনের কথা মনে পড়ে গেল। সেই যে বউ পালানোর পর সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল রমেন, আর ফিরলই না। এত কীসের দুঃখ হয়েছিল ওর? এত ভোগসুখে ছিল, দু' হাতে টাকা ওড়াত, বউয়ের জায়গায় দশটা মেয়েমানুষ পুষতে পারত— তবে সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হওয়ার মানে কী? আজ সারাদিন রমেনের কথা ভাবছি আর নার্ভাস লাগছে— সারা জীবন কষ্ট করে আমি সদ্য একটু সুখের মুখ দেখেছি, এখন— শালা এখন যদি কোথা থেকে হঠাৎ ভুতুড়ে কোনও দুঃখ এসে কাঁধে চেপে বসে, আর অত কষ্টের তৈরি করা সবকিছু যদি হঠাৎ বিস্বাদ লাগে! যদি সব ছেড়েছুড়ে আমিও লম্বা দিই? ভাবতেই ভয় করে যে। দুপুরে তোর ফোন পেলাম— তোর অসুখের কথা জানতাম— তবু কেন ভয়ংকর চমকে উঠলাম বল তো! ফোন রেখে দেওয়ার পর দেখি হাত দু'টো কাঁপছে।

তুলসী আর ললিত দু'জনেই নিবিষ্টভাবে চেয়ে ছিল তার দিকে। সঞ্জয় হঠাৎ লজ্জা পেল। তুলসীকে বলল, আজ তোর বউয়ের কাছে তোর প্রেস্টিজ খুব বেড়ে যাবে। আজ তোকে আমার গাড়িতে একটা লিফট দেব।

ললিত মাকে দেখতে পেল— ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আঁচলে হাত মুছছে। ফোকলা মুখে একটু হাসি।

মা বলল, ও সঞ্জয়, আমার ললিতকে একটা ভাল চাকরি দে। তোর হাতে এখন কত ক্ষমতা!

ললিত ধমক দেয়, আঃ মা!

মা হাসে, তাতে কী! সঞ্জয় আমার ছেলের মতো।

ঠিকই তো! বলে সঞ্জয় উঠে গিয়ে মা'র হাত ধরে নিয়ে আসে, সকলের মাঝখানে বিছানায় বসায়, বসুন মাসিমা।

মা তুলসীকে বলে, ও তুলসী! আমাকে তোর বউ দেখালি না?

ললিত হাত ছুড়ে বলে, ইস মা, তোমার যে কত ডিম্যান্ড!

সেদিকে খেয়াল না করে বুড়ি আবার সঞ্জয়কে বলে, তোর গাড়িতে একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবি, একদিন তারকেশ্বর। নিবি না?

বলে মা ফোকলা মুখে হাসে— দু'টো ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

মা'র জন্য অস্বস্তি বোধ করে ললিত, বলে, তুমি যাও না, মা। ওদের জন্য কিছু করে দাও।

দিই। চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি, চিঁড়ে আর পাঁপড় ভেজে দেব।

আঁচলে নাক মুছে মা উঠে দাঁড়ায়।

মা চলে গেলে আবার সহজ লাগে তাদের।

সঞ্জয় হঠাৎ ঝুঁকে ললিতের বুকে আঙুলের দু'টো টোকা দিয়ে বলে, তোর মনোবল চমৎকার আছে। এইজন্য তোকে আমি হিংসে করি।

বাচ্চা ছেলের মতো লজ্জায় হাসল ললিত। এতদিন কথাটা তাকে কেউ বলেনি। সকলেই তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার দরকার ছিল না। তার মন চাইছিল কেউ এ-রকম একটা কিছু বলুক যে, সে সাহসের সঙ্গেই মুখোমুখি হচ্ছে সবকিছুর। ললিত তাই লজ্জায় হাসল।

সঞ্জয় বলে, আমি একগুঁয়ে, জেদি, কোনও কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ি না। তবু দেখ শেষ পর্যন্ত আমি দুর্বল। একটা ঘটনার কথা বলি শোন। কিছুদিন আগে আমি একটা পাখা কিনেছিলাম। সিলিং ফ্যান। কিনে এনে নিজেই সেটাকে টেবিলের ওপর চেয়ার তুলে ফিট করলাম। তারপর রাত্রে পাখাটার ঠিক নীচে মেঝেয় মাদুর পেতে রিনিকে নিয়ে শুলাম। এভাবে তিন-চারদিন কেটে গেল— পাখার নীচে শুই, হাওয়া খাই, রিনিকে ভালবাসার কথা বলি; তারপর একদিন অফিসের শেষে এক পার্টির সঙ্গে রেস্তরাঁয় গেছি। বিজনেসের নানা রকম কথা হচ্ছে, তারই এক ফাঁকে আমি সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকালাম। একই কোম্পানির পাখা। চোখটা একটু আটকে গেল। তারপর কথা বলি আর বারবার পাখাটার দিকে চেয়ে দেখি। যতবার তাকাই ততবারই একটা অস্বস্তি হতে থাকে। ওইভাবে বারবার দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার চোখ আটকে গেল একটা ছোট স্ক্রুর ওপর। পাখাটা যে-রডটায় ঝোলানো থাকে, সেই রড আর পাখার জয়েন্টে একটা ছোট্ট স্ক্রু লাগানো। স্ক্রুটা দেখতে দেখতে আমি বিজনেসের কথা বলছি, আর মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করছি ওই স্ক্রুটা আমি দেখছি কেন! পাখাটা যাতে রডের প্যাঁচ কেটে পড়ে না যায় তার জন্যই ওই স্ক্রুটা লাগানো— এ তো আমি জানি! তবে দেখছি কেন! ঠিক এই সময়ে আমি একটা শব্দ শুনলাম। হয়তো রাস্তায় গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ, কিংবা পেয়ালা পিরিচের ভেঙে যাওয়ার শব্দ— কীসের শব্দ তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু ওই শব্দটাই আমার মাথার মধ্যেকার ধোঁয়া কাটিয়ে দিল। হঠাৎ মনে পড়ল আমার পাখাটার ওই স্ক্রু লাগানো হয়নি! সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠলাম, দৌড়ে বেরোলাম দোকান থেকে— রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম, ভিড়— আমি পাগলের মতো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি থামালাম। সে-ট্যাক্সিতে সোয়ারি ছিল, আমি তার প্রায় পায়ের ওপর পড়ে বললাম— বড় বিপদ, আমাকে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিন। প্লিজ। ট্যাক্সিতে বসে আমি উন্মাদের মতো অস্থির ছিলাম। সারা দুপুর-বিকেল ঠিক পাখাটার তলায় মাদুর পেতে রিনি ঘুমোয়— ওর বুকের কাছে থাকে পিকলু। চার-পাঁচ দিন ঘুরেছে পাখাটা, ওই স্ক্রু ছাড়া। আলগা প্যাঁচের ওপর রডের সঙ্গে লাগানো! ভাবাই যায় না— ওইভাবে ওই পাখা আমিই লাগিয়েছি। আমি— যে-আমি ছিলাম মেকানিক, কতজনের বাসায় পাখা ফিট করে দিয়ে এসেছি! পাখা লাগানোর সব কিছুই আমি জানি— এ আমার অধীত বিদ্যা। তবু ভুল! ছোট্ট একটা মারাত্মক স্ক্রু আমি লক্ষই করলাম না! কে জানে বাসায় গিয়ে দেখব— ভাঙাচোরা রিনি আর থ্যাঁতলানো পিকলুর ওপর জগদ্দল পাখাটা মুখ থুবড়ে আছে।

ট্যাক্সির লোকটা জিজ্ঞেস করল, আপনার কী বিপদ? আমি কেবল বললাম, একটা স্ক্রু, একটা স্ক্রু! লোকটা না বুঝে ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। বাসার সামনে নেমে আমি এক দৌড়ে ভিতরে গিয়ে দেখলাম— সঞ্জয় হাসে, কী দেখলাম বল তো?

তুলসী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, কী?

পাখাটা চলছে, আর তাতে স্ক্রু লাগানো আছে ঠিকমতোই। ভুল হয়নি।

তুলসী হাসল, ট্র্যাজি-কমেডি!

কিন্তু মাইরি, তারপর থেকেই আমি বুঝে গেছি যে, নিজেকে আর বিশ্বাস করা যায় না। শালা, কোথায় নাট-বল্টুর ভুল করে রেখে দিয়েছি কে জানে! একদিন নিজের ফিট করা সংসার-টংসার হুড়মুড় করে নেমে যাবে। আর নয়তো ফুর্তি করতে করতে হঠাৎ বেমক্কা লাফিয়ে উঠে একটা স্ক্রু একটা স্ক্রু বলে ছুট লাগাব। নিজের ওপর আর কিছুতেই নির্ভর করা যাবে না! মাইরি, ললিত, তোর চেয়ে আমি অনেক দুর্বল। কেবলই মনে হয়, কোথায় কোন গোলমাল করে রেখেছি— সব ভেঙেচুরে যাবে।

ললিত হাসে।

সঞ্জয় বলে, আমার মনে হয় রমেনটারও এ-রকমই একটা কিছু হয়েছিল। ছোট্ট একটা ভুল ছিল কোথাও, হঠাৎ ধরতে পেরেছিল রমেন। নইলে ওর হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে যাওয়ার মানে কী? অ্যাঁ! দু'জনে একসঙ্গে কত বদমাইশি করেছি বল তো! ট্রাফিক পুলিশের মাথা থেকে টুপি তুলে নিয়ে ছুট লাগিয়েছি, দোকানে খেয়ে পয়সা দিইনি, বদলে আফ্রিকান নাচ দেখিয়ে ছাড়া পেয়েছি, সিনেমা হল-এ মারপিট করে নতুন বইয়ের প্রথম শো দেখেছি— কী স্পিড ছিল রমেনের! তবু ওর হল কী? আজ সারাদিন আমার রমেনটার কথা মনে পড়ছে।

রমেন! ললিত তার ডান দিকে তাকটার দিকে তাকাল। ওখানে অনেক ধুলো-পড়া পুরনো কাগজপত্র। ওর মধ্যে খুঁজলে রমেনের কয়েকটা চিঠি পাওয়া যাবে। আর, ঠিকানা। বড় সুন্দর ছেলে ছিল রমেন— ময়মনসিংহের সেই জমিদারের ছেলেটা। কখনও-সখনও নাম সই করত— রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

ললিত বলল, আমার কাছে রমেনের ঠিকানা আছে। নিবি?

না। মাথা নাড়ল সঞ্জয়, থাকগে। যে যার মনে থাকুক। বলে খুব চালাক-হাসি হাসল সঞ্জয়, বললে, ও শালা আমার কাছে হাজার দুয়েক টাকা পায়! সেটা আমার ব্যবসায় ডুবেছে।

তুলসী বলে, পাপিষ্ঠ।

সাড়ে আটটা নাগাদ সঞ্জয় আর তুলসী উঠল। দরজা থেকে তুলসী হঠাৎ বলল, আজ আদিত্যকে দেখলাম।

সঞ্জয় বলে, কোথায়!

গড়িয়াহাটায়। ডবল ডেকারের দোতলা থেকে দেখলাম আদিত্য চিনেবাদাম খেতে খেতে দক্ষিণমুখো চলেছে। সঙ্গে একটা কালোমতো মোটাসোটা মেয়েছেলে।

শুনে সঞ্জয় চেঁচিয়ে হাসল। আর, ললিত চমকে উঠল।

ললিতের মনটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। অমন সুন্দর, শ্যামলা মেয়েটি— শাশ্বতী আদিত্যর ও-পাশ থেকে ঝুঁকে বার বার ব্যাকুল হয়ে বলছিল— আমার পিসেমশাই এই রোগ থেকে সেরে উঠেছেন। দেখবেন, আপনারও সেরে যাবে। তুলসীটার রুচি নেই, চোখও না। কালোমতো, মোটাসোটা মেয়েছেলে! কেমন বিশ্রীভাবে বলল! তুলসী ওকে ঠিকমতো দেখেইনি।

গলির মুখে দাঁড়িয়ে ললিত অন্যমনস্কভাবে শুনল, সঞ্জয় তুলসীকে বলছে, শালা গাঁইয়া, এখনও গাড়ির দরজা ঠিকমতো বন্ধ করতে শিখিসনি।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে ওরা দু'জন ঝুঁকে একসঙ্গে সিগারেট ধরিয়ে নেয়। পিছন থেকে মা চেঁচিয়ে বলে, বউকে নিয়ে একদিন আসিস সঞ্জয়। তোর ছেলেটাকে দেখিনি। আর, আমাকে নিয়ে যাস তোর গাড়িতে। তুলসী, তোর বউ আনিস।

আসব... আসব... ওরা চেঁচিয়ে বলে, চলি রে, ললিত।

ললিত মাথা নাড়ে।

পিছন ফিরে গলির অন্ধকারের মুখোমুখি হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ললিত। মেয়েটি— ওই শ্যামলা সুন্দর শাশ্বতী— আজ রাতে হয়তো তার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ তীব্র একটা আনন্দ বোধ করে ললিত। পরমুহূর্তেই মনে হয়, এটা গর্হিত আনন্দ।

॥ নয় ॥

বাবার যে পুরনো ছবিটা দেয়ালে টাঙানো আছে তার পিছন থেকে দেয়াল বেয়ে পেট-মোটা একটা টিকটিকি ললিতের মুখোমুখি নেমে এল। গত কয়েক দিন ধরেই ললিত লক্ষ করেছে, মাঝে মাঝে টিকটিকিটা দেয়াল থেকে ধুপধাপ টেবিলের ওপর, মেঝের ওপর পড়ে যায়, আবার দেয়াল বেয়ে ওঠে, বাবার ছবিটার আড়ালে চলে যায়। সেই পুরনো টিকটিকিটাই কি, যেটা মায়ের সব কথায় সায় দিয়ে বরাবর ডেকে উঠত, টিকটিক টিকটিক? সে-কথাগুলো প্রায় সময়েই ছিল তার বিয়ে করার ঘর-সংসার করার কথা, কিংবা বাড়ি তৈরির জন্য তাগাদা। বরাবর টিকটিকিটা সায় দিয়ে গেছে। ও পরিষ্কার মায়ের দলে। মা কথা শেষ করে টিকটিকির ডাক শুনে মেঝেয় টোকা দিয়ে বলেছে, ওই শোন, তিন সত্যি। ললিত উত্তর দিতে গিয়ে কান পেতে থেকেছে, টিকটিকিটা ডাকেনি। সেই পুরনো টিকটিকিটাই কি না তা লক্ষ করার জন্য টেবিল ল্যাম্পের আলোটা ঘুরিয়ে ওর গায়ে ফেলে ললিত। লক্ষ করে টিকটিকিটার পেট বেঢপ মোটা। প্রায় কাচের মতো স্বচ্ছ সেই পেটের মধ্যে কালচে মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। আরও একটু কাছে চোখ নিয়ে সে দেখল পিছনের পায়ের কাছাকাছি পেটের মধ্যে দু' ধারে নিখুঁত গোল দুটি ডিম। এত স্পষ্ট যে, ললিত চমকে ওঠে। ডিম দু'টো ঢাকা দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত নেই ওর শরীরে। খুব অল্প যন্ত্রপাতি দিয়েই ওর শরীর তৈরি হয়েছে— ওইটুকু স্বচ্ছ শরীরের মধ্যেই ওর বুদ্ধি, হজমশক্তি, ভয় এবং সন্তান। বরাবরই ও ললিতের বিপক্ষে ছিল— মায়ের দলে। ললিত এখন দেখল, ও মাথা তুলে কালো জ্বলজ্বলে দু'খানা পুঁতির মতো চোখ দিয়ে তাকে দেখছে। বুঝি বা ললিতকে জানাচ্ছে গর্ভধারণের কষ্ট। কেন যে এটা বরাবর মায়ের সঙ্গে তার বিপক্ষে জোট বেঁধেছে তা এখন ললিত বুঝতে পেরে হাসে। ছাদ পর্যন্ত মসৃণ সাদা দেয়ালটার কোথায় ও ডিম পাড়বে! নিখুঁত গোল দু'টি ডিমকে গড়িয়ে পড়া থেকে কী করে বাঁচাবে ও? চিন্তিতভাবে টিকটিকিটার চোখে চোখ রেখে ভাবছিল ললিত। আপন মনে বলল, তোমার বেশ বিপদ, বুঝলে টিকটিকি-মা! তারপর সে ভেবে দেখল কখনও টিকটিকির ডিম মেঝেয় পড়ে ভাঙতে দেখেনি সে। ওরা ঠিক কোথাও-না-কোথাও এক আধটা খাঁজ খুঁজে পায়। প্রত্যেকের জন্যই এক-একটা বন্দোবস্ত আছে পৃথিবীতে। বাবার ছবিটার দিকে চেয়ে সে একটু হাসল। ছবিটার পিছনেই বোধ হয় টিকটিকিটার বাসা। ছবিতে মোক্তারের পোশাক পরা লোকটা এককালে পুব বাংলায় দাপটে ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। ঢোলা প্যান্ট পরে খালি পায়ে সাহেবদের বুট-পরা পায়ের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে। সাহেব-রেফারিরা যে-সব গোল নাকচ করেছিল সেগুলো ধরলে সে-আমলে শ' দেড়েক গোল দিয়েছিল লোকটা। প্রতিটি গোলেরই আলাদা আলাদা গল্প ছিল। রোমাঞ্চকর সে-সব গল্প। উইয়ে খাওয়া একটা ফটোগ্রাফ ছবির ফ্রেম থেকে খুলে মা সযত্নে ট্রাঙ্কে রেখে দিয়েছে। ছবিটায় আছে প্রকাণ্ড একটা শিল্ডকে ঘিরে একটা পুরনো আমলের ফুটবল টিম। শিল্ডটার বাঁ ধারে মাটিতে বসে বাবা— সামনে দু'খানা পা পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করে রাখা, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, মাথার মাঝখানে সিঁথি. মোটাসোটা নাদুসনুদুস শরীর, গায়ে জার্সি না থাকলে খেলোয়াড় বলে মনেই হত না। লোকটার বরাবর গর্ব ছিল— আমরা 'হায়ারে' খেলতাম। মাকে ছেলেবেলায় বলতে শুনেছে ললিত যে, ফুটবলের ডিমে তা দিয়েই লোকটা অর্ধেক জীবন কাটিয়ে দিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার উৎসবের সময়ে গ্রামে নবীনদের সঙ্গে প্রবীণদের একটা খেলা হয়েছিল। সেই শেষবার প্রবীণদের দলে বাবাকে খেলতে দেখেছিল ললিত। অফসাইডের জন্য বাবার দেওয়া একটা গোল নাকচ হল। ললিত কাঁদো-কাঁদো হয়েছিল ক্ষোভে, আক্রোশে। সান্ত্বনার মধ্যে রেফারিটা ছিল চশমা চোখে। সেই বিকেলেই হল 'কেদার রায়' নাটকের অভিনয়। শেষ দৃশ্য: কার্ভালো বুকে পিস্তল

দেগে আ...আ...গু-উ-ড বাই বে-ন্-গো-ও-ল' বলে ঢলে পড়ছে। চোখের জল শার্টের ঝুলে মুছে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল ললিত, চেঁচিয়ে সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, ওই লোকটা, ওই কার্ভালো তার বাবা! তার বাবা! পিছনের দু'টো লোক চেঁচিয়ে বলেছিল, বসে পড়ো খোকা, তোমার বাবা সত্যিই মরে নাই।

মোক্তারের পোশাক পরা লোকটার ছবির দিকে চেয়ে একটু হাসল ললিত, মনে মনে বলে, টিকটিকির ডিমে তা দিচ্ছো, বাবা? তারপর গম্ভীর হয়ে আবার হাসল, দাও। হায়ারেই খেলছ কিন্তু এখনও!

টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজপত্র, পুরনো চিঠি। সেগুলো ধুলো-টুলো ঝেড়ে দেখছিল ললিত। তাকে চিঠি লেখার লোক কম। তাই চিঠি বেশি জমেনি। কিছু চিঠি হারিয়ে গেছে, কিছু বা উনুন ধরানোর কাজে লাগিয়েছে মা। তবু এর মধ্যেই রমেনের কয়েকখানা চিঠি পাওয়া গেল। অনেক দিন আগে লেখা। রমেনের সঙ্গে চিঠি চালাচালি বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন। তার কথা ভুলেই গিয়েছিল ললিত। সঞ্জয় আজ না বললে মনেই পড়ত না, মনে পড়ে ভাল হয়েছে। তিন-চার শ' টাকা দেনা আছে রমেনের কাছে। সেটা শোধ দেওয়া দরকার। টাকাটার কথা হয়তো রমেনের মনেও নেই। কত লোকের কাছে রমেনের কত টাকা পড়ে আছে। জড়ো করলে কয়েক হাজার হবে। তার হিসেব রমেন রাখত না। রমেনের কাছ থেকে যারা টাকা নিয়েছে, তারা কোনও দিনই বোধ হয় সেটা শোধ দেওয়ার কথা ভাবেনি, রমেন নিজেই ভাবতে দেয়নি। তারপর এখন রমেন বোধ হয় সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসিই কিছু হয়ে গেছে, বিহারের ছোট শহরে এক আশ্রমে বাস করছে। সেই আশ্রমের ব্যাপার-স্যাপার ললিত জানে না। তবে মনে হয় তারা এতদিনে রমেনকে গেরুয়া-টেরুয়া পরিয়ে, মাথা কামিয়ে একটা আধ্যাত্মিক চেহারা দিয়েছে। সে হয়তো এখন আর টাকা-ফাকা ছোঁয় না, যে-কোনও মেয়েছেলেকে মা বলে ডাকে, কীর্তন-টীর্তন করে। এখন আর তার টাকা শোধ দেওয়ার মানেই হয় না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে চায় ললিত। রমেনের কথা মনে না পড়লে টাকাটার কথাও মনে পড়ত না, কিন্তু দৈবক্রমে যখন মনে পড়েই গেছে তখন শোধ করে দেওয়াটাই ঠিক হবে। কোনও দিন যদি রমেনের স্বার্থবুদ্ধি ফিরে আসে, তখন যেন ললিতের প্রতি তার কোনও আক্রোশ না থাকে। মরার পরও যদি ললিত কিছুদিন তার চেনা লোকজন, আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের স্মৃতিতে থেকে যায় তবে সে-থাকাটা যেন ঋণমুক্ত, হিংসা-দ্বেষহীন এবং ভারশূন্য হয়।

রমেনেব ঠিকানাটা পাওয়া গেল সহজেই। সোজা ঠিকানা। শুধু নাম, আর পোস্ট-অফিস। এতেই চিঠি চলে যায়। চিঠির কাগজে কেবল 'ভাই রমেন' এই পাঠটুকু লিখে ললিত এর পরে কী লিখবে তা ভাবছিল, এমন সময়ে শম্ভু এসে ডাকল, ললিতদা।

কী রে!

একটু বাইরে আসুন।

কেন রে!

একটু দরকার আছে।

ললিত বাইরে এসে দেখল গলির মুখে পাড়ার কয়েকজন ছেলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কথা বলছে। তাকে দেখে সিগারেট লুকোল। শম্ভু গলির মধ্যে তাকে এনে বলল, আপনি বিমান রক্ষিত নামে কাউকে চিনতেন?

ললিত একটু ভেবে বলল, কেমন চেহারা বল তো! কোথায় থাকে?

শম্ভু বলল, এ-পাড়ারই লোক— নতুন এসেছে। ফরসা রোগা চেহারা, দেখলে মনে হয় অসুখবিসুখ আছে, ভাসা-ভাসা চোখ...

ললিতের মনে পড়ল না। বলল, উঁহু। দেখলে হয়তো চিনব। কিন্তু কী ব্যাপার?

শম্ভু তার দলের একটা ছেলেকে ডাকল। সুবল। সুবল এগিয়ে এসে বলল, লোকটা এ-পাড়ায় নতুন। পশ্চিমের বস্তিবাড়ির কাছেই একটা খোলার ঘরে থাকে। কয়েক দিন আগে রাত্রিবেলা কিছু লোক এসে লোকটাকে খুব মেরে-ধরে গেছে। আমরা কিছু জানতাম না। পরদিন সকালে খবর পেয়ে আমরাই ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়েছি। কিন্তু মার খাওয়ার পর থেকেই লোকটা কেমন পাগল-পাগল হয়ে গেছে। একা একা কান্নাকাটি করে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। গতকাল থেকে সে আপনার নাম বলছে।

বলছে যে, আপনার সঙ্গে নাকি কলেজে এক ক্লাসে পড়ত। আমরা ভদ্রলোকের মার-খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর করছি, কিন্তু কিছুই বের করা যাচ্ছে না। পুলিশেও খবর দেবে না, হাসপাতালেও যাবে না। লোকটা রোগা, কিন্তু ভীষণ গোঁয়ার। আমরা খুব চাপাচাপি করায় গতকাল হঠাৎ বলল, ঠিক আছে, এ-পাড়ায় ললিত ভট্টাচার্য থাকে, সে আমার কলেজের ক্লাস-মেট, তাকে ডেকে দিন, তার কাছে বলব। আপনার অসুখ বলে আপনাকে আমরা প্রথমে খবর দিইনি, কিন্তু এখন দেখছি আপনাকে না হলে ব্যাপারটা কিছুই জানা যাবে না।

শম্ভুর দলবলের অধিকাংশ ছেলেই বেকার। তাদের সময় কাটতে চায় না। পাড়ায় কোনও ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট হলে খুশি হয়, সেইটে নিয়ে কিছু দিন মেতে থাকে। অচেনা একটা লোক রহস্যময় কারণে বেপাড়ার কিছু লোকের হাতে মার খেয়েছে— এর গুপ্ত রহস্য ভেদ না করলে শান্তি নেই।

কিন্তু ললিত কিছুতেই মনে করতে পারল না। যে -কলেজে সে পড়ত সেটা কলকাতার একটা বড় কলেজ। আসলে সেটা ছিল গোয়ালঘর। এক ঘরে আড়াই শ' ছেলে গাদাগাদি করে বসে তারা জেনারেল ক্লাস করত। প্রায় সবসময়েই রোল কলের পর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের করিডোরে সিগারেট ফুঁকত, কিংবা চায়ের দোকানে আড্ডা জমাত। সেই আড়াই শ' ছেলের মধ্যে কে যে রোগা ফরসা চেহারার ভাসা-ভাসা চোখের বিমান রক্ষিত তা কে বলবে। সে, রমেন আর আদিত্য পড়ত এক ক্লাসে, তুলসী পড়ত এক ইয়ার নীচে। এরা ছাড়া আর যারা ক্লাসের বন্ধু ছিল তাদের মধ্যে কাউকেই বিমান রক্ষিত বলে মনে হল না তার। সে মাথা নাড়ল, না রে সুবল, মনে পড়ছে না। চল, একবার দেখেই আসি ছেলেটাকে।

ঘরে গিয়ে জামা নিয়ে বেরিয়ে এল ললিত। চেঁচিয়ে মাকে সদর বন্ধ করতে বলল, তারপর আর মায়ের উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করল না।

পশ্চিমের বস্তি খুব দূরে নয়। মিনিট তিনেক যেতে হয়। পাড়ার রাস্তা থেকে একটা শ্যাওলা-পড়া কাঁচা মেটে রাস্তা গিয়ে বস্তিতে শেষ হয়েছে। বস্তি থেকে একটু আলগা ঘরখানা— ওপরে খোলার চাল, কিন্তু দেয়াল আর মেঝে পাকা। ঘরে ইলেকট্রিক বাতিও রয়েছে। সুবল বলল, এই ঘর। ভদ্রলোক বাইরের ঘরে থাকেন, ভিতর দিকটা বাড়িওলার।

সুবল এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোকজন উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করল। খালি গায়ে লুঙ্গিপরা একটা লোক এসে তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। লোকটা বিমান রক্ষিতের বাড়িওয়ালা। রাস্তার আলোয় তার মুখে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা দেখতে পেল ললিত। লোকটা তাকে চেনে। এ-পাড়ায় এখনও ললিতের খানিকটা দাপট আছে। লোকটা তাকে দেখে নমস্কার করল; বলল, একটা কিছু সমাধান করে যান দাদা। শুনেছি আপনার বন্ধু, ঘরখানা ছেড়ে দিতে বলেন। বড় অশান্তি হচ্ছে।

দরজায় অনেকক্ষণ ধাক্কা দেওয়ার পর দরজা খুলল। দরজায় দাঁড়িয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা একটা লোক। রাস্তার ম্লান আলোতেও হঠাৎ লোকটার দু'টো চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠল। লোকটা বলল, কী ব্যাপার?

অসম্ভব সুন্দর ভরাট গলা লোকটার। একবার শুনলেই মন আকৃষ্ট হয়। পরনে পায়জামা, ওপর-গায়ে একটা তোয়ালে জড়ানো।

সুবল বলল, ললিতদাকে নিয়ে এসেছি।

শুনে লোকটা তাদের কয়েকজনের দিকে একটু অনির্দিষ্টভাবে চেয়ে থেকে বলল, আসুন।

ঘরে পঁচিশ কি চল্লিশ পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় ঘরের ভিতরটা দেখল ললিত— চার দিকে কেবল বই আর বই। নোংরা বিছানা, ময়লা মশারি নিচু করে টাঙানো, ঘরের এধার-ওধার জুড়ে টাঙানো দড়িতে রাজ্যের জামা-কাপড়। বিমান রক্ষিত যে জামা-কাপড় ধোপাবাড়ি দেয় না তা একনজরেই বোঝা যায়। দড়ি থেকে গামছা ঝুলছে, পায়জামা শুকোচ্ছে। এক উদাসীনতা ছাড়া ঘরটার আর কোনও চরিত্র নেই। এই হতদরিদ্র ঘরে চকচকে নতুন দামি মলাটের ইংরিজি বইগুলি খুবই বেমানান লাগছিল।

দরজা খুলে দিয়েই লোকটা আবার বিছানায় গিয়ে বালিশে পিঠ দিয়ে আধশোয়া হয়েছে। তাকে দেখে বলল, এসো ললিত, বিছানায় বোসো।

কাছ থেকে ললিত মুখখানা দেখল। ব্যান্ডেজের তলায় কপাল ঢাকা পড়েছে, নাকটা ফুলে লাল হয়ে আছে, বাঁ চোখ থেকে ডান দিকের থুতনি অবধি একটা প্রকাণ্ড কালশিরার দাগ, ঠোঁট ফাটা— তাতে রক্ত জমে আছে। গা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা, তাই সেখানকার ক্ষতগুলো দেখা গেল না। স্বাভাবিক মুখখানা হয়তো বা চিনতে পারত ললিত। কিন্তু এখন এই ফোলা-কাটা-ফাটা মুখখানা কিছুতেই চেনা গেল না। তার দিকে অপ্রতিভ তাকিয়ে লোকটা একটু হাসবার চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে ফাটা ঠোঁট দিয়ে রক্ত ফুটে বেরোল। 'আপনি' না 'তুমি' কী বলবে ঠিক করতে না পেরে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল ললিত। হঠাৎ খেয়াল হল লোকটা একটু আগেই তাকে 'তুমি' বলেছে। সে বলল, কথা বোলো না, তোমার ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছে।

তোয়ালে দিয়ে ঠোঁটটা একটু চেপে ধরে লোকটা সেই ভরাট সুন্দর গলায় বলল, আমি তোমাকে চিনি। তোমার বোধহয় আমাকে মনে পড়ছে না!

ললিত একটু হাসল।

শম্ভুরা ঘরের মধ্যে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, জানালা দরজা দিয়ে উঁকি মারছে কৌতূহলী লোক। লোকটা এই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ মুখে চুপ করে রইল। চোখে-মুখে খানিকটা ঘাবড়ে যাওয়া ভাব।

ললিত শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা এখন যা, আমি একটু কথা বলি।

শম্ভু মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে গেল ওর দলবল। ললিত উঠে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল ওরা দরজার বাইরে জটলা করছে। সুবল গলা বাড়িয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, চিনতে পারছেন তো? না কি শালা চারশ' বিশ!

ললিত বলল, চিনেছি। তোরা চলে যা। কাল সকালে দেখা করিস।

দরজা বন্ধ করল ললিত, জানালা ভেজিয়ে দিল। তারপর সিগারেটের প্যাকেট মাঝখানে রেখে লোকটার মুখোমুখি বিছানায় বসল।

বোঝা যায় ভাসা-ভাসা দু'টো চোখের তলায় অনেক কথা জমা হয়ে আছে। লোকটা ভ্রূ জড়ো করে তার দিকে একটু তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, তুমি সত্যিই আমাকে চিনতে পারছ?

ললিত একটু দ্বিধা করে বলল, ঠিক মনে পড়ছে না।

লোকটা চোখ খুলল, আমাকে খুব কম ছেলেই চিনত। আমি কারও সঙ্গেই মিশতে পারতাম না।

বলে একটু থেমে বলল, কলেজ-জীবনে তুমি ছিলে আমার হিরো। তোমাকে আমার খুব মনে আছে। তুমি ছাত্র-ইউনিয়ন করতে। চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতে, অনেক ভোটে জিতে তুমি হয়েছিলে কলেজ-ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি— সব ঠিক বলছি তো?

ললিত মাথা নাড়ল— ঠিক।

লোকটা আবার বলল, তুমি ছিলে ছাত্রমহলে ভীষণ পপুলার। যে-কেউ মুশকিলে পড়লে তোমার কাছে ছুটে যেত। তুমি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক লড়াই জিতেছিলে। প্রায়ই দেখতাম ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে তোমাকে ঘিরে জটলা হচ্ছে। ছেলেরা তোমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও করিডরে, কখনও কলেজের সামনে রাস্তায়, কখনও চায়ের দোকানে। তুমি কড়া মেজাজের প্রিন্সিপালের ঘরে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারতে, ভাইস-প্রিন্সিপালকে মেজাজ দেখিয়ে আসতে পারতে, প্রফেসররা তোমাকে ভয় পেত। তুমি ছাত্রদের অনেক ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করেছ। ঠিক বলছি না?

ললিত মাথা নাড়ে, ঠিক।

আমার খুব হিংসে হত ভাই! বলে লোকটা আবার হাসল। তার ফাটা ঠোঁট দিয়ে রক্তবিন্দু ক্রমান্বয়ে গড়িয়ে আসছে, আর সে তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে মুছে কথা বলছে, আমি ভেবেই পেতাম না ছেলেরা তোমার সঙ্গে এত কী কথা বলে! তাদের সঙ্গে তোমারই বা কী এত কথা থাকতে পারে! কথার অভাবে আমার কোনওকালে তেমন বন্ধু জোটেনি। দু'-চারটে কথার পরই আমার কথা ফুরিয়ে যায়, বলার মতো কিছুই আমি আর খুঁজে পাই না, অসহায়ভাবে আমি চুপ করে থাকি। ছেলেবেলা থেকেই এইরকম আমার কপাল। যতবার বন্ধু পাতাতে গেছি ততবারই টের পেয়েছি আমার বলার মতো তেমন কিছু নেই। অথচ চিরকাল দেখেছি আমার সমবয়সি বন্ধুরা ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসে নিচু স্বরে কথা

বলছে, খেলতে খেলতে কথা বলছে, খেলার শেষে কথা বলছে, স্কুলে যেতে যেতে, স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে দল বেঁধে, জোট বেঁধে কথা বলছে। আমার ইচ্ছে হত আড়াল থেকে আড়ি পেতে ওদের কথাগুলো মুখস্থ করে রাখি, তারপর সেই কথাগুলোই আমার কথা করে তুলি। কিন্তু শুনতে গিয়ে দেখেছি সেই কথাগুলো একেবারেই তুচ্ছ সামান্য সব কথা, যার তেমন কোনও মানে নেই। তবু সবাই ওইরকম আজেবাজে কথা দিয়েই পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখছে। আমি ও-রকম আজেবাজে কথা বলার চেষ্টাও করে দেখেছি, আমার হয় না। বন্ধুরা বরাবর আমাকে এড়িয়ে গেছে। তাই ক্রমে ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব কমে যেতে লাগল। নিজের কথার অভাব সম্বন্ধে আমি এত সচেতন হয়ে উঠছিলাম যে, মানুষের সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব কমে যেতে লাগল। সকলের মধ্যেই ঘুরি ফিরি, কিন্তু কারও সঙ্গেই সাহস করে কথা বলি না। এটা আমার এমন একটা রোগের মতো হয়ে দাঁড়াল যে, আমার উপস্থিত-বুদ্ধি পর্যন্ত কমে যাচ্ছিল। রাস্তার অচেনা লোক কোনও ঠিকানা বা রাস্তার খোঁজ করলে আমি খুব ঘাবড়ে যেতাম, ঘড়িতে ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করলে দিশেহারা হয়ে নিজে হাতঘড়ির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও সঠিক সময়টা বুঝতে পারতাম না। প্রায়ই আমি লোককে ভুল ঠিকানা কিংবা ভুল সময় বলে দিয়েছি। আমাদের বাড়িতে কোনও আত্মীয়-স্বজন এলে, কিংবা কেউ বেড়াতে এলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম। আমি অন্য কারও বাড়িতে পারতপক্ষে যেতাম না। ট্রামে-বাসে কেউ আমার পা মাড়িয়ে দিলে আমি বলতে পারতাম না— পা'টা সরিয়ে নিন মশাই, দোকানদার ভুল পয়সা ফেরত দিলে বলতে পারতাম না যে, পয়সা ভুল হয়েছে, ওজনে কম দিলে বলতে পারতাম না— তোমার দাঁড়িপাল্লার ফেরটা একটু দেখি হে! এক বার বাসে আমার চোখের সামনে দেখলাম, একটা ছোকরা পকেটমার এক বুড়ো লোকের পকেট থেকে ব্যাগ তুলে নিল। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। এক বার ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে গ্যালারির ওপর থেকে আমি সিগারেটের জ্বলন্ত শেষ অংশটুকু ফেলে দিয়ে লক্ষ করলাম সেটা গ্যালারির কাঠের ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ল। সেখানে একটা লোক উবু হয়ে বসে পেচ্ছাব করছিল, তার ঘাড়ের শার্টের কলারে গিয়ে আটকে গেল টুকরোটা! লোকটা টের পায়নি, ওদিকে তার শার্টের পিছন দিকটা ধরে গিয়ে ধোঁয়া উঠছিল। আমি এক-দৃষ্টে সভয়ে সে-দৃশ্যটা দেখলাম, কিন্তু লোকটাকে ডেকে ব্যাপারটা বলতেই পারলাম না।

আবার ঠোঁটে তোয়ালে চাপা দিল লোকটা। বলল, তুমি এটা ঠিক বুঝবে না। কারণ, তোমার কখনও কথার অভাব হয়নি। তুমি বরাবর অনায়াসে কথা বলেছ। শুনে তোমার একটু অদ্ভুত লাগছে, না?

হাসল ললিত, বলল, বলো, থেমো না।

তোমার একটা সিগারেট খাই। বলে লোকটা সিগারেট ধরাল। খুব কষ্টে ফাটা ঠোঁটে সিগারেট আটকে অল্পস্বল্প টান দিল। তারপর বলল, স্কুলে বা কলেজে যে-সব ছাত্র জনপ্রিয় ছিল, তাদের সবাই ছিল আমার হিরো। তুমিও ছিলে। তোমাকে খুব লক্ষ করতাম আমি। ছিপছিপে ফরসা শরীর, চোখা নাক, চাপা গাল, তুমি চুপ করে থাকলেও তোমার ধারালো মুখখানা কিন্তু নীরবে কথা বলত। তুমি কখনও কাউকে অগ্রাহ্য করতে না, এবং নিজের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে তুমি সচেতন ছিলে। আমার ধারণা হত যে, একদিন তুমি দেশের নেতা-টেতা গোছের কিছু হয়ে উঠবে। কলেজের ফাংশনে একবার তোমাকে দেখেছিলাম কলকাতার মেয়রের সঙ্গে কথা বলতে, আর-এক বার দেখেছিলাম এক সুন্দরী বিখ্যাত গায়িকার সঙ্গে। আমার বিশ্বাস ছিল তোমার ক্ষমতা এত বেশি যে, তুমি হয়তো একদিন ওই বিখ্যাত গায়িকাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে পারবে। তোমাকে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বড় চমৎকার মানিয়েছিল। তোমাকে আমি হিংসে করতাম, কিন্তু মনে মনে সবসময়ে চাইতাম তুমি যেন অপরাজেয় হয়ে থাকো, সামনের ইউনিয়ন ইলেকশনে কেউ যেন তোমাকে হারাতে না পারে, কলেজ কর্তৃপক্ষ যেন কখনও তোমাকে উপেক্ষা না করে, তোমার সম্ভাব্য বিয়ের প্রস্তাব যেন কখনও প্রত্যাখ্যান না করে সেই বিখ্যাত সুন্দরী গায়িকা। দেখো, তোমাকে আমি কতটা মনে রেখেছি।

হাসল লোকটা, রক্তের ফোঁটা ফুটে উঠল ঠোঁটে, তোয়ালে চাপা দিয়ে বলল, কিন্তু আসলে আমার দুর্বলতা থেকে তোমাকে আমি যতটা বড় মনে করতাম তুমি হয়তো ঠিক ততটা বড় নও। তুমি যা, তার চেয়ে তোমাকে আমি বহু গুণ বাড়িয়ে দেখেছিলাম। না?

ললিত মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, ঠিক।

আমি যে সত্যিই তোমার সঙ্গে পড়তাম তার আরও একটা প্রমাণ দিই। সে সময়ে তুমি কলেজের ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধে লিখেছিলে— 'ভারতে সাম্যবাদ এবং কয়েকটি অসুবিধা'— ঠিক বলছি না? সেই প্রবন্ধে তুমি লিখেছিলে যে, ভারতবর্ষে ধর্মই হচ্ছে সাম্যবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। অথচ এ-ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। কারণ, ধর্মই ভারতবর্ষের সভ্যতাকে তৈরি করেছে, ধর্মই চিরকাল ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছে এ দেশের ইতিহাস। একটা পুরো জাতি ধর্মে শৃঙ্খলিত। সাম্যবাদের প্রথম আঘাতটি যখন এর ওপর এসে পড়ে তখন ঠিক অনুরূপ একটি প্রত্যাঘাতও লাভ করে। কারণ, এ দেশের লোক ধর্মের নামেই পারত্রিক দুঃখগুলি ক্লেশে বহন করে, কর্মফল স্বীকার করে বাস্তব পৃথিবীর আঘাতগুলি অনায়াসে গ্রহণ করে। তুমি আরও লিখেছিলে: আর আশ্চর্যের বিষয় যে, এখনও কোনও কোনও মন্দির বা দেবস্থানে হত্যা দিয়ে বা মানসিক করে লোকের কিছু কিছু মনস্কামনা পূরণ হয়। কোনও ধর্মগুরু বা যাজক এখনও লোককে কিছু কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করান, যার ফলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস ভাঙনের মুখে এসেও আবার জোড়া লেগে যায়। তোমার প্রবন্ধটা এ-রকমই ছিল, না?

ললিত মাথা নাড়ে, ঠিক।

তুমি এই সাম্যবাদ এবং ধর্মের একটা সমাধান দিয়েছিলে। তুমি লিখেছিলে: এ দেশে ধর্মের অসারতা প্রমাণ করতে হলে সাম্যবাদের প্রতিটি প্রচারককেই হাতেকলমে ধর্মের প্রতিটি বিধি এবং আচারকে মানতে হবে। মনুর অনুশাসনকে শিরোধার্য করে নিয়ে লোকের সামনে সমস্ত বিধিগুলি পূর্ণ করে নিয়ে দেখাতে হবে যে, এগুলো আসলে ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। এদেশে ধর্মকে হাতেকলমে অপ্রমাণ না করতে পারলে এর ভিত নড়ানো যাবে না।

সিগারেটটা শেষ করে ঘরের একধারে না দেখে ছুড়ে ফেলল লোকটা, বলল, তোমার সমাধানটা আমার অদ্ভুত লেগেছিল।

বলতে বলতে হঠাৎ হো-হো করে হাসল লোকটা, খুব অদ্ভুত। ধর্মকে অস্বীকার করার জন্য সাম্যবাদীরা ফোঁটা তিলক কেটে বোষ্টম হচ্ছে, কাপালিক হয়ে শ্মশানকালীর পুজো করছে, কিংবা সাধু হয়ে চলে যাচ্ছে হিমালয়ে, কীর্তন করে ফিরছে সারা দেশ— ভাবাই যায় না।

লজ্জায় ললিত একটু লাল হল। বাস্তবিক ও-রকমই একটা অস্বাভাবিক প্রস্তাব সে করেছিল সেই প্রবন্ধটায়। ঠিক।

লোকটা একটু স্থির হয়ে, রক্তাক্ত হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি এখনও সেই প্রস্তাবে বিশ্বাস কর?

ললিত মাথা নাড়ল, না।

কেন করো না?

ললিত চুপ করে রইল।

লোকটা হঠাৎ বলল, আমি বিশ্বাস করি। তুমি ঠিকই লিখেছিলে।

টিকটিক করে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। লোকটা লক্ষ করল না, কিন্তু ললিত শুনল।

বেশ কষ্ট এবং কসরত করে লোকটা উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল, চা খাবে?

ললিত বলল, না।

আমি একটু খাব।

বলে লোকটা উঠল। ঘরের একধারে রান্নার জন্য কিছু অ্যালুমিনিয়মের বাসনপত্র আর কেরোসিন স্টোভ ছিল। লোকটা স্টোভ জ্বেলে কেটলি চাপিয়ে আবার এসে চৌকিতে বসে একটু হাঁফাল। তোয়ালেটা গা থেকে বেখেয়ালে সরে যেতেই লোকটার খুব রোগা শরীর দেখা গেল। বুকের খাঁচাটা সরু একটা নলের মতো গোল। ললিত স্থির চোখে লোকটাকে দেখছিল। সুবলের সন্দেহ, মার খেয়ে লোকটা পাগল-পাগল হয়ে গেছে। তাই হবে।

লোকটা বলল, এ-পাড়ায় এসে আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেই চিনেছিলাম। না, তোমার চেহারা সেই আগেকার মতো ধারালো নেই, একটু ভোঁতা হয়ে গেছে। আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম না। কারণ, আমি জানতাম তুমি আমাকে ঠিক চিনবে না। আমাকে খানিকটা চিনত তোমার বন্ধু রমেন।

রমেন?

লোকটা মাথা নাড়ল। বলল, তোমাকে এ-পাড়ায় দেখে খুব হতাশ হলাম। দেখলাম, আমি যা ভেবেছিলাম তুমি তার কিছুই হওনি। অলস সময় কাটিয়ে দিচ্ছ। তারপর শুনলাম, তোমার অসুখ। তারপর আর তোমার সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল হয়নি।

ললিত মৃদু একটু হেসে বলল, আমার কথা বাদ দাও। আমার নিজেরও আর কৌতূহল নেই। তুমি নিজের কথা বলো।

লোকটার মাথায় বা কোথাও কোনও যন্ত্রণা হচ্ছিল। খানিকক্ষণ মুখখানা বিকৃত করে যন্ত্রণাটা সহ্য করল। তারপর একটু ঝিম মেরে রইল। বলল, আমি কি খুব এলোমেলো কথা বলছি?

না তো!

ঠিকঠাক গুছিয়ে বলতে পারছি?

নিশ্চয়ই।

লোকটার ঘোলাটে চোখ চিকমিক করে উঠল। তেমনই ধীর ভরাট গলায় বলল, আমার বাবা উকিল ছিল, বাবার ইচ্ছে ছিল আমিও উকিল হই। কিন্তু আমার রকমসকম দেখে বাবা সে-আশা ছেড়ে দিল। আমি যা ইচ্ছে পড়তে লাগলুম। প্রথমে বিজ্ঞানে ইন্টারমিডিয়েট, তাবপর বি কম, মাঝপথে বি কম ছেড়ে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি এ। অনার্সের ক্লাসে তোমার বন্ধু রমেনের সঙ্গে আলাপ।

আলাপ?

লোকটা হাসল, আলাপ শুনে হাসছ?

বাস্তবিক আলাপটা হঠাৎ হয়নি। রমেনকে তুমি বোধ হয় খানিকটা চেনো— সে খুব কৌতূহলী ছেলে। কোনও বিষয়ে একবার সে কৌতূহলী হলে তাকে ঠেকানো মুশকিল। আমার চুপচাপ অসহায় ভাব লক্ষ করে সে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে। আমার কথা আসতই না, দু'-একটা কথা বলেই আমি থেমে যেতাম। কিন্তু রমেন আমার শেষ দেখবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

লোকটা হঠাৎ মুখ বিকৃত করে বলল, যাক গে, সে বিস্তর কথা। বি.এ পাস করে আমি দর্শনের এম এ-তে ভরতি হলাম, তুমি পড়তে ইংরিজি নিয়ে। তখনও তোমাকে আমি দেখেছি। শেষ পর্যন্ত আমার আর পড়া হয়নি।

কেন?

লোকটা হাসল, তারপর অকপটে বলল, আমি কিছু দিনের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

## ॥ দশ ॥

লোকটা কষ্টেসৃষ্টে উঠে স্টোভ থেকে চায়ের কেটলি নামিয়ে বলল, আমি আকাশেব কথা ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

নিপুণ হাতে চা তৈরি করল লোকটি। কেটলি থেকে যখন লিকার ঢালছিল তখন সেই লিকারটাকে একদম কালো আর থকথকে ঘন দেখাচ্ছিল। খুব কড়া লিকারের চা। রক্তবর্ণ সেই চা কাপে নিয়ে আবার এঁকেবেঁকে বিছানায় এসে বসল। বলল, আকাশের কথা ভাবতে ভাবতে, কিন্তু দেখো, বরাবর আমার চার পাশের পৃথিবীর বা সমাজ-সংসারের ভাবনার চেয়ে আকাশের ভাবনাই আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। বিভোর হয়ে ভাবতুম। ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা, লোকের মধ্যে আকাশের ভাবনা ঢুকিয়ে দিতে পারলে, আকাশ-বিভোর করে দিতে পারলে পৃথিবীতে পাপটাপ অনেক কমে যাবে, দুঃখ-কষ্ট, বিরহ-মৃত্যু অনেকটাই সহনীয় হয়ে যাবে তখন। মানুষ খানিকটা বিবাগী উদাসী হয়ে যাবে। অবশ্য তারও একটা বিপদ ছিল। মানুষ তখন আর তেমন চাষেবাসে মনোযোগী হবে না, ঠিকমতো কলকারখানা চালাবে না, প্রজনন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতেও পৃথিবীর খুব একটা ক্ষতি হত না। হত কি? হিসেব করলে দেখা যায়, আমরা পৃথিবীতে প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি জিনিস উৎপাদন করি। বেশি উৎপাদন করি বলেই বেশি লুকিয়ে রাখি, বেশি সঞ্চয় করি। তাতে বেশি অভাব দেখা দেয়।

কী বলো? তা ছাড়া আকাশ-চিন্তায় মানুষের কামভাব কমে যায় অনেক। তাতে মানুষ কমই জন্মাবে পৃথিবীতে, লোকসংখ্যা কমে যাবে ঢের। সচ্ছলতা দেখা দেবে। না?

চায়ে চুমুক দিয়ে সেই গরম কড়া চায়ের তীব্র স্বাদে লোকটা মুখ বিকৃত করল। তারপর বলল, এইভাবে আকাশ-চিন্তায় আমি পাগল হয়ে গেলাম। আকাশটা একটু একটু করে আমার মধ্যে ঢুকছিল। কিন্তু আমার মাথা একটা সসীম বস্তু। তার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধ রয়েছে, তার ভাবনা-চিন্তার রয়েছে একটা সীমা। তার মধ্যে অসীম আকাশটা ঢুকবে কী করে? তবু রোজই আমি টের পেতাম অনবরত আমার মাথার মধ্যে বিশাল, প্রকাণ্ড অনন্ত আকাশ ঢুকছে তো ঢুকছেই। আমার মাথার ভিতরটা টইটম্বুর হয়ে গেল, তারপর ফাটো ফাটো হল। ব্যথায় আমি একা একা চিৎকার করতাম। সেই সময়ে আমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। আমার মা-বাবার ধারণা হয়েছিল যে, দর্শন পড়তে পড়তেই আমার ও-রকম অবস্থা। আমি তিন-চার মাস বাসায় বসে রইলাম। আমার বাবা ছিল জজ-কোর্টের উকিল, কিন্তু তাঁর পশার ছিল না। সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে কাছারিতে যেত, জামিন বা এফিডেবিটের ছোটখাটো কাজ থেকে পয়সা পেত। সংসার চলত না। বি এ ক্লাসের মাঝামাঝি থেকে রমেন আমার পড়ার খরচ না দিলে আমার পড়া কবে বন্ধ হয়ে যেত। তিন-চার মাস পর আমার পাগলামি সেরে গেলে বাবা আর আমাকে পড়তে দিল না। খুব ধরা-করা করে কর্পোরেশনে আমাকে একটা কেরানির কাজে বহাল করে দিল। ধাঙ্গড়-জমাদারদের হাজিরা নেওয়ার কাজ। তারপর বাবা বুড়ো হয়ে, অসুখে ভুগে মারা গেল। তার এক বছর বাদে উদুরিতে মারা গেল মা। আমার ছোট বোনটা একজনকে ভালবেসে বিয়ে করল। আমার দাদা চলে গেল চাকরি নিয়ে জার্মানিতে। আমাকে একা পেয়ে সাবেকি বাসা থেকে উচ্ছেদ করে দিল বাড়িওয়ালা। আমি মামলায় হাজির হইনি বলে একতরফা ডিক্রি পেয়ে সে কোর্টের পেয়াদা এনে আমার মালপত্র, বই, বিছানা ফুটপাথে বের করে দিল সকালবেলায়। আমি সারা দিন পাড়াপড়শিদের ভিড়ের মধ্যে ফুটপাথে আমার বাক্সের ওপর বসে রইলাম। আমার অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেল। আমি কাউকেই বলতে পারলাম না যে, 'আমাকে একটু সাহায্য করুন' কিংবা 'আমাকে একটু আশ্রয় দিন।' ভাগ্যক্রমে কর্পোরেশনের একটা দয়ালু জমাদার আমাকে দেখতে পায়। সে হাজিরা-খাতায় টিপসই দিয়ে সারা দিন নিজের ধান্ধায় ঘুরত। আমি তাকে কিছুই বলতাম না এমনিতেই, তার ওপর সে রোজ আমাকে বাঁধা রেট-এ দশ পয়সা করে ঘুষ দিত মুখ বন্ধ রাখার জন্য। সেই লোকটাই অবশেষে আমাকে এইখানে নিয়ে আসে। সেই থেকে আমি এই ঘরে আছি।

হঠাৎ আচমকা ললিত প্রশ্ন করল, তুমি ঘুষ নাও?

লোকটা মাথা নাড়ল, নিই। আপত্তি করতে আমার লজ্জা করে। ওরা, ওই ধাঙ্গড়-জমাদাররা খুব আদর করে খুব ভালবাসার সঙ্গে পয়সাটা দেয়। আমি খুব অসহায় বোধ করি, ফিরিয়ে দিতে পারি না। তা ছাড়া যদি ফিরিয়ে দিই তবে ওদের দিয়ে আমাকে কাজ করিয়ে নিতে হবে। যদি তা করি তবে ওরা রেগে যাবে, ছুতোনাতা ধরে হাঙ্গামা করবে, আমাকে চাকরিতে থাকতে দেবে না। সেই হাঙ্গামা সহ্য করার মতো জোর আমার নেই। বুঝলে! আমি যদি সৎ হই, তবে আমার কর্তব্যপরায়ণ এবং সাহসীও হওয়া দরকার। নইলে দুর্বল সৎকে দিয়ে সমাজের কোনও উপকার নেই। সৎ হওয়া সোজা। আমি রোজ সকালে জমাদারদের দেওয়া পয়সা ফিরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কিছুতেই তাদের দিয়ে কাজ করাতে পারি না। আমি ঘুষ না-নিলেও শহর নোংরা থাকবে। নয় কি? কেননা আমি কর্তব্যপরায়ণ বা সাহসী নই। ঠিক বলছি না?

ললিত হাসল, বলল, বলে যাও।

লোকটা একটু চুপ করে রইল। কপালে ব্যান্ডেজের তলা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে একটু চুলকে নিল। তারপর যন্ত্রণায় মুখ একটু বিকৃত করে বলল, আমার সবচেয়ে প্রিয় বই হচ্ছে কবিতা আর দর্শনের। এই সমস্ত দামি বইগুলো আমার ঘুষের পয়সায় কেনা। ওদের পয়সা না নিলে আমি কী করে এই বইগুলো কিনতাম! অ্যাঁ! ওই সব বইগুলোর মধ্যে এক-একটা আশ্চর্য জগৎ, একটা কবিতার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া—আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে ওই বইগুলি। আমি সৎ হলে কিংবা ধাঙ্গড়-জমাদাররা কাজে ফাঁকি না দিলে এই আনন্দ আমি কোথায় পেতাম! তা ছাড়া দেখো, ওই ঘুষ

নেওয়ার ব্যাপারটা আমি প্রচলন করিনি। ওই চাকরির ওটাই নিয়ম ছিল, আমি কেবল ওই নিয়মটার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। আমি নিয়ম পালটানোর খুব পক্ষপাতী নই। যদি নিয়ম পালটাতেই হয় তবে সমস্ত দেশটার সব নিয়ম এক আঘাতে, একবারে পালটে ফেলাই ভাল। আমি যদি আমার দুর্বল ক্ষমতা নিয়ে ছোট্ট একটা নিয়মকে পালটানোর চেষ্টা করি তা হলে গোলমাল হবে খুব, আমার বিপদ ঘটবে। প্রকাণ্ড একটা পুরনো মেশিনে তুমি যদি একটা নতুন ধরনের পার্টস লাগানোর চেষ্টা করো তা হলে পুরো মেশিনটাই চেঁচাবে, আর্তনাদ করবে, নতুন পার্টসটাকে কিছুতেই থাকতে দেবে না। তাই আমি একটা বিরাট রহস্যময় মেশিনের কোনও অংশই পালটানোর চেষ্টা করিনি। তার নিয়ম মতোই তাকে চলতে দিয়েছি। আমি ধাঙড়-জমাদারদের চটাইনি, বরং তাদের নিয়ম মতো খুশি রেখেছি। ফলে দেখো, তাদের পয়সায় আমি ইচ্ছেমতো বই কিনেছি, তাদেরই দয়ায় ফুটপাথ থেকে এমন সুন্দর একটা ঘরে আশ্রয় পেয়েছি।

"সুন্দর ঘর" কথাটা শুনে ললিত মুখ লুকিয়ে একটু হাসল।

চা শেষ করে কাপটা বিছানার ওপরেই রেখে উঁচু বালিশে আধশোয়া হয়ে লোকটা বলতে লাগল, দেখো, একটা নিয়ম পালটানোর চেষ্টা করতে গিয়েই আজ আমার এই অবস্থা। আমি অনেক দিন ধরেই জানি যে, আমি দুর্বল মানুষ, আমি কথা বলতে পারি না। সারা জীবনে আমার প্রতি যত অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে, আমাকে যত অপমান করা হয়েছে সবই আমি সহ্য করেছি। কেননা আমার স্বভাব অনুযায়ী সেটাই ঠিক নিয়ম। এবং এই নিয়ম অনুযায়ী চললে আমার কোনও বিপদ নেই। অথচ কয়েক দিন আগে এক বার অল্পক্ষণের জন্য আমি আমার স্বভাবের, এই নিয়ম পালটে ফেলেছিলাম। ঘটনাটা অবশ্য খুবই ছোট এবং সাধারণ একটা ঘটনা। সেদিন অনেক রাত্রে আমি নাইট শোতে একটা সিনেমা দেখে ফিরছিলাম...

ললিত একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, তুমি সিনেমা দেখ?

লোকটা ঘাড় নাড়ল, দেখি। বই পড়তে পড়তে বা চিন্তা করতে করতে আমার মাথা ভার হয়ে যায়। তাই আমি সিনেমা হল কিংবা খেলার মাঠে চলে যাই। আমি কখনও সিরিয়াস ছবি-টবি দেখি না, আমি দেখি বেলেল্লা হিন্দি ছবি— যাতে প্রচুর হুল্লোড় আছে, যার মধ্যে দুঃখ-টুঃখ বড় একটা নেই। ওইসব ছবি আমার মাথাকে খুব সজীব করে দেয়।

ললিত হাসল, ঠিক আছে। তারপর বলো।

হ্যাঁ, তারপর সেদিন অনেক রাতে আমি ফিরছিলাম। ভিড়ের বাসে আমি উঠতে পারিনি। ভবানীপুর থেকে টালিগঞ্জ খুব একটা দূর নয় বলে আমি হাঁটা-পথেই চলে আসছিলাম। রেল-ব্রিজ পেরিয়ে কিছু দূর আসতেই কে যেন পিছন থেকে বলল, 'ও মশাই, শুনুন!' ফিরে দেখি ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে দু'জন লোক। সাধারণ বাঙালির মতোই তাদের চেহারা— শ্যামলাই বোধহয় গায়ের রং, রোগা-টোগা, না-লম্বা-না-বেঁটে। পরনে ধুতি আর শার্ট। আমি ফিরে তাকাতেই বলল, 'আপনার কাছে দশ কি পাঁচ পয়সার কয়েন হবে? আমরা দুই বন্ধু একটা বাজি ফেলেছি, কিন্তু 'টস' করার মতো খুচরো পয়সা আমাদের কাছে নেই।' লোকটা ভারী ভদ্রলোকের মতো হেসে বলল। খুব শান্ত আর ধীরস্থির তার হাবভাব। আমি কথা না বলে পকেট থেকে একটা আধুলি পেয়ে তার হাতে দিলাম। লোকটা খুব আপ্যায়িত হয়ে বলল, 'বাঃ, এতেই হবে।' বলে আমার সামনে দাঁড়িয়েই 'টস' করল। বাঁই করে পয়সা আঙুলের টোকায় শূন্যে উড়িয়ে দু'হাতের চেটোয় চেপে ধরল। তারপর 'টসে'র ফলাফল দেখে আমার হাতে আধুলিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল—'অনেক ধন্যবাদ।' আমি চলে আসছি, তখন আবার সেই লোকটা পিছু ডাকল, 'দাদা, শুনুন।' আমি দাঁড়ালাম। আবার বিনয়ের হাসি হেসে বলল, 'আমাদের 'টস'-এর রেজাল্টটা জেনে গেলেন না? আমার এই বন্ধুর ভাগে পড়েছে আপনার হাতঘড়িটা, আর আমার ভাগে আপনার ম্যানিব্যাগ। ও দু'টো দিয়ে আপনি চলে যান।' দেখলাম লোকটার বন্ধু একটা মাঝারি লম্বা ছুরি বের করে খুব মনোযোগের সঙ্গে নিজের আঙুলের নখ কাটছে। আমাকে লক্ষই করছে না। দু'জনেরই ভাবভঙ্গি শান্ত, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, আর বেশ গা-ছেড়ে-দেওয়া, হাসিখুশি। তারা আমাকে একটুও ভয় দেখানোর চেষ্টা করেনি, চাপা গলায় কথা বলেনি। আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন বড় জোর রাত বারোটা বেজে দশ কি পনেরো মিনিট। কলকাতায় ওটা তখনও রাতই নয়। আমাদের চার

দিকেই তখনও কিছু লোকজন চলাচল করছে, রাস্তায় জ্বলছে আলো, অল্প দূরেই একটা মাংসের দোকান ধোলাই হচ্ছে— ঝাঁটা আর জলের শব্দ আমার কানে আসছিল, ফুটপাথে শোয়া লোকগুলো তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি সবাই। এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা আমাকে প্রকাশ্যে লুট করছিল। আমার স্বভাবের নিয়ম অনুযায়ী তখন কী করা স্বাভাবিক ছিল, বলো তো! স্বাভাবিক ছিল চুপচাপ তাদের হাতে আমার পুরনো বাবার আমলের ঘড়ি আর অল্প কয়েকটা টাকাওলা মানিব্যাগটা ছেড়ে দেওয়া। সেটাই ঠিক স্বাভাবিক হত। আমার চেয়ে ঢের সাহসী লোকও ঠিক তাই করত। কিন্তু সেই মুহূর্তে, অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমি আমার স্বভাবের নিয়ম পালটে ফেললাম। আমি দিলাম না।

দিলে না?

লোকটা মাথা নাড়ল, না। তারা যদি আমাকে ভয় দেখাত, কিংবা যদি আচমকা আমার সামনে দাঁড়িয়ে সব কেড়েকুড়ে নিত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের সব দিয়ে দিতাম। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা অনেক সময় নিয়েছিল, রসিকতা করে আমারই পয়সা দিয়ে 'টস' করল, তারা আমাকে দেখাল তাদের আত্মবিশ্বাস কত প্রবল, কত সহজে ঠান্ডা মাথায় তারা দুঃসাহসিক সব কাজ করতে পারে। আর সেটা লক্ষ করেই আমার স্বভাবের নিয়মটা বোধ হয় হঠাৎ পালটে গেল; এ-রকম মাঝে মাঝে হয় যে, খুব সাধারণ দুর্বল মানুষও কোনও দুঃসাহসিক কাজ দেখলে অনুরূপ কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে। আমার বিশ্বাস, খুব সাধু সৎ প্রকৃতির কোনও লোকও যদি চোখের সামনে একটা দুঃসাহসিক খুন, ডাকাতি কিংবা গুণ্ডামি দেখে তবে তার মনের গভীরে কোথাও-না-কোথাও ওইরকম একটা কিছু করার ইচ্ছে জেগে উঠবে। এটা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। কিন্তু সাধারণ মানুষের ইচ্ছে হলেও তারা সব করে না। তারা বিবেকানন্দের জীবনী পড়ে, বড় খেলোয়াড়ের খেলা দেখে, বড় গুণ্ডার গুণ্ডামির খবর শোনে, বলাৎকার বা ধর্ষণের খবর পড়ে পত্রিকায়। তবু অধিকাংশ মানুষই মহাপুরুষ কিংবা খেলোয়াড়, গুণ্ডা কিংবা ধর্ষণকারী হয় না। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে সব ইচ্ছাই পাশাপাশি থেকে যায়। কিন্তু তারা স্বভাবের নিয়ম বড় একটা ভাঙে না, সাধারণ নিরীহ জীবন যাপন করে যায়। তারা যে মহাপুরুষের মতো ত্যাগী জ্ঞানী মানবপ্রেমিক হয় না, খেলোয়াড়ের মতো কুশলী হয় না, অসৎ গুণ্ডার মতো নৃশংস হয় না, কিংবা ধর্ষণ বা বলাৎকারের গুপ্ত উত্তেজনা উপভোগ করে না— তার কারণ, তারা জানে যে, ও-রকম কিছু হতে গেলে বা করতে গেলে প্রকৃতি এবং নিয়তি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আমাকে সেই রাত্রে যারা ছিনতাই করছিল তাদের দুঃসাহস এবং আত্মপ্রত্যয় দেখে অনুরূপ দুঃসাহস এবং আত্মপ্রত্যয় দেখানোর ইচ্ছেটা হয়তো স্বাভাবিক হত। কিন্তু আমি তাদের হাতে আমার মানিব্যাগ বা ঘাড় দিলাম না। আমি তাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তাদের পিছনে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম, পুলিশের গাড়ি! তারা চমকে পিছু ফিরে চাইল। আমি দৌড় দিলাম। আর দৌড়োতে দৌড়োতে আমি একটা তীব্র উত্তেজনা এবং আনন্দ বোধ করছিলাম। ও-রকম আনন্দ আর উত্তেজনা আমি কখনও বোধ করিনি, আমার দর্শন কিংবা কবিতার বইয়ে এতকাল ধরে আমি যা আনন্দ পেয়েছি, এ আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশি। আমার মনে হল জীবনে এই প্রথম আমি একটা কিছু করছি, একটা অসাধারণ কিছু। আমি একদম দৌড়োতে জানি না, কখনও দৌড়োইনি, খানিকটা ছুটেই আমার হাঁফ ধরে গেল, তবু আমি দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসছিলাম, এবং নিজের এই ব্যবহারে আমি অবাকও হচ্ছিলাম খুব। সেই লোক দু'টো বোধ হয় আমাকে চিনত। তাদের ধারণা ছিল আমাকে লুট করা খুবই সহজ ব্যাপার হবে, তাই তারা লুটের আগে আমার সঙ্গে রসিকতা করেছিল। কিন্তু আমি তাদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখেই তারা হয়তো খুব রেগে গেল। সেটাও খুবই স্বাভাবিক। যার ওপর আধিপত্য করা সহজ, তুমি যদি দেখ যে, সে তোমার বশ মানছে না, তবে তুমি রেগে যাবে না? কাজেই স্বাভাবিক কারণেই তারা রেগে গেল। কারণ, আমি পোকামাকড়ের মতো তুচ্ছ একটা লোক তাদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছি। তাদের প্রেস্টিজে লেগেছিল। কিন্তু তারা সোজাসুজি আমার পিছু নিল না। সম্ভবত তারা আমার ঘর চিনত। কারণ, আমি খানিকটা ছুটে, খানিকটা জোরে হেঁটে যখন ঘরের দরজায় পৌঁছলাম তখন দেখি আমার দরজার বাইরে দু'ধারে তারা দু'জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তভাবে। বোধ হয় তারা কোনও শর্টকাট রাস্তায় এসেছিল, যা আমি জানি না। তাদের একজনের হাতে একটা সাইকেলের চেন, অন্যজনের হাতে লোহার উকো। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমার আর দৌড়োবার ক্ষমতা ছিল না। তারা দু'জন চটপটে

পায়ে এসে আমার দু'দিকে দাঁড়াল, ধরে নিয়ে গিয়ে বলল, দরজা খোলো। আমি তালা খুলে ভিতরে ঢুকতে তারাও ঢুকল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তখনও স্বভাবের নিয়মে আমি তাদের ভয় পাচ্ছিলাম না। আমি তখনও তীব্র আনন্দ এবং উত্তেজনা বোধ করছিলাম। তারা দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপরেই ফাইট শুরু হয়ে গেল। আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়ে তারা ভুল করেছিল। কারণ, আমি শান্তভাবে মার খেলাম না, ঘড়ি আর মানিব্যাগও ছাড়লাম না। আমি একজনকে বই ছুড়ে মেরেছিলাম। মাটিতে পড়ে গিয়ে একজনের গোড়ালি কামড়ে দিয়েছিলাম। সারাক্ষণ আমি লড়াই করার চেষ্টা করেছিলাম বলে তারা আমাকে বেশি মেরেছিল। ওদিকে হইচই শুনে লোকজন উঠে পড়ছিল বোধ হয়, তারা অল্প সময়ে যত দূর সম্ভব আমাকে মেরে পালিয়ে গেল।

লোকটা হাসল। ফাটা ঠোঁট দিয়ে টস করে রক্তের ফোঁটা পড়ল সাদা তোয়ালেটার ওপর। তারপর লোকটা বালিশের তলা থেকে একটা কালো মানিব্যাগ আর পুরনো আমলের বড় গোল একটা হাতঘড়ি বের করে ললিতকে দেখাল, এই সেই ঘড়ি আর মানিব্যাগ। একেবারেই এলেবেলে জিনিস— পুরনো পচা ঘড়ি, ছেঁড়া মানিব্যাগে বোধ হয় গোটা তিন-চার টাকা ছিল। এর জন্যেই আমি এত লড়াই দিয়েছি ভেবে আমি এখন আশ্চর্য হই।

লোকটা মানিব্যাগ আর হাতঘড়িটা দু'হাতে চেপে ধরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সযত্নে আবার বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রেখে বলল, এই হচ্ছে ব্যাপার। খুবই সামান্য তুচ্ছ একটা ঘটনা।

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে ভেবে বলল, দেখো, ঘটনাটা যতটা সামান্য মনে হচ্ছে, বাস্তবিক সেটা ততটা সামান্য নয়। লোক দু'টো আমাকে মারবার সময়ে বলেছিল, শালা, শুয়োরের বাচ্চা, বেজন্মা, তোমার জিওগ্রাফি পালটে দেব। কিন্তু কার্যত আমার জিওগ্রাফির বদলে তারা আমার ফিলজফি পালটে দিয়ে গেছে।

লোকটা চুপ করল। ললিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রকম?

লোকটা তার চোখে চোখ রেখে বলল, আমি এখন আর তেমন নিরীহ শান্ত লাজুক মানুষটি নই। এই ঘরে মাঝে মাঝে একটা সাদা বেড়াল আসে, আমার চায়ের দুধ ডেকচি উলটে খেয়ে যায়। দেখতে পেলে আমি তাড়িয়ে দিই, কিন্তু আর কিছু করি না। কিন্তু পরশুদিন দুপুরবেলা বেড়ালটা আমার ঘরে ঢুকে ডেকচি খোলবার চেষ্টা করতেই আমি লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে ওর লেজটা চেপে ধরলাম। ও পালাবার ফিকিরে জানালায় লাফিয়ে উঠেছিল, কিন্তু লেজটা আমি হাতে পেয়ে গিয়েছিলাম। বেড়ালটা আমাকে ফ্যাঁস করে আঁচড়ে দিল, হাতে দাঁত বসাল, আমি ওকে তবু ছাড়লাম না, তুলে এক আছাড় দিলাম মেঝেয়। ব্যাটা ঝিম ধরে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। আর আসেনি। ও যখন আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছিল তখনও আমি ঠিক ও-রকম একটা উত্তেজনা আর আনন্দ টের পাচ্ছিলাম। তা ছাড়া দেখো, আগে আমি যে-কোনও লোকের কাছেই চট করে বশ মেনে নিতাম, কারও সঙ্গেই কখনও গোঁয়ারতুমি করিনি। কিন্তু তোমার পাড়ার ছেলেরা এসে যখন আমার মার খাওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল তখন আমি তাদের স্পষ্ট কিছুই বললাম না। তারা আমাকে ব্যাপারটা খোলসা করে বলার জন্য অনেক ভয় দেখিয়েছে, আবাব অভয়ও দিয়েছে, বলেছে আমার হয়ে তারা শোধ নেবে। এ-সব ছেলেদের আমি চিরকালই ভয় পাই, কারণ বরাবর রাস্তায় ছেলেরা আমাকে খ্যাপায়, টিটকিরি দেয়। কিন্তু এবার আমি আমার জেদ বজায় রাখলাম, তাদের কিছুই বললাম না। তারা বলল, আমার কাছে প্রায়ই একটা মেয়ে আসে বইখাতা নিয়ে— এ-ব্যাপারটার সঙ্গে সেই মেয়েটার কোনও যোগাযোগ আছে কি না। আমি তাদের কোনও উত্তর দিলাম না। যদিও জানি যে, পাড়ার ছেলেরা সেই মেয়েটার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে একটা কেচ্ছা রটিয়ে দিতে পারে।

মেয়েটা কে? ললিত নরম গলায় জিজ্ঞেস করল।

সেটা আর-একদিন বলা যাবে। বলে ক্লান্তিতে লোকটা চোখ বুজল। বলল, আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছি। আমার মাথার মধ্যে কুয়াশা জমছে।

ললিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি তোমার কাছে পরে আসব। আজ তুমি ঘুমোও।

লোকটা হেসে বলল, আমার হিরো।

বলে চোখ বুজল।

ললিত দরজার কাছ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি খাও কোথায়?

লোকটা চোখ খুলে তাকে দেখল, বলল, নিজে রান্না করি।

ললিত বলল, এখন কে তোমাকে রান্না করে দেয়?

লোকটা মাথা নাড়ে, কেউ না। পাড়ার একটা বাচ্চা-টাচ্চাকে ধরে পাউরুটি আনিয়ে দুধ বা চা দিয়ে খেয়ে নিই। কখনও কষ্টেসৃষ্টে সেদ্ধভাত করে নিই।

ললিতের দয়া হচ্ছিল। বলল, কিছু মনে কোরো না, কয়েক দিন আমার বাসায় খাও। আমি তোমার খাবার পাঠিয়ে দেব।

দেবে?

লোকটার চোখমুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল দেখাল, মাথা নেড়ে বলল, তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করছ?

করছি। ললিত হাসল।

লোকটা খুশি হয়ে বলে, আমি বহুকাল নিমন্ত্রণ খাইনি। ভাল খাবার কাকে বলে জানিই না। তুমি পাঠিয়ে দিয়ো। একটু ভাল হলে আমি নিজেই যাব তোমাদের বাসায়, মাঝে মাঝে খেয়ে আসব।

লোকটা চুপচাপ একটু ললিতের মুখখানা দেখল, বলল, তোমার মা খুব ভাল রাঁধেন, না? আমার খুব পোস্তর বড়া, কচুর শাক আর লাউঘণ্ট খেতে ইচ্ছে করে, তোমার মাকে এ-কথা বোলো।

ললিত হেসে ঘাড় নাড়ল। বলবে। তারপর বলল, তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো।

লোকটা হাসে, আমি অনেক দিন ধরে তো ভালই ছিলাম। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ভাল থাকাটা ভীষণ একঘেয়ে।

ললিত কথাটা ঠিক বুঝল না। বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা রাস্তাঘাট দেখে আর দূরে কুকুরের ডাক শুনে ললিত বুঝল রাত অনেক হয়েছে। হাতে ঘড়ি ছিল না, আন্দাজ করল, বারোটার কাছাকাছি।

মিত্রদের বাড়ির সামনে অশ্বত্থ গাছটার তলায় গাঢ় ছায়া জমে আছে। সেই ছায়ার মধ্যে পা দিয়ে আপন মনে বিষণ্ণ একটু হাসল ললিত। পাড়ার বুড়িদের মধ্যমণি বলে মাকে সে মাঝে মাঝে বলে, হিরোবুড়ি। কিন্তু সে যে কখনও হিরো ছিল কারও, তা ললিত টের পায়নি। সত্য বটে কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে সে ইউনিয়ন করেছে, ভোটে নেমেছে, বক্তৃতা করেছে, কলেজের ফাংশনে হয়তো কথা বলেছে, কলকাতার মেয়র কিংবা বিখ্যাত কোনও সুন্দরী গায়িকার সঙ্গে। কিন্তু সে-সব স্পষ্ট মনে নেই তার, সে-সব নিয়ে গৌরব করার মতোও কিছু ছিল না। অথচ সেইসব কলেজি হইচই ছেলেমানুষির মধ্যেও সে ছিল একটি দুঃখী ছেলের হিরো। তার শরীর একটা অচেনা আনন্দে শিউরে উঠল।

অথচ ভেবে দেখল বিমান রক্ষিতের চোখে তাকে যা দেখিয়েছিল তা আসলে সত্য ছিল না। ললিতেরও ছিল নানা দুর্বলতা, ক্ষোভ, লজ্জা। বিমান জানে না, লাজুক ললিত মিতু নামে একটি মেয়ের সঙ্গে দুর্বলতাবশত কোনও দিন কথাই বলতে পারেনি। এক বার ছাত্র আন্দোলনের সময়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে বিকেলের দিকে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। গলিঘুঁজি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ললিত, ওয়েলেসলি স্ট্রিটে একজন সার্জেন্ট তার কনুই চেপে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল সে কোথায় যাচ্ছে। ললিত কেবল বোকার মতো বলেছিল, বাড়ি। সার্জেন্টটা তার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করায় সে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে কিছুতেই তার বাড়িটা কোথায় তা মনে করতে পারেনি। অনির্দিষ্টভাবে হাত তুলে— বোধহয় ময়দানের দিকটা দেখিয়েই সে বলেছিল, ওই দিকে। তার অবস্থা দেখে করুণা করেই সার্জেন্টটা সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল তাকে, বলেছিল, সাবধানে যাবেন, নিজের বাড়িটা ভুল করবেন না। সেই ঘটনার লজ্জা এখন খুব ক্ষীণ হয়ে এলেও ললিতের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। কিছুই ভোলেনি ললিত। কিছু দিন আগে, বোধ হয় বছরখানেক হবে— সে এক বার পিসিমার সঙ্গে তাদের এক দূর সম্পর্কের বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিল পিসিমার বাড়ির জন্য সরকারি ঋণের তদবির করতে। সেখানে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, ড্রইং রুমে ছোট্ট মদের 'বার', শেকলে ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠনের মতো মস্ত কাচের বাতিদান দেখেছিল ললিত, আর দেখেছিল একটি মেয়েকে— যার গায়ের রং নতুন তামার পয়সার মতো উজ্জ্বল এবং আলো বিকিরণকারী, সে কৌতূহলী চোখে অনেকক্ষণ দেখেছিল ললিতকে। সেই আত্মীয় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন সে কী করে। প্রশ্নটা শুনে ললিত খুব দুর্বল আর অসহায় বোধ করেছিল। তার চোখের সামনে তখন ওই বিপুল সাদা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। অদ্ভুত বাতিদান, ছোট্ট

মদের 'বার'-এর কাচগুলি ঝিকমিকিয়ে উঠছে, আর ওই সুন্দরী কিশোরীর কৌতূহলী চোখ-এর মাঝখানে বোকার মতো বসে থেকে তার মুখে আনতে খুবই লজ্জা করছিল যে সে মাস্টারির চাকরি করে, আড়াইশো টাকারও কম বেতন পায়। এতকাল ধরে বড়লোকদের সম্পর্কে তার যে আক্রোশ আর ঘেন্না ছিল তা কোথায় উবে গিয়েছিল তখন! প্রকাণ্ড সোফায় বসে সেই বিপুল ঘরখানাকে চারিদিকে টের পেয়ে তার মনে তীব্র ভয় আর আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছিল। নিজের হতশ্রী এবং দারিদ্র্যকে সে কখনও আর এমনভাবে টের পায়নি। তার ইচ্ছে হয়েছিল তখনই উঠে পালিয়ে চলে যায়। সম্ভবত পিসিমাও ভেবেছিল যে অত বড়লোকের কাছে তার মাস্টারির চাকরিটার কথা বলা উচিত হবে না। তাই কৌশলে পিসিমা তার হয়ে উত্তর দিয়েছিল, ও এখন এম এ পাশ করে রিসার্চ করছে। আশ্চর্য এই যে, পিসিমার উত্তর শুনে এক রকমের স্বস্তি পেয়েছিল সে।

এ-সবের কিছু বিমান জানে না। কিন্তু ললিত জানে যে সে হিরো নয়। কোনওকালে ছিলও না। বিমান একটা ভুল ছবি টাঙিয়ে রেখেছিল চোখের সামনে। ভাবতে ভাবতে ললিত শ্বাসকষ্টের মতো একটা বুক চেপে-ধরা দুঃখকে টের পাচ্ছিল। এইরকম ছোটখাটো ভুলের ওপর, মিথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা নড়বড়ে সে। ভুল ললিতকেই চিনছে সবাই। সেও নিরীক্ষণ করছে এক ভুল নিজেকে। এখন এক বার মৃত্যুর আগে সঠিক ললিতকে তার চিনে নেওয়া দরকার।

একা ফাঁকা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে তার চটির ক্ষীণ দুর্বল শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, সুস্থ সবল মানুষের পায়ের শব্দ যেমন হয়, তারটা তেমন নয়। এত মৃদু শব্দ যে মনে হয়, আর কয়েক পা গেলেই শব্দটা মিলিয়ে যাবে।

ঘরে এসে ললিত দেখল, মা মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে তখনও। চেয়ারে বসতে গিয়ে সে লক্ষ করল বাবার ছবির আড়াল থেকে টিকটিকিটা মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখছে। ললিত ম্লান হেসে মৃদু স্বরে বলল, কার জন্য জেগে আছ, টিকটিকি-মা? কোনজন বাড়ি ফেরেনি তোমার— ছেলে, না কর্তা?

চেয়ার টানার শব্দে মা ঘুম ভেঙে বলল, কে রে! ললিত!

হুঁ।

কোথায় যে যাস! বলে মা উঠে বসল, অরুণ এসেছিল।

কে অরুণ!

ওমা! অরুণ তোর পিসির ছেলে। কাল একবার ওদের বাসায় যাস, যদি পারিস। বার বার যেতে বলে গেছে।

আচ্ছা।

শোয়ার ঘরেই মা ভাতের হাঁড়ি-টাড়ি এনে রেখেছে। এখন উঠে ভাত বাড়তে বসে বলল, ক'টা বাজে দেখ তো?

ললিত ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে বারোটা।

ইস! কত রাত হয়েছে...

খাওয়ার পর রোজই মায়ে-পোয়ে একটু গল্প হয়।

খাওয়ার পর ললিত অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। মা তখন নিজের বিছানায় অন্ধকারে বসে আঙুলে চুলের জট ছাড়াচ্ছে। বলল, আত্মীয়-স্বজনদের একটু খোঁজখবর করিস। নইলে আমি মরে যাওয়ার পর কেউ তোকে চিনবেই না। দেখলেও ভাববে, কে না কে!

ললিত হেসে বলল, কে কোথায় থাকে মা!

মা বলল, কেন, কাঁচড়াপাড়ায় তোর ফুলমাসি থাকে, রাঙাকাকা থাকে মাজদিয়া, ইছাপুরে সোনাভাই, হাবড়ায় থাকে নসু ঠাকুরপো...

জটিল সব সম্পর্ক। অচেনা সব মানুষ। শুনতে শুনতে ললিত ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত বারোটাতেও তুলসী আর সঞ্জয়ের ছাড়াছাড়ি হয়নি। ললিতের বাসা থেকে গাড়ি ছাড়ল সঞ্জয়। চলল, সোজা এসপ্ল্যানেডের দিকে। তখন আটটা বেজে গেছে।

তুলসী বলল, কোথায় যাচ্ছিস! আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে যা।

সঞ্জয় হাসল, দুনিয়াটাই তো বাসা রে। সেই বাসাটা দেখে নে।

তারপর সোজা গাড়ি চালিয়ে এসে থামল এসপ্ল্যানেডের একটা নিরিবিলি, শান্ত বার-এর সামনে। দরজা খুলে বলল, নাম শালা।

তুলসী ইতস্তত করে বলল, গোলমাল হয়ে যাবে মাইরি।

কেন, বউ গন্ধ পাবে? বলে হাসল সঞ্জয়, বেশি সাধুগিরি দেখাবি তো বউ হাওয়া হয়ে যাবে, দেখিস। রমেনটার তাই হয়েছিল।

তুলসী অস্বস্তিতে হাসল। তারপর নামল। বলল, অনেককাল অভ্যাস নেই।

ইস! শালা যেন কত খেয়েছে!

রাত দশটায় যখন বার-এর মদ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল তখন তুলসী অনেকটা মাতাল। সঞ্জয় বলল, আর খাবি তুলসী?

তুলসী মাথা নাড়ল, খাবে। তার দু'চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়ছে। কাঁদছিল সে।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল। এখানে বন্ধ হয়ে গেছে। সাকী কিংবা গ্র্যান্ডে যাই।

গ্র্যান্ড। মৃদু আলো, বাজনা, ছড়ানো প্রকাণ্ড রেস্টুরেন্ট। দেখে হু হু করে উঠল তুলসীর বুক। কে বলবে বাংলাদেশ এটা! কে বলবে! কে বলবে যে সে সেই তুলসী যে মফস্সলের মাস্টার, স্টেশন থেকে মাইলটাক আলপথ তাকে ধুতি হাঁটুর ওপর তুলে হাঁটতে হয়! সেখানকার স্কুলে আদ্যিকালের বুড়ো বি এ, বি এস সি আধামূর্খ গ্রাম্য একদল লোকের সঙ্গে কাজ করতে হয়! সেখানে মাঠে-ঘাটে বিষধর সাপ, জলেজঙ্গলে রহস্যময় পোকামাকড়। না, এটা মোটে বাংলাদেশই নয়। এই তো নিউ-ইয়র্ক! ইজ নট ইট? সে আপন মনে হাসল। ইট ইজ লন্ডন পারহ্যাপস? হ্যাঁ, লন্ডন। বসন্তকাল।

চেয়ারে বসে সে সঞ্জয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার কেঁদে ফেলল, মাইরি, ললিতটার জন্য কষ্ট হচ্ছে।

সঞ্জয় তার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল, স্টেডি!

চারধারে এক বার বোকা চোখে চেয়ে দেখল তুলসী, তারপর বলল, আমার লাইফ-এ মাইরি কী আছে বল তো! অ্যাঁ!

তারপর আবার কাঁদতে লাগল। চেয়ে দেখল তার অদূরে বসে আছে চারজন জাহাজি লোক, হাতে উল্কি, মুখে সমুদ্রের জলবায়ুর কর্কশ ছাপ। তাদের চওড়া কাঁধ, চওড়া কবজি, তারা বিদেশি ভাষায় কথা বলছে। কিছু দিনের মধ্যেই তাদের জাহাজ ছেড়ে যাবে— দূর থেকে কত দূরে চলে যাবে তারা। তখনও আমি হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে...আলপথে! তুলসী কাঁদতে থাকে। মদ খায়। কাঁদে।

কী হচ্ছে? সঞ্জয় ধমক দেয়।

আমার লাইফ-এ কী আছে বল তো? অ্যাঁ!

বউ! তোর বউ আছে! সঞ্জয় সান্ত্বনা দেয়।

তুলসী দেখে জলপাই রঙের সুট পরা একটা বিদেশি লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। কোন দেশি লোক ও? স্পেন? অ্যাঁ! ইয়েস, স্পেন। বুলফাইট। ও লোকটা বুলফাইটার। একজন নিগ্রোর মুখ নজরে পড়ে তুলসীর। লোকটার মোটা ঠোঁট উলটে দিল— ঝকঝকে ধারালো দাঁত দেখা যায়। বক্সার! হ্যাঁ, লোকটা বক্সার। ক্যাসিয়াস ক্লে! না, প্যাটারসন?

নিউ ইয়র্ক! দিস ইজ নিউ ইয়র্ক। তুলসী বিড় বিড় করে।

হঠাৎ সে শুনতে পেল 'কঁ কঁ' করে কর্ক খোলার একটা শব্দ। সে চমকে উঠল। শব্দটা সে কোথায় শুনেছে! শব্দটা চেনা। খুব চেনা। আবার সেই 'কঁ-কঁ' শব্দটা শুনল তুলসী। সে চার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর নিচু হয়ে টেবিলের তলাটা দেখল।

কী খুঁজছিস? সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে।

সাপটাকে।

সাপ?

হ্যাঁ, মাইরি এখানেই আছে। শালা ব্যাঙ ধরেছে।

চার দিকে আর-একবার তাকিয়ে তারপর সতর্কভাবে উঠে দাঁড়ায় তুলসী। হাত উঁচু করে সবাইকে সাবধান করে দেয়। স্টপ! অল স্টপ! দেয়ার ইজ এ স্নেক হিয়ার...

সঞ্জয় তার হাত টেনে বসিয়ে দেয়।

তুলসী নীরবে কাঁদতে থাকে।

রাত সাড়ে বারোটায় যখন বাসায় ফিরল তুলসী তখন সিঁড়ির দরজায় ভিড় করে দাদা বউদি মৃদুলা দাঁড়িয়ে আছে। তুলসী ভ্যাবলা চোখে তাকিয়ে দেখল। অসহায়ভাবে। বউদি এগিয়ে এসে ধরল তাকে। মৃদুলা মুখ ফিরিয়ে নিল, দাদা আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল।

ডু ইউ হেট মি? সে মৃদুলাকে জিজ্ঞেস করল। তারপর বুঝদারের মতো হাসল সে, ইউ হেট মি। আই নো!

বউদি ঘরে পৌঁছে দিল তাকে। মৃদুলাকেও ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা টেনে বাইরে থেকে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মৃদুলা দরজা বন্ধ করতেই খুব হাসল তুলসী। তারপর হঠাৎ বলল, আমার একটা কথা রাখবে?

মৃদুলা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, কী?

তুলসী বলে, মনে করো এটা একটা রাস্তা, তুমি একটা অচেনা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছ, আর আমি একটা রকবাজ মাস্তান ছেলে। তুমি হাঁটো...হেঁটে যাও...যেন আমাকে চেনো না...হাঁটো...

ভয় পেয়ে কয়েক পা হাঁটে মৃদুলা। তুলসী মুখের মধ্যে আঙুল পুরে তীব্র সিটি বাজিয়ে দেয়। চমকে ওঠে মৃদুলা। তুলসী হাসে, মাইরি, আমি কখনও রকবাজি করিনি, মাস্তানি করিনি। সঞ্জয়ের কাছে সিটি দেওয়া শিখেছিলাম— কোনও কাজে লাগেনি। লাইফে আমি একটা মেয়েকেও টিজ করতে পারিনি...বিশ্বাস করো...

তুলসীর চোখে জল এসে যায়। তারপর বলে, এবার তুমি একটা অচেনা মেয়ে—তোমাকে আমি সিটি দিয়েছি...তুমি দাঁড়িয়ে পড়ো...ঘুরে এসে আমাকে একটা চড় মারো, কিংবা চটিজুতো...কিছু একটা করো...বিট মি...আমাকে ছেড়ে দিয়ো না...আমি রকবাজ মাস্তান নোংরা, মাইরি মৃদুল, আমাকে ছেড়ে দিয়ো না...

তুলসী কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

শোয়ার আগে সঞ্জয় বুকে-পিঠে পাউডার ছড়াচ্ছিল। আয়নায় গলা উঁচু করে কী একটু গলার কাছে আঙুল দিয়ে টিপে দেখল সে। তারপর রিনির দিকে ফিরে বলল, গলায় একটা লাম্প টের পাচ্ছি যেন!

কীসের লাম্প?

সঞ্জয় ঠোঁট ওলটায়, কী জানি!

তারপর আবার জায়গাটাকে টিপে দেখে। মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। লাইট নিবিয়ে বিছানায় আসতে আসতে বলে, বড় ভয় করে বুঝেছো! এখন কাজকর্ম সদ্য জমিয়ে তুলেছি...

তাতে কী হল।

কিছু না। সঞ্জয় একটু হাসে, মাঝে মাঝে হঠাৎ বড় ভয় করে আজকাল। ক্যান্সার-ফ্যান্সার যদি হয়...

দূর! অলক্ষুণে কথা!

রিনি তাকে আলতো জড়িয়ে ধরে।

তখন বহু দূরের একটা গ্রামে জাতীয় সড়কের পাশে একটা সাপের মৃতদেহকে ঘিরে পরিশ্রমী সঞ্চয়ী পিঁপড়েদের ভিড়। ললিতের বাবার ছবির পিছনে গর্ভযন্ত্রণায় অস্থির একটা টিকটিকি ডেকে উঠল।

## ॥ এগারো ॥

ললিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটেছিল। আদিত্য আর শাশ্বতী। বড় রাস্তার কাছে এসে আদিত্য হঠাৎ আপন মনে হেসে বলল, এই হচ্ছে ললিত, বুঝলে সতী, এই হচ্ছে

শাশ্বতী বুঝল, আদিত্য কোনও গভীর ভাবনার মধ্যে আছে। হয়তো কলেজ জীবনের স্মৃতি কিংবা অন্য অনেক তুচ্ছ সুন্দর সব ঘটনার কথা। 'এই হচ্ছে ললিত ' এই কথাটা দিয়ে শাশ্বতীকে কিছুই বোঝাতে চায়নি আদিত্য, সে নিজের মনেই ললিতের ছবি দেখছে, আব মনের সেই ছবিটাকেই দেখাতে চাইছে শাশ্বতীকে। শাশ্বতী লক্ষ করল, আদিত্যর চোখ অন্যমনস্ক। ট্রাম লাইন পেরোবার আগে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ফিরে দাঁড়াল, আমার সিগারেট!

বিপজ্জনক রাস্তার মাঝখান থেকে শাশ্বতী তার জামার হাতা ধরে টেনে সরিয়ে আনল। হাসল আদিত্য।

রাস্তা পেরিয়ে আদিত্য বলল, আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বোধ হয় চায়ের দোকানেই ফেলে এসেছি। নিয়ে আসব? তুমি একটু দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসি...

শাশ্বতী ভ্রূ কোঁচকায়, ক'টা সিগারেট ছিল প্যাকেটে?

গোটা চার-পাঁচ হবে বোধ হয়।

দূর! ওর জন্য এতটা রাস্তা যাবে! বরং এক প্যাকেট কিনে নাও।

নেব?

নাও।

আদিত্য সিগারেট কিনতে গেল কয়েক পা দূরের দোকানটায়। শাশ্বতী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আদিত্য দোকানের আয়নায় মুখ দেখছে। চোখের কোল টেনে ধরে দেখল চোখের রং, গালের একটা ব্রণ টিপল একটু, মুখটা সামান্য বেঁকিয়ে বোধ হয় নিজেকে ভেঙাল, ধৈর্যশীল দোকানদারটি ততক্ষণ সিগারেটের প্যাকেটটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে রইল। আদিত্য হাসল একটু, তারপর সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে হাত নেড়ে কী কথা বলতে লাগল দোকানির সঙ্গে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে প্যাকেট খুলল, সিগারেট বের করে দড়ির আগুনে ধরিয়ে নিল। এবং এতক্ষণ সময় সে এক বারও শাশ্বতীর দিকে ফিরে তাকাল না। যেন তার সঙ্গে যে শাশ্বতী আছে এ কথা সে ভুলেই গেছে। শাশ্বতীর মনে হয় এখন যদি সে চুপে চুপে ট্রামে উঠে সরে পড়ে তা হলেও আদিত্য হয়তো ব্যাপারটা ঠিক খেয়াল করবে না। অন্যমনস্কভাবে এসে পরের ট্রামে উঠে কোথাও চলে যাবে। অনেকক্ষণ পরে হয়তো খেয়াল হবে তার যে শাশ্বতী তার সঙ্গে ছিল। তখন যে-অবস্থায় থাক লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে ট্রাম বাস বা ট্যাক্সি ধরে শাশ্বতীর খোঁজ নিতে ছুটবে। একদিন তারা দু'জনে সিনেমা 'হল' থেকে দুপুরের শো দেখে বেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে আলাদা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও লম্বা আদিত্যকে দেখতে পাচ্ছিল শাশ্বতী। আদিত্য এক বারও মুখ ফিরিয়ে তাকে খুঁজল না। সোজা এগিয়ে গেল রাস্তায়, ভিড়ের জন্য আস্তে যাচ্ছিল একটা বাস, সোজা তার পাদানিতে উঠে গেল। ব্যাপারটা কী হল বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল শাশ্বতীর। তারপর সারা বিকেল আর সন্ধে শাশ্বতীর কেবল কান্না পেয়েছিল বারবার। রাত আটটা নাগাদ তাদের বাড়িতে এসে আদিত্য হাজির। খুব অনুতপ্ত তার চোখমুখ। তাকে আড়ালে ডেকে বলল, ছিঃ ছিঃ...আমার কী যে হয়েছিল...ইস...মাইরি, আমি একটা পাগল! আসলে...বুঝলে সতী, ছবিটা ছিল ভীষণ অ্যাবজরবিং, আমি ওই ছবিটার কথা ভাবতে ভাবতেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম...মাইরি দেখো, ভুলের জন্য হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে রেখেছি...পানিশমেন্ট...আর ভুল হবে না। শাশ্বতী দেখেছিল আদিত্যর বাঁ হাতে উলটো পিঠে সদ্য-পড়া একটা ফোস্কা, তখনও চারধারটার চামড়া লালচে হয়ে আছে। আদিত্যর অনুতাপে কোনও ভান ছিল না, শাশ্বতী জানে। এখন তার কেবল এইটুকুই মনে হয় যে, সে এমন একটা লোককে আঁচলে বাঁধছে যে-লোকটা খানিকটা পাগল-খ্যাপা, খানিকটা উদাসীন, যার মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভালবাসার বোধ অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। এখন একটু দূর থেকে আদিত্যকে দেখছিল শাশ্বতী। লম্বা ঢ্যাঙা রোগা ফরসা একটা লোক এলোমেলো এক ঝাঁকড়া চুল মাথায়, শার্টের ভাঁজ ঠিক

নেই— দেখলেই বোঝা যায় বড় অস্থির স্বভাবের লোক। অত্যধিক কথা বলে আদিত্য, কথা বলার সময়ে তার চোখ নাচে, মুখের চামড়া কাঁপে, হাত-পা নড়ে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না যে, বাগবাজারে সাত-আট কিংবা দশ পুরুষের প্রকাণ্ড একখানা দেড় বিঘার বাড়িতে সে থাকে— যেখানে শ্বেতপাথরের মেঝে, আর ঝাড়লণ্ঠন রয়েছে। আদিত্যর মুখেই শুনেছে শাশ্বতী যে, যদিও বাড়িটা শরিকে শরিকে কিছুটা ভাগ হয়ে গেছে, তবু আদিত্যরা এখনও দু'টো মহল নিয়ে থাকে, যে-মহলে এখনও চোরা গুপ্ত-কুঠুরি আছে। আর আছে মাটির নীচে ঘর— সে-ঘরের কোনওটায় থাকে নগদ টাকা আর গয়না, কোনওটায় বেলেমাটির প্রকাণ্ড জালায় রাখা হয় গ্রীষ্মকালের ঠান্ডা জল, কোনও কোনও ঘর আছে যা এক সময়ে ছিল এ-মহলের ও-মহলের মধ্যে সুড়ঙ্গ-পথ। ভাবলেই ভয় করে শাশ্বতীর। ওই বাড়ির মধ্যে যদি কোনও দিন তাকে বউ হয়ে যেতে হয় (যদিও শাশ্বতীর সন্দেহ আছে, তাকে কোনও দিন আদিত্যর মা-বাবা বাড়ির বউ হিসেবে নেবে কি না!) তা হলে কত রকমের ভয়-ভাবনার মধ্যে গিয়ে পড়বে সে! সে সে-বাড়ির আচার-ব্যবহার-সহবত জানে না, সঠিক ভাষা কিংবা সভ্যতা জানে না, ওখানে চোরা গুপ্ত সব কুঠুরির মধ্যে প্রাচীন প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়, কাঁকড়াবিছে লুকিয়ে থাকে, রাত্রিবেলা ডেকে ওঠে তক্ষক, সেখানে শ্যাওলা-ধরা ছাদের ফাটল দিয়ে গজিয়ে উঠছে অশ্বত্থ গাছ। কত দূরে কোন অচেনা রাজ্যে চলে যেতে হবে তাকে! যদিও বাইরে থেকে অনেকটা জমিদারের মতোই দেখায় আদিত্যদের, কিন্তু আসলে তারা জমিদার নয়। কোনওকালে ছিলও না। তাদের বংশ বেনের। চিরকাল তারা ব্যবসা করেই এসেছে। কখনও বা তাদের ব্যবসা লোহার, কখনও তেজারতির। তাদের প্রজা নেই, গ্রামে সম্পত্তি নেই। আদিত্যর ধারণা জমিদারদের তুলনায় তারা অনেক সৎ, অনেক কম অহংকারী। আমরা কখনও প্রজার রক্ত শুষে খাইনি, বুঝেছো, সতী! আদিত্য বলে, মানুষের মাথায় পা রেখে চলিনি আমরা, প্রজার সেলাম নিইনি। আমার বাবা চিরকাল খদ্দেরদের 'বাবু' বলে ডেকেছে। অমুকবাবু-তমুকবাবু নয়, শুধু 'বাবু'। উঁচুদরের খদ্দেরকে বলেছে 'হুজুর'। বলতে বলতে হাসে আদিত্য, আমরা বিনয়ী লোক। আর রমেনটা ছিল জমিদার। পূর্ব বাংলায় কোথায় কোন ময়মনসিংহে জমিদারি ছিল ব্যাটার, চিরকাল সেই জমিদারির দাপট খাটিয়ে গেছে। পার্টিশানের পরে কলকাতাতেও দেখেছি ওর সব আগেকার প্রজাদের। এক বার বাসে ওকে দেখে একটা বেশ ভদ্র চেহারার লোক তাড়াহুড়ো করে সিট ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—বসুন, ছোটবাবু, বসুন। বলেই সিটটা হাত দিয়ে একটু ঝেড়েও দিল। অথচ তখন আর লোকটা রমেনদের প্রজা নয়, রমেনও নয় আর জমিদার। তবু তখনও প্রজা-জমিদার স্বত্বের সম্পর্কটা রয়ে গেছে। না, আমরা ও-রকম নই, মানুষের আত্মা আমরা কিনে নিইনি। আমরা লাভ করেছি, এই পর্যন্ত, ব্যস! শাশ্বতী ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি তোমার বাবার খদ্দেরদের কী বলে ডাকো? বাবু?' আদিত্য লজ্জা পেয়ে ঠোঁট উলটেছে, দূর! তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই নেই।' শাশ্বতী হাসে 'লুকোচ্ছ কেন? বলো না। আদিত্য হাসে বললে তুমি আর আমাকে ভালবাসবে না। বাঙাল মেয়েরা ভীষণ অহংকারী। তবু শেষ পর্যন্ত আদিত্য কিছুই লুকোতে পারে না, বলে দেয়। লাজুক হেসে বলেছে, ছেলেবেলায় আমিও খদ্দেরদের 'বাবু' বলে ডাকতুম। ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক তা বুঝতে পারতুম না। কলেজে ললিত-রমেনদের পাল্লায় পড়ে আমার প্রথম লজ্জা হল। যখন আমি আমাদের খদ্দের দেখলে সম্মান করি, 'বাবু' ডাকি, তখন ও-দিকে রমেনকে দেখে বাসের সিট ছেড়ে দেয় ওর প্রজা। দেখেশুনে ঠিক করলুম আমি ব্যবসায় আর নেই। চাকরি করব। দেখো, তাই করছি। এখন আর বাবার খদ্দেরদের আমি চিনিই না। শাশ্বতী হাসে, এ মাঃ, তুমি কাউকে কোনও দিন 'বাবু' ডেকেছ ভাবতেই পারি না। আদিত্য মাথা নাড়ে, এখন আমি দু'টোই অপছন্দ করি। কেউ আমাকে 'বাবু' ডাকুক, সেটাও। কাউকে আমি 'বাবু' ডাকি, সেটাও। স্বার্থই মানুষকে ও-রকম ডাকায়। স্বার্থই মানুষকে ছোট কিংবা বড় করে দেখায়। নইলে দেখ রমেন আর আমি একবয়সি, একই ক্লাসে পড়তুম, তবু অনেক দিন পর্যন্ত রমেনকে আমার হিংসে হয়েছে। অথচ হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। রমেনটা চমৎকার দৌড়োত, ভাল ফুটবল খেলত, গান গাইত, লম্বা চওড়া চেহারা ছিল, নায়কের মতো মুখশ্রী। সে-সব কিছুই আমার ছিল না। তবু কখনও ওর খেলাধুলো, গান বা চেহারার জন্য ওকে হিংসে হয়নি। কিন্তু যখনই মনে পড়ত বাসে একজন রীতিমতো ভদ্রলোক ওকে 'ছোটবাবু' বলে ডেকে সিট ছেড়ে দিয়েছিল, তখনই আমার বংশানুক্রমিক একটা স্বার্থে ঘা লাগত। আমি ব্যাপারটা সহ্য করতে পারতুম

না। সবসময়ে রমেনের সঙ্গে নিজের তুলনা করে দেখতুম কে বড়, কে ছোট। তাই রমেনের বন্ধু হতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ললিত বা তুলসীর কোনও কমপ্লেক্স ছিল না, ওদের সময় লাগেনি। রমেন মাঝে মাঝে ওদের ঢাউস পুরনো মোটর গাড়িটা নিয়ে কলেজে আসত, আমরা চার-পাঁচজন সেই গাড়িতে চড়ে বেড়াতে যেতাম। গঙ্গার ধার দিয়েই সাধারণত গাড়ি নিয়ে যেত রমেন। অনেক দূর গিয়ে নির্জন কোনও জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বলত, নাম। তারপর জামা-কাপড় খুলে আন্ডারওয়্যার পরে জলে ঝাঁপ দিত, চেঁচিয়ে ডাকত আমাদের, আয়রে। কেউ কেউ নামত জলে, আমি সাঁতার জানতাম না বলে নামিনি। রমেন একদিন জোর করে ধরে নামাল। ডায়মন্ডহারবারের কাছে উথাল পাথাল গঙ্গা— সেইখানে স্রোতের মুখে আমাকে টেনে নিয়ে গেল দূরে। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ভয়ে চেঁচাচ্ছিলাম, ও মুখ ঘুরিয়ে বলল—চেঁচাস না, শালা। লোকে আমাকে সন্দেহ করবে। এখন তুই-আমি মিলেমিশে এক হয়ে গেছি, তুই ডুবলে আমিও ডুবব— ভয় নেই। বুঝলে সতী, রমেনটা কিছু ভেবেটেবে ও-কথা বলেনি। কিন্তু হঠাৎ আমার চেঁচানি বন্ধ হয়ে গেল। কেমন যেন সাহস পেয়ে গেলাম। আমি ডুবলে রমেনও ডুববে— ওই কথাটা বলার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা হঠাৎ ভীষণ একটা আনন্দ দিয়েছিল আমাকে। চারধারে বিপুল জলস্রোত—আমি সাঁতার জানি না—রমেন— একমাত্র রমেন ছাড়া তখন আর আমার কোনও অবলম্বনই নেই। ঠিক সে সময়ে ওই কথা কোনও ভরসার কথা নয়, তবু আমি ভরসা পেলাম। মনের ভয় কেটে গেল। ও না-ভেবেই বলেছিল, তুই-আমি মিলেমিশে এক হয়ে গেছি। জলের মধ্যে আমি ওর কোমর ধরে ছিলাম বলেই বোধ হয় ও ওই কথা বলেছিল। কিন্তু কথাটা যত বার পরে ভেবে দেখেছি তত বারই মনে হয়েছে ওই রমেন শালা মস্ত জ্ঞানীর মতো বলেছিল কথাটা। জলে হোক, ডাঙায় হোক, সুখে হোক, দুঃখে হোক, কোথাও-না-কোথাও একবার না একবার আমাদের মিলেমিশে এক হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা তা হচ্ছি না। বুঝলে সতী, তারপর থেকেই আমি মনে মনে ছোট-বড়র ভাবটা আস্তে আস্তে তুলে ফেলার চেষ্টা করছি। ইচ্ছে করেই আমি বাবার ব্যবসাতে নামিনি, বাবা কত রাগারাগি করেছে। এতদিনে কোন ঘুন-ধরা বনেদি পরিবারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু আমি তা করিনি। আদিত্যর এ-সব কথার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল, খানিকটা ছিলও না। শাশ্বতী জানে, আদিত্য সুখী ছেলে। আদরে মানুষ। সে এখনও তেমন কষ্টসহিষ্ণু নয়, কোনও দিন নিজে হাতে বাজারও করেনি। সবচেয়ে বড় কথা, এখনও নিজেদের ব্যবসা নিয়ে তার একটু অহংকার আছে, আর এখনও সে তার সেই বন্ধু রমেনকে একটু হলেও হিংসে করে। বাড়ি ছেড়ে এসে আদিত্য তাকে বিয়ে করবে— এটা ভাবতেও শাশ্বতীর ভাল লাগে না।

একটু দূর থেকে আদিত্যকে দেখছিল শাশ্বতী। অনেকক্ষণ দেখল। তারপর হঠাৎ একটু শ্বাস ছেড়ে আপন মনে বলল, পাগল!

সিগারেট ধরিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াতেই শাশ্বতী আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, দোকানদারের সঙ্গে কী অত কথা বলছিলে?

আদিত্য হাসল, সে অনেক কথা। প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, এখান দিয়ে চার নম্বর বাস কতক্ষণ পর পর যায়। তারপর ওর কাচ্চা-বাচ্চা, কারবার, দেশ-গাঁওয়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম। খুব খাতির করল...

শাশ্বতী রাগ করে, আর আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায় এতক্ষণ! তুমি এক বার ফিরেও তাকালে না!

আদিত্য চুপচাপ সিগারেট টেনে গেল, তারপর অনেক ভেবেচিন্তে বলল, আমার মন ভাল নেই, তাই অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করছিলাম।

শাশ্বতী চুপ করে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

আদিত্য হঠাৎ হাসে, ললিতকে কেমন দেখলে?

শাশ্বতী বলল, কেমন মানে?

আদিত্য ধীর চোখে অনেকক্ষণ শাশ্বতীকে দেখে, তারপর বলে, তোমার কি মনে হয় ও ব্যাটা টিঁকে যাবে?

শাশ্বতী ভ্রূ কোঁচকায়, ও-সব কী কথা! আমি কী করে জানব?

আদিত্য বলে, তোমার মেসোমশাইয়ের চেহারা অসুখের পর কীরকম হয়েছিল? খুব সুন্দর?

শাশ্বতী ইতস্তত করে, অত মনে নেই।

আদিত্য মাথা নাড়ে, আজ ললিতের যে-চেহারাটা আমি দেখলাম সেটা ওর আসল চেহারাই নয়। ও দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। অনেক ব্রাইট। কিন্তু আমি বলছি সতী, এটা ওর চেহারাই নয়। অমন ঝলমলে চোখ ছিল না ওর। আসলে এটাই ওর শেষ চেহারা।

শাশ্বতী ধমক দেয়, ট্রাম আসছে। সরে এসো।

আদিত্য শাশ্বতীর দিকে তাকায়, বলে, লোকে মরে যাওয়ার আগে সুন্দর হয়।

শাশ্বতী বলে, সবাই হয় না।

আদিত্য একটু চিন্তা করে, সবাই হয় না, কিন্তু কেউ কেউ তো হয়! ধরো যারা পাপ-টাপ খুব একটা করেনি, যারা মোটামুটি সৎ পবিত্র জীবন যাপন করেছে, তাদের হয়তো ভগবান শেষ কয়েকটা দিন সুখের করে দেন। তখন ব্যাধি থাকে না, চেহারা সুন্দর হয়ে ওঠে. চোখ উজ্জ্বল হয়, পৃথিবীর ওপর আরও মায়া হতে থাকে। আর ঠিক এই অবস্থাতেই তারা হঠাৎ চলে যায়।

একটু চুপ করে থাকে আদিত্য, তারপর হঠাৎ বলে, মাইরি সতী, ললিতটা বরাবরই কেমন একটু পবিত্র ছিল। খুব পরোপকারী আর তেজি। তাই ওর চেহারার এই উজ্জ্বলতাটা ভাল নয়।

রাস্তায় ধুলো উড়ছে খুব। চার পাশে ভিড়। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে শাশ্বতী একটু পিছিয়ে দাঁড়ায়, তারপর বলে, ট্রামে উঠবে না?

দাঁড়াও, সিগারেটটা শেষ করে নিই। অবশেষে ওরা উঠল একটা ভিড়ের ট্রামে। শাশ্বতী মেয়েদের সিটে বসবার জায়গা পেল। আদিত্য দাঁড়িয়ে রইল।

শাশ্বতী দেখল, আদিত্যকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। একগাদা লোকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে আদিত্য, তার চোখে চোখ পড়তেই একটু ম্লান হাসল। তারপর দীর্ঘ শরীরটা অল্প একটু নুইয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। হয়তো বন্ধু ললিতের জন্য ওর মন খারাপ। কিংবা হয়তো এখন নিজের পরিবারের গোঁড়ামি, এবং শাশ্বতীকে বিয়ে করার অনিশ্চয়তার কথা ভেবে ওর মন ভাল নয়। কে বলবে কোনটা ঠিক? কিন্তু শাশ্বতী জানে আদিত্যর মন একটা গড়ানে ঢালু জায়গা— সেখানে জল দাঁড়ায় না। মাঝে মাঝে কেবল সুখ দুঃখ বিষণ্ণতা কিংবা তীব্র কোনও অনুভূতি প্লাবনের মতো এসে চলে যায়। আদিত্য কখনও কখনও তাকে ভীষণ ভালবাসে, কখনও কখনও তার কথা ভুলে যায়। শাশ্বতীর ভয় করে।

শাশ্বতী তার এই বয়সের মধ্যে খুব বেশি পুরুষ দেখেনি। তাদের পরিবারে এক ধরনের অনুশাসন ছিল। বরাবর বাইরের ঘরে পুরুষমানুষ এলে তারা ভিতরের ঘরে থেকেছে। রাস্তায় কখনও কারও সঙ্গে কথা বলেনি। হোটেল-রেস্টুরেন্ট বা সিনেমায় যায়নি অভিভাবক ছাড়া। উপহার নেয়নি অনাত্মীয় পুরুষের কাছ থেকে। বাইরে থেকে ফিরতে সন্ধে হলে বরাবর তাদের কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। এই রকম অনুশাসনের মধ্যে থেকেও তার দিদি লীলাবতীর জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কী ভাবে তা হয়েছিল তা শাশ্বতী জানে না। শুধু জানে, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে লীলাবতীকে কয়েকজন শয়তান লোক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সারা রাত তারা লীলাবতীকে ব্যবহার করে খুব ভোরে ক্যালকাটা ফুটবল মাঠের বেড়ার কাছে ফেলে রেখে যায়, পৌষের শীত আর ঘাসের শিশিরের মধ্যে। লীলাবতীর জ্ঞান ছিল না, যখন তাকে কুড়িয়ে আনা হয়। তার তখন গা-ভরা জ্বর। মাস দেড়েক নিউমোনিয়া আর এক ধরনের আচ্ছন্নতার অসুখে ভুগে উঠবার পর সে যখন মাস দেড়েকের গর্ভবতী তখন সমীর সান্যাল নামে একজন উদার পুরুষ তাকে সব জেনে বিয়ে করে নিয়ে যায়। তাদের পরিবারে সেই প্রথম রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হল, এবং সেই বিয়েতে কোনও নিমন্ত্রণও হয়নি। বরাবর রেজিস্ট্রি বিয়ের বিরোধী তার বাবা সেই বিয়েতে সাক্ষী দিয়েছিল, আর সাক্ষী দিয়েছিল তার দাদা কালীনাথ। তারপর গত আট-দশ বছর আর লীলাবতীর কোনও খবর রাখে না তারা। সমীর সান্যাল বা লীলাবতী তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তাদের বিপদে ফেলেনি। কোথায় কীভাবে আছে তারা কে জানে! কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকেই তাদের পরিবারের অনুশাসন অনেকটা ঢিলে হয়ে গেল। লীলাবতীর বিয়ে হয়ে গেলে বাবা এক দিন খুব গম্ভীরভাবে তাদের উঠোনে একটা গর্ত খুঁড়তে লাগল। প্রকাণ্ড গর্ত। তার ওপর লতাপাতা

বাঁখারি দিয়ে একটা ছাউনি দিল। তারপর এক দিন তার মধ্যে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বসে রইল। পাড়ার লোকেরা ভিড় করে এল সেই দৃশ্য দেখতে। বাবা তার সেই গুহার মধ্যে বসে লোকের সঙ্গে কথা বলত, নানা প্রশ্নের উত্তর দিত। বলত, দেখো, উদ্ভিদ জগৎ কত নির্বিকার, দেখো প্রকৃতির মধ্যে কোনও সমাজ নেই। আমি এইরকম নির্বিকার হতে চাই। কখনও বলত, দেখো, আমার ব্রহ্মতালু ভেদ করে একটা আমলকী গাছ গজিয়ে উঠবে। আমি ওইভাবেই আবার জন্ম নেব। তখন শাশ্বতীর বয়স আট কি নয়। বাবার সেই গুহার সামনে লজ্জায় কেউ যেতে পারত না বলে মা মাঝে মাঝে তাকে পাঠাত সেই গর্তের মুখ পাহারা দিতে। এক্কাদোক্কা কিংবা গুটি-খেলা ফেলে শাশ্বতী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত সেই গুহার সামনে। কেউ উঁকি মারতে এলে দু'হাত ছড়িয়ে পথ আটকাত, যাবেন না। যদি কেউ প্রশ্ন করত কেন? অমনি ফিক করে হেসে ফেলত সে, বাবা যে ন্যাংটো!

সেই সময়ে তার গুহাবাসী বাবার সম্পর্কে কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক রটনা করেছিল যে, তিনি তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁর মুখের কথা বিফলে যায় না। অনেকে আসত রেসের ঘোড়ার নম্বর বা লটারির টিকিটের ফলাফল জানতে। কিছু কিছু হয়তো বা মিলেও গিয়েছিল। তাই বাবাকে নিয়ে তখন বেশ হইচই চলছে পাড়ায়। অন্য দিকে ভেঙে যাচ্ছে তাদের পরিবার। তখন তার মা তাদের দুই ভাই আর দুই বোনকে নিয়ে দিশেহারা পাগল-পাগল। বি-এ পড়া ছেড়ে কষ্টেসৃষ্টে চাকরিতে ঢুকল কালীনাথ। বাবার আমল থেকে তারা চলে এল দাদার আমলে। অনেক গরিব হয়ে গেল তারা। হই চই করা আমোদপ্রিয় তার দাদা কালীনাথ—যাকে কোনও দিন সঠিক দাদার সম্মান দেয়নি শাশ্বতী— সেই কালীনাথ মাত্র বাইশ বছর বয়সেই হয়ে গেল তাদের অভিভাবক। চোখে রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা, মুখখানা গম্ভীর, সারাদিন চাকরি আর টিউশানি আর রাতের কলেজে বি এ পড়তে পড়তে কালীনাথ হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেল। তখন থেকেই কালীনাথ না-ছোড় একটা অম্বলের অসুখেও ভুগে আসছে। বাবা তার গুহায় বাস করল প্রায় বছরখানেক। তারপর সমতলে উঠে এল। বুজিয়ে দেওয়া হল সেই গর্ত। বাবা জামা-কাপড় পরতে লাগল। তবু, বাবা কোনও দিন আর পুরোপুরি ভাল হয়নি। চার-পাঁচ-ছয় মাস একরকম ভালই থাকে, তারপর আবার পাগলামি দেখা দেয়।

যদিও তাদের পরিবারটি ছিল নিরীহ শান্ত ভালমানুষদের পরিবার, তবু লীলাবতীর ঘটনার পর থেকেই তাদের পরিবারের অখ্যাতি রটে যায়। এই অখ্যাতি প্রবল সমস্যা হয়ে দেখা দেয় শাশ্বতীর মেজদি হৈমন্তীর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টার সময়। যত বার হৈমন্তীর সম্বন্ধ এনেছে কালীনাথ তত বারই পাত্রপক্ষের কাছে বেনামা চিঠি গেছে, নয়তো কেউ-না-কেউ তাদের লীলাবতীর ঘটনার কথা জানিয়ে দিয়েছে, আবও জানিয়ে দিয়েছে যে, হৈমন্তীর বাবা পাগল। পাত্রপক্ষ পিছিয়ে গেছে। ক্রমে বোঝা যাচ্ছিল যে, সম্বন্ধ করে স্বাভাবিকভাবে হৈমন্তীর বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অন্তত যত দিন লোকে লীলাবতীর কথা একেবারে ভুলে না যায়। তাই দাদা এবং মা ভেবেছিল, যদি কেউ পছন্দ করে বা ভালবেসে বিয়ে করে, একমাত্র তবেই হৈমন্তীর বিয়ে সম্ভব। কাজেই তাদের পরিবারে মেয়েদের ওপর যে দীর্ঘকাল একটা অনুশাসন ছিল সেটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। দাদা তার বন্ধুদের নিয়ে আসত বাসায়, আলাপ করিয়ে দিত হৈমন্তীর সঙ্গে, মোটামুটি ভাল ছেলে দেখে হৈমন্তীর প্রাইভেট পড়ানোর কাজে বহাল করা হল কয়েক বার, কলকাতার বাইরে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেও বেড়াতে পাঠানো হল তাকে। হৈমন্তীর চেহারা ভাল ছিল না। সামনের দাঁত উঁচু, রং খুব কালো। প্রথম প্রথম স্বজাতি ব্রাহ্মণ ছেলেই জোগাড় করার চেষ্টা করছিল কালীনাথ। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য জাতেও হাত বাড়িয়েছিল। হৈমন্তীকে উপলক্ষ করেই তাই একদিন সহকর্মী আদিত্যকে বাসায় নিয়ে এল কালীনাথ। তাকে পরোটা আর অমলেট খাওয়াল। সে চলে গেলে মাকে ডেকে বলল, জাত-ফাত আর দেখো না। এ বিরাট বড়লোকের ছেলে। খুব সৎ। তা ছাড়া ওদের টাইটেলটাও খুব গোলমেলে— ওরা রায়। ব্রাহ্মণ না কি অন্য কিছু তা চট করে বোঝাও যাবে না। মা কোনও উত্তর দেয়নি, অসহায়ভাবে চুপ করে ছিল।

এ-কথা ঠিক যে, তাদের পরিবারে যখন এ-সব ঘটছিল তখন তাকে— শাশ্বতীকে—কেউ লক্ষই করেনি। তার ওপর কোনও শাসন ছিল না। তবু শাশ্বতী ধরা দিল নিজের স্বভাবে।

নদীর কাছাকাছি ঘাস-ঢাকা মাটিতে যেমন একটা ভেজা ভাব থাকে তেমনই এক ভেজা-ভাব আছে তার শরীরে। অথচ তার শরীরের অনুভূতিগুলি খুব প্রখর। ছেলেবেলা থেকেই যদি কেউ তাকে

আচমকা ছোঁয়, কিংবা গায়ে হাত দেয়, অমনি আপনা থেকেই তার শরীর কেঁপে ওঠে— গায়ে কাঁটা দেয়। শাশ্বতী জানে যে, তার শরীরে একটা শুদ্ধতা কিংবা পবিত্রতার ভাব রয়েছে— যেটা কোনও দিন নষ্ট করতে তার খুব কষ্ট হবে। তার তিনটে ডাক নাম আছে— মলু, ঠান্ডু আর সতী— গায়ের রং ময়লা বলে এক সময়ে বাবা তার নাম রেখেছিল মলিনা। সেই থেকে মলু। স্বভাবে ঠান্ডা বলে তার মা তাকে ডাকে ঠান্ডু। আর সকলে ডাকে— সতী। তার শরীর কিংবা স্বভাবের সঙ্গে তিনটে নামেরই কিছু মিল রয়েছে। সে স্বভাবে ঠান্ডা, লাজুক। যে-কোনও স্পর্শেই তার শরীর কেঁপে ওঠে। সম্ভবত সে-কারণেই, স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সে পুরুষদের কাছাকাছি গেছে খুব কম। তার উপযুক্ত পুরুষ কে বা কেমন— এ-সব ভাবনা চিন্তা সে খুব কমই করেছে। কারণ সে বরাবর তার শরীর ও মনের ওই সহজাত পবিত্রতা বা শুদ্ধতাটুকুকে ভালবেসেছে— সে-শুদ্ধতা কোনও পুরুষের কাছে নষ্ট করতে তার খুব কষ্ট হবে। পাড়ার বখাটে ছেলেরা তার ওই পবিত্রতার ভাব লক্ষ করেই বোধ হয় সে হেঁটে গেলে 'সিস্টার নিবেদিতা! সিস্টার নিবেদিতা!' বলে চেঁচায়।

তার এই পবিত্রতার ভাবটুকু প্রথম নষ্ট করার চেষ্টা করে বোকা অভিজিৎ। তার প্রাইভেট টিউটর। অঙ্কে কাঁচা ছিল বলে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে কালীনাথ তার জন্য বি এস সি অভিজিৎকে ঠিক করে দিয়েছিল। অভিজিৎ অঙ্কে তুখোড় ছিল, আর সব বিষয়ে বোকা। কিছুদিন পড়ানোর পরই সে শাশ্বতীর প্রেমে পড়ে গেল। সপ্তাহে তিন দিন তার পড়ানোর কথা, লজ্জার মাথা খেয়ে সে আসত চারদিন কি পাঁচদিন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, তুমি দুপুরে ঘুমোও, না? তারপর দুঃখের ভান করে বলত, একজন সারা দিন রোদে রোদে ঘোরে, খেটে মরে, আর একজন ঘুমোয়! কখনও বা অঙ্ক না-মিললে সে শাশ্বতীকে মার দেওয়ার ভান করত, কানের লতি আলগোছে ধরে মাথায় ঠুস করে একটু থাপ্পড়। কখনও বা হঠাৎ চোখ ঘোলা করে বলত, দেখো তো আমার জ্বর হয়েছে কি না! কাল সারা বিকেল বৃষ্টিতে ভিজলাম! এ-সব বোকামির ফলে শাশ্বতীর ভালবাসা বেড়েছিল। অভিজিতের প্রতি নয়, তার নিজের শুদ্ধতার প্রতি। কারণ অভিজিৎ-এর কাছাকাছি সে তার শুদ্ধতাকে সবচেয়ে বেশি টের পেত।

তারপর অনেককাল আর পুরুষ ছিল না তার জীবনে। তার মেজদি হৈমন্তীকে উপলক্ষ করে যে-সব পুরুষ আসত তাদের কৌতূহলভরে দেখত শাশ্বতী। এদের মধ্যে কোন জন তার মেজদিকে পছন্দ করবে? ওই রকম কৌতূহল নিয়েই সে আদিত্যকে দেখেছিল। দূর থেকে, খুব বিষণ্ণ মুখে পরোটা আর অমলেট খাচ্ছিল আদিত্য। মাকে বলল, মাসিমা, আমার মন ভাল নেই। বাবার সঙ্গে ঝগড়া চলছে চার-পাঁচদিন ধরে। প্রথম দেখে আর কথা শুনে শাশ্বতী বুঝেছিল আদিত্য খুব সরল, তার মনে কথা থাকে না। আদিত্যকে তার মোটেই পছন্দ হয়নি। হৈমন্তী তার সঙ্গে অনেক কথা বলল, কিন্তু আদিত্য হৈমন্তীর সাজগোজ লক্ষ করল না, চোখে তেমন করে চোখ রাখল না। তারপরও সে অনেকবার গেছে শাশ্বতীদের বাড়িতে, কিন্তু কোনও দিনই সে বোধ হয় বুঝতে পারেনি কেন কালীনাথ তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। হয়তো আজও জানে না। তবে আদিত্য মিশুক ছিল, কথা বলত খুব। মাঝে মাঝে যেত তাদের বাড়ি, সবাইকে হাসিয়ে আসত কিছুক্ষণ—কখনও সে তার কৃপণ বাবার গল্প বলত, কখনও নকল করে দেখাত কীভাবে কালীনাথ অফিসে তার পেটের রোগের গল্প করে। বলার ভঙ্গিতে কত দিন তাদের সঙ্গে মা'ও হেসে গড়িয়ে পড়েছে। আদিত্য চলে যাওয়ার সময় তারা দুই বোন বারান্দায় বেরিয়ে আসত, চেঁচিয়ে বলত, আবার আসবেন। একদিন এই 'আবার আসবেন' শুনে আদিত্য থমকে দাঁড়িয়ে ইশারায় তাকে ডাকল। কাছে গেলে গলা নামিয়ে বলল, 'এসে কোনও লাভ আছে? যদি ভরসা দাও তবেই আসি। খামোকা এসে লাভ কী? যদিও পুরুষমানুষ খুব বেশি দেখেনি শাশ্বতী, তবু আদিত্যর কথাটা সে একপলকেই বুঝেছিল। তারপরেই একদিন আদিত্য একা তার সঙ্গে দেখা করল কলেজের সামনে, রাস্তায়...হৈমন্তীর আপত্তির কিছু ছিল না। এক দিন বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সে গুনগুন করে আদিত্যর ব্যাপারটা বলে দিল হৈমন্তীকে। হৈমন্তী একটুও আপত্তি করল না, অনেক পুরুষ দেখে সে তখন খানিকটা হকচকিয়ে আছে। কোনজন যে তাকে নেবে তা বুঝতে পারছিল না। কাজেই বিশেষ কারও ওপর তার পক্ষপাত থাকার কথা নয়।

এই আদিত্য। কখনও তাকে ছোঁয় না, খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে কাছে আসার চেষ্টা করে না, মাঝে মাঝে তার কথা ভুলে যায়। মন্দ লাগে না শাশ্বতীর। সে এই প্রথম পুরুষ দেখছে বোকা অভিজিতের পর।

মাঝে মাঝে তার শরীরের সেই অমোঘ পবিত্রতাটুকুর কথা ভেবে তার মন খারাপ হয়ে যায়। আসলে বয়স। বয়সের দোষ। পাড়ার ছেলেরা তাকে 'সিস্টার নিবেদিতা' বলে ভেঙায়। কিন্তু সত্যিই তো আর সে সে-রকম কেউ নয়! শাশ্বতীদের কি নিবেদিতা হলে চলে! তাই সে সুন্দর পবিত্রতার কথা আজকাল ভুলে যায় শাশ্বতী। ট্রাম-বাসের ভিড়ে লোকজন গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, শাশ্বতী আর তেমন শিউরে ওঠে না। সে অনেকটাই ভুলে গেছে। ভুলে যাবে।

শাশ্বতী লক্ষ করল, রাসবিহারীর মোড়ের কাছে এসে গেছে তাদের ট্রাম, তবু বে-খেয়ালে অন্য মনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদিত্য। সে দাঁড়িয়ে আদিত্যকে বলল, নামবে না?

নামব। বলে হাসল আদিত্য।

নেমে বলল, কোন দিকে যাওয়া যায়?

আমি বাড়ি যাব। শাশ্বতী বলে।

বাড়িতে কে আছে তোমার?

কে নেই?

যে-ই থাক, আমি তো নেই!

আদিত্য হাত উঁচু করল একটা ট্যাক্সিকে। সেটা থামল না। 'শালা...' গাল দিল আদিত্য।

ট্যাক্সির কী দরকার! পয়সা কামড়াচ্ছে? শাশ্বতী বলে।

এখন বাসে-ট্রামে ভিড়।

চলো হেঁটে যাই। কোথায় যাবে?

লেক।

এইটুকু তো মোটে!

আদিত্য মাথা নাড়ে, দূর! অনেকটা রাস্তা।

দ্বিতীয় খালি ট্যাক্সিটা ধরল আদিত্য। পাশাপাশি বসে সিগারেট ধরাল। বলল, ললিতকে কেমন দেখলে?

তুমি এতক্ষণ ললিতের কথা ভাবছিলে?

আদিত্য হাসে, মাইরি সতী, ললিতটাকে আমি বড় ভালবাসতুম। বলে আদিত্য কী একটু চিন্তা করে, বলে, কিন্তু কীরকম ওর চেহারাটা দেখাল বলো তো আজ? ঠিক যেন ভগবানের বাচ্চা। ডিরেক্ট ভগবানের। তুমি লক্ষ করোনি?

আমি কি ভদ্রলোককে আগে আর দেখেছি নাকি?

আজ কেমন দেখলে?

ভগবানের বাচ্চা কেমন হয় জানি না তো!

ঠিক! আদিত্য হাসে, ওটা একমাত্র আমিই জানি।

তারপর চুপ করে থাকে।

কাছাকাছি কেউ সিগারেট খেলে গন্ধে শাশ্বতীর গা গুলোয়।

শাশ্বতী বলল, একটু সরে বসো। বাইরের দিকে মুখ করো।

আদিত্য ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়, আমার চেহারাটা কেমন? জিরাফের মতো?

এতক্ষণে শাশ্বতী হাসল, বলল, গায়ে মাংস লাগলে তোমাকে খারাপ দেখাবে না।

এখন দেখায়?

শাশ্বতী হাসে, কী জানি! চেহারা দেখি নাকি!

কী দেখো তবে?

চেহারা ছাড়াও অনেক কিছু থাকে।

দূর! আর কী দেখার আছে? মেয়েরা ছেলেদের আর কী দেখে? চেহারা কিংবা টাকা-পয়সা ছাড়া?

শাশ্বতী কপাল তোলে, দেখে না?

না। মাথা নাড়ে আদিত্য, বরং পুরুষরা দেখে। আজ আমি ললিতের চেহারায় যা দেখলুম, তুমি তা দেখোনি।

শাশ্বতী রেগে যায়। ঝেঁঝে ওঠে, থাকগে। আমার দেখার দরকার নেই।

আদিত্য হাসতে থাকে। তারপর আচমকা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো গলা নিচু করে বলে, তুমি দেখোনি। কিন্তু আমি দেখেছি। তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে।

শাশ্বতী কোনও উত্তর দেয় না। কিন্তু চমকে ওঠে। তার শরীর ঠিক আগের মতো এক অসহনীয় স্পর্শকাতরতায় কেঁপে যায়। কিন্তু ততক্ষণ ললিতের কথা তার সঠিক মনে ছিল না। কিন্তু চমকে উঠেই তার মনে পড়ল মুখখানা। তীক্ষ্ণ মুখ, চোখের দৃষ্টি গভীর মায়া-মমতায় জড়ানো। হয়তো আদিত্য ঠিকই বলেছে— মৃত্যুর আগে মানুষ সুন্দর হয়। ললিতকে আগে কখনও দেখেনি শাশ্বতী। কিন্তু এখন মনে পড়ল— মানুষটাকে সে সুন্দর দেখেছিল। কিন্তু এও ঠিক যে চেহারার সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় ললিতের তা নেই। বরং বিষণ্ণতা আছে, আর আছে খুব দূরের কোনও চিন্তা। কাছেপিঠের লোকজন বা স্থানকে লোকটা ভাল করে দেখে না। আদিত্যর ও-পাশে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলছিল ললিত। কয়টাই বা কথা। আদিত্যর শরীরের আড়ালে মুখখানা খুব ভাল করে দেখেওনি শাশ্বতী। তবু এখন মনে পড়ল সে-মুখে সাধু-সন্তের মতো কোনও সৌন্দর্য ছিল। শাশ্বতী চমকে উঠল। কিন্তু ভেবে দেখল, আদিত্য দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথা বলছে। শাশ্বতীকে অত অল্প সময়ে ললিত কতটুকু দেখেছে? শাশ্বতী জানে যে তার চেহারায় হঠাৎ দেখে পছন্দ হওয়ার মতো কিছু নেই।

কথাটা শুনে সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আদিত্যর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আদিত্য তখনও হাসছিল, বলল, তুমি যখন বলছিলে যে তোমার বাড়ি মাইকেল মধুসূদনের বাড়ির কাছেই ছিল, যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষতীরে তখন হঠাৎ ওর মুখ-চোখ কেমন হয়ে যাচ্ছিল। বিহ্বল...হ্যাঁ, বিহ্বল কথাটাই ঠিক খাটে।

শাশ্বতী চুপ করে চেয়ে রইল।

খাপছাড়াভাবে আদিত্য বলল, ও শালা কবি।

একটু চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল আদিত্য, শালা মরে যাবে।

আদিত্য ঝুঁকে শাশ্বতীর একখানা হাত ধরার চেষ্টা করে। তারপর আবার হাত টেনে নিয়ে শাশ্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করে বলে, মাইরি, সতী, তুমি রাগ করলে না তো! আমি যা দেখেছি তাই বলছি। অন্যায় হল?

শাশ্বতী আস্তে মাথা নাড়ে, তুমি ভুল দেখেছ।

সিগারেটের ধোঁয়া গলায় রেখে আদিত্য অস্পষ্ট স্বরে বলল, ললিতকে আমি চিনি। আমরা যখন একসময়ে মেয়েছেলে নিয়ে আলোচনা করতুম— কার কীরকম মেয়ে পছন্দ— তখন প্রায়ই ললিত শ্যামলা রঙের মেয়ের কথা বলত। বলত, বাঙালি মেয়ের খুব ফরসা সাহেবি রং ওর পছন্দ নয়। আর বলত, সে মেয়ের সুন্দর চোখ আর অনেক চুল থাকবে।

আদিত্য মিটমিট করে শাশ্বতীর দিকে তাকায়, তোমার সঙ্গে মিলে যায়।

শাশ্বতীর বুক কাঁপে হঠাৎ। কেমন ভয় করে ওঠে। বলে, কী সব যা-তা বলছ!

সামান্য বিস্বাদ মুখ করে আদিত্য, মৃদু গলায় বলে, যা-তা কেন? এর মধ্যে তো কোনও দোষ নেই। তুমি যখন বলছিলে 'আপনি ভাল হয়ে যাবেন' তখন ওর মুখ-চোখ ঝলমল করে উঠল।

দূর!

আদিত্য হাসে, অন্যমনস্কভাবে বলে, দোষ কী সতী? ওর যা চেহারা দেখলাম আজকে— একটা টপ চেহারা—ওই চেহারা নিয়ে বেশি দিন টেঁকে না কেউ। ওর দিন শেষ। তোমাকে দেখে ও যদি আনন্দ পেয়ে থাকে— তাতে দোষ কী? বরং আমি তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যাব...

ট্যাক্সিটা থামিয়ে হঠাৎ মুখ ফেরায় ট্যাক্সিওয়ালা। সে মুখটায় বসন্তের দাগ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে কালো রোদ চশমা— রুক্ষ মুখখানা ফিরিয়ে বলল, কোথায় যাব?

সোজা। বলল আদিত্য। ট্যাক্সিওয়ালা সামান্য হাসে. সোজা আর কোথায়? রেল লাইনের ও-পাশে ট্যাক্সি যাবে না।

শাশ্বতী দেখল কথায় কথায় তারা বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে পৌঁছে গেছে। তাদের যাওয়ার কথা লেকের দিকে, গড়িয়াহাটা হয়ে। গড়িয়াহাটা কখন পেরিয়ে গেছে!

আদিত্য ঠান্ডা গলায় ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, সোজাই যাব, রেল লাইনের ও-পাশে। চলুন।

শাশ্বতী আদিত্যকে খানিকটা চেনে। ওই যে ট্যাক্সিওয়ালা বলল যে রেল লাইনের ও-পাশে যাবে না, তাইতেই জেদ চেপে গেছে আদিত্যর। কাজ থাক বা না-থাক সে এখন রেল লাইনের ও-পাশেই যাবে।

শাশ্বতী মৃদু ধমক দিল আদিত্যকে, কী হচ্ছে?

তারপর ট্যাক্সিওয়ালার রূঢ় মুখখানার দিকে চেয়ে নরম গলায় বলল, আপনি গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। গড়িয়াহাটায় আমরা ট্যাক্সি ছেড়ে দেব।

আদিত্য হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে, না। গেলে তুমি গড়িয়াহাটায় যাও। আমি সোজা যাব।

কেন?

এমনিই।

ট্যাক্সিওয়ালা শাশ্বতীর দিকেই চেয়ে ছিল। শাশ্বতীর মুখ-চোখ ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল অপমানে।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, আপনারা ঠিক করে নিন কোথায় যাবেন। আমি গড়িয়াহাটায় পৌঁছে দিতে পারি, কিন্তু রেল লাইনের ও-পারে যাব না।

কেন? আমি পয়সা দেব না? আদিত্য চেঁচিয়ে বলে।

দিলেই কী! ট্যাক্সিওয়ালা ঝেঁকে ওঠে, ও-পাশে ঘিঞ্জি রাস্তা, ভিড়, রাস্তা খারাপ—আমাদের ঝামেলা পোয়াতে হয়। গাড়িতে চোট হয়ে গেলে সে পয়সা আপনি দেবেন?

চেঁচামেচি শুনে দু'-একজন লোক ট্যাক্সির জানালায় উঁকি মারে। অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে শাশ্বতী। তার ভয় করে। অভিমানে ঠোঁট কাঁপে তার। চোখে জল আসি-আসি করে। টলমলে চোখে সে দেখতে পায়, আদিত্য সামনের সিটের গায়ে থাপ্পড় মেরে বলছে, যেতে হবে, যেতে হবে। আর ট্যাক্সিওয়ালা মাথা নেড়ে বলছে, আমি যাব না। যা খুশি করুন।'

যা কখনও করে না শাশ্বতী, তাই করল হঠাৎ। ঝুঁকে আদিত্যর উগ্র হাতখানা ধরল। শরীর কেঁপে উঠল তার, উত্তেজনার মধ্যেও। কাঁপা গলায় বলল, কী করছ তুমি? গাড়ি ঘোরাতে বলো।

আদিত্য একটুক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর শান্তভাবে ট্যাক্সিওয়ালার দিকে চেয়ে হেসে বলে, ঠিক আছে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিন।

ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

গড়িয়াহাটায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লেকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আদিত্য হঠাৎ বলল, সতী, তুমি অত ভিতু কেন? ও শালাকে আমি ঠিক নিয়ে যেতুম রেল লাইনের ও-পাশে কসবায়, কিংবা যেখানে খুশি।

তখনও শাশ্বতীর বুকে চাপ বেঁধে কণ্ঠরোধ করে আছে একটা অসহায় কান্নার ভাব। সে নাক টেনে স্খলিত গলায় বলল, সেটা খুব বাহাদুরি হত, না?

আদিত্য হাসে, বাহাদুরি নয়। কিন্তু ও যাবে না কেন?

অসুবিধে আছে বলেই যাবে না।

আবার চিড়বিড়িয়ে ওঠে আদিত্য, অসুবিধে ঘোড়ার ডিম।

রাগে লাল হয়ে যায় আদিত্যর ফরসা মুখ। শাশ্বতী লক্ষ করে। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে তারা। একসময়ে হঠাৎ আবার হেসে ওঠে আদিত্য। বলে, বিপদে পড়লে তোমাকে খুব অদ্ভুত দেখায়। আজ দেখলাম।

শাশ্বতী উত্তর দেয় না।

আদিত্য আপন মনে বলে, খুব প্যাশনেট। কিন্তু এমনিতেই তুমি ভীষণ ঠান্ডা। তোমার উত্তেজনা নেই। না?

শাশ্বতী উত্তর দেয় না। কিন্তু তার সামান্য লজ্জা করে।

আদিত্য বলল, আজ আমি মানুষজনকে কেমন উলটোপালটা দেখছি। ললিতকে কেমন দেখলাম। হঠাৎ তোমাকেও! তোমার এত প্যাশন কোনও দিন দেখিনি!

অনেকক্ষণ ধরেই আদিত্য কী একটা কথা তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছে, শাশ্বতী বুঝতে পারছে না। ললিতের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকেই আদিত্য অন্য এক রকমের ব্যবহার করছে তার সঙ্গে। অকারণ ঝগড়া করল ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল ললিতের তাকে খুব

পছন্দ, বারবার জিজ্ঞেস করল ললিতকে সে কেমন দেখল। আদিত্যর সঙ্গে তার সম্পর্কটা মাত্র ছ'-সাত মাসের পুরনো। এই অল্প সময়ে সে আদিত্যকে খানিকটা চিনেছে, খানিকটা চেনেওনি। আজ, এখন আদিত্যকে তার খুব অচেনা লাগছিল। তার রহস্যময় কথাবার্তা ভালও লাগছিল না তার। আদিত্য আবার ঘুরে ফিরে ললিতের কথা উল্লেখ করায় সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাস্তায় ভিড়। অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি হাঁটছে লোকজন, গায়ে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। তবু ফুটপাথের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে শাশ্বতী বলল, তুমি কী বলতে চাও, স্পষ্ট করে বলো।

আদিত্য থতমত খেয়ে যায়। বলে, কী স্পষ্ট করে বলব?

তুমি একটা কিছু বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি না।

দূর! বলে হাসল আদিত্য। তারপর বলল, চলো।

হাঁটতে হাঁটতে আবার হাসিঠাট্টার ছলে আদিত্য বলে, দেখো, সতী, দেখো বিবেকানন্দের মূর্তি আর ওই দেখো রামকৃষ্ণ মিশন। ওই বাড়িটার ভিতরে কখনও গেছ তুমি? গেলে তোমার মনে হবে ঠিক আমেরিকার কোনও বড়লোকের বাড়িতে ঢুকেছ...

শাশ্বতী আদিত্যর মুখ একপলক দেখে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল।

আদিত্য কিছুক্ষণ আবোল-তাবোল বকে গেল। তারপর হঠাৎ ওপর দিকে হাত ছুড়ে বলল, দূর ছাই! তুমি এত চালাক কেন?

শাশ্বতী আদিত্যর মুখ একপলক দেখে নিল। আদিত্য ভ্রূ কুঁচকে আছে।

লেকের পারে ঘাস-জমিতে বসে আদিত্য বলল, ঠিক সতী, আমি তোমাকে একটা কিছু বলতে চাইছি।

কী সেটা? মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে শাশ্বতী।

ললিতকে তুমি কেমন দেখলে?

সেই পুরনো প্রশ্ন? এ পর্যন্ত কয়েক বার জিজ্ঞেস করল আদিত্য।

শাশ্বতী অবাক হয়, বলে, আবার সেই এক কথা?

আদিত্য লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। শাশ্বতী দেখে আস্তে আস্তে ওর মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে।

মুখ নিচু করেই আদিত্য বলল, সতী, আমি ভীষণ হিংসুক। ছেলেবেলা থেকেই। আমি ব্যবসাদারের ছেলে— আমার মনে এতটুকুও মহত্ত্ব নেই।

শাশ্বতী সঠিক বুঝল না। তবু বলল, কী-সব বলছ।

ম্লান হাসে আদিত্য। তারপর বলে, সতী, আমাদের পরিবারে কোনও কালচার নেই, বাপ-দাদাদের মধ্যে আমিই প্রথম গ্র্যাজুয়েট। জোর করে পড়েছিলুম, নইলে ম্যাট্রিক ক্লাসের আগেই আমার ব্যবসাতে নেমে পড়ার কথা।

তাতে কী?

তাতে অনেক কিছু সতী। কিছুতেই আমার নিজেকে তোমার সমান বলে মনে হয় না। ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কেবল মনে হয়, তোমার মধ্যে বংশানুক্রমিক একটা কিছু আছে যা আমি ধরতে পারছি না। তোমার সঙ্গে আমার জাত মেলে না।

শাশ্বতী স্তম্ভিতভাবে আদিত্যর ম্লান মুখ দেখে। তারপর আকুল হয়ে বলে, ছিঃ। এ-সব কী কথা? জাত আবার কেউ মানে নাকি আজকাল?

আদিত্য মাথা নাড়ে, সে-জাত নয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব অনুযায়ী তো এক-একটা জাত থাকে। সেই জাত মিলছে না।

শাশ্বতী গম্ভীর হয়ে বলে, হঠাৎ এ-কথা কেন?

কমপ্লেকস। আদিত্য উত্তর দেয়। একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি আর ললিত চায়ের দোকানে আমার দু'পাশে বসে ছিলে। খুব অল্পই কথা হয়েছে তোমাদের। যা কথা বলার আমিই বললুম, হাসিঠাট্টা করলুম। কিন্তু তোমরা দু'জনে আমার দু'পাশে বসতেই আমার মনে হয়েছিল তোমরা দু'জন এক জাতের। আমি তোমাদের সমান নই। আর তক্ষুনি আমার মনে হচ্ছিল, তোমরা—তুমি আর ললিত— পরস্পর নিঃশব্দে কথা বলছ। সে-কথা চোখ-মুখের কোনও ইঙ্গিতে নয়। সেটা হচ্ছিল আরও রহস্যময়

সাংকেতিক কোনও সূত্রে— যা আমি বুঝতেই পারলুম না। সেটা বোঝার সাধ্যই আমার নেই— আমার জাত একদম আলাদা। অথচ তোমাদের মধ্যে তেমন কোনও কথাবার্তাই হয়নি, এমনকী তোমরা কেউ কাউকে খুব ভাল করে দেখওনি। এক বার তুমি কেবল ব্যাকুল হয়ে বলেছিলে, দেখবেন, আপনি ভাল হয়ে যাবেন, আর-এক বার ললিত তোমার বাড়ি যশোরে শুনে আগ্রহ দেখিয়েছিল। ব্যস, এইটুকু। তবু আমার মনে হচ্ছিল, আমাকে মাঝখানে রেখে অনেক কথা নিঃশব্দে চালাচালি হয়ে গেল তোমাদের। আমি স্বার্থপর, ব্যবসাদারের বাচ্চা— ফালতু পার্টি— মাঝখানে বোকার মতো বসে রইলুম। সে-সব কথা ধরতেই পারলুম না। আমার সেই সূক্ষ্ম অনুভূতিই নেই; যা ললিতের আছে। তোমারও আছে। কিন্তু আমার নেই।

শাশ্বতীর গলা আটকে ছিল। কথা বলতে পারছিল না সে। আদিত্যর লাল আভার লাজুক মুখখানা গভীর তৃষ্ণা এবং বিতৃষ্ণায় দেখতে দেখতে তার চোখে জল এসে গেল। কিন্তু চোখের জল টের পেল না সে।

খুব কষ্টের সঙ্গে সে বলল, ও-রকম কিছুই হয়নি।

জানি। আদিত্য নরম সুরে বলল, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছিল।

সিগারেট ধরায় আদিত্য। তারপর বলে, ললিতকে আজ অসম্ভব সুন্দর দেখেছিলাম আমি। তোমাকে সে-কথা বারবার বললাম, কিন্তু তুমি স্পষ্ট স্বীকার করলে না। আমার সন্দেহ বেড়ে গেল। মনে হল, তুমিও ওর ওই অসম্ভব সুন্দর চেহারাটা ঠিকই দেখেছ, কিন্তু মুখে বলছ না। বলছ না কারণ সেটা তোমার গোপন কথা। তোমরা একে অন্যকে বুঝেছ, কিন্তু আমাকে সেটা বুঝতে দিতে চাও না।

শাশ্বতী কিছু বলতে চেষ্টা করে। পারে না।

আমি একটা ছোটলোক! আদিত্য বলে, আমি হিংসুক। কিন্তু সত্যি বলো সতী, ললিতকে তুমি কেমন দেখলে?

শাশ্বতী শিউরে ওঠে।

আদিত্য! হায় আদিত্য! আদিত্য এতক্ষণ ধরে না খুঁচিয়ে তুললে ললিতের মুখ শাশ্বতীর মনেই পড়ত না। আকুল হয়ে মাথা নিচু করে কাঁদে শাশ্বতী।

আদিত্যর গলা ভারী হয়ে এসেছিল। সে আস্তে আস্তে বলল, আমি ভীষণ নোংরামি করছি সতী। তবু তুমি বলো ললিতকে তুমি কেমন দেখলে আজ?

বলতে বলতে একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেয় আদিত্য, আমাকে ছুঁয়ে বলো, সতী।

শাশ্বতী মুখ তুলল। তার দিকে বাড়ানো আদিত্যর হাতখানা দেখেই হঠাৎ শিউরে উঠল তার শরীর। তার সেই জন্মগত এক অদ্ভুত পবিত্রতা ও শুদ্ধতার দিকে বাড়ানো পুরুষের হাত। একটু থমকে যায় শাশ্বতী।

তারপর হঠাৎ আদিত্যর হাতখানা আকুল হয়ে চেপে ধরে দু'হাতে। শরীর ভয়ংকর কেঁপে ওঠে তার, চমকে ওঠে মন। দুরদুর করে কাঁপে পায়ের তলার মাটি।...ঠিক, এ-কথা ঠিক...ললিতকে সে সুন্দর দেখেছিল...সন্ত যোগীর মতো সুন্দর...

তবু শাশ্বতী ফিসফিস করে বলে, ললিতকে আমি একটুও সুন্দর দেখিনি। বিশ্বাস করো।

## ॥ বারো ॥

সে মিথ্যে কথা বলেছিল।

ভোর রাত্রে পাতলা ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছিল শাশ্বতী। দেখল, ভীষণ অন্ধকারের ভিতর মেঠো পথ দিয়ে লণ্ঠন হাতে একটা লোক চলে যাচ্ছে। লোকটার শরীর দেখা যায় না, কেবল লণ্ঠনের ম্লান আলো তার রোগা, ধুলো মাখা, চলন্ত পা দু'খানার ওপর পড়েছে। লণ্ঠনের আলোয় রহস্যময়, ভৌতিক সব ছায়া নেচে যাচ্ছে। একই স্বপ্ন, দৃশ্য বারবার। যত বার চোখে একটু ঘুম আসে শাশ্বতীর, তত বার সেই মেঠো পথ দেখে, লণ্ঠনের আলোয় চলে যাচ্ছে দু'খানা পা। চমকে তার ঘুম ভেঙে গেল অনেক বার।

যত বার ঘুম ভাঙে শাশ্বতীর, তত বারই চোখ খুলে সে দেখে অন্ধকার ঘরে আবছা মশারির চাল দেখা যাচ্ছে। ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে সে জোর করে চোখ বুজে ফেলে, শ্বাস বন্ধ করে থাকে অনেকক্ষণ। দিনের বেলা এই ঘরটা তার খুব চেনা, কিন্তু নিশুতি রাত্রে এই চেনা ঘরটা আর তাদের থাকে না। প্রেতাত্মাদের হাতে চলে যায়। মাঝরাতে হয়তো বা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে চোর, কিংবা ধর্মনষ্টকারী পুরুষেরা। তাই কোনও দিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে শাশ্বতী পরিষ্কার টের পায়— তাদের ঘরে এবং ঘরের বাইরে সর্বত্র একটা অপার্থিব অচেনা পরিবেশ। নিঃশব্দে কারা যেন ফাঁদ পাতছে, ভয় দেখানোর ষড়যন্ত্র করছে। তাই নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে শাশ্বতী, নিশ্বাসেরও শব্দ করে না, বুকের হৃৎপিণ্ড ধকধক শব্দ করতে থাকে বলে অস্বস্তি বোধ করে। নিজেকে জড়সড় করে কাঠ হয়ে শুয়ে থেকে সে তখন কারও জেগে থাকার একটু শব্দ শোনার জন্যে অপেক্ষা করে। কারও একটু গলাখাঁকারি, কিংবা কোনও বাড়ির দরজা খোলার শব্দ, কিংবা যদি কেউ রাস্তা দিয়ে জুতো মশমশিয়ে হেঁটে যায়— এ-রকম যে-কোনও খুব তুচ্ছ একটু শব্দের জন্য সে কান খাড়া করে থাকে। কেউ জেগে আছে টের পেলে নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রথম বার স্বপ্নটা দেখে শাশ্বতী তেমন কিছু বুঝতে পারেনি। ঘুম ভেঙে মাঝরাতের সেই ভয় হয়েছিল তার। হৈমন্তীর কাছাকাছি একটু সরে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রইল সে। একসঙ্গেই শোয় তারা, কিন্তু শাশ্বতী পারতপক্ষে কখনও হৈমন্তীকে ছোঁয় না। কেননা তার শরীর কাঁপে, শিরশির করে। তা ছাড়া হৈমন্তীর শরীরের একটা বিশ্রী ঘামার দোষ আছে। শীত-গ্রীষ্মে সবসময়েই ও ঘেমে তুকতুকে হয়ে থাকে। ছুঁতে একটু ঘেন্না করে শাশ্বতীর। আজও প্রথম বার শাশ্বতী ছোঁয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বার আবার সে একই স্বপ্ন দেখল— লণ্ঠনের আলোয় মেঠো পথে দু'খানা পা হেঁটে যাচ্ছে। এবার, ভীষণ চমকে উঠল শাশ্বতী। একই স্বপ্ন দু'বার কেউ দেখে নাকি! ঘুম ভেঙে তার ভীষণ অবাক লাগল। দু'হাত মুঠো করে, দাঁত চেপে, চোখ বন্ধ করে সে হৈমন্তীর খুব কাছাকাছি সরে গেল। মাঝরাতের যে-পৃথিবী সেটা তাদের নয়, মাঝরাতের পৃথিবী চলে যায় চোর কিংবা অসৎ মানুষ, অশরীরী আর স্বপ্নের রহস্যময়তার হাতে। শাশ্বতীর বালিশ গরম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পাশ ফিরে শুতে তার সাহস হল না। সে আস্তে আস্তে হৈমন্তীকে ঠেলা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করল। কিন্তু হৈমন্তীর ঘুম খুব গাঢ়। সে একটু বোকাসোকা ভালমানুষ, বুদ্ধি বেশি নেই বলেই বোধ হয় হৈমন্তী অত নিঃসাড়ে ঘুমোতে পারে। হৈমন্তী জাগল না। শাশ্বতী অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল। তারপর সে ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ একটু গানের রেশ শুনতে পেল। অনেক দূরে—তাদের কলোনির বাইরে কিংবা যাদবপুর থেকেও দূরে কোথাও একটা মাইক বাজছে। সম্ভবত রাতজাগা কোনও অনুষ্ঠান। খুবই ক্ষীণ সেই শব্দ— মশা ওড়ার শব্দের চেয়েও মৃদু। তবু অনেকটা স্বস্তি বোধ করে শাশ্বতী ঘুমিয়ে পড়ে। আবার একই স্বপ্ন দেখে সে। আবার ঘুম ভেঙে যায়। ভয় পায় সে। তারপর বহু চেষ্টায় মাইকের সেই আন্দাজি শব্দটা শুনবার চেষ্টা করে। তারপর ঘুমোয়।

ভোর রাত্রে পাতলা ঘুমের মধ্যে সে আবার সেই মেঠো পথ, লণ্ঠন আর রোগা দু'খানা পা দেখতে পেল। হঠাৎ তীব্র ভয়ে চমকে উঠল তার বুক। ছটফট করতে করতে শাশ্বতী হঠাৎ জেগে উঠেই টের পেল তার নিজের গলায় একটা অদ্ভুত গোঙানির শব্দ হচ্ছিল এতক্ষণ। সে সজাগ হয়ে সেই গোঙানির শেষ একটু শব্দ শুনতে পেল। ভীষণ অবাক হয়ে চোখ খুলে রইল শাশ্বতী। তার শরীর অবশ, চোখ-মুখে একটা পোড়া-পোড়া জ্বালার ভাব, তালু বুক শুকিয়ে আছে তেষ্টায়। সে টের পেল বাইরে অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে, ঘরের টিনের বেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাইরের একটা ফিকে সাদাটে ভাব চোখে পড়ে। টিনের চালের ওপর হয় শুকনো পাতা, নয়তো শিশিরের ফোঁটা পড়ার টুপ-টাপ শব্দ হয়। ভোর হয়ে আসছে— এখন পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছে অশরীরী প্রেতাত্মা কিংবা স্বপ্নের মানুষেরা। এখন আর ভয়ের কিছু নেই। তবু শাশ্বতীর বুকে তীব্র একটা ভয় বাঘের থাবার মতো বসে রইল। একই স্বপ্ন কেউ এত বার দেখে!

এ-স্বপ্নটার ভয়েই আর ঘুমোতে ইচ্ছে করল না তার। স্বপ্নটা এই ঘরের আনাচে-কানাচে অপেক্ষা করে ওত পেতে আছে। সে ঘুমোলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে আসবে। শাশ্বতী আস্তে আস্তে উঠে বসল। হৈমন্তীকে আর-একবার জাগানোর জন্য সে হাত বাড়িয়েছিল-- হঠাৎ সেই শিরশির শীতভাবে তার

শরীর কেঁপে ওঠে। আর হঠাৎ মনে পড়ে যায়— গত কাল— গত কাল বিকেলে সে একটা মিথ্যে কথা বলেছিল। আদিত্যকে— তার গা ছুঁয়ে।

ভোর রাত্রির শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে স্থির হয়ে একটু বসে রইল শাশ্বতী। হৈমন্তীর শরীরের দিকে বাড়ানো হাতখানা টেনে আনল। তারপর দু'হাত কোলের ওপর রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে চোখ বুজল। কথাটা সত্য ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কথাটা সে ইচ্ছে করে বলেনি। কাল বিকেলে হঠাৎ আদিত্য পাগল না হলে ললিতের মুখ তার মনেই পড়ত না। পড়লেও সে আস্তে আস্তে ক্রমশ ভুলে যেত সে ললিতকে কেমন দেখেছিল! কিন্তু আদিত্য ভুলতে দিল না, মনে পড়িয়ে দিল। আসলে মুখোমুখি ললিতকে সে কেমন দেখেছিল কে জানে! কিন্তু পরে যখন আদিত্য তাকে নানা কথার মার দিয়ে আস্তে আস্তে একটা কোণে ঠেলে নিয়ে গেল, যখন বারবার জিজ্ঞেস করল সে কেমন দেখেছিল ললিতকে— তখন— হঠাৎ তখনই শাশ্বতীর মনে হয়েছিল যে, সে ললিতকে সুন্দর দেখেছে— সন্ত-যোগীর মতো সুন্দর— অপার্থিব সেই রূপ। আশ্চর্য, আদিত্য তাকে খোঁচা না দিলে এ-কথাটা তার মনে পড়ত না! আর যখনই এই অতি সত্য কথাটা তার মনে এসেছে— ঠিক তখনই সে আদিত্যর গা ছুঁয়ে বলেছে যে, সে ললিতকে একটুও সুন্দর দেখেনি।

মিথ্যে কথা— সে মিথ্যে কথা বলেছিল।

কেউ ছুঁলে শরীর কেঁপে ওঠার যে বিশ্রী একটা অনুভূতি শাশ্বতীর ছিল এত কাল, সেটা আজকাল কমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। আদিত্যর সঙ্গে মিশবার পরে সেটা আরও কমে গিয়েছিল। শাশ্বতী বুঝতে পারছিল, এবার তাকে শরীর দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কাল সন্ধেবেলায় যখন আদিত্য তাকে যাদবপুরের বাসে তুলে দিচ্ছে— তখন সেই এক-চাপ ভিড়ের বাসে ওঠার সময় অচেনা লোকজনের শরীরে লেগে ভয়ংকর শিউরে উঠছিল তার শরীর। সে টের পাচ্ছিল তার প্রতিটি রোমকূপে খর বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। আবার আগেকার মতোই স্পর্শকাতর হয়ে যাচ্ছে সে। সারাটা সন্ধে তার চোখ-মুখ ভেজা-ভেজা ছিল, বুকে ঠান্ডা-বসার মতো একটা কান্নার ভাব ভার হয়ে ছিল। সন্ধেবেলা সে বাড়িতে ফিরে কয়েক বার বই খুলে অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করেছে, না পেরে হাজরাদের বড় মেয়ে শিবানীর সঙ্গে রাস্তায় পায়চারি করে গল্প করেছে অনেকক্ষণ, রাত্রে ভাল করে খেতে পারেনি— যদিও তার প্রিয় সোরা-মাছ রান্না হয়েছিল কাল, তারপর শোয়ার সময় রোজ যা করে শাশ্বতী, বালিশে আঙুল দিয়ে ঠাকুরদেবতার নাম লেখা-সেটা লিখতেও ভুলে গিয়েছিল।

সেই কারণেই সে কি দুঃস্বপ্ন দেখেছে! একই স্বপ্ন দেখেছে বারবার।

না। বোধ হয় তা নয়। ঠাকুরদেবতার নাম লিখেও অনেক বার ভয়ের স্বপ্ন দেখেছে শাশ্বতী। তা ছাড়া, এ-স্বপ্ন বোধহয় ভয়ের স্বপ্ন ছিল না। মেঠো পথে লণ্ঠন হাতে একটা লোক চলে যাচ্ছে— তার শরীর দেখা যায় না। কে লোকটা! কোথায়ই বা যাচ্ছে! কিছুই বোঝা যায় না। গ্রাম-দেশ কখনও দেখেনি শাশ্বতী। তবু তার স্বপ্নে কোথা থেকে এল ওই মেঠো পথ! না, স্বপ্নটা ভয়ের ছিল না। বরং রহস্যময়। বারবার না দেখলে এই স্বপ্ন তার মনেও থাকত না। তবে সে কেন বারবার দেখেছিল?

শাশ্বতী স্থির হয়ে বসে চেয়ে রইল। তার স্পর্শকাতর শরীরে শিউরোনো রোমকূপ, গায়ে জ্বরজ্বর ভাব, তালু-গলা শুকিয়ে আছে তেষ্টায়, চোখ জ্বলছে, পেট ডাকছে কলকল করে— তার রাতের খাবার হজম হয়নি। তবু শারীরিক অনুভূতিগুলো সে সঠিক টের পাচ্ছিল না। তার মনে পড়ছিল যে, গত কাল সে আদিত্যকে ছুঁয়ে একটা ভীষণ মিথ্যে কথা বলেছিল, আর সারা রাত ধরে সে একটা অচেনা-অজানা লোকের দু'খানা পা স্বপ্নে দেখেছে। মনে মনে কোনওটার সঙ্গে কোনওটাই তার মিলছিল না। কেবল মনে হয়, তার মনের গভীরে কোথাও এক অতি রহস্যময় সূত্রে সেই মিথ্যে কথাটার সঙ্গে স্বপ্নে-দেখা লোকটার একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে।

নিজেকে সামলাতে পারছিল না শাশ্বতী। খুব অস্থির লাগছিল তার। ঘরের মধ্যে ভোর রাত্রির এক অদ্ভুত আলো-আঁধারি। মশারির সাদা গায়ে অস্পষ্ট সব ছায়া। বাইরে কখনও কখনও ভোরের কাক ডাকছে। এখনও তেমন আলো ফোটেনি বলে পাখিরা বাসা ছাড়েনি। নানা অস্পষ্ট চিন্তা, স্মৃতি, স্বপ্ন তার মাথার মধ্যে ঘুলিয়ে উঠছিল। অকারণ। আর, একটা ভয়।

সকালের দিকেই ঘুম শাশ্বতীর প্রিয়। কিন্তু ভয়ে সে ঘুমোতে পারল না। চুপচাপ বসে রইল।

অনেকক্ষণ। তারপর পাশের ঘরের দরজায় ছিটকিনি আর আড়কাঠ খোলার শব্দ শুনল সে। মা।

এত সকালে সে কোনও দিন ওঠে না। আজ উঠে বাইরে এসে ভোরবেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। এখন শরৎকাল, সকালের দিকে সামান্য কুয়াশা হয়। একটু শীত করে। উঠোনজোড়া বাগান ভিজে আছে— সতেজ দেখাচ্ছে গাছপালা। ঝাঁকড়া জামরুল গাছটার পেশি-ফোলানো পুরুষ চেহারা-- তার প্রকাণ্ড গা বেয়ে নেমেছে শিশিরের জল। অল্প কুয়াশার একটু আবছা তার ওপরে ডালপালা। রাস্তার ও-পাশে বাড়িগুলো দিনের বেলা রোদে যেমন দেখায় তেমন দেখাচ্ছে না এখন। পাতলা কুয়াশায় ডুবে যেন জলের তলাকার দৃশ্যের মতো দেখায়। কুয়াশার মধ্যে ছায়ার মতো ওড়াউড়ি করছে কাক।

শাশ্বতী দেখে উঠোনের এক ধারে বসে মা তোলা-উনুনের ছাই বের করছে। মা'র পরেই ঘুম থেকে ওঠে হৈমন্তী। মা তাকে না দেখেই হৈমন্তী বলে ভুল করে বলে, হৈম, সতীটার গায়ে চাপা আছে কি না দেখে আয়। আজকাল শীত পড়ে।

শাশ্বতী হাসে, উত্তর দেয় না। উঠোনে নামতেই ঠান্ডা মাটির শীত শরীর বেয়ে ওঠে। শিউরে ওঠে শরীর। মায়ের বুকের পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে উনুনের ছাই তুলে আঙুলে দাঁত মাজতে মাজতে শাশ্বতী তাদের বাগানটার কাছে চলে আসে। একটুক্ষণ গাছপালা দেখে।

হঠাৎ এতক্ষণ পর মা বলে ওঠে, ও মা! তুই?

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে হাসে, উঠে পড়লাম।

এত সকালে! পেট গরম হয়নি তো? রাতে ঘুমিয়েছিস?

শাশ্বতী মাথা নাড়ে, না, কিছু না। এমনিই উঠলাম।

আর কথা হয় না। মা একমনে ঘুঁটে ভাঙে। শাশ্বতী দাঁত মাজতে মাজতে বেড়ায়। বারান্দার ওপর বেড়া দেওয়া একটা খুপরি। কালীনাথ ওটাতে থাকে। জানালার বেড়ার ঝাঁপটা তোলা। সেখান দিয়ে এক বার উঁকি মেরে শাশ্বতী দেখল— কিছুই দেখা যায় না। কেবল মশারিটা। আজ অফিসে কালীনাথের সঙ্গে আদিত্যর দেখা হবে। আদিত্য কালীনাথকে কিছু বলবে কি? বলার মতো কিছুই ঘটেনি। তবু হয়তো আদিত্য বলবে, শাশ্বতীকে নিয়ে ললিতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার কী রকম সব অনুভূতি হয়েছিল। আদিত্য সবাইকে সব কথা বলে দেয়।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজছিল সে, বে-খেয়ালে। মা বারান্দা ঝাঁট দিতে দিতে ঝাঁটাটা বারান্দার কোণে আছড়ে বলল, দাঁতগুলো ক্ষয় করে ফেলবি।

শাশ্বতীর খেয়াল হল সে অনেকক্ষণ দাঁত মাজছে। তাদের বাড়ির পিছন দিকে পুকুর। যাওয়ার রাস্তাটা জুড়ে গত বর্ষায় ঘন হয়ে উঠেছে কচুবন— যাওয়া-আসার সময়ে গায়ে লাগে। একটা পাতা গায়ে লাগতেই টপ করে এক ফোঁটা শিশিরের জল তার হাত বেয়ে নেমে যায়। শিরশির করে ওঠে শরীর। কাঁটা দেয়। আর জন্মে তুমি শজারু ছিলে, সতী নিজেকেই সে-কথা বলে আর হাসে।

পিছনে পুকুর পর্যন্ত তাদের বাড়ির সীমানা। অনেকটা জায়গা। আটচল্লিশ সালের গোড়ায় এসে বাবা এ-জায়গাটার দখল নিয়েছিল। তখন বাবা ছিল বিষয়ী লোক। কোন জমিটা সরেস, কোনটা নীরেস তা সঠিক বুঝত। বাবা পুকুরের গা ঘেঁষে, দু'পাশে রাস্তা হওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখে তবেই দখল করেছিল জায়গা। সাত-আট কাঠা জমি। বুক-সমান উঁচু ঘেরাপাঁচিলে ঘিরে নিয়েছিল জমি। তখন রিফিউজি কলোনিতে জমির কাড়াকাড়ি চলছে— কে কোথায় বসে ঠিক নেই। বাবা ঠিক বসেছিল। এখনও এই কলোনিতে তাদের বাড়িটাই সবচেয়ে সুন্দর জায়গায়। তাদের জমিতে ছ'টা নারকেল গাছ, পিছনে পুকুর, সামনে বাগান, দু'পাশে রাস্তা। যখন এই বাড়িটার জন্ম হচ্ছে তখনই জন্মেছিল শাশ্বতী— এই বাড়িতেই। বাড়ির পিছনে এই কচুবনের মধ্যেই গোয়ালঘরের মতো একটা আঁতুড়ঘর, তার জন্মের তিন-চার মাস আগে থেকেই তুলে রেখেছিল তার বিষয়ী এবং সতর্ক বাবা। জন্মের আট-নয় বছর পরেও ঘরটা দেখেছে শাশ্বতী— সেই ঘরটা তখন সত্যিই গোয়ালঘর। তার ছোট ভাই বাচ্চু জন্মায় শাশ্বতীর জন্মের প্রায় দশ বছর পর। মা-বাবার সেই বয়সে সন্তান হওয়াটা বেমানান— বাচ্চু হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চু হওয়ার সময়ে আর আঁতুড়ঘর তৈরি হয়নি— সে হয়েছিল শোয়ার ঘরেই। কারণ, তখন আর ঠাকুমা বেঁচে নেই, বাবা-মায়েরও নেই দেশগাঁয়ের সেই শুচিবাই। তারা অনেক পালটে গিয়েছিল। এখন আর সেই গোয়ালঘরটা নেই, গোরুটা মরে গেছে কবে। গাছগাছালি কেটে তৈরি

হয়েছিল ঘরটা— আবার সব গাছগাছালিতে ঢেকে গেছে। যেমন উঠোনে যাবার সেই গুহার মতো গর্তটার জায়গায় আবার তকতক করছে উঠোন।

মুখ ধুয়ে পুকুর থেকে উঠে আসবার সময়ে শাশ্বতী ঘাটের পথটুকু দেখল। স্বপ্নের সেই মেঠো পথের সঙ্গে এই পথটুকুর কোনও মিল নেই। সে-পথটা— সেই লণ্ঠনের আলোয় যতটুকু দেখেছিল শাশ্বতী— দিগন্তজোড়া মাঠের ভিতর দিয়ে গেছে। সেটা অনেক দূরের পথ। আশ্চর্য, কোথা থেকে কোথায় যে যাচ্ছিল লোকটা। তার মুখ দেখেনি শাশ্বতী। যদি দেখত, তবে কি চিনতে পারত শাশ্বতী! সে কি চেনা লোক?

স্বপ্নটার কথা মনে পড়তেই সুন্দর ভোরবেলায় আবার তার মন ভারী হয়ে গেল।

উঠোনে ঢুকবার মুখে শাশ্বতী দেখল সামনেই একটা বাধা। বাচ্চু ঘুমচোখে উঠে এসে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে পথ জুড়ে পেচ্ছাব করছে।

শাশ্বতী বলল, অ্যাই!

ঘুম-জড়ানো বোকা চোখে বাচ্চু অবাক হয়ে চেয়ে আছে। ওর হাঁ-করা মুখ দিয়ে ভাপ বেরোচ্ছে। ওর বয়সের কথা কেউ খেয়ালই করে না। সকলের অনেক পরে জন্মেছে বলে সকলেই ওকে শিশুর মতোই দেখে। আদরে আদরে ও শিশুই রয়ে গেছে এখনও। খুব কচি মুখচোখ— বোধবুদ্ধি তেমন ফোটেনি।

শাশ্বতী দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। তারপর হেসে বলল, এই বাচ্চু, দাঁড়া, দেখাচ্ছি! এই ধরলাম...

সে হাত বাড়াতেই বাচ্চু পা মাটিতে ঠুকে চেঁচায়, অ মা!

মা বারান্দা থেকে বলে, ঠান্ডু, ওকে ছেড়ে দে।

শাশ্বতী বলে, তুই ঘাটের রাস্তায় পেচ্ছাব করেছিস কেন?

বাচ্চু প্যান্ট নামিয়ে পিছিয়ে গিয়ে হাসে, ইল্লি...

উঠোনে ঢুকতে ঢুকতে শাশ্বতী মনে মনে হিসেব কবল। করে অবাক হয়ে দেখল, বাচ্চুর বয়স এখন দশের কাছাকাছি। লীলাবতীর ঘটনা যখন ঘটে তখন বাচ্চু খুব ছোট। সে ঘটনাটা আট কি নয় বছরের পুরনো হয়ে গেল। লীলাবতীর মুখ আর মনেই পড়ে না, বাচ্চু লীলাবতীকে ভাল করে দেখেইনি। বাচ্চুর বয়স এখন দশের কাছাকাছি ভেবে একটু অবাক হয় শাশ্বতী। না, আর বাচ্চুর সঙ্গে তার ও-রকম খেলা করা উচিত না।

উঠোনে বাবা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে খুরপি। বাবা এখন বাগানে ঢুকবে, তারপর সারা দিন ঘুরে-ফিরে বাগানেই থেকে যাবে। গাছগাছালির কাছাকাছি। এখন গাছপালা ভালবাসে বাবা. যত্নে বাগান করে। কিন্তু একটা সময়ে, বাবা যখন বিষয়ী লোক ছিল তখন বাগানের জায়গায় বাড়ি করে ভাড়া দেওয়ার কথা ভেবেছিল বাবা। কিন্তু রিফিউজির দখল করা জমির ওপর গভর্নমেন্ট ছাদওয়ালা বাড়ি করতে দেয়নি বলে সেটা হয়নি। জমিটায় বাগান করেছিল লীলাবতী— ওর হাতের কামিনী আর শিউলি গাছ এখনও রয়ে গেছে। মা'র ঠাকুর পুজোর ফুল দেয়। বাবা তার গর্ত থেকে উঠে আসবার পর মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিল খুব। গাছগাছালির খেলায় মেতে রইল। এখন বাবা গাছেদের সঙ্গে কথা বলে, সারা দিন ঘোরে তাদের কাছাকাছি। বাবার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সেই আমলকী গাছটা শেষ পর্যন্ত আর বেরোয়নি। কিন্তু বাবার সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে খানিকটা বিশ্বাস করে কিছু কৌতূহলী লোক অনেক দিন তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করেছে। বাবার মাথা থেকে গাছ বেরোয়নি দেখে হতাশ হয়েছে তারা। কিন্তু শাশ্বতী দেখে, বাবার শরীর গাছ হয়ে না গেলেও তার মধ্যে গাছগাছালির একটা স্বভাব এসে গেছে। নির্বিকার, নিরুত্তাপ, আবেগ নেই এতটুকু। সারা দিন প্রায় বোবা হয়ে থাকে বাবা। অনেকেই হয়তো ভাবে, লীলাবতীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলেই বাবা বাগানটা নিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু শাশ্বতী জানে যে, তা নয়। কারও জন্যই আর তেমন কোনও বোধ নেই বাবার। কতকাল 'মলু' ডাকটা আর শোনেনি শাশ্বতী! আসলে, বাবা সেই গুহার গর্তে বসে গাছেদের মতোই নির্বিকার হতে চেয়েছিল বোধ হয়। সেই চাওয়াটা পূর্ণ হয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে পাগলামি দেখা দেয়। কিছু দিন পর আবার ঠিক হয়ে যায়। বাবা গাছেদের কাছে ফিরে যায়।

একমাত্র বাচ্চুর সঙ্গে ছাড়া বাবা স্বেচ্ছায় কারও সঙ্গেই কথা বলে না। কিন্তু বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস

করলে মাঝে মাঝে উত্তর পাওয়া যায়। অদ্ভুত সব উত্তর। লোকে এখনও বিশ্বাস করে বাবার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যায়। হয়তো যায়। বাগানের বেড়ার পাশে পথের ওপর দাঁড়িয়ে এখনও অনেক লোক বাবার সঙ্গে কথা বলে, পরামর্শ চায়। অধিকাংশ সময়েই নীরব থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে বাবা উত্তর দেয়। লোকে বলে, সে-সব উত্তর মিলে যায়। কিন্তু শাশ্বতীরা জানে যে, বাবার কোনও যোগসিদ্ধ নেই, বাবা সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল। মা'ও তাই জানে। তবু কখনও-সখনও শাশ্বতী লক্ষ করেছে মুশকিলে পড়লে মা বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, সমস্যার কথা বলে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী বলো? তাদের লুকিয়ে জিজ্ঞেস করে মা, তবু তারা দেখেছে ব্যাপারটা।

বাবা তার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাবা এখন বাচ্চুর জন্য অপেক্ষা করছে। বাচ্চু মুখ ধুচ্ছে বারান্দার এক কোণে। মুখ ধুয়ে প্যান্টের দু'পকেটে মুড়ি আর ছোট্ট কাস্তে কিংবা কোদাল হাতে বাচ্চু এসে সমবয়স্ক বন্ধুর মতো বলবে, চলো বাবা। তারপর দু'জনে নিঃশব্দে বাগানে ঢুকে যাবে। সাড়ে সাতটা-আটটায় উঠবে কালীনাথ, তখন মাটিমাখা হাত ধুয়ে বাচ্চু এসে পড়তে বসবে।

বাবার আশেপাশে উঠোনে একটু ঘুরে বেড়াল শাশ্বতী। আঁচলে মুখের জল মুছে নিল। বাবা কি সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে? শাশ্বতীর বিশ্বাস হয় না। তবু তার ইচ্ছে করে বাবাকে দু'-একটা প্রশ্ন করতে। কী উত্তর দেয় দেখাই যাক না।

কিন্তু করি করি করেও ইতস্তত করে শাশ্বতী। সংকোচ হতে থাকে। হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই দেখে বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে-চোখে কিছুই ছিল না, তবু হঠাৎ তার মনে হল এক্ষুনি তার কী একটা গোপন কথা বাবা জেনে যাবে।

শাশ্বতী বারান্দায় উঠে এল। বাচ্চু তার যন্ত্রপাতি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মুখোমুখি হতেই তাকে মুখ ভেঙিয়ে দৌড়ে নেমে গেল বাচ্চু। বারান্দা থেকে শাশ্বতী দেখল বাগানের বেড়ার গেট খুলে আগে আগে বাচ্চু, আর তার পিছনে বাবা ঢুকে যাচ্ছে। গেট বন্ধ করার জন্য বাবা এক বার পিছু ফিরল। ফিরেই সোজা বারান্দায় তার চোখে চোখ রাখল। শান্ত চোখে বোধহয় সদ্য ওঠা সূর্যের আলোর একটু ঝিলিক দেখা গেল। কিন্তু শাশ্বতীর মনে হল— বাবার চোখ সকৌতুকে হেসে উঠছে। 'মানুষের দুর্বলতাগুলি আমি জানি।' বুক কেঁপে উঠল তার। সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাবা কি সত্যিই কিছু জানে? না কি সব ভুয়ো— ফক্কিকারি? তবু তার ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করতে রাত্রের দেখা স্বপ্নটার কথা, কিংবা আদিত্য আর ললিতের কথা, কিংবা তার নিজেরই কথা। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভয় করে তার।

ঠিকে ঝি আজ কাজে আসেনি। একটু বেলা পর্যন্ত দেখে মা আর হৈমন্তী এঁটো বাসন কোসন নিয়ে ঘাটে যাচ্ছিল। পড়ার টেবিলে বসে খোলা বইয়ের সামনে জানালা দিয়ে বাইরে অন্যমনে তাকিয়ে ছিল শাশ্বতী। মাকে ঘাটে যেতে দেখে উঠে এসে বাসনগুলো নিয়ে বলল, আমি আর মেজদি সেরে দিচ্ছি, তুমি রান্নায় যাও।

শাশ্বতী পড়াশুনো করে বলে মা কখনও তাকে ঘরের কাজে ডাকে না। হৈমন্তী পড়াশুনোয় ভাল ছিল না, স্কুল ফাইনালের পর আর পড়া হয়নি। হৈমন্তী একটু বোকাও। বাড়ির কাজে সেই থাকে মায়ের সঙ্গে। কাজেই শাশ্বতী আর এগোয় না। কিন্তু আজ তার অন্যমনস্ক এবং কোনও কাজে ব্যস্ত থাকতে ইচ্ছে করছিল।

ঘাটে হৈমন্তীর মুখোমুখি বাসন মাজতে বসে সে হঠাৎ আচমকা জিজ্ঞেস করল, তুই কখনও দুঃস্বপ্ন দেখিস?

হৈমন্তী বলল, দেখি।

কীসের?

অনেক রকম।

ভূতের?

না। আমি দেখি সাপের।

শাশ্বতী ঠোঁট ওলটায়, দুর! সাপের স্বপ্নে জ্ঞাতি বাড়ে। তাতে তোর কী?

হৈমন্তী একটু ভেবে বলে, কী জানি?

আমি কাল একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখেছি।

কী?

একটা লোক লণ্ঠন হাতে হেঁটে যাচ্ছে।

বলতে গিয়ে শাশ্বতী বুঝল, স্বপ্নটা তার কাছে যতখানি ভয়ের, অন্যের কাছে ততটা নয়। তাই সে আর বলল না।

হৈমন্তী হাসল, তোর মাথায় পোকা। একটা লোক লণ্ঠন হাতে হেঁটে যাচ্ছে, তাতে ভয়ের কী?

শাশ্বতী চুপ করে অনেকক্ষণ একটানা বাসন মাজল।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল, কাল তোরা কোথায় গিয়েছিলি?

শাশ্বতী হৈমন্তীকে আদিত্যর সব খবর দেয়। কোথায় গিয়েছিল, কোন রেস্টুরেন্টে কী খেয়েছিল, কিংবা কোন হল-এ কী সিনেমা দেখেছে— সব। হৈমন্তী খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। তাকে উৎসাহ দেয়। খুবই সরল হৈমন্তী। শাশ্বতীর মাঝে মাঝে মনে হয়, হৈমন্তী তার দিদি নয়, ছোট বোন। সরল, বোকা, ভাল মেয়েটা।

শাশ্বতী হেসে বলল, ওর এক বন্ধুর অসুখ, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

কলেজ পালিয়ে?

হুঁ।

কেমন দেখলি! কী অসুখ?

ক্যানসার।

মেসোমশাইয়ের মতো?

মেসোমশাইয়ের তো শ্বাসনালীতে ছিল। এরটা পেটে।

বাঁচবে?

শাশ্বতী ঠোঁট ওলটায়, কী জানি?

কেমন দেখলি?

চেহারা ভালই। অসুখ বলে মনেই হয় না।

তা হলে বাঁচবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে হৈমন্তী।

শাশ্বতী হাসে। তারপর বলে, লোকটা খুব চালাক। আমি ভদ্রলোককে সাহস দেওয়ার জন্য মেসোমশাইয়ের কথা বললাম, তারপর বললাম, দেখবেন, আপনি ভাল হয়ে যাবেন। উত্তরে একটু ঘুরিয়ে লোকটা বলল, আপনারা তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলুন, আমি যেন দেখে যেতে পারি।

আহা রে। হৈমন্তী বলল, কষ্ট হয়। কত বয়স?

বেশি না। ত্রিশ-বাত্রিশ, কিংবা আর-একটু বেশি।

আদিত্যর মতো?

হ্যাঁ।

হৈমন্তী কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে, তারপর খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে, আদিত্য বিয়ের কথা কিছু বলে না?

একটু অন্যমনস্ক ছিল শাশ্বতী, এই কথায় চমকে উঠে হেসে ফেলল। তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, বলে। যখন বাই ওঠে তখন বলে—এক্ষুনি চলো রেজিস্ট্রি করে আসি। আবার কখনও কখনও বিয়ের কথা ভুলে যায়।

তোরা রেজিস্ট্রি করবি?

করব।

কেন?

শাশ্বতী একটু ভেবে বলল, ওর সঙ্গে আমাদের জাত মেলে না, সামাজিকভাবে করলে মা-বাবা-দাদার নিন্দে হবে।

বলতে বলতে হঠাৎ মনে মনে শিউরে ওঠে শাশ্বতী। গত কাল বিকেলে আদিত্য জাতের কথা

বলেছিল। সে জাত আলাদা। অন্য রকমের এক জাতিভেদ। আদিত্য তাকে বুঝিয়েছিল— কিন্তু সে ভাল বোঝেনি। কিন্তু এখন হৈমন্তীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার মনে হল— সে নিজেও অনেক দিন ধরেই জানে যে, আদিত্যর সঙ্গে তার জাত মেলে না।

হৈমন্তী বলল, দাদা তো ওর সঙ্গে আমারও বিয়ে দিতে চেয়েছিল, সামাজিকভাবেই। তোরা রেজিস্ট্রি করবি কেন?

করলে কী হয়?

হৈমন্তী বিষণ্ণ মুখে বলে,আমাদের বাড়ির দু'টো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, অথচ আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না, আমরা সাজলাম না— দূর, ভাবতে ভাল লাগে না।

শাশ্বতী হাসে, আমার বোধ হয় বউভাত-টউভাত হবে না।

হৈমন্তী মৃদু গলায় বলে, আদিত্যর বাপ-মা রাজি হবে না, না?

শাশ্বতী ঠোঁট ওলটায়, কী জানি! মনে তো হয় না।

হৈমন্তী বড় করে শ্বাস ছাড়ে হঠাৎ। তারপর আচমকা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে, পুরুষমানুষেরা কেমন হয় বল তো!

শাশ্বতী স্থির চোখে একটু হৈমন্তীকে দেখে। তারপর উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্ক থাকে একটু। আশ্চর্য যে এই প্রশ্নটা তারও মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষমানুষেরা কেমন হয়?

পুকুরের ও-পারে হাজরাদের বাড়ি। ঘাট থেকে শিবানী ডাকল।

সতী!

শাশ্বতী মুখ তুলে হাসল, কী রে!

বাসন মাজছিস! ঝি আসেনি?

না।

কলেজ যাচ্ছিস?

যাব।

আমি যাচ্ছি না।

কেন?

জামাইবাবু এসেছে। আজ ম্যাটিনি শো-তে সিনেমায় যাব।

কী ছবি?

কী যেন...বলে হাসল, শক্ত নাম। ভুলে গেছি। হিন্দি। দেবানন্দ ওয়াহিদা। তুই যাবি? টিকিট আছে।

না রে।

শিবানী হাসল, জানতাম, যাবি না। কলেজের পর কোথায় যাচ্ছিস?

কোথাও না।

ইস। শিবানী হাসল, জানি।

শিবানী ঘাট থেকে উঠে গেল। হৈমন্তী গুনগুন করে শাশ্বতীর কাছে শিবানীর নিন্দে করছিল, বেহায়া, পাড়া-বেড়ানি, আড্ডাবাজ। শাশ্বতী মন দিয়ে শুনল না। কেবল এক বার হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলল, আমাদের কেউ প্রশংসা করে না।

হৈমন্তী চুপ করে গেল।

কথাটা বলেই শাশ্বতীর মনে পড়ল যে, এখনও তাদের পরিবারের নিন্দের কথা আদিত্য জানে না। লীলাবতীর ঘটনা তাকে কেউ বলেনি। জানলে কী করবে আদিত্য? ভেবে পেল না শাশ্বতী। হয়তো হো হো করে হেসে বলবে, দূর। ও কিছু না। কিংবা হয়তো গম্ভীর হয়ে বলবে, এ-কথা এত দিন বলোনি কেন? দু'টোর যে-কোনওটাই করতে পারে আদিত্য। তার সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিল। শাশ্বতীর মনে হয় অনেক আগেই তার আদিত্যকে লীলাবতীর ঘটনাটার কথা বলে দেওয়া উচিত ছিল। অন্য কারও কাছ থেকে শোনার আগে তার কাছ থেকে শুনলেই ভাল হত। কেন বলেনি সে?

সারা সকাল হৈমন্তী আর মা'র সঙ্গে ঘরের কাজ করল শাশ্বতী, মশারি তুলে বিছানা ঝাড়ল, ঘর মুছল, ঠাকুর পুজোর জল আনল পুকুর থেকে। বই নিয়েও বসল একটু। পড়া হল না।

পুরুষমানুষেরা কেমন হয়!

কালীনাথ ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে বসে চা খাচ্ছে। তার সামনে মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসেছে বাচ্চু। রান্নাঘরে হৈমন্তী। ঠাকুরঘরে মা। বাবা বাগানে একা।

শাশ্বতী পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠোনে এল। কয়েক পা এদিক-ওদিক হাঁটল। তারপর আস্তে বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢুকে গেল।

ঘন গাছপালার একটা আলাদা জগতের মধ্যে চলে এল সে। ভেরেন্ডাগাছের উঁচু বেড়ার আড়ালে তাদের বাগান। শান্ত। নিস্তব্ধ। ঠান্ডা। হাঁটতে গেলে গাছপালা গায়ে লাগে। সরসর শব্দ হয়। শিউরে ওঠে শাশ্বতীর শরীর। এখানে ততখানি আলো নেই। একটু ঝুপসি আলো-আঁধারি। এর মধ্যে বাবাকে প্রথম দেখতে পেল না শাশ্বতী। অনেকটা বড় তাদের বাগান। সে পায়ে পায়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। বাচ্চুর তৈরি করা নুড়িপাথরের কৃত্রিম পাহাড়, তার পাশ দিয়েই গেছে আঁকাবাঁকা লাল সুরকির ক্ষুদে রাস্তা, রাস্তার মাঝখানে একটা চত্বরে পিচবোর্ডের তৈরি ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাফিক পুলিশটার গায়ে একটা সাদা কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো, তাতে লেখা— বাবা ওই দিকে। নিচু হয়ে লেখাটা পড়ে শাশ্বতী হাসে, ট্রাফিক পুলিশটার ডান হাত যে-দিকে দেখিয়ে দিচ্ছে সে দিকে তাকিয়ে সত্যিই বাবাকে দেখল শাশ্বতী। গোলাপের ডাল মাটিতে পুঁতে তার ডগায় গোবরের ঢিবি লাগাচ্ছে বাবা। ট্রাফিক পুলিশটার দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসে শাশ্বতী। এটা বাচ্চুর বুদ্ধি। বাবা যখন যে-দিকে থাকে সে-দিকে ওটাকে ঘুরিয়ে রাখে। কিংবা হয়তো বাবাই ঘুরিয়ে দেয়, বাচ্চুর বাবাকে খুঁজতে সুবিধে হবে বলে।

গত তিন-চার মাস আর বাগানে আসেনি শাশ্বতী। গত বর্ষায় জঙ্গল বেড়ে গেছে। বাবার কাছে না গিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরল! বাবা তাকে লক্ষ করল না। তারপর ধীর পায়ে আস্তে সে বাবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। অনেক—অনেক দিন হয় সে বাবার সঙ্গে কথা বলেনি। তার লজ্জা করছিল।

তারপর ঝুপ করে মাটিতে বসল সে। বলল, বাবা, এই সময়ে কেউ গোলাপের ডাল লাগায়? বর্ষাকালে লাগাতে হয়।

বাবা উত্তর দিল না। কিন্তু খুব ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে শান্ত চোখে তাকে এক বার দেখে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল।

শাশ্বতীর বুক ঢিবঢিব করে। বাবা কি বুঝতে পারছে যে সে আসল কথা বলার আগে একটা ভূমিকা করছে?

অনেকক্ষণ পর বাবা হঠাৎ তার প্রশ্নের উত্তর দিল। খুব আস্তে গলায় বলল, লাগানো যায়। একটু বেশি জল দিতে হয়।

একটু সাহস পায় শাশ্বতী। বলে, অনেক আগাছা হয়েছে। পরিষ্কার করো না কেন?

বাবা চুপ করে কাজ করতে থাকে। উত্তর দেয় না।

অস্বস্তিতে মাটিতে একটু পা ঘষে শাশ্বতী। জামরুল গাছটার ডালে ছোট্ট মৌচাক—মৌমাছি উড়ছে। ঘাসের ওপর দিয়ে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে হলুদ প্রজাপতি। পোকামাকড়ের শব্দ হয়। ঝিঁঝি ডাকে। শান্ত, সুন্দর, ঠান্ডা ছায়ায় ঝিম মেরে আছে বাগানটা। একটু দূর থেকে বাচ্চুর ট্রাফিক পুলিশ তার দিকেই আঙুল উঁচিয়ে আছে।

শাশ্বতী হঠাৎ শান্ত গলায় বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা, আমার কী হবে বলো তো! আমার ভবিষ্যৎ কী?

বাবা উত্তর দেয় না। কেবল এক বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে শান্ত চোখে দেখে। চোখ ফিরিয়ে নেয়। শাশ্বতীর বুক কাঁপে। ভয় করে।

কাল রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, শাশ্বতী বলল।

বাবা কিছু জিজ্ঞেস করল না।

তবু শাশ্বতী জোর করে বলল, একটা লোক লণ্ঠন হাতে মেঠো পথ দিয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটার মুখ দেখিনি, কিন্তু মনে হয় মুখ দেখলে আমি চিনতে পারতাম। বলে শাশ্বতী থামে, তারপর জিজ্ঞেস করে, লোকটা কে বলো তো!

বাবা উত্তর দেয় না। খুরপির ধার দিয়ে হাতের গোবর চাঁচে। হাতে মাটি মাখতে থাকে। ঘাসের ওপর হাত ঘসে।

শাশ্বতী বাবার দিকে একটু চেয়ে থাকে। তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কাল আদিত্য আমাকে সন্দেহ করেছিল কেন? আমি ললিতকে সুন্দর দেখেছিলাম, কেন? আমি কাল একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম, কেন?

কিন্তু তার লজ্জা করল। বাবা সেই আগেকার মতো বাবা আর নেই। গাছের মতোই উদাসীন। ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু শাশ্বতী পারল না। তবু অনেকক্ষণ বসে রইল শাশ্বতী। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে হাসল।

দূর! বাবা সত্যিই কিছু জানে না। বাবা পাগল।

সে একটা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

চলে আসছিল শাশ্বতী। হঠাৎ শুনল বাবা খুব মৃদু স্বরে বলল, সাবধানে থেকো। পড়ে যেয়ো না।

সে চমকে ঘুরে দাঁড়াল। বাবা গোলাপ-ডালটার সামনে নিচু হয়ে বসে আছে, মাটির দিকে চোখ। না, শাশ্বতীকে নয়। বোধ হয় গাছটাকে বলছে বাবা। শাশ্বতী লক্ষ করে গোবরের ঢিবির ভারে গাছটা নুয়ে পড়েছে মাটির দিকে। হ্যাঁ, গাছটাকেই সাবধান করছে বাবা—সাবধানে থেকো। পড়ে যেয়ো না।

শাশ্বতী মুখ ঘুরিয়ে নিল। সে বাচ্চুর ট্রাফিক পুলিশটাকে পার হল, চলে এল বাগানের গেটটার কাছাকাছি। গেট খুলে বেরিয়ে আসবার সময়ে তার এমনিই মনে হল— বাবা ওই কথা বলেছে শুধু গাছটাকে নয়। শুধু গাছটাকে নয়...

স্নান করতে যাওয়ার সময়ে সে মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে হৈমন্তীকে বলল, আজ সিনেমায় যাবি? আমার কলেজ যেতে ইচ্ছে করছে না। যাবি তো বল, দাদার কাছ থেকে টাকা চেয়ে রাখি।

হৈমন্তী হাসল, আমার সঙ্গে তোর ভাল লাগবে? লাগলে যাব।

স্নান করে এসে আবার কী একটু ভাবল শাশ্বতী। আজ কলেজে এক বার আদিত্য আসতে পারে। এখন, কালকের পর তাদের এক বার দেখা হওয়া দরকার। কালীনাথ বেরিয়ে যাচ্ছে দেখেও শাশ্বতী টাকা চাইল না।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করল, দাদাকে বললি না?

থাক গে, শাশ্বতী বলে, আজ কলেজেই যাই। কাল-পরশু দেখব।

কলেজে যাওয়ার সময়ে চলন্ত বাস থেকে শাশ্বতী একটা পোস্টার দেখল। দেবানন্দের সুন্দর মুখ হাসছে। শিবানীরা আজ সিনেমায় যাচ্ছে। চলন্ত বাস থেকে ছবিটার শক্ত নামটা পড়তে পারল না শাশ্বতী। পেরিয়ে গেল। সিনেমায় গেলেও মন্দ হত না। গেল না বলে হৈমন্তীর মন খারাপ হয়ে গেল বোধ হয়। কিন্তু কলেজে যাওয়াটাই আজ দরকার শাশ্বতীর। আজ কোনও একটা ঘটনা ঘটবে। তার মন বলছে।

## ॥ তেরো ॥

বস্তুত সেদিন কলেজে কিছুই ঘটল না।

টানা তিনটে পিরিয়ড করল শাশ্বতী, সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে। দু'-এক লাইন নোট টুকল খাতায়, বাদবাকি সময় অপটু হাতে কয়েকটা ছবি আঁকল। ছবিগুলো সবই পুরুষমানুষের মুখের। কিন্তু একটা মুখও সুন্দর হল না।

তৃতীয় পিরিয়ড তার ফাঁকা। ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে সে বারান্দা পেরোল আস্তে ধীরে। কমনরুমে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময়ে রাকার সঙ্গে দেখা। রাকার পোশাক সবসময়ে ঝকমকে। সাত দিনে সাত রকমের শাড়ি পরে আসে। মেয়েরা ওকে খ্যাপায় মিস ওয়ার্ডরোব বলে। বাড়ির মোটর গাড়ি ওকে কলেজে পৌঁছে দেয়, নিয়ে যায়। ভারী হাসিখুশি মেয়ে রাকা। কখনও মুখ ভার করে থাকে না। অশ্লীল কথা বলে অনায়াসে সে, ঠিক পুরুষদের মতো।

তাকে দেখে রাকা দু'হাত বাড়িয়ে বলল, আরে গোমড়ামুখী, তোর এখন অফ পিরিয়ড না?

শাশ্বতী মৃদু হাসল, বলল, পর পর দু'পিরিয়ড অফ। তারপর এস. বি-র ক্লাস।

রাকা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, তা হলে চল, আমার গাড়িতে একটু ঘুরে আসবি। দাদা গাড়ি নিয়ে এসেছে, একটু রেডিয়ো-স্টেশনে যাব। আজ আমার অডিশন। কী ভয় করছে রে! দ্যাখ বুকে হাত দিয়ে কেমন ধুপধাপ হাতির পা পড়ছে...বলতে বলতে শাশ্বতীর হাত টেনে বুকে চেপে ধরল রাকা, তারপর চোখ গোল করে জিজ্ঞেস করল, টের পাচ্ছিস!

শাশ্বতী কিছু বুঝল না, হাত টেনে নিয়ে বলল, তুই একা যা। আমার ভাল লাগছে না।

রাকা মুখে দুঃখের ভাব ফুটিয়ে বলল, একটা বন্ধুও যেতে চাইছে না। সব শালি আমাকে ইগনোর করে। এদিকে আমি যে কী ভীষণ ভয় পাচ্ছি।

শাশ্বতী জানে রাকার ভয়-ডর বলে কিছু নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাণ করে। এর আগে বোধ হয় তিন-চারবার রেডিয়োতে অডিশন দিয়েছে রাকা। এক বারও সুযোগ পায়নি। আসলে ছটফটে বলে কোনও কিছুই মন দিয়ে শেখে না ও। ক'দিন গান গায়, ক'দিন সেতার বা সরোদ শেখে, কিছু দিন নাচের স্কুলে গিয়েছিল, এক বছর নষ্ট করেছে আর্ট কলেজে, মাঝেমধ্যে কবিতাও লিখে ফেলে গাদা গাদা। তারপর আবার রাকা ছটফটে আড্ডাবাজ, আমুদে রাকা হয়ে যায়। কোনও শিল্পকর্মই তার ভিতরে গাম্ভীর্য আনে না। তার বিলিতি রঙের দামি টিউবগুলো পচে নষ্ট হয়, সেতারি সরোদ পড়ে থাকে, কবিতার খাতা হলদে হয়ে যায়, খামোখাই গানের স্কুলে মাসে মাসে মাইনের টাকা জমা পড়ে। আবার ঝোঁক চাপলে পনেরো দিনের মধ্যেই বড় গায়িকা, কিংবা সেতারি কিংবা আঁকিয়ে হওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগে।

রাকা হঠাৎ মুখে-চোখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমার দাদাকে তোর মনে নেই? সেই যে এক বার কলেজ ছুটির পর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম! তারপর কত দিন দাদা তোর চোখ আর চুলের প্রশংসা করেছে! আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তোর চুল চোখ অরিজিন্যাল কি না। আজকালকার মেয়েরা তো চুল চোখ তৈরি করতে পারে। আর আমার দাদাকেও তো তুই দেখেছিস! ও-রকম হ্যান্ডসাম ক'জন আছে? বলে চোখ নাচাল রাকা, শাশ্বতীর হাত ঝপ্ করে টানতে টানতে বলল, জীবনে উন্নতি করতে চাস তো শিগগির চল। আমি যখন ভিতরে অডিশন দেব, তখন তুই আর দাদা দু'জনে দু'জনকে অ্যাডমায়ার করবি। আয়...

ব্যাপারটা যে শাশ্বতী জানে না তা নয়। মাঝেমধ্যে রাকা তার দাদার কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে বলেছে। নিয়ে যেতে চেয়েছে তাদের বাড়িতে। শাশ্বতী যায়নি।

কোথায় যেন দুর্বলতা থাকে। থেকে যায়। মানুষে তা বুঝতে পারে, কিন্তু কিছু করার থাকে না। মাস দুই আগেই বোধ হয়, কলেজ ছুটির পর ওরা একসঙ্গে বেরোচ্ছিল। কলেজের গেটের সামনে একটা সবুজ রঙের হেরাল্ড গাড়ির বাফারে পা তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের ভদ্রলোক। ফরসা টকটকে রং, বিশাল কাঁধ, পেশিবহুল দু'খানা হাত। নিজের সৌন্দর্য দেখাতে জানেন ভদ্রলোক। পরনে ছিল গ্রে রঙের চাপা একটা দামি প্যান্ট, গায়ে চেক-ওলা একটা স্পোর্টস শার্ট। চোখে চমৎকার একটা সবুজ রোদ-চশমা। রাকা সব বন্ধুকে ডেকে তাব দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কয়েক মিনিটের মাত্র পরিচয়। তারপরই তারা ভাইবোনে হেরাল্ড গাড়িটার সামনের সিটে বসে, তাদের দিকে একটু মিষ্টি হেসে, হাত নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। রাকা আর তার দাদার সেই চলে যাওয়ার দৃশ্যটি আজও স্পষ্ট মনে আছে শাশ্বতীর। সেই গাড়ি থেকে হাত নেড়ে হেসে চলে যাওয়ার মধ্যে একটা অদ্ভুত আভিজাত্যের সৌন্দর্য ছিল। যে-সৌন্দর্য নিজেদের পারিবারিক জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি শাশ্বতী। সেই সৌন্দর্যটুকু আজও কাঁটার মতো ফুটে আছে মনে। কলেজের বন্ধুদের দেখানোর মতো গাড়ি নেই শাশ্বতীর, নেই অমন সুন্দর চেহারার স্মার্ট একটি দাদাও। যত বার 'হিংসে করব না' বলে ভাবে শাশ্বতী তত বারই নিজের কাছে নিজে হেরে যায়।

ওই যে একটু তার প্রশংসা করেছে ভদ্রলোক— যা সে রাকার মুখে শুনল, তাইতেই মনটা একটু ছটফটে চঞ্চল হয়ে গেল তার। এ তার মেয়েমানুষি দুর্বলতা— সে জানে। তাই রাকা টেনে নিয়ে গেল, আর সেও 'যাব না, যাব না' বলতে বলতে চলে এল কলেজের বাইরে। এবং মনে মনে ভীষণ লজ্জা পেতে লাগল।

আজ হেরাল্ড গাড়িটা ছিল না। তার বদলে সাদা রঙের একখানা অ্যাম্বাসাডার মার্ক টু দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ক'টা গাড়ি আছে কে জানে! আজ রাকার দাদা বাইরে দাঁড়িয়ে নেই। স্টিয়ারিং হুইলে হাত দু'খানা অলসভাবে ফেলে রেখে, মাথা পিছনে হেলিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। রোদ-চশমায় ঢাকা চোখ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় মার্কিন টুরিস্ট।

তাকে দেখেই বোধ হয় টক করে দরজা খুলে নামলেন ভদ্রলোক। রাকা কিছু বলার আগেই ঈষৎ হেসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করলেন, চিনতে পারছেন?

লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল শাশ্বতী। ঘাড় নাড়ল সম্মতির। হ্যাঁ, সে চিনতে পারছে।

রাকা কলকল করছিল ইতিমধ্যেই, ওকে ধরে নিয়ে এলাম দাদাভাই, একা যেতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তা ছাড়া দেখি ওর লাক-এ এবার হয় কি না!

খুব খুশি হল রাকার দাদা, বলল, আরে, আসুন আসুন। আপনি গেলে তো কথাই নেই। আবার আমরা ভাইবোনে গাড়িতে করেই পৌঁছে দেব আপনাকে। আসুন...

কেন যেন শাশ্বতী বুঝতে পারছিল যে, তার যাওয়া উচিত নয়। তার মন চাইছিল না। তবু, সে বড় দুর্বল। কখনও কখনও প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি চলে যায় তার। যে যা খুশি করিয়ে নিতে পারে তাকে দিয়ে। মিনমিন করে সে কী একটু আপত্তি করল বটে। কিন্তু রাকার কলকলানি আর তার দাদার ভরাট গলার হাসিতে সেটুকু চাপা পড়ে গেল।

রাকার দাদাকে বেশ ছেলেমানুষের মতো দেখতে। 'ছেলেটা' বললেই মানায়, 'ভদ্রলোক' বলে উল্লেখ করতে বাধো বাধো লাগে। সামনের সিটে তারা তিন জন বসল। মাঝখানে রাকা। জানালার পাশে শাশ্বতী— লাজুক, নতমুখে।

গলায় আঁচল জড়িয়ে রাকা বলল, বাব্বাঃ, হাওয়া লাগাব না। সে-বার গানের মাঝখানে গলা ফেঁসে গিয়েছিল।

তার দাদা হাসল। ভারী সুন্দর চিকমিকে দাঁত দেখা গেল তার— যেন শ্বেতপাথরে তৈরি। বলল, তোর কোনও দিন হবে না। তোর ধৈর্য নেই। তারপর শাশ্বতীর উদ্দেশে বলল, জানেন, রাকার একজন গানের মাস্টারমশাই বাড়িতে আসেন, ওস্তাদ মানুষ, খুব নামডাক, সেই ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে ও বত্রিশ বার জল খেতে বাড়ির ভিতরে যায়, আর গিয়ে আমাদের সঙ্গে রাজ্যের ইয়ার্কি দিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করে আসে, ওস্তাদজি হাঁ করে বসে থাকেন।

যাঃ! বলে হেসে লুটিয়ে পড়ল রাকা, বলল, কী করব, তেষ্টা পায় কেন? মাইরি, গানের সময় আমার যত তেষ্টা, মাথা চুলকোনো, পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরা— কেমন যে করে!

গাড়িটা যখন বাঁক নিচ্ছে বড় রাস্তায় ওঠার সময়ে ঠিক তখনই আদিত্যকে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসতে দেখল শাশ্বতী। হাওয়ায় রুক্ষ চুল উড়ছে, শ্রীহীন মুখখানা ধুলোটে আর কেমন তেলতেল করছে শিরা-ওঠা প্রকাণ্ড কপালখানা। জামা-কাপড়ের ভাঁজ নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে তাকে। বড়লোকের গাড়িতে একটি সুন্দর পুরুষমানুষের কাছাকাছি বসে চলে যেতে যেতে দৃশ্যটাকে খুব করুণ লাগল শাশ্বতীর। সে একটু চমকে উঠেছিল প্রথমটায়। সামলে নিল। আদিত্য লম্বা লম্বা পা ফেলে যাচ্ছে তারই কলেজের দিকে। গিয়ে বেচারা হতাশ হবে। কিন্তু শাশ্বতী আর ফিরে তাকাল না। কী একটা জিজ্ঞেস করছিল রাকার দাদা। অন্যমনস্ক শাশ্বতী শুনতে পায়নি। এবার ঝুঁকে বলল, উঁ! সে কিছুতেই বলতে পারল না, বলতে তার ইচ্ছে করল না যে— গাড়ি থামান। ওই চলেছে আমার প্রেমিক, আমারই খোঁজে। আমি ওর কাছে যাব। এই সুন্দর মানুষটির কাছে ওই শ্রীহীন জিরাফের মতো লোকটাকে প্রেমিক বলে পরিচয় দিতে তার লজ্জা করল।

শাশ্বতী ঠিকই দেখেছিল। সত্যিই আজ বড় কুশ্রী দেখাচ্ছিল আদিত্যকে। চলন্ত গাড়ি থেকে একপলকে শাশ্বতী তবু ভাল করে দেখেনি। দেখলে দেখতে পেত, এক দিনের মধ্যেই কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে গেছে তার, গাল বসে গেছে, চোখ গেছে কোটরে, দাড়ি কামানো হয়নি, স্নান হয়নি, ভাত খাওয়া হয়নি তার কাল রাত থেকে।

কাল বিকেলে শাশ্বতীর সঙ্গে সে যে অদ্ভুত ব্যবহার করেছিল সেই থেকেই মেজাজ ঠিক ছিল না। সন্ধেবেলা সে তাদের দুর্গের মতো বাড়িটিতে ফিরে প্রথম মহল পার হয়ে দ্বিতীয় মহলের সিঁড়ি বেয়ে

দোতলার বারান্দায় উঠেই একটা দেড়শো বছরের পুরনো দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। যে-দৃশ্যটা ধনতান্ত্রিকতার নিখুঁত একটি ছবি। চিক-দেওয়া বারান্দায় পাথরের মেঝেতে পাতা ছোট্ট গালিচার আসনে চওড়া পাড়ের শাড়ি পরা মা বসে ভারী জাঁতিতে সুপুরি কাটছে। কোলের কাছে নানা রকমের খোপওয়ালা পানের বাটা— প্রতিটি খোপে রয়েছে নানান মশলা। মার হাতে ঝকমক করছে ভারী সোনার গয়না, পিঠের আঁচল চাবির ভারে ঝুলে আছে। আধো-ঘোমটায় ঢাকা মায়ের ঢলঢলে সুখী বোকা মুখখানা। মায়ের হাঁটুর কাছে বাবার চটিপরা পা নড়ছে। বাবা বসে আছে কাঠের জালিকাজ করা সিংহাসনের মতো দেখতে প্রকাণ্ড গদিওলা চেয়ারে, সামনে পাথরের টেবিল। টেবিলের ওপর রুপোর রেকাবে কাটা ফল, রুপোর গ্লাসে জল। পিছনে চাকর দাঁড়িয়ে খুব বড় হাতপাখায় বাতাস করছে।

দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ আগাপাশতলা জ্বলে গেল আদিত্যর। একসময়ে কলেজ-জীবনে ললিত তাকে রাজনীতি শিখিয়েছিল। সেগুলো কোনও দিনই ভাল বোঝেনি আদিত্য। কিন্তু তার ফলে নিজেদের অবস্থার প্রতি একটা বিদ্বেষ গজিয়েছিল তার। তার ওপর রমেনকে দেখে সে শিখেছিল নিজেকে ঘেন্না করতে। সেইসব বিদ্বেষ ঘৃণা মনের কোন অন্ধকার জল ঘোলা করে তলানি থেকে উঠে এল।

সে ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়ল নিঃশব্দে। তারপর শুয়ে রইল বিছানায়, অন্ধকার ঘরে। সে এই পরিবারে, এই বাড়িতে জন্মেছিল বলে নিজেকে ধিক্কার দিল অনেক। বিকেলে যা ঘটেছিল তার সবটুকু বিষ উঠে এল তার গলায়। সে বুঝতে পারল, এ-বাড়ির ছেলে হয়ে লেখাপড়া শিখতে যাওয়া তার উচিত হয়নি, ঠিক হয়নি শাশ্বতীর সঙ্গে প্রেম করতে যাওয়া। তার জাত আলাদা। শাশ্বতীকে নয়, আসলে তার সন্দেহ নিজেকেই। প্রতি মুহূর্তেই ভয়, শাশ্বতীর সঙ্গে বুঝি তাকে মানায় না। সবসময়ে সন্দেহ, ললিত যেন তাকে কোথায় হারিয়ে দিয়ে রেখেছে, কিংবা রমেন বুঝি জন্ম থেকেই মহাপুরুষ, যার নাগাল তার সাধ্যাতীত। এইসব সন্দেহ তাকে কুরে কুরে খায়।

শুয়ে থেকে সে এই বিষজ্বালা টের পাচ্ছিল। গলার কাছে, জিভে দাঁতে উঠে আসছে বিষ। এক্ষুনি ঢালতে হবে কোথাও। নইলে সে রাগে, বিদ্বেষে, ঘৃণায় নীল হয়ে যাবে বুঝি।

ঠিক সেই সময়েই অন্ধকার ঘরে এল মা। চুড়ি বালার ঝন শব্দ করে ঠান্ডা হাতখানা কপালে রেখে বলল, খোকা, তোর শরীরটা ভাল নেই! শরবত খেলি না যে!

অমনি ফণা তুলল আদিত্য। ছিটকে উঠে বলল, চলে যাও, চলে যাও, আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার গায়ে বন্দকি সোনার গয়না...

তার চিৎকার শুনে বাবা বারান্দা থেকে জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে?

ফুঁসে উঠল আদিত্য। উপর্যুপরি ছোবল মারতে লাগল চার দিকে। অন্ধের মতো। কী বলেছিল তা আর আজ খেয়াল নেই তার। বোধ হয় বলেছিল—আপনি কেন লেখাপড়া শেখেননি!...কেন কোনও দিন মূল্য দেননি মানুষকে?....কেন আত্মসম্মান ভাসিয়ে খদ্দেরদের 'বাবু' বলে ডাকেন এখনও?....কেন আপনার জন্য বন্ধুদের কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করবে?...

সে-সব উলটোপালটা কথার কোনও মানেও হয় না। কিন্তু তাতে অপমানের বিষটা ঠিকই ঢালতে পেরেছিল আদিত্য। তার বাবা কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন তার দিকে। ফলটল তখনও খাওয়া হয়নি।

তারপর তুমুল কাণ্ড হয়েছিল অনেক। চেঁচামেচি, কান্না, শরিকির অংশ থেকে জ্ঞাতিরাও চলে এসেছিল। বাবা চটি খুলেছিলেন মারতে। বহুকাল তিনি তাঁর এই শিক্ষিত ছেলেটিকে সমীহ করে চলেছেন। কিন্তু কাল রাতে আর পারেননি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য চটিটা ব্যবহৃত হয়নি। বাবা বলেছিলেন, তোমার সবকিছু বদহজম হয়েছে। লেখাপড়াটড়া সব। তুমি রোগগ্রস্ত, কিন্তু সেটা টের পাচ্ছো না। এখনই দূর হও এ-বাড়ি থেকে।

কাল সারা রাত আদিত্যর কেটেছে ফাঁকা আস্তাবলে। মশা আর পোকার উপদ্রবে, আর নিজস্ব হলাহলে জেগে থেকেছে সারা রাত। মাইনের টাকা মাসের দশ তারিখের মধ্যে ফুরিয়ে যায় তার। এরপর থেকে মা দেয় হাতখরচ— মাসে প্রায় তিন-চারশো টাকা। কাল পকেটেও কিছু ছিল না। গড়িয়াহাটা থেকে ট্যাক্সিতে ফিরেছিল, ফলে অবশিষ্ট ছিল দু'-তিন টাকার মতো। নইলে গতকাল রাতেই সে বেরিয়ে পড়ত। পকেটে টাকা না থাকলে সে এখনও কোথাও যেতে ভরসা পায় না।

সকালে মা এসে চুপি চুপি পাঁচশো টাকা দিয়েছে তার হাতে, বলেছে, কোথাও গিয়ে দু'-দশদিন থেকে আয়। বাবুর রাগ কমলে আবার ফিরে আসিস। বড় রেগে আছে বাবু। আমি তোর সুটকেস-টুটকেস লুকিয়ে গুছিয়ে এনে দিচ্ছি। তুই বরং নিমতেঘোলায় তোর মেজোমামার কাছে গিয়ে থেকে আয় ক'দিন। কাছেই তো...

সুটকেস আর পাঁচশো টাকা নিয়ে সকালে বেরিয়েছে আদিত্য। সুটকেসটা রেখে এসেছে এক বন্ধুর মেসে, কলেজ স্ট্রিটে। তারপর সারা দিন ঘুরছে। কলকাতা শহরটাকে এমন ধূসর মরুভূমির মতো তার আর কখনও লাগেনি। নিজেকে মনে হয়নি এমন অসহায়। আসলে, দিনের শেষে নিরাপদ আশ্রয় বাগবাজারের সেই দুর্গের মতো বাড়িখানায় আর ফিরে যেতে পারবে না— অবচেতন মনে এই চিন্তাই তাকে ভীষণ ভিতু আর অস্থির করে তুলছে। এখন কোথায় যাবে সে, কীভাবে থাকবে? সে কি পারবে নিজস্ব চাকর ছাড়া? সে কি পারবে নিজস্ব আলাদা ঘর, রোজ চাদর বদলানো বিছানা, শোওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ ছাড়া? সে কোনও দিন চেয়ে খায় না— মা নিজে বসে তার খিদে বুঝে খাওয়ায়। নতুন জায়গায় সে কী করে চেয়ে খাবে? তা ছাড়া এক ওই বাড়ির লোকজন আর দাসদাসীরাই সহ্য করে তার উগ্র মেজাজ, তাকে তারা বোঝে— আর কেউ বুঝবে কি? নিজের সম্বন্ধে এইসব অনিশ্চয়তা তাকে আরও অস্থির করে তুলেছিল সকাল থেকে। বন্ধুর নোংরা মেসে সে এক গ্রাসও ভাত খেতে পারেনি। কলাইকরা থালা দেখে বমি উলটে এসেছিল।

আজ অফিস করেনি আদিত্য। কেবল ঘুরেছে আর ঘুরেছে। কয়েকটা বাসারও খোঁজ করেছে সে। পায়নি। কলকাতায় বোধহয় কেউ আর ঘর ভাড়া দিচ্ছে না।

দুপুরের পর শাশ্বতীর অফ-পিরিয়ডটা কখন তা তার মনে ছিল। শাশ্বতীর রুটিন তার মুখস্থ। সেই সময়েই সে এসেছিল শাশ্বতীর কাছে। পেল না। কলেজের দারোয়ান বলল, একটু আগেই শাশ্বতী চলে গেছে। এক দিদিমণির গাড়িতে।

খুব ধীরে ধীরে বড় রাস্তার মোড়ে এসে আদিত্য একটা সিগারেট ধরাল। ক্লান্ত লাগছিল খুব। গাড়িতে কোথায় গেল শাশ্বতী? এখন তাকে কাছে পেলে হয়তো একটু ভাল লাগত আদিত্যর।

আশ্চর্য এই যে, কোনওকালে কোনও অনিশ্চয়তাকে বোধ করেনি সে। বরাবর জানত সে যাই হোক, যাই করুক— তার পিছনে দুর্গের মতো বিশাল আশ্রয়টি আছে। স্বার্থপর লোভী লোকটি তার বাবা— তবু বটগাছের মতো তিনি আছেন মাথার ওপর। এখন সে তার পিছনে সেই দুর্গ আর গাছটিকে অনুভব করতে পারছিল না। শরতের বেলা পড়ে আসছে দ্রুত। একটু পরেই রাত নামবে কলকাতায়। অসহায় আদিত্য একা কোথায় যাবে!

সে ললিতের কথা একটু ভেবে দেখল। বন্ধুদের মধ্যে ললিত একমাত্র লোক যার কাছে যে-কোনও অবস্থাতেই যাওয়া যায়। গেলে দু'হাত বাড়িয়ে 'আয়' বলে টেনে নেবে ললিত। যাবে তার কাছে!

পরমুহূর্তেই সে আপন মনে মাথা নাড়ল। তা হয় না। কাল যা ঘটে গেছে তার পিছনের কারণ আসলে ললিতই। ললিতকে নিয়েই গণ্ডগোলটা লেগেছিল। শাশ্বতীর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য তেতো হয়ে গেল সম্পর্ক— তারপর বাড়ির ওই ব্যাপার। সবকিছুর জন্যই ললিতকে দায়ী করা চলে। সেই কলেজ জীবনে কেন ললিত তাকে শেখাতে গিয়েছিল সাম্যবাদ! যদি না শেখাত তবে আজ সংস্কারবশতই সে তার লোভী স্বার্থপর বাবাকে একরকম করে মানিয়ে নিতে পারত। কেন বিষ ঢুকিয়েছিল ললিত?

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। গড়িয়াহাট ছেড়ে অনেক দূরে একা একা ভবঘুরের মতো হাঁটল আদিত্য। হিজিবিজি চিন্তা, অনিশ্চয়তা আর ভয়ের উলটোপালটা স্রোত তার মাথার ভিতরে ঘূর্ণিঝড় তুলছে।

অবশেষে রাত আটটা নাগাদ সে হাল ছেড়ে দিল। এসপ্ল্যানেডের একটা দোকান থেকে ফোন করল বাড়িতে, বাবাকে।

বাবার স্বর ভেসে এল, সেই পুরনো চেনা সতর্ক ভারী গলাটি—হ্যালো।

আমি আদিত্য বলছি।

একটু চুপ ওধারে। তারপর, কী চাও?

আদিত্য চোখ বুজল ক্লান্তিতে, শ্বাস ফেলে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন।

বাবার গলা হঠাৎ খুব নরম শোনাল, সারা দিন তুমি কোথায় ছিলে? আমি আজ তোমার জন্যই দুশ্চিন্তা করেছি কেবল। রাতে শুয়েছিলে কোথায়?

আদিত্য সে-সব কথার উত্তর না দিয়ে বলল, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমাকে ফিরে আসতে দিন।

এসো, খুব তাড়াতাড়ি চলে এসো। এসে খাও, বিশ্রাম করো। আমাদের সকলেরই ভুল হয়, তাতে লজ্জার কিছু নেই। ...কোথায় আছ— কোথা থেকে টেলিফোন করছ বলো, গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না, আমিই যাচ্ছি।

ট্যাক্সি নিয়ে এসো। টাকা না থাকলে চিন্তার কিছু নেই। আমি গেটের কাছে দাঁড়াচ্ছি, তুমি এলে ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে দেব। চলে এসো।

কথা শেষ হয়ে গেল। তবু টেলিফোন ছাড়ল না আদিত্য। ধরে রইল। ও-পাশে ধরে রইল বাবাও। কয়েক সেকেন্ড। তারা পরস্পরের ক্লান্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনল কেবল। তারপরই আদিত্য রেখে দিল টেলিফোন।

বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরল।

ও দিকে শাশ্বতী আজ একটা নতুন ধরনের বিকেল কাটাল।

রাকাদের গাড়িটায় ওঠার পর থেকেই সে একটা মৃদু উত্তেজনা বোধ করছিল। সে উত্তেজনাটা বেড়ে গেল যখন রাকা তাদের দু'জনকে রেখে ঢুকে গেল রেডিয়ো স্টেশনে।

তখন কিছুক্ষণ লজ্জায় মুখ নত করে রইল শাশ্বতী। রাকার দাদা চুপ করে একটুক্ষণ চেয়ে রইল অন্য দিকে।

তারপর প্রথম কথা বলল রাকার দাদা, এখানেই গাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবেন, না কি কোথাও গিয়ে একটু চা খাবেন? রাকার আসতে বেশ দেরি হবে।

শাশ্বতী একটু চুপ করে থেকে বলল, ফিফ্‌থ পিরিয়ডে আমার একটা ক্লাস ছিল। ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে ক্লাসটা করব।

রাকার দাদা কবজির ঘড়ি দেখে বলল, ক'টায় ক্লাস?

শাশ্বতী সময়টা বলতেই রাকার দাদা মাথা নেড়ে বলল, তা হলে মোটে আধ ঘণ্টা সময় হাতে আছে। অবশ্য আপনাকে দশ মিনিটেই পৌঁছে দিতে পারি... কিন্তু, খুব ইম্পর্ট্যান্ট ক্লাস কি?

শাশ্বতী একটু ইতস্তত করে বলে, না, তেমন কিছু নয়।

তবে চলুন, কোথাও একটু বসি।

শাশ্বতী নতমুখে লাজুক একটু হাসি হাসল কেবল।

রাকার দাদা সুমন্ত এক মিনিটও দেরি না করে ঘুরিয়ে নিল গাড়ি।

এটা কেমন যে শাশ্বতীর এখন বেশ ভাল লাগছে! কেন লাগছে? সে নিজের মনে খুঁজে দেখল. কিন্তু কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পেল না। না কি কেবল বাঁধা নিয়মের বাইরে যাওয়ার মধ্যেই এক আনন্দ আছে। এ কি অবৈধ? অবৈধ কেন হবে! সে তো আর আদিত্যর কাছে বাঁধা নয়! নাকি বাঁধা! কোনও এক অদৃশ্য বন্ধন রয়ে গেছে! আদিত্যর ক্লান্ত মুখখানা চোখে এক পলকের জন্য ভেসে উঠল তার। বহু দূর থেকে এসেছিল মানুষটা, তারই খোঁজে। সে অবহেলায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, গঙ্গার ধারে একটা সুন্দর চা খাওয়ার জায়গা আছে, নির্জন এখন—যাবেন?

শাশ্বতী ঘাড় নাড়ল। যাবে।

সকাল থেকেই তার মন বলছে, আজ একটা কিছু ঘটবে। সেটাই ঘটতে যাচ্ছে কি? ঘটুক, কোনও ক্ষতি নেই। আজ জীবনে এই প্রথম তার গা ভাসাতে ইচ্ছে করছে। গঙ্গার ধার ধরে যাচ্ছে গাড়ি। হাওয়ায় শাশ্বতীর আলগা বেণি থেকে কিছু চুল খুলে উড়ছে। আঁচল উড়ছে। চোখ বন্ধ করল শাশ্বতী। একটু বুঝি শরীর তলিয়ে দিল পিছন দিকে।

ও দিকে ভিড় করে জেটিতে বেঁধেছে জাহাজ। দুপুরের আকাশে তাদের ক্ষণস্থায়ী মাস্তুল দেখা যায়। গঙ্গার জলের ভাপ মুখে এসে লাগে। নৌকো স্থির হয়ে আছে মাঝ গাঙে, দুলছে বয়া। গঙ্গার ঘাট

দেখলেই দূরকে মনে পড়ে। মনে পড়ে, বিদায়। প্রবল স্রোত আর তার ওপরে আকাশের দিগন্ত-প্রসার। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দূর দূরান্ত এসে তছনছ করে দিয়ে যায় মানুষকে। নোঙর তুলে ফেলবার সাধ জাগে মনে।

রেস্টুরেন্টে, প্রায় গঙ্গার জলের ওপর মুখোমুখি দুই চেয়ারে বসে তারা চুপ করে গঙ্গা দেখল অনেকক্ষণ। কথা বলল না।

এ-সব জায়গায় শাশ্বতীকে কেউ কখনও আনেনি। আদিত্য বড় ঘরমুখো। তার সামনে বিপুল বিস্তার আর দূর আর দূরান্তের কথা ভাবতে ভাবতে একসময়ে শাশ্বতীর সাধ হল, সে একজন নোঙরছাড়া ভবঘুরে পুরুষের সঙ্গে একদিন এইখানে আসবে। তারপর এখান থেকেই সংসার ত্যাগ করবে তারা। আর ফিরবে না।

কয়েক মুহূর্ত পর চটকা ভাঙে শাশ্বতীর। সে টের পায় যে সে এক প্রায় অচেনা পুরুষের সঙ্গে একা একটা অচেনা জায়গায় বসে আছে।

সুমন্ত কফি আর স্যান্ডউইচ আনাল। অন্য পুরুষের সামনে খেতে বড় লজ্জা করে শাশ্বতীর! কিন্তু তার স্বভাব অনুযায়ী সে তো আজ চলছে না। তাই গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে সেই সুস্বাদু স্যান্ডউইচ খেতে ভালই লাগল তার।

সুমন্ত প্রথমে কলেজ ইত্যাদির কথা জিজ্ঞেস করল, নিজের কলেজ-জীবনের কথা বলল কিছু কিছু। জিজ্ঞেস করল, শাশ্বতী রাজনীতি করে কি না। তারপর আচমকা ভীষণ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করল সে, আপনি কি কারও সাথে এনগেজ্‌ড?

কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগল শাশ্বতীর। হু হু করে বাতাস বইল অনেক, ছল ছল শব্দ করল জল, দূরে বাজল জাহাজের ভোঁ। সুমন্ত হাতে নুনের কৌটো নিয়ে খেলা করতে করতে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল।

প্রশ্নটা বড় দেরিতে বুঝল শাশ্বতী। বুঝে উত্তর দিতে পারল না। মাথা নত করে রইল। রক্তের ঝাপটা লাগল মুখে।

অবশেষে সুমন্ত মাথা নিচু করে বলল, প্রশ্নটা করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু আমার একটা সৎ উদ্দেশ্য ছিল।

সেটা কী শাশ্বতী জানতে চাইল না। অনুমান করল মাত্র।

সুমন্ত খুব লাজুক নয়। সরাসরি অনেক কথা বলতে পারে। বলল, রাকাকে আমি মাসখানেক আগে বলে রেখেছিলাম আপনার কাছ থেকে যেন কয়েকটা কথা জেনে নেয়। তার মধ্যে এই প্রশ্নটা একটা। রাকা অবশ্য আমাকে বলেছিল যে আপনি এনগেজ্‌ড নন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ও না-জেনে কথাটা বলেছে। বলে হাসল সুমন্ত, রাকা বড্ড কম সিরিয়াস। কোনও ব্যাপারেই গুরুত্ব দেয় না।

শাশ্বতী হঠাৎ, ধরা গলায় কোনওক্রমে বলল, আমি এনগেজ্‌ড এ-কথা তো বলিনি।

নন? ভীষণভাবে শরীর ঝাঁকিয়ে সোজা হয় সুমন্ত।

এখন কী বলবে শাশ্বতী? সে নিজেও যে বুঝতে পারছে না সত্যিই সে কারও সঙ্গে আবদ্ধ কি না!

সুমন্ত খুব সুন্দর করে হাসল। খুশির হাসি। তারপর ভরাট আত্মবিশ্বাসের গলায় বলল, তা হলে একদিন আমার প্রস্তাব যাবে আপনার কাছে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, অবশ্য আরও কিছু জানার থেকে গেল। আপনারও, আমারও। কিন্তু প্লিজ, দয়া করে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবেন না। যদি কিছু জানবার থাকে এক্ষুনি জেনে নিন।

কিন্তু শরীর ঝিমঝিম করল শাশ্বতীর। মৃদু মদের নেশার মতো অবশ হয়ে গেল তার হাত-পা। চুপ করে বসে রইল সে। কথা বলল না।

একটু পরেই ঘড়ি দেখে সুমন্ত বলে, চলুন, যাওয়া যাক।

তারপর অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল: রাকাকে রেডিয়ো স্টেশন থেকে তুলে নিল সুমন্ত। তারপর তারা গেল খুব বড় একটা রেস্টুরেন্টে। অদ্ভুত খাবার খেল সব। অজস্র কথা বলল রাকা। সুমন্ত হাসল খুব। আর সারাক্ষণ ঝিম ঝিম করল শাশ্বতীর শরীরের ভিতরটা।

সুমন্ত হয়তো কোনও ফাঁকে— হয়তো রেডিয়ো স্টেশনেই যখন রাকাকে আনতে লবি পর্যন্ত

গিয়েছিল তখনই— কিছু বলে থাকবে। তাই রাকা এক ফাঁকে শাশ্বতীর কানে কানে বলল, তুই আমার কত নম্বর বউদি জানিস তো! তিন নম্বর! এই দাদা সেজো। তুই হবি আমার সেজোবউদি।

কথাটা শুনতে মোটেই ভাল লাগল না শাশ্বতীর। কিন্তু সে চুপ করে রইল। ভাল করে আজ কিছু বুঝতে পারছে না। সে এখনও বুঝতে পারছে না সে খুব সুন্দরী কি না। কোনও দিন কেউ তো বলেনি যে সে খুব সুন্দর! নইলে কাল কেন ও রকম অদ্ভুত সন্দেহ করেছিল আদিত্য? বলেছিল যে তার জাত আলাদা! সকলেরই কেন এত মনোযোগ তার প্রতি? ভাবতে ভাবতে কেবলই ঘোলা হয়ে গেল মাথা।

ঘোর-ঘোর সন্ধেবেলায় বাড়ির কাছেই বড় রাস্তায় তাকে ওরা নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন শাশ্বতী সত্যিই টলছে। রাকা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, শিগগিরই আমরা একদিন আসছি দল বেঁধে কনে দেখতে। তৈরি থাকিস।

কত দ্রুত ঘটনা ঘটে যায়! কিছু করার থাকে না।

রাতে যখন বিছানায় শুয়ে ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ তখন শাশ্বতী অনুভব করল তার বুক ভরতি টলটল করছে ভালবাসা-আত্মসমর্পণ। কিন্তু কে নিতে পারে সেই মহামূল্যবান? আদিত্য না, সুমন্তও না। যারা তাকে চায় তারা কেউ না। যে পুরুষ তাকে যাচ্ঞা করে সে কিছুতেই তার নয়। সে হবে অন্য কেউ। হয়তো সে খুব উদাসীন। হয়তো সে খুব কর্মব্যস্ত একজন।

কিন্তু সে কে যে কে জানে!

আচমকা মনে ভেসে ওঠে কয়েক মিনিটের দেখা মৃত্যুপথযাত্রী একজনের দৃঢ় ধারালো মুখ। সে-মুখ ললিতের। আহা— যে বাঁচবে না। তবু মনে পড়তেই ঘুমের মধ্যেই অন্যমনে মুখ টিপে হাসে শাশ্বতী। হাসিটুকু ঠোঁটে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

## ॥ চোদ্দো ॥

অপরাহ্ণে এক-একদিন উঠোনে একটা অদ্ভুত আলো এসে পড়ে। শালিখের পায়ের মতো হলুদ তার রং। পাঁচিলের ছায়া তুলসীমঞ্চ ছাড়িয়ে অর্ধেক উঠোন পর্যন্ত চলে যায়। পেয়ারা গাছে ফিরে আসে পাখির ঝাঁক। সেই অলৌকিক হলুদ আলো-আঁধারিতে মা কুঁজো হয়ে সড়সড় করে উঠোন ঝাঁট দেয়, বিড়বিড় করে কী যেন কথা বলে নিজের সঙ্গে।

দুপুরের ঘুম থেকে উঠে ললিত উঠোনের সিঁড়িতে বসে অলস দুর্বল শরীর আর ঝিম-ধরা মাথায় উঠোনের সেই অলৌকিক আলো দেখে বোকা-চোখে চেয়ে থাকে। মনে হয়— সে জেগেছে অন্য এক গ্রহের বিকেলে। এ সব চেনা পৃথিবীর দৃশ্য নয়।

ঝাঁট দেওয়া শেষ হলে মা ঘটি থেকে জলছড়া ছিটিয়ে দেয় সারা উঠোন। তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়, শাঁখ বাজায়। ঠিক সেই সময়ে দূরে কোথাও বাচ্চা ছেলেদের খেলা ভাঙে—তাদের হাসি-চিৎকারের শব্দ ভেসে আসে। আর তখন, ললিতের চোখের সামনে স্বল্পস্থায়ী হলুদ আলোটি ক্রমে মুছে যায়। কোথা থেকে উঠোনে এসে পড়ে বিষণ্ণ সব ছায়া আর ছায়া। ভেজা মাটির গন্ধ মন্থর বাতাসে ভারী হয়ে ওঠে। ললিত দরজার কাঠে তার মাথা হেলিয়ে দেয়, হাঁটু মুড়ে বাচ্চা ছেলের মতো বসে থাকে। হয়তো তখন মা তাকে ডেকে বলে, ঘরে যা ললিত, এখন বড় হিম পড়ে। কিন্তু ললিত সে-কথা শুনতেই পায় না। কেননা তখন অপরাহ্ণের নিঃশেষ আলোয়, দীর্ঘ গাঢ় ছায়ার দিকে চেয়ে থেকে সে বহুদূরের এক নিস্তব্ধতার কণ্ঠস্বর শোনে। তার সামনে ছোট্ট উঠোনটায় শব্দহীন ভাবে শেষ হয়ে যায় একটি দিন। দিন যায়। ললিতের দিন যায়। মহামূল্যবান এক-একটি দিন।

সন্ধ্যাবেলাতেই মায়ের রান্না শেষ হয়ে যায়। তখন মাঝে মাঝে মায়ে-পোয়ে লুডোর ছক ফেলে বসে। অদ্ভুত নিয়মে তাদের খেলা হয়। তারা কেউ কারও গুটি খায় না। যে আগে ঘরে পৌঁছয় তার জিত। এ তাদের নিজস্ব নিয়ম। কেউ বাধা দেয় না তাদের, ভুল ধরে না। তাই অদ্ভুত নিয়মে চলে খেলা।

কোনও দিন বা গলির সামনে পাড়ার রাস্তায় আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় ললিত। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে দু'দণ্ড কথা বলে। সত্যদাসের মুদির দোকানের সামনে বাঁশের খোঁটায় বাঁধা বেঞ্চে গিয়ে

কোনও-কোনওদিন বসে। রান্না করতে করতে গিন্নিদের মশলা ফুরোয়। তাই তখন পড়া ফেলে বাচ্চা ছেলে কি মেয়েটাই আসে মায়ের জন্য এক পোয়া তেল কি দু' আনার গরমমশলা নিতে। একটু সময় কাটিয়ে যায় ললিত। ছেলেবেলায় কত গেছে পড়া ফেলে মায়ের মশলা আনতে। সত্যদাসের দোকানে বাচ্চাদের ভিড় দেখে ললিত, সবাইকে চিনতে পারে না। মাঝে মাঝে সত্যদাসকে ডেকে বলে, ও মেয়েটা কে বলো তো!

ক্লাবের সামনে জটলা করে শম্ভু-সুবলরা। ললিত পারতপক্ষে সেদিকে যায় না। তাকে দেখলে ওরা এখনও সিগারেট লুকোয়। তাই সত্যদাসের দোকানে বসে রাস্তা দেখে ললিত। কখনও সেই রাস্তা ধরেই হা-ক্লান্ত, বিষণ্ণ, চিন্তিত মুখে কপালে ভাঁজ ফেলে তুলসীকে আসতে দেখা যায়। বড় খুশি হয়ে ওঠে ললিত। সারা দিন সে মানুষের জন্য অপেক্ষা করে। যে-কোনও মানুষ আসুক তার কাছে। তুলসীর সঙ্গে কিন্তু আড্ডা জমে না। তুলসী গিয়ে রাজ্যের গল্প ফেঁদে বসে মায়ের সঙ্গে। বুড়োদের মতো সংসারী কথা বলে।

বাবার বাৎসরিক কাজের দিন ঠিক করতে এক দিন এসেছিলেন মাধব চক্রবর্তী। ললিতকে ডেকে বললেন, পৈতেখানা ফেলে দিয়েছিস, তোরা কী রে?

পৈতেটা ঠিক ফেলে দেয়নি ললিত। কবে যেন বহুকাল আগে পুবনো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল পৈতে, সেটা ছেড়ে ফেলেছিল। তারপর আর পরা হয়নি। ললিত চুপ করে থাকে।

মা খুঁজে-পেতে ঠাকুরের সিংহাসনের তলা থেকে একটা প্যাকেটের পৈতে বের করে বলে, ঠাকুরমশাই, গেরোগ্রন্থি দিয়ে রেখে যান। আমি ওকে পরাব।

তখন মাধব চক্রবর্তী ললিতকে গাল দিতে দিতে বসলেন গ্রন্থি দিতে। ললিত সুতো ধরল, মাধব চক্রবর্তী পদ্মাসনে বসে হাঁটুতে সুতোর প্যাঁচ দিতে দিতে হেঁকে বললেন, চণ্ডীখানা পড়িস? তোকে শিখিয়েছিলাম পড়তে!

তারপর আপন মনে হায় হায় করেন মাধব, আচমন ভুলে গেলি, গণ্ডূষ ভুলে গেলি... এরপর গায়ত্রী ভুলবি, গোত্র ভুলবি, কোন ঋষির পুত্র তা ভুলবি, শেষে বাপের নামও মনে পড়বে না...

অনেকটা পর অবিরল হাসতে পারে ললিত।

মাধব চশমা তুলে তাকান, চণ্ডীখানা পড়িস ললিত। তোকে যে পকেট-চণ্ডীখানা দিয়েছিলাম— আছে সেটা?

ললিত ঘাড় নাড়ে। আছে।

পড়িস। চণ্ডীপাঠে রোগ সারে। আমি চল্লিশ বছর পড়ছি। দ্যাখ, আমার শরীরে রোগ নেই।

ললিতদের দেশের গ্রামে পুরুত ছিলেন মাধব। এখানে কাছাকাছিই থাকেন। এখন আসেন কালেভদ্রে। বাবা বেঁচে থাকতে কিন্তু রোজ সন্ধেবেলা মাধব তাঁর লক্ষ্মীনারায়ণের পুজো সেরে আসতেন ললিতের বাসায় খবরের কাগজ পড়তে। চাদরে ঢাকা দিয়ে রেকাবে আনতেন সামান্য প্রসাদ। ললিতের তখন টাইফয়েড চলছে। সারা বিকেল সে তার নলীর মতো ঘাড়খানা উঁচু করে মাধবের জন্য দরজার দিকে চেয়ে থাকত। মাধব এসে হাতে দিতেন আলোচাল-মাখা একটু কলা, একটি বাতাসা, এক টুকরো নারকেল কিংবা আখ। সেই প্রসাদটুকু কতক্ষণ ধরে রেখে রেখে টুক টুক করে পাখির মতো অল্পে অল্পে খেত ললিত— পাছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়! সারা দিনে ওইটুকুই মাত্র কুপথ্য সে করতে পারত। প্রসাদ বলে মা কিংবা বাবা আপত্তি করত না। প্রসাদটুকু শেষ করে ললিত চিঁ চিঁ করে দুর্বল গলায় বলত, ঠাকুরমশাই, আপনার খাওয়ার গল্প বলুন। মাধব হাসতেন, তারপর ফেঁদে বসতেন গ্রামের এক কৃপণ বুড়িকে ভজিয়ে কীভাবে দেড় সের সর খেয়েছিলেন সেই গল্প। সেই সূত্রে আরও কত খাওয়ার গল্প এসে পড়ত। শুনতে শুনতে ঢোঁক গিলত লোভী ললিত, শূন্যমুখে স্বাদ পেত সেইসব খাবারের। 'ভাল হয়ে অনেক-অনেক রকমের খাবার খাব' ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ত সে। মাধবকে কী যে ভাল লাগত তখন!

এই সেই মাধব। কিন্তু মাধব এখনকার ললিতকে কী দিতে পারেন— যা ললিত কৃপণের মতো যত্নে নেবে হাত পেতে! আছে কি মাধবের কাছে কিছু— সেই অলৌকিক স্বাদযুক্ত প্রসাদের মতো? কিছু নেই। তবু ললিত স্নান করে পৈতে পড়ল। পরে নিজেকে শিশুর মতো বোধ করল সে। রুগ্ণ এক

শিশু— যে-শিশুর মাধবের কাছে রোজ এক প্রত্যাশা থাকত। ঠিক সেইরকম পৈতে পরে সে এই পৈতেটার কাছ থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করতে লাগল। হয়তো তা আরও কিছুদিনের জীবনীশক্তি, নিরাপত্তা, অভাবমোচন কিংবা এমনকী নারীপ্রেম।

দু'-একদিন এ-রকম শিশু হওয়ার নেশা তাকে পেয়ে বসল। পকেট-চণ্ডীখানা দুপুরে খুলে বসল সে। খুলল শেষের দিকের পাতা, যেখানে চণ্ডীপাঠের ফল দেওয়া আছে। সংকল্প ও পূজা করার পর এক বার পাঠ করলে ও বলিদান করলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।... চৌদ্দবার পাঠ করলে স্ত্রী ও শত্রু নিজের বশ হয়ে থাকে... কুড়িবার আবৃত্তি করে পাঠ করলে মানুষ দুষ্টব্রন বা বিষফোঁড়া থেকে আরোগ্য লাভ করে। তারও পর আছে "সংকট উপস্থিত হইলে, দুশ্চিকিৎসা ও ব্যাধিতে, প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হইবার সময়ে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইলে, অতিপাতক হইলে, যত্নের সহিত একশোবার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করিবে। তাহাতে বিপদ নষ্ট হইয়া এই জন্মে মঙ্গল ও পরজন্মে পরমগতি লাভ হয়।"

পড়তে পড়তে কেমন একটা লোভ ঘনিয়ে ওঠে মনের মধ্যে। উত্তেজনা বোধ করে ললিত। আত্মবিস্মৃতের মতো উঠে বসে। অতীতের ললিতকে ভুলে গিয়ে পরিপূর্ণ এক নবজাতক শিশু হয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সে গুনগুন করে পাঠ করতে থাকে, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ দেব্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্যাসায় নমঃ, ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ...

পড়তে পড়তে নিজের চারধারে সেই রোমহর্ষকারী শৈশব টের পায় ললিত। যখন কেবল প্রত্যাশা আছে, আছে প্রসারিত দীর্ঘ আয়ু, নির্ভরতা আছে। যেন বা কোলের ললিতকে শক্ত হাতে বুকে আঁকড়ে আছে মা। আর ভয় নেই।

এক বার শিশু হয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই। ভাবতে ভাবতে সারা দুপুর ঘরময় অস্থির পায়চারি করে, সিগারেট ধরায়। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। আবার ফিরে এসে শ্রীশ্রীচণ্ডী খুলে বসে, বিড় বিড় করে বলে, এতকাল ধরে আমি যা শিখেছি সব ভুলিয়ে দাও। আবার নির্বোধ করে দাও। আবার যেন এইসব বিশ্বাস করতে পারি, ছেলেবেলায় যেমন করতুম।

এখন অনেকটাই সেরে গেছে বিমান। পাড়ার এক চেনা কম্পাউন্ডারকে ধরে ওর ব্যান্ডেজ পালটানোর বন্দোবস্ত করেছিল ললিত। ছ'-সাত দিনের মধ্যেই ব্যান্ডেজের সংখ্যা কমে গেছে অনেক। কেবল মাথার চারধারে একটি পট্টি এখনও আছে। ব্যান্ডেজ খোলার পর বিমানের মুখখানা দেখে খুব আবছাভাবে ললিতের মনে পড়েছে যে, এ-মুখ সে কোথাও দেখেছে। হয়তো কলেজের সিঁড়িতে উঠতে নামতে, কিংবা করিডোরে, পথসভার ভিড়ে, হয়তো রমেনের বাড়ির জমায়েতে। এর চেয়ে বেশি কিছু মনে পড়েনি। কলেজ জীবনে হাজারটা ছেলে ঘিরে থাকত ললিতকে— তাদের সকলের মুখ ভিড়ের মুখের মতো, একই রকমের দেখতে।

বিমানের খাবার দু'বেলাই টিফিন ক্যারিয়ারে করে পৌঁছে দিয়ে আসে ললিত। আজকাল বড় লজ্জা পায় বিমান, বলে, আমি বেশ ভাল আছি। রেঁধে খেতে আর অসুবিধে নেই। আর তোমাদের অন্ন ধ্বংস করার মানে হয় না।

ললিত হাসে, অন্ন ধ্বংস হয় আর কোথায়! তুমি তো এইটুকু খাও।

খাওয়ার পরে বিমান ললিতের টিফিন ক্যারিয়ার নিজেই মেজে দেয়। তারপর তারা কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে। সিগারেট ধরিয়ে গল্প করে।

কোনও দিন বিমান বলে, ললিত, তুমি কলেজে যে রকম বক্তৃতা করতে ঠিক সে-রকম আবার শুনতে ইচ্ছে করে। এক দিন শোনাবে একটু?

ছেলেমানুষি দেখে ললিত হাসে। মাথা নেড়ে বলে, সব ভুলে গেছি হে।

কথাটা শুনে বিমান অনেকক্ষণ ভাবে। ভেবে চিন্তে বলে, সে-সব কথা কি তুমি প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে না ললিত? করলে কী করে ভুলে যাবে? তোমার সে-সব বক্তৃতা এমন মারাত্মক নেশা জাগাত আমার মধ্যে যে কত বার ভিতরে ভিতরে ওলট-পালট হয়ে গেছি। কখনও একা ঘরে আমি ঠিক তোমার নকল করে বক্তৃতা করতুম, চোখ বুজে কল্পনা করতুম আমাকে ঘিরে সামনে-পিছনে চারধারে

অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে শুনছে আমার কথা। কথা শোনা শেষ হলেই তারা মার-মার করে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমি তো জানো যে আমি কারও সঙ্গেই কথা বলতে পারতুম না। কিন্তু সে সময়ে আমি একজন বড়লোকের মেয়েকে পড়াতুম। বাচ্চা মেয়ে— সব কথা ভাল বুঝত না। তাই তাকে আমার লজ্জা ছিল না। তোমার বক্তৃতা শুনে আমার এমন নেশা ধরে গিয়েছিল যে সেই বাচ্চা মেয়েটিকে আমি মাঝে মাঝে নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের কথা বলতুম। বলতুম, একদিন সেইসব বঞ্চিত মানুষেরা তাদের সব সম্পত্তি কেড়ে নেবে। তারপর বিচার করবে, দণ্ড দেবে, ধ্বংস করবে তাদের। ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের সুফল কী তা সেই মেয়েটি বুঝত না। কিন্তু তবু সে ভারী ভয় পেয়ে যেত। যেমন বাচ্চা মেয়েরা তাদের পুতুল কেউ কেড়ে নেবে শুনলে ভয় পায় ঠিক সেইরকম ভয় পেত। বুকের ফ্রক খামচে ধরে শুকনো মুখে চেয়ে থাকত। তার সেই ভয়টুকু আমি বেশ উপভোগ করতুম। অন্তত ওই একটা জায়গায় আমার বক্তৃতা বেশ সফল হত।

একটু চুপ করে থাকে বিমান, তারপর দুঃখের সঙ্গে বলে, কিন্তু হায়, তুমি সে-সব কথা ভুলেই গেছ!

সত্যিই যে ললিত সব কথা ভুলে গেছে তা নয়। এখনও কথাগুলো মাঝে মাঝে তার ভিতরে ওড়াউড়ি করে। কিন্তু সে-সবের আর কোনও দংশন নেই। ললিত তাই সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলে, কিন্তু সে-সব কথা তো এখন আর তুমি বিশ্বাস করো না!

বিমান মাথা নাড়ে, না, করি না।

তবে আবার শুনতে চাও কেন?

এমনিই। তোমাকে আবার আমার ও-রকম দেখতে ইচ্ছে করে। তোমার ধারালো মুখখানা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। শক্ত হয়ে ফুলে উঠছে চোয়াল, পাকানো মুঠি তুলে ধরে শপথ করছ, তোমার শরীর নড়ছে চাবুকের মতো। সেইসব ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতুম আমি। তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলুম বলে তোমার কথাই আমার কথা হয়ে উঠেছিল। আবার তোমাকে সে-রকম দেখলে, হয়তো আবার আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করে ফেলব। তুমি কি সত্যিই ভুলে গেছ?

ললিত মৃদু ম্লান হাসে, বলে, ভুলিনি। কিন্তু তোমাকে সে-সব আর বিশ্বাস করাতে চাই না।

কেন চাও না ললিত?

ললিত উত্তর দেয় না।

বিমান আস্তে করে বলে, তবে কি এখন বুঝতে পেরেছ যে তুমি সে-সব কথা ভুল বলতে? তাই আমাকে বলতে চাও না?

ললিত কেবল মৃদু হাসে।

বিমান অনুচ্চস্বরে বলে, এ-কথা ঠিকই যে তুমি ভুল বলতে। মানুষকে সমষ্টিগতভাবে দেখার মধ্যেই একটা বিরাট ভুল আছে। কিন্তু তুমি তাই দেখতে। দ্রুত সমাজ পালটানোর জন্য তুমি চেয়েছিলে বিপ্লব, আর বিপ্লবের জন্য জড়ো করতে চাইছিলে মানুষ। তাই তোমার কাছে সমষ্টিই বড় ছিল। ভিড়কে চিনেছিলে কেবল। বিচ্ছিন্ন মানুষটা ভিড় থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়ালেই তুমি আর তাকে চেনোনি। তাই না ললিত? অথচ যে-মানুষটা মিছিলে পতাকা বহন করে যায়, যে তোর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়ে আসে সেই মানুষটাই হয়তো সময়ের চাষ ফেলে রাখে, বুড়ো বাপকে খাটায়, বীজধান খেয়ে ফেলে, অন্যের খেত থেকে ধান চুরি করে। দাঙ্গা করে জেল খেটে আসে, জোর করে কেড়ে নেয় বউয়ের গয়না— তখন তাকে কে দেখেছে ভাল করে? স্বভাববশত এ লোকটাই একদিন হয়তো তার সর্বস্ব হারায়। এ রকম হাজারটা লোক আসে তোমার বিপ্লবে। তাদের মধ্যে ক্ষমতাব লোভ থাকে, হিংসা থাকে, থাকে প্রতিশোধস্পৃহা, কাম ও মাৎসর্য। কিন্তু তুমি তার স্বভাব বিচার করো না। তোমার কাছে তার সর্বস্ব-হারানোটাই মহত্তর গুণ, তাই তুমি তাকে সর্বহারা বলে বুকে জড়িয়ে ধরো, বিপ্লবের অংশীদার করে নাও, সিংহাসনে বসাতে চাও তাকে। কখনও ভেবেও দেখ না সর্বস্ব যে হারায় সে কী ভীষণ ডিসকোয়ালিফায়েড। কিন্তু মানুষকে সমষ্টিগতভাবে দেখতে শিখেছ বলেই তুমি মনে করো সমাজের ব্যবস্থাই তার সর্বস্ব হারানোর কারণ। সমাজ পালটালেই মানুষ পালটে যাবে। তাই না? তাই তুমি তাকে বিপ্লবে ডাক দাও, তাকে লোভ দেখাও যে তার সব অভাব দূর করে দেবে।

ললিত বাধা দিয়ে বলে, সবাই কি এই রকমের?

না। সবাই এই রকমের নয়। সত্যিকারের নিপীড়িতরাও আসে, আসে মুনাফাখোর বুর্জোয়ার চরও, আসে ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশী কিছু মানুষ। আমরা রোজ যে-সব নানা ত্রুটিযুক্ত মানুষকে চারধারে দেখছি তারাই। তুমি বিপ্লবের আগে তাদের সংশোধন করে নাও না, নির্বিচারে টেনে নাও দলে। কাজে লাগাও তার শক্তিকে। তোমার সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এদের স্থূল শক্তি এবং হিংস্রতা। তুমি যথেষ্ট পরিমাণে এ দু'টিকে জাগিয়ে তোলো, ফলে জেগে ওঠে ব্যক্তিগত লোভ এবং প্রতিশোধস্পৃহা, ফলে সে খুব হিংস্রভাবেই আক্রমণ করে, সমাজকে চুরমার করে দেয়। কিন্তু বিপ্লবের মাঝপথে সে হঠাৎ থেমে পড়ে, দ্রুত খুঁজতে থাকে মুনাফা, প্রবৃত্তির নানা তৃপ্তি— তার কাছে সেগুলিই বিপ্লবের ফসল। সে বহুকাল ভাল খাবার খায়নি, দূর থেকে ধনীদের জীবনযাত্রা দেখে ও রকম জীবনযাত্রার যে লোভ তার বরাবর হয়েছে তা মেটেনি, সে কখনও কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়নি, মানুষকে নিপীড়ন করার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা ভোগ করেনি। অথচ এই লোভগুলি তার দুর্জয়ভাবে রয়ে গেছে। তাই তখন তার মধ্যে জেগে ওঠে অমোঘভাবে বুর্জোয়ার শ্রেণীচরিত্র। কিন্তু পুরনো ধরনের বুর্জোয়াদের মতো তার হাতে পুঁজির কর্তৃত্ব থাকে না বলে সে আরম্ভ করে ক্ষমতা দখলের লড়াই। নিজের পালকের পাখি খুঁজে সে তৈরি করে প্রতিক্রিয়াশীল জোট। তখন আবার নতুন লড়াই শুরু হয় এই শ্রেণীর সঙ্গে, কিংবা এ-রকম একাধিক শ্রেণীর সঙ্গে। সে-লড়াইয়েও দু'পক্ষেই থেকে যায় বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্রের লোক, শোধনবাদী এবং প্রতিবিপ্লবী। ফলে লড়াই আর শেষ হয় না। বহুভাগে ভেঙে যায় মানুষের আদর্শ, তৈরি হতে থাকে বহু দল। তখন, যারা মানুষের সত্যিকারের ভাল করতে চায় তারা নতুন করে 'মানুষ' কথাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। খুঁজতে শুরু করে মানুষের মূল। তারা দেখে সমাজ পালটালেও মানুষের প্রবৃত্তি পালটায় না— সেই দমননীতি, সেই ক্ষমতা দখল, সেই প্রতিবাদের পথ রোধ করা— যা কিনা ছিল বুর্জোয়ার শ্রেণীবৈশিষ্ট্য সেটাই অন্য চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। তাই মূল থেকে পালটাতে হবে মানুষকে।

বিমান একটুক্ষণ ললিতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, অবশ্য এখনও তুমি সে-কথা ভাবতে শুরু করোনি। কিন্তু মনে হয়, তোমার ভিতরে ক্লান্তি এসেছে। ভিড়ের মুখ তুমি বোধহয় আর দেখতে চাও না। এবার হয়তো তুমি মানুষের মূল খুঁজতে শুরু করবে। আমিও খুঁজছি।

ভীষণ প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে ললিতের। সে জানে এগুলো সব ঠিক কথা নয়। কিন্তু বিমান পাগল বলেই সে এর প্রতিবাদ করে না। চুপচাপ বসে শোনে। মৃদু একটু হাসে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ফিরে আসে সে। ফেরার পথে প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, তার তলায় বাঁধানো বেদি। সেইখানে একা চুপ করে বসে ললিত। টিফিন ক্যারিয়ারটা পাশে রেখে একটা সিগারেট ধরায়। এতকাল যে-সব কথার পোকাগুলো নির্বিবাদে এলোমেলো ওড়াউড়ি করত মনে, সেগুলো হঠাৎ দলবদ্ধ দংশন শুরু করে। মানুষকে ডেকে আবার কথা বলতে ইচ্ছে করে তার। জোট বাঁধতে ইচ্ছে করে আবার। সে সামনের শূন্য অন্ধকার জায়গাটার দিকে চেয়ে হঠাৎ মৃদুস্বরে বলে, কমরেডস্, আমি ভুলে গিয়েছিলাম সংগ্রামের কথা। আপনারা আমাকে মাপ করবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আবার আমি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে ফিরে আসব, ভেঙে দেব প্রতিক্রিয়াশীল জোট, সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে মিলিত করব...

কিন্তু বড় ক্লান্তি লাগে। মাথা উত্তেজিত থাকে বলে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসতে চায় না। বিছানা গরম হয়ে ওঠে শরীরের তাপে। ললিত উঠে বাইরের সিঁড়িতে এসে বসে, সিগারেট খায়। বিড়বিড় করে বলে, শৈশবে ফিরে যাওয়া নয়, আমরা চাই তাড়াতাড়ি যৌবনকে পেতে। আমরা অতিক্রম করতে চাই অর্থনৈতিক শৈশব, রাজনৈতিক চেতনার শৈশব, আমরা চাই সমৃদ্ধির যৌবনকে...

ললিত ভাবে, এক দিন সে যাবে অবিনাশের কাছে, গিয়ে বলবে, আমি আবার পার্টিতে আসতে চাই। তুমি ব্যবস্থা করে দাও। হ্যাঁ, কালকেই যাবে, কাল সকালেই। আর সময় নষ্ট করবে না।

কিন্তু সকালবেলা থেকেই অন্য রকম সব ঘটনা ঘটতে থাকে।

চা খেতে খেতে খবরের কাগজ দেখছিল ললিত। অনেককাল দেশের রাজনৈতিক খবরগুলোর কোনও খোঁজ রাখেনি সে। তাই মন দিয়ে পড়ছিল। এমন সময়ে সুবল এসে ডাক দেয়, ললিতদা, একটু কথা আছে। গলিতে আসুন।

গলির মুখে ললিতকে নিয়ে গিয়ে খুব উত্তেজিতভাবে বলল, ললিতদা, সেই মেয়েটাকে আমরা ট্রেস করেছি।

ললিত অবাক হয়ে বলে, কোন মেয়েটা?

সুবলের মুখ হঠাৎ রাঙা হয়ে ওঠে, মাথা নামিয়ে নিয়ে বলে, ওই যে, যে-মেয়েটা আপনার বন্ধু বিমান রক্ষিতের কাছে আসে।

মেয়েটার কথা ভুলেই গিয়েছিল ললিত, বলল, সে মেয়েটা কী করেছে?

সুবল ক্ষীণ হাসে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, কী আবার করবে! পাড়ার মধ্যে একজন মেয়ে একটা ব্যাচেলারের কাছে আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে কথাবার্তা বলে, পাড়ার বাচ্চা-কাচ্চা ছেলেমেয়েরা এ-সব দেখছে...এ তো ঠিক নয়, তাই আমরা একটু খোঁজ-খবর করেছি।

ললিত শুনে একটু লজ্জা পেল। বিমান তার সহপাঠী, বন্ধু। তার কাছে কে এক মেয়ে আসে তা নিয়ে বয়সে ছোট সুবলের সঙ্গে আলোচনা করতে তার ইচ্ছে হল না। শুধু বলল, কী খোঁজ পেলি?

দেখলাম বিরাট বড়লোকের মেয়ে। হিন্দুস্থান পার্কে ওদের বাড়ি। বাড়ির চারধারে কম্পাউন্ড আর বাগান, দু'-তিনটে গাড়ি আছে, কুকুর আছে, ছাদের ওপর পাথরের পরি...

বলতে বলতে সুবল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে নিজে হয়তো উত্তেজনা টের পায় না। কিন্তু ললিত পায়। সুবলের চোখ চকচকে হয়ে আসে, কালো মুখটাতে কয়েকটা শিরা জেগে ওঠে আস্তে আস্তে। বলে, মেয়েটা লেডি ব্র্যাবোর্নে পড়ে, গান জানে--ফাংশনে গায়। এ-রকম মেয়ের সঙ্গে ওই লোকটার কী সম্পর্ক? এ-লোকটা কর্পোরেশনের জমাদারদের টিপসই বাবু, গরিবের পয়সা ঘুষ খায়, রোগা হাড়গিলে চেহারা— এর সঙ্গে কি ও মেয়ের সম্পর্ক হওয়া উচিত? আপনার বন্ধু, তাই বেশি কিছু বলতে চাই না ললিতদা, কিন্তু আমার মনে হয় লোকটা মেয়েটাকে ব্লাফ দিয়ে ভুলিয়েছে। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে লাইফের মতো নিশ্চিন্ত— লোকটা সেই তালেই ছিল। কিন্তু বোধ হয় মেয়েটার অন্য কোনও লাভার ব্যাপারটা জেনে গুন্ডা দিয়ে ঠ্যাঙান দিয়েছে লোকটাকে। ও-সব ছিনতাই পার্টির গল্প আপনি বিশ্বাস করেন? যারা ছিনতাই করে তারা এমন মরকুটে হাভাতে লোককে ধরবে কেন? ওরা লোক চেনে।

ললিত গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, তোরা এখন কী করতে চাস?

সুবল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আপনার বন্ধু— তাকে আর আমরা কী করব? আপনি শুধু ওকে একটু সাবধান করে দেবেন, পাড়ার মধ্যে থেকে যেন এ-সব না করে। ও সব মেয়ের দিকে হাত বাড়ানো কি ওর উচিত? আপনিই বলুন না! ওদিকে মেয়েটাও হয়তো লোকটার হিস্ট্রি জানে না— এ-রকম তো হয় আজকাল—অচেনা লোক গিয়ে নানা রকম ব্লাফ দিয়ে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে— তাই আমাদেরও উচিত মেয়েটাকে বাঁচানো। আমরা মেয়েটাকেও সাবধান করে দেব।

ললিত কোনও উত্তর দেয় না। তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। অন্যমনস্কভাবে ঘরে চলে আসে। বিমানের জন্য নয়, সেই অচেনা মেয়েটার জন্যও নয়, বরং সুবলের জন্যই কেমন যেন চিন্তা হতে থাকে ললিতের। ওর চকচকে চোখ, কথা বলার উগ্র ভঙ্গি, অস্থিরতা—এর মধ্যে কী একটা যেন রয়েছে যা অস্বস্তিকর। বড়লোকের সুন্দর মেয়েটা বিমানের কাছে আসে— এটা কি সইতে পারছে না সুবল? না পারাই অবশ্য স্বাভাবিক। বিমান হাড়গিলে, রোগা, ভিতু, দুর্বল, জীবনে অসফল একজন মানুষ— এ-রকম লোকের কাছে কোনও মূল্যবান কিছু দেখলেই নিতান্ত নিরীহেরও ইচ্ছে করবে ওকে দু'ঘা থাপ্পড় দিয়ে জিনিসটা কেড়েকুড়ে নিতে।

শম্ভু-সুবলরা কি জানে যে, একসময়ে ললিতও বড় বাড়ির মেয়ে মিতুর জন্য পাগল হয়েছিল? মিতুকে বাসায় ডেকে এনে ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি করানোর অক্ষম চেষ্টা করেছিল ললিতের বোকা মা? আর, তারপর থেকে ললিত মুখ তুলে রাস্তায় হাঁটতে পারত না? ওরা কি জানে যে, এখনও মিতু বাপের বাড়িতে এসেছে খবর পেলে ললিত অস্বস্তি বোধ করে? না, শম্ভু-সুবলেরা জানে না। কী করে জানবে! ওরা তখন বাচ্চা ছেলে—হাফপ্যান্ট পরে লাল-নীল রবারের বল নিয়ে রাস্তা আটকে ফুটবল খেলে। জানলে কখনও সুবল ললিতকে এমন নিষ্ঠুরের মতো বলতে পারত না— এ-রকম বাজে লোকটার সঙ্গে কি ও-রকম মেয়ের সম্পর্ক হওয়া উচিত? আপনিই বলুন না!

মিতুর কথা মনে পড়লেই এক নিস্তব্ধ পৃথিবীতে চলে যায় ললিত। যেখানে ললিতের ব্যর্থতাগুলি থরে থরে সাজানো রয়েছে। মিতু তাকে অবহেলা করে গেল, সে হল না সংগ্রামী মানুষের নেতা, হয়ে উঠল না সফল মানুষ। যৌবনের মাঝপথে বেলাশেষের হলুদ আলোটি এসে পড়েছে এখন। দূরবর্তী এক নিস্তব্ধতা আসছে তার দিকে। মূক করে দিয়ে যাবে তাকে। তাই মাঝে মাঝে অস্থিরভাবে মায়ের কাছে চলে আসে ললিত। মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলে, আমার মাথায় একটু হাত রাখো তো মা। একটু হাত রাখো।

মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, কেন রে?

ললিত বিড় বিড় করে বলতে থাকে, সব ভুলিয়ে দাও তো মা, ভুলিয়ে দাও তো। বুদ্ধি, স্মৃতি, অবিদ্যা, ভুলিয়ে দাও। আবার ছোট ললিত হয়ে কোলে ফিরে যাই...

## ৷৷ পনেরো ৷৷

পরদিনই কলেজে রাকা শাশ্বতীকে ধরল, আমার দাদাকে কেমন লাগল বল।

উদাসীন গলায় শাশ্বতী বলে, ভালই তো।

দাদা বলেছে তোর সঙ্গে একটা সিরিয়াস কথা আছে ওর। শিগগিরই এক দিন গাড়ি নিয়ে আসবে। আমরা গঙ্গার ঘাটে যাব তোকে নিয়ে। হ্যাঁরে তোদের কী কী কথা হল কাল?

শাশ্বতী কেমন ঠান্ডা বোধ করে নিজেকে। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।

থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস ছিল না। শাশ্বতী কমনরুমের জানালার কাছে বসে খাতায় হিজিবিজি মুখ আঁকছিল— যেমন সে প্রায়ই আঁকে। এমন সময় শিবানী এসে ডাকল, এই।

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

শিবানী চোরাহাসি হেসে বলল, তোর তিনি এসে দাঁড়িয়ে আছেন গাছতলায়। শিগগির যা।

শাশ্বতী অবাক হল না। আজ আদিত্য আসবে—এমনটা সে আশা করেছিল। প্রায়ই অফিস থেকে পালিয়ে আসে।

অন্য দিনের মতো চমকে উঠে ছুটল না শাশ্বতী। খুব গড়িমসি করে খাতা বন্ধ করল, দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক করল শাড়ি, কপাল থেকে সরাল কয়েক কুচি চুল। বুকের মধ্যে অকারণে একটু ধকধক করছে আজ। হয়তো সে আদিত্যর চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারবে না।

গাছের ছায়ায় আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে। গালের দাড়ি পরিষ্কার কামানো, পাটভাঙা ধুতি আর সাদা শার্ট পরনে, চুল আঁচড়ানো— এ-রকম পরিচ্ছন্ন তাকে বড় একটা দেখা যায় না। যেদিন দাড়ি কামায় সেদিন ময়লা জামা পরে সে, যেদিন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে সেদিন চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়। আজ সবকিছু একসঙ্গে করেছে সে। কাছে গিয়ে—এমনকী—পাউডারের একটু মৃদু গন্ধও পেল শাশ্বতী।

আদিত্য হাসে না, তার মুখ গম্ভীর। বলে, কাল কোথায় গিয়েছিলে?

একজন বন্ধুর সঙ্গে, রেডিয়ো স্টেশনে। শাশ্বতী চোখ নিচু করে বলে।

শুনলাম একটা গাড়িতে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের সঙ্গে গেছ। ছেলেটি কে?

জবাবদিহি চাইবার সুরটা তার ভাল লাগে না, তবু শান্ত গলায় বলে, ও রাকার দাদা সুমন্ত।

খুব জরুরি কাজে গিয়েছিলে?

না। এমনিই, সঙ্গ দিতে।

একটু চুপ করে থাকে আদিত্য। মাথার পাট করা চুল থেকে একটা ঘুরলি আঙুলে পাকায়, তারপর হঠাৎ খুব অদ্ভুত গলায় বলে, কাল তোমার দেখা পেলে আমার একটা সর্বনাশ হত না।

শাশ্বতী চকিত চোখ তুলে আদিত্যকে দেখে, বলে, কী সর্বনাশ?

শ্বাস ফেলে আদিত্য বলে, বলব। এখানে তো বলা যাবে না। চলো কোথাও গিয়ে বসি।

শাশ্বতী ইতস্তত করে বলে, এস-বি'র ক্লাসটা রোজ কামাই হচ্ছে। ক্লাসটা করে যদি—

অধৈর্য হয়ে তাড়া দেয় আদিত্য, আঃ! বলছি জরুরি কথা আছে!

একটু কেঁপে ওঠে শাশ্বতী। আদিত্য এমন ধমকাতে পারে জানত না।

আদিত্য আবার ধমকায়, কী! যাবে?

শাশ্বতী মৃদু স্বরে বলে, চলো।

বালিগঞ্জ স্টেশনে যাওয়ার রাস্তায় বাঁ হাতি একটা রেস্টুরেন্ট আছে তাদের। প্রায়ই এখানে আসে তারা।

আদিত্য বসে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে রইল। শাশ্বতী প্রশ্ন করল না। কিন্তু তার বুকের ভিতরটা ধকধক করছিল ঠিকই।

আদিত্য আস্তে করে বলল, আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি সতী। বাবার ব্যবসায়ে নামব। কাল রাতে সব ঠিক হয়ে গেল।

শাশ্বতী বড় অবাক হয়। এ-রকম কথা ছিল না তো! বরং শাশ্বতীর ধারণা ছিল, বাবার ব্যবসাকে ঘেন্না করে বলেই একদিন আদিত্য জোর করে চাকরি নিয়েছিল। তারপর শাশ্বতীর সঙ্গে প্রেম করার সময়েই আদিত্য বুঝতে পেরেছিল যে, কোনও দিনই শাশ্বতীকে তাদের বাড়ির লোক নেবে না। কাজেই, শাশ্বতীকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধবে আদিত্য। সেইজন্যই চাকরিটা আদিত্যর খুব দরকার। এখন বাবার সঙ্গে ব্যবসায়ে নামলে পরিবার ভেঙে আলাদা হয়ে আসতে পারবে কি আদিত্য? বামুনের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেলে মেনে নেবে কি ওর বাবা? নাকি অত ভেবে দেখেনি আদিত্য!

শাশ্বতী এতসব প্রশ্ন করল না। একটু ধারালো গলায় বলল, ভালই তো। তোমার বাবাও এই চেয়েছিলেন। তুমিও সুবোধ ছেলের মতো কাজ করছ। এবার বাবার পছন্দমতো একটা বিয়ে করে ফেলো।

আদিত্য হঠাৎ রেগে যায়, এখনও তুমি সবটা শোনোনি। বাবার ব্যবসায়ে নামলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না ভাবছ?

শাশ্বতী আদিত্যর চোখে চোখ রাখে, শান্ত গলায় বলে, আমাকে তো তোমাদের পরিবার নেবে না! বিয়ে করলে তোমাকে আলাদা থাকতে হবে। বাবার ব্যবসায়ে তুমি পরিবার ভেঙে আসবে কী করে?

আদিত্য ভীষণ অস্থিরভাবে মাথার চুল টানে, ছটফট করে বলে, সে একটা ব্যবস্থা হবেই। বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলব—পায়ে ধরব।

শাশ্বতী হঠাৎ বিদ্রূপে হাসে, বলে, ব্যবসায়ে নামলে তুমি তোমার খদ্দেরদের 'বাবু' বলেও ডাকবে তো?

আদিত্য হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে, ডাকব—তাতে কী? আমার বাপ-ঠাকুরদা ডাকতে পারলে আমি পারব না কেন?

শাশ্বতী হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলে, তা হলে সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার জাত মিলবে না।

শুনে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেল আদিত্য। কয়েকবার কথা বলবার চেষ্টা করেও চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ পর বিষণ্ণ গলায় বলল, সেইজন্যই তো বলছিলুম কাল আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কলেজে এসে কাল যদি তোমাকে পেতুম তা হলে ঠিক একটা রাস্তা খুঁজে বার করতুম।

আদিত্য করুণ মুখে বসে থাকে চুপ করে। শাশ্বতীর করুণা হয় একটু। বলে, কী হয়েছিল কাল?

আদিত্য আস্তে আস্তে বলল, পরশুদিন সেই যে একটা ভুতুড়ে কাণ্ড করলুম তোমার সঙ্গে—তারপর থেকেই নিজের ওপর গেলুম ভয়ংকর রেগে। তুমি মাইরি কাঁদছিলে সেদিন বিকেলে! আমি কী সব যা-তা বলেছিলুম তোমাকে! কিন্তু কী করব সতী, নিজেকে যে আমার ভীষণ সন্দেহ। কখনও ভুলতে পারি না আমি এমন এক বেনের ছেলে, যে পয়সার জন্য একদলের পায়ে ধরতে পারে। আবার পয়সা দিয়েই কিনে নেয় আর-এক দলকে। আমাদের গদিতে গিয়ে দেখতে পাবে বাবা ক্রীতদাসের মতো হাতজোড় করে, 'বাবু' ডেকে খুশি রাখছে খদ্দেরদের, চালু রাখছে লাভজনক ব্যবসা। আবার বাড়িতে গিয়ে সেই বাবাকেই দেখতে পাবে গম্ভীর হয়ে বসে আছে শ্বেতপাথরের টেবিলের সামনে জমকালো চেয়ারে, সামনে রুপোর রেকাবে দামি ফল, চাকরবাকর বাতাস করছে তাকে, তাকে খুশি করার জন্য ছোটাছুটি করছে দাস-দাসী, বন্ধকি সোনার গয়না পরে তার পায়ের কাছে বসে আছে মা। আমাদের

পরিবারে কেউই বেশিদূর লেখাপড়া শেখে না, অক্ষরজ্ঞান হলেই পড়া ছেড়ে ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। তারপর ঠিক ওইরকম ভাবেই শেখে আত্মসম্মান ভাসিয়ে, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে রোজগার করতে, আর ঘরে এসে দেড়শো বছর আগেকার সামন্তের মতো সেই রোজগারের ফল ভোগ করতে। তুমি তো জানো না, আমার বাবার সেই পুরনো দিনের রীতি অনুযায়ী একজন রক্ষিতা আছেন শোভাবাজারের আলাদা বাড়িতে— যাকে আমরা 'মা' বলে ডাকি। এইসবই আমাদের পারিবারিক শিক্ষা। আমি এই রকম এক বেনের বাচ্চা—তাই সবসময়ে সন্দেহ হয় আমার মধ্যে কীসের যেন অভাব থেকে গেল। আমি বি এ এম এ পাশ করেও ললিতের মতো হতে পারলুম না, টাকা থাকা সত্ত্বেও হলুম না রমেনের মতো। ওরা ওদের পারিবারিক শিক্ষার গুণেই আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। ঠিক সেই কারণেই, তোমাকে ভালবাসি কিন্তু ভয়ে ভয়ে থাকি—পাছে কোনও দিন তুমি আমার শিক্ষার অভাব ধরে ফেল। তাই ললিতের কাছে তোমাকে নিয়ে গিয়েই আমি ভয় পেয়েছিলুম। তুমি তো জানো না, কী ভীষণ স্মার্ট ছেলে ছিল ললিত! আমার মতো বেনের বাচ্চাকে ও বানিয়েছিল কমিউনিস্ট। শিখিয়েছিল নিজের পরিবারকে ঘেন্না করতে। সেই কারণেই আমি বাবার ব্যবসায়ে যেতে পারিনি কোনও দিন। এ ললিতের জন্যই। কী যে বিষ ঢুকিয়েছিল ও। সেই ভয়ংকর ললিতের কী যে আকর্ষণ তা আমি জানি। তাই বারবার তোমাকে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম— ললিতকে তুমি কেমন দেখেছিলে।

হঠাৎ শাশ্বতীর বড় ভয় করতে থাকে। ছলাৎ ছল করে তার বুকের ভিতরে লাফিয়ে উঠছে হৃৎপিণ্ড, রক্তের ঝাপটা লাগছে মুখে। এ-সব টের পাচ্ছে না তো আদিত্য?

আদিত্য টের পায় না। সে নিজের কথায় ডুবে থেকেই ম্লান হাসে। বলে, যাকগে সে-সব কথা। সেদিন—অর্থাৎ পরশু—তোমার সঙ্গে ওই কাণ্ড করে যখন বাড়ি ফিরলুম তখন আমার মন-ভরা বিষ। মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে ভালবাস না। ভালবাস না, কারণ আমি ললিত বা রমেনের মতো নই, আমি এক আলাদা নিচু জাতের লোক। সেজন্য দায়ী আমার পরিবার। আমার বাবা, মা, আমাদের ওই বিশাল দুর্গের মতো বাড়িটা। তাই সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আমি সে-সবকিছুর ওপর রেগে গেলুম। বাবা তখন সদ্য রুপোর রেকাবে কাটা ফল-টল নিয়ে জল খেতে বসেছে—পিছনে পাখা-হাতে চাকর, চার দিকে দাসদাসী, সেই অবস্থাতে আমি তার সামনে গিয়ে বললুম, আপনি লেখাপড়া শেখেননি কেন? শুনে লোকটা হাঁ হয়ে গেল। তারপর তুমুল কাণ্ড। পরশু রাতেই বাবা বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমি সারা রাত ফাঁকা আস্তাবলে বসে মশা তাড়িয়ে কাল সকালে বেরিয়ে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম আর ফিরব না। কিন্তু সতী, কালই প্রথম বুঝতে পারলুম আমি বড় দুর্বল অসহায়, এত বড় কলকাতা শহরে আমি একটা যাওয়ার জায়গা ঠিক করতে পারলুম না। বন্ধুর মেসে কলাইকরা থালা দেখে খেতে পারলুম না, ওর বিছানায় শুতে গিয়ে ঘামের দাগ দেখে ঘেন্না হল। বুঝলুম আমি অভ্যাসের দাস হয়ে গেছি। ওই দুর্গের মতো বাড়ির বাইরে সর্বত্র আমি পঙ্গু, অনুপযুক্ত। তোমার কাছে এলুম দুপুরে—তখন স্নান হয়নি, খাওয়া নেই! কিন্তু তোমাকে দেখলেই আমার অনেকটা সাহস ফিরে আসত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তুমি কাল ছিলে না। গড়িয়াহাটায় দাঁড়িয়ে যখন সন্ধে পার হয়ে গেল তখন রাতের কলকাতা বিপুল এক ভয়াবহ অচেনা জায়গা বলে মনে হয়েছিল। আমি ললিত বা তুলসীর কাছে যেতে পারতুম, কিংবা সঞ্জয়ের কাছে— কিন্তু কোথাও যেতে ইচ্ছে করল না। মনে হল ওরা সবাই এক আলাদা জাতের মানুষ, ওরা স্কুল-কলেজের বন্ধু বটে কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার জাত মেলে না। ভেবে দেখলুম, আমি বাড়ি ছেড়ে এসে ভুল করেছি। ও-বাড়ির বাইরে আমি এক একঘরে। তাই রাতে আবার লজ্জার মাথা খেয়ে, সম্মান বিসর্জন দিয়ে ফিরে গেলুম বাড়িতে। সবাই বুকে টেনে নিল। মা শিখিয়ে দিল—বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চা।

চাইলে? শাশ্বতী উগ্র আগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

হাসল আদিত্য, বলল, সেই ছেলেবেলার পর থেকে বাবাকে কখনও আর প্রণাম করিনি। ঘেন্না করত। কাল পায়ে ধরলুম। বাবা বুকে টেনে নিল। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গল্প করল আমার সঙ্গে। বলল, পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ শান্তি পায় না। বলল, পারিবারিক জীবিকার চেয়ে সম্মানজনক আর কিছু নেই। আমি অনেক রাত পর্যন্ত ভাবলুম। অনেক ভাবলুম আমি। দেখলুম, ও-বাড়িতে থাকতে গেলে অন্য রকম এক মানুষ হয়ে, বাইরের মানুষের মতো হয়ে থেকে লাভ নেই।

তাতে আমার মনুষ্যত্বের কোনও উন্নতি হবে না, আর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক হবে ক্রমেই বিষাক্ত। তার চেয়ে আমি বরং এখন এই পরিবারেরই একজন হয়ে উঠি। আমার একটু শিক্ষাদীক্ষা আছে, ভাল বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ পেয়েছি আমি—কাজেই আস্তে আস্তে আমি হয়তো একদিন এই পরিবারে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারব। ব্যবসাকে করে তুলতে পারব সম্মানজনক লেন-দেন। আমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, নিজেদের সম্মান দিতে শিখবে, মানুষের মূল্য দিতে শিখবে। তারা কেউ বন্ধকি সোনার গয়না পরবে না, একই সঙ্গে দু'দলের সঙ্গে 'হুজুর' এবং চাকরের সম্পর্ক বজায় রাখবে না, তারা হবে না টাকায় কেনা মানুষ। এইরকম সব অনেক ভাবলুম আমি। শেষে অনেক রাতে বাবাকে বললুম, আমি ব্যবসায়ে নামব। সতী, আমি এই সর্বনাশটুকু করে ফেলেছি। এখন বলো, আমি ঠিক করেছি কি না!

শাশ্বতী মাথা নিচু করে ছিল। টেবিলের কাচে আঙুল দিয়ে আঁকছিল মানুষের মুখ। কথা বলল না।

অধৈর্য আদিত্য ঝুঁকে তার হাত ধরতে গেল। শাশ্বতী চট করে তুলে নিল হাত, বলল, প্রশ্নটা তো থেকেই যাচ্ছে।

কী প্রশ্ন?

আমি।

একটু চুপ করে থেকে শাশ্বতী বলল, আমাকে নিয়েই আবার তোমাদের পরিবারে গোলমাল দেখা দেবে, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হবে তোমার। তাঁরা অসবর্ণ বিয়ে মানবেন কেন?

আদিত্য ছেলেমানুষের মতো বলল, আমি বাবাকে রাজি করাবই।

যদি রাজি না হন?

আদিত্য এক বার বলতে যাচ্ছিল, তা হলে আমি চাকরি ছাড়ব না। ব্যবসা ছাড়ব। কিন্তু বলার আগে সে একটু ভাবল। ভাবতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে কয়েক দিন কেটে গেল আদিত্যর। আবার তার চুল হয়ে গেল এলোমেলো, রুক্ষ, জামার কলার উলটে থাকে, দাড়ি কামানো হয় না। অন্যমনস্কভাবে অফিসে যায়। চেয়ারে বসে থাকতে পারে না, ঘুরে বেড়ায় এ-টেবিল ও-টেবিল। ক্যান্টিনে গিয়ে চা নিয়ে একা বসে থাকে অনেকক্ষণ। অফিস থেকে বেরিয়ে অনেক দূর হাঁটে। তিন-চারদিন সে শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা করল না।

ওদিকে শাশ্বতী মাঝে মাঝে একা তার খাতা খুলে বসে। একটা ধারালো তীক্ষ্ণ নাকবিশিষ্ট মুখ সে কয়েক দিন ধরে আঁকার চেষ্টা করছে। পারছে না।

এ দিন ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ করে ইকনমিক্সের ক্লাসে যাচ্ছে শাশ্বতী, এমন সময়ে রাকা এসে ধরল, আজ দাদা আসবে। সাড়ে চারটেয় টাইম দিয়েছে। আজ কিন্তু আমি যাব না, তুই একা যাবি। দাদার সিরিয়াস কথা আছে তোর সঙ্গে।

খুব অবাক হল শাশ্বতী, বলল, কে আসবে বললি?

রাকা থমকে যায়, ভ্রূ তুলে বলে, ও মা, দাদাকে ভুলে গেছিস নাকি?

সত্যিই শাশ্বতী ভুলে গিয়েছিল। ওই খুব রূপবান যুবকটিকে তার একদম মনে ছিল না। বোধহয় সুমন্তর রূপের মধ্যে মনে রাখার মতো কিছু নেই। সে কেবল সুন্দরমাত্র—কিন্তু তা পথ আটকে ধরে না। তার দিকে এক বার তাকিয়ে চলে যাওয়া যায়। তাই শাশ্বতী ভুলে গিয়েছিল।

শাশ্বতী মুখে বলল, ওঃ। কিন্তু আজ আমার বড় কাজ আছে। আজ সময় হবে না।

সে কী! দাদা যে খুব আশা করে আসবে!

শাশ্বতী ইতস্তত করে। সে বড় নরম মেয়ে। সহজ কৌশলগুলো সে প্রয়োগ করতে জানে না। অসহায়ভাবে বলে, কী করব তা হলে?

ও-সব কাজফাজ বাদ দে। এ-কাজটা অনেক জরুরি। আজ খুব সম্ভব দাদা তোর কাছে প্রপোজ করবে।

কেমন অবশ লাগল শাশ্বতীর। খিল ধরে এল হাত-পা।

কমনরুমে এসে সে একা একা ছটফটে মন নিয়ে বসে রইল, ইকনমিক্সের ক্লাসে গেল না।

এলোমেলো ভাবনায় ভেসে যেতে লাগল সে। বুক কাঁপতে থাকল, ঘাম দিল শরীরে। এখন সে কী করবে!

দুপুরে যখন টিফিন ক্যারিয়ারটি হাতে নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল ললিত, ঠিক সেইসময়ে আদিত্য গিয়ে হাজির। উদভ্রান্তের মতো চেহারা, চোখের দৃষ্টি অস্থির, মুখ শুকিয়ে গেছে।

ললিত বলল, কী রে! অফিস নেই?

আদিত্য দু'হাত বাড়িয়ে ললিতের কাঁধ ধরে বলল, লোলিটা, আমার কয়েকটা কথা শুনবি? খুব জরুরি কথা!

এমনিতে আদিত্য খুব হাসি-খুশি, আমুদে। তাই ওর রোগা শুকনো গম্ভীর চেহারাটা দেখে ঘাবড়ে গেল ললিত, বলল, আয়, ভিতরে আয়।

আদিত্য ভিতরে এসে প্রথমেই সটান বিছানা নিল। উপুড় হয়ে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। ললিত ওকে ডাকল না। অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর ওর পাশে বসল, গায়ে হাত দিয়ে ডেকে বলল, এই, কী কথা বলবি যে!

ডাকতে গিয়েই ললিত টের পেল, আদিত্য কাঁদছে। খুব মৃদু শরীর কাঁপছে তার। মুখ ঢেকে রেখেছে। তবু কান্না ললিত চেনে।

সে বিহ্বল বোধ করে বোকার মতো বসে রইল একটুক্ষণ। তারপর আবার ডাকল, কী হয়েছে বলবি তো! এই আদিত্য—

আদিত্য উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ ওইভাবে শুয়ে রইল।

মা ঘরে এসে চোখ কুঁচকে বলল, ওটা কে রে শুয়ে! ললিত, ও কে?

ললিত মাকে ঘর থেকে পাচার করার জন্য উঠতে যাচ্ছিল, সে সময়েই আদিত্য মুখ ফেরাল। ম্লান একটু হেসে বলল, মাসিমা, আমি আদিত্য। একটু চা খাওয়াবেন মাসিমা?

মা হাসে, তোর হয়েছে কী, শুয়ে আছিস যে! দেখে এমন চমকে গিয়েছিলুম। উঠে বোস, আমার উনুনে এখনও আঁচ আছে, চা করে দিচ্ছি।

উঠে শোকতাপা মানুষের মতো হাঁটু জড়ো করে তার ওপর মুখ রেখে বসল আদিত্য। বলল, লোলিটা, সতী আমাকে ভালবাসে না।

শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল ললিত। এতক্ষণ তার অবচেতন মন এইটাই প্রত্যাশা করছিল।

একটু সময় নিল ললিত, তারপর বলল, কী করে বুঝলি?

আদিত্য তেমনি বসে থেকে উদাসী গলায় বলে, ওর সঙ্গে আমার জাত মিলছে না।

একটু অবাক হয়ে ললিত বলে, এত দিন প্রেম করে এখন তোর শাশ্বতী জাতের কথা তুলেছে?

না-না। ও বরং উলটোটাই বুঝিয়েছিল। আমিই প্রথম জাতের কথা তুলেছি।

ললিত মৃদুস্বরে বলে, তা হলে তুই জাত মানছিস আদিত্য? কেন রে, এত দিন পর হঠাৎ জাতের চিন্তা কেন?

আদিত্য দীন ভঙ্গিতে তার হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে দিয়ে বলে, আমি বেনের বাচ্চা, আমি আমার বাপ-দাদাদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। আমার বংশের কালচারের সঙ্গে ওদের মেলে না। আমাদের জাত আলাদা।

শুনে বড় কষ্ট হল ললিতের। আদিত্যর এই দুর্বল দিকটার কথা ললিত অনেক দিন ধরে জানে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আদিত্যর বড় দুর্বলতা রয়ে গেছে নিজের পরিবারকে নিয়ে।

ললিত স্নেহের একখানা হাত বাড়িয়ে আদিত্যর মাথায় রাখল। বলল, কী হয়েছে খুলে বল। তোদের কি ঝগড়া হয়েছে?

একটু ভেবে আদিত্য বলল, ঠিক ঝগড়া নয়, তবে অনেকটা ও-রকমই—

কী নিয়ে?

আদিত্য শ্বাস ফেলে বলল, প্রথমে শুরু হয়েছিল তোকে নিয়ে।

আমাকে! ভীষণ অবাক হয় ললিত।

তোকে নিয়েই প্রথম জাতের কথা উঠেছিল। যেদিন তোর কাছে সতীকে নিয়ে আসি সেদিনই আমি লক্ষ করেছিলুম যে তোর সঙ্গে ওর জাত মেলে। আমার সঙ্গে মেলে না।

তার মানে? ললিত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ধপ করে আবার শুয়ে পড়ে আদিত্য, বলে, কী জানি, আমি কিছুই গুছিয়ে বলতে পারি না। লোলিটা, তুই রাগ করিস না। আমার মনটা ঠিক নেই। আমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি।

ললিত চুপ করে থাকে।

মা চা দিয়ে গেল। বলল, ভাত খেয়ে বেরিয়েছিস তো?

হ্যাঁ, মাসিমা।

তারপর বসে চায়ে চুমুক দিয়ে, যেন বড় স্বাদ পেয়ে, চোখ বুজল আদিত্য। বলল, কয়েক দিনে অনেক নাটুকে কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি চাকরি ছেড়ে বাবার ব্যবসাতে নামছি। তাতেই সতীর সঙ্গে আরও গোলমাল পাকিয়ে গেছে। এবার ও নিজেই বলছে যে, ওর সঙ্গে আমার জাত মিলবে না।

আদিত্য একটু দম ধরে থেকে তারপর বলে, আরও একটা ব্যাপার আছে। মাঝখানে একদিন সতী তার এক বন্ধু আর বন্ধুর দাদার সঙ্গে রেডিয়ো স্টেশনে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল আমি জানি না। সেদিনই কলেজে ওকে খুঁজতে গিয়ে আমি পাইনি। কিন্তু আবছাভাবে আমার পরে মনে পড়েছে, যখন ওর কলেজের কাছে বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে ঢুকছিলুম—তখন উলটো দিক থেকে একটা সাদা রঙের গাড়ি খুব ধীরে ধীরে আমাকে পার হয়ে গেল। তখন আমার মন খুব অস্থির ছিল—স্পষ্ট করে দেখিনি—তবু পরে আমার মনে হয়েছে, গাড়ির সামনের সিটেই ওরা তিন জন ছিল। একটি সুন্দরমতো ছেলে, তার পাশে একটি মেয়ে, আর জানলার ধারে সতী। আমার মনে হয়, সেদিন সতী আমাকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু ডাকেনি। পরে সতী আমাকে নিজেই বলেছে সেদিন সে কোথায়, কার সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু বলেনি যে, সেদিন গাড়ি থেকে সে দেখেছিল আমায়।

না-ও দেখতে পারে।

আদিত্য দৃঢ় মুখে মাথা নেড়ে বলে, আমি সিওর। ও আমাকে দেখেছিল। ডাকেনি।

একটু শ্বাস ছেড়ে আদিত্য বলে, আজ একটু আগেই আমি ওর কলেজে গিয়েছিলাম। বকুল গাছটার তলায় আমি রোজ দাঁড়াই ওর জন্য। সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে শিবানী নামে ওর এক বন্ধু চানাচুর কিনতে এসে আমাকে দেখে একটু হেসে এগিয়ে এল। শিবানী মেয়েটা সতীর বাসার কাছেই থাকে, একটু বেশি কথা বলে আর কী—আমার সঙ্গেও আলাপ আছে। শিবানী নিজেই যেচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে বলল, ওদের রাকা নামে কে এক বন্ধু আছে, তার দাদার সঙ্গে নাকি বিয়ের কথা চলছে সতীর। সতী রাজিও হয়েছে। রাকা নিজেই বলেছে শিবানীকে। আমার মনে হচ্ছে— এই রাকা আর রাকার দাদাই সেই গাড়িওলা পার্টি। শিবানীর কাছে এ-সব শুনে আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। সতীর সঙ্গে দেখা না-করেই সোজা চলে এসেছি তোর কাছে।

হঠাৎ ললিতের শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। থর থর করে কেঁপে ওঠে সে! রাগে, ঘেন্নায়, আক্রোশে। কেন এমন হবে? কেন এমন হতে থাকবে?

সে হাত বাড়িয়ে আদিত্যর হাত চেপে ধরে বলল, তুই ছাড়বি কেন? ছাড়িস না আদিত্য। হয়তো তোর ভুল হচ্ছে। আর যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে—

আদিত্য ক্লান্তমুখে বলে তবে কী?

তবে তোকে আজই বিয়ে করতে হবে। রেজিস্ট্রি।

আদিত্য অবাক চোখে চেয়ে থেকে বলে, কী বলছিস!

একটা সময়ে ললিতের মাথা যন্ত্রের মতো কাজ করত। যখন ইউনিয়নের গোলমাল. কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাবি-আদায়ের বৈঠক কিংবা এ-রকমই কোনও কাজের চাপ পড়ত, তখন সংকটের মুখে অঙ্ক-কষা যন্ত্রের মতো নির্ভুল কাজ করত তার মাথা। তার মুখে কয়েকটা নিষ্ঠুর লাইন জেগে উঠেছে, চকচক করছে উগ্র চোখ। সে আদিত্যর কথার উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তুলল, বলল, ওঠ, এখন অনেক কাজ করতে হবে।

আদিত্য বোকার মতো উঠে দাঁড়িয়ে বলে, কীসের কাজ! তুই কী করতে চাস?

ললিত সংক্ষেপে বলল, আজই রেজিস্ট্রি। আর দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে।

আদিত্য আবার বসে পড়ে, দূর! তা হয় না। সতী রাজি হবে না।

হতে হবে।

লাভ কী? ও আমাকে ভালবাসে না।

তোকে সে-কথা বলেছে?

না। কারণ, সতী সেটা নিজেও এখনও জানে না। কয়েক দিনের মধ্যেই ও টের পাবে যে ও আমাকে ভালবাসে না।

এত দিন বাসল কী করে? এটা কি ইয়ার্কি?

আদিত্য অন্যমনস্ক চোখে ললিতকে একটু দেখল, তারপর বলল, না, ইয়ার্কি নয়। ললিত, শোন একটা ছোট গল্প। আমাদের বাড়ির মেয়েদের তো জানিস—গায়ে তাদের রোদ লাগে না। সেই আমাদের বাড়ির মেয়ে—আমার খুড়তুতো বোন মান্তু একবার প্রেমে পড়েছিল কালো ন্যাংলা মতন একটা ছেলের। সে-ছেলেটা আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজ দিত। কোনদিন কোন ভোরবেলায় বোধহয় মান্তু দোতলার চিকের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেছিল, আর সে সময়েই ছেলেটা সাইকেলে বসে খবরের কাগজ ছুড়তে যাচ্ছিল বারান্দায়—সেই সময়েই তারা দু'জন দু'জনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারপর রোজ ও রকম দেখা হতে লাগল তাদের। আমরা কিছু জানতুম না। শেষ পর্যন্ত সেই ন্যাংলা ছেলেটার জন্য মান্তু একদিন মাঝরাতে ছাদ থেকে দড়ি ঝুলিয়ে নেমে পালানোর চেষ্টা করেছিল। আমরা ধরে ফেললাম। কাকা তাকে জুতোপেটা করে ঘরে তালা দিয়ে রাখল। ভারী আশ্চর্য হয়েছিলুম আমরা—আমাদের মতো বাবুদের বাড়ির মেয়ে কী করে ও-রকম একটা ছেলেকে পছন্দ করে! কিন্তু এখন বুঝি সেটা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়। সেটা কেবল একটা রহস্য ভেদ করার আগ্রহ। চার দিকে যা-সব প্রেম-ট্রেম দেখি তার অধিকাংশই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়, তার মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা নেই, আছে ওই রহস্যভাঙা, আছে রোমহর্ষ। হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই সই। বাঙালি মেয়েরা তো খুব একটা পুরুষমানুষ দেখে না। সতীও তাই। ঘরকুনো, পুরুষ দেখলে ভয় পায়। আমিই ছিলুম ওর প্রথম পুরুষ। আমাকে নিয়েই ওর রহস্য ভেঙেছে। ও কোনও দিন ভালবাসেনি আমাকে। বাসবেই বা কেন! ওর সঙ্গে কি আমার জাত মেলে?

আদিত্য ম্লান হাসে, নিজেকে সেই হকার ছেলেটার মতো লাগছে আমার। সেই ছেলেটা হয়তো পরে রোজ এসে দূর থেকে আমাদের দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে থাকত। দেখত খালি বারান্দা, ভোরের বাতাসে কেবল চিকটা দুলছে।

ললিত থরথর করে কাঁপে। তার শরীব দুর্বল, পা কাঁপে, মাথা টলমল করে। প্রবল রাগে খ্যাপাটে গলায় সে বলে, নতুন বা পুরনো কোনও বর্ণাশ্রম আমি মানি না। আমি সব ভেঙে দিয়ে যাব। ওঠ।

লোলিটা, তুই খেপে গেছিস।

ললিতের দু'টো চোয়াল বদ্ধমুষ্টির মতো ফুলে ওঠে, সে কেবল বলে, ওঠ। আর-একটু পরেই তোর রেজিস্ট্রেশন।

আদিত্য মাথা নিচু করে ভাবে।

ললিত তাড়া দেয়, কী হল!

ও রাজি হবে না। দেখিস।

হবে। আমি রাজি করাব।

কাজটা ঠিক হবে না।

না হোক। তবু করতেই হবে।

আস্তে আস্তে ললিতের উদ্ধত, ফণাতোলা চেহারার সামনে আদিত্য নরম হয়ে আসে। ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবে। গম্ভীর দেখায় তাকে। তারপর বলে, সাক্ষী কে হবে?

আমি হব। আর দু'জন জোগাড় করছি।

আর বিয়ের নোটিশ?

আমার চেনা রেজিস্ট্রার আছে। ওটা ম্যানেজ করে দেব।

হঠাৎ যেন দমকা হাওয়ায় আদিত্যর সব বিষণ্ণতা উড়ে যায়। সে পুরনো দিনের মতো হাসে, বলে, তুই খুব ডেঞ্জারাস।

ললিত সে-কথার উত্তর দেয় না। আপন মনে কী যেন একটু বিড় বিড় করে। হয়তো নিজের ব্যর্থতাগুলির কথা নিজেকে শোনায়। হয়তো প্রতিশোধের কথা নিজেকে মনে করিয়ে দেয়।

বিমানের ঘরের দরজা খোলা ছিল। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে ছিল সে। তাদের পায়ের শব্দে চোখ খুলে উঠে বসল, এসো। আমি সময় গুনছিলাম। খুব খিদে পেয়েছে।

ললিত আদিত্যকে দেখিয়ে বলল, একে চেনো?

একপলক আদিত্যকে দেখেই বিমান বলল, চিনি। আদিত্য রায়। বাগবাজারে তোমাদের বাড়ি—না?

আদিত্য হাসল, তুমি সব মনে রেখেছ!

আমি সবাইকেই মনে রাখি। কিন্তু আমাকে সবাই ভুলে যায়।

আদিত্য মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু আমি ভুলিনি। ললিতকে জিজ্ঞেস করো, তোমার নাম শুনেই চিনেছি। তারপর আদিত্য বিমানের মুখে মারের দাগগুলো লক্ষ করে বলে, ইস্, ছিনতাই পার্টির লোকেরা তোমাকে খুব মেরেছে তো!

বিমান মৃদু হাসে।

আদিত্য তেজি গলায় বলে, তুমি তাদের পেটে লাথি মারলে না কেন?

মেরেছি। তৃপ্ত স্বরে বিমান বলে।

মেরেছ! সাবাস! বলে আদিত্য হাসে। বিমানের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে চার দিকে চায়। তার গলায় হাসিঠাট্টার সুর ফিরে আসে, বলে, তুমি মাইরি জ্ঞানী লোক, কত বই তোমার!

মেঝেতে বসে একটা অ্যালুমিনিয়মের থালায় খাচ্ছিল বিমান। কাঙালের মতো বসার ভঙ্গি। তাড়াতাড়ি খাচ্ছে—স্পষ্ট বোঝা যায় ওর খুব খিদে পেয়েছে। ললিত ওকে খানিকটা খাওয়ার সময় দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল—তোমার শরীর কেমন?

ভাল। অনেক ভাল।

চলাফেরা করতে পারছ?

বিমান মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

একটা কাজ করতে পারবে?

কী?

একটা বিয়ের সাক্ষী দেবে? রেজিস্ট্রি বিয়ের?

বিয়ে! কার? বিমান অবাক চোখে তাকায়।

আদিত্য একটু হেসে বলে, আমার। মাই ম্যারেজ টু-ডে।

যাবে? ললিত আবার বিমানকে জিজ্ঞেস করে।

বিমান হাসে, ঘাড় নেড়ে বলে,যাব। কখন?

আমরা একটু পরে এসে তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যাব।

বিমান মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়, বলে, বাঃ। আজ কপাল ভাল। বিকেলে আজ খুব খাওয়া হবে—কী বলো?

হবে। অন্যমনস্কভাবে বলে ললিত, আজ তোমার ঘরেই আমরা ফিস্ট করব। মুরগি কিনে আনব।

বিমান হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আদিত্যকে বলল, এত সহজে বিয়ে করা যায়, আমি জানতুম না। আমার ধারণা ছিল, বিয়ে করতে অনেক সময় আর বিবেচনা লাগে।

আদিত্য মাথা নিচু করে আস্তে বলল, আমারও লেগেছে।

লেগেছে? বিমান হাসে, তবে তোমার সাক্ষীর জোগাড় নেই কেন? তা ছাড়া, রেজিস্ট্রি বিয়ে তারাই করে যাদের সামাজিক সম্পর্কে গোলমাল আছে।

আদিত্য ভ্রূ কোঁচকায়, তুমি কি সাক্ষী দিতে ভয় পাচ্ছ?

না, না। সুন্দর করে হাসে বিমান, কিন্তু আমি যখন বিয়ে করব তার অনেক আগে থেকে আমি

নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করব তার জন্য। আমার বিয়ের সময়ে সবকিছু প্রস্তুত থাকবে, এমনকী প্রকৃতিও।

একটু থেমে বিমান বলে, আমি একটি মেয়েকে ভালবেসে, তার জন্য পাগল হয়েই বিয়ে করতে ছুটব না। কারণ, যারা ও-রকম বিয়ে করে তাদের সত্যিকারের বিয়ে হয় না। বিয়ের কারণ ভিন্ন।

আদিত্য সামান্য লাল হয়ে বলে, তুমি কীসের জন্য বিয়ে করবে তা হলে?

বিমান খাওয়া থামিয়ে রেখে বলে, বিয়ে সমাজকে সন্তান দেয়। তাই আমি দেখব কীভাবে আমি সমাজকে সুসন্তান দিতে পারি। ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে সমাজ অনেক বড়!

তুমি প্রেম মানো না?

বিমান হাসে, প্রেমটা ঠিক বোঝা যায় না। ওটা খুব ধোঁয়াটে ব্যাপার। কখনও আছে, কখনও নেই। কিন্তু প্রেম থাক বা না থাক, বিয়েতে সন্তান আছেই। প্রকৃতি আমাদের প্রেমের ধার ধারে না। সে আমাদের দিয়ে যন্ত্রের মতো তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেয়। আমরা যতখানি প্রেমিক, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রজনন-যন্ত্র।

চকমকে চোখে হাসে বিমান। আমাদের একটা অ্যালসেশিয়ান মাদি কুকুর ছিল। বাবা সেটাকে বাজে কুকুরদের সঙ্গে মিশতে দিত না। দরকার মতো সেটাকে নিয়ে যাওয়া হত মিত্তিরদের মদ্দা অ্যালসেশিয়ান কুকুরটার কাছে। বছর বছর চমৎকার বাচ্চা হত—তেজি, স্বাস্থ্যবান। একবার সেটা বাজে জাতের কুকুরের সঙ্গে মিশেছিল—সেবারকার বাচ্চাগুলো হয়েছিল কুচ্ছিত, ভিতু, পেটুক। জন্মবিজ্ঞানের নিয়ম রয়েছে। মানুষের ভিতরেও এ-রকম বর্ণের তফাত আছে। কিন্তু মানুষ জন্মবিজ্ঞানের কোনও নিয়ম মানে না। যেমন খুশি বিয়ে করে—সমাজে সব একাকার করে দিতে থাকে।

আদিত্য তর্কের জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল। ললিত তা হতে দিল না। হাত ধরে টেনে আনল রাস্তায়, বলল, এখন ও-সব কথা থাক। আমাদের কাজ আছে অনেক।

ললিত চেঁচিয়ে বিমানকে তৈরি হতে বলে চলে এল।

ফিরে এসে আদিত্য ললিতের মাকে বলল, মাসিমা, মাই ম্যারেজ টু-ডে।

কী বললি? মা জিজ্ঞেস করে।

আদিত্য হাসে, বলছিলুম, আপনি বড় ভালমানুষ।

মা হেসে বলে, পাগল! এবার একটা বিয়ে কর।

ললিত গজগজ করে, তোমার কেবল এক কথা।

আদিত্য হো-হো করে হাসে, সেই কথাই তো বলছিলুম মাসিমা, আপনি ভালমানুষ বলে বুঝতে পারলেন না।

বারোটার মধ্যেই তারা তৈরি হয়ে ট্যাক্সি ডেকে আনল। বেরিয়ে পড়ল তিনজন। আদিত্য একটু সংশয়ের গলায় জিজ্ঞেস করে, প্রথমে কোথায় যাবে?

ললিত ওর কাঁধে হাতের একটু চাপ দিয়ে বলল, আগে তোকে একটু ভদ্র পোশাক পরাই। দাড়িটাও কামিয়ে নে। তারপর দেখা যাবে--

দূর। আদিত্য বলে, এ-পোশাকই ভাল। আমি সাজব না!

কিন্তু অবশেষে সবই করতে হল আদিত্যকে। ধুতি, রেডিমেড সিল্কের পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, রুমাল কেনে হল। দোকানের ট্রায়ালরুমে ঢুকে সেগুলো পরে বেরিয়ে এল আদিত্য। ললিত হেসে বলল, সাবাস!

কিছু ফুল, শাশ্বতীর জন্য একটা শাড়ি কিনতে কিনতে সোয়া দুটো বেজে গেল প্রায়। একটা পেট্রল পাম্পে ট্যাক্সি থামিয়ে সঞ্জয়কে ফোন করল ললিত, অফিসে থাকিস। খুব দরকার। যাচ্ছি।

আড়াইটের পাঁচ মিনিট আগে ট্যাক্সিটা শাশ্বতীর কলেজের সামনে বড় রাস্তায় এসে থামে। আদিত্যকে ঠেলা দিয়ে ললিত বলে, নাম।

পাগল!

নামবি না?

দূর! আমাকে দেখলে হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেবে। তুই যা!

ললিত ভ্রূ কুঁচকে বলল, অত মেয়ের ভিড়ে কি চিনতে পারব! মোটে তো এক বার দেখা।

বলেই সে মনে মনে একটু চমকে ওঠে। সে কি মিথ্যে কথা বলল না? আসলে শাশ্বতীকে লক্ষ জনের ভিতরেও সে চিনতে পারবে।

আদিত্য মাথা নাড়ে, পারবি। তুই না পারলেও ও পারবে। কলেজের সামনে ওই বকুল গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়া। ওখানে একটা চানাচুরওয়ালা বসে, সতী ওর রোজকার খদ্দের। একটু পরেই একটা পিরিয়ড শেষ হবে।

ললিত আস্তে আস্তে হেঁটে এসে বুড়ো চানাচুরওয়ালাটার পাশে গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। কিন্তু হঠাৎ বড় অস্বস্তি হতে থাকে তার। কেন যেন বুক কাঁপতে থাকে। কেন যেন দুর্বল লাগে নিজেকে। মনে পড়ে শ্যামলা সুন্দর কোমল একখানা মুখ, মায়াবী চোখে চেয়ে বলছে, দেখবেন, আপনার অসুখ সেরে যাবে।

সেই কথাটাই যেন গুনগুন করে ফিরে আসছিল তার কানে।

হঠাৎ দিকবিদিক জুড়ে প্রবল ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে—যেন, পাতাল থেকে উঠে আসে সেই শব্দ, আকাশ থেকে নেমে আসে।

চমকে উঠল ললিত। সিগারেটটা আঙুল থেকে খসে পড়ে গেল।

## ॥ ষোলো ॥

নিজের এই দুর্বলতা অসহায়ভাবে লক্ষ করল ললিত। আশ্চর্য হয়ে গেল। কোথা থেকে এই দুর্বলতা আসছে? সে তো শাশ্বতীর প্রেমিক নয়! এক বার মাত্র কয়েক মিনিট দেখা হয়েছিল তাদের, আর আজ একটু পরেই আদিত্যর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে এসেছে ললিত, এখন সে আর অল্পবয়সি যুবা নয়—যখন মিতুকে দেখলে কেঁপে উঠত বুক; তখন কাঁপা আঙুল থেকে সিগারেট পড়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। এখন কি আর সে-রকম কিছু হয়? সে নিজের অস্থিরতার জন্য, দুর্বলতার জন্য অসহায় বোধ করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। পায়ের কাছেই জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে ছিল। চটি দিয়ে ঘষে ঘষে সেটার নাড়িভুঁড়ি বের করে ফুটপাথে মিশিয়ে দিল সে। এবড়োখেবড়ো বকুল গাছটার গায়ে জোরে চেপে ধরে রইল হাত।

অনেক দিন আগে তাদের বাসার ছোট্ট উঠোনটায় সে বাবার সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিল একদিন সকালবেলায়। বাবা লুঙ্গি পরে তুলসীগাছের বেদিটাকে স্ট্যাম্প করে ব্যাট করছিল, ললিত করছিল বল। অসমান উঠোনে ডিউজ বলটা লাফিয়ে উঠছিল বারবার, ললিত বাহাদুরির জন্য প্রাণপণ জোরে বল ছুড়ছিল। সেটা কোনও এক সময়ে বাবার পায়ের হাঁটুর নীচে হাড়ে লেগেছিল, ললিত টের পায়নি। খেলার শেষে সে ঘরে এসে দেখল বাবার পায়ে হাড়ের ওপর থ্যাঁতলানো চামড়া ফেটে হাঁ হয়ে ফুলে কালশিটে পড়ে আছে, মা হাঁটুগেড়ে আইওডিন লাগাতে লাগাতে তাকে বলল, দ্যাখ, কী করেছিস! ললিত আশ্চর্য হয়েছিল। অত জোরে বল লাগাতেও বাবা একটুও চেঁচিয়ে ওঠেনি, 'উঃ আঃ' করেনি, শান্তভাবে খেলা শেষ করে ঘরে এসেছে, তাকে বুঝতেও দেয়নি। ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু ললিতের মনে ছবিটা আঁকা হয়ে আছে। পরবর্তীকালে যত বার ব্যথাবেদনা পেয়েছে ললিত তত বারই চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাবার সেই ঘটনাটুকুর কথা মনে পড়ে গেছে। অমনি ললিত ব্যথার বা ক্ষতের স্থান চেপে ধরে সহ্য করেছে। ক্রমে এইটেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তার। ছেলেবেলা থেকেই। তার বন্ধুরা বলত, ললিতের ব্যথা লাগে না। ললিত জানত সে অনেকের চেয়ে বেশি সহ্য করতে পারে। নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য সে অনেক বার সিগারেটের আগুনে তার চামড়া পুড়িয়ে দাঁত টিপে সহ্য করেছে। শরীর থেকে সে শুরু করেছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে নিজের চেষ্টায় সে মনের দুঃখগুলিকেও গোপন করতে থাকে। শরীর আর মন তো খুব দূরের সম্পর্ক নয়! সবাই জানে ললিত কাউকে তার দুঃখ দুর্দশার গল্প বলে না, তার নাকি-কান্না নেই। নিজের দুর্বলতাগুলিকে ঢেকে রাখতে জানে ললিত। একমাত্র মিতুর ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাতেও ললিতের দোষ ছিল না, মায়ের চোখ তাকে ধরে ফেলেছিল।

সেইটে ছাড়া ললিতের দুর্বলতার আর কোনও অখ্যাতি নেই। হাসপাতালে গিয়ে সে যখন প্রথম বুঝতে পারল তার ক্যান্সার হয়েছে, তখন প্রথমটায় ভেঙে পড়েছিল ললিত। কিন্তু তাকে সামলে দিল তুলসীর চোখ। বায়োপসির ফলাফল জানার পর তুলসী তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সামলে গেল ললিত, এক ঢোঁকে কান্না গিলে ফেলে হেসেছিল। মনে মনে ঠিক করা ছিল তার, এই শেষ যন্ত্রণাটুকু সে শান্তভাবে সহ্য করবে। তার চেনা লোকেরা তাদের জীবনে উদাহরণ করে নেবে ললিতের সহনশীলতা। সে সেই কারণেই প্রাণপণে সহ্য করে যাচ্ছে। সে ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলেনি 'আমাকে বাঁচান', সে বন্ধুদের জড়ো করে বলেনি 'আমার মাকে দেখিস—আমি চললাম', এমনকী এখনও তার ঈশ্বরে অবিশ্বাস অটল রয়েছে, সেই অবিশ্বাস ভেঙে সে তারকেশ্বর কিংবা কালীঘাটে মানত করতে ছোটেনি। সেদিন শাশ্বতী যখন তার মেসোমশাইয়ের ঘটনা তাকে বলেছিল, তখনও ললিত তাকে ঘুর কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিল তার কোনও উদাহরণের দরকার নেই। ঠিক আছে—সব ঠিক আছে। সে বরং মাঝে মাঝে ভেবে দেখেছে বাঁচার চেয়ে মরাটাই বরং তার বেশি দরকার। যারা তার বিপক্ষে, যারা তার শত্রু, কিংবা যারা তাকে ভালবাসেনি তারা সবাই দেখুক ললিত কত শান্তভাবে মরে যেতে পারে।

তাই এখন এই রহস্যময় দুর্বলতার দেখা পেয়ে বড় অসহায় বোধ করে ললিত। সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এতক্ষণ সে তো ঠিক ছিল। একটু আগে সে আদিত্যকে বিয়ে করতে রাজি করিয়েছে।—সব ঠিক আছে। তবে এটা কী? এটা কেন? সে তার হাত থেকে খসে-পড়া সিগারেটটার ছিন্ন-ভিন্ন অংশটা চেয়ে দেখল। তারপর মনে মনে গাল দিল নিজেকে—ইডিয়ট!

ঘণ্টা পড়ার একটুক্ষণের মধ্যেই তার চারপাশের রাস্তা রং-বেরঙের মেয়েতে ছেয়ে গেল। প্রথমটায় একটু দিশেহারা বোধ করল ললিত। কোনও দিকে তাকাতে তার লজ্জা করছিল। সে কেবল আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছিল তার চার পাশে ভিড় করে গুনগুন কথা বলতে বলতে ঘুরছে মেয়েরা। মাঝখানে সে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। কে বলবে এর মধ্যে তার আধচেনা, এক বার দেখা শাশ্বতী কোন জন।

চারজন মেয়ে চানাচুরওয়ালার কাছে হেঁটে এল। তাদের মধ্যে একজন আকাশি-নীল শাড়ি পরা। আসতে আসতে ও থেমে গেল হঠাৎ। একটু দূর থেকে ললিতের দিকে চেয়ে বলল, আপনি?

ললিত দেখল, শাশ্বতী।

হঠাৎ খুব নির্জন হয়ে গেল চারপাশের পৃথিবী। যেন একটা কাচের ঘরের মধ্যে তারা দু'জন মাত্র দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র। তারপরেই ললিত কাচের ঘর ভেঙে দিল। হাত জোড় করে স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। জরুরি।

ললিত জানল না, সেই মুহূর্তে কী ভীষণ বুক কাঁপল শাশ্বতীর। থর থর করে কেঁপে উঠল তার অস্তিত্ব। মুখে ঝাঁপিয়ে এল রক্তস্রোত। তবু, বাইরে স্বাভাবিকই থাকল সে। যেন আগে থেকেই জানত শাশ্বতী এমনভাবে মাথা নেড়ে বলল, চলুন। তার তিন বন্ধু একটু অবাক চোখে তাদের দেখছিল। শাশ্বতী বন্ধুদের বলল, দাঁড়া আসছি।

একটু দূরে আর একটা গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল দু'জন। ললিত বেশি ভূমিকা করল না। বলল, আদিত্য সকাল থেকে পাগলামি করছে। ওর সন্দেহ আপনি ওকে আর পছন্দ করেন না।

শাশ্বতী ভ্রূ কুঁচকে শুনল, তারপর মুখ নামিয়ে বলল, জানি। ওর মাথায় পোকা ঢুকেছে। কিন্তু আমি কী করব?

ললিত মৃদু বিষণ্ণতার হাসি হাসে, আদিত্যর খ্যাপামি উঠলে অনেক দূর গড়ায়। আর, খুব সামান্য ব্যাপারেই ওর খ্যাপামি দেখা যায়। নইলে ও সত্যিই ভাল মানুষ। খুব ভাল।

ললিতকে নস্যাৎ করে দিয়ে শাশ্বতী ঠান্ডা গলায় বলে, আমি ওকে জানি।

ললিত লজ্জা পায়। তারপর সামলে নিয়ে আস্তে করে বলে, ও আমার সঙ্গে এসেছে। মোড়ে ট্যাক্সিতে বসে আছে। আপনি একটু ওর কাছে চলুন। তারপর আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু এক জায়গায় যেতে হবে। খুব দূরে নয়। সন্ধের আগেই আপনাকে আমরা বাসায় পৌঁছে দেব।

কোথায়?

ট্যাক্সিতে বলব।

শাশ্বতী তার শাড়ির আঁচল তুলে একটা কোণ দাঁতে চাপে, খুব অন্যমনস্ক দেখায় তাকে। বলে, বলবেন না কেন? কোথায় যাচ্ছি তা আমার জানা দরকার।

ললিত বিপদের গন্ধ পেয়ে যায়। মুখখানাকে করুণ করে তোলার একটু চেষ্টা করে সে। বলে, সঙ্গে আদিত্য থাকবে। আপনার ভয় কী?

শাশ্বতী পরিষ্কারভাবে হাসে, ও অদ্ভুত সব কাণ্ড করে। আমার ভাল লাগে না। ভয় করে।

ললিত মৃদু হাসে, এখন ভয় নেই। ও খুব অনুতপ্ত। আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়।

আড়ি তো হয়নি!

ললিত কপাল তুলে বলে, হয়নি? আশ্চর্য! ও যা বলছিল তাতে মনে হয় ওর সঙ্গে আপনার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে।

শাশ্বতী মাথা নেড়ে জানায়, না।

তবে? ললিত জিজ্ঞেস করে।

শাশ্বতী বয়ঃসন্ধির লাজুক মেয়ের মতো হাসে—সেটা একটা ভুতুড়ে কাণ্ড। কোনও মানে নেই।

কী?

আপনাকে বলা যায় না। ওটা আমাদের—আমাদের একটা ব্যাপার।

ব্যাপারটা জানতে ললিতের লোভ হচ্ছিল। এখন একটু পরেই শাশ্বতী আদিত্যর গিন্নি হয়ে যাবে, তখন আর গতকাল কী হয়েছিল তা জানার চেষ্টাও করা যাবে না। কিন্তু তার আগেই এই কয়েকটা মুহূর্ত—যতক্ষণ কুমারী আছে শাশ্বতী—যতক্ষণ সে আইনত কারও নয়—ততক্ষণ সেই অল্প একটু সময়ে গতকালের কথা জেনে নিলে হত!

কিন্তু ললিত নিজেকে সংযত করে নিল।

সে শাশ্বতীকে বলল, চলুন প্লিজ।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে জিরাফের মতো গলা বের করে ছিল আদিত্য। তাদের দেখেই ভিতরের আবছায়ায় সরে গেল। ললিত শাশ্বতীকে নিয়ে এসে ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল, বলল, দেখুন, কেমন বর সেজে বসে আছে আদিত্য। সুন্দর দেখাচ্ছে না!

শাশ্বতী বোকার মতো অবুঝ চোখে এক বার ললিতের দিকে তাকাল। ট্যাক্সিতে উঠল না, দাঁড়িয়ে রইল।

ললিত তাড়া দিল, উঠুন। তাড়াতাড়ি, লোকে আপনাকে দেখছে। ভাববে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করল শাশ্বতী। ইতস্তত করে তারপর উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে দরজা বন্ধ করে দেয় ললিত। সামনে ড্রাইভারের পাশে সে আর বিমান পাশাপাশি বসে। নতুন গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট কেনা আছে আদিত্যর পকেটে। ললিত ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা দে। আর, তোরা কথা বল।

আমি কী বলব! আদিত্য মৃদু গলায় বলে।

ললিত মৃদু হাসে, একপলকে দেখে শাশ্বতী গাড়ির সিটের ওপর রাখা খবরের কাগজে জড়ানো রজনীগন্ধার গুচ্ছ আর লাল-সাদা গোলাপের তোড়া অবাক চোখে দেখছে। সিটের পিছনে শাড়ির মোড়কটা আর আদিত্যের ছাড়া জামা-কাপড় নতুন কেনা পাঞ্জাবি আর ধুতির খালি প্যাকেটে ভরে রাখা। আদিত্যকে ললিত বলল, শাড়িটা ওর হাতে দে। আদিত্য বাঁ হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে শাশ্বতীর দিকে বাড়িতে ধরল। শাশ্বতী চেয়ে রইল, হাত বাড়াল না। আদিত্য ঝুপ করে ওর কোলে ফেলে দিল মোড়কটা।

এইটুকু দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিল ললিত। অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে এখন। শাশ্বতীকে কলেজে পাওয়া না গেলে মুশকিল হত। এখন কাজটা আধাআধি মিটেই গেছে। আর একটু বাকি। কয়েকটা স্বাক্ষর মাত্র। সিগারেট ধরিয়ে সে নিচু গলায় বিমানকে বলল—শরৎকাল, তবু দেখো, এখনও গরম

গেল না। নাও, সিগারেট—বলে প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। আচমকা বিমান বলল—তুমি কি খুব উত্তেজিত?

কেন? অবাক হয়ে ললিত জিজ্ঞেস করে।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাওনি।

ওঃ হো—বলে ললিত আর-একবার মুখ ঘোরায়। আদিত্য বাইরের দিকে চেয়ে আছে, শাশ্বতী কিছুই না বুঝতে পেরে স্তম্ভিতভাবে বসে। ললিত মৃদু হেসে বলল, এ হচ্ছে বিমান রক্ষিত আমাদের বহু পুরনো বন্ধু, আর বিমান, এই হচ্ছে শাশ্বতী...

শাশ্বতী এ-সব কথা শুনতেই পেল না। সে প্রবল উত্তেজনা চেপে কষ্টে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ওর গলার স্বর শুনে মায়া হয়। যেন বাচ্চা মেয়ে ভয় পেয়ে কথা বলছে।

বিমান তার ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথাটা কষ্টে পিছন দিকে একটু ঘোরাল, বলল, কেন, আপনি জানেন না?

শাশ্বতী শ্বাসরোধ করে মাথা নাড়ে, না।

এরা কেউ জানে না, অনেক দিন আগে—শাশ্বতী যখন ছোট – তখন তার দিদি লীলাবতীকে কেউ বা কারা কলেজের রাস্তা থেকে এইরকম ভাবেই হয়তো ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিল। কোথায় কোন অচেনা জায়গায় যে তারা নিয়ে গিয়েছিল লীলাবতীকে। না, এরা কেউ শাশ্বতীর অচেনা নয়, তার পাশেই বসে আছে আদিত্য—হাত বাড়িয়ে তাকে ছোঁয়া যায়। আদিত্যকে ভালবাসে শাশ্বতী। ভালবাসে। কিন্তু এরা কেউ জানে না যে এখন—এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে—এরা তিন জন অচেনা পুরুষ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ট্যাক্সিতে তুলেছে। নিয়ে যাচ্ছে অচেনা এক রহস্যময় জায়গায়। এরা তার ধর্ম কেড়ে নেবে, নষ্ট হয়ে যাবে তার আজন্মের প্রিয় এক পবিত্রতা। এক বার তার ইচ্ছে হল ট্যাক্সিওয়ালার কাঁধে টোকা দিয়ে বলে, ভাই ট্যাক্সিওয়ালা, আমি এদের কাউকে চিনি না, এরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। পায়ে পড়ি, তুমি গাড়ি ঘোরাও, আমাকে বাসায় পৌঁছে দাও। আমি অবুঝ মেয়ে—এখনও পবিত্র আমি—দয়া করো।

কিন্তু ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার হাত-পা। গলায় স্বর ফুটছে না। তার পাশে ফুল, কোলের ওপর কাগজের প্যাকেট থেকে উঁকি মেরে আছে খুব ঝলমলে একখানা শাড়ি। সে এর অর্থ খানিকটা বুঝতে পারল, আর খানিকটা বুঝতে চাইল না।

এরা কেউ জানে না যে, শাশ্বতীর বড় ভয় করছে। রজনীগন্ধার উগ্র গন্ধ গোলাপের সঙ্গে মিশে গিয়ে বাতাস বিষিয়ে গেছে এখন। তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ... না, সে এদের কাউকেই চেনে না, কাউকেই না...এরা তিন জন অচেনা পুরুষ, আর সে একজন পবিত্র অবুঝ সরল মেয়ে—এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? শাশ্বতীর বড় ভয় করছে।

বিমান তার মাথার ব্যান্ডেজের তলা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে মাথা চুলকোয়। ব্যথায় মুখ বিকৃত করে। খুব অন্যমনস্ক দেখায় তাকে। সে হঠাৎ গলা নামিয়ে ললিতকে বলে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

কী?

এটা?

কেন?

অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করে বিমান, তারপর সিগারেট ধরানোর অছিলায় মাথা নিচু করে ফিসফিস করে বলে, মেয়েটা আদিত্যকে ভালবাসে না।

শুনে ট্যাক্সিওয়ালা চকিতে এক বার তাদের দিকে তাকায়।

দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে থাকে ললিত। ট্যাক্সি পার্ক সার্কাসের ছ'কোনা চত্বরে এসে হু-হু করে ঘুরে গেল বাঁয়ে। ধরল পার্ক স্ট্রিট। সোজা সুন্দর রাস্তা। বড় সুন্দর কতগুলি জায়গা ছিল পৃথিবীতে পার্ক স্ট্রিটের মতো! সুন্দর জায়গা ছিল পৃথিবী! বেঁচে থাকা কী রকম ভাল। পার্ক স্ট্রিট ধরে যেতে হঠাৎ গুমরে মুচড়ে ওঠে মন ললিতের। কত সুন্দর রোমাঞ্চকর সব ঘটনা ঘটতে পারত জীবনে, আরও বহুদিন বেঁচে থাকলে!

ললিত! আদিত্য শুকনো গলায় ডাকে।

ললিত ফিরে দেখে, আদিত্যর মুখ অল্প লাল। কিছু একটা বলার চেষ্টা করে আদিত্য, কিন্তু উত্তেজনায় প্রথম চেষ্টায় সেটা বলতে পারে না। ললিত লক্ষ করে ওর গায়ের নতুন পাঞ্জাবির বুকে এখনও দাম লেখা টিকিটটা লাগানো, এতক্ষণ তারা কেউ লক্ষ করেনি। সে হাত বাড়িয়ে বলে, বুকের টিকিটটা ছিঁড়ে ফ্যাল!

কীসের টিকিট! বলে আদিত্য নিজের বুকের দিকে চেয়ে টিকিটটা দেখে, আরও ঘাবড়ে যায়। এক হাতে টিকিটটা খুঁটে তুলতে চেষ্টা করে সে, তারপর গলা ঝেড়ে আস্তে বলে ওকে বলে দে।

কী?

আমরা, কোথায় যাচ্ছি।

শাশ্বতী স্মৃতিহীন বোকার মতো চেয়ে থাকে। 'ফিট'-এর পর প্রথম জ্ঞান ফিরলে যেমন মুখ-চোখের ভাব হয়, তেমনি।

ললিত হঠাৎ খুব স্বাভাবিক গলায় শাশ্বতীকে বলে, এত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে? আপনাদের তো একদিন না একদিন বিয়ে হতই। আজ শুধু আইনের দিকটা সেরে রাখা।

তবু শাশ্বতী বুঝতে পারে না। আইনের দিক! কীসের আইন! কার সঙ্গে তার একদিন না একদিন বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?

আপনারা কথা বলুন। তাড়াতাড়ি কথা বলে নিন। সামনেই আমার এক বন্ধুর অফিস, আমি আর বিমান নেমে যাব। অল্প সময়—তার মধ্যেই আপনারা কথা বলে নিন। ললিত বলল।

কথা! শাশ্বতী ভেবেই পায় না কী কথা, কার সঙ্গে কথা।

আদিত্য যদি তার অচেনা পুরুষ হত তবে শাশ্বতী চেঁচিয়ে বলতে পারত, আমাকে নামিয়ে দাও, পায়ে পড়ি। সে বাইরের লোকজনকে উদ্দেশ করে গলা বাড়িয়ে ডাকতে পারত, এরা আমাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁচাও। কিন্তু তা তো নয়! তার মনে পড়ে সে হৈমন্তীকে বলেছিল যে একদিন খুব শিগগিরই তারা রেজিস্ট্রি বিয়ে করবে। কিন্তু ভুল—বড় ভুল বলেছিল শাশ্বতী। কেন ভুল? না, শাশ্বতী তা জানে না। সে কেবল আবছাভাবে এইটুকু জানে যে, সকলেই সকলের জন্য নয়। কেউ কেউ কারও জন্য থেকে যায় এক জন্ম। সকলেই সকলের জন্য নয়। তবু ভুল লোক দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। সামলানোর সময় পাওয়া যায় না। ভুল ঠিকানায় চলে যায় ভালবাসার চিঠি। আর ফেরত আসে না।

এক রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছিল শাশ্বতী। একটা লোক লণ্ঠন হাতে মাঠঘাট ভেঙে খুব দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে। তার মুখ দেখা যায় না, কেবল পা দু'খানায় পড়েছে লণ্ঠনের আলো। তবু মনে হয়েছিলসে বড় প্রিয়জন শাশ্বতীর, সে এক উদাসী মানুষ। দূরগামী। আজ জেগে থেকে সে সেই দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল। যেন, তার একান্ত প্রিয়জন কেউ তাকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

সে এক বার উদভ্রান্তের মতো আদিত্যর দিকে তাকায়। সেই লোক—সেই লোক কি আদিত্য? না, স্পষ্টই বোঝা যায় সে আদিত্য নয়। নতুন পাঞ্জাবি-পরা আদিত্য জড়সড় হয়ে বসে আছে। বাইরের দিকে মুখ, সদ্য কামানো গালে আলো চকচক করছে, কানের কাছে সেলুনের সাবানের শুকনো সাদা দাগ। এ স্বপ্নের কোনও মানুষ নয়। আশ্চর্য এই যে, একে—এই নিতান্ত সাদামাটা আদিত্যকে কত ভালবাসার কথা বলেছে শাশ্বতী, সব দিতে চেয়েছে তাকে! কিন্তু ভুল লোক—একেবারে ভুল লোক—আদিত্য তার স্বপ্নের কেউ না। শাশ্বতী ভালবাসে খুব দূরের যাত্রী একজন মানুষকে—যে সঙ্গীহীন একা একা খুব বড় প্রকাণ্ড এক ধু-ধু মাঠ রাতের অন্ধকারে পার হচ্ছে। চেনা আদিত্যকে এখন আর চেনে না শাশ্বতী। সেই অচেনাকে চেনে। সেই অচেনা কি ওই ললিত! হবেও বা। শাশ্বতী সঠিক জানে না কিছুই।

পার্ক স্ট্রিট। অচেনা জায়গা শাশ্বতীর। ট্যাক্সি হঠাৎ থেমে আসে। চমকে ওঠে সে। ট্যাক্সি বাঁক নেয়। ধীর হয়ে আসে। থেমে যায়।

ললিত মুখ ফিরিয়ে হাসল, আপনি এখনও রেগে আছেন! এবার কথা বলুন। ও বেচারা খুব মনমরা হয়ে আছে।

ললিত বিমানকে নিয়ে নেমে গেল। জানালা দিয়ে ঝুঁকে বলল, আমরা মিনিট পনেরোর জন্য যাচ্ছি। আপনারা বোঝাপড়া করে নিন।

শাশ্বতী হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে বলে, আমি নামব।

কেন?

শাশ্বতী উদভ্রান্তের মতো চেয়ে থেকে বলল, আমি যাব না।

মুহূর্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ললিতের। সে নিঃসংকোচ স্থির দৃষ্টিতে শাশ্বতীর অদ্ভুত ফ্যাকাশে মুখখানা দেখে। গোলমালটা কোথায় তা সে এখনও জানে না। কিন্তু জানার দরকারও নেই। অনেক দিন আগে সে ছিল অল্পবয়সি এক অসহায় ছেলে, যখন মিতুর জন্য সে রাস্তায়-ঘাটে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত হাঁ করে। মিতু ফিরেও তাকায়নি। মিতু তাকে গোপনে বড় অবহেলা করে গেছে। এখন আর মিতুর জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই তার, কেবল সেই তখনকার কমবয়েসি ললিতের জন্য তার এক মায়া আছে। পুরুষের অপমান কিংবা দুঃখ সে বোঝে। বোঝে প্রতিশোধ। মনে মনে কঠিন হয়ে গেল ললিত। আদিত্য নামে এক বন্ধুর জন্য নয়, কেবলমাত্র একজন পুরুষের জন্য একটা কিছু সৎ কাজ তার করে যাওয়া দরকার। একটু আগেও হয়তো শাশ্বতীর জন্য মায়া হচ্ছিল তার। কিন্তু এখন হঠাৎ তার ভিতরে এক আহত পুরুষ বাঘের মতো গর্জন করে উঠল।

মুখে মিষ্টি হাসল ললিত, বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখবেন। কোনও ভাবনা নেই। আমরা আজ রাতে আদিত্যর পয়সায় মুরগি খাব—আপনি কি তা চান না?

কিছুই বুঝতে পারল না শাশ্বতী। পাগলা বোকা চোখে চেয়ে রইল।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রকাণ্ড একটা হলঘর। তার ভিতরেই পার্টিশান দেওয়া খোপে সঞ্জয়ের অফিস। তারা ঢুকতেই ব্যস্ত সঞ্জয় মুখ তুলে বলল, কী ব্যাপার?

একটা ঝামেলা ঘাড়ে করে এনেছি। তোকে যেতে হবে।

কোথায়? সঞ্জয় সই করতে করতে বলে।

সাক্ষী দিতে। আজ আদিত্যর বিয়ে, ওরা নীচে ট্যাক্সিতে বসে আছে। খুব দ্রুত বলে ললিত। তার হাঁফ ধরে যায়।

জানতাম! সঞ্জয় শ্বাস ফেলে বলে, আমার যে ক'টা বন্ধু আছে, এক শালারও মাথার ঠিক নেই।

ললিত দম ফেলার সময় দেয় না, হাত বাড়িয়ে বলে, টেলিফোন ডিরেক্টরিটা শিগগির—

তারপর বসে মোটা বইখানা টেনে তাড়াতাড়ি পাতা ওলটাতে থাকে ললিত, আপনমনে বলতে থাকে—ডাক্তার বাগচী... ডাক্তার বাগচী... ম্যারেজ রেজিস্ট্রার...

সঞ্জয়ের উলটো দিকের চেয়ারে কালো মোটামতো একটা লোক বসে ছিল। ললিত তাড়াহুড়োয় তাকে লক্ষ করেনি। সেই লোকটা হঠাৎ ললিতের কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমার হাতে একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছে। যাবেন?

ললিত চমকে উঠে চেয়ে প্রথমে চিনতে পারে না লোকটাকে, তারপর বলে, আরে! লক্ষ্মীকান্ত!

লক্ষ্মীকান্ত হাসে, ম্যারেজ পার্টির জন্য ভাল ঘরও আছে আমার হাতে। নিরিবিলি। বর বউ রাত কাটাতে পারে স্বচ্ছন্দে। ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে দেব—কম ভাড়া—

ললিত তাকে হাত ধরে টেনে তোলে, চলো, তোমার চেনা রেজিস্ট্রারের কাছে। কিন্তু নোটিস দেওয়া নেই, আর মেয়েটা আপত্তি করতে পারে। কান্নাকাটিও করবে হয়তো, কান দিলে চলবে না। পারবে?

লক্ষ্মীকান্ত মিটমিট করে হেসে বলে, মেয়েরা সহজে রাজি হয় না—এ তো জানা কথা। পারব।

ব্যান্ডেজের তলায় আঙুল চালিয়ে আর-একবার কপাল চুলকোনোর চেষ্টা করছিল বিমান। ললিতের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তোমাকে ভীষণ অস্থির দেখাচ্ছে। তোমার হাত কাঁপছে।

ললিত চমকে ওঠে হঠাৎ। ঠিক, তার হাত কাঁপছে। গুরগুর করছে বুকের ভিতরটা। দুপুরে সামান্যই খেয়েছে ললিত, কিন্তু হজম হয়নি। কলকল করে তার পেট ডাকছে। নিজের ব্যস্ততা আর অস্থিরতা লক্ষ করে লজ্জা পায় ললিত, বলে, সময় বেশি নেই। ব্যাপারটা আজকেই করতে হবে।

লক্ষ্মীকান্ত বলে, মোটে সোয়া তিনটে। অনেক সময় আছে। দরকার হলে রাত দশটায় করে দেব।

সঞ্জয় মুখ তুলে বলে, একটু বোস। আমি কাজ ক'টা সেরে নিই। সাক্ষী-ফাক্ষী দিয়ে আর অফিস ফিরব না, কেটে পড়ব তোদের সঙ্গে।

ললিত অস্থির মন নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। এক বার উঠে জানালার কাছে যায়। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে

আছে অচল হয়ে। ট্যাক্সির জানালার কাচের ওপর ছোট্ট শ্যামলা হাতের আঙুল, কবজি, আর হাতঘড়িটা দেখা যাচ্ছে। শাশ্বতী। আবার ফিরে আসে ললিত। অস্থির বোধ করে। সময় নেই—আর সত্যিই খুব একটা সময় নেই। তার নিজের সময় ফুরিয়ে আসছে।

চেয়ারের পিছনে মাথা হেলিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে। চোখ বোজে। ওরা সত্যিই কথা বলছে কি? কে জানে! সে ওদের পনেরো মিনিট সময় দিয়ে এসেছে। সময় আছে। নিজের হাতঘড়ি দেখে ললিত। এখনও অনেক সময় আছে। সে চোখ বুজে থাকে। শুনতে পায় লক্ষ্মীকান্ত নিজে থেকেই বিমানের সঙ্গে পরিচয় করে নিচ্ছে, খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করছে বিমানের জীবন-বিমা করা আছে কি না! ললিত মৃদু একটু হাসে। কত ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লোক—ওইভাবে বেঁচে থাকতে হঠাৎ তার শরীর শিরশির করে ওঠে—বেঁচে থাকা কী রকম ভাল। কত ভাল।

মিনিট কুড়ি বাদে সঞ্জয় উঠল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সঞ্জয় বিমানকে বলল আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো! ললিতের খেয়াল হল অস্থিরতায় সে দু'জনের চেনা করিয়ে দেয়নি। বিমান তার সুন্দর গলায় উত্তর দিল, রমেনের বাড়িতে। রমেন গান গাইত, চোখ বন্ধ করে হাঁটত, চোখ বেঁধে দিলেও বলে দিত ঘরের কে কোনখানে বসে আছে। আমি সেখানে যেতাম। সঞ্জয় বলে, ওঃ হো, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনিই—আপনার নাম বিমান না?

ললিত আর কোনও কথা শুনতে পেল না। সে ওদের চেয়ে কয়েক পা এগিয়ে নামতে লাগল।

শাশ্বতী অবিকল সেইভাবেই বসে ছিল যেভাবে ললিত তাকে দেখে গেছে। যেন গত কুড়ি মিনিটে সে একটুও হাত-পা নাড়েনি। নিশ্বাসও নেয়নি। সঞ্জয় আর লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে পরিচয় করানোর সময়ে একটুও হাসল না শাশ্বতী। কথা বলল না। হাত দু'টো জড়ো করল কেবল। বুকের কাছে তুলে ছেড়ে দিল—হাত দু'খানা কাঠের টুকরোর মতো পড়ে গেল।

বোঝা গেল আদিত্য অনেক সিগারেট খেয়েছে। ট্যাক্সির ভিতরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার।

সঞ্জয়ের গাড়িতে উঠল লক্ষ্মীকান্ত আর বিমান। ট্যাক্সির সামনের সিটে পুরনো জায়গায় বসল ললিত। সঞ্জয়ের সাদা গাড়িটা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আগে আগে।

ললিত এক বার মুখ ফিরিয়ে শাশ্বতীকে বলল, আপনারা কথা বলেননি?

শাশ্বতী বেভুল তাকিয়ে রইল শুধু।

হাসল ললিত, আপনমনে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর তখন শাশ্বতী দেখছিল এক অচেনা শহরের অদ্ভুত রাস্তাঘাটের ভিতর দিয়ে কয়েকজন ধর্মনষ্টকারী অচেনা পুরুষ তাকে এক রহস্যময় জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। যেমন অনেক বছর আগে নিয়ে গিয়েছিল তার দিদি লীলাবতীকে।

আর তখন সঞ্জয়ের গাড়িতে পিছনের সিট থেকে হাত বাড়িয়ে বিমান সঞ্জয়ের পিঠে টোকা দিল, বলল, ওই মেয়েটা আদিত্যকে ভালবাসে না।

বাসে না? সঞ্জয় বিস্মিত হয়!

না। মাথা নাড়ে বিমান, বিড়বিড় করে বলে, আমি জানি।

তা হলে? সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে।

বিমান একটু ভাবে, তারপর তার ধীর গম্ভীর গলায় বলে, কিন্তু ললিতের ইচ্ছে বিয়েটা হোক।

তারপর একটু ভেবে বলে, কিন্তু আমি জানি, সকলের সঙ্গে সকলের বিয়ে হয় না। বিয়ের একটা নিয়ম আছে। বিয়েটা খুব পবিত্র জিনিস। ভুল বিয়ে দুঃখী, অলস, অকর্মণ্য এবং বিশ্বাসঘাতক মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। এবং তার জন্য, ভুল বিয়ে যারা করে তারা সমাজের কাছে দায়ী থাকে। তাদের বিচার হওয়া উচিত।

লক্ষ্মীকান্ত মাথা নেড়ে বলে, ঠিক!

সঞ্জয় মৃদু হাসে। বিমানটা পাগল।

ভিতর থেকে লক্ষ্মীকান্ত বুড়ো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সঙ্গে তার গোপন কথাবার্তা বলে বেরিয়ে আসে।

পাশাপাশি তিনটে আরামদায়ক বড় সোফার একটিতে আদিত্য আর শাশ্বতী খুব ফাঁক হয়ে বসেছে। অন্যটাতে ললিত আর সঞ্জয়। তৃতীয়টায় বিমান, তার পাশে লক্ষ্মীকান্ত এসে বসল।

শাশ্বতীর এখনও কোনও সাড়া নেই। সে খুব বিস্মিতভাবে চারধারে চেয়ে দেখছে। আদিত্য মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে আছে।

সঞ্জয় দু'-একবার হাসিঠাট্টা করবার চেষ্টা করে চুপ করে ছিল। ললিত হঠাৎ একসময়ে বলল, সব শেষ! বাঃ!

রেজিস্ট্রার তার মোটা চশমার কাচের ভিতর দিয়ে তাদের দিকে চেয়ে দেখল। প্রকাণ্ড খাতা খুলল, বের করল ফর্ম। নিঃশব্দে লিখতে লাগল।

নিস্তব্ধ ঘর।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার তার ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল, দু'জনের নাম?

ললিত বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হল না। মৃদু একটু শব্দ করে খুব আস্তে শাশ্বতী কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ তার সংবিৎ ছিল না। কিন্তু এখন সে হঠাৎ বুঝতে পারছে। তাকে কোথায় কেন এনেছে ওরা।

চমকে সোজা হয়ে বসে আদিত্য। সঞ্জয় উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ললিত চেয়ে থাকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বিমান। সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলল, ভদ্রমহিলা কাঁদছেন। উনি বিয়ে করতে রাজি নন।

লক্ষ্মীকান্ত শাশ্বতীর সামনে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলতে থাকে, দিদি, আমারও বউ রাজি ছিল না। এই দেখুন, আমার কালো মোটা চেহারা---বিচ্ছিরি। কিন্তু এখন আমার ছ'-ছটা বাচ্চা, বউ কত খোঁটা দেয়, তবু আমরা সুখে আছি.. দিদি, রাজি হয়ে যান, সব ঠিক হয়ে যাবে... সব ঠিক হয়ে যাবে...

বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার তার প্রকাণ্ড খোলা খাতাখানার দিকে অসহায় চোখে চেয়ে থাকে।

বিমান খোঁড়াতে খোঁড়াতে ললিতের কাছে এসে গলা নিচু করে বলে, আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। রাজি করিয়ে আনব। তোমরা অপেক্ষা করো।

ললিত কথা বলে না। চেয়ে দেখে বিমান খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনে জড়সড় ভিতু শাশ্বতী।

তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু বিমান আর শাশ্বতী ফিরল না।

গভীর ক্লান্তির সঙ্গে ললিতের চোখ বুজে আসে। বদহজমের টক ঢেঁকুরে হঠাৎ তার গলা বুক জ্বলে যায়। মুখে জল আসে। হাসপাতালে ওষুধপত্রের যত গন্ধ পেয়েছিল ললিত, হঠাৎ সেইসব গন্ধ তার নাকে আসতে থাকে। হিক্কার মতো একটা শব্দ করে সে। মুখ চেপে ধরে রাখে। তারপর কোনওক্রমে জিজ্ঞেস করে, বাথরুমটা—বাথরুমটা কোন দিকে?

## ॥ সতেরো ॥

তাকে নীচে ফুটপাথে নিয়ে এল মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা রোগা অচেনা লোকটা। এটা কোন জায়গা ঠিক বুঝতে পারছিল না শাশ্বতী। উলটো দিকে একটা বড় পার্ক—তাতে বিশাল বিশাল পামগাছ, অনেক লোকের ভিড়—যেন কোনও মিটিং হচ্ছে। পার্কটার একটা গেটের ওপর সাইনবোর্ড—বহুবাজার ব্যায়াম সমিতি। এটা কি বউবাজার? কে জানে! শাশ্বতী কলকাতার অনেক অংশই চেনে না।

মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা লোকটা খুব উত্তেজিতভাবে গলা নামিয়ে বলল, আপনি পালিয়ে যান।

বড় সুন্দর লোকটার গলা। ভরাট, দানাদার, যেন খুব স্বাস্থ্যবান সুন্দর চেহারার পুরুষের গলা।

কিন্তু কোথায় পালিয়ে যাবে শাশ্বতী? কার কাছ থেকে?

সে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে, এটা কোন জায়গা?

লোকটা তার দিকে চোখ গোল করে তাকায়, জায়গাটা চেনেন না? ওই তো ওয়েলিংটন স্কোয়ার, যেখানে মিটিং হয়। আর ওই ধর্মতলা স্ট্রিট।

না, শাশ্বতী চেনে না। সে আঁচলে চোখ দু'টো এক বার চেপে ধরে।

লোকটা তেমনি উত্তেজিত গলায় বলে, ট্যাক্সি ডেকে দেব? বেশি দেরি করবেন না। ওরা ঠিক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপনার মন ঘুরিয়ে দেবে। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান।

হঠাৎ দূর স্মৃতিতে যেন শাশ্বতীর মনে পড়ে আদিত্য নামে একটা লোক—আদিত্য নামে একজন ছিল। শাশ্বতী তাকে বলেছিল ভালবাসবে। কিন্তু বাসা হয়নি—ঠিকমতো বাসা হয়নি। এখন সেই আদিত্য তিনতলার ওপর বসে আছে একটা সোফায়—তার পরনে সদ্য কেনা জামা-কাপড়, মুখে লজ্জায় ভাব, হাতে ফুল। কিন্তু এখন আদিত্যকে অনেক দূরে ফেলে এসেছে শাশ্বতী। শাশ্বতী ফিসফিস করে ধরা গলায় বলে, একা একা ট্যাক্সিতে চড়তে আমার ভয় করে। তা ছাড়া আমার কাছে পয়সাও নেই।

আমার কাছেও নেই। বলে হাসল বিমান। তারপর বলল, তা হলে বাসে যান। ওই যে বাস-স্টপ।

শাশ্বতী ব্যাপারটা তখনও সঠিক বুঝতে পারছিল না। অগোছালো ঘরের মতো হয়ে আছে তার মন। সে বিমানের দিকে ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলে, আমি একা যেতে পারব না। আমার শরীর কেমন করছে!

বিমান ওপরের ব্যালকনিটা দেখছিল। সেখানে সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে সিগারেট, খুব অন্যমনস্ক চোখে দূরে দেখছে। বিমান শাশ্বতীকে চোখের ইঙ্গিত করে চাপা গলায় বলল, সরে চলুন। সঞ্জয় দেখতে পাবে।

খানিক দূর ভিড় ঠেলে হাঁটল তারা। নিঃশব্দে। বিমান খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগে আগে। শাশ্বতী পিছনে। শাশ্বতী হাঁফিয়ে গেল অল্পেই। ফুটপাথের ধারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, আমার পা ব্যথা করছে।

বিমান মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে, বসবেন?

শাশ্বতী মাথা নেড়ে জানায়—বসবে।

বিমান বলে, তবে একটু চলুন। কাছেই।

ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে ধীরে হেঁটে তারা চাঁদনির কাছে চলে এল। গলিঘুঁজির মধ্যে একটু ঢুকে একটা চায়ের দোকান। বিমান তাকে নিয়ে সেই খুপরি দোকানে ঢুকে একটা কাঠের সরু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। জায়গাটা গুদামঘরের মতো বদ্ধ। কিন্তু নির্জন, নিঃশব্দ। শাশ্বতী বোধহীন চোখে দেখছিল। কোথা থেকে কোথায় এসেছে সে, সঙ্গের এই অদ্ভুত লোকটাই বা আসলে কে তা কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু শাশ্বতীর আলাদা ইচ্ছে বলে কিছুই নেই এখন। তার একটু ঘুম পাচ্ছে, একটু তেষ্টা পাচ্ছে, খুব ক্লান্ত লাগছে—এই কয়েকটা শারীরিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছিল না সে। এখন কেউ একজন তাকে চালিয়ে নিয়ে যাক।

একটা ছোট টেবিল, আর দু'খানা চেয়ার তার দু'দিকে ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই ঘরটায়। এক ধারে দড়িতে ঝোলানো ময়লা জামা-কাপড় আর গামছা, মেঝেতে গোটানো কয়েকটা সরু পাতলা বিছানা দেখে মনে হয় এখানে গরিবদুঃখী লোকেরা থাকে—এটা তাদের শোযার একটা আস্তানা। ঘরের কোণে বস্তা, তেলের টিন, ঝুড়িভরতি আলু আর আনাজ। দোকানের ভাঁড়ার। বোঝা যায় এ-ঘরটা বাইরের খদ্দেরদের জন্য নয়। ঘরটা নিচু, এক পাশে কেবল একটা জানালা। বিকেলের এক ফালি লাল রোদ এসে শাশ্বতীর পা ছুঁয়ে রইল।

মুখোমুখি বিমান বসল। এইবার শাশ্বতী লক্ষ করে দেখল বিমানকে। বিমানের চোখে-মুখে তীব্র উত্তেজনা জ্বলজ্বল করছে, ঠোঁটে টেপা একটু হাসি, যে-হাসিটা চেপে রাখতে বিমানের কষ্ট হচ্ছে, ওর মুখখানা লাল, টেবিলের ওপর রাখা হাতখানা কাঁপছে। জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে একটু তাকিয়ে থাকে বিমান, তারপর হঠাৎ ঝুঁকে চাপা গলায় বলে. জীবনে এই প্রথম—না, না—এই দ্বিতীয়বার আমি একটা কিছু করলাম, জানেন? একটা ভাল কিছু। আমার ভিতরটা ফেটে যেতে চাইছে।

বলে বিমান আপনমনে আনন্দে বিভোর হয়ে হাসে। ওর সমস্ত শরীর রি-রি করে কাঁপতে থাকে।

যেন ডাকাতদলের হাত থেকে শাশ্বতীকে উদ্ধার করে এনেছে একজন সাহসী গোয়েন্দার মতো, এ-রকমই হয়তো নিজেকে মনে হচ্ছিল বিমানের।

আস্তে আস্তে শাশ্বতীর অবোধ অবুঝ ভাবটা কেটে যেতে থাকে। সে পরম ক্লান্তিতে ঘাড় হেলিয়ে একটু চোখ বুজে থাকে। হঠাৎ তার নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে লজ্জায়, ভয়ে। শিউরে কেঁপে ওঠে সে। হঠাৎ সে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে, আমি কি সই করেছি?

কোথায়?

ওইসব কাগজে? তখন আমার কিচ্ছু ঠিক ছিল না মাথার। কী করেছি মনে নেই।

বিমান ঝকঝকে চোখে চেয়ে হাসে। মাথা নেড়ে বলে, না। কিন্তু আপনি খুব কমজোরি, আর-একটু থাকলে ওরা আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিত।

শাশ্বতী জিজ্ঞেস করে, কেন?

বিমান উত্তেজিতভাবে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু বেশি উত্তেজনায় তার কথা আটকে যায়। বলে, মানুষ অনেক সময়ে মানুষের ভালটাই ভাবে, কিন্তু করতে গেলে উলটো করে ফেলে।

শাশ্বতী একটা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

সদ্য ঘুম থেকে ওঠা একটা বাচ্চা বয় খালি গায়ে হাই তুলতে তুলতে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। বিমান জিজ্ঞেস করে, কী খাবেন?

কিছু না। শাশ্বতী উত্তর দেয়।

একটু চা?

না। মাথা নাড়ে শাশ্বতী, আমার বমি হয়ে যাবে। আমি শুধু একটু জল খাব।

জল—বিমান উত্তেজিতভাবে ছেলেটাকে বলে, এক গ্লাস জল—শিগগির—!

ছেলেটা বোকা চোখে তাকিয়ে থেকে মন্থর পায়ে চলে যায়। বিমান ছেলেটার যাওয়ার ভঙ্গিটা চেয়ে দেখে, তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে শাশ্বতীকে বলে, কী মজা! ওরা আমাদের কোথাও খুঁজে পাবে না।

বলে আপনমনে একটু হাসে।

শাশ্বতী হাসে না। তার খুব ক্লান্তি আর হতাশা বোধ হয়। সে জানে, আজ হোক কাল হোক আদিত্য তাকে খুঁজে বের করবে। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার আর তিনজন সাক্ষীর সামনে তাকে বোকার মতো বসিয়ে রেখে এসেছে সে। সে আর ফিরে যাবে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবে আদিত্য। অপমানে লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে, চিড়বিড় করবে রাগে। তারপর আজ হোক কাল হোক, হয় বাসায় নয় তো রাস্তায়-ঘাটে কোথাও কিংবা কলেজের সামনে ওত পেতে থেকে শাশ্বতীকে ধরবে আদিত্য। তখন কী হবে শাশ্বতী জানে না। কিন্তু আদিত্য খুঁজে বের করবেই তাকে—করবেই—সহজে ছেড়ে দেবে না। শাশ্বতী জানে।

জল খেয়ে শাশ্বতী বলল, এবার যাব।

চলুন। বলে বিমান উঠে দাঁড়ায়।

শাশ্বতী ইতস্তত করে বলে, চা খেলেন না? এতক্ষণ আমরা এখানে বিনিপয়সায় বসলাম! একটা কিছু খাওয়া উচিত ছিল।

না, না। বিমান বলে, এ আমার অনেক কালের চেনা দোকান। কলেজে পড়ার সময়ে এখানে আমি আর রমেন আসতাম। এই ঘরটা তখন থেকেই আমাদের জন্য আছে। আপনার ওই চেয়ারটায় রমেন বসত। আমরা অনেকক্ষণ এখানে কাটিয়ে যেতাম। আমি এখনও প্রায় আসি।

ও। শাশ্বতী বলে।

কাঠের সরু সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নেমে আসে তারা। বড় রাস্তায় এসে শাশ্বতী বলে, আপনার কথা ওর কাছে কোনও দিন শুনিনি তো! আপনি ওঁদের কীরকম বন্ধু?

বিমান মাথা নাড়ল, আমি ওদের বন্ধু নই। এক সময়ে এক ক্লাসে পড়তাম, মুখ-চেনা ছিল।

শাশ্বতীর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে যে, তা হলে সে এদের দলে জুটল কী করে! লজ্জায় জিজ্ঞেস করল না।

কিন্তু বিমান নিজের থেকেই বলল, আজ হঠাৎ অনেক বছর বাদে আদিত্যর সঙ্গে প্রথম দেখা। ললিত ওকে আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আদিত্যকে আজ এত দিন বাদে প্রথম দেখার দিনেই ললিত ওর বিয়েতে সাক্ষী দিতে বলল আমাকে। আসলে আমার মনে হয়, ললিতের ধারণা ছিল, এই

গোলমেলে বিয়েতে আমার মতো একটা পাগল-টাগল নিরীহ গোবেচারাকে সাক্ষী দিতে ডাকাই নিরাপদ। সেয়ানা বন্ধুরা সাক্ষী দেওয়ার আগে অনেক প্রশ্ন করবে, সব ব্যাপার জানতে চাইবে, এবং গোলমাল দেখলে পিছিয়ে যাবে।

শাশ্বতী অনেকক্ষণ বাদে এইবার হাসল। জিজ্ঞেস করল, আপনি কি পাগল?

হ্যাঁ। বিমান গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে, মাঝে মাঝে আমার মাথার গোলমাল হয়।

কেন?

বিমান আঙুল তুলে শাশ্বতীকে আকাশটা দেখিয়ে বলল, আমার মাথায় আকাশ ঢুকে যায়। তখন মাথার মধ্যে খুব যন্ত্রণা হয়। আমি পাগল হয়ে যাই। কিন্তু সবসময়ে আমার পাগলামি থাকে না।

শাশ্বতীর দিকে চেয়ে একটু বুঝদারের মতো হাসল বিমান, বলল, এখন আমি পাগল নই। আমি জানি মেয়েরা পাগলদের ভয় পায়। কিন্তু আপনার কোনও ভয় নেই। একটু আগেই আমি সুস্থ মানুষের মতো একটা কাজ করেছি—আপনাকে নিয়ে এসেছি ওদের কাছ থেকে। আদিত্য এক পাত্র বিষ খেতে যাচ্ছিল, আমি ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেটা ও আজ বুঝবে না। দেখা হলে ও আমার সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করবে।

শাশ্বতী আবার হাসে, বলে, আমি কি বিষ?

না। মাথা নাড়ে বিমান, এমনিতে আপনি বিষ নন। ঘি আর মধু আলাদা আলাদাভাবে বিষ নয়, কিন্তু মেশালে বিষ। ঠিক সেই রকম। ভালবাসা-টাসা আমি খুব ভাল বুঝি না। কিন্তু এইটুকু বুঝি যেমন তেমন বিয়ে হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এখন কি আপনি বাসে উঠবেন? বাসে খুব ভিড়। অফিস ভাঙার সময়।

মন্থরগতিতে বোঝাই বাস-ট্রাম চলেছে। সামনেই চৌরাস্তায় ধীরে ধীরে সৃষ্টি হচ্ছে একটা ট্র্যাফিক-জ্যাম।

শাশ্বতী উদ্বিগ্ন চোখে দেখল। বলল, ওঠা যাবে না।

তা হলে?

শাশ্বতী হাসল, এখন হঠাৎ আমার খিদে পাচ্ছে আবার।

বিমান বলল, তবে চলুন ওই দোকানটায় ফিরে যাই। ওখানে বললে কইলে বাকিতে খাওয়া যাবে। কিন্তু খাবার খুব বাজে। আমি ওখানে আসি কেবল নিরিবিলিতে বসার জন্য, আর পয়সা না থাকলে বাকিতে খাওয়ার জন্য। যাবেন?

না। শাশ্বতী মাথা নাড়ে, ওই গুদাম ঘরে আমার দম আটকে আসছিল। তা ছাড়া ওটা তো আসলে একটা শোয়ার ঘর, পুরুষেরা শোয়। আমার ভাল লাগে না।

বিমান তার বাঁ পকেট থেকে ছেঁড়া পুরনো মানিব্যাগটা বার করে পয়সা হিসেব করে বলল, তিরানব্বই পয়সা আছে মোটে।

শাশ্বতী বলল, আমার কাছে এক টাকার মতো।

বিমান একটু ভেবে বলল, তা হলে কোনও মাদ্রাজি দোকানে চলুন। সস্তায় খাওয়া হবে।

একটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সিনেমা হল পেরিয়ে যাচ্ছিল তারা। হলঘরের সামনের ফুটপাথে ঠান্ডা হয়ে আছে। শীতে কেঁপে উঠল শাশ্বতী। তারপর বলল, বড় রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় করছে। ওরা যদি গাড়িতে এই রাস্তাতেই ফেরে!

ঠিক। বিমান দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারপর বড় রাস্তা ছেড়ে গলিঘুঁজির মধ্যে হাঁটতে লাগল তারা। পৃথিবীময় অচেনা মানুষ, অন্ধের মতো গায়ে ধাক্কা দিয়ে উলটোপালটা হেঁটে যাচ্ছে নাম-পরিচয়হীন মানুষেরা। অচেনা রাস্তাঘাট, চোরাগলি, শাশ্বতী কোনও দিন এই সব জায়গা দেখেনি। এই অচেনা জায়গায় ভিড়ের মধ্যে সে একজন অজানা পুরুষমানুষের সঙ্গে কোথায় কোন রেস্টুরেন্টে চলেছে! কিন্তু তার একটুও ভয় করে না। পথ-চলতি লোকেরা মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা বিমান, আর তার সঙ্গে তাকে যেতে দেখে কৌতূহলে তাকাচ্ছে। কিন্তু শাশ্বতীর খুব একটা লজ্জা করে না। বরং তার মন এখন ঝরঝরে পরিষ্কার—বন্ধনহীন। জ্বর সেরে গেলে শরীর যেমন দুর্বল আর শীতল মনে হয়, তেমনি লাগছে তার। একটু হয়তো বা দুর্বল। কিন্তু জ্বর নেই। জ্বর আর একটুও নেই। তার খুব ভাল লাগছে, সে যেন এখন সেই ফ্রক-পরা ঝুঁটি-বাঁধা শাশ্বতী, বাবার সঙ্গে পুজোর জামা কিনতে বেরিয়েছে।

আবার কাঠের সিঁড়ি, আবার দোতলা। তবে এ-রেস্টুরেন্টটা অনেক বড়, আর লোকজনের খুব ভিড়। টেবিলের সামনে লোকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, জায়গা খালি হলে বসবে। সমস্ত ঘরটায় একটা টক গন্ধ, আর বাসনকোসন ধোয়ার খুব শব্দ হচ্ছে।

বিমান নিচু গলায় বলে, ভয় নেই। কম পয়সায় লোকে খায় বলে এত ভিড়। এখানে কেবিন আছে— অনেকক্ষণ বসা যায়।

একটু অপেক্ষা করে কেবিন পাওয়া গেল। দু'টো দোসা আনতে বলল বিমান। তারপর শাশ্বতীর দিকে চেয়ে হাসল। বাচ্চা ছেলের মতো অহংকার তার মুখে। শাশ্বতীকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, আপনার কোনও ভয় নেই। আমি এখন পাগল নই। পাগলামি আসার আগেই আমি টের পেয়ে যাই। তখন আমার কাছাকাছি যারা থাকে তাদের সাবধান করে দিই যে, আমি আর কয়েক দিনের মধ্যেই পাগল হয়ে যাব।

শাশ্বতী বাচ্চা মেয়ের মতো একটু হাসে। পরমুহূর্তেই বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে বলে, আমার বাবাও মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায়।

পাগল? খুব অবাক হয় বিমান, কী রকম?

শাশ্বতী আস্তে আস্তে বলতে লাগল তার বাবার কথা। বলতে তার ভাল লাগছিল, মন মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল তার। সে কখনও চোখের জল মুছল, কখনও হাসল।

বিমানকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। হাত কাঁপছিল তার। প্রথমে কিছুক্ষণ সে কথা বলার চেষ্টা করেও পারল না। তারপর কষ্টে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আমরা যারা পাগল তারা কী রকম তা ঠিক বোঝানো যায় না। আমরা সকলেই এক রকমের পাগল নই, বুঝলেন! আমরা যে যার নিজের মতো করে পাগল। না, আমি ভবিষ্যৎ কিছু দেখতে পাই না, কিন্তু যখন আমার মাথায় আকাশ ঢুকতে থাকে আর মাথার যন্ত্রণায় আমি কষ্ট পেয়ে কাতরাই তখন মাঝে মধ্যে আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। প্রকাণ্ড একটা জায়গা— সেই জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, সূর্য চাঁদ তারা কিচ্ছু নেই, সেইখানে বিরাট খোলা জায়গায় হাজার হাজার মানুষ। অন্ধকারে অসম্ভব গোলমাল করে তারা, চিৎকার করে, এর সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। আছড়ে পড়ে মানুষ, আবার উঠে দাঁড়ায়। রাস্তা খুঁজে না পেয়ে হাতড়ে চলে, কোথায় চলেছে জানে না। কখনও তারা চেঁচিয়ে বাবা মা ভাই বন্ধুর নাম ধরে ডাকে, কাঁদে, আবার কখনও কেউ পা মাড়িয়ে দিয়েছে বলে ঝগড়া করে। মারপিট ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা যায়। দাঁত ঘষার শব্দ, গালাগালের শব্দ। অন্ধকারের মধ্যে এইসব ঘটতে থাকে। কিন্তু তখন আমার মাথায় আকাশ ঢুকছে বলে যন্ত্রণায় আমি বেশি কিছু বুঝতে পারি না। চোখ খুলে ঘোর অন্ধকার দেখি। আর দেখতে পাই আমার গায়ের ওপর দিয়ে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু তারা আসলে কোথাও যায় না, ঘুরে-ফিরে অন্ধকারে আবার একই জায়গায় ফিরে আসে, তারপর ভুল এবং নিরর্থক পরিশ্রম বুঝতে পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হাঁফায়। ককিয়ে কেঁদে ওঠে। খুব মজার সেই দৃশ্য।

শাশ্বতী আস্তে করে হেসে ওঠে, মুখে রুমাল চাপা দেয়।

বিমান হাসে না। গম্ভীরভাবে বলে, যুদ্ধের সময়ে যখন হাতিবাগানে বোমা পড়ল তখন আমরা কলকাতা ছেড়ে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে গিয়েছিলাম। গোয়ালন্দের স্টিমার পার হয়ে রাত্রিবেলা ট্রেনে ওঠার সময়ে অন্ধকারে ঠিক ওই রকমই একটা ধাক্কাধাক্কি, গোলমাল আর দিশেহারা অবস্থায় পড়েছিলাম আমরা। মা আমাকে নিয়ে ছেঁচড়ে একটা কামরায় উঠেছিল, আমাদের মেঝেয় ফেলে গায়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠেছিল মানুষ, থেঁতলে দিয়ে গিয়েছিল আমাদের। তার ওপর বাবা দাদা আর আমার ছোট বোনটা যে কোথায় গিয়েছিল ছিটকে তা কে জানে! সেই আতঙ্ক আর ভয়, আর সেই অন্ধকার এখনও আমার মধ্যে রয়ে গেছে। এক-একবার মনে হয়েছে আমার পাগলামির সময়ে আমি সেই দৃশ্যটাই দেখি। কিন্তু তারপর ভেবে দেখেছি যে, আসলে তা নয়। গোয়ালন্দের যাত্রীদের একটা উদ্দেশ্য ছিল—তারা ট্রেনে উঠে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই অন্ধকার জায়গায় লোকগুলোর আসলে কোনও উদ্দেশ্য নেই, এরা জানেই না কোথায় গেলে কী হবে, এত হাঁটাচলা, এত পরিশ্রমের অর্থ কী। তাই আমি এর একটা অর্থ করলাম যে, আসলে এই যে মানুষ জন্মাচ্ছে পৃথিবীতে, বেঁচে থাকছে, কাম-ক্রোধ-লোভের হাত ধরে চলেছে— এরা তো আসলে জানে

না কেন জন্ম, কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন। তাই পৃথিবীতে সবসময়েই রয়েছে এক ঘোর অন্ধকার, কিন্তু মানুষ সেটা বুঝতেই পারে না। তাদেরই মন থেকে অন্ধকার ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে। তাই রেলগাড়ির হ্যান্ডেল ধরে যেতে যেতে ঝুলন্ত মানুষ দেখতে পায় না তার মাথা লক্ষ্য করে ষাট মাইল বেগে ছুটে আসছে ইলেকট্রিকের পোস্ট, দেখতে পায় না রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ কখন ট্রাফিকের লাল বাতি সবুজ হয়ে যায়। বুঝতে পারে না, লম্বা ঘাসের ভিতরে চিকন-শরীর সাপ চলে আসছে কাছাকাছি, তারা কখনও দেখে না চারপাশের জীবাণু-জগৎ, শরীরে উঠে আসছে কষ্টকর রোগ। যতটুকু দেখে মানুষ ততটুকু আসলে কিছু নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু আছে, যা সে দেখতে পায় না। তাই আমার পাগলামির সময়কার ওই দৃশ্যে সূর্য নেই, চাঁদ নেই, তারা নেই। ওই দৃশ্যে আমি এক অদ্ভুত সত্যকে দেখতে পাই, যা আর কেউ দেখে না। ঘোর অন্ধকার একটা পৃথিবীতে জন্মান্ধ মানুষেরা হাঁটছে।

বিমান শাশ্বতীর চোখ দেখে হঠাৎ হেসে বলল, না, না, আমি এখন ঠিক আছি। কোনও ভয় নেই। আপনার বাবা এক রকমের পাগল, আমি আর-এক রকমের। কিন্তু কিছু কিছু পাগল আছে যারা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কিছু দেখতে পায়। হয়তো সেইসব পাগলদের কিছু কিছু অনুভূতি প্রখর হয়ে ওঠে, অন্য অনুভূতিগুলো ম্লান হয়ে যায়।

বিমান উৎসুক চোখে শাশ্বতীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ছেলেমানুষের মতো সরল হাসি হাসল, এই যে একটু আগে আদিত্য আপনাকে আইনের প্যাঁচে বিয়ে করার চেষ্টা করছিল, ওটাও এক রকমের অন্ধকারে হাঁটা। ও কেবল বোঝে ওর প্রবল ভালবাসা আছে। কিন্তু সেই ভালবাসা কত দূর সাহায্য করে মানুষকে? বিয়ে কি কেবল ভালবাসারই একটা ঘটনা? তার আগে-পরে কিছু নেই? ও হঠাৎ আজ দুপুরে এসে দু'-একটা কথাবার্তা বলেই বলল, আমার বিয়েতে সাক্ষী দেবে চলো। মনে মনে আমি চমকে উঠলাম। বিয়ে করা কি এতই সহজ, এত দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। সাক্ষীরও ঠিক নেই, প্রস্তুতি নেই— হঠাৎ বিয়ে! মনে মনে আমি তখনি ঠিক করলাম আমি সাক্ষী দিতে রাজি হব। সঙ্গে থাকব ওদের। দরকার যদি হয়, যদি বুঝি জোড় মিলছে না তা হলে শেষ সময়ে গোলমাল করে দেব।

বলে বিমান উজ্জ্বল মুখে হাসল, আমি গোলমাল করে দিয়েছি। না? আপনাকে রাজি করানোর অছিলায় বের করে না-আনলে ওরা ঠিক আপনাকে দিয়ে সই করিতে নিত। তাই না?

শাশ্বতী ভীত মুখে চেয়ে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

বিমান শব্দ করে হাসল। তাদের সামনে সদ্য রেখে যাওয়া প্লেটে দোসা ঠান্ডা হতে লাগল। বিমান বলল, বিয়েটা আসলে কী তা আমি আদিত্যকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তখন ও ভালবাসায় এত ঠাস-ভরাট যে, ওর মধ্যে কথাটা ঠিক ঢুকল না। ওর পক্ষে তখন এটা বোঝা সম্ভবই ছিল না যে, প্রকৃতি আমাদের কাছ থেকে সন্তান চায়, সমাজ চায় প্রকৃত মানুষ। একটা বিয়ে মানেই মানুষের একটা ধারা, আবহমানকালের একটা মনুষ্যস্রোত। তাই না? প্রতিটি স্বামী-স্ত্রীই এ-রকম একটা স্রোতের উৎস। সেই স্রোতটার কথা খেয়াল রাখতে হয়, কেবল ক-এর সঙ্গে খ-এর দেখা হয়ে গেল— তারপর ভালবাসা—গভীর ভালবাসা—বিয়ে—এ-রকমভাবে হয় না। চাষাও জানে কোন জমিতে কী রকম চাষ, সে জানে ভাল জমিতে খারাপ বীজ জ্বলে যায়— ফসল হয় না। কিংবা রুগ্‌ণ ফসল হয়। আপনি কি চান এ-রকম সন্তান, যে আপনার চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ, যে আরও অন্ধ, পৃথিবী যার কাছে আরও ঘোরতর অন্ধকার?

শাশ্বতী লজ্জা পায়। তার মুখে রক্ত ছুটে আসে। চোখ নামিয়ে নেয় সে।

বিমান সামনে ঝুঁকে তার একখানা হাত স্পর্শ করেই হাত সরিয়ে নেয়, বলে, লজ্জা পাবেন না। বরং মনে করে নিন আপনি অবুঝ একটি মেয়ে, আর আমি আপনার বাবার মতোই একজন কেউ। আমি আপনাকে শেখাচ্ছি কীভাবে হাঁটতে হয় অন্ধকারে। দেখুন, আমি চাই আমার সন্তান আমার চেয়ে চক্ষুষ্মান হোক, পৃথিবীর ওই অন্ধকার যেন তাকে দিশাহারা না করে। তাই না? কিন্তু একটি মেয়েকে গভীর ভালবেসে বিয়ে করলেই কি সে-রকম সন্তান পাওয়া যাবে? না। কারণ, প্রকৃতির নিয়ম মানুষের ভালবাসার ধার ধারে না। ঠিক বীজ ঠিক জমিতে না পড়লে বীজ জ্বলে যায়। আমরা অকর্মণ্য, বিশ্বাসঘাতক, ভ্যাবলা, অলস, চোর মানুষ নিয়ে আসি পৃথিবীতে। সমাজ টলমল করে। তাই না? ওই দোকানটায় যে বাচ্চা ছেলেটা ছিল তাকে লক্ষ করেছেন? আমি ওকে প্রায়ই লক্ষ করি। মানুষকে আড়াল

থেকে লক্ষ করা আমার প্রিয় স্বভাব। ছেলেটাকে দেখি একটা কথা বললে বুঝতে অনেক সময় নেয়, কাজের মাঝখানে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে, চুরি করে খায়, মালিক মারলে ঠিক জন্তুর মতো চেঁচায়, আবার পরমুহূর্তেই মারের কথা ভুলে যায়। আমি ওকে দেখেছি ওই ঘরের এক কোণে বসে গায়ের ওপর পড়া একটা টিকটিকিকে ধরে তার শরীর থেকে ল্যাজটাকে খুব অন্যমনস্কভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। তারপর সেই টিকটিকিটাকে হাতে কচলে ডেলা পাকিয়ে ফেলে দিল এক ধারে, হাতের রস রক্ত মাথায় মুছে নিল। কী করছে তা ভাল করে খেয়ালই করল না। আমি কখনও মুরগির মাংস খাইয়েছি, কখনও ক্যাডবেরির চকোলেট, জিজ্ঞেস করেছি, কেমন রে? ও উত্তর দিয়েছে, ভাল। আবার ও যখন পাঁউরুটির গুঁড়ো আর গুড় দিয়ে জলখাবার খায় তখনও জিজ্ঞেস করেছি, কেমন রে! ঠিক একই রকমভাবে বলেছে, ভাল। খাওয়ার সময়ে ওকে দেখবেন— ও স্বাদ বুঝতে পারে না। খেয়ে যায়। আমি রেগে গিয়ে ওকে বলি, হয় তুই সিদ্ধপুরুষ, নয় তো গোবর। আজ আপনার জন্য জল এনে ও গ্লাসটা ধরে দাঁড়িয়েই ছিল, আপনি হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা না নিলে ও দাঁড়িয়েই থাকত। ওটা টেবিলের ওপর রেখে যে ওর সরে যাওয়া উচিত সেটা ও বোঝেই না। আমি জানি ওর মাথার মধ্যে বোধ নেই, বুদ্ধি নেই, কেবল কুয়াশার মতো একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার আছে। এই জীবনের মাথামুণ্ডু ও কিছুই বোঝে না, এক অদ্ভুত অচেনা রহস্যময় জগতে ও আন্দাজে আন্দাজে চলেছে। ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে জন্মান্ধ মানুষ। উনুনের ধারে ওর নোংরা বিছানায় বেড়ালের থাবার নীচে ও ঘুমিয়ে থাকে, খিদে পেলে চুরি করে খায়, কখনও সততার অর্থ বোঝে না।

বিমানের মুখ আঠাঘামে চকচক করে। দ্রুত কথা বলে সে হাঁফিয়ে পড়ছে, তবু থামতে চায় না, ঝুঁকে বলে, কোথা থেকে আসছে এইসব অন্ধ মানুষেরা? কোথা থেকে? এরা ভুল বিয়ের মন্দ উৎপাদন নয়?

বিমান আপনমনে একটু হাসে, মাথা নেড়ে বলে, ওর মা-বাবা দূরদর্শী ছিল না। দূরদর্শী হলে তারা তাদের অতীতের বংশধারার দিকে লক্ষ রাখত, ভবিষ্যৎ সমাজের কথা ভাবত—চট করে বিয়ে করত না। কিন্তু বস্তুত তারাও ছিল অন্ধ মানুষ, ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে আন্দাজে-আন্দাজে তারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে—খিদে পেলে খেয়েছে, তৃপ্ত হয়েছে রতিক্রিয়ায়—কোনওটারই অর্থ বোঝেনি। আমি মাঝে মাঝে কাগজে দেখি রেসের ঘোড়ার বংশগতি ছাপা হয়—যাতে রেসুড়ে মানুষ বুঝতে পারে কোন ঘোড়ার কী জাত। ভাল কুকুর, ভাল গোরুর জন্যও আছে এক রকমের পদ্ধতি। সেখানে শ্রেণীভেদ মানা হয়, ভালবাসা নামে কিছু নেই। কেবল মানুষেরই আছে ভালবাসা—আজ দুপুরে আদিত্যর মুখে-চোখে আমি এইরকম একটা অন্ধ উন্মত্ত ভাব দেখেছি। অন্ধের মতো ও যাচ্ছে, আর একজন অন্ধ ললিত ওকে পথ দেখাচ্ছে।

বিমান একটু চুপ করে থাকে, তারপর দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, কারখানায় একটা স্ক্রু তৈরি করতেও কত যত্ন লাগে, কত সতর্কতা—অত যত্নে খুব কম মানুষই উৎপাদিত হয়। তাই না?

শাশ্বতী লাজুক হেসে বলল, আপনি খেয়ে নিন।

বিমান কোমল চোখে শাশ্বতীর দিকে চেয়ে একটু হাসে। তারপর দোসার টুকরো ভেঙে মুখে দেয়। ধীর গলায় বলে, আমরা যারা পাগল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও-সখনও এমন কিছু দেখি, যা আর কেউ দেখে না। ঠিক বলছি না?

শাশ্বতী মাথা নাড়ে, ঠিক।

গভীর তৃপ্তিতে হাসল বিমান, নিজের মুখটা শাশ্বতীকে দেখিয়ে বলল, কয়েক দিন আগে আমাকে দু'টো লোক খুব মেরেছিল। বলতে গেলে সেই মার খাওয়াটাই আমার জীবনের প্রথম সাহসের কাজ। আর, দ্বিতীয় সাহসের কাজ আজকেরটা। এই প্রথম আমি একটা কিছু করতে শুরু করেছি। নিজেকে আমার খুব ভাল লাগছে আজকাল। খুব ভাল।

যখন দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা তখন সন্ধে হয়ে গেছে। এসপ্ল্যানেডের আকাশে মরা আলো। শাশ্বতীর পাশে পাশে খুঁড়িয়ে কষ্টে হাঁটে বিমান। কৌতূহলী লোকজন তাদের দেখে।

বিমান হঠাৎ নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, ললিতের সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?

শুনে শাশ্বতী সামান্য কেঁপে ওঠে। তারপর নিচু গলায় বলে, মাত্র এক দিনের আলাপ।

এক দিনের! সামান্য অবাক হয় বিমান। তারপর মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু দেখলাম টেলিফোন

ডিরেক্টরির পাতা ওলটাতে ওর হাত কাঁপছে, দু' আঙুলে সিগারেট ধরে রাখতে পারছে না। খুব অস্থির দেখাচ্ছিল ওকে। আমি ভেবেছিলাম, ও আপনাকে গভীরভাবে চেনে। হয়তো কোনও কারণে আপনার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়।

হঠাৎ থেমে আসে শাশ্বতীর পা। বুক কেঁপে ওঠে। তারপরেই আবার সে স্বাভাবিক হাঁটতে থাকে। কোনও কথা বলে না।

## ॥ আঠারো ॥

বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার দেখিয়ে দেয়, বাথরুম ওই দিকে। ললিত দৌড়ে যায়। বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

বেসিনের ওপর দেয়ালে আয়না। বমি করার পর মুখ তুলে ললিত দেখে তার জলে ভেজা মুখখানা ফ্যাকাশে। মোটাসোটা লক্ষ্মীকান্তর পাশে তাকে এতটুকুন দেখাচ্ছে। কালো বিশাল হাতখানা দিয়ে তার কপাল ধরে রেখেছে লক্ষ্মীকান্ত, যাতে দুর্বল মাথা টলে না পড়ে যায়। ফরসা কপালের ওপর কালো আঙুল।

এখন একজন আধমরা লোককে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ললিত। এ শরীর আর তার নয়। তার যে শরীর ছিল এটা কখনও আলাদাভাবে টের পায়নি ললিত। এখন সে তার হালকা ছিপছিপে শরীরটাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে।

লক্ষ্মীকান্ত মায়া-মমতার চোখে তার দিকে তাকায়। ভেজা হাতে কানের পিঠে আর ঘাড় ভিজিয়ে দেয়, এইবার একটু ভাল লাগছে না দাদা—অ্যাঁ?

ভাল। বেশ ভাল।

লক্ষ্মীকান্তর হাত ছাড়িয়ে একা হাঁটার চেষ্টা করে ললিত। পৃথিবী টলে যায়।

বাথরুমের দরজায় সঞ্জয় দাঁড়িয়ে ছিল। ললিত মুখোমুখি হতেই সঞ্জয় হাত বাড়িয়ে বলল, আয়। এখন কেমন লাগছে?

এক হাত থেকে আর-এক হাতে চলে গেল শরীর। সঞ্জয় বগলের তলায় কাঁধ দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। ললিত হঠাৎ লক্ষ করে যে সঞ্জয়ের চেয়ে সে লম্বা। অন্তত ইঞ্চিখানেক। কিন্তু এখন আর তাতে কিছু আসে যায় না। বরং এক ইঞ্চি লম্বা হয়েও তার লজ্জা করছিল। একজন মানুষের পক্ষে যুবাবয়সে এর চেয়ে বেশি আর কী লজ্জার থাকতে পারে যে, সে আর একজনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে?

সঞ্জয় চাপা গলায় বলে, ব্যাপারটা কীরকম বুঝছিস? মেয়েটা কি কেটেই পড়ল! প্রেস্টিজ-ফ্রেস্টিজ আর...কী ব্যাপার বল তো!

ঘরে ঢুকতেই বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে, আপনার কী হয়েছে বলুন তো! আমি ডাক্তার।

ডাক্তার! ঘরে অথচ ডাক্তারির চিহ্ন নেই। ওষুধের কোনও গন্ধও না। স্টেথস্কোপটাই বা কোথায়! হঠাৎ ললিত দেখতে পেল টেবিলের ওপর জার্নালের স্তূপ। ডাক্তারই হবে।

হয়তো প্র্যাক্টিস বেশি নেই। কিন্তু ললিত কিছুতেই এখন লোকটাকে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। ধুতির ওপর ঝোলানো শার্ট, ফুলহাতার লিঙ্ক বোতাম, বুকপকেটে ঠাসা কাগজপত্র আর ছোট ডায়েরি। তোবড়ানো শুকনো মুখ—যে-মুখ মনে থাকে না। চশমা জোড়াই যেন লোকটার চোখ—আলাদা চোখ নেই।

ললিত দুর্বল হাতখানা বাড়িয়ে ধরে। লোকটা লাজুক মিনমিনে গলায় বলে, আমি অবশ্য চোখের ডাক্তার, কিন্তু জেনারেল রোগ-টোগ বুঝতে পারি।

চোখ বুজে, ঘাড় হেলিয়ে মন দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়ি দেখে জিজ্ঞেস করল, কোনও অসুখবিসুখ আছে? অম্বল-টম্বল?

গ্যাসট্রিক কারসিনোমা।

কী?

ক্যানসার।

একটা শ্বাস ফেলার শব্দ হয়। অতি সম্মানের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার হাতখানা নামিয়ে দেয় লোকটা।

হতাশ লাগে ললিতের।

সাবধানে থাকবেন।

ললিত সোফায় গা ছেড়ে একটু হাসে।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার লক্ষ্মীকান্তর দিকে ফিরে বলে, কী, তোমার পার্টি কই?

দেখে আসি। লক্ষ্মীকান্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

আদিত্য সোফার পিছনে মাথা রেখে দু' হাতে মুখ ঢেকে আছে। কপাল চকচক করছে ঘামে। মাথার চুল একটু আগে পাট করা ছিল, এখন আবার এলোমেলো।

সঞ্জয় সিগারেট ধরায়। পায়ে পায়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

অনেকক্ষণ পর লক্ষ্মীকান্ত ফিরে আসে, নাঃ, ধারে-কাছে নেই।

বুড়ো লোকটা গম্ভীর হয়ে ঘড়ি দেখে, এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

ললিত দেখছিল— সবুজ দেয়ালে রং চটে গেছে। একটা ভেজা নোনা ধরার গন্ধ। মাথার ওপর দুই ব্লেডের একটা পাখা চলছে, পুরনো আমলের পাখা, কিচকিচ শব্দ হয়। জানালা দরজার সবুজ পরদাগুলো ময়লা বিবর্ণ হয়ে গেছে। পুরনো আমলের ডেস্কে, কুমিরের গায়ের মতো খসখসে সোফার ঢাকনায়, চট বেরিয়ে আসা মেঝের লিনোলিয়ামে—সব জায়গাতেই ধুলো জমে আছে বলে মনে হয়। কিংবা ঘরটা অন্ধকার বলে ও-রকম ধুলোটে দেখায়।

এই ঘরে বিয়ে হয়। বর এসেছে বলে ঠেলাঠেলি পড়ে যায় না, শাঁখ না, উলু না, কিংবা নেই রোমাঞ্চকর চোখে-চোখে শুভদৃষ্টি। তবু বিয়ে হয়। হয়ে যায়। এই ধুলোটে জায়গায়। আধো অন্ধকার কৃত্রিম গোধূলিতে। চোরের মতন। 'রেজিস্ট্রিই ভাল'—চিরকাল এই কথা বলে এসেছে ললিত। তবু এখন তার মন সায় দেয় না। একটু আগে শাশ্বতী বসে ছিল এই ঘরে। কেঁদেছিল। হায়, তার কড়ি খেলা হল না, আর একজন কুড়িয়ে দেবে বলে সে মাদুরের ওপর ঘট উপুড় করে ছড়িয়ে দিল না চাল, তাকে সম্প্রদান করল না কেউ, সে নিজে হেঁটে এল। এই ঘরে বড় বেমানান লাগছিল শাশ্বতীকে। যশোরে কপোতাক্ষতীরে ওর দেশ। কলকাতায় জন্মেছিল শাশ্বতী? হবেও বা। তবু বাংলার গভীর হৃদয়ে লুকোনো ছিল ওর মায়াবী গ্রাম—মধুসূদনের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। যশোরের কপোতাক্ষতীরে।

সে কেন আসবে এখানে—রুগি দেখা ঘরে, লজ্জাহীনার মতো সে কেন বলবে, 'আমরা বিয়ে করতে এসেছি! বিয়ে দাও!' বাংলা দেশে কে কবে শুনেছে এই কথা? 'বিয়ে করলাম।' এই কথা বলে রেস্তরাঁয় খেয়ে বিছানায় চলে যায় বর-বউ? কোনজন শুনি না হাসিবে এই কথা? এখানে হয় না বিয়ে—কিছুতেই হয় না। পালাও শাশ্বতী, আমি একদিন সুন্দর বিয়ে দেব তোমার। ওই কি সাজ? হাতে কলেজ-ফেরতা বইখাতা, পরনে সুতির শাড়ি, পায়ে চপ্পল? তুমি কপালে সিঁথিমৌর, হাতে গাছকৌটো নিয়ে সেজে এসো। অনেক দূর থেকে নৌকোয় করে আসবে তোমার বর। কপোতাক্ষ বেয়ে, গভীর বাংলাদেশে মায়াবী এক গ্রাম জুড়ে বেজে উঠবে শাঁখ, উলুধ্বনি। কড়ি খেলার শব্দ হবে।

লক্ষ্মীকান্ত আবার ঘুরে আসে, দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, নাঃ।

দেয়ালের গোল ঘড়িটায় পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট।

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের চশমা ঝিকমিকিয়ে ওঠে, সে কী? সব জায়গায় দেখেছিলে? কাছাকাছি রেস্তরাঁয়? পার্কে?

সব। লক্ষ্মীকান্ত হাঁফায়।

সঞ্জয় আদিত্যের কাঁধে হাত রেখে বলে, জেগে থাক।

আদিত্য মুখের ওপর থেকে মুখঢাকা হাত সরিয়ে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে একটু চেয়ে রইল সঞ্জয়ের দিকে। তারপর চার দিকে তাকিয়ে কাকে খুঁজল। আবার সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

ওর বোকা মুখখানার দিকে চেয়ে লোভ সামলাতে পারল না সঞ্জয়, বলল, ঘুমোচ্ছিলি? ঘুমোস না। ঘুমোলে সে এসে যদি ফিরে যায়? জেগে থাক রে, আশা রাখ।

খানিকক্ষণ সঞ্জয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ ঠাট্টাটা ধরতে পারল আদিত্য। মুহূর্তে লাল—ভীষণ লাল হয়ে যায় আদিত্যর মুখ। চাপা গলায় সে বলল, ওই শালা—ওই ললিতের সব দোষ—আমার প্রেস্টিজ—আমার প্রেস্টিজ—

ললিত অবাক চোখে দেখছিল, আদিত্যর এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে, রোগা ফরসা শরীরে তামার রঙের মতো একটা আভা। তার দিকে চেয়ে কী যেন বলছে আদিত্য! তারপরই লাফিয়ে এগিয়ে এল।

আদিত্যকে এগিয়ে আসতে দেখেও কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছিল না ললিত। সে হয়তো তখন খুব তুচ্ছ কোনও কিছু ভাবছিল। তাই সে নিজের গালে আদিত্যর লম্বা আঙুলের চড় মারার চটাস শব্দটা শুনতেই পেল না। নরম সোফার ওপর তার দুর্বল শরীরটা এক বার দুলে উঠেই গড়িয়ে পড়ল।

সঞ্জয় দৌড়ে এসে আদিত্যকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কী হচ্ছে? আদিত্য ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর আচমকা হাঁটু ভেঙে বুকের কাছে পা তুলে সঞ্জয়ের তলপেটে একটা লাথি মারল সে। সঞ্জয় 'আঃক' শব্দ করে দু' ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

লক্ষ্মীকান্ত আদিত্যর হাত ধরে টেনে বলে, কী করেন দাদা, কী করেন—এঃ হেঃ—

উদভ্রান্তের মতো দাঁড়ায় আদিত্য। খ্যাপা চোখে চার দিকে চায়। হাওয়ায় উড়ছে ওর রুক্ষ চুল। গায়ের ফরসা রং তামার রঙের মতো হয়ে গেছে।

তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যায়। কেউ ওকে আটকায় না।

বুড়ো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের চশমা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে, কী হচ্ছে এ-সব—অ্যাঁ? কী হচ্ছে, লক্ষ্মীকান্ত?

লক্ষ্মীকান্ত ললিতকে ধরে বসায়, খুব লেগেছে, দাদা?

না—ললিত মাথা নাড়ে। উঠে বসে। কষ্টে একটু হাসে ললিত, আমি ঠিক আছি লক্ষ্মীকান্ত।

শরীরে কয়েক বার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে, তারপর আস্তে আস্তে দাঁড়ায় সঞ্জয়। কুঁজো হয়ে পেটটা চেপে ধরে ব্যথা-বেদনার 'ইঃ' শব্দ করে। তারপর সোফায় বসে একটু হাঁফায়।

আশেপাশে অনেক কুঠুরি-অফিস রয়েছে। সে-সব জায়গা থেকে ছুটে এসেছিল কিছু লোক। তারা উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে, জিজ্ঞেস করছে, 'কী হয়েছে দাদা,' 'কী ব্যাপার দাদা।' তাদের ছায়ার মতো দেখতে পায় ললিত। লক্ষ্মীকান্ত তাদের ঘরের বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় দু' হাত ছড়িয়ে বলছে, 'কিছু না, কিছু না, মানুষে মানুষে কত রকমের হয়। আপনারা বাইরে চলুন, হাওয়ার রাস্তা দিন।' এর মধ্যে কোনও মেয়েকে না দেখে হতাশ হয়ে কালো বেঁটে একটা লোক চেঁচিয়ে বলল, 'বিষহরীটি কোথায়—অ্যাঁ? কাকে নিয়ে গড়াচ্ছে এত দূর? নাকি কেবল পুরুষে পুরুষে!'

ললিত চার দিকে দেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। সঞ্জয়ের মুখ লাল, কিন্তু সে ললিতের চোখে চোখে পড়তেই ক্লিষ্ট একটু হাসে। মাথা নেড়ে জানায় যে, সে ঠিক আছে। কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি। খুব সাঙ্ঘাতিক কিছুই না! সব ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ পর তারা সরু কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছিল। সামনে রেলিঙে হাতের ভর রেখে, পেট চেপে কুঁজো হয়ে সঞ্জয়, পিছনে লক্ষ্মীকান্তর কাঁধে শরীরের ভার ছেড়ে ললিত।

সঞ্জয়ের গাড়িতে ললিত সামনের সিটে, সঞ্জয় পাশে বসল। পিছনে লক্ষ্মীকান্ত। সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা ললিতের দিকে বাড়িয়ে দেয় সঞ্জয়। ললিত মাথা নেড়ে বলে, থাক।

স্টিয়ারিঙে হাত রেখে একটু ইতস্তত করল সঞ্জয়। তারপর ললিতের দিকে বিব্রত চোখে তাকিয়ে একটু হাসল। কোনও প্রশ্ন করল না সঞ্জয়, কিন্তু ললিত বুঝতে পারে এবার সে ললিতের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইছে। কেন এ-রকম হল! কী ব্যাপার!

বুক দুরদুর করে ওঠে ললিতের। সঠিক সেও তো জানে না কী ব্যাপার। জিজ্ঞেস করলে সে কী উত্তর দেবে ওদের?

কিন্তু সঞ্জয় ইচ্ছে করেই কিছু জিজ্ঞেস করল না। হয়তো ললিতের অসহায় মুখখানা দেখে তার মায়া হল একটু। হয়তো সে কিছু একটা আন্দাজ করে নিল। প্রশ্ন করল না। মাথার ওপরের ছোট্ট আয়নাটা ঘুরিয়ে সে নিজের মুখটা একটু দেখল। আপনমনে বলল, শালার এখনও মায়া দয়া আছে—বুঝলি!

লাথিটা জোরে মারলে এতক্ষণে আমি হাসপাতালে—কিংবা লাথিটা তলপেটে না হয়ে আর-একটু নীচে লাগলে—মাইরি—

কথাটা শেষ করল না সে। গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ওয়েলেসলি দিয়ে বিকেলের ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে যাচ্ছে সঞ্জয়ের গাড়ি। মন্থর ট্রামের জানালায় উদাসী মানুষদের বিষণ্ণ মুখ। ধুলোময়লা মাখা কলকাতার রাস্তায় হাঁটছে জীর্ণ মানুষেরা—মুখে রাগ, বিরক্তি, হতাশা, থুথু ফেলে চলে যাচ্ছে—সিনেমা হলের সামনে সঙ্গিনীর জন্য অপেক্ষা করছে একটি ছেলে—তার হাঁটুর কাছে মুখ তুলে একটা বাচ্চা ভিখিরির ছেলে—সে লক্ষ করছে না— ট্রাফিকের পুলিশ হাত বাড়িয়ে কার অদৃশ্য চুলের মুঠি ধরল—হঠাৎ থেমে দুলতে থাকে গাড়ি—

সঞ্জয় তার দিকে তাকিয়ে বলে, শরীর কেমন?

ললিত মাথা নাড়ে, ভাল। বেশ ভাল।

শালা বেজন্মা মেরে গেল। ধরতে পারলে শালাকে...

ললিত চুপ করে থাকে। দুরদুর করে বুক— পাখির মতো।

কিন্তু সঞ্জয় কথা ঘুরিয়ে নিল। চাপা গলায় বলল, অনেক দিন মারধর খাইনি—বুঝলি—পেটে চর্বি জমে গেছে, লাথিটা লাগতেই দম আটকে গেল। মনে হল, মরে যাচ্ছি। আসলে বয়স—বুঝলি! এই বয়সে চোট-ফোট লাগলে ভড়কে যাই...

সরে যাচ্ছে ট্রাফিক-পুলিশের হাত। গিয়ার বদলের শব্দ হয়। সঞ্জয় হাসে, বলে, লাথিটা লেগে দম আটকে যেতেই মনটা হায় হায় করে উঠল। কত কিছু বাকি রয়ে গেল জীবনে—কত রকমভাবে বাঁচা যেত! তখন আমি তাড়াতাড়ি ভেবে দেখছিলাম কোন কাজটা সবচেয়ে জরুরি যেটা আমি বাকি রেখে যাচ্ছি! হঠাৎ মাইরি আমার ভেতর থেকে একটা চ্যাচানি বেরিয়ে আসছিল— চার হাজার টাকা— চার হাজার টাকার চেকটা কোথায় গেল!

ললিত অবাক হয়ে বলে, কীসের চার হাজার টাকা?

সঞ্জয় চাপা গলায় বলে, তখন কি আমিই জানি কীসের চার হাজার টাকা! কিন্তু মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে আমি কেবল ওই চার হাজার টাকার কথা ভাবছি। তখন আমার পিকলুর মুখ মনে পড়েনি—রিনির কথাও না—কেবল ওই চার হাজার টাকার কথা। অথচ বুঝতে পারছি না কীসের টাকা। তারপর আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল। ...কী হয়েছিল জানিস?

হঠাৎ গলা খুব নিচু করে সঞ্জয়, প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার যে ছোট্ট কোম্পানিটা আছে তার একটা বকেয়া পেমেন্টের জন্য পরশুদিন দাদার হাতে একটা চার হাজারি বেয়ারার চেক দিয়েছিলাম। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের চেক—দাদার আর আমার সই থাকে। আজ বেলা এগারোটা নাগাদ ফোন করে দাদা জানাল যে, পরশুদিন চেকটা দাদার পকেটমার হয়ে গেছে। বুকপকেটে রেখেছিল টের পায়নি। আজ ব্যাঙ্ক খোলার ঘণ্টাখানেক পরে টের পেয়ে ছুটে গিয়েছিল ব্যাঙ্কে, কিন্তু চেকটা ক্যাশ হয়ে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই। শুনে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে ফোন করলাম। এজেন্ট আমার চেনা লোক, তক্ষুনি ক্যাশ থেকে লোক ডেকে পাঠাল। আমি তাকে চেক-এর নম্বর দিয়ে বললাম যে, যে-লোকটা আজ চেকটা ক্যাশ করেছে তার চেহারাটা মনে আছে কি না। লোকটা স্পষ্ট কিছু বলতে পারল না, কিন্তু আবছাভাবে যা বলল তাতে চেহারাটা একজনের সঙ্গে মিলে যায়। যদি সেই লোকটাই চেক ক্যাশ করে থাকে তবে এটা নিশ্চিত যে, চেকটা দাদার পকেটমার হয়নি—বুঝলি! তা ছাড়া দাদা আবার সব জিনিসই তার মানিব্যাগে রাখে—এমনকী দেশলাইটা পর্যন্ত—তবে চেকটা বুকপকেটে রাখতে গেল কেন? তাই সারা দিন আমি মনে মনে চেকটা ট্রেস করার চেষ্টা করছিলাম—কোথা থেকে কীভাবে কার মারফত গিয়েছিল চেকটা—কীভাবে ধরা যাবে ব্যাপারটা। আর, যখন হঠাৎ আদিত্যর লাথি খেয়ে মরে যাচ্ছি তখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ ওই চেকটার জন্য কেঁদে উঠল। কিন্তু বিশ্বাস কর, টাকাটার জন্য নয়—আমার মাসের রোজগার ওর চেয়েও বেশি। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে চার চারটে হাজার টাকা আমার ঠকা রয়ে গেল—জিত হল না। আমার হাতের নাগালের বাইরে রয়ে গেল একটা অঙ্ক—যার উত্তরটা আমি মনে মনে মিলিয়ে ফেলেছি—অথচ পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল—খাতা টেনে নিচ্ছে গার্ড। চেঁচিয়ে বলছি—আর-একটু সময় দাও—আর-একটু—এই চার হাজার টাকার চেকটা ট্রেস

করেই আমি চলে যাব—আর কিছু না—। মাইরি, এখন হাসি পাচ্ছে—শালা, অন্তিম মুহূর্ত এসে গেল—পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি—অথচ কোনও ভালবাসার মানুষের কথা মনে পড়ল না? ওই চেকটার মধ্যে এমন কী রস ছিল যে, পিকলুর কথা—রিনির কথা মনে পড়ল না?

পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি ঘুরিয়ে থামিয়ে ফেলেছিল সঞ্জয়, বলল, নামবি? একটু সেলিব্রেট করে যাই চল।

কীসের সেলিব্রেট?

আদিত্যর লাথিটার।

ললিত ম্লান হেসে মাথা নাড়ে, না। আমার ও-সব বারণ।

ঠিক তো! ভুলে গিয়েছিলাম। বলে জিভে আফশোসের চুক চুক শব্দ করে সঞ্জয়। গাড়ি ছেড়ে বলে, তা হলে চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ একটু লোড করতেই হবে। বডি পড়ে যাচ্ছে মাইরি!

বাসায় এসে ললিত শুনল তুলসী এসে ফিরে গেছে।

ওকে ধরে রাখলে না কেন মা?

অনেকক্ষণ বসে ছিল তো। সিনেমার টিকিট কাটা ছিল বলে চলে গেল। খুব খুশি ছিল আজ, বলল কোথাকার ফুটবল খেলায় ও গোল দিয়েছে।

গোল! কীসের গোল?

কী জানি।

তলপেটটা ফুলে ঢিবি হয়ে আছে। ভারী। যেন ন' মাসের বাচ্চা রয়েছে পেটে। দাঁতে দাঁতে টিপে হাসল সঞ্জয়।

লক্ষ্মীকান্তকে ছেড়ে দিল রাসবিহারীর মোড়ে।

গাড়ির স্টিয়ারিং ধরা এক হাতে, অন্য হাতে আবার ছোট আয়নাটা ঘুরিয়ে মুখ দেখে সঞ্জয়, বলে, কী মিস্টার সেন, খুব এক পেট হয়ে গেল তো? বুড়ো বয়সের চোট হে, সারতে সময় লাগবে। চাই কি প্রোস্টেস্ট গ্ল্যান্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে। সুখে নেই হে তুমি, যতই গাড়ি বাড়ি বউ ছেলে আগলাও, কোথা থেকে যে সংসারের লাথিটা আসবে, টেরই পাবে না।

দাঁত চেপে হাসে সঞ্জয়। গাড়ি চালায়। পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

সামান্য মাতাল হয়ে ফেরার পথে একজায়গায় গড়িয়াহাটার কাছে অন্ধকারে গাড়ি দাঁড় করায় সঞ্জয়। সিগারেট ধরায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার ভালবাসার লোকজন বোধ হয় খুব কমই আছে পৃথিবীতে। যখন সে ভাবছিল এই তার শেষ মুহূর্ত—মরে যাচ্ছে সে—তখন তার রিনি কিংবা পিকলুর কথা মনে পড়তে পারত—কিংবা অনীতা—তার অন্ধ বোনটার কথা—হাতড়ে হাতড়ে কাছে এসে চুপ ক'রে পাশ ঘেঁষে বসে থাকে—কিংবা মা—কিংবা যে-কেউ—কিন্তু মনে পড়েনি। কেবল একটা চার হাজারি চেকের কথা মনে পড়েছিল। আশ্চর্য! তবে পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী? অ্যাঁ? কী? সেটা কি টাকা? একটু শিউরে উঠে মৃদু হাসে সঞ্জয়। ঠিক আছে। তবে তাই হোক। আমেন।

রোজই ভুল হয়ে যায়। এখনও কেনা হয়নি রিনির রোজি ড্রিম আর পিকলুর বিলিতি ফিডার। আজ কিনে নিল সঞ্জয় গড়িয়াহাটার প্রকাণ্ড দোকান থেকে।

বাসায় ফিরে দেখল বাইরের ঘরে গম্ভীর মুখে দাদা অজয় বসে আছে। সামনের টেবিলে খালি চায়ের কাপ, আর কাগজ-চাপার তলায় একটা নতুন চেক।

কী ব্যাপার!

অপরাধী মুখে দাদা বলে, এটা সই করে দে। পেমেন্টটা আটকে আছে।

এই লোকটা—অজয়—তার দাদা এক সময়ে ব্যাঙ্কের পিয়ন ছিল, খাকি পোশাক পরা লোকটা সাহেবদের সেলাম দিয়েছে অনেক। অনেক দিন আগে এ-লোকটাই তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল প্রায় অকারণে। সেই থেকে দরিদ্র সঞ্জয় আলাদা হয়ে গেল, এখনও আলাদা রয়েছে তাদের পরিবার। এখন লোকটার চোখে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের চকচকে চশমা, গায়ে নীল টেরিলিন, গাল কামানো, মাথায় অভিজাত গোলাপি রঙের টাক। তবু ব্যাঙ্কের পিয়ন ছিল—আর তাকে এক বার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল বলে অজয়কে খাতির করে না সঞ্জয়, তার সামনেই সিগারেট খায়, মদের গন্ধ লুকোতে চেষ্টা করে না।

সঞ্জয় উত্তর দিল না। ধীরেসুস্থে জামা প্যান্ট ছেড়ে বাথরুম ঘুরে ডাইনিং টেবিলে এসে চায়ের সামনে বসল। অনেকটা সময় নিল সে।

তারপর বাইরের ঘরে এসে দেখল অজয় স্থিরভাবে বসে আছে। তাকে দেখে একটু নড়ল।

নিঃশব্দে চেকটা সই করে দিল সঞ্জয়।

এক বার ইচ্ছে হল বলে যে, যে-লোকটা চেক ভাঙিয়েছিল তাকে চিনতে পেরেছে ব্যাঙ্কের ক্যাশ-ক্লার্ক। শুনে অজয় চমকে উঠে সাদা মুখে তাকাবে। কিংবা সঞ্জয় ইচ্ছে করলে বলতে পারে, উত্তরপাড়ায় বউদির নামে জমি কিনেছ—আমি কি জানি না?

জানে। সঞ্জয় সব জানে। অজয় বড় বোকার মতো ঠকিয়েছে তাকে। এত বোকার মতো যে হাসি পায়। ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না। অজয়কে নিরাপদে চলে যেতে দেয় সে।

তলপেট ভারী হয়ে আছে। কত দূর গড়াবে কে জানে। একদিন আমি সব ছেড়েছুড়ে দেব। বুঝলে রিনি। সব ছেড়েছুড়ে—তারপর সাধু হয়ে যাব রমেনের মতো। না, রমেনের মতো নয়। রমেন সবকিছুর মাঝখান থেকে হঠাৎ খেলা ভেঙে উঠে গিয়েছিল। আমি তত দূর পারব না। আগে কোম্পানিটা ট্রান্সফার করব অনীতার নামে—আহা, অন্ধ বোনটি—টাকা ছাড়া কে আর ওকে পথ দেখাবে? তোমার আর পিকলুর জন্য ব্যাঙ্কে রাখব কয়েক লাখ টাকা—তারপর—হ্যাঁ, তারপর সাধু হয়ে যাওয়া যায়। তারপর সাধু হওয়া শক্ত নয়।

## ॥ উনিশ ॥

সঞ্জয় যেদিন জোর করে মদ খাইয়ে দিয়েছিল তাকে, আর সে মাতাল হয়ে রাতে বাসায় ফিরেছিল, তার পরদিন সকালবেলায় ভিতরের বারান্দার এক কোণে দাড়ি কাটার সরঞ্জাম নিয়ে বসে ছিল তুলসী। রান্নার জায়গায় মৃদুলা কৌটো-টৌটো খুলে কী খুঁজছে। তুলসী সন্তর্পণে আয়নাটা একটু ঘুরিয়ে তার ভিতর দিয়ে মৃদুলার দিকে চেয়ে থাকে। কালোজিরে কিংবা সর্ষে খুঁজতে খুঁজতে মৃদুলা এক বার হঠাৎ মুখ তুলে তাকায়। আয়নার ভিতর দিয়ে চোখাচোখি হতে মৃদুলা টপ করে চোখ নামিয়ে যেন পাতকুয়ার মধ্যে ঝুঁকে পড়ল।

সকাল থেকেই কেউ কথা বলছে না তার সঙ্গে, মৃদুলাও না। বাড়িটা থমথম করছে। অথচ বারান্দায় রান্নার জায়গায় বউদি, ঘর জুড়ে দাদা আর খবরের কাগজ—সব যথারীতি, রোজকার মতোই।

পাশ দিয়েই বউদি বাথরুমে যাচ্ছে, তুলসী তাড়াতাড়ি আয়নার ওপর ঝুঁকে পড়ে।

বারান্দায় যখন বউদি নেই ঠিক সেই সময়েই মৃদুলা চা দিতে এল। তুলসী মৃদুলার একটা হাত খপ করে চেপে ধরে বলে, কাল রাতে কী হয়েছিল বলো।

ছাড়ো। জানি না।

পায়ে পড়ি, বলো।

ছিঃ, তুমি গুরুজন না!

আমি পাষণ্ড, ওই সঞ্জয় হারামজাদার দোষ। কী করেছি বলো।

অনেক কিছু—মাতালরা যা যা করে। আমাকে শিসও দিয়েছ।

মাইরি?

আজ সকালে দাদা বলেছে তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া উচিত, নইলে ছেলেমেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

আমি চলে যাব।

কোথায়?

কোথাও। বাসা খুঁজছি।

একটু চুপ করে থাকে তুলসী। তারপর বলে, এক দিন একটু খেলে কী হয়! সঞ্জয়রা তো রোজ খায়।

তুমি কি সঞ্জয়?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না মৃদুলা, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

তুলসী দেখে আয়না থেকে বুড়োটে মুখটা চোর-চোখে চেয়ে আছে। হিসেব করলে এই শেষ ভাদ্রে তার মধ্যযৌবন। বয়স তেত্রিশ। কিন্তু বাস্তবিক মধ্যযৌবন বলে কিছু টের পায় না তুলসী। নিজের এই মুখখানা সে গতকাল, পরশু কিংবা দশ-পনেরো বছর আগে যে-রকম দেখেছিল, অবিকল সে-রকম দেখছে। আরও দশ বছর পরেও বোধ হয় একই রকম দেখাবে। এই হচ্ছে তুলসী—তুলসীচন্দন—কেবলমাত্র তুলসী হয়ে ওঠা ছাড়া এর আর কোনও গতি নেই। না, সে সঞ্জয় নয়। তবু 'তুমি কি সঞ্জয়?' এ-প্রশ্নটা সারা দিন তার বুকে লেগে রইল।

আবার ঘুরে-ফিরে সুযোগ বুঝে কাছে এল মৃদুলা, ফিসফিস করে বলল, তুমি বরং পলাশপুরেই বাসা নাও।

দূর, ওখানে যা সাপ! কালকেই ক'জনকে কামড়েছে।

লোকে তো আছে!

দূর। সব হিংসুক—বোকা। আর কয়েক দিন দেখো না, কলকাতাতেই একটা কিছু—

মৃদুলা চলে যাচ্ছিল। তুলসী তার হাত টেনে বলে, কাল কোথায় গিয়েছিলাম জানো? গ্র্যান্ড!

হাসে তুলসী, আবার বলে, গ্র্যান্ড!

আবার উত্তেজনাহীনভাবে দিন কেটে যায়। কিছুই ঘটে না।

স্কুলে এসে এক দিন তুলসী শুনল আজ খেলা আছে। জবর খেলা। টিচার্স ভারসাস স্টুডেন্টস। টিফিনের মধ্যেই টিম তৈরি হয়ে গেল। শিক্ষকদের ক্যাপ্টেন হরি চক্রবর্তী—এক সময়ে কলকাতায় সেকেন্ড ডিভিশনে কয়েকদিন খেলেছেন—বললেন, 'তুলসী, তুমি রোগা-টোগা আছ, ছুটতে পারবে—তুমি রাইট আউট।' গতবারও রাইট আউট ছিল তুলসী, হাফটাইমের পর লাইনের ধারে নেতিয়ে বসে হাঁফিয়ে যাচ্ছিল। তবু ঠিক আছে। পাঞ্জাবিটা খুলে ধুতিতে মালকোঁচা মেরে গেঞ্জি গায়ে রাইট আউটেই দাঁড়িয়ে গেল সে।

ইচ্ছে করেই ছেলেরা আজ বুট পরে নামেনি। তবু তাদের খালি পাগুলোই লোহার মতো শক্ত। লাল-হলুদ জারসি তাদের গায়ে। যেখানেই যাচ্ছে বল সেখানেই লাল-হলুদের পা। ওদের গোলকিপার হাফিজ—ইলেভেন সায়েন্সের। তার গায়ে হলুদ গেঞ্জি, হাতে বল-ধরা দস্তানা, কপালে নামানো টুপির ঢাকনি—এ-তল্লাটের নাম-করা গোলকিপার। জলে শোল মাছ যেমন নড়ে-চড়ে তেমনি শূন্যে বাতাসের মধ্যে চলে যায় হাফিজ, পিংপং বলের মতো মাটিতে পড়ে লাফায়। হরি চক্রবর্তীর দু'টো শট তুলে নিল মা যেমন শোয়ানো শিশুকে তুলে নেয়।

হাফটাইম পর্যন্ত গোল-লেস।

এতক্ষণ মাঠে কোথাও ছিল না তুলসী। লাইন ধরে সে মাঝে মাঝে এগিয়ে গেছে, পিছিয়ে এসেছে আবার। তার দিকে বাড়ানো পাসগুলি তার কাছে পৌঁছয়নি, চলে গেছে লাল-হলুদের পায়ে। ওরাই তো সারা বছর খেলে, তাই বলটা ওদের পোষ-মানা, পোষা কুকুরের মতো লজ্জাহীন পায়ে পায়ে ছুটছে। সারা মাঠময় লাল-হলুদ, লাল-হলুদ ঝলকে যাচ্ছে দুপুরের রোদে। ডাঁটো শরীরের ঘাম ঠিকরে দিচ্ছে দুপুরের আলো। হরি চক্রবর্তী চেঁচিয়ে বলে, 'লাইনের বড় ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছো তুলসী, ঢুকে এসো—পাস পায়ে যাবে না—ঢুকে এসে বল তৈরি করে নাও।' তুলসী দেখে কখনও সবুজ ঘাসে, কখনও নীল আকাশের গায়ে সাদা বলখানা। খুব দূরে দুষ্প্রাপ্য বস্তুর মতো মনে হয়। তুলসী চেষ্টা করে না।

হাফটাইমে ভরপেট কোকোকোলা। তার শরীর হিস হিস করে। আরও ঝিমিয়ে পড়ে তুলসী। শরীরটা জুতের নেই। সেদিনের হুইস্কির ঝোঁক এখনও যেন একটা ঝিমুনির মতো রয়ে গেছে। গতকাল কত দূর মাতলামি করেছিল সে? সে কি শিস দিয়েছিল? আশ্চর্য! মৃদুলাকে শিস দেওয়ার কী আছে! শিস দিত সঞ্জয়—যেখানে মেয়েছেলে দেখত—সেখানেই দু'টো আঙুল গোল করে মুখে পুরে দিত—চুঁ-হিঁ-হিঁ করে বেজে উঠত আশ্চর্য শিস। তুলসী শিখেছিল, কিন্তু কোনও দিন দেয়নি। কারণ সে তো

সঞ্জয় নয়! ...তার পা ছুঁয়ে চলে গেল বলটা—ধীরে ধীরে লাইনের ও-পারে। থ্রো-ইন। 'কী খেলছে! সোজা বল—ধরতে পারলে না!' তুলসী লজ্জা পায়। লোকটা বড় সিরিয়াস। ছাত্রদের সঙ্গে খেলা, তবু জান লড়িয়ে দাও। কে না জানে একটা না একটা সময়ে ওরা ঠিক গোল ছেড়ে দেবে! শিক্ষকরা জিতলে কাল ছুটি। ওরা জানে।

ওপর থেকে নেমে আসছে সাদা বলটা। তাকে লক্ষ্য করে। সুন্দর দেখায় বলটাকে। তুলসী অলসভাবে দেখে। বলটার পিছনে নীল আকাশ, নৌকোর পালের মতো মেঘ।

সে কেন ধরবে ওই বলটা? কী স্বার্থ তার? সে তো সঞ্জয় নয়—যে অধ্যবসায়ী সঞ্জয় বউয়ের জন্য গোলাপি স্বপ্ন কিনে নিয়ে যায়—ছেলের জন্য কেনে বিলিতি ফিডার—বিকেলের অবসরে গ্র্যান্ডে গিয়ে বসে থাকে! কিংবা সে নয় ললিত—যে ললিত হাসপাতালের বিছানায় শোয়া—সাদা রোগা মুখখানায় নীল শিরা জেগে আছে—হাতের নলীতে ঢোকানো গ্লুকোজের ছুঁচ—জানে মরে যাবে, তবু ঠাট্টা করছে—তোর মুখটা গম্ভীর কেন রে তুলসী? তোর ভাবী বউটা কি কুচ্ছিত? মরবে তবু কেমন শান্ত! কিংবা সে নয় রমেন—যে রমেন গাড়ি চালাত—পিয়ানো বাজিয়ে গাইত পূর্ব বাংলার মাঝিদের গান—কিংবা রিলে রেসের শেষ ল্যাপ-এ ব্যাটনের জন্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কী সুন্দর সেইসব ভঙ্গি রমেনের! সে তুলসীই—আর কেউ নয়। সে একদিন হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে ভরসন্ধেবেলা তার কাঁদুনে ছেলেকে 'ও-ও' করে ঘুম পাড়াবে—বাজারে গিয়ে পাশের লোকজনকে লক্ষ করে বলবে, এই বাজারে বাঁচা যায় না—বুঝলেন—বাঁচা যায় না। তারপর একদিন পৃথিবীর বিশাল ভার তাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। তবে সে কেন ধরবে ওই বলটা? কী স্বার্থ তার? আশ্চর্য অভিমানে তুলসী চেয়ে থাকে।

ঝলকে ওঠে লাল-হলুদ। সুঠাম চেহারার রঞ্জিত হাঁটুতে বলটা আটকে নেয়। তুলসী দেখে। এম-কম জগত্তারণ বলটা প্রাণপণে বুক দিয়ে আটকায়।

আশ্চর্য এই, বলটা তার কাছেই গড়িয়ে আসে। ধীরে ধীরে, বিনীতভাবে। অপরাধী ছাত্রের মতো এসে সামনে দাঁড়ায়। মাথা নিচু করে।

কী সংবাদ ভগ্নদূত?

তুলসী ছোটে। খুব জোরে নয়। তার পায়ে বল। লাইনের বাইরে থেকে ছেলেরা চেঁচায় স্যার, ম্যান বিহাইন্ড. ম্যান বিহাইন্ড—

এইভাবেই ছুটত রমেন, ইন-আউট ইন-আউট করতে করতে। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে চলে যেত, তারপর হঠাৎ ঘুরে গুপ করে সেন্টার করত বল। কিংবা চিতাবাঘের মতো ডজ করতে করতে ঢুকে আসত।

সামনেই উড়ছে ছোট্ট লাল নিশান— কর্নার ফ্ল্যাগ। অনেক দূর চলে এসেছে তুলসী। এখনও তার পায়ে বল। কী করবে তা সে বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় রমেন হলে কী করত? কালো বেঁটে বোটবেগুনের মতো চেহারা গোপীকান্ত ছুটে আসছে—তার গায়ে আগুনের মতো জ্বলছে লাল-হলুদ জারসি। ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো বাঁকা পা দু'খানা—এত বাঁকা যে, পা জোড়া করে রাখলেও বোধ হয় মাঝখান দিয়ে বল গলে যায়।

সেই চেষ্টাই করল তুলসী। গোপীকান্তর দু' পায়ের ভিতর দিয়ে বলটা গলিয়ে দেবার। হল না। বল ধরে উড়িয়ে দিল গোপীকান্ত। হঠাৎ নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে।

কিন্তু এ কেমন যে, সে চিরকাল সেই তুলসী? আজন্ম? আমৃত্যু?

গোল দেওয়ার জন্য সেন্টার লাইনের ও-পাশে চলে গেছে সব লাল-হলুদ খেলোয়াড়—বুড়ো মাস্টারদের নাচিয়ে পায়ে পায়ে টোকা দিচ্ছে বল। গোলের সামনে গিয়েও ফিরে আসছে। এ-পাশে ফাঁকা সবুজ মাঠ, সামনে কেবল পায়চারি করছে একজন ব্যাক। এ-তল্লাটের সেরা গোলকিপার হাফিজ পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বংশীবাদক কৃষ্ণের মতো পা দু'খানা ক্রস করা, দাঁতে ঘাসের ডাঁটি চিবোয়!

হঠাৎ শূন্যপথে উড়ে আসে বল। ফাঁকা মাঠে।

ঝামেলা! তুলসী অলসভাবে এগোয়। লাল-হলুদ ব্যাক ক্লাস এইট-এর পীযূষ এগিয়ে আসে। হাফিজ ভঙ্গি বদলায়।

ফাঁকা মাঠ। উঠে আসে বল। আশ্চর্য, কাছে এসে প্রণামের মতো মাথা নিচু করে দেয় বলটা। বশংবদের মতো পায়ে পড়ে থেমে যায়। সামনে একা পীযূষ। তার লোহার ডাণ্ডের মতো পা। তুলসী ঘুরে তাকে কাটানোর অক্ষম চেষ্টা করে। পায়ে পা লেগে খটাং শব্দ হয়। তুলসী পড়ে গিয়ে ফের ওঠে। পীযূষ তখনও মাটিতে—উঠছে। বলটা তার পায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে তুলসীর কাছে চলে আসছে—শিশু যেমন অচেনা লোকের কোল ছেড়ে বাপের কাছে ছুটে আসে।

তুলসী পায়ে বল টেনে নেয়। ছোটে।

লাইনের বাইরে থেকে ছেলেরা চেঁচায়, ফাস্ট টাইম স্যার, ফাস্ট টাইম—!

তুলসী দৌড়য়। আদি অন্তহীন ফাঁকা মাঠ। কেউ নেই। কিন্তু বুকে খিঁচ ধরে ওঠে একটা ব্যথায়! তুলসী হাঁফিয়ে পড়ে। মার-মার করে ছুটে আসছে পায়ের শব্দ—হাতি-ছোটার শব্দের মতো। ম্যান বিহাইন্ড!...সে কেন নয় রমেনের মতো কুশলী? সে নয় অধ্যবসায়ী সঞ্জয়, কিংবা আত্মবিশ্বাসী ললিত। সে তুলসী—কেন সে কেবল তুলসী?

ডান ধার থেকে তুলসী ঢুকতে থাকে। এক দুই করে লাল-হলুদ জার্সি এগিয়ে আসে। তুলসী বল নিয়ে ঘুরে যায়, মানুষের অলিগলি দিয়ে ছুটতে থাকে। বুকে খিঁচ-ধরা ব্যথা—সে হাঁফায়। বল তার পায়ে বশংবদ লেগে আছে—গড়িয়ে যাচ্ছে।

ফার্স্ট টাইম স্যার—গোলে মারুন!

কিন্তু কোন দিকে গোল-পোস্ট? তুলসী উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকায়। কোন দিকে গোলপোস্ট?...ওই তো তিন বাঁশের গোলপোস্ট—বার বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। ডান দিকে। একা হাফিজ।

বাঁ পা থেকে ডান পায়ে বল টেনে নেয় তুলসী। হঠাৎ ডান দিকে বেঁকে ছুটে যায়। সে কেন তুলসী? সে কেন চিরকাল সেই তুলসী?

লাল-হলুদ একজন সামনে এসে ভুঁইফোঁড় দাঁড়িয়ে যায়। পা থেকে খসে যায় বল। লাল-হলুদের পায়ে চলে যায়। ছেলেটা মৃদু হাসে, মন্থর পায়ে এগোয়।...এ-অবস্থায় রমেন হলে কী করত? তুলসী ভেবে পায় না। সে দেখতে পায় ছেলেটার পা থেকে বল গড়িয়ে একটু এগিয়ে গেছে। ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে। খুব নিশ্চিন্ত ভাবভঙ্গি। হঠাৎ রেগে যায় তুলসী। খুব রেগে যায়। সে কাছেই রয়েছে—তবু ছেলেটা কেন অত নিশ্চিন্ত? কেন সাবধান হচ্ছে না? অবহেলা!

হঠাৎ হালকা পায়ে ছুটে আসে তুলসী। ছেলেটার পা থেকে তিন-চার হাত দূরে বল গড়িয়ে যাচ্ছে। তুলসী টুক করে বলটা সরিয়ে নেয়। ছেলেটা বোকার মতো চেয়ে থাকে। তাকে সময় দেয় না তুলসী, দিশেহারার মতো বাঁ দিকে ঘুরে এগোয়।

সামনেই গোল-পোস্ট। হাফিজ দাঁড়িয়ে—-হলুদ গেঞ্জি, চামড়ার দস্তানায় ঢাকা দু'খানা হাত— তৈরি—তার মুখে টুপির ছায়া— অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ক্রূর চোখ। ফণা তুলে অল্প অল্প দোলে হাফিজ।

হাঁটু ভেঙে আসে। হাফিজের মুখোমুখি—হঠাৎ মনে হয়, সে পারবে না। অসম্ভব।

বলে পা লাগার ঢুম শব্দ হয়। সে মেরেছে কি? হ্যাঁ, মেরেছে।

হাফিজ শূন্যে ভেসে যায়।

হঠাৎ বাতাস ছুটে এসে গায় লাগে।

গো-ও-ও-ল! গো-ও-ও-ও-ল! গো-ও-ও-ও—

মাঠের বাইরে ছেলেরা নাচছে। মাঠের ভিতরে ছুটে আসে ছেলের পাল।

হরি চক্রবর্তী জড়িয়ে ধরে, জগত্তারণ কাঁধে তুলে নেয়।

তুলসীর কাছা খুলে ঝুলতে থাকে।

কাল ছুটি!

বিকেলে দু'খানা সিনেমার টিকিট কাটে তুলসী। তারপর প্রথমেই গেল ললিতের বাসায়। গিয়ে শুনল, আদিত্য আর বিমানকে নিয়ে দুপুরে বেরিয়েছে ললিত। কী একটা ব্যাপার আছে ওদের। বলে গেছে বিকেলে নাকি ওরা মুরগি এনে ফিস্টি করবে। তুলসী তাই ললিতের মা'র সঙ্গে বসে একটু গল্প করল। তারপর এক কাপ চা খেয়ে উঠে পড়ে। বাসায় এসেই মৃদুলাকে তাড়া দেয়, তাড়াতাড়ি শাড়ি-টাড়ি পরে নাও। বুকপকেট থেকে সিনেমার টিকিট দু'খানা উঁচু করে দেখায়।

ও মা! মৃদুলা বলে। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, মাত্র আমরা দু'জন? বাসার লোকে কী মনে করবে!

করুক গে। তুমি তাড়াতাড়ি করো। সময় নেই।

তুলসীকে খুব উত্তেজিত দেখায়। মাঝে মাঝে সে আপনমনে হাসছে।

সিনেমা হলের উলটো দিকে সুরুচি কেবিন। তুলসী বলল, চলো।

মৃদুলা ইতস্তত করে, দেরি হয়ে যাবে।

দূর। নিউজ রিল আগে শেষ হোক।

কবিরাজি কাটলেট কেটে গরম টুকরোটা মুখে দিয়ে তুলসী চোখ নামায়, কেমন?

মাংস ডিম আর ঘিয়ের স্বাদে মুখ ভরে যায়, মৃদুলা লজ্জায় হাসে, রোজ খেতে ইচ্ছে করে। বাসার রান্নায় এখন রুচি হয় না। ভাতের গন্ধে বমি হয়ে যায়।

রোজ খাওয়াব।

দূর। রোজ কি আসা হবে বাইরে?

কেন! বাসায় নিয়ে যাব!

মৃদুলা চোখ গোল করে, বাসায় এত লোক—সকলের সামনে?

তা কেন? লুকিয়ে নিয়ে যাব, রাতে শোয়ার সময়ে দরজা বন্ধ করে মশারির মধ্যে বসে খাবে!

মৃদুলা হাসে, তা কি হয়?

কেন হবে না? আপৎধর্মে সব হয়। সবাইকে অত খাতির করলে চলে না। দেশের বাড়িতে মাকে দেখেছি মশারির মধ্যে বাবা এনে খাওয়াত। তখন ছোট ভাইটা পেটে—যে বাঁচল না। তুমিও খাবে।

মৃদুলার মুখ ঝলমল করে। উত্তেজনায় খাবারের স্বাদ পায় না তুলসী। চোখের সামনে অবিকল দেখতে পায় হাফিজকে—শূন্যে অসহায় হাত বাড়িয়ে ভাসছে—খেলার শেষে হেডমাস্টার বলছে—খুব অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল থেকে মেরেছিলে হে—রিয়েলি—ভেরি গুড—। গোলটার কথা ভাবতে ভাবতে আপনমনে শূন্যে তুলসীর পা উঠে যায়। নিজেকে সামলায় তুলসী। মৃদুলা দেখলে হাসবে।

ইন্টারভ্যালে প্যাকেটে পোট্যাটো চিপস ফেরি করছিল সাদা ইউনিফর্ম পরা ট্রে-হাতে একটা লোক। তুলসী হাত বাড়িয়ে বলল, দু'টো দেখি।

মৃদুলা মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, একটা নাও।

দূর।

একটু পরে দাম নিতে ঘুরে এল লোকটা। দেড় টাকা। শুনে চমকে উঠল তুলসী। মৃদুলা চোখ গোল করে ফিসফিস করে বলল, ও মা! এইটুকু আলুভাজা—কী গলা-কাটা দাম গো!

তুলসী মৃদু হাসে, ঠিক আছে।

একদিন সে সঞ্জয়ের সঙ্গে গ্র্যান্ডে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি থেকে সামলে নিল ব্যাপারটা। রোজ তো আর নয়। বরং আর কোনও দিন আগে থেকে দাম না জেনে সে পোট্যাটো চিপস কিনবে না।

বেরিয়ে আসার সময় তুলসী দেখে মৃদুলার চোখ লাল। সে জিজ্ঞেস করল, কেঁদেছিলে?

মৃদুলা ম্লান হেসে বলে, ইস, কী কষ্টের ছবিটা!

তুলসীর হঠাৎ বড় মায়া হয় মৃদুলার জন্য।

লবিতে প্রচণ্ড ভিড়, নাইট শোয়ের লোকেরা ঢোকার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠে তুলসীর হাতখানা চেপে ধরল মৃদুলা। বলল, দেখো দেখো, ওই লোকটা—ওই নীল জামা পরা—আমার উরুতে চিমটি কেটে পালাচ্ছে। ওকে ধরো—ওই যে—

কই? কোথায়? দিশেহারার মতো বলে তুলসী।

মৃদুলা তাড়া দিয়ে বলে, ওই যে—ও পালিয়ে যাচ্ছে—ছুটে ওকে ধরো—

তুলসী দেখতে পেল লোকটাকে। নীল হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট পরা, লম্বা কালো কালো বিশ্রী চেহারা। কিন্তু দেখেও দেখল না তুলসী। ওকে ধরে কী করবে সে? কী করতে পারে? ওই মস্ত লম্বা লোকটাকে কীভাবে বা ধরবে তুলসী? খুবই অসহায় বোধ করে সে। তবু অনিচ্ছার সঙ্গে এগিয়ে একটু এদিক-ওদিক দেখে ফিরে এসে তুলসী বলে, নাঃ, পালিয়ে গেছে।

অপমানে লজ্জায় মৃদুলার চোখ-ভরা জল, বলল, তোমার চোখের সামনে দিয়ে গেল, তুমি দেখতে পেলে না?

তুলসী দার্শনিকের মতো বলে, যেতে দাও। কত বদমাইশ মতলববাজ লোক রয়েছে পৃথিবীতে! সবাইকেই কি ধরা যায়! কত ধরবে তুমি—অ্যাঁ?

বাস-স্টপে এসে মৃদুলা চোখ মোছে। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, লোকটার মুখটা ঠিক দেখতে পাইনি। কিন্তু ঠিক বিভুর মতো—বিভুরও ওই রকম বদমাশের মতো চেহারা—ওই রকম কালো লম্বা—ধরতে পারলে আমি ঠিক চটি খুলে মারতাম।

রাত্রি। তুলসী শুয়ে ছিল। গা হাত পায়ে হাজারটা ফোঁড়া টনটন করে, হাত-পা নাড়তে কষ্ট হয়, দম নিতে বুক ফেটে যায়। মনে হয় খুব জ্বর আসছে।

মৃদুলা নরম হাতে তার হাঁটু টিপে দিতে দিতে বলল, কেন ওইসব খেলতে যাও! হাত-পা ভাঙলে, তখন?

তুলসী মৃদু কাতর ধ্বনি করে। তারপর আস্তে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, ওই লোকটা কি সত্যিই বিভু, তুমি ঠিক দেখেছিলে?

মৃদুলা ঠোঁট ওলটায়, কী জানি! মনে হয়েছিল তো। হনহন করে পালিয়ে গেল, মুখটা দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে তুলসী, তারপর ঘুমোবার আগে উদাস গলায় বলে, কলকাতাটা বড্ড নোংরা—বুঝলে—একেবারে নোংরা শহর। সম্মান নিয়ে থাকা যায় না। এই ভিড়ভাট্টা গণ্ডগোলের মধ্যে—দূর, দূর—তার চেয়ে চলো পলাশপুরেই চলে যাই। ওখানে খেতখামার করব—বুঝলে—খেতখামার—একটা গোরু পুষব—কাছেই একটা ভেড়ি আছে—টাটকা মাছ—মাস্টারমশাই বলে ওখানকার লোক সম্মান করে খুব—গাঁয়ের মানুষ তো—সরল সোজা—

বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ও দিকে শাশ্বতীকে বাসে তুলে দিয়ে সারা বিকেল বিমান এসপ্ল্যানেডে ঘুরে বেড়িয়েছে। ময়দানের ও-ধারে গড়ের পিছনে দেখেছে আশ্চর্য সূর্যাস্ত। তুলিতে আঁকা গোধূলির ছবি। না, ঠিক গোধূলি নয়, গোরু ছিল না, মানুষের পায়ে পায়ে উড়ছিল ধুলো। ফুচকাওলাকে ঘিরে মানুষের ভিড়, চ্যাপটা মাটির উনুনে ভুট্টা পোড়াচ্ছে দেহাতি মানুষ, মনুমেন্টের তলায় মিটিং। সে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ট্রাম লাইনের ওপরে তারের জটিলতা, লক্ষ করল সে, কার্জন পার্কে বসে আছে অলস মানুষ।

সুন্দর এক দৃশ্য দেখল সে। প্রাইভেট বাসের হাতল ধরে পড়ো-পড়ো মানুষকে বুকে জড়িয়ে তুলে নিল বিশাল চেহারার পাঞ্জাবি কন্ডাক্টর। একটা বাচ্চা ভিখিরির ছেলেকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিল ট্রাফিক পুলিশ। কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল এসে গেল।

প্রতিটি মানুষকেই ডেকে একটি-দু'টি কথা বলতে ইচ্ছে করে। অচেনা মানুষের কাঁধে হাত রেখে কয়েক পা হাঁটতে সাধ হয়। তার চার দিকে অসহায় জন্মান্ধ সব মানুষ -জানে না কোথা থেকে কীভাবে এসেছে। জিজ্ঞেস করলে বড় জোর বাবার নাম বলতে পারে—তার বেশি কিছু নয়। ওইখানে মিটিং করছে কিছু লোক—কী বলছে ওরা? বিমান এগিয়ে শোনে— শিগগিরই ধর্মঘট। বাংলা বন্ধ— ট্রেনের চাকা চলবে না— কারখানায় চাক্কি বন্ধ—অফিস ফাঁকা থাকবে। বড় রাস্তায় ফুটবল খেলা হবে। এক দিন ছুটি।

ছোট্ট একটা মিছিল আসছে মিটিঙের দিকে। রোগা ক্রুদ্ধ মানুষেরা হাত তুলে চেঁচাচ্ছে, নিপাত যাক।—নিপাত যাক।

জন্মান্ধ মানুষ। জানে না বিদ্রোহ বিপ্লবের বীজ নষ্ট করে দেয়। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাবি মিটলেই এরা ঝিমিয়ে পড়বে। রেলের চাকা চলবে—কারখানায় চাক্কি ঘুরবে—অফিসে বশংবদ মানুষেরা মাথা নিচু করে ঢুকে যাবে। আজকাল আর তেমন মানুষের জন্ম হয় না—তেমন ল্যাংটা মানুষের—যে পৃথিবী কাঁপায়। যার দাবি-দাওয়া অভিশাপ নেই, যে দিতে আসে।

একটু আগেই সে একটা কাজ করেছে। খুব সাহসের কাজ। নিজেকে তাই খুব সজীব বলে মনে হয় তার। সে লোকের চোখে চোখ রেখে হাসে, তারপর তাদের পেরিয়ে হেঁটে যায়।

ট্রামে উঠে বিমান দেখল পিছন দিককার লম্বা সিটে প্রকাণ্ড চেহারার একটা লোক অনেক জায়গা নিয়ে বসে আছে। তার মুখে মদের গন্ধ, কড়া চোখে চার দিকের রোগা লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। সে একটু সরে বসলে তার পাশে একজন রোগাটোগা লোকের জায়গা হয়ে যায়। কিন্তু কেউ বসতে সাহস করছে না।

চোখে চোখ পড়তেই বিমান একটু হাসে, ভরাট সুন্দর গলায় বলে, একটু সরে বসুন।

লোকটা কেঁপে ওঠে। প্রকাণ্ড লোকটা কুঁকড়ে সরে যায়। বিমান আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বসে। দাঁড়ানো লোকগুলো ঈর্ষার চোখে তার মাথার ব্যান্ডেজ লক্ষ করছে। এরা হয়তো আজ বাসায় ফিরে বউয়ের কাছে বিমানের আশ্চর্য সাহসের গল্প করবে।

শরীরটা ভাল নেই। বড় রাস্তা থেকে বিমান একটা রিকশা নিল। ঘরের সামনে রিকশাটা ছেড়ে দেওয়ার সময়ে দেখল রিকশার গায়ে একটা পোস্টার। মৃদু রাস্তার আলোতে বিমান পড়ল, তাতে লেখা— দিন আনি দিন খাই, বাংলা বন্‌ধে উপোস যাই।

ওধারে যে মিটিং হচ্ছে—এধারে তারই প্রতিবাদ।

এটা কী? বিমান জিজ্ঞেস করে।

লোকটা কপালের ঘাম মুছে বলে, কী জানি বাবু। একজন লাগিয়ে দিয়েছে, বলেছে ছিঁড়ে ফেললে মাথা নামিয়ে নেবে। কী লেখা আছে ওতে?

লেখা আছে, তুমি দিন আনো দিন খাও, বাংলা বন্‌ধে তুমি উপোস যাবে।

লোকটা হাসে।

তুমি বাংলা বন্‌ধ চাও না?

কী জানি! লোকটা উদাস গলায় বলে।

ওর কেবল মনে পড়ে গত বর্ষার কথা। বর্ষাকাল রোজগারের সময়। যখন কলকাতায় রিকশা ছাড়া যানবাহন নেই। আবার এক বছর পর আসবে সেই সময়। তখনই বিপ্লব। মাঝখানে বাবুমানুষেরা যা খুশি করে নিক, কিছু যায় আসে না।

রাতের খাবার নিয়ে এল শম্ভু। সঙ্গে সুবল।

ললিতদার শরীর খারাপ। খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

টিফিন ক্যারিয়ারটা ফেরত নিয়ে যাবে বলে ওরা বসে রইল। খাটের ওপর পাশাপাশি। মেঝেতে বসে নিঃশব্দে খেয়ে নিচ্ছিল বিমান।

হঠাৎ সুবল বলে, বালিগঞ্জের এ কে দত্তকে আপনি চেনেন?

বিমান মুখ ফেরাল, চিনি।

সুবল বলে, তার মেয়ে অপর্ণা—গান গায়—তাকে?

বিমান মাথা নাড়ে, চিনি—ছেলেবেলা থেকে।

আপনাদের সম্পর্কটা কী?

বিমান হাসে। তারপর তার সুন্দর ভরাট গলায় বলে, অপুর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ছেলেবেলা থেকে। ওদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি একই গ্রামে, পাশাপাশি। ছেলেবেলায় আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। সকলেই আশা করত আমি বড় কেউ একজন হয়ে উঠব। ওরা আমাকে তখন থেকে পছন্দ করে রেখেছিল।

আর, এখন? সুবল প্রশ্ন করে।

বিমান মাথা নাড়ে, এখন আর ওরা আমাকে পছন্দ করে না। কেননা, আমি তেমন কিছু হইনি। ওরা কথা ফেরত নিয়েছে। কিন্তু অপুর বোধবুদ্ধি পাকেনি, সে ছেলেবেলা থেকেই জানে একদিন আমি তার স্বামী হব। আমি তার চিরকালের খেলাঘরের পুতুলের বর। সে আমাকে ছাড়তে পারছে না। এখনও নেশার ঘোরে আমার কাছে চলে আসে। বুদ্ধি পাকলে আর আসবে না। ও এখনও বুঝতে পারছে না যে, আমি কিছু নই।

আর আপনি? আপনার কোনও দুর্বলতা নেই?

না। বিমান মাথা নাড়ে। আস্তে আস্তে বলে, আমি বিশেষ কোনও মেয়ের প্রতি দুর্বল নই। আমার দুর্বলতা সন্তানের প্রতি।

বিমান নিঃশব্দে খায়। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে, আমি অঙ্ক কষে বিয়ে করব—খুব ধীরেসুস্থে, ভেবেচিন্তে—তারপর পৃথিবীতে এমন একজন মানুষের জন্ম দেব—এমন একজন- –

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে বিমান, কথা আটকে যায়! সময় নিয়ে সামলে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, এমন একজন, যে ঠিক আমার মতো নয়। সে আমার চেয়ে অনেক লম্বা-চওড়া হবে—অনেক সুপুরুষ—সে আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী হবে—চক্ষুষ্মান—সে নিজের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেখতে পাবে—সে জানবে সে কোথা থেকে এল—সে পৃথিবীতে কোনও দাবিদাওয়া নিয়ে আসবে না—সে দিয়ে যেতে আসবে—স্বভাবেই সে হবে ঐশ্বর্যবান। পৃথিবী এ-রকম একজন মানুষের জন্য বসে আছে।

কী করে আনবেন? সুবল জিজ্ঞেস করে।

ঠিক মতো বিয়ে করলে—দেখেশুনে, অঙ্ক কষে—

পারবেন? সুবল আর শম্ভু হাসে।

বিমান মাথা নাড়ে, কে জানে! আমি যদি না পারি তবে আমার ছেলে চেষ্টা করবে, কিংবা তার ছেলে। আমার বংশে এ-রকম চেষ্টা থেকে যাবে। ও-রকম একজন পৃথিবীতে আসতে আমাদের কত জন্ম কেটে যায়!

কার মতো হবে সেই ছেলে? কার্ল মার্ক্স, না স্বামী বিবেকানন্দ? সুবল জিজ্ঞেস করে।

কার্ল মার্ক্স, না স্বামী বিবেকানন্দ? কথাটা বুঝতে পারে না বিমান। কেবল বিড়বিড় করে। হ্যাঁ, কার্ল মার্ক্স—সেই দাড়িওয়ালা স্মিতমুখ সাধুসন্তের মতো লোকটা—যে বলছে যে, সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, মানুষের সপক্ষে—যে-লোকটা উলটে দিচ্ছে পৃথিবীর দান! অদ্ভুত মনোবল লোকটার। হ্যাঁ, কার্ল মার্ক্সকে চেনে বিমান। কিংবা বিবেকানন্দ! শিকাগো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে লোকটা কেবল গেরুয়া আলখাল্লা আর পাগড়ি মাথায় কাঠের প্যাকিং বাক্সে বসে রাত কাটাচ্ছে, তবু সোজা দাঁড়িয়ে বলছে, আমি তোমাদের ভ্রাতা, তোমরা আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনী। আমি জীবকে ঈশ্বর বলিয়া জানি। ঈশ্বরলাভই প্রতিটি জীবনের লক্ষ্য।...কিন্তু কার মতো হবে সেই মানুষ— কে জানে? বিমান বিড়বিড় করে, কিন্তু থই পায় না। বস্তুত পৃথিবীর কোনও মানুষের সঙ্গেই তার সেই স্বপ্নের মানুষটির অবিকল মিল নেই।

টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ওরা চলে গেলে বিমান আপনমনে বলল, আজ রাতে আমি গীতা পড়ব। অনেককাল পড়ি না।

সুবল শম্ভুকে বলল, লোকটা বদ্ধ পাগল।

শম্ভু একটু চুপ থেকে বলে, এ কে দত্তকে তুই চিনলি কী করে?

বাড়ি পর্যন্ত গেছি মেয়েটাকে 'ফলো' করে। বাড়ির গেটে নামের ট্যাবলেট ছিল। সেই দেখে ফোন করেছিলাম।

কী হল?

ফোন করে বললাম যে, আপনার মেয়ে একজন খুব বাজে লোকের সঙ্গে মিশছে। ও-পাশ থেকে গমগম করে লোকটা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আমার ফোন নম্বর জানলেন কী করে? বললাম, আমি সুবল মিত্র—বি-কম পাশ—ওই বাজে লোকটা যে পাড়ায় থাকে সেই পাড়াতেই থাকি, ফোন নম্বর পেয়েছি ডিরেক্টরিতে। লোকটা তবু ছাড়ে না, বলল ডিরেক্টরিতে পেলেন তো আমার নাম নিশ্চয়ই জানা ছিল। কোথা থেকে জানলেন? বলতে তো পারি না যে আপনার মেয়েকে 'ফলো' করেছিলাম, তাই অনেক কায়দা-কসরত করতে হল, বললাম, আপনি অত বড় ফার্মের মালিক, আপনাকে কে না চেনে? তখন বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। বিমান রক্ষিতকে আমি চিনি। ব্যাপারটা দেখব। বলে ফোন রেখে দিল।

সুবলের বুক জ্বালা করে ওঠে। সে যে বি কম পাশ এ-কথা কেন বলতে গেল? আজকাল কি বিকম পাশের কোনও দাম আছে? খামোকাই সে বলেছে কথাটা—বোকার মতো।

বিমান রক্ষিত বেঁচে গেল। কারণ, অপর্ণা দত্তর সঙ্গে ওর প্রেম নেই। থাকলে? থাকলে—সুবলের গা হাত শিরশির করে ওঠে। কেন থাকবে? ওই বড় বাড়ি—যার চূড়ায় পাথরের পরি—অনেকখানি জমিতে বাগান—সে-বাড়ির মেয়ে কেন প্রেম করবে কর্পোরেশনের জমাদারদের হাজিরাবাবুর সঙ্গে? কেন করবে?

ও দিকে রাতের গাড়িতেই কলকাতা ছেড়ে গেছে আদিত্য। ভোররাত্রে বিহারের এক জংশন স্টেশনে নেমেছে সে। বেশ শীত। অল্প কুয়াশা।

স্টেশনের বাইরে বাঁধানো চত্বরে কয়েকটা টাঙ্গা, রিকশার সারি দাঁড়িয়ে আছে। রাত-জাগা কিংবা ভোরে-ওঠা লোকেরা ছোট্ট দোকান থেকে ভাঁড়ে চা খাচ্ছে।

চারটে বেজে দশ মিনিট। এত ভোরে আদিত্য কখনও ওঠে না। এখনও ঘোর অন্ধকার চার দিকে। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। ট্রেনে একটা বুড়ো লোক সঙ্গী ছিল। তার কাছেই জেনেছে যে, এইখানে থাকার মতো একটা ডাকবাংলো আছে।

সে একটা ছোকরা টাঙ্গাওলাকে ডাকবাংলোর কথা বলে জিজ্ঞেস করল, কেতনা লেগা?

দু' টাকা।

দূর। একটুখানি পথ।

চড়াই উতরাই আছে বাবু। পাহাড়ি জায়গা!

আদিত্য হাসল, আর যদি মাঝপথে টাঙ্গা থামিয়ে গলায় ছুরি দাও!

লোকটা হাসে।

টাঙ্গা দুলতে দুলতে চলে। একটা বিশাল উতবাই ভাঙতে থাকে।

আকাশের গভীর রং থেকে একটা আভা আসে। আদিত্য দেখে ডান দিকে একটা উপত্যকা নেমে গেছে। বাঁ দিকে দূরে পাহাড়। খোলা মাঠ বেয়ে আসছে বহু দূরের গন্ধমাখা বাতাস।

ভোরবেলা জায়গাটা সুন্দর দেখাবে। ভাবে আদিত্য।

এইখানে যদি আশ্রয় পায় তবে একা একা অনেক দিন থাকবে সে। অনেক দিন সে আর লোকালয়ে ফিরে যাবে না।

## ॥ কুড়ি ॥

রাত্রে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট কথা বলে পাশ ফিরল শাশ্বতী। মৃদু একটু হাসল স্বপ্নের ভিতরে।

হৈমন্তীর গায়ের ওপর তার পা। হৈমন্তী ঠেলা দিয়ে বলল, এই, ঠিক হয়ে শো। আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিচ্ছিস।

শাশ্বতী ঘুমের মধ্যেই তাকায় তারপর বিড়বিড় করে অস্পষ্ট কথা বলে একটু। বোধ হয় বলে—তোমরা সবাই শাশ্বতীকে ক্ষমা কোরো। আমি কি ছাই বুঝি আমার মন! তোমাদের কাউকে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি— ক্ষমা কোরো।

শাশ্বতী ভেবে রেখেছে, খুব শিগগিরই সে একদিন ললিতের সঙ্গে দেখা করবে। জিজ্ঞেস করবে, এতে আপনার কী স্বার্থ ছিল? কেন আপনি এমন কাজ করতে গিয়েছিলেন?

ললিতের সঙ্গে ঝগড়া করার মতো অনেক কথা শাশ্বতীর মনে পড়ে। কেন আমাকে কেউ মন বোঝার সময় দিল না! কেন ধরে-বেঁধে নিয়ে গেল ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে! কী স্বার্থ তোমার ললিত! না, অত পুরুষমানুষ মিলে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে যেয়ো না শাশ্বতীকে। বরং তাকে আর-একটু সময় দিয়ো। আর-একটু মায়া কোরো শাশ্বতীকে। শাশ্বতী কি ছাই বোঝে তার মন! আর তুমি! শুনেছি, আজ টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা ওলটাতে তোমার হাত কেঁপেছিল। তুমি দু' আঙুলে সিগারেট ধরে রাখতে পারছিলে না! আমার ওপর কীসের প্রতিশোধ তোমার! তুমি তো জানতেও না তুমি কী করে ফেলতে যাচ্ছ! তবু তুমি জোর করে কেন ঘটাতে চাইছিলে ওই অঘটন! তোমার মায়া দয়া নেই!

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল সঞ্জয়। সামনে একটা গ্রিল দেওয়া ছোট বারান্দা আছে। সেখানে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে পাশে খুদে টেবিলে হুইস্কি নিয়ে বসে ছিল। গরম লাগছিল খুব, শুতে ইচ্ছে করছিল না। তা ছাড়া তলপেটের ব্যথাটা কেমন একটা টানা দপদপানিতে দাঁড়িয়ে গেল। নড়তে-চড়তে লাগে। এ-রকম ব্যথা নিয়ে ঘুমোনো যায় না। তা ছাড়া ঘুম সামান্য একটু কমেও গেছে সঞ্জয়ের। স্বাভাবিকভাবে বড় একটা ঘুম আসতে চায় না, কেবল হাই ওঠে, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে। চিন্তায় ভার হয়ে যায় মাথা। ঘুম এলেও অস্বাভাবিক সব স্বপ্ন দেখা দেয়। তার চেয়ে হুইস্কিই ভাল। শরীরে ব্যথা বেদনা আস্তে আস্তে মৃদু ঝিমঝিমির মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। গাঢ় চুম্বনের মতো আঠা হয়ে লেগে আসে চোখের পাতা। আঃ, শান্তি। ঠিক বটে যে সেটা আসলে ঘুম নয়, অজ্ঞান হয়ে থাকা। কারণ, সকালে উঠে কখনও ঠিক ঘুমিয়ে ওঠার তৃপ্তি টের পায় না সে। মনে হয়, অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরল। সারা দিন আবার হুইস্কির জন্য শরীর সাপের মতো ফোঁসে, ছোবলায়।

বারান্দায় হাওয়া ছিল। স্নান এবং সামান্য একটু রুটি মাংসের পর হুইস্কির স্বাদই আলাদা। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে খাচ্ছিল সঞ্জয়। রিনি আগে ধমকাত, কাঁদত, আজকাল গা করে না। শুধু বলে, বাথরুমে সাবধানে যেয়ো, আমার কাচের আলমারির গায়ে পোড়ো না। রাতে রিনি, পিকলু ঘুমোবার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। বলল, কী, আজ কতক্ষণ চলবে?

শোওয়ার সময়েও রিনির ঠোঁটে লিপস্টিক। সঞ্জয়ের ইচ্ছে হল বলে, ঠোঁট ধোও না কেন—সবসময়ে লিপস্টিক মেখে থাকলে রঙের তলায় ঠোঁটের চামড়া সাদা হয়ে যাবে—কুষ্ঠ-ফুষ্ঠ কত কী হতে পারে, আজকালকার কেমিকালে বিশ্বাস কী?

কিন্তু সঞ্জয় কিছু বলল না। উত্তরে রিনি তা হলে অনেক কথা বলবে— মদটদ খাওয়া নিয়ে— তার অতীত জীবন নিয়ে— ঝগড়াই লেগে যাবে হয়তো। দরকার কী? ও ওর মনে থাক। একটু লিপস্টিক বই তো নয়। মা সারা দিন পান খায়, তাই সকালে মুখটুখ ধোয়ার পর ঠোঁটের দু'পাশের কষে সাদা দাগ দেখা দেয়। ঘেন্না করে সঞ্জয়ের। রিনির লিপস্টিক থেকেও ও-রকম কিছু দাগ-ফাগ হওয়া বিচিত্র নয়।

ছিপছিপে শরীর, আঁট করে খুন-খারাপি রঙের শাড়ি পরেছিল রিনি—শরীরটা ওর এত সতেজ যে যেন চারপাশটাকে আক্রমণ করছে। চলায়-ফেরায় একটা ধনুকের মতো ছিটকে ওঠার ভাব আছে—আট-ন' মাস আগে ও যখন পোয়াতি ছিল তখনও ওর সতেজ ভাবখানা ছিল লক্ষ করার মতো। এখনও বোঝা যায় না যে বাচ্চা হয়েছে। কপালে লিপস্টিকেরই একটা গোল ফোঁটা দেয় রিনি, চুলের মধ্যে কোন অতল অরণ্যে ক্ষুদ্র একটু সিঁদুরের বিন্দু ছোঁয়ায়, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে কত কসমেটিক আনতে বলে সঞ্জয়কে, কখনও বলে না, সিঁদুর এনো। একদিন সঞ্জয় ঠাট্টা করে বলেছিল, আমার একটা খরচ বেঁচে গেছে, বাবা। সিঁদুরের। শুনে রিনি ম্লান মুখে বলেছিল, তুমি মেয়েদের ব্যাপারে কেন মাথা গলাও? স্বামীকে সিঁদুরের কথা বলতে নেই জানো? বিয়ের পর বছরে বোধ হয় সেরখানেক সিঁদুর লাগত রিনির—মাথা এ-ফোঁড়, ও-ফোঁড় করে কুড়ুলের কোপের মতো জমে থাকত সিঁদুর, সুন্দর টিকলো নাকের ওপর গুঁড়ো ঝরে পড়ত। আমি আর কুমারী নই, তোমরা কেউ আর আমাকে যাচ্ঞা কোরো না—এই কথা ঘোষণা করত সগর্বে। এখন আবার অনেকটা কুমারী হয়ে গেছে রিনি, সিঁদুর লুকোয়।

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কারও প্রেমে পড়োনি তো? তোমাকে গিটার শেখাতে এক মাস্টার আসে না ছোকরা মতো? তাকে আমি দেখিইনি। রেডিয়োতে হিন্দি কিংবা রবীন্দ্রসংগীত বাজায় বলে শুনেছি! দেখতে কেমন? উম্যান-ইটার! দুপুরবেলায় আসে তো—না?

টিজ করতে ইচ্ছে করে। টিজ তবু কিছুই করেনি সঞ্জয়। তলপেটে আদিত্যর লাথিটা তখনও জমে আছে। কেন যে শালা ঝেড়েছিল লাথিটা কে বলবে! রোগা আধমরা ললিতটাকে চড়টা কসিয়েছিল জুতমতোই। কেন যে তা কে জানে? কী যেন নাম সেই কালো কালো মেয়েটার— শাশ্বতী না কী যেন— এমন কিছু সুন্দর নয় সে— বিয়ের বাজারে চালাতে গেলে নগদ দু'-তিন হাজারের ধাক্কা— তবু তার জন্যই খেপে গেল পাগল আদিটা। দূর শালা। রিনিকে বরং দেখে যা— দেখে যা উঁচু-নিচু কাকে বলে— কী রকম মোলায়েম ফরসা চামড়ায় বাঁধানো আমার বউ, দেখে যা। ওই কালো মেয়েটার জন্য কি খুব বেশি হুজ্জুত করা যায়! তবু মাইরি তুই কতকালের সব পুরনো দোস্তদের না-হক মাস্তানি

দেখিয়ে গেলি! কোনও মানে হয়? ললিত বাগড়া দিচ্ছে? তো দিয়ে দে না ওই আধমরা ছেলেটাকে ওই কালো মেয়েটা! দু'-চারদিন ভোগ করে নিক। তারপর তো মরেই যাচ্ছে ও। ও মরে গেলে— মানুষের তো তখন আর কোনও স্বত্ব থাকে না— তখন ওর স্থাবর অস্থাবর আমরাই তো পাব রে! একটু উদার হলে দ্যাখ, কত ঝগড়া কাজিয়া এড়ানো যায়। তোরা কী রে!

রিনি এগিয়ে গিয়ে গ্রিল ধরে কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফাঁকা রাস্তা। হিন্দুস্থান পার্কে এ সময়টায় ভূত নামে। কেবল ও-ধারে একটা গ্যারাজের সামনে খাটিয়া পেতেছে এক বুড়ো দারোয়ান, নিশুত রাত চিরে পাতকুড়ুনিদের অপার্থিব চিৎকার ভেসে আসে—মা গো—।

রিনি মুখ ফিরিয়ে বলে, শুনছ?

কী?

ওই যে চিৎকার! বড্ড ভয় করে।

রিনি অপ্রস্তুত হাসি হাসে। তারপর বোধ হয় একটু চালাক হওয়ার চেষ্টা করে বলে, কী রকম যেন শাপ-শাপান্তের মতো শুনতে লাগে। এমন বিচ্ছিরি গলা করে ডাকে যেন সর্বস্ব চলে গেছে—

খামোখাই দামি লিপস্টিক মাখে রিনি। বাজে খরচ। সঞ্জয় জানে গিটার শেখানোর মাস্টারের সঙ্গে রিনি প্রেম করে না। আঙুলে আঙুলে ছুঁয়ে গেলে সতীত্বের ভয়ে কুঁকড়ে যায়। ধুস।

সঞ্জয় সামান্য হেসে বলল, আমি এক সময়ে ওদের কাছাকাছি থাকতাম। কত রাত চিৎপুরের ফুটপাথে শুয়ে কেটেছে বইয়ের দোকানের তক্তার তলায়। দুই-এক বার অনেকটা ভিক্ষের মতো করে লোকের কাছে হাত পেতেছি। ওর একটা মজা আছে।

কী মজা?

আছে। এখন আর সেটা বোঝাতে পারি না। তবে সর্বস্ব চলে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে।

রিনি চুড়ির ঝনন শব্দ করে রাস্তায় মুখ ফেরাল। তারপর হঠাৎ বলল, আবার ও-রকম হতে পারো?

সঞ্জয় মাথা নাড়ল, না।

রিনি মৃদু হাসি-মুখ ফিরিয়ে বলে, পারো না? তবে যে বলো মজা আছে! আমাকে খ্যাপানো অত সোজা—না?

সঞ্জয় বলল, এখন পারি না তার কারণ অন্য। এখন যদি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে গিয়ে ফুটপাথে মাদুর পেতে শুয়ে থাকি, তবু মনে হবে, রাতে চোর এসে আমার কী একটা চুরি করে নেবে। কী একটা যেন খোয়া যাবে আমার। কিছু খোয়া না গেলেও ওই রকম মনে হবে। স্বস্তি পাব না। কিন্তু যদি কোনও দিন সত্যিই সর্বস্ব চলে যায়, তা হলে—

রিনি হাই তুলল। তারপর পরিপূর্ণ শরীরখানা একটু আলসেমি জড়ানো ভঙ্গিতে মুচড়ে সঞ্জয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে একখানা ড্রিম-ল্যাম্প জ্বলছে। তার আলো পড়ল ওর গায়ে। সাধু সন্ন্যাসীর মতো পবিত্র মুখ কবল সঞ্জয়, বলল, তোমার গিটারটা একটু বাজাও না, শুনি। নতুন কী শিখেছ?

ঘুম পাচ্ছে।

ওঃ! তা হলে বরং গিয়ে ঘুমোও।

সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁঝে ওঠে রিনি, আহা, আমি ঘুমোতে চাইলাম, আর উনি ঘুমোতে দিলেন। কেন, হুকুম করতে পারো না—না, আমি এক্ষুনি গিটার শুনতে চাই, নিয়ে এসো গিটার, আমার পায়ের কাছে বসে বাজাও—

সঞ্জয় হাত তুলে বলল, আস্তে। এ সময়ে জোরালো শব্দ শুনলে নেশা কেটে যায়।

অভিমানী মুখ করে রিনি বলে, যাও, বাজাব না।

শান্ত গলায় সঞ্জয় বলল, গিটারটা আনো।

সামান্য একটু আদর-কাড়া ঝগড়া করল রিনি। কিন্তু এতকাল পরে এই প্রথম তার বাজনা শুনতে চেয়েছে বলে সে চাপা আনন্দে একটু ঝলমলে মুখে সত্যিই গিটার নিয়ে সঞ্জয়ের পায়ের কাছে বসল। পিকলুকে যেমন কোলে নেয় রিনি তেমনই কোল দিল যন্ত্রখানাকে।

কী বাজাব?

দেহাতি গান জানো?

রিনি হাসে, গাঁইয়া কোথাকার।

তা হলে যা খুশি বাজাও।

একটু টুংটাং করে রিনি সত্যিই বাজাতে লাগল। বিভোর হয়ে।

একটু আশ্চর্য হয়ে সঞ্জয় শুনছিল। সেই ওঠা-পড়াহীন বিষণ্ণ মেয়ে-কান্নার সুরে গান—ঠিক যেমন দেহাতি গান হয়। রিনি তাই বাজাচ্ছে। সঞ্জয় গানটা একটুও ধরতে পারল না। কিন্তু পড়ন্ত বেলায় এক পাহাড়ি নদী পার হয়ে রংচঙে কাপড় পরে মানুষ মেলায় যাচ্ছে। সাজপরা গোরু টেনে নিয়ে যাচ্ছে রঙিন গাড়ি। এ-রকম দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠছিল।

রিনি থামলে জিজ্ঞেস করল, এটা কি হিন্দি ছবির গান?

দূর!

তবে?

ছেলেবেলায় গানটা শুনেছিলাম। সেবার দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে। সুরটা মনে ছিল, সেই থেকে বাজালাম।

কথাগুলো কী বলো তো।

রিনি হাসল।

গার্ডবাবু, গার্ডবাবু, সিটি না বাজা না, ঝান্ডি না দিখানা, পিলাটফারম ম রহ গৈল গাঁটাবিয়া... গুনগুন করে গাইল রিনি।

হাসতে হাসতে সঞ্জয় টের পাচ্ছিল পেটের নীচে একটা ভাবী বস্তু ঝুলছে। তলপেটটা। প্ল্যাটফর্মে গাঁটরি পড়ে রইল—হায় ঈশ্বর, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে! হে গাডবাবু, তোমার পায়ে পড়ি—সর্বস্ব পড়ে আছে আমার প্ল্যাটফর্মে—

রিনি!

উঁ।

আজ, আর কিছু বাজিয়ো না। শুনতে ভাল লাগবে না। তুমি খুব সুন্দর শিখেছ, খুব সুন্দর—

রিনি হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলল, তবে প্রাইজ দাও।

প্রাইজ দিতেই যাচ্ছিল সঞ্জয়, হঠাৎ রিনি মুখ আচমকা সরিয়ে নিয়ে বলল, ইস, ছাইপাঁশের গন্ধ! কী স্বাদে যে খাও—

রিনি উঠে চলে গেলে একা একা একটা ডিঙি নৌকোর মতো চেতনা ছেড়ে অচেতনতার দিকে ভেসে গিয়েছিল সঞ্জয়। কাল রাতে।

রাত প্রায় একটা পর্যন্ত বিমান গীতা পড়েছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা তার কাছে। পড়তে পড়তে হুঁশ হল যখন মাথার পিছন দিকে একটা তীব্র যন্ত্রণা দেখা দিল হঠাৎ: চোখের ডিম দু'টো টনটন করে উঠল। তখন বই রেখে বাতি নিবিয়ে দিল বিমান। কিন্তু শুতে গিয়ে বুঝল ঘুম আসবে না। ঘুম সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা ব্যাপার এখন। মাথার ব্যান্ডেজটার ওপর দিয়ে সে একটা রুমাল শক্ত কটকটে করে বেঁধে গিঁট দিল। তারপর খোলা হাওয়ায় ঘুরবে বলে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বট গাছের তলায় কতগুলো ছেলেছোকরা বসে আছে। তাদের পরনে সরু প্যান্ট, গায়ে রংচঙে শার্ট, মুখে সিগারেট আর হাতে মাটির ভাঁড়। রাস্তার আবছা আলোয় তাদের দেখা যায়। চা খাওয়ার মতো করে চুমুক দিচ্ছে ভাঁড়ে। একটু চা খেতে বিমানেরও ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে কাছাকাছি কোনও চায়ের দোকান দেখতে পেল না। অল্প দূরে একটা পানের দোকান খোলা আছে কেবল। সে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিল অমনি একটা ছেলে উঠে এসে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কী চাই!

বিমান একটু ইতস্তত করে বলল, একটু চা কোথায় পাওয়া যায়!

ছেলেটা খুব অবাক হয়ে বলল, চা!

পিছন থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করল, কে রে?

ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে বলল, চা চাইছে।

খ্যা-অ্যা-অ্যা করে একটা হাসির শব্দ হল। আর একজন বলল, নিয়ে আয়, চা খাইয়ে দিচ্ছি।

আর একজন বলল, হ্যাঁ, খাওয়াও আর কী— এমন পয়সার মাল কোথাকার কোন মড়াকে—

যাঃ, মদ কাউকে রিফিউজ করতে নেই, পাপ হয়। শচে, নিয়ে আর ভদ্রলোককে—

মাথার মধ্যে তখন এমন একটা দপদপ রক্ত বওয়ার শব্দ হচ্ছে, আর এমন টনটন করছে দু'টো চোখ যে বিমান ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝতে পারল না। এরা তাকে মদ খাওয়াতে চাইছে। সে কখনও খায়নি। কিন্তু মাথা আর চোখের এই অসহ্য যন্ত্রণায় কিছু একটা করা দরকার। যদি খুব নেশা হয় তা হলে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

ছেলেগুলো খুব খারাপ নয়, সে এগোতেই বাঁধানো বেদির ওপর একটু সরে বসে তার জন্য জায়গা করে দিল। বসার পর বিমান দেখলে এদের দলে—কী আশ্চর্য—একটা মেয়েও রয়েছে। মেয়েটার মুখ অন্য দিকে ফেরানো, তবু এক পলক দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটা একেবারে রদ্দি। মুখে অতিরিক্ত পাউডার, খুব সস্তা ঝলমলে একটা শাড়ি। ছেলেগুলো ওর দিকে তাকাচ্ছেও না, খুব সম্ভবত আসর গরম করার জন্য ওকে নিয়ে এসেছে ভাড়া করে—তারপর সবাই ঠান্ডা মেরে গেছে। বিমান চোখ ফিরিয়ে নিল।

ভাঁড়ে প্রথম চুমুকটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত শরীর পেট থেকে জিব পর্যন্ত যেন নিঃশব্দে চেঁচিয়ে উঠল, না না, এ-জিনিস আমরা নেব না, এ-জিনিস আমাদের সঙ্গে খাপ খায় না। বিমান মুখের মধ্যে ঢোকটাকে রেখে বসে রইল, গিলতে পারল না। ফেলতেও না।

তার পাশ ঘেঁষে বসে আছে সেই সমবেদনাশীল ছেলেটা, যে তাকে ডেকে বসিয়েছে এইখানে। সে ছেলেটা তেমনই আদর করার মতো গলায় জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

বিমান ঢোকটা গিলে ফেলল। কাশির দমকে চোখে জল এসে গেল তার। অস্ফুটভাবে বলল, ভীষণ ঝাঁঝ আর তেতো-তেতো—এতে কী আছে?

কী জানি! শালারা কত কিছু মেশায়। কারবাইড থাকতে পারে কিংবা যে-কোনও পয়জন। কিন্তু ও-সব সয়ে যায়, ইম্যুনিটি ফর্ম করে গেলে কিছুই আর হয় না—আমি তো বিলিতি জিনিস কত খেয়েছি কিন্তু বাংলা মালের তুলনা হয় না—আহা, বাংলার মাটির জিনিস, বাঙালির হাতে তৈরি—

বলতে বলতে ছেলেটা কথা থামিয়ে গুনগুন করে গাইতে লাগল, বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার—

ও আমার সোনার বাংলা, আর-একজন আধ-চেতন সুরে গায়, তারপর হেসে ওঠে।

সেই সমবেদনাশীল ছেলেটা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় বেরিয়েছিলেন?

আমার বড্ড মাথা ধরেছিল।

খেয়ে নিন। মাথা যে আছে টেরই পাবে না।...কোথায় থাকেন?

কাছেই।

একা?

হুঁ।

ছেলেটা হাসল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল, তা হলে আপনার জন্য আরও ফাস্ট ক্লাস বন্দোবস্ত করতে পারি। ওই যে মেয়েটা—ওকে ঘরে নিয়ে যান। ও আপনার মাথা টিপে দেবে, পদসেবা করবে, ঘুম পাড়াবে—দারুণ এক্সপার্ট মেয়ে—নেবেন সঙ্গে? ভয় নেই, ওকে কিছু দিতে হবে না। টাকা-পয়সা যা দেওয়ার আমরা দিয়ে রেখেছি—

মেয়ে! মেয়ে দিয়ে বিমান কী করবে! শুনে সে ভীষণ চমকে ওঠে, ভয় পেয়ে বলে, না, না, তার দরকার নেই—

শুনে ছেলেটা ভীষণ হতাশ হয়। বলে, নিন না। মেয়েদের যা যা থাকে ওর সব আছে, বয়সও এমন কিছু বেশি হয়নি। কেবল আমাদের কাছে একটু পুরনো হয়ে গেছে—রোজ আসে তো, তাই—কিন্তু আপনার কাছে বেশ নতুন লাগবে—নিয়ে যান—বলে ছেলেটা মুখ ফিরিয়ে মেয়েটাকে ডেকে বলে, পারুল, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যাবে? যাও না—খুব ভাল লোক—

মেয়েটা ফিরেও দেখে না। আর বিমানের ভীষণ ভয় করে। সেই ছেলেটা বলে, নিন না। আপনার ভালর জন্যই বলছি—

বেদিটাকে ঘিরে আরও সাত-আটজন বসে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে তাদের কারও মুখই ভাল দেখা যায় না। তাদের মধ্যে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, কে নেবে পারুলকে? কোন শালা? আজ পারুল আমার।

এই কথা বলে ছেলেটা ও-পাশ থেকে উঠে পারুলের সামনে দাঁড়ায়। খস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে এক হাতে ধরে অন্য হাতে মেয়েটার থুতনি তুলে ধরে মুখ দেখার চেষ্টা করে। বলে, তুমি আমার নও?

মেয়েটা ঝটকা মেরে ছেলেটার হাত সরিয়ে দেয়। ছেলেটা তখন দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দু' হাত বাড়িয়ে খিমচে ধরে মেয়েটাকে। রে-রে করে হাসে মেয়েটা ডানা ঝাপটানোর মতো শব্দ করে।

প্রকাশ্যে, একটু আধো-অন্ধকারে ব্যাপারটা চলতে থাকে। এ-পাড়াটায় ভদ্রলোক কেউ থাকে না, বটগাছের উলটো দিকে একটা পোড়ো মাঠ—তার ও-পাশে বস্তি। আশেপাশে দু'-একটা গরিব-গুরবোর দীন-দরিদ্র বাসা রয়েছে। কিন্তু কোনওখান থেকেই কোনও প্রতিবাদ আসে না, দূর থেকে ছুটে আসে না লোক। হয়তো ওই সব বাসায় যারা থাকে তারা অন্ধকারে জানালায় খড়খড়ি খুলে দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করছে নিঃশব্দে, হয়তো বউকে ফিসফিস করে বলছে, কী কাণ্ড হচ্ছে দেখসে—সেই বদ ছেলেগুলো গো—একটা মেয়েকে। বউ হয়তো চাপা রাগের স্বরে বলছে, তা তোমার ওখানে দরকার কী? দিনকাল ভাল না, জানালা বন্ধ করে চলে এসো...

এবার ভাঁড়ের তরল পদার্থটার কোনও তেতো-কটু স্বাদ পেল না বিমান। ঢকঢক করে জলের মতো খেয়ে নিল। কিন্তু সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ চমকে মেঘ ডেকে উঠল যেন। কান মুখ চোখে ঝমঝম বাজনা বেজে উঠল। মনে পড়ে গেল বিকেলে সে একটা মেয়েকে বাঁচিয়েছে। সরল শিশুর মতো একটি মেয়েকে। মেয়েটা কাঁদছিল। সব মেয়েই কাঁদে। কেননা, মানুষের জন্মের রহস্য বাঁধা থাকে তারই আঁচলে। সে জানে, তাকেই সন্তানের ভার বহন করতে হবে, বহু কষ্টে জন্ম দিতে হবে। তবে সে কেন বহন করবে যেমন তেমন সন্তান— সে কেন চাইবে যে খুশি সন্তান দিয়ে যাক তার গর্ভে? বরং সে মনে মনে অপেক্ষা করে শ্রেষ্ঠ একজন পুরুষের—যাকে সে হয়তো কখনও পায়, কখনও পায় না, কিন্তু অপেক্ষা করে থাকে। যদি শত পুরুষেও তার দেহ ছিঁড়ে খায় তবু সে স্বভাবে থাকে একগামী— যাকে সে হয়তো কখনওই দেখেনি সেই শ্রেষ্ঠ একজন পুরুষ তার অন্তরে স্বামী হয়ে থাকে। তাই মেয়েমানুষকে না চিনলে তাকে কখনও ছুঁতে নেই। কিন্তু মূর্খ চাষার মতো বহুগামী পুরুষ মাটি না-চিনে বীজ ছড়িয়ে যায়। পৃথিবীতে কত মানুষ তাদের বিবাহিতা স্ত্রীদের বলাৎকার করে যায় নিজের অজান্তে। কখনও বোঝে না একটি প্রতিক্রিয়া কত দূর সর্বনাশ নিয়ে আসে।

বট গাছ ছাড়িয়ে একটু দূরেই অন্ধকারে বাতি নেবানো একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিটা বোধ হয় এদেরই। ছেলেটা পারুলকে সেই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনিচ্ছায় যাচ্ছে পারুল, তাকে যেতে হবে বলে। সে টাকা নিয়েছে। অন্য ছেলেগুলো চুপচাপ বসে থাকে।

মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণায় হঠাৎ কেমন ভোঁতা হয়ে আসে। এক ডেলা মাটির মতো অর্থহীন লাগে মাথাটাকে। বিমানের হাত-পা অবশ হয়ে আসে। মাথা ঝিমঝিম করে। সে হঠাৎ পাশের ছেলেটাকে ফিসফিস করে বলে, আমি ওকে—ওই পারুলকে নিয়ে যাব—

ছেলেটা হেসে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, গদা, পারুলকে ছেড়ে দে, এই ভদ্রলোক রাজি আছেন—

ছেলেটা বলে, ফোট শালা। আজ পারুল আমার। আমার হাত কামড়ে দিয়েছে পারুল, খিমচে দিয়েছে গালে, তবু আমি ভালবাসায় জ্বলে যাচ্ছি—

শুনলেন তো, ও ছাড়বে না। আপনি যান না, ওর সঙ্গে লড়ে কেড়ে নিন পারুলকে। যদি পারেন তবে আমরা সবাই ক্ল্যাপ দেব—যান না—

ছেলেটা তাকে ঠেলে তুলে দেয়।

বিমান উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে না। পা অবশ হয়ে আসে। সে আবার পড়তে পড়তে সামলে নেয়। এমন অশালীন, কুৎসিত একটা দৃশ্য সে আর কখনও দেখেনি। বহু পুরুষের মধ্যে একটি মেয়েকে নিয়ে টানাটানি। আজ বিকেলে সে একটি মেয়েকে বাঁচিয়েছে। যে-মেয়েটা বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু হায় ঈশ্বর, এই নষ্ট মেয়েটা যে জানেও না সময়মতো কেঁদে উঠতে। একটু পরেই ওর জোর নষ্ট হয়ে যাবে—আর তারপর—

হঠাৎ দু' হাত ওপরে তুলে বিমান চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও—বাঁচাও—

কিন্তু কিছু হল না। গলার স্বর ফুটল না তেমন। হতাশভাবে ভীত চোখে বিমান দেখল অন্ধকারে ছেলেগুলো সবাই তার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। তাদের সিগারেট জ্বলছে।

কিন্তু কেউ কিছু করার আগেই বিমান খুব ক্লান্তভাবে মাটিতে পড়ে গেল। চোখ বোজার আগের মুহূর্তে তার মনে হল—সে একা বড় অসহায়। বিপক্ষের শত্রুদল বড় প্রবল। এখন খুব শক্তিমান, খুব প্রকাণ্ড কেউ যদি তার পাশে থাকত!

তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিমান।

খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙল, সূর্যের প্রথম আলোটি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিগুণ বেগে দপদপ করছে মাথার শিরা। ভাল করে চোখ খুলতে সময় লাগল অনেক। চেয়ে দেখল সে গাছতলায় পড়ে আছে। তার চারদিকে ভাঙা মাটির ভাঁড়, শালপাতা, কয়েকটা দেশি মদের বোতল, ধুলোয় জুতোর ছাপ। দু'-একজন কৌতূহলী লোক পথ চলতি না-থেমে তাকে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই সে একটা জিনিস টের পেল। বহুকাল বাদে তার মাথার ভিতরটা আবার ফাঁকা লাগছে। সে মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু স্পষ্ট টের পেল মাথার ভিতরে আকাশের একটা অংশ ঢুকে আছে। বেরোচ্ছে না। আস্তে আস্তে বেলা বাড়তে লাগল, আর সে টের পেতে লাগল কোন সুদূর থেকে আকাশের শূন্যতা তুষারপাতের মতো নিঃশব্দে তার মাথার ভিতরে খসে পড়ছে।

খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল বিমান। আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই সে আবার কিছু দিনের জন্য পাগল হয়ে যাবে। পাগল হয়ে যাওয়ার আগে এই লক্ষণগুলো তার খুব চেনা। এখন পরিচিত সবাইকে এই খবরটা তার জানিয়ে দিতে হবে। তোমরা সবাই সাবধান থেকো, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

## ॥ একুশ ॥

আর-একবার ব্যর্থতার স্বাদ পেল ললিত। গভীর হতাশায় ডুবে যেতে লাগল। সে আর কোনও ঘটনাই ঘটাতে পারে না পৃথিবীতে।

দুপুরে খাওয়ার পর তীব্র অম্বল বর্শার ফলার মতো বুক চিরে উঠে আসছিল। একটু পরেই বমি হয়ে যাবে। ললিত কাত হয়ে শুয়ে, শরীরটাকে মুচড়ে, বালিশে মুখ ঠেসে বমিটা ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। হাতে জ্বলে যাচ্ছে বৃথা সিগারেট—ঠোঁট পর্যন্ত আনতে পারছে না সে। বালিশে মুখ গুঁজে সে একটা অস্ফুট 'অঃ ক' শব্দ করে।

মা বাসায় নেই। কারও বাড়িতে গিয়ে বসেছে আড্ডায়। বুকের ভিতরটা ভরদুপুরে একা কেমন খাঁ খাঁ করে। দুপুর তার কোনও দিন কাটতে চায় না। কেমন ঝিম ধরে যায় মনে, বড় একা লাগে। দুপুরেই তার মিতুর কথা মনে পড়ে কিংবা মরবার কথা।

জানালার শিকের ভিতর দিয়ে ঘরে এসে মুখ বাড়িয়েছে পেয়ারা গাছের কয়েকটি পাতা। হাওয়ায় নড়ছে। সবুজ, কচি। নতুন জন্মেছে তারা, এখনও ধুলো বালি পড়েনি তাদের গায়ে। শিশুর মতোই নিষ্পাপ দেখাচ্ছে। শিশুর মতোই যেন এক মুখশ্রী রয়েছে তাদের। ললিতের ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে সে একটু ওদের আদর করে আসে।

পেয়ারাপাতায় শিশুমুখ লক্ষ করে সে বড় অবাক হয়। বড় ভাল লাগে তার। সেই দিকেই স্থির চোখে চেয়ে থেকে, ক্লান্ত হয়ে ক্রমে তার চোখ বুজে আসে। তন্দ্রা এসে যাচ্ছিল তার। বমিটা হয়তো শেষ পর্যন্ত হবে না।

এমন সময় টের পায়, খোলা দরজা দিয়ে কে যেন নিঃসাড়ে ঘরে এল। মা কি? না তো, মায়ের গন্ধ সে চেনে। চোখ খুলল না ললিত। অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হচ্ছিল, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কে যেন তাকে দেখছে। শ্বাস বন্ধ করে রইল সে। যে এসেছে সে বোধ হয় পৃথিবীর কেউ নয়। সে এসেছে ওইপার থেকে— যে-পারে তাকে শিগগিরই যেতে হবে। চোখ খুললেই সে দেখবে একজন একটা টিকিট এগিয়ে ধরে রেখেছে তার দিকে, সে বলবে, তোমার টিকিট হয়ে গেছে, জাহাজ ছাড়তেও আর দেরি নেই।

কিংবা, যে এসেছে সে হয়তো আদিত্য। ললিত চোখ চাইলেই বলবে, ট্রেটার! শাশ্বতীকে ফিরিয়ে দে।

ললিত!

চমকে চোখ খুলল ললিত। আস্তে আস্তে উঠে বসল। ক্লান্ত গলায় বলল, বোসো বিমান।

বিমানের চোখ লালচে, রুক্ষ চুল, স্নান-না-করা ধুলোটে চেহারা। সে নিবিড়ভাবে ললিতের দিকে চেয়ে ছিল। শ্বাস ফেলে বলল, ললিত, আমি আবার পাগল হয়ে যাচ্ছি।

সে কী? ললিত অবাক হয়ে বলে, কী হয়েছে?

কী জানি! মাঝে মাঝে এমনিই এটা হয়, কোনও কারণ থাকে না। আবার কখনও কোনও একটা ধাক্কা খেলে এটা হয়। কাল অনেক রাতে আমি একটা ভাড়াটে মেয়েকে কয়েকজন গুণ্ডা ছেলের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে বিমান বলে, কয়েক দিনের মধ্যেই আমার পাগলামি শুরু হবে। আমি টের পাচ্ছি।

ললিত নড়েচড়ে বসল, বলল, কাল বিকেলেও তুমি একজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলে, না বিমান?

মাথা নিচু করে একটু বসে থাকে বিমান। তারপর বলে, একে বাঁচানোটা তার চেয়ে শক্ত ছিল। কারণ এ বাঁচতে চায়নি। ওই যে বটগাছতলায় বাঁধানো বেদি আছে, ওখানে কয়েকজন ছেলের সঙ্গে সে বসে ছিল—অনেক রাতে—অন্ধকারে আমি তার মুখও দেখিনি—

ললিত বড় বড় চোখে চায়, বলে, আই বাপ, বিমান, ওটা যে শচীনদের আড্ডা, ওরা ওখানে চোলাই খায়।

বিমান মাথা নাড়ে, বলে, জানি। মেয়েটাকেও ওরা ভাড়া করে এনেছিল, আমি জানতাম। চা খেতে বেরিয়ে আমি ওদের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলাম! কিন্তু তারপর যখন একটা ছেলে সেই মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন—বুঝলে—তখনই আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। জানি মেয়েটা নিজের ইচ্ছেয় এসেছে, ওটাই তার কাজ তার রুজি-রুটি, তবু মনে হল সে যেন ভিতরে ভিতরে বেঁচে যেতে চাইছে—সেটা কেউ বুঝতে পারছে না—

ললিত জিব দিয়ে চুকচুক করে একটা আফশোসের শব্দ করে বলে, রাতারাতি তুমি পৃথিবী পালটে দিতে চাও?

বিমান একটা শ্বাস ফেলে বলল, আমার এ-রকম হয়। আগে আমি কত নিরীহ ছিলাম, যা-কিছু চোখে পড়ত তা থেকেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতাম। জানি তো আমি কেমন দুর্বল মানুষ! কিন্তু কাল রাতে আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকছিলাম, বলছিলাম, বাঁচাও, কে কোথাও আছো—। কেউ এল না, কেউ সাড়াও দিল না। কিন্তু নিশ্চয়ই অনেকে সেই ডাক শুনেছিল। তবু কেউ আসেনি। কেন জান? তারা সবাই আমারই মতো নিরীহ—চোখের সামনে অন্যায় দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেয়, কেউ 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করলে কানে হাত চাপা দেয়। আমি এতকাল সবাইকেই আমার চেয়ে সাহসী আর শক্তিমান ভেবেছি। কিন্তু বৃথা, কেউ তা নয়।

ললিত একটু হেসে বললে, কিন্তু আমি তোমার ডাক শুনতে পাইনি।

পেলে কী করতে? যেতে?

নিশ্চয়ই।

আর যখন গিয়ে দেখতে যে আমি কতকগুলো বাজে ছেলের হাত থেকে একটা নষ্ট মেয়েকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি, তখন কী করতে? লড়াই করতে ওদের সঙ্গে?

না।

বিমান উত্তেজিতভাবে ললিতের একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, না! না কেন?

সেটা পণ্ডশ্রম হত। ওই ছেলেগুলো ওইরকম, মেয়েটাও ওইরকম— সেখানে আমাদের কী করার আছে?

নেই! বিমান হতাশ হয়, নেই কেন! তুমি কি ওদের সমর্থন কর?

ললিত ভ্রূ কুঁচকে উত্তেজিত বিমানকে একটু দেখল, তারপর বলল, না, সমর্থন করি না। কিন্তু ওরা যে খুব একটা অন্যায় করছিল তাও তো নয়! কেউ যদি নিজের পয়সায় মদ খায়, ভাড়াটে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে তাতে আমার কী? মদ খাওয়া বারণ নয়, প্রস্টিটিউটদেরও লাইসেন্স আছে—

ঠিক। কিন্তু তোমার মন কী বলে! কাল বিকেলে দেখছিলাম তুমি আদিত্য আর শাশ্বতীর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছ। মেয়েটা বিয়ে করতে রাজি নয়, যে-কোনও কারণেই হোক সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। তবু তুমি তাকে গায়ের জোরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি মনে মনে বুঝতে পারছিলে এটা অন্যায়, তবু তুমি তোমার অহংকার আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখছিলে। আমি এখনও জানি না ওই মেয়েটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী! তবু আমার বিশ্বাস তুমি ওর ওপর একটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে চাইছিলে। তাই অত জোর দেখিয়েছিলে তুমি। নিরপেক্ষতার ভান করেছিলে। তবু তোমার মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছিল, তোমার হাত কাঁপছিল। কাল শাশ্বতীর জন্য আমার ততটা কষ্ট হয়নি, যতটা তোমার জন্য হচ্ছিল।

ললিত চোখ নামিয়ে বলল, তার সঙ্গে এ-ঘটনার সম্পর্ক কী?

বিমান মৃদু হাসল, বলল, কাল যদি আমিও তোমার মতো নিরপেক্ষ থাকতাম তা হলে আজ তুমি হাত কামড়াতে, চুল ছিঁড়তে, গাল দিতে নিজেকে। তুমি অত নিরপেক্ষ থেকো না, তা হলে একদিন তোমার ঘরে চোর ঢুকবে আর তুমি দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকবে।

ললিত মাথা নাড়ল, কিন্তু বলো, কালকের মেয়েটাকে তুমি বাঁচাতে চেয়েছিলে কেন?

বিমান নিজের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, যখন ওই ইতর ছেলেটা নষ্ট মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন মেয়েটার কোনও উপায় ছিল না। সে সতী নয়, ঘরের বউ নয়, চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকায় সে কেনা হয়ে গেছে, তার পছন্দ-অপছন্দ নেই, যে কিনবে সে তার। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, সে-মেয়েটা এ রকম চাইছিল না। কেউ তাকে কিনে জিনিসপত্রের মতো যেমন খুশি ব্যবহার করুক—এটা কে চায়! আমার মনে পড়েছিল, বিকেলে শাশ্বতীকেও তোমরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলে, সেও যাচ্ছিল. সে হয়তো সইও করত, কারণ সে বুঝতে পারছিল যে, তার উপায় নেই। না, না, তুমি রাগ কোরো না, শাশ্বতীর সঙ্গে আমি সে-মেয়েটার তুলনা করছি না। কিন্তু আমার কাছে দু'টোই অনেকটা এক ব্যাপার। বিকেলে শাশ্বতীকে যেমন দেখেছি, রাত্রিবেলায় ওই মেয়েটাকেও ঠিক ওই রকম দেখেছিলাম— উপায়হীন বলে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিছু লোক।

ললিত একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, তুমি পাগল।

বিমান গম্ভীরভাবে বলল, ঠিক। ললিত, যেদিন আমি দু'টো ছিনতাইবাজ লোকের কাছ থেকে আমার ঘড়ি আর মানিব্যাগ কেড়ে নিলাম, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমি এ-রকম কাজ আবার করব এবং করতে থাকব। আমার স্বভাবের নিয়ম পালটে গেছে। কিন্তু তার ফল এই হবে যে, এক দিন কেউ আমাকে নিঃশব্দে সরিয়ে দেবে, কাজের বাধা হচ্ছে বলে। কে আমাকে রক্ষা করবে তখন? কে আমার সহায় হবে? মানুষের মধ্যে তেমন শক্তিমান কাউকে দেখি না। তার চেয়ে এই ভাল যে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি...আঃ, কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

বিমান একটুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল। মুখে মৃদু একটু হাসি। তার মাথার মধ্যে চমৎকার নীলাভ আকাশখানা আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে। মাথার ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সব চিন্তা, স্মৃতি, ক্ষোভ।

ললিত অস্বস্তি বোধ করে। দাঁতে নখ কামড়ায়। তারপর একসময়ে বিমানের গায়ে হাত দিয়ে বলে, কী ভাবছ?

আকাশ। ধীর স্বরে এই কথা বলে চোখ খুলে বিমান একটু হাসে, বলে, আকাশের চিন্তাই ভাল। আর দু'-এক দিনের মধ্যেই আমার ভিতরটা আকাশে ভরে যাবে। চার দিকে কিছুই আর চোখে পড়বে না। তখন যে খুশি এসে কেড়ে নিক আমার ঘড়ি কিংবা মানিব্যাগ, যার খুশি জোর করে বিয়ে করুক শাশ্বতীকে, সেই বদ ছেলেগুলো যেমন খুশি বেলেল্লাপনা করুক পারুলের সঙ্গে— তাতে আমার আর কিছু যাবে আসবে না।

হঠাৎ ললিতের বড় লজ্জা করে। সে মুখ নিচু করে বলে, আমরা কী করতে পারি বলো!

বিমান মাথা নাড়ল। বলল, কিছু না। কাল রাতে আমার মনে হয়েছিল একজন খুব শক্তিমান মানুষের

বড় দরকার, যিনি মানুষের এক ডাকে ছুটে আসবেন। ওই ছেলেগুলো বোমা মারে, ছোরা চালায়, আর ওই মেয়েটা ভাড়াটে। কে আসবে ওদের হাত থেকে ওই ন্যাকা ঢঙি মেয়েটাকে বাঁচাতে! সেটা হবে একটা হাস্যকর কাজ। কারণ, মদ খাওয়া বারণ নয়, বেশ্যাদেরও লাইসেন্স আছে। কাজেই আসতে চাইলেও বউ দরজা আটকে দাঁড়াবে, বাধা হবে ভয়, দুর্বলতা, কিংবা নিরপেক্ষ থাকার ইচ্ছা। কাজেই একমাত্র সেই লোকই ছুটে আসতে পারে যার ঘর-সংসার নেই, পরিবার পরিজন নেই। মানুষ ডাকলে সে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। তেমন একজন মানুষকে বড় দরকার—সবাই তেমন একজন মানুষের অপেক্ষা করছে—যার দিকে নির্ভর করে দু' হাত বাড়িয়ে বলা যায়, বাঁচাও—আমি শাশ্বতী—আমি পারুল—আমি ললিত—আমি বিমান—আমাকে বাঁচাও...

ললিত হাসে, কোথায় পাবে?

বিমানের চোখ চিকমিক করে, হঠাৎ বলে, যদি না-থাকে, তবে একজন কাউকে তৈরি করে নিতে হবে।

পাগল।

বিমান আস্তে আস্তে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর করুণ মুখ করে বলে, আমার একটা উপকার করবে?

কী?

পকেট থেকে অপর্ণাকে লেখা চিঠিখানা বের করে বিমান। বলে, এই ঠিকানায় মেয়েটাকে চিঠিটা পৌঁছে দেবে? ডাকে দিতে পারতাম, কিন্তু ওদের বাড়ির অভিভাবকেরা মেয়েদের নামে চিঠি এলে খুলে পড়ে, তারপর দেয়। তুমি দিয়ে আসবে ওর হাতে?

ললিত অবাক হয়, বলে, কী করে! আমি একটা অচেনা লোক, ওদের বাড়িতে—

বিমান বাধা দিয়ে বলে, না, বাড়িতে নয়। চিঠিতে একটা ফোন নম্বর দেওয়া আছে। আগে ওকে ফোন করো, কিন্তু নিজে কোরো না, পুরুষের গলা শুনলে ওরা অপর্ণাকে ডেকে দেবে না। তুমি বরং কোনও মেয়েকে দিয়ে ফোন করিয়ো। অপর্ণা ফোন হাতে নিলে তুমি কথা বলবে। বাড়ির বাইরে কোথাও একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়ো—খুব শক্ত না, তবে একটু ঝামেলার ব্যাপার। পারবে?

তুমি নিজে গেলে না কেন?

দূর! ওরা আমাকে ঢুকতেই দেবে না।

কেন?

বাঃ, আমি—আমি পাগল না!

ললিত একটু ইতস্তত করল। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। বিমান বলল, চারটের পরে যেয়ো তখন ও কলেজ থেকে ফিরবে।

চারটের একটু আগেই ললিত ঘরে তালা দিয়ে বেরোল। শম্ভুর ছোট ভাইটা একা একা সিঁড়িতে বসে সিগারেটের কুড়ানো প্যাকেট গুনছে। তাকে ডেকে বলল, মা কোন বাড়িতে গেছে জানিস?

ওই তো, হালদারদের বাড়ি।

ঘরের চাবিটা দিয়ে আসবি? বলিস, ফিরতে একটু দেরি হবে।

ঘাড় হেলিয়ে চাবিটা নিয়ে দৌড়ে গেল ছেলেটা।

ললিত খানিক দূর হাঁটল। তখনও গলা বুক ঢকঢক করছে অম্বলে। হাঁটতে গেলে পা কাঁপছে। শ্বাস ফেটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি কি পারব শেষ পর্যন্ত? ভাবল ললিত। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে সে আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত হেঁটে গেল। বেরিয়ে এসে বাইরের রোদে হাওয়ায় চমৎকার লাগছে তার। কিন্তু শরীর দিচ্ছে না।

একটু দূরে ফিল্ম-স্টুডিয়োটার সামনে একটা ট্যাক্সি খালি হচ্ছে। পকেটে হাত দিয়ে সে টাকা কয়টা গুনে দেখল। পাঁচ টাকা আর কিছু খুচরো আছে। হয়ে যাবে। তারপর দূর থেকে অসহায়ভাবে দুর্বল হাত তুলল ললিত। মনে মনে বলল, হে ভগবান, ট্যাক্সিওয়ালাটা যেন আমাকে দেখতে পায়, আর অন্য কেউ যেন ওটাকে ধরে না-ফেলে।

ট্যাক্সিওয়ালাটা দেখতে পেয়েছিল তাকে। ধীর গতিতে সামনে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সিতে উঠে নিশ্চিন্তে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে হঠাৎ তার মনে পড়ল একটু আগে ট্যাক্সিটার জন্য সে ভগবান—অর্থাৎ ভগবান নামে একটা অলীক বস্তুকে ডেকেছে। সে একটু মৃদু হাসল। ট্যাক্সিটা সে পেয়েছে, তবে এবার কি ভগবানকে বিশ্বাস করবে? করতে মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করা যায় না। বিশ্বাস করুক আর না করুক, তবু যদি ভগবানের ইচ্ছেয় সে ট্যাক্সিটা পেয়ে থাকে তবে তাকে তার একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তাই সে ফিসফিস করে বলল, ধন্যবাদ। তারপর নিজের কাছেই লজ্জা পেল।

গড়িয়াহাটার কাছে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল ললিত।

চার দিকে অনেক টেলিফোন করার জায়গা রয়েছে। কিন্তু এখন দরকার একজন মেয়েকে।

কিন্তু এখন মেয়ে কোথায় পায় ললিত! একটি বেশ ভদ্র, সভ্য, শান্ত এবং চালাক মেয়ে! ললিত আপন মনে একটু হাসল, তারপর মনে মনে বলল, মাইরি, ভগবান, একটা মেয়ে জুটিয়ে দাও দেখি, যে-মেয়ে কথা বলতে গেলেই ভ্রূ কোঁচকাবে না, তেড়ে আসবে না, বেশ দয়ালু গোছের একজন...

আশ্চর্যের বিষয়, পেট্রল পাম্পের জানালা দিয়ে টেলিফোন টেনে এনে বাইরে দাঁড়িয়ে ফোন করছে একটা মেয়ে। চোখে চশমা, হাতে বটুয়া, হলদে শাড়ি পরা, বেশ ধারালো বুদ্ধির চেহারা মেয়েটির। কথা বলতে বলতে হাসছে। মিষ্টি হাসিটি। ললিত নিঃশব্দে তার অদূরে গিয়ে বশংবদভাবে দাঁড়াল। অপেক্ষা করতে লাগল।

মেয়েটা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর এক সময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে এক পলক দেখে টেলিফোনে বলল, এই ছেড়ে দিচ্ছি, পিছনে লোক অপেক্ষা করছে... আচ্ছা!

মেয়েটি পয়সা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ললিত পথ আটকাল।

প্লিজ যদি একটু উপকার করেন।

একটুও ঘাবড়াল না মেয়েটা, নরম মুখে বলল, বলুন।

একটি মেয়েকে একটু টেলিফোনে যদি ডেকে দেন। ওর গার্জিয়ানরা—

মেয়েটি ঝিলিক দিয়ে হাসল, বলল, বুঝেছি। নাম্বারটা দিন। আর নামটা—

ললিত বলল, তারপর শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। মেয়েটা দ্রুত অভ্যস্ত হাতে ডায়াল ঘুরিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, হ্যালো—অপর্ণা আছে?...আমি মীরা ওর সঙ্গে...

মেয়েটি মাউথপিসে হঠাৎ হাত চাপা দিয়ে ললিতকে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, কলেজে পড়ে তো!

হ্যাঁ।

কোন কলেজে?

'হে ভগবান', ললিত মনে মনে দ্রুত বলল, 'কোন কলেজে?' হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল, সুবল বলেছিল লেডি ব্র্যাবোর্ন।

লে—লেডি ব্র্যাবোর্ন।

মেয়েটি মিষ্টি গলায় টেলিফোনে বলল, হ্যাঁ আমরা এক ক্লাসের মাসিমা।...কে, অপর্ণা? এই যে ভাই, কথা বলুন—আমি কিন্তু মীরা—

মিষ্টি একটু হাসল মেয়েটি। ললিত হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা নিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, ধন্যবাদ। মেয়েটি ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল।

ও-পাশ থেকে খুব সতর্ক সরু একটা মেয়ে-গলা বলল, কী রে—মীরা?

ললিতের গলা কাঁপছিল, সে ঘাবড়ে যাচ্ছিল। বলল, আমি বিমান রক্ষিতের বন্ধু—আমার নাম ললিত।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল না।

বিমান একটা চিঠি দিয়েছে আপনাকে। সেটা কোথাও এসে আপনাকে নিতে হবে।

ইস, দ্যাখ তো, কী বিচ্ছিরি সময়ে বললি, চারটে বেজে গেছে, বিকেলে আবার আমার মিউজিক ক্লাস—কোথা থেকে ফোন করাছিস!

অস্বস্তি বোধ করে ললিত বলল, গড়িয়াহাটা।

আচ্ছা, শোন মীরা, আমি যাচ্ছি তোর বাসায়, আর আধ ঘণ্টা পর, মিউজিক ক্লাসে যাওয়ার পথে।...ইস, তুই আজই লক্ষ্ণৌ যাচ্ছিস আগে বলিসনি তো! হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল?...ফোন করে ভাল করেছিস পি এস-এর নোটটা না হলে একদম প্রিপ্যারেশন হত না...

ললিত হঠাৎ বুঝতে পারলে মেয়েটা তাকে সময় দিচ্ছে। এবার তাকে একটা জায়গার নাম বলতে হবে। সে দ্রুত চিন্তা করে বলল, হিন্দুস্থান মার্টের ভিতরে যে চায়ের দোকানটা আছে— ওইখানে। সাড়ে চারটে।

ইস, তোকে কি আর চিনতে পারব, যা মুটিয়ে ফিরবি লক্ষ্ণৌ থেকে!

ললিত ইঙ্গিত বুঝল, বলল, আপনার পোশাকটা বলুন। আমিই আপনাকে চিনে নেব।

পরশুদিন যা একখানা শাড়ি কিনেছি না রে, দেড়শো টাকাও বলবি সস্তা। জামদানির ওপর পিঙ্ক বাটিকের কাজ। আজ পরে যাব, দেখিস...আচ্ছা ছাড়ছি...কেমন!

টেলিফোন রাখার পর ললিত টের পেল তার কপাল ঘামছে।

আরও আধঘণ্টা সময় আছে। কিন্তু একটু যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে ললিতের সে সাধ্য নেই। তাই সে আস্তে আস্তে হেঁটে হিন্দুস্থান মার্টের নির্জন চায়ের দোকানটায় এসে বসল। এক কাপ চা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ল একজনের একটা পাওনা সে এখনও চুকিয়ে দেয়নি। ঠিক সময়ে সে ঠিক মেয়েটিকে পেয়ে গিয়েছিল টেলিফোন করার জন্য, আর অপর্ণার কলেজের নামটাও মনে পড়েছিল ঠিক সময়ে। মৃদু একটু হাসল ললিত আপনমনে, তারপর একদম ফাঁকা রেস্টুরেন্টটায় একটু চোখ বুলিয়ে অনুচ্চ ফিসফিস স্বরে বলল, ধন্যবাদ, তুমি খুব ভাল।

উত্তেজনাটা বড় চমৎকার লাগছিল ললিতের। এখন তার ইচ্ছে করছে আরও বহুবার ওইরকম রহস্যময়ভাবে সাংকেতিক ভাষায় অচেনা মেয়েদের ফোন করে দুপুরবেলায় এ-রকম রোজ এসে বসে থাকে এ-রকম রেস্তরাঁয়, কারও জন্য অপেক্ষা করে। এ-রকম কত কিছু হতে পারত জীবনে—ঠিক যেন অলৌকিক কাণ্ড সব!

একটু অন্যমনস্ক ছিল ললিত। হঠাৎ সিগারেট ধরিয়ে মুখ তুলে দেখল চমৎকার শাড়ি পরা একটি রোগা ফরসা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মুখখানা লম্বাটে একটু কিশোরীর মতো মুখশ্রী। চোখ দু'টো বড়, কিন্তু একটু ভারী—খুব কাঁদলে যেমন চোখের চেহারা হয়। তবে এ-মেয়েটি কাঁদেনি—চোখ দু'টোই ও-রকম। মুখের হাসিটুকু দেখে মনে হয় এ খুব বেশি হাসে না কখনও। আঁচল ডান ধার দিয়ে ঘুরিয়ে এনে সমস্ত শরীরটা ঢেকেছে।

একটু হেসে বলল, আপনিই ললিত?

ললিত মাথা নেড়ে বলল, বসুন।

বসল। তারপর একটু বিব্রত হেসে বলল, টেলিফোনে আমার কথা শুনে খুব হেসেছেন, না? কী করব বলুন, আমাদের বাড়ির ওইরকম নিয়ম।...কই, চিঠিটা দেখি।

দেড়-দুই লাইনের চিঠি, তবু বুকের কাছে তুলে নিয়ে ললিতের চোখের আড়াল করে গভীরভাবে পড়ল অপর্ণা। মুখখানা হঠাৎ বড় ম্লান হয়ে গেল। চিঠিটা ধরে রইল একটুক্ষণ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি ওর কীরকম বন্ধু—পুরনো?

যদিও মিথ্যে কথা, তবু ললিত বলল, অনেক দিনের সেই কলেজ-লাইফ থেকে। মাঝখানে দেখাশোনা ছিল না, এখন কাছাকাছি বাসা।

ওঃ। ওকে কেমন দেখলেন?

খুব শকড।

কেন? মেয়েটা হঠাৎ ঝুঁকে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল।

বলা উচিত হবে না, তাই গতকালের ঘটনা কিছু বলল না ললিত, শুধু বলল, ও অল্পেই উত্তেজিত হয়।

মেয়েটা একটু চুপচাপ থেকে হঠাৎ বলল, কিছুদিন আগে কে যেন টেলিফোন করে বাবাকে ওর নামে যা-তা কথা বলেছে। বলেছে ও নাকি আমাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, কে বলুন তো!

ললিত সামান্য শিউরে ওঠে মনে মনে। সুবলের কালো চকচকে মুখখানা মনে পড়ে, সে মাথা নেড়ে বলল, কী জানি!

হঠাৎ অপর্ণার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। স্খলিত গলায় বলল, ওকে যন্ত্রণা দিয়ে কার কী লাভ! আমার বাবা ইচ্ছে করলে ওর চাকরি খেয়ে ফেলতে পারেন, নানা রকম ট্রাবল দিতে পারেন—কাজেই বাবাকে যে জানিয়েছে তার কী লাভ? আমি ওকে এইটুকু বেলা থেকে জানি, ওর মতো ভাল হয় না।

একটু চা বলে দিই!

না। অপর্ণা মাথা নাড়ল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি বাবার একমাত্র সন্তান। বাবার সব সম্পত্তি আমার। কিন্তু তাতে কারও কোনও লাভ নেই, আমি ওকেই ভালবাসি। আর কাউকে কখনও—

ললিত হঠাৎ বলল, এ-সব কথা কেন বলছেন?

মেয়েটা চোখ নামিয়ে নেয়, টেবিলের নুনের কৌটোটা একটু নাড়াচাড়া করে, বলে, কী জানি! আমার কেবলই মনে হয় আমাদের যেন একটা বিপদ আসছে—

## ॥ বাইশ ॥

ললিত একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কীসেব বিপদ?

অপর্ণা প্রথমে উত্তর দিল না। নতমুখে টেবিলের কাছে তার সাদা প্রায় রক্তশূন্য একটি আঙুল দিয়ে কয়েকটা গোল চিহ্ন আঁকল। তাবপর তার বয়সের তুলনায় ভারিক্কি বিষণ্ণ মুখখানা তুলে বলল, কয়েক দিন ধরে দেখছি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে একটা কালোমতো ছেলে ঘুরে বেড়ায়। যেতে যেতে আমাদের বাড়ির ব্যালকনি কিংবা খোলা জানালার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। আমি যখন কলেজে যাই তখন দেখি সে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কয়েক দিন তাকে কলেজের গেটের সামনেও দেখেছি।

চা খাওয়ার পর ললিতের অম্বলের ভাব বেড়ে যাচ্ছিল। ব্যথা করছিল বুক আর পিঠ। কেমন একটা ঘুম-ঘুম ভাব, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

অপর্ণার কথা শুনে সে একটু হাসল, বলল, তাতে কী? ও-রকম কত ছেলে পিছু নেয় মেয়েদের, তারপর বোধবুদ্ধি হলে আবার সরেও যায়। ওকে বেশি পাত্তা দেবেন না।

এ-কথা যখন বলছিল ললিত তখন তার অমোঘভাবে মিতুর কথা মনে পড়ছিল। মিতুও হয়তো নিজের বাবা মার কাছে বলত যে একটা ফরসামতো রোগা ছেলে যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে থাকে, কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো চেয়ে থাকে তাদের বাড়ির দিকে।

মেয়েটি ললিতের উপদেশ শুনল কি না বলা যায় না, বলল, পিছু-নেওয়া ছেলে আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এ-ছেলেটা ভীষণভাবে আমাব কাছে আসার চেষ্টা করছে। একদিন দেখি আমাদের দারোয়ানের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে সিগারেট ধরাল, আব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী একটু কথাও বলে গেল। পরে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ছেলেটা নাকি তার কাছ থেকে কয়েকটা ফুলের চারা চেয়েছিল। আমি দারোয়ানকে বারণ করে দিয়েছি ওব সঙ্গে কথা বলতে।

ললিত সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, তাতে কী? ওতে ভয় পাবেন না।

মেয়েটির মুখে-চোখে একটু রক্তাভা দেখা যায়; নিশ্বাস চেপে খুব আস্তে আস্তে বলল, ছেলেটি আমাকে লক্ষ্য করে আমাদের মোটরগাড়ির মধ্যে একটা কাগজের দলা ছুড়ে দেয়। খুলে দেখি চিঠি। ভুল বানানে লেখা অজস্র আজেবাজে কথা। আমি কাউকে বলিনি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস এই ছেলেটাই টেলিফোন করেছিল আমার বাবাকে। আমার কেমন যেন ভয় করে। এমন অবস্থা যে বাড়ি থেকে একা বেরোতে পারি না, ছেলেটা ভীষণ ডেসপারেট—কী জানি কী করে বসে! টেলিফোনে বাবাকে বলেছিল যে ওর বাসার কাছেই নাকি থাকে, একই পাড়ায়। সেটা জানার পর থেকে আমি আর ওর কাছেও যাই না।

পেটের মধ্যে কলকল শব্দ হচ্ছে। ছুঁচের মুখের মতো গলার কাছে খোঁচা দিচ্ছে অম্বল। হঠাৎ পেটের মধ্যে শব্দটা এত জোরে হল যে ললিতের ভয় হচ্ছিল মেয়েটা শুনতে পাচ্ছে।

ললিত উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, আমিও ওই পাড়ায় থাকি। যদি একা যেতে ভয় করে তবে আমার সঙ্গে চলুন, কোনও ভয় নেই। আপনি গেলে বিমান খুশি হবে।

মেয়েটা ম্লান হেসে বলল, কিন্তু ও যে বারণ করেছে।

ললিত বলল, কিন্তু একটু আগেই ও আমার কাছে এসেছিল। তখন দেখেছি ও নর্মাল। কথাবার্তা ভালই বলছিল। এখনও ভয়ের কিছু নেই।

মেয়েটি একটু চিন্তা করে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন।

অপর্ণাই তার অভিজাত ভঙ্গিতে কেবলমাত্র একটি তর্জনীর সংকেতে খালি ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল।

দু'জন দু' কোণে বসল। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। অপর্ণা বাইরের দিকে তাকিয়ে। আর ললিত তার বুক আর পেটের অস্বস্তিটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একটু গা এলিয়ে সিটের পিছনে মাথা রেখে। বমিটা হয়তো হবে। এক গ্লাস জলের পর এক কাপ চা খেয়েছে ললিত। খাওয়াটা ঠিক হয়নি।

অপর্ণা মুখ ফিরিয়ে ললিতকে দেখে বলল, আপনার কি শরীর খারাপ?

না।

একটু অন্যমনে চুপ করে থেকে অপর্ণা বলল, এখন আমাদের সময় ভাল যাচ্ছে না। কিছু দিন আগেই বাবার কারখানার কর্মচারীরা বাড়ির সামনে এসে জমায়েত হয়েছিল একদিন, বোনাস আর কাজের সিকিউরিটির জন্য। ইউনিয়নের লিডার এক ছোকরা এল বাবার সঙ্গে কথা বলতে। সে আমাদের বৈঠকখানায় বসে বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর সামনেই সিগারেট খাচ্ছিল। ফলে বাবা সেদিন ভীষণ রেগে যায়, আর নার্ভাস হয়ে পড়ে। সেই ঘটনার পরেই বিকেলের দিকে বাবার ব্লাড-প্রেশার অসম্ভব বেড়ে যায়। রাত্রে একটা স্ট্রোকের মতো হয়—

ললিত বলে, সে কী! ছেলেটা সিগারেট খেয়েছিল বলে?

অপর্ণা মৃদু একটু হাসল, উনি পুরনো আমলের লোক। কর্মচারীরা সামনে সিগারেট খাবে এটা উনি বরদাস্ত করতে পারেননি।

ললিতের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু সে বলল, কিন্তু এ-রকম হওয়াই তো স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল পেটমোটা, অসৎ, অতিরিক্ত মুনাফাখোর মালিকদের সম্মান করতে করতে ওরা এই ম্যানারিজমকে আর বিশ্বাস করছে না—

এই অপ্রিয় কথাগুলো একজন মালিকের মেয়েকে তার বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কথাগুলো এমনিতেই বেরিয়ে এল। তাই একটু লজ্জা করছিল ললিতের।

অপর্ণা বাইরের দিকেই চেয়ে ছিল। ট্যাক্সিটা একটা ডবলডেকারের পিছু পিছু আস্তে আস্তে যাচ্ছে। অপর্ণা মুখ না-ঘুরিয়েই বলল, ইউনিয়নের ওই ছেলেটা আমাদের এক জ্ঞাতির ছেলে। যখন সে চাকরি চাইতে এসেছিল তখন বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস সে সিগারেট খাওয়ার দরকার বলেই সিগারেট খায়নি, সে খেয়েছিল ইচ্ছে করে, বাবাকে চটিয়ে দেওয়ার জন্যই—

ললিত একটু উত্তেজনা বোধ করে বলে, কিন্তু আমি কাগজে ছবি দেখেছি কুড়ি-একুশ বছরের বাচ্চা নিগ্রো ছেলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাদের দাবিদাওয়ার কথা বলছে—তার হাতে সিগারেট, সামনে মদের গ্লাস—খুব ইজি ভঙ্গি—

অপর্ণা হাসল, বলল, আমি ও-সব জানি না। আমি ছেলেবেলায় আমাদের কারখানার কর্মচারীদের কাকা কিংবা দাদা বলে ডেকেছি, তারাও বাবাকে কখনও জ্যাঠামশাই কখনও অন্য কোনও আত্মীয়তার সম্পর্কে ডেকেছে। আমাদের মধ্যে খুব একটা দূরত্ব ছিল না। কিন্তু ওই ছেলেটা বাবার সামনে সিগারেট খেয়ে সেই দূরত্ব তৈরি করে দিল—

ললিত ভিতরে উত্তেজিত হয়েছিল, সেই উত্তেজনা তার গলার স্বরকে অজান্তে তীব্র করে দিল। বলল, দূরত্ব ছিলই। হয়তো বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। দু'টো শ্রেণী, তাদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ— কী করে তারা পরস্পরের কাছের লোক হয়?

অপর্ণা এ-কথার উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বিষণ্ণ মুখখানা ফিরিয়ে বলল, হলে ভাল হত।

ললিত হাসতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে তার পেটের ভিতর থেকে একটা 'ওয়াক' উঠে আসছিল। সে তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

অপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়। বড় সুন্দর দেখায় তাকে। বলে, আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?

ললিত বলল, না, না। আপনি কথা বলুন।

অপর্ণা বলল, বাবাকে নিয়েই আমার ভয়। এখন বেশি উত্তেজনা তাঁর পক্ষে ভাল না। গতকাল রাত থেকে তাঁর কর্মচারীরা হাওড়ার কারখানায় তাঁকে আটকে রেখেছে। এখন পর্যন্ত তাঁর কোনও খবর আমরা পাইনি।

ললিত জিজ্ঞেস করল, কেন আটকে রেখেছে?

অপর্ণা মৃদু হাসিমুখে বলে, তিনি প্রায় নব্বইজনকে ছাঁটাই করেছেন।

ললিত একটু চমকে ওঠে, নব্বইজনকে! এই অভাব-কষ্টের দিনে!

অপর্ণা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। বাবা নব্বইজনকে ছাঁটাই করতে চান না। ওই যে ইউনিয়নের ছেলেটা আর ও-রকম আরও জনাচারেক—এই মোট পাঁচ জনকেই বাবা তাড়াতে চাইছেন। কিন্তু সরাসরি ওই পাঁচ জনকে সরানো খুব মুশকিল। তাই নব্বই জনকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছেন তিনি। এখন আন্দোলন হবে, তর্কাতর্কি হবে, স্ট্রাইক চলবে। আর বাবা আস্তে আস্তে তাদের দাবির কাছে হার স্বীকার করতে থাকবেন। নব্বই জনের জায়গায় আশি জন, তারপর সত্তর জন—এভাবে সংখ্যা কমাতে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত পঁচাশি জনকেই আবার কারখানায় ফেরত নেবেন, তারপর বলবেন তোমাদের দাবিদাওয়া প্রায় সবই মেনে নিলাম, কেবল ওই শেষ পাঁচ জনকে বাদ দাও। ওদের নিতে পারব না। তখন ইউনিয়ন দেখবে যে তারা মালিকের কাছ থেকে প্রায় সবটাই আদায় করে নিতে পেরেছে—তাদেরই জয় হয়েছে—আর স্ট্রাইক চালিয়ে যাওয়ার মানে হয় না—ছেলেপুলে পুজোর আগে না খেয়ে আছে, নতুন জামা-কাপড় কিনতে পারছে না—কাজেই তারা মিটমাট করে নেবে। কিন্তু বাবা ঠিক যে-পাঁচজনকে ছাঁটাই করতে চেয়েছিলেন, তাদেরই ছাঁটাই করবেন, কর্মচারীরা সেই ব্যাপারটা বুঝতেই পারবে না। তারা বৃহত্তর স্বার্থে নব্বইজনের জায়গায় পাঁচজনের ছাঁটাই মেনে নেবে।

ললিত একটু ছটফট করছিল ভিতরে ভিতরে। বলল, এটা তো শত্রুতা।

অপর্ণা হাসল, হ্যাঁ, ভীষণ শত্রুতা। আমাদের মধ্যে আর একটুও আত্মীয়তার ভাব নেই। কিন্তু আপনাকে এত কথা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

ললিত মুখ ফিরিয়ে নিল।

অপর্ণা মৃদু গলায় বলল, তবু বলছি, কারণ আমার মন একদম ভাল নেই। বাবার হাই ব্লাডপ্রেশার, তার ওপর এইসব উত্তেজনা। এখন যদি তাঁর একটা কিছু হয়ে যায়, আমি সেই কথাই ভাবছি—

ললিত চাপা গলায় বলল, তখন আপনি মালিক হবেন!

অপর্ণা শান্ত গলায় বলল, ঠিক। কিন্তু তখন আমি আর মা কী ভীষণ একা হয়ে যাব! তখন ওই সব কর্মচারীরা যদি আমাদের ঘেরাও করে রাখে! যদি বাসায় এসে হামলা করে! মা গো, সে-কথা ভাবতেই বুকের ভিতরটা শুকিয়ে যায়।

অপর্ণা আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় একটুক্ষণের জন্য। তারপর খুব সংকোচে লাজুক গলায় বলে, তাই বাবা প্রাণপণে আমার বিয়ের জন্য চেষ্টা করছেন। বুঝতেই তো পারছেন কেমন পাত্র খুঁজছেন আমার বাবা! ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট— বংশপরম্পরায় যাদের মালিক হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে— এমন পাত্র। সে-ছেলে চরিত্রহীন বা মাতাল হলেও কিছু যায় আসে না, বাবা ও-সব বাছবিচার করবেন না। আর দু'-তিন মাসের মধ্যেই আমার বিয়ের ডেট ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি ও-রকম ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তা হলে কোনও দিনই আর কর্মচারীর সঙ্গে আমাদের শত্রুতা মিটবে না।

ললিত বলল, আপনি কী চান?

অপর্ণা একটুও না-ভেবে বলল, আমি চাই আমাদের মালিক আর শ্রমিকদের মধ্যে একই স্বার্থ কাজ করুক। পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া আর ভালবাসা থাক।

ললিত প্রাণপণে তার বমির ভাবটা আটকে রাখার চেষ্টা করছিল। সেই চেষ্টায় তার চোখে জল এসে গেল। সে একটু হাঁফাতে লাগল।

অপর্ণা জিজ্ঞেস করল, আপনার কী হয়েছে?

ললিতের ইচ্ছে হল অপর্ণার আগের কথাটার উত্তর দিয়ে বলে, এই দেখুন, এতকাল একসঙ্গে বাস করেও আমার শরীরটার সঙ্গে বোঝাপড়া বা ভালবাসা হয়নি, এ কেবল আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য জন্মেছে। এর সঙ্গেও আমার স্বার্থের মিল নেই।

কিন্তু সে-কথা না বলে ললিত বলল, শরীরটা ভাল নেই। কিন্তু আপনি কিছু ভাববেন না, ও ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি শ্রমিক-মালিকের এক স্বার্থের কথা কী যেন বলছিলেন! কী যেন, বোঝাপড়া আর ভালবাসার কথা!

অপর্ণা লাজুক মুখে মাথা নামিয়ে বলল, ওটা আমার একটা এমনিই খেয়াল। আসলে বোধ হয় আমাদের সঙ্গে কর্মচারীদের শত্রুতা কোনও দিন মিটবে না। কিন্তু ওদের শত্রু ভাবতে আমার ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে ওদের সব দাবিদাওয়া মিটিয়ে দিই। কিন্তু ভেবে দেখেছি, শত্রুতাটা এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, দাবি মিটিয়ে দিলেও ওরা খুশি হবে না। ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠবে— কেন একজন লোক আমাদের মালিক হয়ে আছে! কেন তাকে আমরা সম্মান করব? কেন তার সামনে আমরা সিগারেট খাব না? একজন মানুষ এখন আর কিছুতেই অন্য একজন মানুষের অধীন হতে চায় না। কেননা মানুষ তারই অধীন হতে পারে যাকে সে ভালবাসে।

ললিত একটু অবাক হয়েছিল অপর্ণার কথা শুনে। একটি অল্পবয়সি মেয়ের কাছে সে এ-রকম কথা আশাই করেনি। কে জানে, এ-সব কথা হয়তো ওকে বিমান শিখিয়েছে, এ-কথা হয়তো ওর নয়। সে মৃদু গলায় বলল, ব্যক্তিগত মালিকানার ওটাই তো দোষ। মালিকানা যদি রাষ্ট্রের হাতে যায়—যে-রাষ্ট্র সকলের স্বার্থে কাজ করে—তবে সেই রাষ্ট্রে এ-ব্যাপার হবে না।

অপর্ণা হাসল, আপনি কি কমিউনিস্ট?

ললিত উত্তর দিল না।

অপর্ণা মৃদু গলায় বলল, কমিউনিস্ট কি না এই প্রশ্ন করলে আজকাল অনেকেই চুপ করে থাকে। কিন্তু আমি জানি আপনি কমিউনিস্ট।

ললিত হাসল, কী করে জানলেন?

অপর্ণা বলল, অবশ্য আমার ভুল হতে পারে। তবু মনে হয় অনেক দিন আগে আপনার বন্ধু বিমানের কাছে আপনাদের কয়েকজনের কথা শুনতাম।

ললিত অবিশ্বাসের সুরে বলল, তাই নাকি?

অপর্ণা মৃদু হাসল, এক সময়ে ও আমাকে পড়াত। তখন ও কলেজের ছাত্র। খুব ভাল ছাত্র ছিল, কিন্তু কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারত না। বাবা ওকে অনেক বলে কয়ে আমাকে পড়াতে রাজি করিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম ও পড়াত না, চুপচাপ বসে থেকে বইপত্র নাড়াচাড়া করে উঠে যেত। কিন্তু আমি তখন বাচ্চা মেয়ে, ফ্রক পরি কাজেই বোধ হয় আমাকে ও বেশি দিন লজ্জা করল না। আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু পড়ার কথা নয়। তখন ও মাঝে মাঝে ললিত নামে একজনের কথা বলত— সেই ললিত ছিল কমিউনিস্ট ইউনিয়নের নেতা— খুব চালাকচতুর চৌকস ছেলে। তাই যখন টেলিফোনে আপনি নাম বললেন, তখনই আমার সেই ললিতের কথা মনে পড়েছিল. তা ছাড়া আপনিও তো ওর কলেজের বন্ধু— কাজেই মনে হচ্ছে আপনি সেই ললিত। না?

ললিত একটা অদ্ভুত শিহরিত আনন্দ বোধ করল। আশ্চর্য, কত দূরে কোথায় চলে গেছে তার পরিচয়। এই মেয়েটাও মনে রেখেছে তাকে! ললিতের বড় জানতে ইচ্ছে করে আরও কত দূরে। আরও কোথায় কোথায় লোকে তাকে মনে রেখেছে!

অপর্ণা ঘাড় হেলিয়ে তাকে একটু দেখল। তারপর রহস্যময় একটু হেসে বলল, আপনার বন্ধু একসময়ে আপনার খুব প্রভাবে পড়েছিল। প্রায়ই ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দিয়ে রাষ্ট্রগত মালিকানার কথা বলত। আমাকে বলত, তোমাদের কারখানার সব ক্যাপিটাল শেয়ারে ভাগ করে শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। নইলে একদিন শ্রমিকদের রাষ্ট্রে তোমাদের বিচার হবে...এইসব কথা। আমি তখন ছোট মেয়ে, ওর কথা শুনে হাঁ করে চেয়ে থাকতাম, কখনও হাসতাম। কিন্তু মনে মনে ওর সব কথাই আমার সত্য বলে মনে হত—

কেন? ললিত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

অপর্ণা সামান্য একটু রাঙা হয়ে বলে, খুব ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে এক বার আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। ওরা আমাদের জ্ঞাতি, দেশে আমাদের বাড়ি ছিল ওদের বাড়ির পাশে। এ-সব ক্ষেত্রে অনেক সময়ে যেমন হয়— বাবা-মায়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করে রাখেন— আবার বড় হলে ভুলে যান— অনেকটা তেমনি। কাজেই ও যখন পড়াতে এল তখন আমি জানতাম যে এই লোকটাই একদিন আমার যথাসর্বস্ব—

বলেই চুপ করে গেল অপর্ণা।

ললিত হাসি চেপে বলল, বলুন।

অপর্ণা একটু ঘোর লাগা চোখে চেয়ে থেকে বলল, তাই ওর সব কথা আমি মনের মধ্যে গেঁথে নিতাম। কিচ্ছু ভুলতাম না। দেখুন না, আপনার নাম আমি আজও মনে রেখেছি।

ঠিক। ললিত ঘাড় নাড়ল।

অপর্ণা মৃদু হাসি হেসে বলল, আপনাকে দেখে ও একেবারে কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে আবার বাবার নিন্দে করত। বলত, আমাদের রক্তের মধ্যে বিষ থেকে যাবে এই মালিক স্বার্থের। তাই একদিন নাকি আমাদের মেরে ফেলা হবে!

শুনে আপনি রাগ করতেন না?

অপর্ণা মাথা নাড়ল, না। বরং ভয় হত খুব। ভাবতাম ও যা বলছে ঠিকই বলছে। আমার ইচ্ছে হত বাড়ি ছেড়ে, মা-বাবা ছেড়ে ওর কাছে চলে যাই। ও যেন আমাকে বাঁচায়। কিন্তু ওর এই মনোভাব বেশিদিন রইল না।

টালিগঞ্জ রেলব্রিজ পার হয়ে ট্যাক্সিওয়ালা মুখ ফেরাল, কোন দিকে যাবেন?

ললিত বলল, আর-একটু ভাই, তারপর আনোয়ার শা রোড—

অপর্ণার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তারপর?

অপর্ণা বলল, ও তখন আর-একজন বন্ধুর প্রভাবে পড়েছে। সেই বন্ধুটি ছিল জমিদার—পূর্ববাংলা কোথাকার যেন—পার্টিশানের পর সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে—তার নামটা কী যেন—

ললিত সাগ্রহে বলল, রমেন? রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী?

ঠিক। অপর্ণা উজ্জ্বল মুখে বলল, রমেন। সেই বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর একদিন আমাকে এসে বলল, দেখো, আমার এই বন্ধুটি বড় অদ্ভুত। কলকাতায় ওর যে-সব প্রজা-টজা আছে তারা এখনও ওকে খুব সম্মান করে, ওর বাসায় যায়, ওর খোঁজখবর নেয় ঠিক যেন আত্মীয়ের মতো। রাস্তায়-ঘাটে দেখা হলে প্রণাম বা নমস্কার করে, ট্রামে-বাসে সিট ছেড়ে দেয়। অথচ ওরা পুরুষানুক্রমে প্রজাদের শোষণ করে আসছে। আমি জিজ্ঞেস করতাম, তাতে কী হল? ও উত্তরে বলত, হয় ওর প্রজাগুলো দীর্ঘকাল ওদের সম্মান করতে করতে নিজেদের একেবারে দাস বানিয়ে ফেলেছে, নয়তো ওরা সত্যিই ওকে ভালবাসে। তারপর এসে বলল, না, ওর প্রজারা ওর সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহার করে। ওটা ঠিক ম্যানার্স নয়। মোটর অ্যাকসিডেন্ট করে ও বুকের একটা হাড় ভেঙেছে, সেই শুনে ওর এক প্রজা মা কালীর কাছে কালো পাঁটা মানত করেছে। কোন স্বার্থে সেটা সে করবে? এখন তো আর ওর জমিদারি নেই যে সেই প্রজার একটু সুবিধে করে দেবে! ওরা সত্যিই ভালবাসে ওকে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কী করে দু'টো শ্রেণী তাদের স্বার্থ ভুলে—এবং সমাজ-বিপ্লব ছাড়াই একে অন্যকে ভালবাসছে!

ললিত সামান্য গম্ভীরমুখে বলল, ওটা হয়তো একটা একসেপশন। হয়তো রমেনরা বেশি চালাক ছিল, প্রজাদের প্রিয় হয়ে তাদের আরও বেশি এক্সপ্লয়েট করার চেষ্টা করেছিল।

অপর্ণা মাথা নেড়ে বলল, সে যাই হোক। ও কিন্তু আপনার প্রভাব কাটিয়ে উঠল। আমাকে বোঝাত—ব্যক্তিগত মালিকানা জিনিসটা খারাপ নয়। যদি এ-রকমভাবে দু'টো শ্রেণী একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে, যদি তারা পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়—আর যদি ভালবাসে, ভালবাসা পায়—তা হলে জমিদার আর তার প্রজা চমৎকার কমিউন গড়ে তুলতে পারে। আমি তখন ওর কাছ থেকেই কথা বলতে শিখেছি। বললাম, আর রাষ্ট্রের মালিকানার কী হবে! ও ঠোঁট উলটে বলল, দূর, রাষ্ট্র তো একটা যন্ত্র। যন্ত্র কি কখনও ভালবাসতে পারে! মানুষ ভাতকাপড়ের চেয়েও মানুষের ভালবাসা বেশি চায়। রমেন আর তার প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এখনও ওর

প্রজাদের কেউ কেউ ছোট কর্তাকে না বলে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে না। জমি কিনবার সময়ে, চাষবাসের ব্যাপারে, রোগ-বালাইতে আগে আসে রমেনের কাছে তারপর উকিল ডাক্তার বা সরকারি লোকের কাছে যায়। রাষ্ট্র কি এতটা ভালবাসতে পারে! জমিদারের জায়গায় একদিন আসবে কমিউন বা ব্লকের অফিসার, কারখানায় আসবে সরকারি ডিরেক্টর—তাতে কি শ্রমিক বা প্রজারা খুশি হবে! তখনও তাদের একজন লোক চাই শোকে দুঃখে বিপদ বালাইয়ে কিংবা কেবল মন খারাপ হলেই যার কাছে ছুটে যাওয়া যায়, যাকে দেখলে বা যার কথা শুনলে বুক জুড়িয়ে যায় এমন কেউ একজন ভালবাসার লোক। রমেনরাও কি প্রজাদের কাছে তাই ছিল!

শুনে ললিত খুশি হল না, আস্তে করে বলল, কিন্তু অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য থেকে গেলে শেষ পর্যন্ত এ ভালবাসা কি টেকে? কে গ্যারান্টি দিতে পারে যে রমেনের ছেলে রমেনের মতো হবে! তা ছাড়া মালিক-শ্রমিক সম্পর্কটাই তো ভয়াবহ— একে অন্যকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।

অপর্ণা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, সেই জন্যই আমি এমন একটা স্বার্থ খুঁজছিলাম যাতে আমি আর আমার কর্মচারীরা সেই রমেনের মতো একে অন্যের প্রয়োজন হয়ে উঠি। আমি জোর করে মালিক হব না, কিন্তু ওরা আমাকে ওদের প্রয়োজনে ভালবেসে মালিক করে রাখবে—আমি ওদের সে-রকম স্বার্থ হয়ে উঠতে পারি কি না—এ-রকম একটা খ্যাপাটে ইচ্ছে আমার মাঝে মাঝে হয়!

ললিত হাসতে থাকে। বুক থেকে বমির ভাবটা সরে যাচ্ছে এখন। সে বলে, আপনার খুব মালিক হবার ইচ্ছে!

অপর্ণা ম্লান হাসে, না। আমার কেবল ওইটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে যে, দু'টো শ্রেণীকে তুলে না দিয়ে একে অন্যের স্বার্থ হওয়া যায় কি না! আসলে আমার এখন ওই রমেনের মতো একজন হতে ইচ্ছে করে।

অম্বলে ললিতের বুক জ্বলে যায়। সিগারেটে ডুবে থাকে সে। ট্যাক্সিটা ধীরে ধীরে আনোয়ার শা রোডে ঘুরে ঢুকে যাচ্ছে।

ললিত ধীরে ধীরে বলল, ওটা বোধ হয় আপনার দুর্বলতা। আপনি চাইছেন মালিকানা চলে গেলেও যেন আর-এক ধরনের মালিকানা এসে যায় হাতে। একটা শেষ সম্বল রেখে দিতে চান—তাই না?

অপর্ণা একটু উদভ্রান্তের মতো চেয়ে থেকে বলে, রমেনও কি তাই চেয়েছিল?

ললিত ঘাড় নাড়ে, বোধ হয় রমেনের ব্যাপারটাও তাই। ওর মধ্যে বংশানুক্রমিক একটা জমিদারির ভাব থেকে গেছে। ওটা হেরিডিটারি, এড়ানো যায় না। জমিদারি কিংবা মালিকানা চলে গেলে মানুষ তখন নেতা হবার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের অনেক নেতাই এসেছেন অভিজাত সমাজ থেকে। মানুষ তাদের ত্যাগের মহিমা কীর্তন করেছে, কিন্তু কখনও ভেবে দেখেনি তারা সেই বংশানুক্রমিক আভিজাত্যের কাছেই নতুন রকমে মাথা বিকিয়ে দিল।

অপর্ণা অবাক হয়ে বলে, তা কেন? যে ভাল তাকে ভালবাসতে দোষ কী?

ললিত অধৈর্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, তা হবে না। এমন সমাজ হয়তো তৈরি হবে যখন মানুষ মালিক বা জমিদারের এই ভালবাসাকে ঠিক বিশ্বাস করবে না। তাদের কাছ থেকে একটুও সম্মান পাবেন না আপনি। তখন যে-কেউ সিগারেট খাবে আপনার সামনে, ইচ্ছে হলে সেই ছোকরা আপনার কাছে—

বলেই থেমে গেল ললিত। সে বলতে যাচ্ছিল 'আপনার কাছে প্রেম নিবেদন করবে। নির্ভয়ে।' কিন্তু সে-কথাটা বড় নিষ্ঠুর। বলার নয়।

অপর্ণার মুখ এখন নানা রঙে রঙিন। মুখের রেখা কেমন পালটে যাচ্ছে। হঠাৎ সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, আমি সব ছেড়ে দিতেই তো চাই। আমার এ-সব একটুও ভাল লাগে না। এই কারখানা, স্ট্রাইক, কর্মচারীদের সঙ্গে শত্রুতা—এ-সব মনে হলেই আমার বুক কাঁপে। ইচ্ছে করে চলে যাই কোথাও।

ললিত শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

অপর্ণা আস্তে করে বলে, সেই ছেলেবেলায় যেমন ওর কথায় ভয় পেয়ে ইচ্ছে হত ওর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, ঠিক তেমনিই একটা ইচ্ছে হয় আমার। ও আমাকে এই সব গোলমাল থেকে টেনে নিয়ে যাক। কিন্তু ও কেন পাগল হয়ে যাচ্ছে—ও কেন—বলতে বলতে ঠোঁট কেঁপে গেল অপর্ণার।

ব্যথিত মনে ললিত চুপ করে থাকে। সে নিজে যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠুর। না বললেও হত।

কিন্তু এ-কথাটা সে কিছুতেই মনে মনে সহ্য করতে পারছিল না যে এই মেয়েটার রমেনের মতো হতে ইচ্ছে করে। কেন, রমেনের মতো কেন? এ-মেয়েটা তো রমেনকে চেনেও না।

হঠাৎ খুব হীনের মতো একটা কাজ করল ললিত—যার জন্য পরে সে অনুতাপ করেছিল। সে হঠাৎ অপর্ণাকে বলল, রমেন তার প্রজাদের কাছে হয়তো দেবতা ছিল। কিন্তু নিজের স্ত্রীর কাছে? আপনি কি জানেন যে ওর বউ পালিয়েছিল বলে ও হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে?

ভীষণ অবাক হল অপর্ণা, বলল, নিশ্চয়ই বাজে মেয়ে! নইলে ও-রকম লোকের কাছ থেকে পালায়!

ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল সেই বট গাছটার তলায় যার চার দিকে বাঁধানো বেদি— যেখানে বিমান কাল ছেলেদের পাল্লায় পড়েছিল। ট্যাক্সি এই পর্যন্ত আসে, এরপর হেঁটে যেতে হয়। ললিত ভাড়া দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিয়েছিল, অপর্ণা ভীষণ রাঙা হয়ে বলল, না, না, ট্যাক্সিটা আমিই ডেকেছিলাম... খুব লজ্জা আর সংকোচের সঙ্গে বাধা দিয়ে অপরাধীর মতো নিজেই ভাড়াটা দিয়ে দিল।

করুণা! ললিত মনে মনে হাসল।

বিমান শুয়ে ছিল। ললিতকে দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, চিঠিটা দিয়েছ?

ললিত দরজায় দাঁড়িয়ে, পিছনে অপর্ণা। হেসে বলল, দিয়েছি। আর উত্তরটাও নিয়ে এসেছি।

কই? বলে হাত বাড়াল বিমান।

ললিত সরে গেল, তারপর জোরে হেসে উঠল।

কিন্তু ললিত বুঝতে পারল হাসিটা ওদের স্পর্শও করেনি। ধীর পায়ে অপর্ণা ঘরে এসে দাঁড়াতেই বিমানের সঙ্গে অপর্ণার চোখ পরস্পর গেঁথে গেল। নিস্পন্দ হয়ে রইল দু'জনে। কিন্তু সেই নিথরতার মধ্যেও তাদের মুখে যেন কয়েকটা রূঢ় কর্কশ রেখা কোমলতায় বেঁকে গেল। ইঙ্গিতময় ভাববাহী হয়ে গেল ঘরের বাতাস। ললিত বুঝল ওরা কথা না-বলে, চেষ্টাহীনভাবে পরস্পরকে গভীর ভালবাসা জানাতে পারে।

কষ্ট হল ললিতের। বিমানটা পাগল। আর এ একজন কারখানা-মালিকের মেয়ে। কিন্তু মনে হয়, ওরা দু'জনেই ভিখিরি—অকিঞ্চন--ওদের দু'জনের ওরা দু'জন ছাড়া আর কিছু নেই। দু'টোই পাগল।

তার ইচ্ছে হল অপর্ণাকে ডেকে বলে, যদি কোনও দিন ভবিষ্যতের সমাজ মালিক পক্ষকে অবলুপ্ত করতে চায়, সেদিন আপনাকে ক্ষমা করা হবে, কেননা আপনি এই পাগলকে ভালবেসেছিলেন।

ললিত দু'জনকে ওই অবস্থায় রেখে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিল সাবধানে।

## ॥ তেইশ ॥

সেদিনের পর শাশ্বতী বেশ কয়েক দিন কলেজে গেল না। সে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজ করল, কোমরে আঁচল বেঁধে বাবার জমি কোপাল, বাচ্চুর সঙ্গে ইচ্ছে করে করল ঝগড়া। প্রতি মুহূর্তেই তার ভয় হচ্ছিল, যে-কোনও দিন আদিত্য এসে হাজির হবে।

কিন্তু আদিত্য এল না। তিন দিন পর একদিন সন্ধেবেলা কালীনাথ অফিস থেকে ফিরে তাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, আদিত্যর সঙ্গে তোর দেখা হয়?

না।

কী হল, ক'দিন আফিসে আসছে না!

খবরটা শুনে বুকটা একটু ধক করল শাশ্বতীর। কী জানি, যদি সুইসাইড বা ও-রকম কোনও পাগলামি করে থাকে আদিত্য! ও কি অতখানি ভালবেসেছিল শাশ্বতীকে! কে জানে! যদি ও-রকম কিছু করে থাকে তবে চেনা লোকেরা এখন শাশ্বতীকে দেখিয়ে বলবে, এই বাজে মেয়েটাই যত নষ্টের

গোড়া। শাশ্বতী তাই সারাক্ষণ মনে মনে বলে, আমি খুব সাধারণ বোকা মেয়ে একটি। আমার জন্য কেউ যেন আত্মহত্যা না করে, কেউ যেন বিবাগী না হয়— হে ভগবান!

কলেজে যাচ্ছে না বলে কেউ কোনও প্রশ্ন করে না। তাদের বাড়ি থেকে শাসন উঠে গেছে, কমে গেছে কৌতূহল। এখন যে যা খুশি করে, অন্যেরা দেখে নিস্পৃহভাবে। কেবল মাঝে মাঝে হৈমন্তী তাকে খোঁচায়, কী রে, ঝগড়া-টগড়া করেছিস নাকি!

না।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস করে, তোদের তো দেখা হচ্ছে না কয়েক দিন।

শাশ্বতী উত্তর দেয় না।

হৈমন্তী কখনও কখনও আরও কৌতূহল দেখায়, বলে, তোরা যে রেজিস্ট্রি করবি বলেছিলি—তার কী হল?

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কতার ভান করে।

একদিন বিকেলে কলেজ ফেরত সবুজ হেরাল্ড গাড়িখানা নিয়ে রাকা এসে হাজির। সঙ্গে তার দাদা সুমন্ত ছিল না, বাড়ির ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে এনেছে।

গাড়িওয়ালা লোক এ-বাড়িতে কখনও আসেনি। তাই একটু চাপা উত্তেজনা দেখা দিল বাড়িতে। বাচ্চু গায়ে জামা দিয়ে মিষ্টি আনতে গেল দোকান থেকে।

অবশ্য খাবারের প্লেট রাকা ছুঁলও না। তার মুখখানা খুব গম্ভীর, বিষণ্ণ। সাধারণত হাসি-খুশি থাকে বলে বিষণ্ণ রাকাকে বড় অচেনা লাগছিল। এবং সেজন্য মনে মনে ভয়-পাওয়া হরিণের মতো চঞ্চল, অস্থির বোধ করছিল শাশ্বতী।

যাওয়ার সময় বাগানের আগলটার কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাকা বলল, তুই যে এনগেজ্‌ড তা তো কই আমাকে বলিসনি! কলেজের অনেকেই জানে দেখলাম, কেবল আমি ছাড়া। শুনলাম ভদ্রলোকের নাম আদিত্য রায়, কলেজে এসে প্রায়ই দেখা করেন তোর সঙ্গে!

শাশ্বতী আঙুলে আঁচল জড়ায়, মুখ নিচু করে থাকে। উত্তর দেয় না।

রাকা দুঃখিত গলায় বলে, দাদা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছে। বলছিল, তুই নাকি ওকে কিছু ঠিক করে বলিসনি! রাকা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ, তারপর মৃদুস্বরে বলে, কয়েক বছর আগে ওকে আর-একজন মেয়ে রিফিউজ করেছিল— তারপর খুব ড্রিঙ্ক করত দাদা, ষাট-সত্তর মাইল স্পিডে গাড়ি চালাত। একদিন সইতে না-পেরে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। স্বাস্থ্য ভাল বলে বেঁচে যায়। কিন্তু এবার ও খুব সিওর ছিল। প্রথমেই জেনে নিয়েছিল, তুই এনগেজ্‌ড কি না। এখন নতুন ধাক্কা খেয়ে ওর আবার কী হবে কে জানে! কয়েক দিন খুব অন্যমনস্ক দেখছি ওকে—

শাশ্বতী উত্তর দেয় না। কিন্তু তার ঠোঁট কাঁপে। বড় মায়া হতে থাকে তার সেইসব পুরুষের জন্য যাদের সে ভালবাসেনি। কেন ওরা তাকে অবহেলা করেনি! তোমরা কেমন পুরুষ! পৃথিবীতে কত কাজ আছে পুরুষের, কত রহস্যমোচন, কত আবিষ্কার, কত আদর্শ-প্রচার— তবু কেন একটি মেয়ের জন্য— সামান্য, কালো, সাধারণ একটি মেয়ের জন্য সব দিয়ে দাও! এবং উদাসীন থেকো তোমরা, উদাসীন থেকো—মন বুঝতে সময় দিয়ো।

পাঁচ-ছ' দিন কেটে গেলে একদিন শিবানী এসে বলল, আজও কলেজে যাবি না! এস-বির ক্লাসে আজ পলিটিক্সের নোট দেবে।

একটু ইতস্তত করল শাশ্বতী। বাইরে যেতে এখন বড় ভয় করে তার। মনে হয়, অনেক রাগী, প্রতিশোধকামী পুরুষ তার অপেক্ষায় চার দিকে ওঁত পেতে আছে।

একটু চিন্তা করে শাশ্বতী বলল, চল যাই।

তারপর অনিচ্ছায় সে তৈরি হয়ে নিল।

বাসে বসে শিবানী জিজ্ঞেস করল, তুই তো রোজ কলেজ থেকে কাটিস, খুব সিনেমা-রেস্টুরেন্টে যাস—না?

শাশ্বতী উত্তর দেয় না।

খুব উড়ছিস! শিবানী দুঃখ করল, নিশ্বাস ফেলে বলল, আর দ্যাখ, অলক যে সেই চাকরি করতে

গৌহাটি গেল, একটা চিঠি পর্যন্ত দিল না। পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই।

শাশ্বতী চুপ করে রইল।

কলেজের স্টপেজ এসে গেল। নামবার জন্য বাসের পা-দানিতে নেমে একটু মুখ বাড়াতেই শাশ্বতী দেখতে পেল, কলেজের সামনে বড় রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় লম্বা রোগামতো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে সেদিন ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আদিত্য অপেক্ষা করছিল।

ওই লম্বা লোকটা কি আদিত্য? দূর থেকে ঠিক বোঝা যায় না। আদিত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল, বুক কাঁপল ভীষণ।

শাশ্বতী পিছিয়ে আসে, বলে, আমি নামব না।

সে কী!

না। শাশ্বতী মাথা নাড়ে, আমি একটু অন্য জায়গায় যাব। কাজ আছে।

কোথায়?

কোথায় তা শাশ্বতী তাড়াতাড়িতে ঠিক করতে পারল না। বলল, আছে।... তুই পলিটিক্সের নোটটা আমাকে দিস, আমি টুকে নেব।

আবার বাসের মধ্যে ফিরে এসে বসল শাশ্বতী। পয়সা বের করে কন্ডাক্টরকে বলল, আমি রাসবিহারীর মোড়ে নামব।

মনে মনে ঠিক করল শাশ্বতী যে, রাসবিহারীর মোড় থেকে ফিরতি বাস ধরে বাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু রাসবিহারীর মোড়ে এসে তার খেয়াল হল, এখান থেকে দক্ষিণমুখো কিছুটা গেলেই ললিতের বাসা। ঠিকানা জানে না শাশ্বতী, কিন্তু বাসাটা তার মনে আছে। সেদিন থেকেই ললিতের ওপর একটা রাগ তার রয়ে গেছে। সেই রাগটা থাকতে থাকতেই বোঝাপড়াটা মিটিয়ে আসবে নাকি শাশ্বতী! বেশি দেরি করার দরকার কী? বেশি দেরি করলে শাশ্বতীর রাগ থাকে না, সাহস কমে যায়।

কী করছে তার বিচার করল না সে। দক্ষিণ দিকে উনত্রিশ নম্বর ট্রাম ফাঁকা যাচ্ছে। শাশ্বতী উঠে পড়ল।

ললিতের জন্য বড় ভয় করে ললিতের মায়ের। দিন দিন কেমন ঘরছাড়া বিবাগীর মতো হয়ে যাচ্ছে ওর ভাবখানা। এক দিকে তাকিয়ে থাকে তো তাকিয়েই থাকে— বেলা বয়ে যায়।

সেই কবে একটা মাস্টারির চাকরি জুটিয়েছিল ললিত, এখনও তাতেই রয়ে গেল। উন্নতির কোনও চেষ্টা নেই! শুয়ে বসে সময় কাটায়, চায়ের দোকানে গিয়ে আদ্দেক দিন কাটিয়ে আসে। এই বয়স— এখন উদ্যোগী হয়ে, ছোটাছুটি করে কত কিছু করে ফেলে মানুষ! তা করবে না। কিছু বললেই বলে, আমরা তো দু'জন, ঠিক চলে যাবে দেখো। বাপের স্বভাব। ওর বাপ সারাটা জীবন খেলা-খেলা করে পাগল ছিল, বাড়ির মানুষকে চিনতেই পারত না। সে-লোকটা সারাটা জীবন কেবল আপ্তবাক্য বলে গেল।— পয়সাকড়ি দিয়ে কী হয়! ছুঁচের ফুটো দিয়ে বরং হাতি গলে যায়, তবু কোনও বড়লোক স্বর্গে যায় না। বাপ ছেলে দু'জনেরই ধারণা যে বড়লোক হওয়াটার মধ্যে কিছু নেই। তার চেয়ে এই ভাল, যেভাবে চলছে চলুক। ললিতের বন্ধুরা কিন্তু ওর মতো বোকা নয়। তারা সময় থাকতে যে যারটা গুছিয়ে নিচ্ছে। কেমন গাড়ি করে ফেলল সঞ্জয়, বিয়ে করল তুলসী! ললিতটাই মুখচোরা। কোথাও গিয়ে নিজের জন্য দাঁড়াতে পারে না, কেড়ে-কুড়ে আনতে পারে না নিজের ভাগেরটা। অথচ খুব অহংকারী। দেশের বাড়িতে যখন হরির লুঠ পড়ত, তখন ললিত দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। ওর চোখের সামনে অন্য সব ছেলেমেয়ে মাটিতে পড়ে কাড়াকাড়ি করে বাতাসা কুড়োত। ও পারত না। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে এমন ভাবখানা করত যেন ও-সব ছোটলোকির মধ্যে নেই।

কেন ওর লোভ-টোভ এত কম! টাকাকড়ির দিকে ঝোঁক নেই কেন? রাস্তায়, গলিতে কত বয়সের মেয়ে হেঁটে যায়, ললিত চোখ তুলে তাকায় না। কিন্তু এ-বয়সে ও-রকম হওয়া কি ভাল! তরতাজা বয়স—এ-বয়সে বয়সের গুণ থাকবে না!

এইসব সারা দিন ভাবে ললিতের মা। বড় ভয় করে তার। আপনমনে বিড়বিড় করে।

শোওয়ার ঘরে হলুদের গুঁড়ো খুঁজতে এসেছিল মা। এমন সময়ে খুট খুট করে খুব ভয়ে ভয়ে কে যেন কড়া নাড়ল।

দরজা খুলতেই দেখা গেল ভিতু জড়সড় এক মেয়ে। হাতে বইখাতা, পরনে চমৎকার একখানা জয়পুরি ছাপা শাড়ি। শ্যামলা রং, সুন্দর মুখখানা। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ললিত...ললিতবাবু এইখানে থাকেন?

আহা, ললিতের সঙ্গে বড় মানায়। ভাবে ললিতের মা।

তুমি কোত্থেকে আসছ?

মেয়েটি লাজুক মুখে বলল, যাদবপুর। ললিতবাবু নেই?

এই বেরোল। তুমি ঘরে এসে একটু বোসো। ডেকে পাঠাচ্ছি। বেশি দূরে যায়নি।

চপ্পল জোড়া বাইরে ছেড়ে ঘরে এল শাশ্বতী। ললিতের মায়ের ছোট্ট চৌকিটার একধারে এতটুকু হয়ে বসল। বাস-স্টপ থেকে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়েছে রোদে, শাশ্বতী ছোট্ট দলা পাকানো রুমালে কপালের ঘাম মুছছিল।

ললিতের মা আদরের গলায় জিজ্ঞেস করল, গরম লাগছে?

লজ্জায় মাথা নাড়ল শাশ্বতী, না।

ললিতের মা একটু হেসে পাখাটা খুলে দেয়।

ললিতের মা দেখল, এখন যেখানে মেয়েটি বসে আছে ঠিক সেইখানে অনেক দিন আগে একদিন দুপুরে মিতু বসেছিল। ললিতের বড় পছন্দ ছিল তাকে। কিন্তু ওইখানে বসে মিতু কেঁদেকেটে অস্বীকার করে গেল। ললিতকে বিয়ে করতে রাজি হল না। ওই চৌকিটা যেখানে মেয়েটি এখন বসে আছে—ওটা অলক্ষুণে চৌকি।

ললিতের মা বলল, তুমি এখানটায় ললিতের চৌকিতে এসে বোসো। এখানে বেশি হাওয়া লাগবে।

শাশ্বতী বাধ্য মেয়ের মতো উঠে ললিতের চৌকিতে গিয়ে বসল।

ললিতের মা মনে মনে বলল, ঠাকুর, ঠাকুর, দেখো এ যেন সেই হয় যাকে ললিত বিয়ে করবে। আহা, বড় লক্ষ্মীমন্ত মুখখানি। ললিতটা বড় মুখচোরা। কই, এত দিন বলেনি তো এমন একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাবসাব, চেনা-জানা হয়েছে? বোকা ছেলে, তুই কাউকে পছন্দ করলে আমি কি রাগ করব? তোর পছন্দ জেনেই তো মিতুকে আমি ডেকে এনেছিলাম। মিতু রাজি হল না, আমাকে কত অপমান করে গেল! কিন্তু তাতে আমি দুঃখ পাইনি। তোর বুকের ভিতরটা যে পুড়ে গিয়েছিল—তার চেয়ে কি ওইটুকু অপমান বেশি? আহা, ললিত এবার বেশ পছন্দ করেছিস। মিতু সুন্দর ছিল কিন্তু এর মতো লক্ষ্মীমন্ত ছিল না। বেশ রে ললিত, বেশ!

একটু চা খাও মা, সঙ্গে আর কী খাবে—দু'টো চিঁড়ে ভেজে দিই!

না, না। লজ্জায় মাথা নাড়ে শাশ্বতী। কানের মাকড়ি ঝিকিয়ে ওঠে, কপালের ওপর এক থোকা চুল দোল খায়।

ছেলেমানুষ! কচি। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ললিতের মা।

শাশ্বতী এই ছোট্ট ঘরখানা দেখছিল। নির্জন সুন্দর ঘরখানা, বাইরের কোনও শব্দ আসে না। জানালার ওপর ঝুঁকে আছে সবুজ, সতেজ একটা পেয়ারার ডাল। পাখি ডাকছে। ভিতরে ছোট্ট একটু উঠোন, এক পাশে তুলসীমঞ্চ। ঘরে আসবাবপত্র বেশি নেই। যা আছে তাতে বোঝা যায় এদের অবস্থা অনেকটা শাশ্বতীদের মতোই। তাই এই ঘরে বসতে খুব একটা অস্বস্তি হয় না। সমান অবস্থার মানুষের সঙ্গে মিশতেই স্বস্তি বোধ করে সে। এ-কথা ঠিক, শাশ্বতী কোনও দিন খুব বড়লোকের ঘরে বউ হয়ে যেতে চায়নি। বিশাল ঘরদোর, অনেক অদেখা আসবাব, বেশি চাকর-বাকর—এ-সব কোনও দিন ভাবতে ভাল লাগে না তার। মন খারাপ হয়ে যায়। কোনও দিন বড়লোকের ঘরে গেলে শাশ্বতী হাঁফিয়ে উঠবে। সেখানে অনেক চকচকে জিনিসপত্রে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, মানুষগুলোকে পুতুলের মতো লাগে। যে-ঘরে আসবাবপত্র কম সেইখানে মানুষগুলোর ওপর বেশি করে চোখ পড়ে, সহজ লাগে।

ওপর দিকে চেয়ে শাশ্বতী দেখল বুড়োর মাথার মতো নড়বড়ে ফ্যানটা দুলছে। ওটার নড়া দেখে একটু হাসল শাশ্বতী। ভুলে গেল যে সে ঝগড়া করতে এসেছে।

একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে গণেশের দোকানের দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, ললিতদা, মাসিমা ডাকছে, একজন বসে আছে আপনার জন্য।

ললিত উঠল, বোধ হয় তুলসী ফুলসী কেউ এসেছে।

ঘরের দরজায় পা দিয়েই শাশ্বতীকে দেখতে পেল ললিত। লাফিয়ে মোচড় দিয়ে উঠল বুক। ধড়াস শব্দ হল শরীরের মধ্যে। হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেল বাতাস। পায়ের নীচে দুরদুর করে কেঁপে উঠল মাটি।

আপনি!

শাশ্বতী উঠে দাঁড়িয়েছিল। ললিতের ধারালো উজ্জ্বল মুখখানা একপলক দেখেই চোখ নামিয়ে নিল শাশ্বতী। কোনও রকমে বলল, আমি... আমি একটু এলাম।

তারপরেই সে অবাক হয়ে টের পেল তার আর কোনও কথা বলার নেই। কথা শেষ।

আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিল ললিত। ঘরে এসে সন্তর্পণে মায়ের চৌকিটাতে বসল।

শাশ্বতীর খুব ঝগড়া করার কথা। সে বলতে এসেছিল, কেন আপনি ওই কাণ্ড করতে গেলেন? তাতে আপনার কী স্বার্থ ছিল?

কিন্তু সে-কথা না বলে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল শাশ্বতী, বলল, সেদিন আমি ওখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। আপনি তাতে রাগ করেননি তো!

উত্তরে ললিতের বলার কথা, কেন আপনি ও-রকম করলেন? ছিঃ ছিঃ, আদিত্য খেপে গিয়ে সঞ্জয়ের পেটে লাথি মেরেছে, আমাকে চড় মেরেছে। কেন আপনি আমাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে বে-ইজ্জত করলেন?

কিন্তু সে-কথা বলল না ললিত, বরং অপরাধীর মতো মুখ নামিয়ে বলল, না, আপনি ঠিকই করেছিলেন।...

শাশ্বতী হাসল। তার সাদা ছোট ছোট দাঁতে সকালের সতেজ রোদ আর পেয়ারা পাতার সবুজ রঙের একটা আভা ঝিকমিক করে গেল।

চায়ের কাপ আর চিঁড়ে ভাজার প্লেট হাতে মা ঘরে ঢুকল। মায়ের মুখে চোরা হাসি। বলল, ললিত, তুই একটু চা খাবি? করে দেব?

ললিত বলল, দাও।

মা শাশ্বতীকে চা-টা দেয়। বলে, একটু খাও। এ-বাড়িতে প্রথম এলে। খাও।

চা রেখেই ললিতের মা তাড়াতাড়ি চলে যায়। মনে মনে বলে, ঠাকুর, ঠাকুর...

মুখ নিচু করে বসে ছিল শাশ্বতী। হঠাৎ মুখখানা তুলে বলল, দেখবেন, আপনার অসুখ সেরে যাবে। আমার মেসোমশাইয়ের একদম সেরে গেছে...

যাবে! সেরে যাবে! হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে জল ছলছলিয়ে ওঠে ললিতের। আহা, যদি সত্যিই সেরে যায়!

শাশ্বতীর ছেলেমানুষের মতো সতেজ মুখখানা আত্মবিশ্বাসে কঠিন হয়ে যায়, সে বলে, দেখবেন...

ও-রকমভাবে যদি কেউ চায়, ও-রকমভাবে যদি কেউ বলে তা হলে কীভাবে মরবে ললিত? কীভাবে?

ঠোঁট কেঁপে ওঠে ললিতের। চোখে জল এসে যায়। দুর্বলতা! কই, এতকাল তো এ রকম দুর্বল লাগেনি নিজেকে?

নিজেকে সামলে নেয় ললিত। একটু চোরা-হাসি হেসে বলে, শুনলাম আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে!

শাশ্বতী ভ্রূ তোলে, আমার! সে কী?

শুনেছি। ললিত শ্বাস ছাড়ে। মৃদুস্বরে বলে, খুব আনন্দের খবর।

শাশ্বতী বুঝতে না পেরে বলে, কার কাছে শুনলেন? কার সঙ্গে ঠিক হল আমার বিয়ে?

ললিত একটু সন্দেহের গলায় বলে, আদিত্য বলছিল, আপনার কে এক বন্ধু—রাকা না কী যেন নাম—তার দাদার সঙ্গে।

শাশ্বতী থমকে যায়। সুমন্তর কথা তার মনেই ছিল না। কিন্তু সে-কথা কী করে আদিত্য জেনেছিল! সে-কথা কেন এল ললিতের কানে!

বড় লজ্জা করল শাশ্বতীর। সুমন্তর সঙ্গে সে একা গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটের রেস্তরাঁয়, কথা বলেছিল অনেক। প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু এ-কথা সে কাকে বোঝাবে যে দু' দিন আগেও সে ছিল বড় ছেলেমানুষ! সে কি ছাই বুঝতে পেরেছিল তার মন? এখন মনে মনে শাশ্বতী ক্ষমা চাইল, তোমাদের কাউকে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি, তবে ক্ষমা কোরো। আমি বড় বোকা মেয়ে। আমাকে ক্ষমা কোরো।

মুখ নিচু করে শাশ্বতী বলল, ওটা ভুল খবর। ওই ভদ্রলোক চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি চাইনি।

কে জানে কেন, কথাটা শুনে হঠাৎ বুক হালকা লাগে ললিতের। এক দুর্বোধ্য আবেগে বুক ভেসে যেতে থাকে। সে অপলক চোখে তার সামনে জীবন্ত, তরতাজা এক দৃশ্য দেখে। ঘন চুলের ভিতর থেকে ঝিকমিক করছে কানের রিং, পরনে কালো-হলুদে মেশানো সুন্দর একখানা জয়পুরি শাড়ি, নিকোনো উঠোনের মতো পরিষ্কার ব্রনহীন মুখখানা। এখন যদি ললিত ওকে ভালবাসার কথা বলে! তবে কি ও লাজুক মুখ নামিয়ে সম্মতির হাসি হাসবে?

আত্মবিস্মৃত ললিত মুহূর্তকাল পরে নিজের সংবিতে ফিরে এল। শোষ-কাগজের মতো এক বিষাদ হঠাৎ শুষে নিল তার হৃদয়। সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

শাশ্বতী মৃদুস্বরে বলল, শুনুন, আমার একটু কথা আছে।

কী?

শাশ্বতী ইতস্তত করে বলে, আপনার বন্ধুকে আমি অনেক দুঃখ দিয়েছি। ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, আমি কোনও দিন ওকে ভালবাসিনি।

ও জানত। অন্য দিকে চোখ রেখে ললিত বলে।

শাশ্বতী একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমি খুব অন্যায় করেছি, না?

ললিত মাথা নাড়ল। না।

শাশ্বতী বিষণ্ণ গলায় বলে, ও হয়তো রেগে যাবে। শোধ নেবে। কিন্তু আমার যে কিছু উপায় ছিল না।

কথাটায় ললিত একটু বিচলিত হয়। তারপর সোজা তাকায় শাশ্বতীর দিকে, বলে, আপনি ঠিকই করেছিলেন।

শাশ্বতী মৃদুস্বরে বলে, ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, ও যেন কোনও পাগলামি না করে। আমার দাদার কাছে শুনেছি, দু' দিন ও অফিসে আসছে না। বড় ভয় করেছিল শুনে। যদি ও সুইসাইড বা ও-রকম কিছু করে—

ললিত হাসে, মাথা নেড়ে বলে, করবে না। ওকে আমি চিনি। আমি ওর বাড়িতে খবর নিয়েছি। ও কলকাতায় নেই। কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেছে।

শাশ্বতী ছলছলে চোখে বলে, যদি কিছু করে! তা হলে লোকে আমাকে দেখিয়ে বলবে, ওই বাজে মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। এ-রকমই তো হয়, লোকে না জেনে নিন্দে করে। ওকে বলবেন, আমি খুব সাধারণ একটি মেয়ে, আমার মতো তুচ্ছ একজনের জন্য পাগল হওয়ার মানে হয় না। ও অনেক ভাল মেয়ে পাবে।

ললিত সরল, বোকা মেয়েটির দিকে তাকায়। তারপর বলে, সেদিনকার ব্যাপারটার জন্য আমিই দায়ী। আপনি কোনও বন্ধুর দাদাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন শুনে আমি রেগে গিয়েছিলাম।

শাশ্বতী একপলক ললিতের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে হাসল, বলল, হ্যাঁ, সেদিন আপনাকে খুব ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। মাথার চুল উড়ছে, লাল টকটক করছে মুখ, চোখ জ্বলছে— আপনাকেই আমি সবচেয়ে ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, রেগে গেলে আপনি ভয়ংকর কাণ্ড করতে পারেন। সেই ভয়ে আর-একটু হলে আমি হয়তো সই করে ফেলতুম।

ললিত লাজুক মুখে হাসল, বলল, মানুষ তো নিজের মুখ দেখতে পায় না, সেদিন আমাকে কীরকম দেখাচ্ছিল কে জানে! কিন্তু আমি চেয়েছিলাম বলেই আপনি সই করতেন? আপনার নিজের ইচ্ছের জোর নেই?

শাশ্বতী মৃদুস্বরে বলে, অতগুলো পুরুষ ঘিরে ধরলে ভয় লাগে না! কেমন অচেনা পরিবেশ, রাগী সব মানুষ, আর ওই বিশ্রী দম-আটকানো ঘর! এ-সব থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য হয়তো শেষ পর্যন্ত আপনারা যা বলতেন, তাই করতাম। আমার মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল। আপনাদের সেই ব্যান্ডেজ-বাঁধা বন্ধু বের করে আনার পরও অনেকক্ষণ আমি বুঝতে পারিনি আমি সত্যিই সই করে এসেছি কি না।

বড় মায়া হয় ললিতের। সে একটু চিন্তা করে আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিও চাইনি যে, আপনাদের বিয়েটা ওইভাবে হোক। আপনি চলে যাওয়ার পর আমি চেয়েছিলাম যেন আপনি আর ফিরে না আসেন।

বলেই একটু ইতস্তত করল ললিত, বলল, কিন্তু আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন?

শাশ্বতী হাসছিল। মৃদু চিকমিকে হাসি। মাথা নেড়ে বলল, বিশ্বাস করেছি।

তারপর আচমকা বলল, কিন্তু কেন তা চেয়েছিলেন?

সত্যিই তো! সে কেন চেয়েছিল! তার তাতে কী লাভ? তবু তার মন চায়নি বিয়েটা হোক। বিশেষত ওইভাবে, ধুলোটে এক অফিসঘরে, সরকারি ভাষায় আধুনিক মন্ত্রপাঠ করে। সে চায়নি এই কাটাকাটা মুখের, শ্যামলা মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাক। কিন্তু কেন? কী লাভ তার?

ললিত মিনমিন করে শুধু বলল, আমি ভেবেছিলাম, আপনি অন্য কাউকে ভালবাসেন।

সে-কথার উত্তর দিল না শাশ্বতী। ব্যাগ আর কলেজের খাতা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, এবার আমি যাব।

বিদায়ের সময়ে কেউই জিজ্ঞেস করল না আবার দেখা হবে কি না। কিংবা কবে দেখা হবে!

ফেরার সময়ে বাসে একা একটি মন নিয়ে বসে ছিল শাশ্বতী। কত ভাবল সে। সে শুনেছে, ক্যানসার হলেও কেউ বেঁচে যায়, যেমন তার মেসোমশাই বেঁচে আছেন। ললিত তা হলে কেন মরে যাবে? মৃত্যুর মুখোমুখি ললিত কি এখন বড় একা! একা বলেই মাঝে মাঝে রেগে যায় নিজের ওপর! সেদিন ওকে লক্ষ করেছে শাশ্বতী। একদম পাগলের মতো দেখাচ্ছিল ওকে। ওর মন চাইছিল না, তবু জোর করে শাশ্বতীকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কেন ওর এত অহংকার? কেন শাশ্বতীকে অবহেলা করেছিল? মরে যাবে বলে? মৃত্যুরও কি অহংকার হয়! কিন্তু শাশ্বতীর আর ওর ওপর একটুও রাগ নেই। এখন পুরুষমানুষকে অনায়াসে বুঝতে পারে শাশ্বতী। সেদিন অতসব গন্ডগোলের মধ্যেও ললিতকে সে বুঝে গিয়েছিল।

মাঝে মাঝে শাশ্বতীর ভিতরটা ধক করে ওঠে আজকাল। ও কি মরে যাবে! কেন মরে যাবে! ক্যানসারের তো ওষুধ বেরিয়েছে, শাশ্বতী পড়েছে কাগজে! বেরোয়নি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। তার মন বলছে। সে জানে।

দুপুরেই ললিতের মা গেল প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি। বুড়িদের আড্ডায় বিন্তি কিংবা লুডো খেলতে খেলতে বলল, কেমন সুন্দর লক্ষ্মীমন্ত একটা মেয়ে এসেছিল আজ তাদের গরিবের ঘরে। ওই মেয়েই হয়তো আসছে একদিন বউ হয়ে।

সারা ঘর খুঁজে দেখে ললিত। শাশ্বতী কিছু কি ফেলে গেছে! যার জন্য সে আবার কখনও ফিরে আসবে এই ঘরে! না, কিছুই না। ললিত স্থির হয়ে দাঁড়ায়। বিড়বিড় করে প্রশ্ন করে, কোনও দিন আসবে না আর!

তারপর সংবিৎ ফিরে পায়। বিন্দু বিন্দু জলের মতো এইসব পার্থিব দুর্বলতা লেগে আছে তার গায়ে। সে একদিন সব জলকণা ঝেড়ে ফেলে মায়াবি হাঁসের মতো উড়ে যাবে।

উড়ে যাবে! ফিরবে না আর! দেখবে না অপরাহ্ণের উঠোনে সেই অদ্ভুত হলুদ আলোটি! সতেজ পেয়ারাপাতায় শিশুর মুখের ছবি! মানুষের মুক্তির কথা ভাববে না আর! ভালবাসবে না!

কেবলই কি জড়বস্তু থেকে জন্ম নিয়ে জড়ে ফিরে যাওয়া! কিছু নেই আর! হায়, তবু কেন যে কেবলই মনে হয় ললিতের, এখনও তার জীবন অপরিমেয় বাকি রয়ে গেছে!

## ॥ চব্বিশ ॥

বর্ধমানের কয়েক স্টেশন আগে ডাউন লাইনের ধারে এক নিরালা জায়গায় সোঁদাল গাঁয়ের একজন লোক কলকাতার গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। দুঃখী লোকটা। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সে বেঁচে আছে, পৃথিবীতে, আজ তার শেষ দিন। রেল লাইন বাঁক নিয়ে চলে গেছে পশ্চিমের দিকে উদোম মাঠের ভিতর দিয়ে। নিষ্ফলা মাঠের ও-পাশে প্রকাণ্ড সূর্য ডুবে যাচ্ছে। পুবে বহু দূর থেকে হরেন সাঁইয়ের ধানকলের শব্দ আসছে ঝকঝক। নাবাল জমিতে এখনও জমে আছে গত বর্ষার জল, ব্যাঙ ডাকছে। একটু আগে হালকা একটা মেঘ বৃষ্টি দিয়ে গেল। বেশ বিকেলটি—জলে-ভেজা মাঠঘাটে পড়ন্ত রোদ পাকা ফসলের মতো দেখায়। দুঃখী লোকটা দেখে। কাঁধের গামছাখানা দিয়ে চোখের জল মুছে নেয়। শেষ বিকেলটা বড় সুন্দর। যদি এমন সুন্দর হত জীবন—এমন ভর-ভরন্ত নিস্তব্ধ বিকেলটির মতো! কিন্তু তা তো হয়নি। বাবার ঋণ ছিল অনেক, জমি চলে গেল মহাজনের ঘরে। ভাগচাষে চলছিল দিন—কিন্তু পর পর দু' বছর অজন্মা। ধানের দর পড়ে গেল। হরেন সাঁইয়ের কলে ঝাড়াই হচ্ছে তারই রোয়া-কাটা ধান। এখন আর তার কোনও দুঃখ নেই—এক্ষুনি রেলগাড়ি চলে আসবে— বাড়বাড়ন্ত হোক সাঁইমশাইয়ের। ঝাড়া হাত-পা তার, কাঁদবার কেউ নেই— এক যদি বারুইপুরে মেয়েটার কাছে খবর যায়। তা সে-খবরও যাবে দুলকি চালে— পৌঁছতে পৌঁছতে মাসখানেক— তত দিনে হাওয়া-বাতাসে জলে-মাটিতে মিশে কোথায় চলে যাবে সে! তার খানিকটা চলে যাবে আকাশে, মেঘ হয়ে চোখের জল ফেলবে, তার আর খানিকটা মাটিতে মিশে বুকে করে নেবে সেই জল, তার আর খানিকটা হু-হু বাতাসের সঙ্গে ছুটে এসে ধানের আগা ছুঁয়ে চলে যাবে কোথায়! দুঃখী লোকটা তার চারধারে অলৌকিক বিকেলটা দেখে নেয়। ফলিডল কেনারও পয়সা ছিল না বলে সে আড়াই মাইল হেঁটে এসেছে রেলরাস্তা পর্যন্ত। উঁচু জমিতে দাঁড়াতেই ফুরফুরে হাওয়া লাগছে। বাতাসে এখন বড় আদর। সেই আদুরে বাতাসটাই একটা শব্দ নিয়ে আসে। গুরুগুরু শব্দ। দূরে রেলব্রিজে উঠে এল গাড়ি। তারপর পায়ের নীচে মাটি চড়াইয়ের বুকের মতো কাঁপে। মাইলখানেক দূরে বাঁকের মুখে পিঁপড়ের মতো কালো ট্রেনখানা উদোম মাঠের উপর দিয়ে চলে আসছে। ড্রাইভার সাহেব দেখে ফেলবে। লোকটা দু' কদম নেমে যায় ঢালু বেয়ে। উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরায়। খুব জোরে টানতে থাকে। বাঁকের ওপর দিয়ে পাক মেরে আসছে গাড়িখানা। বিড়ি ফেলে লোকটা উঠে দাঁড়ায়। গামছাখানা জড়িয়ে নেয় মুখে, তারপর দুই লাফে উঠে আসে ঢালু বেয়ে। গামছার আবছায়ার ভিতর থেকে এক বার কালো ট্রেনখানা দেখে, মার মার ঝোড়ো শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে মেয়ের নাম ধরে ডেকে বলে—ব-কু-ল, যা-আ-ই—বাতাসের একটা ধাক্কা লাগে জোর।

অনেক হিজিবিজি দেখতে পায় লোকটা। দেখে কোমরের ওপর দাঁড়িয়ে আস্ত একটা রেলগাড়ির কামরা। কিন্তু খুব ভার লাগে না। তার শরীরের ভিতর দিয়ে কুলকুল করে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে—ভিজে যাচ্ছে ঘাস মাটি। সে জলের জন্য এক বার হাঁ করে। দু' বার তিন বার। মুখে কথা ফোটে না। ঘাড়টা কাত হয়ে যায়। অনেক মানুষের পা বৃষ্টির মতো মাটিতে পড়ছে। অনেক লোক—অনেক লোক—কথা বলছে। কিন্তু সে কেবল অঝোরে নদীর শব্দটা শোনে। তার শরীরের ভিতর থেকে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। সে জলের জন্য হাঁ করে! কেউ তার কথা বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে বৃষ্টির জলে যেন ধুয়ে যাচ্ছে মুখগুলো! সে ভয়ে চেঁচায়, জল! কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না। হঠাৎ আবছায়ার মধ্যে কোথা থেকে সুন্দর একখানা মুখ তার মুখের ওপর নেমে আসে। বড় সুন্দর মুখ—দয়ালু দু'টি জলভরা চোখ। লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এইরকম—এইরকম একজন মানুষকেই সে তো সারা জীবন নিজের অজান্তে খুঁজছে! কখনও আলপথে লণ্ঠন হাতে যেতে যেতে, কিংবা যখন বর্ষার একবুক জলে নেমে ট্যাটায় গাঁথা বস্তুটি শোলমাছ না কেউটে না জেনে হাত ডুবিয়েছে জলে, কিংবা কখনও দিকশূন্য বৈশাখী দুপুরের ধু-ধু মাঠ আর অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে পৃথিবী ও আকাশের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেনি, কিংবা কখনও যখন বাইরের দাওয়ায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হঠাৎ অস্পষ্টভাবে নিজের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়েনি—তখন সেইসব সময়ে সে তো আবছাভাবে একেই খুঁজে বেড়িয়েছে এত দিন! এই দয়ালু মুখখানা—আহা, যা

পরের জন্য কাঁদে—সময়ে দেখা হল না গো—এ ঠিক নিয়ে যেত তাকে সেইখানে যেখানে ঈশ্বর আছেন। কচু পাতায় জল মুখ ভরে ঢেলে দিচ্ছে মানুষটা, চোখে-মুখে পড়ছে জলের ছিটে। লোকটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে— তুমি কি অচেনা মানুষ! না গো। দুঃখী মানুষ তোমাকে দেখলেই চিনে নেবে। অন্ধকার নেমে আসে। সূর্যের মুখ ঢেকে দয়ালু মুখখানা তার দিকে চেয়ে থাকে। এই একজন মানুষ, যে তার জন্য কাঁদছে। লোকটা নিশ্চিন্তে চোখ বোজে।

আস্তে আস্তে তার মাথাটা কোল থেকে মাটির ওপর নামিয়ে দেয় রমেন। তারপর উঠে দাঁড়ায়। ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসে নাবাল জমিতে যেখানে জল জমে আছে। হাতের রক্ত ধোয়, ধুতিটা ভিজিয়ে নেয়, মুখে জলের ছিটা দেয়। উঠে আসবার সময়ে দেখে লোকটার কাটা ডান হাতখানা পড়ে আছে। যত্নে তুলে নেয় সেটা, ভিড় ঠেলে মৃতদেহের কাছে রেখে দেয়। তারপর একটু দূরে এসে দাঁড়ায়। দিগন্তে নীল মেঘের রঙের একটা আস্তরণ, সূর্য দু'-আধখানা হয়ে অস্ত যাচ্ছে। রমেন নিঃশব্দে হেঁটে এসে নিজের কামরায় ওঠে।

কামরার ভিতরে ভিড়ের মানুষেরা তাকে রাস্তা করে দেয়। অন্যমনে সে এসে দাঁড়ায় তার পুরনো জায়গায় দুই বেঞ্চের মাঝখানে। শান্তভাবে।

সভয়ে তার কাছ থেকে সরে গেল একজন লোক, বলল, আপনার কাপড়ে এখনও রক্ত!

বেঞ্চ জুড়ে হোল্ড-অলের বিছানা পেতে বসে আছে একজন খিটখিটে চেহারার লোক। সঙ্গে তিনটে বাচ্চা আর গোলগাল বউ। রমেন প্রথম গাড়িতে উঠতে এই লোকটা তাকে জায়গা দিতে চায়নি, বলেছে, দেখছেন তো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছি, এর মধ্যে কোথায় বসবেন! সেই লোকটা এখন রমেনকে জিজ্ঞেস করল, লোকটা মরে গেছে?

রমেন মাথা হেলায়।

ইস্। লোকটা বলে, তারপর হোল্ড-অলের একটা অংশ উলটান দিয়ে জায়গা করে দিয়ে বলে— আপনি বসুন।

আমি...মানে... আমার কোলেই লোকটা মারা গেছে। আপনার বিছানাপত্র ছোঁয়া যাবে।

তাতে কী? বৃহৎ কাষ্ঠাসনে দোষ নেই।

রমেন বসল না।

দুর্গাপুর থেকে গাড়ি ছাড়ার শেষ সময়ে একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠেছিল। ওর দৌড় দেখে বোঝা গিয়েছিল যে. ছেলেটা দৌড়তে জানে। তার গায়ে হ্যান্ডলুমের চমৎকার একটা চেক শার্ট পরনে কর্ডের প্যান্ট পায়ে হান্টিং বুট, কাঁধ থেকে একটা মাঝারি কিট ব্যাগ ঝুলছে। গায়ের রং ফরসা, একটু নিষ্ঠুর চৌকো ধরনের মুখ, চোখ দু'টি স্থির। স্থির কিন্তু শান্ত নয়। বরং একরোখা। একটি কিংবা দু'টি খুন করার পর মানুষের চোখ ও-রকম স্থির হয়ে আসে। তখন চোখের পাতার একটা গাঢ় ছায়া পড়ে চোখের মণিতে। আর সেখানে, চোখের গভীরে ধিক ধিক করে একটা চোরা আলো।

ছেলেটা গাড়িতে ওঠার পর থেকেই হোল্ড-অলোলা লোকটার সঙ্গে তার ঝগড়া হচ্ছে। ছেলেটা বসার জায়গা চাইতেই লোকটার বউ বলল, কী করে জায়গা হবে? আমাদের বাচ্চা-কাচ্চা... এত জিনিসপত্র... ওঁর শরীর খারাপ। ছেলেটা মুখ বিকৃত করে ঘেন্নার চোখে, লোকটা তার বউ আর তিনটে বাচ্চাকে দেখেছিল একটু, কিছু বলেনি। ট্রেন ঘণ্টাখানেক লেট চলছিল, তাই হোল্ড-অলওলা লোকটা এক বার রমেনকে বলেছিল, গেরো দেখেছেন? পৌঁছতে প্রায় রাত হয়ে যাবে। আমি আবার থাকি বাঘা যতীনে—এলাকাটা ভাল নয়। অত রাতে ছিনতাই-ফিনতাই, তা ছাড়া ট্যাক্সিওয়ালাকেই বিশ্বাস কী? তখন দুর্গাপুরের ছেলেটি একটু আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বলল, আমিও ওই দিকেই যাব। আমাকে সঙ্গে নেবেন? আমি সঙ্গে থাকলে ভয় নেই। লোকটা বিব্রত চোখে ছেলেটাকে একটু দেখে মাথা নেড়ে বলল, না, না, তার দরকার নেই। ছেলেটা ঠাট্টার গলায় বলল, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? লোকটা বলল, না, তা নয়। ভগবান দেখবেন। ঠিক পৌঁছে যাব। ছেলেটা একটু হাসল, ভগবান তো একটু আগেও ছিলেন, যখন আপনি ভয়ের কথা বলছিলেন! লোকটা সে-কথার উত্তর দেয়নি, রমেনের দিকে তাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গ আনবার চেষ্টা করে বলেছে, আজ আমার আসার কথা ছিল না—জানেন! ঠিক ছিল

পরশুদিন আসব। কিন্তু পঞ্জিকায় দেখেছি অমৃতযোগ ছিল আজ... যাত্রার সময়ে। তারপর একটু ম্লান হেসে বলল, কাশীতে সেবার ভৃগুবিচার করালাম—দুর্ঘটনায় মৃত্যুর যোগ। তাই পঞ্জিকা না দেখে বেরোই না বড় একটা...। দুর্গাপুরের ছেলেটা দু'দিকে ব্যাঙ্কে দু'খানা লম্বা কেঠো হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, একটু ঝিলিক দিল তার হাসি, বলল, কেটে পড়ুন দাদা, কেটে পড়ুন। পৃথিবীতে জায়গা বড় কমে যাচ্ছে। ছ'জনের জায়গা দখল করে বসে আছেন, কুড়িজনের খাবার টেনে নিচ্ছেন...

ঠিক সেই সময়ে ইঞ্জিন থেকে তীব্র বাঁশি বেজে ধীরে ধীরে থেমে আসছিল গাড়ি।

সেই ছেলেটা এখন রমেনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। একটু অন্যমনস্ক ছিল রমেন, ছেলেটা তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, কেমন দেখলেন?

কী।

লোকটা যে মরে গেল! কোনও কষ্ট পেল না। ইনস্ট্যান্ট।

রমেন উত্তর দিতে পারল না। তার ঠোঁট একটু কেঁপে গেল মাত্র।

ছেলেটা নিচু গলায় বলল, আপনি খুব শক্‌ড্? প্রথম প্রথম ও-রকম হয়। কলকাতায় নেমে একটা বড় ব্র্যান্ডি খেয়ে নেবেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি মানুষকে মরতে অনেক দেখেছি।

খুব ধীর চাপা গলায় রমেন বলল, জানি।

ছেলেটা খুব সামান্য একটু চমকে উঠল।

রমেন সরে এসে গাড়ির খোলা দরজার সামনে দাঁড়ায়। দরজায় মুখে ভিড়ে। দু'টো লোক একে অন্যের বিড়ি থেকে আগুন ধরিয়ে নিচ্ছে, তাদের দু'জনের মুখের ঠিক মাঝখান দিয়ে ডুবে যাচ্ছে সূর্য।

মেঝেতে উবু হয়ে বসে ছিল বেঁটে মতো একটা লোক। এত বেঁটে যে, আর দু'-এক ইঞ্চি ছোট হলেই বামনবীর হয়ে যেত। পরনে ময়লা হাফশার্ট আর ধুতি। সে ভিড়ের মধ্যে একটা ফাঁক দিয়ে রমেনকে দেখছিল। হ্যাঁ, ওই তো সেই লোক, যে ট্রেনে কাটা-পড়া মানুষটার মাথা কোলে করে বসে ছিল, অচিন মানুষের জন্য কেঁদেছিল— ওই তো সেই লোক! লম্বা লোকটা, ফরসা, গায়ে হাফ-হাতা পাঞ্জাবি— হ্যাঁ, ওই লোকটা। মরন্ত মানুষটা ওই মুখখানার দিকে চেয়ে মরে গেল। মরন্ত মানুষ লোক চেনে, ভুল হয় না। এ লোকটাকে দুঃখের কথা বলা যায়, এ বুঝবে ঠিক। সে একে বলবে গতবার তার কোলের ছেলেটা কীভাবে মারা গেল। মিঠিপুর তার গাঁ, চব্বিশ পরগনায়। গতবার বান ডাকল রাত দু'টোয়। ঘরে সে, তার বউ আর দেড় বছরের ছেলে। জলের শব্দে ঘুম ভেঙে দেখে ঘরের মেঝেয় হাজার সাপের মতো জলের খেলা। মুহুর্মুহু জল বেড়ে ওঠে, সে বউকে ডাকে—সামাল! গরিব মানুষ, জিনিসপত্র তেমন কিছু ছিল না— যায় তো সেগুলো যাক, কিন্তু মানুষগুলো বড় আপন। বউকে বলল, আমার কোমর প্যাচায়ে ধর। বউ ধরল। ছেলে কোলে করে জলে নামল সে। ঘরে তখন তার কোমর-জল, বাইরে নামতেই গলা পর্যন্ত। তখন মাঠঘাট কিছু ঠাহর হয় না, অন্ধকার, অঝোর বৃষ্টি, বাতাস ডাকে, উথালপাথাল গাঁই-গাঁই জলের ডাক। লোকটা জলের মধ্যে টালমাটাল ছুটছিল, সঙ্গে কোমর-ধরা বউ, বুকে ছেলে। পশ্চিম দিকে বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান—সেই জায়গাটাই সবচেয়ে উঁচু, সেখানে বাঁধানো বেদি আছে। শতখানেক গজ দূর। ওই এক শ' গজ রাস্তা তার বুকে ধরা ছিল ছেলেটা— জলের তলায়। গলা-জল ভেঙে যখন গিয়ে উঠল বাবার থানে তখন খেয়াল করে দেখে— আরে, এ আমি করেছি কী? অ্যাঁ! বুকের মধ্যে জোরে চেপে ধরেছি ছেলে, দেখি তার মুখ ডুবে রয়েছে জলের মধ্যে! ছেলে শ্বাস নেয় নাই। অ্যাঁ?

লোকটা আপনমনে বিড়বিড় করল, এরে কবো? হ্যাঁ, এরে কওয়া যায়।

লোকটা হাত বাড়িয়ে রমেনের পা ছুঁয়ে ডাকে, ও কর্তা।

রমেন নিচু হয়ে লোকটাকে দেখে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জল-টসটসে চোখ। একে দেখেছে রমেন। যখন ট্রেনে কাটা-পড়া লোকটা রমেনের কোলে মাথা রেখে মরে যাচ্ছে তখন এ-লোকটাই দৌড়ে গিয়ে কচু পাতায় জল এনে দিয়েছিল, রমেনের কানের কাছে বিড়বিড় করে বলেছিল, বাঁচিয়ে দিন, কর্তা, বাঁচিয়ে দিন—আপনি পারেন। হে ঠাকুর—

রমেন নরম গলায় বলে, কী?

লোকটা একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরে। তার আর কিছুই দেওয়ার নেই।

রমেন বিড়িটা নেয়। লোকটার মুখোমুখি উবু হয়ে বসে বিড়িটা ধরায়। লোকটা গলে যায় এই সোহাগে। বিড়বিড় করে তার দুঃখের কথা বলে। তারপর আস্তে আস্তে রমেনের বুকের কাছে ঝুঁকে আসে লোকটার মাথা, তীব্র ফিসফিসানির স্বরে লোকটা বলে, বলেন কর্তা, কেন বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল! কী হয়েছিল আমার! কাঁধে তুলে নিলেই ছেলেটা বেঁচে যেত, কিন্তু কেন বুদ্ধি হয় নাই?

হাতে কচলে চোখের জল মোছে লোকটা। রমেনের সুন্দর মুখ স্তব্ধ হয়ে দেখে। তারপর বলে, তারপর থেকেই আমি বন্ধকি কারবার ছেড়ে দিলাম, ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছি, তীর্থে যাই মাঝে মাঝে, ভিখিরিরে ভিক্ষে দিই, মানুষের বিপদ দেখলে মন কেমন করে, ছুটে যাই— কিন্তু আর লাভ কী? বুদ্ধিনাশে ছেলেটা মরে গেল। তার ওপর দেখেন আমি ঈশ্বরেচ্ছায় বামনবীর, আপনার মতো লম্বা হলে পর—কিন্তু ভগবান চান নাই—

মনে মনে মৃদু হাসে রমেন। লোকটা জানে না বামনবীরের মতো তার চেহারায় রূপ ঝরে পড়ছে। সত্য বটে, কখনও-সখনও আমাদের প্রিয়জন চলে যায়, তার শূন্যস্থানে অন্তরে চলে আসে দয়া, মায়া, কিংবা বিস্তার। লোকটা এখনও টের পায়নি। ছেলে না থাকায় দুঃখই ছেলে হয়ে তার কাছে আছে।

রমেন তার কাঁধে হাত রেখে চুপ করে বসে।

লোকটা বিড়বিড় করে, আপনার বড় দয়ামায়া। মরন্ত মানুষটার ভুল হয় নাই।

গাড়ির গতি কমে আসে। অনেক লাইনের জটিল ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। হোল্ড-অলওলা লোকটা গলা বাড়িয়ে ডাকল, ও দাদা।

রমেন তাকাতেই হাতের প্লাস্টিকের জলের বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে ম্লান মুখে বলল, বারবার আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। সামনেই বর্ধমান, একটু জল এনে দেবেন দাদা, কাইন্ডলি! আপনি ইয়ংম্যান, ছুটে গিয়ে আনতে পারবেন— আমার সায়াটিকা—

আসানসোলে একে এক বার জল এনে দিয়েছিল রমেন।

অভ্যাসবশত বোতলটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল রমেন, কিন্তু হাতটা ফেরত নিল। দুর্গাপুরের ছেলেটা শিথিল চোখে তাকে দেখছিল। রমেন ছেলেটাকে দেখিয়ে লোকটাকে বলল, এঁকে দিন। ইনি এনে দেবেন। আমি মড়া ছুঁয়েছি।

লোকটা ইতস্তত করে। হঠাৎ ঘেন্নায় ছেলেটার মুখ বেঁকে যায়। রমেনের চোখে স্থির চোখ রাখে ছেলেটা। মৃদু একটু হাসল রমেন— বন্ধুত্বের হাসি। ছেলেটা হাসিটুকু ফেরত দিল না। রমেন মনে মনে বলল, আমি তোমার শত্রু নেই।

ছেলেটা চোখ সরিয়ে নিয়ে লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন। এনে দিচ্ছি।

গাড়ি বর্ধমান পার হয়ে গেল। দুর্গাপুরের ছেলেটা জল এনে হোল্ড-অলওলার বেঞ্চে জায়গা পেয়ে গেছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রমেন দেখে অপরাহ্ণের আলোয় প্রকাণ্ড একখানা আদি-অন্তহীন মাঠ দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে তাদের রেলগাড়ি। চষা জমির ছায়ার মতো আকাশে ফুটে আছে কোদালে মেঘ।

জানালার ধারে একটেরে সিটটিতে বসে ছিল বুড়ো একটা লোক। সে রমেনের ধুতিতে রক্তের ছোপ দেখছিল, লক্ষ করল রমেনের বিষণ্ণ মুখ। তারপর বলল, লোকটা বাঁচল না, না?

রমেন মাথা নাড়ল।

লোকটা একটু চুপ করে থেকে বলল, চার দিকেই লোক মরে যাচ্ছে খুব। খাদ্যসমস্যা। এই বাজারে মানুষ বাঁচে?... আপনি কোথায় যাবেন?

কলকাতায়।

কলকাতায় কোথায়?

ঠিক নেই।

ঠিক নেই? সে কী? বাড়ি-বাসা নেই সেখানে?

রমেন একটু ইতস্তত করে বলে, ছিল, কাশীপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের একখানা বাড়ি ছিল। শুনেছি সেটা উদ্বাস্তুরা দখল করে নিয়েছে। আমি কোনও বন্ধুর বাসায় উঠব।

ইস, বাড়িটা বেদখলে চলে গেল! আপনি এতকাল করছিলেন কী? আজকাল কি একটা বাড়ি করা

সহজ! গঙ্গার ধারে ওই জায়গায় এখন বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা কাঠা!

লোকটা উদ্বিগ্ন হয় খুব। বলে, আদি বাড়ি ওইটাই?

না, রমেন বলে, আদি বাড়ি ময়মনসিং।

ময়মনসিং! লোকটা নড়ে-চড়ে বসে। ময়মনসিঙের কোথায়?

কালীবাড়ির কাছে।

কার বাড়ি?

রায় হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

লোকটা সোজা হয়ে বসে, তিনি আপনার কে হন?

দাদু।

লোকটা অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখে। স্থির চোখে। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে বলে, ছোটকর্তা! আপনি আমাদের ছোটকর্তা না?

বুড়ো লোকটার খোলা চোখে জল চলে আসে, সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, বসেন, বসেন—

রমেন তার কাঁধে হাত রাখে। লোকটা বিহ্বলভাবে বসে পড়ে। সে বুঝতে পারে না এর মানে কী! ছোট কর্তার ময়লা ধুতিতে রক্তের ছোপ, একটু আগে কাটা-পড়া লোকটাকে বুকে করে ধুলোয় বসে ছিল! গালে না-কামানো দাড়ি! মেঝেয় বসে একটা ভিখিরি মানুষের সঙ্গে বিড়ি খেল? কী করে হয়! সে ছোটকর্তাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছে, বন্দুক চালাতে দেখেছে, সে দেখেছে ছোটকর্তা তেরো বছর বয়সে একা মোটর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়। সেই বাড়ির দেউড়ির ওপর সিংহের মূর্তি, মাঠে পেখম-ধরা ময়ূর, বড় কর্তা বারান্দায় দুরবিন হাতে বসে আছে, ছোটকর্তা বুট পরে চামড়ার বল মারছে দেয়ালে। কী করে হয়!

আয় হায় রে, এ আপনার কী চেহারা ছোট কর্তা! জমি নাই—বাড়ি বে-দখল—আয় হায় রে—

রমেন তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়, কী বলবে ভেবে পায় না রমেন। কেবল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

লোকটা কত বার সেই বাড়িতে ছুটে গেছে দায়ে দফায়! মুশকিল-আসান ছিল সেই বাড়ি। পাকিস্তানের পর যখন খালি হয়ে গেল বাড়িটা— লুট পড়ে গেল— তখন কত দিন তার বুক ব্যথিয়ে উঠেছে। কলকাতায় এসে কত বার অভাবে দুঃখে তার মনে পড়েছে ময়মনসিঙের সেই বড় বাড়ির কথা। ইচ্ছে হয়েছে— কাশীপুরে এক বার ছোটকর্তার কাছে যায়। আপনারাই চিরকাল আমাদের দেখেছেন, আমরা আর কোথায় যাব? কিন্তু আয় হায় রে—ছোটকর্তার এখন আর কিছু নাই। কেমন শূন্য লাগে তার, নিঃস্ব ভিখিরির মতো লাগে নিজেকে। কাশীপুরে ছোটকর্তা আছেন, এই বিশ্বাস নিয়েই সে এতকাল অনেক দুঃখে সান্ত্বনা পেয়েছে। কিন্তু এখন সে কী ভেবে সান্ত্বনা পাবে!

আমি মুকুন্দ ঘানিওয়ালা—মনে নাই? রমেন মাথা নাড়ে, মনে আছে।

সৎ জমিদার পিতার মতো। শাসনে রাখেন, সোহাগও করেন। নিষ্কর জমি দিয়ে দেন, বসত করান, ধর্মে-কর্মে মতি আনেন মানুষের। কী মানুষ ছিল সব—মাথা নুয়ে আসত আপনা থেকেই! তার চেয়ে কি এখনকার বি ডি ও-রা ভাল! না কি সরকারি লোকেরা! অনেক হয়রানির পর মুকুন্দ বুঝে গেছে—সব জোচ্চোর, ঠক। এখন আর সেইসব স্বপ্নের মানুষেরা জন্মায় না, যাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই দুঃখের কথা নিঃশব্দে বলা হয়ে যেত।

নীরবে রমেনের হাতে বে-খেয়ালে হাত বুলোয় মুকুন্দ। বলে, সব চলে গেল, ছোট কর্তা! আমরা তবে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব?

রমেন ঠিক বলতে পারে না। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে, মুশকিলে পড়লে আমি আছি। আমার কাছে এসো।

কিন্তু সে বড় অহংকারের কথা। রমেনের মুখ ফুটে বেরোয় না। সে কেবল মুকুন্দের হাতে হাত রেখে ছোট্ট জায়গাটিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ওর পাশে বসে থাকে।

মাঝে মাঝে একটা বুড়ো ময়ূর, আর একটা পুরনো মোটর গাড়ির কথা রমেনের মনে পড়ে। কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু. সবুজ মাঠে ধূসর রঙের ময়ূরটা এক বোঝা পেখম টেনে আস্তে আস্তে চরে

বেড়াচ্ছে— এই দৃশ্য মনে পড়ে। কিংবা লজঝড়ে পুরনো, ক্যাম্বিসের হুডওয়ালা তাদের গাড়িটা বৃষ্টির দিনে পাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে।

কখনও বা মনে একটি-দু'টি ভিন্ন ছবি ভেসে ওঠে। প্রকাণ্ড একটা ভাঙা পিয়ানোর ওপর ধুলোর আস্তরণ, তার ওপর আঙুল দিয়ে রমেন তার নাম লিখছে— রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কিংবা মনে পড়ে প্রকাণ্ড দেউড়ির ওপর পুরনো জং-ধরা লোহার আর্চ, তাতে একটা চৌকো কাচের বাতি ঝুলছে, আর লোহার ফ্রেম বেয়ে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা। কিংবা সেই নোনা-ধরা, শ্যাওলায় সবুজ দেয়ালগুলি—যা তাদের বাড়ির সীমানা ছিল, যার ওপর দিয়ে দু' হাত দু' দিকে পাখনার মতো ছড়িয়ে টাল খেতে খেতে চোখ বুজে কত দিন হেঁটেছে রমেন! কিংবা মনে পড়ে তাদের ভূতগ্রস্ত, প্রকাণ্ড বাড়িটার পশ্চিমের ভিতের কাছে একটা আতসকাচ হাতে দাদু বসে আছে।

এখন সেই বৃষ্টির দিন, আর পাম গাছের তলায় দাঁড়ানো তাদের সেই বুড়ো ভাঙা গাড়িটার ভিজে যাওয়ার কথা মনে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে সেই বুড়ো ময়ূরটার পেখমের বোঝা টেনে টেনে সতর্ক চলা, গ্র্যান্ড পিয়ানোর গায়ে লেখা তার পুরনো নাম, আর আতসকাচ হাতে বাড়ির পশ্চিমের ভিতের কাছে দাদুর বসে থাকার দৃশ্য মনে পড়ে গেল। তার চারধারে এখন এক বার তাকিয়ে দেখলে কিছুতেই মনে হয় না যে, সে-সব সত্যিই একদিন ছিল— সেই ময়ূর, পুরনো গাড়ি, সেই গ্র্যান্ড পিয়ানো, কিংবা সেই দাদু। যেমন, মনে হয় না ছেলেবেলায় সত্যিই তাকে ওইভাবে তার নাম লিখতে বা বলতে শেখানো হয়েছিল— রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

## ॥ পঁচিশ ॥

লোকটা বলেছিল, 'জানি'। কী জানে লোকটা? রাত আটটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে নেমে বিভু ভিড়ের মধ্যে লোকটার পিছু নেয়। লোকটার ডান হাতে সুটকেস, বাঁ বগলে শতরঞ্জিতে বাঁধা ছোট বিছানা— মফস্‌সলির মতো হাবভাব। কিন্তু ও কিছু একটা জানে। নিশ্চিত। গতকাল থেকেই বিভুর মন ভাল নেই। মানুষ কত সহজেই টুক করে মরে যায়! এই তো একটু আগে বর্ধমানের কাছে কাটা পড়ল একটা লোক—এই লম্বা লোকটা গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল, কয়েক পলক এই লোকটার দিকে চেয়ে কাটা-পড়া মানুষটা মরে গেল। কী সহজ ব্যাপার! গতকাল আর-একটা লোক ঠিক ও-রকমই সহজভাবে মারা গেছে দুর্গাপুরে। ইউনিয়নের সেই লোকটা কীরকম ছিল কে জানে। বিভু তাকে চেনেও না। লোকটা সকালের শিফ্‌টে ডিউটিতে যাচ্ছিল—অল্প কুয়াশায় আবছা মাঠের ভিতর দিয়ে, একটা টিফিন-ক্যারিয়ার আর একটা থলে হাতে চলে আসছিল সে—সদ্য ঘুমভাঙা চোখে তখনও বোধ হয় বউ কি বাচ্চার মুখখানা ভাসছিল তার। অতশত জানে না বিভু, সে কেবল লোকটিকে আসতে দেখেছিল। লোকটা থেমে একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল— বিভু হাতে বাঁধা বোমাটা টপকে দিয়ে দৌড় দিল। রেল লাইনের ও পারে দাঁড়িয়ে ছিল জিপ গাড়িটা, তাকে তুলে নিল। জিপ গাড়িতেই টাকার লেনদেন হয়ে গেছে। এখন পকেট গরম, বিভু ফিরছে কলকাতায়। কিন্তু তবু গতকাল থেকেই তার মন ভাল নেই। দুনিয়াভর এত মানুষ, তার মধ্যে দু'-একজন মরে গেলে কী হয়! কিছুই না, তেমন কিছুই হয় না। এই যে বর্ধমানের কাছে কাটা পড়ল লোকটা তার জন্য কী হয়েছে। ট্রেনটা আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট দেরিতে এসেছে—তার বেশি কিছুই হয়নি। কামরার মধ্যে মানুষেরা 'আহা, উহু' করছিল বটে, কিন্তু দুঃখের চেয়েও তারা বিরক্তই হচ্ছিল বেশি ট্রেনটা লেট হচ্ছে বলে। কেবল ওই লম্বা লোকটা— যার হাতে টিনের সুটকেস, বগলে বিছানা— কেবল ওই লোকটাকেই অন্য রকম দেখেছিল বিভু। কাটা ছেঁড়া থ্যাঁতলানো হয়ে যাওয়া মানুষটাকে বুকে জাপটে ধরেছিল। বিভুর মনে ভাল লাগেনি। অত আদরের কী আছে? পৃথিবীর দু'-চারজন লোক কমে গেলে ক্ষতি কী? কালকের ইউনিয়নের সেই লোকটাই বিভুর প্রথম 'কেস' নয়। এর আগে আর একজন তার হাতে গেছে কলকাতায়। দু'বারই দুই ঘটনার সময়ে বিভুর একটা অদ্ভুত দৃশ্য মনে পড়েছিল। অনেক দিন আগে দেশের বাড়িতে বাবা খেতের কাজ করতে যেত। বেলাশেষে তার জন্য ভাত বয়ে নিয়ে যেত বিভু। এক দিন ভাত দিয়ে ফেরার সময়ে আলপথে

খেলতে খেলতে অন্যমনে ফিরছিল বিভু। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ভীষণ চিৎকার করে ডাকল, ভাই রে-এ। পিছন ফিরে সে দেখল একজন মুসলমান লোক লম্বা লাঠি উঁচু করে ধরে চেঁচিয়ে বলছে, ভাই রে, তুই এঁকেবেঁকে ছোট, এঁকেবেঁকে ছোট... আর তখন বিভু দেখতে পেয়েছিল চষা জমির ওপর দিয়ে তার পিছু নিয়েছে কাল-কেউটে... বিভু ছুটেছিল। আর তার ছায়ায় ছোবল মারতে মারতে পিছু পিছু সাপটা। 'ভয় নাই রে, এসে গেছি...' বলতে বলতে মাঠটা কোনাকুনি পার হয়ে এল সেই মুসলমান লোকটা, লম্বা লাঠির এক ঘায়ে সাপটাকে নিশ্চল করে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে সাপটাকে বলল, আর একটু হলিই আমার ভাইটারে খেয়েছিলি শালা...। অনেক দিন আগের সেই ঘটনা তবু দু' বারই বিভুর সেই দৃশ্যটা মনে পড়েছে। চষা নিষ্ফলা জমির ওপারে উঁচু আলের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ বেলার ম্লান আলোর ছায়ার মতো একজন মুসলমান লোক লম্বা লাঠি উঁচু করে তাকে চেঁচিয়ে বলছে, ভাই রে, তুই এঁকেবেঁকে ছোট, এঁকেবেঁকে ছোট... বিভুর মন ভাল লাগে না। গতকাল সকালবেলা লোকটাকে বোমা মেরে যখন জিপ গাড়ির দিকে দৌড়চ্ছে বিভু তখনও হুবহু সেই দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল— নিস্তেজ বিকেলে, তার পিছু নেওয়া সেই সাপ, দূরে আলের ওপর দাঁড়ানো সেই লাঠি-হাতে মুসলমান লোকটা চেঁচিয়ে বলছে, ভাই—রে-এ-এ—

এই লম্বা চেহারার লোকটা বলেছিল, 'জানে'। কী জানে ও? কেমন করে জানে?

হাওড়া স্টেশনের প্রকাণ্ড হলঘর আর চাতাল পার হয়ে সিঁড়িতে পা দেওয়ার মুখে সে পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে লোকটাকে স্পর্শ করল।

রমেন মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দুর্গাপুরের সেই ছেলেটা।

কোন দিকে যাবেন? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

রমেন মৃদু স্বরে বলে, যাদবপুরের দিকে।

আমিও, ওই দিকেই। ট্যাক্সি নেব, আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাবেন?

না, বিভু যাদবপুরের দিকে যাবে না, সে যাবে বেহালা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে বরং ঘুরপথে লোকটাকে যাদবপুরে নামিয়ে দিয়েই যাবে। জানা দরকার এ-লোকটা কী জানে! কতটুকু জানে!

রমেন হাসল, তারপর মাথা নেড়ে জানাল, যাবে।

ট্যাক্সিতে ছেলেটা রমেনকে সিগারেট দিল। দু'-একটা মামুলি কথাবার্তা বলল। তারপর চুপ করে রইল।

বাইরে কলকাতা। আরও পুরনো আরও ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। যেন প্রাণপণে রুজ-পাউডার মেখে আছে এক বুড়ি ট্যাঁশ মেম! ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছে বাজার করার চটের থলে। মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে ট্রাফিকের সুন্দর হলুদ বাতিটি। বিধাতার মতো আত্মবিশ্বাসে হাত বাড়ায় মোড়ের পুলিশ। মতলববাজ মানুষের চোখ জোনাকি পোকার মতো জ্বলে উঠেই ভিড়ের মধ্যে নিবে যায়।

রমেন বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

ছেলেটা তার দিকে একটু ঝুঁকে বলল, আমার চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায়?

রমেন একটু নড়ল। তারপর তার স্বচ্ছ সুন্দর মুখখানা ফেরাল ছেলেটির দিকে, নরম গলায় বলল, চেহারায় মানুষের কর্মের কিছু কিছু ছাপ থাকে।

আমার আছে?

রমেন মাথা নাড়ল, আছে।

আছে। তবে আছে। অধৈর্য বিভু সিগারেট বাইরে ছুড়ে দেয়। তার চেহারায় ছাপ পড়ে গেছে। আসলে এ-সবের জন্য দায়ী একটি মেয়ে। মৃদুলা। দেখতে এমন কিছু সুন্দর ছিল না। রং ময়লা, গালে এক-আধটা ব্রন, নাক ভোঁতা। তবু কী যে টান ছিল তার। বিভু কথা বলতে পারেনি কোনও দিন, তার বুক কাঁপত। সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মৃদুলার বাপ জাত দেখাল। তারপর সরিয়ে নিয়ে গেল মৃদুলাকে কোথায়! তার হাতের বাইরে। আক্রোশে বিভুর সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করে, মাথায় রক্ত উঠে আসে ছল ছল করে! তার কাছে মানুষের মূল্য কমে যায়। পৃথিবীতে এত মেয়ে আছে, তার মধ্যে সে একজন সামান্য মৃদুলাকে চেয়েছিল— যার নাক ভোঁতা, গালে ব্রন, রং ময়লা। সে ওই ব্রনগুলিতে

আদরের হাত বুলিয়ে দিত, ঠোঁট ছোঁয়াত চাপা নাকটিতে, নিজের গায়ে মেখে নিত ওর ময়লা রং। কত কথা মৃদুলাকে বলবার জন্য মনে মনে তৈরি করেছিল সে, যখন একমাত্র মৃদুলাকে চায় সে, তখন একমাত্র সেই মৃদুলাকেই পাচার করে দেওয়া হল অন্য জায়গায়। সে জানে মাস দেড়েক আগে মৃদুলার বিয়ে হয়ে গেছে। তাকে পাত্তা দিল না মেয়েটা। ঠিক আছে। তবে এবার পাত্তা দাও বিভুকে, পৃথিবীর মানুষ। বুটের লাথি খেয়ে পাত্তা দাও, ছোরা খেয়ে ঢলে পড়তে পড়তে, আচমকা বোমা খেয়ে উড়ে যেতে যেতে...। দেখো হে, আমি বিভু—বিভু মাস্তান। বাপের সুপুত্র। কোথায় যাবে মৃদুলা? একদিন ঠিক দেখা হয়ে যাবে। বিভু জানে।

খ্যাপাটে চোখে বিভু তার দিকে তাকাল, কীসের ছাপ পড়েছে আমার চেহারায়?

হাত বাড়িয়ে রমেন তার হাতখানা ধরল। ম্লান মুখে বলল, আপনি তো জানেন।

বিভু হাত টেনে নেয়, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন? ওস্তাদের মতো বললেন, জানি। কী জানেন আপনি? আপনি কি জ্যোতিষ?

রমেন মাথা নাড়ল, না।

তবে? বিভু বিহ্বলভাবে চার দিকে চায়, বলে, আপনি তবে কোথাও আমাকে দেখেছেন! কোথায়?

একটি কিংবা দু'টি খুন করার পর মানুষের চোখ স্থির হয়ে যায়। বাইরে থেকে দেখায় শান্ত, কিন্তু আসলে তা শান্ত নয়। তখন চোখের পাতার একটা গাঢ় ছায়া পড়ে মণিতে। রমেন তা জানে। কিন্তু কী করে তা বলবে রমেন, অত আন্দাজি কিছু বলা যায়!

রমেন একটু কাশল, তারপর ঘুরিয়ে দিল কথাটা, না, আপনাকে এর আগে কোথাও দেখিনি। তবে আপনার চেহারা দেখে মনে হয় সম্প্রতি আপনার কোনও আপনজন মারা গেছেন।

মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় বিভু, হঠকারীর মতো বলে ফেলে, না, না, তারা কেউ আমার আপনজন ছিল না। আমি তাদের চিনতামই না—

রমেন বুঝতে পারে ছেলেটা প্রকৃতিস্থ নেই। সে ত্বরিতে ওর হাত নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, আমি বুঝেছি। ইঙ্গিতে ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলে, ও শুনতে পাবে; চুপ করুন...

বিভু হকচকিয়ে চুপ করে যায়। তারপর চুপ করে থাকে।

রমেন ওর হাতে হাত বুলিয়ে দেয় তারপর খুব মৃদু গলায় বলে, কে বলল যে, তারা আপনার আপনজন ছিল না?

আর কথাবার্তা তেমন কিছু হল না। বিভু সারাক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আর ওর হাতখানা কোলে নিয়ে বসে রইল রমেন।

অনেক দিন আগে, রমেনের বয়স যখন দশ-এগারো, তখন যুদ্ধ চলছে। তাদের তিনটে বন্দুক তখন সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। তাই সেই বয়সেই তাড়াতাড়ি বন্দুক শেখানোর জন্য তাদের পুরনো চাকর উদ্ধব আর ড্রাইভার আশু তাকে নিয়ে গেল কেওটখালির মাঠে। দূরে রাখল তিনপায়া একটা ব্ল্যাক বোর্ড, তাতে দু'টো বৃত্ত আঁকল, তারপর তার হাতে তুলে দিল কারুকার্যকরা ভারী বন্দুকখানা। বলল, মারো, মাঝখানের গোল্লাটায় মারো। রমেন মেরেছিল, ভীষণ শব্দে প্রথমবার হাত থেকে প্রায় ছিটকে গেল বন্দুকখানা, গুলিটা কোথাও লাগেনি—উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর কয়েক বারের চেষ্টাতেই সে ঠিক মাঝখানের বৃত্তটাকে ফুটো করে দিল। উদ্ধব বলল, আর জন্মে তুমি অর্জুন ছিলে। তারপর বন্দুক চালানো নেশার মতো পেয়ে বসল তাকে। উদ্ধব দ্রোণাচার্যের মতো বোর্ডে পাখি এঁকে চোখ বসিয়ে বলত, চোখে মারো তো। রমেন মারত। যখন এই ভীষণ নেশা তাকে প্রতি দিন বিকেল বেলা ঘর ছেড়ে বন্দুক হাতে বেরোনোর জন্য অস্থির করে তুলত, সেই সময়ে একদিন বন্দুকগুলো জমা পড়ে গেল। সন্ধেবেলা ভীষণ দুঃখে দাদুর ইজিচেয়ারের পাশে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ছিল রমেন, দাদু তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, এ তো ভালই হল। এর পরে একদিন তোমাকে দেখলে অবোধ জন্তুরা ভয় পেত। রমেন বোঝেনি। অনেকক্ষণ পর একসময়ে দাদু মৃদু স্বরে আপনমনে বলল, তুমিই আমার অস্ত্র।

সে-কথাটার অর্থ রমেন এখন খানিকটা বোঝে। এই অচেনা ছেলেটা তার পাশে বসে আছে, এর

ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে হয়তো রয়েছে হাতে-বাঁধা বোমা, তলপেটের কাছে লুকানো ছোরা—তবু কত নিরস্ত্র, অসহায় দেখাচ্ছে একে। এ জানে না অস্ত্রের ব্যবহার, কিংবা প্রকৃত অস্ত্র কাকে বলে। এক দিন এ নিজের হাতে মারা যাবে।

রমেন বড় মায়ায় ছেলেটির হাতে হাত বুলোয়।

যাদবপুরের কাছে ট্যাক্সি থেকে নেমে জানালা দিয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল রমেন, আবার কোনও দিন দেখা হয়ে যাবে। আচ্ছা ভাই...

আচ্ছা... ছেলেটা হাত তুলল।

ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিল ট্যাক্সিওয়ালা।

রমেন একা একটু হাসে। মানুষের কাছ থেকে মানুষের কাছে, ক্রমে আরওতর মানুষের কাছে চলেছে সে। এইভাবেই দিন কাটে তার।

যাদবপুরের কিছুই আর চেনা যায় না। যখন প্রথম এখানে প্রজারা বসত নিয়েছিল, তখন মাঝে মধ্যে আসত রমেন। দুপুরেও ঝিঁঝির শব্দ শোনা যেত। শোনা যেত মাটি কাটার শব্দ। জমির দখল নিয়ে লাগত কাজিয়া, লাঠি সড়কি বেরোত। ঝগড়া লাগত কমিটিতে কমিটিতে। ফড়ে আর দালালদের যাতায়াত ছিল খুব। উচ্ছেদের হুমকি দিতে আসত দারোগা। তখন সারা দিন প্রজাদের কাছে কাছে থাকত রমেন। সঙ্গে থাকত উদ্ধব আর লব। তাদের হাতে লাঠি। বাইরের হাঙ্গামার জন্য তারা ছিল, রমেন দেখত জমির বণ্টন। যাদবপুর থেকে পুঁটিয়ারি, বারাসাত, দমদম, হাবড়া, কখনও বা সুন্দরবনের দিকে ঘুরে ঘুরে সে বেরিয়েছে। নতুন জায়গায় এসে দিশেহারা প্রজারা তাকে দেখে বল-ভরসা পেয়েছে আবার। কখনও কখনও জিপ গাড়িতে নিশান উড়িয়ে কাজ দেখাতে আসত পার্টির লোক, জমির লোভ দেখিয়ে ঘুষ চাইত কমিটির মেম্বার, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠত কো-অপারেটিভ সোসাইটি। রমেন তার প্রজাদের আড়াল দিয়ে দাঁড়াত।

এখনকার আলো ঝলমলে যাদবপুর দেখে খুশি হয় রমেন। গায়ে গায়ে দোকান, ট্যাক্সির স্ট্যান্ড, কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়। একটু অচেনা লাগে তার। কিন্তু চেনা রাস্তা খুব কমই হেঁটেছে সে জীবনে।

রিকশাওয়ালা ক্রিং করে বেলের শব্দ করে বলে, যাবেন বাবু—

রমেন সুন্দর শান্ত হাসি হেসে বলে, না ভাই।

রেল লাইন পেরিয়েও অনেকটা হাঁটতে হল রমেনকে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করতে হল। কলোনির একদম শেষ দিকে উদ্ধব জমি নিয়ে ঘর করেছিল, সেটা রমেনের মনে আছে। কিন্তু এখন আর কলোনির কোনও শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। রেল লাইনটা এক দিকে আটকে রেখেছে, অন্য আর সবদিকে বাড়ির পর বাড়ি। সব প্রাকৃতিক দৃশ্য মুছে গেছে।

উদ্ধবের ছোট মেয়েটি কুপি উঁচু করে ধরে আগলের ও-পার থেকে জিজ্ঞেস করে, কে?

উদ্ধবের বাড়ি এটা?

অন্ধকারে, কুপির আলোর আবছায়ায় প্রকাণ্ড লম্বা লোকটিকে অবাক আর ভিতু চোখে দেখে শিশু মেয়েটি। তারপর ফিরে গিয়ে মাকে ডেকে আনে।

ঘোমটা টেনে উদ্ধবের বউ সামনে আসে, কাকে চান?

উদ্ধব কি বাড়িতে নেই!

না। ফিরতে তিনির রাত হয়। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

বউটি ঠিক বুঝতে পারে না।

রমেন একটু ইতস্তত করে বহুদিনকার পুরনো ভুলে-যাওয়া এক নাম বলে, রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

অমনি চঞ্চল হয়ে ওঠে বউটি। কী করবে বুঝতে পারে না। প্রথমেই তার মুখ দিয়ে বেরোয়, ওঃ মা!

আগল খুলে হাট করে দেয় বউটি। অভ্যর্থনার কোনও ভাষা মুখ দিয়ে বেরোয় না। মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে। এ যে বুড়োকর্তার নাতির নাম! এ নাম যে তার শিশুবয়সের সংস্কার!

পর দিন সকালে উদ্ধবের উঠোন ভরে যায় মানুষে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ টাকা রেখে প্রণাম করে। দেখে অনেক দিন আগেকার কথা মনে পড়ে যায় বলে রমেন হাসে। টাকা ফিরিয়ে দেয়, বলে, চিরকাল তোমরা আমাকে অনেক দিয়েছ। এবার বলো তোমাদের আমি কী দিতে পারি?

উদ্ধব চেঁচিয়ে বলে, তুমি আমাদের কাছে থাকো। আমরা সবাই মিলে তোমাকে বসত করে দেব, বিয়ে দেব, সংসারী করব। তার বদলে তুমি আমাদের দেখবে, যেমন বুড়ো কর্তা দেখত।

কিন্তু এক জায়গায় থাকে না রমেন। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গা। বাইরে থেকে শান্ত দেখায় তাকে। কিন্তু তার ভিতরে ভিতরে এক তীব্র আনন্দময় উত্তেজনা থরথর করে কাঁপে।

অনন্ত মন্ডলের বাড়ি পশ্চিম পুঁটিয়ারি। তার নেশা জমি। দেশে থাকতে চাষ করত, এখন আর তা করে না, কিন্তু জমিরই ব্যবসা তার। কোনও কোনও জায়গা, দেখলেই সে বুঝতে পারে যে এখানে একদিন বসত হবে। অমনি এক লপ্তে জমি কেনে, মাটি ফেলে উঁচু করে, তার দিয়ে ঘিরে ফেলে রাখে। দু'-তিন বছরের মধ্যেই বিঘার দর কাঠার দরের নীচে চলে যায়। ঘোড়েল দু'খানা চোখ অনন্তর—জমি, তার চোখে চোখে কথা বলে। এখন তার ঘরে ফ্লুরোসেন্ট আলো জ্বলে, রেডিয়োর আওয়াজ হয়, বাগানে ফুটে থাকে রজনীগন্ধা। তার দু'টো বউ আজকাল ঝগড়া কাজিয়া কম করে। ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যায়।

ছোটকর্তার লম্বা চেহারাখানা তার বারান্দায় সকালের রোদে ছায়া ফেলতেই চমকে ওঠে অনন্ত, পাগলের মতো দু' হাত ওপরে তুলে চেঁচায়, ছোটকর্তা না? অ্যাঁ?

রমেন দেশি সুরে কথা বলে, অনন্ত কেমন?

মুহূর্তে তুলকালাম কাণ্ড করতে থাকে অনন্ত। দুই বউকে টেনে নিয়ে আসে, নড়া ধরে আনে ছানাপোনাদের, রমেনের পায়ের কাছে ফেলে আর চেঁচায়, ভগবান, ভগবান!

ছেলেপুলেরা এখন বুঝতে শিখেছে। তারা ব্যাপারটা পছন্দ করে না। দেশ ভাগের সময়ে হয় তারা শিশু ছিল, নয়তো জন্মায়নি। কাজেই একটা অচেনা লোককে নিয়ে বাবার লাফালাফি তাদের আত্মসম্মানে ঘা দেয়। কিন্তু দুই বউ পায়ে লুটিয়ে পড়ে, তাদেব চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রমেন হাত জোড় করে চোখ বুজে তাদের প্রণাম নেয়।

রমেন বারান্দায় থামে ঠেস দিয়ে বসে। তাকে ঘিরে বসে অনন্ত, দুই বউ, আর শিশু ছেলেমেয়েরা। তদ্গতভাবে চেয়ে থাকে অনন্ত, আপনমনে হাসে, চোখ মোছে।

অনন্তর বড় ছেলে পার্টি করে, সে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করতেই অনন্ত ঝাঁকি মেরে ওঠে, পায়ে হাত দে। রমেন উঠে দু' হাতে ছেলেটিকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, ঠিক আছে, ও-ই যথেষ্ট।

সবাই গোল হয়ে বসে রমেনের গল্প শোনে। বড়রা সবাই দেখেছে ছোটকর্তাকে গাড়ি চালাতে, বন্দুক ছুড়তে। কিন্তু এখন এ কী চেহারা ছোটকর্তার? তাদের চোখ ছল ছল করে।

আপনাদের কাছে কত সুখে ছিলাম, ছোটকর্তা?

রমেন হাসে, কেন সুখে ছিলে?

আপনারা ছিলেন আমাদের আপনজন, যেন আত্মীয়।

রমেন একটু চুপ করে থেকে বলে, কিন্তু এখন তো আমি ভিক্ষুক।

অনন্ত সোজা হয়ে বসে, কী কন ছোটকর্তা! আমরা আছি না? কীসের অভাব আপনার, বলেন!

রমেনের মনে আছে অনেক দিন আগে তার পৈতের সময়ে দণ্ডী ঘরে যাওয়ার আগে গায়ে গেরুয়া উত্তরীয়, হাতে দণ্ড আর ঝোলা, কামানো মাথা—এই রকম চেহারায় সে সমবেত ভদ্রমণ্ডলির কাছে তার গেরুয়া ঝোলা বাড়িয়ে ধরে ভিক্ষে করছে, ভবতি ভিক্ষাং দেহি। ভবান্ ভিক্ষাং দেহি। সঙ্গে তার কাঁধে হাত রেখে দাদু আর কুলপুরোহিত সতীশ ভরদ্বাজ। ভদ্রজনের কাছে ভিক্ষা চাওয়া শেষ হলে দাদু তার হাত ধরে বাইরের উঠোনে নামিয়ে আনল। সেখানে হাজার প্রজা দাঁড়িয়ে। সে ঝোলা সামনে বাড়িয়ে 'ভিক্ষাং দেহি' বলার সঙ্গে সঙ্গে কী চঞ্চলতা পড়ে গেল সেই সহস্র লোকের মধ্যে। যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল মানুষের ভিতরে। তারা আশা করেনি ছোটকর্তা ভিক্ষে চাইবে তাদের কাছেও।

মুহূর্তে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। তাদের হাত কাঁপে, মুখে উত্তেজনার চাপা উজ্জ্বলতা। তারা যে যা এনেছিল সব ঢেলে দেয় রমেনের ঝোলায়। তারা ছোট্ট রমেনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে, চেঁচিয়ে ডাকে, কাছে আসতে চায়, দাদু কানের কাছে গুনগুন করে বলে, বলো, ভবান্ ভিক্ষাং দেহি, বলো চেঁচিয়ে, বলো অন্তর থেকে। ছোট্ট রমেন চেঁচিয়ে বলতে থাকে, ভিক্ষা দাও, আমাকে ভিক্ষা দাও। আবেগে তার গলা কাঁপে, চোখে জল আসে। ঝোলার ভারে কাঁধ ছিঁড়ে পড়ে, তাই টেনে টেনে রমেন হাঁটে, ভিক্ষে চায়। মানুষ ঘিরে ধরে তাকে। চোখের জল মুছে ভিক্ষে দেয়। রমেনের আর খেয়াল থাকে না সে কী করছে, কিংবা সে আসলে কে। তার বিমুগ্ধ মন কেবল ভাবে যে সে এক মহান ভিক্ষুক। নেশার মতো ওই ভিক্ষাবৃত্তি তাকে টেনে নিয়ে যায়, সে ফিরে আসতে পারে না। আর ফিরে আসার দরকারই বা কী! সে কখন যেন ভিক্ষে চাইতে চাইতে দেউড়ি পার হয়, লাল ধূলোর রাস্তায় পড়ে। দু'ধারে জয়ধ্বনির মতো চেঁচিয়ে ওঠে মানুষ, তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

দেউড়ি পার হতেই কে যেন তার হাত ধরেছিল। ব্যস আর না, এবার ফিরে এসো। ছোট্ট রমেন অভিভূত চোখে চেয়ে ছিল। কোথায় ফিরবে সে? কেন ফিবরে?

আজ রমেন জানে, তারা যে সৎ জমিদার সেটা প্রমাণ করার জন্যই যে দাদু প্রজাদের কাছে তাকে দিয়ে ভিক্ষে করিয়েছিল তা নয়। দাদুর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় দণ্ডিঘরে এসে তাকে আহ্নিক করার পদ্ধতি শেখাবার পর দাদু বলেছিল, রমেন, ব্রহ্ম মানে বিস্তার। ব্রাহ্মণ তাই তার ক্ষুদ্র বাড়িতে বা সংসারে আবদ্ধ থাকেন না। তুমি যদি ব্রাহ্মণ তবে যেন একদিন সেই বিস্তার লাভ কোরো। আজ দরদালান থেকে ভিক্ষে করতে করতে তুমি দেউড়ি পার হয়ে গিয়েছিলে, ভিক্ষে চাওয়ার সময়ে তুমি কাঁদছিলে—কেন বলো তো। কারণ, ওই একটুতেই তুমি টের পেয়েছিলে বিস্তার কাকে বলে।

দাদু এসে দিনের অনেকটা সময় থাকত তার আবছা অন্ধকারে দণ্ডি ঘরে। বলত, তুমি মনেও কোরো না যে তুমি জমিদারের ছেলে বলে লোকে তোমাকে ভিক্ষা দিয়ে কেঁদেছে। তা নয়। আসলে তারা কেঁদেছে সেই ব্রাহ্মণের জন্য যে একদিন ভারতবর্ষকে ধর্ম দান করেছিল। শিখিয়েছিল কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়, কীভাবে বেড়ে উঠতে হয়। তারা ভিক্ষার ছলে ছলে যেত মানুষের কাছাকাছি, তাদের দাওয়ায় বসত, দুঃখের কথা শুনত, ভাগীদার হত তার মনের। এইরকম করেছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও— তারা যাজনে ছেয়ে ফেলেছিল দেশ, ভিক্ষার ছলে ছলে তারা ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল বুদ্ধের বাণী। মনে রেখো, ভিক্ষুকের পাত্র থেকে শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষের বিপ্লব। কারণ ভিক্ষা থেকেই এসেছিল জন-সংযোগ, জন-জাগরণ। মানুষের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া। ভিক্ষুকরাই তা করেছিল।

তারপর দাদু অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিল, কিন্তু আমি তোমাকে ভিক্ষে করতে বলতে পারি না। খামোখা তুমি ভিক্ষে করবে কেন? কিন্তু যদি তাঁব দেখা পাও, যিনি তোমাকে অন্ধ করে দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন তোমার বল, তাবপর আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন—যদি তাঁকে কোনও দিন পাও, আর তিনি যদি তোমাকে ভিক্ষা করতে পাঠান তবে প্রসন্ন মনে তা কোরো। কিন্তু তুমি কি তাকে কোনও দিন খুঁজবে রমেন?

দাদু চুপ করে অন্যমনস্ক থেকেছিলেন, তারপর বলেছিলেন, দুঃখে কাতর মানুষই কেবল তাঁর অনুসন্ধান করে। রমেন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তোমার জীবনে যেন দুঃখ তাড়াতাড়ি আসে।

অনন্ত আর তার ছেলে, বউয়ের কাছে সেই সব গল্প করছিল রমেন।

হঠাৎ চোখ মুছে অনন্ত বলে, হাঁ, মনে আছে কর্তা, কী সুন্দর আছিল আপনার ব্রহ্মচাবীর পোশাক। আমি ভিক্ষা দিছিলাম। আঙুল থিক্যা খুইল্যা দিছিলাম রুপার আংটি আর কোমরের কষি থিক্যা দুইটা টাকা। আইজ আমি আরও বেশি দিতে পারি। বলেন কী চাই!

আমি তোমারে কী দিচ্ছি?

এই তো দিলেন! এই যে আসলেন অধমের বাড়িতে, চোখ জুড়াইয়া গেল।

রমেন মাথা নাড়ে, হাসে, বলে, আবার আসুম হে, আবার—

অনন্তর বড় ছেলে—একুশ কি বাইশ বছর বয়স—রমেনের পিছু নিয়ে রাস্তায় আসে। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, আপনি কি তাঁকে পেয়েছিলেন?

সতীশ ভরদ্বাজ—সেই কালো বেঁটে তেজি ব্রাহ্মণ—এখন শয্যাগত। ছেলেদের সঙ্গে বনিবনা হয়নি,

তারা আলাদা থাকে, সামান্য কিছু দেয়। দুই মেয়ের একজন প্রেম করে বিয়ে করেছে, অন্যজন বিধবা— শ্বশুরবাড়িতে আঁকড়ে পড়ে আছে।

বুকচাপা, অন্ধকার, ভ্যাপসা টিনের ঘরটায় রমেন ঢুকে দেখে বিছানায় একখানা ছায়া পড়ে আছে। দু'খানা চোখ জ্বলজ্বল করে প্রত্যাশায়।

কষ্টে উঠে বসে সতীশ ভরদ্বাজ, বলে, আমার বুড়িটার কপালে তখনও সিন্দূর—বুঝলা? বসো হে, তোমারও তো সব গেছে!

রমেন পায়ের দিকটায় বসে। সতীশ ভরদ্বাজ—সেই অহংকারী তেজি লোকটা—আক্ষেপ করে, আমি তো সদ্‌ব্রাহ্মণ, তবে ক্যান আমার এই অকাল মৃত্যু? ক্যান আমার বংশে অনাচার, অলক্ষ্মী? ইষ্ট কই?

বুড়ি একটা মোড়া পেতে সামনে বসে। গোদা পা দু'খানা দেখলেই বোঝা যায় শরীরে জল এসেছে। সিঁদুরের তলায় সিঁথিতে ঘা দেখা যায়। কপাল চাপড়ায় বুড়ি—সব গেল গিয়া।

কিছুই যায়নি। শতগুণে ফিরে আসছে সব। আর কয়েকটা দিন মানুষ তার সম্পূর্ণ ভুলগুলো বুঝে নিতে যতটা সময় নেবে— তারপরই বিপ্লবী ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে ছেয়ে যাবে দেশ। জীবন বৃদ্ধির ধর্ম দান করে বেড়াবে মানুষকে। তেমন ভিখারিকে সর্বস্ব দেওয়ার জন্য ছুটবে মানুষ।

রমেনের শান্ত তৃপ্ত মুখখানা দেখে হঠাৎ যেন সতীশ ভরদ্বাজ কেমন একটু আশান্বিত হয়ে ওঠে। সর্বস্বই কি গেছে ছেলেটার? না কি আবার কিছু পেয়েছে!

ঘর অন্ধকার করে সন্ধেবেলায় শুয়ে ছিল রমণীমোহন। পুত্রশোক দু'টি গেছে পর পর। আগে নদীর তলা থেকে এক ডুবে খামচি দিয়ে মাটি তুলে আনত, এখন হাঁপানিতে হাঁফায় সারা দিন। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করে। কীরকম উদ্দণ্ড কীর্তন করত রমণী তা আর এখন কারও মনে নেই। বিধবার সম্পত্তি, গ্রাস করে করেছে ছোট্ট বাড়িখানা. তারপর থেকে পাপবোধে ভুগছে।

কই হে, রমণী।

ছোটকর্তার গলা না? রমণী চমকে ওঠে। তারপরেই বুঝতে পারে ওটা ভুল। কর্তারা কোথায় চলে গেছে! কে জানে বেঁচে আছে কি না! রমণী পাশ ফিরে শোয়।

কে যেন হাত ধরে তাকে তুলে বসায়। আবছা অন্ধকারে মুখোমুখি ছোটকর্তার মুখ। যেন ঘুম ভাঙার পরে স্বপ্ন।

রমেন চলতে চলতে মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। চার দিকের আবহাওয়ায় কিছু একটা অনুভব করতে চেষ্টা করে। প্রতি জনপদেরই একটা বিশিষ্টতা আছে। অনেক মানুষ এক জায়গায় বসবাস করতে করতে কিছুটা একে অন্যের মতো হয়ে যায়। তাদের যৌথ চিন্তার বিকিরণ সেই জায়গার আবহাওয়াকে সম্মোহিত করে রাখে। কখনও রমেন মফস্‌সলের কোনও ছোট্ট শহরে পা দিয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে, এ-জায়গা অর্থলিপ্সুদের অধিকারে। প্রায় সময়েই দেখা গেছে যে তার ভুল হয়নি।

মানুষের চারধারে জ্যোতির্বলয় নেই। না থাক, কিন্তু তার অস্তিত্বের একটা বলয় সে তার চারধারে নিয়ে বেড়ায়। সেটা হয়তো তার গায়ের উত্তাপ, রক্তের স্পন্দন, গায়ের বিশেষ গন্ধ। দেহ সবসময়েই বিকিরণ করছে তার অস্তিত্বের সংবাদ। ঠিক সে-রকম, মানুষ তার সারা জীবনের যা কিছু কাজ তার স্বভাব এবং চিন্তারও একটি বলয় তৈরি করে নিজের অজান্তে। একে অন্যের বলয়ের মধ্যে এসে কী একটা টের পায়, কিন্তু সঠিক বোঝে না। তার নিজের অস্তিত্ব তাকে ব্যতিব্যস্ত রাখে বলেই সে অন্যকে সঠিক চিনতে পারে না।

কিন্তু রমেন পারে। সে স্পষ্টতই মানুষের চারধারে সেই বিশেষ বলয়টিকে অনুভব করে। যত মানুষ তার কাছাকাছি আসে, রাস্তায় মুখোমুখি এসে পেরিয়ে যায়। কিংবা রেলগাড়িতে বসে থাকে মুখোমুখি—তাদের প্রত্যেককেই বুভুক্ষু ভালবাসায় লক্ষ করে রমেন। সবসময়েই সে মানুষের সেই বলয়টির নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে।

মানুষেরা জোটবদ্ধ হয়, হতে থাকে তার চার পাশে। প্রজারা পাড়ার প্রতিবেশীদের ডেকে আনে ছোটকর্তাকে দেখাবার জন্য। রমেন তাদের কাছাকাছি যায়, দাওয়ায় বসে, বহু দূর হেঁটে যায় একসঙ্গে। মানুষ সংগ্রহ করতে থাকে সে, সংগ্রহ করতে থাকে মানুষের সর্বস্ব। একদিন এই বিপুল ভিক্ষা সে নিয়ে

যাবে তাঁর কাছে, যিনি একদিন তাঁকে নিশির ডাকের মতো ডেকে নিয়েছিলেন।

ভাদ্রের শেষ এখন। বাংলাদেশের প্রকৃতি সেজে উঠেছে এই সময়ে। অনেক দূর দেশের পাখি আর বাতাস আর সুন্দর পালের নৌকোর মতো মেঘ আসে। গত বর্ষার স্মৃতি মানুষ ভুলে যায়। ঠিক ওই পাখি বা মেঘের মতোই নূতন একটি জিনিস দেখতে পায় লোক—পুটিয়ারি, বারাসাত, চব্বিশ পরগনা, হুগলিতে। তারা দেখে গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় রমেনকে। সঙ্গে তার দুঃখী মানুষেরা। লোকটাকে দেখলেই বড় ভাল লাগে মানুষের—এক পলকের জন্য সংসারের সুখ-দুঃখের কথা ভুল পড়ে যায়। মানুষের মাথার চার দিকে জ্যোতির্বলয় নেই— এ তো ঠিক কথাই। কিন্তু কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয়, এর মাথার চার দিকে ও-রকম অদৃশ্য কিছু একটা রয়েছে।

কীভাবে সেই বিপ্লব শুরু হবে তা মাঝে মাঝে ভাবে রমেন। কেবলই মনে হয় পারাপার জুড়ে শুয়ে আছে কর্ষিত ভূমি। তার হাতে বীজ।

## ॥ ছাব্বিশ ॥

রমেনের জীবনে দুঃখ তাড়াতাড়ি এসেছিল, যেমন ছিল তার দাদুর আশীর্বাদ।

মাঝে মাঝে একটা বুড়ো ময়ূর আর একটা পুরনো মোটর গাড়ির কথা রমেনের মনে পড়ে। তাদের বারবাড়ির উঠোন ছিল কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু। সেই সবুজ ঢালু মাঠে ধূসর রঙের ময়ূরটা এক বোঝা পেখম টেনে আস্তে আস্তে চরে বেড়াচ্ছে। কিংবা লজঝড়ে, পুরনো, ক্যাম্বিসের হুডওয়ালা তাদের গাড়িটা বৃষ্টির দিনে পাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে! কখনও বা মনে পড়ে, প্রকাণ্ড ভাঙা পিয়ানোর ওপর ধুলোর আস্তরণ, তার ওপর আঙুল দিয়ে রমেন তার নাম লিখছে— রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কিংবা মনে পড়ে, তাদের ভূতগ্রস্ত, প্রকাণ্ড বাড়িটার পশ্চিমের ভিতের কাছে একটা আতসকাচ হাতে দাদু বসে আছে। চোখাচোখি হলে দাদু হেসে বলতেন, দেখো রমেন, পিঁপড়ে কেমন মাটি তুলেছে! তারপর চিন্তিতমুখে মাথা নেড়ে বলতেন তিনি, দেখো, পশ্চিমের ভিত থেকেই বাড়িটার ভাঙন শুরু হবে। এই দিক থেকেই বাড়িটা গাঁথা শুরু হয়েছিল, আমার মনে আছে।

রমেন অবাক হয়ে বলেছে, সে তো একশো বছর আগেকার কথা! তুমি তখন কোথায়?

তখন দাদু বিব্রত মুখে আতসকাচখানা রেখে দু' হাতে চোখ মুছে নিয়েছেন, অপ্রতিভ হাসিমুখে বলেছেন, আমার মনে হয় আমি তখনও ছিলাম। এইখানেই। আমি দেখেছি এ-বাড়ির ভিত গাঁথা হতে।

কী করে?

পশ্চিমের নির্জন চত্বরে তারা দু'জন— রমেন আর তার প্রায়-অন্ধ দাদু দু'টি শিশুর মতো বসেছে পা ঝুলিয়ে। দাদু বলছে, তখন আমি আসতাম ব্রহ্মপুত্রের ও-পার থেকে, নৌকোয় পার হয়ে। আমার ছিল মাটিমজুরের কাজ। এখন যেখানে মুকুন্দর মাটি ফেলেছি এই ভিত গাঁথার সময়ে—এ-রকম আমার মনে পড়ে। তখন মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হত যে, এইখানে যে বড় বাড়িটা একদিন তৈরি হবে আমি যেন সেই বাড়িতে একদিন জন্মাই।

সত্যি? রমেন ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

দাদু হেসে বলেছেন, কী জানি! আমার এ-রকম মনে হয়।

দাদুর চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে রমেন তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যেত পুবের দালানের বারান্দায়, খুব ভোরবেলা সূর্য প্রণাম করতে। কখনও নিয়ে যেত ছাদে, সন্ধেবেলায় খোলা আকাশের নীচে। দাদু কখনও ক্বচিৎ চার দিকের পরিদৃশ্যমান জগতের কথা তার কাছে জানতে চাইতেন। কিন্তু দাদুকে অন্ধ বলে কখনও মনে হত না রমেনের। বরং মনে হত খুব গভীর ধ্যানস্থ মানুষটি চার পাশের দৃশ্যমানতার অনেক গভীরে ডুবে আছেন তাই তাঁর অন্যমনস্ক হাত তামাকের নলটা খুঁজে পাচ্ছে না।

একদিন সন্ধেবেলা দাদু হাতড়ে তার মাথাটা খুঁজে নিয়ে ডান হাতখানা মাথায় রেখে জিজ্ঞেস করলেন, রমেন, খুব ছেলেবেলার কোনও কথা তোমার মনে পড়ে?

রমেনের বয়স তখন বারো কি তেরো, সে একটু ভেবে বলল, পড়ে।

কী রকম?

রমেনের মনে পড়েছিল তার বাবার মৃত্যুর কথা। বয়ড়ার আবাদ থেকে ফেরার পথে ঘোড়াসুদ্ধ বাবাকে ধরেছিল কানাওলায়। বড় হয়ে রমেন জেনেছে কানাওলা আসলে ভূত নয়, এক ধরনের আবল্যি, মানুষের বোধবুদ্ধি কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট করে দেয়। বয়ড়া থেকে ফেরার পথে কালীজয়দের বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ পাশা খেলে রাতে ফিরছিল বাবা। ঘোড়া ছুটেছিল, কিন্তু কোথাও পৌঁছুতে পারছিল না। তখন যুদ্ধের সময় মাঠে মাঠে কাটা হয়েছে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ ট্রেঞ্চ, রাস্তার আলো নেই। ঘোড়া রাস্তা চিনত। ক্ষীণদৃষ্টি বাবা ঘোড়ার ভরসায় সওয়ার হয়ে বসে ছিল, কোনও দিকে ঘোড়াকে চালানোর চেষ্টা করেনি। কিন্তু ঘোড়াটা রাস্তা ঠিক করতে পারছিল না। তাকে ধরেছিল কানাওলা। কেউ কেউ দেখেছে মেজোকর্তার ঘোড়া সে-রাতে বড় রাস্তা ছেড়ে কেওটখালির মাঠে নেমে যাচ্ছে। তারা চিৎকার করে ডেকেছে বাবাকে। দূর মাঠ থেকে বাবা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু অন্ধকারে তাকে আব দেখা যায়নি। বাবা চেঁচিয়ে বলেছিল যে রাস্তা ঠিক করতে পারছে না। যারা দেখেছিল মেজোকর্তাকে তাদেব কেউ এসে খবর দিয়েছিল বাড়িতে। মুহূর্তে বাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল, কানাওলা কানাওলা— রমেনের মনে পড়ে, সে তখন খুব ছোট, কাছারি বাড়ির উঁচু বারান্দায় উদ্ধববর হাত ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে ব্রহ্মপুত্রের ঢালু পার দিয়ে মুকুন্দের ঘানিঘরের পিছনের মাঠ দিয়ে অনেক হ্যারিকেন দুলতে দুলতে যাচ্ছে বাবাকে খুঁজে বের করতে। বিশাল চরাচর জুড়ে অন্ধকারে অসহায় টিমটিমে হ্যারিকেনগুলো চলে যাচ্ছে দূরে। দূরাগত মানুষের কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতো ডাকছে—মেজোকর্তা—আ—। বাবাকে পাওয়া গিয়েছিল একটি অগভীর ট্রেঞ্চের মধ্যে, ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে ছিল ট্রেঞ্চের ধারে। বাবার মৃতদেহ কীরকম দেখেছিল তা রমেনের মনে নেই, কিন্তু মনে আছে পরদিন সকালবেলায় সে দেখেছিল সেই অপরাধী ঘোড়াটাকে, সকালের আলোয় যখন তাকে বাইরের উঠোনে হাঁটিয়ে আনা হল। কী লজ্জিত বিমর্ষ ছিল তার চলার ভঙ্গি।

দাদুকে সে সেই ঘটনার কথা বলতেই দাদু তামাকের নল টেনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তখন তোমার বয়স পাঁচ কি ছয়। ও-বয়সের অনেক কথাই মানুষের মনে থাকে। তোমার আরও ছেলেবেলার কথা মনে নেই!

রমেন আবার ভেবেছিল।

তখন সে কত ছোট কে জানে, তবে এক বার অনেক ছোট বয়সে— তার মনে পড়েছিল ভীষণ জ্বরের ঘোরে সে শুয়ে আছে। চার পাশটা আবছা দেখাচ্ছিল। কেউ একজন তার জিবের তলায় থার্মোমিটার গুঁজে দিয়েছিল, আর সে কড়মড় করে চিবিয়ে ফেলেছিল সেটা। তারপর তাকে উপুড় করে বমি করানো হয়েছিল।

সেই ঘটনার কথা শুনে দাদু প্রসন্ন হাসলেন, হ্যাঁ, তখন তোমার বয়স তিন। বাঃ রমেন, তোমার স্মৃতিশক্তি সুন্দর। কিন্তু আরও ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে কি?

এরপর রমেনকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছিল। আরও ছেলেবেলা! আরও ছোট বয়সের কথা!

তারপর তার হঠাৎ মনে পড়েছিল খুব ছেলেবেলায় হয়তো স্মৃতি, হয়তো বা কল্পনা—কিন্তু বহুদিন আগে সে যেন তার মায়ের হাতে একটা নীল রঙের কেটলি দেখেছিল।

শুনে দাদু নড়ে-চড়ে বসলেন। তামাকের নল নামিয়ে রেখে উত্তেজিত গলায় বললেন, তোমার দু' বছর বয়সে সেই কেটলিটা ভেঙে যায়। কিন্তু সেটা কল্পনা নয়, সত্যিই একটা নীল রঙের কেটলি আমাদের ছিল রমেন, তোমার ভুল হয়নি। কিন্তু তুমি আর-একটু চেষ্টা করো, দেখো তো আরও ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে কি না!

রমেন আবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে, হাত শক্ত মুঠো করে। সে দেখতে পেয়েছিল সেই ছেলেবেলা যেন এক কুয়াশার জগৎ, আবছায়ার মায়ারাজ্য। কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু কেমন যেন আভাস পাওয়া যায়।

দাদু উগ্র আগ্রহে তার মুখের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। জিজ্ঞেস করছিলেন, মনে পড়ে না রমেন। কিছুই মনে পড়ে না?

রমেন মাথা নেড়ে হেসে বলল, না।

খুব তুচ্ছ সামান্য কিছুও না?

রমেন বলল, না তো।

দাদু মৃদু হাসলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমি আজকাল এই খেলাটা খেলি। এই মনে পড়ার খেলা।

তোমার কত ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

দাদু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, অনেক দূর পর্যন্ত মনে পড়ে।

কত দূর।

দাদু একটু দ্বিধা করলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অনেক দূর। রমেন, মানুষ চেষ্টা করলে জন্ম-মুহূর্তটিও মনে করতে পারে।

তোমার মনে আছে?

দাদু হেসে চুপ করে রইলেন।

কেমন ছিল তোমার জন্ম-মুহূর্ত?

দাদু ধীর গম্ভীর গলায় বললেন, অন্য রকম। সেই মুহূর্তটি অন্য সব দিনের মতো নয়।

শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল রমেনের।

তবু বলো।

দাদু মাথা নেড়ে বললেন, বললে তুমি ঠিক বুঝবে না রমেন, কিন্তু তুমি নিজে কোনও দিন সেই মুহূর্তটির কথা মনে করার চেষ্টা কোরো। তুমি নিরন্তর স্মৃতিব্যক্ত থেকো, তা হলে কোনও দিন না কোনও দিন তোমার ঠিক মনে পড়বে। তোমার মন যদি স্বচ্ছ থাকে, যদি তুমি কখনও পাপবোধে কষ্ট না পাও, যদি তোমার মন কখনও কারও অনিষ্টচিন্তা না করে, যদি তুমি অসদাচরণ না করো, তা হলে সেই পবিত্র মুহূর্তটি একদিন ঠিক তোমার কাছে ধরা পড়বে।

বহুকাল ধরে সেই চেষ্টা করেছিল রমেন। বহু বার। যখন নদীতে সাঁতার দিত, বল নিয়ে দৌড়ত, গান গাইত, কিংবা চালাত মোটর গাড়ি, যখন একা থাকত কিংবা ঘর অন্ধকার করে বসত মাঝে মাঝে তখন কত বার এই খেলা খেলেছে রমেন। তারপর আপনমনে হেসে উঠেছে। কখনও তার ফাঁকা মাথার ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গেছে ছেলেবেলায় হারানো তিনটে মার্বেল, মনে পড়েছে ছেলেবেলায় কিশোরীদের প্রিয় মুখগুলি যাদের সঙ্গে ফের দেখা হয়নি।

তার বাবার নামে দাদু একটা স্কুল খুলেছিলেন ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেঁষে। নরেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুল। সেই স্কুলের বেয়ারার চাকরির জন্য দাদুর পায়ে এসে পড়ল একটা জাত-ভিখিরি। সঙ্গে কালো একটা রোগা বউ, রোগা রোগা গোটা দুই ছেলেমেয়ে, তাদের বগলে ন্যাকড়ার পুঁটুলি। বড় মেয়েটার বয়স বছর দশেক। লোকটা কবুল করল যে, সে হচ্ছে সেই অশ্বিনী যে জাতে ছোট হয়েও কুলীন কায়স্থের বিধবাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বয়রার গ্রাম থেকে। এক বছর বাদে গ্রামে ফিরে আসার পর পণ্ডিতেরা খড়ম পেটা করে গ্রাম-ছাড়া করে। গত দশ বছর সে সেই কায়স্থের বিধবাকে বয়ে বেড়াচ্ছে। এখন তাদের গুটি দুই ছেলেমেয়ে। বুড়ো কর্তার জমিদারির বাইরে পৃথিবীটা নরক। সে এই স্বর্গরাজ্য ছাড়তে চায় না।

দাদুর মন তখন দূরে নিবদ্ধ। ব্রহ্মপুত্রের ও-পারের দিকে চোখ। কিন্তু দৃষ্টি আরও দূরপ্রসারী, কেননা সেই চোখ জোড়া তখন কোনও বস্তুকেই সঠিক দেখে না। নরেন্দ্রনারায়ণ মরে যাওয়ার পর দাদুর ও-রকমই হয়েছিল। মাঝে মাঝে অন্ধকারে বসে-থাকা দাদুর মাথার পিছনে হঠাৎ কখনও রমেন সাদা আলোর মতো কিছু দপদপিয়ে উঠতে দেখেছে।

অশ্বিনীর উপুড়-হওয়া শরীরের তলা থেকে পা টেনে নিয়ে দাদু বললেন, তোমার ছেলেমেয়েরা বর্ণসংকর। ওদের কী গতি হবে? আমার এলাকায় তোমরা পতিত। স্বজাতের বিধবাকে বিয়ে করলে আমি তোমায় চাকরি দিতাম, জমিও দিতাম। তুমি তোমার চেয়েও নিচু জাতের মেয়ে বিয়ে করলে সমাজের উপকার হত। কিন্তু এ যে প্রতিলোম।

অশ্বিনী অশিক্ষিত মানুষ, এত সব কথা বুঝল না। কিন্তু সে যে ভয়ংকর পাপ করেছে তা বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগল। দাদু তখন ওর বউকে ডাকলেন। সে কাছে এসে আড়ষ্টভাবে আলগা প্রণাম করল,

পা ছুঁল না। দাদু তাকে বললেন, এই যে অশ্বিনী—এর প্রতি তোমার কোনও শ্রদ্ধা আছে?

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

এর প্রতি তোমার কীসের আকর্ষণ? বিয়ে করার ইচ্ছে হলে আমাকে এসে বলনি কেন? আমি তোমার বিয়ে দিতাম। দরকার হলে ব্রাহ্মণের সাথেও।

মেয়েটি হঠাৎ বলল, তাতে কী হয়েছে?

দাদু উত্তর শুনে একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তোমার গলার স্বর শুনে মনে হয় তুমি স্বাধীনচেতা। আমার এলাকায় মেয়েরা ততখানি স্বাধীন যতখানি মেয়েদের পক্ষে হওয়া সম্ভব। তারা পুরুষের মতো স্বাধীন নয়। আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তোমার পুরুষালি স্বর শুনে মনে হয় তোমার চরিত্রও পুরুষের মতো। তুমি মেয়ে হয়ে তোমার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারনি, তাই তুমি অসহিষ্ণু, অসুখী।

মেয়েটা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

দাদু ধীর অনুত্তেজিত স্বরে বললেন, বিয়ের উদ্দেশ্য প্রজাবৃদ্ধি। তাই প্রজাপতি বিয়ের দেবতা। বিয়ের একটা অনুশাসন আছে। যাঁরা মনুষ্য-বিজ্ঞান জানতেন তাঁরা এই নিয়ম তৈরি করেছিলেন। তুমি সেই নিয়ম ভেঙে জাতিনষ্টকারী পাপ করেছ।

মেয়েটি সামান্য বিদ্রোহের ভঙ্গিতে বলল, আমি জাত বিচার করিনি। মানুষ দেখেছিলাম।

দাদু সামান্য হাসলেন, তুমি বিচার করার কে? মানুষের তুমি কতটুকু জানো? মানুষের বিচার হয় তার বংশগতি তার বর্ণবৈশিষ্ট্যের ওপর। তোমরা আমার এলাকায় থাকতে পারো, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হয়ে নয়। আমি তোমাদের সম্পর্ক ভেঙে দিলাম। তোমরা আলাদা থাকবে, অনাত্মীয়ের মতো। আর, তোমার ছেলেমেয়েরা কোনও দিন বিয়ে করতে পারবে না। তাদের প্রজাবৃদ্ধির অধিকার নেই।

মেয়েটি অপমানিত মুখে চুপ করেই ছিল।

দাদু তার নীরবতার মধ্যে কোনও একটি প্রশ্ন আন্দাজ করে বললেন, নিম্নবর্ণের মেয়ের উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হলে জাতি উন্নত হয়, আর উচ্চবর্ণের মেয়েব নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে বিয়েতে জাতি অধঃপতিত হয়। তুমি নিম্ন সহবাস করেছ। তোমার ছেলেমেয়েরা বর্ণসংকর। আমি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর নই, কিন্তু সকলের ভালর জন্য আমি তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাই। তাতে ওদের হয়তো একটু কষ্ট হবে, কিন্তু বৃহত্তর কারণে ওরা সে কষ্টটুকু মেনে নেবে।

এরপর নরেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলে ঠনঠন করে ঘণ্টা বাজাত অশ্বিনী। একা থাকত স্কুলঘরের পিছনের দিকে খুপরিতে। বউ বা ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাতে তাকে অসুখী মনে হত না। বরং কায়স্থের বিধবাকে নষ্ট করার জন্য যে পাপবোধে সে কষ্ট পাচ্ছিল তা থেকে বেঁচে যাওয়ায় সে বুড়োকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করত।

সেই কায়স্থ বিধবাটি বাড়ির পিছন দিকে যে ছোট্ট দাতব্য ডিস্পেনসারিটি ছিল তার শিশি বোতল ধোয়ার কাজ করত। মাঝে মাঝে সে বাড়ির ঝি-দাসীদের কাছে তার বীভৎস বিতাড়িত জীবনের গল্প করত।

তাদের দুই ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলেটি ছোট। মেয়েটি বড়, বছব দশেক বয়স তখন তার। তারা সারা বাড়িতে ঘুরঘুর করত। জল বা খাবার ছোঁয়া তাদের বারণ ছিল। বারণ বাইরে যাওয়া। রমেনের মাঝে মাঝে চোখে পড়ত মেয়েটি তার পড়ার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখছে। কখনও বা নীচের বারান্দা ঝাঁট দিতে দিতে হঠাৎ থেমে হাঁ করে চেয়ে থেকেছে। পিছনের ঘেরা পাঁচিলের দিকে যার ওপর দিয়ে দু' হাত দু' দিকে ছড়িয়ে টালমাটাল হাঁটছে রমেন।

উদ্ধব মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলত, ওই মেয়েটা ছোটকর্তার দিকে চেয়ে থাকে কেন! ওই রে মেয়েটা, এই হটে যা—

কিন্তু মেয়েটা ছিল স্বভাবে বাধ্য। রমেন যা করতে বলত তা তৎক্ষণাৎ করত, তার মুখে খুশির আভা দেখা যেত। ক্রমে সে রমেনের পোষা কুকুরের মতো হয়ে গেল। যেখানে রমেন সেখানেই ইরাবতী। পায়ে পায়ে ফিরত সে। তার করুণ কৃশ, শ্যামলা এবং সুন্দর মুখখানায় রমেনের প্রতি একটা কাঙাল ভাব ফুটে থাকত। ড্যাঙড্যাঙে রোগা হাত-পা আর মস্ত খোঁপায় তাকে একই সঙ্গে ছেলেমানুষ আর বয়স্ক দেখাত। আর তার দু' চোখে সব সময়েই বাস করত একটা হরিণের মতো সন্ত্রস্তভাব।

দাদু মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ পেয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, রমেন, তোমার সঙ্গে কে?

ইরা।

দাদু ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে থাকতেন।

মুখ-বেঁকা লব ছিল রমেনের খাস চাকর। তার ছিল নাড়ী-জ্ঞান, আর জানা ছিল হোমিওপ্যাথি। সে ইরাকে প্রায়ই রমেনের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলত, বামন হয়ে চাঁদ ধরার মতলব, অ্যাঁ? কেন তুমি পায়ে পায়ে ঘোর?

একা খুব সুখেই ছিল অশ্বিনী। সে বউ ছেলেমেয়ের নামও করত না। ছুটির পর ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে বসে থাকত। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে তার তাড়ি-খাওয়া মেজাজি গানের রেশ শুনতে পাওয়া যেত। ইরার মা'র সঙ্গে কখনও দেখা হলে দূর থেকে হাতজোড় করে নমস্কার করত সে। রমেন তার কাছে সাঁতার শিখেছিল।

মাঝেমধ্যে ইরার মা'র সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে কখনও-সখনও চমকে উঠত রমেন। মনে হত এই মহিলার চোখ কথা বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে দাদু মারা গেলেন। খুব শান্তভাবে। সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে খড়মের শব্দ তুলে দরদালানের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন শোওয়ার ঘরে। তারপর শুয়ে পড়লেন। খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেলেন তিনি। সেই সময়ে রমেন বাবার সাদা ঘোড়াটায় চড়ে কেওটখালির মাঠে ট্রেঞ্চের গর্তগুলো লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করছিল।

যুদ্ধের পর বিশাল পরিবর্তন এসেছিল পৃথিবীতে।

বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা মাঝে মাঝে ভূত দেখতেন। ওই দেখাটা তাঁর নেশার মতো ছিল। সাতচল্লিশ সালের শেষ দিকে যখন রমেন কাশীপুরে আসে তখন মাকে জোর করে নিয়ে আসতে হয়েছিল। তার ধারণা ছিল কলকাতায় গেলে বাবার আত্মা আর তাকে দেখা দেবেন না।

নিঃসন্তান জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন বাবারও আগে। জ্যাঠাইমা চলে গেলেন গোবরদিতে তাঁর বাপের বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মা ছাড়া রমেনের আর কোনও আত্মীয় নেই। তখন তার দু'ধারে দাঁড়াল প্রাচীন গাছের মতো দু'জন লোক। উদ্ধব আর লব। চারা গাছটিকে তারা বেড়ার মতো ঘিরে রাখার চেষ্টা করছিল। পারেনি।

অশ্বিনী থেকে গিয়েছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলের পিছনের খুপরিতে বসে ব্রহ্মপুত্র দেখার নেশা তাকে ছাড়েনি। একা সে তখন সুখী ছিল। বড়কর্তার দয়ার কথা লোককে বলত। ইরার মা তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিল। কাশীপুরের বাড়ির রান্নাঘরের পাশে তাদের জন্য টিনের ঘর তুলে দিয়েছিল উদ্ধব আর লব, শাসিয়ে দিয়েছিল যেন তারা ভিতর-বাড়িতে না আসে। কিন্তু ইরা আসত। মাঝে মাঝে ইরার মা থানকাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে অতীব তীব্র চোখে দেখত রমেনকে। তার ছেলেমেয়েকে বুড়োকর্তা সকলের সামনে বর্ণসংকর বলে আলাদা করে দিয়েছিল, নিষেধ করেছিল বিয়ে দিতে। সেই অপমান বোধ হয় সে ভোলেনি।

তখন কলেজে পড়ে রমেন। ম্যাগাজিনে ললিত ভট্টাচার্য নামে একজনের প্রবন্ধ বেরোল— ভারতে সাম্যবাদ এবং কয়েকটি অসুবিধা। সেই প্রবন্ধে খুব জোরালো যুক্তিতে দেখানো হয়েছিল কীভাবে প্রাচীন আর্যরা অর্থনৈতিক কারণে মানুষকে বর্ণাশ্রমে ভাগ করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। এ ছিল শোষণের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা। যে-ব্যবস্থা আজও কার্যকরী রয়েছে ভারতবর্ষে। ইত্যাদি।

তখন ইরার বয়স বোধ হয় ষোলো-সতেরো। স্নিগ্ধ শরীর। শ্যামলা নরম রং। মায়ের কাছে বসে দুপুরে ফ্রেমে আঁটা সাদা কাপড়ে গোলাপ ফুলের নকশা তোলে। রমেনের পায়ের শব্দ পেলে নিঃসাড়ে উঠে আসে। জামা-জুতো ঠিক করে দেয়। রমেনের মাঝে মাঝে তাকে দয়া করতে ইচ্ছে হত। মাঝে মাঝে ভালবাসতেও। তাই ললিত ভট্টাচার্যের সেই প্রবন্ধটা বড় ভাল লেগেছিল রমেনের। সে তখন নিজের সমর্থনে একটা যুক্তি দাঁড় করাতে চাইছিল। আলাপ হওয়ার পর ললিত নামে সেই ছেলেটি আবেগতপ্ত স্বরে মানুষের মুক্তির কথা বলত। সেগুলো বিশ্বাস করেছিল রমেন। ক্রমে সে নিজেও মানুষের মুক্তির কথা বলতে শুরু করে।

বছর দুয়েক বাদে পাকিস্তান থেকে চলে এল অশ্বিনী। সে খুব একা বোধ করছিল সেখানে, তা ছাড়া বুড়ো বয়সের চিন্তাও ধরেছিল তাকে। সে কাশীপুরের বাড়িতে কয়েক দিন থেকে তারপর যাদবপুরের দক্ষিণে কোথায় খানিকটা জমি পেয়ে গেল, তুলে ফেলল দু'খানা ঘর। একদিন উদ্ধব চেঁচিয়ে রমেনের কাছে নালিশ করল, অশ্বিনী লুকিয়ে ইরার মা'র সঙ্গে দেখা করে, তাকে নিয়ে যেতে চায়। বুড়োকর্তার নিষেধ মানছে না অশ্বিনী, তার নাকি একা একা লাগে, বউ ছেলেমেয়ের জন্য প্রাণ কাঁদে। ইরার মাও পালাবার তালে আছে।

তখন মানুষের মুক্তির কথা ভাবে রমেন। তাই উদারভাবে বলল, ওর বউ ছেলেমেয়ে, ওর তো নেওয়াই উচিত। যদি যেতে চায়, তবে ইরার মাকে ছেড়ে দিয়ো।

তখন রমেন আর ছোট নয়। বিশাল লম্বা তার চেহারা, গলার স্বর গুরুগম্ভীর। উদ্ধব আর লব তাকে তখন সমীহ করতে শুরু করেছে। তারা দু'-একবার বুড়োকর্তার দোহাই দিল, কিন্তু তারপর একদিন অশ্বিনী তাদের চোখের সামনে দিয়েই নিয়ে গেল ইরার মাকে তার দুই ছেলেমেয়েসহ।

তখন প্রজারা আসত রমেনের কাছে। রমেন তাদের চেয়ারে বসতে বললে বসত না, উবু হয়ে মাটিতে কিংবা পিঁড়িতে বসে কথা বলত। তারা রমেনকে সম্মান করতে ভালবাসত। রমেন অনেক দিন ভেবেছে ওটা অন্তর্নিহিত দাসত্ব না সত্যিই ভালবাসা! প্রজারা আসত হাজার সমস্যা নিয়ে। কখনও জমি কিনবার আগে সেই জমি কেনা উচিত কি না তা জানতে, কখনও মেয়ের বিয়ে ঠিক করার সময়ে পরামর্শ চাইতে। অসুখে ডাক্তারের যে প্রেসক্রিপশন তা ঠিক হয়েছে কি না তাও দেখাতে আসত কেউ কেউ। এ ছাড়া টাকার সাহায্য, ছেলের চাকরি কিংবা নিছক পেটের কিছু না-জুটলে খাদ্যপ্রার্থী প্রজারা আসতই। দাদু বেঁচে ছিল বলে এতকাল প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়নি রমেনের। কিন্তু রমেন দেখেছে তাদের দেশের বাড়িতে প্রজাদের নিরন্তর আনাগোনা। তারা কত বিষয়-সমস্যা নিয়ে আসত দাদুর কাছে। দাদু তাদের বরাবর সঠিক পরামর্শ দিয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পরও কাশীপুরের বাড়িতে প্রজাদের আনাগোনা দেখে সে অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারত যে প্রজারা তাদের পুরনো অভ্যাস মতো আসে, বুড়ো কর্তার জায়গায় ঠিক ওইরকম একজন সর্বজ্ঞ লোক চায় যে সঠিক পথ বলে দেবে। দাদু কখনও ভুল পরামর্শ দিতেন না। তবে কি দাদু সর্বজ্ঞ ছিলেন? না, তা নয়। দাদু তাঁর পূর্বপুরুষের কাছ থেকে প্রজাপালন শিখেছিলেন। ফলে যুবাবয়স থেকেই তিনি প্রজাদের সংস্পর্শে আসতে শুরু করেন। প্রজাদের যা সমস্যা তা তিনি জানতে শুরু করেন। আর সব কিছুর সমাধানের জন্য তিনি শিখেছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা, চাষবাস, কামার কুমোরের কাজ, তাঁত চালানো, তিনি জানতেন মাছের গতিবিধি, তা ছাড়া জানতেন ফৌজদারি আইন, সর্বোপরি মনু পাতঞ্জল, গীতা ভাগবত, তাঁর প্রায় মুখস্থ ছিল বছরকার পাঁজি। আরও বোধ হয় অনেক কিছুই জানতেন দাদু—তাঁর না-জানা বিষয় ছিলই না। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য দাদু অতখানি শিখেছিলেন, তাই প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। এখন প্রজারা সেই অপরিহার্য বুড়োকর্তার খোঁজে রমেনের কাছে আসতে লাগল। রমেন প্রথমে দিশেহারা বোধ করত খুব। কিন্তু সে সবাইকেই সৎ এবং আন্তরিক পরামর্শ দিতে চেষ্টা করত। কিন্তু দেখতে পেত তার সাংসারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বড় কম। তা ছাড়া প্রজাদের সমস্যা হাজার রকমের। জমিদারি না পেলেও একটা বিপুল সংখ্যক প্রজাকে সে পেয়েছিল, আর পেয়েছিল দায়িত্বের উত্তরাধিকার। মানুষগুলোকে সে ফিরিয়ে দিতে পারত না. বরং সে দেখতে চাইত দাদুর কাছে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কী পেয়েছিল, এবং সে সেটা দিতে পারে কি না। ফলে অবসর সময়ে বা ছুটির দিনে রমেন গাঁ-গ্রামে ঘুরতে শুরু করে, প্রজাদের বাড়ি বাড়ি যেতে থাকে, জমি চেনে, রাত জেগে লবের কাছে শেখে হোমিওপ্যাথি, পড়ে আইনের বই। আর প্রতি সকালে-বিকালে কারও-না-কারও কোনও-না-কোনও সমস্যার সমাধান তাকে দিতে হয়। প্রজারা প্রায়ই আনত তরিতরকারি, প্রণামী দিত টাকা, এক নিঃসন্তান বুড়ো তার বিঘা তিনেক জমি উইল করে দিয়ে গেল মরার আগে। যাদবপুরের দক্ষিণে একটা জায়গায় রমেনদের প্রজারা বেশি জোট বেঁধে ছিল। সেখানে রমেন গিয়ে দাঁড়ালে একটা হইচই পড়ে যেত। এই অভিভাবকত্ব আস্তে আস্তে ভাল লাগতে শুরু করে রমেনের। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা দৈন্যের বিরুদ্ধে সে নিজেকে তৈরি করতে থাকে। এই সময়ে কলেজ ইউনিয়নের চোখা চালাক জেনারেল সেক্রেটারি ললিত আসত তাদের বাড়িতে। তাকে দেখত ঘুরে ফিরে, দেখত আসবাব, শুনত

পিয়ানো বাজিয়ে রমেনের গান, তারপর মৃদু হেসে বলত, তোমার গা থেকে এখনও গন্ধ গেল না। এখনও তোমাকে সবাই ছোটকর্তা ডাকে।

রমেন লজ্জা পেত। অন্য দিকে রমেন তখন সাম্যবাদের ইশতেহার পড়েছে, কলেজ ইলেকশনে পোস্টার এঁকেছে রাত জেগে, চেঁচিয়ে বক্তৃতা করেছে, জিতিয়ে দিয়েছে ললিতকে। সে তখন মানুষের সাম্যের কথা, মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা ভাবে, তর্ক উঠলে কথায় কথায় ললিতের মতো বলে, রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।

এই দুই রকম বোধ তাকে কিছুদিন খুব দোলাচলে রাখল। এক দিকে তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে বুড়োকর্তার ছাপ পড়েছে, অন্য দিকে ললিতের। দু'টোকে মেলাবার একটা চেষ্টা করছিল সে। পারছিল না।

ঠিক এ-রকম সময়ে এক দিন হারু দত্ত নামে এক প্রজা এসে জানাল যে অশ্বিনীর মেয়ে ইরাবতী তাদের পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে। তার ছেলে পরাণ ধরেছে ইরাকে বিয়ে করবে। অশ্বিনী আর সেই কায়স্থের বিধবাও সেই তালে আছে, মেয়েকে কারও ঘাড়ে গছাতে চায়। অথচ বুড়োকর্তার নিষেধ ছিল। ওদের জন্মের দোষ...

শুনে হঠাৎ রেগে গেল রমেন। 'জন্মের দোষ' কথাটা সে সহ্য করতে পারল না। এই লোকগুলো সেই কবেকার কথা মনে রেখেছে। বুড়োকর্তার কথা, তাই এরা ভুলতে পারছে না।

সেই মুহূর্তে রমেনের মন দাদুর দিক থেকে সরে এসেছিল। সে ভেবেছিল মানুষ জন্মমাত্রই স্বাধীন, মুক্ত, তার আবার শ্রেণীভাগ কীসের! তার মন দুলছিল। কতগুলো বিষয়ে সে দাদুকে স্বীকার করতে পারছিল না। ইরার মায়ের প্রতি দাদুর নিষ্ঠুর আদেশ এবং কয়েক বছর আগের সেই সন্ধ্যায় মেয়েটির ম্লান মুখখানা তার মনে পড়ছিল।

হঠাৎ একটা আবেগবশত সে হারু দত্তকে বলল, তোমরা কি ওদের ঘেন্না করো? কিন্তু আমি যদি ইরাবতীকে বিয়ে করি?

হারু সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বলল, কর্তা, আপনি বিষ খেলেও কিছু হবে না। পাপ আপনাদের ছোঁয় না। কিন্তু আমরা কি তা পারি!

শুনে সামান্য একটু অহংকার বোধ করেছিল রমেন।

তারপর এক দিন সে সোজা গিয়ে হাজির হল অশ্বিনীর বাড়িতে। তখন দুপুরবেলা। রমেনকে দেখেই অশ্বিনী গা ঢাকা দেওয়ার জন্য পিছ-দরজা দিয়ে পুকুর-ঘাটের দিকে রওনা হয়েছিল। রমেন প্রচণ্ড হাঁক মেরে ডাকল তাকে। সে বশংবদভাবে সামনে দাঁড়াতেই বলল, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করব।

কপাটের আড়াল থেকে লালপেড়ে শাড়ির ঘোমটায় ঢাকা একখানা মুখ খুব উদগ্রীবভাবে কথাটা শুনল, তার চুড়িপরা হাতের একটা ঝনাৎ শব্দ শোনা গেল শুধু।

কেন যেন তখনই রমেনের মনে হয়েছিল সে কাজটা ভাল করল না।

বিয়েটা খুব সহজ হল না। রমেনের মায়ের ভূতরোগ থেকে তখন মাথায় ছিট দেখা দিচ্ছে। তবু মা শুনে কেঁদেকেটে একশা করলেন। লব গম্ভীর হয়ে বলল, তোমার সঙ্গে বুড়োকর্তার তফাত এই যে, তুমি বেশি দূর দেখতে পাও না, বুড়োকর্তা অনেক দূর দেখতে পেতেন।

প্রজারাও শুনে খুশি হল না কেউ। কেবল তাদের ছেলেদের মধ্যে যারা কলেজটলেজে পড়ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ রমেনকে খুব বাহবা দিল।

উদ্ধব খুব বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞেস করল, অশনা তা হলে তোমার শ্বশুর হচ্ছে! দেখো, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরো না যেন।

সকলেরই অসন্তোষের কারণ ঘটিয়ে এক দিন বিনা সমারোহে ইরাকে বিয়ে করে আনল রমেন। আর সেই সঙ্গে প্রজাদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা কমে গেল অনেক। তারা দেখল, বুড়োকর্তা— যিনি অনেক দূর দেখতে পেতেন— তাঁর কথা রমেন শুনল না।

বিয়ের পরেই রমেন ইরাকে সঠিক বুঝতে পারল। এ সেই নিরীহ অবোধ কিশোরী নয়, এ অন্য রকমের। ঝাঁঝালো শরীর ছিল ইরার, যতখানি ঝাঁঝ রমেনের ছিল না। প্রথমে অমিল হল সেইখানে। আর-একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল এই যে প্রতি দিন সকালে উঠে রমেন কেমন অবসাদ বোধ করত।

রমেন এক দিন ইরাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার কি কোনও অসুখ আছে?

না তো! কেন?

কী জানি! আমার কেমন দুর্বল লাগে। মনে হয় একটা সংক্রামক কিছু তোমার কাছ থেকে এসেছে। আমার এ-রকম হত না তো।

আর একটা ব্যাপার রমেন লক্ষ করত, ইরা কখনও কারও 'মা' ডাক সহ্য করতে পারত না। প্রজারা তখনও কিছু আসে, তারা 'মা' বলে ইরাকে ডাক দেয়, আর ইরা কেমন কুঁকড়ে যায়। অস্থির বোধ করে। রমেন জিজ্ঞেস করলে বলত, মা-টা শুনলে আমার কেমন যেন নিজেকে অপরাধী লাগে।

ইরার মা বুদ্ধিমতী ছিল। বিয়ের পর শাশুড়ি সেজে কখনও এ-বাড়িতে আসত না। অশ্বিনী মাঝে মাঝে চুপিচুপি এসে বাইরে দেখা করত। রমেনের সঙ্গে দেখা হলে সে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে ডাকত 'ছোটকর্তা'। সম্পর্কটা ছিল আগের মতোই। কিন্তু একটা অসম্ভব হাস্যকর সম্পর্ক। লোকে এ-নিয়ে বলাবলি করত।

ইরা সারা দিন অস্থির বোধ করত। একটু নির্বোধ ছিল সে. স্বভাব ছিল ঢিলেঢালা, কথা বুঝতে সময় নিত। কিন্তু সে কিছুতেই নিজেকে রমেনের স্ত্রী বলে বিশ্বাস করতে পারত না। সম্ভবত ছেলেবেলায় ছোটখাটো জিনিস চুরি করা অভ্যাস ছিল ইরার। এক দিন উদ্ধব এসে নালিশ করল যে, ইরা গোপনে কিছু জিনিসপত্র অশ্বিনীকে দিয়েছে। তার নিজের চোখে দেখা। সে ইরাকে ধরতেই ইরা কেঁদে ফেলেছে, আর অশনা পালিয়েছে।

রমেন শান্তভাবে উদ্ধবকে বলল, তাতে কী! ও ওর নিজের জিনিস দিয়েছে।

কথাটা উদ্ধব বিশ্বাসই করতে পারল না। ঠোঁট উলটে বলল, ওঃ। নিজের জিনিস!

এক বছর এ-রকমভাবেই রইল ইরা। তখন রমেন খুব ব্যস্ত মানুষ। আইন পড়ে, আর পার্টি করে, প্রজাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কমিউন তৈরির চেষ্টা করে। কখনও প্রবীণ প্রজাদের মধ্যে কেউ তার বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলে সাম্যের কথা শোনায় রমেন। কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝতে পারত তার জনপ্রিয়তা অনেক কমে গেছে। সাধারণ মানুষেরা বুঝেছিল যে বুড়োকর্তার মুখ থেকে যা বেরোয় তা বেদবাণী। কিন্তু রমেন বুড়োকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করেছে।

রমেন খুবই হতাশ বোধ করত। প্রজাদের মধ্যে প্রথম নিজের নেতৃত্ব বোধ করতে শুরু করে তার নেশা লেগে গিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল তার পূর্বপুরুষদের মতো, দাদুর মতো সেও এদের সুখে-দুঃখে নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে প্রজারা তাকে বলেছে, আমাদের এলাকা থেকে আপনি ইলেকশনে দাঁড়ান। আমরা জিতিয়ে দেব।

ঠিক যে সময়ে সে দাদুর আসন নিতে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তেই ইরাকে বিয়ে করায় তার ছবি ম্লান হয়ে গেল। অথচ ও দিকে সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসও তার দানা বেঁধে ওঠেনি।

তখন দাদুর ক্ষমতা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে রমেন। শুর মুখের কথার একটু অনুশাসন ভেঙে একজন একঘরেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার জনপ্রিয়তা কমে গেল। সে আশ্চর্য হয়ে সেই বিশাল গাছের মতো মানুষটির কথা ভাবত— যার ডালপালায় প্রজারা নিরাপদ নীড় বেঁধে আছে। যিনি জমিদার এবং নেতা। যিনি প্রজাদের সব ভালমন্দ জানতেন। রমেন এও বুঝতে পারে যে, প্রজারা তাকে যেটুকু মানে তা তার পূর্বপুরুষদের সুকৃতির গুণে। সে নিজে থেকে কিছুই অর্জন করেনি। তাই আজ যদি সে পূর্বপুরুষদের অনুশাসন ভাঙে তবে প্রজারা আর তার কথা শুনবে না।

রমেন তাই তখন মাঝে মাঝে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠত। অস্থির বোধ করত। সাধারণ মানুষের জীবন, স্ত্রীর সঙ্গে বিছানা ভাগ করে শুয়ে সন্তান পালন করে, ঘর গোছানো সংসার করে জীবন কাটানোর কথা মনে করতেই তার মন খারাপ হয়ে যেত। সে কিছুতেই ভাবতে পারত না যে সে তার পূর্বপুরুষের মতো জীবন যাপন করবে না। বরং তার মনে হত একটা বৃহত্তর জীবনই তার জন্য অপেক্ষা করছে। যে জীবন বিশাল, যে জীবনের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে, মানুষের ভালবাসা না পেলে সে বাঁচবে না। কে তাকে সেই অসাধারণ জীবন দেবে? কে তাকে দেবে সর্বজ্ঞত্ব? রমেন মনে মনে সেইরকম একজনকে খুঁজত। দাদু তাকে খুঁজতে বলেছিল।

বিয়ের এক বছর বাদে যখন ইরা মাত্র মাস দুয়েকের গর্ভবতী তখনই এক দিন সে পালিয়ে গেল।

উদ্ধব খবর দিল হারু দত্তর ছেলে পরাণ মাঝে মাঝে আসত এ-বাড়িতে। ইরার সঙ্গে বসে গল্প করত অনেক। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পরাণও নেই।

লব তার বিষণ্ণতা আর লজ্জা দেখে বলল, তোমার নারীজ্ঞান নেই। যে উদ্ধার পেতে চায় না তাকে জোর করে উদ্ধার করেছিলে। বুড়োকর্তা কি মিছে বলেছিলেন? তিনি জানতেন।

তিনি জানতেন। ওই কথাই ছড়িয়ে গেল চার দিকে। রমেন দেখতে পেল প্রজাদের চোখ অন্ধ করে দাদুর ছবি ঝুলছে। তিনি জানতেন।

তারপর সেই জানাটাকেই অনেকভাবে জানতে চেষ্টা করেছে রমেন।

ইরাকে কেউ খুঁজল না। সে নিজেও নয়। তেমন কোনও অস্থিরতাও প্রকাশ করল না রমেন। তখন তার মন জুড়ে দাদুর ছবি।

কেবল মাঝে মাঝে সে প্রচণ্ড জোরে তার পুরনো মোটর গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে যেত উদ্দেশ্যহীনভাবে। ওই সময়েই এক বার সে দুর্ঘটনায় পড়ে।

## ॥ সাতাশ ॥

ইরা চলে গেলে রমেন বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধ করে দিল। বন্ধুরা মাঝে মধ্যে আসত, রমেন তাদের দেখে ভয় পেত, পাছে তারা ইরার কথা জিজ্ঞেস করে। চেনা মানুষ দেখলে ভয় পেত রমেন, একা থাকতে ভালবাসত। পুরনো ভাঙা পিয়ানোটার তখন ঠিকমতো আওয়াজ হয় না, তবু রমেন সেটা বাজাত মাঝে মাঝে, গাইত পূর্ব বাংলার মাল্লাদের গান। কখনও গাড়িখানা নিয়ে চলে যেত দূরে। গঙ্গার ধার ঘেঁষে দাঁড় করাত গাড়ি, জামা খুলে ঝাঁপ দিত জলে। অনেক দূর সাঁতরে আসত। প্রজাদের আনাগোনা কমে গিয়েছিল অনেক। সারাটা দিন ফাঁকা পড়ে থাকত রমেনের। হাতে কোনও কাজ ছিল না। রমেন এম এ পরীক্ষা দিলই না। নিতান্ত অনিচ্ছায় দিল আইনের দ্বিতীয় পরীক্ষা, পাশ করতে পারল না। কোনও দুঃখই সে বোধ করল না তার জন্য। মাঝে মাঝে খুব ভোরবেলা উঠত রমেন। বল নিয়ে সে আর আগের মতো দৌড়ত না। সে খেলা ছেড়ে দিয়েছিল। তবু ভোরবেলা উঠে সে মাঝে মাঝে বাইরে আসত। কাশীপুরের বাড়ির সামনের দিকে একটু ছাড়া জমি ছিল বাগান করার জন্য। বাগান হয়নি, লব আব উদ্ধবের তখন বয়স হয়েছে, গাছের শখ কারও ছিল না— কে বাগান করবে! সেই ছাড়া জমিতে কিছু আগাছা আর লম্বা ঘাস জন্মেছিল, একটা বেল গাছ থেকে মাঝে মাঝে তক্ষকের ডাক শোনা যেত। সেই ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে রমেন খামোখা চক্কর দিয়ে ঘুরত। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে চোখ বুজত সে, ছেলেবেলায় ফেরার চেষ্টা করত। নির্জন রাস্তায় পায়ের শব্দ পাওয়া যেত স্নানার্থীর। তারা গঙ্গার দিকে চলে যেত। রমেনের হঠাৎ মনে পড়ত ছেলেবেলার মতো পুবের দালানে দাদুর পাশে দাঁড়িয়ে যেমন সূর্য প্রণাম করত সে, তেমন অনেককাল করে না। এক-আধদিন প্রণাম করার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কোনও রোমাঞ্চ বোধ না করায় ছেড়ে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে ইরার কথা ভাবত। কেন ইরা তাকে পছন্দ করল না? সে মাঝে মাঝে নিজের কথা ভাবত। সে কীরকম জীবন-যাপন করবে এরপর?

এই সময়ে দু'টি ঘটনা ঘটে পর পর।

গঙ্গার ঘাটে শেষ দুপুরের নির্জনতায় একটি বাচ্চা ছেলে জলের তোড়ে কোথা থেকে এসে ভেসে যাচ্ছিল। কিছু লোক দেখতে পেয়ে তাকে টেনে তুলেছে। রমেন গিয়ে দেখে বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে খালি গায়ে নতুন পইতে, পরনে নেভি ব্লু প্যান্ট— হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। জলে থেকে সাদা হয়ে গেছে গা। জ্ঞান নেই। যারা তুলেছিল তারা হতবুদ্ধির মতো চেঁচাচ্ছিল— কী করতে হবে বুঝতে পারছিল না। লোকজন ছুটে আসছিল চার দিক থেকে—কিন্তু তাদের এক জনও জানত না কী করতে হবে। ভিড় সরিয়ে রমেন ছেলেটাকে ধরেই বুঝতে পারল শরীরে প্রাণ আছে। সে জানত কী করে জলে-ডোবা মানুষ বাঁচাতে হয়। যা করতে হয় সে তাই করছিল। ছেলেটাকে ঠিকমতো শুইয়ে হাঁটুর চাপ দিয়ে ধরে লঘু দ্রুত হাতে মালিশ করে দিচ্ছিল শরীর। নিঃশব্দে ভিড়ের অত লোক তাকে দেখছিল

সে একটা ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে আনছে। কাজেই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছিল রমেন। বাইরের জ্ঞান ছিল না। একজন চেঁচিয়ে বলল, জল বেরোচ্ছে, বেঁচে যাবে! একজন শান্ত প্রকৃতির লোক উবু হয়ে পাশে বসে দেখছিল, সে গায়ে হাত দিয়ে দেখে বলে ওঠে, গা গরম লাগছে যেন একটু। অনেকক্ষণ ধরে ডুবে ছিল ছেলেটা, গভীর অজ্ঞানতার মধ্যে চলে গিয়েছিল। সময় লাগছিল অনেক। অনভ্যাসে রমেনের হাত টাটিয়ে গেল, ঘাম দিচ্ছিল তার শরীরে, উত্তেজনায় মুখে-চোখে গরম রক্তের আঁচ। অতগুলো লোকের সামনে একজনকে বাঁচিয়ে তোলার একটা তীব্র উত্তেজনায় সে থামছিল না। ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন রমেনকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। সে ডেকে এনেছিল ডাক্তার। হঠাৎ রমেন শুনতে পেল 'ও কী করছেন।' এই প্রশ্নে মুখ তুলে দেখল হাতে ব্যাগ, স্টেথসকোপওলা ডাক্তারকে, প্রবীণ মুখ। হতবুদ্ধির মতো চেয়ে থেকে রমেন বলল, কী করব! ডাক্তার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, ওভাবে নয়। ওকে চিত করে শোওয়ান, তারপর মালিশ। একপলকের জন্য রমেনের মনে হল, ডাক্তার ভুল বলছে। সে জানে, সে দেখেছে জলে-ডোবা মানুষ বাঁচাতে। তবু কেমন দিশেহারা বোধ করল রমেন। এতগুলো লোক সাক্ষী, যদি ডাক্তারের কথা সে না-শোনে, আর যদি তার হাতেই ছেলেটা মারা যায়? ভুল হয়েছিল। ডাক্তারের কথামতো ছেলেটাকে নতুন করে শোওয়াল রমেন, পনেরো মিনিটের মধ্যেই তার হাত টের পেল ছেলেটার কচি শরীর শক্ত হয়ে আসছে। সে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তার বিব্রত মুখ দেখল, মাথা নেড়ে মৃদু স্বরে বলল, ঠিক হচ্ছে না। ডাক্তার ঝুঁকে ছেলেটার নাড়ি দেখলেন, ইতস্তত করে বললেন, তা হলে আবার আগের মতো করুন তো দেখি। কী জানি, বোধ হয়...। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। একদম কাঠের মতো হয়ে গেল ছেলেটার শরীর। অনেকক্ষণ সেই মৃতদেহটা দু' হাতে আকুলভাবে খুঁজে দেখল রমেন।

ডাক্তার ভুল বলেছিল। অতগুলো লোকের সামনে সে ডাক্তার— তাকে একটা কিছু করতে হয়। নইলে তার সম্মান থাকে না। ডাক্তার জানত না কী করে জলে-ডোবা মানুষ বাঁচাতে হয়। হয়তো পড়েছিল কোনও দিন, কাজে লাগেনি বলে ভুলে গেছে। আর রমেন ঠিকই জানত কী করে বাঁচাতে হয়, তবু সে পারল না। একা একা ঘুরে বেড়াত রমেন আর মাঝে মাঝে চমকে উঠত ভয়ে। ভুল জেনেও সে কেন ভুল করেছিল! অত মানুষ সামনে ছিল বলে সে কি এই ভয় পেয়েছিল যে ছেলেটা মারা গেলে অত মানুষ তাকে দুয়ো দেবে, নাকি সে ভেবেছিল ডাক্তার— যেহেতু ডাক্তার সেইহেতু তার চেয়ে ভাল জানে? নাকি সে অন্তরে বিশ্বাস করেনি যে সে সত্যিই ছেলেটাকে বাঁচাতে পারে। এ কেমন যে সে তার অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারছে না? কেন ওইরকম টানা-পোড়েন মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হল তার?

এই সময়ে একদিন মুনির বুড়ো বাপ এসে বলল, ছোটকর্তা, এক মুসলমানের জমি নিচ্ছি। শরিকি জমি, একটু গন্ডগোল আছে, তার ওপর পাকিস্তানের জমির সঙ্গে বদল করছি। কাগজপত্রগুলো একটু দেখে দেন।

মুনির বুড়ো বাপ দলিল-টলিল দেখতে দিল। অনেকক্ষণ ধরে দেখল রমেন। জমির কাগজ তার ছেলেবেলা থেকে চেনা। যে মুসলমান লোকটি মুনির বাপের সঙ্গে এসেছিল তার সঙ্গেও কথাবার্তা বলল রমেন। বুঝল জমিতে গন্ডগোল নেই। সব ভাই এককাট্টা হয়ে জমি ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবু রমেন অনেকক্ষণ ভাবল। দলিলটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, আমার যদি ভুল হয়! তুমি কোনও উকিলকে দেখাও।

আপনি তো উকিলের বাবা।

তবু রমেন মাথা নাড়ল, না হে, যদি আমার ভুল হয়ে থাকে?

মুনির বাপ অনেকক্ষণ চেয়ে রইল রমেনের দিকে। বুড়োকর্তার নাতির মুখ থেকে কথাটা বেরোল না! তবে সে কার কাছে ভরসা করে যাবে?

এক দিন একটা বার-এর সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সামান্য একটু হুইস্কি খেয়েছিল রমেন। তখন মাঝে মাঝে খেত। সঙ্গে ছিল সঞ্জয়। সেই রাত্রে সঞ্জয় হুইস্কির গ্লাস সামনে রেখে তাকে বুঝিয়েছিল যে, সে একটা মোটর-সারাইয়ের কারখানা খুলতে চায়। তার টাকা নেই, রমেন টাকা দিলে সে অংশীদারিতে ব্যাবসা করবে। রমেন ব্যাবসা করতে রাজি হয়নি। কিন্তু বলেছিল, তুই ব্যাবসা কর আমি বরং কিছু ধার দেব।

সঞ্জয় হেসে বলল, তোর জীবন-সংগ্রাম বলে কিছু নেই। দূর, তুই একটা মরা মানুষ।

সেই রাতের কথা স্পষ্ট মনে আছে রমেনের। সঞ্জয়কে একটা চেক লিখে দিয়েছিল রমেন, এবং খুব সহজ বোধ করেছিল নিজের মধ্যে। অনেক রাতে একা গাড়ি চালিয়ে ফেরার সময়েও সেই মহত্ত্বের বোধ কাজ করছিল তার মধ্যে। সে গুনগুন করে ভাবছিল তার একটি প্রিয় ফরাসি গান—ও-লাল-লা-ও-লা-লা...। ঝরঝর ছড়ছড় করে শব্দ করছিল অবিরল পুরনো মোটরগাড়ি। গভীর রাত্রের প্রাঞ্জল রাস্তা-ঘাট দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল সে। খুব সামান্য নেশা হয়েছিল তার। সে ডালহৌসি স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সেই নির্জনতায় অনুভব করেছিল তার চারপাশে প্রকাণ্ড সব গাছের অরণ্য। তার ভিতর দিয়ে ঝরনার মতো ঝরঝর করে বয়ে যাচ্ছে তার গাড়ি। তার মাঝে মাঝে শৈশবের কথা মনে পড়ছিল। তার ফাঁকা মাথার ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে গেল কবেকার হারানো তিনটে মার্বেল। যে-মার্বেলগুলো কখনও খুঁজে পায়নি বলে তার মনে রয়ে গেছে। মনে পড়েছিল ছেলেবেলার কিশোরীদের মুখ। সেই মুখগুলি তার প্রিয় ছিল. কেননা ফের দেখা হয়নি। কখনও বা মনে পড়েছিল একঢল সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে পেখমের বোঝা টেনে চরে বেড়াচ্ছে ধূসর রঙের ময়ূর। আর পাম গাছের ছায়ায় বাড়ির পশ্চিমের ভিতের কাছে আতসকাচ হাতে বসে আছে তার জ্ঞানী দাদু। মনে পড়েছিল মুকুন্দর ঘানিঘরের পিছনের মাঠটায় এক অন্ধকার সকালে সে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে। কাঁদছে হয়তো বা হারানো বলটির জন্য, হয়তো বা ঘরে ফেরার পথটির জন্য, কিংবা অলি নামে যে-মেয়েটি তাকে চুমু খেয়েছিল তার জন্য, হয়তো বা গাছপালা আকাশ এবং মায়ের মুখের জন্য। এইভাবেই টেরিটিবাজার ছাড়িয়ে গেল তার গাড়ি। শৈশব চিন্তায় অন্যমনস্ক রমেন এক বার লক্ষ করল পুরনো মোটর গাড়িটা গর্জন করছে অস্থিরভাবে, অভিভাবকের মতো বলছে ঠিক মতো চালাও। নইলে বিপদ। আপনমনে হাসল রমেন। কী হয়, যদি সে এখন সেই শৈশবের মতো এক বার চোখ বুজে দিক নির্ণয়ের খেলা খেলে? সেই চোখ-বুজে চলার খেলা সে বহু কষ্টে শিখেছিল—এ তার অধীত বিদ্যা, তবু এক বার এক অন্ধকার ভোরে সেই খেলা সে ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়ে কেঁদেছিল মর্তের মানুষের মতো। এখন আর-এক বার তার পরীক্ষা করে দেখার সাধ হল। এক বার সাবধানে চোখের পলক একটু বেশিক্ষণের জন্য ফেলল রমেন। তার গাড়ি কেঁপে উঠে সাবধান করে দিল তাকে। কোন দূরে পাখা ঝাপটাল একটা ময়ূর। দাদু পিঁপড়ের সারি থেকে চোখ তুলে তাকাল যেন। হাসল রমেন। আবার চোখ বন্ধ করে দিল। মনে মনে বলল, খুলব না। গাড়ি টাল খেল। কখনও ডান দিকে কখনও বাঁয়ে দুলতে লাগল। চোখ বন্ধ করে রইল রমেন। প্রাণপণে। সে মনে মনে এই কথা বলেছিল—আমি আর-এক বার ফিরে যাব সেই পাম গাছের ছায়ায় যেখানে চরে বেড়াচ্ছে ধূসর ময়ূর, ইজিচেয়ারে বসে-থাকা দাদুর পায়ের কাছে আমি বসব। তিনি অন্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে বলবেন, রমেন চোখ বড় মায়ার সৃষ্টি করে। রমেন বিড়বিড় করে বলল, শৈশবেই আমি ভাল ছিলাম। আমি জীবন-সংগ্রাম চাই না। আমি আর-এক বার জন্ম নিতে চাই। আমি শিশু হয়ে আসব, আবার খুব বড় হওয়ার আগেই আমি ফিরে যাব মায়ের জঠরে। ফিরে যাই। আমি জীবন-সংগ্রাম চাই না।

হঠাৎ যেন একমুখী স্রোতের নদী থেমে গেল, তারপর স্রোত বইতে লাগল উলটো দিকে। পশ্চাৎগামী এক রেল গাড়ির মতো ফিরে যেতে লাগল রমেন। মনে মনে তীব্র ইচ্ছাশক্তির বলে বন্ধ করে রইল চোখ। অলীক কয়েকটি মুহূর্তে সে সত্যিই ফিরে গিয়েছিল শৈশবে। আলো-আঁধারির এক ঝুঁঝকো বেলা, নিস্তব্ধ পৃথিবী শ্বাস বন্ধ করে প্রত্যক্ষ করছে এক শিশুর জন্ম। রমেন জন্মাচ্ছে। এক অব্যক্ত জগৎ থেকে ব্যক্ত জগতে চলে আসছে সে। টের পাচ্ছে ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীত, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মৃত্যু। টের পেয়ে শিশু রমেন কাঁদছে। জন্মমুহূর্ত! ওই তার জন্মমুহূর্ত!

গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, যেমন বিপদ দেখলে সওয়ারিকে অন্যমনস্ক টের পেলে লাফিয়ে উঠে সাবধান করে দিত তার প্রিয় সাদা ঘোড়াটা। রমেন চোখ চেয়ে দেখল বাঁকের মুখে তার গাড়ি— সামনে গাছ, ফুটপাথ, ঘুমন্ত মানুষ, দেয়াল। প্রচণ্ড জোরে ব্রেক চেপে ধরেছিল রমেন। স্টিয়ারিঙের সঙ্গে লেগে মট করে ভেঙে গেল তার পাঁজরের একখানা হাড়। রমেন অস্ফুট স্বরে গাল দিল, ইডিয়েট। হেডলাইটের আলোয় আর গাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে ফুটপাথে তাদের ছেঁড়া বিছানায় উঠে বসেছিল

কয়েকজন ভিখিরি মানুষ। তারা অসহায়ভাবে নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করল এক বার, তারপর হাই তুলে আবার শুয়ে পড়ল।

বুকে প্লাস্টার নিয়ে শুয়ে থাকত রমেন, মাঝে মাঝে আপনমনে বলত, ইডিয়েট!

সে বছর মা লবকে ডেকে বলল, দেশ ছাড়ার পর আমরা আর দুর্গার পুজো দিইনি। সে জন্যেই এতসব অমঙ্গল ঘটছে। এ বার আমি পুজো দেব। তোমরা ব্যবস্থা করো।

সে বার পুজোয় খুব ধুম লেগেছিল। দেশ ছাড়ার পর এই প্রথম বড়বাড়ির পুজো। প্রজারা এসেছিল জোট বেঁধে দিগ্বিদিক থেকে। অষ্টমী পুজোর দিন কাশীপুরের বাড়ি ফেটে পড়ছিল ঢাকের আওয়াজে আর লোকজনে।

মায়ের ছিল হার্টের অসুখ। মহাত্মা গান্ধী গডসের গুলিতে মারা গেলে সেই সংবাদ যখন চোঙায় প্রচার করা হয়েছিল, তখন মা অজ্ঞান হয়ে যায়, যদিও মা জানত না, গান্ধী আসলে কে ছিলেন। দাদু মারা যাওয়ার পরও বহু দিনের জন্য শয্যা নিয়েছিল মা। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই মায়ের হার্টের অসুখের সৃষ্টি হয়। তারপর রমেনের অদ্ভুত বিয়ের সময়, ইরা যখন পালিয়ে যায়, আর রমেন যখন দুর্ঘটনায় পড়ে তখনও মায়ের শয্যাশায়ী অবস্থা হয়েছিল। রমেন মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে শুনত পাশের ঘরে মা একা একা কথা বলছে গুনগুন করে। মার ধারণা ছিল বাবার আত্মা তার কাছে আসে।

অষ্টমী পুজোর দিন দুপুরবেলা মা গোপনে গিয়েছিল মণ্ডপে প্রতিমাকে বুকের রক্ত নিবেদন করতে। রমেনের জন্য তার মানত ছিল। ছোট্ট একটা ব্লেডের টুকরো ডান হাতের আঙুলে ধরে বুকে সামান্য টান দিয়েছিল মা, তার আগে থেকেই তার মুখ-চোখ সাদা দেখাচ্ছিল। দু' ফোঁটা রক্ত নেমে সেমিজে পড়তেই মা মুখ নিচু করে তা দেখেছিল। তারপরই ঢলে পড়ল মা। পুরুতঠাকুর সতীশ ভরদ্বাজ আসনের ওপর দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল, তার আসনের কাছেই পড়েছিল মা'র ঘোমটায় ঢাকা মাথাটা। তখন রমেনের প্লাস্টার করা বুক, তবু সে মাকে দু' হাতে তুলে নিয়েছিল কোলে—কিন্তু স্পর্শমাত্র বুঝতে পেরেছিল সারা দিনের উপবাসী তৃষ্ণার্ত সেই রোগা দেহখানায় প্রাণ নেই।

এখন উৎসবের কলকাতা। মা'র মৃতদেহের অনুগমন করেছিল রমেন। ভিড়ের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে তার মনে হয়েছিল যে সে অসম্ভব এক নির্জনতার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কয়েকজন পথ-চলতি মানুষ মৃতদেহ দেখে সংস্কারবশত জোড়হাতে নমস্কার করেছিল মাকে। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় রমেনের চোখে জল এল। সেদিন মর্মান্তিক পথ কীর্তন করেছিল রমণীমোহন— যে ছিল দাঙ্গাবাজ, জেলে-চাষা— করুণ কান্নার সুরে তার 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' শুনে কত লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল রমেন। মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙত রোজ। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই লব রোজ শুত রমেনের ঘরের দরজায়। শোওয়ার আগে সে রোজ মন্ত্র পড়ে বাড়ি-বন্ধন করে আসত। লবের দাঁত ছিল না, মুখখানাও ছিল বাঁকা, তাই ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত শব্দ করত সে। ঘুম ভেঙে সেই শব্দ শুনত রমেন। শব্দটা ছিল এমনিতে বিরক্তিকর, কিন্তু সেই একাকিত্বের মধ্যে লব কাছেই আছে জেনে তার ভাল লাগত। কখনও সে শুনত দেয়াল ঘড়ির চলমানতার প্রবল শব্দ, কখনও শুনত টুং টাং আওয়াজ করে ইঁদুর তাদের প্রকাণ্ড গ্র্যান্ডপিয়ানোর তার কাটছে। সেই সময়েই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একজন কচি উদ্বাস্তু মেয়েকে বিয়ে করে লজ্জাবশত আলাদা হয়ে গেল উদ্ধব। আর লব আরও বুড়ো হয়ে গেল এক দিন। তার কাছে রমেনের কোষ্ঠীটা জমা ছিল। বুড়ো-চোখে নিবিষ্ট মনে সে সেইটে দেখত সারা দিন। দেখতে দেখতে চিট হয়ে গিয়েছিল লম্বা কাগজখানা। লব মাথা নেড়ে বলত, কোষ্ঠীতে আছে তুমি ভাল গুরু পাবে। তোমার শনি প্রবল।

রমেন পড়ত বই। কখনও রাজনীতির। কখনও ধর্মের। দু'টোকে মেলাতে চেষ্টা করত। সে সময়ে এক বার ললিত এসে বলল, চলো, একটু গ্রামের দিকে যাই। আমরা বড় বেশি থিওরিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছি, একটু জন-সংযোগ দরকার।

রমেন আনন্দে রাজি হয়ে কয়েক দিন ঘুরল ললিতের সঙ্গে। ললিত গ্রামে লোক জড়ো করে বক্তৃতা করত। কয়েক দিন ধরে রমেন শুনে বুঝতে পারল, ললিত সেই একই কথা বলছে যা সে কলকাতায় মাঝে মাঝে স্ট্রিটকর্নার করার সময়ে বলেছিল, কিংবা যা বলেছে কলেজের নির্বাচনে, লোকে শুনত।

বুঝবার চেষ্টা করত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করত না। তাই একদিন সে ললিতকে বলল, তুই যা বলিস তার ওপর তোর নিজেরই গভীর বিশ্বাস নেই।

ললিত অবাক হয়ে বলল, নেই? কী করে বুঝলি?

রমেন মাথা নেড়ে বলল, যে প্রকৃত বিশ্বাসী তার একটা হাত নাড়ার ভিতর দিয়েও সেটা বোঝা যায়, তাকে অত বলতে হয় না।

ললিত থমকে গিয়ে বলল, সেটা কী রকম?

একটু ইতস্তত করে রমেন উত্তর দিল, আমার দাদুকে দেখেছি যখন তামাকের নলটি বাঁ হাতে টেনে নিতেন তখন তাঁর সেই ভঙ্গির মধ্যেও কোথায় যেন একটা প্রবল ভালবাসার ভঙ্গি ফুটে উঠত, আর বোঝা যেত লোকটির মন বড় স্থির।

ললিত হাসল, তোর সেই জমিদার-দাদু!

রমেন হাসেনি, একটু ভেবে বলেছিল, যদি দাদু জমিদারি ছেড়ে দিতেন এবং প্রজাদের বলতেন তোমরা তোমাদের জমিদার নির্বাচন করে নাও— আমার মনে হয়, দাদুকে তারা বিপুল ভোটে আবার জিতিয়ে দিত। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক নেতা, প্রজারা তাঁর কথাকে বেদবাক্য বলে মানত।

ললিত হেসেছে। মানুষের দেবতা হওয়ার কত অসুবিধে তা বুঝিয়েছে রমেনকে।

রমেন বোঝেনি। কারণ ইতিমধ্যে সে নিজের ভিতরে দেখেছে দাদুর ছায়া। প্রজারা চাইছে তার মধ্যে তাদের জ্ঞানী বুড়োকর্তাকে দেখতে।

এক দিন দুপুরে মেডিক্যাল কলেজের সামনের ফুটপাথে একটা বুড়ো লোককে পড়ে থাকতে দেখল রমেন। এ-রকম হামেশা কলকাতায় দেখা যায়। লোকটার গায়ে চিট ময়লা, খোলা মুখের কাছে মাছি উড়ছে, বিজবিজ করছে, সাদা কালো দাড়ি। মাথার কাছে উপুড় করা একটা অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটি। বোঝা যায় ওই বাটির ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, কোনও কারণে বাটি সরে গিয়ে মাথাটা ফুটপাথে পড়ে গেছে। বে-খেয়াল লোকটাকে পেরিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে এল একটু, আবার হেঁটে গেল খানিক দূর। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এক বার লোকটার নাড়ি ধরে দেখে লোকটা মরে গেছে কি না। ফিরে এল রমেন। লোকটার নিজের পায়খানা পেচ্ছাপের ওপর শুয়ে আছে। হাতে পায়ে লেগে শুকিয়ে আছে সেই সব। গালের পাশে চাপ হয়ে আছে বাসি বমি। দীনতম ভিখিরি একটা, দুরারোগ্য অসুখে ভুগে হয়তো মারা গেছে। রমেন উবু হয়ে বসল তার কাছে, তারপর প্রশ্ন করল নিজেকে, আমি কি এই লোকটাকে ভালবাসতে পারি? সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে সে তা পারে না। বরং প্রবল ঘৃণা এবং উদাসীনতা বোধ করল সে। উঠে চলে যেতে ইচ্ছে হল। তবু নিজের ওপর জোর খাটাল রমেন। শরীরের ভিতর থেকে বমির ভাব উঠে আসছিল, ঘেন্নায় কাঁপছিল শরীর, তবু সে লোকটার পড়ে থাকা বাঁ হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। আশ্চর্য এই যে, লোকটা বেঁচে ছিল। লক্ষ করে লোকটার ছেঁড়া জামার তলায় বুকের ওঠা-নামাও লক্ষ করল রমেন। তারপরই প্রবল ভয় তাকে পেয়ে বসল। এখন সে কী করবে? লোকটা মরে গিয়ে থাকলে তার কোনও দায়িত্ব ছিল না, কিন্তু এখন যখন লোকটা বেঁচেই আছে তখন তার কিছু করা দরকার। অন্তত উচিত একে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত শরীরে ঘাম দিয়ে দুর্বল বোধ করছে রমেন, বমি আসছে। সে চোখ তুলে দেখতে পেল কিছু কৌতূহলী লোক তার চার ধারে দাঁড়িয়ে গেছে। তারা দেখছে বিশাল সুন্দর চেহারার এক দয়ালু পুরুষ বসে আছে রাস্তার ভিখিরির পাশে। মহান দৃশ্য। তারা দেখতে চায় সেই দয়ালু মানুষটি কী করেন ভিখিরির জন্য। সবাই অপেক্ষা করছে। তারা পথ-চলতি মানুষ, নিজের কাজে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠেছে মানুষের প্রতি সহানুভূতি। রমেন তাদের চোখে এইসব দেখতে পেল। কিন্তু প্রবল ভয়ে কাঠ হয়ে গেল তার হাত-পা। না, সে এদের সামনে কোনও উদাহরণ স্থাপন করতে পারল না, কেননা সে তত দূর শক্তিমান নয়।

কে একজন জিজ্ঞেস করল, কী বুঝলেন দাদা, বেঁচে আছে?

রমেন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। না। উঠে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে সে পালিয়ে এল।

ডান হাতখানা অনেক বার ধুয়েছিল রমেন, কিন্তু তবু বহু দিন ধরে তাতে একটা শিরশিরানি অনুভূতি থেকে গিয়েছিল; মনে হত মানুষকে ভালবাসা কত কঠিন।

আর-এক বার রমেন প্রবল ভিড়ের ট্রামে যেতে যেতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। একটা স্টপে বেঁধেছে ট্রাম, রমেন দেখছে একদল স্কুল-ফেরতা বাচ্চা মেয়ে বিকেলের ভিড়ের ট্রামটায় উঠতে চেষ্টা করছে। তাদের মুখ দেখলে বোঝা যায় অনেকক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে ছিল গ্রীষ্মের রৌদ্রে, তাদের চুল ধুলোয় ধূসর, মুখ লালচে, চোখে উৎকণ্ঠা। তারা অনেকক্ষণ খায়নি, তারা শিশু তাই বাড়িতে যেতে চাইছে তাড়াতাড়ি—অনেকক্ষণ মাকে দেখেনি। কিন্তু সেই ভিড়ে তারা কেউ উঠতে পারল না। ট্রাম ছেড়ে দিলে একটা বছর সাতেকের মেয়ে তবু প্রাণপণে দৌড়ে আসছিল। সে হোঁচট খেল, হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল হ্যান্ডেল। তারপর ট্রামটা হু-হু করে তাকে ছাড়িয়ে গেল দেখে সে রাগ করে কান্নামুখে চেঁচিয়ে বলল, আমরা কি আজ বাড়ি যাব না?

'রোখ্‌কে' বলে উঠে পড়ল রমেন। ভিড় ঠেলে পরের স্টপে সে নেমে পড়ল ট্রাম থেকে, আবেগবশত। কিন্তু নেমেই বুঝতে পারল যে বোকার মতো একটা কাজ করেছে। এত সামান্য কারণে ট্রাম থেকে নেমে পড়ার কোনও কারণ নেই। সে আবার নিজেকে গাল দিল, ইডিয়েট।

তখন কখনও-সখনও ইরার কথা মনে পড়ে রমেনের। ইরা গর্ভবতী অবস্থায় চলে গিয়েছিল। যদি গর্ভপাত না করে থাকে তবে এত দিনে রমেনের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সেই সন্তান হয়তো কোনও দিনই জানবে না যে রমেন তার বাবা। ইরা তাকে সেই কথা বলবে না কখনও। সে হয়তো ছেলেবেলা থেকে হারুর ছেলেকে ডাকবে 'বাবা' বলে। এইসব কথা ভেবে মাঝে মাঝে অস্থির হত রমেন।

মাঝে মাঝে ছাদে শুয়ে থেকে সে দেখত আকাশ জুড়ে পড়ে আছে আকীর্ণ ধুলারাশির মতো ছায়াপথ। দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যেত। মনে হত এই পথ গেছে তার পূর্বপুরুষদের কাছে।

তখন রমেন বড় বেশি স্পর্শকাতর। ঠিক বুঝতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে মনে হয় খুব সাধারণ জীবন যাপনের জন্য সে জন্মায়নি। তার জন্মের একটা কোনও উদ্দেশ্য আছে। এক-একদিন সে মাঝরাতে উঠে দরজা খুলে লবের ঘুমন্ত দেহ পার হয়ে যেত। কিন্তু চলে যেতে পারত না। ঘর ও বাইরের মধ্যে কী এক অদৃশ্য বাধা আছে যা মনে মনে পেরোতে পারত না সে। কখনও বা সে চোখ বুজে দিকনির্ণয়ের খেলা খেলত আপনমনে, ঘুরে বেড়াত একা একা— চোখ বুজে ঘর থেকে ঘরে ফিরে যেত শৈশবে।

তারপর এক দিন সে বুঝতে পারল যে, যেতে হবে।

হাওড়া স্টেশনে তাকে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিল লব। বিদায়ের মুহূর্তে খুব জ্ঞানী পুরুষের মতো সে বলেছিল, একেবারে চলে যেয়ো না। একদিন ফিরে এসো। আমাদের তো আর কেউ নেই।

## ॥ আটাশ ॥

পলাশপুরে ভদ্রলোকের বসত যত বাড়ে ততই ভাল। গাঁখানা ছেলেবেলা থেকেই রক্তে মিশে আছে। আগে একেবারেই চাষাভুষোর গাঁ ছিল। এখন ধানকল, বি ডি ও-র অফিস, জাতীয় সড়ক আর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়েছে। আরও ভদ্রলোক আসুক, বসত বাড়ুক। বর্ণ হিন্দুরা না থাকলে গাঁ গ্রামের মধ্যে নিরেট একটা অন্ধকার টের পাওয়া যায়। বউ পেটানো, ছেলেকান্না, মুখখিস্তি। বসন্ত সিংহি জন্মকালেও এ-গাঁয়ের বাতাসে একছত্র সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারিত হতে শোনেনি। চালচলনে কারও সহবত ছিল না। লোকে বুঝত তালের রস মানেই তাড়ি। এখন গাঁয়ের চেহারা পালটেছে। ভদ্রলোক এবং সত্যিকারের ভদ্রলোক আরও আসুক। ঝলমল করে উঠুক গাঁখানা।

তুলসীকে তাই নিজের বাড়িখানা সযত্নে ঘুরে ঘুরে দেখাল বসন্ত সিংহি। উঠোনে টিউবওয়েল, পাকা পায়খানা, উঁচু ভিতের বাড়ি। বিধবার সম্পত্তি। খুড়িমা শেষ জীবনটা বসন্ত সিংহির ঘাড়ে পড়েছিল। বদলে লিখে দিয়েছিল জমিখানা। উনিশশো পঞ্চাশে তুলেছিল বাড়িখানা। টিনের চালওলা দু'খানা পাকা ঘর, পাকা ভিত। সরকারি অফিসকে ভাড়া দেওয়ার মতলব ছিল। কিছু দিন ব্রিজ-কনস্ট্রাকশনের অফিসাররা থেকেছিল। তারপর এক সময়ে জুনিয়ার হাইস্কুলটা এক লাফে হাই হয়ে গেল, বাঙালদের আগমনে বসতি বেড়েছিল কিছু— স্কুলে ছেলে ধরে না। তখন উঁচু দিকের কয়েকটা ক্লাস বসত

এইখানে। মাগনাই ছেড়ে দিয়েছিল বসন্ত। আহা, বিদ্যাশিক্ষা হলে বাড়ি পবিত্র হয়।

তুলসী উঠোনের পিছন দিকটা ঘেরা নেই বলে ভ্রূ কোঁচকাল, ও-পাশ থেকে বাড়ির ভিতরটা যে দেখা যায়!

বসন্ত সিংহি হাসে, দেখা যায়! কিন্তু দেখবে কে? ও দিকটা পতিত জমি, জঙ্গল।

শেয়াল ফেয়াল ঢুকে পড়তে পারে।

ঘিরে দেব। ভাববেন না।

ভদ্রলোক আসছে পলাশপুরে। তার জন্য না হয় খরচা একটু হলই।

ভাড়া মাত্র ত্রিশ। তুলসী মনে মনে খুশিই হচ্ছিল। এই বাসাখানা তার হবে। একান্তই তার আর মৃদুলার। সে পরিবারের কর্তা। ব্যাপারটা ভাবাই যায় না। এতকাল পরে স্বাধীন হচ্ছে তুলসী।

তুলসী তবু বলল, এক দিন আমার ওয়াইফকে নিয়ে আসব। সে পছন্দ করলে তবে—

বসন্ত সিংহি হাসে, মা লক্ষ্মী কলকাতার মানুষ। পছন্দ হবে না জানি। তবে দেখবেন থাকতে থাকতে অসুবিধেগুলো আর লাগবে না।

সন্ধেবেলা বাসায় ফিরে মৃদুলাকে গোপনে বাসাটার বর্ণনা দিল তুলসী।

মৃদুলা ম্লানমুখে বলল, আমার এ অবস্থায় টিউবওয়েল পাম্প করা কি সম্ভব হবে?

দূর! ও তো আমি করে দেব। তখন হাতে কত সময় পাওয়া যাবে। সকাল থেকে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত ছুটি। আবার বিকেলে তিনটে কি চারটে থেকে। অত সময় নিয়ে আমি করব কী? কত ঘরের কাজ করে দেব দেখো।

মৃদুলা তারপর শুকনো মুখে বলে, দাদাকে কীভাবে বলবে? মুখোমুখি বলতে পারবে?

তুলসীর দাদা নারায়ণ গম্ভীর মানুষ। একটু বোকাও। ছেলেবেলায় সবাই বলত বোকা নারাণ। গবেট ছাত্র ছিল। কিন্তু ঘষে ঘষে বেরিয়ে গেল ঠিকই। যে বছর পাকিস্তান হয় সে বছর পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান দু' জায়গায় ম্যাট্রিক দিয়েছিল নারায়ণ। দু'টোতেই পাশ করেছিল থার্ড ডিভিশনে। তারপর বি এ পর্যন্ত পাশ করে ফেলল ব্যাঙ্কে কেরানির চাকরি করতে করতে। নোয়াখালি ব্যাঙ্ক ফেল করলে চাকরি পেল রেলে। দূরে বদলি করায় চাকরি ছেড়ে ঢুকল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাজনা বিভাগে। সবাই বলত নারায়ণের কপালটাই ভাল। সেই তুলনায় ছাত্র ভাল ছিল তুলসীই। কিন্তু কার্যকালে তুলসী মফস্সলের মাস্টার। দাদা অফিসার, নাকতলায় দেড় কাঠা জমি কিনেছে। এখন খুব গম্ভীর দেখায় দাদাকে। মুখোমুখি আলাদা বাসা করার কথা বলতে ভরসা পায় না সে। বিয়ের পর এখনও মাস দুয়েক কাটেনি, এর মধ্যে ভাগ হওয়ার কথা বলাই যায় না।

তবু বলতেই হবে।

তুলসী একটু ভেবে বলে, টেলিফোনে বলব।

মৃদুলা হেসে ওঠে, কী বুদ্ধি!

তবে?

মৃদুলা ম্লানমুখে বলল, যে ভাবেই আলাদা হও ঠিক আমার ঘাড়ে দোষ পড়বে।

অনেক দিন হয় মৃদুলা তার মা আর ভাইকে দেখে না। বাবাও সময় পান না আসার। এক-একবার ইচ্ছে করে বেহালার বাসায় যায়। কাপড়ের ঢাকনা-দেওয়া তানপুরাটা এখনও দাঁড় করানো আছে শোওয়ার ঘরের বেঞ্চিটার এক কোণে। পাশে রাখা আছে গদিতে ঢাকা তবলা আর পেতলের ডুগি। ধুলো পড়ছে। বাবাকে বলেছিল ওগুলো দিয়ে যেতে। বাবা আনেনি। পলাশপুরে চলে যাওয়ার আগে এক বার বেহালার বাসায় ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে খুব। কত কালের পুরনো বাসা তাদের— চোখ বেঁধে দিলেও মৃদুলা ঠিক এ-ঘর ও-ঘর চলে যেতে পারবে। কিন্তু যাওয়া যায় না। এখনও বিভুর দলবল ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে।

রাত্রে শোওয়ার আগে মৃদুলা একটা পোস্টকার্ডে মাকে চিঠি লিখে জানাল যে তারা শিগগিরই পলাশপুরে বাসা নিয়ে চলে যাচ্ছে। শেষে লিখল, এক বার পলাশপুর এসো। কলকাতায় তো আর দেখা হবে না। আমার খবর তো জানোই। আর সাত-আট মাস পরে কী হবে ভাবতেই ভয় করে। যদি না-বাঁচি তবে আর দেখাই হবে না। পলাশপুরে কিছু দিন গিয়ে থেকে এসো বাবা আর টুপুকে নিয়ে...

লিখতে লিখতে কয়েক বার চোখের জল মুছল মৃদুলা।

রাত্রে পাশাপাশি খেতে বসে তুলসী কাঁপা বুকে একসময়ে দুম করে কথাটা বলে ফেলল। আশ্চর্য এই, নারায়ণকে খুব দুঃখিত বা ভেঙে পড়া দেখাল না। বরং মুখের রেখাগুলো সহজ আর চোখ দু'টোয় একটু অবিশ্বাসের ভাব দেখা গেল। যেন স্বস্তি।

বলল, কীরকম বাসা? ভাল?

খুব। এক্কেবারে আলাদা।

কেবল পিতু ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বলল, কাকিমাকে নিয়ে যাবে?

তুলসী মাথা নিচু করে রইল।

বউদি ধমক দিয়ে বলল, না তো কী! হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে দু' বেলা? তারপর তুলসীর দিকে চেয়ে হেসে বলল—একটা তবু জায়গা হল বেড়াতে যাওয়ার।

বউমার যত্ন-টত্ন নিতে পারবি তো!

খামোখাই মৃদুলাকে বউমা ডাকে নারায়ণ। ওর মুখে বেমানান আর বুড়োটে লাগে। নাম ধরে ডাকলেই তো পারে। আসলে নারায়ণের ধারণা বাবার অভাবে সে-ই তুলসীর বাবার জায়গা দখল করে আছে।

খুবই নিশ্চিন্ত লাগল তুলসীর। কথাটা বলে ফেলা গেছে।

রাতে মৃদুলা ঘুমোয়। দুশ্চিন্তায় জেগে থাকে তুলসী। দেখে, কেমন লাবণ্যহীন হয়ে গেছে মৃদুলার মুখ। ঠোঁট শুকনো, চোখের কোল কালো, হনুর হাড় দুটো জেগে উঠছে। রাতে খাওয়ার পরই বমি হয়ে গেছে। ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে বিকেলে দু'টো চপ এনেছিল তুলসী। মশারির মধ্যে বসে সেই চপ দু'টো খাচ্ছিল যখন তখনই মৃদুলাকে খারাপ দেখাচ্ছিল। আজ সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিল মৃদুলা, মুখখানা হাঁ করা, গাল বসা, শরীরটা যেন মুচড়ে আছে ব্যথা-বেদনায়। ওর খোলামেলা বিশৃঙ্খল শরীর দেখে একটুও কাম জাগেনি তুলসীর। বরং বড় উদোম মাঠের মধ্যে যখন হাওয়া বয়ে যায় তেমনি হা-হা করে উঠেছিল তার বুক— মৃদুলা কি বাঁচবে?

তুলসী ঠিক করল এবার থেকে সে ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবে, যথাসম্ভব ভাল কাজ করবে রোজ দু'-একটা, পবিত্র থাকবে। থাকা দরকার। মাঝে মাঝে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবে মৃদুলাকে।

পলাশপুরে নিয়ে গিয়ে একটুও কাজ করতে দেবে না মৃদুলাকে। সে জল তুলবে নিজে, বিছানা পাড়বে, রান্নার লোক রাখবে একজন—যদি পয়সায় কুলোয়। পলাশপুরে গেলে সব হবে।

ললিত একদিন হাসপাতাল থেকে চেক-আপ করিয়ে এল। অল্পবয়সি ডাক্তারটি হেসে বললেন, শরীর তো ঠিক আছে। এবার কাজকর্মে লেগে পড়ুন। ঘরে বসে থাকার আর দরকার নেই।

আবার যেন সেই পুরনো দিনে ফিরে গেছে ললিত। ক্লাস-ঘরের নোংরা দেয়ালে পেন্সিলে লেখা জ্যামিতির উপপাদ্য, ইতিহাসের রাজাগজার নাম আর সন-তারিখ, বিজ্ঞানের যন্ত্রের ছবি, কিংবা সরল অঙ্ক, ভূগোলের জলবায়ু। যত দূর হাত পৌঁছেছে তত দূর দেয়ালে যথাসম্ভব লিখেছে ছেলেরা। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা গেছে কিছু দিন আগেই।

পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ললিত। ছেলেদের মুখগুলি বাতাসে ভেসে ভেসে হঠাৎ কতগুলি শূন্য হয়ে যায়। পড়ানো থামিয়ে ললিত জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে। পশ্চিমের আকাশে মেঘস্তর। কখনও বা দেখে তিনতলার ছাদ থেকে উড়ছে মেরুন রঙের শাড়ি। কখনও বা জানালার পাশের দেয়াল বেয়ে একটা বেড়াল কেমন নিঃশব্দে হেঁটে লাফ দিয়ে কার্নিসে উঠে যায়। কত হাজার দৃশ্য দেখা যায়।

আজকাল তার ক্লাসে ছেলেরা খুব একটা শব্দ করে না। আগে গল্প বলুন স্যার বলে জ্বালিয়ে খেত, আজকাল নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। ললিত স্যার তাদের বড় প্রিয় ছিল। কেউ হয়তো তাদের বলে দিয়েছে যে, ললিত স্যার আর বেশি দিন থাকবেন না। তাই কখনও কখনও ললিত টের পায় মুখের ভিড়ের ভিতরে একটি-দু'টি চোখ যেন তার দিকে চেয়ে ছলছলিয়ে ওঠে।

গিরিজা হালদার ক্যাশ ক্লার্ক। জালে-ঘেরা কাউন্টারের ও-পাশে বসে থাকে— তার গম্ভীর

হিসাবমনস্ক মুখ। আগে মাঝে মাঝে কাউন্টারের ঘুলঘুলির সামনে ক্লাসে যাওয়ার পথে ললিত দাঁড়িয়ে দেখত হালদার কালেকশনের টাকা গুনছে। সে ঘুলঘুলির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে অদৃশ্য রিভলভার উঁচিয়ে বলত, হ্যান্ডস আপ। হালদার হাসত। কখনও বা অকারণে হালদারের সামনে রাখা রবার স্ট্যাম্প তুলে দেয়ালে ছাপ বসাত। হালদার চেঁচিয়ে কপট রাগ দেখাত।

পোলাপান আর কারে কয়? আপনে কি ছ্যামরাগো পড়াইতে আহেন, না তাম্‌শা করতে? তবু ললিতের ওই ছেলেমানুষি হালদারের প্রিয় ছিল। বিনা দরখাস্তে অনেক বার ললিতের ক্যাজুয়াল ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, যা ললিত টেরও পায়নি। আজকালও ঘুলঘুলির সামনে দাঁড়ায় ললিত। হালদার শরীর ঠিক রাখার উপদেশ দেয়, চোখে চোখ রাখে না। রবার স্ট্যাম্প তুলে নিয়ে আগের মতোই দেয়ালে ছাপ বসায় ললিত, হালদার আপত্তি করে না, কেড়ে নিতে হাত বাড়ায় না। যত খুশি স্ট্যাম্প মারো, ইচ্ছেমতো মেরে নাও। আর কী কী করতে ইচ্ছে করে তোমার? খেলাটা তাই জমে না। রবার স্ট্যাম্পটা রেখে দেয় ললিত। মায়ের সঙ্গে সেই লুডো খেলাটাও জমেনি। এখন সবাই তাকে দান ছেড়ে দেয়।

তবু সেই পুরনো স্কুলবাড়িতে সেই পুরনো দিনগুলির স্মৃতি ছায়ার মতো দোল খায়। টিচার্স রুম-এর দেয়ালে বিখ্যাত মনীষীদের উইয়ে-খাওয়া ফোটো। সেই আলমারির ওপরে গ্লোব। মেয়ে-দেখা চেয়ার— যে-চেয়ারে বসলে রাস্তার পথ-চলতি মেয়েদের দেখা যায়। বিভূতিবাবুর সঙ্গে অনেক বার চেয়ারটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে ললিত। এখন চেয়ারটা তার জন্য খালি রাখা হয়। ললিত বসে না।

ক্লাস এইটের মাধব মুকুন্দ-বেয়ারার ছেলে। টিফিনে সে ক্লাস থেকে এসে মাস্টারমশাইদের চা দিয়ে যায়। ছেলেরা সেই কারণে তাকে খেপায়। মাধব এখন বড় হয়ে গেছে একটু। স্কুলের ফুটবল টিমে খেলছে। বাপ তাকে ক্রমশ সমীহ করছে। ললিত লক্ষ করে এ-সব।

ক্লাস নাইনের হরেনকে দেখে অনেক দিন আগেকার একটা দৃশ্য মনে পড়ে যায়। হরেনকে ভরতি করতে এসেছিল ফরসা গোলগাল সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক। পোশাকে বনেদিয়ানা, স্কুলের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। লোকটাকে চিনতে পেরেছিল ললিত। একসময়ের বন্ধু। ললিত পরিচয় দিতেই লোকটা একটু ঘাবড়ে গেল, হেসেটেসে বলল, তুমি এই স্কুলে! বাঃ বেশ ভালই হল।

ললিত জিজ্ঞেস করল, কাকে ভরতি করতে এসেছ?

লোকটা খুব অপ্রস্তুত হয়ে লাজুক অপরাধী গলায় বলল, আমি তো জানতাম না যে, তুমি এই স্কুলে আছো। আমি—

গলা খুব নিচু করে ললিতের কানে কানে বলল, যাকে ভরতি করতে এনেছি সে আমার ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট। পড়াশুনোয় ঝোঁক আছে বলে—বলতে বলতে লাল হয়ে গেল লোকটা।

সাম্যবাদে বিশ্বাসী ললিত। তবু হঠাৎ তার মনে একটা কোথাও ধাক্কা লেগেছিল। সেটা নিশ্চয় দুর্বলতা। আমি শালা তোমার চাকরকে পড়াব? পরমুহূর্তেই দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে অতিরিক্ত উৎসাহে ললিত চেঁচিয়ে উঠেছিল, খুব ভাল, এই তো চাই।

ললিত হরেনকে বেশিরকম নজরে রাখত। লাভ হয়নি। হরেনের মাথা ভাল না, বোকা। কিন্তু বহুকাল হরেনের কাছে সহজ হতে পারেনি ললিত।

মাঝে মাঝে সঞ্জয়ের টেলিফোন আসে। ললিতকে ক্লাস থেকে ডেকে আনে বেয়ারা, হেডমাস্টার হাত বাড়িয়ে রিসিভার তার হাতে দেয়, তারপর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নিয়ম হল, ফোন এলে কাউকেই ক্লাস থেকে ডেকে দেওয়া হবে না, তাতে ক্লাসের ক্ষতি। শুধু 'ফোন এসেছিল' এই খবরটা দেওয়া হবে। কিন্তু ললিতের বেলায় এই নিয়মটা ভাঙা হয়েছে। হেডমাস্টারের যে-চোখে ললিতের দিকে তাকানো উচিত ঠিক সেইভাবে উনি আজকাল তাকান না, বরং তাঁর চোখে একটা 'আহা' ভাব।

এ-সবই হয়তো সত্য। কিংবা ললিত কল্পনা করে। আজকাল সে বড় স্পর্শকাতর হয়ে গেছে।

অক্টোবরের প্রথম থেকেই শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধেবেলা কুয়াশা হয় আজকাল। রাত গভীর হলে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে একটা বিদেশি রহস্যময়তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পুজোর ছুটির আর দেরি নেই।

এক দিন টিফিনের আগে তুলসী এসে হাজির।

চল, একটা সিনেমা যাই।

সিনেমা!

ললিত সিনেমার কথা ভুলেই গিয়েছিল। কতকাল আর সিনেমা দেখা হয়নি।

তুলসী বিমর্ষ মুখে বলে, পলাশপুরের বাসার ভাড়া আগাম দিয়ে এলাম। পুজোর ক'টা দিন কাটিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পর চলে যাচ্ছি। আর সিনেমা-ফিনেমা দেখা হবেই না।

টিফিনেই বেরিয়ে পড়ল দু'জন। ললিত হেডমাস্টারকে বলতেই উনি ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, চলে যান, ক্লাস ম্যানেজ করে নেওয়া যাবে।

ম্যাটিনিতে একটা বেলেল্লা ছবি দেখল দু'জনে। ললিতের মনটা খারাপ ছিল। তুলসীটা দূরে চলে যাচ্ছে। এখন কেউ একটু দূরে যাচ্ছে শুনলে কেমন যেন হাহাকারে ভরে যায় বুক। আর কয়েকটা মাস থেকে যেতে পারলি না তুলসী? আমার খাটের এক কোণে তোর কাঁধ দেওয়ার কথা ছিল যে! দিবি না? অতদূরে কে তোকে খবর দেবে সময়মতো?

পর্দার চলন্ত ছবির দিকে চেয়ে দু' চোখ ভরে জল আসছিল! হয়তো বহুকাল পরে দেখছে বলেই পরদার আলো চোখে সহ্য হচ্ছে না, কিংবা হয়তো মন অজান্তে তুলসীর চলে যাওয়ার কথা ভাবছে। চেয়ারের হাতলে রাখা তুলসীর রোগা হাতখানার ওপর নিজের হাতখানা রাখে ললিত। অন্যমনস্কভাবে বসে থাকে। অনুভব করে সুখে দুঃখে তাদের পুরনো বন্ধুত্ব।

সিনেমার পর তুলসী বলল, চল একটু হাতিবাগানে গিয়ে পুজোর জামা-কাপড় কয়েকটা কিনে আনি। সাউথে বড্ড দাম।

তুলসীর পকেট গরম। সিনেমা হলের সামনে ছ'টার শোয়ের একটা দল নামছিল ট্যাক্সি থেকে। খোলা দরজা দিয়ে ফুড়ুত করে ট্যাক্সির মধ্যে চলে গিয়ে তুলসী ডাকল, আয়।

সেই পুরনো দিনের মতো। অবিকল পুরনো দিনের মতো।

ট্যাক্সি থামিয়ে মিষ্টির দোকানে তারা ছানার মিষ্টি খায়।

তুলসী খুশি গলায় বলে, খা। যা খুশি খা।

ফাঁসির খাওয়া খাওয়াচ্ছিস!

মৃদুলার জন্য একটা বিষ্ণুপুরি সিল্কের শাড়ি কিনল তুলসী। লাজুক গলায় বলল, আমি ওকে সোনাদানা কিচ্ছু দিইনি। প্রথম পুজোটা বিয়ের পর, তাই। নইলে তাঁত-ফাঁত দিতাম।

ললিতের মায়ের কথা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। অনেককাল মাকে কাপড়-চোপড় দেওয়া হয়নি। মা কখনও কিছু বলে না। আগেকার পাড়ওলা শাড়িগুলোই এখনও পরে।

কে জানে তার জীবনের এটাই শেষ পুজো কি না। একটা সরু কালোপেড়ে কাপড় মায়ের জন্য কিনল ললিত। আর একটা সুন্দর ছাপা শাড়ি কিনল।

তুলসী অবাক হয়ে বলে, শাড়ি কার জন্য?

তোর বউয়ের জন্য। চল, আজ তোর বউকে দেখে আসি। তুই তো শালা ডাকলিই না।

তুলসী ভীষণ খুশি হয়, বলে, চল শালা, মালটা দেখিয়ে দিই।

বড় মিষ্টি বউটি তুলসীর। ললিতের নাম শুনে প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। একটু অবাক চোখে দেখল ললিতকে। তারপর হাতজোড় করে বলল, ওঃ—আপনিই—আপনিই—

এর চেয়ে বেশি কিছু তার বলার নেই। ললিত বোঝে।

শাড়িটা দিতেই ভীষণ লজ্জা পায় মৃদুলা। 'এ-সব কেন' বলে মৃদু আপত্তি করে আদরে শাড়িখানা নিয়ে বুকের কাছে ধরে রাখে একটু। ললিত নামে একজন মৃত্যুপথযাত্রীর দেওয়া বলে শাড়িখানাকে মনে মনে সম্মান করে সে। এ-সবই বুঝতে পারে ললিত।

পিতু এসে ললিতের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, বলে, ললিতকাকা, সেই কবে বলেছিলে একটা সিনেমা দেখাবে—

তুলসীর বউদি আসে। চোখ বড় করে বলে, ওঃ মা! কী ভাগ্যি ঠাকুরপো! কী একটু অসুখ হয়েছিল শুনলাম, তারপর থেকে দেখা নেই!

বাচ্চারা ঘরে এসে ভিড় করে।

এ-রকম চমৎকার দিন আসে এক-একটা। ঠিক সেই আগেকার মতো স্বাভাবিক, সুন্দর, হালকা দিন। তখন ব্যাধিটার কথা মনেও থাকে না।

তুলসীর বউ দুধের গ্লাস আর সন্দেশ নিয়ে এসেছিল। তাকে ফিরিয়ে দিল ললিত, বলল, ও-সব নয়। চা খাব। অনেককাল খাই না।

মৃদুলা ইতস্তত করছিল, তুলসীর দিকে তাকিয়েছিল একটু, ললিত হালকা ধমক দিল, চা আনুন।

অনেকক্ষণ সময় কাটাল ললিত।

মৃদুলা বলল, এক বার পলাশপুরে আসবেন। ওখানে তো আমাদের সময় কাটবে না।

যাবে। ললিত যাবে।

বেরোবার মুখে তুলসী সঙ্গ ধরে বলল, চল পৌঁছে দিয়ে আসি। ললিত তাকে ফিরিয়ে দেয়, দূর শালা, নিজেকে একটু নর্মাল ভাবতে দে আমাকে।

একা একা রাস্তায় খানিক ঘুরল ললিত। স্বপ্নের মতো এক-একটা দিন আসে— যখন আগেকার সবকিছু ফিরে পাওয়া যায়।

সন্ধে পার করে ফেরার পথে বাসায় না ফিরে বিমানকে দেখতে গিয়েছিল ললিত।

বন্ধ দরজার বাইরে থেকেই শুনতে পেল, ভিতরে বিমান একা একা অনর্গল কথা বলছে।

আজ বিমানের চোখ অনেকটা ঘোলাটে লাল হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে কথার তাল থাকছে না।

সে জোর করে মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করছিল। ললিতকে দেখে ক্ষীণ শুকনো হাসি হাসল একটু। এনে বসাল বিছানার ওপর। তারপর নিজের হাতে চা করতে বসল। অনেক বার চায়ের বাসনকোসন কেটলি, চামচ, জমাট দুধের কৌটো গোলমাল করে ফেলছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় সে দু' কাপ চা বানিয়ে ফেলল। চা বানাবার সময়ে অনর্গল কথা বলছিল সে, কাকে বলছে তা সবসময়ে খেয়াল থাকছিল না। মাঝে মাঝে হাসছিল।

ললিত তাকে জোর করে পাশে বসাল, কাঁধে হাত রেখে বলল, কী হয়েছে বিমান?

বিমান কথার তাল রাখতে পারছে না। কেবল বড় কষ্টের সঙ্গে বলে, সব ব্যাপারই কেমন খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে দেখছ! অথচ কত সুন্দর হতে পারত সবকিছু!

অনেকক্ষণ তারপর চুপ করে থাকে বিমান, আস্তে আস্তে বলে, এবার আমার একদম ইচ্ছে করছে না।

কী? ললিত আকুল প্রশ্ন করে।

এই পাগল হয়ে যেতে।

বড় কষ্ট হয় ললিতের। চুপ করে থাকে।

ফেরার পথে অশ্বত্থ গাছটার তলায় ঝুঁঝকো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায় ললিত। ভাবে। সে নাড়াবুনে হয়েও এক দিন সেজেছিল কীর্তনীয়া। মানুষের মুক্তির কথা বলেছে কত! হায়, এই পাগলের জন্য সে কিছুই করতে পারে না।

রাতে ঘরে ফিরে ললিত শুয়ে ছিল একা। চুপচাপ। শরীর ভাল ছিল না, তার চেয়েও খারাপ ছিল তার মন। কোনও একটা দিনই সম্পূর্ণ ভাল যায় না কখনও। তার মাথার মধ্যে বিমানের কথা দু'টি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এইবার আমার একটুও ইচ্ছে করছে না, পাগল হয়ে যেতে।

কত কথা ভাবে ললিত। এক দুঃখবোধ আরও দুঃখের ঝরনা খুলে নেয়। বুকের ভিতরে কী একটা খামচে ওঠে। আর কত দিন! কত দিন আর! সে মরে যাওয়ার পরও সবাই থেকে যাবে। তুলসী হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে স্কুলে যাবে। সঞ্জয় গাড়ি চালিয়ে ফিরবে তার রিনি আর পিকলুর কাছে। শাশ্বতী হয়তো তার প্রেমিকের সঙ্গে হেঁটে যাবে দোকানের আলোয়—ফুটপাথ ধরে—অনির্দিষ্টভাবে। কিংবা আদিত্যই ফিরে আসবে নাকি! আহা আদিত্য! কত দিনের বন্ধু তার! কেটে গেল শালা। আবার আসবে কি ফিরে। ললিত মরার আগে এসে ডাকবে, কী রে লোলিটা?

শম্ভু এসে দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, ললিতদা, একজন আপনাকে খুঁজছে।

আলসেমি ভেঙে উঠল ললিত।

গলির মুখে এসে দেখল আবছায়ায় একটা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে টিনের সুটকেস আর ছোট্ট বিছানা।

কে?

ললিত, আমি রে, আমি রমেন। তোর কাছে এলাম।

হঠাৎ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল ললিতের বুক। কতকাল...কতকাল দূর থেকে তার কাছে কেউ আসেনি!

রমেন! দু'হাত বাড়িয়ে ললিত বলল, আয়।

## ॥ উনত্রিশ ॥

যে-রমেন চলে গিয়েছিল— ললিত জানে— সে-রমেন ফিরে আসেনি। এ অনেক দূরের একজন মানুষ। কোন রহস্যময় অচেনা জগৎ থেকে এসেছে। এ হয়তো এমন কিছু জানে যা ললিতের এতকাল জানা ছিল না। যে রমেন গাড়ি চালাত, সাঁতার দিত, ফুটবল খেলত কিংবা পিয়ানো বাজিয়ে গাইত পুব বাংলার মাঝিদের গান— সে এ নয়।

উঠোনের এক কোণে আধো-অন্ধকারে যখন কুঁজো হয়ে রমেন হাত-মুখ ধুচ্ছে, তখন ললিত দরজায় দাঁড়িয়ে সেই আবছায়া দীর্ঘ মূর্তিটিকে দেখছিল। বড় অচেনা লাগে। বড় দূরের। এর সঙ্গে হয়তো আর আড্ডা জমবে না।

রমেন আলোতে এলে তার সুন্দর মুখে নিস্পৃহতা লক্ষ করে ললিত। শান্ত ভাব। আত্মস্থ। হয়তো এ-রকমই ছিল বুদ্ধের মুখ। না কি এ-মুখ নির্বোধের? যে যা নেই তাকেই বিশ্বাস করে বৃথা আয়ুক্ষয় করে! যে প্রজাদের বর্ণাশ্রম মানতে শেখায়! শেখায় বিবাহ-সংস্কার! ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেজে মানুষকে তার সংগ্রামের ইতিহাস থেকে প্রান্তর-প্রান্তর দূরে নিয়ে যায়!

রমেন ললিতের মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে, বলে, তোর চিঠি পেয়ে এলাম। টাকা শোধ দিতে ডেকেছিস!

ললিত লজ্জা পায়। বলে, না রে। টাকা তো মানিঅর্ডার করেও পাঠাতে পারতাম।

তবে!

ললিত ইতস্তত করে বলে, তোকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। কেমন আছিস রমেন?

রমেন মিটিমিটি হাসে।

ক্যান্সারের কথা রমেনকে লিখেছিল ললিত। কিন্তু রমেন তার ব্যাধির কথা জিজ্ঞেসও করল না। বলল না, কেমন আছিস!

মা এলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাকে প্রণাম করে রমেন। এ-রকম প্রণাম ললিত আর দেখেনি। তার বন্ধুরা বিজয়ার পর ছাড়া বড় একটা প্রণাম করে না মাকে। তাও দায়সারা, পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকানো।

চিনতে পারছেন?

মা চিনতে পারল না।

ললিত বলল, ও অনেক বার এসেছে আমাদের বাসায়। রমেনকে তুমি কত দেখেছ!

মা বলে, তখন হয়তো ছোট ছিল। এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।

রাতে পাশাপাশি বালিশে মুখোমুখি শুয়ে অনেক কথা বলল তারা। কত কথা জমে ছিল ললিতের। বলতে বলতে বহুবার উঠে সিগারেট ধরাল ললিত, উত্তেজিত হয়ে উঠল, ক্লান্ত হল। অবশেষে ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ। তখন একসময়ে ক্লান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার অসুখের কথা জিজ্ঞেস করলি না, রমেন?

সে-কথার উত্তর দিল না রমেন। তার একখানা হাত অন্ধকারে ললিতের কাঁধে এসে পড়ল। রমেন

বলল, আয় ললিত, আগের মতো আবার আমরা একটা কমিউন তৈরি করতে চেষ্টা করি।

কমিউন! ভীষণ অবাক হয় ললিত। কমিউন! একটা অতীত স্বপ্নের ছায়া তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়। একপলক পরে সে সচেতন হয়ে বলে, ঠাট্টা করছিস?

রমেন ধীর গলায় বলে, না রে।

ললিত মৃদু হেসে বলে, তবে, সে কি হবে ধর্মীয় কমিউন! সেখানে কি গরিবকে বলা হবে— তোমরা এই জাগতিক দুঃখ হাসিমুখে বহন করো, পরকালে স্বর্গলাভ করবে! আর ধনীকে বলা হবে— তোমাদের সঞ্চিত সম্পদ কিছু কিছু দান করো, তোমরাও স্বর্গের অধিকারী হবে! এইভাবেই ধর্ম সাম্য আনার চেষ্টা করেছে—আমরাও তাই করব?

রমেন আস্তে করে বলে, তা নয়।

ললিত হাসে, বলে, তুই কর। আমাকে ছেড়ে দে। লাতন হয়ে পড়ে আছি। দুম করে একদিন রওনা দেব।

রমেন হাসে, বলে, যতই তোকে আয়ু দেওয়া যাক, ততই তুই আরও আড্ডা দিবি, চা খাবি, দায়সারা চাকরি করবি— কিন্তু তারপরও তো এক দিন মরতেই হত! আয়ু দিয়ে কী করবি ললিত?

ললিত ঘুমচোখে হাসে, বলে, কী করব... কী করব... অনেককিছু করব রে! বিকেলে আমাদের উঠোনে একটা অদ্ভুত আলো এসে পড়ে—কোনও দিন লক্ষ করিনি—সেই আলোটুকু রোজ চুপ করে বসে দেখব একা-একা।...ঠিক দুপুরবেলা—মা যখন একা থাকে—সেই সময়ে ওই জানালার পাশে চৌকিতে বসে লুডো খেলব মায়ের সঙ্গে—পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে একটু রোদ এসে পড়বে মায়ের মুখে। ...একটা প্রেম করব—বুঝলি? সন্ধের পর কলকাতার রাস্তায় দোকানের যে আলো পড়ে, সেই আলোয় তার পাশে পাশে হাঁটব...বিয়ে করব। ...প্রথমে একটা মেয়ে হবে। তার শিশুমুখের গন্ধ নেব বুক ভরে।...তারপর আস্তে আস্তে বুড়ো হব...অসুখ হবে...মরে যাব...

রমেন আস্তে হাসল, বলল, তার চেয়ে এই তো ভাল।

কী ভাল?

মৃত্যুর সময়টা জানা থাকা ভাল। এটা তো একরকমের সৌভাগ্য, যখন মানুষ জানতে পারে আর ঠিক ক'টা দিন তার হাতে আছে।

তাতে কী হয়?

আয়ু ফুরিয়ে আসছে জানলে মানুষ খুব চনমনে হয়ে ওঠে। সচেতন হয়। তখন চেষ্টা করলে সে সাত দিনে একশো বছরের জ্ঞান লাভ করে চলে যায়।

ললিত অলসভাবে হাসে, বলে, কে চায় জ্ঞানলাভ করতে?

রমেন হঠাৎ একটা উদ্ধৃতি উচ্চারণ করে, কারও কারও মৃত্যু পালকের মতো হালকা। কারও কারও মৃত্যু পাহাড়ের মতো ভারী।

ললিতকে কথাটা চাবুকের মতো স্পর্শ করে। সে চুপ করে থাকে। এটা কার উদ্ধৃতি তা তার মনে পড়ে যায়।

রমেন ধীর স্বরে বলে, মৃত্যুটা দুঃখের নয়। ও তো আছেই। দুঃখের সেটা যখন মানুষ কর্তব্য না করে চলে যায়। সে যে-খাদ্য খেয়েছিল, যে-পোশাক পরেছিল, পেয়েছিল যত ভাল ব্যবহার, তার সবকিছুর ঋণ রেখে চলে যায়। ...ললিত, মনে পড়ে?

ললিত চুপ করে থাকে।

রমেন বলে, অকৃতজ্ঞ মানুষই সভ্যতার সব ফসল ভোগ করে নির্লজ্জের মতো, বদলে সভ্যতাকে কিছুই দেয় না।

ললিত হাসে ঘুমচোখে। তারপর মাথাটা এগিয়ে দেয় রমেনের বুকের কাছে! রমেন একখানা হাত রাখে ললিতের মাথা স্পর্শ করে। বলে, ঘুমো।

ললিত ঘুমোয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেই বিদ্যুতের মতো কী যেন স্পর্শ করে তাকে। অন্ধকারে পাশ ফেরার সময়ে সে অস্ফুট গলায় ডাকে, রমেন!

সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ধীর গলায় উত্তর পায়, এই তো আমি। জেগে আছি। তুই ঘুমো।

ললিত ঘুমোয়। কিন্তু সারা রাত ধরে সে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। অজান্তে রমেনকে খোঁজে। সাড়া পেয়ে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

সকালবেলা সে রমেনকে জিজ্ঞেস করে, তুই কাল রাতে ঘুমোসনি?

রমেন মিটিমিটি হাসে, বলে, কেমন যেন মনে হয়েছিল রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে গেলে তুই আমাকে খুঁজবি।

ললিত লজ্জা পেয়ে বলে, তার জন্য ঘুমোসনি? তুই কী রে শালা! অত দূর ঘুরেটুরে এলি— তোর টায়ার্ড লাগছিল না?

রমেন মাথা নাড়ে, আমি কম ঘুমোই। তাই আমার দিন তোর দিনের চাইতে অনেক বড়!

কাল রাত থেকেই ললিতের মায়ের মনে একটা সন্দেহ ঢুকেছে। এই যে রমেন নামে ছেলেটা এসেছে ললিতের কাছে, এর রকমটা কী? সাজেগোজে দীনদরিদ্র, কিন্তু মুখখানা দেখে মনে হয় বড়ঘরের ছেলে। বড় সুন্দর মুখখানা। চেনা-চেনা লাগছিল। ললিত বলছিল বটে, রমেন এ-বাসাতে অনেক এসেছে মা! ওকে তুমি কত বার দেখেছ। কিন্তু আজকাল চোখে একটা ঘোলা-ঘোলা ভাব—কোনও কিছুই ঠিকমতো নজরে আসে না। তা ছাড়া কত দিন আগে দেখা—অত কি মনে থাকে?

সে যাই হোক, কিন্তু ললিত বলছিল, ছেলেটা নাকি সন্ন্যাসী। কোন আশ্রমে থাকে। এটা শোনার পর থেকেই মনটা কেমন খচখচ করছে। ওই সন্ন্যাসী ছেলেটা ললিতের কাছে কেন এসেছে! কী দরকার! বড় ভয় করে ললিতের মায়ের। এ-ছেলেটা আবার তুক করে যাবে না তো ললিতকে! একেই তো ললিত উদাসী ছেলে! আধা-সন্ন্যাসী হয়েই আছে তো।

কাল রাতে এক বিছানায় শুয়ে ওরা দু'জন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কথা বলছিল। কী যে অত কথা ওদের। ললিতের মা অনেক চেষ্টা করেছে শুনতে। কিন্তু গুনগুন শব্দ, দেশলাই জ্বালবার খস ছাড়া কিছুই কানে আসেনি। সারা রাত জেগে ওই ছেলেটা কী যেন বুঝিয়েছে ললিতকে। বিবাগী ছেলেদের বড় ভয় ললিতের মায়ের। কী কথা হয়েছিল ওদের কাল রাতে? একেই বুড়ি নাচুনি, তার ওপর আবার ঢাকের বাদ্যি।

সকালে ললিত বাথরুমে গিয়েছিল, সে সময়ে রমেনকে একা পেয়ে ললিতের মা এসে বলল, বুঝলে বাবা, ললিতের তো সংসারে মতি নেই, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে যেয়ো তো! দেখো, যেন ওর আর-একটু সংসারে ঝোঁক হয়, টাকাকড়ির দিকে মন দেয়। আর দেখো, ও মেয়ে দেখলে কানা হয়, চোখ তুলে তাকায় না—কিন্তু এ-বয়সে ও-রকম স্বভাব কি ভাল? তরতাজা বয়স—এ-বয়সে বয়সের গুণ থাকবে না? তুমি ওকে একটু দেখো তো—

দেখব।

দেখো। ওর যেন সংসারে মন হয়। আমি ওর জন্য মেয়ে দেখে রেখেছি। বেশ মেয়েটি। বড় লক্ষ্মীমন্ত।

## ॥ ত্রিশ ॥

নিজের ওপর মাঝে মাঝে আজকাল বড় রেগে যায় শাশ্বতী। ক্যান্সারের ওষুধটার কথা সে যে কোথায় পড়েছিল, কোন কাগজে, কবে, তা তার কিছুতেই মনে পড়ছে না। অনেক ভেবেছে সে।

এক দিন ডাঁই করা পুরনো খবরের কাগজ মেঝেতে নামিয়ে ধুলো ঝেড়ে বহু সময় ধরে খুঁজেছে। মা এসে অবাক, ও কী রে ঠাড্ডু, সারা দিন কাগজ গড়ায়, খুলেও দেখিস না—এখন পুরনো কাগজ পেড়ে ঘর নোংরা করে কী দেখছিস?

কী দেখছে তা কি কাউকে বলতে পারে শাশ্বতী? কে বুঝবে। তাই সে রেগে বলে, ঘর ঝেঁটিয়ে দেব। এখন যাও তো।

এক দিন কালীনাথকেও জিজ্ঞেস করেছিল শাশ্বতী, দাদা, তোর মনে আছে—একদিন কাগজে বেরিয়েছিল না যে ক্যান্সারের কী একটা ওষুধ বেরিয়েছে!

ক্যান্সারের ওষুধ! কালীনাথ অনেকটা ভাবে. মাথা নেড়ে বলে, কোথায়, নজরে পড়েনি তো! বেরিয়েছে নাকি!

হুঁ। আমি নিজে দেখেছি।

কালীনাথ একটু ভেবে বলে, তা হলে খুঁজে দেখিস তো। কাগজে পেলে বলিস। অফিসে সবাইকে খবরটা দেব। খুব সেনসেশেন্যাল খবর। কেউ বলেনি তো!

শুনে রেগে যায় শাশ্বতী। খবরটা কি কেউ দেখেনি! তবে কি বেরোয়নি ও-রকম খবর? নাকি সে উড়ো শুনেছে কোথাও!

খুব সন্দেহ হয় তার। কিন্তু হাল ছাড়ে না।

পাড়ার মহিম ডাক্তারকে শাশ্বতী কাকা বলে ডাকে। তার ডিসপেন্সারিতে সবসময়ে ভিড়। এক দুপুরেই যা একটু ফাঁকা। তখন মহিমকাকু কল-এ বেরোয়, আর মদন কম্পাউন্ডার বসে বসে ঝিমোয়। সেই সময়েই এক দিন সেখানে হানা দিল শাশ্বতী, মদনদা, একটা খবর জানেন? ক্যান্সারের ওষুধ কোথায় কবে বেরিয়েছে!

মদন বুড়ো মাথা নেড়ে বলে, বেরোল আর কোথায়! তবে বেরোব-বেরোব করছে। দু' চার দশ বছরের মধ্যে বেরিয়ে যাবে।

মদন জানে না, জানলে আর কম্পাউন্ডার হয়! শাশ্বতী তখন মহিম ডাক্তারের টেবিলের ওপর রাজ্যের মেডিকাল জার্নাল বসে বসে ঘাঁটে। সব বুঝতে পারে না, কিন্তু মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে খোঁজে—কোথাও ক্যান্সারের সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে কি না।

মদন কম্পাউন্ডার জিজ্ঞেস করে, কার ক্যান্সার?

কারও না। এক বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরেছি।

অ। বলে মদন হাই তোলে।

কলেজের লাইব্রেরিতে কোনও ডাক্তারি বই নেই। তবু শাশ্বতী ক্যাটালগ খুঁজে ফিজিওলজির গোটাকয় বই নিল। পড়ে কিছুই বুঝতে পারল না। নিজের বোধবুদ্ধির ওপরও তার ভয়ংকর রাগ হতে লাগল।

হাসপাতালে কদাচিৎ গেছে শাশ্বতী। যেতে ভয় করে। অনেক দিন আগে তার বড়দি লীলাবতী কিছু দিন ছিল মেডিকাল কলেজে। তখন, খুব ছোটবেলায় সে দু'-একবার সেখানে গেছে। সে জানে দু' নম্বর বাস মেডিকাল কলেজের পাশ দিয়ে যায়। সেই স্মৃতির ওপর নির্ভর করে, খুব সাহস করে এক দিন কলেজে বেরিয়ে, কলেজে না গিয়ে সে দু' নম্বর বাসে চাপল। ভয়ে বুক ঢিবঢিব করছিল তার, তবু যেতেই হবে বলে গেল।

ক্যান্সার ইউনিট খুঁজে পেতে দেরি হল না। ছোটখাটো একটা বাড়ি। লোকজনের ভিড় কম। সে গেটের কাছে একজন বেয়ারাকে বলল, আমি একজন ডাক্তারের সঙ্গে একটু কথা বলব।

লোকটা তাকে একটা ফাঁকা অফিস-ঘরের মতো ঘর দেখিয়ে দেয়।

সেখানে বাচ্চা এক ডাক্তার বসে আছে। রোগা, ফরসা, চোখে চশমা, মিষ্টি মুখখানি। কথা বলতেই বোঝা গেল, একটু তোতলা। সুন্দর ব্যবহার তার। শাশ্বতীকে বসতে বলল।

কার ক্যান্সার?

একজনের। আমার চেনা একজন।

কোথায় হয়েছে?

পেটে?

লোকটা হাসে। বলে, পেটে তো অনেক কিছু আছে। পেটের কোথায়?

শাশ্বতী যত দূর জানে বলল—লোকটা ভেবে বলল, তা হলে গ্যাসট্রিক কারসিনোমা। অপারেশন হয়েছে বললেন?

হয়েছে।

লোকটা ঠোঁট ওলটায়, বলে, লাভ নেই অবশ্য।

শাশ্বতীর ভয়ংকর বুক কেঁপে ওঠে। কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সে কাঁপা গলায় বলে, আর ট্রিটমেন্ট নেই?

লোকটা মিষ্টি হেসে বলে, গ্যাসট্রিক কারসিনোমা পাঁচ বছর পর্যন্ত টিকলে আমরা কিওর বলে ধরি। কিন্তু পাঁচ বছরই ম্যাক্সিমাম।

তার পর কী হবে?

কালো কফির রঙের বমি হবে। বাঁ কাঁধের দিকে কতগুলো লাম্প দেখা যাবে। খিদে থাকবে না। বমির সঙ্গে রক্তও থাকতে পারে—

কিন্তু শাশ্বতী সে-সব শুনতে পায় না। না শোনার জন্যই বলে, আমি শুনেছি রে দিলে ভাল হয়ে যায়! আমাকে আপনাদের যন্ত্রপাতিগুলো দেখাবেন?

আসুন। বলে লোকটা মিষ্টি হেসে উঠে দাঁড়ায়। সে নতুন ডাক্তার। এই কচি সুন্দর মেয়েটাকে সে নিজের কৃতিত্ব দেখাতে আপত্তি করে না।

নিঃশব্দ, ঠান্ডা ঘরে প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলো ভীত চোখে দেখে শাশ্বতী। এই বিশাল যন্ত্রেও ওইটুকু রোগ ভাল হয় না!

লোকটা তাকে দূর থেকে যন্ত্রের কলাকৌশল বুঝিয়ে দিতে থাকে। শাশ্বতী শোনেও না। কেবল চেয়ে থাকে। বলে, কিন্তু আমি শুনেছিলাম, এর ওষুধ বেরিয়েছে।

ওষুধ! অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। কিন্তু কোনওটাই অমোঘ নয়।

কিন্তু কথাটা মনে রাখে না সে।

মানুষ এতকাল ধরে করেছে কী! কী করেছে তারা! শাশ্বতী ভেবে দেখে, এই একটু ছোট্ট ঘটনার কাছে পৃথিবীর সব আবিষ্কার ব্যর্থ হয়ে আছে! সে মানুষের ওপর বড় রেগে যায়। কেন অকাজের কাজ করে মানুষ! কেন খামোখা প্লেন বানাচ্ছে! রকেট ছুড়ছে! তৈরি করছে বোমা! এ তো ছেলেখেলা শুধু শুধু। তারা সব ছেড়ে দিক। তারা এক্ষুনি বসে যাক সেই অমোঘ ওষুধটা বানাতে। শাশ্বতী তাদের পাঁচ বছর সময় দেবে। না, অত নয়। এক বছর— এক বছরের মধ্যে যদি বানাতে পারে ভাল। নইলে—নইলে—হায়, নইলে অসহায় শাশ্বতী কী শাস্তি দেবে তাদের তা ভেবে পায় না।

তাদের ঝি ইন্দু মাঝে মাঝে ঠাকুরপুকুরের এক তান্ত্রিকের কথা বলত। সে রোগ সারায়, প্রাণবিনিময় করে দেয়। ইন্দুকে এক দিন জিজ্ঞেস করল শাশ্বতী. হ্যাঁগো ইন্দুদি, সেই তান্ত্রিক ক্যান্সার সারাতে পারে?

ইন্দু ঘাড় হেলিয়ে বলে, সব। আমার ননদাইয়ের অমন বাতব্যাধি সেরে গেল!

ইন্দুর কাছ থেকে তান্ত্রিকের ঠিকানাটা রেখে দেয় শাশ্বতী।

কয়েক দিনের মধ্যেই এ-রকম অনেক ঠিকানা এসে যায় তার হাতে। সে ভেবে কূল পায় না, কার কাছে যাবে।

মাঝে মাঝে সকালের রোদে বাবা বাগানে আগাছা নিড়োয়, ফুলগাছের গোড়া খুঁড়ে দেয়। তখন বাবার কাছে গিয়ে চুপ করে বসে শাশ্বতী। বাবা কথা বলে না, কিন্তু কদাচিৎ কখনও উদাসীন চোখে তার দিকে একপলক তাকায়।

শাশ্বতী ডাকে, বাবা।

উত্তর নেই।

কী করলে ক্যান্সার সারে?

উত্তর নেই।

কেন মানুষ ওষুধ বের করছে না এক্ষুনি?

মানুষের কাজে বড় হেলাফেলা। শাশ্বতী ভাবে।

ললিতের বাসায় সেই যে গিয়েছিল শাশ্বতী তারপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে। প্রায় এক মাস পর একদিন রবিবারের কাগজে একজন কবিরাজের প্রবন্ধ বেরোল। হিমালয়ের গাছগাছড়ার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় এক দুর্লভ গাছের নাম করে বলেছেন যে, এর থেকে একদিন দুরারোগ্য ক্যান্সারের প্রতিষেধক বেরোতে পারে।

কালীনাথকে লুকিয়ে প্রবন্ধের পাতাটা ভাঁজ করে ব্যাগে ভরল শাশ্বতী। অল্প একটু সাজগোজ করে বন্ধুর বাসায় যাচ্ছে বলে বেরিয়ে পড়ল।

ললিতের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল খুব লম্বা, ফরসা একজন লোক। গায়ে হাফহাতা পাঞ্জাবি, পরনে খাটো ধুতি।

ললিতবাবু নেই?

আছে। আসুন। লোকটি বড় সুন্দর হাসে। শাশ্বতী লক্ষ করে।

আধশোয়া থেকে উঠে বসল ললিত। দরজাটা আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল রমেন, সে সরে যেতেই শাশ্বতীকে দেখে সে প্রথমে কথা বলতে পারল না। কেমন যেন বুক-কাঁপা, কথা-গুলিয়ে-যাওয়া, আবেগসর্বস্ব এক অনুভূতি টের পায় সে।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

এতক্ষণ শাশ্বতী কেবল আসছিল ললিতের কাছে। একটা ব্যগ্র প্রয়োজনের কথাই তার মন জুড়ে ছিল। কিন্তু এখন, ললিতের মুখোমুখি সে হঠাৎ টের পায়, এতটা করার মধ্যে সে সকলের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। সবাই বুঝতে পারছে এখন, কেন শাশ্বতী এত দূর এসেছে।

বুঝুকগে। শাশ্বতীর কিছু আর যায় আসে না।

আসুন। ভিতরে আসুন। রমেন ডাকে।

শাশ্বতী ভিতরে এসে তার শুষ্ক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে একটু হাসে। বলে, কেমন আছেন দেখতে এলাম।

তারপরেই মাথা নিচু করে সে।

শাশ্বতীকে বসিয়ে মাকে ডেকে আনে ললিত রান্নাঘর থেকে।

এতক্ষণ মনে মনে বোধহয় শাশ্বতীকেই প্রার্থনা করছিল মা। গতকাল ওই সন্ন্যাসী ছেলেটা আসার পর থেকেই। ও কোনও তুক করার আগেই যেন শাশ্বতী আসে।

একগাল হেসে কাছে বসে শাশ্বতীকে প্রায় কোলে টেনে নেয় মা, বলে, মুখ শুকিয়ে গেছে যে! রোদে রোদে ঘোরো বুঝি! তারপরেই আর দেরি না করে জিজ্ঞেস করে, তোমরা বাঁড়ুজ্যে না! শাণ্ডিল্য গোত্র তো!

ললিতের কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। বলে, উঃ মা, কী হচ্ছে!

হায় মা! মায়ের জন্য বড় কষ্ট হয় ললিতের। মিতুর অপমান মনে পড়ে। মনে পড়ে আর কিছুদিন বাদে এই ঘরে কেমন একা হয়ে যাবে মা। মা জানে না, ললিত— তার একমাত্র ললিত থাকবে না। ধমক দিতে ললিতের কষ্ট হয়। চোখ ছলছল করে। মা আর শাশ্বতীর ও-রকম কাছ ঘেঁষে আপনজনের মতো বসে থাকা সে দেখতে পারে না। সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

শাশ্বতীকে তাদের কাছে না-রেখে রান্নাঘরের দরজায় টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল মা। মায়ের মুখে আজ হাসি ধরছে না। এই গরিবের সংসারে লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটা কি আসতে রাজি হবে! হয় যদি! আহা, যদি হয়!

শাশ্বতীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য রমেন আর ললিত একসঙ্গে বেরিয়েছিল।

আনোয়ার শা রোড ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর ললিত একটু হাঁফিয়ে গেল। বেশ রোদ এখন। সেও আবেগবশত জোরে হেঁটেছে। লক্ষ করে শাশ্বতী বলল, আপনারা ফিরে যান। আমি তো রাস্তা চিনি। যেতে পারব।

রমেন ললিতকে ফিরিয়ে দেয়, তুই চলে যা। আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।

ক্লিষ্ট একটু হেসে ললিত দাঁড়িয়ে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে এল আস্তে আস্তে। এসে শাশ্বতীর রেখে-যাওয়া পত্রিকার প্রবন্ধের পাতাটা খুলল সে। খুলে হাসল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একসময়ে রমেন হাত ধরে শাশ্বতীকে রাস্তার ধারে সরিয়ে আনল। পিছনে অনেকক্ষণ ধরে হর্ন দিচ্ছিল একটা গাড়ি, শাশ্বতী শুনতে পায়নি। সে একটু লাজুক হাসল।

যতক্ষণ ললিত সামনে ছিল ততক্ষণ লোকটাকে ভাল করে লক্ষ করেনি শাশ্বতী। এখন লক্ষ করে দেখল লোকটা একটা থামের মতো বড়। গায়ের ফরসা রং থেকে রোদ ঠিকরে আসছে, সুন্দর চেহারা, কিন্তু পোশাকের কোনও যত্ন নেই। পরনে একটা হাফ-হাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি। লোকটা বোধ হয় কখনও খেয়াল করে না যে সে কতখানি সুন্দর। শাশ্বতীর ভাল লাগল যে সে রাস্তার মাঝখান দিয়ে অসাবধানে হাঁটছিল বলে লোকটা তাকে একটুও ধমক দিল না, উপদেশও দিল না। শুধু হাত ধরে সরিয়ে এনে আবার নির্বিকারভাবে হাঁটছে। যেন দরকার হলে আবার হাত ধরে সরিয়ে আনবে, ধমক বা উপদেশ দেবে না।

শাশ্বতী জিজ্ঞেস করল, বললেন না তো আপনি সন্ন্যাসী কি না!

রমেন শান্তভাবে বলল, না।

শাশ্বতী তার দাঁতে ঠোঁট টেপা সুন্দর হাসিটা হাসল, বলল, কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী হলে খুব ভাল হত।

কেন?

সন্ন্যাসীদের তো অনেক তুকতাক তন্ত্র-মন্ত্র জানা থাকে। আমি আপনার কাছ থেকে ক্যান্সারের ওষুধ জেনে নিতাম।

রমেন একটু হাসল।

শাশ্বতী চিন্তিত মুখে বলল, কিন্তু যত দূর মনে হয় আমি কাগজে দেখেছি ক্যান্সারের ওষুধ বেরিয়েছে। তাই না?

রমেন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, বেরিয়েছে।

শাশ্বতীর মুখ সামান্য উজ্জ্বল দেখাল। বলল, আপনিও দেখেছেন, না?

রমেন একটু চিন্তা করে বলল, দেখেছি বোধ হয়।

বেরিয়েছে। শাশ্বতী হঠাৎ নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি।

রমেন একটুও হাসল না। খুব গম্ভীরভাবে বলল, আমি অবশ্য একটা টোটকা ওষুধের কথা জানি।

কী সেটা?

হাঁটতে হাঁটতে বাস-রাস্তায় এসে গিয়েছিল তারা। রমেন বলল, আর-এক দিন বলা যাবে। ওই আপনার বাস-স্টপ।

না, আপনি বলুন। অধৈর্যের স্বরে বলল শাশ্বতী। এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে বলল, ওইখানে একটা রেস্টুরেন্ট দেখা যাচ্ছে। চলুন, একটু বসি।

রমেন একটু ইতস্তত করে বলল, আমি রেস্টুরেন্টে কিছু খাই না।

আচ্ছা, আমি চা খাব। আপনি বসবেন। চলুন।

সকাল সাড়ে দশটায় রেস্টুরেন্টটা খুব ফাঁকা ছিল না। কয়েকজন ইতর ধরনের ছেলে ছোকরা এদিক ওদিক বসে আছে। কেউ জোরালো শিস দিচ্ছে, তার সঙ্গে টেবিলে আঙুল ঠুকে তবলা বাজানোর শব্দ। দেখেশুনে মুখ শুকোল শাশ্বতীর। বলল, এখানে হবে না। বড় বাজে জায়গা।

সব জায়গাই এ-রকম। আসুন, কোনও ভয় নেই।

ভিতরটা নোংরা অন্ধকার। ছেলেছোকরারা লম্বা একটা টেবিল দখল করে রেখেছে, বাদবাকি রেস্টুরেন্টটা ফাঁকা। এরা আড্ডা দেয় বলেই বোধহয় এখানে তেমন খদ্দের আসে না। যে-দোকানে একবার এ-ধরনের আড্ডা বসে সে-দোকান আস্তে আস্তে মিইয়ে যায়, টিম টিম করে চলে।

ইস, কী অসভ্যের মতো তাকাচ্ছে! ফিস ফিস করে শাশ্বতী বলল।

আপনিও তাকান। ভয় পাবেন না।

যাঃ।

রমেন তার সরল সুন্দর চোখে তাকিয়ে ছিল ছেলেগুলোর দিকে। প্রায় নিষ্পলকভাবে।

শাশ্বতী ফিসফিস করে বলল, কী করছেন! ওরা ভীষণ বাজে।

সে-কথায় কান দিল না রমেন। তাকিয়েই রইল। ব্যাপারটা খুব আস্তে আস্তে ঘটতে লাগল। কালোকোলো, রংচঙে জামা প্যান্ট পরা ছেলেগুলো ঘন ঘন তাকাচ্ছিল তাদের দিকে। হাসছিল, গা টেপাটেপি করে নিচু স্বরে কথা বলছিল। তারা কিছুক্ষণ রমেনকে লক্ষ করল, তার চোখের দৃষ্টি ফেরত

দিল সমানে সমানে। একজন বলল, মাইরি, আমাদের ভসসো করে ফেলবে। তারপর আস্তে আস্তে ঠান্ডা লড়াইটায় তারা হারতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আর কেউ তাকাচ্ছিল না, নিজেদের আড্ডায় ডুবে গেল।

রমেন শাশ্বতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, চোখের একটা কোনও শক্তি আছে। আপনি যদি কখনও এ-সব ছেলের চোখে সাহস করে চোখ রাখেন তবে দেখবেন এরা সেটা সহ্য করতে পারে না। তবে খুব সরলভাবে তাকাতে হয়, রেগে গিয়েও নয় আবার ভয়ে ভয়েও না—

কিন্তু ওষুধের কথাটা!

রমেন মাথা নাড়ল—হ্যাঁ। সেটাও চোখেরই একটা ব্যাপার। আমাদের পরিবারে একটা পুরনো চোখের অসুখ ছিল। আমার ঠাকুরদার বাবা ছিলেন প্রায় অন্ধ মানুষ। দাদু সেই অসুখটা জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন। যৌবনকাল থেকেই তাঁকে চশমার সঙ্গে আতসকাচ কিংবা দূরবিন ব্যবহার করতে হত। আবার দাদুর দুই ছেলে, আমার বাবা আর জ্যাঠামশাই, আর এক মেয়ে, আমার পিসিমা—এদের বয়স তিরিশ পেরোনোর আগেই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করল। আর চল্লিশের আগেই সকলের অন্ধ হয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সেই সময়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল আমাদের বিরাট বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ি, বাগান, খাজনার হিসেব এ-সবের দেখাশোনা নিয়ে। কে এ-সব দেখে? আমার ঠাকুমা বরাবর ভিতর-বাড়িতে থাকতেন, বাইরে বেরোতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন বাবার চোখ খারাপ হতে শুরু করল তখন ঠাকুমাকে বেরোতে হল। আর, আশ্চর্যের বিষয় যে, ঠাকুমা খুব অল্পদিনেই সব বুঝেসুঝে নিলেন। খুব নিখুঁতভাবে— এমনকী দাদুর চেয়েও ভালভাবে তিনি জমিদারি চালাতেন। আমাদের বিরাট বাড়ি, বাগান-সম্পত্তি, সবকিছুর ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ ছিল। সকলের দেখা তিনি একা দেখতেন। তাই এত তীক্ষ্ণ হয়েছিল তাঁর চোখ যে বাগানের একটা ফুল কেউ তুললে তিনি টের পেতেন, গাছের একটা পাতা পড়ে গেলেও তাঁর চোখ এড়াত না। প্রতিটি প্রজার মুখ তাঁর মনে থাকত। আমাদের বাসায় অজস্র সিন্দুক, আলমারি আর বাক্স প্যাঁটরা ছিল— ঠাকুমা সেগুলোর তালা একবার চাবি ঢুকিয়ে খুলতেন, কখনও কোন তালার কোন চাবি তা ভুল করতেন না। এইভাবে সারা দিন চোখ ব্যবহার করতে করতে তাঁর চোখ ভয়ংকর তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, আর বিষয়সম্পত্তির ওপর তাঁর ভয়ংকর একটা ভালবাসা চলে আসে। এর পর ঠাকুমা যখন মারা যান তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। তাঁর উদুরি হয়েছিল। তার ওপর গায়ে জল এসেছিল। একটা পা গ্যাংগ্রিন হয়ে পচে গোড়ালির হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেল। কিন্তু ঠাকুমা মরছিলেন না। একদিন দু'দিন করে এক মাস দু'মাস বেঁচে রইলেন। ওই ফোলা পচাগলা শরীরের মধ্যে একমাত্র তাঁর চোখ দু'টোই ছিল দেখবার মতো। সেই বড় বড় চোখ, সেই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একই রকম ছিল, রোগের যন্ত্রণা সেগুলিকে একটুও ছোঁয়নি। কেবল বলতেন—আমি মরে গেলে এত সব কে দেখবে? বোধহয় সেই কারণেই ভীষণ ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি বেঁচে রইলেন আরও সাত-আট মাস। সেই বেঁচে থাকাটা দেখার মতো ছিল। তারপর একদিন দুপুরবেলা আমার জেঠিমা ঠাকুমার শিয়রের দিকের আলমারি খুলে কী যেন বের করতে গেছেন, ঠাকুমা ঘাড় উলটে সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বড়বউ, কী নিচ্ছ? ব্যস ওই অবস্থায় তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল। আমরা চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। ঘাড় উলটে ঠাকুমা এত বড় বড় চোখে আলমারিটার দিকে চেয়ে আছেন— একেবারে জীবন্ত মানুষের মতো খোলা চোখ, কেবল হাঁ-করা মুখের মধ্যে এলিয়ে থাকা জিবটা দেখে বোঝা যায়, ঠাকুমা বেঁচে নেই। সেই খোলা চোখ বন্ধ করতে আমাদের বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল। যত বার বুজিয়ে দেওয়া হয় তত বারই আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে যায়, আর ঠাকুমা তাকিয়ে থাকেন।

আহা। স্বভাবত কোমল মন শাশ্বতীর। তার চোখ ছলছল করে।

ওষুধের কথাটা কী জানেন? ঠাকুমা মরে যাওয়ার পর আমি অনেক ভেবে দেখেছি ঠাকুমার যে মরতে অত সময় লেগেছিল তার একটা কারণ হচ্ছে ওই বিষয়-সম্পত্তির প্রতি ভালবাসা। বিষয়-সম্পত্তির প্রতি বেশি টান ভালবাসা আমরা ভারতীয়েরা পছন্দ করি না, কিন্তু তবু বিষয়-সম্পত্তির মতো খারাপ জিনিসের প্রতি ওই ভালবাসাও ঠাকুমার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছিল। তা হলে দেখুন, ভাল কিছু সৎ কিছুর প্রতি যদি মানুষের ও-রকম তীব্র ভালবাসা হয়, আর তাকে রক্ষা করার জন্য যদি মানুষ

সজাগ হয়ে ওঠে তা হলে তার আয়ু বেড়ে যাবে না? শুধু আয়ু নয়, তার চোখের দৃষ্টি বেড়ে যাবে, বাড়বে শ্রবণক্ষমতা, বেড়ে যাবে স্মৃতিশক্তি কিংবা ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি। তখন আর পাঁচজন যা দেখে না, যা শোনে না তার সব সে দেখতে বা শুনতে পাবে। তাই না?

অনেকখানি ঘাড় হেলাল শাশ্বতী, বলল, ঠিক।

তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, তা হলে আপনি বলছেন, আপনার বন্ধুর অসুখটা সেরে যাবে?

মিটমিট করে একটু হাসল রমেন, বলল, আপনার কী মনে হয়?

গূঢ় প্রশ্ন। শাশ্বতী এর উত্তর জানে না। ললিতের উজ্জ্বল চোখ মুখখানা সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায়। মৃত্যুর মুখোমুখি একা একটা লোক। রোগী। শাশ্বতীকে ভালবাসে—কিন্তু সেটাকে স্বীকার করতে চাইবে না, এমন অহংকারী! রমেনের সুন্দর সবল মুখখানার দিকে চেয়ে শাশ্বতীর ঠোঁট একটু কেঁপে ওঠে। রমেনের প্রশ্নটার কোনও উত্তর দেয় না শাশ্বতী, কিন্তু হঠাৎ স্খলিত গলায় বলে, আপনি ওকে বাঁচিয়ে দিন।

এই থামের মতো প্রকাণ্ড লোকটার সামনে কথাটা বলতে একটুও লজ্জা করে না শাশ্বতীর।

রমেন একটা নিশ্বাস ফেলল।

এক কাপ চা সামনে জুড়িয়ে যাচ্ছিল। শাশ্বতী তাতে দু'-এক বার ঠোঁট ছুঁইয়ে উঠে পড়ল, বলল, অনেক বেলা হয়ে গেছে—

রাস্তায় এসে শাশ্বতী বলল, আপনি একটা কথা কাউকে বলবেন না।

কী কথা!

আমি ওকে ভালবাসি।

রমেন মাথা নাড়ল, বলব না।

বাস-স্টপের ভিড় থেকে একটু আলগা দাঁড়াল দু'জন। শাশ্বতী হাত দিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে মাথা উঁচু করে রমেনকে দেখল। তারপর বলল, আপনি বরং ওকে বলবেন।

কী?

শাশ্বতী লাজুক মুখ নামিয়ে বলল, বলবেন যে আমি ওকে ভালবাসি।

তারপর একটু ইতস্তত করে শাশ্বতী বিব্রত মুখে বলল, আমাকে যদি ও ভালবাসে তা হলে হয়তো—আপনি যা বললেন সে-রকম—ওর আয়ু বেড়ে যেতে পারে—

রমেন একটু হেসে মাথা নাড়ল, না। মেয়েদের ভালবাসা তো সোজা। সে-ভালবাসায় লাভ নেই। বরং মেয়েদের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা মানুষের মধ্যে মৃত্যুপ্রেম জাগিয়ে দেয়।

সে কী?

রমেন শান্তভাবে বলল, আপনি যে-কোনও প্রেমের কবিতা পড়ে দেখবেন, কিংবা প্রেমের গল্প উপন্যাস, তাতে দেখবেন মৃত্যুর কথা কিছু না কিছু থাকবেই। যারা প্রেম-ট্রেম করে তাদের কথাবার্তা শুনে দেখবেন, তারা দু'-দশটা কথার পরেই একে অন্যকে বলছে—আমি যদি মরে যাই তা হলে তুমি কী করবে? মৃত্যুর চেতনা ছাড়া কিছুতেই প্রেমকে মহৎ করা যায় না। ও-রকম প্রেমে কি আয়ু বাড়ে?

তবে? কাকে?

রমেনের মুখে উত্তরটা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সে উচ্চারণ করল না। 'ঈশ্বর' শব্দটা উচ্চারণ করার একটা বিশেষ সময় আছে, নইলে তো মানুষের মনে তরঙ্গ তোলে না। বরং শুনে মানুষ হেসে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু কখনও কখনও এক-একটা বিশেষ সময় যখন মানুষ রেল লাইনের ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে থাকে রেলগাড়ির প্রতীক্ষায়, যখন জলপ্লাবনে ছেলে কোলে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়, কিংবা যখন—। তাই রমেন কথা বলে না। একটু হাসে মাত্র।

শাশ্বতী মুখ তুলে রমেনের উজ্জ্বল চোখ দু'খানা দেখল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনার কখনও চোখের অসুখ হয়নি?

না। বলে মাথা নাড়ল রমেন, তারপর একটু চুপ করে থেকে দুষ্টু ছেলের মতো হেসে বলল, কিন্তু একবার আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য...কিন্তু ওই আপনার বাস এসে গেল।

বাসটা সামনে এসে দাঁড়াতেই কিন্তু শাশ্বতী পিছিয়ে গেল, বলল, বড্ড ভিড়।

রমেন একটু চিন্তা করে বলল, তা হলে চলুন রাসবিহারীর মোড় পর্যন্ত আপনাকে হেঁটে এগিয়ে দিয়ে আসি।

শাশ্বতীও তাই চায়। এ লোকটার সেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্পটা তাকে শুনতেই হবে। সদ্য চেনা একজন লোককে এতদূর খামোখা হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কেমন বেমানান তা তার মনেও হল না। বলল, বেশ হবে। চলুন। ওখান থেকে আমি যাদবপুর যাওয়ার বাস ফাঁকা পাব।

কিছুক্ষণ তারা নিঃশব্দে হাঁটল। ফুটপাথ নেই বলে রাস্তাটা বিপজ্জনক, অবিরল গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তার দিকটায় রমেন, রাস্তার ধার ঘেঁষে শাশ্বতী। খানিক দূর হেঁটে শাশ্বতী হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়ে বলল, এবার সেই গল্পটা বলুন। সেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্পটা—

রমেন সামান্য একটু হাসল। বলল, রাস্তা একটু ফাঁকা পাই তারপর—

রেলব্রিজ পেরিয়ে যাওয়ার পর চওড়া সুন্দর রাস্তার ফুটপাথে উঠে এল দু'জন। শাশ্বতী এতক্ষণ কৌতূহল চেপে ছিল, এবার শ্বাস ফেলে বলল, এবার—

রমেন মাথা নেড়ে বলল, আমার ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর একদিন সন্ধেবেলা খেলাধুলো সেরে ফিরছি। আমাদের বাড়ির সামনের দিকটায় বিরাট হলঘরের মতো একটা বৈঠকখানা। সেই বৈঠকখানায় সন্ধের অন্ধকারে দেখি দাদু প্রকাণ্ড পিয়ানোটার পাশে বসে আছেন। হাতের আতসকাচ দিয়ে পিয়ানোর গায়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছেন নিচু হয়ে। আমি তাঁকে টের পেতে না-দিয়ে পা টিপে টিপে বড় ঘরটা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে দাদু খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমি। দাদু একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে—যেন আমাকে কোলে নেবেন—এমনভাবে বললেন, রমেন! কাছে এসো তো। কাছে যেতেই উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমার সামনে বোসো। আমি মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসলাম। দাদু আমার মুখ হাতে তুলে বললেন, দেখি রমেন, তোমার মুখখানা। আমার মুখের ওপর আতসকাচ ধরে দাদু অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখ দেখলেন। তখনও ঘরে আলো দিয়ে যায়নি, ঘরটা অন্ধকার। আবছা একটু শেষবেলার আলোয় সেই আতসকাচের ভিতর দিয়ে আমি তাঁর দু'টো প্রকাণ্ড চোখ, নাকের ওপর উঁচু হাড়, ঘন ভ্রূ আর কপাল দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হচ্ছিল সেই চোখ জোড়া আমার ভিতরে অনেকখানি দেখে নিচ্ছে। যখন আমার বয়স দশ কি এগারো, তখন আমি আমার প্রথম বয়ঃসন্ধির খারাপ স্বপ্নটি দেখেছি, আর একদিন, দুপুরবেলা অলি নামে একটি মেয়ে চোর-চোর খেলার সময়ে মুকুন্দর ঘানিঘরে অন্ধকারে লুকিয়ে আমাকে একটা চুমু খেয়েছিল, তখন আমার গালে একটি-দু'টি ব্রণ দেখা দিচ্ছে। তাই দাদুর সেই চোখ জোড়ার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল তিনি আমার সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমার বুক কাঁপছিল। কিন্তু দাদু সেদিন আমাকে অন্যরকমভাবে দেখলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখে তিনি খুব স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, রমেন, তুমি কি খুব বেশি কিছু চাও? খুব টাকা পয়সা, বড় জমিদারি, অনেক বাড়ি-গাড়ি? সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো তখন আমার বয়স নয়। দাদু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজে থেকেই বললেন, তুমি কখনও খুব বেশি কিছু চেয়ো না। লোকে যেন একদিন তোমাকে ভিখিরির পোশাকেও ঐশ্বর্যবান বলে চিনতে পারে। এই বলে দাদু আতসকাচ সরিয়ে রাখলেন, জলভরা চোখ দু'হাতে মুছে নিয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, চোখ বড় মায়ার সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পরদিন দাদু দুপুরবেলা একা একা ছাদে উঠে গেলেন। তারপর আতসকাচের ভিতর দিয়ে ভরদুপুরের সূর্যের দিকে চেয়ে দেখলেন। তাঁর দু'টো চোখই একদম নষ্ট হয়ে গেল। এই ঘটনায় আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তার ওপর আমার মা মাঝে মাঝে আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন আমি চোখে কীরকম দেখি। আমি ভালই দেখতাম, তবু মা'র সন্দেহ যেত না, জিজ্ঞেস করতেন—ওই যে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে নৌকোটা যাচ্ছে—বল তো ওটা কী নৌকো; কখনও বা জিজ্ঞেস করতেন—ওই যে ছাদে একটা টিকটিকি—ওটাকে দেখতে পাচ্ছিস? এতে আমার ভয় আরও বেড়ে যেত। তখন আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে একদিন আমিও আস্তে আস্তে অন্ধ হয়ে যাব। তাই তখন আমি গোপনে গোপনে একটা কাজ শুরু করলাম। গোপনে আমি চোখ বুজে হাঁটতাম, দিক ঠিক করার চেষ্টা করতাম। যদি কোনও দিন সত্যিই অন্ধ হয়ে যাই তবে যেন হঠাৎ মুশকিলে পড়তে না হয়। এই চেষ্টা আমি এমন প্রাণপণে করতাম, এমন প্রাণের টানে যে হোঁচট খেয়ে পড়লে, কিংবা কোনও কারণে ভয় পেলেও চোখ খুলতাম

না। আমার এই কাজের সঙ্গী ছিল উদ্ধব নামে আমাদের এক চাকর। সে আমাকে গাড়ি করে অচেনা জায়গায় নিয়ে যেত, তারপর আমার হাত বেঁধে চোখে রুমাল জড়িয়ে ছেড়ে দিত, তারপর দূরে কোথাও লুকিয়ে থেকে একবার মৃদু একটা শিস দিয়েই চুপ করে যেত। আর আমি সেই শব্দটুকু মনে রেখে দিক নির্ণয় করে ঠিক ওকে খুঁজে বের করতাম। তারপর আস্তে আস্তে আমি এ-খেলায় এত পাকা হয়ে গেলাম যে একা একা আমাদের বাড়ির পাঁচিলের ওপর দিয়ে চোখ বুজে দ্রুত হাঁটতে পারতাম। উদ্ধব আমাদের বাড়ির বাইরের মাঠে দূরে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে বৃত্ত এঁকে তার পিছনে দাঁড়িয়ে শিস দিত, আমি এয়ারগান দিয়ে চোখ বুজে সেইখানে ঠিকঠাক গুলি করতাম। এইভাবেই আমার যখন চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার আর কোনও ভয় নেই। এবার আমি আমার অন্ধকার দিনগুলোর জন্য প্রস্তুত। সেই সময়েই একদিন ঘটনাটা ঘটল। আমি রোজ খুব ভোরে উঠে ফুটবল নিয়ে দৌড়তে যেতাম মাঠে। বলটা মাটিতে গড়িয়ে দিতাম, তারপর পায়ে পায়ে বল নিয়ে মাঠের চার দিকে চক্কর। অন্ধকার থাকতে আমার দৌড় শুরু হত, মাঠটাকে পাঁচ কি ছ'বার পাক দেওয়ার পর আলো ফুটত। রোজই এ-রকম হত। একদিন খুব ভোরে উঠে দৌড়োতে গেছি, পায়ে বল—দৌড়তে দৌড়তে পাক খাচ্ছি মাঠের চার দিকে, ক্রমে ক্রমে এক দুই করে সাত আট দশ বার মাঠটা ঘুরে এলাম। কিন্তু সেদিন ভোর হচ্ছিল না। অন্ধকার জমাট বেঁধে রইল। কিন্তু সেদিকে আমার খেয়াল ছিল না, আমি বিভোর হয়ে দৌড়তাম এবং প্রায়ই সে সময়ে আমার চোখ বন্ধ থাকত। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে আমার পা থেকে বলটা একটু জোরে গড়িয়ে গেল আমার আয়ত্তের বাইরে। আমি থেমে চোখ খুলে বলটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি চার দিকে নিরেট ঘুটঘুটি অন্ধকার। মাটির দিকে চেয়ে দেখি জমাট অন্ধকার, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি চাঁদ তারা কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, চার দিকে চেয়ে দেখি কোনওখানে কোনও আলো নেই, ঝাপসা গাছপালা নেই। কিচ্ছু নেই। আমি চোখের কাছে তুলে আমার সাদা হাতটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, দেখলাম কিচ্ছু নেই। মনে পড়ল আমি মাঠটাকে অন্তত দশবার পাক দিয়েছি, তবু সেদিন ভোর হয়নি। আমি এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি যে চোখ বুজে হাঁটতে শিখেছিলাম, কিংবা শিখেছিলাম দিকনির্ণয় করার কৌশল সে-সব কিছুই এখন আমার মনে পড়ল না। আমার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল ভয়ে। আমি আর এক পাও এগোবার সাহস পেলাম না, দিকনির্ণয় করতে আমার ভয় হল— যদি ভুল পথে চলে যাই? তাই তখন আমি খুব অসহায়ভাবে আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসলাম। আমার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। খুব তুচ্ছ কারণেই তখন আমি কাঁদছিলাম—কখনও হারানো বলটির জন্য, কখনও অলি নামে মেয়েটির জন্য, কখনও বা ঘরে যাওয়ার মেঠো পথটির জন্য। আমি কি আর কখনও কিছুই দেখব না? এতকাল ধরে আমি যা-কিছু দেখেছি, কিংবা যা-কিছু আমার দেখা হয়নি আমি সেই সবকিছুর জন্য কাঁদছিলাম। এইভাবে অলীক, অসম্ভব কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। এর আগে আমি কখনও ভগবানকে ডাকিনি, ডাকার দরকার হয়নি বলে। যুদ্ধের সময়ে বন্দুক আর গাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে বলে দশ-বারো বছর বয়সে বন্দুক চালাতে শিখেছিলাম, তেরো বছর বয়সে শিখেছি গাড়ি চালাতে, পনেরো-ষোলো বছর বয়সে শিখে গেছি কী করে চোখ বুজে চলতে হয়। আমি তো সবকিছুর জন্যই নিজের ওপর নির্ভরশীল—তবে ভগবানকে আমার কী দরকার। যে নিজে নিজে চলতে পারে তার ভগবান দিয়ে কী হবে? তাই সেই অদ্ভুত সময়ে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে মাঠের মধ্যে বসে থেকে যখন আমি ভগবানের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম তখন তাঁর কোনও চেহারাই আমার মনে এল না। তবু আমি আকুল হয়ে বললাম, রক্ষা করো, আমাকে রক্ষা করো—আমার চোখ ফিরিয়ে দাও। সেই আকুলতার মধ্যে বোধ হয় একটা কিছু ছিল, আমার মনশ্চক্ষে ভগবানের একটা চেহারা ভেসে উঠল। কেমন জানেন? সেই আতসকাচের ভিতর দিয়ে আমি দাদুর মুখ যে-রকম দেখেছিলাম অনেকটা সেই রকম। সে যেন দাদুর মতোই আমার প্রিয় কেউ, যে আমায় বড় ভালবাসে, সে যেন একটা আতসকাচের ভিতর দিয়ে নিবিড় ভালবাসায় শেষবারের মতো আমার মুখখানা দেখে নিচ্ছে। যেন বলছে—আহা, তুমি কি আমার রমেন! আমার রমেন! দেখি তোমার মুখখানা। অনেকটা দাদুর মতোই তার মুখ। পাহাড় পর্বত সমুদ্র আর গাছগাছালি রয়েছে, সেইখানেই রয়েছে আকাশ। এ-রকম কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেলে শীতের উত্তুরে হাওয়া হু হু করে বয়ে গেল—গাছপালায় চার দিকে সেই বাতাসের শব্দ হল। সেই বাতাসটাই আমার কোলের কাছে গড়িয়ে আনল

আমার হারানো বল। আমি দু' হাতে বুকে তুলে চেপে ধরলাম বলটা। চোখ চেয়ে দেখলাম চার দিকে আলোয় আলো—আর সূর্য উঠছে।

শাশ্বতীর পা কখন থেমে গিয়েছিল। সে মুখ তুলে শ্বাস চেপে জিজ্ঞেস করল, সত্যি?

রমেন ম্লান হাসল আবার, বলল, সত্যি।

আপনি কাউকে এ-গল্প বললেন না?

আমি দাদুকে এই ঘটনার কথা বলেছিলাম। দাদু তখন ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ, তাই আমার বিশ্বাস ছিল দাদু সেই ঘটনাটা অবিশ্বাস করবেন না। তাই সেদিন সন্ধেবেলা দাদু তাঁর আহ্নিক সেরে এসে যখন বড় ঘরটায় আরাম-কেদারায় বসেছেন তখন আমি তাঁর পাশে মেঝেতে বসে সকালের ঘটনার কথা বললাম। শুনে দাদু আমার মাথায় নীরবে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিলেন। টের পেলাম তাঁর হাত থরথর করে কাঁপছে। সেজবাতিটা কমিয়ে দেওয়া ছিল, তবু সেই অল্প আলোতেও দেখলাম তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আস্তে আস্তে বললেন. ভগবানের কথা ভাবতে গিয়ে তুমি কেন একজন মানুষের কথাই ভাবলে রমেন? ভগবান কি মানুষ? আমি এর উত্তর দিতে পারলাম না। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখলাম—সত্যিই তো, ভগবান যদি মানুষের মতোই দেখতে হয় তবে আর সে ভগবান কীসের? তবু আমি মুখে বললাম, মানুষ হলেও সে খুব প্রকাণ্ড মানুষ! ওই আকাশ পর্যন্ত তার মাথা, আর তার চোখের মধ্যে যেন পাহাড় সমুদ্র এ-সব রয়েছে! শুনে দাদু হেসে বললেন, মানুষ প্রকাণ্ড হলেই কি ভগবান হয়? প্রকাণ্ডতাই যদি ভগবানের গুণ তবে তুমি আকাশ, কিংবা পাহাড় কিংবা সমুদ্র—কিংবা এ-সব যা-কিছু মিলিয়ে যে প্রকাণ্ড চরাচর তাকে ভগবান ভাবলে না কেন? কিংবা তুমি তো ভাবতে পারতে যে তিনি এ-সবের অতীত একটা শক্তি। দাদুর এই কথা শুনে আমি ভেবে দেখলাম যে তা হয় না। পাহাড় আকাশ কিংবা সমুদ্র কী করে ভগবান হবে—তারা কি আমার কথা শুনতে পেয়েছিল? তাদের কি মন আছে যে আমার কথা বুঝবে? তা ছাড়া আমি তার যে-মুখ দেখেছিলাম তা অনেকটা দাদুর মতোই—যিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি সেই কথাই দাদুকে বললাম। তখন দাদু আর হাসলেন না, গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন, তারপব এক সময়ে বললেন, রমেন, অনেকদিন আগে ভগবান বলেছিলেন যে তিনি বার বার পৃথিবীতে আসবেন। যদি সে-কথা সত্যি হয় তবে এটা ঠিক যে তিনি বার বার পৃথিবীতে আসছেন। হয়তো এখন এ মুহূর্তেও তিনি আছেন পৃথিবীতে। কিন্তু মানুষ সে-কথাটা বিশ্বাস করে না বলেই তাঁকে কখনও খুঁজে দেখে না। কিন্তু তুমি খুঁজে দেখো। তুমি তাঁর কথা মানুষকে বোলো। বোলো যে তুমি তাঁর কাছে যাবে। তা হলে কেউ-না-কেউ একদিন ঠিক তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।

রুদ্ধশ্বাসে শাশ্বতী জিজ্ঞেস করল, তারপর—আপনি কি তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন?

রমেন সে-কথার উত্তর দিল না, বলল, কিন্তু আমরা কোথায় এসে পড়েছি দেখছেন?

শাশ্বতী দেখল, রাসবিহারী মোড়! তার মন খারাপ হয়ে গেল, বলল, আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম।

রমেন মৃদুস্বরে বলল, দেরি হয়নি তো?

তারপর শাশ্বতীকে একটা ডবলডেকারে তুলে দিয়ে রমেন ফিরল।

## ॥ একত্রিশ ॥

আজকাল সঞ্জয়ের গাঢ় একরকমের ঘুম হয় রাতে, কিন্তু তৃপ্তি হয় না। মাঝে মধ্যে উঠে দেখে সাতটা সাড়ে-সাতটা বেজে গেছে। খুব আশ্চর্য হয়ে যায় সে। এ-রকম তো কখনও হত না! ছটার মধ্যে তার ঘুম ভাঙবেই। সে নিয়মের অনুশাসন মেনে চলা মানুষ।

বিরক্ত হয়ে সে রিনিকে জিজ্ঞেস করে, সকালে ডেকে দাওনি কেন?

কত ডেকেছি! তুমি কেবল উঁ-উঁ করে এ-পাশ ও-পাশ ফিরলে।

শরীরটা বুড়িয়ে গেছে বোধহয়। পায়ে পায়ে জড়তা আর আলসেমির ভাব। বিছানা ছাড়ার পর কোনও দিনই ঘুমের জড়তা থাকে না তার। কিন্তু আজকাল শরীর পালটাচ্ছে।

অফিসে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় পানের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সঞ্জয়, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট ধরে রইল। দোকানদারই দৌড়ে এল এক প্যাকেট সিগারেট হাতে।

গাড়ি আবার ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে দেখল বাস-স্টপে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ-চেনা মেয়ে, একসময়ে একই এক্সপ্রেস বাসে অফিসে গেছে। গাড়িটা দিয়ে তাকে প্রায় ঢেকে ফেলল সঞ্জয়। চোখে চোখ পড়তেই হাসল, চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

মেয়েটি একটু অবাক হয়। এই প্রথম আলাপ। কিন্তু একসময়ে বাসে অফিস-যাওয়ার একঘেয়ে দূরত্বটুকু সঞ্জয় পার হত এই মেয়েটার দিকে চেয়ে থেকে। মেয়েটা প্রথম-প্রথম চোখ সরিয়ে নিত। তারপর মাথা নিচু করে লজ্জার ভান করেছিল কিছুদিন। তারপর একদিন—কবে থেকে যেন—চোখে চোখ রাখতে শুরু করল। চমৎকার সময় কেটে যেত। খেলা-খেলা একটা ব্যাপার—প্রেমের মতোই—অথচ প্রেম নয়—এ-রকমই একটা ব্যাপার।

বহুদিন হয় সঞ্জয়কে আর খুঁজে পায়নি মেয়েটা। আজ গাড়িসুদ্ধু দেখে খুব অবাক হল। ভদ্রলোক কোনও দিন কথা বলতে সাহস করেনি তার সঙ্গে, কিন্তু এখন গাড়ি হওয়াতেই বোধহয় সাহস বেড়েছে। মেয়েটি ইতস্তত করে বলল, বাসেই যেতে পারব।

দূর! আসুন না।

বাঁ হাতে সামনের দরজাটা খুলে ধরে সঞ্জয়। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসে।

শরৎকালের মতো ঋতু নেই। এমন উজ্জ্বল রোদ! সেই আলোতে মেয়েটি বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে। সুডৌল সুন্দর মুখখানা, নাকে একটা পাথর বসানো নাকছাবি ঝিকিয়ে উঠেছে। ডান হাতে সাদা ব্যাগ, বাঁ হাতে ভাঁজ করা রোদ-চশমা। ভাগ্যিস চশমাটা পরেনি! অমন সুন্দর চোখ দু'খানা—তাতে ভয়, সংশয় আর ইচ্ছার যে খেলাগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো দেখাই যেত না।

মেয়েটি উঠে এল। গাড়ি ছেড়ে দিল সঞ্জয়।

নিঃশব্দে বসে থাকে মেয়েটি, অস্বস্তি বোধ করে বোধ হয়। সঞ্জয় সেদিকে তাকালই না, আলতো হাতে স্টিয়ারিং ধরে অলস ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে গতি বাড়িয়ে দিচ্ছিল সে। মেয়েটি একপলক তাকে দেখল নিঃশব্দে—এতকাল কোথায় ছিলে তুমি? তোমাকে কত খুঁজেছি!

ট্রাফিক জংশনে লাল আলো দেখে সঞ্জয় গাড়ি থামায়। সিগারেটের প্যাকেট খুলতে খুলতে মেয়েটির দিকে তাকায়। না, মেয়েটির শরীর কিংবা মুখ দেখে না। কেবল সিঁথিটা লক্ষ করে। সিঁদুরের চিহ্ন নেই। লুকোয়নি তো! ঠোঁটে আবছা লিপস্টিক, কপালে টিপ নেই। কিছুই বুঝতে পারে না সঞ্জয়। আজকাল বাঙালি মেয়েরা জনসাধারণকে ফাঁকি দিতে শিখেছে: সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, কোথায় আপনার অফিস?

নিউ সেক্রেটারিয়েটের কাছে, ম্যাককারিয়ন।

ঝামেলা। এখন আবার সেই নিউ সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত গিয়ে তারপর পার্ক স্ট্রিটে ঘুরে আসতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। সঞ্জয় ঘড়ি দেখল। এখনও মিনিট পনেরো সময় আছে, কিন্তু তাতে হবে না। এখন পর্যন্ত এই অফিসে তার এক দিনও দেরি হয়নি! যদি হয়, আজই প্রথম হবে। এই মেয়েটির জন্যই। তা ছাড়া আজ সকাল সাতটায় উঠেছে সে। সময় ছিল না বলে দাঁত ঠিক মতো ব্রাশ করা হয়নি, গালে ক্ষুর পড়েনি ঠিকমতো, হাত দিলে খরখর করছে। অগোছালো হয়ে আছে সে। খামোখা জিজ্ঞেস করল, চাকরি করেন?

হুঁ।

কোন ডিপার্টমেন্ট!

পাবলিসিটি।

তাকে কথা শেষ করতে দেয় না সঞ্জয়, বলে, আমাকে আপনার মনে আছে?

বাজে কথা ছেড়ে চট করে কাজের কথায় চলে আসে।

মেয়েটা লজ্জা পায় বোধ হয়। উত্তর দেয় না।

হাজরার মোড় পেরিয়ে সঞ্জয় গাড়ি ছোটায়। গতি বাড়াতে থাকে। যদি সময়টাকে বাঁচানো যায়!

মেয়েটা বলল, গাড়ি কিনলেন!

ওই একরকম কেনাই।

খুব সুবিধে এখন, না? বাসে যা ভিড় বাড়ছে দিন দিন—

সঞ্জয় মৃদু হাসল, বলল, যখন গাড়ি ছিল না তখন একদিনও লেট হয়নি। আজই প্রথম লেট হবে বোধ হয়।

গাড়ি কি অনেক দিন কিনেছেন? বহু কাল আপনাকে দেখি না তো! বোধ হয় বছর খানেক—

না। গাড়ি তো সদ্য হল। মাঝখানে কিছু দিন ট্যাক্সিতে যেতাম।

মেয়েটা বলে, বেশ গাড়িটা। ছোটখাটো, কোজি—

ঘুরেফিরে গাড়ির প্রসঙ্গ। সঞ্জয়ের বিরক্তি লাগে। আমাকে দেখছ না কেন সেই আগের মতো? তখন একশো জনের চোখের সামনে বিহ্বল হয়ে দেখতে, এখন একা গাড়িতে আমরা দু'জন, তুমি কেবল গাড়িতে মনোযোগ রেখেছ! গাড়িটা কি আমার চেয়েও বেশি।

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, কোথায় থাকেন?

পণ্ডিতিয়া। আপনি?

হিন্দুস্থান পার্ক।

মেয়েটা একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে, একা?

সঞ্জয় মিটমিটে ডানের মতো হাসে, মাথা নেড়ে বলে, না, আমার লোকজন আছে।

মেয়েটা ঠিক বুঝতে পারে না লোকজন কথাটার মানে কী। মেয়েটাকে ভাবতে দেয় সঞ্জয়, নিজের থেকে সে বলবে না যে তার রিনি আর পিকলু আছে। মেয়েটা সারা দিন ভেবে যাক। কেন আমি বলব? তোমরা কেন আজকাল সিঁদুর লুকোও। কেন জনসাধারণকে ফাঁকি দাও? এই যে আমি তোমার সাদা সিঁথে দেখেও কিছুতেই সিওর হতে পারছি না, যেমন আজকাল রিনিকে দেখেও বাইরের লোকজন বুঝতে পারে না—এই যন্ত্রণা কেন দাও?

ঘড়ি দেখে সঞ্জয়। মেয়েটাকে গাড়িতে তোলা ভুল হয়েছে। একদম ভুল। চৌরঙ্গি দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, সে এই মাত্র সার্কুলার রোডের ক্রসিং পেরোল। ঘড়িতে আছে আর মাত্র ন'-দশ মিনিট সময়। সে কেন গাড়িতে তুলে নিল মেয়েটাকে! হ্যাঁ, কেন তুলেছিল? কী উদ্দেশ্য তার? বুঝলে অচেনা মহিলা, মেয়েদের আমরা মাত্র একটিই ব্যবহার জানি। মাত্র একটিই। তোমাকে আমার গাড়িতে কেন তুলেছি তা চোখ বুজে একটু ভাবলেই দেখা যায়, দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখা যায়। আমি রোজ ওই বাস-স্টপে গাড়ি থামাব, তুলে নেব তোমাকে। তারপর আস্তে আস্তে...। আমি অতদূর চরিত্রহীন। বুঝলে! কিন্তু একটা সময়ে আমার গোটাকয় জিনিস ছিল— সততা, নিষ্ঠা, কর্মক্ষমতা। আমি শূন্য থেকে বোস অ্যান্ড কোম্পানি তৈরি করেছিলাম। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিখিরির মতো ঘুরেছি, ঝুলিতে ছিল ওই তিনটে জিনিস। ওই তিনটে জিনিসই আমাকে সব দিয়েছে, তারপর তারা ঝরে গেছে আস্তে আস্তে। শেষটা ছিল কর্মক্ষমতা। কাল পর্যন্তও ছিল সেটা। আজ সকাল সাতটায় ভেঙেছে ঘুম, দেরিতে যাচ্ছি অফিসে, শরীর ছেড়ে দিচ্ছে আলসেমিতে। শেষ গুণটাও ছেড়ে যাচ্ছে আমাকে। আর কী চাই! দুর রে!

এসে গেছি। ম্যাককারিয়নের অফিস ওই তো দেখা যাচ্ছে। কাল আবার দেখা হবে কী বলো? জানি তো, একদিন অসময়ে গার্ড নিশান উড়িয়ে গাড়ি ছেড়ে দেবে, প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকবে গাঁটরি—খামোখা ভেবে কী হবে বলো! তার চেয়ে আমাদের ঘন ঘন দেখা করা ভাল।

দুপুরে ফোন করেছিল সঞ্জয় ম্যাককারিয়নের মুখার্জিকে। অনেক কালের চেনা লোক।

আরে মশাই, আপনাদের পাবলিসিটিতে একটা মেয়ে আছে না! নাকে নাকছাবি?

ওঃ, মিস দাশগুপ্ত!

মিস। আর ইউ সিওর যে মেয়েটা মিস?

মুখার্জি হাসে, কী ব্যাপার?

কিছু না। শুধু জানতে চাইছিলাম যে মেয়েটা সত্যিই মিস কি না, আজকাল তো বোঝাই যায় না...

জেনেই বা লাভ কী? মিস হলে সুবিধেটা কোথায়? ওর অনেক ভক্ত।

আমার এক শালা সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে—ইঞ্জিনিয়ার, ভাবছিলাম তার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে কেমন হয়! ভক্তের কথা কী যেন বলছিলেন?

মুখার্জি গলার ঠাট্টার ভাবটা পালটে বলে, না, ও কিছু না। মেয়েটা সত্যিই ভাল। কাউকে পাত্তা দেয় না। দেখতে পারেন। আমি পরশু-টরশু আরও খোঁজ নিয়ে জানাব।

পরশু কেন? কাল—কালকেই জানাবেন।

কাল বাংলা বন্‌ধ্—মনে নেই!

ওঃ হোঃ। ঠিক আছে, তবে পরশুই—

ফোন রেখে দেয় সঞ্জয়।

আর কিছু না, মেয়েটাকে এর পরদিন তার নাম ধরে ডাকবে সঞ্জয়, মুখার্জি আর যা যা জানাবে সব বলে দেবে মেয়েটাকে। ভীষণ অবাক হয়ে যাবে মেয়েটা। খুশি হবে। ভাববে সে কত ইম্পর্ট্যান্ট সঞ্জয়ের কাছে। একটা মেয়েকে নষ্ট করা কত সোজা!

আজ যেন কেমন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। দু'টো লোক পরশু থেকে পেমেন্টের জন্য ঘুর ঘুর করছে। দুই-একটা সইয়ের ব্যাপার। কিন্তু তাও করল না সঞ্জয়। বলল, পরশু নেবেন।

কলমটা চোখের সামনে আড়াআড়ি তুলে ধরে অন্যমনে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। একটা প্রোডাকশন দেখতে যাওয়ার কথা ছিল হাওড়ায়। ওপরওয়ালাকে ইন্টারকম টেলিফোনে বলল, পরশু যাবে। সব পরশুর জন্য ফেলে রাখছিল সঞ্জয়। বহুকাল পর আজ তার দুপুরে একটু ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

নাকে নাকছাবি পরা একখানা মুখ হঠাৎ লক্ষ মানুষের ভিড় থেকে তাকে গেঁথে তুলছে। মেয়েদের মধ্যে একটা কিছু আছে—একটা রহস্যময় কিছু। অন্তর্বাস খোলার পর যা দেখা যায়, বা স্পর্শে টের পাওয়া যায় সেটুকুই সব নয়। হলে কারও জন্যই কারও এত স্পৃহা থাকত না। রিনি কি কিছু কম দিতে পারে? তবু কেন যে মনে হয় রিনিব যা পেয়েছে তার অনেক বেশি রিনির আছে—যা তাকে দেয়নি। মাঝে মাঝে দেখা যায় রিনি বাবু হয়ে বসে পিকলুকে কোলে নিয়ে ঝুঁকে ওর মুখ দেখছে, পিকলু হাত পা ছুড়ে প্রবল ঔ-ঔ শব্দ করছে। তখন সমস্ত শরীব জুড়ে যে নম্র এক মা ফুটে ওঠে রিনির—ওটা, ওটুকুই কি মেয়েদের রহস্য? বোধ হয় চিরকাল প্রকৃতির সঙ্গে মেয়েরা গোপন ষড়যন্ত্র করে আসছে—ঠকাচ্ছে পুরুষদের! তাদের যেটুকু দেওয়ার—সেইটুকু, সেই তুচ্ছ শরীরটুকু সামনে ছুড়ে দিয়ে গোপন করছে মূল্যবান কিছু। পুরুষেরাও এর বেশি মেয়েদের বোঝে না৷ কিন্তু সে কেবল অতৃপ্ত থেকে যায়। যেমন রিনির কাছে না-পেয়ে সঞ্জয় এখন অফিসের কাজ ভুলে নাকছাবি পরা একটা মেয়ের মুখ ভাবে। কিন্তু পাবে কি সঞ্জয়! পাবে না। আরও পাগল-পাগল লাগবে, আরও খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করবে। বারবার অন্তর্বাস ছিঁড়ে ফেলে সেই একই অতৃপ্তি। না হে, এখানে নেই। এইরকম অতৃপ্ত থেকে যায়, মানুষ বলে—আমি ঠিক এ-জিনিস চাইনি, আরও কিছু—আরও কিছু যেন ছিল পাওয়ার। কী সেটা? ধরি-ধরি করেও ধরা যায় না। যেমন রমেন। কী দরকার ছিল ওর সন্ন্যাসী হওয়ার? ইরা এমনকী মেয়ে ছিল? কিছু না। তবু বোধ হয় রমেনের মনে হয়েছিল, তাকে ঠকিয়ে কী যেন নিয়ে গেল ইরা, হয়তো তাকে দিল না, অন্য পুরুষকে দিল। এই আক্ষেপ, এই ক্ষোভ পুরুষকে পাগল করে দিতে পারে। রমেন তো পাগলই হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জয় কতবার রিনিকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছে, তোমার স্বরূপ কী? রিনি ঘুমকাতুরে গলায় সাজিয়ে বানিয়ে বলেছে, তুমি। সঞ্জয়ের হাসি পেয়েছে, তুমি আর আমি কি এক!

কে জানে এখন রিনির গিটার শেখার মাস্টার এসেছে কিনা! কী করছে এখন রিনি? সঞ্জয়ের মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সে-ই গিটারের মাস্টার হয়ে রিনির কাছে যায়, কিংবা পিকলু হয়ে দেখে নেয় রিনির স্বরূপ। কী ভাবে যে দেখা যাবে কে জানে!

নাকছাবি পরা ওই মেয়েটা— ওর কী আছে? ওকে নিয়েই বা কী করবে সঞ্জয়? তবু ওকে ফাঁদে ফেলার অনেক উপায় আছে সঞ্জয়ের হাতে। ম্যাককারিয়নের অবস্থা ভাল না, যে-কোনও সময়ে উঠে

যেতে পারে কোম্পানি, ওখানকার কর্মচারীরা কেউ স্বস্তিতে নেই। সঞ্জয় জানে। ওই রন্ধ্রপথে ঢোকা যায়। না, কিছুই করবে না সঞ্জয়, কেবল এই আলসেমিটুকু কাটানোর জন্য, এই একঘেয়ে টাকা-রোজগার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একটু টিজ করবে—

কিংবা তাই কি? সে কি একটি মেয়েকে নিয়ে আজ খুব বেশি ভাবছে না?

ঘরে একা ছিল সঞ্জয়। হঠাৎ দু'টো আঙুল গোল করে জিবের তলায় দিয়ে তীব্র সিটি দিয়ে উঠল। একবার দু'বার তিনবার। শরীরে ঝাঁকি লাগে। মনে ঝাঁকি লাগে। সে গাছের মতো ঝড়ের হাওয়ায় দোলে।

বেয়ারাটা হঠাৎ ফ্লাশ ডোর ঠেলে ঘরে ঢোকে। স্লিপ রেখে দাঁড়ায়। সঞ্জয় দেখে স্লিপের ওপর সুন্দর বাংলা হরফে লেখা—রমেন।

কে রমেন! কোন রমেন!

আর-কিছু মনে পড়ার আগে তার কেবল মনে পড়ে যে রমেন তার কাছে টাকা পায়। দু' হাজার টাকা।

মনে পড়তেই একটু চমকে ওঠে সঞ্জয়। যেদিন আদিত্যর লাথিটা লেগেছিল তলপেটে সেদিনও তার মৃত্যুর মুখোমুখি চার হাজার টাকার কথা মনে পড়েছিল। আশ্চর্য, আজকাল কেবল এইসব মনে পড়ে তার।

লোকটা ঘরে এলে সে অবাক হয়ে দেখে, সেই ভীষণ সুন্দর চেহারা, যার পাঞ্জায় বাঘের জোর ছিল, হরিণের মতো দৌড়ত একদিন যে ছেলেটা, সে এখন এমন একজন—যার গায়ে ফতুয়া, পরনে ধুতি, মিটিমিটি একটু হাসি লেগে আছে মুখে।

সঞ্জয় উঠে দু'হাত তুলে বলে, প্রজাপালক শ্রীমন্মাহারাজ রায় রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভূপ বাহাদুরের জয় হোক।

রমেন হাসে। শান্ত চোখে চেয়ে থাকে।

সঞ্জয় ঝুঁকে বলে, মরিসনি! তুই মরিসনি তা হলে! দেখছি পৃথিবীতে আমার পাওনাদারদেরই আয়ু সবচেয়ে বেশি! হাসে সঞ্জয়, বলে, হোক। তবু আয় রমেন, আয়...

টেবিলটা ঘুরে গিয়ে সে দু'হাতে রমেনকে জড়িয়ে ধরে। হাসতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় একটু। হারানো মানুষ ফিরে এলে পৃথিবীকে ভাল লাগে বড়।

একটু শ্বাস ছেড়ে সঞ্জয় বলে, আর এখানে না। চল কেটে পড়ি। আজ অফিস ভাল লাগছিল না একটুও। চল, রিনিকে দেখবি...পিকলুকে...

তাড়াহুড়ো করে গোটা দুই টেলিফোন করল সঞ্জয়। তারপর রমেনের হাত ধরে টানতে টানতে টপাটপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামল। চাবি দিয়ে গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, চালাবি? চালা না!

রমেন স্মিতমুখে মাথা নাড়ে, আমার লাইসেন্স নেই যে!

কী করেছিস?

কোথায় হারিয়ে গেছে। দশ-বারো বছর গাড়ি চালাইনি।

কী জোর গাড়ি চালাত রমেন! হাওয়ায় উড়ত লম্বা চুল, ফরসা কপাল ঢেকে যেত চুলে, আর সুন্দর মুখে টেপা হাসি হেসে মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীদের দেখত, কে কতটা ভয় পেয়েছে। দেখতে লজ্ঝরে ছিল রমেনের গাড়িটা কিন্তু ইঞ্জিনকে রূপোর মতো ঝকঝকে রাখত রমেন। সে-সব গাড়িও আর নেই। সঞ্জয় এই ছোট গাড়িখানা নিয়েই কত ঝামেলায় আছে! রোজ একটা না একটা কিছু বদলাতে হচ্ছে, সারাতে হচ্ছে।

গাড়িটা বেচে দিয়েছিস? সঞ্জয় গাড়ি চালাতে চালাতে বলে।

না। রমেন মৃদুস্বরে বলে, কিছুই বেচিনি। সব পড়ে ছিল। পড়ে থেকে থেকেই বোধহয় ধুলো হয়ে গেছে।

খুব নিস্পৃহ গলা রমেনের। সেই নিস্পৃহতা সঞ্জয়কে আঘাত করে। সে শুনেছে কাশীপুরে রমেনদের বাড়িটা দখল করেছে উদ্বাস্তুরা। এ-সব ভাবলে কেমন বুকের ভিতরটা খামচে ওঠে। কত কষ্ট করে মানুষকে বাড়ি গাড়ি জিনিসপত্র করতে হয়! কত পরিশ্রম, কত ত্যাগস্বীকার, কত ব্যক্তিগত গুণের

পরিবর্তে! কেউ সেগুলোকে ধুলোমাটি করে দিয়ে গেছে শুনলে মনটা গুরগুর করে। একেই কি সন্ন্যাস বলে? গাড়ি চালাতে চালাতে মুখ ফিরিয়ে একঝলক রমেনের মুখখানা দেখে সঞ্জয়। এই কি সন্ন্যাসী? খেলার মাঝখানে খেলা ছেড়ে চলে গেছে বলেই সন্ন্যাসী! রমেনের মুখে কিছুই দেখে না সঞ্জয়। কেবল দেখে একটু তৃপ্তি, শান্ত ভাব একটু, হয়তো বা একটু উদাসীনতা। তুই কি ঠকে যাসনি রমেন! বিনা কষ্টে সব পেয়েছিলি, আর আমাকে দ্যাখ—কত লাথিগুঁতো খেয়ে কতটুকু করেছি। আর তার জন্য দিয়ে দিয়েছি ঐশ্বর্যের মতো সব ব্যক্তিগত গুণগুলি! এটুকু সুখের জন্য মানুষ কত দেয়! আর তুই অনায়াসে সব পেয়ে ঠকে যাসনি তো রমেন! ঠিক জানিস তো!

হঠাৎ ফিস ফিস করে সঞ্জয় বলল, কী পেলি?

রমেন অন্যমনস্ক মুখ ফিরিয়ে বলল, অ্যাঁ!

কিছু না রে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালায় সঞ্জয়। তারপর বলে, আমার কাছে কিছুদিন থাকবি রমেন!

কেন রে!

সঞ্জয় ক্লিষ্ট হেসে বলে, তোর কাছে কতগুলো জিনিস শিখে নিতাম।

কী?

চোখ বুজে তোর সেই হাঁটা—কতবার ইচ্ছে হয়েছে ও-রকম হাঁটি। পারিনি। কিংবা প্রজাদের ওপর তোর ওই ইনফ্লুয়েন্স—কী মারাত্মক হিংসে করতুম আমরা! কিংবা তোর সেই আশি-নব্বুই মাইল স্পিডে গাড়ি চালানো, তোর দৌড়, তোর সাঁতার—সব শিখে নিতুম। আর শিখতুম, কী করে হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়!

রমেন! নামটা শুনে রিনি খুব অবাক হয়। সঞ্জয়ের কাছে সে অনেকবার শুনেছে এই নাম। তবে এই সেই রমেন! বউ পালিয়ে গিয়েছিল বলে যে সন্ন্যাসী হয়ে যায়! এই শান্ত, অসম্ভব সুন্দর, শক্তিমান স্বামীটিকে ছেড়ে কে এমন বউ আছে যে পালিয়ে যায়! বড় বোকা মেয়ে সে। বড় বোকা।

একটু হতভম্বের মতো রমেনকে দেখল রিনি। তারপর সংবিৎ পেয়ে বলল, আমি ওঁর কাছে শুনেছিলাম যে, আপনি আর কোনও দিন ফিরে আসবেন না। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার খুব ইচ্ছে করত আপনাকে দেখতে। মনে মনে চাইতাম, আবার আপনি ফিরে আসুন, আবার ঘরসংসার হোক আপনার—

হো-হো করে সঞ্জয় হাসে, দেখেছিস, দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছি। ঘর করছে একজনের, আর ভাবছে আর-একজনের কথা—

রিনি লাল হয়ে ধমক দেয়, তোমার মুখের আটক নেই—

সঞ্জয় পিকলুকে নিয়ে আসে।

এই দ্যাখ পিকলু মহারাজ। ব্যাটা আমাকে মহা অপছন্দ করে। সুযোগ পেলেই গায়ে মুতে দেয়। তারপর বুকে চেপে ধরে সঞ্জয় পিকলুকে বলে, কেন রে ব্যাটা, আমি তোর তুলসীগাছ?

শুনছেন? রিনি রমেনের দিকে চেয়ে অসহায় ভাবে বলে, একটামাত্র ছেলে আমাদের, তাকেও দিনরাত কুকুর বাঁদর বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। অথচ ছেলেটা কী লক্ষ্মী! দেখুন, একটুও কাঁদে না!

রমেনের কোলে এসে হৌ-হৌ করতে থাকে পিকলু। রমেন ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে নেয়।

ঘুরে ঘুরে ঘরদোর দেখাল রিনি আর সঞ্জয়। সিঁড়ির দিকটায় দেড়তলায় একখানা একটেরে ঘর রয়েছে আলাদা। সেটা দেখিয়ে সঞ্জয় বলে, ওই ঘরটা ক'দিন আগে ভাড়া নিয়েছিলাম একটা স্টাডি করব বলে। আলমারি-টালমারির অর্ডারও দিয়েছিলাম। পরে একদিন ভেবে দেখলাম, আমি স্টাডি বানিয়েছি শুনলে বন্ধুরা হাসবে। তাই শেষ পর্যন্ত করলাম না। ঘরটা পড়ে আছে। তুই যদি থাকিস খুব আরামে থাকবি। দক্ষিণে জানালা আছে। যতদিন খুশি থাক—যতদিন খুশি—ঘরটা ছেড়ে দিলাম তোকে। থাকবি রমেন?

থাকুন না। রিনি মিনতি করে।

রমেন মৃদু হেসে মুখ নামিয়ে নেয়।

রিনি লুচি ভাজল, প্লেট ভরে সাজিয়ে দিল মিষ্টি, যত্নে তৈরি করে দিল ঘোলের শরবত। রমেন একটুখানি খেল মাত্র। বলল, ভাল খাবার না খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। এখন এ-সব সহ্য হবে না।

শুনে রিনির চোখ ছলছল করে। বলে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

রমেন মিটিমিটি হাসে, বলে, একজন ডেকেছিল।

কে?

রমেন হঠাৎ চুপ করে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টি দুরে চলে যায়। অন্যমনে আস্তে আস্তে বলে, সে এমন একজন—এমন একজন—যে পৃথিবীকে খুব ভালবেসেছিল। ভালবেসে গলে গিয়েছিল। গলে গিয়েছিল মানুষের দুঃখ দেখে।

বলতে বলতে একটু আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সে। তাই থমকে গেল হঠাৎ। এখনও সময় হয়নি। এখনও ঠিক সময় নয়!

সঞ্জয়ের মুখে একটু বিদ্রূপ আর অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছিল মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল রমেন। আর বলল না।

রিনি কিন্তু চনমন করে ওঠে, বলুন না, বলুন না।

রমেন কেবল মিটি মিটি হাসে। প্রসন্নমুখে।

তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল পিকলু। পিকলুকে নেওয়ার সময়ে রিনি বলল, আপনি ওকে ভাল করে আশীর্বাদ করুন। আমাদের ওই একটিমাত্র। যেন বেঁচে থাকে।

## ॥ বত্রিশ ॥

পরদিন বাংলা বন্‌ধ। বেলা করে উঠে বিভু তার নতুন কেনা টেরিলিনের শার্ট, টেরিকটনের গাঢ় রঙের প্যান্ট, তার ভারী সোলের জুতো জোড়া পরে নিল। এখন তার নাম হয়ে গেছে। কলকাতার গুন্ডা মহলে নাম করে নিচ্ছে বিভু। দুর্গাপুর থেকে ফিরে আসার পর আদিলের চায়ের দোকান থেকে খবরটা ছড়িয়ে গেছে। বিভুর একটা কেস বাড়ল। শরীরটা শক্ত হয়ে যায়, বুক ঠেলে ওঠে। সাফল্যের কেমন এক ধরনের আনন্দ আছে।

রোদ-চশমা পরে একটা টহল দিতেই পাড়ার আনাচকানাচ থেকে একজন দু'জন সঙ্গ নিতে থাকে। তোষামোদকারী। বিভু ডাঁটে হাসে। রাজার মতো হাঁটতে থাকে। কথা ছুড়ে দেয় এদিক ওদিক। বিভু মাস্তান।

আদিল এখন খাতির করে খুব। পর পর দু'বার চা খাওয়াল সবাইকে। সবসুদ্ধ বারো কাপ।

কত রে?

কী একটা হিসেব বলল আদিল, বিভু শুনলই না। পাঁচ টাকার একখানা নোট শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বিভু জিজ্ঞেস করল, আজ হরতাল কীসের?

খাদ্য সমস্যা। কমিউনিস্টরা ডেকেছে।

কথাটা ভাল করে কানে গেল না বিভুর। সিগারেট ধরানোর সময়ে হঠাৎ তার মনে হল অনেকদিন হয় তার সঙ্গে হরতাল-টরতালের আর যোগাযোগ নেই। তবু যখন দেখা যায় হরতালের দিন সব অফিস-দোকান বন্ধ, কলকারখানার চাকি চলছে না, রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই তখন কেমন যেন বুক ভরে ওঠে। মিছিল দেখলে চনমন করে শরীর।

পাড়ার হরিশ তার পানের দোকানের একখানা তক্তা খুলে চোরের মতো সিগারেট বেচছে, সেখানে ভিড়। বিভু দলবল নিয়ে গিয়ে তার দোকান ঘিরল।

বন্ধ করে দে।

হরিশ ভয় পেয়ে বলে, বন্ধই তো। কেবল চেনা লোক দেখে দিচ্ছি—

না একদম বন্ধ। শালা দেশের লোক না খেয়ে আছে আর তুমি পয়সা লুটবে!

বিভুর সঙ্গীরা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসে।

বিভু টহল মারে পাড়ায়। বড় রাস্তায় ফুটবল খেলা হচ্ছে, গলির মধ্যে ক্রিকেট। ওরা খেলুক ক্ষতি নেই। কিন্তু তেলেভাজার দোকান কেন খোলা? মিষ্টির দোকানের ভিতর থেকে কেন আসছে জিলিপির গন্ধ? বন্ধ, সব বন্ধ করে দে। দেশের মানুষ না খেয়ে আছে—

বিভুর গা গরম হয়ে যায়। বন্ধ, সব বন্ধ আজ।

দুর্গাপুরের লোকটা কোন দলের ছিল কে জানে! অত খবর বিভুকে দেয়নি ওরা। কিন্তু ব্যাপারটায় রাজনীতি আছে, বিভু জানে। টালিগঞ্জের শচে তাকে কাজটা ধরে দিয়েছিল, বলেছিল, তুই-ই যা, নতুন উঠছিস, হাত পাকবে। এখন সে-লোকটার বালবাচ্চা বউ কিংবা মা বাপ কাঁদছে হয়তো। ওরা তো জানে না বিভু আঠা দিয়ে বোমা বাঁধে, আঠা শুকোলে ছোট্ট আর কড়কড়ে হয়ে আসে মারাত্মক জিনিসটা, যত শুকোয় ততই যে-কোনও সময়ে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়! এমনও হতে পারত যে বিভুর হাতেই ফেটে গেল বোমাটা—তখন কোথায় বিভু? বোমা তো আর কারও পোষা নয় যে, বিভুকে চিনে রাখবে! পরশুদিন গাড়ির সেই লম্বা লোকটা বলেছিল যে তাকে দেখলে নাকি মনে হয় তার কোনও প্রিয়জন মারা গেছে। কথাটা ঘুরিয়ে বলা; আসলে লোকটা বুঝতে পেরেছিল যে, বিভু খুনে। না, দুর্গাপুরের সেই লোকটা বিভুর প্রিয়জন ছিল না, শত্রুও নয়। কোন দলের যে তাও বিভু জানে না। তবু সে লোকটার জন্য তেমন দুঃখও নেই বিভুর। ভারতবর্ষে যদি এতদিনে তেমন কোনও যুদ্ধ হত তবে বিভু যেত সৈন্যের খাতায় নাম লেখাতে। কত অচেনা মানুষ মারা পড়ত তার হাতে। এও অনেকটা সে-রকমই, টাকা খেয়ে মানুষ মারা। তবে আর দুঃখ কীসের। নিজের মতো করে বিভুও একজন সৈন্য। কেবল একটা ব্যাপারেই খটকা লাগে তার। দু'টো খুনের বেলাতেই সে সেই কবেকার ছেলেবেলার কেউটে-তাড়া-করা বিকেলের দৃশ্যটা দেখেছে। পিছনে আলের ওপর দাঁড়িয়ে একটা মুসলমান লোক লম্বা লাঠি তুলে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে, ভাইরে-এ-এ। কে ওই লোকটা? কেন সে দু'-দু'বার বিভুকে সাবধান করেছে?

ভাবতে ভাবতে মাথা কেমন ঘুলিয়ে ওঠে।

মৃদুলার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে বিভু দেখে বাইরের ঘরে মৃদুলার বাবা ইজিচেয়ারে বসে আছে। আজকাল চোখে চোখ পড়লেই কেমন অসহায়ভাবে তাকায় লোকটা, বিড় বিড় করে ঠোঁট নড়ে। যেন বলে—আমাকে মেরো না। ক'দিনেই লোকটা বুড়িয়ে গেছে অনেক। দুশ্চিন্তা। মৃদুলার বিয়ের খবর পেয়ে দু'বার বুড়োটাকে ধরেছিল বিশুরা। বুড়ো ওদের পায়ে ধরেছে। বামুন! হায় ঈশ্বর! ক'দিন সারা রাত ঢিল পড়েছে ওদের বাড়িতে, সদরে ঢেলে দিয়েছে গু, সন্ধেরাত্রে ছোরার ওপর টর্চ ফেলে বাইরে থেকে ছোরা চমকে ভয় দেখিয়েছে। এত কিছুর পর বুড়োটা নিস্তেজ হয়ে গেছে। মৃদুলার ভাই আজকাল খুব ভয়ে ভয়ে রাস্তায় হাঁটে, তাদের মুখোমুখি হলে ভয়ে মুখ সাদা হয়ে যায়। দিনরাত এখন জানালা বন্ধ থাকে ওদের বাসায়। বিয়ের পর মৃদুলা আর আসেনি। ভয়! কিন্তু তাতে লাভ নেই, বিভু একদিন পেয়ে যাবে মৃদুলাকে। খোলা দরজাটার মুখোমুখি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ায় বিভু। বুড়োটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে—চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না—যেন সম্মোহিত।

বিভু একটু হাসল। তারপর দলবল নিয়ে হাঁটতে লাগল।

বড় রাস্তা দিয়ে জালে ঢাকা কালো একটা পুলিশ-ভ্যান চলে যাচ্ছে। আধখানা ইট তুলে নিয়ে বিভু ছুড়ে মারল, শালা! ঝং করে পিছনের জালে লাগল ইটটা। ভ্যানটা থামল না।

পালা, শালা, পালিয়ে যা। হারামি! এই রাস্তা দিয়ে কোনও গাড়ি চলবে না আজ। সব বন্ধ— সব—।

বিশু কানের কাছে মুখ এনে বলে, খামোকা হুজ্জত করিস না, তোর গন্ধ ছুটে যাবে চারধারে।

হ্যাঁ। বিভু জানে। গন্ধ ছুটবার আগেই তাকে পালাতে হবে। এইখানে বেহালার কোন কোণে বিভু-ফুল ফুটে উঠেছে তা টের পেতে মানুষের দেরি হবে না। ইতিমধ্যেই পাড়ার ভদ্রলোকেরা একবার জয়েন্ট পিটিশনের মুসাবিদা করেছিল বিভুর নামে। তার আগে ওসি'র সঙ্গে পরামর্শ করেছিল ওরা। বিশুরা হুজ্জত করে সেটা রুখেছে। কিন্তু ঠান্ডা থাকাই ভাল বিভুর। খুনের গন্ধ বহু দূর যায়। সারাজীবন গায়ে লেগে থাকে।

কিন্তু মাঝে মাঝে রক্ত গরম হয়ে যায়। ভাঙ শালা, সব ভেঙে ফেল। মাঝে মাঝে ডবল ডেকারে

দশ নম্বর বা আটের বি কিংবা দু' নম্বর বাসে যেতে যেতে বড়লোকদের অন্দরমহল চকিতে চোখে পড়ে। কী সুন্দর পরদা ওড়ে হাওয়ায়, কী সব বিছানা, কিংবা কেমন স্বপ্নের মতো আলো জ্বলে, কেমন বাগান! নিউ মার্কেটে ঘুরে বেড়ায় ছোট ব্লাউজ আর আঁচল-খসা শাড়ি পরা আপেলের মতো মেয়েরা—তাদের ঘুম-ঘুম চোখ—যেন এ-দেশের এ-জগতের কেউ নয়। নন্দীদের অ্যালসেশিয়ানটা প্রকাণ্ড গামলায় গম আর মাংসের ঝোল খাচ্ছে চকচক করে। ভুর-ভুর শব্দে চলছে এয়ারকুলার—ঠান্ডা ঘরে অকাতরে ঘুমোয় আগরওয়ালা। ভাঙ শালা, সব ভেঙে ফ্যাল। মার বোমা, উড়ে যাক কলকাতা। লুট করে আন ওই মেয়েদের, ভিখিরিদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যা ওই এয়ারকন্ডিশন ঘরের ভিতরে—সামনে সাজিয়ে দে রুটি-মাখন আপেলের টুকরো। ভাঙ শালা, ভেঙে ফ্যাল। মাঝে মাঝে রক্ত গরম হয়ে যায় বিভুর। ফুলের মালায় সাজানো প্রকাণ্ড গাড়িতে যাচ্ছে বর-বউ, বিভুর ইচ্ছে করে লাফিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়, গাড়ি আটকে বলে—নামো, নেমে হেঁটে যাও। এইরকম কত কী ইচ্ছে করে বিভুর। ইচ্ছে করে সুভাষ বোস হয়ে পালিয়ে যেতে, ইচ্ছে করে অস্ত্রাগার লুট করতে ইচ্ছে করে ফাঁসির মঞ্চে উঠে গলায় দড়ি পরে 'বিদায় দে মা' কিংবা 'বন্দে মাতরম' গাইতে গাইতে মরে যেতে। কিন্তু বস্তুত শত্রুর দেখাই পায় না বিভু। ইংরেজ আমলে হিসেবটা সোজা ছিল, হিরো হওয়া কঠিন ছিল না। শত্রুরা ছিল চেনা। কিন্তু এখন কেবল মাথাটা ঘুলিয়ে যায় বিভুর। কে যে শত্রু তা বুঝতেই পারে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বটে একজন-দু'জন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কি একজন-দু'জন নেতা-ফেতাকে শেষ করে আসি। কিন্তু তাতে কী লাভ? দু'-তিনটে দারোগা কি ম্যাজিস্ট্রেট মারলে কেউ তার প্রশংসা করবে না। নেতাকে মারলে নির্ঘাত জনতা তাকে লাথি মেরে শেষ করবে। এখন আর ক্ষুদিরাম হওয়া অত সহজ নয়। সুভাষ বোসও হওয়া যায় না আর। ছেলেবেলায় 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচালে কখনও-সখনও পুলিশ তাড়া করত, চনমন করে উঠত আশেপাশের লোকজন। কিন্তু এখন চেঁচালে লোকে ভেড়ার মতো তার দিকে একটু চেয়ে নিজের কাজে চলে যাবে। ঈশ্বরের বিধানে সবসময়েই তো আর শত্রুর গায়ের রং সাদা নয়! সবসময়ে চেনাও যাবে না তাকে যে মুখোমুখি লড়ে যাবে।

তবু বিভুর ভিতরটা খেপে ওঠে। পিচের ওপর আছড়ে ইট ভাঙে সে। মিত্তিরদের প্রকাণ্ড বাড়ির একতলায় বাথরুমে ঘষা কাচের সুন্দর জানালা বিভুর ইট লেগে মড়াত করে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। 'কে? কে?' বলে কারা ছুটে আসে বারান্দায়। বিভু দৌড়ে চলে যায় অলিগলির মধ্যে, দু' হাত তুলে চেঁচায়—বন্ধ—আজ সব বন্ধ—সব বন্ধ করে দে। একটা ঝাঁপও যেন না খোলে!

রাস্তায় চলন্ত লোকজন দ্রুততর বেগে হেঁটে সরে যায়। বন্ধ হয়ে যায় বাড়িঘরের জানালার পাল্লা।

বিশু হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে তার কানের কাছে মুখ এনে বলে, তুই কি কমিউনিস্ট, না তুই কী? হরতাল তো তাতে তোর কী?

আমি! আমি! ঠিকঠাক জবাব দিতে পারে না বিভু। কিন্তু হঠাৎ ভিতরটা টগবগ করে ফোটে।

হুজ্জত করিস না। তোর এ-সবে মাথা গলানোর কী? তোর পকেটে টাকা আছে, তোর বাবার পয়সার অভাব নেই...

আই। বিভু দাঁড়িয়ে যায়। বাবা! বাবার কথাই মনে ছিল না। তিন-চারটে গোরুর দুধ আর তার সঙ্গে মিল্ক পাউডার, সয়াবিন আর কী-সব যেন মিশিয়ে তৈরি হয় দুধ, ছানা। কী এক অদ্ভুত উপায়ে টালিগঞ্জ খালপাড়ে চলে বাবার মিষ্টির দোকান। মনে পড়তেই ঝিমিয়ে যায় বিভু। এককালে বাবা দেশে নিজের হাতে চাষ করত। এখন অবস্থা ফিরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

যদি বাপকেই মারি তা হলেই কি শহিদ হওয়া যাবে? দূর! তাই কখনও হয়! লোকে থুথু দেবে গায়ে।

না, শত্রু চেনা এখন আর সহজ নয়। সকলেই সকলের শত্রু। মানুষ মারলে এখন আর বাহবা নেই। সেই ভোররাত্রে উঠে ঠান্ডা জলে স্নান খরে গীতা পড়তে পড়তে হঠাৎ ফাঁসিতে চলে যাওয়া—জেলখানার বাইরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার লোক কাঁদছে—ফিসফিস করে বলছে 'অমর শহিদ বিভু ঘোষ জিন্দাবাদ'—এ-রকম একটা ছবি স্বপ্নের মতোই থেকে যাবে। অলীক।

তার চেয়ে যদি কখনও যুদ্ধ হয়! বিভু চলে যাবে। তারপর ভয়ংকর লড়াইয়েব শেষে একদিন তার দেহ নির্জন নদীর ধারে পড়ে থাকবে, বুটসুদ্ধ পা দু'খানা অন্তর্জলিতে জল ছুঁয়ে আছে, মুখে হাসি—আমি দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি।

শুনলে হা-হা করে হেসে উঠবে লোকজন।

না, ও-সব কিছু আর হবে না। বিভু আস্তে আস্তে ভাড়াটে হয়ে যাবে। শুধু গোপনে তার অন্তরে এক না-হওয়া শহিদের, বিপ্লবীর, দেশপ্রেমিকের রক্ত ফুট-ফুট করে ফুটে ফুটে ক্রমে শীতল হয়ে আসবে।

মৃদুলার বাড়িটাকে ভরদুপুরেও পোড়ো বাড়ির মতো দেখায়। লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে যেন।

ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে বিভুর। খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে। কোনও দিন বিভু একটা খুব মহৎ কাজ করে মরে যাবে। তার সেই কীর্তির কথা মৃদুলা যেন জানতে পারে, হে ভগবান! যেন তার জন্য মৃদুলাকে একদিন কাঁদতে হয়।

## ॥ তেত্রিশ ॥

কাল মাঝ রাতে রিনি হঠাৎ ঠেলে তুলেছিল সঞ্জয়কে, শুনছ, আমার বড্ড ভয় করছে।

হুইস্কির গভীর আচ্ছন্নতা থেকে আঠায় লাগানো দু' চোখের পাতা খুলে সঞ্জয় বলে, কীসের ভয়! স্বপ্ন দেখেছ?

কী যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনল রিনি, বলল, ওই শোনো। এত রাতেও রাস্তায় কারা চিৎকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাবার চাইছে।

সঞ্জয় কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসে শুনল। এ তার চেনা চিৎকার। 'মা গো, মা গো' বলে গলিতে গলিতে, রাস্তায়, বড় রাস্তায় কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের গলার ওই অপার্থিব চিৎকার। কলকাতায় আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এরা পাতকুড়ুনি। মানুষের রাতের খাওয়ার সময় পার হয়ে গেলে রাস্তায় বেরোয়।

রিনির ভিতু সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ঘুম-চোখেও সঞ্জয়ের হাসি পেল। বলল, এ তো রোজকার ব্যাপার। আজ নতুন করে শোনার কী?

রিনির মাথা নড়ে উঠল। ইয়ারিং ঝলসে ওঠে ম্লান আলোয়। বলল, রোজ শুনি। তুমি তো ঘুমোও, আমার যেন কেমন গায়ে কাঁটা দেয়, ঘুম আসে না। কত মেয়ে-মদ্দ রাত জেগে পথে পথে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে। বুকের মধ্যে কেমন করে।

সঞ্জয় হাসে।

রিনি বলে, হেসো না। এরা আগে এত বেশি ছিল না। দিনকে দিন বাড়ছে।

ভিখিরিকে ভয় কীসের রিনি? বলে পাশ ফেরার চেষ্টা করে সঞ্জয়।

রিনি আস্তে করে বলে, ওরা সবাই কি ভিখিরি?

না তো কী? গাঁয়ে যখন খরা কি বন্যা হয় তখন দলে দলে চলে আসে শহরে। এবারও হয়তো কিছু একটা হয়েছে কোনও জেলায়। প্রতি বছরই হচ্ছে তো!

কী হয়েছে?

কী জানি! কাগজে লিখছে এবারকার ফলন ভাল নয়।

রিনি শ্বাস ফেলে বলে, কাল দেখলাম আমাদের পায়ের দিকের জানলার শার্সিতে একটা ছায়া। ঘোমটা মাথায় একটা বউ, তার কোলে বাচ্চা ছেলে। এমন চমকে উঠেছিলাম! মনে হল জানালার কাছে গিয়ে দেখব যে, ওখানে কেউ নেই, কেবল ছায়াটাই দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাতেও বোধ হয় কেবল চিৎকারগুলোই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক এ-রকম অদ্ভুত মনে হয় আমার—

তা হলে ভূতই হবে বোধ হয়।

আচ্ছা গো, এই যে দিনরাত জুড়ে দেশময় ভিখিরিরা হাঁটছে তার মানে কি ভিখিরিরা অনেক বেড়ে গেছে?

অনেক।

রিনি একটু চুপ করে থাকে। অন্ধকারে তার ঘন শ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

বড় ভয় করে গো!

ভয় কীসের?

মনে হয় এরা শিগগিরই দলে ভারী হয়ে যাবে খুব। আর এরা দল বাঁধলে—

সঞ্জয় নিঃসাড়ে হাসল। রিনি একটা আঙুল দিয়ে ওর বুকের ওপর আঁকিবুকি কাটল।

তারপর বলল, দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে না-খাওয়া খিদে-পাওয়া লোক, দিনরাত জুড়ে ঘুরে ঘুরে ডাকছে। আমার বুক কাঁপে। আমি যেন টের পাই, আমাদের এই ছোট্ট একটু ঘর-সংসারের দিকে, আমাদের এক ফোঁটা পিকলুটার দিকে চার দিকের খিদে-পাওয়া মানুষের শাপশাপান্ত ছুটে আসছে। আমার বিধবা ঠাকুমা মা'র সঙ্গে ঝগড়া হলে মাটিতে লাথি মারতে মারতে বলত, তোর অবস্থা যেন আমার মতো হয়—আমার মতো হয়। ঠিক সেই রকম বুঝলে, ঠিক সেই রকম আমি চার দিকে মাটিতে লাথি মারার শব্দ শুনি। আমার বুকের মধ্যে ধুপধুপ শব্দ হয়। কারা যেন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে , তোদের অবস্থা যেন আমাদের মতো হয়—আমাদের মতো হয়—আমাদের মতো হয়। অনেক সময়ে শাপশাপান্ত ভীষণ ফলে যায়, জানো?

শুনতে শুনতে সঞ্জয় ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, ও বাচ্চা মেয়ের মতো সঞ্জয়ের বুকের মধ্যে মিশে রইল। আধফোটা গলায় বলল, তুমি এ-সবে বিশ্বাস করো না, না?

সঞ্জয় আস্তে করে বলল, মিছিল দেখেছ রিনি, শুনে দেখো মিছিলের স্লোগানেও কত অভিশাপ থাকে। সব কি ফলছে? ভেবে দেখলে আমাদের সকলেরই মন-ভরা অভিশাপ। কাকে দিতে হবে তা জানি না।

তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল সঞ্জয়।

আজ সকাল থেকেই আবার গড়িমসি করছিল সঞ্জয়। বেলায় ঘুম ভেঙেছে আজ। তারপর রিনির নরম সাদা বুকের মাঝখানে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ। চন্দনের গন্ধ পেয়েছে গা থেকে। জিজ্ঞেস করেছে, কাল তোমার গিটারের মাস্টার এসেছিল?

হুঁ।

কী শিখলে?

বাব্বা, আজকাল যে খুব খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে! ব্যাপার কী?

সঞ্জয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে করে বলেছে, শেখো, খুব ভাল করে শেখো। আমি জীবনে সিটি দেওয়া ছাড়া আর কিছু শিখিনি। পিকলুকে তুমি গান-বাজনা কিংবা সাহিত্য-ফাহিত্য কিছু একটা শিখিয়ো। ও-রকম একটা কিছু জানা থাকলে মানুষের একটা কিছু থাকে।

পিকলু তখন উপুড় হয়ে প্রাণপণে হামা টানার চেষ্টা করে গর্জন করছিল, চার দিকে উঁচু বালিশের বেড়া পার হতে পারছিল না। রিনি তার গাল টিপে দিয়ে বলল, শোনো পিকু, বাবু কী বলছে। তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

সঞ্জয় আস্তে বলল, যদি বাঁচে।

ফের!

সঞ্জয় হাসে। ভিখিরির অভিশাপ ফলে যায়, রিনির এ-বিশ্বাসও আছে। না, সিঁদুর লুকিয়ে, সেজেগুজে, গিটার শিখেও রিনি কোথায় যেন থেমে গেছে।

সঞ্জয়ের মন ভাল নেই। কাল রমেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই মন খারাপ হয়েছিল। আহা, বেচারা রমেন। এখন ওর আর কিছু নেই। চক্রবৎ সুখ-দুঃখ আসে। এ তো জানা কথা। তবু কি তা ভাবতে ভাল লাগে? রমেন যখন গঙ্গার ধারে তার প্রকাণ্ড বাড়িতে বাইরের ঘরে বসে পিয়ানো বাজায়, যখন পুরনো মোটরখানা দাবড়ে চষে বেড়ায় কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার, তখন সঞ্জয় সামান্য মোটর মেকানিক, ভূতের মতো খাটে আর পয়সা জমানোর বৃথা চেষ্টা করে। আর গতকাল তার এয়ারকন্ডিশন্ড অফিস ঘরে মুখোমুখি বসেছিল রমেন যার কিছুই নেই। আবার কি কখনও এই অবস্থা পালটে যাবে? উলটো হয়ে যাবে ছবিটা? ঐশ্বর্যবান এক রমেনের পাশাপাশি একই সমাজে বাস করবে ভিখিরি সঞ্জয়! দেখা যাচ্ছে কোনও কিছুরই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব নেই। রিনির ওই যে ভয়, ওটাও এক দিন সত্যি হতে পারে—জোট বাঁধতে পারে ভিখিরি আর অকিঞ্চন মানুষেরা!

এক-এক সময়ে মনে হয় যখন তার কিছুই ছিল না তখনই সঠিক ঐশ্বর্যবান ছিল সঞ্জয়। তিনটে গুণ

ছিল তার। সততা, কর্মক্ষমতা আর নিষ্ঠা। তখন সে কত রাত চটের বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছে। তার কোলের মধ্যে শুয়ে থাকত একটা বেড়াল, মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেত ইঁদুর। কখনও বা ফুটপাথে শুয়ে থেকে সে শুনেছে গায়ের পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছে মাতালের পা, ঘুম ভেঙে কখনও দেখেছে রাতের আকাশ থেকে সহস্র চোখে কে একজন তাকে লক্ষ করছে। সুন্দর ছিল সেইসব রহস্যময় অনুভূতি। খোলামেলা মানুষ ছিল সে। সে স্পষ্টই জানত, বুঝতে পারত একদিন তার অবস্থা ফিরবে। যে চায়ের দোকানে সে বয়গিরি করত সেটা উঠে গেছে এখন, তার মালিক মারা গেছে লিভার সিরোসিসে, ছেলেমেয়েগুলো এত দিনে রাস্তায় নেমে গেছে বোধ হয়। হাজরার মোড়ের কাছে সেই মোটর সারাইয়ের কারখানা যেখানে সে ছিল মেকানিক তা সে-রকম হতশ্রী রয়ে গেছে। পরশুদিন সেই কারখানার পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এল সঞ্জয়—বুড়ো হয়ে গেছে বাদু মিঞা—কালো একটা মোটর গাড়ির বনেট-খোলা ইঞ্জিনের মধ্যে ঝুঁকে গাড়ির মালিকের সঙ্গে দরাদরি করছে বোধ হয়। ইচ্ছে হয়েছিল গাড়িটা এক বার থামায়। কিন্তু লজ্জা করেছিল। সে তো সেই ছেলেবেলাতেই জানত যে একদিন সে মোটর দাবড়ে ঘুরে বেড়াবে, বাড়ি করবে বালিগঞ্জে। কেননা তার তিনটে গুণ ছিল—অসম্ভব তিনটে গুণ। যা ওদের নেই। সে গাড়ি থামায়নি।

সত্য বটে, গুণগুলো এখন আর সঞ্জয়ের নেই। তবু সে নিজের চেষ্টাতেই উঠেছে এত দূর। তাই এখন যদি দুম করে একটা কিছু হয়, যদি জোট বাঁধে ভিখিরিরা; যদি বিপ্লব হয়, যদি কোনও দুর্ঘটনায় হঠাৎ পঙ্গু হয়ে যায় সে, যদি মারা যায়, তবে আবার সব চলে যাবে। কেন যাবে? কেন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই সংসারে? যদি এখন কেউ এসে তার কাছ থেকে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে বলে, আবার গোড়া থেকে শুরু করো দেখি! কেমন পারো শূন্য থেকে তৈরি করতে বাড়ি, ঘর, ফ্রিজিডেয়ার, মোটর গাড়ি! তা হলে কিছুতেই পারবে না সঞ্জয়। কিছুতেই না। কেবল ভয় করে এখন। অকারণে মাঝে মাঝে ভয় করে।

যেমন ভয় করেছিল কাল, রমেনের মুখোমুখি।

কলিং বেলটা টুংটাং করে বেজে উঠলে বিছানা ছেড়ে উঠল সঞ্জয়। দরজা খুলে দেখল পাশের ফ্ল্যাটের মাদ্রাজি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

লোকটা বাংলায় বলে, আপনার টেলিফোন।

সঞ্জয় এখনও নিজের টেলিফোন পায়নি, অ্যাপ্লাই করেছে অনেক দিন। এই লোকটার টেলিফোনে তার কাজ চালাতে হয়।

টেলিফোন ধরতেই চমকে গেল সঞ্জয়। অজয়ের গলা।

কে! সঞ্জু? শিগগির আয়, মা'র স্ট্রোক।

হঠাৎ হাত-পা হিম হয়ে আসে, গলা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বলে, কীসের স্ট্রোক।

জানি না। অবস্থা ভাল না। জ্ঞান নেই। চলে আয়।

কী করে যাব? আজ তো সব বন্ধ।

পুলিশের গাড়ি ধরার চেষ্টা কর, ওরা অনেক সময়ে নেয়। দেরি করিস না।

সঞ্জয় ঘরে ফিরে আসে। তার পা সামান্য কাঁপছে। কিছুক্ষণ অর্থহীনভাবে সে রিনির দিকে চেয়ে রইল।

রিনি জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

সঞ্জয় উত্তরে বলল, বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটা হেঁটে যাওয়া যায়? তোমার কোনও আইডিয়া আছে কতক্ষণ লাগবে?

রিনি উঠে বসে, কী হয়েছে বলো তো!

সঞ্জয় অন্যমনস্কভাবে বলল, যদি পুলিশের গাড়িতে না নেয় তবু রাস্তাটা আমাকে হেঁটেই পেরোতে হবে।

## ॥ চৌত্রিশ ॥

ডিটেকটিভ বই পড়তে পড়তে এক দিন বারান্দায় সকাল দশটার সময়ে ঘাড় কাত করে রায়বাবু বসে আছেন। কোলের ওপর খোলা বই। ছেলের বউ স্নান করাতে নিয়ে যেতে এসে ডাকল, বাবু, উঠুন...

রায়বাবু নড়লেন না। খোলা বইয়ের পাতা ফরফর করে বাতাসে উড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমে গেল রাস্তায়।

খবর পেয়ে ললিত তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছিল, মা পিছন থেকে ডেকে বলল, মড়া ছুঁস না। তোর রোগা শরীর, সবতাতে সর্দারির দরকার কী?

বারোটা নাগাদ খাটলি, ফুল, নতুন কাপড় এসে গেল। শম্ভু, সুবল, আর কয়েকজন ছেলে রাস্তার মাঝখানে খাট সাজিয়ে ফেলল।

মড়া যখন নামানো হচ্ছে তখন মাথাটা ঝুলে লটপট করছে দেখে ভিড় থেকে এগিয়ে রমেন মাথাটা তুলে ধরে। বিশাল চেহারা ছিল রায়বাবুর। কোমরের দিকটা ধরে ঠিক তাল সামলাতে পারছিল না শম্ভু। রমেন ললিতকে ডেকে বলল, মাথাটা ধর তো এসে, আমি কোমরটা ধরি।

ললিতের ভিতরটা তখন কাঁপছ। এইভাবে- এক দিন এইভাবে—

সে শূন্য চোখে চেয়ে বলে, ছোঁব?

ধর শিগগির। রমেন ধমক দেয়।

রমেন রায়বাবুর কোমর ধরতেই শম্ভু তাকে চাপা গলায় বলে, দাদা, আপনি খাটে কাঁধ দিলে কিন্তু খাট এক দিকে উঠে থাকবে। আপনি যা টল।

সার্জেন্টের চাকরিতে লোকটা একনজরে সিলেক্টড হয়ে যেত। শম্ভু ভেবে দেখল।

চার বছরের নাতিটা ভয় পেয়ে কাঁদছে। এ-রকম রাজকীয় সমারোহে সে দাদুকে কখনও দেখেনি। একা ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে সে মানুষের পায়ের ভিতরে ভিতরে রাস্তা খুঁজছিল। হঠাৎ তাকে আকাশে তুলে নিল কেউ। অবাক হয়ে সে দেখল একটা লোক—সকলের মাথার ওপরে তাকে তুলে ধরেছে। উঁচু থেকে সে তার দাদুর মুখখানা শেষবারের মতো স্পষ্ট দেখতে পেল।

বল হরি—হরি বল।

ললিত নিচু স্বরে বলল, শ্মশানে যাবি?

রমেন বলল, তুইও চল।

বিবর্ণ মুখে ললিত বলে, আমার শরীরটা—

রমেন শক্ত করে তার হাত ধরে, চল।

শ্মশানের বদ্ধ চাতালে বসে আগুনের আঁচ অসহ্য লাগছিল ললিতের। আর ওই গন্ধটা। একটু দূরে শম্ভুরা আড়াল হয়ে সিগারেট টানছে আর ঠাট্টা করছে ডোমদের সঙ্গে—কীরে ক' বোতল বেঙ্গলি টেনেছিস?

রমেন শান্ত মুখে বসে ছিল। একটা ছোট্ট খাট নিয়ে এসেছে কয়েকজন। বাচ্চা ছেলের মড়া। রমেন ললিতকে ডেকে বলল, ওই দ্যাখ, কলেরার মড়া।

কী করে বুঝলি?

রমেন উত্তর না দিয়ে উঠে গেল। কথাবার্তা বলতে লাগল বাচ্চাটার সঙ্গের লোকজনদের সাথে।

রায়বাবুর চিতাটা ভালই ধরেছে। গনগন করছে আঁচ। আগুনের ভিতর থেকে এখনও অমলিন পা দু'টো দেখা যায়। পা দু'টো দেখছিল ললিত। ফট করে একটা শব্দ হয়ে চিতাটা নড়ল—কাঠের গিঁট ফাটল বোধ হয়। ললিত দেখল রায়বাবুর দু'খানা ফরসা পা—আগুন ছোঁয়নি এখনও—একটু নড়ে উঠল। অনভিজ্ঞ লোক দেখলে চমকে উঠত। ললিত অনভিজ্ঞ নয়, এর আগে সে দু'-চার বার মড়া পুড়িয়েছে। তবু এখন কেমন শরীরে ঘাম ছাড়ে।

ডোমদের একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে তাকে রায়বাবুর চিতাটা দেখিয়ে কিছু একটা বলছে।

কী রে?

ওই পা দু'টো। চিতা থেকে পড়ে যাবে। ভারী কাঠ চাপা দিন।

ললিত বুঝল না কী করে পা দু'টো চিতা থেকে পড়বে। এখনও চিতার মধ্যেই শোয়ানো রয়েছে পা দু'টো।

রায়বাবুর বড় নাতিটা শম্ভুদের দঙ্গলের মধ্যে হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছে। সে হঠাৎ মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা।

সবুজ পাতায় ছাওয়া বীথি পথটি দিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে অবনীশ। অফিসে ফোন করে ওকে পাওয়া যায়নি। পি ডব্লিউ ডি-তে কাজ করে—সাইটে গিয়েছিল। অফিসে ফিরে খবর পেয়ে সোজা শ্মশানে এসেছে। এখনও গায়ে অফিসের টিপটপ সাজপোশাক। টেরিলিনের টাই ঝুলছে গলায়। কালোর ওপর একটা লাল ত্রিভুজ। দাঁড়িয়ে টলছিল। এক্ষুণি অবনীশ পড়ে যাবে। ছায়ার মতো রমেনকে দেখা গেল তার পাশে। অবনীশ আর পড়বে না। বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজল ললিত।

শুনতে পেল কে যেন চেঁচিয়ে বলছে, পা দু'টো দ্যাখ।

ললিত চোখ খুলে দেখে রায়বাবুর পা দু'টো দু'খানা কাঠের মতো সোজা, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যাচ্ছে। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে উঠে স্থির হল। যেন ডুবন্ত মানুষের পা—জলের ওপর উঠে আছে। তারপর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ভেঙে আরও ওপরে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে।

রমেন দৃশ্যটা আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়াল। ডান পা'টা খসে গেল প্রথমে। হাঁটু থেকে পাতা পর্যন্ত অংশটা গড়িয়ে চিতার গা বেয়ে দূরে গিয়ে পড়ল। তখনও ফরসা রং গোড়ালির কড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বাচ্চা ছেলেটা দৃশ্যটা দেখতে পেল না, অবনীশও না। রমেন তার প্রকাণ্ড চেহারা দিয়ে দৃশ্যটা ঢেকে ফেলল।

ডোমরা বড় একটা গা করে না। কিছু একটু করতে বললেই বোতলের পয়সা চায়। রমেন ললিতকে বলল, তুই একটু আড়াল করে দাঁড়া, আমি পা-টা তুলে দিই। বাচ্চাটা নইলে ভয় পাবে।

ললিত কষ্টে দাঁড়াল। রমেন চিতার ও-পাশে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে পা-খানা চিতার মধ্যে গুঁজে দিল, বাঁশ দিয়ে ভেঙে দিল অন্য পা।

মাথা ঘুরে বসে পড়ল ললিত। তারপর টক-তেতো জল বমি করতে লাগল। অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয়নি। সে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল, রমেন!

উঁ। খুব কাছ থেকে উত্তর দিল রমেন।

তুই আমাকে এখানে আনলি কেন?

রমেন উত্তর দিল না।

দিন সাতেক বাদে বিমানের ঘরখানা খালি হয়ে গেল। তার বইগুলো নিয়ে গেল ললিত, আর বাসনপত্রগুলো বস্তায় পুরে মুখ বেঁধে রাখা হল বাড়িওয়ালার ঘরে। অপর্ণার প্রকাণ্ড মোটরগাড়িখানা বটতলায় অপেক্ষা করছিল, লাগেজ বুটের বিশাল ডালাটা খোলা। বিমানের বিছানাপত্র আর বাক্স পাড়ার লোকরাই ধরাধরি করে তুলে দিল গাড়িতে। সুবলকে ভীষণ ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। তার মুখ লাল, চোখের পাতা বার বার নেমে আসছে, যত বার অপর্ণার দিকে তাকাচ্ছে সে।

বইয়ের র‍্যাক আর চৌকিটা পড়ে রইল। অপর্ণা বাড়িওয়ালার হাতে বাকি ভাড়ার টাকা দিয়ে বলল, ও-জিনিসগুলো ইচ্ছে করলে পরে যে ভাড়াটিয়া আসবে তারা ব্যবহার করতে পারে। নইলে আপনি যা খুশি করবেন।

বিমানকে মাঝখানে রেখে দু'ধারে বসল ললিত আর রমেন। স্টিয়ারিং হুইল ধরেছে অপর্ণা। গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে সুবল জানালা দিয়ে ঝুঁকে বলল, ললিতদা, দরকার হলে আমি সঙ্গে যেতে পারি।

অপর্ণা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল।

ললিত মাথা নেড়ে জানাল, দরকার হবে না।

একটু হতাশা দেখা গেল সুবলের মুখে।

পাড়ার লোক ভিড় করে গাড়ি দেখছে।

দু'জনের মাঝখানে নিথর হয়ে বসে আছে বিমান। সে আজকাল আর কিছুই টের পায় না। আকাশে

টইটুম্বুর তার মাথা। দিনরাত আকাশ-ডুব। তাকে খুব রোগা দেখাচ্ছিল। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। তালুর খানিকটা অংশ চেঁছে ফেলা হয়েছে, সেখানে একটা পুলটিস লাগানো। দু'টো কোটরগত চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আগে পাগল হয়ে গেলে শান্ত থাকত বিমান। কিন্তু এবার সে গন্ডগোল করেছে। প্রায়ই লাঠি হাতে লোকজনকে তাড়া করত। রাতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ত। অচেনা বাড়ির দরজায় নিশুত রাতে গিয়ে কড়া নেড়ে চেঁচাত, টেলিগ্রাম... টেলিগ্রাম... শম্ভুদের জিমনাসিয়ামে গিয়ে প্যারালাল বার-এ উঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করত মাঝে মাঝে। এক দিন পেশিবহুল একটা ছেলে তাকে বের করে দেয়, তাকে ইট নিয়ে তাড়া করেছিল বিমান, বিপুল চেহারার ছেলেটি ভয়ে ছুটে পালিয়েছিল।

এখন বিমান শান্ত। কোনও অস্থিরতা নেই, কিন্তু কোটরগত দু'খানা জ্বলজ্বলে চোখ মাঝে মাঝে চারপাশে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে চিনতে পারছে না এরা কারা এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

ললিতের মুখ আর ঠোঁট সাদা। বিমানের একখানা হাত কোলে টেনে নিয়ে তার ওপর হাত রেখেছে সে। ঠান্ডা সেই হাত। ঘামছে। সে কোনও একটা সান্ত্বনার কথা বলতে চাইছিল অপর্ণাকে। পারছিল না।

গাড়ি চলতেই রমেন বিমানের কানের কাছে মুখ এনে ডাকল, বিমান।

বিমান নড়ল একটু, উত্তর দিল না। রমেন বিমানের উদ্ধত মাথাটা হেলিয়ে দিল সিটের পিছন দিকটায়। অমনি গলার শীর্ণতা ফুটে উঠল বিমানের, দেখা গেল কণ্ঠাস্থি ওঠা-নামা। বিমান বার বার তার শুকনো মুখের বাতাস গিলছে। রমেন ওর কপালের ঘাম মুছে দিল হাতের চেটোয়। বিমান স্নান করতে চায় না, খেতে চায় না। রমেনই ওকে সব করাচ্ছে। একা। রমেনের হাতে-গালে ওর দাঁত আর নখের দাগ দেখা যায়।

ললিত চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে ব্যাপারটা ঠিক চোখে দেখতে পারছিল না। অপর্ণা আর বিমানের কত সুন্দর বোঝাপড়া ছিল! এখন এই সব বিয়োগান্ত দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। একটা গভীর শূন্যতার মধ্যে তার মনে পড়ে এক দিন—খুব শিগগিরই—তাকে মরে যেতে হবে। বিমানের দিকে তাকিয়ে ওই রোগা মুরগির গলার মতো সরু আর তেলচিটে ময়লা-বসা গলা দেখে তার মনে হয় ও-রকমই একটা রুগ্‌ণ চেহারা নিয়ে সে মরবে।

তিন দিন আগে আদিত্যর একটা চিঠি এসেছে। সংক্ষিপ্ত চিঠি। লিখেছে— এখানে জানালা খুললেই পাহাড় দেখা যায়। একটা অদ্ভুত উপত্যকা সামনে, ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। দেহাতিরা হেঁটে নদী পেরিয়ে হাটে যায়। কলকাতার সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। উদোম মাঠে দাঁড়িয়ে যখন চার পাশটা খাঁ খাঁ করতে দেখি তখন হঠাৎ নিজেকে খুব মহৎ লাগে—মাইরি বিশ্বাস কর। একটা পিপুল গাছের নীচে চেয়ার টেনে বসে থাকি সারা দুপুর—এক বারও সতীর কথা মনে পড়ে না। লোলিটা, সতীকে যদি দেখিস তবে বলিস, আমি যদি বিয়ে করতাম ওকে তবে সারা জীবন সন্দেহ করতাম। এ-রকম অদ্ভুত সম্পর্ক মানুষকে ছোট করে। আমি এখন অনেক দিন এখানে থাকব। সতীকে বলিস আমি ওকে অনেক ট্রাবল দিয়েছি। আর না। সঞ্জয়ের পেটে লাথি মেরেছিলাম—ওটা কি মরেই গেছে? মরলে পৃথিবীর মহৎ উপকার হয়েছে। কিন্তু ঠিক জানি ও মরেনি, অনেক জ্বালাবে। যদি পারিস এইখানে চলে আয়।

চিঠি পড়ে ললিতের ঠোঁট সামান্য কেঁপেছে। গলায় ঠেলা মেরেছে কান্নার ঢেলা। শাশ্বতীকে ছেড়ে দিচ্ছে আদিত্য! কিন্তু তাতে কী লাভ?

অলৌকিকভাবে বেঁচে যেতে ইচ্ছে করে।

বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল ললিত। শুনতে পারছিল বিমান গুনগুন করে কথা বলছে। কখনও-সখনও হঠাৎ বিমান লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে ছুটে বেরোনোর চেষ্টা করেছে। কখনও চিৎকার করেছে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই নিথর হয়ে গেছে। এখন বিমান কী বলছে তা শুনতে পাচ্ছিল না ললিত।

সঞ্জয়ের মা মারা গেছে। গুরুর দশা নিয়েই এসে দু'দিন আড্ডা দিয়ে গেছে। গলায় ধড়া, হাতে কুশাসন, গালে দাড়ি আর একটোকা চুল মাথায়। কী বীভৎস শোকের চেহারা! হিন্দুত্বের ওই আর-এক দোষ। শোকটাকে বিজ্ঞাপনের মতো নিয়ে বেড়ায়। লোকে চমকে ওঠে—মন খারাপ হয়ে যায়। বরং শোকচিহ্নগুলি লুকিয়ে রাখাই ভাল—মানুষের এমনিতেই দিনে কত বার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে।

অপর্ণা—রোগা ফরসা মেয়েটা—সুন্দর গাড়ি চালায়। এত বড় গাড়ি কী অনায়াসে চালিয়ে নিচ্ছে!

ওর মনের অবস্থা কী তা ললিত বোঝে। তবু ওপরের দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মাঝে মাঝে উড়ন্ত চুল চোখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে দু'টো সহজ হাতে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সামনেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মহামহিম এক ল্যাংটা পাগল, হাতে লাঠি, ললিত চোখ বুজে ফেলে লজ্জায়। গাড়ির গতি ধীর হয়ে যায়। ললিত টের পায় গাড়িটা বেঁকে পাশ কাটিয়ে নিল। পাগলটা রাস্তা ছাড়ল না। পাগল কত বেড়ে গেছে আজকাল। হঠাৎ হঠাৎ খেপে যাচ্ছে মানুষ। বিড়বিড় করছে হঠাৎ। মাঝরাতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়, গায়ের জামা-কাপড় খুলে ফেলে দিচ্ছে। পাকিস্তান হওয়ার পরই এটা বেড়ে গেছে খুব। গতবারের আগের বার পুজোয় বন্ধুরা সব বেড়াতে গেল বাইরে। ললিত মাকে একা রেখে যেতে পারে না কোথাও। তাই সে রাস্তায় ঘুরে-টুরে সময় কাটাত। সেই সময় এক দিন ভবানীপুরের ফুটপাথে প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতরে একটা লোকের চোখে চোখ আটকে গেল। লাল আঁজি-আঁজি জ্বলজ্বলে পাগলের চোখ। লোকটা হঠাৎ তার দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, তুমি। হঠাৎ গুড়গুড় করে উঠেছিল ললিতের বুক। আমি! আমি কী! আমি কী! এক রাস্তা ভিড়ের মধ্যে অচেনা লোকটা তার শীর্ণ হাত তুলে তাকে চিহ্নিত করছে। থরথর করে কাঁপছে তার আঙুল, লক্ষ লোকের মাঝখানে সে ললিতকেই কিছু বলতে চাইছে—তুমি। হঠাৎ ও-রকমভাবে কেউ 'তুমি' বলে চেঁচিয়ে উঠলে যে কেউ টলে যায়। নিজেকে আজন্ম পাতি পাতি করে খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, আমি কী করেছি! কী করেছি! ললিতের ঠিক তাই হয়েছিল। সেই পাগলটা কেন তাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলেছিল, তুমি? হয়তো সে একটা কিছু দেখেছিল যা অন্য কেউ লক্ষ করেনি। সে হয়তো লক্ষ করেছিল ললিতের অসংগতি। হয়তো কোনও ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা। কিংবা হয়তো সৌভাগ্যসূচক কিছু। আলটপকা বড় নাড়া খেয়েছিল ললিত। পরমুহূর্তেই সে স্বাভাবিক হয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। আশ্চর্য, সেই ঘটনার পর দু'বছরও কাটেনি, তার ক্যান্সার হল।

কোনও যোগাযোগ নেই, তবু আবছাভাবে মনে হয় যোগাযোগ আছে। পাগলটা হয়তো তাকে সাবধান করেছিল।

বিমান গুনগুন করে কথা বলছে। মুখ ফিরিয়ে ললিত দেখল রমেন নিবিষ্টভাবে বিমানের কথা শোনার চেষ্টা করছে।

কী শুনছিস?

রমেন আস্তে বলল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ললিত বিমানের দিকে ঝুঁকে বসল। কথাগুলো ঠিক বোঝা যায় না। অসংলগ্ন। মনে হয় বুঝি বা কোনও কবিতার লাইন।

কতোবার গিয়েছি যে ব্যাবিলনে, স্বপ্নের উদ্যানে...কতোবার গিয়েছি যে...

রমেন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে সোজা হয়। তারপর অপর্ণার দিকে মুখ বাড়িয়ে বলে, আপনি পারবেন না। গাড়ি টাল খাচ্ছে, অ্যাকসিডেন্ট হবে।

অপর্ণা মুখ ফেরায়। মুখখানা অল্প লাল, উত্তেজিত। চোখ টলটল করছে। একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, ঠিক ব্যালান্স থাকছে না।

গাড়ি থামান।

থামিয়ে?

আমি চালাব।

অপর্ণা একটু থমকে বলে, লাইসেন্স আছে?

রমেন হাসে, ছিল। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। আমি চালিয়ে নিতে পারব।

অপর্ণা জিওলজিক্যাল সার্ভের উলটো দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সরে বসল। রমেন গিয়ে ধরল হুইল—সামান্য হাঁফাচ্ছিল অপর্ণা, বলল, সার্কুলার রোডের লাল বাতি আমার নজরেই পড়েনি। দিব্যি পার হয়ে এলাম। পুলিশ বোধ হয় নম্বর টুকে নিয়েছে।

ললিত দশ বছর পর গাড়ি চালাতে দেখছে রমেনকে। দশ বছর আগে পুরনো ঝরঝরে অস্টিন গাড়িটা যখন চালাত রমেন তখন তারা আশেপাশে আর পিছনে বসত। রমেন নিয়ে যেত শহরের বাইরে। কত বার গাড়ি চালানো শেখার চেষ্টা করেছে ললিত, ঠিকমতো পারেনি। একসঙ্গে এতগুলো

যন্ত্র সামলাতে হয় যে তাল থাকে না। রমেন বিরক্ত হয়ে বলত, যন্ত্রপাতির মধ্যে তোর মনোযোগ নেই।

হঠাৎ ললিত আর-একটা ব্যাপার লক্ষ করে মনে মনে হেসে উঠল। সামনের সিটে ওরা দু'জন। রমেন—প্রাক্তন জমিদার আর অপর্ণা—কারখানা মালিকের মেয়ে। পিছনে সে স্কুলমাস্টার, আর বিমান—কর্পোরেশনের জমাদারবাবু। ঘটনাচক্রে দু'টো শ্রেণী আলাদা আলাদা জোট বেঁধেছে।

দক্ষিণেশ্বরের কাছে মানসিক হাসপাতাল। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা। সামনের দিকে একটু বাগান আছে। ললিত ভিতরে গেল না। গাড়ি থেকে নেমে বাগানের মধ্যে বেড়াতে লাগল। বিমানকে ধরে ধরে নিয়ে গেল রমেন, পিছনে অপর্ণা নত মুখে। দৃশ্যটা এত খারাপ লাগছিল ললিতের! একটু পরে দু'জন লোক এসে গাড়ির লাগেজবুট খুলে বিমানের বাক্স-বিছানা নিয়ে গেল। হাসপাতালে বাক্স-বিছানা রাখতে দেয় কি না কে জানে! হয়তো মানসিক হাসপাতালের ব্যবস্থা আলাদা, নয়তো রমেন আর অপর্ণা বন্দোবস্তটা করিয়ে নিয়েছে। ওগুলো কোথাও রাখার জায়গা ছিল না।

ওদের ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল। যখন বারান্দায় তিনটে সিঁড়ি ভেঙে ওরা দু'জন—অপর্ণা আর রমেন নেমে আসছিল, তখনই হঠাৎ বিমানের জন্য সত্যিকারের একটা কষ্ট টের পাচ্ছিল ললিত। সেরে উঠতে বিমানের কত দিন লাগবে কে জানে! তত দিনে ললিত কোথায়?

ফেরার সময়েও গাড়ি চালাচ্ছিল রমেন। রমেনের পাশে ললিত। পিছনে অপর্ণা।

এক সময়ে অপর্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ওরা যত্ন নেবে তো?

রমেন মুখ না ফিরিয়ে বলল, নেবে। ওরা আমার অনেক দিনের চেনা লোক।

অপর্ণা দাঁতে রুমাল কাটল, তারপর আচমকা বলল, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

ললিত ভয়ংকর চমকে উঠে ফিরে বলল, সে কী?

অপর্ণা মাথা নুইয়ে চুপ করে রইল একটুক্ষণ, যেন কাঁদবে। কাঁদল না। ম্লান মুখখানা তুলে বলল, বাবা সেদিন আমাকে ডেকে বললেন, অপর্ণা, তুমি বুঝতে পারছ না আমার শরীরের অবস্থা। কিন্তু ডাক্তার কাজকর্ম চলাফেরা একদম বারণ করে দিয়েছে। এখন আমার এত সব কে দেখে! আমি ইঙ্গিতটা ধরতে পারলাম। উত্তর দিইনি। কিন্তু বাবা খুব কনসিডারেট, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার যদি পছন্দ মতো কেউ থাকে তো বলো আমি তার সঙ্গেই বিয়ে দেব। কিন্তু তাড়াতাড়ি বিয়ে, উইদিন এ মান্থ। জামাইকে আমার ছেলে হয়ে সব দেখতে হবে।

আপনি কী বললেন?

অপর্ণা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমি কিছু বললাম না।

কেন?

ও তো বাবার ছেলে হতে পারত না!

তাতে কী আসে যায়!

অপর্ণা একটু হাসল। তারপর বলল, কী জানি! আমি তো তবু রাজি ছিলাম। কিন্তু ও সেদিন আমাকে বলল, আমি তোমাকে নিয়ে কী করব? তোমাকে খাওয়ানোর সাধ্য আমার নেই। তা ছাড়া আমি বিয়ে করব কেন, আমি কি সুস্থ? আমার সন্তান যে মাথার দোষ নিয়ে জন্মাবে না তার গ্যারান্টি কী? আমার ঠাকুমা পাগল ছিল। আমাদের সমাজ যদি মানুষ সম্পর্কে সচেতন হত তা হলে আইনত আমার মতো মানুষকে বিয়ের অযোগ্য বলে ঘোষণা করে দিত। সমাজ যখন তা করছে না তখন দায়িত্ব আমারই।

ললিত ভীষণ চঞ্চল হয়ে বলল, কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করলে একা থাকতে পারেন!

অপর্ণা আবার নতমুখ হয়ে যায়। সম্ভবত নিজের ত্যাগের অভাবের কথা ভাবে। তারপর বলে, সেটা করা যায় না যে তা নয়। কিন্তু কীসের আশায়! কেন?

কোনও যুক্তিপূর্ণ কথা খুঁজে পায় না ললিত, তবু আবেগ থেকে বলে, একজনের কাছে আপনি বাঁধা আছেন।

আপনাকে তো বলেছি আমি ভীষণ দুর্বল, আর ভিতু। একা আমি অত কারখানা চালাতে পারব না। কর্মচারীদের আমি ভয় পাই। তা ছাড়া ওই যে ছেলেটা আপনাদের পাড়ার—ভীষণ ডেসপারেট, আজও বার বার আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছিল—ও-রকম সব ছেলের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচাবে?

বড় রেগে গিয়েছিল ললিত, উত্তেজনার মাথায় বলে ফেলল, ভগবান বাঁচাবেন।

বলেই লজ্জা পেল।

খুব অবাক হল অপর্ণা। বলল, ভগবান! আপনি ভগবানের কথা বলছেন?

ইয়াঃ! বলে হেসে ফেলল ললিত, বলল, অত ভয় পেলে কি চলে?

অপর্ণা মাথা নাড়ল, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম ওর মাথা পুরোপুরি ভাল হওয়া মুশকিল। র‍্যাডিক্যাল কিওর নেই। থাকলে আমি চেষ্টা করতাম। অথচ বিয়েটা বাবার দিক থেকে সত্যিই প্রয়োজন।

ললিত চুপ করে থাকে।

রমেন মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনাকে কোথায় পৌঁছে দেব?

অপর্ণা বলে, পরাশর রোড। ওখানে এক বন্ধুর বাসায় যাব। মাকে বলে এসেছি রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ আছে।

পরাশর রোডে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই কলস্বরা একটি মেয়ে ছুটে এল। অপর্ণা তখন নামছে, তার হাত ধরে ভীষণ উত্তেজিত চাপা গলায় হাসতে হাসতে বলল, মাসিমা একটু আগে ফোনে তোর খোঁজ করছিলেন, ড্রাইভার নিয়ে বেরোসনি বলে চিন্তা। আমি বলেছি তুই আর-এক বন্ধুর বাড়িতে একটু গেছিস, এক্ষুনি এসে পড়বি। ইস, সেই থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছি—

অপর্ণা মৃদু হেসে রমেনের দিকে ফিরে বলল, গাড়িটা আমার এখন দরকার নেই, আমি তো সেই দু' ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরব। আপনি বরং ললিতবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারেন। ওঁর তো শরীর খারাপ।

রমেন ললিতকে একটু চোখ টিপল, তারপর অপর্ণাকে বলল, সেই ভাল, চলরে ললিত।

বলে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রমেন।

গাড়ি ছাড়তেই ললিত বলল, তুই আবার গাড়ির ঝামেলাটা ঘাড়ে নিলি কেন! আবার তো তোকে ফিরতে হবে। বেশ তো দু'জন নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে পড়তাম।

রমেন মৃদুস্বরে বলল, গাড়ি চালানোর একটা নেশা আছে। কতকাল চালাই না! আর কী ভাল গাড়ি দেখছিস! বুইকের হাল-মডেল।

ললিত ঝেঁঝে উঠল, দূর।

রমেন একটু চুপ করে থেকে বলল, মেয়েটা বোধ হয় আমাকে কিছু একটা বলতে চায়। হয়তো একা বলবে। তাই গাড়িটা দিল, যাতে আমি ফিরে আসি।

আমার সামনে বলতে দোষ কী ছিল?

রমেন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালাল রমেন। ময়দানের কাছাকাছি এসে পড়ল।

ললিত বলল, খামোখা পেট্রল পোড়াচ্ছিস!

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়িয়ে গিয়ে নির্জন রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাল রমেন। আয়, ড্রাইভিং সিটে বোস।

আমি! দূর, আমি ও-সব পারব না। শেখার বয়স চলে গেছে।

আয় না।

দূর, অন্যের গাড়ি, কোথায় চোটফোট লেগে যাবে।

কিন্তু রমেন ছাড়ল না।

ললিত বসল ড্রাইভিং সিটে। অনেকদিন আগে একটু-আধটু শিখেছিল। শিখিয়েছিল রমেন। রমেন তাকে আবার সব বুঝিয়ে দিল, তারপর বলল, চালা।

স্টার্ট দিতেই গাড়ি লাফিয়ে উঠল।

রমেন আস্তে করে বলল, তাড়াহুড়ো নেই। আস্তে চালা।

যন্ত্রপাতিগুলো ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ললিতকে। তীব্র উত্তেজনা বোধ করছিল সে। প্রথমটায় গাড়ি একটু এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল, পিছন থেকে সাঁ সাঁ করে গাড়িগুলো তাদের পেরিয়ে যাচ্ছিল। ভয় করছিল ললিতের— যদি ধাক্কা লাগে! রমেন একটা হাতে ধরে রেখেছিল স্টিয়ারিং।

আস্তে আস্তে রোখ আর সাহস বেড়ে যাচ্ছিল ললিতের। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে একটু লালচে

মুখে প্রবল মনোযোগের সঙ্গে একাই গাড়িটা চালিয়ে নিচ্ছিল ময়দানের নির্জন রাস্তায় রাস্তায়। পাশে একটু ঘাড় হেলিয়ে চোখ বুজে বসে আছে রমেন—যেন ঘুমোচ্ছে। এক বারও সাবধান করছে না ললিতকে।

সাহস বাড়ছিল। উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল।

চাপা গলায় সে বলল, রমেন!

উঁ।

ওই যে সামনে একটা ছোট গাড়ি যাচ্ছে—দ্যাখ ওটাকে ওভারটেক করছি।

কর দেখি।

ললিত করল। গাড়িটা চালাচ্ছিল একটা মেয়ে। এক ঝলক সে প্রকাণ্ড বুইকটার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাল। ভীষণ একটা আনন্দ পেল ললিত। এই দেখো আমি ললিত—কত বড় আর দামি একখানা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

তারপরেই একটু হতাশা আসে। গাড়িটা তার নয়।

ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ চক্কর দিল ললিত। সমস্ত মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে সে গাড়ি চালাচ্ছিল। অখণ্ড মনোযোগে।

বোজা চোখে রমেন একটু হাসল।

রমেন!

উঁ।

এবার ফিরি। তুই চালা এবার। ভিড়ের রাস্তায় আমি তো পারব না।

দূর। ভবানীপুর পর্যন্ত তুই চালা। তারপর আমি দেখব।

আশ্চর্য এই, ললিত অনায়াসে ভবানীপুর পর্যন্ত চলে এল। অসুবিধে হচ্ছিল না তা নয়। কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে সে চালাচ্ছিল। ভুল করছিল না।

এলগিন রোডের কাছে গাড়ি থামিয়ে জায়গা বদল করার সময় রমেন চাপা গলায় বলল, সাবাস।

বাচ্চা ছেলের মতো লাজুক হাসল ললিত। তার কপালে ঘাম। হাত-পা কাঁপছে। অনেক—অনেক দিন বাদে আজ সত্যিকারের একটা আনন্দকে সে টের পাচ্ছিল। একটা ছোট্ট সাফল্যের অনাবিল আনন্দ। আমি সব পারি।

প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ লোক গাড়ি চালায় যন্ত্রের মতো নির্ভুলভাবে। তারা হয়তো কোনও দিনই ললিতের এই আনন্দকে টের পায় না। একমাত্র ললিত জানে কেন এই আনন্দ।

রাত সাড়ে আটটায় অপর্ণাকে পৌঁছে দিচ্ছিল রমেন।

সারাক্ষণ তেমন কোনও কথা হল না।

শুধু এক বার অপর্ণা প্রবল ক্ষোভের সঙ্গে বলল, এখন লোকে আমাকে খারাপ ভাববে। আমি সারা জীবন একজনকে ভালবাসলাম, কিন্তু বিয়ে করছি আর একজনকে। কিন্তু আমি সত্যিই তা চাই না। জানেন! যদি কেউ একজন আমার ভার নিত—যার টাকা পয়সা কিংবা মেয়েমানুষের জন্য একটুও দুর্বলতা নেই তবে কত ভাল হত। কিন্তু সে-রকম বোধহয় কেউ নেই—না?

রমেন উত্তর দিল, আছে। বিমান।

অপর্ণা জিজ্ঞেস করে, আপনি—আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

আধো-অন্ধকারে রমেন হঠাৎ অপর্ণার দিকে একপলক তাকাল।

ভীষণ চমকে উঠল অপর্ণা। তার মনে হল এ-লোকটা জানে যে অপর্ণা আসলে সেই ছেলেবেলার বয়ঃসন্ধিতে কবে যেন বিমানকে ভালবেসেছিল। তারপর ভালবেসেছিল সেই স্মৃতিকে। তারপর কখনও সে ভালবেসেছে অকিঞ্চনকে ভালবাসার মধ্যে তার নিজের যে মহৎ আত্মত্যাগ আছে তাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোনওটাই বিমান নয়। যে-বিমান কর্পোরেশনের জমাদারদের বাবু, যে মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায় তাকে সঠিক কবে ভালবেসেছে অপর্ণা?

এ-লোকটা বোধহয় জানে সব। বুঝতে পারে। তাই সে সারা রাস্তায় আর কথা বলল না।

## ॥ পঁয়ত্রিশ ॥

রায়বাবুর শ্রাদ্ধের দিন ভিতরের উঠোনে কীর্তন দিল অবনীশ। নিমন্ত্রণ পেয়েই রমেন লাফিয়ে উঠে বলল, আমি যাব।

সন্ধেবেলা ললিতকেও জোর করে নিয়ে গেল রমেন।

কয়েকজন রোগা চেহারার কালো লোক খোলে চাঁটি দিয়ে মিনমিন করে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' করছিল। ভিতরের বারান্দায় ভিড় করে বসেছে পাড়ার বুড়ো-বুড়ি আর কচিকাঁচারা। শম্ভুদের দলটা ঘোরাফেরা করছে। তারা শ্মশানবন্ধু।

রমেন হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, একে কি ছাই কীর্তন বলে!

তারপর একসময়ে নিঃশব্দে নেমে গেল রমেন। দেখা গেল সে কীর্তনীয়াদের মাঝখানে। তার শরীর দুলছে। কেঁপে উঠছে। তারপরই হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল সে, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ...কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'...

পলকেই পালটে যায় আসরের চেহারা। বিদ্যুতের মতো কী যেন একটা সবাইকে স্পর্শ করে। কেঁপে ওঠে ললিত। দূরাগত বজ্রের মতো গুরুগুরু করে ওঠে খোল।

এমনিতেই চমৎকার গলা রমেনের। সুন্দর গান গায়। তার সঙ্গে এখন এক দুরন্ত ঝড় এসে যোগ দেয়। মানুষজন দুলে ওঠে। থির থির করে কাঁপে পায়ের তলার মাটি। রোগা কালো কীর্তনীয়ারা লাফিয়ে ওঠে রমেনের চারধারে। এ-রকম একজনের অভাবেই যেন এতক্ষণ বৃথা হচ্ছিল তাদের গান। শম্ভু-সুবলেরা এতক্ষণ কোথায় ডুব দিচ্ছিল মাঝে মাঝে, এখন তারা আসর ঘিরে দাঁড়ায়। চিত্রার্পিত হয়ে থাকে।

শূন্যে লাফিয়ে ওঠে রমেন, হুংকার দিয়ে মুহুর্মুহু বলে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম... কীর্তনীয়াদের পা হরিণের পায়ের মতো দ্রুত বৃষ্টিপাতের মতো মাটি ছুঁয়ে যায়।

কী করে কী করে এত লোকের সামনে নাচছে রমেন, গান গাইছে? ওর লজ্জা করছে না? ললিতের শরীর কেমন ঝিম মেরে আসে।

কখন যেন শম্ভুর পেশিবহুল চেহারাটা কীর্তনীয়াদের দলে ভিড়ে যায়। সে গায়ের জামা খুলে ফেলেছে। পরনে প্যান্ট, গলায় খোল।

মানুষ বাস্তবতা ভুলে যেতে থাকে। কীর্তনের উদ্দণ্ড ঢেউ আঙুলের মতো তাদের ভিতরে স্নায়ুগুলোকে যন্ত্রের তারের মতো বাজাতে থাকে।

দেখা যায় রমেন কাঁদছে।

বুড়িরা ফুঁপিয়ে উঠে চোখে আঁচল চাপে।

হঠাৎ ললিত দেখে তার সামনে রমেন। চোখ জ্বলছে। দু'হাত বাড়িয়ে হঠাৎ তাকে টেনে নেয় রমেন।

ললিত চেঁচিয়ে ওঠে, কী করছিস?

পরমুহূর্তেই সে দেখতে পায় যে, সে আসরের মাঝখানে। তার চার দিকে পাগল লোকগুলো চোখ বুজে নাচছে, গায়ে ঢলে পড়ছে। বিনি মদের মাতাল।

ললিত স্থিরভাবে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। পারে না। রমেন তাকে এক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়। ললিত টলে পড়ে যেতে যেতে সামলায়। সুবল তাকে টেনে নিয়ে কী যেন বলে। দু' হাত তুলে নাচে আর হাসে।

কীর্তনীয়াদের গানের বোল এখন আর স্পষ্ট বোঝা যায় না। কেবল 'জয়... জয়' ধ্বনি শোনা যায়। কার জয়? কীসের জয়? বুঝবার চেষ্টা করে ললিত। এর ওর ধাক্কা খায়। টলে পড়ে যেতে গেলে কেউ একজন ধরে আবার দাঁড় করিয়ে দেয়। তুলসীতলায় বাবা একা কীর্তন করত। কাঁদত। বাবার হাতে থাকত ছোট করতাল। বিষয়বুদ্ধিহীন বাবা কীর্তনের মধ্যে ভুলে থাকত তার বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা। সেই দৃশ্য মনে পড়ে ললিতের। মনে পড়ে ছেলেবেলার হরির লুট। মনে পড়ে কীর্তন তার রক্তে রয়েছে। অথচ সে কখনও কীর্তন করেনি।

জয়-জয়-জয় গর্জন করে তার চার দিকের পাগল লোকেরা। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হয়, উলুর শব্দ বন্যার মতো ভেসে আসে। আকুল কান্নার শব্দ শোনা যায়। হৃৎপিণ্ড টিপটিপ করে লাফিয়ে ওঠে।

'জয় জয়' ধ্বনিটা ধরে ললিত। তারপর ফিসফিস করে বলে, জয়-জয়। সংকোচ লজ্জা ভয় ক্রমে কেটে যায়। এত ভিড়ের মধ্যে কে আর তাকে আলাদা করে দেখবে?

তারপর ললিতের আর কিছু খেয়াল থাকে না। সে শুধু মাঝে মাঝে দেখে তার চারধারে অবাস্তব ছায়ার মতো লোক দূরে সরে যাচ্ছে, কাছে আসছে। মাঝে মাঝে কে যেন বুকে টেনে নিচ্ছে তাকে, ছেড়ে দিচ্ছে।

'জয়-জয়' বলে দু' হাত তুলে নাচতে থাকে ললিত।

কে জানে কখন শেষ হয়েছিল কীর্তন। ললিত শুধু শেষে টের পায় তার গায় এক অদ্ভুত উত্তেজনায় কদমফুলি কাঁটা দিয়েছে। কার জয়ধ্বনি সে এতক্ষণ দিয়েছে কে জানে। তবু, জয় হোক—তার জয় হোক।

রমেনকে ঘিরে ভিড়। সবাই জানতে চাইছে রমেন আসলে কে।

প্রায় দিনই সকাল বিকেলে দু'-চারজন করে রমেনের প্রজারা আসে। হাতে করে নিয়ে আসে লাউ, শাকপাতা, ফল, কিংবা নগদ টাকা।

ললিত মাঝে মাঝে ধমক দেয়, এ-সব তুই নিস কেন?

রমেন হাসে। নিতে হয়। মানুষে ভালবেসে দিলে নিতে দোষ নেই। মানুষের দান গ্রহণ করা এককালে ব্রাহ্মণের প্রফেশন ছিল।

কেন সে-রকম প্রফেশন থাকবে?

রমেন একটু ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, ললিত, আমার পূর্বপুরুষেরা মানুষের অনেক উপকার করেছিল। মানুষ কৃতজ্ঞ হয়ে সেই ঋণ শোধ করত। ক্রমে ক্রমে ওইভাবেই আমাদের জমিদারি তৈরি হয়েছিল। আবার আমার আমলে চলে গেল জমিদারি। আমি আবার ব্রাহ্মণের পুরনো প্রফেশনে ফিরে এসেছি। ওরা আমাকে ভালবেসে দেয়, আমি নিই।

কেন দেয়? তুই ওদের জন্য কী করিস!

রমেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আস্তে আস্তে বলে, কী দিই তা ওরা জানে। আমার তো টাকা পয়সা নেই। তাই আমি গিয়ে কেবল ওদের পাশে দাঁড়াই। দেশ ছাড়ার পর ওদের আর কোনও মানসিক আশ্রয় নেই। এককালে শোকে-দুঃখে ওরা আমাদের বাড়িতে ছুটে যেত। এখন তাই ওরা আমাকে দেখলে খুশি হয়। ছুটে আসে। দুঃখের কথা বলে আমাকে। আমি ওদের দাওয়ায় বসি, ছেলেপুলেদের সঙ্গে কথা বলি, কারও বাসায় গিয়ে কীর্তন গাই—লোকগুলো আবার ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ এখন পয়সা করেছে। কেউ বা ডুবে গেছে। ওদের মধ্যে একটা সমতা আনার চেষ্টা করি। এর ওর কাছ থেকে চেয়ে এনে দিই। একে অন্যকে দেখার কথা বলি। কিন্তু এইটুকু তো মাত্র নয়। ওরা আমার কাছ থেকে টাকা পয়সার সাহায্য তেমন চায় না। ওরা এটুকু ভেবেই খুশি যে, আমি ওদের পাশে আছি। ছোটকর্তাকে ওদের দরকার একটা প্রতিমার মতো—যার মধ্যে বুড়োকর্তার ছাপ আছে। কাজেই আমি ওদের স্বার্থ— আমাকে বাঁচিয়ে রাখা ওদের দায়িত্ব।

ললিত তবু গুনগুন করে আপত্তি করে। রমেনের কথাগুলো সাম্যের বিরোধী। কেন একজন দেবতার মতো হয়ে উঠবে?

রমেন মৃদু হেসে বলে, এককালে তোকে দেখতাম রাত জেগে পোস্টার লিখছিস, ঘুরে ঘুরে পার্টির চাঁদা তুলছিস, মিটিং করছিস, মিছিল সামলাচ্ছিস। নিজের দিকে তোর খেয়ালই থাকত না। তখন তোর মনে একটা প্রকাণ্ড আদর্শ কাজ করছে— সকলের ভাল করার আদর্শ। তুই হয়তো টেরও পেতিস না যে, সকলের ভাল করার চেষ্টা করছিস বলে তোকে বাঁচিয়ে বাখা সকলের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি দেখতাম কেউ নিজে থেকেই তোর ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে ধরিয়ে দিচ্ছে, কেউ এনে দিচ্ছে চা, রাত বারোটায় তোর জন্য দোকান খুলিয়ে নিয়ে আসছে পাঁউরুটি। তুই সে-সব টেরও পাচ্ছিস না। এক মনে কাজ করে যাচ্ছিস। আমার ব্যাপারটাও অনেকটা তেমনি। লোকের স্বার্থ হয়ে ওঠা। আমি কেন নিজের পেটের ধান্দায় ঘুরব— আমার পেটের ধান্দায় ঘুরবে অন্যেরা। কারণ, আমি তো তাদের ধান্দাতেই ঘুরছি।

কিন্তু এই প্রফেশন মহৎ নয়। এর মধ্যে ভিখিরিপনা আছে।

তবে কী করব। চাকরি? সে তো বাঁধা মাইনের ব্যাপার। মাইনের টাকা হাতে পেয়ে তার মাপে মাপে নিজেকে ছোট করে ফেলব, খরচ কমাব, জমাতে শিখব।... দ্যাখ না, সেদিন সঞ্জয়ের কাছে গেলাম, পুরনো দিনের কথা হচ্ছে—তার মাঝখানে হঠাৎ ও খুব অসহায়ভাবে লাজুক মুখে বলল, তুই আমার কাছে দু'-তিন হাজার টাকা পাস, কিন্তু সেটা এক্ষুনি দিতে পারছি না রে। সদ্য গাড়িটা কিনেছি, ওভারহল করতে অনেক খরচ গেছে। বিজনেসেও লস দিলাম অনেক... এইসব কথা। ওর এয়ারকন্ডিশনড করা অফিসঘরে বসে আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল— সত্যিই সঞ্জয়টা গরিব, ঠিক আগে যেমন গরিব ছিল। কী করে টাকা দেবে ও? ওর যে টাকার বড় দরকার। অথচ ও আমাকে বারবার বলছিল যে ও সন্ন্যাসী হতে চায়, আর কয়েক বছর পরেই ও সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

বলে রমেন হাসে। ললিত চুপ করে থাকে।

কোনও দিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ললিত দেখে, রমেন বসে আছে। জানালার দিকে মুখ। কোলের ওপর জড়ো করা দু'টি হাত। নিস্তব্ধ। জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের একটা ফিকে আলো আসছে, সেই আলোতে ললিত দেখে রমেনের দু' চোখ দিয়ে জলের দু'টি ধারা নেমে এসেছে।

দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁদছে। মশারির ও-পাশে জানালা। তার ও-পাশে ধূলিকণার ঝড়ের মতো নক্ষত্রে আকীর্ণ আকাশ। ধোঁয়াটে চাঁদ আকাশে। অপার্থিব মূর্তির মতো রমেন বসে আছে। ললিত বুঝতে পারে, রমেনের চেতনা নেই। সে ধ্যান করছে।

নিশুত রাতে কুকুরের কান্না, অস্পষ্ট আকাশ, ধ্যানস্থ রমেন—সব মিলেমিশে এমন এক স্বপ্নের মতো দেখে ললিত— যেন তা সত্য নয়, অথচ হঠাৎ বুকের ভিতর হু হু বাতাস বয়। কেন যে, ললিত জানে না। জানালা দিয়ে ঝরে পড়ছে তারার গুঁড়ো, জ্যোৎস্নার মোম। কুকুর কাঁদছে শূন্যতার দিকে চেয়ে। আদিগন্ত ছায়াপথ পড়ে আছে হিম আকাশে। মানুষ হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখ চেয়ে দেখে। মূক হয়ে যায়। বিশ্বজগতের কোন রহস্যের সঙ্গে নিবিড় হয়ে আছে মগ্ন রমেন। ললিত তা কোনও দিনই জানবে না।

## ॥ ছত্রিশ ॥

অনিমা দাশগুপ্ত নামে সেই মেয়েটি খুব আশ্চর্য হল যেদিন সঞ্জয় ওকে নাম ধরে ডাকল।

কী করে জানলেন?

সঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলল, শুধু নাম! আমি আপনার ভক্তদের সংখ্যা পর্যন্ত জানি।

মেয়েটা একটু হাসে, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সঞ্জয়ের কামানো মাথার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে, আপনার মায়ের কী হয়েছিল?

বয়েস। একটু বিষণ্ণভাবে নিজের কথা চিন্তা করে সঞ্জয়, বলে, আমাদেরও হচ্ছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটে যাচ্ছে।

অনিমা এখনও রিনি আর পিকলুর কথা জানে না। আরও সময় দরকার। এখনই বলা যায় না। অনিমা কিন্তু ঘুরেফিরেই জিজ্ঞেস করে তার বাড়িতে কে আছে। সঞ্জয় এড়িয়ে যায়।

সঞ্জয় জানে অনিমার যারা ভক্ত তাদের কারও গাড়ি নেই। একটা গাড়ির যে কত উপযোগ! এই গরিব ভিখিরির দেশে একটা গাড়ি দেখিয়ে কত কিছু করা যায়!

আজ আর সোজা বাড়ি ফেরা হয় না। অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যায় ডালহৌসিতে। ম্যাককারিয়নের অদূরে গলির মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিগারেট খায়। একটুক্ষণের মধ্যেই অনিমা চলে আসে। তারপর অনেকক্ষণ নানা রাস্তায় তাদের গাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

বাসায় নতুন ফোন ফিট করে দিয়ে গেছে মিস্তিরিরা। ফোন আসার কয়েক দিন পরেই এক রাত্রে বাসায় ফিরে দেখল রিনি খুব অসহায় ভঙ্গিতে বসে আছে, সুন্দর মুখখানা শুকনো। কী হয়েছে তা প্রথমে বলল না।

যখন রাতে বাইরের গ্রিল দেওয়া বারান্দায় হুইস্কি নিয়ে রোজকার মতো বসেছে সঞ্জয়, তখন নিঃশব্দে ছায়ার মতো সামনে এসে দাঁড়াল রিনি।

আজকে একটা অদ্ভুত ফোন এসেছিল।

কে করেছিল?

চিনি না। মোটা গলার একজন পুরুষমানুষ। বলল— আপনাকে একটা খবর জানানো দরকার। আপনার স্বামীর একটু খোঁজখবর নেবেন। সম্প্রতি উনি—

রিনি থেমে গেল। সঞ্জয় চেয়ে ছিল রিনির দিকে। মেয়েটা বড় নরম। সারা দিন কেঁদেছে হয়তো, এখনও কথা বলার সময়ে ঠোঁট কাঁপছে একটু একটু। রিনির তেজ বলে কিছু নেই। মুশকিলে পড়লেই কেমন অসহায় হয়ে পড়ে। সঞ্জয় ধমক-টমক দিলে উলটে ঝগড়া করতে পারে না, কেঁদে ভাসায়। দুর্বল মেয়ে। কথাটা ঠিক মতো স্পষ্টভাবে বলতে পারছে না। ভয় পাচ্ছে। বললেই দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সঞ্জয় চুপ করে থাকে। ফোনটা কে করেছে তা খানিকটা আন্দাজ করে নেয়। শুভময় ঘোষাল নামে ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার। অনিমার ভক্তদের মধ্যে সেই সবচেয়ে উজ্জ্বল। ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে। তার প্রতি একটু দুর্বলতা আছে অনিমার।

প্যান্টের হিপ পকেটে সাতশোর মতো টাকা ছিল। এটা এক দিনের রোজগার। সঞ্জয় হঠাৎ উঠে গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে পকেট থেকে টাকার থোকাটা বের করল। রিনির হাতে দিয়ে বলল, এটা রেখে দাও।

রিনি আড়ষ্টভাবে টাকাটা হাতে নিয়ে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে থাকে। বুঝতে পারে না হঠাৎ এ সময়ে— জরুরি কথার মাঝখানে—সঞ্জয়ের হঠাৎ টাকাটার কথা মনে পড়ল কেন!

রিনির সাদা মুখখানার দিকে চেয়ে হঠাৎ বড় লজ্জা পায় সঞ্জয়।

রিনি বলল, লোকটা বলছিল তুমি নাকি অনিমা নামে একজন মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও!

রাস্তায় রাস্তায় এখন খুব ভিড়। পুজোর বাজার। দোকানের শো-কেসে সাজানো পুতুল-মেয়ের মুখ চোখে চোখ রেখে হাসে। সুন্দর সব শাড়ির রং রাস্তা আলো করে দেয়। তাদের গায়ে লটকানো ভয়ংকর দাম লেখা টিকিট। স্কুলের পর দোকান দেখতে দেখতে ললিত অনেক দূর হাঁটে। ইচ্ছে করে দোকানে ঢুকে অনেক কিছু সওদা করে নিয়ে যায়। অনেক দিন পর এবার মায়ের জন্য একটা সাদা থান কাপড় কিনেছে সে, তারপর আর কারও জন্যই কিছুই কেনার নেই। তবু দোকানের দিকে চেয়ে পথ হাঁটে ললিত, মানুষের কেনাকাটা দেখে। কখনও ফুটপাথের দোকানে চওড়া পাড় আর সুন্দর নকশার শাড়ি দেখে দাঁড়িয়ে যায়। দাম জিজ্ঞেস করে, শাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, কত?

দোকানদার সাগ্রহে বলে, পঁয়ত্রিশ। নিন, কিছু কমে দেব।

ললিত মাথা নেড়ে বলে, থাক।

আশ্চর্যের বিষয় আজকাল রাস্তায় মেয়েরা তার দিকে তাকায়। আগে প্রায়ই মেয়েরা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। কিন্তু এখন ললিতের চোখ মাঝে-মধ্যে অচেনা পথ-চলতি মেয়ের চোখে আটকে যায়। মেয়েটা চোখ সরায় না, তাকে দেখে, পেরিয়ে গিয়েও এক-আধবার ঘাড় ফেরায়।

দোকানের আয়নায় নিজের মুখখানা মাঝে মাঝে দেখে ললিত। সুন্দর মুখ। অসুস্থতার কোনও ছাপ নেই। মা বলে ছেলেবেলায় তার রং ছিল দেখবার মতো, রোদে পুড়ে আর ঘুরে ঘুরে সে-রং নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ললিত এখন ভাবে, বোধ হয় সেই শিশু বয়সের গায়ের রং আবার ফিরে এসেছে তার।

বোধ হয় মৃত্যুর আগে মানুষের কয়েকটা সুদিন আসে। সে ক'দিনে তাকে ভোগ করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এক দিন স্কুল থেকে ফিরে সে ঘরে শুয়ে আছে বিছানায়, এমন সময়ে 'মাসিমা, ও মাসিমা' বলে ডেকে খোলা দরজা দিয়ে পালের নৌকোর মতো ভেসে ঘরে এল একটি মেয়ে। সাবলীল লম্বা মেয়েটি, পরনে তাঁতের রঙিন শাড়ি। বাঁ কোলে একটি বাচ্চা। প্রথমে ললিত চেনেনি, মা'ও না। দু'জনেই একটু অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। মেয়েটি কোলের বাচ্চাটিকে মেঝেয় দাঁড় করিয়ে মাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই অহংকারের সেই পুরনো ভঙ্গিটি, ঘাড় পিছনে হেলানোর মিষ্টি মুদ্রাদোষটি দেখে চিনতে পারল ললিত। মিতু। স্বেচ্ছায় মিতু কখনও এ-বাসায় আসেনি। এই প্রথম তার স্বেচ্ছায় আসা। এখন তার সিঁথিতে সিঁদুর, কোলে বোধ হয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সন্তান।

হাসিমুখে বলল, আমি মিতু।

মা গলায় ঘরঘর শব্দ করে বলল, অ। বোসো। কবে এলে?

কাল এসেছি। বম্বে তো অনেক দূর। আসাই হয় না। চার বছর পর এলাম। পুজোর পরই শ্বশুরবাড়ি যাব ব্যারাকপুরে।

শোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসল ললিত। এখন আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে মিতু। মসৃণ গা, সতেজ শরীর। দেখলেই বোঝা যায় বড়লোকের ঘর করে। ললিত একবার-দু'বারের বেশি তাকাতেই পারল না। ভীষণ লজ্জা করছিল। কেন এসেছে মিতু!

মা রান্নাঘরে গেল, মিতু গেল পিছু পিছু। ললিত এক বার ভাবল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, যাতে মিতুর সঙ্গে দেখা না হয় আর। উঠে সে জামা গায়ে দিল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল। হঠাৎ মনটা বড় ভাল লাগছিল তার। মিতু আসাতে বহুদিনের পুরনো একখানা কাঁটা সরে গেছে। শেষবার এ-বাড়িতে যখন এসেছিল মিতু তখন মায়ের ওপর রাগ করে কেঁদেকেটে মাকে অপমান করে চলে গিয়েছিল। ভেবেছিল মা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ললিতের সঙ্গে বিয়ে করাতে চায়। সেই লজ্জায় এত দিন কাঁটা হয়ে ছিল ললিত। মিতু নিজে থেকেই এসেছে বলে বড় ভাল লাগছিল ললিতের। জীবনের শেষ কয়েকটি দিন ভরে যাচ্ছে কানায় কানায়। হয়তো মরার সময়ে সে ভরা মন নিয়ে যাবে। কোনও দুঃখ থাকবে না। পৃথিবীর কাছে সব দাবিদাওয়া শেষ হয়ে গেলে মরা কত সহজ হয়ে যায়!

দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে এসে চৌকিতে বসল ললিত। সিগারেট ধরাল। শুনতে পেল উঠোনের ও-পাশের রান্নাঘরে মা আর মিতুর গলা পরস্পর কথা বলছে। ললিত কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছিল।

তখন ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। সন্ধের সামান্য একটু মরা আলোয় ছায়ার মতো একা, একটু কুঁজো হয়ে বসে আছে ললিত। এ সময়ে উঠোন পার হয়ে চলে যাওয়ার জন্য ঘরের মধ্যে এল মিতু। ললিত মুখ না তুলেও বুঝতে পারছিল মিতু চলে যাচ্ছে। জীবনে কোনও দিন মিতুর সঙ্গে তার কোনও কথা হয়নি। আজও হবে না কি? হে ভগবান...

মিতু দরজার মুখ থেকে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। কোলের বাচ্চাটা কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। আবছা অন্ধকারে মিতুর সুন্দর, অহংকারী মুখখানা বিষণ্ণ দেখাল আজ। মৃদু গলায় হঠাৎ মিতু সোজা তার সঙ্গে কথা বলল, এখন কেমন আছেন?

কেমন হঠাৎ কাঠ-আড়ষ্ট হয়ে গেল হাত-পা, গলা বুজে আসছিল। ললিত আস্তে বলল, ভালই।

মিতু এক পাও কাছে এল না, কিন্তু গলার স্বর অনেকটা নিকটজনের মতো শোনাল, বলল, কী হয়েছে!

ললিতের ইচ্ছে ছিল না রোগের নামটা বলে। কী হবে মেয়েটার মন খারাপ করে দিয়ে। পরমুহূর্তেই ইচ্ছেটা পালটে গেল আবার। কেন মিতু চিরকাল সুখী থাকবে? দেখি না ক্যান্সার শুনে ওর মুখটা কেমন পালটে যায়!

ললিত মৃদু গলায় বলে, ক্যান্সার।

প্রথমটায় বুঝতেই পারল না মিতু, বলল, কী!

ললিত আবার বলল।

মিতুর চুড়ি-পরা হাত হঠাৎ ঝনাৎ করে পড়ে যায়। নিশ্বাসের সঙ্গে মিতু বলে, যাঃ! মিথ্যে কথা।

এত আপনজনের মতো শোনায় মিতুর গলা যে, ফের কথাটা শুনতে ইচ্ছে করে।

সত্যিই। ললিত বলে।

কিন্তু আমি যে শুনলাম আপনি শিগগিরই বিয়ে করছেন!

ললিত অবাক হয়, কে বলল?

পাড়ায় সবাই বলছে। শাশ্বতী না কী যেন নাম মেয়েটির!

ললিত অন্ধকারেই মাথা নেড়ে বলে, না।

না?

মিতু একটু চুপ করে থাকে। তারপর আপনমনে বলে, আমি তো জানতাম না। মাসিমা বলছিলেন কলিক পেন।

মা জানে না।

মিতুর কোলের বাচ্চাটা নড়ে উঠে 'অঃ' শব্দ করল। মিতু চঞ্চল হয়ে বলে, ওকে মশা কামড়াচ্ছে, এবার যাই।

আচ্ছা।

মিতু একটু দ্বিধা করে বলে, অনেক দিন আছি। মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব।

ললিত বলে, আচ্ছা।

চলেই যাচ্ছিল মিতু। যখন ঘরের দরজার বাইরে তার এক পা তখনই হঠাৎ ললিত জিজ্ঞেস করল, কেন এসেছিলেন?

মিতু থেমে যায়। তারপর মাথা নিচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলে, জানি না।

গলিটাকে খুব নির্জন করে দিয়ে মিতু চলে গেল।

ললিত জানে যে তাকে সুখী করা ছাড়া মিতুর এই আসার কোনও দরকারই ছিল না। এইভাবেই শেষ কয়েকটা দিন সে সুখেই কাটাবে।

রাতে এক ডাকেই রমেন সাড়া দেয়। যেন এতক্ষণ না ঘুমিয়ে ললিতের ডাকটারই অপেক্ষায় ছিল। জেগে উঠে বসে রমেন, তার গায়ে হাত রেখে গভীর গলায় বলে, কী রে!

ললিত কী বলবে ভেবে পায় না। ভিতরটা অস্থির লাগে। সারা দিন সে জীবন্ত মানুষজনের ভিতরে ঘুরে বেড়িয়েছে, দেখেছে দোকান, মেয়েদের চোখ, দোকানে সাজানো ফল, বইয়ের মলাট, অচেনা মানুষের মুখ, রাস্তার মোড়ে বকুল গাছ— এইরকমই সব তুচ্ছ বিষয়গুলির জন্য হঠাৎ ব্যথিয়ে ওঠে বুক, দম বন্ধ হয়ে আসে। সামনের পুজোয় শরৎকালে সে এ-সব দৃশ্য হয়তো আর দেখবে না। এই ব্যক্ত জগৎ ছেড়ে সে কি কোনও অব্যক্ত জগতে চলে যাবে! না কি কোনও অস্তিত্বই আর থাকবে না তার? সে কি আবার জন্ম নেবে? নাকি এক বারই ললিত এসেছিল, আর আসবে না?

ললিত শ্বাস ফেলে বলে, রমেন, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না রে, তুই দেখিস।

রমেন সান্ত্বনা দেয় না, উত্তরও দেয় না। কেবল চুপ করে জেগে বসে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ললিতের শ্বাস কাঁপতে থাকে। তারপর কখন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

## ॥ সাঁইত্রিশ ॥

লক্ষ্মীপুজোর পরদিন তুলসী আর মৃদুলা চলে যাচ্ছে। সকাল থেকেই গোছগাছ করছিল মৃদুলা। মাঝে মাঝে গোছানো থামিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছিল। বাইরে বহু দূর পর্যন্ত কলকাতার হিজিবিজি দেখা যায়— একটা স্বচ্ছ ধোঁয়ায় আবৃত। কলকাতার বেশির ভাগই মৃদুলার অচেনা। সে কেবল এতকাল ধরে চিনেছে তাদের বেহালা, তার স্কুল কলেজ, কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়ি, বড় জোর কয়েক বার গেছে বোটানিকসে কি চিড়িয়াখানায়—বাদবাকি কলকাতা তার কাছে অচেনা, রহস্যময় এবং ভয়াবহ। ঢাকুরিয়ার বাসার জানালা দিয়ে কলকাতার কিছুই দেখা যায় না। তবু মৃদুলা নির্নিমেষ চেয়ে ছিল। কোথায় যেন নাড়ির যোগ ছিঁড়ে সে চলে যাচ্ছে। মৃদুলার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। বিয়ের পর এক বারও বাপের বাড়ি যাওয়া হয়নি। কবে যে যাওয়া হবে আর! কয়েক দিন আগে তার চিঠি পেয়ে বাবা এসেছিল টুপুকে নিয়ে। বাবার শরীর ভেঙে গেছে অনেক, শরীরের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে। মুখে কেমন খড়ি-ওঠা শুকনো ভাব, মুখচোখের অবস্থা খুব ব্যথাতুর। টুপু তেমনি লাজুক, তবে আরও একটু রোগা হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে ছাদে চলে গিয়েছিল মৃদুলা। কত কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কয়েক দিনের অদেখাতেই দিদিকে লজ্জা পাচ্ছিল টুপু, মাথা নিচু করে, চোখে চোখ না রেখে মিহি গলায় কথা বলছিল। কিছু দিন আগেই যে জলখাবার কম হয়েছে বলে দিদিকে পাখার ডাঁট দিয়ে মেরেছিল তা এখন তাকে দেখলে বিশ্বাসই হয় না। টুপুর কাছেই মৃদুলা শুনেছে বিভু এখন নাম-করা গুন্ডা। তার

দাপটে পাড়া অস্থির থাকে। কোমরে ছোরা আর পকেটে পাঞ্চ, ব্লেডের টুকরো, কখনও বা হাতে সাইকেলের চেন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রিবেলা মদ খেয়ে ট্যাক্সিতে ফিরে ট্যাক্সিওয়ালার ওপর হামলা করে। কখনও তাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে সিগারেট ফোঁকে। সপ্তমী পুজোর দিন গলির মধ্যে সে টুপুকে মুখোমুখি পেয়ে রাস্তা আটকায়, জিজ্ঞেস করে, এই শালা, তোর দিদির ঠিকানা কী রে? টুপু ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে সত্যি কথা বলেছে যে, সে জানে না। বিভু হেসে বলেছে, ভাবিস না, তোর দিদির ঠিকানা ঠিক খুঁজে বের করব। ঢাকুরিয়ার দিকে থাকে আমি জানি। বিশে একদিন দেখেছে কালোমতো শুটকো একটা লোকের সঙ্গে যাচ্ছে। আমি ঠিক খুঁজে বের করব। তারপর দেখিস কী হয়। শুনে মৃদুলা ঠিক আগের মতোই ভয় পেয়েছিল, তবে কেন যেন বিভুর জন্যও এই প্রথম একটু কষ্ট হচ্ছিল তার। টুপুর কাছেই আরও শুনেছে, মা'র বুকে এখন কেমন একটা ব্যথা হয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তার দেখে বলে যায় অসুখটা আসলে মনের। মৃদুলা সে-কথা বিশ্বাস করে। প্রত্যেকটা পরিবারেরই একটা করে আলাদা ধাঁচ আছে। কোনও পরিবারে রাগ বেশি, যেমন তাদের রাঙা পিসিমার বাড়ির প্রায় সবাই রাগী। সে-রকম, কোনও পরিবারে বেশি লোভ, কিংবা কম। ঠিক তেমনই তাদের পরিবারে সকলেরই একটু ভয়ের ধাঁচ আছে। অল্পেই ভয় পায় তারা। আত্মসমর্পণ করে দেয়। তাই ওইটুকুন ছেলেটা— ওই বিভুর ভয়ে তাদের পরিবারটা তছনছ হয়ে গেল। নইলে তারা গুটিকয় নিরীহ মানুষ— মা বাবা টুপু আর সে মিলে কত শান্তিতে ছিল। রাতে তারা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিত, তারপর মা বাবা আর দুই ভাইবোনের একটা ছোট্ট আসর বসত। কী যে সুন্দর ছিল সেই আসর! বাবা বলত কোর্টকাছারির অদ্ভুত সব গল্প, কত বার বাবার মক্কেল হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তারা পরস্পরের গা ঘেঁষে বসেছে। হরিদাস ছিল গুরুতব লোক, গুরুর কথায় ওঠে-বসে, সারা দিন দয়াল গুরুর মহিমার কথা লোককে বলে বেড়ায়। বর্ধমানের এক গাঁয়ে একটা লোক অল্পবয়সে সান্নিপাতিকে মারা যাচ্ছিল। তার কচি বউ আর মায়ের কান্না শুনে থাকতে না পেরে হরিদাস গিয়ে বসল তার বিছানায়, হেঁকে বলল, গুরুর নামে বসলাম, আমি বলছি এ রুগি মরবে না এখন। হরিদাস বসেই রইল, রুগিও রইল ঘোর জ্বরবিকারের মধ্যে বেঁচে। হরিদাস নড়ে না, রুগিও মরে না। গাঁয়ের কবিরাজ এসে দেখে বলে, রুগি শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে কী করে যেন বেঁচে আছে সে। সাত দিন নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বসে রইল হরিদাস, রুগিও রইল। তখন খবর গেল হরিদাসের গুরুর কাছে যে, হরিদাস মুমূর্ষু রুগিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ক্রমে, রুগির চোখ গর্তে চলে যাচ্ছে, শরীর হয়ে যাচ্ছে কাঠের মতো শুকনো, তবু বেঁচে আছে। হরিদাস বিছানা ছাড়ছে না, পায়খানা পেচ্ছাবে যাওয়ার সময়ে গায়ের চাদরখানা খুলে রুগির বিছানায় রেখে যায়। শুনেটুনে হরিদাসের গুরুদেব তামাকের নল মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, যখন চাদর রেখে যাবে তখন সেটা সরিয়ে নিন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া ভাল না। তাই হয়েছিল। হরিদাসের চাদর সরিয়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মৃত্যু ঘটেছিল। আর-এক বার হরিদাস গুরুর নামে উৎসর্গ করা গাছ-পাকা একটা কাঁঠালকে একমাস ধরে রেখে দিয়েছিল। সে কেবল গাছ থেকে পাড়ার সময়ে একবার বলেছিল, তোকে গুরুর নামে উৎসর্গ করছি, যখন সময় হবে তখন পাকিস। তারপর এক মাস নানা ধান্দায় ঘুরে বেরিয়েছে সে, এক মাস জগদ্দল কাঁঠালটিও ছিল একই অবস্থায়। পাকেনি। এইরকম অবিচল ভক্তিও একদিন টলে গিয়েছিল হরিদাসের। তার ক্ষমতার কথা যখন চারধারে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন নিজেকে সে মহাশক্তিমান ভাবতে শুরু করে। বসে বসে সে ভাবত—আমি কম কী? তারপর থেকেই আস্তে আস্তে তার ক্ষমতা নিবে যেতে লাগল। এতটাই নিবে গেল যে, শেষজীবনে সে গুরুর সঙ্গে মামলায় নামে— তার গুরুর নামে উৎসর্গ করা সম্পত্তি ফেরত চায়। অল্পেই বুড়িয়ে যাওয়া হরিদাস নিজের এই পাপের গল্প বলত বাবাকে, চটি খুলে মারত নিজের গালে। গুরু তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন, আর ফিরিয়ে নিলেন তাকে দেওয়া সেই অপার্থিব শক্তি। হরিদাস বাবাকে দুঃখ করে বলত, সাধু মানে জাদুকর নয়, বরং ত্যাগী, প্রেমী। বড় দেরিতে সেটা বুঝলাম।

তাদের সেই পারিবারিক, ছোট্ট আসরটিতে আরও কত গল্প হত! তারা পরস্পরের গা ঘেঁষে, গা শুঁকে বসত। কলেজের বন্ধুদের গল্প করত মৃদুলা, কখনও বা গান শোনাত, কখনও কারও অদ্ভুত কথা বা আচরণ নকল করে দেখিয়ে হাসাত মা-বাবাকে। বেশ ছিল তারা— ভিতু, আমুদে, পরস্পরের মধ্যে

গভীর সম্পর্ক। হঠাৎ বাজপাখির মতো ছোঁ মারল বিভু। নইলে আজও মৃদুলা বেহালার সেই বাসায় সকাল-বিকেল তানপুরা নিয়ে বসত, গ্রীষ্মের বিকেলে গা ধুয়ে চলে যেত ছাদে—বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তারা আর চাঁদ আর কলকাতার আকাশরেখায় রঙিন আলো দেখে কীরকম আনন্দ পেত।

বিভু জানেও না সে মানুষের কত ক্ষতি করেছে। সে চারজন ভিতু মানুষকে করে দিয়েছে দুর্বল, অসুস্থ, তাদের আয়ু যাচ্ছে কমে। তাদের সংসারে এখন লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়া ছন্নছাড়া ভাব। বাড়িতে কখন বোমা পড়ে সেই চিন্তায় বাবা কোর্টে ভাল সওয়াল-জবাব করতে পারছে না। অচিরে তার পসার কমে যাবে।

জানালা দিয়ে বাইরে কলকাতার সামান্য দৃশ্যটুকু দেখে মৃদুলা আর ভাবে, এই শহর ছেড়ে সে যে চলে যাচ্ছে তার কারণও ওই বিভু। সেদিন সিনেমো হলে অনেকটা বিভুর মতো দেখতে সেই লোকটা তাকে চিমটি কেটে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তুলসী কলকাতার ওপর খেপে গেল। ভাগ্যক্রমে মৃদুলার বিয়েও হয়েছে এক ভিতু মানুষের সঙ্গে, যে কেবল পালিয়ে যেতে শিখেছে, রুখে দাঁড়াতে জানেই না। ফলে, এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পাড়ি দিচ্ছে তারা দু'জন। কেমন হবে পলাশপুর জায়গাটা? আগে খুব পলাশপুরের নিন্দে করত তুলসী, আজকাল বলে, কলকাতায় থাকা মানে পৃথিবী এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া। এখানে পচে গেলাম। মৃদুলা জানে এ-সব মন-ভোলানো কথা। পলাশপুরে নিশ্চয়ই ভরসন্ধেয় শেয়াল চলে আসে উঠোনে, রাতদুপুরে কাঁদে কুকুর, ঘাসে গা মিলিয়ে চলে বেড়ায় সাপ, আর জোঁক লাফায়। গ্রামীণ মানুষগুলোর সঙ্গেও মিলমিশ হতে সময় লাগবে অনেক। তারা কলকাতার লোক, তারা এখন কলকাতার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কেমন লাগবে মৃদুলার?

দুপুরবেলা বাসনের বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে তুলসী তার ঘেমো পরিশ্রান্ত মুখখানা মৃদুলার কানের কাছে এগিয়ে এনে বলল, মায়ের একটা সুন্দর সাঞ্চা-হাতা ছিল। পানের মতো দেখতে। কাঁসার, আর খুব ভারী। বউদি সেটা সরিয়ে রেখেছে কোথাও, খুঁজে বার করো দেখি।

উদাসীন গলায় মৃদুলা বলে, বাদ দাও। আমরা স্টেনলেস স্টিলের জিনিস কিনে নেব।

তুলসী মুখ বিস্বাদ করে বলে, ইঃ! সে-রকম জিনিস আর হয়! মা আমাকে এক বার সেই হাতাটা দিয়ে পিটিয়েছিল। আমি ভীষণ কান্নাকাটি করায় মা বলেছিল, এটা তোর বউকে দেব—কাঁদিস না। হাতাটার একটা সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে।

ভাগ-বাঁটোয়ারায় অনেক কিছুই সরিয়ে রেখেছিল তুলসীর বউদি। কিন্তু মৃদুলা তেমন গা করল না। যেমন মৃত্যুর আগে মানুষের মায়া কমে যায় তেমনি মায়া কমে যাচ্ছিল তার। সে আড়ালে আবডালে কাঁদছিল।

বাসনের বস্তা বেঁধে তুলসী যখন ছাদের সিঁড়ির চাতালে বসে সিগারেট ধরিয়েছে তখন মৃদুলা তার পিঠ খুঁটে দিতে দিতে বলল, আবার আমরা ফিরে আসব। তুমি কলকাতায় চাকরি খুঁজো। ওখানে গিয়ে গা ছেড়ে দিয়ো না। গা ছাড়লে তুমি চাষাভুষা হয়ে যাবে।

কলকাতায় চাকরি! শুনে তুলসী একটু চমকে ওঠে। কয়েক দিন আগে ললিত তাকে বলেছিল, তুলসী, আমি সেক্রেটারি আর হেডমাস্টারকে বলে রাখব আমার চাকরিটা যাতে তোর হয়। সেই থেকে ভিতরে ভিতরে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একটা লোভ কাজ করছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে হয়, কলকাতায় ললিতের চাকরিটা পেলে মন্দ হত না। পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা টানা-পোড়েন চলতে থাকে। কোথায় যেন ভিতরে ভিতরে ভাল-তুলসী আর মন্দ-তুলসীর একটা অবিরাম মল্লযুদ্ধ চলছে। কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। তাই মৃদুলার কথা শুনে তুলসী একটু চমকে ওঠে। তারপর নিঃশব্দে সিগারেট টানতে থাকে। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ খেয়াল করে বলে, আজ যাওয়ার সময়ে ললিতের দেওয়া শাড়িটা পরে যেয়ো।

কেন?

এমনিই। শাড়িটা ও দিয়ে যাওয়ার পর এক দিনও পরোনি।

বাঃ। আমি যে নীল মুর্শিদাবাদিটা—

না। তুলসী দৃঢ়ভাবে বলে, ললিতের দেওয়াটা।

একটু থমকে যায় মৃদুলা, বলে, আচ্ছা।

তারপর খানিকক্ষণ তুলসীর পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, ললিতবাবু তো চাকরি ছেড়েই দেবেন। তখন তোমার ওখানে হয় না?

শুনে তুলসী চট করে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে। মৃদুলা পিছু পিছু নেমে আসে, বলে, কলকাতায় তো আমাদের ফিরে আসতেই হবে। আমি চিরকাল পলাশপুরে থাকতে পারব না।

তুলসী ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হেঁকে বলে ওঠে, আমি পলাশপুরের লোক। আজ থেকে আমি চিরকাল পলাশপুরের লোক। আই ডিজওন ক্যালকাটা।

পিতু মেয়েটাকে কোনও দিনই পছন্দ করত না মৃদুলা। পিতু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাপ-মা'র সামনেই হিন্দি গান গুনগুন করে কোমর দোলায়। ছাদের আলসে থেকে ঝুঁকে রাস্তার ছেলেদের ইশারা করে! মৃদুলার সঙ্গে তার বনে না। কিন্তু আজ পিতু সারা দিন কাঁদছে। 'বন্ধের পর পরীক্ষা না হলে ঠিক তোমার সঙ্গে চলে যেতাম কাকিমা, অনেক দিন থেকে আসতাম তোমাদের পলাশপুরে। সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসতাম ঠিক শাশুড়িদের মতো।' কান্নার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে এ-রকম ঠাট্টাও করছে পিতু।

ইস! কত কাজের মেয়ে। জল গড়িয়ে খেতে পারে না। পরীক্ষার পরে যেয়ো, দেখব কেমন।

একটু হাসিঠাট্টা করেই পিতু 'ইস, সত্যি চলে যাচ্ছো' বলে থমথমে মুখ করে থাকে, চোখে টসটস করে জল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুলাও কাঁদতে বসে।

স্টেশনে খুব বেশি লোক আসবে বলে আশা করেনি তুলসী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বিদায় জানাতে অনেক লোক এসে গেল। সময়মতো এল না কেবল সঞ্জয়। কথা ছিল সে তার গাড়ি নিয়ে এসে তুলসীকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। সঞ্জয়ের কথার খেলাপ বড় একটা হয় না। এটা সেই অন্যতম সদগুণ যার ওপর সঞ্জয় বড় হয়েছে। বেলা তিনটে অবধি তার জন্য অপেক্ষা করে অবশেষে ট্যাক্সি ধরতে হল।

বালিগঞ্জ স্টেশনের ওভারব্রিজের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল লম্বা রমেন, উজ্জ্বল কিংবা শেষ উজ্জ্বল চেহারার ললিত, তার বাঁ ধারে সার্জেন্টের পোশাক পরা, কোমরে পিস্তলওলা একজন লম্বা চওড়া লোক। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল, ললিত আর রমেনকে পুলিশ ধরেছে। কাছে এসে শম্ভুকে চিনতে পেরে খুব জোরে শ্বাস ছাড়ল তুলসী. বলল, হ্যাঁরে, আমি কলকাতায় থাকতে থাকতে তুই সার্জেন্ট হলি না! তোর ভরসায় নিশ্চিন্তে রাস্তায় হাঁটতাম কয়েক দিন!

শম্ভু শুনে তৃপ্তির চওড়া বোকা-হাসি হাসল একখানা। তারপর জড়সড় মৃদুলার পাশে শাড়ি-পরা কচি চেহারার পিতুকে আড়চোখে লক্ষ করে অকারণে পিস্তলের খাপের ওপর হাতখানা রাখল সে।

দূর থেকেই বাবা আর টুপুকে প্লাটফর্মে ভিড়ের মধ্যে লক্ষ করে হাত তুলল মৃদুলা। শরীর ভাল থাকলে চেঁচিয়ে উঠত। টুপু তাকে দেখতে পেয়ে বাবাকে ডেকে আঙুল দিয়ে দিদিকে দেখিয়ে দিল। কী করুণ, কী স্নেহময় হাসি ফুটল মুখে! পিতুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে লাইন পেরিয়ে প্লাটফর্মে উঠে গেল মৃদুলা।

মাকে আনলে না বাবা! একটু দেখতাম।

তার শরীর ভাল না রে। তা ছাড়া বাড়িটা ফাঁকা থাকবে।

তোমরা কবে যাচ্ছ পলাশপুরে, বলো। আমরা ওখানে একা, একদম মন টিকবে না। তোমরা গিয়ে এক-দুই মাস থাকবে। বলতে বলতে মৃদুলা একটু থেমে ভাবে, তারপর বলে, চলো না, কলকাতার বাসা উঠিয়ে সবাই পলাশপুরে যাই। ওখানে সবাই কাছাকাছি থাকব।

পলাশপুর সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই মৃদুলার, কিন্তু সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায় সে এক স্বপ্নের দেশ— যেখানে বাস্তবের কোনও রূঢ়তা নেই, যেখানে বাইরের দুর্দৈব এসে সংসার ভেঙে দেয় না, যেখানে সবাই চিরকাল সুখে থাকে। এইরকম এক পলাশপুরের চিন্তা করে সে বড় আশান্বিত হচ্ছিল।

বাবা তার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখছিলেন, ধীর স্বরে বললেন, ভয়ে ভয়ে থেকেই আমরা শেষ হয়ে গেলাম। ছেলেটার বড্ড বাড় বেড়েছে। কেউ এমন নেই যে ওকে ঠান্ডা করতে পারে। কানাঘুষো শুনছি আজকাল খুনজখম শুরু করেছে।

মৃদুলার বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে, ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে, তা হলে কী হবে! মা গো! তুমি শিগগির একটা কিছু করো। পলাশপুর এমন কিছু দূর নয়, তুমি ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারবে।

বাবা ম্লান শুকনো মুখে হাসলেন, তাই কি হয়! পালিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না। বরং সহ্য করে দেখি আরও কিছু দিন, তারপর না হয় অন্য পাড়ায় বাসা নেব।

একসময়ে ফাঁক বুঝে টুপু মৃদুলার কানে কানে বলল, দিদি, আমাকে পলাশপুরে নিয়ে যাবি? আমি জামাইবাবুর স্কুলে পড়ব।

মৃদুলা আকুল চোখে অসহায়ভাবে চোদ্দো বছরের টুপুর কচি, নরম আর ভিতু মুখখানা দেখে। কী যে বলবে ভেবে পায় না।

টুপু মৃদু স্বরে বলে, বেহালায় আমার একটুও ভাল লাগে না।

কেন রে?

টুপু কী একটু ভেবে লজ্জায় লাল হয়। চোখ নামিয়ে নেয়। কী করে সে মৃদুলাকে বলবে যে, পাড়ার রাস্তা দিয়ে সে হাঁটতে পারে না। বিভুর দল এখনও তাকে দেখলেই দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে—এই বিভুর শালা। সেই থেকে 'বিভুর শালা' বলে খ্যাপায়। সে দুর্বল, ভিতু, মারপিট করতে পারে না, কাউকে ভয়ও দেখাতে পারে না। লজ্জায় সে কেবল মুখ লুকোয়। মাঝে মাঝে পড়ার টেবিলে বসে লজ্জায় আর অপমানে কাঁদে।

মৃদুলা বুঝতে পারে, টুপু পালাতে চায়। নিশ্চিন্ত, নিরাপদ এবং সম্মানজনক পরিবেশে চলে যেতে চায় সে।

টুপুর পিঠে হাত রাখে মৃদুলা। নরম গলায় বলে, যত দিন মা-বাবা আছে এখানে ততদিন তাদের কাছেই থাক। তুই ছাড়া দু'জনকে দেখবে কে? তুই কাছে না থাকলে মা বাবা আরও ভেঙে পড়বে। একটু চুপ করে মৃদুলা আবার বলল, মাঝে মাঝে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই পলাশপুরে চলে যাবি।

কেমন একটু হতাশ আর স্তিমিত হয়ে যায় টুপু। এত দিন সে মনে মনে কল্পনা করেছে, কলকাতার বাইরে অনেক দূরে মেঠো সুন্দর গ্রামখানায় সে চলে যাবে, তারপর সেইখানেই থেকে যাবে সে। দিদিকে বললেই নিয়ে যাবে দিদি। বেহালার বাসায় আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না তার। বড় ভয় করে, লজ্জা লাগে।

বাবা আর দিদি কথা বলছে, টুপু একটু দূরে সরে দাঁড়াল। প্লাটফর্মের শানে একটু জুতো ঘষল। অন্যমনস্কভাবে সে ভাবছিল, খুব শিগগিরই সে একটা ব্যায়ামাগারে ভরতি হবে। সারিবাদি সালসার বিজ্ঞাপনে যে বিপুল চেহারার লোকটাকে দেখা যায় দু'হাতে প্রকাণ্ড একটা সাপকে ধরে পিষে ফেলছে, ঠিক ওইরকমই একটা শরীর বানাবে সে।

অন্যমনস্কভাবে চার দিকে চাইছিল টুপু। হঠাৎ একসময়ে চোখ তুলে কিছু দেখে সে খুব স্থির হয়ে গেল। ওভারব্রিজের ওপরে লোহার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে একটা বিমের ধার ঘেঁষে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার চাপা গাঢ় কালচে রঙের প্যান্ট আর ঘি-রঙের টেরিলিনের শার্ট স্পষ্ট চেনা যায়। চোখে গগলস, খুব নির্বিকারভাবে সিগারেট টানছে। বিকেলের আলো খুব নিস্তেজ, তবু লোকটাকে চিনতে ভুল হয় না। চোখে গগলস বলে বোঝা যায় না কোন দিকে চেয়ে আছে। তবু টুপু বোঝে যে, বিভু তাকে দেখছে না, প্লাটফর্মের হাজারটা লোকের কাউকেই না। তার চোখ এক নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির।

ভয়ে টুপুর মুখ সাদা হয়ে গেল। দিদি কিংবা বাবা কেউ লক্ষ করেনি বিভুকে। টুপু তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিয়ে নিজের জুতোর ডগার দিকে চেয়ে রইল।

জিনিসগুলো যেখানে নামিয়ে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে সেখানে ছোট ভাইটার হাত ধরে নিজের বাবা-মা'র সঙ্গে আলাদা দাঁড়িয়ে ছিল পিতু। প্রকাণ্ড চেহারার সার্জেন্টটা তার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। যত বড় চেহারা লোকটার ততখানি সাহসী নয়। বরং ভিতু। চোখে চোখ পড়লে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিচ্ছে। অত ঘাবড়াচ্ছে কেন ছেলেটা। পিতু তো চোখ দিয়ে বলতেই চাইছে যে, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। সার্জেন্টদের আমি সত্যিই পছন্দ করি।

ট্রাঙ্কের ওপর রাখা বেতের ঝুড়িটাকে একটু ঠেলে দিয়ে সেখানে বসল পিতু। ছোট্ট রুমালে নাকের নীচের সামান্য ঘাম চেপে নিল। তারপর হাতে থুতনি রেখে ঝুঁকে বসে চেয়ে রইল লোকটার দিকে। লোকটা কাকার চেনা, নাম শুনেছে শম্ভু। লোকটা যদি সাহসী হত তা হলে এই স্টেশনেই লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকত। কাল স্কুলের বন্ধুদের সে তার সার্জেন্ট-ভক্তের কথা অহংকার করে বলতে পারত।

ও দিকে অল্প অল্প করে ঘেমে যাচ্ছিল শম্ভু। মেয়েটার চোখে চোখ রাখতে পারছিল না। কচি সতেজ শরীরে, মোম-মাখানো মসৃণ চামড়া আর লম্বাটে ধাঁচের মুখওলা কিশোরীটা তাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে। বেশ ভাইঝিটি তুলসীদার। যদি কোনও দিন সুযোগ হয় তবে সে তার লাল মোটরসাইকেলের পাশে ছোট্ট খোপগাড়িতে বসিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে সারা কলকাতা দেখিয়ে বেড়াবে।

এতদিন মেয়েদের কথা ভাবতেই পারত না শম্ভু। জিমনাশিয়ামের ইনস্ট্রাকটর কড়া ব্রহ্মচর্য করে যেতে বলেছিল তাকে। স্বাস্থ্যকে বরাবর ভালবেসে এসেছে শম্ভু। তাই এতকাল মেয়েদের ভাল করে চেনেনি সে। গোরুর মতো ছোলা মুগ খেয়েছে। কাঁচা ডিম গিলেছে। কিন্তু এবার এই প্রকাণ্ড শরীরটার একটা মূল্য পেতে ইচ্ছে করে। কেউ মুগ্ধ হোক, ভালবাসুক। পাখা ঝাপটাক বুকের মধ্যে। ছোট্ট পাখির মতো একটি মেয়ে, একটি কিশোরী।

শম্ভু প্রাণপণে ভেবে বের করতে চেষ্টা করল, এটা কীসের ইঙ্গিত।

শুক্রবার দিন বিকেলে অফিসের পর নিজের গাড়িতে নাকি দিঘায় গেছে সঞ্জয়। বাড়িতে রিনিকে ফোনে জানিয়ে গেছে যে, সে দিঘায় যাচ্ছে। তারপর থেকে আর কয়েক দিন তার কোনও পাত্তা নেই। এ দিকে ললিত আর রমেনকে অনেক আগেই বলে রেখেছিল সঞ্জয়— সামনের রবিবার তোরা আমার বাসায় খাবি। রমেনকে বলেছিল—তোর টাকাটা রবিবারে নিবি। সব দিয়ে-থুয়ে এবার আমি ঋণমুক্ত হব অথচ রবিবারে তার বাসায় গিয়ে সে নেই জেনে দু'জনেই বেকুব। রিনি অবশ্য তাদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করেছে। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে হঠাৎ রিনি ভেঙে পড়েছিল। খুব কান্নাকাটি করে বলল যে, প্রায়ই নাকি বাসায় ভুতুড়ে টেলিফোন আসে। একজন লোক টেলিফোনে বলে—মিস দাশগুপ্ত নামে কে একজন মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সঞ্জয়। ময়দানের অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। দিঘাতেও সঞ্জয় গেছে সেই মেয়েটির সঙ্গেই।

শুনে তুলসীর মন খারাপ হয়ে গেল। সঞ্জয় তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজ গাড়ি নিয়ে আসেনি। তার অর্থ— সে এখনও ফেরেনি কলকাতায়। সঞ্জয় কথার খেলাপ করেছে আজ। অথচ কোনও দিন করত না। কতকগুলো সদগুণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জয়। ধৈর্য, অধ্যবসায়, অবিচল পরিশ্রম আর নিষ্ঠা— যে-গুণগুলো তাদের আর কারও নেই। যদি সঞ্জয়ের কখনও পতন হয় তবে তুলসীর কাছে অনেকগুলো সদগুণের অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে।

চারিদিকে হই-হট্টগোল শুনে বোঝা যাচ্ছিল যে, ট্রেন আসছে। উবু হয়ে বসে থাকা লোকজন মুখের বিড়ি ফেলে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

তুলসী চেঁচিয়ে বলে, শম্ভু, তুই তো ব্যায়ামবীর, আমার মালপত্রে একটু হাত লাগা।

শুনে শম্ভু গটগট করে হেঁটে গেল। পিতুর কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল পিতু। নিচু হয়ে ট্রাঙ্কটা হাতলে ধরে আলগা করে ওজন দেখার সময়ে শম্ভু বড় মিষ্টি একটা গন্ধ পায়। না, এটা স্নো-পাউডারের গন্ধ নয়। সে-গন্ধ ছাপিয়ে কিশোরী-দেহের ঘামের বোঁটকা মিষ্টি মেশোরু গন্ধ পায় সে। চকিতে এক টানে ট্রাঙ্কটাকে মাটি থেকে আলগা করে ফেলে। এক হাতে। সে জানে, এভাবে গায়ের জোরটা কাউকে দেখানো এক ধরনের বোকামি। চার পাশের লোকজন তাকে হাঁ করে দেখছে। কিন্তু সে আর কী করতে পারে! শরীরের জোর ছাড়া তার আর কী আছে যা সে মেয়েটিকে দেখাতে পারে?

ট্রাঙ্কটা আবার নামিয়ে রেখে পিতুর দিকে চেয়ে হাসল শম্ভু, বলল, তেমন ভারী নয় তো!

নয়! ভারী অবাক হয় পিতু, বলে, ওর মধ্যে একগাদা কাচের বাসন আর বই আছে। খুব ভারী হওয়াব কথা।

পরিতৃপ্তির বোকা-হাসি হাসল শম্ভু।

রমেন অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছে, ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে কী যেন লক্ষ করছে দুর্গাপুরের সেই ছেলেটা। খুনি-চোখ পরকলায় ঢেকে রেখেছে। খুব অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে হাতের আঙুলের একটা আংটির পাথর মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

প্লাটফর্মের মাঝামাঝি হেঁটে এসে ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটিকে দেখল। বড় অসহায় ছেলেটির ভঙ্গি। পৃথিবীতে বড় অনিশ্চয়তা বোধ করছে ও।

তুলসীর শালা বাচ্চা ছেলেটি জুতোর ডগা শানে ঘষতে ঘষতে হঠাৎ মুখ তুলে ওভার ব্রিজের ওপর

দাঁড়ানো ছেলেটিকে দেখল। তার মুখ সাদাটে। তাতে লেখা আছে ভয়। রমেন বুঝতে পারছিল না, ওভারব্রিজের ওপর থেকে দুর্গাপুরের ছেলেটা কাকে দেখছে। সে খানিকটা আন্দাজে তুলসীর শালার পাশে দাঁড়াল। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, কী হয়েছে?

ছেলেটা ভীষণ চমকে উঠে তার দিকে তাকাল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, না, কিছু না।

কিন্তু স্বস্তি পেল না রমেন। তার মন একটি কোনও বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখল ওভারব্রিজের ওপর থেকে দুর্গাপুরের ছেলেটা আস্তে আস্তে সরে আসছে সিঁড়ির দিকে। একটু পরেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ছেলেটা। কালো চশমার ওপর তার কোঁচকানো ভ্রূ আর চোয়ালের দৃঢ়তা লক্ষ করে রমেন। খুব কাছ দিয়ে বুক ঘেঁষে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে গেল সে, কিন্তু রমেনকে লক্ষ করল না। তারপরেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ছেলেটা।

তুলসীর শালা গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে মৃদুলা স্থির চোখে ভিড়ের ভিতরে কী যেন দেখছে। ঠোঁট কাঁপছে তার। তুলসীর শ্বশুরের চোখ কেমন ঘোলাটে, চঞ্চল। দু' হাতে আঙুল মটকাচ্ছেন তিনি। হাঁ করে শ্বাস টানছেন।

ঠিক এই সময়ে গাড়ির গুড়গুড় গম্ভীর শব্দ হচ্ছিল। তুলসী হেঁকে বলল, রমেন, তোর তো কোনও পিছুটান নেই, আমার সঙ্গে পলাশপুর যাবি? কয়েক দিন থেকে আসবি আমার সঙ্গে! একা এত মালপত্র নিয়ে সন্ধেবেলায় নামতে কেমন ভয় করছে।

রমেন একটুও চিন্তা না করে বলল, যাব।

বিভু মনস্থির করতে পারছিল না। সে খবর পেয়ে সঠিক পিছু নিয়ে এসেছে স্টেশনে। ওভারব্রিজ থেকে দেখেছে মৃদুলাকে এতক্ষণ। কিন্তু হায় ঈশ্বর, এ কী চেহারা হয়েছে মৃদুলার? কী রোগা হতশ্রী, শুষ্ক চেহারা! চোখের নীচে কালি, হনুর হাড় উঁচু, ঠোঁটে শুকিয়ে আছে পানের রস। কনুইয়ের চামড়ায় পড়েছে কড়া। গায়ের রং ফ্যাকাশে। হায় ঈশ্বর! এর কাছে আর কী চাওয়ার আছে বিভুর?

এতকাল বৃথাই সে ডাকপিয়নকে ভয় দেখিয়ে মা-বাবাকে লেখা মৃদুলার চিঠিগুলো পড়েছে। লোক লাগিয়ে খুঁজে বের করেছে ঠিকানা। পিছু নিয়ে এসেছে এত দূরে। ভেবেছিল, পলাশপুর পর্যন্ত যাবে। তারপর এক দিন ওর স্বামী স্কুলে গেলে নির্জন দুপুরে হানা দেবে মৃদুলার দরজায়। বলবে, ওই শুঁটকো লোকটার চেয়ে কি আমি খারাপ ছিলাম? দেখো তোমার জন্যই আমি আজ ফেরারি, পুলিশ কেস পিছনে নিয়ে ঘুরছি। এ-বিষয়ে তোমার কী বলার আছে!

কিন্তু খুব কাছ থেকে মৃদুলাকে দেখার পর বিভু ভিড় ঠেলে অনেক দূর এগিয়ে গেল। ফিরে এসে আর-একবার মৃদুলাকে দেখতে ইচ্ছে করল না। প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তটা নির্জন। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। গাড়ি এসে গেলে সে উদাসীন চোখে লক্ষ করল, ঢেউয়ের মতো হাজার হাজার মানুষ আছড়ে পড়ছে গাড়িতে। তার উঠতে ইচ্ছে করল না।

গাড়ি ছেড়ে গেল। আস্তে আস্তে ট্রেনের কোনও একটা জানালায় কবেকার দেখা একটা আধ-চেনা লোকের মুখ লক্ষ করে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। বড় সুন্দর মুখখানা। কবে, কোথায় যেন দেখেছে। ঠিক মনে পড়ল না। ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে ভাবতে ফিরে যেতে লাগল বিভু।

## ॥ আটত্রিশ ॥

সেই রাত্রে আর রমেনের ফেরা হল না। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ছিল তখন হতভম্ব ললিত চেঁচিয়ে তাকে বলেছিল, তুই সত্যিই চললি নাকি?

রমেন মৃদু হেসে ঘাড় নাড়তে ললিত আবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কবে ফিরবি?

রমেন তার উত্তর দিতে পারেনি। আসলে সে তো কোথাও ফেরে না। যেখানেই সে যায় সেখানেই তার ফিরে যাওয়া। অন্তত ওই রকমভাবেই ভাবতে চেষ্টা করে রমেন। আশ্চর্য এই যে, ভাবতে আজকাল আর অসুবিধে হয় না। তবু ললিতের জন্য কষ্ট হচ্ছিল। রমেনকে ছাড়া আজকাল বোধ হয় ললিতের একটু একা-একা লাগে।

পলাশপুরের নতুন বাসায় পা দিতে-না-দিতে মৃদুলার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সন্ধের মুখে পৌঁছে তারা খানিক দূর ইলেকট্রিকের আলো আর পিচের রাস্তা পেল। তারপর অন্ধকার কাঁচা রাস্তায় একটুখানি গিয়ে ফাঁকায়, প্রায় মাঠের মধ্যে অন্ধকার বাসা। তুলসীর ছাত্ররা আর কয়েকজন মাস্টার, বাড়িওয়ালা নিজে— সবাই মিলে কয়েক পলকে পুরুষালি রীতিতে যেমন-তেমন ভাবে ঘর দু'খানা সাজিয়ে ফেলতে সাহায্য করল। কিন্তু হ্যারিকেনের আলোয় যে ধোঁয়াটে অন্ধকার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাতে অভ্যাস ছিল না বলে মৃদুলার কেবল মনে হচ্ছিল সে এক চির অন্ধকারের নির্বাসনে এসেছে। আর কোনও দিন কলকাতা আর বেহালার মুখ দেখবে না। বাড়ির ভিতরদিককার দরজা খুলে ভিতর-বারান্দায় দাঁড়াতেই প্রতিপদের চাঁদের আলোয় ভাসা উঠোন, তারপব আগাছার বেড়া, আর বহুদূর বিস্তৃত এক কুয়াশায় মেঘাচ্ছন্ন আগাছা কণ্টকিত প্রান্তর দেখে তার মনে হল সে মৃত্যুর পরের জগতে চলে এসেছে। চার দিকের এ-জগৎ বেঁচে থাকার জগৎ নয়।

চা খেয়ে সবাই বিদায় নিয়ে গেলে রইল কেবল তুলসীর লম্বা সন্ন্যাসী বন্ধুটি। এও হয়তো কাল কি পরশু চলে যাবে। ভেবে মৃদুলার কেমন কান্না পায়। এখন যে-কোনও মানুষ কাছে থাকলেই ভাল লাগবে। যে-কোনও মানুষ।

নতুন তোলা-উনুনে চালে ডালে চাপিয়ে ভাজার বেগুন কুটতে বসেছিল সে, এমন সময়ে যে-সব ভীরু মেয়েরা দরজার আড়াল থেকে তাদের মালপত্র নিয়ে আসতে দেখেছে তারা আসতে লাগল এক দুই করে। অসম্ভব তাদের কৌতূহল কলকাতার মেয়েদের প্রতি। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মৃদুলা বুঝতে পারছিল যে গ্রাম সুখের জায়গা নয়।

তুলসী আড়াল আবডাল থেকে হ্যারিকেনের মাজা আলোয় যতটা সম্ভব মৃদুলার মুখের ভাব লক্ষ করে যায়। তারপর নানা কথা ভেবে কেমন একটু নার্ভাস বোধ করে। এতখানি করার পর যদি মৃদুলা সুখী না হয়ে থাকে তবে তার সুখ কোথায়?

নতুন চৌকির ওপর সদ্য পাতা বিছানায় রমেনের মুখোমুখি আঁট হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল তুলসী। বলল, এ-জায়গাটা খুব ডেভেলপ করবে, বুঝলি? ভাবছি কিছু জমিয়ে-টমিয়ে এ দিকেই জমি কিনব।

কথাটা বলেই তার খেয়াল হল যে, যাকে সে এই কথা বলল তার জমি-বাড়ি কিংবা পার্থিব সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ না থাকারই কথা! মনে মনে একটু লজ্জা পেল তুলসী। বরাবর রমেনের কাছে নিজেকে তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে তার, আজও হল।

সকালবেলায় উঠেই রমেনের চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু মৃদুলা একটু আপত্তি তুলল, কেন যাবেন এক্ষুনি? কোনও কাজ তো নেই! আজকের দিনটা থেকে যান না।

আসলে বালিগঞ্জ স্টেশনে বিভুকে দেখার পর থেকেই মৃদুলা ক্রমান্বয়ে অস্বস্তিতে আছে। কেবলই মনে হয় যে-কোনও সময়ে যে-কোনও দিন বিভুর আবির্ভাব ঘটবে এইখানে। তুলসীকে মৃদুলা চেনে। যদি কখনও বিভুর মুখোমুখি হয় তবে কোথায় উবে যাবে তুলসীর সাহস! বিভুর আক্রোশের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই তুলসীর নেই। তাই লম্বা চওড়া সাহসী রমেন কয়েকটা দিন তাদের কাছে থাক। দু'টো ঘরের একটা তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রমেন থাকল।

মৃদুলাকে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে চলে যেতে দেখল বিভু। ফেরার পথে ট্যাক্সিতে খুব অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল সে। গড়িয়াহাট পেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ করল সামনে আর একটা ট্যাক্সি। পিছনের কাচ দিয়ে দেখা যায়, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে।

প্রথমটায় কিছু মনে হয়নি বিভুর। দৃশ্যটা উদাসীনভাবে দেখল একটু। কিন্তু ট্যাক্সিটা আগাগোড়া তার ট্যাক্সির আগে আগে চলছিল। এতে সামান্য উষ্ণতা বোধ করল সে। কেন ওই ট্যাক্সিটা আগে আগে যাবে! বিকেলের নিস্তেজ আলোয় সে লক্ষ করে, মেয়েটার মাথা ভেঙে ছেলেটার ঘাড়ে নেমে আসে। ছেলেটা একটা হাত তুলে মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে। ওদের দু'জনেরই অবস্থা একটু বেসামাল।

বিভু হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালার কাঁধ ছুঁয়ে বলে, ওই ট্যাক্সিটাকে ওভারটেক করো সর্দারজি।

ট্যাক্সিওয়ালা বিভুকে খানিকটা চেনে। যারা চেনে না তারাও চিনে নেয়। ফলে সর্দারজি নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে হর্ন দিল।

ত্রিকোণ পার্কের কাছে দু'টো ট্যাক্সির জানালা সমান্তরাল হলে বিভু মুখ বাড়িয়ে দেখে, মেয়েটার কোলে ছেলেটার হাত।

বিভু চেঁচিয়ে বলল, এই শালা, সরে বোস।

ভীষণ চমকে ছেলেটা হাত টেনে নিল। ওদের ট্যাক্সিওয়ালা ফিরে তাকাল। বিভুর চিৎকারেই বুঝি ওদের ট্যাক্সিটা টলমল করে একটু আঁকাবাঁকা হয়ে আবার সোজা হল।

ওদের পেরিয়ে এসে বিভু পিছন ফিরে দেখল, ছেলেটা আর মেয়েটা অনেক দূরে সরে বসেছে। হাসল বিভু। পরিতৃপ্তির হাসি। শালা প্রেম করবে! দেশের এই অবস্থা, আর শালারা প্রেম করবে, অ্যাঁ!

মাঝে মধ্যে আজকাল বিভুর অদ্ভুত সব খেয়াল দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে দু'টি ছেলেমেয়ে জোড় বেঁধে যাচ্ছে, বিভু হয়তো আসছে উলটো দিক থেকে। এ-রকম অবস্থায় সে ঠিক দু'জনের মাঝখান দিয়ে সোজা হেঁটে যায়; দু'জনকে ছিন্ন করে, দূরে সরিয়ে। আনন্দ পায়।

রাসবিহারীর মোড়ের কাছে, রসা রোডে এক দিন এই কাণ্ড করল বিভু। এবারের ছেলেটা হলুদ গেঞ্জি গায়ে, স্বাস্থ্যবান চেহারা। ফলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটা বিভুর কাঁধ চেপে ধরল।

বিভু ফিরে দাঁড়ায়। আপনমনে শান্তভাবে একটু হাসে। তাই! ছোকরার গায়ে জোর আছে। প্রেমিকাকে বীরত্ব দেখাতে চায়।

কী হল এটা? ভদ্রভাবে হাঁটতে শেখোনি! ছেলেটা গরম খেয়ে বলে।

বিভু শুধু হাসে। গায়ে জোর থাকলে কী হয়, প্রেমিকরা কোনও দিনই তেমন নিষ্ঠুর হতে জানে না। তুমি কি পারো আমার মতো হৃদয়হীন হতে! পারলে তুমি হতে মাস্তান। কিন্তু তুমি তো তা নও।

বিভু কিছুমাত্র গায়ের জোর দেখাল না। কেবল অতিশয় হৃদয়হীনতায় ঠান্ডা মাথায় ডান হাতের দু'টো আঙুল সাঁড়াশির মতো তুলে লঘু হাতে ছেলেটির চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

এই হল কায়দা বুঝলে! শত রেগে গেলেও তুমি কখনও পারবে না কারও চোখে আঙুল ঢোকাতে। তোমার মায়া হবে।

ছেলেটা প্রথমে বুক ফাটা চিৎকার করে দু'চোখ চেপে ধরেছিল। চশমা পরা মেয়েটা প্রথমে বুঝতে পারেনি কী হল। তারপর বুঝতে পেরে সে তাড়া করল বিভুকে হাতের সাদা ভ্যানিটি ব্যাগটা অস্ত্রের মতো তুলে ধরে।

বিভু শান্তভাবে কয়েক পা দৌড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেল ছুটন্ত বাস।

পা-দানিতে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই সে দেখল ছেলেটা ফুটপাথে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বোধ হয় কাঁদছে। ভিড় জমে উঠেছে আস্তে আস্তে।

প্রেম! শালা প্রেম! দেশের লোক বোমা বন্দুক খেয়ে মরে যাচ্ছে, ফসল ফলছে না জমিতে— তোমরা শালা প্রেম করবে! প্রেমের কি এই সময়! প্রেম দিয়ে কী হয় রে শালা জীবনে, যে সর্বস্ব নিয়ে একটা মেয়ের পিছনে ল্যাং ল্যাং করে ঘুরবে একটা ছেলে!

বিভু তাই রাস্তায় জোড়া ছেলেমেয়ে দেখলে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কখনও দূর থেকে চেঁচিয়ে আওয়াজ দেয়। মুখ খারাপ করে।

বিশু মাঝে মাঝে তাকে সাবধান করে দেয়, বড় বেশি তড়পাচ্ছিস। এক দিন বেমক্কা মার খেয়ে যাবি, তোর চেয়ে ঢের মাস্তান আছে।

কিন্তু বিভু বিড় বিড় করে। না, তার চেয়ে বেশি কেউ নেই।

টুপু যেদিন মৃদুলাকে তুলে দিয়ে এসেছিল তার পরদিনই ফুটপাথের দোকান থেকে একটা দেশি লোহার লম্বা চকচকে ছুরি কিনেছিল। হাতলটা কাঠের। ছুরিটা এত লম্বা যে পকেটে আঁটে না।

পরদিন শানে ঘসে ছুরিটাকে আরও তেজালো করে তুলেছিল সে। বন্ধুরা দেখে বলল, বেশ ছুরি। কী করবি এটা দিয়ে!

দেখিস।

টুপু ছেলেমানুষ। কিন্তু ঠিক ছেলেমানুষের মতো সে বলেনি কথাটা। স্টেশনে দিদির সামনে দিয়েই যখন বিভু হেঁটে গিয়েছিল তখন দিদির মুখের ভাব আর বাবার অসহায় শ্বাস টানা সে লক্ষ করেছিল। এর পর থেকেই তার নিজেকে বড় বেশি অসুখী মনে হয়েছিল। এত বিমর্ষ সে আর কখনও বোধ করেনি।

খোলা অবস্থায় ছুরিটা সে পকেটে রাখে। পকেটে হাত দিয়ে মাঝে মাঝে অনুভব করে হাতলটা। ছুরিটাকে নাড়ে, ঘোরায়। ফলে কয়েক বার তার হাত কাটল, ছুরির ডগায় ফুটো হয়ে গেল আঙুল।

রাতে মা-বাবার চোখের আড়ালে দিদির শোওয়ার ঘরে একটা পুরনো কোলবালিশ দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ছুরিটার প্রথম পাঠ নিল টুপু। আশ্চর্য কোলবালিশটা ঠিক ছুরি-খাওয়া মানুষের মতোই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গেল। পেটের ওপর হাতলটা রইল জেগে।

কেবল টুপু জানল, এ-রকম হবে। আর-কেউ জানল না।

টুপুর সিনেমায় যাওয়া বারণ। কিন্তু পোস্টার দেখে সে দু'টো মারদাঙ্গার ছবি বেছে নিল। স্কুল পালিয়ে দেখে এল দু'টো ছবি। তার চোখে মুখে এবং মনে যথেষ্ট হিংস্রতার সঞ্চার হয়ে গেল। ছবি দু'টোর শেষে সত্য এবং অহিংসা এবং প্রেম ইত্যাদির কথা বলা হয়েছিল। টুপু সেগুলো মনে রাখল না।

আজকাল টুপু ডিটেকটিভ বইগুলো দু'বার করে পড়ছে।

বাইরে থেকে তাকে এখন বেশ ভাবুক আর গম্ভীর দেখায়। কেউ 'বিভুর শালা' বলে চিৎকার করে তাকে খ্যাপালে সে ফিরেও তাকায় না।

সে এই পারিবারিক দুর্দিনের শেষ দেখতে চায়।

কয়েক দিনই গা-ঘেঁষা দূরত্বে দেখা হল বিভুর সঙ্গে। আগের মতোই রাস্তা ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়াল টুপু। ভয় পেল। চোখে চোখ রাখল না।

টুপু নানাজনের কাছে শুনে শুনে শিখেছে যে পেটই হল সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। সেখানে হাড় নেই। ছুরিটা ঢুকিয়ে একটু আড়াআড়ি টেনে দিতে হয়। ছুরিতে খুব ধার থাকলে ব্যাপারটা মোটেই শক্ত না।

## ॥ উনচল্লিশ ॥

দীর্ঘ রাস্তা মোটর চালিয়ে গভীর রাতে ফিরেছে সঞ্জয়। তারপর বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে নিঃসাড়ে। কাত হয়ে শুয়ে আছে সে। তেল-না-দেওয়া রুক্ষ চুলে ধুলোটে লালচে রং। এখনও চুল বাড়েনি সঞ্জয়ের। মায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে কামানো হয়েছিল মাথা। তেল তেল করছে মুখ, গালে দাড়ি বেড়ে কর্কশ দেখাচ্ছে মুখখানা। হয়তো স্বপ্ন দেখছিল সঞ্জয়। তার ঠোঁটে একটু হাসির আভাস। সারা মুখখানায় কোনও পাপের চিহ্ন নেই, কিন্তু তাকে নিদারুণ পরিশ্রান্ত দেখায়।

রিনি এই দৃশ্যটা দেখল বার বার। কাল রাতে ঘুম থেকে উঠে সে সঞ্জয়কে দরজা খুলে দিয়েছিল। দেখেছিল হাসিমুখে সঞ্জয় দাঁড়িয়ে আছে দরজায়, হাতে সুটকেস।

ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, পিকলু কই?

পিকলু! পিকলুকে কি সঞ্জয়ের মনে ছিল?

সুটকেস মেঝেয় রেখে মশারি তুলে আধখানা শরীর ভিতরে ঢুকিয়ে ঘুমন্ত পিকলুকে 'বাবা সোনা' এই সব বলে আদর করেছিল সঞ্জয়। ঠিক বাবাদের মতোই, আদেখলেপনায়।

সম্ভবত সেটা ছিল রিনির মুখোমুখি হওয়ার অস্বস্তি থেকে পলায়ন। নইলে পিকলুকে কখনও হাত-মুখ না ধুয়ে আদর করে না সে।

কিন্তু রিনি জানে, এ-অস্বস্তিটুকু চিরকাল থাকবে না সঞ্জয়ের। বিয়ের পর প্রথম প্রথম সঞ্জয় বাইরে মদ খেলে কড়া জর্দা দেওয়া পান খেয়ে আসত। তবু টের পেত রিনি। টের না পাওয়ার ভান করত। ক্রমে ক্রমে সাহসী হতে হতে সঞ্জয়ের হুইস্কির বোতল আজকাল খাওয়ার ঘরের ফ্রিজেই মজুত থাকে।

ঠিক সেই রকম দিঘা বেড়ানোর ব্যাপারটাও এক দিন সঞ্জয় প্রকাশ্যে করবে; রিনির মুখোমুখি দাঁড়াবে নিঃসংকোচে সরল গাছের মতো। সেদিনের কথা ভাবলে রিনির ভয় করে।

কাল রাতে যে সঞ্জয় আসবে তার খবর আগে দেয়নি। ফলে খাবার ছিল না।

সঞ্জয় মুখে বলল, খেয়ে এসেছি।

কিন্তু বস্তুত অতিরিক্ত উন্মাদনায় তার খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। তার মুখ-চোখ সেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

রিনি কথা না বলে রুটি টোস্ট করেছে, ডিম ভেজেছে, তৈরি করেছে কফি। সঞ্জয়ের খাওয়ার সময়ে মুখোমুখি বসে লক্ষ করেছে তার মুখ। সমুদ্রের আবহাওয়ায় থাকার ফলে তাকে একটু কালো দেখাচ্ছিল।

*রিনি কেঁদেছিল সঞ্জয় ঘুমোনোর পর।*

সকাল থেকে ঘুরে ফিরে রিনি আসছে শোওয়ার ঘরে। অকারণে সঞ্জয়ের মাথার নীচে বালিশ ঠিক করেছে। পিকলুকে বিছানা পেতে শুইয়েছে খাওয়ার ঘরে ডাইনিং টেবিলের ওপর। পাছে তার চেঁচামেচিতে সঞ্জয়ের ঘুম ভেঙে যায়।

পিকলু এখন হামা টানে। টলমলে পায়ে কখনও দাঁড়ায়। তারপর ঝুপ করে বসে পড়ে। পাছে সে পড়ে যায় সেই ভয়ে শোওয়ার ঘর থেকে বারবার খাওয়ার ঘরে যাচ্ছিল রিনি।

এইভাবে সারা সকাল সে হাঁটছে। খাওয়ার ঘর থেকে শোওয়ার ঘর, আবার খাওয়ার ঘর। রিনি কোনও শারীরিক অনুভূতি টের পাচ্ছিল না। সকাল থেকে সে কিছুই খায়নি। কিন্তু তার খিদে পাচ্ছিল না, তেষ্টা পাচ্ছিল না। দুই ঘরে যাতায়াতে সে বোধ হয় মাইলখানেক হেঁটে ফেলল।

বেলা ন'টা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠতেই বুকের ভিতরে দুর দুর করে উঠল তার। দম বন্ধ হয়ে এল প্রায়। আজ সকালে সে এই প্রথম নিজের শরীর টের পেল।

কে?

আমি সেই লোক। সঞ্জয়বাবু ফিরেছেন?

লোকটা কোনও দিনই নিজের নাম বলে না। কিন্তু গলাটা এখন চেনা হয়ে গেছে রিনির।

ফিরেছেন। রিনি কাঁপা গলায় বলে। প্রথম প্রথম টেলিফোন রেখে দিত রিনি। কিন্তু আজকাল রাখে না। লোকটা সঞ্জয়ের নানা খবর দেয় তাকে। এই রকমভাবেই লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া এবং অদ্ভুত বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে রিনির। সম্ভবত লোকটা সেই মেয়েটাকে ভালবাসে।

লোকটা কী যেন ভাবে। তারপর বলে, আপনি ওঁকে কিছু বলেননি?

কী বলব।

বলা উচিত। নইলে এ-রকম হতে থাকবে। আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না।

রিনি চুপ করে থাকে।

লোকটা আত্মগতভাবে বলে, মেয়েটা এত সস্তা ছিল না বুঝলেন? কী করে যে ও এতটা বোকামি করতে পারে! মানুষ কী রকম পালটায়!

রিনি চুপ।

লোকটা আস্তে করে বলল, আমি আজ সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করব। যদি উনি কথা শুনতে না চান তবে—

লোকটা এইটুকু বলে ইতস্তত করলে রিনি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে, তবে কী করবেন?

কিছু একটা করব! সামথিং হার্শ। আমার অনেক বন্ধু আছে। মেয়েটিকে বাঁচানো দরকার, আপনাকেও।

টেলিফোন রেখে দিয়ে রিনি আবার ঘুরতে থাকে। খাওয়ার ঘর থেকে শোওয়ার ঘর, আবার খাওয়ার ঘর।

সঞ্জয় চোখ মেলে তাকিয়ে সকালের ঝলসানো রোদ দেখে চোখ মিটমিট করে। অভ্যাসবশত ঘুম-চোখে হাত বাড়ায় রিনির জন্য। পায় না। পাশ ফিরে শূন্য বিছানাটা দেখে। সাদা এবং প্রকাণ্ড বিছানা। রিনি কোথায়! কেটে পড়ল নাকি? সঞ্জয় চমকে ওঠে।

ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে সে রিনিকে দেখে, এ ঘর থেকে শ্লথ পায়ে ও-ঘরের পরদার আড়ালে চলে গেল।

শুয়ে থেকেই একটা সিগারেট ধরায় সঞ্জয়। সকালের এত স্পষ্ট আলো তার সহ্য হয় না। এত স্পষ্টতা তার অসহ্য লাগে। তার মনে হয় এর পর থেকে সারা জীবন দিনের চেয়ে রাতটাই তার বেশি ভাল লাগবে।

দিঘা থেকে ফেরার পরদিন সঞ্জয় গাড়িটা গ্যারেজে পাঠিয়েছিল ধোয়ামোছা আর মেরামতের জন্য। বিকেলের দিকে অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি না পেয়ে হেঁটেছিল অনেক দূর। টের পায়নি যে তাকে অনুসরণ করছে কয়েকজন লোক— যাদের চেহারা কালো, রোগা, কিন্তু মজবুত, যাদের দেখলেই পেশাদার গুন্ডা বলে চেনা যায়।

*একটু অন্যমনস্ক ছিল সঞ্জয়। অনিমার ভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে ছেলেটি সেই শুভময়* ঘোষাল তার অফিসে এসেছিল সেদিন। ছেলেটি মোটাসোটা গোলগাল, সঞ্জয় শুনেছে ছেলেটা নাকি ভাল রবীন্দ্রসংগীত গায়। ছেলেটি সঞ্জয়ের মুখোমুখি হয়ে একটুও না ঘাবড়ে বলল, আপনি দু'টি মেয়ের সর্বনাশ করছেন। এক নম্বর, অনিমা, আর দু'নম্বর রিনি— আপনার স্ত্রী।

এ-সব শান্তভাবে শুনল সঞ্জয়। বেয়ারাকে ডেকে দু' কাপ কফি আনতে বলল। বাড়িয়ে ধরল সিগারেটের প্যাকেট। ছেলেটাও শান্তভাবে সিগারেট নিল, কফি খেল। কিন্তু সোজা চোখে চোখ রেখে যা বলার তা বলতে ছাড়ল না। পুরনো ধরনের নীতিকথাই বলল বেশি। চরিত্র, সতীত্ব, সমাজ— এই সব নিয়ে যত দূর বলা যায়। ছেলেটি অনিমাকে ভালবাসে। গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারার কোনও ছেলেকে এ-রকম শীতল এবং শান্তভাবে রেগে যেতে কখনও দেখেনি সঞ্জয়।

শুভময়ের সঙ্গে একটু কথার খেলা খেলতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। তাই কথার এক ফাঁকে হঠাৎ বলেছিল, অনিমার জন্য আমার কাছে আরও কয়েকজন এসেছিল। ডিজায়রেবল ক্যান্ডিডেটস।

ডাহা মিথ্যে। কিন্তু ছেলেটি এই প্রথম সামান্য লাল হয়ে গেল।

সঞ্জয় হঠাৎ টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলল, অনিমা কীরকম মেয়ে তা তো আপনি জানেন বোধ হয়। আপনি শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে, ওকে নিয়ে সামলে রাখতে পারবেন না। চান্স পেলেই ও দড়ি ছিঁড়বে, খোঁটা ওপড়াবে। আমি পাকা লোক, তব আমিই সামলাতে পারছি না।

সঞ্জয় ছেলেটির গোল মুখে কোনও ভাবপারবর্তন টের পেল না। াকন্তু ওর মুখে রাক্তমাভাটা লেগেহ ছিল।

সঞ্জয় হঠাৎ যেন বে-খেয়ালে তার চেক-বইটা বের করে ফয়েলগুলো শুভময়কে দেখিয়ে বলল, চার দিনে আমরা খরচ করেছি হাজার দেড়েক টাকা। এই দেখুন।

শুভময় ইঞ্জিনিয়ার। সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। সম্ভবত সে বড়লোকের ছেলে নয় এবং বাড়িতে পুষ্যিও অনেক। সম্ভবত হাজার খানেকের বেশি মাইনে সে এখনও পায় না। তাই চার দিনে দেড় হাজার টাকা খরচের কথায় সে একটু ভ্রূ তুলল।

তারপর আস্তে করে বলল, বাঙালি মেয়েরা আজকাল কত দূর অধঃপতনে গেছে!

বলে সে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, আপনার স্ত্রীকে আমিই বেনামে ফোন করতাম। আজ সকালেও করেছি।

খুশি হল সঞ্জয়। বলল, আবার করবেন। যখন খুশি। ও খুব একা একা বোধ করে। ফোন করলে খুশি হবে।

এটাও কথার খেলা। ছেলেটার নীতিবোধ বড় প্রবল। সেইখানেই বোধ হয় আঘাতটা লাগল। শীতল চোখে নীরবতায় সঞ্জয়কে একটু দেখে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অফিসে যতক্ষণ ছিল সঞ্জয় তারপর, ততক্ষণ সে মৃদু একটা অস্বস্তি বোধ করেছে। কোনও কারণ নেই তবু কেবলই সে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল।

অন্যমনস্ক সঞ্জয় 'বার'-এ একটু সময় কাটিয়েছিল বিকেলে। তারপর এসপ্ল্যানেডের ভিড় ঠেলে মেট্রোর সামনে দাঁড়াল ট্যাক্সির জন্য। কী ভেবে রাস্তা পার হয়ে গেল গোলঘরের পেচ্ছাপখানার দিকে। আবার বেরিয়ে এসে প্যান্টের বোতাম এঁটে গাছের তলায় ঝুপসি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যখন সিগারেট ধরাচ্ছিল তখন গোটা চারেক লোক নিঃশব্দে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। চারজন পেশাদার লোক।

কাজটা অবশ্য তাদের পক্ষে সহজ হয়নি। সঞ্জয় প্রথম চোটে দু'জনকে নিয়ে নিয়েছিল। একজনের

তলপেটে একটা লাথিও জমিয়ে দিয়েছিল সে। এরা কারা, এবং কেন তাকে মারছে তা ভাববার চেষ্টাও করেনি সে। কেবল লাথিটা মেরে সে আদিত্যর লাথিটার শোধ নেওয়ার এক অদ্ভুত আনন্দ বোধ করেছিল।

কিন্তু লোকগুলো ছিল পেশাদার। মার খাওয়া তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। কাজেই সঞ্জয়ের ঘুঁষি লাথি তারা তৃণজ্ঞান করে খুব চটপট সেই প্রকাশ্য জায়গায় তাদের কাজ সারল। চার পাশ থেকে ঘিরে, অভ্যস্ত সুন্দর হাতে।

পেটে সামান্য মদ ছিল সঞ্জয়ের। ফলে সে ওদের হাত আর পায়ের কাজ বুঝতেই পারল না। ঢলে পড়ল লোহার রেলিঙের তলায়, সিমেন্টের বাঁধানো গোড়ায় মাথা রেখে শুয়ে বমি করতে লাগল।

একসময় এ-সব ঘটনা ছিল তার গায়ের ধুলো। চট করে ঝেড়ে ফেলতে পারত। কিন্তু এবার তা হল না। কয়েক দিন ঘরে শুয়ে-বসে থাকতে হল তাকে। ডাক্তার দেখাতে হল। ওষুধ খেতে হল। ডাক্তার দেখেশুনে বললেন, ব্লাডপ্রেশার খুব হাই।

ইয়াঃ। সঞ্জয় শুয়ে থেকে সারা দিন আপনমনে হাসে। মনে মনে রিনিকে সম্বোধন করে কথা বলে, এই সবই বয়সের ব্যাপার, বুঝলে রিনি। বয়স হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে আর নেই। কে আমাকে মেরেছে আমি তার কী জানি। কেন মেরেছে তাই বা কে জানে। কিন্তু এ-কথা ঠিক, বয়সের শেষ ঢলে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়। খুব শান্তভাবেই মানুষের তা গ্রহণ করার কথা। আমি তো আর খুব সুন্দর জীবনযাপন করিনি!

আমি এখনও সন্ন্যাসী হওয়ার কথা ভুলিনি। বাইরে এই যে আমাকে দেখছ— সদগুণ ঝরে-যাওয়া লোক— চুরি করছে, টাকা জমাচ্ছে, করছে অবৈধ প্রেম, মদ খাচ্ছে— এ-সব কিছু আমার অন্তরের সেই বৈরাগ্যকে স্পর্শও করছে না। একদিন-না-একদিন সেই বৈরাগ্য সব ফেলে রেখে চলে যাবে।

কিন্তু যাওয়া হয় না।

মাঝে মাঝে আজকাল রাতে তার ঘুম আসে না। অনেকটা হুইস্কি খাওয়ার পরেও না।

কখনও নানা কাজে ব্যস্ত সঞ্জয় হঠাৎ গলার কাছে হাত তুলে একটা মাংসের ডেলাকে অনুভব করে। লাম্প। চমকে উঠে ভাবে—ক্যান্সার ফ্যান্সার হবে না তো! কখনও বা শোওয়ার দোষে ঘুমের মধ্যে তার শ্বাসকষ্ট হয়। অমনি তড়বড় করে উঠে বসে, ভাবে—শরীরের মধ্যে কোথাও রক্ত জমাট বাঁধছে না তো! যদি থ্রম্বসিস হয়!

কখনও বা সে ঘুম-চোখে অকারণে রিনিকে ডাকে।

রিনি!

উঁ! রিনি ঘুমগলায় উত্তর দেয়।

রিনি! আবার ডাকে।

উঁ!

রিনি!

উঁ!

তখন পাশ ফিরে রিনির কানে কানে বলে, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। পিকলুকেও। ঘর সংসার টাকা সব কিছুকেই। তবে আর কবে আমি সন্ন্যাসী হব!

রিনি এ-সব কথা বিশ্বাস করে না। চুপ করে থাকে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সঞ্জয়ের কেমন যেন ফাঁকা লাগে বুক। আড়াল থেকে কে যেন তাকে এই সব মিথ্যে রঙিন কথা বলায়। অকারণে। সে রমেন হবে না। সে কোনও দিন রমেন হবে না।

## ॥ চল্লিশ ॥

রমেনের ছোট্ট বিছানা আর টিনের সুটকেস পড়ে আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই জিনিসপত্র রেখে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনাও রেখে যায়। কিন্তু রমেনের বেলায় এ-নিয়ম খাটবে কি? ও দু'টো তুচ্ছ জিনিস রমেনকে ফিরিয়ে আনবে, এ-কথা ভাবতে ললিতের ভরসা হয় না।

তবু নিজের অজান্তে রমেনের জন্য অপেক্ষা করে ললিত। রমেন যত দিন তার কাছে ছিল, তারা পাশাপাশি শুত, তখন প্রায়ই ললিত টের পেত, সারা রাত জেগে আছে রমেন। মাঝরাতে কি ভোর-রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে অসহায় ললিত মৃদু অস্পষ্ট গলায় ডাকত, রমেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেত— কী রে! ললিত জিজ্ঞেস করত, জেগে আছিস? উত্তর পেত— আছি। তাই আবার নিশ্চিন্তে ঘুমোত ললিত। রমেনের এই নিরন্তর জেগে থাকা দেখে ললিত বড় অবাক হয়েছে প্রতি রাত্রে। ললিত ডাকবে, ডেকে পাছে সাড়া না পায়, সেইজন্যই কি জেগে থাকত রমেন? তুই কী রে রমেন? আমার জন্য কই কেউ তো কখনও এ-রকম জাগিয়ে রাখেনি নিজেকে!

কত কথা মনে পড়ে ললিতের। অপর্ণার মোটর গাড়িটা তার হাতে এক বিকেলে ছেড়ে দিয়েছিল রমেন, তারা ঘুরপাক খেয়েছিল ময়দানের নির্জন রাস্তায়। বহুকাল বাদে সেইদিন প্রথম নিজের ওপর কিছুক্ষণের জন্য একটা গভীর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল সে। কিংবা মনে পড়ে, শ্মশানের সেই ঘটনার কথা— তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভয় ভেঙে দিয়েছিল রমেন। কিংবা মনে পড়ে, কীর্তনের মধ্যে তাকে টেনে নিয়েছিল— অলৌকিক জয়ধ্বনি বের করেছিল তার অবিশ্বাসী কণ্ঠ থেকে।

এখনও মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে গেলে অদূরে রমেন আছে ভেবে ঘুম-গলায় ললিত ডাকে, রমেন! উত্তর পায় না। মাঝরাতে তাই হঠাৎ এক শূন্যতা ভূতের মতো শিয়রের জানালা জুড়ে দাঁড়ায়।

রমেনের সঙ্গে আর দেখা হবে কি তার? সময়মতো রমেন যদি না ফেরে? মরার সময়ে রমেন যদি কাছে থাকে তবে বোধ হয় ললিতের তেমন কষ্ট হবে না।

বিজয়া দশমীর দশ দিন বাদে একদিন শাশ্বতী এল মাকে বিজয়ার প্রণাম করতে।

প্রণাম করে উঠে হাসিমুখে বলল, বড় দেরি করে এলাম।

সতেজ, সুন্দর হাসিটি। ঝকঝকে দাঁতে সকালের রোদ আর পেয়ারাপাতার সবুজ আভা চিকমিক করে গেল।

ললিতকে ইচ্ছে করেই একটু উপেক্ষার ভান করে শাশ্বতী। 'কেমন আছেন! শরীর ভাল তো!' এ রকম দু'টি-একটি মামুলি প্রশ্ন করে সোজা চলে গেল রান্নাঘরের দরজায়। মা'র সঙ্গে বসে গল্প করল অনেকক্ষণ।

চলে যাওয়ার সময়ে ললিত তাকে এগিয়ে দিতে সঙ্গ নেয়। আর তখন দু'জনেরই বড় লজ্জা করতে থাকে। শাশ্বতী রমেনকে বলেছিল, সে যেন ললিতকে বলে যে, শাশ্বতী তাকে ভালবাসে। রমেন সে-কথা বলে গেছে। তাই তারা বড় লজ্জা পায়। রমেন বলে গেছে, কিন্তু তারা কেউ পরস্পর পরস্পরকে সে-কথা বলে না।

শাশ্বতী মুখ তুলে প্রশ্ন করে, আপনার সেই সন্ন্যাসী বন্ধু—তিনি কোথায়?

কী জানি!

রমেন বলেছিল, ক্যান্সারের ওষুধ জানে। সে-কথা বিশ্বাস হয় শাশ্বতীর। ক্যান্সারের ওষুধ এখনও বাজারে বেরোয়নি। তা বলে কি নেই? কেউ না কেউ ঠিক জানে। লুকিয়ে রেখেছে। বলছে না। শাশ্বতী এও জানে যে, রমেনই সেই লোক। ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন। সময় হলে ঠিক মুহূর্তে সে এসে দেখা দেবে আবার। ভোজবিদ্যার মতো আরোগ্য দান করবে ললিতকে। এ-কথা মুখে বলে না শাশ্বতী। কিন্তু অন্তরের গভীরে সে বিশ্বাস করে। ভীষণ বিশ্বাস করে।

## ॥ একচল্লিশ ॥

কালীপুজোর রাত্রে খুব অদ্ভুতভাবে মারা গেল বিভু। পাড়ার পুজো। বিকেলে প্রতিমা আনার সময়ে তাদের লরির ধাক্কায় বোসপাড়ার মণ্ডপের একটা স্টিকলাইট ভেঙেছিল। সেইজন্য বোসপাড়ার ছেলেরা আটকে রেখেছিল প্রতিমাসুদ্ধ তাদের লরি। লাইটের দাম না দিলে তারা প্রতিমা ছাড়বে না।

কয়েকটা ছেলে দৌড়ে এসে এ-খবর পাড়ায় রটিয়ে দেয়। শুনে ভীষণ খেপে গিয়েছিল বিভু। বিভু মাস্তান। বস্তুত শহিদ বা সৈন্য কোনওটাই হওয়া যায়নি বলে তার ক্ষোভ নানা দিকে ফেটে বেরোচ্ছিল। তাই সকলের আগে দৌড় দিয়েছিল সে। বোসপাড়ায় যাওয়ার ঘুরপথ একটা আছে। সে-রাস্তায় বিভু যায়নি। সে গিয়েছিল দলবল নিয়ে। মহীনের খাটাল পার হয়ে বস্তি, নালা, মাঠ পেরিয়ে। বোমবাজি আর ছোরার ঝিলিকে বোসপাড়া ম্লান হয়ে গিয়েছিল। খাঁ খাঁ করছিল ওদের মণ্ডপ। আলোজ্বালা শূন্য মণ্ডপে ওদের অসহায় কালী, খাঁড়া তুলে বিভুর মাস্তানি দেখছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট তারা দখল করে রইল মণ্ডপ। বোসপাড়ার ছেলেরা ছাদ কিংবা অলি-গলি থেকে কয়েকটা ইট পাটকেল ছুড়ল মাত্র। ওদের ছ'জনকে মাটি নেওয়াল বিভু আর তার দল। বাদবাকিরা পালাল।

ফেরার পথে বিভু রাস্তার আলোর বালব ভাঙতে ভাঙতে এল। তার কচি শাকরেদরা এ-ব্যাপারে নিখুঁত পরিপাটি হাতের কাজ দেখাচ্ছিল। গোটা পাড়া অন্ধকার করে দিয়ে ফাঁকা নিরাপদ কয়েকটা পটকা ফাটিয়েছিল তারা।

অন্ধকারেই ঘটল ঘটনাটা। নিজেদের পাড়ার সীমানায়। অনেক রাতে মণ্ডপের পিছনেই সেই রাতে চমৎকার ভোজ রান্না হচ্ছিল। মাংস আর ভাত। ঝুড়ি ভরতি ছিল বাংলা মদের বোতল। বিভু রাত বারোটার পর খিদে বাড়াতে দু'টো বোতল তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল মণ্ডপ ছাড়িয়ে মহীনের খাটালের পাশে বস্তিতে ঢুকবার কাঁচা রাস্তার ধারে— যেখানে একটা নতুন বাড়ি উঠছে। বাঁশের ভারার শেষ ধাপটাতে বসে শান্তভাবে বিভু খাচ্ছিল। নেশা হয়েছিল খুব। দাঁড়িয়ে উঠে সে একটা হাঁক ছেড়েছিল। রুস্তমি হাঁক।

ভয়ে কেঁপে কুঁকড়ে আরও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল পাড়া।

তারপর সামান্য টলোমলো পায়ে মণ্ডপের দিকে ফিরছিল বিভু।

সামনে রহস্যময় একটা আলো-আঁধারি, দূরে ধূ ধূ করে জ্বলে মণ্ডপের আলো। মাইক্রোফোনে বাজছে হিন্দি গান।

ঠিক এ সময়েই অন্ধকার থেকে একটা বাচ্চা ছেলেকে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে দেখেছিল বিভু। সে সতর্ক হয়নি। হওয়ার কারণও ছিল না। আজ কত ছেলে রাত জেগেছে।

ছেলেটা মুখোমুখি ঠিক ছায়ার মতো এগিয়ে এল। তাব ডান হাত পকেটে। তারপরই পকেট থেকে হাতটা বেরিয়ে এল। বিভু কেবল দেখতে পেয়েছিল হাতখানা একটু পিছিয়ে নিয়ে তারপর সামনের দিকে জোর চালাল ছেলেটা। খুব নিখুঁতভাবে নয় অবশ্য। কচি হাতে তেমন জোরও ছিল না।

তবু তখনই বিভু টের পেয়েছিল তার পেটের ভিতর পর্যন্ত ঠান্ডা অবশ করা কঠিন অনুভূতি। প্রথমে ব্যথা লাগে না। ছেলেটা কুঁজো হয়ে তার পেটের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছোরাটা টানার চেষ্টা করল। কিন্তু টেরিলিনের শার্টটা আর ভিতরের গেঞ্জিতে আটকে ছিল বলে ছোরাটা খুব বেশি দূর গেল না। ছেলেটা ছোরার হাতলে জড়ানো রুমালটা দ্রুত খুলে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তখন বিভু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল তার পেটের ওপর আলো-আঁধারিতে একটা ছোরার হাতল। খুবই আনাড়ি হাতের কাজ। তবু এও যথেষ্ট।

'আঁঃক' করে একটা শব্দ তুলেছিল বিভু। হাঁটু ভেঙে সামনে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছিল। তারপর মুহূর্তে নিজের সর্বনাশ বুঝতে পেরে কয়েক পা প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে সে চিৎকার করেছিল— বি...শু...

যখন তার শরীর নিয়ে হইরই করছে ছেলেরা, অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তার ডাকতে ছুটছে তখন বিভু চোখ বুজে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। বেলা শেষের পড়ন্ত আলোয় চষা খেতের ও-পারে লম্বা একটা লাঠি উঁচু করে ধরে একজন মুসলমান লোক তাকে চেঁচিয়ে বলছে—ভাই রে...এ, তুই এঁকে বেঁকে ছোট, এঁকে বেঁকে ছোট...

বস্তুত মৃত্যুর সময়টা বেশ উপভোগই করেছিল বিভু। শেষ পর্যন্ত তার কোনও দুঃখ ছিল না। যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল ততক্ষণ সে জিজ্ঞেসও করেনি, কে তাকে মেরেছে।

পাড়ার ছেলেদের সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে পুলিশ গিয়ে রাত্রে বোসপাড়ার কয়েকটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিভু-হত্যা-মামলার কোনও কিনারা হয়নি।

কালীপুজোর রাত্রেই খুব জ্বর এসেছিল টুপুর। অন্তত টুপুর তাই মনে হয়। যেদিন সে যে ভয়ংকর কাজটা করেছিল, তারপর অন্ধকারে অনেকটা দৌড়েছিল সে। যদিও এ-পাড়া তার শিশুবয়স থেকে চেনা, তবু সে দিক ঠিক করতে পারছিল না। তার আবছা মনে পড়ে সে বস্তির বাইরের কাঁচা নর্দমা পেরোতে গিয়ে একটা আছাড় খায়। কোনও ব্যথা টের পায়নি, তারপর খাটালের পাশের নাবাল মাঠটা পার হয়। কারও বাগানের বাঁশের কঞ্চির বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে আবার পড়ে যায়। এমন প্রাণভয় সে আগে কখনও বোধ করেনি। বাগানের বেড়ার শব্দ শুনে কুপি হাতে একটা বুড়ো লোক মাঠকোটা বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেই কুপির আলোতেই টুপু বাগানের এক কোণে কয়েকটা কলাগাছের ঝোপ দেখতে পেয়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে, তারপর বেড়া টপকে সে যখন ঠান্ডা, ভেজা-ভেজা সেই কলাঝোপের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল, তখনই টের পেল, তার সমস্ত শরীর হি-হি করে কাঁপছে, গলা শুকনো, বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ। হয়তো সেই সময়ে কিছুক্ষণ তার চেতনাও ছিল না। আবার আধচেতনার মধ্যে সে টের পেল, তাকে প্রবল মশা খুবলে খাচ্ছে, পায়ের পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেঁচো, কানের কাছে ঝিঁঝি ডাকছে। তার বড় ভূতের ভয়। তবু সেই অন্ধকারে, বাগানের ঝোপঝাড় দেখেও তার ভূতের কথা মনে পড়েনি। কেবল প্রবল জ্বর আর শীতের ঠকঠকানি টের পেয়েছিল সে।

চারি দিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ টের পেয়ে অনেক রাতে কলাঝোপ থেকে বেরিয়ে জ্বর গায়ে বাসায় ফিরল সে। মা জেগে বসে ছিল, বাবাও ঘর-বার করছেন দেরি দেখে। তাঁরা কেউ কিছু বলার আগে সে কোনওক্রমে বলল, আমার বড় জ্বর হয়েছে। আমি শোব।

দেখি। বলে মা গায়ে হাত দিতেই সে ভীষণ চমকে উঠেছিল। তখনও তার প্রতিটি রোমকূপ শিউরে কাঁটা দিয়ে আছে।

সারা রাত তার মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙল। সে এ-পাশ ও-পাশ করে ভাবল, বড় আনাড়ির মতো কাজ হয়েছে। ওই ছুরিটা! ওটা তার বন্ধুরা দেখেছে। এখন যদি তারা বলে দেয় ওটা টুপুর ছুরি! রুমাল দিয়ে হাতের ছাপ এড়িয়েছে সে, কিন্তু ছুরিটা যে অনেকেই চেনে। তা ছাড়া, বিভু যদি না মরে গিয়ে থাকে! নিশ্চয়ই তাকে চিনেছে বিভু। যদি কাল-পরশু এসে তাকে ধরে! কিংবা মরার আগে যদি পুলিশের কাছে এজাহার দিয়ে যায়!

ভয়ে উঠে বসেছে টুপু। মাকে ডেকে বলেছে, জল দাও।

আবার শুয়েছে। আবার উঠে ডেকেছে মাকে, আমি পেচ্ছাপ করতে যাব। আলোটা জ্বেলে দাও।

সকাল হতেই প্রবল ভয় তার কণ্ঠা পর্যন্ত হয়ে এল। এবার! এবার কিছু একটা হবে। সে যত ভাবে ততই তার নিজের ভুলগুলো চোখে পড়ে। দেয়ালির রাতে অনেক লোক জেগে ছিল। তাদের কেউ কি টুপুকে ছুটতে দেখেছে! যদিও তখন বেশি রাতে সব বাড়িতেই প্রদীপের আলো নিভে গেছে, তার ওপর ছিল অমাবস্যা— তবু দেখে থাকা অসম্ভব নয়।

সে বাড়ি থেকে বেরোল না। বলল, জ্বর হয়েছে। কিন্তু তার মা আর বাবা তার গায়ে হাত দিয়ে কিছুই টের পেল না। তারা চুপ করে রইল। ও দিকে পাড়ায় প্রবল উত্তেজনা। কারা এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে গেল। কাঠ হয়ে পড়ে রইল টুপু।

বাবা ফিরে এসে হঠাৎ খুব খুশিমুখে মাকে বলল, ওই যে বিভুটা—ওটাকে কাল বোসপাড়ার কোনও ছেলে স্ট্যাব করেছিল। রাত্রেই মারা গেছে।

কয়েক দিন ধরে আস্তে আস্তে টুপু বুঝতে পারল, কেউ তাকে সন্দেহ করছে না। তবু অস্বস্তি বোধ করত সে। খাওয়া হত না, ঘুম হত না। রাস্তায় বা বাড়িতে কেউ তার দিকে তাকালে সে বড় চমকে উঠত।

মাঝখানে সে দিনকতক বেড়িয়ে এল মৃদুলার কাছ থেকে। সেই বেড়ানোটা ভালই লেগেছিল তার।

এ-বছর পরীক্ষা হয়ে গেলে সামনের বছর থেকে তাকে পলাশপুরেই ভরতি করা হবে হয়তো। তাই যেন হয়। বেহালায় সম্ভবত আর থাকতে পারবে না টুপু।

কিন্তু আবার আস্তে আস্তে তার মন্য অন্য দিকে ফিরছে এখন। সে বুঝে গেছে বিভুর মৃত্যুর জন্য বোসপাড়ার ছেলেদেরই সন্দেহ করছে পুলিশ। বোসপাড়ার মারপিট লেগেই আছে। ভদ্রলোকেরা নিষ্ফল নাগরিক কমিটি তৈরি করে শান্তিরক্ষার কথা ভেবে আরও বুড়ো আর অথর্ব হয়ে যাচ্ছে।

বাবাকে আজকাল একটু সজীব দেখায়। এখন বাবা খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকাল ন'টার রোদে পাড়ার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলে। নিশ্চিন্ত মনে হাঁটাচলা করে রাস্তায়। বাবাকে আজকাল আর তেমন বুড়ো দেখায় না।

মাঝে মাঝে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে টুপু। দেখে অবাক হয়। তার মুখের মেয়েলি কচি ভাবটা সে আর খুঁজে পায় না।

বড় হয়ে সে কী হবে, এ-কথা ভাবতে গেলে আজকাল সে বিভুর কথাই ভাবে। তবে সে হয়তো বিভুর মতো অসতর্ক আর বোকা হবে না। সে যদি হয় তবে হবে আরও বুদ্ধিমান এক মাস্তান।

পিতুর মর্নিং স্কুল শেষ হয় প্রায় এগারোটায়। সে সময়ে পিতুর সঙ্গিনীরা প্রায়ই দেখতে পায় স্কুলের সামনেই বড় রাস্তায় একটা সাইড-কার সমেত লাল মোটর সাইকেল থেমে আছে। কালো কিন্তু স্বাস্থ্যবান চেহারার সার্জেন্ট লোকটা চোখে গগলস এঁটে বসে থাকে। মেয়েরা হাসে। পিতুকে ঠাট্টা করে বলে, চিলা চিভা চির?

পিতু একটু রাঙা হয়। কিন্তু গর্বে অহংকারে ময়ূরের মতো পেখম ধরে সে মনে মনে।

শম্ভু আজকাল আর ব্যায়াম করে না। এবার "দক্ষিণ কলকাতাশ্রী" কম্পিটিশনেও সে নাম দেয়নি। আসলে পিতুরই ব্যাপারটা পছন্দ নয়। সে কয়েক বারই বলেছে, শরীরে সাপের মতো মাংস কিলবিল করে—মাগো! ঘেন্না করে আমার। সেই থেকে শম্ভুরও বীতরাগ এসেছে ব্যায়ামে।

প্রথম চাকরি। তাই ভয় করে। নইলে পিতুকে সে মোটর-সাইকেলে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিত। এখন শুধু গলিতে-ঘুঁজিতে একটু আধটু চক্কর দেয়। এগিয়ে দেয় বাস-স্টপ পর্যন্ত। তারপর বিমর্ষ মনে কোনও এক রাস্তার মোড়ে একা একঘেয়ে গাড়ি-ঘোড়া সামলানোর কাজ করে।

কিন্তু পিতুর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হতে থাকে।

মাস দুয়েকের মধ্যেই আকাশের শেষ অংশটুকু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল বিমানের মাথা থেকে। চিন্তাশক্তি ফিরে এল। এখন তাকে হাসপাতালের দালানের বাইরে যেতে দেওয়া হয়। সে মাঝে মাঝে বাগানে চলে আসে। চমৎকার বাগান। ভেজা মাটির গন্ধে বুক ভরে যায়। সে পপি আর চন্দ্রমল্লিকার সারির ভিতর দিয়ে ঘোরে। মালীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলে।

অপর্ণার প্রকাণ্ড গাড়িটা এসে প্রায় রোজই ফুলগাছগুলোর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। অপর্ণার সঙ্গে বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলে বিমান। আকাশের নীচে। চার দিকে ফুলের আলোর মধ্যে। কত কথা হয়।

আর কিছুদিন মাত্র তাকে রাখা হবে এইখানে। অবজার্ভেশনের জন্য। তারপর বিমানের ছুটি। তখন তারা দু'জনে এক অদ্ভুত স্বর্গ রচনা করবে—এই কথা ভাবে অপর্ণা।

অপর্ণা মাঝে মাঝে রমেন নামে সেই লোকটির প্রতি বড় কৃতজ্ঞতা বোধ করে। এক দিন নিভৃতে মোটর গাড়িতে বসে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সেই মানুষের কথা যে নিরন্তব সততায় অপর্ণাকে রক্ষা করবে। আছে কি তেমন মানুষ! সাধু-সন্ন্যাসীর মতো সেই লোকটা বলেছিল, আছে। বিমান। সেই যে চমকে গিয়েছিল অপর্ণা, তারপর আজও সে সেই সত্য কথাটা ভুলতে পারে না। সত্য যে, বিমান ছাড়া আর কেউ নেই তার।

অপর্ণা রোজ আসে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে। এক দিন এক শীতের বিকেলে অপর্ণা তার প্রকাণ্ড গাড়িখানা নিয়ে হাসপাতাল থেকে তুলে নিল বিমানকে। বলল, আমরা কিন্তু নতুন জায়গায় যাচ্ছি। তুমি আপত্তি করতে পারবে না।

না, বিমান আপত্তি করল না। ছেলেবেলা থেকে সে কখনও সুখের মুখ দেখেনি। সুখকে গ্রাহ্যও করেনি। কিন্তু এখন সে টাকার শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে ভয় পায়। তার পুরনো ব্যাধি সেরে গেছে।

যেদিন সে দু'জন ছিনতাইবাজের হাত থেকে নিজের ঘড়ি আর মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেদিন থেকেই বস্তুত তার এই ব্যাধির সূত্রপাত হয়েছিল। এখন সেই সব পাগলাটে ইচ্ছে তার আর হয় না। অপর্ণার পাঠানো নানা মহার্ঘ ফল ও খাবার, দামি ওষুধ এ-সবের ফলে ব্যাধি সেরে তার শরীর এখন মোটাসোটা, উজ্জ্বল গায়ের রং, মাথার চুল সুবিন্যস্ত, গায়ে ভাল জাতের জামা প্যান্ট। তবে, তাকে কেমন একটু ভিতু, সুখী আর লাজুক দেখায়। তার মাঝে মাঝে মনে হয় সে বোধ হয় আর ইচ্ছে করলেও মাথার ভিতরে আকাশটাকে টের পাবে না। আকাশ চিরকালের জন্য মাথার ওপরে—অনেক ওপরে, সরে গেছে।

মোটর গাড়ির এক কোণে গভীর গদির মধ্যে ডুবে থেকে সে বিকেলের স্নিগ্ধ, নীল সুন্দর আকাশের দিকে নিস্পৃহভাবে একটু চেয়ে দেখল।

চোখ ফিরিয়ে দেখল আকাশি নীল শাড়ি পরেছে অপর্ণা। সামনের দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে। কয়েক বারই জিজ্ঞেস করেছে বিমান, কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে। অপর্ণা তার উত্তর দেয়নি। কেবল রহস্যময়ভাবে হেসেছে।

এখন আর জিজ্ঞেস করছিল না বিমান। যেখানেই হোক, খুব সুন্দর ভাল জায়গাতেই তাকে নিয়ে যাবে অপর্ণা, এ-কথা বিমান জানে। তারপর সেখানেই সে আর অপর্ণা থাকবে সুখে, চিরকাল, যত দিন না অমোঘ বিচ্ছেদগুলি আসে। কিন্তু এখন বিমান কেবল এটুকুই দেখতে পায় যে, অপর্ণার শাড়িখানার আকাশি নীল রংটা বড় সুন্দর। এ-রং অপর্ণাকে মানায়।

আশ্চর্য এই যে, ডাক্তারেরা কত জাদু জানে। কত ভোজবিদ্যা লুকোনো আছে ভাল ওষুধ আর পুষ্টিকর খাবারে। এখন আর কিছুতেই একটা অন্ধকার পৃথিবীর কথা ভাবা যায় না, যে-পৃথিবীতে জন্মান্ধ মানুষেরা হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজছে।

অপর্ণা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। আস্তে করে বলল, তোমার মাথার আসলে কোনও গোলমাল ছিলই না, ডাক্তার বলেছে।

কী বলেছে?

বলেছে অপুষ্টি এবং বেশি চিন্তা-ভাবনা থেকে তোমার ও-রকম হয়েছিল। ওটা কিছু না। তুমি একদম সেরে গেছ।

বিমান সেটা টেব পায়। কতক জিনিস আছে যা টের পেতে ভুল হয় না।

অপর্ণা বলল, বাবা রাজি হয়েছেন।

কীসে?

লাজুক হেসে মুখ নামাল অপর্ণা, বলল, তুমি একটুও আমার কথা ভাবো না। ভাবলে বুঝতে পারতে।

বিমান বুঝতে পেরে যায়। সামান্য একটু সুখ এবং দুঃখ সে যুগপৎ বোধ করে। হ্যাঁ, বোধ হয় এখন সে অপর্ণাকে ভালবাসে। এতকাল সেই ভালবাসা সে বুঝতে পারত না।

বুঝতে পেরে নিজেও লাজুক হাসল বিমান, বলল, রাজি হলেন? কী করে!

বাঃ! আমি বাবার এক মেয়ে না! একটাই তো সন্তান আমি! আমার ইচ্ছে না রেখে কি বাবা পারে!

বিমান চুপ করে থাকে।

একটু ইতস্তত করে অপর্ণা বলে, কিন্তু এরপর থেকে তোমাকে ওই বিদঘুটে চাকরি ছেড়ে আমাদের কারখানা-টারখানার ভার নিতে হবে। তুমি আর আমি দু'জনে মিলে চালিয়ে নেব, কী বলো?

বিমান ঘাড় নাড়ে। এখন আর কোনও কাজই তার শক্ত বলে মনে হয় না।

হিন্দুস্থান পার্কে অপর্ণাদের বাড়ির অদূরে একটা সাদা সুন্দর ছোট বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সদ্য রং করা বাড়ি, এখনও এধারে ওধারে কাজ চলছে। অপর্ণা বলল, এটা আমাদেরই একটা বাড়ি। এত দিন ভাড়াটে ছিল।

তারা গেল কোথায়?

তাদের তুলে দেওয়া হল। পুরনো ভাড়াটে কম টাকা দিত। তা ছাড়া ওদের অবস্থাও পড়ে গিয়েছিল।

কী করে তুললে—মামলা করে?

অপর্ণা মাথা নাড়ল, না। তাতে অনেক সময় লাগত। আমরা ওদের কিছু নগদ টাকা দিয়েছি। ঘুষ।

বলে মাথা নিচু করল অপর্ণা। বিমানের সামনে হয়তো এটুকু ওর অপরাধবোধ।

কিন্তু তার দরকার ছিল না। কবিতার আর দর্শনের বই কেনার জন্য বিমানও ঘুষ নিত জমাদারদের কাছ থেকে। মাথা পিছু দশ পয়সা।

মিস্ত্রিদের কাজের তদারক করতে করতে ধুলোবালি আর চুনের গুঁড়ো লাগা চেহারার উঁচু করে পরা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা অপর্ণার বাবা সদরের সামনে এসে গম্ভীর মুখে ওদের সামনে দাঁড়ালেন।

বিনা দ্বিধায় বিমান এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

যত দূর গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাঁকে তিনি আসলে তত দূর গম্ভীর ছিলেন না। তিনি বিমানের মুখে কী একটু খুঁজে দেখলেন। তাঁর হিসেবি চোখ কিছু একটা খুঁজে পেল। পরমুহূর্তেই বিমানের কাঁধে একখানা হাত রেখে বললেন, এই বাড়ি তোমার।

তারপর একটু থেমে বললেন, শুধু এই বাড়ি কেন, ক্রমে ক্রমে আমার যা আছে সবই তোমার হবে। সব দেখেশুনে নিয়ো।

এই কথা শুনে একটু কুঁকড়ে গেল বিমান। কেন কুঁকড়ে গেল তা সে বুঝতে পারল না তক্ষুনি। কিন্তু অস্বচ্ছভাবে তা হল, কোনও দিনই আর তার দ্বারা কোনও মহান মানুষের জন্ম হবে না।

এক রবিবারের সকালে রিনি আর পিকলুকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে এল সঞ্জয়। ললিতের মাকে ডেকে বলল, চলুন মাসিমা, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, আর যেখানে যেখানে যেতে চান, সব ঘুরিয়ে আনি। সারা দিনের প্রোগ্রাম।

সঞ্জয় ললিতের মুখের দিকে ভাল করে তাকাল না। লজ্জা পাচ্ছিল বোধ হয়। মা বেরোবার জন্য গোছগাছ করতে রান্নাঘরে গেল, সঙ্গে রিনি। পিকলু ললিতের কোলে বসে দুই স্বাস্থ্যবান হাতে তার মুখে থাবা দিচ্ছিল। সেই সময়ে সিগারেট ধরিয়ে সঞ্জয় জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। ললিত মনে মনে হাসে! ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় সঞ্জয়কে। বলে, ইডিয়েট, তোর লজ্জা করে না? সব পেয়েও ফাউ-এর জন্য হাত বাড়াস, ভিখিরি হ্যাংলা কোথাকার!

কিন্তু কিছু বলে না ললিত। অনেক পুরনো একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় বলে নিজেকে দুর্বল লাগে। বহুকাল আগে— তখনও সঞ্জয় ম্যাকগুইয়ের অ্যান্ড কোম্পানির অফিসার—সে-সময়ে সার্কুলার রোডের একটা বিশাল ফ্ল্যাটবাড়িতে একটি মেয়ের কাছে মাঝে মধ্যে যেত সঞ্জয়। বাইরে থেকে বোঝা যায় না— নিখুঁত সম্পন্ন গৃহস্থের মতো সাজানো ড্রয়িং রুম, আলমারিতে রবিঠাকুরের বই, দেয়ালে সুন্দর ছবি— অথচ সেটা প্রকৃতপক্ষে এক বেশ্যার আস্তানা। জোর করে সেখানে এক বার সঞ্জয় টেনে নিয়ে গিয়েছিল ললিতকে। ললিত সেই সুন্দর ঘর দেখে অবাক হয়েছিল। মেয়েটিও কুণ্ঠিত ছিল না— ছিপছিপে শরীর, টানা চোখ, কথাবার্তা শিক্ষিতার মতোই। মেয়েটি গিটারে তাদের রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়েছিল। ললিতের মাথা ঘুরে গিয়েছিল অল্প। তারপর কী হয়েছিল তা ললিত ইচ্ছে করেই মনে না-করার চেষ্টা করে। কিন্তু উঠে গিয়ে সঞ্জয়ের চুলের মুঠি ধরার মতো জোর আর সে পায় না। ওই এক বার—মাত্র এক বার—একটি নীতিবোধহীনতার ঘটনা তাকে সারা জীবন সঞ্জয়ের কাছে দুর্বল করে দিল কি? আশ্চর্য! অতীতের স্খলন, পতন কিংবা দুর্বলতাগুলির স্মৃতিকে জয় করতে না পারলে মানুষ কি আর কোনও দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না!

ললিত পিকলুর পেটের মধ্যে মুখ গুঁজে তার শিশুদেহের গন্ধে আর-এক বার সেই অতীতের ঘটনাটি ভুলবার চেষ্টা করল।

ওরা চলে গেলে একা একা ঘর পাহারা দিচ্ছিল ললিত। এক ডাঁই পরীক্ষার খাতা খুলে বসে। পুজোর পর থেকেই আবার স্কুলে যাচ্ছে সে। নিয়মিত। এক দিনও কামাই করেনি। একসময়ে সে ছাত্রদের পড়া ফেলে রাখত। টাস্ক দিয়ে বসিয়ে রাখত চুপচাপ। পরে টাস্ক দেখত না। ফলে ছাত্রদের পড়া পড়ত বাকি। সে-সব এখন আর করে না সে। খুব মন দিয়ে পড়ায়। আজকাল সে কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা

করে। স্কুল ম্যাগাজিনটার ভার ইচ্ছে করেই সে নিয়েছে এবার, সামনের সেশনে সে একটা ডিবেটিং ক্লাবও খুলবে।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে ললিত দেখে দেশলাই ফুরিয়েছে। মোড় থেকে কিনে আনবে বলে গায়ে জামা দিয়ে বেরোল ললিত। গলিটা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই সে আপাদমস্তক বিদ্যুৎপ্রবাহে কেঁপে উঠল। দেখল, শাশ্বতী আসছে।

মাঝে মাঝেই আসে শাশ্বতী। মায়ের সঙ্গে গল্প করে যায়। কখনও বা স্কুলে ফোন করে ললিতের শরীরের খবর নেয়। তাই, শাশ্বতীর আসাটা তেমন বিচিত্র নয়। কিন্তু আজ! একা ফাঁকা ঘরে শাশ্বতীকে নিয়ে যাবে ললিত! তারা বসবে মুখোমুখি! এই দুরন্ত নির্জন শীতের দুপুরে! কেবল সে আর শাশ্বতী!

গুড়গুড় করে ডেকে ওঠে বুকের ভিতরটা ললিতের। উৎকণ্ঠা, ভয়, উত্তেজনা চেপে রাখতে গিয়ে তার হাসিটা ক্লিষ্ট হয়ে যায়।

আসুন।

শাশ্বতী তার মায়াবী চোখ তুলে সুন্দর হাসে।

ললিত মুগ্ধ হয়।

আজ মা নেই কিন্তু।

কোথায় গেছেন? শাশ্বতী একটু ভ্রূ তোলে।

দক্ষিণেশ্বর, আরও কোথায় কোথায় যাবে। আমার এক বন্ধু গাড়ি করে নিয়ে গেছে।

শাশ্বতী তবু এগিয়েই আসে। ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, কোথায় বেরোনো হচ্ছিল দুপুরে?

ললিত হাসে, দেশলাই নেই। আনতে যাচ্ছিলাম।

শাশ্বতী আবার ভ্রূ কোঁচকায়, সিগারেট খাওয়া কিন্তু বড্ড বেড়েছে। এতটা ভাল নয়।

সেই কাঁপা বুক, ক্লিষ্ট মুখখানা, অস্বস্তি নিয়ে শাশ্বতীকে ঘরে আনে ললিত। সদর দরজাটা হাট করে খুলে রাখে।

বসুন।

কালোর জমির ওপর হলুদ এমব্রয়ডারি করা একখানা রোব ছিল শাশ্বতীর গায়ে। সেখানা খুলে রেখে শাশ্বতী বলে, এতটা হেঁটে এসে গরম লাগছে।

আশ্চর্যের বিষয়, শাশ্বতীর হাবভাবে এতটুকু জড়তা নেই। ওর কি বোধশক্তি কম! ও কি বুঝতে পারছে না যে ললিতের সঙ্গে এই ভয়ংকর দুপুরে ও একা! ঠিক যেন নিজের বাড়িতে এসেছে, এ-রকমই হাবভাব ওর।

কপালের ঘাম ছোট্ট রুমালে মুছে বলল, কী করছিলেন! ওমা, কত খাতা!

বলতে বলতে ললিতের কাছে উঠে এসে ঝুঁকে খাতাগুলো কৌতূহলে দেখে শাশ্বতী। বলে, ইস! কত ফেল করিয়েছেন! একটুও মায়া দয়া নেই আপনার।

ললিত কাঁপা বুক নিয়ে বসে থাকে। মেয়েরা কত নিঃসংকোচ হতে পারে। সেদিন মিতু এসেছিল; সেও কত নিঃসংকোচে কথা বলল। অত ঘটনার পর ললিত তো মরে গেলেও কোনও দিন কথা বলতে পারত না মিতুর সঙ্গে।

মায়ের বিছানায় পা তুলে, হাঁটু মুড়ে বসে শাশ্বতী মৃদু চিকমিকে হাসি হাসে। অনায়াসে চোখ রাখে ললিতের চোখে। বলে, অনেক হেঁটে এসেছি। একটু চা খাব।

শুনে ললিত উঠতে যাচ্ছিল।

ও কী! কোথায় চললেন?

দোকানে চা বলে আসি।

কেন! অবাক হয় শাশ্বতী, চা আমি নিজেই তৈরি করে খেতে পারব। রান্নাঘরে কোথায় কী আছে আমি তো সব জানি।

অসহায়ভাবে ললিত বসে। চেয়ে থাকে।

হয়তো শাশ্বতী কিছু বুঝতে পারে। মাথা নিচু করে নরম অভিমানী গলায় বলে, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?

ললিত ভীষণ লজ্জা পায়। লাল হয়ে কী একটু বলতে যায়। শাশ্বতী বাধা দিয়ে বলে, তা হলে আমি বরং চলে যাই।

কেমন যেন উদাসীন, অভিমানী, দুঃখী শোনাল ওর গলা। ললিতের অন্তর ককিয়ে ওঠে, না। যাবে কেন! গেলে আমি নিঃস্ব হয়ে যাব।

কিন্তু সে-কথা বলে না ললিত।

আচমকা তাকে আপাদমস্তক শিহরিত করে শাশ্বতী বলে, তুমি আমাকে অত ভয় পেয়ো না।

ললিত স্তব্ধ হয়ে নিজের রক্তের কলরোল শোনে।

দুরন্ত দুপুর বয়ে যায়।

কত ঘটনাই ঘটে যেতে থাকে পৃথিবীতে!

এক দিন অপর্ণা আর তার সঙ্গে ফরসাটে এবং মোটামুটি ভাল চেহারার একজন লোক এসে হাজির। তখন সকালবেলা। অপর্ণা লাজুক মুখে একটু হাসল। সঙ্গের লোকটিও। তারপর লোকটি বলল, আমাদের বিয়ে। নেমন্তন্ন করতে এলাম। যেয়ো। দোসরা ফাল্গুন।

ভীষণ অবাক হয়েছিল ললিত। রেগেও গিয়েছিল, অচেনা উটকো লোকটা তাকে 'তুমি' বলায়।

কিছুক্ষণ পরে ভুল ভাঙল। লোকটি যে বিমান— এ-কথা কে বিশ্বাস করবে? তার ইচ্ছে হয়েছিল বিমানের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, চোখের তারার গভীরে অনুসন্ধান করে দেখে এই সেই পুরনো বিমান কি না।

বিমানকে দেখে ডাক্তার আর হাসপাতালের ওপর ভক্তি বেড়ে গেল ললিতের। ভক্তি বাড়ল ওষুধের ওপর। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি সে কৃতজ্ঞতা বোধ করতে লাগল। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। হে ভগবান, মানুষকে আর-একটু শক্তি দাও। আমি মরার আগেই সে আবিষ্কার করুক ক্যান্সারের ওষুধ।

নেমন্তন্ন করতে এল আদিত্যও। খুব ব্যস্তসমস্ত আর উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

এসে এক গাল হাসল। অমলিন হাসি। সেই আদিত্য— যার গড়ানে মন— সেখানে কোনও জল দাঁড়ায় না। বলল, মাঘের পঁচিশে বিয়ে—বুঝলি! পাত্রী ঠিক করেছেন বাবা। তাকে আমি চোখেও দেখিনি। বাবা দেখার কথা বলেছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। দেখলুম, বাবার ইচ্ছেমতোই যখন চলব ঠিক করেছি, তখন আর নিজে দেখে কী হবে! নিজে তো আমি কিছুই করতে পারলুম না! জানি তো, সেই মেয়ে টাকার কাঁড়ি আর জিনিসপত্রের জঙ্গল নিয়ে আসছে। বনেদি ঘরের মেয়ে, যার গায়ে রোদ লাগেনি! কিন্তু সেজন্য আর দুঃখ নেই রে। আমি সব ভুলে গেছি। অতীতের সব।

বলে হাসল।

তারা দু'জন এসে বসল গণেশের চায়ের দোকানে। ললিত আর আদিত্য। সেদিনকার মতো বেঞ্চটাতে বসল দু'জন। কেবল মাঝখানে শাশ্বতী ছিল না। হয়তো তারা অনুভব করল সেটা, হয়তো করল না। কিন্তু গোপন এক অপরাধবোধে অস্বস্তি পেতে লাগল ললিত।

আদিত্য আস্তে আস্তে বলল, প্রকৃতি-টকৃতির মাঝখানে তিন মাস কাটিয়ে এলুম বুঝলি! একা থাকতুম একটা বাংলোয়। বাংলোর সামনেই একটা পিপুল গাছ— দুপুরে যখন হু হু করে গরম বাতাস বইত— তখন সেই গাছের ছায়ায় একটা চেয়ার নিয়ে বসতুম। বহুদূর পর্যন্ত ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যেত। জীবনে আমি এত দূর পর্যন্ত কমই দেখেছি। তাই নেশা লেগে যেত খুব। মাঝে মাঝে দেখতুম সামনের তিরতিরে নদীটা হেঁটে পার হয়ে বিকেলের দিকে দেহাতি লোকরা দূরের হাটে যাচ্ছে। সঙ্গ ধরতুম তাদের। কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে করত না। ফেরার কথা ভাবলেই মনে হত, সভ্য জগতে সম্পর্কগুলো বড় জটিল। ফিরলেই আবার সে বনেদি বাড়ির কমপ্লেকস চেপে ধরবে। চেপে ধরবে ব্যর্থতার সব বোধ, হতাশা। তার চেয়ে এখানেই থেকে যাই না কেন! এক-একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে বসতুম। কী নিস্তব্ধ লাগত চার দিক। কী উদাসী বৈরাগীর মতো দেখাত মাঠ ঘাট, নদী দূরের পাহাড়। মনে হত এরা আমাকে ভিক্ষা চাইছে। বলছে, দিয়ে দাও। নিজেকে দিয়ে দাও। অমনি রমেনের কথা মনে পড়ত। ইচ্ছে হত, চলে যাই। রমেনের মতো চলে যাই। এক দিন হয়তো তাঁকে খুঁজে পাব যে এক দিন রমেনকে নিশির ডাকের মতো ডেকে নিয়েছিল। লোলিটা, এক একদিন আমি চলেও

যেতাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে নদী পার হতাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম পাহাড়ের তলাকার জঙ্গল পর্যন্ত। সেইখানে গাছগাছালির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বিড় বিড় করে বলতাম, ফিরব না। ফিরব না। কিন্তু যেই সন্ধে হল—অন্ধকারে যখন সব ডুবে যাচ্ছে— অমনি ঘরের জন্য, আলোর জন্য, বিছানার জন্য কেমন অস্থির লাগত। কত বার ভাবতুম, আর মায়ের কাছে টাকা চাইব না, যে-ক'দিন এখানে আছি দেহাতি বস্তি কিংবা এর-ওর-তার কাছে ঘুরে ঘুরে চেয়ে-চিন্তে কাটিয়ে দিই— যেমন ফকির কি সন্ন্যাসীরা করে। কিন্তু হাতের টাকা ফুরিয়ে আসতেই কেমন ধকধক করত বুকের ভিতরটা। ভয় করত বড়। তাই মাকে আবার টাকা পাঠাতে লিখতুম। দ্যাখ, ফিরব না ফিরব না করেও আবার ফিরতে হল। ভালই হল—কী বলিস! সবাই কি আর রমেন হতে পারে!

হাসল আদিত্য।

যাস কিন্তু লোলিটা। পঁচিশে মাঘ— মনে থাকে যেন।

যাব। নিশ্চয়ই যাব।

লোলিটা, পুরনো কিছু মনে রাখিস না।

আদিত্য অস্থিরভাবে মাঘ মাসের প্রতীক্ষা করে আজকাল। রোজই নিমন্ত্রিতের তালিকায় একটু-দু'টি নতুন নাম যোগ করতে থাকে। তালিকা বড় হয় রোজ।

অনেক দিন বাদে নিশ্চিন্তে বাপের বাড়িতে এসেছে মৃদুলা। সঙ্গে তুলসী।

খ্রিস্টমাসের বন্ধটা তারা বেহালায় কাটাবে। খুশিতে ডগমগ করে মৃদুলা। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায় নিশ্চিন্তে। তাদের দুর্গ্রহ কেটে গেছে। একজনের মৃত্যু যে কত আনন্দদায়ক হতে পারে! বুকের চাপ হালকা করে দিতে পারে কতটা!

পলাশপুরে ফিরে যাওয়ার আগের দিন তুলসী দেখা করতে এলে তার মুখে চাপা আনন্দের আভা দেখে একটু অবাক হয় ললিত। বহুকাল ধরে সে তুলসীর এ-রকম তাজা, প্রাণময় মুখশ্রী দেখেনি।

বুঝলি রে, আমার একটা ফাঁড়া খুব জোর কেটে গেছে। বলে তুলসী। তারপর মৃদু মৃদু হাসতে থাকে আপনমনে। বস্তুত এবার বোধ হয় সে মৃদুলাকে পুরোপুরি পাবে। কোথাও আর মৃদুলার কোনও ভয়ংকর দাবিদাব নেই।

তুলসীর কাছেই শুনল ললিত, পলাশপুরে কয়েক দিন থেকে আবার কোথায় চলে গেছে রমেন। বলে গেছে, আসবে। কবে আসবে কে জানে! তুলসী ঠোঁট উলটে বলে, ও শালা নৌকো বাঁধে না।

সুবলকে আজকাল আর চেনা যায় না। যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে সুবলকে দেখতে পায় ললিত। হয় গণেশের দোকানের সিঁড়িতে, নয়তো রায়বাবুর শূন্য বারান্দায় বসে আছে। একা একা বিড়বিড় করছে। গালে দাড়ি, রুখু চুল, চোখ দু'টো অস্বাভাবিক চকচকে। কখনও তাকে ছেঁড়া পায়জামা আর ময়লা রঙিন শার্ট পরে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখা যায়। আ-ছাঁটা চুল বাবরি হয়ে নামছে ঘাড়ে।

দেখে ললিত বড় দুঃখ পায়। দেখা হলে সুবল সিগারেট চায়, নয়তো বলে, একটু চা খাওয়াবেন ললিতদা? আগে সুবল ললিতের সামনে সিগারেট লুকোত। কিন্তু সে-সব কথা মনে রাখে না ললিত। মাঝে মাঝে নিজেই ডেকে বলে, নে সুবল, সিগারেট খা। চা খাবি? আর কী খাবি বল!

সুবলের সারাটা দিনই প্রায় কাটে হিন্দুস্থান পার্কের রাস্তায় ঘুরে। দূর থেকে সে অপর্ণাদের বাড়িটাকে দেখে। দেখতে পায় বাড়িটাতে রং করা হচ্ছে। বাঁশের ভাড়ায় উঠে কাজ করছে মিস্ত্রিরা। ওরা অপর্ণার কত কাছে আছে— এই ভেবে সে হিংসা বোধ করে। একা একা বিড়বিড় করে কথা বলে সে, মাঝে মাঝে তার মাথার মধ্যে এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণা হয়।

অপর্ণাদের প্রকাণ্ড গাড়িটা তার গা ঘেঁষে রাজহাঁসের মতো মাঝে মাঝে চলে যায়। সুবল দেখে, অপর্ণাদের বাড়িতে অনেক জিনিসপত্র কিনে আনা হচ্ছে। আনাগোনা করছে বহু লোকজন।

কী হবে এ-বাড়িতে? কোন উৎসব?

সুবল তা কিছুতেই ভেবে পায় না।

যাবে। দু'জনের বিয়েতেই যাবে ললিত। সুন্দর উপহার দিয়ে আসবে। জানিয়ে আসবে সত্যিকারের শুভকামনা।

ঘুরে-ফিরে শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা হয়। রোজই। যেমন সাধ ছিল ললিতের, ঠিক তেমনি সন্ধেবেলার কলকাতার রাস্তায়, দোকানের আলোতে তারা পাশাপাশি হাঁটে। কখনও বা চুপচাপ বসে থাকে পাশাপাশি। এখন তারা পরস্পর কম কথা বলে। পৃথিবীতে আর কেউ তেমন করে টের পায় কি না কে জানে, তবে তারা যখন পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, তখন স্পষ্টই টের পায়, সময় বয়ে যাচ্ছে। সময় বয়ে যাওয়ার কোনও শব্দ নেই, তবু তারা এক রকমের অদ্ভুত শব্দও বোধ করে। সেই টিপ টিপ শব্দ তাদের নিস্তব্ধতাকে ভয়াবহ করে তোলে।

মাঝে মাঝে শাশ্বতী রমেনের কথা জিজ্ঞেস করে, উনি কোথায় গেলেন? ফিরবেন না?

কে জানে! ঠোঁট ওলটায় ললিত।

মৃত্যুর কথা ভাবলেই পৃথিবীর প্রতি মায়া-দয়া বেড়ে যায়। অন্তরে অন্তরে ললিত মানুষের প্রতি জীবজগৎ ও গাছপালার প্রতি এক দুর্বোধ্য ভালবাসাকে অনুভব করে। এ রকম ভালবাসা সে কখনও টের পায়নি। একদিন সে যখন মানুষের মুক্তির কথা বলত, বিপ্লবের রাস্তা তৈরি করতে ব্যস্ত থাকত— তখনও না। তার মরে যেতে ইচ্ছে হয় না। সে ভাবে, এ-পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সে একটা কিছু করে যাবে। খুব শিগগিরই করবে। মরে যাওয়ার আগেই।

কিন্তু মরেই কি যাবে ললিত! মাঝে মাঝে এর উত্তর সে খোঁজে শাশ্বতীর মুখে। শাশ্বতী সুন্দর হাসে। নিশ্চিন্ত মুখখানা। যেন সে নিশ্চিত বুঝে গেছে যে ললিত বেঁচে থাকবে—অসুখ সেরে যাবে।

মাঝে মাঝে সে মায়ের দিকেও চেয়ে থাকে। কাঠকুড়ুনির মতো কোলকুঁজো মা ঘরের কাজ সারছে। খুটখুট করে ইঁদুরের মতো শব্দ করছে ঘরময়।

কেমন ছিল মায়ের সেই বয়সের চেহারা যখন ললিত ছিল তার কোলে?

কে জানে! ললিতের কেবল ইচ্ছে করে আর-এক বার শিশু হয়ে এই মায়ের কোলে ফিরে আসতে। মাকে আরও কত ভালবাসার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু আচমকা ফুরিয়ে গেল বেলা।

রমেনের সঙ্গে আর দেখা হবে কি তার? সময়মতো রমেন যদি না ফেরে! মরার সময়ে রমেন যদি কাছে থাকে তবে বোধ হয় ললিতের তেমন কোনও কষ্ট হবে না। রমেন তার সুন্দর, শান্ত মুখখানা মুখের কাছে এনে বলবে, আবার আমাদের দেখা হবে ললিত, আবার আমাদের দেখা হবে। সেই গভীর বিশ্বাসের কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ললিতের মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে যাবে আনন্দে।

আসবে কি রমেন? মনে মনে অস্থির হয় ললিত। আকুল প্রতীক্ষা করে। সেই প্রতীক্ষায় তার আয়ু একটু একটু বাড়তে থাকে। অলক্ষ্যে। সে টের পায় না। কিংবা টের পায়। কে জানে!

রাতে মাঝে মাঝে এখনও ঘুম ভাঙে তার। হঠাৎ মনে হয়, কাছেই রমেন বসে আছে। পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙে। ললিত পাশ ফিরে শোয়। কিন্তু তার কেবলই মনে হয়, কোথাও না কোথাও রমেন ঠিকই জেগে আছে। পাপ-পুণ্যময় দিনশেষে মানুষ যখন ঘুমোয়, তখন কারও-না-কারও শিয়রের কাছে নিরন্তর জেগে আছে রমেন।

পলাশপুরে এক রাতে মৃদুলার চিৎকারে ঘুম ভাঙল তুলসীর। ভয় পেয়ে উঠে বসল। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় দেখা গেল মৃদুলা চোখ বড় করে তাকিয়ে ঘন শ্বাস টানছে।

কী হয়েছে মৃদুলা?

দেখো, আমার পেটের মধ্যে কী যেন নড়ছে।

নড়ছে? ভারী অবাক হয় তুলসী, কী নড়ছে?

ভীষণ ভয় করছে আমার। একটু তন্দ্রার মতো লেগে এসেছিল, অমনি হঠাৎ নড়ে উঠল। মৃদুলা ভিতু গলায় বলে।

তুলসীও ভয় পায় প্রথমে। তারপর মৃদুলার পেটের ওপর সে হাত রাখে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর টের পায়, হঠাৎ টোকা দেওয়ার মতো সেই নড়া, নড়ে ওঠা।

ওই দেখো। মৃদুলা চমকে বলে।

বোধ হয় বাচ্চাটা। তুলসী ফিসফিস করে বলে।

নড়ছে! বাচ্চাটা নড়ছে! ইস, কী রকম যে লাগছে আমার!

তুলসী মৃদুলার পেটের ওপর কান পাতল। অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। আবার সেই নড়ে ওঠা টের পেল। তার শরীর কাঁটা দিল রোমাঞ্চে। কী রকম পোকার মতো নড়ছে! শব্দটা কীসের? ওটা কি ওর হৃৎপিণ্ড, না কি হাত। না কি পা? কে জানে? সে জানান দিচ্ছে যে সে আছে, সে আসছে।

দুঃখময় পৃথিবীতে মানুষ কত পুরনো হয়ে গেল! তবু মানুষের জন্ম এখনও কী রোমাঞ্চকর!

# উজান

॥ এক ॥

ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে আমার নাম হচ্ছে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। আমার বাবার নাম নরেন্দ্রনাথ, এবং দাদুর নাম কালীকুমার। আমাদের দেশ ছিল বিক্রমপুরের নশঙ্কর গ্রামে। কিন্তু আমার দাদু ময়মনসিংহে ফৌজদারি মামলার ছড়াছড়ি দেখে মোক্তারি পাশ করে ময়মনসিংহে চলে আসেন। তারপর সেখানেই থেকে যান। তাঁর প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। ময়মনসিংহে বাস্তবিক ফৌজদারি মামলা হত বিস্তর, এবং কালীকুমার কিছু দিনের মধ্যেই পসার করে ফেলেছিলেন। মুক্তাগাছার জমিদার বীরভদ্র রায় কোনও এক মামলায় জিতে দাদুকে ময়মনসিংহ শহরে বসবাস করার জন্য অনেকটা নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। সেইখানে দাদু চারটে টিনের ঘর তুলেছিলেন, মাঝখানে উঠোন আর বাইরে প্রকাণ্ড কাছারিঘর। এই বাড়িতেই আমার বাবা, কাকা, জ্যাঠামশাইরা এবং তার পরবর্তী আমরা বিস্তর ভাইবোন জন্মগ্রহণ করি। আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী কোনও বাড়িতেই পাকা আঁতুড়ঘর থাকে না। দরকার মতো আঁতুড়ঘর তৈরি করে নেওয়া হয়, এবং প্রয়োজন মিটলে তা ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু আমরা ভাইবোনেরা— অর্থাৎ বাবা, কাকা, জ্যাঠামশাইদের ছেলেমেয়েরা এত দ্রুত এবং পর পর জন্মগ্রহণ করেছিলাম যে দাদুকে দক্ষিণের ঘরের পিছনে, একটি গন্ধলেবুর গাছ কেটে পাকা আঁতুড়ঘর তুলতে হয়েছিল।

আগেই বলেছি দাদু ময়মনসিংহে এসে অল্প দিনেই যথেষ্ট পসার করেছিলেন। পকেটে আঁটত না বলে কোনও কোনও দিন তিনি তাঁর শোলার হ্যাট ভরতি খুচরো পয়সা আর টাকা নিয়ে ফিরতেন এবং ঠাকুমা শাড়ির আঁচল পেতে ধরলে হ্যাট উপুড় করে পয়সা ঢালতেন। আমরা শিশু বয়সে উঠোনে খেলা থামিয়ে হাঁ করে সেই দৃশ্য দেখেছি। তখন ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে টাকা রাখার চলন ছিল না। ব্যাঙ্ক প্রায়ই ফেল পড়ত এবং পোস্ট অফিসে টাকা তোলার সময়ে সই মিলত না। কাজেই সেইসব টাকা রাখার জন্য বিপুল ভারী একখানা সিন্দুক থাকত আমাদের বড় ঘরে। এক ফুট লম্বা এবং প্রায় সেরখানেক ওজনের একটা চাবি দিয়ে সেই সিন্দুক খুলে ঠাকুমা টাকা রাখতেন। দাদু ক্রমে ক্রমে বয়ড়া এবং কেওটাখালি অঞ্চলে অনেকটা ফসলের জমি কিনলেন, কয়েকটা কটন মিলের শেয়ার কিনলেন আর দুর্গাবাড়িতে করলেন চমৎকার একখানা বাড়ি। সেই বাড়িটা গৃহপ্রবেশের পরেই ভাড়া দিয়ে দেওয়া হল।

দাদুর সচ্ছলতা কিন্তু খুব ভাল ফল দেয়নি। প্রথমত তিনি শহরে এসে ভাগ্য ফিরিয়েছেন দেখে আমাদের বাড়ি থেকে তাঁর নানা সম্পর্কের ভাই এবং ভাইপোরা পড়া বা চাকরির জন্য ময়মনসিংহে চলে আসতে লাগল। ফলে আমাদের বাড়িটায় লোকজন গায়ে গায়ে গিজগিজ করত, দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া অসহায় কয়েকজন বিধবাও এসে আশ্রয় নিলেন। দ্বিতীয়ত দাদুর চার ছেলের মধ্যে কারওই পড়াশুনা কিংবা চাকরির দিকে মন গেল না। আমার বড় জ্যাঠামশাইকে আমি ক্ল্যারিওনেট বাজাতে দেখতাম। ভালই বাজাতেন, শেষে প্লুরিসি হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। ক্ল্যারিওনেট বাজানো ছাড়া তাঁর আর কোনও গুণ ছিল বলে কেউ জানে না। অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। চার ছেলে আর দুই মেয়ে নিয়ে তিনি থাকতেন দক্ষিণের ঘরে। ছিলেন অসম্ভব স্ত্রৈণ এবং নিরীহ। মোটাসোটা থলথলে জেঠিমাকে দেখতাম সন্ধে বাতির পর থেকেই বিছানায় শুয়ে হাতপাখা নাড়ছেন। বড় জ্যাঠামশাই ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিলেন, কাজেই তাঁর একটা গতি করার জন্য ঠাকুমার তাড়নায় দাদু মেছোবাজারে খুললেন একটা কাটা-কাপড়ের দোকান— অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। দোকানটা বড়ই ছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

আলমারি, পেতলের গজকাঠি, পুরু গদির বিছানা, তাকিয়া-টাকিয়া দিয়ে ভাল বন্দোবস্ত, আর ছিল একজন কর্মচারী। জ্যাঠামশাই সকালে মুড়ি চা খেয়ে পুরনো আমলের র‍্যালে সাইকেলে চেপে দোকানে যেতেন। দুপুরে খেতে এসে তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন। তখন আমরা তাঁর পাকাচুল তুলতাম। চুল তুলে কাগজে মুড়ে রাখতাম। জ্যাঠামশাই ঘুম থেকে উঠে চুল গুনে আমাদের পয়সা দিতেন। দশটা চুলে একটা বড় তামার পয়সা। তাঁর সাইকেলের রডে চেপে কত বার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে গেছি। দোকানের সামনে চওড়া বারান্দা ছিল, সেখানে দু'টো ঝরঝরে মেশিন নিয়ে বসত বুড়ো দরজি অল্লু। সুন্দর জালিকাজ করা সাদা একখানা টুপি পরত সে। চাঁদির চশমার ভিতর দিয়ে তার চতুর এবং প্রসন্ন দু'খানা চোখ দেখতে পেতাম। সে মেশিনে বসত কমই। মাটিতে শতরঞ্জি পেতে হরেক রকমভাবে কাপড় কাটত। কখনও করত হাত-সেলাই। বড় মেজাজি ছিল সে। ফোঁড় তুলতে তুলতে গাঢ় গলায় ডাকত 'রমজান বিড়ি দে।' রমজান মেশিন ছেড়ে তটস্থ হয়ে এসে তার ঠোঁটের ফাঁকে বিড়ি গুঁজে দিত, তখন সে আবার বলত, 'সাজ্জাদ, ধরিয়ে দে।' সাজ্জাদ উঠে এসে বিড়িতে আগুন দিত। কখনও তাকে নিজে বিড়ি ধরাতে দেখিনি। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের বারান্দায় বসত বলে সে আমাদের ভাড়া দিত না। কিন্তু কখনও তাকে দেখিনি জ্যাঠামশাইকে খাতির করতে। আমি শিশু বয়সে তার আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম সুতো-ফুরিয়ে যাওয়া কাঠের রিল, ভাঙা ছুঁচ আর রঙিন কাপড়ের টুকরো কুড়িয়ে নেব বলে। বুড়ো অল্লু উদাসীন চোখে আমাকে দেখত। দোকানের কর্মচারীটির নাম ছিল সুরেশ। আমাদের সে খুবই খাতির করত। কাঁধে তুলে রাস্তায় নিয়ে বেড়িয়ে আনত। কিন্তু তার ঠোঁটে শ্বেতী ছিল বলে জ্যাঠামশাই তার সঙ্গে মিশতে বারণ করতেন। দোকানে একটি গড়গড়া ছিল আর হাতপাখা। সুরেশ তামাক সেজে আনত, জ্যাঠামশাই তাঁর বাপের দোকানে গদীয়ান হয়ে বসে গড়গড়া টানতেন। প্রায়ই দেখতাম খদ্দের মার্কিন কিংবা ছিট কিনতে এসে দরে পোষাচ্ছে না বলে ফিরে যাচ্ছে, আর জ্যাঠামশাই নিমীলিত চোখে নিস্পৃহভাবে তা দেখছেন। বেচাকেনা করত সুরেশ, জ্যাঠামশাই কদাচিৎ খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলতেন। খদ্দেরহীন দোকানে সুরেশ বসে বসে জ্যাঠামশাইয়ের গা টিপে দিত। আলমারিতে পুরনো হয়ে পচত গাদা গাদা কাপড়। সারা বছর আমাদের বাড়ির যাবতীয় জামা-কাপড় আসত ওই দোকান থেকে। ওইভাবেই দোকানের স্টক ফুরোত বোধহয়। তাই জ্যাঠামশাই পুজোর আগে প্রতি বছর কলকাতায় মাল কিনতে যেতেন। পয়লা বৈশাখে জমকালো রকমের হালখাতা হত দোকানে। লাল শালু, কদম ফুল আর রঙিন কাগজের শিকলি দিয়ে সাজানো হত। রুক্মিণীর দোকান থেকে আসত বালসাই আর চমচম। গোলাপজল ছিটানো হত, খাওয়ার পর দেওয়া হত পান আর গোল্ডফ্লেক সিগারেট। আমার বড় জ্যাঠামশাই বীরেন্দ্রনাথ এইভাবেই অনেক দূর পর্যন্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।

মেজো জ্যাঠামশাই হরেন্দ্রনাথ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় এক দিন গার্ড তাঁকে একটু সরে বসতে বলায় ভয়ংকর অপমানিত বোধ করে হল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপর আর পরীক্ষা দেননি কোনও দিনই। পড়াশুনোয় ভাল ছিলেন বলে দাদু তাঁকে আবার জোর করে মেডিকাল স্কুলে পড়তে পাঠালেন। কিন্তু মড়া কাটতে তাঁর ভীষণ ঘেন্না হল এবং কঙ্কাল দেখে রাত্রে ভয় পেতেন বলে ঠাকুমা তাঁকে লেখাপড়া থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। সেই থেকে মেজো জ্যাঠামশাই বাড়ির একগাদা বাচ্চাকাচ্চার বাঁধা প্রাইভেট টিউটর। সন্ধের পর কাছারিঘরের বারান্দায় আমাদের পারিবারিক স্কুল বসে যেত। দাদু তাঁকে দিয়ে জমি দেখাশুনো করাতেন। মাঝে মাঝে মেজো জ্যাঠামশাই বয়ড়া বা কেওটখালি থেকে ক্যারিয়ারে বেঁধে নিয়ে আসতেন আখ, কামরাঙা, খইয়ের ধান। হাতের লেখা সুন্দর ছিল বলে তিনি বাসার যাবতীয় ফর্দ করতেন, দরখাস্ত লিখতেন। পাড়ার নিরক্ষর লোকেরা তাঁকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে বা পড়িয়ে নিয়ে যেত। তিনি বাড়ির বাজারও করতেন। এ-সব করতে তিনি ভালই বাসতেন। কখনও রোজগারের চেষ্টা দেখতেন না। তবে তিনি আমাদের পরিবারের বিস্তর কাজে এসেছিলেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন রেলের গার্ড সুরেন দত্ত। সুরেন দত্তের দয়ায় আমাদের যাবতীয় আত্মীয়স্বজন এক দিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে অন্য দিকে বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত বিনা টিকিটে চলে যেত কিংবা আসত। সুরেন গার্ড লোকটা তেমন দাপুটে লোক ছিলেন না। দুই বিয়ের দু'টি বউ নিয়ে মনমরা হয়ে থাকতেন, সন্ধের পর ঢুকঢুক করে একটু মদ খেয়ে কান্নাকাটি করতেন। ছুটির দিনে আসতেন গোলকপুরের জমিদারদের পুকুরে মেজোজ্যাঠার সঙ্গে মাছ ধরতে। তিনি দাপুটে না হলেও তাঁর নাম নিয়ে আমাদের পরিবারের

যাবতীয় আত্মীয়স্বজন রেলে দাপটে চলাফেরা করত। এ-সব আত্মীয়স্বজনের কাউকেই সুরেন গার্ড বোধহয় চিনতেন না। কিন্তু তিনি কিছু মনেও করতেন না। শুনলে মিটমিট করে হাসতেন। চোখ দু'টি বুজে যেত।

বাবা ছিলেন দাদুর তৃতীয় পুত্র। সত্যি কথা বলতে কী, অনেকটা বয়স অবধি আমি আমার বাবাকে খুব ভাল করে চিনতাম না। তার কারণ আমাদের বাড়িতে কারও কোনও ব্যক্তিগত জীবন ছিল না। কাছারিঘর নিয়ে মোট পাঁচটা ঘরে আমরা এত লোক বাস করতাম এবং এত লোক বাড়িতে যাতায়াত করত যে ব্যক্তিগত জীবন সেখানে সম্ভবই ছিল না। তার ওপর আমরা যারা বাচ্চা তারা থাকতাম দাদু আর ঠাকুমার হেফাজতে। কাছারি থেকে ফিরে দাদু সন্ধের পর আমাদের গুনে গুনে ঘরে তুলতেন। রাতে বড় ঘরের মেঝেয় ঢালাও বিছানা হত। আমরা জনা পনেরো নানা বয়সের বাচ্চা সেই বিছানায় জায়গা নিয়ে এ-ওর পাশে শোয়া নিয়ে ঝগড়া করতে করতে গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়তাম। মা-বাবার কথা খেয়ালই হত না। সারা দিন হয়তো চকিতে দু'-একবার মাকে দেখতাম বাসনের পাঁজা হাতে পুকুরে চলেছে কিংবা নিরামিষ ঘরে পাটকাঠির আগুনে দুধের জ্বাল ঠেলছে কিংবা পরিবেশন করছে। সে-বাড়িতে থাকতে মা বলে আলাদা কিছু বুঝতে পারতাম না। জ্যেঠিমা খুড়িমা পিসিমার মতো মাও একজন মাত্র. তার বেশি কিছু না। বাবা ছিলেন আরও দূরের লোক। বড় এবং মেজো জনের পর দাদুর এই তৃতীয় ছেলেটি ইতিহাসে এম.এ পাস করেছিলেন, সঙ্গে ফাউ হিসেবে ওকালতিও। কিন্তু ইচ্ছে ছিল না বলেই বোধ হয় চাকরির চেষ্টা করতেন না। সকালে তাঁকে কোনও কোনও দিন এক ঝলক দেখতাম। দুপুরে আর-এক ঝলক— তখন খেতে আসতেন; রাতের খবর জানতাম না। কেউ হয়তো চিনিয়ে দিয়েছিল ওই তোর বাবা। তাই বুঝতাম যে ওই লোকটা আমার বাবা। তার বেশি কিছু বুঝতাম না। বাবা ফিরেও দেখতেন না। আমার জন্মের পরও বেশ কিছু দিন বাবা বেকার ছিলেন। রোগা ছিপছিপে, ধুতি আর সাদা শার্ট, চশমা আর চপ্পল পরা লোকটিকে আমি খুবই বিষণ্ণ দেখতাম।

আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ খুব অল্পবয়সেই লেখাপড়া ছেড়েছিলেন। বোধ হয় ক্লাস এইট-এই। তারপর কাছারিঘরের বারান্দার একধারে তিনি তাঁর নিজের মতো একখানা জিমনাশিয়াম খুললেন। সেখানে রিং ঝুলত, থাকত ওজন তোলার যন্ত্র, ঘুষি মারবার জন্য বালির বস্তা। কাকার চেহারাটা ছিল দেখবার মতোই। বিপুল দম ছিল বলে সাঁতরে ব্রহ্মপুত্র এ-পার ও-পার হতেন। শম্ভুগঞ্জের রেলব্রিজ থেকে ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দিয়ে তিনি শহরে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। আর তাঁর নাম ছিল গুন্ডামিতে। কালো কালো মারকুটে চেহারার একদঙ্গল ছেলে নিয়ে তিনি একটা দল গড়েছিলেন। কোনওকালে তিনি হকি খেলেননি, তবু আমাদের পুবের ঘরে চৌকির নীচে, বইয়ের আলমারির তলায় বিস্তর হকিস্টিক মজুত থাকত। প্রায়ই দেখতাম কাকা বাইরে থেকে উত্তেজিতভাবে দৌড়ে এসে হকিস্টিক হাতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর ওই ভারী প্রকাণ্ড শরীর নিয়েও বানরের মতো গাছ বাইতে পারতেন এবং পারতেন হরিণের মতো চকিত পায়ে দৌড়তে। মাঝে মাঝে তাঁর মাথায় বা হাতে ব্যান্ডেজ দেখতে পেতাম। বাড়ির কারও সঙ্গেই তাঁকে কথাবার্তা বলতে দেখিনি। তিনি খুব গম্ভীরভাবে বাড়ির ভিতরে আসতেন, শান্তভাবে বসে প্রচুর খেয়ে নিতেন, এবং আবার গম্ভীরভাবে বেরিয়ে যেতেন।

দাদু ছাড়া আমাদের বাড়ির অন্যান্য পুরুষদের নিস্পৃহতা ছিল দেখবার মতো। তাঁদের সংসারত্যাগী এবং বাউন্ডুলে বলে মনে হত। ঠাকুমা তাঁর ছেলেদের কাজকর্মে উদ্যোগী করার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র বড় জ্যাঠামশাই ছাড়া আর কারওই পত্নীপ্রেম বোধ হয় তেমন তীব্র ছিল না। বড় জ্যাঠামশাই রাতে দোকান থেকে সোজা বাড়িতে ফিরতেন এবং আমরা উঠোনে চাঁদের আলোয় খেলতে খেলতে অনেক বার দেখেছি দক্ষিণের ঘরে হ্যারিকেনের সলতে কমিয়ে জ্যাঠামশাই জ্যেঠিমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ওই স্ত্রৈণতাটুকু ছাড়া জ্যাঠামশাইয়ের আর কোনও উদ্যোগ ছিল না। কেবল কোনও কোনওদিন গোলকপুরের জমিদারদের পুকুরঘাটের বাঁধানো চত্বরে বসে ক্ল্যারিওনেট কিংবা আড়বাঁশিতে করুণ সুর বাজাতেন।

তিন ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াতে আমার কাকা নগেন্দ্রনাথের বিয়ের জন্য দাদু কিংবা ঠাকুমা আর তেমন চেষ্টা করেননি। তা ছাড়া তিন ছেলের ছেলেমেয়েতে বাসা ভরে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাইদের কিংবা বাবার কোনও দাম্পত্য জীবন বলে কিছু ছিল না। দেশ থেকে আত্মীয়স্বজনরা

এলে তাঁরা যে-কোনও একটা জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়তেন। হয়তো কাছারিঘরে, নয়তো কোনও বন্ধুর বাসায়। স্বামী-স্ত্রীর দেখাশোনা কীভাবে হত আদৌ হত কি না কে জানে। কাজেই দাদু-ঠাকুমা নগেন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়ে আর ভিড় বাড়াননি।

আমার দাদু তাঁর ছেলেদের গাল দিতেন আড়ালে, ঠাকুমাকে সাক্ষী রেখে। কিন্তু ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্যই তিনি সঞ্চয়ে মন দিয়েছিলেন। ছেলেরা যেমন ছিল উদাসীন তিনি সে রকম ছিলেন সতর্ক। তিনি সবসময়ে কৌটোর মুখ ভাল করে বন্ধ করতেন, ঠিক মতো মশারি গুঁজতেন, তাঁর হাত থেকে কখনও কুয়োর বালতি জলে পড়ে যায়নি। খুব ভোরে উঠে আহ্নিক করে তিনি দা আর খুরপি নিয়ে ঢুকতেন বাগানে। খালি গা, হাঁটুর ওপর তোলা কাপড়, পায়ে খুরোওয়ালা খড়ম। সবুজ গাছপালার মধ্যে তাঁর গৌরবর্ণ শরীরে রোদ লেগে একটি সুন্দর দৃশ্য সৃষ্টি করত। তিনি যখন বাগানে কাজ করতেন তখন তাঁর ধৈর্যশীল মক্কেলরা কাছারিঘরের বারান্দায় উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করত। তারা ছিল সব গরিব-গুরবো চাষি, তারা দাদুকে ভয় করত, তার ওপর দাদু স্যার আশুতোষের মতো একজোড়া ভয়ংকর গোঁফ রেখেছিলেন।

সন্ধেবেলা আমাদের গুনে গুনে ঘরে তুলতেন দাদু। আমরা মেঝেতে ঢালাও বিছানায় শুতাম, দাদু আর ঠাকুমা থাকতেন খাটে। সেই প্রকাণ্ড ঘরের এক কোণে ছিল পাটাতনে ওঠার কাঠের সিঁড়ি, সিঁড়ির তলায় চাল রাখার ডোল, অনেক ট্রাঙ্ক-বাক্স, বিস্তর আলমারি। এক কোণে ছিল ছোটপিসিমার পড়ার টেবিল। রাতে শুয়ে আমরা ছোটপিসিমার গুনগুন করে ইংরিজি পড়ার শব্দ শুনতাম। তার সঙ্গে শোনা যেত বাইরের বারান্দায় দাদুর পায়চারি করার খড়মের আওয়াজ। তখন নিঃসাড়ে ঘুম হত। তবু কখনও ভয়ের স্বপ্ন দেখে কিংবা জোর পেচ্ছাপ পেলে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেত। তখন শুনতাম দাদুর সঙ্গে ঠাকুমার ঝগড়া হচ্ছে। কখনও বা শুনতাম নিশুত রাতে দাদু একা জেগে আছেন, তাঁর গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। তখন সেই শিশুবয়সেও বুঝতে পারতাম দাদুর একাকিত্ব। বুকের ভিতরটা খামচে উঠত।

দাদু এবং তাঁর ভাইদের নাম ছিল 'কুমার' দিয়ে। তাঁরা ছিলেন কালীকুমার, কৃষ্ণকুমার, রাজকুমার ইত্যাদি। আমার বাবা জ্যাঠাদের নাম ছিল 'নাথ' দিয়ে— বীরেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি। আমাদের আমলে তেমন কোনও রীতি রাখা যায়নি। আমাদের যেমন তেমন নাম রাখা হয়েছিল। আমরা বড়ও হয়েছিলাম যেমন-তেমন ভাবে। মনে পড়ে অনেকটা বয়স পর্যন্ত আমরা ল্যাংটা হয়ে ঘুরেছি, প্যান্ট যে কোথায় হারিয়ে যেত। কেউ ডেকে প্যান্ট পরিয়েও দিত না বড় একটা। কেবল আমাদের কলেজে পড়া ছোটপিসিমা আমাদের ল্যাংটো দেখলে রাগ করত। আমাদের ঠাকুমা কিংবা মায়েদের ডেকে বকত। কিন্তু বাদবাকি সবাই ছিল নিস্পৃহ। বাড়ির পিছনে ছিল একটা বড় পগার, অল্প দূরেই ছিল গোলকপুরের জমিদারদের পুকুর, আর বড় রাস্তার ও-পারে ছিল ব্রহ্মপুত্র, কাজেই খুব ছেলেবেলাতেই আমরা সাঁতার শিখেছিলাম। সাঁতার এবং জলের নেশা শিশুবয়সে বড় প্রবল ছিল। আমরা বেলা থাকতেই পুকুর বা পগারে গিয়ে পড়তাম। যখন বাড়ি থেকে কেউ গিয়ে ধমকে নড়া ধরে আমাদের জল থেকে তুলত তখন আমাদের গা সাদা আর চোখ লাল, আমার দুরন্ত জ্যাঠতুতো দাদারা মাঝে মাঝেই হারিয়ে যেত। খোঁজ পড়ত খাওয়ার সময়ে। মেজো জ্যাঠামশাই সাইকেল নিয়ে বেরোতেন, তারপর গুদারাঘাট, শম্ভুগঞ্জের রেলপুল, রেল স্টেশন কিংবা অশ্বিনীর কাঁঠাল বাগান এ-রকম বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনতেন তাদের। কদাচিৎ আমাদের সাবান দিয়ে স্নান করানো হত, কিংবা আমাদের চুলে পড়ত চিরুনি। আমরা তা পছন্দও করতাম না। আমরা দু'-তিনজন ভাইবোন একথালায় খেতে বসতাম। মুসুরির ডাল আর গন্ধলেবু দিয়ে মাখা ভাত গরাস ধরে জেঠিমা কিংবা পিসিমাদের কেউ খাইয়ে দিত। সেইসব গরাসে একটু-আধটু মাছের ছিটে থাকত কিংবা থাকত না। কিন্তু আমরা সমান স্বাদ পেতাম। সকালে জলখাবারের প্রচলন ছিল না বলে আমরা দিনে ভাত খেতাম তিন বার— সকালে দুপুরে আর রাত্রে। যাদের পৈতে হয়েছিল তারাই কেবল এক সূর্যে দু'বার ভাত খেতে পেত না। আমাদের জামা-কাপড় তৈরি হত একই থানের কাপড় থেকে। তৈরি করে দিত বুড়ো অল্লু। সে-সব প্যান্ট-জামা ঠিকমতো 'ফিট' করত কি না কে জানে। আমরা টেনে-হিঁচড়ে পরতাম, তারপর এর ওর জামাপ্যান্ট গুলিয়ে যেত, তারপর হারাত। দাঁত মাজার জন্য দাদু রাশিকৃত কাঠকয়লা জড়ো করে রাখতেন বড়

ঘরের বারান্দার কোণে। আমরা কদাচিৎ দাঁত মাজতাম। ঝাঁকড়-মাকড় চুল, ময়লা দাঁত, খালি গা— ময়লা নোংরা একদঙ্গল রাস্তার ছেলের মতো আমরা ঘুরে বেড়াতাম।

দেশ থেকে মাঝে মাঝে আসতেন ছোটদাদু আর লেংড়ি ঠাকুমা। আসতেন সোনাকাকা, ধনকাকা, সাধু জ্যাঠামশাই, মটরি পিসি, সবাইকে আমাদের মনে থাকত না। কিন্তু যারা আসত আমরা তাদের চলে যাওয়ার দিনটিকে লক্ষ রাখতাম। যে-কেউ বাক্স বিছানা বেঁধে রওনা হচ্ছে অমনি আমরা তার সঙ্গ ধরতাম, চলে যেতাম রেল স্টেশন অবধি। গাড়ি ছাড়ার আগ-মুহূর্তে হাতে হয়তো পেতাম এক আনা কিংবা ডবল পয়সা। কত যত্নে সে-সব পয়সা রাখতাম, কত টুক টুক করে একটি একটি পয়সা খরচ করতাম। বছরে এক বার আমাদের একটা বাঁধা রোজগার ছিল। সেটি ছিল ঝুলনের দিন। বড় রাস্তার ধারে ছিল ললিতের মুদিখানা। তারই পাশে আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ ঝুলনের দিন একখানা ঘর বাঁধতেন। সেই ঘর-বাঁধায় আমরা প্রাণ দিয়ে খাটতাম। ধোপাদের নাবাল জমি থেকে কোদাল মেরে ঝুড়ি ভরতি মাটি এনে ফেলতাম, আনতাম বিস্তর নুড়ি পাথর। সে-সব দিয়ে ঘরের মধ্যে পাহাড় তৈরি হত। সেই পাহাড়ে হত কত কারুকার্য। সুরকি ঢেলে পথ তৈরি হত, পথের মোড়ে দাঁড় করানো হত পুতুল। পাহাড়ের পিছনে সূর্যোদয়ের সিনারি টাঙানো হত। দড়িতে কাঁঠাল কাঠের প্রকাণ্ড পিঁড়ি বেঁধে দোলনা তৈরি হত। রাংতায় সাজানো হত দোলনা। দু'টো হ্যাজাক জ্বলত, আমাদের জ্ঞাতি নিবারণ জ্যাঠার ফুটফুটে একটি বাচ্চা মেয়ে ছিল, তুলারানী তার নাম, তাকে সাজানো হত রাধা। সন্তোষী বৈষ্ণবীর নাতি কালোকোলো মোটাসোটা সুবলকে সাজানো হত কৃষ্ণ। মানুষ-ঝুলন দেখার জন্য ভিড় ভেঙে পড়ত। সামনে রাখা পেতলের রেকাবে টঙাটঙ পয়সা পড়ত। তুলা চোখের পাতা না ফেলে ঠিক ছবি হয়ে বসে থাকতে পারত। লোকে ফেটে পড়ত রাধার প্রশংসায়। মাঝে মাঝে রাধা-কৃষ্ণের ছোটবাইরের জন্য সামনে ফেলে দেওয়া হত পরদা। দশ মিনিট হাফটাইম। রাত দশটা পর্যন্ত এ রকম চলত, তিন দিন ধরে। আমরা লক্ষ রাখতাম পয়সার থালায়, আমাদের কাকা নগেন্দ্রনাথ ঝুলনঘরের একপাশে স্বামী বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন কোনও অরাজকতা দেখা না দেয়। এক বার কাকার এক বন্ধু আমাদের ঝুলনঘরে রবারের নল দিয়ে তিরতিরে একটা ফোয়ারা তৈরি করলেন। জলের ধারার ওপর বসিয়ে দিলেন একটি পিংপং বল। বলটা জলের ওপর শূন্যে ভাসত, নাচত। ময়মনসিংহে আমাদের ঝুলনের খুব নামডাক হয়ে গেল সেবার থেকে। ঝুলনের পর এক দিন নগেন্দ্রনাথ প্রণামীর পয়সা হিসেব করতেন। আমরা ভাগে চার ছয় আট আনা পর্যন্ত পেতাম। বছরে ওই একটা আমাদের বাঁধা রোজগার ছিল। এ ছাড়া আমরা পয়সার মুখ বড় একটা দেখতাম না।

আগেই বলেছি ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে আমার নাম হচ্ছে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আমার এই নামটা জানতে আমাকে বিস্তর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমার ডাকনাম কুকু, বরাবর ওই নামে সাড়া দিয়েছি। লোকে নাম জিজ্ঞেস করলে বলতাম কুকু। পোশাকি নাম কোনও ব্যবহারে আসত না বলে কেউ শেখায়নি। ছেলেবেলায় এ রকম অনেক কিছুই আমার জানা ছিল না। যেমন জানা ছিল না পনেরো জন ভাইবোনের মধ্যে রোগা তিরতিরে কালো বুনু হচ্ছে আমার আপন দিদি। আমি তাকে নাম ধরে ডাকতাম এবং সকলের সঙ্গে তাকে এক করে দেখতাম। যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, তোমরা ক' ভাইবোন, তবে আমি একটু হিসেব করে বলতাম, পনেরোজন। শুনে লোকে হাসত। আসলে অতজনের মধ্যে আমরা দু'জনই ছিলাম সহোদর। আমি কুকু, আর আমার দিদি বুনু। আবছা মনে পড়ে, তখন আমার দিদি বুনু ছিল রোগে-ভোগা, খ্যানখ্যানে একটা মেয়ে। ফ্রকের তলায় টিংটিঙে দুই বকের পা, হাতে ঢলঢলে কাচের চুড়ি, গায়ে কার পুরনো ফ্রক। সেই বুনুকে খুব ভোরবেলা কালোজিরে চালের ভাত আর কাঁচকলা সেদ্ধ খাওয়ানো হত, সারা দিনে তার আর অন্নপথ্য ছিল না। কিন্তু লোভী বুনু মানুষজনের যাতায়াতের পথে, বড় ঘরের দরজায় প্রায় সময়েই হাত পেতে দাঁড়িয়ে নাকিসুরে একটানা বলে যেত, একটু গুড় দাও, একটু মুড়ি দাও, বাতাসা দাও। ঠাকুমা-জেঠিমাদের পায়ে পায়ে সে ঘুরে বেড়াত খাওয়ার লোভে। অনেকটা বড় বয়স পর্যন্ত সে ছিল হালকা রোগা, তাই প্রায়ই দেখতাম তাকে কোলে নিয়ে দাদু ঠাকুমা কিংবা পিসিমারা ঘুরছেন। রাতে ঠাকুমার শরীরের ওম-এর মধ্যে সে ঘুমোত। রোগা ছিল বলে আমাদের সঙ্গে তাকে শুতে দেওয়া হত না।

একমাত্র বড় ঘর ছাড়া আর সব ঘরেই ভিত ছিল মাটির। রোজ সকালে সেই সব ভিত মাটির

গোলায় ন্যাতা ভিজিয়ে লেপা হত। এ-কাজে পাকা হাত ছিল আমার মায়ের। লেপার পর মাটি শুকিয়ে গেলে দেখা যেত অতি সুন্দর সরল রেখা হাতের লেখার লাইনের মতো পড়ে আছে। ভিতর-বাড়ির তিনটে ঘর লেপার পর মাকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাত। পগারের সুপারি গাছ দিয়ে বাঁধানো ঘাটে মাঝে মাঝে মাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখতাম। কোলের কাছে কাদাগোলা মেটে হাঁড়ি নিয়ে বসে ন্যাতাটা জলে ধুচ্ছে তো ধুচ্ছেই। খুবই অন্যমনস্ক দেখাত মাকে। এক-একদিন সন্ধেবেলা আমার খুব মন খারাপ লাগত। এমন এক-একটা বিকেলবেলা আছে যখন সূর্য ডুবে যাওয়ার সময়ে অন্তত একটা মায়াবী অপার্থিব আলো এসে পড়ত আমাদের উঠোনে। আকাশের রং যেত পালটে। আমাদের সমস্ত বাড়িটায় কেমন এক আলো-আঁধারির সৃষ্টি হত। বারবাড়ি থেকে ভিতর-বাড়িতে আসতে আসতে হঠাৎ আমার বহুজনের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া আমাকে অনুভব করতাম। টের পেতাম আমার আলাদা একা এক 'আমি' আছে। সেই সব বিষণ্ণ বিকেলে আমার মাঝে মাঝে মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে হত। প্রায়ই পশ্চিমের ঘরে মাকে খুঁজতে গিয়ে পেতাম না। সারা বাড়ি খুঁজে মাকে হয়তো পেতাম বড় ঘরের পাটাতনের সিঁড়ির তলায় গামলায় চাল মেপে তুলছে। আমি অবোধ দুর্জ্ঞেয় এক বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই যে মার কাছে গেছি তা মা বুঝত না। তবু একটুক্ষণের জন্য হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিত। আমাদের বাড়িতে সকলের সামনে ছেলেকে আদর করা ছিল বড় লজ্জার ব্যাপার। তাই পাটাতনের সিঁড়ির তলায় অন্ধকারে মা আমাকে এক হাতে ধরে অন্য হাতে মাথার এলোমেলো চুল ঠিক করে দিত। একটুক্ষণের জন্য মাথাটা চেপে রাখত বুকে। আমি তখন মায়ের গা থেকে মা-মা গন্ধটা পেতাম। মা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করত, বিকেলে জলখাবার খেয়েছি কি না, দুপুরে পেট ভরেছিল কি না। আমি বুক ভরে মায়ের গায়ের সুঘ্রাণ নিতাম, বিকেলের বিষণ্ণতা কেটে যেত। আবার মাকে ভুলে যেতে সময় লাগত না।

যে-বিষণ্ণতার কথা বলছিলাম সেটা যে কেমন, সেটা যে কেন তা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। পৃথিবীতে মানুষ অনেক দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু আলস্যবশত তার কারণ অনুসন্ধান করে না। শিশুবয়সে আমিও করিনি। তবু মাঝে মাঝে মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যখন দাদুর একা জেগে থাকার শব্দ শুনতাম, তাঁর কাশি, খড়মের শব্দ, তামাক টানার আওয়াজ, তখন তাঁর সেই একাকিত্ব একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চের মতো আমার বুক খামচে ধরত। সেই বিষণ্ণতা সুখের মতোই উপভোগ্য ছিল। যেমন কখনও কখনও রাতে কাছারি ঘরের বারান্দায় মেজো জ্যাঠামশাই তাঁর পড়ানো শেষ করলে আমরা কয়েক ভাই বারবাড়ির উঠোনে হুটোপাটি করতে করতে হঠাৎ আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম। দেখতাম ব্রহ্মপুত্রের ও পারে অন্ধকার শম্ভুগঞ্জের বিস্তীর্ণ মাঠে ভৌতিক নীল আলো শিখার মতো দপদপিয়ে জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। অন্ধকারে বিশাল নদী বয়ে যাচ্ছে ঝরঝর করে। তখন কখনও কখনও আমি আমার চার পাশে এক নিস্তব্ধ অলৌকিককে অনুভব করতাম। এই অনুভূতি সুখের না দুঃখের কে জানে, কিন্তু আমি দৌড়ে চলে আসতাম ভিতর-বাড়িতে, উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাকে খুঁজতাম। তখন আমার সারা গায়ে শিউরনো রোমকূপ শাঁসওয়ালা ব্রণের মতো কাঁটা দিত। খেলতে খেলতে কখনও হঠাৎ আমি খেলা তুলে দাঁড়িয়ে পড়তাম। কী যেন একটা বহু দূরের সুখস্মৃতি আমার মনে পড়ি-পড়ি করেও পড়ত না। সে যেন এ-জন্মের কথা নয়, সে যেন এ-জীবনেরও কথা নয়। কিন্তু স্পষ্টত কিছুই মনে পড়ত না, কেবল ধূপ জ্বলে যাওয়ার পর ঘরে যেমন বহুক্ষণ গন্ধের ক্ষীণ রেশ থাকে, অনেকটা তেমনি স্মৃতির এক সুঘ্রাণ আমি পেতাম। আর সেই সঙ্গে আমার বড় ভয় করত। কেন না সেইসব অনুভূতি ছিল আমার সম্পূর্ণ একার। কাউকেই বলে তা বোঝাতে পারতাম না।

বড় ঘরে অনেকগুলো কাঠের আলমারি ছিল। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা আলমারি কখনও খোলা হত না। আমি সেই আলমারিগুলোর কাছে ঘুর ঘুর করতাম। ভিতরে কী আছে তা দেখবার দুরন্ত কৌতূহল হত। অনেক বার বলার পর এক দিন ঠাকুমা একটা আলমারি খোলার চাবি দিয়েছিলেন। ভরদুপুরে সেই আলমারি খুলে আমি মূক হয়ে গিয়েছিলাম। ভিতরে তেমন কিছুই ছিল না। ওপরের তাকে গাদা করা ছিল কিছু পুরনো বই, অন্য তাকগুলোয় ছিল কিছু ভাঙা অব্যবহার্য বাসন, কাচের ফুলদানি, কালি শুকিয়ে যাওয়া দোয়াত, নিব লাগানো হ্যান্ডেল, আর ছিল ন্যাকড়ায় জড়ানো দলিল দস্তাবেজ জাতীয় অনেক কাগজ, একটা পিতলের উট, কয়েকটা রংচটা কাপ-মেডেল, পুরনো টর্চবাতি,

খালি কৌটো, এ রকম আরও হরেক জিনিস। তার ওপর ছিল মাকড়সার জাল, আরশোলার নাদি, বইয়ের পোকা আর ন্যাপথলিনের গন্ধ। সে-সব কোনও কিছুই আমি তেমন লক্ষ করিনি। কিন্তু আলমারিটার পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বহু পুরনো আমলের একটা বন্ধ বাতাস আমাকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই বাতাস আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বয়ে গিয়ে মাথার ভিতরে যেন এক অসাবধান গৃহস্থের বাড়ির দরজা-জানালার কপাট খুলে দিয়ে বয়ে গেল। ওলট-পালট হয়ে গেল আমার বোধবুদ্ধির। কোথা থেকে অজস্র অচেনা দৃশ্যের আভাস, অচেনা স্মৃতি সেই খোলা দরজা-জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁটের মতো উড়ে আসতে লাগল। মনে হল আমি শিশু নই, আমি বহু পুরনো আমলের মানুষ। দীর্ঘ এক জীবন পৃথিবীতে আমি যাপন করেছি। ফলে পাল্লা-খোলা আলমারির সামনে পাঠ ভুলে যাওয়া শিশুর মতো বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

এক দিন একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সেই শিশুবয়সে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক দেখা করতে এসেছে বছর ছয়েক কি সাড়ে ছয়েকের একটি ছেলের সঙ্গে যে-ছেলেটি দঙ্গলের মধ্যে অস্তিত্ব হারানো খুব সাধারণ একটি শিশুমাত্র! বারবাড়িতে দাড়িয়াবান্ধা খেলছিলাম, এমন সময়ে আমার জ্যাঠতুতো দিদি পুন্নি এসে ডাকল, কুকু, ঠাকুমা ডাকছে, শিগগির আয়। তোর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে। মনে আছে, শুনে বুকের মধ্যে ধুক করে উঠেছিল, কে আমাকে ডাকছে! বিচ্ছিন্নভাবে একাকী আমাকে কার দরকার?

ভিতর-বাড়িতে বড় ঘরের বারান্দায় দাদুর গদি-আঁটা চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছিলেন অনাদিনাথ। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ঠাকুমা, আমাকে দেখে অনাদিনাথকে বললেন, এর কথা বলছিলে?

অনাদিনাথ বিপুলবেগে মাথা নেড়ে হেসে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই-ই। এসো তো বাবা, এসো তো।

অনাদিনাথকে আমরা সেই বয়সে বড় ভয় পেতাম। তার কারণ অনাদিনাথ ছিলেন ভীষণ লম্বা। অত লম্বা লোক আমরা সেই শিশুবয়সে আর দেখিনি। জমিদারদের পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে জারুল গাছের ছায়ায় ছোট একখানা বেড়ার ঘর ছিল তাঁর। একা একা সেই ঘরে থাকতেন। কাজ করতেন জমিদারের সেরেস্তায়। তখনকার জমিদার বোকেনবাবু ছিলেন আগের জমিদারের পোষ্যপুত্র। বোকেনবাবুর আগের সম্পর্কের আত্মীয় হতেন অনাদি। একা মানুষ। অনাদিনাথকে যেতে দেখলে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম। পুকুরে যখন স্নান করতে নামতেন তখন আমরা কত দিন দেখেছি, তিনি ধীরে ধীরে জলে নামছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন মাঝপুকুরের দিকে কিন্তু তবু ডুবছেন না। তাঁকে আমি কখনও সাঁতার কাটতে দেখিনি, মাঝ-পুকুরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তিনি ডুব দিয়ে উঠে আসতেন। এর বেশি অনাদিনাথ সম্বন্ধে আমি কিছু জানতাম না।

সে-আমলে আমরা দুষ্টুমির জন্য পাড়া-প্রতিবেশীদের চড়টা চাপড়টা খেতাম। আমাদের বাড়ির লোক সে-বিষয়ে নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন তাঁদের ছেলেপুলেদের শাসন করবার অধিকার পাড়া-প্রতিবেশীদের আছে। তাই অনাদিনাথ কাছে ডাকলে আমি অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। তিনি হাত বাড়িয়ে আমার একখানা হাত ধরে, শ্বাস ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো।

তারপর এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি হল। লম্বা অনাদিনাথ ঝুঁকে আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। পিছনে আমার যাবতীয় কৌতূহলী ভাইবোন দল বেঁধে আসছে। আমাকে কোথায়, কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে-বিষয়ে তারা চেঁচিয়ে আলোচনা করছে। তাদের ধারণা, আমাকে মার দেওয়া হবে।

পুকুরপাড়ে অনাদিনাথের ঘরের সামনেও ভিড় জমে গেল। কেঁদে ফেলার আগের মুহূর্তের মতো আমার চোখ-মুখ ফেটে পড়ছিল। অনাদিনাথ ভরসা দিচ্ছিলেন, ভয় নেই বাবা, কোনও ভয় নেই।

ঘরে ঢুকে ঝাঁপের দরজা টেনে বন্ধ করলেন অনাদি, জানালার ঝাঁপ খুলে ধীরেসুস্থে ঠেকনা লাগালেন। বাঁশের উঁচু মাচায় তাঁর আধময়লা বিছানা পাতা। সেখানে আমাকে তুলে বসিয়ে তিনি বসলেন মুখোমুখি একটা টুল টেনে। অনাদিনাথ লোকটি খুব সপ্রতিভ ছিলেন না বলেই আমার এখন মনে হয়। তিনি সেদিন আমার সামনেও যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাঁর হাসিটি ছিল যেমন বাচ্চা ছেলেরা ব্যথা পাওয়ার পর কাঁদবার আগে একটু ব্যথাতুর হাসি হাসে। তারপর সেই হাসিটিই কান্না হয়ে যায়। অনেকক্ষণ সেইরকম হাসি হাসলেন অনাদিনাথ, মাথার লম্বা চুল টেনে আঙুলে পাকালেন। তাঁর জানালা বেয়ে আমার ভাইবোনেরা আর পাড়ার রাজ্যের ছেলেমেয়ে উঠে আমাদের দেখছে।

তারপর অনাদিনাথ আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, বাবা, তোমার কি পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে?

পূর্বজন্ম কথাটির অর্থ বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী জন্ম?

তিনি সাগ্রহে ঝুঁকে বললেন, আগের জন্ম। এর আগে কখনও তোমার কি অন্য কোনও নাম ছিল? অন্য কোথাও ছিল তোমার বাড়ি?

আমি ভয় পেয়ে মাথা নাড়লাম, না।

খুব হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন অনাদিনাথ, মনে পড়ে না?

না।

ভাল করে মনে করে দেখো। নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

এই কথা বলে তিনি উঠে জানালা থেকে সবাইকে সরিয়ে ঝাঁপ ফেলে দিলেন। ঘরটা আবছা অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

সেই আবছায়ায় অনাদিনাথ তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। ভয়ে এবং অস্বস্তিতে আমার ঘাম দিচ্ছিল।

অনাদিনাথ বললেন, এবার চোখ বুজে ভাবো। ভাবতে থাকো। নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়বে। তুমি বাবা জাতিস্মর, আমি জানি।

অনেকক্ষণ অনাদিনাথ আমাকে আটকে রাখলেন। কিন্তু আমার কিছু মনে পড়েনি।

তিনি বললেন, কিন্তু তুমি যে তোমার দাদা রাখালকে বলেছ তোমার কী সব পুরনো কথা মনে পড়ে!

এ-কথা ঠিক যে, রাতে পাশাপাশি শুয়ে আমি আর আমার জ্যাঠতুতো দাদা রাখাল অনেক কথা বলাবলি করতাম। সে-বার প্রফেসর গুপ্ত ম্যাজিক দেখিয়ে ময়মনসিংহের ছেলেমেয়েদের তাক লাগিয়ে চলে যাওয়ার পর থেকে আমার দাদা রাখাল পুবের ঘরে স্টেজ বেঁধে ছুটির দুপুরে প্রায়ই ম্যাজিক দেখাত। মানুষ অদৃশ্য করার খেলায় আমি ছিলাম তার বিশ্বস্ত অনুচর। দুই চৌকির মাঝখানে একটু ফাঁক রাখত সে, আর সেই ফাঁকের ধারে আমাকে দাঁড় করাত। তারপর সমবেত দর্শকদের ডেকে বলত, এই দেখুন দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের কুকু। আছে তো? ঠিক আছে—এই বলে সে আমার সামনে একটা কাপড় ধরে আড়াল করত, আমি টুপ করে চৌকির ফাঁক দিয়ে নীচে ডুব দিতাম। কাপড়টা সরিয়ে রাখাল চেঁচিয়ে বলত, এই দেখুন কুকু নেই। নেই, সে কোথাও নেই— খুঁজে দেখুন। তারপর সে চেঁচিয়ে ডাকত, কুকু— কোথায় কুকু—যেখানেই থাক, সাড়া দাও। আমি চৌকির তলায় হামাগুড়ি গিয়ে বইয়ের আলমারির পিছন দিয়ে বেরোতাম। দর্শকদের পিছনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলতাম, এই যে আমি। এই থেকে দাদা রাখালের সঙ্গে আমার চূড়ান্ত বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার নির্জন একাকিত্বের সেইসব অনুভূতির কথা তাকে আমি কিছু কিছু বলার চেষ্টা করতাম।

কিন্তু অনাদিনাথকে সেইসব কথা বলতে বড় লজ্জা করল। বললাম, সে-সব আমি ঠিক জানি না, কী যেন হয়!

অনাদিনাথ মাথা নাড়লেন, হুঁ। তারপর অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তুমি লিখতে পার?

একটু একটু পারি। যুক্তাক্ষর হয় না।

অনাদিনাথ হাসলেন, ঠিক আছে। এবার থেকে কিছু মনে পড়লে দৌড়ে আমার কাছে চলে এসো। আর কাউকে কিছু বোলো না।

সেদিন বাড়িতে আমাকে নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। ঠাকুমা, দাদু, মেজো জ্যাঠামশাই সবাই ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কী কথা মনে পড়ে। ঠাকুমাকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখেছিলাম। তিনি আমাকে আঁচলের বাতাস দিলেন, মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে বীজমন্ত্র পড়ে দিলেন। কেবল আমার কলেজে-পড়া ছোটপিসিমা আমাকে আড়ালে ডেকে খুব ধমক দিলেন, ফের ওই অনাদিটার কাছে কখনও যাবি না।

সাত বছর বয়সে আমাকে ধরল ম্যালেরিয়ায়। তখন বর্ষাকাল। বিছানায় থাকতে চাইতাম না বলে বারান্দায় পিঁড়ি পেতে কাঁথা জড়িয়ে আমাকে বসিয়ে রাখা হত। সারা দিন কাঙালের মতো বসে উঠোন জুড়ে বৃষ্টিপাত দেখতাম। দুর্বল ঘাড় সোজা হয়ে থাকতে চাইত না। তখন পিঁড়ি জোড়া দিয়ে শুয়ে

থাকতাম। মাঝে মাঝে ঠাকুমা জোর করে ঘরে নিয়ে যেতেন। দিনে তেমন জ্বর থাকত না, কিন্তু দুপুরের পর থেকেই চোখ জ্বালা আর শীতভাব টের পেতাম। তারপর প্রবল কাঁপুনি দিলে আস্তে আস্তে আধ-চেতনার মধ্যে ডুবে যেতাম। আমাকে দু'-তিনটে লেপ দিয়ে ঠেসে রাখা হত। কত এলোমেলো ঘোর ঘোর দৃশ্য স্বপ্নের মতো দেখতে পেতাম। গা ভরে জ্বর আসত। পরিপূর্ণ টলটলে জ্বর। কানে ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ একটানা একটা শব্দ। চারদিক নিস্তব্ধ লাগত। আর মনে হত এক অবাস্তব জগতে রয়েছি।

ফিরে ফিরে জ্বর আসত বলে বড় ঘর থেকে আমাকে কবে যেন মায়ের কাছে পশ্চিমের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এক দিন মাঝ রাতে প্রবল তেষ্টায় ঘুম ভেঙে গিয়ে অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারলাম না— কোথায় আছি। কিন্তু বাতাসে মায়ের শরীরের মা-মা সুঘ্রাণটি অমোঘভাবে টের পেয়ে পাশ ফিরতেই মায়ের রোগা বুকের মধ্যে গিয়ে পড়ল আমার জরতপ্ত মাথাটি। জ্ঞান বয়সে সেই প্রথম মায়ের কাছে শোয়া। মায়ের ও পাশে বাবা। আমার জেগে-ওঠা টের পেয়ে তিনি পাশ ফিরলেন। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, জ্বর কত?

মা আমার কপালে হাত রেখে বলল, খুব। তবে ঘাম দিচ্ছে। বোধ হয় ছাড়বে।

বাবা আমার কপালে হাত রাখলেন। পরমুহূর্তেই কুণ্ঠিত হাত সরিয়ে নিলেন। উঠে বসে সিগারেট ধরালেন। মা ধমক দেয়, কী যে বদ স্বভাব, মশারির মধ্যে সিগারেট খাওয়া, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তার ওপর জ্বরো ছেলেটা রয়েছে।

অপ্রতিভভাবে বাবা মশারি তুলে বাইরে গেলেন।

মা ডেকে বলে, বাইরে যখন গেলেই তো জলের ঘটি আর গ্লাসটা দাও।

বাবা নীরবে ঘটি আর গ্লাস মশারির মধ্যে এগিয়ে দিয়ে টিনের চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে লাগলেন। আমাকে জল খাওয়াতে খাওয়াতে মা গজগজ করছিল। সে-সবই বাবার প্রতি তাঁর পুঞ্জীভূত অনুযোগ।

জ্ঞান বয়সে সেই প্রথম জ্বরের ঘোরে আমি বাবা আর মায়ের দাম্পত্য জীবনের একটি দৃশ্য দেখলাম। খুব সুখের দৃশ্য নয়। কিন্তু দৃশ্যটা আমার একরকম ভালই লেগেছিল।

পশ্চিমের ঘর ছিল রান্নাঘরের পাশেই। মাছ ভাজার গন্ধ, ডাল ফোড়ন দেওয়ার গন্ধে বাতাস যখন ম ম করত তখন আমি জ্বরগায়ে ভাত খাওয়ার বায়না ধরে কাঁদতাম। বারান্দার পিঁড়িতে বসার মতো সাধ্য আর ছিল না। একটানা ভুগে শরীর নেতিয়ে থাকত বিছানায়। কুইনাইন আর তেমন তেতো লাগে না। জিব অসাড় হয়ে গেছে, কুইনাইন ঢক করে খেয়ে ফেলি। কাঁচা মৌরির একটা ছোট্ট মোড়ক মা বালিশের কাছে রেখে দিত। তাই থেকে দু'-একদানা মৌরি মুখে দিই। ভাতের গন্ধে মন খারাপ হয়ে যায়। মা রোজই বলে, আজ বিকেলে জ্বর না এলে কাল ভাত দেব। সারা দিন তাই নানা লোককে দিয়ে গা দেখাই। গা ঠান্ডা। দুপুর গড়িয়ে যায়। হয়তো জ্বর আসে না। ভীষণ আনন্দে বুক ভরে ওঠে। আজ হয়তো আর আসবে না। তা হলে কালকেই ভাত। মাকে তেমন বিশ্বাস হয় না। আমার পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় বসে সুনীতির মা তকলিতে পৈতের সুতো কাটত। তাকে ডাকাডাকি করে বলি, জেঠিমা, জ্বরটা দেখুন না একটু। বুড়ি এসে কপালে হাত ছুঁইয়ে বলত, না জ্বর কই! তবে গা-টা একটু ছ্যানছ্যানে আছে। ওই ছ্যানছ্যান টুকুতেই আমি ভয় পেতাম। সুনীতির মাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারতাম না। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতাম খুরওলা খড়ম পায়ে আমাদের জ্ঞাতি নিবারণ জ্যাঠামশাই হাতে পঞ্জিকা নিয়ে বড় ঘর থেকে দাদুর বাবার বাৎসরিক কাজের দিন ঠিক করে বেরিয়ে আসছেন। গায়ে ময়লা ফতুয়া, পরনে পুজোর প্রণামীতে পাওয়া মোটা খাটো ধুতি, চোখে নিকেল ফ্রেমের গোল চশমা। তাঁর টকটকে ফরসা রং, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি— আত্মভোলা এই জ্যাঠামশাই ছিলেন আমাদের বাঁধা পুরুত। দক্ষিণের ঘরের পিছনে যেখানে আমাদের বাড়ির সীমানা সেখানেই বড় একখানা একচালায় তিনি থাকতেন। তাঁর চার ছেলেমেয়ের মধ্যে সবাই ছিল সুন্দর। কিন্তু তুলারানী যে আমাদের ঝুলনে রাধা সাজত— সে ছিল সবার সেরা। নিবারণ জ্যাঠামশাইকে দেখে ডাকতাম, ও জ্যাঠামশাই আমার জ্বরটা দেখুন না। আমাদের বাড়িতে অংশত আশ্রয় নিয়েছিলেন বলেই বোধ হয় নিবারণ জ্যাঠামশাই আমাদের ছেলে বুড়ো সবাইকেই খাতির করতেন। আমার ডাক শুনে শশব্যস্তে এগিয়ে এসে জ্বর দেখলেন, কই জ্বর! কোথায় জ্বর। গা তো ঠান্ডা।

কাল ভাত খাব জ্যাঠামশাই!

খেয়ো, খেয়ো। আমি মাইমাকে বলে দেবো'খন।

জ্যাঠামশাই চলে যাচ্ছিলেন, আমি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললাম, জ্যাঠামশাই, ভাত কি কাঁঠালবিচি দিয়ে খাব?

তিনি থমকে মুখ ফিরিয়ে এক বার আমার দিকে চাইলেন। তাঁর মুখখানা বড় ম্লান হয়ে গেল। কথা না বলে তিনি চলে গেলেন। আমি একা একা হি হি করে হাসলাম। কাঁঠালবিচি নিবারণ জ্যাঠামশাইয়ের বড় প্রিয় ছিল। কেবল পোড়া কাঁঠালবিচি আর ভাজা শুকনো লঙ্কা দিয়ে তিনি একপেট পান্তাভাত খেয়ে উঠতেন। আমরা দূর থেকে তাঁকে দেখে কাঁঠালবিচি বলে চেঁচিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। জ্যাঠামশাই চেঁচিয়ে গাল পাড়তেন। তাঁর মাথা ঝাঁকানোর ফলে টিকি লাফাত। আমরা হাসতাম, হি-হি।

জ্বর নেই। জ্বর আসবে না। ভাবতে ভাবতে আমি উত্তেজিতভাবে নিজের মুখের ভাপ হাতের ওপর পরীক্ষা করতাম। তারপর ক্লান্ত মাথা বালিশে রেখে সিলিঙে রোদের রঙে চোখ রেখে দেখতাম বেলা কত হল। যদি বিকেল পেরিয়ে যায় তবে জ্বর আর আসবে না। সিলিঙে রোদ করমচা গাছের ঝিরঝিরে ছায়া দুলিয়ে খেলত। আমি জিজ্ঞেস করতাম, জ্বর আসবে? ছায়াটা ডাইনে-বাঁয়ে নড়ে দুলে বলত, না, না। জ্বর আসবে না। পশ্চিমের ঘরের পিছনে পগারের ঘাটে এঁটো বাসন মাজার শব্দ হচ্ছে তখন, হুড়োহুড়ি করছে কাক। কচু বনে বাতাস লেগে ধপধপ শব্দ হচ্ছে। নিঝুম দুপুরে বোলতার পাখার শব্দ কানে আসে। তখন কেমন নেশার মতো একটু ঘুম লেগে আসে। হঠাৎ ঠান্ডা স্পর্শে চমকে দেখি—মা। সদ্য আঁচিয়ে আসার ফলে তার হাত ঠান্ডা। আমার কপালে হাত রেখে জ্বর দেখছে। আমি তখন তার হাতে মাছের আঁশটে গন্ধ পেতাম। খাওয়ার পর মা পান খেয়ে এসেছে, লাল টুকটুক করছে ঠোঁট। ঘটি থেকে আলগা করে জল খেত বলে থুতনি থেকে গলা পর্যন্ত একটা জলের রেখা। এলো ভেজা চুল। মা কাছে এলেই তাই একটু শীত শীত করতে থাকত। বলতাম, জ্বর নেই তো মা!

মা আমার কপালে গাল ঠেকিয়ে দেখে বলত, একটু গমগম করছে তো। শুনে মন খারাপ হয়ে যেত। পাখির মতো দুর্বল ঘাড় লটকে হাঁ করে বলতাম, ছাবা দাও। মা মুখ থেকে পানের একটু ছিবড়ে দিত। অনেকক্ষণ ধরে সেটুকু খেতাম।

জ্বরের সময় আস্তে আস্তে পেরিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে। গাঢ় লাল হয়ে আসছে সিলিঙের রোদের রং। সন্ধে হতে আর দেরি নেই। ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে যেন এক ঝলক বাতাস আসত। একটা শীত স্পর্শে আমি চমকে উঠতাম। তারপরই আমার দুর্বল রোগা শরীর থিরথির করে কেঁপে উঠত। ভয়ে আমি ককিয়ে উঠতাম। বিশ্বাস হত না। তবু টের পেতাম জ্বর আসছে। জ্বর আসছে।

মা লেপ দিয়ে আপাদমস্তক চেপে ঠেসে ধরত। সারা সন্ধে ধরে পরিপূর্ণ জ্বর আসত আমার। অসম্ভব হতাশায় হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় মশারির চালের দিকে চেয়ে আমি জ্বরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভাবতাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হত—বিকেলে নিবারণ জ্যাঠামশাইকে কাঁঠালবিচির কথা বলে খেপিয়েছিলাম, সেই জন্যই জ্বর আসেনি তো! মনে মনে ভাবতাম আর কখনও কোনও অন্যায় করব না।

মাঝে মাঝে জ্বর ছেড়ে যেত। তিন দিন চার দিন জ্বর আসত না। তারপর এক দিন শুভক্ষণে ভোরবেলা মা পশ্চিমের বারান্দায় ইঁটের উনুন সাজিয়ে কাঠের জ্বালে কালোজিরে চালের ভাত কাঁচকলা আর পেঁপে সিদ্ধ করতে বসত। ভরা বর্ষা তখন। উঠোন ভেসে যাচ্ছে বৃষ্টিতে। টিনের চালে খই ফোটার শব্দ। তবু ভাত খাওয়ার আনন্দে আমি কাঁথা চাপা দিয়ে জানালার ধার ঘেঁষে বসে মায়ের ভাত রাঁধা দেখতাম। চোখে পড়ত, একটা ছোট চটের টুকরোয় মাথা আর পিঠ ঢেকে আমাদেরই কোনও বোনের পরিত্যক্ত ছেঁড়া ফ্রক পরে তুলারানী উঠোন পেরিয়ে বড় ঘরের দিকে যাচ্ছে। বুকের কাছে ধরা একটা কলাই করা বাটি। ঠাকুমার কাছ থেকে মুড়ি চেয়ে আনবে।

ক্রমে বর্ষার জল উঠোন ভাসিয়ে পগারের সঙ্গে এক হয়ে যেত। আমার জ্যাঠতুতো ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিকুঞ্জ কলার মান্দাস বেয়ে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াত। দাদুকে কোর্টে নেওয়ার জন্য রিকশা আসত ভিতর-বাড়িতে বড় ঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত। দাদু বেরিয়ে গেলে পুবের ঘর থেকে আমার ভাই-বোনেরা দল বেঁধে বেরিয়ে আসত জলে লাফাবে বলে। কালোজিরে চালের সুগন্ধী ভাত খেয়ে হাত শুঁকতে শুঁকতে আমি জানালার কাছে বসে বর্ষার দৃশ্য দেখতাম।

## ॥ দুই ॥

ঘোর জ্বরের মধ্যে অস্পষ্ট ঘোর ঘোর হয়ে যায় পৃথিবী। স্বপ্নের মতো অবাস্তব হয়ে যায় চারধার। ঘুম ও জাগরণের তটরেখা ঘুচে যায়। চেনামুখ বুকের ওপর ঝুঁকে চোখে চোখ রেখে চেয়ে থাকে। আমি ঠিক যেন চিনতে পারি না। কখনও টের পাই কার যেন ভেজা ঠান্ডা হাত আমার কপাল আর বুক ছুঁয়ে জ্বর দেখছে। সেই শীতস্পর্শে শিউরে ওঠে গা। মাঝে মাঝে আধা-চেতনায় চমকে উঠে টের পাই, গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বালতিতে জল পড়ার গভীর বিষণ্ণ শব্দ। মাথা, মুখ আর কানের পিঠ বেয়ে জলের ধারা নামে। মনে হয় জলপ্রপাতের মধ্যে শুয়ে আছি। চোখ খুলে দেখি বিছানার ধারে ঝুলে আছে মাথা, মাথার নীচে অয়েলক্লথের লাল রং। মেঝেয় রাখা বালতি। কোনওটারই অর্থ বুঝতে পারি না। কেবল মনে হতে থাকে, পাতকুয়োর মধ্যে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছি। এক্ষুনি পড়ে যাব। ভয় পেয়ে নড়ে উঠি, জলের ধারা থেকে মাথা সরিয়ে নিই। কে যেন চেপে ধরে থাকে।

বর্ষাকালটা সে-বার বড় দীর্ঘস্থায়ী হল। আমার ভিতর-বাইরেও এক অবিরল বর্ষাকাল টের পাই। মাঝে মাঝে নিশুত রাতে জ্বর ছেড়ে যায়। দুর্বল, ঠান্ডা শরীর। তীব্র পিপাসায় জেগে উঠি। শুনতে পাই, বাইরে অবিরল জলের শব্দ। কচুপাতায় বাতাস লাগছে। ধোপাদের নাবাল মাঠে জল জমে থাকে, সেখান থেকে অবিরল ব্যাঙ ডাকার শব্দ আসতে থাকে। হাঁস চুরি করে উঠোনের জমে-থাকা জলে ছপছপ শব্দ করে পার হয়ে যায় শিয়াল। পুবের ঘরের দাওয়া থেকে আমাদের দু'টো দিশি কুকুর ঘুম ভেঙে একটু ভুক-ভুক শব্দ করে, তারপর বৃষ্টির বিষণ্ণতায় নেতিয়ে পড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার ডুবে যায় ঘুমে। ঘরে ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে হাওয়া আসে, দপদপিয়ে ওঠে কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনের শিষ। ঘরময় ভৌতিক ছায়া নড়ে যায়। তখন হঠাৎ টের পাই, চারি দিকের এক অলৌকিক শূন্যতা আমাকে আমার চেনাজানার জগৎ থেকে, মা বাবা আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। মনে পড়ে না, আমি কে। নাম মনে পড়ে না, ঘর মনে পড়ে না, বয়স মনে পড়ে না। কেবল মনে হয়, আমি আবহমান কাল থেকে এমনি এক বর্ষার মাঝরাতে ম্লান হ্যারিকেনের আলোয় জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর শুয়ে আছি। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠি। অমনি মা বুকে জাপটে ধরে পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর মতো 'ও-ও' শব্দ করে ঘুম পাড়ায়।

মাঝে মাঝে মেঘ কেটে গেলে বহু দূরে অস্বচ্ছ নীল গারোপাহাড় মেঘের মতো দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্র ফুলে ওঠে, ভয়াবহ বিশাল ঘোলা জল রেল গাড়ির মতো ছুটতে থাকে। আমি ভাত পথ্য পেয়ে টলমলে পায়ে বারবাড়ি পর্যন্ত চলে যাই। মুগ্ধ হয়ে দেখি, মাঠের রং বৃষ্টিতে ধোয়া গাঢ় সবুজ, গভীর নীল আকাশ, সেই আকাশের গায়ে সাদা রোঁয়ায় ঢাকা নরম বলের মতো ফুল ফুটিয়ে কাছারিঘরের পিছনে কদম গাছটা দাঁড়িয়ে। ব্রহ্মপুত্রের পারে দাঁড়ালে নদীর ও-পারে পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত দেখা যায়।

কাছারিঘরের বারান্দায় কাকার জিমনাশিয়ামের একটি কোণে তুলারানী তার পুতুলের সংসার সাজিয়ে বসেছে। ন্যাকড়ার পুঁটলিতে আর-একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে সুতোয় বেঁধে তার পুতুলের মাথা তৈরি হয়। কালি দিয়ে চোখ-মুখ এঁকে দেয় কেউ। সেই তুচ্ছ পুতুলের ধড়হীনতাকে সারা দিন নানা রঙিন কাপড়ের টুকরোয় ঢেকে দেয় তুলারানী। অখণ্ড মনোযোগে। সারা দিন ওই তার খেলা।

মাথা ধোয়ানোর সুবিধে হবে বলে আমার চুল খুব ছোট করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। নলের মতো সরু হয়ে গেছে ঘাড়। মাথাটা নড়বড় করে। হাঁটু আর কনুইয়ের হাড় গিঁটের মতো ফুলে থাকে। বুকের পাঁজরা গোনা যায়। আমার সেই চেহারা দেখে পুতুলের ঘর থেকে তুলারানী হেসে খুন হয়।

কুকুভাই, তোমাকে কেমন দেখায় গো!

লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যাই।

পুবের ঘরের ছাঁচতলায় কেরোসিন কাঠের বাক্সে হাঁসের ঘর। ভাঙা হাঁসের ঘরের সামনে দাদু হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। তাঁর কপালে ভাঁজ, গম্ভীর চোখ-মুখ। তাঁর চার ধারে কাদার ওপর হাঁসের পালক ছড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে একপলক তাকিয়ে থেকে বলেন, জুতো পায়ে দাওনি কেন? যাও, জুতো পরে এসো। ঠাকুরমার কাছ থেকে ক'টা পেরেক চেয়ে এনো, আর হাতুড়িটা।

তারপর দাদু ঠুকঠুক করে সারা সকাল হাঁসের ঘর সারায়, আমি পাশে উবু হয়ে বসে থাকি। দাদু

আপনমনে কথা বলেন, খামোখা দু'টো কুকুরকে ভাত দিই। ভাউরার পোয়েরা কোনও কাজে যদি আসে! দেখছে তো এই বাড়ির স্বভাব, সবাই বসে বসে খায়, কেন কাজ করবে?

পচা কাঠে ভুসভুস করে পেরেক ঢুকে যায়। কেরোসিন কাঠের মতো পলকা কাঠ, তার ওপর জোর বর্ষা গেছে! দাদু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকেন বিরক্তিতে। বিড়বিড় করে বলেন, কিছুই বাঁচানো যাবে না। সব যাবে, সব চলে যাবে এক দিন। অবোধ জীব, অবোলা, নিজেদের বাঁচাতে জানে না। শেয়ালে ধরাতে কত না জানি চেঁচিয়েছিল, বৃষ্টিতে শোনা যায়নি।

আমি শুনেছিলাম দাদু, হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দ, পাখার ঝটফটানি, তারপর শেয়ালটা জল ভেঙে চলে গেল।

কাউকে ডাকোনি কেন?

আমার তখন জ্বর যে! তা ছাড়া, খুব ভয় করছিল।

দাদু বাক্সর ভিতর হাত দিয়ে পচা নাড়া বের করে আনতে আনতে বলে, যাও তো, খড়ের গাদা থেকে খড় নিয়ে এসো। পারবে তো? শরীর কেমন?

আমি উত্তর না দিয়ে দুর্বল পায়ে ছুটে যাই। খড় নিয়ে এসে দেখি দাদু হাতে একটা ডিম নিয়ে বসে মন দিয়ে দেখছেন। চোখ তুলে বললেন, দ্যাখো, ডিমটা কতকাল ধরে কোয়ালের তলায় ছিল। নীল হয়ে গেছে। কেউ ঠিক মতো কিছু দেখে না। হাঁসদেরও বড় ভুলো মন, ডিম পেড়ে অনেক সময়ে ভুলে যায়।

সযত্নে তিনি বাক্সে কোয়াল বিছিয়ে দেন, বিড়বিড় করে বলেন, বিষয়ী যারা তারা সবাই সাধু নয় ঠিকই কিন্তু যারা বড় সাধু তারা কিন্তু নিশ্চয়ই বড় বিষয়ী, সংসারজ্ঞান তাদের নখে নখে থাকে। কিন্তু যারা অলস-উদাসীন অকর্মা তাদের ধর্মও হয় না, কর্মও হয় না। তারা পৃথিবীতে অতিথির মতো বাস করে। তাদের বাস স্বপ্নে। আমি তো আর স্বপ্ন দেখি না।...তোমার ক'দিন জ্বর আসছে না কুকু?

দু'দিন।

ভাত খেয়ে দুপুরে ঘুমিয়ো না যেন। তাতে শরীর রসস্থ হয়। তুমি অত ভুগছো কেন? আর কেউ তোমার মতো ভোগে না তো! যারা সৎকাজ নিয়ে থাকে তাদের অসুখ হয় না। কাজ আর চিন্তা সৎ হলে শরীরে এক ধরনের তাপ সৃষ্টি হয়, তাতে রোগের পোকা মরে যায়।

হাঁসের ঘর বেঁধে বাগানের দক্ষিণ সীমায় নারকোলের গাছগুলোর কাছে চলে আসেন দাদু। আমাকে কাছে ডেকে বলেন, ওই গাছটা দ্যাখো, বাড়ছে না। কোদালটা দৌড়ে নিয়ে এসো তো কুকু, আর সুদর্শনকে বলো গোয়ালঘরে নুনের ভাণ্ড আছে সেটা যেন নিয়ে আসে।

দাদু নারকোল গাছের গোড়া কুপিয়ে নুন পুঁতে দেন। উঠোনে তখন দুর্লভ রোদটুকুতে তাড়াতাড়ি তোশক বালিশ টেনে রোদে দিচ্ছে সুদর্শন চাকর। রান্নাঘরে ঢুকবার আগে পুকুরে ডুব দিয়ে ভেজা কাপড়ে আদ্যার স্তব বলতে বলতে সাদা উঠোনে ছোট্ট পায়ের জলছাপ ফেলে ঘরে যাচ্ছেন বড় জেঠিমা। বড় ঘরের দরজায় দু'হাত ওপর দিকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে আমার রোগা দিদি বুনু। পুন্নি বারান্দার কোণে বসে দাদুর তামাক সাজছে। তুচ্ছ দৃশ্য সব, কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। অনেক দিন পর উঠোনের রোদে দাঁড়িয়ে সংসারের এই সব দৃশ্য দেখে নিজেকে পৃথিবীর একজন বলে মনে হয়।

কিন্তু তবু আমি সকলের থেকে আলাদা। দাড়িয়াবান্দা খেলতে গিয়েছিলাম একবার জ্বর থেকে উঠে। প্রথম দান খেলতে গিয়েই বুঝেছিলাম যে, আমি আর সেই আগের কুকু নেই। দুর্বল শরীর ঢলে পড়ে, কিছুতেই কোট পার হতে পারি না। দু' দানের পর খেলুড়িরা আমাকে বাদ দিয়ে দিল। সেই থেকে আমি দলছুট। মাঝে মাঝে জ্বর আসে, আমি ঘরে চলে যাই। বেশ কিছু দিন পর আবার যখন বেরিয়ে আসি তখন আমার সঙ্গের খেলুড়িরা আমাকে অনায়াসে ভুলে গেছে। অভিমানে আমি চলে যাই ব্রহ্মপুত্রের পারে যেখানে নতুন একটা ইস্কুলবাড়ি তৈরি হচ্ছে। চার দিকে দেয়াল উঠেছে, ছাদ ঢালাই হয়নি। বড় বড় জানালা দরজায় পাল্লা নেই, হু হু ব্রহ্মপুত্রের হাওয়া আসে। এ-ঘর থেকে ও-ঘর একা একা ঘুরে বেড়াই। কথা বলি একা। কখনও রফিকের সঙ্গে দেখা হয়। দুপুরবেলা ইস্কুলবাড়ির দেয়ালে ভারার ওপর বসে কর্ণিক হাতে রফিক রাজমিস্ত্রি ইঁট গাঁথে। তার চোখে সুর্মা, পাটকরা চুল, কানে বারো মাস আতরের তুলো। পরনে চমৎকার বার্মিজ লুঙ্গি আর হাতা গুটানো ইংলিশ কাফের রঙিন শার্ট। মাথার

ওপর খোলা ছাতা, বাঁটখানা ঘাড় আর কাঁধের ফাঁকে চেপে ধরে রাখে। তার ছেলে সাদিক গামছায় বাঁধা সানকিতে ভাত বয়ে আনে, আর ঘটিতে জল। রফিক ভাত খেতে খেতে আমাকে ডেকে কাছে বসায়। জয়দেবপুরের ঈশান পণ্ডিতের ভূত-পোষার গল্প বলে।

ভূত পোষা বড় সোজা নয় বাবা, সারাক্ষণ বীজমন্ত্র ধরে রাখতে হয়। শান্তি মতো ঘুমোতে পারবে না, খেতে পারবে না, বাহ্য পেচ্ছাপ ফিরতে পারবে না, সারাক্ষণ ভূত ঘুরবে সঙ্গে সঙ্গে। ঘর-বাড়িতে ম ম করবে তাদের গায়ের বিটকেল গন্ধ; ভামের গায়ের গন্ধ জানো তো— অনেকটা সে-রকম। তারা সারাক্ষণ তক্কে থাকে, কোন সময়টায় তোমার বীজমন্ত্রে ফাঁক পড়েছে। পড়ল তো সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়বে তারা। ঈশান পণ্ডিতের হয়েছিল সেই বিপদ...

আমি দেখি, গুঁড়ো মাছের চচ্চড়ির তেল দিয়ে অনেকটা ভাত লাল করে মেখেছে রফিক। পেঁয়াজ রসুনের তীব্র ঝাল-গন্ধ নাকে এসে লাগে। আমার লোভী চোখ চকচক করে। সন্তর্পণে মুখ ফিরিয়ে ঢোক গিলে ফেলি।

সন্ধেবেলা কাছারিঘরের বারান্দায় মেজো জ্যাঠামশাই যে ইস্কুল বসান আমি আর সেখানে বসি না। সাঁঝবাতির পরই বড় ঘরে ঠাকুমা খাটের মশারি ফেলে দেয়, নিখুঁত করে গোঁজে। পাঁচ ব্যাটারির প্রকাণ্ড ভারী টর্চখানা জ্বেলে মশা খোঁজে। আমি মশারির মধ্যে শুয়ে থাকি। সারা দিন রোদ লেগে ঘরের টিনের বেড়া আর চাল তেতে থাকে, সন্ধের পর জুড়োয়। তাই নানা রকম ঠুংঠাং ঝন শব্দ হতে থাকে। বাইরে মশার শব্দ তীব্র তারের যন্ত্রের মতো বাজতে থাকে। ঝিঁঝি ডাকে। বারান্দা থেকে দাদুর তামাক খাওয়ার নিঃসঙ্গ শব্দ শুনতে পাই। পাটাতনের ওপর ইঁদুরের নরম দৌড়-পায়ের আওয়াজ আসে। আসনের সামনে বসে লেংড়ি ঠাকুমা উরুর ওপর প্রদীপের সলতে পাকায়। মশা খুঁজে ঠাকুমা ছোট্ট একটা কৌটো খুলে দাদুর আফিঙের ডেলা থেকে ছোট্ট ছোট্ট গুলি তৈরি করে একটা সাদা গুঁড়ো দিয়ে মেখে রাখে। কী মিষ্টি গন্ধ আফিঙের! সেই গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে। গুলি পাকানো হয়ে গেলে ঠাকুমা শুয়ে শুয়ে নারকোলের ছোবা দিয়ে গা চুলকোয়। ঠিক সেই সময়ে তুলার মা আসে। পরনে পুজোর প্রণামীতে পাওয়া খাটো লালপেড়ে মোটা শাড়ি। আঁচলের তলায় লুকোনো বাটি। তার গা থেকে আমি বরাবর শশার গন্ধ পাই। মশারির বাইরে খাটের বাজুতে ভর রেখে মশারির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খামোখা ঠাকুমার মাথার চুলে বিলি কাটে। নিচু স্বরে গুনগুন করে মা-জেঠিমাদের নামে কূট-কচালির কথা বলে। সন্ধ্যারাত্রিতে কত বার তাকে দেখেছি প্রেতমূর্তির মতো আমাদের উঠোনে চলাফেরা করতে, কখনও দেখেছি দক্ষিণের ঘরের খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা পশ্চিমের ঘরের বেড়ার ধার ঘেঁষে। দাদু মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ে, কে ওখানে? অমনি নিঃশব্দ দ্রুতবেগে সে মিলিয়ে যায়। তখন ঠাকুমা দাদুকে ধমকে বলে, বাড়ির বউ-ঝি ঘুরছে এখানে সেখানে, তোমার চেচানোর কী?

দাদু অবাক হয়ে বলে, বউ-ঝি হলে উত্তর দিত। হ্যারিকেনটা আনো তো। দিনকাল ভাল না।

আসলে তুলার মাকে কেউ কোনও কাজে লাগায়নি। সে নিজেই ঠাকুমার হয়ে গোয়েন্দাগিরির কাজ বেছে নিয়েছিল। তার সামনে মা-জেঠিমাকে সতর্কভাবে কথা বলতে দেখেছি। তার ছিল খুব ফরসা রং, নাকে নথ, মুখটা ছিল একটু ছুঁচোলো। তার তাড়নায় কত বার নিবারণ জ্যাঠামশাই বিবাগী হয়ে যাবে বলে বেরিয়ে বেগুনবাড়ির যজমানদের বাড়িতে কয়েক দিন কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছে, সঙ্গে এনেছে শোলাকচু, পানিফল, কামরাঙা, কিছু আতপ চাল, সঙ্গে হয়তো বা গোটা দুই গামছা। মুখে অপরাধী হাসি। সুন্দর ফুটফুটে তুলারানীর মুখশ্রী নিষ্পাপ, কিন্তু সে বরাবর গন্ধলেবুর গাছ থেকে লেবু চুরি করে নিয়ে যায়, হাঁসের ঘর থেকে ডিম কিংবা রোদে দেওয়া আমসি। তার দাদা সিধুর রাজপুত্রের মতো টকটকে চেহারা, তবু শোনা যেত, সে একজন পাকা সিঁদেল চোরের সাকরেদি করে বেড়ায়।

কত বার পুকুর পাড়ে এঁটো বাসন থেকে ঘটি-বাটি চুরি গেছে। ঠাকুমা চেঁচামেচি করেছে, পরদিন তুলার মা সেই সব বাসন চুপি চুপি ঠাকুমাকে ফেরত দিয়ে যেত, বলত, ঘরের পিছনে কাকে নিয়ে ফেলেছিল।

অত ভারী বাসন কি কাকে নিতে পারে? তুমি বলো কী রাঙাবউ?

শীতকালের ভোরবেলা আমাদের বাগানের কপি গাছের পরতে পরতে শিশিরের গুঁড়ো জমে থাকে। কুয়াশা পান করে লকলকিয়ে ওঠে পালঙের পাতা। কাকভোরে একজোড়া কচি হাত গাছপালার আড়ালে

চুপিসারে উপড়ে নেয় কচি দুধ-সাদা কপিগুলি, ছিঁড়ে নেয় পালঙের পাতা। কাঠকয়লা দাঁতে চেপে কুয়োয় বালতি ফেলতে গিয়ে থমকে গিয়ে দাদু উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শোনেন, হাঁক দেন, কে রে!

অমনি বাগান নিস্তব্ধ। গাছপালার আড়ালে সরে যায় কচি ফরসা দু'খানা হাত। নিথর জড়সড় হয়ে যায় কচি শরীর। দাদু বারান্দার টিনের বেড়ায় গোঁজা দাখানা টেনে নিয়ে আগল খুলে বাগানে ঢোকেন। খুঁজতে থাকেন বাগানময়। আগাছার আড়াল থেকে ভীত একজোড়া চোখ তাঁকে লক্ষ করে। দাদু পুব দিকে এগিয়ে গেলে ছোট্ট পা দু'খানায় হরিণ-দৌড় দেয় চোর। দাদু চকিতে ফিরে আগাছার আড়ালে কুয়াশায় অস্পষ্ট চোরের মূর্তি দেখে দাখানা ছুড়ে দেয়। তখন পশ্চিমের ঘরের দাওয়া থেকে ভোরবেলা হাই তুলতে তুলতে কচুপাতায় পেচ্ছাব করছি। শব্দ শুনে ছুটে যাই। তারপর শীতের সকালে এক তীব্র শ্বাসরোধকারী সুন্দর দৃশ্য দেখি। গাঢ় সবুজ ঘাসের ওপর সাদা তুলোর দলার মতো বসে আছে সুন্দর তুলারানী। যন্ত্রণায় মুখ খুলে শ্বাস নিচ্ছে, ইঁদুরের দাঁতের মতো ঝিরিঝিরি সাদা দাঁত, লাল টুকটুকে মাড়ি, ঠোঁটে নীল আভা, মুখে আঠাঘামের মতো শিশিরের জল লেগেছে, থোপা থোপা কালো আঙুরের মতো চুলের রাশি ঝেঁপে আছে মুখখানি। বোতামছেঁড়া ঢলঢলে ফ্রক নেমে গিয়ে তার সাদা শিশু শরীর উদোম হয়ে ঠান্ডায় কাঁপছে। গোড়ালির কাছে পড়ে আছে দাদুর ভারী দাখানা, সাদা সুন্দর গোড়ালি ভাসিয়ে আলতার মতো রক্ত ঝরছে। কী সুন্দর সেই দৃশ্য! কী নিষ্ঠুর, তীব্র আকর্ষণকারী! বুকের কাছে তখনও ধরা রয়েছে ধপধপে সাদা কচি কপির ফুল। সেই দৃশ্যের সৌন্দর্য কে আর দেখেছে সেই কাকভোরে! শুধু একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাব দাদু স্ব-সৃষ্ট এই অদ্ভুত সৌন্দর্যের দৃশ্য দেখে প্রথম শ্লোক উচ্চারণকারী বাল্মীকির মতোই স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অনেকক্ষণ পর দাদু আমাকে দেখলেন। তাঁর চোখের কয়েক পলকের মুগ্ধতা কেটে গিয়ে অস্বস্তি দেখা দিল।

কুকু, যাও তো, বড় ঘরের জালের আলমারিতে আয়োডিনের শিশি আছে, নিয়ে এসো। ঠাকুমাকে বলো তুলো আর পরিষ্কার তেনা দিতে। এই বলে দাদু গ্যাঁজা গাছের পাতা ছিঁড়ে হাতে ডলে তুলারানীর কাটা পায়ে চেপে ধরলেন। পায়ে পট্টি বেঁধে দিতে দিতে বিড়বিড় করেন, নিখাগীর বেটি, নিমকহারাম...

তবু তুলারানীর সুন্দর মুখে কৃতকর্মের কোনও ছাপ পড়ে না। সাদা দুধেদাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে সে হাসে। কালো আঙুরের থোলোর মতো তার চুলরাশি ঝেঁপে থাকে প্রতিমার মতো মুখ। গোড়ালিতে, হাঁটুর ভাঁজে, কনুই আর ঘাড়ে ময়লা বসেছে, রুক্ষ চুলে তেল পড়েনি কতকাল। তবু তাকে কত শুভ্র ও সুন্দর দেখায়। চোর তুলারানীর সেই সৌন্দর্য কেউ দেখে না, বহু ছেলেমেয়ের ভিড়ে সেই সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে। কোনও দিন হয়তো বা দেখেছিলেন আমার বড় জেঠিমা।

মাঝে মধ্যে আমার মোটাসোটা বড় জেঠিমা আমাকে 'সোনার গোপাল' বলে ডাকতেন। দক্ষিণের ঘরে কত দিন তাঁর বুকে শুয়ে ছেলেবেলায় গোবরদির কইমাছ আর খোয়াক্ষীরের গল্প শুনেছি। সেই সময়ে মশাল জ্বেলে আসত মুশকিল আসান, কিংবা শ্মশানকালীর সাজপরা বহুরূপী। ভয় পেয়ে জেঠিমার বুকে মিশে নিথর হয়ে থাকতাম। হঠাৎ জেঠিমা চেঁচিয়ে উঠতেন, কী সর্বনাশ করলি রে ও কুকু, কী করলি? ও সেজোবউমা, দেখো এসে, এত বড় ছেলে মুশকিল আসান দেখে ভয় পাওয়ার কী তোর —অ্যাঁ?

ঘাটে-পথে, কি করমচাতলায় কোথায় এক দিন তুলারানীর একক অসহনীয় সৌন্দর্য লক্ষ করলেন বড় জেঠিমা। বেশ চেঁচিয়ে বললেন, কুকুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।

তুলারানী ইঁদুরের মতো দাঁতে দাঁত চেপে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল, ইঃ!

দশ-পনেরো দিন ভাল থাকি, ভাত খাই, একা একা অল্পস্বল্প খেলা করি। আবার এক দিন দুপুরে ভাত খাওয়ার পর শীতভাব টের পেয়ে রোদে গিয়ে চুপিসারে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসি। ম্লান অপরাহ্নের আলো মিলিয়ে যায়। কোথা থেকে এক রহস্যময় শীতবাতাস এসে আমাকে বাঁশপাতার মতো কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। সন্ধের আগেই বিছানা নিই। অস্পষ্ট ঘোর-ঘোর হয়ে যায় পৃথিবী। স্বপ্নের মতো অবাস্তব হয়ে যায় চার ধার। ঘুম ও জাগরণের তটরেখা আস্তে আস্তে মুছে যেতে থাকে। অন্য ছেলেমেয়েরা যেমন দিন দিন বড় হয়, আমি তেমনি দিন দিন শিশু হতে থাকি। বায়না ধরি, কাঁদি। সারা দিন খাটাখাটনির পর ঘুমোতে না পেরে মা উঠে বসে চড়-চাপড় দেয়। বড় ঘর থেকে দাদু ডাক দেন, ও সেজোবউমা, কাকে মারছ? ওই রোগা ছেলেটাকে! তোমরা কি মানুষ?

খড়মের শব্দ করে দাদু উঠোন পার হয়ে আসেন। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন, ওকে আমার কাছে দাও। রোগা ছেলের বায়না সামলাতে পার না—কেমন মা তোমরা?

মা ঘোমটা মাথায় দরজা খুলে দেন। দাদু সাত বছর বয়সি আমাকে অনায়াসে শিশুর মতো কোলে করে নিজের বিছানায় নিয়ে যান। ঠাকুমার বুক ঘেঁষে শুই। তাঁর এগারো ভরির বিছে-হারের শীতল স্পর্শ আমার কপাল ছুঁয়ে থাকে। শুনতে পাই ঘরের এক কোণে ছোটপিসিমা বি এ পরীক্ষার ইংরেজি পড়া করছে। সেই অচেনা ভাষার গুনগুন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

শীতের গোড়ায় সে-বার এক মাঝরাতে উঠে পেচ্ছাপ করে ফিরে এসে ভীষণ ককাতে লাগলেন দাদু।

ঠাকুমা জেগে উঠে বললেন, কী হয়েছে?

দাদু মাথা নাড়লেন, কিছু না। দেখি আর-এক বার যাই। পেচ্ছাপের দ্বারে বড় জ্বালা করছে। রাতে জল খাইনি নাকি! বলে ঘটি থেকে কয়েক গ্লাস জল ঢেলে খেলেন। তারপর আধঘুমের মধ্যে শুনলাম, তিনি বার বার দরজার খিল খুলে বাইরে যাচ্ছেন, ককিয়ে উঠছেন মাঝে মাঝে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন।

পরদিন কোর্টে গেলেন না। শুয়ে রইলেন। ডাক্তার এল। বাড়ির সকলের মুখ গেল শুকিয়ে। একটি সুতোয় ঝুলছে সংসার, যদি সেই সুতোটাই ছেঁড়ে! বড় জ্যাঠামশাই দোকানে গেলেন না, মেজো জ্যাঠামশাইকে দাদু পাঠালেন এক উকিলের কাছে উইলের কাগজপত্র তৈরি করতে। বাবা উদাসীন চোখে চেয়ে পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় বসে পা নাচালেন সারা সকালটা। বেলা বাড়লে লোকজনে বাড়ি ভরে গেল। সেদিন কেউ আর হাঁসের ঘর খুলে দিল না, বাছুরে সবটা গোরুর দুধ খেয়ে ফেলল, মাঠায় মাখনের গুলি ভাসিয়ে বেচতে এসে ফিরে গেল হারাণ গোয়ালা। ভাইবোনদের জেঠিমারা তাড়াতাড়ি মাছ-ভাত খাইয়ে দিল। ঠাকুমা আর সতেরো বছরের পুরনো চাকর সুদর্শন দাদুর মাথার দু'ধারে বসে রইল ঠায়। আমাকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হল পশ্চিমের ঘরে মায়ের কাছে। সারা দিন নিস্তব্ধ রইল বাড়ি। বেড়া ভেঙে গোরু ঢুকল বাগানে, মটরশাকের ক্ষেত নষ্ট করে দিয়ে গেল।

ক'দিন পর দাদু উঠলেন। এসে বসলেন বাইরের ইজিচেয়ারে। সুদর্শন তামাক সেজে আনে। কিন্তু দাদুর পেচ্ছাপের দোষটা থেকেই গেল। কেমন একটু বুড়োটে দেখায় তাঁকে। একটু বিরক্তির ভাব থাকে মুখে কিংবা অন্যমনস্কতা। গলার কাছে হঠাৎ একটু চামড়া ঝুলে পড়ে দুলদুল করে। কয়েক দিন বন্ধ থাকার পর অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার আবার খোলে, বাবা যায় ফজলুর বাড়ির তাসের আড্ডায়, মেজো জ্যাঠামশাই সাইকেলের রডে আমার দিদি বুনুকে চাপিয়ে নিয়ে যায় বয়ড়ার আখের খেত দেখতে। কিন্তু কেউই আর খুব নিশ্চিন্ত বোধ করে না।

॥ তিন ॥

সারা দিন আমার কিছুই করার ছিল না বলে, জ্বর গায়ে আমি কেবল জানালা দিয়ে উঠোনের দৃশ্য দেখতাম। আমাদের বড় উঠোনটায় দেখবার দৃশ্য সামান্যই ছিল। তবু সারা দিন সেইটুকু দেখা এবং কেবলই দেখা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। বৃষ্টির জলে উঠোন ভরে উঠছে। তাতে ফুটকুড়ি কাটছে বৃষ্টির ফোঁটা, বড় ঘরের বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট পড়ছে, সদ্য লেজ খসা ব্যাঙ উচ্চিংড়ের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে ঘরের দিকে। সুদর্শন একটা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়ে বড় ঘর থেকে রান্নাঘরে যাচ্ছে। সুপুরির খোল টানতে টানতে বারবাড়ি থেকে ভিতরের উঠোনে ঢুকছে তুলারানীর দাদা সিধু। দক্ষিণের ঘরের ছাঁচতলায় অসাবধানে সাইকেলখানা ঠেস দিয়ে রেখে গেছে আমার জ্যাঠতুতো দাদা সুবল, সাইকেলখানা ভিজছে। পগার থেকে বাসন ধুয়ে এসে পুবের বারান্দায় বসে পায়ের জোঁক ছাড়াচ্ছেন মেজো জেঠিমা। বৃষ্টি বাড়লে আবছা হয়ে যেত উঠোনের দৃশ্য। কুয়াশার মতো একটা ভাপ উঠে চার দিক ছেয়ে ফেলত। তখন আর কারও নড়াচড়া দেখা যেত না। চারি দিক জনহীন, নিস্তব্ধ হয়ে যেত। কেবল সৃষ্টির প্রথম যুগে হাজার বছর ধরে যেমন অবিরল বৃষ্টি এসেছিল, বৃষ্টির দৃশ্য দেখা যেত। রোদ উঠলে উঠোন জুড়ে রোদে দেওয়া হত জামা-কাপড়, বিছানা, ধান, বড়ি, জুতো। কোর্ট কেটে

এক্কা-দোক্কা খেলত পুন্নি, তুলারানী, বুনু, নমি। বহু দূর আকাশ দেখা যেত। কখনও কখনও আমি পিছনের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াতাম। জানালার কপাটের গায়ে হাতির কানের মতো বিশাল কচুপাতা মাথা উঁচু করে আছে। ফলের বোঝা নিয়ে অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে পেঁপে গাছ, জলবিছুটির ঘন বন, তার ও পাশে শ্যাওলায় সবুজ পগার। ঘাটের কাছে ছাই-মাটিতে ঘোলা হয়ে আছে জল। পগারের ও-পাশে বৈষ্ণবী বিরজার ঘরখানা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় নিঝুম দেখাত। একজন্ম বেশ্যাবৃত্তি করে সে কিছুই সঞ্চয় করতে পারেনি। তবু তার সংসার চলত। সারা দিন সে ঘরখানা, উঠোনখানা বড় পরিষ্কার রাখত, কাঁঠাল তলায় আমতলায় একটিও পাতা কি কুটো পড়ে থাকত না। তার পিতৃপরিচয়হীন ছেলে কমলাক্ষ ছিল কালো নধরকান্তি। চকচকে ছিল কমলাক্ষের গায়ের চামড়া। বরাবর দেখেছি সে আমাদের খেলতে দেখলে মাঠের ধারে এসে দাঁড়াত, কখনও খেলতে নামত না। ভদ্রলোকদের দেখলে সে মাথা নিচু করে চলে যেত। রাখাল কি সুবল কখনও কখনও তাকে সকলের সামনে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, তোর বাবার নাম কী রে? মেছোবাজারের বেশ্যাপাড়ায় কমলাক্ষের দিদি হারাণী তার মায়ের ব্যবসায় নেমেছিল। মাঝে মাঝে দেখেছি থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়িতে সস্তা রংচঙে শাড়ি আর গিল্টির গয়না পরা হারাণী এসে নামল বড় রাস্তায়। আমাদের বারবাড়ি দিয়ে দক্ষিণের ঘরের পিছনের বাগানের ও-পাশে তাদের যাওয়ার রাস্তা। সেই রাস্তাটুকু বেশ আস্তে ধীরে, হাসিমুখে, হেলেদুলে পার হত হারাণী। তার কপালে সিঁথিতে মেটে সিঁদুর, তেল চকচকে মুখ, পানে রাঙা ঠোঁট। তাকে দেখে আমাদের পাড়ার অনেক ভদ্রলোককে লুকোতে দেখেছি। ছাতায় মুখ ঢেকে এক দিন সরে পড়েছিল গোলকপুরের জমিদারদের দাতব্য ডিস্পেন্সারির কম্পাউন্ডার বুড়ো সিদ্ধেশ্বর। আমাদের শুনিয়েই হারাণী তাকে ডাক দিল, ও সিদ্ধেশ্বর, শোনো। বুড়ো সিদ্ধেশ্বরের সে কী অপ্রস্তুত অবস্থা। ওই বুড়ো লোকটাকে নাম ধরে ডেকে তুমি বলে সম্বোধন করায় আমি মনে মনে ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম। তাকে দেখলে আমাদের খেলা যেত থেমে। আমরা সবিস্ময়ে চেয়ে দেখতাম জলজ্যান্ত একজন বেশ্যাকে। ভয় পেতাম, ঘেন্না করতাম, তবু দেখতাম। দক্ষিণের বাগানের আগাছা, ভাঁট-ঘেঁটুর জঙ্গলের আড়ালে তার রুপোলি চুমকি বসানো গাঢ় রঙের শাড়ির আঁচল বাতাসে নিশানের মতো ওড়াতে ওড়াতে সে ফুরফুর করে চলে যেত ঘরের দিকে। কীসের অহংকার ছিল তার কে জানে! আমাদের সবচেয়ে বড়দাদা ছিল শিবপদ। তখন তার বয়স সতেরো-আঠারো, তারপরেই ছিল বিষ্ণুপদ। তারা দু'জন আমাদের দলে খেলত না। এক দিন দেখি, হারাণী ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছে দেখে তারা বারবাড়ি থেকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল দক্ষিণের বাগানে। আমরা কৌতূহলে পিছু নিলাম। আগাছার জঙ্গলে মুখ লুকিয়ে তারা দু'জন হারাণীকে দেখে ভারী গলায় ডাকল, ও হারাণী, বসবে নাকি! কথাটা তারা কোথায় শিখেছিল কে জানে! আমাদের ঢেঁকিঘরে একটা গোখরো সাপকে মারতে গিয়ে একজন কামলা শাবলে খোঁচা দিয়েছিল এক বার। সাপটা যে রকম তীব্র ভয়ংকর ক্রুর ফণা তুলে উঠেছিল, ঠিক সেইরকমই ফণা তুলতে দেখলাম হারাণীকে। এক মুহূর্ত থেমে সে চলে গেল। বিকেলে একখানা সাদা খোলের কালোপেড়ে শাড়ি পরে, খালি পায়ে, এলো খোঁপা বেঁধে, সম্পূর্ণ দোষমুক্ত কুমারী মেয়ের মতো ধীর পায়ে সে এল দাদুর কাছে। কী নালিশ সে করেছিল কে জানে! আমি বড় ঘরের বারান্দায় মুড়ির বাটি হাতে বসে হঠাৎ অতীত-ভবিষ্যৎ ভুলে তাকে দেখলাম। কী সুন্দর হয় মানুষের মুখ যখন অহংকার ছেড়ে যায় তাকে! হারাণী বসল বারান্দার নীচে উঠোনের মাটিতে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তাকে দেখতে বারান্দায় ভিড় করল মেয়েরা, কাচ্চাবাচ্চায় উঠোন গেল ভরে। দাদু আড়চোখে এক বার তাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। অত লোক তাকে দেখছে, তবু হারাণীর কোনও কুণ্ঠা নেই। সপ্রতিভ লাজুক হাসিটি। প্রসাধনহীন মুখখানার সুন্দর ডৌলটুকু মিষ্টি লাবণ্যে মাখা। মুখ নামিয়ে উঠোনের মাটিতে অহংকারহীন, পাপবোধে আক্রান্ত তার সেই সৌন্দর্যটুকু সে সবাইকে দেখতে দিল শান্তভাবে। দাদুর কাছে মৃদুস্বরে সে যখন নালিশ শেষ করে চলে গেল, তখন ঠাকুমা বারান্দায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উঠোনে শেষবেলায় গোবরছড়া দেওয়ালেন। দাদু নিঃশব্দে উঠে গেলেন বারবাড়িতে। শিবপদকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। গুদারাঘাটের বেঁধে রাখা পাটের নৌকার খোল থেকে বিষ্ণুপদকে টেনে আনল সুদর্শন আর দু'জন কামলা। দাদু বড় ঘরের বারান্দায় তাকে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে খড়মপেটা করে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। শিবপদকে পাওয়া গিয়েছিল অনেক রাত্রে। আতঙ্কিত

মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি, উঠোনে শিবপদ কুকুরের মতো চেঁচাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখি, জ্যোৎস্নায় ভাসা উঠোনে তাকে মাটিতে ফেলে লাথি মারছেন আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ, শিবপদর হাত-পা বাঁধা, উঠোন বারান্দা জুড়ে অত রাত্রে সবাই ঘুম ভেঙে উঠে এসে সেই দৃশ্য দেখছে। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে সেই নিষ্ঠুর ঘটনা দেখে হাঁউমাউ করে কাঁদছিল আমার অপদার্থ, পেটুক, ভিতু এবং বোকা পিসতুতো দাদা গণনাথ। ঠাকুমা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলছিল, মেরে ফেলিস না। চোখটা মুখটা দেখে মারিস...

পরদিনই পাটের নৌকায় উঠে কোথায় নিরুদ্দেশ হল শিবপদ। বড় জেঠিমা অন্নজল ত্যাগ করে দক্ষিণের ঘরে বিছানা নিলেন। গম্ভীর মুখে বড় জ্যাঠামশাই বেরোলেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার খুলতে। মেজো-জ্যাঠামশাই গেলেন থানায়। বিকেলের দিকে দেখি, ঢেঁকিঘরের পিছনে খড়ের গাদায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বিষ্ণুপদ সিগারেট ধরাচ্ছে। তার কপালে তখনও দাদুর খড়মের কালশিটে দাগ। আমাকে দেখে ডাক দিয়ে বলল, কে আমাদের নাম বলেছিল রে কুকু?

আমি ভয় পেয়ে বললাম, জানি না।

জানিস না? তোদেরই কেউ।

আমি একটু ভেবেচিন্তে বললাম, বোধ হয় গণাদা।

সে ভ্রূ কুঁচকে বলল, গণা! আচ্ছা দেখব।

গণনাথই বলেছিল কি না আমি তা জানতাম না। কিন্তু তার নাম বলতে কোনও বাধা ছিল না। আমার সেজোপিসিমার বিয়ে হয়েছিল কামারখাড়ার এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে। তার চার মেয়ের পর একমাত্র ছেলে গণনাথ জন্মায়। প্রথম দুই মেয়ের পর তৃতীয় জন ছেলে হবে এমন আশা করেছিলেন আমার পিসি। কিন্তু তা হল না। চতুর্থ বারও আশা ভঙ্গ হওয়াতে ছোট দুই মেয়ের ওপর পিসি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তা ছাড়া, অভাবের সংসার বলে ছোট দুই মেয়ে একটু বড় হওয়ার পর চলে এল ময়মনসিংহে। মা-বাপ ভুলে দঙ্গলে তারা বড় হতে লাগল। পিসির পঞ্চম গর্ভধারণ সার্থক করে গণনাথ জন্মায়। সে-খবর পিসেমশাই টেলিগ্রাম করে দাদুকে জানিয়েছিলেন। সবাই ঠাট্টার হাসি হেসেছিল জামাইয়ের সেই নির্লজ্জতা দেখে। গণনাথ খেতে শিখলে পিসিমা তাকে ছানা খাওয়াতেন, ফল খাওয়াতেন, বাটি বাটি দুধ গেলাতেন মুহুর্মুহু। আমরা কত বার দেখেছি গণাদা ভাত খেতে খেতে মাঝপথে থেমে উঠে প্যান্ট ছেড়ে পগারপাড়ে দৌড়োচ্ছে। তারপর ধোয়ামোছা হয়ে এসে বাকি অর্ধেক খেতে বসেছে। ততক্ষণ পিসিমা বসে বসে ভাতের মাছি তাড়িয়েছেন। বেশি আদর-যত্নেই বোধহয় গণনাথের বুদ্ধি ছিল খুব ভোঁতা। ঘুম থেকে সদ্য উঠলে মানুষের যেমন একটা দিশেহারা নির্বোধ চেহারা হয়, তার ছিল সেই চেহারা। দশ-এগারো বছর বয়সেও সে রাতে ভয়ের স্বপ্ন দেখলে হাঁউরে-মাউরে করে কাঁদত। লেখাপড়ায় ছিল গাব। রাস্তাঘাটে বেরোলেই ছেলেরা তার পেছনে লাগত। পিসি গণনাথের হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া করে বেড়াতেন। তারপর কামারখাড়ার পরিবেশ গণনাথের প্রবল প্রতিকূল দেখে তিতিবিরক্ত হয়ে ছোট দুই মেয়ের মতো তাকেও আমাদের বাড়িতে রেখে গেলেন পিসিমা। আমাদের অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গেলেন, যেন গণনাথকে চোখে চোখে রাখি, তাকে যেন না খ্যাপাই। এবং যাওয়ার সময়ে আমাদের তুষ্ট করার জন্য প্রত্যেকের হাতে একটা করে আধুলি দিয়ে গেলেন। গণনাথের অত আদর আমার দুরন্ত ভাইদের পছন্দ ছিল না। তাই পিসিমা চোখের আড়াল হতেই রাখাল আর সুবল গণনাথের পিছনে লাগল। প্রায়ই দেখেছি গণনাথ বারবাড়ি থেকে দৌড়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে ঠাকুমার কাছে কারও-না-কারও নামে নালিশ করতে। স্নান করতে নামলে তাকে জলে চোবানো ছিল আমাদের মজার খেলা। চোর-চোর খেলায় প্রতি দানেই চোর হত গণনাথ। দাড়িয়াবান্ধায় সে ছিল বাঁধা জল্লা। সে পারত না দৌড়াতে, কিংবা খেলতে, গাছ বাইতে কিংবা সাঁতার কাটতে। সাইকেলের হাফ-প্যাডল শিখতে তার বছর ঘুরে গেল। তার দুধের টাকা পাঠাতেন পিসিমা। সকালে আমরা যখন মুড়ি-গুড় খেতাম, সে তখন কাঁসার বাটিতে সরে-দুধে গম্ভীর মুখে মুড়ি মাখছে কাঁঠালি কলা দিয়ে। তার চেহারা ছিল ফরসা, গোলগাল, নির্বোধ সুন্দর মুখ ছিল তার। সে ছিল সব ব্যাপারে আমাদের থেকে আলাদা। আর যে আলাদা তাকে কখনও বাচ্চা ছেলেরা সইতে পারে না। গাবগাছের ঢেঁকি হয় না, তাই দাদু গণনাথকে গাল দিয়ে বলতেন, গাবের ঢেঁকি। প্রায়ই দেখেছি, গণনাথকে খেলার মাঝপথে খেলা থেকে বের করে দিচ্ছে রাখাল কিংবা সুবল। রান্নাঘর থেকে তাড়া করে বের করছে সুদর্শন। খুব সামান্য

অপরাধে পুবের ঘরের বারান্দায় তাকে দিয়ে নাকে খত দেওয়াচ্ছে বিষ্ণুপদ। যাতায়াতের পথে গণনাথকে দেখলে আমরা কেউ-না-কেউ হয় তার কান মলে দিয়ে যেতাম, নয়তো মাথায় চাঁটি মেরে যেতাম। গণনাথ কাঁদত, নালিশ করত। অবশেষে তার নালিশ শুনতে শুনতে সবাই বিরক্ত হয়ে নালিশ করার জন্য তাকে চড়চাপড় দিয়ে বিদায় দিত। আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ বাচ্চাদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। একমাত্র সুবল তাঁর কাছে ব্যায়াম করত, আর কেউ কাছে ঘেঁষত না। আমাব সেই উদাসীন এবং বাইরের ব্যাপারে ব্যস্ত কাকাকেও মাঝে মাঝে দেখেছি, কাছারিঘরের উঠোনে লুঙ্গি গুটিয়ে উবু হয়ে বসে গণনাথকে ডেকে অকারণে কান ধরে ওঠ-বোস করাচ্ছেন। তাঁর মুখে এক ধরনের দুর্বোধ্য নিষ্ঠুর আনন্দের চাপা হাসি দেখা যেত। ওঠ-বোস করতে করতে ঘেমে লাল হয়ে যেত গণনাথ, ভীত সম্মোহিত চোখে কাকার দিকে চেয়ে সেই কষ্টকর অকারণ শাস্তি ভোগ করত। মাঝে মাঝে কামারখাড়া থেকে পিসি আসতেন বিস্তর পোঁটলা আর কৌটো নিয়ে। গণনাথের জন্য হরেক নাড়ু, তক্তি, বরফি, পায়েস আনতেন, আর জামা-কাপড়। আমরা কয়েক দিন আর গণনাথকে ঘাঁটাতাম না। নাড়ু তক্তির ভাগ পেতাম। পিসিমা চলে গেলেই গণনাথের পেন্সিল আর মার্বেল কেড়ে নেওয়া হত, জামার প্যান্টে দিয়ে দেওয়া হত কালির ছিটে, তাকে ঘোড়া বানিয়ে পুবের ঘরে পানু, টুকু আর অধীর তার পিঠে বসে পেটে গোড়ালির গুঁতো দিত।

অসুখ থেকে যখন মাঝে মাঝে উঠতাম তখন আমি আর আমার বয়সি কোনও ছেলেরই সমকক্ষ থাকতাম না। না গায়ের জোরে, না দৌড়ে, না সাঁতারে। তাই মাঝে মাঝে লুকিয়ে পুতুল খেলতাম তুলারানীর সঙ্গে। ভাইরা সবাই যেত জমিদারদের পুকুরে। আমি পশ্চিমের ঘরের পিছনের পগারে নেমে অল্প জলে পা দাপাতাম। এ-সব সময়ে অসুখের পর আমি ছিলাম সঙ্গীহীন, একা। গণনাথও ছিল দলছুট। তাই এক সময়ে সেই ছেলেবেলায় গণনাথের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। অসুখের জন্য তখন আমার স্কুলে ভরতি হওয়া কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে। এ-বছর না, ও-বছর। জ্বর আসে ঘুরে ঘুরে। গণনাথকে স্কুলে ভরতি করতে গিয়ে মেজো জ্যাঠামশাই দেখলেন সে মাত্র ক্লাশ টু-র উপযুক্ত।

কামারপাড়া থেকে পিসিমা লিখলেন, গণনাথকে ক্লাস সিক্সে ভরতি করিয়া দাও। আমি টাকা দিব, তাহার জন্য বাসায় একজন ভাল মাস্টার রাখিয়ো। নিচু ক্লাসে ভরতি হইলে তাহাকে সবাই খ্যাপাইবে। তাহার বোধবুদ্ধি খারাপ নয়, চেষ্টা করিলে সে পারিবে। তোমাদের পাঁচজনের উপরেই তাহার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। কাজেই ঠিক হল, গণনাথকে বাড়িতে পড়িয়ে পরের বছর উঁচু ক্লাসে ভরতি করা হবে।

সবাই যখন স্কুলে যায় তখন আমি আর গণনাথ বাসায় থাকি। দুপুরে বাবা চলে যায় ব্রিজ খেলতে, মা থাকে ভাতঘুমে। সেই সময়ে আমার পায়ের কাছে জানালায় উঁকি মারে গণনাথের সুন্দর নির্বোধ মুখখানা। দু'গালে ধরে না তার হাসি। একটা টিনের সুটকেসে গণনাথের কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। সেই সম্পত্তির মধ্যে থাকত পিসিমার দিয়ে যাওয়া কিছু খাবার। গণনাথ তা থেকে আমসত্ত্ব ভেঙে আনত। হাত বাড়িয়ে দিত আমাকে।

অনাদিনাথ যখন মাঝে মাঝে আসতেন আমার পূর্বজন্ম বিষয়ক প্রশ্ন করতে তখন দেখেছি বড় ঘরের বারান্দার চেয়ারে বসে তিনি পকেট থেকে একটা রুপোর মতো চকচকে গোল টিনের কৌটোর মুখের প্যাঁচ খুলে নস্যি নিচ্ছেন। তাঁর নস্যির টিপ ধরার কায়দা এবং নেওয়ার পর লালচে জল-টলটলে চোখ, হাঁচি আসার আগের মুহূর্তের মতো নাকের পাটার ফুলে ফুলে ওঠা এবং সবশেষে এক অপার্থিব তৃপ্তি ও সুখে প্রসন্ন হয়ে যাওয়া মুখে একটু হাসি দেখে কত বার ইচ্ছে হয়েছে নস্যি নিই। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে ছিল নস্যি কেনার। কাছেপিঠের সব দোকানদারই আমাদের চেনে।

এক দিন আমি গণনাথকে দুপুরে বললাম, নস্যি নিবি গণাদা?

গণনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কীভাবে নেয়?

নাকে। ভারী আরাম হয়। অনাদিবাবুকে দেখিসনি!

বড় কালীবাড়ির গদার দোকান থেকে গণনাথ এক পয়সার এত নস্যি নিয়ে এল কাগজের পুরিয়াতে। ব্রহ্মপুত্রের পারে একটা আঘাটা ছিল, যেখানে পচত বাঁশ আর পাট। এখানে-ওখানে কাঁকড়া আর ইঁদুরের গর্ত। খাড়া পাড়ের আড়ালে নেমে আমরা মুখোমুখি বসে নস্যি নিয়ে হাঁচতে লাগলাম। মাথার ভিতরে প্রলয়ংকর ঘূর্ণিবেগে আমার চিন্তা ভাবনা স্মৃতি স্বপ্ন খড়কুটোর মতো উড়তে লাগল। চোখের

জলে অবলুপ্ত হয়ে গেল চার পাশ। পৃথিবী সরে যেতে লাগল আমার চেতনা থেকে। এক-একটা হাঁচি যেন এক-একটা ধাক্কায় আমাকে এক অচেনা জগতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমি দু'হাতে গণনাথের একটা হাত চেপে ধরে প্রাণপণে পৃথিবীতে লেগে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলাম। যেখানে বসে আমরা নস্যি নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম সেখানে কেউ আমাদের দেখবে না। কিন্তু হাঁচি সামলে চোখের জল এবং মুখের লালা কষ থেকে মুছে চারি দিক চেয়ে হঠাৎ দেখি, ব্রহ্মপুত্রের পারে যেখানে প্রবর্তক ইস্কুলের বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে বাঁশের ভারার ওপর বসে ছাতা মাথায় রফিক আমাদের দেখছে। দৌড়—দৌড়—দৌড়।

ধরা পড়ল গণনাথ একা। রফিক কিছু বলেনি। কিন্তু কালীবাড়ির দোকানদার গদা এসে বলে গিয়েছিল ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমা বিকেলে গণনাথকে পাখার ডাঁটি দিয়ে পেটালেন। গণনাথ মার খেল, কিন্তু আমার নাম বলল না। কিন্তু বিষ্ণুপদর কাছে আমি গণনাথের নাম বলেছিলাম বলে পরদিন বিষ্ণুপদ গণনাথকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দক্ষিণে জমিদারদের আমবাগান পর্যন্ত নিয়ে তার পরনের প্যান্ট কেড়ে নিয়ে ওই অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল। প্রায় আধ মাইল রাস্তা লোকালয়ের ভিতর দিয়ে ল্যাংটো ফিরতে হয়েছিল গণনাথকে। লজ্জায় লাল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে।

শরতের শেষে শীতের গোড়ার দিকে আমাদের কাছারিঘরের বারান্দায় হঠাৎ কামলা লাগিয়ে বেড়া বাঁধা হচ্ছিল। সারা দুপুর আমি আর গণনাথ সেই দৃশ্য দেখলাম। খোলা বারান্দাখানা দেখতে দেখতে কেমন একখানা ঘর হয়ে গেল।

গণনাথ বলল, এই ঘরে একজন যক্ষ্মারুগি থাকবে—- জানিস!

সত্যি!

গণনাথ মাথা নাড়ে, সত্যি। তোদের জ্ঞাতিকাকা না কী যেন হয়। যক্ষ্মারোগী বলে দিদিমা রাগারাগি করছিল। দাদু বলল—যক্ষ্মা হয়েছে বলে কি আর মাখনকে ফেলে দিতে পারি!

মাখন! আমি অবাক হই, যাঃ, মাখন নামে আমার আবার কে কাকা আছে!

আছে কেউ। তোদের গ্রামের। কালু ভটচাযের ভাইপো। এখানে আসবে চিকিৎসা করাতে। আমি কখনও যক্ষ্মারোগী দেখিনি। তুই দেখেছিস?

আমি মাথা নাড়ি। আমাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের মামাবাড়ির সম্পর্ক ভাল ছিল না। কদাচিৎ আমি মামাবাড়ি গেছি। আমার মামাবাড়ির লোকেরা ঘটির দেশের। শ্রীরামপুরের কাছে কোনও বড় গ্রামে তাদের বাড়ি। দাদু রেলের চাকরি করতে ময়মনসিংহে এলে সেখানে মায়ের বিয়ে হয়। সেই বিয়ের দানসামগ্রী নিয়েই ঝগড়া হয়েছিল বলে মামাবাড়ি থেকে কদাচিৎ কেউ আসত। দাদু যখন বাহাদুরাবাদ ঘাটে চাকরি করছেন তখন এক বার জ্ঞানবয়সে আমি মামাবাড়ি যাই। সে-বাড়ি যেন সাহেবের বাড়ি। চার দিকে ফরসা রঙের সুন্দর সব মানুষ ঝলমল করছে। দাদুর মাথায় নিগ্রোদের মতো কালো কোঁকড়া চুল, গায়ের রং সাহেবদের মতো টুকটুকে। মনে পড়ে, তাঁর সুন্দর পুরন্ত ঠোঁট দু'খানা। বারান্দার চেয়ারে বসে আমাকে দুই হাঁটুর মধ্যে নিয়ে একটু ঝুঁকে, মৃদু হাসিমুখে বলছেন, এই বাঙাল, রস খাইলু ভাড় ভাঙলু, পয়সা দিলু না। দিদিমা আমাকে দেখে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, ও মহামায়া, কী কালো হয়েছে তোর ছেলে! ও বাড়ির রং একটুও পেল না। আমার সেই মামাবাড়ির ফরসাদের মধ্যেও ফরসা আর সুন্দর ছিলেন নাকি আমার বড়মামা। আমার জন্মের কয়েক মাস আগে তিনি যক্ষ্মায় মারা যান। সেই থেকে আমি যক্ষ্মার কথা জানি। যক্ষ্মারুগি মারা যায়। একজন যক্ষ্মারুগিকে দেখার বড় ইচ্ছে ছিল আমার।

রোজ সকাল-বিকেল বারবাড়ির সেই ঘরখানা দেখে আসি। মাখনলাল নামে আমার সেই যক্ষ্মারুগি জ্ঞাতিকাকা এলেন কি না। দেখি পুবের ঘর থেকে চৌকি সরিয়ে এনে সেই ঘরে পাতা হচ্ছে। কাছারিঘরের পিছনে তোলা হচ্ছে টিন আর বেড়া দিয়ে অস্থায়ী কাঁচা পায়খানা। আমাদের ডেকে ঠাকুমা সাবধান করে দিলেন, কাছারিঘরে আর যাবি না। যক্ষ্মারোগী থাকবে। কাছে গেলেই কিন্তু বিপদ।

আমরা রোজ সেই মাখনলাল নামে রহস্যময় লোকটির জন্য অপেক্ষা করি। সে আর আসে না।

ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করি, মাখনকাকা কবে আসবে?

আসবে। চিঠি দিয়েছে কয়েক দিন দেরি হবে। তারপর ঠাকুমা সাবধান করে দেন, যদি কোনও

খাবার-টাবার আনে, যদি দিতে চায় বলবি খিদে নেই। যদি তবুও জোর করে দেয়, তবে হাত পেতে নিবি, কিন্তু সাবধান, খাবি না। বাইরে এনে লুকিয়ে ফেলে দিস।

আসবে আসবে করেও মাখনকাকা আসতে দেরি করছিলেন। এ দিকে শিবপদ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর দশ দিন বাদে তাকে পাওয়া গেল মুক্তাগাছার বাজারে। মিষ্টির দোকানে বাসন-ধোয়ার কাজ করছে। দাদুর বন্ধু চন্দ্রনাথ উকিল মুক্তাগাছার বাজারে পাট বিক্রি করতে গিয়ে ধরে আনেন। শিবচন্দ্রের সারা গায়ে ময়লা। কানের পুরনো ঘা বেড়ে পুঁজ রক্ত পড়ছে। দাঁত ময়লা, জামা ময়লা, চেহারা হাড্ডিসার। সেই দশ দিন জেঠিমার পায়ের শব্দ আমরা শুনিনি, কথাও না। সারা দিন ঘরে থাকতেন। রাত্রে জ্যাঠামশাই দোকান থেকে এসে তাঁর শিয়রের কাছে চুপ করে বসতেন। নিজেদের ছেলের ব্যাপারে তাঁদের দুশ্চিন্তাটা ছিল নীরব। বাড়িটা থমথম করত। শিবপদ ফিরে এলে জেঠিমা গম্ভীরভাবে উঠলেন। ট্রাঙ্ক বাক্স গোছালেন এবং ছয় ছেলেমেয়েকে নিয়ে এক দিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে গুরুজনদের নীরবে প্রণাম করে তাঁর বাপের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে রওনা হয়ে গেলেন। দলের ছয়জন চলে যাওয়াতে আমাদের বাড়িটাকে খুব নিস্তব্ধ লাগল হঠাৎ।

## ॥ চার ॥

দক্ষিণের বারান্দায় সারা দিন জ্যাঠামশাইয়ের স্নানের কাপড় আর গামছা হাওয়ায় ওড়ে। দাঁড়কাক চালে বসে খা-খা করে ডাকে, বেড়াল বেয়ে বেড়ায়, কুকুর গো-হাড় টেনে এনে বারান্দায় বসে চিবোয়। বড় জেঠিমার রোদে দেওয়া বিছানার উষ্ণতা আর লক্ষ্মীবিলাস তেলের গন্ধ আর পাই না। দাদু আজকাল কম কথা বলেন। কাছারি থেকে এসে পুবমুখো ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে চুপ করে থাকেন। তাঁর খড়মের শব্দ আর তেমন করে বাড়িময় বাজে না। বাড়ির লোকজনরাও কথা বলে আস্তে। বিশাল পরিবারের দঙ্গলের শব্দও ওঠে না তেমন।

বড় ঘরের এক কোণে বহুকাল ধরে একটা চোঙাওয়ালা গ্রামোফোন পড়ে ছিল। একটা টিনের বাক্সে ছিল গাদা করা পুরনো রেকর্ড। সেইসব রেকর্ডে ফিনফিন মিনমিন করে শব্দ হত। কারও তেমন শখ ছিল না বলে নতুন রেকর্ড কেনা হয়নি। বড় জেঠিমা চলে যাওয়ার কিছু দিন পর বড় জ্যাঠামশাই গ্রামোফোনটা দক্ষিণের ঘরে নিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে দেখতাম অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার বন্ধ করে এসে তিনি চুপচাপ তন্ময় হয়ে চোঙের কাছে কান লাগিয়ে গান শুনছেন। আমি বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি আমারে দাও হে বাঁচায়ে...

ছুটির দিনের সকালে আমরা নতুন এক দৃশ্য দেখতে লাগলাম। বড় ঘরের পশ্চিমে তেঁতুল গাছের ছায়ায় একটা আনাড়ি মিস্ত্রির তৈরি বেঢপ বড় হেলানো চেয়ার পেতে বসেছেন জ্যাঠামশাই। হাতে তাঁর নীল প্যাড আর কলম। গান লেখেন, লিখতে লিখতে থেমে গুনগুন করে গানের কলি গাইছেন, রোদ সরে আসে, তিনি ছায়ার দিকে চেয়ার টেনে নিয়ে ফের বসেন। উঠোন জুড়ে বাচ্চারা হুটোপুটি করে। তিনি বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকান। গাছের ডালে হুড়োহুড়ি করে কাক পক্ষী, পুচ করে পুরীষ ফেলে উড়ে যায়। চেয়ারের পাশেই ঘটিভরা জল রেকাব দিয়ে ঢাকা থাকে। সেই জলে মাথা মুছে বিড়বিড় করে গাল দিয়ে জ্যাঠামশাই গানের পরের লাইন লেখেন। মা কিংবা মেজো জেঠিমা নাক পর্যন্ত ঘোমটায় ঢেকে তাঁকে চা দিয়ে আসে, সুদর্শন দিয়ে আসে তামাক। নিঃসঙ্গ জ্যাঠামশাইয়ের চার ধারে বেলা গড়িয়ে যায়, তিনি টের পান না।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত আমার নিঃশব্দ দিনগুলিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে তেঁতুলের ছায়ায় জ্যাঠামশাইয়ের গান লেখার সেই দৃশ্য দেখে বুকটা হু হু করত কেন যে! তাঁর লেখার ভঙ্গির ভিতর দিয়ে বোধ হয় এক স্বজনহীন মানুষের দুঃখী চেহারাটা ফুটে উঠত। তাঁর শরীরে আলো আর ছায়া ফেলে যখন গড়িয়ে যেত বেলা, তখন মনে হত, সময় বড় নিষ্ঠুর সত্য। সময়—তাঁর যে সময় কাটে না। ইচ্ছে হত, তাঁর কাছে গিয়ে একটু বসি।

তুলারানী পাঁচটা বেড়ালছানা নিয়ে পুরনো উলের একটা গুটি গড়িয়ে গড়িয়ে খেলত উঠোনময়।

মাঝে মাঝে সে গিয়ে অন্যমনা জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের কাছে গুটিসুটি হয়ে বসত। খানিক অবাক চোখে জ্যাঠামশাইয়ের গান লেখা হাঁ করে দেখে তারপর কাঁধে-মাথায়-কোলে বেড়ালের ছানা নিয়ে মুখে ঘষে ঘেঁটে আদর করত তাদের। কখনও বা গুটি খেলত একমনে। জ্যাঠামশাই মাঝে মাঝে লেখা থামিয়ে স্মিতমুখে তুলারানী আর তার বেড়ালছানাদের কাণ্ড দেখেন, তাঁর বুক ওঠে নামে। অপত্যস্নেহে ভরে ওঠে হৃদয়। তিনি তাই তাঁর জলখাবারের বাটি থেকে তুলারানীর কোঁচড়ে মুড়ি ঢেলে দেন, দেন চায়ের দুর্লভ তলানিটুকু। জ্যাঠামশায়ের কাছে আর একজনকেও দেখি ঘুর ঘুর করতে। সে আমাদের বড় পিসিমার ছেলে ভূতে-পাওয়া নিকুঞ্জ।

আমাদের নিকুঞ্জভাই ছিল জলের পোকা। সে মাছের মতো সাঁতার দিত। বর্ষাকালে যখন পুকুর আর উঠোন এক হয়ে যেত জলে, তখন সে কলা গাছের মান্দাসে উঠোন থেকে পুকুর, সেখান থেকে ধোপাদের নাবাল মাঠের ওপর দিয়ে চলে যেত ব্রহ্মপুত্র অবধি। বড় নদীর তীব্র স্রোতে ভেলা ভাসিয়ে চলে যেত কেওটখালির শ্মশানে। সেই স্রোতে ভেলা ভেঙে গেলে নির্বিকার নিকুঞ্জ সাঁতরে ফিরে আসত। তার এই জলরোগ সারানোর জন্য দাদু এবং জ্যাঠামশাইরা বিস্তর চেষ্টা করেন, কিন্তু রোগ সারেনি। সুযোগ পেলেই সে চলে যেত জলে। কেবল মাঝে মাঝে সে বলত, আমার গায়ে বড় জ্বালা করে। কী রকম জ্বালা, কোথায় জ্বালা তা বুঝিয়ে বলতে পারত না। বোধ হয় জলে তার সেই জ্বালা যেত জুড়িয়ে। দেখেছি জলে শরীর ডোবালে আরামে তার চোখ আধবোজা হয়ে আসত। ঠাকুমা নিকুঞ্জর দিকে তাকিয়ে প্রায়ই চিন্তিত হয়ে বলতেন, এটা যে কোন পদার্থ হবে কে জানে! ওর গা থেকে আমি আঁশটে গন্ধ পাই। মানুষের ঘরে যে এটা কী জন্মেছে!

ঠাকুমার এই সন্দেহের একটা কারণ ছিল। আমার বড় পিসিমা প্রভাময়ীর বিয়ে হয়েছিল মালখানাগড়ের এক রক্ষণশীল পরিবারে। সেই পরিবারে বউমানুষরা থাকত কড়া শাসনে। সেইখানে গিয়ে পিসিমা থাকতে পারতেন না। কান্নাকাটি করে বাপের বাড়িতে চিঠি লিখতেন। নানা ছুতোনাতা ধরে অশান্তির সৃষ্টি করে ময়মনসিংহে চলে আসতেন। এসে মাসের পর মাস থেকে যেতেন। এই নিয়ে দুই পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল। এই ব্যাপারে দাদু ঠাকুমারও ঝগড়া হত। দাদু চাইতেন পিসিমাকে জোর করে পাঠাতে, ঠাকুমা চাইতেন না। শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা উঠলেই পিসিমা তিন-চার দিন একনাগাড়ে কান্নাকাটি করতেন। অনেকে বলত পিসিমার আসলে বর পছন্দ হয়নি। সেটা সত্য কি না জানি না। তবে লোকটির চেহারা ছিল একটু বুড়োটে ধরনের। রং খুব ফরসা, কটা চোখ, পাতলা গড়নের ছোট মানুষটি। সবসময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তাঁর মতো নিরীহ সজ্জন দেখা যায় না— এ-কথা পাঁচজনে বলত। তিনি ছিলেন ড্রাফটসম্যান। ব্যাকার্ডি থম্পসন অ্যান্ড ম্যাথুজ নামে এক সাহেব কোম্পানিতে চাকরি করতেন এবং চাকরিতে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। তাঁর হাতের লেখা সুন্দর বলে বিখ্যাত ছিল, তিনি স্কেল ছাড়া সোজা লাইন টানতে পারতেন, প্রায় নিখুঁত বৃত্ত আঁকতে পারতেন। এই নিরীহ মানুষটি কিন্তু খুব ব্যক্তিত্বহীন ছিলেন না। ঠাকুমা তাঁকে এক বার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি চাকরির জায়গায় আলাদা বাসা করে বউ নিয়ে গেলে সব অশান্তি মিটে যাবে। কিন্তু পিসেমশাই রাজি হননি। বলেছিলেন, এখনও বাপ-মা বেঁচে আছেন, তাঁরা নিজেরা না-বললে আমি আলাদা সংসার করতে পারি না। এ-কথা ঠাকুমার পছন্দ হত না, দাদুর হত। ঠাকুমা বলতেন, লোকেশটা একেবারে ভেড়া। ওর বাপ-মা ওকে তুক করে রেখেছে। শুনে দাদু গরগর করে উঠতেন, ওটাই মানুষ। তোমার মেয়েটাই হারামজাদা।

এ-সব কথা যখনকার তখন আমরা জন্মাইনি। লোকমুখে শুনেছি, পিসিমা বাপের বাড়িতেই থাকতেন। মাঝেমধ্যে পিসেমশাই এসে হাতখরচের টাকা, পরনের শাড়ি, প্রসাধন, তেল, সাবান ইত্যাদি রেখে চলে যেতেন। তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান এবং কর্তব্যবোধ সজাগ ছিল। যদিও স্ত্রী বিমুখ, তবু সেই স্ত্রী যেন বাপের বাড়ির ওপর নির্ভরশীল না হয় সেই দিকেও তাঁর চোখ ছিল।

পিসিমা তখন ময়মনসিংহে, সেই সময় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। পিসেমশাইয়ের বাবা এবং মা একই দিনে প্রায় একসঙ্গে মারা যান। প্রথমে, উদরী রোগে তাঁর বাবা, এবং এর দু'ঘণ্টা পর তাঁর মা— মাথায় রক্তক্ষরণে, এই অপূর্ব মৃত্যুর খবরে চারিদিকে হইহই পড়ে যায়। এমনকী খবরের কাগজেও মালখানাগড়ের আদর্শ দম্পতির খবর বেরোয়। এই ঘটনার এক বছর পর পিসেমশাই আলাদা

সংসার করলেন। পদ্মাপাড়ের এক গঞ্জে তখন তাঁর কোম্পানির কাজ হচ্ছিল। সেইখানেই অবশেষে তাঁদের আলাদা সংসারে দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। শুরু হয়েও কিন্তু আবার তাঁদের দাম্পত্য জীবন ভাঙবার মুখে আসে। তাঁদের বাড়ির পিছনেই ছিল পদ্মানদী। তার তীব্র স্রোত এবং জলের গম্ভীর কল্লোল সারা দিন শোনা যেত। ঘর খুলে উঠোনে নামলেই পদ্মার বিশাল বিস্তার দেখা যেত। এক রাত্রে পিসিমা প্রাকৃতিক কারণে বাইরে যাবেন, পিসেমশাইকে ডেকে জাগন রেখে উঠোনে এসেছেন। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট চরাচর দেখা যাচ্ছে। সেই সময়ে তাঁর গায়ে এক খারাপ বাতাস লাগে। তিনি দেখতে পান পদ্মার ওপরে স্রোতের উলটো দিকে একটা শূন্য ভেলা ভেসে আসছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সেই থেকে পিসিমাকে এক বিচিত্র মূর্ছারোগে ধরল। লোকে বলত প্রভাময়ীকে কালীতে পেয়েছে। বিস্তর চিকিৎসা তুকতাক ঝাড়ফুঁক বৃথা হয়ে গেল। পিসেমশাই একা তাঁকে সামলাতে পারতেন না। ফলে প্রভাময়ীকে আবার ময়মনসিংহে আনা হয়। আনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটতে থাকে। অনেক রাতে হঠাৎ শব্দ হয় কে যেন একটা কাঁসার থালা মেঝের ওপর গড়াচ্ছে। কখনও দেখা যায় বিগ্রহের সিংহাসনের সামনে কে গু ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যারাতে হঠাৎ আঁশটে গন্ধে সারা বাড়ি ম ম করে উঠত। অজ্ঞান অবস্থায় পিসিমার হাত মুঠো করা থাকত। সেই মুঠো খুললে তার ভিতরে অদ্ভুত সব জিনিস বেরোত— ছাই, মাছের আঁশ, মাংসের হাড়, রক্তমাখা ন্যাকড়া, আরও কত কী।

ঠাকুমা গোটা চার-পাঁচ মানসিক করলেন। ঠিক করলেন, কালীবাড়িতে মোষ বলি দেওয়াবেন। কেবল আমার নাস্তিক দাদুই রাগে গরগর করতেন, পিসিমাকে খড়মপেটা করতে ছুটে আসতেন। ঠাকুমা আগলে রাখতেন পিসিমাকে।

এ-রকম এক বছর চলার পর, এক শেষরাতে মূর্ছাগ্রস্ত অবস্থায় পিসিমা কথা বলছিলেন। ঠাকুমা জেগে শুনলেন, পিসিমা তাঁর নাম ধরে ডেকে বলছেন, ওঠ, প্রভাময়ীর হাতের মুঠোয় যা আছে তা নিয়ে গিয়ে তুলসীতলায় পুঁতে দিয়ে আয়। এবার ও ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু দেখিস, আরও এক বছর যেন স্বামী-সংসর্গ না করে, তবে ভাল হবে না।

এরপর আমার পিসিমা প্রভাময়ী সত্যিই ভাল হয়ে যান। কিন্তু এক বছর তাঁকে স্বামীসংসর্গ থেকে আলাদা রাখার যে চেষ্টা ঠাকুমা করেছিলেন তা দাদুর জন্যই ব্যর্থ হয়। দু'মাস পরেই দাদু জোর করে পিসিমাকে পিসেমশাইয়ের কাছে পাঠান। এর এক বছরের মধ্যেই নিকুঞ্জ জন্মায়।

খুব ছোট থাকতেই নিকুঞ্জ আমাদের বাড়িতে চলে আসে। তার কারণ সম্ভবত এই যে, দৈবাদেশের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ সময়ে জাত এই সন্তানটিকে কাছে রাখতে পিসিমা ভয় পেয়েছিলেন। খুব অল্প বয়সেই সে হাঁটতে এবং কথা বলতে শিখেছিল। পিসিমা সেটাকেও অস্বাভাবিক ব্যাপার ভেবে ভয় পেতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, এ-ছেলে বাঁচবে না। তিনি এইসব নিয়ে কান্নাকাটি করতেন। খবর পেয়ে দাদু পদ্মাপাড়ের সেই গঞ্জে গেলেন। 'দেখি এ ছেলেকে কোন শালা মারে' এই বলে সমস্ত দৈব এবং অলৌকিকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশ প্রকাশ করে দাদু নিকুঞ্জকে নিয়ে ময়মনসিংহে চলে এলেন। কিন্তু ঠাকুমা বাস্তবিক কোনও দিনই নিকুঞ্জকে সহজভাবে নিতে পারতেন না। নিকুঞ্জর এক ধরনের একাচোরা স্বভাব ছিল। বাড়ির আনাচে-কানাচে সে একা একা ঘুরে ঘুরে বেড়াত। সন্ধ্যার আবছায়া নামলে হয়তো দেখা যেত, সে কুয়োতলার আমগাছের পিছনে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুমা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সুদর্শনকে ডাকতেন, সুদর্শন, যা তো! দেখ ওটা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে কুয়োপাড়ে, ডেকে আন তো, কিছুতেই ওটা মানুষজনের মধ্যে থাকতে পারে না দেখছি।

এইসব কারণে আমরাও ছেলেবেলা থেকে নিকুঞ্জকে ভয় পেতে শিখেছি। আমাদের ধারণা ছিল, সত্যিই তার গায়ে আছে একটা আঁশটে গন্ধ, সে স্বাভাবিক মানুষ নয়।

তাই নিকুঞ্জ বড় হয় অনাদরে। কেবলমাত্র দাদু তাকে আকণ্ঠ ভালবাসতেন। সন্ধেবেলা কোর্ট-কাছারি সেরে ফিরে এসে তিনি কুয়োপাড়ে নিকুঞ্জর পায়ের ময়লা তুলতেন ছোবড়া দিয়ে ঘষে। নিজের দুধের বাটির অর্ধেক খেয়ে বাকি অর্ধেক রেখে যেতেন তার জন্যে। কিন্তু তবু পুরুষমানুষের চেয়ে মেয়েদের আদরই বেশি কার্যকর্‌রী। নিকুঞ্জর বরাতে তা জুটত না।

মাঝেমধ্যে পিসিমা আসতেন। তিনি হয়তো বুঝতে পারতেন নিকুঞ্জর অনাদর। অত ছেলেমেয়ের

মধ্যে নিকুঞ্জকে একটু বেশি আদর করার সোজা উপায় তাঁর ছিল না। তিনি তা করতেন কৌশলে। পরিবেশনের সময়ে তিনি এসে মা কিংবা জেঠির হাত থেকে হাতা কেড়ে নিয়ে বলতেন, তোমরা তো সারা বছরই বড় সংসারের হাঁড়ি ঠেলছ। দাও, আমরাও কিছু করে দিয়ে যাই। এই বলে বাচ্চাদের তিনি ভারী আদরে পরিবেশন করতেন। কেবল গাল দিতেন নিকুঞ্জকে। বলতেন, কী রে পোড়ারমুখো জুলজুল করে কী দেখিস? মাছের মুড়ো? তোর যখন নজর পড়েছে তখন কি ওটা আর কারও হজম হবে! নে, তুই-ই খা। খেয়ে আমার গুষ্টির পিণ্ডি চটকা। এই সব গাল দিয়ে নিকুঞ্জর পাতে মুড়ো দেওয়ার ঘটনাকে ঢাকতেন পিসিমা। মা জেঠিমা এই নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করত।

তবু নিকুঞ্জ অনাদরেই বড় হয়। তার চোখে মুখে এক উদাস ভাব। ধুলামলিন চেহারা। আমাদের বাড়ির কোনও ছেলেই ফিটফাট থাকে না। তবু সপ্তাহে দু'-চারদিন আমাদের চুলে চিরুনি পড়ে, সপ্তাহে এক দিন গায়ে পড়ে সাবান। শীতকালে গাল বা ঠোঁট ফাটলে একটু-আধটু জল-ফেটানো গ্লিসারিন। নিকুঞ্জর চুলে কখনও চিরুনি পড়ে না। গায়ে সাবান দিতে তার ঘোর অনাসক্তি। দাদু ছুটির দিনে কখনও কখনও জোর করে ধরে তার গায়ে সাবান দিতেন। দাদুর চোখের আড়াল হয়ে নিকুঞ্জ অভিমানে গায়ে ছাই-মাটি মাখে। তার ঝাকড়-মাকড় চুলে উকুনের বাসা। বড় ঘরের এজমালি বিছানায় সে শুত না। সম্ভবত ঠাকুমা তা চাইতেন না। পুবের ঘরে আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ একটা তক্তপোশে শুতেন, অন্য ধারে দু'টো বেঞ্চ জোড়া লাগিয়ে নিকুঞ্জ তার সাধের বিছানা পাতত। সে আলাদা থাকে—দাদুর সেটা পছন্দ ছিল না। কিন্তু ঠাকুমা চাইতেন, সে আলাদাই থাকুক।

আমার দাদা নিকুঞ্জকে আমি একরকম ভালই বাসতাম। সে ভালবাসার কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। রোগে ভুগে আমার বড় হওয়া যেন থেমে গিয়েছিল। ম্যালেরিয়া তখন বছরের বেশির ভাগ সময়েই আমাকে ঘরে কয়েদ রাখে। খোলা জানালা দিয়ে সংসারের দৃশ্য দেখি। গভীর একাকিত্ব এবং জ্বর আমাকে চার দিককে দেখবার এবং অনুভব করবার এক তীব্র বোধশক্তি দিয়েছিল। আড়ালে বেড়াল হেঁটে গেলেও বোধ হয় আমি তা টের পেতাম। সেই একাকিত্ব এবং বোধশক্তি দিয়েই আমি সংসারের তুচ্ছ দৃশ্যগুলি থেকে আহরণ করতাম অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। দেখতাম, বর্ষায় ভাসা উঠোনে নিকুঞ্জ মান্দাস বাইছে, কিংবা পিছনের পগারে শরীর ডুবিয়ে আছে সে। মনে হত, ওর শরীরে বড় জ্বালা। মনে হত, ওর জীবন কাটবে কষ্টে। নিকুঞ্জর জন্য অকারণে আমার মন হু-হু করত।

থুথু ফেলার একটা আর্ট আছে। সবাই পারে না। আমার মেজো জ্যাঠামশাই সস্তার নেশা করতেন। খইনি। মুহুর্মুহু তাঁকে থুথু ফেলতে হত। এ-ব্যাপারে তাঁর এতটাই দক্ষতা এসেছিল যে, ঘরের ঠিক মাঝখানটিতে বসেও তিনি জানালা গলিয়ে বাইরে থুথু ফেলতে পারতেন। এমনকী, জানালার শিকের গায়েও লাগত না। বরাবর ও রকম থুথু ফেলার শখ আমার। আমার রোগগ্রস্ত একাকী দিনগুলিতে যখন সময় কাটতে চাইত না তখন আমি ঘরের পিছন দিককার জানালা খুলে ঠিক মেজো জ্যাঠামশাইয়ের মতো থুথু ফেলার চেষ্টা করতাম। ঘরের পিছন দিকটায় ছিল বাঁশবন, ঘন বিছুটির নিবিড় জঙ্গল, রাংচিতা আর জিকা গাছ। সেখানে আমি কত বার সাপের খোলস পড়ে থাকতে দেখেছি। তক্ষক ডাকে, ব্যাঙ ডাকে, বর্ষায় গাছের পাতায় জোঁক লিকলিক করে। হাঁসের ঘর ভেঙে হাঁস চুরি করে শেয়ালরা গভীর রাতে এই জঙ্গল ভেদ করে যায়। ওই জঙ্গলে কেউ কখনও যেত না। কেবল আমিই জানালা খুলে মাঝে মাঝে দেখতাম, বিকেলে সিঁদুরে মেঘের তীব্র আভা। দুই মেঘের স্তরের মাঝখান দিয়ে লাল সূর্য চোখ-ধাঁধানো আলো ফেলেছে গাছগাছালিতে। মায়াবী আলো-ছায়ায় সে এক আশ্চর্য জগৎ। দু'টো শিকের মাঝখান দিয়ে যথাসম্ভব মুখ বাড়িয়ে থুথু ফেলার চেষ্টা করি, আর পলকহীন চোখে চেয়ে সেইসব গাছপালা, তার আলো তার ছায়ার সঙ্গে এক হয়ে যাই। সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে কোনও মানুষ কখনও দেখি না। থুথু ফেলতে মুখ বাড়িয়েও থুথু ফেলতে ভুলে যাই।

একদিন বিকেলে জানালা খুলে পশ্চিমের সেই আশ্চর্য আলো দেখতে গিয়ে বড় অবাক হয়ে দেখি, সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে একটি ছেলে। কাঁঠাল গাছের তলায় শুকনো পাতার রাশির ওপর সে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে তার পিছন ফেরানো, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট তাকে দেখা যায় না।

কে রে?

সে উত্তর দিল না। তাকাল না। শুনতে পাচ্ছি, অনুচ্চ মিষ্টি সুরে সে শিস দিচ্ছে, এক পা এক পা করে

পিছু হেঁটে সরে আসছে। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছে মরমর, কৌতূহলে এক জানালা থেকে আর-এক জানালায় ছুটে যাই, ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল পড়ে, আবার আগের জানালায় ফিরে আসি। হঠাৎ দেখি, ছেলেটির সামনে থেকে আড়াল সরে গেছে, দেখতে পাই সে আমাদের নিকুঞ্জ ভাই। তার সামনে কয়েক হাত দূরে কোমর সমান উঁচু ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যাস্তের রঙের মতোই সিঁদুর রঙের এক সাপ। ও-রকম সিঁদুরে রঙের সাপ আমি কোনও দিন দেখিনি। শেষবেলার সবটুকু রং সে যেন ডুব দিয়ে শরীরে তুলে নিয়েছে। তারপর সেই রঙে মাতাল হয়ে দুলছে, এগিয়ে আসছে।

শিস দিয়ে পিছিয়ে আসছে নিকুঞ্জ ভাই। বিছুটির পাতা ঝুলছে তার ঘাড়ের ওপর, হাতের কাছে, তার পিছনে ঘন গাছপালার বাধা, পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা নেই। আমি চেঁচিয়ে বললাম, তোর পিছনে বিছুটির ঝোপ নিকুঞ্জ ভাই...

ঠিক সেই সময়ে সাপটা একটু পিছনে হেলে সপাৎ করে চাবুকের মতো ছোবল দিল। দেখি নিকুঞ্জ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

সাপ—সা-আ-প বলে আমি চেঁচাচ্ছি তখন, কাঁদছি, নিকুঞ্জ উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। বাঁ হাতখানা তুলল সে। দেখি, ফণার দু' আঙুল নীচে সাপের গলাটাকে ধরে আছে সে। সিঁদুরে রঙের সেই রূপবান সাপ তার দীর্ঘ শরীরের রং কিলবিল করে মেখে দিচ্ছে তার হাতে, গলায়। তখন নিকুঞ্জ ভাইয়ের সাদা মুখখানা আমি একপলক দেখতে পেলাম, তার সমস্ত শরীর টলছে, বাঁ হাতখানা তুলে সে আমাকে কী যেন বলতে চাইছে, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না। সাপটিকে ধরে আছে বটে, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে সে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। আমি কোনও ক্রমে উঠোনের দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

লোকজন গিয়ে যখন নিকুঞ্জভাইয়ের হাত থেকে সাপ ছাড়াল, তখন সাপটা শ্বাস বন্ধ হয়ে মরেছে। অনেকক্ষণ ধরে নিকুঞ্জর হাতে পায়ে সাপের দাঁতের দাগ খোঁজা হল, পাওয়া গেল না। কিন্তু তারপর কয়েক দিন নিকুঞ্জ ভাল করে কথা বলতে পারত না, খেতে পারত না, খেয়ে উঠেই বমি করত, রাতে দেখত ভয়ের স্বপ্ন, জিজ্ঞেস করলে বলতে পারত না, কী ভাবে সে সাপটিকে ধরেছিল।

আগে এক-একদিন দুপুরে সে আমার জানালার কাছে এসে দাঁড়াত। বলত, কী করিস রে কুকু?

আমি খুশি হয়ে বলতাম, আয় নিকুঞ্জভাই, ষোলোগুটি খেলি।

ঘরের মাটির ভিতে আমি ষোলোগুটির ছক কেটে রেখেছিলাম। সেখানে দুপুরের নিরিবিলিতে ষোলোগুটি খেলতে খেলতে নিকুঞ্জ তার গায়ের জ্বালার কথা বলত, কী জানি কেন যে আমার গা এত কুটকুট করে, চামপোকা হয়েছে বোধ হয়।

মাঝে মাঝে সে এ-কথাও বলত, বড় হয়ে আমি হব মাঝি কিংবা সারেং। আমাদের এক আত্মীয় আছে, জাহাজে ঘুরে বেড়ায়। আমিও ও-রকম হয়ে যাব। এক জ্যোতিষ বলেছে, আমি জলে মরব। স্থলে নয়।

আমারও তাই মনে হত, জল ছাড়া আমাদের নিকুঞ্জভাই বাঁচবেই না। নিকুঞ্জর সঙ্গে আমাদের তফাত ছিল অনেক। তবুও নিকুঞ্জভাইকে আমি এক রকম ভালই বাসতাম। প্রায় ছুটির দুপুরেই তার জন্য অপেক্ষা করতাম ষোলোগুটি খেলব বলে।

সাপ ধরার ঘটনার পর অনেক দিন নিকুঞ্জ আর আসেনি। স্বাভাবিক হতে তার অনেক সময় লাগল। তারপর আবার দুপুরে মাঝে মাঝে আসত ষোলোগুটি খেলতে। তখন সেই সাপের ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলত, কী জানি কী যে করলাম। সাপ ধরতে কেউ তো আমাকে শেখায়নি! কয়েক দিন আগে কামরাঙাতলায় পিল তৈরি করে আমি আর পাঁচু মার্বেলের জেত্তাল খেলছিলাম। পাঁচু আমার জিত না দেওয়ায় ঝগড়া হল খুব। পাঁচু আমার টপ মার্বেলটা রাগ করে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল। সেটা আমার আঙুলে বসে-যাওয়া গুলি, তাই সেটা মাঝে মাঝে খুঁজে দেখি। ওই কাঁঠাল গাছের গোড়াতেই পড়েছিল। সেদিনও খুঁজতে গিয়েছিলাম। কাঁঠালপাতা পা দিয়ে সরাতে সরাতে দেখছি। ঝোপ-জঙ্গলে লাল রোদ পড়েছিল সেদিন। খুব লাল রোদ। হঠাৎ দেখি, সেই লালের ভিতর থেকে আরও লাল কী যেন সপাৎ করে মুখ তুলল। দেখি সাপ। ঠিক রক্তের মতো লাল, গা থেকে রোদ পিছলে যাচ্ছে। একটু থমকে গিয়েছিলাম, সাপটা ছোবলের জন্য মুখ বাড়াল। হয়তো ভয় পেয়েছিলাম।

কিন্তু হঠাৎ কেবল মনে হল, এবার যদি বেঁচে যাই তবে আমি অনেক দিন বাঁচব। বড় হয়ে আমার যে সারেং হওয়ার কথা আছে। আমাকে বাঁচতেই হবে। মনে হতেই আমি টপ করে ডান পা সরিয়ে নিলাম। সাপটা মাটিতে ছোবল দিয়ে উঠে আবার ফণা তুলল। আবার ছোবল। আমি আবার লাফিয়ে সরে যাই। তখন শরীর কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, তবু কেবলই মনে হচ্ছে— স্থলে নয়, স্থলে নয়, আমি মরব জলে। জল ছাড়া আমি মরবই না। আমাকে বাঁচতেই হবে। শুনেছি, বাঁশি শুনলে সাপেরা মোহিত হয়। আমার বাঁশি ছিল না। আমি শিস দিচ্ছিলাম। কিন্তু সাপটা এগিয়েই আসছিল। আমার পিছনেই বিছুটির ঝোপ, বুনোলতা, ডাঁটা গাছ, পিছোবার রাস্তা নেই, একটু অন্যমনস্ক হলেই সাপটা শেষ করে দিয়ে যাবে। অনেক দিন আগে আমাদের গ্রামে একটা লোককে আমি সাপ ধরতে দেখেছিলাম, গলার কাছটায় ধরে। ছোবল দিতে মাথা নামায় যখন, ঠিক তখন, হঠাৎ সেইটে মনে পড়ে গেল। পরের বার সাপটা ছোবল দিতেই আমি সেই লোকটা যেমন করেছিল ঠিক হুবহু তেমন করলাম। তারপরেই দেখি— আরে! এ কী ভয়ংকর ব্যাপার! আমার হাতে একটা লাল সাপ—একটা জ্যান্ত সাপ! এতক্ষণ তেমন ভয় ছিল না, শুধু বাঁচবার ইচ্ছে ছিল। সাপটাকে ধরার পরই আমি ভীষণ ভয় পেয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি, তোকে দেখে কী যেন বলার চেষ্টা করছি, পারছি না। আমার হাতে-পায়ে খিল ধরে আসছে, মুঠো আলগা হয়ে সাপটা ছুটে যাচ্ছিল যেন, তারপর আর জ্ঞান ছিল না।

নিকুঞ্জর এই ঘটনা শুনে বড় জ্যাঠামশাই বলতেন, সুরই হচ্ছে আসল। যার সুরজ্ঞান আছে তার ভয় নেই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শিসের সুরে সাপটা সম্মোহিত হয়েছিল।

নিকুঞ্জর ছিল গানের গলা, চৈত্রমাসে দক্ষিণের পাড়া থেকে যে সঙ বেরোত তাতে সে কত বার শিবের গান গেয়েছে। দাদুর পরই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন বড় জ্যাঠামশাই। তার কারণ বোধ হয় ছিল ওই গান, ওই সুরবোধ। সেই সময়ে ছেলেদের গান-বাজনার শখকে কেউ ভাল নজরে দেখত না। সেইজন্য নিকুঞ্জ অনেক বকুনি খেয়েছে। কেবলমাত্র বড় জ্যাঠামশাই তাকে গোপনে ডেকে নিতেন দক্ষিণের ঘরে। নিজের লেখা গানে সুর দিয়ে নিকুঞ্জকে গাইতে বলতেন। নিকুঞ্জ গাইত। ওহে নিঠুর বাঁশি...

তেঁতুল গাছের ছায়ায় ভারী চেয়ার পেতে বসে শীতের রোদে পা রেখে জ্যাঠামশাই গান লেখেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে তুলারানী তাঁর পায়ের আঙুল টেনে দেয়। তুলারানীর চারধারে থুপ হয়ে বসে থাকে তুলোর পুঁটলির মতো সাদা সাদা বেড়ালছানা। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে সন্না দিয়ে পাকা চুল তোলে নিকুঞ্জ। খোলা প্যাড কোলে, মুঠোয় ধরা কলম, জ্যাঠামশাই আরামে নিমীলিত চোখে হালকা ঘুমে মজে আছেন। এই দৃশ্য উত্তরের জানালা দিয়ে কত বার দেখেছি।

## ॥ পাঁচ ॥

আমার মেজো জ্যাঠামশাইয়ের ছিল বায়ুরোগ। যখন ডাক্তারি পড়তে তাঁকে এক মেডিকাল স্কুলে পাঠানো হয়েছিল তখনই তিনি এই রোগে আক্রান্ত। লোকে বলে, তিনি মড়া কাটতে গিয়ে ভয় পেয়েছিলেন। শিয়রের কাছে কঙ্কাল ঝুলিয়ে শুতেন, রাত্রিবেলা সেই কঙ্কাল খটখট করে সারা ঘর ঘুরে বেড়াত। এইসব কারণে তাঁকে পড়া ছাড়িয়ে বাসায় নিয়ে আসা হয়। তাঁর কবিরাজি চিকিৎসা করানো হয়েছিল। তিনি বরাবর দুধের সর আর মধু দিয়ে মেড়ে স্বর্ণসিন্দূর খেতেন। খেতেন সুস্বাদু চ্যবনপ্রাশ, মাথায় মাখতেন তিল তেল। তাঁর শীতবোধ ছিল না। শীত-গ্রীষ্মে তিনি হাতপাখা নাড়তেন। আমরা পালাক্রমে তাঁর চ্যবনপ্রাশ চুরি করে খেতাম। তাঁর স্বর্ণসিন্দূর খাওয়ার সময়ে আশেপাশে ঘুরতাম।

নিবারণ জ্যাঠার ছিল হোমিওপ্যাথির বাক্স। নিকেলের চশমা চোখে তিনি গম্ভীরভাবে লোকের রোগের বিবরণ শুনে ওষুধ দিতেন। বলতেন, বাবা, হোমিওপ্যাথিতে যক্ষ্মাও সারে, কেবল একটু ধৈর্য ধরতে হয়। মহাত্মা হানিম্যানকে তিনি বিগ্রহের পরই সম্মান করতেন। আমরা হোমিওপ্যাথির স্বাদ পেয়ে গেছি তখন। কী সুন্দর মিষ্টি এবং সুঘ্রাণ চিনির গুলি! আমরা প্রায়ই নানা আবোল-তাবোল অসুখের কথা বলে নিবারণ জ্যাঠার ওষুধ খেতাম।

ওষুধের স্বাদ পেয়েছিল তুলারানীও। আমাদের বাড়ির বাঁধা ডাক্তার ছিলেন পার্শ্বনাথ। সেবার তুলারানীর মায়ের সূতিকা সেরে গেলে পার্শ্বনাথ তাঁকে একটা কমলালেবুর গন্ধওয়ালা সুন্দর টনিক খেতে দিয়েছিলেন। তুলারানী সেই টনিক চুরি করে হাতের কোষে অনেকটা ঢেলে আনত। বারবাড়ির মাঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খেত। নালিশ করে দেওয়ার ভয় দেখালে সে বলত, ইস, তোমরা মেজো জ্যাঠার চ্যবনপ্রাশ চুরি করে খাও! আমিও বলে দেব। হয়তো তুলারানির ধারণা ছিল, মানুষ যা খায় তার সবই সুস্বাদু।

দাদু-ঠাকুমার বিছানায় শুতে গিয়ে অনেক বার দেখেছি, ঠাকুমা আফিমের ডেলা থেকে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে কী একটা পাউডার মেখে কৌটোয় ভরে রাখে। রোজ বিকেলে দাদু কাছারি থেকে ফিরে চায়ের সঙ্গে একটা করে গুলি খান। ঘুমচোখে অনেকবার আফিঙের মিষ্টি, অদ্ভুত গন্ধটা পেয়েছি। হয়তো কোনও দিন পেয়েছিল তুলারানীও।

তখন শীতকাল শেষ হয়নি। কুয়াশা কেটে দূরের গারো পাহাড় দেখা যায়। ময়মনসিংহের বক্ষলগ্ন ব্রহ্মপুত্র শুকিয়ে গেছে অনেক। চর দেখা যায়। সেখানে রবিশস্যের চাষ প্রায় শেষ হয়ে এল। জলের পাশে দাঁড়ালে স্বচ্ছ জল ভেদ করে নদীর গভীর তলদেশ অনেকটা দেখা যায়। সেখানে স্বচ্ছন্দ শরীরে বাঁক নিয়ে চলাফেরা করে মাছ। জ্বর সেরে গেছে বলে আমি পায়ে পায়ে এসেছি বারবাড়িতে। চার দিকে আদিগন্ত প্রকৃতিকে মুগ্ধ চোখে দেখি। কাকার জিমনাশিয়ামের ফাঁক-ফোঁকরে তুলারানী পুতুলের সংসার সাজিয়ে বসেছে। সেখানে দু' দণ্ড দাঁড়াই। পুতুলের বাক্স থেকে মুঠো করে হাত বের করল তুলারানী! মুঠো খুলে বলল, বল তো কুকুভাই, এটা কী?

তার ছোট্ট সাদা হাতের তেলোয় একটা কালো গুলি। ঝিরঝিরে সুন্দর দাঁত দেখিয়ে হাসে তুলারানী। বলে, খুব স্বাদ গো। দাদু রোজ খায়। আমি ঝুঁকে দেখতে যাচ্ছি, পাছে কেড়ে নিই এই ভয়ে সে টপ করে হাত মুখে তুলে গুলিটা গিলে ফেলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লাল হয়ে গেল সে। খেলতে খেলতে হঠাৎ উপুড় হয়ে ঢলে পড়ল সে। হেঁচকি উঠছে, ফেনা আসছে মুখে। তার সুন্দর সাদা ছোট্ট শরীর গড়াগড়ি খেয়ে ধুলা মাখছে। সেই দৃশ্য দেখে আমি প্রাণপণে চেঁচাই।

খবর পেয়ে হোমিওপ্যাথির বাক্স হাতে এলেন নিবারণ জ্যাঠা। এলেন জমিদারদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউন্ডার সিদ্ধেশ্বর, এলেন পার্শ্বনাথ। তখন তুলারানীর জ্ঞান নেই, গভীর অবসন্নতায় নীলাভ এক ঘুমে ডুবে আছে সে। বাড়িসুদ্ধ লোক চুপ হয়ে গেল। নিবারণ জেঠি চেঁচিয়ে কাঁদছেন, জ্যাঠামশাই ওষুধের বাক্স খুলে বসে আছেন অসহায়ভাবে। বিপদের মুখে ওষুধের নাম মনে পড়ছে না, এক-একটা শিশি তুলে দেখে রেখে দিচ্ছেন। আমরা ভিড় করে ফিসফিস করছি। গণাদা আমাকে কানে কানে বলল, মরে গেছে!

দিন দুই-তিন পর হাসপাতাল থেকে সে ফিরে এল। একটু রোগা হয়েছে, একটু দুর্বল। কিন্তু ঠিক আগের মতোই ঝিরঝিরে দুধে দাঁত দেখিয়ে হাসে। আবার ওষুধ চুরি করে খায়, অনাদরে বড় হয়, কেবল বিরহকাতর বড় জ্যাঠামশাই যখন ছুটির সকালে তেঁতুলের ছায়ায় বসে গান লিখতেন তখন তুলারানী গিয়ে বসত তাঁর পায়ের কাছে। আমি পশ্চিমের ঘরের জানালা দিয়ে দেখতাম জ্যাঠামশাই মাঝে মাঝে লেখা থামিয়ে সস্নেহে তার দিকে চেয়ে আছেন। তখন তাঁর মাথার পাকাচুল তুলে দিচ্ছে নিকুঞ্জ। আমি দেখতাম, তাদের তিনজনের ভারী মিল!

দাদু মাঝে মাঝে গরগর করেন। এক মহাপুরুষের শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেন, বাপের বাড়ি হামেহাল থাকলে নারী পয়মাল। বড় জেঠিমা চলে যাওয়ার পর থেকেই দাদু অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের খোঁজখবর বেশি করে নিতেন। সুরেশ প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। দাদু দোকানের খাতাপত্র আনিয়ে গভীর মনোযোগে হিসেব দেখেন। তামাকে টান পড়ে না। ঠাকুমাও সুরেশকে ডেকে আড়ালে খোঁজখবর নিতেন। আমরা আভাসে বিপদের গন্ধ পেতাম। যখন পালে-পার্বণে, অন্নপ্রাশন, পৈতে কিংবা বিয়েতে পিসিমারা সব আসে তখন প্রায়ই দুপুরের দিকে বড় ঘরের কোণে ঠাকুমা পিসিমারা পাটি পেতে পানের বাটা নিয়ে গোল হয়ে বসে, নানা কূটকচালিতে তাঁদের মেয়েলি সময় কাটে। আমি অনাহূত অনেক বার সেইখানে বসে বড় জ্যাঠামশাই আর জেঠিমার নিন্দে শুনেছি। কিন্তু তবু সেইসব নিন্দের কথা আমার মন থেকে

উড়ে গেছে, যখন কোনও কোনও জ্যোৎস্নারাত্রে কোমরে ধুতির খুঁট জড়িয়ে ক্ল্যারিওনেট হাতে জ্যাঠামশাই গিয়ে বসতেন গোলকপুরের জমিদারদের বাঁধানো পুকুর ঘাটে। রুপোর কারুকাজ করা ক্ল্যারিওনেটখানা যখন বাজাতে শুরু করতেন তখন সমস্ত চরাচর নিঝুম হয়ে যেত, জলে ঘাই মারতে ভুলে যেত মাছ। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত পৃথিবী আমার মহান জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকত। সেই সাধারণ, নিরীহ মানুষটিকে তখন মনে হত প্রকাণ্ড; মনে হত দূরবর্তী— যেমন ঈশ্বর। সেই বাঁশির সুর অদৃশ্য ফাঁসের মতো চারি দিকে ছড়িয়ে সমস্ত দূরকে টেনে আনত কাছে। শুনতে শুনতে কত বার আমার চোখের সামনে অচেনা দূর সব সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য ফুটে উঠত। কত বার দেখেছি, সেই সুর দূরের পুকুরঘাট থেকে উলটোপালটা বাতাস ভেদ করে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো ছুটে আসে। আমার রাগী দাদুও তাঁর পুবমুখো ইজিচেয়ারে বসে তামাকের নল হাতে বিষয়চিন্তা করতে করতে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে থাকতেন। তামাকের নলে টান পড়ত না, বিষয়চিন্তা উড়ে যেত মাথা থেকে, তিনি সোজা হয়ে বসে বাড়ির সবাইকে চাপা ধমক দিয়ে বলতেন, তোরা একটু চুপ কর তো। বরাবর যখনই জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভাবব, তখন অবিকল এক সুন্দর জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশের গায়ে তাঁর বিভোর মুখখানা মনে পড়বে। মনে পড়বে, আধভাঙা এক সাদা ঘাটের পৈঠা, পায়ের কাছে জল, বাতাসে কদম্বগন্ধ। সেখানে সংসারের সম্পর্কগুলি এসে কখনও পৌঁছয় না।

গোঁসাইবাড়ির নিন্দুক মেজো বউ আমাকে মাঝে মাঝে ডেকে নেয়, আয় কুকু, কুমড়ো ফুলের বড়া ভেজেছি। আমি রোগে-ভোগা পেটুক। দু'বার বলতে হয় না। কুমড়ো ফুলের বড়ার নামে গিয়ে বসি গোঁসাইবাড়ির তকতকে নিকোনো রান্নাঘরে। গরম বড়া রেকাবে সাজিয়ে দেয় গোঁসাই খুড়ি। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, তোর বড় জেঠিমা চলে গেল কেন রে?

আমি সব কথা অকপটে বলে দিই। গোঁসাই খুড়ির চোখ জুলজুল করতে থাকে।

আর কী হয়েছিল?

আর জানি না।

জানিস না? ওমা! তোদের দোকানে নাকি কী সব চুরিটুরি হয় শুনেছি! লোকে বলাবলি করে, তোর জ্যাঠামশাইকে নাকি দাদু এবার তাড়িয়ে দেবে!

শুনে বড় কষ্ট হয়। দাদু জ্যাঠামশাইকে তাড়িয়ে দেবেন? সত্যি বটে, প্লুরিসি হওয়ার পর ডাক্তার বারণ করায় জ্যাঠামশাই ক্ল্যারিওনেট কিংবা বাঁশি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবু এখনও দক্ষিণের ঘরের কাচের আলমারিতে তাঁর বোবা বাঁশিগুলো সাজানো আছে। সেই সব বাঁশির সুর স্মৃতি থেকে সৌরভের মতো এসে মাঝে মাঝে আমাদের চকিতে স্পর্শ করে যায়। স্পর্শ করে আমার বিষয়ী দাদুকেও। দাদু তা হলে কী করে জ্যাঠামশাইকে তাড়াবেন?

বিরহকাতর জ্যাঠামশাই নিজে কোনও বিপদের গন্ধ পেতেন না। তিনি বিভোর হয়ে গান লেখেন, কলের গানে শোনেন পুরনো রেকর্ড, নিজের গানে সুর দেন।

মুন্সীগঞ্জের বিখ্যাত স্বদেশি পিয়ারী ঘোষাল ছিলেন আমার মেজো পিসিমার সম্পর্কের দেওর। তিনি প্রায় সময়েই জেলে থাকতেন, নয়তো থাকতেন পালিয়ে। এক এক সময়ে তিনি হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হতেন। নিরীহ চেহারার ছোটখাটো মানুষ। মুখে হাসি আর পান লেগেই থাকত। তিনি আমাদের জেলখানার গল্প শোনাতেন। পেটে আলসার ছিল বলে খেতেন খুব কম। তিনি এসেই দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন। পাড়ার বউ-ঝি গান শুনতে ভিড় করত। এক-আধবেলা থেকে তিনি আবার উধাও হতেন।

সেবার পিয়ারী ঘোষাল এসে চলে যাওয়ার পর জ্যাঠামশাইয়ের স্বদেশি গান লেখার ঝোঁক চাপে। তিনি অনেকগুলো স্বদেশি গান লিখলেন এবং সুর দিলেন। কয়েক দিন বাদে পিয়ারী ঘোষাল এসে কয়েকটা গান নিয়ে গেলেন। পিয়ারী ঘোষাল আবার যখন ঢাকায় ধরা পড়লেন তখন তাঁর কাছে জ্যাঠামশাইয়ের লেখা গানগুলো পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহের নিশিদারোগা ছিলেন লতায়-পাতায় আমাদের দাদু। হাফপ্যান্ট, বুট আর গোল ধরনের শোলার টুপি পরে তিনি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চেপে আসতেন। তাঁর বিশাল ঘোড়াটা বাঁধা হত

পুবের ঘরের বারান্দার খুঁটির সঙ্গে। অত বড় ঘোড়া দেখার জন্য পাড়ার লোক ভিড় করত। সে-ঘোড়াটা যেন আমাদেরই সম্পত্তি। এ-রকম অধিকারবোধ নিয়ে আমরা ভিড় করতাম। নিশিদাদু বসতেন বড় ঘরের বারান্দায় টিনের চেয়ারে। হ্যাট খুলে কোলে রাখতেন, তাঁর বিশাল টাক দেখা যেত, দু'টি প্রকাণ্ড পা ছড়িয়ে দিতেন সামনে। কোনও লোকের অত মোটা পা আমরা আর দেখিনি। বিশাল উরু, ফুটবলের মতো বড় পায়ের গুলি, পেল্লায় একজোড়া বুট, আমরা সবিস্ময়ে সেই পা দু'খানা দেখতাম।

পিয়ারী ঘোষাল ধরা পড়ার পর মেজো পিসিমা দাদুকে চিঠি লিখে জানালেন পিয়ারী ঠাকুরপো আবার ধরা পড়ায় বাসায় শান্তি নাই... ইত্যাদি। এরই দিন সাত-আট বাদে এক দিন বিকেলে দাদু কাছারি থেকে ফেরার পর নিশিদারোগার ঘোড়া মাটি কাঁপিয়ে এসে বারবাড়িতে থামল। নিশিদাদু গম্ভীর মুখে বুটের শব্দ তুলে ভিতর-বাড়িতে এলেন। লোকজন তাঁর সামনে থেকে সাঁৎ সাঁৎ লুকিয়ে পড়ল। কেন জানি না, দারোগা পুলিশ দেখলে সে আমলের নিরীহ সজ্জনরাও লুকোবার চেষ্টা করতেন। নিশিদাদু এসে বারান্দায় বসলে সবাই তাঁকে খাতির করতে লাগল। তিনি দাদুকে ডেকে বললেন, কালীদা, পিয়ারী ঘোষালের কাছে কিছু স্বদেশি গান পাওয়া গেছে, সেগুলো কার লেখা জানেন?

দাদু বললেন, না তো!

নিশিদাদু গম্ভীরভাবে বললেন, বাড়ির ছেলেদের খোঁজখবর রাখেন না। তারা সব বখে যাচ্ছে।

বড় জ্যাঠামশাইয়ের বয়স তখন চল্লিশ পার। সেটা বখে যাওয়ার বয়স নয়। তবু অবস্থা বিবেচনা করলে, নিশিদাদু কিছু ভুল বলেননি। জ্যাঠামশাই কিছুটা বখেই গিয়েছিলেন বোধ হয়।

সব শুনেটুনে দাদু গুম হয়ে রইলেন। কিন্তু তাঁকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল না। বরং স্যার আশুতোষ মার্কা গোঁফের ফাঁক দিয়ে চকিতে এক-আধটা চিড়িক চিড়িক হাসি দেখা গেল। কিন্তু যথাসম্ভব গুম হয়ে থাকার চেষ্টাই করলেন তিনি।

নিশিদাদু বললেন, অবশ্য পিয়ারী ঘোষাল বীরেনের নাম বলেনি। বলেছে আমাদের ইনফর্মার, গানের কপিতেও কোনও নাম নেই। কাজেই ডাইরেক্ট অ্যাকশন এখনই কিছু হচ্ছে না। তবু সাবধান করে যাই, যে-কোনও সময়ে সার্চ হতে পারে।

নিশিদাদু চলে গেলে দাদুর মুখ চাপা হাসিতে লাল হয়ে গেল। তিনি হেঁকে সুদর্শনকে তামাক আনতে বললেন। সেদিন বিকেলে আর বাগানের কাজে গেলেন না। পুবমুখো ইজিচেয়ারে আঁট হয়ে বসে পা দোলালেন কিছুক্ষণ। ঠাকুমা চিন্তিত মুখে দাদুর কাছাকাছি ঘুরঘুর করেন আর চাবির ঝনাৎ শব্দ করে কথা পাড়বার চেষ্টা করেন, নিশিদারোগা কি ধরবে নাকি বীরেনকে?

দাদু গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে বলেন, ধরুক না। অপদার্থ বাউন্ডুলেদের ওইরকমই সব হয়। আমি কিছু করতে পারব না যাও। যা হয় হোক। বউ চলে গেছে তো বিরহের গান লিখুক, তা না লিখতে গেছে স্বদেশি গান...

এই বলে দাদু তামাক টানতে লাগলেন. ঠাকুমা বললেন, তো বড় বউমাকে একটা খবর দিয়ে আনাও। ছেলের এ-সব মতিগতি তো ভাল নয়। বউমা এসে যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে...

দাদু হেঁকে উঠলেন, তা হলে যা-ও একটু মানুষের মতো হয়ে উঠছিল তা-ও আর হবে না। বউয়ের আঁচল-ধরা হয়ে জীবনটা যাবে। এখন তো তবু পাঁচজনকে বলতে পারবে যে তুমি এক স্বদেশির মা। পাঁচজন সমীহ করবে। বউমা এলে গান-টান শিকেয় উঠবে. দোকান থেকে ফিরে এসে বউয়ের মাথা টিপে দেবে, পদসেবা করবে— অপদার্থের একশেষ।

...জ্যাঠামশাই ঝোঁকের বশে স্বদেশি গান লিখেছিলেন। ব্যাপারটা যে এত দূর গড়াবে তা তাঁর ধারণায় ছিল না। রাতে দোকান থেকে ফিরে এসে সব শুনে তাঁর মাথা গরম হয়ে গেল। খেতে পারলেন না। ঘুম আসছে না বলে সুদর্শনকে ডেকে এক বালতি জল আনিয়ে বারান্দায় বসে মাথা ধুয়ে নিলেন। সেই রাতে সুদর্শন তাঁর ঘরে শুল। পরদিন সকালেই তিনি তাঁর গানের খাতাখানা পুড়িয়ে ফেললেন। সে-খাতায় প্রায় সবই ছিল বিরহের গান, দু'-একটা মাত্র স্বদেশি। তবু সবটাই পোড়ালেন, যেন কেউ টের না পায় যে কোনও দিন ভুলক্রমেও তিনি গান লিখেছেন।

দাদু এ-সব দেখে খুব রেগে গিয়ে আকাশ বাতাসকে গালাগাল করেন। স্ত্রৈণ পুরুষদের দুর্দশার কথা বলে সবাইকে সাবধান করেন।

তারপর একদিন বড় জ্যাঠামশাই আমাকে আর গণাদাকে ডেকে নিয়ে সাইকেলের রডে আর ক্যারিয়ারে চাপিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে নিয়ে গেলেন। সুরেশকে আগেভাগেই তিনি কোথায় সরিয়ে দিয়েছিলেন। রমজান বাজারের থলেতে করে পা-বাঁধা এক প্রকাণ্ড মোরগ নিয়ে এল। রুক্মিণীর দোকান থেকে এল এক খাঁচি মিষ্টি। সে-সব আমার আর গণাদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, নিশিদারোগার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়। আমার নাম বলে দিস। আর সাবধান, আমাদের বাড়ির কেউ যেন টের না পায়।

তখন বিকেলবেলা। থানার লাগোয়া লাল ইঁটের বাড়ি। এধার-ওধার বিস্তর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর গণাদা পুলিশ-টুলিশ দেখে জড়োসড়ো আর সরু হয়ে ঢুকি। বারান্দায় একটা মোটাসোটা ছেলে বেতের চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছিল। আমাদের দেখে উঠে এসে বলে, ভেট বুঝি? মুরগিটা তো বেশ! বুঝলাম, আমাদের বয়সি এই ছেলেটা এ-সব মুরগি-টুরগি নিয়ে বিস্তর লোককে তাদের বাসায় আসতে দেখে থাকে।

সাড়া পেয়ে নিশিদাদু বেরিয়ে এলেন। খালি গা, পরনে লুঙ্গি, চোখে বই পড়ার ভারী চশমা। আমাদের দেখে অবাক হয়ে বললেন, এ-সবের কী দরকার ছিল? আমি থাকতে বীরেনের গায়ে হাত দেয় কে? তা ছাড়া, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি এ-সব চলে! এসো এসো তোমরা, ভিতরে বসবে চলো—

নিশিদাদুর ভিতর-বাড়ির বারান্দায় বসে আমি আর গণাদা কবজি ডুবিয়ে দুধ, মুড়ি, আমসত্ত্ব আর মর্তমান কলার ফলার করি। আর আড়চোখে চারি দিকে দেখি। কেমন ভয় ভয় করে, লম্বা লক্‌লকে চেহারার একটা ফ্রক পরা মেয়ে বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে আমাদের খাওয়ার দৃশ্য দেখে মিটিমিটি হাসে। সে দেখছে বলে আমার ভাল করে খাওয়াই হল না। সারাক্ষণ কাঁটা হয়ে বসে রইলাম। গণাদার অত বোধবুদ্ধি নেই। সে চিনি কম হয়েছে বলে আরও চিনি চাইল। ভীষণ শব্দ করে খেল, হাত চাটল, ঢেঁকুর তুলল। মোড়া পেতে সামনে বসে ছিলেন নিশিদাদু। বললেন, তুই যা রোগা কুকু, এক্সারসাইজ-ফাইজ করিস না! এই দেখ আমার নাতনি—আমার বড় মেয়ের মেয়েটা—টিকলি তোর চেয়ে ছোটই হবে—এ এখন আমার বড় ঘোড়াটায় চড়তে পারে। লজ্জায় আমি ভাল করে টিকলিকে দেখলাম না।

জ্বরে ভুগে আমার শরীর রোগা, বসা গাল, কোটরগত চোখ, পেঁপেপাতার নলের মতো সরু ঘাড়, আমার বয়সি যে-কোনও ছেলের চেয়ে কমজোরি। তবু সেই অপদার্থ আমি ঘোড়ায় চড়া টিকলিকে কত বার কল্পনায় দেখেছি!

বয়ঃসন্ধি কেমন এক আলো-আঁধারির সময়। শরীরের স্বেদগন্ধ পাই। হরিণের মতো চঞ্চল হয় শরীর। পৃথিবীর সমস্ত বিরহবেদনা মনে এসে বাসা বাঁধে। আলোছায়াময় এক ঘেরাটোপ ঘিরে থাকে। জলে নিজের ছায়া দেখি, অনেকক্ষণ স্নানে নামি না। যাকে কখনও স্পর্শ করা যাবে না, সেই দূরবর্তিনী টিকলিকে— যাকে আমি কয়েক পলক মাত্র দেখেছিলাম— সে আমার কল্পনায়, বয়ঃসন্ধির আলো-আঁধারের এক অরণ্যে মায়াবী আলোয় প্রকাণ্ড ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ধীরে ধীরে অন্যমনে চলে যেত।

নিশিদারোগাকে ভেট দেওয়ার ব্যাপারটা চাপা থাকেনি। গণাদা বলে দিয়েছিল। এরপর নিশিদাদু ঘন ঘন আসতেন। দাদু গরগর করতেন রাগে। ঠাকুমা সযত্নে নিশিদাদুকে মিষ্টি খাওয়াতেন।

॥ ছয় ॥

গলায় বাদামি রঙের কম্ফর্টার জড়ানো, পরনে আধময়লা ধুতি আর শার্ট, কালো, ছোটখাটো চেহারার লোকটিকে দেখে কে বলবে যক্ষ্মারুগি! মনে পড়ে, তাঁর শীর্ণ মুখে একটু কাঠ-কাঠ অপ্রস্তুত হাসি ছিল। কেবল তাঁর চোখ দু'টো ছিল খুব চকচকে, জলভরা চোখের চাউনি তীব্র। এইটুকুই ছিল তাঁর অস্বাভাবিকতা। তিনি ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন একদম একা। গাড়োয়ান তাঁর টিনের সুটকেস, রঙিন নতুন শতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা আর গুটি কয়েক পোঁটলা-পুঁটলি কাছারিঘরের বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

বাড়িসুদ্ধ লোক তাঁকে দেখার জন্য ভিড় করে এল বারবাড়িতে। দিশেহারার মতো তিনি চারি দিকে চেয়ে গলার কম্ফর্টারটা খুলে আবার বাঁধলেন, আর প্রাণপণে সেই কাঠ-হাসি হাসার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বড় জেঠিমা চলে যাওয়ার পর থেকেই বাড়ি থমথম করছে। দাদু খুব গম্ভীর। কারও মন ভাল নেই। সেই অবস্থায় মাখনকাকার খুব ভাল অভ্যর্থনা পাওয়ার কথা নয়। তার ওপর যক্ষ্মারুগি।

তিনি প্রণাম করলে দাদু জিজ্ঞেস করলেন, হৈম এল না?

মৃদুস্বরে মাখনকাকা বললেন, না। বাড়িতে বাচ্চাকাচ্চাগুলো আছে—তাদের দেখে কে! আমি একাই এলাম সোনাকাকা।

সবসময়ে দেখাশোনার একজন লোক চাই তো! তুই রুগি মানুষ।

নাচার হলে কেউ এসে পড়বে।

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন, কে আসবে? সকলের সঙ্গেই তো তোর ঝগড়া। অত বড় সংসার ভেঙে আলাদা হয়ে গেলি! সংসার ভাঙার মতো পাপ আছে। লোকবল জনবল কিছু থাকে না। মানুষ একা হয়ে যায়। এখন বিপদের দিনে কে পাশে এসে দাঁড়াবে?

মাখনকাকা লজ্জিত মুখ মাটিতে নুইয়ে রেখে বললেন, দেখি।

দাদু একটিও কথা না বলে খড়মের শব্দ তুলে ভিতর-বাড়িতে গেলেন। ভিড় ভেঙে যেতে লাগল। মাখনকাকা তখনও মাঠে দাঁড়িয়ে, কেউ দেখিয়ে দেয়নি কোনটা তাঁর ঘর, কেউ ডাকেনি তাঁকে ভিতর-বাড়িতে। তাঁর শীর্ণ কাঁধের ওপর দিয়ে প্রবর্তক স্কুলের উঠন্ত দেয়াল আর বাঁশের মাচা দেখা যায়। মাথার ওপর নীল আকাশ, আর পিছনে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বিস্তার। এই পটভূমিতে তাঁকে বড় তুচ্ছ অসহায় এবং একা লাগছিল সেই শেষ বেলার ম্লান আলোয়।

খেলার শেষে যখন ফিরছি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। দেখি তখনও তাঁর বাক্স-বিছানা বারান্দায় পড়ে আছে, তিনি উবু হয়ে বারান্দার ধারে বসে বিড়ি খাচ্ছেন। আমাকে দেখে ডাকলেন, ও খোকা, এখানে কেরাসিন কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারো?

কেরাসিন? সে তো সেই বড় কালীবাড়িতে পাওয়া যায়। গদাইকাকার দোকানে।

ইস! সে তো অনেক দূর! তোমার বাড়িতে চাকর-বাকর নেই! কেউ একটু এনে দিতে পারে না? আমি পয়সা দেব।

বাড়ির ভিতরে এসে বললাম, কিন্তু কেউ গা করল না।

কাছারিঘরের বারান্দা বেদখল হয়ে যাওয়ায় মেজো জ্যাঠামশাই পুবের ঘরের বারান্দায় আমাদের পড়াতে বসেছিলেন। রাতে মেজো জ্যাঠামশাইয়ের ইস্কুল থেকে ছুটি পেয়ে বারবাড়ির কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু মাঠে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নেমে দেখি, ঘাসে শিশির পড়েছে। শরতের প্রথম হিমভাব বাতাসে টের পাওয়া যায়। লেবু ফুলের মৃদু গন্ধ। সেই জ্যোৎস্নায় গা ডুবিয়ে আমাদের বাইরের বারোয়ারি টিউবওয়েল থেকে কলসিতে জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে বুড়ি বৈষ্ণবী বিরজা। মাঠের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটিতে বসে আছে আমার ছোট পিসিমা, আর তিনজন পিসতুতো দিদি। জ্যোৎস্না ফুটলে তারা মাঝে মাঝে ওইখানে এসে বসে। বাদামের খোলা ভাঙে, আঙুলের ডগায় ঝাল নুন মুখে নিয়ে শিস টানে, কিংবা কখনও গান গায়!

ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় আমরা হল্লা করি, নাচি, ডিগবাজি খাই! চোখে পড়ে মাখনকাকার ছাঁচবেড়ার ঘরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে আলো আসছে, ঝাঁপের দরজা বন্ধ। বেড়ার ফোঁকরে উঁকি মেরে দেখি তিনি হ্যারিকেন জ্বেলে একটা পুরনো টর্চ-বাতিতে নতুন ব্যাটারি ভরছেন। সামনে খোলা টিনের সুটকেস, বিছানার ওপর কয়েকটা কৌটো, একটা কাঁসার বাটি পড়ে আছে। টর্চে ব্যাটারি ভরে তিনি কাঁসার বাটিতে কৌটো থেকে মুড়ি ঢাললেন, আর একটা কৌটো থেকে নারকোলের তক্তি। তারপর গামছা কাঁধে ফেলে ঘটি হাতে ঝাঁপের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে তিনি আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে! কে রে! আমরা দুড়দাড় করে পালালাম।

এরপর থেকে মাখনকাকাকে মাঝে মাঝে দেখতাম টিউবওয়েল থেকে নিজেই পাম্প করে বালতিতে জল ভরে মাথা ধুয়ে নিচ্ছেন। দেখতাম, নিজের থালা-বাটি সামনে সাজিয়ে নিয়ে ঘরের

ঝাঁপটি খুলে রেখে মেঝের পিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন কখন ভিতর-বাড়ি থেকে সুদর্শন এসে ভাত দিয়ে যাবে। থালা-বাটি নিয়ে বসে থাকতে থাকতে ধৈর্য হারিয়ে মাঝে মাঝে বিড়ি ধরাতেন। একসময়ে সুদর্শন ভাত নিয়ে আসত, ভিখিরিকে দেওয়ার মতো করে ঢেলে দিয়ে যেত পাতে। খাওয়ার পর তাঁকে কত দিন দেখেছি বাসন মাজবার জন্য কলপাড় থেকে দুর্বল হাতে লম্বা ঘাস ছিঁড়ছেন। বাসন মাজবার সময়ে আমাদের কারও চোখে চোখ পড়লে লজ্জার হাসি হেসে বলতেন, অভ্যাস নেই কিনা, তাই আমার মাজা বাসন পরিষ্কার হয় না। তোমার কাকিমা যা বাসন-কোসন করে রাখে, ঠিক যেন রুপো; ও-সব হাতের গুণ। যক্ষ্মারোগ তাঁকে যে নিঃসঙ্গতার মধ্যে এনে ফেলেছে সেই আত্মীয়তাহীন নিঃসঙ্গতায় বোধ হয় মাঝে মাঝে খুব তীব্রভাবে তাঁর নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ত। দাদুর মুহুরি সর্বেশ্বরের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতেন, বুঝলেন খুড়ো, ভেবেছিলাম ফসলের সময়টা গ্রামেই কাটিয়ে তারপর আসব চিকিৎসা করাতে। তত দিনে ধানচালও গোলায় উঠে যেত। কিন্তু এমন ঘন ঘন জ্বর আসতে লাগল—ম্যালেরিয়াকে বলে ওদিক থাক—ডাক্তারও থাকতে ভরসা দিল না। ফসল ওঠার মাথায় মাথায় চলে আসতে হল, নইলে এ-সময়ে প্রতি বছর এক বার করে ঢাকায় যাই সওদা করতে। ফুর্তি-টুর্তি করে আসি।

মাঝে মাঝে রাতে সুদর্শন ভাত নিয়ে গেলে মাখনকাকা খুঁতখুঁত করতেন, বিকেলের দিকে জ্বরটা এল সুদর্শন, ভাত খাওয়া কি ঠিক হবে? দু'-চারখানা রুটি-টুটি হলে—

সুদর্শন চড়া গলায় বলে, এ-বাড়িতে রুটির পাট নেই খুড়োমশাই, বেলন-চাকিও নেই। ও-সব হাঙ্গামা কে করে! কত বড় সংসার দেখছেন তো!

মাখনকাকা হতাশ হতেন। তারপর দেখতাম, ছোট একটা বেলন-চাকি কিনে এনে তেড়া-বেঁকা রুটি বেলে কাছারিঘরের এককোণে ইঁটের উনুনে কাঠের জ্বাল তুলে মাখনকাকা রুটি সেঁকে নিচ্ছেন।

সর্বেশ্বর শুতেন কাছারিঘরের ভিতরে, চাকর-বাকর এবং কয়েকজন কামলার সঙ্গে। হেঁকে সাবধান করতেন, ঘর-দোরে কবে আগুন লাগে মাখন, তার চেয়ে মুড়ি-টুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দাও না।

তখন খাল বিল পুকুর থেকে শেষ বর্ষার জল টেনে নিয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র। ধোপাদের মাঠে নিকুঞ্জর মান্দাস আর চলে না। মাঝে মাঝেই ছানা কাটার মতো আকাশের মেঘ কেটে যায়। হঠাৎ বৃষ্টি থেমে রোদ ওঠে। নতুন বেনারসির মতো ঝলমল করে চারধার। তখন দুঃখিত চিত্তে দাওয়ায় বসে মাখনকাকা গুনগুন করে গান— কপাল মন্দ হলে, লোকে মন্দ বলে, সম্বন্ধ রাখে না সহোদর ভাই—

সেই সময় নিকুঞ্জ, জগদীশ আর রাখালের একসঙ্গে পৈতের দিন পড়ল। তিন-চার দিন আগে থেকে বাড়ি ভরে উঠল আত্মীয়স্বজনে। আমরা অত লোকের মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে লাগলাম। কেউ পাত্তা দেয় না। সারা দিন চিৎকার চেঁচামেচি, ব্যাপারবাড়ির লোকজনের আনাগোনা। সেই উৎসবে আমরা ক'ভাই-বোন অনাদরে অলক্ষ্যে পড়ে আছি। খাওয়া শোয়ার ঠিকঠিকানা নেই।

গণাদা আর আমি জুড়ি বেঁধে ঘুরি, চুরি করে মিষ্টি-টিষ্টি খাই। আমাদের তেমন কোনও খেলা ছিল না। পুবের ঘরের নিচু চালে উঠে লাফ দিয়ে নীচে পড়ি। নয়তো পেয়ারা গাছের নীচের ডাল ধরে দোল খাই। নদীর পাড়ের প্রবর্তক ইস্কুলের অর্ধসমাপ্ত বাড়িটার এ-ঘর ও-ঘর দৌড়ে এক ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা খেলি। আমার আর গণাদার জীবনে তেমন কিছু ঘটে না। তাই বাড়িতে উৎসব হলে আমাদের বড় আনন্দ।

পৈতের দিন সকাল থেকে লোক আসছে। মুহুর্মুহু রিকশা আর ঘোড়ার গাড়ি এসে থামছে। নানা অচেনা লোক তাদের ছেলে-মেয়ে বউ নামে। আমরা নিস্পৃহ চোখে চেয়ে দেখি। সমাগত আত্মীয়স্বজনদের কেউ বা কাছে ডেকে বলে এই বুঝি নরেনের ছেলে! বড় রোগা হয়েছে দেখছি! কোন ক্লাসে পড়ো?... ভাসাভাসা উত্তর দিয়ে সরে আসি।

হঠাৎ একসময়ে ভিড়ের মধ্যে একটু ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। বড় জ্যাঠামশাই হন্তদন্ত হয়ে বারবাড়িতে ছুটে যান। তাঁর পিছু পিছু গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড হুডওয়ালা মোটরগাড়ি থেকে নিশিদাদু নামছেন। সঙ্গে ঠাকুরমা, সেই মোটাসোটা ছেলেটা, আর টিকলি। নিশিদাদুর গাড়ি ছিল না। সম্ভবত তাঁকে যারা খাতির করত তাদেরই কারও গাড়ি তিনি ঝোঁকে এনেছিলেন। আমাদের বাড়িতে মোটর গাড়ি আসাটা

একটা বিরল ঘটনা। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে সেই গাড়ি ঘিরে রইল। সেই রঙিন ছেলেমেয়েদের ভিড়ের ভিতরেও টিকলি আমাকে এক পলক দেখল। আর এক আনন্দ, তীব্রতর এক দুঃখ, এক দহনজ্বালা আমার শিশুমনকে স্পর্শ করল এসে। আমি আর চোখ তুলতে পারলাম না। এতক্ষণ হারিয়ে ছিলাম ভিড়ের মধ্যে, নিজেকে টেরও পাইনি। টিকলি তাকাতেই মনে পড়ল—আমি বড় রোগা, আমি খেলতে জানি না, ছুটতে পারি না। অকারণ অভিমানে ভরে উঠল বুক। চারি দিকের অনাদর এসে আঘাত করল আমাকে।

জ্বর এলে যেমন একা হয়ে যাই, ধীর পায়ে হেঁটে চলে যাই পশ্চিমের ঘরে দীর্ঘ নির্বাসনে, ঠিক সে-রকমই একা একা ভূত আমাকে পেয়ে বসে। দলছুট করে দেয়। উত্তরে বাস করেন সুন্দর মানুষ সিতিকণ্ঠ, তাঁদের বাগানের এক মস্ত জাম গাছের ছায়ায় একটা বেদির মতো মসৃণ পাথর পড়ে আছে কবে থেকে। সেই পাথরটায় গিয়ে বসি। দুপুরের রোদ গায়ে এসে পড়ে, বাতাসে দোলে গাছের ঝিরঝিরে ছায়া, কাক ডাকে। একটা তক্ষকের ডাক শুনি। ফড়িং লাফিয়ে কাছে আসে, আবার দূরে যায়। বাতাসে নরম আঁশ তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। ক্রমে গভীর, গাঢ়, উজ্জ্বল দুপুর আমার শরীরের মধ্যে জ্বলতে থাকে। টের পাই, আমার বয়স বাড়ছে।

করমচা তলায় পা টিপে টিপে আসে তুলারানী। ঝরে পড়া করমচা ফ্রকের কোঁচড়ে কুড়োতে কুড়োতে মাথা নেড়ে ঝাকড়-মাকড় চুলের ঝাপটা সরাতে গিয়ে দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে হাসে। তার নতুন দুধ-সাদা ঝিরঝিরে দাঁতের হাসিটি হেসে চেঁচিয়ে বলে, তোমাদের বাড়িতে যা তেতোর ডাল হয়েছে না গো কুকুভাই, সারা বাড়ি ম ম করছে গন্ধে।

সংবিৎ পেয়ে ধীরে ধীরে ভিতর-বাড়িতে আসি। তখন মুণ্ডিত মস্তক তিন ভাই ভিক্ষা চাইছে। তাদের পরনে গেরুয়া, হাতে দণ্ড আর ঝোলা। সারিবদ্ধ মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়েছে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য। লোক ভেঙে পড়েছে বাড়িতে। উত্তরের বড় ঘরের বারান্দায় মেয়েদের ভিড়। ওই মেয়েদের ভিড়ের দিকে আমি তাকাতে পারি না। কারণ ওইখানে টিকলি রয়েছে। তার পরনে সাদা মেম-ফ্রক, তাতে পাতলা লেস লাগানো, দু'টো বিশাল বিনুনি তার বুকের দু'পাশে ঝুলে আছে, কপালে পশ্চিমা টিপ, চোখে কাজল। সে ঘোড়ায় চড়তে পারে। তার অহংকারী চোখ এখন হয়তো বা আমাকে দেখছে। ঠোঁটে একটু হাসি। সে একটি রোগে ভোগা ছেলের প্রতি করুণা বোধ করছে এখন।

আমি এবার ভিড়ে গা ঢাকা দিতে চেষ্টা করি। এর ওর পায়ের ধাক্কা খেয়ে বলের মতো এদিক-ওদিক গড়িয়ে যাই। বুক জুড়ে এক পিপাসা, শিউরানো রোমকূপ, অন্যমনস্ক চোখ, সারা দিন কেউ আমার খোঁজ নেয় না। একা একা ঘুরে বেড়াই।

পুবের দণ্ডীঘরে তখন তিন নতুন ব্রাহ্মণের নির্বাসন শুরু হয়েছে। জানালা-দরজা বন্ধ। তবু ফুটোফাটা দিয়ে তাদের কার্যকলাপ দেখার জন্য ভিড় কবছে কাচ্চাবাচ্চা। দক্ষিণের ঘরের পিছনে লেবু ঝোপের পাশে এক মালসা চরু আর ফুলের টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে গণাদা আমাকে ডাকে। কাছে যেতে হি হি করে হেসে বলে, নতুন বামুনের পেসাদ। অনেকটা বেঁচে গিয়েছিল, নিবারণ জ্যাঠার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। খাবি? অনেকটা আছে।

খেতে ইচ্ছে করে না। আমি মাথা নেড়ে বলি, তুই খা।

নতুন বামুনরা পেচ্ছাপ করতে যাবে, উঠোন পেরিয়ে পগারের দিকে সেই করমচা তলায়। পাছে কোনও শূদ্রের মুখ দেখতে হয়, কিংবা সূর্যের আলো চোখে পড়ে, সেই ভয়ে গেরুয়া উত্তরীয়তে তাদের মুখ ঢাকা। নিবারণ জ্যাঠা দণ্ডীঘরের দরজা থেকে আমাকে ডাকেন, যা তো কুকু, হাত ধরে ধরে ওদের নিয়ে যা, করচমচা-তলা থেকে আবার ঘুরিয়ে এনে দিয়ে যাবি। দেখিস, কেউ যেন ওদের না ছোঁয়।

উঠোন পেরিয়ে সকলের চোখের আড়াল হতেই রাখাল আর জগদীশ মুখের ঢাকনা খুলে হি হি করে হাসে। কেবল নিকুঞ্জ ঢাকনা খোলে না। রাখাল আমাকে খোঁচায়, ইস চরু জিনিসটা খাওয়াই যায় না রে, একদম মিষ্টি নেই। বমি-বমি করে। রুক্মিণীর দোকান থেকে রসগোল্লা এসেছে সকালে, পাটাতনে তোলা আছে। পাছ-দুয়ার দিয়ে গিয়ে যদি উঠিস কেউ দেখতে পাবে না। নিয়ে আয় না কুকু।

আমি ওদের দিকে চেয়ে দেখি। কেমন ঈর্ষায় বুক জ্বলে যায়। আজ শ' শ' লোক ওদের দেখেছে, মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করেছে কতজন! গোলকপুরের জমিদারের বউ ভিক্ষে দেওয়ার সময়ে অঝোরে

কেঁদেছিলেন। ওরা উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো সব বৈভব উপেক্ষা করে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে হেঁটে গেছে। কী মহান দেখাচ্ছিল তিন কিশোর ব্রহ্মচারীকে। ওরা বুঝি নিজেদের অন্তর্গত সেই মহত্ত্বকে উপলব্ধি করে না!

নাকি করে! নিকুঞ্জর মুখে আমি সেই সত্যিকারের বৈরাগ্যকে দেখেছিলাম। ভিক্ষার সময়ে সে কারও মুখের·দিকেই ভাল করে চেয়ে দেখেনি। তার দূরলগ্ন চোখ অন্য কাকে প্রত্যক্ষ করেছিল। সে সন্ন্যাসীর চোখে চেয়ে ভিক্ষা করে দণ্ডীঘরে চলে গিয়েছিল।

আমার বড় ইচ্ছে হয়েছিল, ওইরকম গেরুয়া পোশাক পরে উদাসী চোখে হেঁটে যাই। যা আমার এখনকার চেহারা তা নয়, লোকে আমার অন্য এক রূপ দেখুক, যার মধ্যে মহত্ত্বের স্পর্শ আছে। আছে পৌরুষ এবং বৈরাগ্য।

গণাদা রসগোল্লা চুরি করে আনে, হাতের কোষে নিয়ে আসে পায়েস কিংবা মাছের পেটি। সারা দিন ধরে খায়। কখনও দক্ষিণের লেবু তলায়, কখনও পুবের বাগানে, কখনও বা কাছারিঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে খেতে দেখি। অন্য সব উৎসবের সময়ে এ-রকম আমিও কত খেয়েছি। আজ ইচ্ছে করছিল না। গণাদার চোখে চোখ পড়লেই সে চোখ ছোট করে হাসে, কাছে এসে বলে, জালের আলমারিতে এত খেজুর। খাবি কুকু? এখন বড় ঘরে ঠাকুমা নেই।

আমি মাথা নাড়ি। আমার ভিতরটা খাওয়ার কথায় বমি বমি করে। শরীরে জ্বর আসবার আগের মতো শীতভাব।

যখন বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক, বেশির ভাগ লোকেরই খাওয়া শেষ হয়ে ধোয়ামোছা চলছে, তখন সবার শেষে নেমন্তন্ন খেতে এলেন সুন্দর মানুষ সিতিকণ্ঠ, নীল সাইকেলখানা থামালেন বারবাড়িতে। রূপ ঝরে পড়ল। সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, কাঁধে চওড়া পাড়ের মটকার উড়ুনি। আঙুলে পোখরাজের আংটি চমকাচ্ছে।

তাঁকে খেতে বসানো হল বড় ঘরের বারান্দায়। একা খাচ্ছিলেন সিতিকণ্ঠ। তাঁর অসামান্য সৌন্দর্যে সমস্ত বাড়িটা ভরে উঠেছিল যেন। মেয়েদের মহলে উত্তেজিত খবর ফিসফিসিয়ে রটে যায়— সিতিকণ্ঠ...সিতিকণ্ঠ... সেই যে সুন্দর মানুষটা!

এ-রকমই বিস্তৃত ছিল তাঁর রূপের খ্যাতি। মেয়েরা দরজায়-জানালায় ভিড় করে তাঁকে দেখতে লাগল। বাজারে, আমাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের কাছেই সিতিকাকার খেলার সরঞ্জামের দোকান। সে-দোকানে ভিড় হয় খুব। সিতিকণ্ঠের রূপ অনেককে টেনে আনে। সিতিকণ্ঠও জানতেন তাঁর রূপকে ব্যবহার করতে। বারবার দেখেছি, সিতিকণ্ঠ নিমন্ত্রণে আসেন সবার পরে, যাতে ভিড়ের ভিতরে তাঁর রূপ হারিয়ে না যায়।

উঠোনের পুব দিকে হাঁসের ঘরের ওপর এক পা তুলে দাঁড়িয়ে সিতিকণ্ঠের খাওয়ার সুন্দর ভঙ্গিগুলো দেখি। কী সুন্দর সিতিকণ্ঠ নামে মানুষটা। কী মুখ-চোখ, কী রং, মাথায় কেমন সারবন্ত বাগানের ফলনের মতো একরাশ ঘেঁষ, কালো কুচকুচে ঢেউ-চুল।

কেউ কেউ সিতিকণ্ঠ হয়, কেউ কেউ তা হয় না। তবু সারা দিন জ্বর-বিকারের মতো আমার মন প্রার্থনা করে, আমাকে সিতিকণ্ঠের মতো সুন্দর করো।

শেষ বেলার বারবাড়ির বারান্দায় নিজের থালাবাটি সাজিয়ে বসে আছেন মাখনকাকা। সুদর্শন তখনও তাঁর ভাত দিয়ে যায়নি। আমাকে দেখে ডাকেন, বলেন, আজ কী কী রান্না হল তোমাদের?

আপনি খাননি?

মাখনকাকা লজ্জা পান, বলেন, ব্যাপারের বাড়ি তো! ভুলেই গেছে বোধ হয়। আমি ক্ষয়কাশের রুগি। ভিতর-বাড়িতে গেলে আবার কে কী মনে করবে। তা তুমি একটু বলবে নাকি খোকা সুদর্শনকে? খিদেটা মরে গেল, পিত্তি পড়ছে।

ব্যস্ত সুদর্শনকে গিয়ে বলতেই সে ঝেঁঝে ওঠে, হবে, হবে, এখনও তো সকলের খাওয়া হয়নি। সারা দিন আমরাও দাঁতে খড়কে কাটিনি।

আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসে। উৎসবের ভিড় আলগা হতে থাকে। অনেকেই বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। বারবাড়িতে আমরা মোতায়েন আছি। যখন যার দরকার, তখন গিয়ে রিকশা বা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে এনে দিই।

পশ্চিমের পগার পাড়ে একটি নিঃশব্দ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে বেলা শেষ হয়ে আসে। করমচার দীর্ঘ ছায়া বারবাড়ি পর্যন্ত চলে আসে। তারপর অসীমের দিকে চলে যেতে থাকে। সেই ছায়াই ক্রমে সন্ধ্যা আনে, আনে রাত্রিকে। এ-দৃশ্য আমি কত বার দেখেছি।

ঠিক সেই সময়ে বারবাড়ির মাঠ ধরে নিশিদাদু বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সেই মোটা ছেলেটা, একটু তফাতে নিশিঠাকুমা আর টিকলি, বড় জ্যাঠামশাই সসম্ভ্রমে তাঁদের মোটর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তাঁরা গাড়িতে উঠলে সুদর্শন প্রকাণ্ড পেতলের টিফিন ক্যারিয়ারটা ভিতর বাড়ি থেকে বয়ে আনল। গিয়ে দাঁড়াল গাড়িটার কাছে।

গণাদা ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলে, নিশিদাদুর ভেট।

নিশিদাদু মৃদু আপত্তি করতে থাকেন, এ-সবের কী দরকার ছিল! অ্যাঁ? এ-সবের...

এক ভিড় মানুষজন দৃশ্যটা দেখছে। শুনতে পাই, টিকলি চাপা ধমক দিয়ে বলছে, আমরা অনেক খেয়েছি, আর লাগবে না। দাদু, এ-সব নিয়ে যেতে বলো।

নিশিদাদু সে-কথায় কান না দিয়ে ড্রাইভারকে বলেন, কুমুদ, টিফিন ক্যারিয়ারটা তুলে নাও তো। বেচারা কষ্ট করে বয়ে আনল। তারপর বড় জ্যাঠামশাইকে উদ্দেশ করে বলেন, বীরেন, বেশ খাইয়েছ তোমরা—বেশ। মাছটা কোথা থেকে আনিয়েছিলে বলো তো! মোহনগঞ্জ থেকে? ঘণ্টটায় বাপু ঝাল কিন্তু কম হয়েছিল...

মেঘের মতো গুর গুর করে ডেকে ওঠে মোটর গাড়িটা। মোরগের মতো কোঁকর কোঁ হর্ন দেয়। মোটর গাড়ির পিছু পিছু আমরা ছুটতে থাকি, আমাদের প্রিয় খেলা; ধুলো এসে মুখ ঢেকে দেয়। পোড়া পেট্রলের গন্ধ আসে নাকে। বড় রাস্তা ধরে অনেক দূর পিছু নিই। ক্রমে মোটর গাড়ির পাল্লা বেড়ে যায়। শেষবারের মতো দেখতে পাই, গাড়ির জানালা দিয়ে একখানা শ্যামলা হাত একটুখানি বেরিয়ে আছে, কৌতূহলে এক-আধবার পিছু ফিরে দেখছে সুন্দর একখানা মুখ। তারপর তারা ধুলো আর দূরত্বের ভিতরে অদৃশ্য হয়। আমরা ফিরে আসি। ফেরার পথটি বড় একা লাগে। ঘুরে-ফিরে মনে পড়ে— আমি বড় রোগা, আমি বড় দুর্বল, আমি কিছু পারি না।

নিকুঞ্জরা দণ্ডী ভাসিয়ে আসার কয়েক দিন বাদে একদিন আমি নিকুঞ্জকে গিয়ে বলি, আমাকে গান শেখাবি নিকুঞ্জভাই?

নিকুঞ্জ উদাস গলায় বলে, আমি গানের কী জানি!

শেখা না। তুই কত গান জানিস।

শিখে কী হবে?

ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারি না। আমাকে একটা কিছু হয়ে উঠতে হবে। যেমন করেই হোক। নইলে আমার মন কাঠকুড়ুনির মতো ঘুরে ঘুরে দুঃখ কুড়িয়ে আনবে। অহরহ ভ্রমণরত দুঃখ-আহরণকারী আমার মনকে আমি একটা খেলনা দিতে চাই। সে খেলুক গান নিয়ে।

কয়েক দিন নিকুঞ্জর পিছনে পিছনে ঘুরি। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইবার চেষ্টা করি। গলা মেলে না। নিকুঞ্জ হাসে, বলে, তোর গলায় সুর নেই।

চোখে জল চলে আসে। মন উদাস লাগে।

তবু ধৈর্য হারাই না। সাহস করে এক দিন বড় জ্যাঠামশাইকে গিয়ে ধরি, আমি আপনার কাছে বাঁশি শিখব।

জ্যাঠামশাই ভারী অবাক হন, বাঁশি শিখবি! কেন?

আমার ইচ্ছে করে।

আমার নিরীহ জ্যাঠামশাই চিন্তিত মুখে একটু ভেবে বলেন, বাঁশি-টাশি তোর দাদু পছন্দ করেন না। তা ছাড়া ওতে বুকের দোষ হয়। আমিও কতকাল বাজাই না!

তবু জ্যাঠামশাই দোমনা হয়ে পড়েন। তিনি তখন আর গান লেখেন না। বাঁশি তাঁর বারণ।

গ্রামোফোনও কদাচিৎ শোনেন। শিল্পকর্মহীন জ্যাঠামশাই ক্রমে ক্রমে সাধারণ দোকানদার হয়ে যাচ্ছেন। বোধ হয় সে রকম হতে তাঁর ভাল লাগে না। যা তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে তাকে ধরে রাখার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়। আমি বাঁশি শিখতে চাই জেনে তিনি তাই মনে মনে অস্থির হন। যদি তাঁর বাঁশি আমি তুলে নিতে পারি তবুও খানিকটা তাঁর শিল্পকর্মের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থেকে যাবে। তাই কয়েক দিন পর জ্যাঠামশাই আমাকে দক্ষিণের ঘরে ডেকে নিয়ে কাচের আলমারি খুলে চমৎকার বড় একখানা আড়বাঁশি বের করে দিলেন। কী মসৃণ সে-বাঁশির গা, তাতে এখানে সেখানে রুপোর তার জড়ানো।

জ্যাঠামশাই বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিতে শিখিয়ে দিলেন।

আমি ফুঁ দিলাম। শব্দ হল না।

সে-বছরই নিশিদাদু অন্য মহকুমায় বদলি হয়ে গেলেন।

## ॥ সাত ॥

কাছে-ধারে দুই জমিদার বাড়িতে দু'টো পুজো হয়, আর কালীবাড়িতে। সে-বার নিবারণ জ্যাঠার ছেলে সিধু একটা দেড়হাত দুর্গামূর্তি নিয়ে এল ষষ্ঠী পুজোর দিন। গুদারঘাটে শম্ভুগঞ্জের কারিগররা মূর্তি বেচতে নিয়ে আসে। ছোট ছোট পুতুলের মতো দুর্গামূর্তি। তাতে চালচিত্র নেই বটে, কিন্তু কার্তিক-গণেশ লক্ষ্মী-সরস্বতী সব আছে বাহনসুদ্ধ। বোধ হয় ঘাট থেকেই মূর্তিটা চুরি করে এনেছিল সিধু। দুর্গামূর্তি দেখে বাড়িতে মহা শোরগোল উঠল। সবাই জানে মূর্তি আনলেই পুজো করতে হবে, আর এক বার পুজো করলে সেটা দাঁড়াবে বছরওয়ারি। নিবারণ জ্যাঠার খাওয়ার সংস্থান নেই, অন্যদের পুজো করে তাঁর সংসার চলে কায়ক্লেশে। তিনি হেঁকে বললেন, যেখান থেকে এনেছিস ফিরিয়ে দিয়ে আয়। মূর্তি কাঁধে বারবাড়িতে ঢ্যাটা সিধু দাঁড়িয়ে রইল। গেল না। আমার ঠাকুমা বেরিয়ে এসে বললেন, বছরকার দিনে মূর্তিটা এনে ফেলেছে, এখন ফিরিয়ে দিলে যদি বাড়ির কারও অকল্যাণ হয়! তার চেয়ে নিবারণ বরং দুটো ফুল বেলপাতা ফেলে দাও।

নিবারণ জ্যাঠা বিব্রতমুখে বললেন, কিন্তু এ তো আব এক বারের ব্যাপার নয় মাঐমা। বছর বছর চলবে যে।

ঠাকুমা তাঁর আঁচলের চাবির ঝনাৎ শব্দ করে বললেন, চলে চলুক। বারবাড়িতে দুর্গাপুজো হচ্ছে এ-রকম একটা স্বপ্ন আমি ক'দিন আগে দেখেছি। কিছু খরচাপাতি আমি দেবোখন, তুমি পুজো করো।

তখন হঠাৎ নিবারণ জ্যাঠা চুপ করে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন। তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। তারপর 'জয় মা' বলে তিনি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। সিধুর কাঁধ থেকে মূর্তি কেড়ে নিজের কাঁধে নিয়ে খানিকক্ষণ মহানন্দে নৃত্য করলেন।

সেই দিনই সন্ধের মধ্যে বাড়ির কামলারা, নিবারণ জ্যাঠা, সর্বেশ্বর, সিধু আর মাখনকাকা সবাই মিলে বাববাড়িতে বেশ বড়সড় মণ্ডপ দাঁড় করালেন। ইট সাজিয়ে, মাটি লেপে মূর্তির বেদি তৈরি হয়ে গেল। আমরা কাঁঠালের মাছির মতো মণ্ডপঘরের আশেপাশে বিকেল থেকে লেগে আছি।

পেচ্ছাপের অসুখটার পর থেকেই দাদুর মেজাজ বড় খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠী পুজোর দিন সকালে কোথায় একটা ধানজমি দেখতে গিয়েছিলেন, ফিরলেন সন্ধেবেলায়। পুজোর ব্যাপার দেখেশুনে ভয়ংকর খেপে গিয়ে বড় ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করলেন কিছুক্ষণ। তার ফলে সমস্ত বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেল। মণ্ডপঘরে যারা কাজ করছিল তারা প্রতিমার মতোই নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। বোঝা গেল, পুজো হবে না। কিছুক্ষণ পরে দাদু তাঁর পুবমুখো ইজিচেয়ারে বসে আধ-অন্ধকারে তামাক টানতে লাগলেন। সুদর্শন বাতাস দিয়ে মশা তাড়াতে লাগল। পুজোর ব্যাপারে আর এগোনো উচিত হবে কি না জিজ্ঞেস করতে নিবারণ জ্যাঠামশাই ভিতরের উঠোনে এসে ম্লানমুখে নামাবলী গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুমা বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকটা কাঁচা টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, কাউকে পাঠিয়ে আমাদের দোকান থেকে বাড়তি হ্যাজাকটা আনিয়ে নাও, আর বাদ্যকারদের খবর দাও আজই যেন আসে। শুনে আমার নাস্তিক দাদু বাঘের মতো একটু গরগর করলেন, কথা বললেন না।

বড় জ্যাঠাইমা চলে যাওয়ার পরই বাড়িটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। মুষড়ে পড়েছিলেন আমার দাদু। কাকাকে আমি কদাচিৎ বিষণ্ণ দেখেছি, যদিও তিনি গম্ভীর মানুষ ছিলেন। কিন্তু সেদিন রাত্রে তিনি শিবপদকে লাথি না মারলে যে জ্যাঠাইমা চলে যেতেন না এটা বুঝতে পেরে তিনি কয়েক দিন খুব বিষণ্ণ ছিলেন।

আমরা অনেকটা রাত পর্যন্ত হ্যাজাকের জন্য অপেক্ষা করে ভিতর-বাড়ি থেকে ভাত খাওয়ার ডাক আসাতে কোনওক্রমে কয়েক গ্রাস খেয়ে আবার গিয়ে দেখি, দিনের আলোর মতো হ্যাজাক জ্বলছে। আর সেই হ্যাজাক টুলের ওপর রেখে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নিবিষ্ট মনে পাম্পের পর পাম্প দিচ্ছেন আমার কাকা। বাদ্যকাররা এসে একটু দ্যাটাং ট্যাটাং শব্দ করতেই খড়মের শব্দ তুলে ভিতর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন দাদু, হেঁকে বললেন, কী বাজাস তোরা ট্যাং ট্যাং করে। গা-গতর দিয়ে বাজা। বাদ্যকাররা প্রাণপণে বাজাতে লাগল। হ্যাজাকের আলোয় দাদুর মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাল। দেখি, কাকার বিষণ্ণতা কেটে গেছে। মাখনকাকা যক্ষ্মারুগি—তাঁর ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষে না। সারা দিন তিনি তাঁর এক ঘরের সংসারে আপনমনে থাকেন। কিন্তু সেদিন দেখি কোমরে র‍্যাপার আর গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে তিনি মণ্ডপের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। রোগমুক্ত স্বাভাবিক মানুষের মতোই তাঁকে দেখাচ্ছিল। মেজো জ্যাঠামশাই সাইকেলের ক্যারিয়ারে কয়েক থাক রঙিন কাগজ আর হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে কয়েকটা ঘট নিয়ে এলেন। পুন্নি, বুনু, আমার পিসতুতো দিদিরা বসল কাগজ কেটে শিকলি বানাতে। ঠিক সেই সময়ে, দাদু আমার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তুমি আবার এই হিমে বাইরে কেন? জ্বর হলে পুজোটায় ঘরে আটকে থাকতে হবে। যাও গিয়ে শুয়ে পড়ো।

বাইরের হ্যাজাকের আলো আর বাজনার শব্দ থেকে বিষণ্ণ মনে বিদায় নিয়ে ভিতর-বাড়ির উঠোনে এলে এক নিঝুম আলো-আঁধারি চোখে পড়ে। সাদা উঠোনে জ্যোৎস্না গড়িয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড উঁচু কয়েকটা গাছের ছায়া ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। হঠাৎ সেই নিঝুমতায় পা দিয়ে দলছুট, রোগগ্রস্ত নিজেকে বড় বেশি টের পাই। চোখে জল আসে। তবু নিঃশব্দে পশ্চিমের ঘরে গিয়ে লণ্ঠনের কমিয়ে রাখা পলতে বাড়িয়ে দিই, তারপর শুয়ে শুয়ে মশার পনপন্ আর দূরের ঢাকবাদ্যি, কচি গলার চেঁচামেচি শুনি। পাশেই রান্নাঘর থেকে ডালে ফোড়ন দেওয়ার গন্ধ আসে। বড় ঘরের বারান্দা থেকে ঠাকুমা আর লেংড়ি ঠাকুমার গলার আওয়াজ পাই। কে যেন বারবাড়ি থেকে সাইকেল চালিয়ে ভিতরের উঠোনে এল, সাইকেলের চেন ছাড়ার আওয়াজ পাই। মেজো জেঠিমা বড় ঘরের প্রকাণ্ড টিনের বাক্স খুলে পুজোর জন্য বাসন-কোসন নামাচ্ছেন। বড় পরাত, তামার থালা, রেকাব, ভোগের হাঁড়ি, কড়াই। ঘরে শুয়ে এইসব টের পেতে পেতে একটা স্বাভাবিক জীবনের জন্য বড় হিংসে হয়। রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে, আর টের পাই, মা-বাবা কেউ শুতে আসছে না, অনেক রাত পর্যন্ত বাড়িময় পুজোর নানা আয়োজন চলছে।

বড় জ্যাঠামশাইকে দেখতাম অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার বন্ধ করে এসে দক্ষিণের ঘরের অন্ধকারে চুপ করে বসে আছেন। তিনি আর বাঁশি বাজাতেন না। গান লিখতেন না, কলের গান শুনতেন না। কেবল অন্ধকারে বসে হাতপাখায় মশা তাড়াতেন। নিঃসঙ্গ মানুষ আমার বরাবর ভাল লাগে। এতকাল ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে জ্যাঠামশাইকে কখনও দেখিনি। স্ত্রৈণ মানুষটি কখনও তাঁর অবাধ্য ছেলেদের কাছ থেকে সম্মান পেতেন না। জেঠিমা ছেলেদের সামনেই তাঁকে শাসন করতেন। পৃথিবীতে সম্ভবত তারা সুখী যারা স্ত্রীর বশীভূত নয়। সে হিসাবে জ্যাঠামশাই সুখী ছিলেন না। জেঠিমা যাওয়ার সময়ে শ্বশুর শাশুড়ি কিংবা স্বামী কারও অনুমতি নিয়ে যাননি। বলে যাননি কবে আসবেন। তবে বোঝা যাচ্ছিল জ্যাঠামশাই আলাদা বাসা না করলে তিনি এ-সংসারে ফিরবেন না। জ্যাঠামশাইয়ের সে সাধ্য ছিল না। তাই তিনি নিজের অসহায়তাকে সঙ্গী করে দক্ষিণের ঘরের অন্ধকারে বসে হাতপাখায় মশা এবং দুশ্চিন্তা তাড়ানোর চেষ্টা করতেন। সংসারে স্ত্রৈণ মানুষের সমাদর কম, কেউ সমীহ করে না। জ্যাঠামশাইকে আমরা কেউ ভয় পেতাম না। চাকর-বাকররা এক ডাকে সাড়া দিত না। জেঠিমা চলে যাওয়ার পর প্রায়ই দেখতাম রাতে ফিরে তিনি তাঁর ঘরের হ্যারিকেনে নিজে হাতে তেল ভরছেন, কিংবা বিছানা ঝাড়ছেন, নিজের কাপড় ধুয়ে মেলে দিচ্ছেন। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের পুজোর মাল কেনার জন্য তিনি ক'দিন আগে কলকাতা গিয়েছিলেন, ফেরার সময়ে মালসুদ্ধ একটা ট্রাঙ্ক হারিয়ে যায়। প্রথমে

ঘটনাটা তিনি চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু দোকানের কর্মচারী সুরেশকে ডেকে এক দিন দাদু কী মালপত্র কেনা হয়েছে জিজ্ঞেস করায় সুরেশ ঘটনাটা বলে দেয়। দাদু জ্যাঠামশাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি কৈফিয়ত দিলেন যে, মালপত্র বেশি থাকায় পুজোর ভিড়ে সব এক কামরায় তোলা যায়নি। বুক না করে মালগুলো তিনি এমনিতেই নিয়ে আসছিলেন। রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যও মালগুলো বিভিন্ন কামরায় তোলা দরকার ছিল। তিনি আর সুরেশ ছিলেন দুটো ভিন্ন কামবায়। সুরেশের কামরা থেকেই ট্রাঙ্কটা হারিয়ে যায়। ঘাটে স্টিমার পেরোনোর সময়ে সেটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুরেশ অন্য রকম কথা বলল। তার কামরায় মোট চারটে ট্রাঙ্ক ছিল, চারটেই নেমেছে। পঞ্চম ট্রাঙ্ক তার কামরায় ছিল না, তোলাই হয়নি। জ্যাঠামশাইকে এ-ব্যাপারে কেউই বিশ্বাস করেনি। দাদুও নয়। তিনি বললেন, সুরেশ সাবধানী লোক। ট্রাঙ্ক যদি হারিয়েই থাকে তবে তা তোমার হেফাজত থেকে গেছে। এর আগেও তুমি একটা গাঁট হারিয়েছিলে। কোনও ব্যাপারেই তোমার মন নেই। কত টাকার মাল ছিল সেই ট্রাঙ্কে?

হাজার টাকা। জ্যাঠামশাই ইতস্তত করে বললেন।

দাদু একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, ঠিক আছে, সেই হাজার টাকার মালের রসিদ আমাকে এনে দাও।

রসিদ দোকানে জমা আছে।

আমাকে যখন হোক দেখিয়ো। আমি দেখতে চাই ঠিক কত টাকার মাল ছিল।

সেই রসিদ আর জ্যাঠামশাই দেখাতে পারেননি। দাদু মাঝে মাঝে তাগাদা দিতেন, যেমন অবিশ্বাসী কর্মচারীকে লোকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং সন্দেহ করে, ঠিক তেমনই করতেন।

অষ্টমী পুজোর দিন সন্ধেবেলা সদ্য আরতি শুরু হয়েছে, মণ্ডপ ভেঙে পড়ছে লোকে। ঢাকের আওয়াজে নিজের বুকের মধ্যে ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে দাদুর চিৎকার শুনে ভিতর-বাড়িতে এসে দেখি, দাদু পুবমুখের ইজিচেয়ারে সটান সোজা হয়ে বসে, তাঁর পায়ের কাছে বারান্দায় বসে আছেন জ্যাঠামশাই। দাদু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে বলছেন, তুমি স্ত্রীকে শাসন করতে পারো না, ছেলেদের শাসন করতে পারো না, তোমার আত্মশাসনও নেই। যার নিজস্ব জীবিকা নেই তার চরিত্রও থাকে না। তুমি কি মনে করো, হাজার টাকার মাল হারিয়ে গেল, আর তার রসিদও পাওয়া গেল না—এটা খুব বিশ্বাসযোগ্য কথা! আমি জানি, তুমি স্ত্রীর চাপে পড়ে আমার টাকা ভেঙে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছ। নইলে বউমা বাপের বাড়িতে গিয়ে কোন ভরসায় বসে থাকে? সে জানে না যে তার অপদার্থ স্বামী তার শ্বশুরের ওপর নির্ভরশীল! অত সাহস তবে তার কোথা থেকে হয়?

ঠাকুমা দাদুকে থামানোর চেষ্টা করছিলেন। দাদু তাঁকে ধমকে সরিয়ে জ্যাঠামশাইকে বললেন, তুমি সংসার ভাঙার চেষ্টা করছ। আমি জানি, তোমার দিক থেকেই এ-সংসার ভাঙবে।

অল্প একটু জ্যোৎস্না নারকোল গাছের ডগা ছুঁয়ে জ্যাঠামশাইয়ের মুখে এসে পড়েছে। অধোবদনে তিনি চুপ। মাটিতে একখানা হাতের ভর রেখেছেন। উৎসবের বাড়ির ভিড় চরিত্রভ্রষ্ট জ্যাঠামশাইকে দেখছে, যেমন হারাণীকে দেখেছিল।

বাইরের মণ্ডপে তখন সর্বস্ব ভুলে মাখনকাকা ধুপচি নিয়ে নাচছেন। তাঁর খালি গা, পাকসাট মেরে পরা ধুতি, মুখে বিভোর একটু হাসি। নিজের রোগ, শোক, বিরহ এবং মৃত্যু নিবেদন করে দিতে চাইছেন দেড় হাত মাটির প্রতিমাকে। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। তাঁর গলায় একটা সোনার হার, তাতে একটা মাদুলি দুলছে। হাতে তাগায় বাঁধা তাবিজ-কবচ, বুকের হাড়পাঁজরা গিজগিজ করে ফুলে উঠছে। নাচতে নাচতে বোধ হয় তাঁর কান থেকে ঢাকের আওয়াজ মুছে গিয়েছিল। বেতালে পড়ছিল পা, মাথা অবসন্ন ভাবে লটকে পড়ছে। তবু এমন বিভোর একটা ভাব ছিল তাঁর সেই নাচে যে, কেউ হাসল না। সিধু তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ধুপচিতে ধূলিকণার মতো ধূপ গুগ্‌গুল ছুড়ে দিচ্ছিল। মণ্ডপ ধোঁয়ায় অন্ধকার করে দিয়ে মাখনকাকা নাচছিলেন আর নাচছিলেন। যতক্ষণ না সত্যিই টলে গেল তাঁর শরীর ততক্ষণ নাচলেন। তারপর এক সময়ে হঠাৎ দু' হাতের দুই ভারী ধুপচি পর পর একে একে খসে পড়ল, ছিটিয়ে পড়ল আগুন। সেই আকীর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে মাখনকাকা উপুড় হয়ে পড়লেন। হইহই করে

লোকজন গিয়ে তাঁকে ধরল, তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল তাঁর ছাঁচবেড়ার শূন্য ঘরে। দুপুরে আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ নিজের হাতে পাঁঠা বলি দিয়েছিলেন। সেই বলিদান দেখে বড় খুশি হয়েছিলেন মাখনকাকা, মুখ চোখাচ্ছিলেন সারা দিন। কীভাবে মাংস রান্না করলে ভাল হয় সে-বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেছিলেন সর্বেশ্বরের সঙ্গে। দুপুরে দু'-এক টুকরো মাংস খেয়ে বললেন, পেঁয়াজ রসুন ছাড়া কি মাংসের স্বাদ হয়! এ-সব ধনেবাটা জিরেবাটা দিয়ে পুরুতবাড়ির রান্না আমি খেতে পারি না। কয়েক টুকরো মাংস রইল, রাতে নিজে জারিয়ে নেব। এই বলে সযত্নে এঁটো মাংস তুলে রেখেছিলেন, অবশেষে সেই রাত্রে তাঁর খাওয়াই হল না। পরদিন নবমী পুজোর সকালে দেখা গেল, তাঁর প্রবল জ্বর, আর খুব কাশছেন। চোখ দু'টো টকটকে লাল, মুখে সেই প্রথম দিনের অপ্রস্তুত কাঠ-কাঠ হাসি। এই প্রথম আমরা তাঁর অসুখ বুঝতে পারলাম। নইলে এত দিন তাঁর চলা-ফেরা সুস্থ মানুষের মতোই ছিল, যা দেখে আমরা যক্ষ্মারোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশ্বাস হারাচ্ছিলাম।

প্রতি মুহূর্তেই ছিল আমার জ্বর আসার ভয়। এক পা ফেলে আর-এক পা ফেলতে যাচ্ছি—সেই এক পদক্ষেপের সময়টুকুতেও আমি ভাবতাম হয়তো এক্ষুনি সেই শিরশিরে শীতভাব টের পাব। কত বার মাঝপথে খেলা ছেড়ে উঠে গেছি বিছানায় পশ্চিমের ঘরে। নির্জনে নিজের হাতে শ্বাস ফেলে ফেলে দেখছি জ্বর এল কি না। উত্তুরে বাতাসে গা একটু শিউরে উঠলেই মন বিষণ্ণতায় ডুবে যেত। পুজোর তিনটে দিন উৎসবের মধ্যেও তাই পুরনো কাঁটার মতো বিঁধে থাকা একটু ভয় সবসময়ে আমার মনে জেগে থাকত। ভাসানের দিন প্রতিমা বিসর্জনের পর আমরা এসে শূন্য মণ্ডপে ভিড় করে বসলাম শান্তিজলের ছিটে নেওয়ার জন্যে। মুড়িসুড়ি দিয়ে পা ঢেকে বসেছি, নিবারণ জ্যাঠা আম্রপল্লবের জল তুলে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। সেই সামান্য জলকণা গায়ে পড়তেই সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, কেঁপে উঠল থির থির করে। কোথা থেকে এক অদ্ভুত বাতাস এল হিমভাব নিয়ে। আমি আপনমনে ক্লিষ্ট একটু হাসলাম মাত্র। ঠিক ছিল, শান্তিজলের পর মেজো জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আমি যাব গোলকপুরের জমিদার বাড়িতে বিজয়া সারতে। প্রতি বছর সে-বাড়িতে এই দিনে মুক্তাগাছার বিখ্যাত মণ্ডা আসে। তার বদলে দলছুট আমি বারবাড়ি থেকে একা একা ভিতরের উঠোন পেরিয়ে চলে এলাম পশ্চিমের ঘরে। ধীর পায়ে।

## ॥ আট ॥

পুকুরের দক্ষিণে মিত্তিরদেব পোড়ো ভিটে। ভাঙা, শ্যাওলা-ধরা ইটের পাঁজা স্তূপ হয়ে আছে। আগাছায় ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। গাছ কেটে মানুষ তার বসত তৈরি করে। প্রতিবাদহীন গাছেরা তা মেনে নেয়। কিন্তু অপেক্ষা করে থাকে। এক দিন মানুষ মরে, তার বসতবাড়ি পড়ে থাকে। তখন অলক্ষ্যে বেদখল করা ভূমি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নিঃসাড়ে দখল করে গাছেরা। নিবিড় ভালবাসায় সব ডুবিয়ে দেয়।

মিত্তিরদের বাড়িটা ছিল অনেক বড়। তাই অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। দু'-চারখানা দেয়াল এখনও দাঁড়িয়ে, তাদের মাথায় সবুজ মুকুট— মৃত্যুর। তাদের গায়ে যে জানালা-দরজার ফাঁকগুলো রয়েছে সেগুলোতে এখনও নানা কেয়ারি দেখা যায়। দেয়ালে লেগে আছে পঙ্খের কাজ। দু'টো খাড়া দেয়ালের মাঝখানে একটা নিবিড় ছায়ায় ঢাকা গলি, সেখানে সারাদিনে রোদ পড়ে না। মাথার ওপর একটা পিপুল গাছ ছায়া দেয়। সেই নির্জন গলিটায় কোনও আবর্জনা নেই। মেঝেটা ফাটাফুটো, দু'-এক মুঠো ঘাস আর কণ্টিকারির ঝোপ। মাঝে মধ্যে নির্জন দুপুরে আমি এইখানে এসে বসি। দক্ষিণের বাগান থেকে কুড়িয়ে আনা আমের খোসা ছোট্ট পকেট-ছুরিতে ছাড়াতে ছাড়াতে চার দিকে চেয়ে দেখি। কেমন ঝিম মেরে আছে চারধার। ভরদুপুরেও ঝিঁঝি ডাকছে। আপনিই আমার হাত থেমে যায় অন্যমনে। কেমন নেশার মতো, ঘুম ও স্বপ্নের মতো লাগে সেই নিস্তব্ধতা। কখনও মনে হয় আমার চারধারে এক খুব প্রাচীনকালের গুহার অন্ধকার। সেখানে জমে আছে সেই প্রাচীন বাতাস। দেয়ালে নানা চিত্র-বিচিত্র করা। হাড়-জিরজিরে রোগা ছেলের মতো ইঁট বের করা সেই দেয়াল থেকে মাঝে মাঝে আপনিই ঝুরঝুর করে বালি খসে পড়ে। তক্ষক ডাকে, টিকটিকির ডাক শুনি। কটকট করে

শব্দ করে গর্তের বয়স্ক ব্যাঙ। দেখি, ইটের পাঁজার এখানে-ওখানে সাপের খোলস পড়ে আছে।

এ-বাড়িতে কারা ছিল কে জানে? কেবল মনে হয় তাদের অনেক টাকা ছিল, আর অনেক ছেলেমেয়ে। বাড়িঘর গমগম করত। ছেলেগুলো ছিল মোটাসোটা, ফরসা। মেয়েদের গায়ের রং ছিল মোমের আলোর মতো, লালচে আভার চুল ছিল মাথায়, থোপা-থোপা আঙুরগুচ্ছের মতো। মুখের ছাঁদ লম্বাটে, কালো মিশমিশে চোখের তারা, পুরন্ত অভিমানী ঠোঁট। মুক্তাগাছার জমিদারদের বাড়িতে আমি এ-রকম ছেলেমেয়ে দেখেছিলাম। কিংবা হয়তো সে-রকম ছেলেমেয়ে আমি কোথাও দেখিনি! মিত্তিরদের পোড়ো ভিটের সম্মোহনকারক এক-এক দুপুরে আমি সেইসব স্বপ্ন-শিশুকে দেখতে পেতাম। জানালার তাকের ওপর বসে একটি না-বালিকা-না-কিশোরী মেয়েকে দেখেছি, জাম চুষে খেয়ে বিচিটাকে দাঁতে আলগা কামড়ে ধরে থেকে আনমনে বাইরের খর দুপুরের দিকে চেয়ে আছে। মোটা মতো একটা ছেলে সোফায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, হাতে ইংরিজি ছবির বই। কী নিস্তব্ধ তাদের অন্দরমহল! পুরনো আমলের ভারী প্রকাণ্ড সব আলমারি, তাতে পুরু কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায়— থরে থরে কত জিনিস সাজানো রয়েছে। কারুকার্য করা গোলাপি কাচের শিশি, বিলিতি ঝাড়ুদারনি মেমসাহেবের পাথরের মূর্তি, আলুর পুতুল, বয়ম, সুন্দর ছবি-আঁকা জাপানি চায়ের বাসন, বার্মিজ পাখা, আরও কত কী। জানালায় দরজায় নেটের পরদা মেঝেয় কার্পেট, দরজায় প্রকাণ্ড নরম দড়িতে বোনা পাপোশ। তাদের কলের গানের যন্ত্রে চোঙা নেই, জালে ঢাকা বাক্সর ভিতর থেকে গান ভেসে আসে। চওড়া পেড়ে ধোপধোয়া শাড়ি পরে ছেলেমেয়েদের মা শান্ত মুখে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে চোখ বুজে মনে হয়, আমি যেখানে বসে আছি, সেটা ছিল চাকরদের মহলে যাওয়ার পথ। সেই মেয়েটি সারা বাড়ি কী যেন খুঁজতে খুঁজতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ক্রমে এই দিকে আসছে— আসছে। চোখ বুজে থেকে আমি স্পষ্ট সেই নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনতাম, মনে হত মৃদু একটা সুবাস পাচ্ছি— হয়তো তেল কিংবা পাউডারের, হয়তো তার শরীরের প্রাকৃতিক গন্ধই ও-রকম। আমার গা শিউরে উঠত যখন টের পেতাম, সে নিঃশব্দে গলির দরজা খুলে সুন্দর অবাক মুখটি বাড়িয়ে কৌতূহলে আমাকে দেখছে। আমি বাইরের ছেলে—লুকিয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকেছি বলে তার একটুও রাগ নেই। কেবল কৌতূহল আছে, রোমহর্ষ আছে।

সেইখানে আমার অনেকক্ষণ কেটে যায়। যখন দেখি, বাইরের আলো গেছে মরে, পুকুরপাড় দিয়ে পশ্চিমপাড়ার মানুষেরা বাজারদরের কথা বলতে বলতে ঘরমুখো ফিরছে, তখন উঠে পড়ি। পুকুরপাড়ে অনাদিনাথের ঘরের জানালার ঝাঁপ তোলা। দেখি লম্বা অনাদিনাথ তাঁর ঘরের দরজায় চৌকাঠে ঠেস দিয়ে বসে শেষবেলার ম্লান আলোয় চোখের কাছে একখানা বই খুলে পড়ছেন। বড় রাস্তায় ললিতের দোকানে হ্যাজাক জ্বলছে। বারবাড়ির উঠোনে ছায়ার মতো ছোটাছুটি করে তখনও গাদি খেলছে রাখাল সুবল।

বিকেলবেলায় মা অল্প একটু সাজগোজ করে। চুল টান করে খোঁপা বাঁধে, মুখ মেজে একটু ক্রিম দেয়, সিঁদুরের টিপ পরে। পরিষ্কার একখানা শাড়ি থাকে পরনে। বাঙালবাড়ির ঘটি-বউ বিষণ্ণ মুখে রোদে দেওয়া জামা-কাপড় তুলে এনে আলনা গুছোয়। তাকে বড় অচেনা লাগে, যেন বাড়ির কেউ বেড়াতে এসেছে। অচেনা লাগে সব কিছুই। পুবের ভিটে ঘেঁষে ওঠা লাউডগা, বড় ঘরের বারান্দায় প্রকাণ্ড জাঁতাখানা, দক্ষিণের ঘরের বাইরে ঠেস দিয়ে রাখা সাইকেল। মনে হয়, এ-সব জিনিস সঠিক জায়গায় নেই, কে যেন উলটেপালটে রেখে গেছে। হঠাৎ মনে হয়, দক্ষিণের ঘর বড় ঘরের জায়গায় চলে গেছে, বড় ঘর জায়গা পালটে বসেছে দক্ষিণের ঘরে। বাগানের পশ্চিম কোণে যে কলার ঝাড়, সেটা যেন ছিল উত্তরের দিকে! এমনি ওলটপালট লাগে সবকিছু। অচেনা লাগে। যেন আমি অনেক দিন এ-বাড়িতে ছিলাম না। আমার না-থাকা সময়ে সব কালক্রমে পালটে গেছে। কিংবা মনে হয়, বিকেলের মায়াবী আলোয় যখন সব জায়গায় এক অপার্থিব হলুদ আলো এসে পড়ে, তখন বদল হয়ে যায় সব জায়গার চেহারা, সব চেনা চিহ্ন মুছে যায়। আমি সেই মায়াবী আলোয় পথ ভুলে অন্য কার বাড়িতে এসে উঠেছি!

অনাদিনাথের বাসার রাস্তাটা আগাছায় ভরে উঠেছে। চলতে গেলে দু'পাশের কচুপাতা, বনতুলসী, কণ্টিকারির ডালপালা গায়ে লাগে। উদাসীন অনাদিনাথ যেভাবে যা আছে সেইভাবেই তা রেখে দেন।

মাঝে মাঝে সেই সুঁড়িপথ ধরে অনাদিনাথের উঠোনে এসে দাঁড়াই। চৌকাঠ থেকে অনাদিনাথ চোখ তুলে ভারী খুশি হন। অত লম্বা বলেই কি না কে জানে অনাদিনাথকে বড় একা দেখাত। কারও সঙ্গেই তাঁর মেলামেশা ছিল না। একমাত্র কম্পাউন্ডার সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে তাঁকে কখনও কখনও ছাতা মাথায় বাজারে যেতে দেখেছি। আমাকে দেখে বই মুড়ে রেখে উঠে পড়েন।

এসো এসো কুকুবাবু। বলে তিনি আমাকে এনে বসান তাঁর বাঁশের মাচার আধ-ময়লা বিছানায়। কেরোসিনের বাতিটি জ্বেলে নেন।

টুলের ওপর বসে মুখোমুখি হয়ে বলেন, কেমন আছ কুকুবাবু? ক'দিন তোমার জ্বর হচ্ছে না? তারপর দুঃখ করে মাথা নেড়ে বলেন, ইস! এত ঘন ঘন জ্বর হলে যে তোমার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যাবে!

অমনি আমি জিজ্ঞেস করি, স্মৃতিভ্রংশ কী?

তুমি সব ভুলে যাবে, কিছুই মনে থাকবে না।

আমি উত্তর দিই না। কিন্তু মনে মনে আমি জানি যে, আমার সব কথা মনে থাকে। জ্বর হয় বলেই আমার বাইরের খেলা নেই। দৌড়ছুট নেই, ক্লান্তিতে ঢলে পড়া ঘুম নেই, তাই আমার নেই ভুলে যাওয়া। সারা দিন আমার খেলা আমারই মনের সঙ্গে। আমার সব মনে থাকে। কত তুচ্ছ দৃশ্য—একটি হলুদ পাতার খসে পড়া, একটি বুড়ো ব্যাঙের ডাক, কবে বর্ষাকালে রাখালের ব্রহ্মপুত্রে ভাসানো একটি কাগজের নৌকো—যা সবাই ভুলে যায়—আমার মনে থাকে। এক-একদিন যখন জ্বর ছেড়ে গেলে, দুর্বল শরীরে যখন বাইরে বেরোনো বারণ থাকে, তখন উঠোনমুখো একটেরে জানালার ধারটিতে বসে আমি অন্যমনে আমার মনের ঢাকনাটিকে তুলে নিই। দেখতে পাই, ঝাঁপি ভরা ঐশ্বর্যের মতো সব স্মৃতি সাজানো আছে। সব শব্দ, গন্ধ, ডাক, জ্বরের বিকারে দেখা কত অসম্ভব স্বপ্ন। আমি তো ভুলি না। যত দিন যায় তত বেশি করে মনে পড়ে।

অনাদিনাথ আমার কাছে কত সাধুপুরুষের গল্প করেছেন। বলেছেন, পৃথিবীতে তারাই অমরতা লাভ করে যাদের জন্মজন্মান্তরের কথা মনে থাকে। এই বলে তিনি গীতা খুলে শ্লোক পড়ে শোনাতেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, হে পার্থ, তুমিও বহুবার জন্মগ্রহণ করেছ, আমিও বহুবার। তোমার সঙ্গে আমার তফাত এইটুকু মাত্র যে তোমার সে-সব জন্মের কথা মনে নেই, আমার আছে।

এই সব কথা একসময়ে শেষ হয়। অনাদিনাথ চুপ করে অন্যমনে বসে থাকেন। বাইরে রাত নিঝুম হয়ে আসে। ঝিঁঝির শব্দ হয়, শেয়াল ডাকে, উত্তরে বাতাসে পাতা খসে পড়ে। হ্যারিকেনের ম্লান আলো নিঃসঙ্গ মানুষটির দীর্ঘশীর্ণ মুখে এসে পড়ে। তিনি হঠাৎ একটু লজ্জার হাসি হাসেন, কিশোরীর মতো লজ্জায় মুখটা আলো থেকে হাতের ছায়ায় আড়াল করে বলেন, আচ্ছা কুকু, তোমার ছোটপিসি এবার যেন কী পরীক্ষা দেবে?

বি এ।

তিনি মাথা নেড়ে বলেন, তাই শুনছিলাম বটে। আমাদের বি-এ পাশ মেয়ে খুব কম, হাতে গোনা যায়। তোমার পিসি পরিবারের একটা গৌরব।

আবার চুপ করে তিনি গভীর চিন্তা করেন, তারপর বলেন, তোমার পিসিমার মুখে অনেক ব্রণ। শঙ্খের গুঁড়ো মাখতে বোলো, ওতে ভারী উপকার। আমি বলেছি বলে বোলো না আবার—বলে তিনি খুব অপ্রতিভ হাসি হাসেন। বাইরে দুরন্ত হাওয়া দেয়। রাত বাড়ে। তিনি লণ্ঠন হাতে কুঁজো হয়ে আমার হাতখানা ধরে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে আসেন। বাড়ির পিছনে আঁস্তাকুড়, ঢেঁকি শাকের জঙ্গলের মধ্যে নিবারণ জ্যাঠার ঝুপসি ঘরখানা। সেইখানে এসে দাঁড়ালে আমাদের রান্নাঘরের আলো দেখা যায়। বাইরের অন্ধকার থেকেই অনাদিনাথ চুপিসারে বিদায় নেন, আমি অন্ধকার উঠোন দৌড়ে পার হয়ে যাই।

সেবার শীতকালে এক বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে পোস্টকার্ডের একটা চিঠি পেয়ে দাদু খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে বাবাকে ডেকে চিঠিটা দিয়ে বললেন, পড়ে দেখো। তোমার শ্বশুরের চিঠি।

বাবা চিঠি পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ পর দাদু মুখ থেকে তামাকের নল সরিয়ে বললেন, তোমার শ্বশুর তোমাকে কী চাকরি দিতে পারেন জানি না। তবু ডেকেছেন যখন, তখন এক বার যাওয়া ভাল। বাহাদুরাবাদ তো আর খুব দূরে নয়। জিনিসপত্র সব গুছিয়েই নিয়ে যেয়ো। যদি চাকরি সত্যিই হয় তো ওখান থেকেই চাকরি করতে যেয়ো। সময় নষ্ট করে লাভ কী!

বাবা নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন।

দাদু বিড়বিড় করে বললেন, নিষ্কর্মা বসে থাকলে কী হয় তা তোমার বড়দাকে দিয়ে দেখছ তো। বুদ্ধি নষ্ট হয়, চরিত্র থাকে না, দুর্বলচিত্ত হয়ে যায় মানুষ। বাড়ির বেড়ালটা পর্যন্ত তাকে ভয় পায় না। তুমি পরশুই রওনা হও। আমি নিবারণকে দিয়ে দিন দেখিয়ে রেখেছি।

পরের পরের দিন বাবা বাক্সবিছানা নিয়ে রওনা হলেন। আমাদের বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী মেয়েরা সবাই উচ্চস্বরে কাঁদল। এমনকী নিবারণ জেঠিমা এসেও বিস্তর চোখের জল ফেললেন। তখনকার দিনে মেয়েদের খুব বেশি কিছু দেখাবার জিনিস ছিল না। যা দু'-একটা ছিল তার মধ্যে কান্না একটা।

দিন দশেক বাদে কলকাতা থেকে বাবার চিঠি এল। তিনি রেলের চাকরি পেয়ে কলকাতায় গেছেন। কিছু দিন কলকাতায় থাকার পর তাঁকে অন্য জায়গায় বদলি করা হবে। চাকরিটা ভালই। লাইনে যাওয়ার জন্য রেলের সেলুন পাওয়া যাবে, আর ভাল বাড়ি।

ঠাকুমা সেদিন কালীবাড়িতে পাঁঠা বলি দেওয়ালেন। দাদুর গম্ভীর মুখে একটা চাপা রক্তাভা দেখা যেতে লাগল—কষ্টে উত্তেজনা চেপে আছেন। সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখাল মাকে। বিয়ের অনেক গয়নাই মা পরত না, এক জোড়া চাঁচভরা পলতোলা বালা ছিল তার। বাক্স থেকে বের করে পরল। দুপুরে পগারের ঘাটে ঝামায় পা ঘষতে ঘষতে দত্তবাড়ির বউ সরস্বতীকে বলল, আমার বাবার জন্যই তো হল। আজকালকার বাজারে ডেকে নিয়ে চাকরি দেওয়া—ক'জন পারে!

বিকেলের দিকে পার্শ্বনাথ ডাক্তার প্রায়ই মাখনকাকাকে দেখতে আসতেন। ভিজিট নিতেন না, রুগি দেখে ভিতর-বাড়িতে আসতেন। রেকাবে সাজিয়ে তাঁকে দেওয়া হত পেঁপে, আম চুষির পায়েস, কালীবাড়ির বালুসাই। তারপর এক গ্লাস জল খেয়ে পান মুখে দিয়ে উঠতেন। বিনা পয়সার ডাক্তার বলে তাঁর খুব খাতির ছিল আমাদের বাড়িতে। কিছু হলেই ডাকো পার্শ্বনাথকে। দাদু তাঁর কাছে মাখনকাকার রোগের খবর নিতেন, কেমন বোঝো?

পার্শ্বনাথ মাথা নাড়তেন, জমি-বেচা টাকায় এ-সব চিকিৎসা হয় নাকি!

বাবার চিঠি যেদিন এল সেদিন পার্শ্বনাথ এলে দাদু আর রুগির খবর নিলেন না। বাবার চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, বোঝো কাণ্ড! টি. আই. মানে কী হে? আমাদের সুরেন গার্ডের চেয়ে বড় পোস্ট নাকি?

পার্শ্বনাথ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, হবেই। কত কোয়ালিফায়েড ছেলে নরেন। সুরেন তো নন্‌ম্যাট্রিক। সেলুন যখন পায় তখন তো—তিনি ভেবেচিন্তে বললেন, এক সাহেব-সুবোদেরই দেখেছি সেলুনে যেতে, আর্দালি থাকে সঙ্গে—

দাদু উজ্জ্বল চোখে চেয়ে পার্শ্বনাথের মুখে খুঁটিনাটি দেখতে লাগলেন। বললেন, তার ওপর সেকেন্ড ক্লাস পাস পাবে—

পরদিন সকালে দাদু খুরপি দিয়ে কপিগাছের গোড়া উঁচু করছেন, আমি আগাছা টেনে তুলছি, দাদু কাজ করতে করতে চোখ না তুলেই বললেন, কুকু, যাবি নাকি ভাই বাবার কাছে? যেতে ইচ্ছে করে?

আমি চুপ করে রইলাম। আসলে বাবাকে আমি সঠিক ভাল করে চিনতাম না। তাঁর জন্য আমার মন-কেমন করত না। কিন্তু ইচ্ছে হত, এই বাড়ি ছেড়ে খুব দূরে কোথাও যাই, যেখানে খুব বেশি ভিড় নেই, যেখানে আমার রোগের কথা কেউ জানে না, যেখানে আমাকে সবাই খেলায় ডেকে নেয়। একটা নতুন অচেনা জায়গার জন্য প্রাণ আনচান করত, টের পেতাম। আমি চুপ করে আছি দেখে দাদু বিড় বিড় করে বললেন, যাবেই তো। নিশ্চয় যাবে। সে তো আর সংসার ভেঙে যাচ্ছে না, সে গেছে নতুন সংসার গড়তে। তার কাছে যাবে বইকী। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো। সুযোগ-সময় হলে সে এক দিন এসে তোমাদের নিয়ে যাবে। আমি আটকাব না, দেখো। আমি কি কাউকে আটকেছি?

সেবার কয়েক দিন বৃষ্টি হয়ে গেল শীতকালে। হাত-পা কালিয়ে যাওয়া শীত পড়ল। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ফরসা গণাদা। তার দু' গাল লাল হয়ে থাকে, নাকের ডগায় নীল রং দেখা যায়। মাখনকাকার ছাঁচবেড়ার ঘরের ফুটোফাটা দিয়ে হিম-উত্তুরে হাওয়া আসে। ঘোর জ্বরের মধ্যে পড়ে আছেন মাখনকাকা, উঠবার ক্ষমতা নেই। লেপ আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে সর্বেশ্বরকে ডাকেন, খুড়োমশাই, এক পাতিল আগুন যদি দিতে বলেন। সর্বেশ্বর আগুন করে দেয়। লোক ডাকিয়ে বেড়ার গায়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে ফুটোফাটা বন্ধ করার চেষ্টা করে।

বড়দিনের পর স্কুল-কলেজ খুলেছে। আমার ভাইবোনেরা নতুন বইপত্র নিয়ে স্কুলে যায়। এক নির্জন দুপুরে গণাদা বারবাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে ডাকল, কুকু, দেখে যা শিগগির।

দৌড়ে গেলাম। মাখনকাকার ঘরের ঝাঁপ দরজাটা আধখোলা। ভিতরের আধো-অন্ধকারে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। উঁকি মেরে দেখি, মাখনকাকা নিঃসাড়ে শুয়ে আছেন। তাঁর চুল বেড়ে ঝুপসি মাথাটা প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। নোংরা জামা-কাপড়, কৌটো, বাটি ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। সেই মলিনতার মধ্যে মাখনকাকার কালো রোগা মুখখানার সামনে বালিশের ওয়াড়ে একটা টকটকে তাজা রক্তগোলাপ ফুটে আছে। সেই ঘরের আর সবকিছুই সেই গোলাপের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে তার রং।

গণাদা ফিসফিস করে বলল, রক্ত। রক্ত এলে আর বাঁচে না।

রক্ত! তাই তো! কিন্তু সেই মুহূর্তে রক্তের ভয়াবহতা আমি টেরই পেলাম না। তার আশ্চর্য সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করলাম কেবল। সুন্দর—কী সুন্দর রক্তগোলাপটি মুখের কাছে ধরে, সুঘ্রাণ বুকের বাতাসে টেনে নিয়ে মাখনকাকা ঘুমিয়ে পড়েছেন!

বিকেলে খবর পেয়ে পার্শ্বনাথ এলেন। দেখেশুনে বললেন, মাখন, এবার হাসপাতালে যাও। নইলে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাও। বাড়িতে কি এ-সব রোগের চিকিৎসা হয়?

মাখনকাকা ভারী চোখের পাতা খুলে অর্থহীন চোখে একটু চেয়ে রইলেন, তারপর ক্লান্ত বিরক্ত স্বরে বললেন, তার চেয়ে বাড়িতেই ফিরে যাই, কী বলেন ডাক্তারবাবু? ছেলেমেয়েগুলোকে বহুকাল দেখি না।

যা ভাল বোঝো।

খবর পেয়ে তাঁর দেশ থেকে এক শালা এল। দাদুর কাছে গিয়ে জোড়হাতে বলল, আর কয়েকটা দিন এখানেই রাখুন। দেশে গেলে বিনা চিকিৎসায় মারা পড়বে।

দাদু বললেন, থাকলে আমার আপত্তি কী! কিন্তু বাপু, এখানে তো চিকিৎসা হচ্ছে না। দেখাশোনা করারও লোক নেই। ওই রোগে কে দেখে সাহস করে! হাসপাতালেই দিয়ে যাও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে।

লোকটা কাকুতি মিনতি করল অনেক, হাসপাতালে খাবারদাবার দেয় না ঠিক মতো, তার ওপর বারোজাতের ছোঁয়া। ডোম মড়া ফেলে এসে হাত না ধুয়ে খাবার দিচ্ছে- -আমার নিজের চোখে দেখা। নার্সরাও বড় মুখ করে। মাখনদাকে তো জানেন কী রকম তেজালো মানুষ! ঝগড়া লেগে পড়বে।

হুঁঃ। বলে দাদু তামাকের নল টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, তেজ তো খুব! মা-বাপ ভাইদের ওপর তেজ—ও সবাই পারে।

মাখনকাকা রয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে কুয়াশা সরে গিয়ে যখন নীলাভ মেঘের মতো গারো পাহাড় দেখা যেত, রুপোলি রোদে ব্রহ্মপুত্রের স্বচ্ছ জল ভেদ করে যখন দেখা যেত ছোট মাছের ঘোরাফেরা, আমরা রোদ পোয়াতে বাইরে এসে বসতাম—তখন মাঝে মাঝে মাখনকাকা জ্বর কমে গেলে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘটি হাতে বেরিয়ে কলপাড়ে যেতেন। আমাদের কাউকে ডেকে বলতেন, একটু ভাল ঘি এনে দিতে পারো খোকা? আমি পয়সা দেব। লেবুপাতা দিয়ে ঘি মেখে একটু ভাত খেতে ইচ্ছে করে।

এক দিন তুলারানীকে মেজো জেঠিমা বিকেলবেলায় ধরলেন বাড়ির পিছনে আঁস্তাকুড়টার পাশে। তুলারানীর এক হাতে খইয়ের মোয়া, অন্য হাতে গুড়-নারকেলের পাক দেওয়া পুরে তৈরি প্রকাণ্ড একটা মঠ।

কোথায় পেলি এ-সব?

তুলারানী উত্তর দেয় না।

জেঠিমা তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন ভিতর-বাড়ির উঠোনের মাঝখানে। ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন। বললেন, খইয়ের মোয়া তো এ-বাড়িতে হয়নি, তোর মাও করেনি—তবে কোথায় পেলি? আর ওই মঠ তো আমরা কোনওকালে করি না।

তুলারানী নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। গণাদা দেখেই লাফিয়ে উঠল, এ-সব মাখনকাকার শালা এনে দিয়ে গিয়েছিল। মাখনকাকা রোজ খায় দেখেছি।

মাখনকাকা বিকেলের জ্বরে পড়ে আছেন তখন। তাঁর ঘরে খোঁজ করে দেখা গেল, মোয়ার টিন খোলা। নাড়ুর কৌটোর ভিতরে নরম পুরে ছোট্ট হাতের ছাপ।

কী সর্বনাশ! যক্ষ্মারোগীর ঘর থেকে চুরি করেছিস। এই বলে তুলারানীর হাতে থাবা দিয়ে মোয়া ফেলে দিলেন ঠাকুমা। চার দিকে ছড়ানো মোয়ার খই, ধুলায় লুণ্ঠিত নারকেলের মঠ, ময়লা বোতাম-ছেঁড়া ঢলঢলে ফ্রক গায়ে, চোখের জলে মুখের বসা ময়লা গলে লাগছে হাতের পিঠে—চার দিকের কৌতূহলী চোখের সামনে মাঝ-উঠোনে দাঁড়িয়ে চোর তুলারানী কাঁদছে। সুন্দর তুলারানী কাঁদছে। সেই বয়সে এমন অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের দৃশ্য কমই দেখেছি।

সেই কান্নার দশ মিনিট পর উঠোন জুড়ে আমার দিদি বুনুর সঙ্গে ছোটাছুটি করতে করতে খিলখিল করে হাসে তুলারানী। সন্ধের পর টিপটিপ করে উঠোন পেরিয়ে বড় ঘরের বারান্দায় উঠে দরজার পাশে দাঁড়ায়। ফ্রকের তলা থেকে ছোট্ট শিশি বের করে বলে, ঠাকুমা, মা একটু তেল চাইল, দাদা এইমাত্র বোয়াল মাছ আনল একটা। তার মুখে কিংবা মনে কোনও ছাপ থাকে না কৃতকর্মের। সব ধুয়ে-মুছে যায়। তুলারানী সাদা ঝিরঝিরে দাঁত বের করে হাসে, ঠাকুমাকে বলে, ইস গো, তোমাদের দুধে কেমন মোটা হয়ে হলুদ সর পড়েছে!

॥ নয় ॥

ঠিক দুপুরে ঢাকার গাড়ি গুম্‌গুম্ করে শম্ভুগঞ্জের রেলপুল পার হয়ে গেল। দত্তবাড়ির করমচা গাছ থেকে একটা ঘণ্টানাড়া পাখি ডাকে—ঠিক নিবারণ জ্যাঠামশাইয়ের পুজোর ঘণ্টার শব্দ। বিয়েতে পাওয়া একখানা মোটা উপন্যাস পড়তে পড়তে মা'র চোখের পাতা ঢুলে এল। পাশ ফিরে চুলের গোছা বালিশের ওপর দিকে সরিয়ে দিয়ে চোখ বুজল মা। ঠিক সেই সময়ে পগারের জলে গুপুত করে ঘাই মারে বড় একটা মাছ।

নিঝুম দুপুরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। উঠোনে রোদে-দেওয়া কলাই খুঁটে খাচ্ছে শালিখ। পুবের ঘরের চালে একপাল কাকের সভা বসেছে। বাইরের ঢালু মাঠটাতে একটা ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে একা একা খেলা করে বাতাস।

আমি ধীরে ধীরে দক্ষিণের ঘরের পিছনে বাগানের বেড়ার ধার দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় চলে আসি পুকুরপাড়ে। কয়েকটা খাপরা ছুড়ে জলে ব্যাঙবাজি খেলি। গুলতির রবার টেনে টিপ করি একটা বুলবুলিকে। আমার দুর্বল হাতের ছোড়া গুলি অত দূর যায় না। পাখিটা উড়ে যায় অনাদিনাথের ঘরের ওপর দিয়ে আরও দক্ষিণের অচেনা দেশে। ঘাটের পৈঠায় দাঁড়িয়ে নিথর জলে ঝুঁকে আমি কিছুক্ষণ দেখি আমার রোগা চেহারার ছায়া। তারপর পায়ে-পায়ে চলে আসি মিত্তিরদের পোড়ো ভিটেয়। দুই দেয়ালের মাঝখানে ছায়ায় ঢাকা গলিপথ মায়ের মতো আমাকে আগলে নেয়। নোনা ধরা পুরনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসি। বুঝতে পারি, চুপ করে বসে থাকা আমার বড় প্রিয়।

অশ্বত্থের ডালে দোলা খেয়ে দেয়াল বেয়ে নেমে আসে মসৃণ সবুজ, সরু এক সাপ। নেমে এসে ভাঙা ইট, পুরনো ঘুণ-ধরা কাঠ আর আগাছার ভিতরে তার শরীর লুকোয়। আবার বেরিয়ে আসে খোলা জায়গায়। তাকে দেখেই বোঝা যায়, এখনও সে শিশু। কৌতূহলে সে থেমে মুখ ফিরিয়ে নিজের অদ্ভুত সুন্দর শরীরের শোভা দেখে। আবার শ্লথভাবে চলে, আবার থামে। একসময়ে সে আমার মুখোমুখি হয়। অবাক মুখ তুলে অপলকে আমাকে দেখে কিছুক্ষণ। ছোট গাছের শিকড়ের মতো তার জিব হিলহিল করে নড়ে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। আমি চুপ করে দেখি। কালো শ্যাওলায়

পিছল দেয়ালের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে রানির মতো গৌরবে হেঁটে আসে একটা সাদা বেড়াল। আড়মোড়া ভাঙে, অন্যমনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখে। তারপর ইটের খাঁজে খাঁজে পা রেখে নেমে আসে। নিঃশব্দে ঘোরে-ফেরে, খাপ পেতে বসে। অপেক্ষা করে। তারপর লাফিয়ে গিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে কী একটা টেনে আনে। ঝটপট শব্দ হয়। দেখি, সাদা বেড়ালটার গলা জড়িয়ে ধরে ঝোলে সাপটা। তার পেটের কাছটা বেড়ালটার মুখে। চুপ করে বসে থাকে বেড়াল, সাপ তার গা বেয়ে নেমে যায়, ঝোপের মধ্যে যেতেই আবার তাকে টেনে আনে, ঝটপট শব্দ হতে থাকে। নরম থাবায় তাকে উলটেপালটে দেখে বেড়াল। সাপের সাদা বুক রোদে ঝলসে ওঠে। আবার উলটে গিয়ে সে তার সবুজ রং ঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। নিঃশব্দে তাদের সেই ভয়ংকর খেলা চলে, দুপুরের নিঝুম আলোছায়ায়।

কীভাবে যে দুপুর কেটে যায়! বেরিয়ে এসে বিকেলের মায়াবী আলোয় এক অচেনা দেশের পথ-ঘাট পার হয়ে এক অচেনা বাড়িতে অনাত্মীয় মানুষের কাছে ফিরে আসি।

প্রবর্তক ইস্কুলের বাড়িটা প্রায় শেষ হয়ে এল। সামনের বছর থেকে এখানে ইস্কুল বসবে। ফাঁকা ঘরগুলোয় এখনও জানালা দরজার কপাট লাগানো হয়নি, দেয়ালে পলেস্তারা পড়েনি, মেঝে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে। হু-হু করে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে গারো পাহাড়ের হাওয়া আসে। সেইখানে ছোঁয়াছুঁয়ির ছেলেমানুষি খেলা খেলি আমি আর গণাদা। কখনও ইস্কুল-ইস্কুল খেলা। কখনও এঘরে-ওঘরে হারিয়ে যাওয়ার খেলা। এ-সব আমরা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে খেলা ভুলে দুই ভাই ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। নদীর ও-পারে ভূত-প্রেতের রাজত্ব। সন্ধেবেলা সেখানে আলেয়া জ্বলে-নেভে, আগুনের বল লাফ দিয়ে ওঠে বাতাসে। গণাদা আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, বলে, ও-পার দিয়ে রেলগাড়িতে যারা যায়, তারা কত ভূত দেখে—না রে!

ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

গণাদা মুখ ফিরিয়ে বলে, মাখনকাকা আর বাঁচবে না—জানিস। তাঁর ঘরের সামনে রাত্রে কারা যেন আসে—ছায়ার মতো। মরে যাওয়ার আগে ভূতপ্রেতরা দেখা দেয়।

কী করে বুঝলি?

গণাদা লজ্জিত মুখে বলে, সেদিন রাতে দাদু ঘুম থেকে তুলে মারল তো! তারপর বাইরে আনল প্যান্ট ছাড়িয়ে পা ধুইয়ে দিতে। আমি ওই শীতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দাদু কুয়োর পাড়ে বালতি জলে ফেলেছে। ঠিক সেই সময়ে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখলাম, কাছারিঘরের বারান্দায় একটা ছায়া। মাখনকাকার ঝাঁপের দরজার কাছে ঝুঁকে চেয়ে আছে। শেষ নিশ্বাস পড়লেই নিয়ে চলে যাবে। ভয় পেয়ে দাদুকে ডাকলাম, দাদু কান মলে দিয়ে বলল, তোর মতো পিচাশ ছাড়া কে আর ভূত দেখবে—যদি ধরে, তোকেই ধরবে। কিন্তু আমি জানি ঠিক, মাখনকাকার ঘরের সামনে যে ছিল সে মানুষ না। আমি চেঁচাতেই দেখি আর কেউ নেই। জ্যোৎস্নায় চার দিক ফাঁকা, নিঝুম।

তারপর আমরা দু'জন কাছ ঘেঁষে দাঁড়াই। চোখ ব্রহ্মপুত্রের ও-পারে। সবুজ মাঠের ও পারে একটু সাদা মেঘ ধোঁয়ার মতো দেখা যায়। ফাঁকা স্কুলবাড়িতে হুস হুস শব্দ করে বাতাস ঘুরে বেড়ায়। আমরা দেখি, সাদা পাল তুলে মন্থর নৌকো যাচ্ছে কোন স্বপ্নের দেশে। কী জানি কেন, কেবলই আমার মনে হয়, চার দিকের এই মাঠ, ঘাট, নদী, আকাশ—এ-সবই পৃথিবীর শেষ কথা নয়। এর অদৃশ্যে আরও এক জগৎ রয়েছে। সেখানেও আছে গাছপালা, মায়াবী আলো, আর ছায়া, খেত, পরিশ্রমী মানুষেরা। কোথাও একটা দরজা আছে, যেটা খুললেই সেই অন্য জগতের মধ্যে পা দেব। ঠিক হুবহু আমাদের জগতের মতো নয়। যেখানে আমাদের নদী, সেখানে হয়তো তাদের রাজার বাড়ি, যেখানে আমাদের শহর সেইখানে বিশাল ঝিল, এই স্কুলবাড়িটায় হয়তো এখন তাদের মন্দিরে সন্ধ্যা-পুজোর ঘণ্টা বাজছে। জ্বরের বিকারে অদ্ভুত স্বপ্নে মাঝে মাঝে সেই গোপন দরজাটা আমার কাছে খুলে যায়। আমি সেই পৃথিবীতে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে আসি।

শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে এক সকালে বিষ্ণুপদ এসে হাজির। ভারী ফিটফাট দেখাচ্ছিল তাকে। কামানো ঘাড়, কলারওলা গেঞ্জি, ঘন নীল রঙের ভেলভেটের হাফ-প্যান্ট, হাতে চামড়ার

সুটকেস। বড় জেঠিমার বাপের বাড়ি কম দূর নয়। অত দূর থেকে ট্রেনে সে একা এসেছে। তাকে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

সে এসে বড় জ্যাঠামশাইয়ের হাতে একটা চিঠি দিল। বলল, আমি কালকেই ফিরে যাব। চিঠি পেতে পাছে দেরি হয় সেইজন্য মা আমাকে পাঠিয়েছে।

সেই চিঠি পেয়ে জ্যাঠামশাই সারা সকালটা উত্তেজিতভাবে ঘরে পায়চারি করলেন। তারপর বেরোলেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার খুলতে।

বড় জেঠিমা চলে যাওয়ার পর আমরা একটু বড় হয়েছি। বিষ্ণুপদ আগে পাত্তা দিত না। এবার এসে আমাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলল। কিন্তু কথার ভাব একটু আলগা ধরনের। অন্য বাড়ির লোকের মতো। বলল, বাবার জন্য নারায়ণগঞ্জের বাজারে আমরা একটা দোকানঘর ভাড়া নিয়েছি। মনোহারী দোকান হবে। বাবা সেই দোকানে বসবে এখন থেকে। এখানে থাকবে না।

তারপর খুব গম্ভীর হয়ে সে বলল, এখানে অপমানের ভাত কে খায়?

দাদু তাকে দেখেও দেখলেন না। গম্ভীরভাবে কোর্টে বেরিয়ে গেলেন। ঠাকুমা কাছে ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। খুব কাটা-কাটা তেরছা উত্তর দিল বিষ্ণুপদ। স্নান করতে পুকুরে নেমে সে সাঁতার কাটল না, কয়েকটা ডুব দিয়ে উঠে পড়ল। দুপুরে খেতে বসে ইচ্ছে করেই অল্প খেয়ে জলের গ্লাস মুখে তুলে উঠে গেল। আমাদের বাড়ির গামছা ছুঁল না, পকেট থেকে সবুজ রুমাল বের করে মুখ মুছল।

বিকেলের দিকে বাইরের মাঠে বসে গোল হয়ে আমরা তার কাছে নারায়ণগঞ্জের গল্প শুনলাম। সে বলল, ময়মনসিংহে কিচ্ছু পাওয়া যায় না। ওখানে এত বড় বড় কইমাছ—বলে সে কনুই পর্যন্ত মাপ দেখায়। হাসে, বলে, ক্ষীর আর সবরিকলা দিয়ে মেখে মুড়ি খাই রোজ। সঙ্গে অ্যাত্তো বড় বড় আঠা-কদমা। এখানে তো কালেভদ্রে মাংস হয়, ওখানে প্রতি রবিবারে মাংস।

রাতে জ্যোৎস্নায় পা ছড়িয়ে ইজিচেয়ারে বসে আছেন দাদু। নিঃশব্দে। সেই সময়ে বড় জ্যাঠামশাই গিয়ে বারান্দার নীচে দাঁড়ালেন। দাদু তাঁকে ফিরে দেখলেন না, কিন্তু খাড়া হয়ে বসলেন।

বললেন, শ্বশুরবাড়ির দেশে যাবে তো! সে আমি আগেই জানতাম। এখানে অপমানের ভাত, ঘেন্নার ভাত কে খায়! যাবে যাও। কিন্তু চরিত্রটা ঠিক রেখো। চরিত্রেই মানুষ রাজা-উজির, চরিত্রেই ভিখিরি।

এই বলে দাদু অনেকক্ষণ অন্যমনে চুপ করে রইলেন। তারপর তাঁর চরিত্রের পক্ষে বেমানান ভারী বিষণ্ণ গলায় বললেন, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। যা করার করলেন তোমাদের শ্বশুরেরা। ভাল, খুব ভাল।

জ্যাঠামশাই কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু জ্যোৎস্নায় তাঁর দু'গাল বেয়ে দুটো জলের ধারাকে ঝিকিয়ে উঠতে দেখা গেল।

দাদু তেমনি অন্যমনস্ক গলায় বললেন, কাল যদি হয় তো কালই চলে যাও। নগেন তো বসেই আছে, সে দোকান দেখবে'খন।

পরদিন দুপুরে গাড়ি। সুদর্শন ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আনল। কামলারা মালপত্র তুলে দিল গাড়ির ছাদে। জ্যাঠামশাই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, মাগো, কত দোষ করেছি গো মা, কত দোষ করেছি! চাকর দিয়ে কেন জুতোপেটা করোনি আমাকে?

উচ্চরোলে সবাই কাঁদছে জ্যাঠামশাইকে ধরে। জ্যাঠামশাই আমাদের কাছে ডাকেন, আর বুকে জড়িয়ে ধরেন, আর কাঁদতে থাকেন। এই করুণ দৃশ্য কেবল গম্ভীরভাবে ঘোড়ার গাড়িতে বসে দেখছিল বিষ্ণুপদ। এক বার সে ফিক করে একটু হেসে ফেলে রুমালে মুখ ঢেকে আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

দক্ষিণের শূন্য ঘরটায় মেজো জ্যাঠামশাই চলে এলেন পরদিন। পুবের ঘরে একটু পার্টিশন দেওয়া জায়গায় এতকাল ছিলেন তিনি। এবার বড়সড় ফাঁকা একখানা ঘর পেয়ে গেলেন। ভারী খুশি দেখাল তাঁকে। দক্ষিণের ঘরে অবশ্য তখনও বড় জেঠিমার আলমারি, বাক্স-টাক্স রয়ে গেল তালাবন্ধ হয়ে। অনেক দিন পরে পরে কখনও-সখনও শিবপদ বা বিষ্ণুপদ আসত। আলমারি কিংবা বাক্স খুলে টুকটাক জিনিসপত্র বের করে নিত। এক রাত্রি অতিথির মতো থেকে পরদিন ফিরে যেত। আমরা দেখতাম

তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে, পরনে ভাল প্যান্ট-শার্ট। বোঝা যেত জ্যাঠামশাইয়ের নায়ারণগঞ্জের মনোহারী দোকান ভালই চলছে।

মাখনকাকার জ্বর আর ছাড়ে না। খুব কাশি হয়। মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে। কখনও দেখি, ময়লা বিছানায় চাদর জড়িয়ে বাইরে এসে বসেছেন। নিধে নাপিত তাঁর ক্ষৌরি করে দিচ্ছে। সেই অবস্থায় আমাদের দেখতে পেলে মাখনকাকা সলজ্জ হাসি হাসতেন। বলতেন, গাল বড় কুটকুট করে দাড়ি জমলে। যেন দাড়ি কামানোটা যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অপরাধ, এ-রকমই একটা সংকোচ তাঁর মুখে দেখা যেত। গলা উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে আধবোজা চোখে পরম তৃপ্তিতে তিনি ক্ষৌরি হতেন। কামানোর পর গালে হাত বুলোতেন, ছোট্ট হাত-আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন নিজের মুখ। সর্বেশ্বরকে বলতেন, খুড়োমশাই, বাজার থেকে একটা ভাল মাঝারি সাইজের আয়না এনে দিয়ো তো। আমার আয়নাটার পারা-টারা উঠে ধোঁয়াটে মেরে গেছে, মুখ দেখা যায় না।

মাখনকাকা ক্ষৌরি হলে গণাদা আমাকে ডেকে বলত, জানিস মানুষ মরার আগে চেহারা ভাল হয়! মাখনকাকাকে দ্যাখ, কেমন চকচকে দেখাচ্ছে!

বুঝতে পারতাম, গণাদা পরম কৌতূহলে মাখনকাকার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। একটা বেশ ঘটনা হয় তবে। গণাদা কখনও মানুষ মরতে দেখেনি বলে দুঃখ করত। আমিও দেখিনি। গণাদার সঙ্গে সঙ্গে তার দেখাদেখি আমিও অপেক্ষা করতাম।

জ্বরের ঘোরে রাত-বিরেতে মাঝে মাঝে মাখনকাকা 'কে! কে রে!' বলে চেঁচিয়ে উঠতেন। সর্বেশ্বর লণ্ঠন হাতে বেরোত, হয়েছে কী, ও মাখন!

দেখো তো, কে যেন আমার গলার কাছে হাত রেখেছিল। আমি জেগে উঠতেই পালাল। গলায় সোনার হারছড়া রয়েছে, তাতে বিশালাক্ষীর কবচ। দেখো তো, চোরটোর কি না!

সর্বেশ্বর ঘুম চোখে ঝিঁঝি ডাকা অন্ধকারে ধোঁয়াটে লণ্ঠন তুলে এদিক-ওদিক একটু দোলাত। দক্ষিণের ঝুপসি বাগান, বারবাড়ির মাঠ—কোথাও সে আলো পৌঁছত না। সর্বেশ্বর হাই তুলে বলত, কোথায় কী! স্বপ্ন দেখেছ।

ঘুমই নেই, তার স্বপ্ন। একটু ঝিমুনি এসেছিল কেবল।

ঝাঁপের দড়িটা ভাল করে বেঁধে শোও। যা ঘর, শেয়ালের লাথিতে পড়ে যাবে। এই বলে সর্বেশ্বর ঘুমোতে যেত।

কিন্তু একদিন মাঝরাতে 'কে! কে!' চিৎকার করে উঠে মাখনকাকা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন! সবাই ছুটে গেল।

দেখা গেল, মাখনকাকা পা ছড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। ভ্যাবলা নির্বোধ মুখখানা চোখের জলে ভাসছে। তাঁর গলার হারটা সত্যিই নেই।

কী হয়েছে মাখন?

মাখনকাকা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোমাকে বলেছিলাম খুড়োমশাই, দু'রাত্রি আমার গলায় কে হাত দিয়েছিল। তুমি বিশ্বাস করোনি। আজ একটু ঘুমিয়েছি, হঠাৎ গলায় টান পড়তেই জেগে উঠে হারছড়া চেপে ধরলাম। রোগা শরীরে কি পারি! হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে গেল। এই দেখো, কেবল হুকটা আমার হাতে থেকে গেছে।

কে নিল, দেখতে পেয়েছিলে?

না গো, সে সেয়ানা-চোর। ঘরে ঢুকে হ্যারিকেন নিভিয়ে দিয়েছিল—তবে বড়সড় জোয়ান চেহারা, গায়ে চুপচুপে করে তেল মাখা।

বলে মাখনকাকা কাঁদতে থাকেন। বলেন, মায়ের দেওয়া হারটা, আমার ঘরে আর একদানা সোনা নেই। কেবল এই হুকটা। —বিশ্বাস করো—আবার কখনও বলেন—এবার আমি মরব। বিশালাক্ষীর কবচ ছিল গলায়, তাই এতকাল রোগভোগেও প্রাণটা টিক টিক করছিল। এবার আর রক্ষা নেই—এবার শেষ—

কাকা নগেন্দ্রনাথ ব্যাপারটা নিঃশব্দে দেখলেন। তারপব সোজা গিয়ে ধাক্কা দিলেন তুলারানীদের দরজায়, নিবারণদা, একটু উঠুন তো। বাড়িতে এত শোরগোল—আপনার ঘুম ভাঙে না কেন?

নিবারণ জ্যাঠা দরজা খুলে ঘুম চোখে ভয় পেয়ে বলেন, হয়েছে কী। চোর পড়েছে নাকি।

কাকা তাঁকে ঠেলে ঘরে ঢুকে বলেন, সিধু কই?

পাশের খুপরিতে সিধু ঘুমোয়। কাকা মশারির মধ্যে হাত চালিয়ে প্রথমে তার বুক দেখলেন, জোরে দুরদুর করছে কি না। গায়ে হাত ঘষে দেখলেন গায়ে তেল আছে কি না! তারপর চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে আনলেন উঠোনে।

হার বের কর।

ঘুম ভেঙে ভীত চোখে আমরা জানালা দিয়ে দেখছি। কাকার মোটা হাতের থাপ্পড় খেয়ে টস টস করে রক্ত পড়ছে সিধুর মুখ দিয়ে। টলে টলে পড়ে যাচ্ছে সে। কাকা ধরে আছেন এক হাতে, অন্য হাতে সর্বেশ্বর। নিবারণ জেঠিমা চেঁচিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছেন, আমার সর্বনাশ হল গো। নিবারণ জ্যাঠামশাই চোখের নিকেলের চশমা খুলে অকারণে মুছছেন ধুতির খুঁটে!

কাকা সিধুকে মারেন, আর বলেন, হার বের কর। কোথায় রেখেছিস হার?

সিধু উত্তর দিল না। কেবল মার খেল, আর কাঁদল। তাকে মাটিতে ফেলে কাকা লাথি তুলেছিলেন। বোধহয় শিবপদর সেই ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় লাথি মারলেন না।

পরদিন ছেঁড়া হারের একটা টুকরো দক্ষিণের বাগানে লেবুগাছতলায় কুড়িয়ে পেয়ে হাতে করে নিয়ে এল তুলারানী। সেই নিরাপরাধ নির্লোভ মুখখানি, হাতে নিয়ে উঁচু করে ঠাকুমাকে দেখাল, উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, লেবুতলায় কুড়িয়ে পেলাম ঠাকুমা, মাখনকাকার হার। এই একটুখানিই পড়ে ছিল।

এই বলে সে হারের অংশটুকু বারান্দায় ঠাকুমার পায়ের কাছে রেখে গুরগুর করে চলে গেল। কামলা লাগিয়ে সারা বাগান খুঁজেও হারের বড় অংশটা আর কবচ পাওয়া গেল না।

মাখনকাকা দিন দিন নিভে যেতে লাগলেন। বাইরে এসে বড় একটা বসেন না। সারা দিন বিছানায় শোওয়া, স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর থেকে তাঁর আবোলতাবোল কথাবার্তার শব্দ কানে আসে। কখনও ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

বাবার চিঠি আসে। কলকাতা থেকে তিনি নতুন জায়গায় গেছেন। সে-জায়গার নাম মাল জংশন। বড় নির্জন জায়গা। বাড়ির পিছনে চা-বাগান। স্টেশন আর ছোট্ট বাজার ছাড়া লোকালয় নেই। রাত্রে ফেউ ডাকে। তাঁর রান্না করে দেয় এক মুসলমান বাবুর্চি। মাঝে মাঝে প্ল্যান্টার সাহেবদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পান। চিঠি পড়ে দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। নিবারণ জ্যাঠা পাশে বসে পুরোহিত-দর্পণ দেখতে দেখতে বলেন, প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।

আমি সেই জায়গাটাকে কল্পনা করি। সেই নির্জনতা, পাখির ডাক, ঘন অরণ্যের গন্ধ, আদিগন্ত শূন্য প্রান্তর। সেখানে গেলে কি খুব একা লাগবে। সেখানে গেলে কি চিরকালের মতো সেরে যাবে জ্বর! সাহেবদের ছেলেরা আমাকে খেলায় নেবে!

ছোটপিসিমার টেস্ট পরীক্ষার ফল বেরোল। তিনি অ্যালাউড হয়েছেন। তিনি দিন-রাত বই হাতে বসে আছেন। রান্না ঘরে খেতে আসেন, বাঁ হাতে খোলা বই নিয়ে। মেজো জেঠিমা বিকেলে যখন তাঁর চুল বেঁধে দেন তখনও তাঁর হাতে বই। কারও সঙ্গে কথাবার্তা নেই। কেবল দু'-একজন মেয়ে বন্ধু এলে তিনি গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেন, পড়াশুনোরই কথাবার্তা হয়।

এক দিন দাদু কোর্ট থেকে ফিরে জল-টল খেয়ে বাগানের কাজে যাবেন বলে তৈরি হচ্ছেন, এমন সময়ে সিদ্ধেশ্বর কম্পাউন্ডার এসে হাজির। সিদ্ধেশ্বরের একটু চরিত্রদোষ আছে বলে শোনা যেত। কিন্তু তা ছাড়া এমনিতে বড় ভাল মানুষটি। বড় নিরীহ। রুগিদের ওষুধ দিতে কখনও কাউকে ধমকাতেন না, যা কম্পাউন্ডাররা সাধারণত করে থাকে।

তিনি এসে বসলেন বারান্দায় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে। দাদুর সঙ্গে এ-কথা সে-কথা বললেন অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ একসময়ে বললেন, ছোট মেয়েটি তো গ্র্যাজুয়েট হতে চলল, কালীদা, বিয়ের চেষ্টা দেখছেন নাকি!

দাদু একটু থমকে গিয়ে বললেন, না তো! দেখব, এখনও সময় যায়নি।

সিদ্ধেশ্বর একটু অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, সচ্চরিত্র একটি পাত্র ছিল হাতে। দাবিদাবাও নেই। তাই বলছিলাম কী—

দাদু ধমকে উঠলেন, কে পাত্র?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সিদ্ধেশ্বর অন্য কথা বলেন, পাত্রের বাড়িও ফাঁকা, শ্বশুর-শাশুড়ির ঝামেলা নেই, বউ হবে ঘরের কর্ত্রী। চেহারা-ছবি ভাল। খুব লম্বা-চওড়া—

কে বলো না!

আজ্ঞে আপনিও চেনেন তাকে। ওই তো পুকুরপাড়ের ঘরে থাকে আমাদের অনাদিনাথ। জ্যাঠামশাইয়ের নিকট-আত্মীয়—

শুনে দাদু যেন অবিশ্বাসে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চাপা গলায় গরগর করে উঠে বললেন, কে তোমাকে এ-প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছে, অ্যাঁ! অনাদির লেখাপড়া কদ্দুর, জানো? জানো তার বংশে কুষ্ঠরুগি ছিল? তার ওপর চালচুলো নেই, বোকেনবাবুর দয়ায় টিকে আছে—বামন হয়ে চাঁদে হাত! অ্যাঁ?

হাতের দাখানা মাটিতে আছড়ে ফেলে দাদু লাল হয়ে বললেন, এত বড় সাহস!

তখন দাদু অল্পেই রেগে যান। রাগলে মনে হয় খুন করতে পারেন।

সিদ্ধেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

তা হলে আসি, কালীদা—

দাদু চেঁচিয়ে বললেন, আর কখখনও এ-সব মতলব নিয়ে এসো না—যাও বেরোও—

ম্লান মুখে সিদ্ধেশ্বর হনহন করে পালালেন।

তারপর সারা বিকেল দাদু লেজ আছড়ালেন আর গরগর করলেন। এই অসম্ভব বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুনে ছোটপিসিমা ভীষণ রেগে কাঁদতে লাগলেন। দাদু তাঁকে ডেকে বললেন, এ-সব কথা মাথায় রেখো না। তুমি পড়াশুনো করো। আমি অনাদিকে ডাকিয়ে শাসন করে দেব। সে এই মতলবেই এই বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত বটে! বলে কিনা, আমাদের কুকু হল জাতিস্মর, ও-সব ছুতো এখন বুঝতে পারছি। তুমি যাও—আমি এখনও বেঁচে আছি—

আমার অনাদিনাথের বাড়িতে যাওয়া বারণ হয়ে গেল।

আমাদের বারবাড়ি দিয়ে দক্ষিণের বাগানের পিছন দিকের রাস্তা ধরলে অনাদিনাথের ঘরে যেতে সুবিধে হত। এতকাল তিনি তাই যেতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁকে দেখতাম, ধোপাদের মাঠ ঘুরে, মুকুন্দর ঘানিঘরের পিছনে কচুবন ঠেলে অনেকটা পথ হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। আমাদের দেখলে ছাতায় মুখ আড়াল করতেন। ওই লম্বা লোকটা সংকোচে কুঁজোও হয়ে যেতেন একটু।

## ॥ দশ ॥

সিতিকণ্ঠের মতো সুন্দর মানুষ দেখি না। কী একখানা রং। সেই রঙে রোদ পড়লে আলো দেয়। মিশমিশ করে একমাথা চুল—যেন সারবন্ত বাগানের ফলন। চোখা নাক, বিশাল চোখ। সেই রং আর রূপ নিয়ে সিতিকণ্ঠ একখানা নীল রঙের সুন্দর হালকা গড়নের র‍্যালে সাইকেলে চাপতেন। পরনে ফিনফিনে ধুতি, গায়ে ক্রিম রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল, শীতকালে পাঞ্জাবির ওপর একটা ধূসর রঙের শাল। তাঁদের বাড়িটা ছিল আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে। বেরোতে বা ঢুকতে হলে যেতে হত আমাদের বারবাড়ি দিয়ে। একটা ঘুপচি মতো আঁকাবাঁকা জঙ্গুলে রাস্তা ছিল তাঁদের বাড়িতে ঢোকার। সিতিকণ্ঠ তাই সাইকেলটা হাঁটিয়ে আনতেন আমাদের বারবাড়ির মাঠ পর্যন্ত। সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় দাঁড়াতেন। সাইকেলখানা কোমরে হেলান দিয়ে রেখে বাতাসে হাত আড়াল করে দেশলাই জ্বেলে ধরাতেন সিগারেট। আঙুলের পোখরাজের আংটি চমকাত। তারপর বড় সুন্দর ভঙ্গিতে এক হাতে সাইকেল ধরে থেকে ছোট্ট একটু অনায়াস লাফে উঠে যেতেন সাইকেলের সিটে। ঢালু জমিতে সাইকেল গড়িয়ে নামত। সিতিকণ্ঠ উঁচু হয়ে পিছনে চাপা-পড়া পাঞ্জাবির ঝুল এক হাত দিয়ে ছাড়িয়ে দিতেন, চুল ঠিক

করতেন। অবহেলায় চড়াই ভেঙে উঠে যেতেন বড় রাস্তায়। যেতেন বড়বাজারে তাঁর খেলাধুলার সাজসরঞ্জামের দোকানে।

পৃথিবীতে এক বার নিজের মতো হয়ে জন্মগ্রহণ করলে কিছুতেই আর অন্য কারও মতো হয়ে ওঠা যায় না। এ-কথা কি আমি শিশুবয়সেই জানতাম না? তবু বরাবর আমার সিতিকণ্ঠের মতো সুন্দর হয়ে উঠতে ইচ্ছে করত। সিতিকণ্ঠ সম্ভবত মানুষের এইসব দুর্বলতার কথা জানতেন। প্রায় সকলেই জানে। তাই সিতিকণ্ঠ সবসময়ে সুন্দর থাকতেন। তাঁদের বাড়িতে কত বার জামরুল কুড়োতে গেছি। পোষা একটা বাঁদর ছিল তাঁদের আর ছিল একটা বেজি। বাঁদরটা বাঁধা থাকত শেকলে. বারান্দার থাম বেয়ে চালে উঠে যেত, চোখ পিটপিট করে গা চুলকোত, চেনা মানুষের ঘাড়ে উঠে যেত অনায়াসে। বেজিটার গলায় ছিল চামড়ার সরু বকলস। কত বার সিতিকণ্ঠ তাকে নিজের ঘাড়ে মাথায় নিয়ে, কোলে নিয়ে বসে থেকেছেন। আমরা সেই বানর আর বেজি দেখতেও যেতাম। বাড়িতেও দেখতাম, সিতিকণ্ঠের চুল সবসময়ে পাট করা। পরনে পরিষ্কার ধপধপে ধুতি। গরমকালে ফিনফিনে গেঞ্জি থাকত গায়ে। গজদন্ত দেখিয়ে হাসতেন, বলতেন, তোকে এক দিন সাইকেলের রডে চাপিয়ে কেওটখালি দেখিয়ে আনব কুকু। তাঁর সাইকেলটা ছিল দেখার মতো। আমাদের সকলের বাড়িতে যখন কালো সাইকেল, তখন তাঁরটা ঘন নীল। ফরসা সিতিকণ্ঠকে নীল সাইকেলে কী যে মারাত্মক সুন্দর দেখাত! সাইকেলের সিটটা ছিল নিচু, স্পোক আর রিম রুপোর মতো ঝকঝকে, নীচের দিকে বাঁকানো ছিল হ্যান্ডেল, লাগানো ছিল গিয়ার। পাঁচ আইন চালু হলে তিনি সাইকেলে একটা ডাইনামোঅলা বাতি লাগিয়েছিলেন। সাইকেলটার বড় যত্ন ছিল তাঁর। কত বার দেখেছি, উঠোনে সাইকেলটাকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে সিতিকণ্ঠ ন্যাকড়া কেরোসিনে ভিজিয়ে শুকনো ময়লা তুলছেন। বলতেন বটে, কিন্তু কখনও তাঁর সাইকেলের রডে কাউকে তুলতেন না। এক মা ছিল সিতিকণ্ঠের, আর কেউ না। দু'খানি টিনের ঘর, ছোট্ট উঠোন, কুয়োতলা— এইটুকুই ছিল তাঁদের। সুন্দর বলে সাহেবদের কোম্পানিতে চাকরি পেতে পারতেন তিনি—নেননি। সুন্দর বলে জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করতে পারতেন—করেননি। আমার কাকার তিনি বন্ধু ছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন, কী মার্ভেলাস হেলথ করেছে নগেন! কাকা আত্মপ্রসাদে হাসতেন! সেই সিতিকণ্ঠের বিয়েতে আমরা বরযাত্রী গেলাম মীরকান্দাপাড়া। নৌকোয়, মোটরে অনেকটা পথ। বউ নিয়ে যখন ফিরলেন পাড়া ভেঙে পড়ল। উঠোন থেকে বউ ঘরে উঠতে পারে না—এত ভিড়। কয়েক দিন সিতিকণ্ঠকে আরও উজ্জ্বল দেখাল—কারণে অকারণে হাসেন, চাপা উত্তেজনা এবং বোধ হয় সুখবোধে তাঁর মুখখানা টকটক করে। অক্রূর ছিল আমাদের বাঁধা ফোটোওয়ালা। সে তার প্রকাণ্ড তিন ঠ্যাঙে ক্যামেরা নিয়ে এসে উঠোনে রাজবাড়ির সিন টাঙিয়ে সিতিকণ্ঠ আর তাঁর স্ত্রীর ছবি তুলল। তাঁর স্ত্রী চেয়ারে বসে, আর সিতিকণ্ঠ চেয়ারের হাতলে হাত রেখে একটু হেলে দাঁড়িয়ে, স্ত্রীর মাথাটি তাঁর বুক ছুঁয়েছে— কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে এই ছবি তুলে গেল অক্রূর। কয়েক দিন সিতিকণ্ঠর যাওয়ার পথে সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকত, তাঁর স্ত্রীর চলাফেরার ঠুনঠুন গয়নার শব্দ উঠত। মাঝে মধ্যে দেখতাম ছেলের বউকে নিয়ে সাইকেল রিকশায় সিতিকণ্ঠের মা চলেছেন কালীবাড়িতে। সিতিকণ্ঠের বউকে ভাল করে দেখলাম, যখন কয়েক দিন পর পগারের ঘাটে বাসনের পাঁজা নিয়ে আসতে লাগলেন। সিতিকণ্ঠের মতো সুন্দব না, তবু সেই নতুন কাকিমা সুন্দরই ছিলেন। ভারী কালো ছিল তাঁর চোখের তারা দু'টি। মাঝে মাঝে দেখেছি আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ পগারের ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁতন করতে করতে তাঁকে 'বউঠান' বলে ডেকে নানা রসিকতা করছেন।

টিক্কাপাড়ার ঘাড়-কামানো কাপ্তান কিষ্টা এসে এক দিন বলল, সিতিদা, এখন আর বাঁদরটা দিয়ে কী করবেন! এটা আমাকে দিয়ে দিন। অনেক দিন ধরে একটা বাঁদর পোষার বড় শখ আমার।

এ-কথা ঠিক যে বিয়ের পর বাঁদর বেজি আর সাইকেল সম্বন্ধে একটু উদাসীনতা এসেছিল সিতিকণ্ঠের। মাঝে মাঝে দুপুরের খাবার না পেয়ে বাঁদরটা চালে উঠে চেঁচাত, ধুপধাপ শব্দ করে লাফাত। নতুন কাকিমা সকৌতুকে একটা লম্বা বাঁশ হাতে সেটাকে মাঝে মধ্যে খোঁচা দিতেন। কে জানে কেন, ওই নিষ্ঠুরতাটুকু তাঁর ছিল।

কিষ্টা চাইলে সিতিকণ্ঠ কয়েক পলক চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা, নে। খুব যত্ন করিস। ওরা অবোধ প্রাণী তো—তোদের বউঠান আবার বাঁদর-টাঁদর তেমন পছন্দ করে না—

শুনতাম, কাপ্তান কিষ্টা হারানির ঘরে হারমোনি বাজায়। তবলা ঠোকে। ললিতের দোকানের সামনে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠ্যাং ফাঁক করে কিষ্টা সিগারেট ফোঁকে— এই দৃশ্য কত বার দেখেছি! আলিসান চেহারা ছিল তার, আর প্রকাণ্ড কাঁধ। মাঝে মধ্যে কাকার জিমনাশিয়ামে তাকে রিং-এর দোল খেতে দেখেছি। সেবার সিধু আমাকে দেয়ালির দিন বাতি দেখাতে নিয়ে যায়। মেছোবাজারের কাছে একটা ইট-ওঠা নোংরা গলিতে ঢুকে সিধু আমাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কী পাড়া বল তো!

আমি হাঁ করে চার দিকে চেয়ে দেখলাম। চিনতে পারলাম না। কোনও দিন আসিনি। কিন্তু জায়গাটা যেন ময়মনসিংহের কোনও পাড়া নয়। আমার চেনা কোনও জায়গার সঙ্গেই তার মেলে না। দেখি, চার দিকে ঘরের চালে প্রদীপের বদলে সারি সারি কুপি জ্বলছে। কেরোসিনের ধোঁয়ায় চারি দিক কেমন ঘোলাটে। সারা রাস্তায় অবাধ মেয়ে-পুরুষের ভিড়। খুব হল্লা চলছে। দেখি, মাথা নামিয়ে চলছে মাতাল, ঘরের দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা। তাদের সিঁথিতে মেটেসিঁদুর, কপালে টিপ, চোখে গাঢ় কাজল। আঁট করে শাড়ি পরেছে, দুলে দুলে হাসছে। সিধু চোখ কুঁচকে চার দিক দেখে আর মিটিমিটি হাসে। সেখানে দু'জন চেনা লোককে আমি দেখি। প্রথম জন, আমাদের সুরেন গার্ড। তাঁর চোখে সুর্মা, বিষণ্ণ মুখ, গিলে করা পাঞ্জাবি— তিনি ঠিক আমাদের মুখোমুখি পেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাকে চিনতে পারলেন না। আমি জ্যাঠামশাই বলে ডাকতে যাচ্ছিলাম, সিধু আমাকে টেনে নিয়ে গেল, বলল, এখানে তোকে ও চিনবে নাকি! দ্বিতীয় জন, কিষ্টা। সে একটা পানের দোকানের সামনে কাচের গুলি-ওলা সোডার বোতল হাতে দাঁড়িয়ে। আমাদের অনেকক্ষণ চোখ কুঁচকে দেখল। পরে যখন জেনেছিলাম, ওটা হারানীদের পাড়া, তখন থেকে কিষ্টাকে আমি ভয় পেতাম। যদি কখনও এসে কাকাকে বলে দেয়!

কিষ্টা সিতিকণ্ঠের বাঁদর নিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখতে আমরা বারবাড়িতে ছুটলাম, ঢিলে হাফপ্যান্ট কোমরে চেপে ধরে। দক্ষিণের বাগানের পিছনের রাস্তা দিয়ে, পুকুরপাড় দিয়ে কিষ্টা যাচ্ছে, কোলে শিশুর মতো আদরে ধরে রেখেছে বাঁদরটাকে, মাঝে মাঝে মুখ ডুবিয়ে আদর করছে। আমবাগান পর্যন্ত তার পিছু নিয়ে দুঃখিত মনে ফিরে আসি। মনে হয়, যদি বুদ্ধি করে আমিই গিয়ে সিতিকণ্ঠের কাছ থেকে চেয়ে নিতাম বাঁদরটা। ঠিক করেছিলাম, এবার কেউ চাওয়ার আগেই আমি গিয়ে এক দিন বেজিটা চেয়ে আসব। আমার কাঁধে-মাথায় খেলা করবে সে, হাত থেকে বাদাম ভেঙে খাবে। কাপ্তানের মতো ঘুরব বেজি নিয়ে। কে জানে, হয়তো বেজিটা আমার মনের কথা বুঝতে পারত। কিংবা, হয়তো বাড়িতে তার আদর কমে গিয়েছিল। সিতিকণ্ঠের বিয়ের পর আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে তাকে প্রায়ই দেখতাম।

বড় জ্যাঠামশাই চলে গেলে দাদু তাঁর উইল পালটালেন। তাঁর পেচ্ছাপের অসুখটা রয়েই গেল। মাঝে মাঝে পা ফোলে, চোখের কোলে বাড়তি মাংসের ডেলা দেখা যায়, মুখে রস জমে গাল আর থুতনি ভারী হয়ে থাকে। পুবমুখো ইজিচেয়ারে বসে তিনি সামনে বাগান, তার ও-পারে ব্রহ্মপুত্র এবং ও-পারে এক অনির্দিষ্ট দৃশ্যহীন শূন্যতাকে দেখেন। নিবারণ জ্যাঠামশাই এসে মাঝে মাঝে তাঁকে গীতার ব্যাখ্যা শোনান। কিন্তু তার দরকার ছিল না। দাদু নিজে কুমারনাথের গীতা প্রায় মুখস্থ বলতে পারতেন। তবু তিনি গম্ভীরভাবে শোনেন। কখনও কখনও বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমার সংস্কৃত উচ্চারণ হয় না নিবারণ, কী সব পড়ো! দন্ত্য স তালব্য শ একরকম শোনায়! আর ও-রকম পাঁচালির সুরে কেউ গীতা পড়ে নাকি!

লজ্জা পেয়ে নিবারণ জ্যাঠা সাধ্যমতো প্রাণপণে পড়বার চেষ্টা করেন। তাঁর থুথু ছিটকোতে থাকে, কষে ফেনা জমে ওঠে। দুঃসাধ্য সংস্কৃত তাঁকে ঘামিয়ে তোলে।

ঠিক সেই সময়ে কখনও-সখনও দেখা যায়, সিতিকণ্ঠের বেজি বাড়িতে অনাদর বলে চলে এসে দাদুর ইজিচেয়ারের নীচে চুপ করে বসে আছে। তার ধূসর শরীর থেকে বিষণ্ণতা ঝরে পড়ছে। দাদু গম্ভীরভাবে গীতা শুনতে শুনতে হঠাৎ বাতাস শুঁকে সোজা হয়ে বসেন, হুঃ, কেমন যেন ভামের গন্ধ পাই! ও সুদর্শন, দ্যাখ তো হাঁসের ঘরটা—পোয়ালের নীচে-টিচে দ্যাখ—ভাম এল নাকি। গোয়ালঘরটাও দেখিস—হ্যাঁ, তারপর পড়ো হে নিবারণ—

অর্জুন কৃষ্ণকে দুই সেনাদলের মাঝখানে রথ স্থাপন করতে বলছেন। বলছেন, দেখি আমার শত্রুরা কীভাবে অবস্থান করছে, এবং কারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়...

সিতিকণ্ঠের বেজি দাদুর পায়ে গা ঘষে। দাদু চেঁচিয়ে ওঠেন, দ্যাখ তো কী এটা। আরে এ কি সিতিকণ্ঠের বেজিটা নাকি।

রাখাল লাঠি হাতে ছুটে আসে, দাদু হাত তুলে বলেন, মারিস না, মারিস না। ও কিছু করেনি, থাক, বসে আছে।

দাদুর মায়াদয়া বড় বেড়ে গেছে আজকাল। ঘুম কমে গেছে অনেক। প্রায় সারা রাত তাঁর তামাক খাওয়ার শব্দ হতে থাকে। শীতকালে শেষ রাতে উঠে তিনি গলায় মোটা কম্ফর্টার জড়িয়ে নেন, পায়ে পরেন ফুল-মোজা, মাথায় বাঁদুরে টুপি, গায়ে ভাল মতো এন্ডির চাদর জড়ান। পশ্চিমের ঘরের দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে সেই ভোররাত্রে ডাকাডাকি করেন, ভাই রে, ওঠ—উঠবি না?

আমি উঠে পড়ি। শীতের পোশাক বলতে একটা পুরনো ফুলহাতা সোয়েটার—গত বছর রাখালের গায়ে ছোট হওয়াতে আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। আর পায়ে শক্ত চামড়ার ফিতেওয়ালা জুতো। দাদুর সঙ্গে বাগানে আসি। হিম, নিঃসাড় চারধার, কুয়াশায় ঝিম মেরে আছে। কপি পাতার পরতে পরতে জমে থাকে শিশিরের জল, কুয়াশার হিম। কাছারিঘরের বারান্দা থেকে মাখনকাকার শেষ রাতের কাশির শব্দ আসে। কাকা একা একা বালির বস্তায় একনাগাড়ে গুপ গুপ করে ঘুষি মারছেন— শোনা যায়। একটা আষাঢ়ে শালিখ পুষেছিল রাখাল। পুবের ঘরের বারান্দায় ঝুলন্ত খাঁচা থেকে সে অস্পষ্ট হরিনাম শোনায়। সেই সময়ে সিতিকণ্ঠের ঘুমন্ত বাড়ির উঠোন পেরিয়ে আমাদের বাগানের ভিতরে ঢুকে আসে বেজিটা। কপি খেতের আল পেরিয়ে যায় তুর-তুর করে, মাটিতে আঁচড় কাটে, ঘুরে-ফিরে চক্কর দেয় আমাদের আশেপাশে। দাদু সস্নেহে চেয়ে দেখেন।

বাগানে সত্যিই কোনও কাজ থাকে না। দাদু খামোখা আগাছা তোলেন। মাটি খুঁড়ে উলটে দেন। ফলন্ত গাছগুলির দিকে চেয়ে কখনও চুপ করে বসে থাকেন। তাঁর চোখে-মুখে অপার মায়া ঝরে পড়ে। ভূমি, অর্থ এবং সন্তান—এই তিন নিয়ে পুরুষের অধিকারবোধ, আর প্রায়ই এই তিনই তার দুঃখের কারণ। সুখবোধ মিশ্রিত নানা দুঃখ ছিল তাঁর, ছিল অন্যমনস্কতা—দু'হাতের আঙুল নরম মাটিতে ডুবিয়ে তিনি হয়তো আহরণ করতে চাইতেন আরও জীবনীশক্তি, যাতে কৃত সমস্ত ভুল কর্মগুলির সংশোধন করে যেতে পারেন। কিংবা হয়তো গভীর অন্যমনস্কতায় তিনি ডুবে থাকতেন আর-একটি পুনর্জীবনের চিন্তায়—যে-জীবন বাগানের গাছপালার মতোই নিস্পৃহ, সিতিকণ্ঠের বেজিটার মতোই বিবাগী ও উদাসীন।

মাখনকাকা একটা সবুজ র‍্যাপার জড়িয়ে রোদে এসে বসেন। তাঁর গা সাদা দেখায়, মুখে খড়ি ওঠে। শীর্ণ হাত দিয়ে মাঝে মাঝে চুলের জট ছাড়ান। বড় তীব্র হয়ে গেছে তাঁর চোখের দৃষ্টি। ছুঁচের মতো এসে গায়ে বেঁধে। এখন তাঁকে পুরোপুরি যক্ষ্মারোগীর মতো দেখায়। সর্বেশ্বরকে ডেকে বলেন, খুড়োমশাই, কাল রাতে বাবা এসেছিল। বুকে বড় ব্যথা হয় ক'দিন—ধনেশ পাখির তেলে বড় উপকার। তা সে আর কোথায় পাব, একটু পুরনো ঘি এনেছিলাম, তাই নিজে নিজে মালিশ করি। ভাল পারি না। রাতে কাশতে গেলে বুক ছিঁড়ে যায়, সাঁই সাঁই করে হাঁপির টানের মতো টান ওঠে। বড় কষ্ট। কাল রাতে দম বন্ধ হয়ে এল প্রায়। তেল নেই বলে হ্যারিকেন নিভে গেছে, অন্ধকারে সে কী কষ্ট! অজ্ঞান হয়ে যাই আর কী! কেমন একটু আচ্ছন্নতার মতো এল, সেই সময়ে দেখি, বাবা ঢুকলেন ঝাঁপ ঠেলে। ধপধপ করছে পৈতেখানা। নুদি-ভুঁড়িতে পিছল-পিছল গা, কাছে এসে ঝুঁকে বললেন, কোথায় ব্যথা? এইখানে? বলে বুকের মাঝখানটিতে ঠান্ডা নরম হাত রাখলেন। কোথায় গেল ব্যথা আর কাশি। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেন, আজ আর জ্বরটা নেই, তাই ভাবছিলাম দুটি ভাত খেলে কেমন হয়। দুধ পাঁউরুটি আর গিলতে পারি না—বমি এসে যায়।

সেবার খোস-পাঁচড়ায় গা ভরে উঠল। মুখ আর বুক বাদে সর্বত্র টোপাটোপা হয়ে ফুলে ওঠে হলুদ গোটা। লেবু কাঁটা দিয়ে গেলে দিই, চাপড়া ঘা হয়ে ওঠে। হাত-পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে, কুঁচকিতে, পিছনে। ভারী জামা-প্যান্ট গায়ে রাখা যায় না, মায়ের পুরনো শাড়ির ছেঁড়া অংশ কোমরে জড়িয়ে থাকি। পুঁজে-রক্তে গায়ে আটকে থাকে কাপড়, ছাড়াতে গেলে ব্যথায় ককিয়ে উঠি। সিদ্ধেশ্বর কম্পাউন্ডার গন্ধকের মলম লাগিয়ে দেয়। ঘি মাখা ভাত খাইয়ে দেয় মা। উচ্চিংড়ের মতো উবু হয়ে

বসে খাই। বগলের ঘায়ের জন্য দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে হাঁটি, খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তুলারানী একা-একা দাওয়ায় বসে গুটি খেলে, অবাক চোখে আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলে, ঠিক ব্যাঙের মতো দেখায় গো তোমাকে ও কুকুভাই। গণাদা কাছে আসে না। দূর থেকে আমার মতো হাত-পায়ের ভঙ্গি করে ভ্যাঙায়, পাঁচড়ার খোসা খুঁটে হাতে নিয়ে তাকে তাড়া করি। বারবাড়ি পর্যন্ত যাই বড়জোর। দেখি, রেজ্জাক গাড়োয়ান তার রোগা ঘোড়া দু'টোকে ধোপাদের মাঠে ছেড়ে দিয়ে গেছে। রাখাল দড়ির লাগাম বেঁধে উঠে বসেছে একটা ঘোড়ার পিঠে, বলছে, হ্যাট হ্যাট। ঘোড়া নির্বিকার ঘাস খাচ্ছে। বলি, আমাকে এক বার চড়াবি রাখাল ভাই, আমি ভাল হয়ে গেলে!

রাখাল চেঁচিয়ে হাসে, কুকু কেমন করে হাঁটে রে!

তুলারানী তার থোপা থোপা চুল নেড়ে ছুটে আসে, বলে, এইরকম ভাবে—বলে আঁকাবাঁকা হয়ে হেঁটে দেখায়। লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে আসি।

পাঁচড়ার শেষ ঘা শুকিয়ে আসে। দুপুরে একা-একা বেরোই। হাতে মাছমারা ট্যাঁটা থেকে ভেঙে নেওয়া একটা শলা। সামনে লোহার ফলা লাগানো। মিত্তিরদের ভিটের ভাঙা ইটের স্তূপ পার হই। চার দিকে জঙ্গল বেড়ে গেছে। বিছুটি বন হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। সেই নিস্তব্ধ গলিতে দেয়ালের অনেক গভীরে শিকড় ডুবিয়ে দিয়েছে অশ্বত্থের গাছ। শান ফেটে উঠে আসছে ঘাসের গোছ। গলির বাইরে ক্ষুরের ধারের মতো রোদ পড়ে আছে। দুপুরের রোদ খাড়া হয়ে নামে গলির মধ্যে। ইটের খাঁজে খাঁজে ছায়া জমে। স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল আর মেঝে থেকে ভাপ উঠতে থাকে। ইকড়ি-মিকড়ি ছায়ায় বসে থাকি। ঝুরঝুর করে বালি আর সুরকি ঝরে পড়ে। দেয়ালের মাথায় দূর থেকে লাফাতে লাফাতে একটা কাক কাছে আসে, ঘাড় ফিরিয়ে মনোযোগ দিয়ে আমাকে দেখে প্রশ্ন করে—ক্কঃ? ট্যাঁটার শলা দিয়ে মেঝেতে সাদা দাগে নাম লিখি—কুকু—কুকু—কুকু। যদি দুর্গম বিছুটি বন আর ইটের পাঁজায় সাপের বাসা পার হয়ে কেউ কখনও এখানে আসে, দেখবে— তার ঢের আগে এই জায়গা কুকু আবিষ্কার করে গেছে।

হাতে ট্যাঁটার ভাঙা শলা এখানে-ওখানে ঠুকতে ঠুকতে মিত্তিরদের পোড়ো বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরি। একা একা কথা বলি। কল্পনায় চলে যাই এক সুখী পরিবারের ছায়াচ্ছন্ন, শান্ত অন্দরমহলে। ভাঙা ইট কাঠের স্তূপে চড়াই উতরাই পার হই। রূপবান দুপুরের আলোছায়াময় ঐশ্বর্য ভাঙা খিলান-গম্বুজে থরে থরে জমে থাকে। হঠাৎ দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড আর্চ-এর মতো জানালার চৌকাটে পা দিয়ে সামনেই নীল জল দেখতে পাই। জমিদারদের বিশাল পুকুর। প্রকাণ্ড ঘাটে আজ লোকজন নেই। জমিদারদের দারোয়ান জগা সিং লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্নানার্থীরা সরে যাচ্ছে দূর দিয়ে। ভয়ে ভয়ে আঘাটায় নেমে এক-দুই ডুব দিয়ে উঠে যাচ্ছে। কয়েকজন কৌতূহলী ছেলে-বউ এধারে-ওধারে দাঁড়িয়ে আছে। জমিদারবাড়ির কেউ স্নানে আসবে আজ। কৌতূহলে দাঁড়িয়ে থাকি। জানি, আজ আমি রাখী আর পাখিকে দেখতে পাব।

তারা আসতে বড় দেরি করে। শূন্য ঘাট আর সাদা সিঁড়ি তাদের অপেক্ষায় পড়ে থাকে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি মিত্তিরদের ভাঙা জানালায়। বুক দুরদুর করে কাঁপে। বছরে এক বার কি দু'বার সেই সুসময়, যখন রাখী আর পাখি কলকাতার ডায়োসেসান স্কুল থেকে বাড়ি আসে। কয়েক পলক তাদের দেখি। অন্তরের গভীরে অন্যমনে আবার অপেক্ষা করি সারা বছর তাদের জন্য। তারা তা জানে না।

হঠাৎ বুক চলকে সারা শরীরে রক্ত ঝরে যায়। শ্বেত পাথরের মতো সাদা ঘাটের প্রথম পৈঠায় তারা এসে দাঁড়ায়। মেমছাঁট ফ্রক পরনে, মোমমাজা সাদা গা, পায়ে চটি। কাঁধে সাদা—খুব সাদা, নরম টার্কিশ তোয়ালে। কী রকম বিলিতি পুতুলের মতো অবিশ্বাস্য সুন্দর দেখায় তাদের। পৃথিবীর কোনও মানুষ তাদের ছুঁতেও পারে না। অহংকারে তাদের ছিপছিপে শরীর হেলে দোলে। তারা হাঁটে না। যেন ভেসে ভেসে সিঁড়ির ওপর দিয়ে নেমে যায় নীল জলের কাছে। জলে পা রেখে শীতে কুঁকড়ে উঠে হাসে, বুকের ওপর জড়ো করে হাত। তাদের ঝি সাবানের বাক্স হাতে সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি, নীল জলে তাদের শরীর ডিঙি নৌকোর মতো জল কেটে এগোয়। অমন সাঁতারও আমরা কেউ জানি না।

আমাদের কুয়োতলায় শানের ফাটলে জমে-থাকা জলে মাঝে মাঝে শালিখ স্নান করে যায়। তারা চলে গেলে দু'-একটা পালক বাতাসে ওড়ে, বুকের নরম সাদা তুলোর মতো রোমরাজি পড়ে থাকে।

ঠিক সেই রকমই রাখী পাখি স্নান করে গেলে বাতাসে খসে পড়া পালকের মতো সৌরভ থেকে যায়, থাকে স্মৃতি, রোমহর্ষ।

বিকেলের দিকে যখন মাঝে মাঝে পুকুরপাড় দিয়ে ঘরে ফিরে আসি তখন দেখি, অনাদিনাথ শেষ বেলার আলোয় বই খুলে বসেছেন তাঁর ঘরের দরজায়। আমি কাছে যাই না। দূর থেকে দেখি, তাঁর দীর্ঘ শরীর অনেক রোগা হয়ে গেছে। পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে আছে, সামনে ঝুঁকে অনেকটা বুড়োদের মতো তিনি বসে আছেন। তাঁর ঘরে যাওয়ার পথে আগাছা এখন নিবিড়। ঘরের বেড়ায় বুনো লতা বাইছে। দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে কাত হয়ে ঝুলছে জানালার ঝাঁপ। তাঁকে বড় গরিবের মতো দেখায়।

এক দিন গণাদা আমাকে ডেকে বলে, এক জায়গায় গুপ্তধনের খোঁজে যাব আমি আর রাখাল— জানিস!

কৌতূহলে বলি, কোথায়?

গণাদা ফিসফিস করে বলে, বেশি দূর না। ওই পুকুরের ও-পাশে আমবাগানের ধারে মিত্তিরদের পোড়ো বাড়ি—সেইখানে। জমিদারদের খাজাঞ্চি গিরীন বলেছে, ওখানে মাটি খুঁড়লে এখনও বিস্তর সোনাদানা পাওয়া যাবে। সাপ আর ভূতের ভয়ে লোকে যায় না। আমি আর রাখাল যাব।

শুনে ভয়ংকর চমকে উঠি। বলি, যাঃ।

গণাদা বলে, যাব—দেখিস।

আমি উত্তর দিই না। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে সারা বছর আমি জ্বরে ভুগি, খোস পাঁচড়ায় আমার গা খসে পড়ে, আমার ইস্কুল নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, খেলা নেই। আমার কেবল আছে একটা গোপন জায়গা—যার কথা কেউ জানে না। কেন তোমরা সেখানে যাবে? কেন কেড়ে নেবে আমার সেই আশ্চর্য নির্জনতার খেলনা?

## ॥ এগারো ॥

পৃথিবীর আকাশ বাতাস কোনও ছবিই ধরে রাখে না।

নাকি রাখে!

রাখলে আমার সেই ছবিটি এক বার দেখতে বড় ইচ্ছে করে। একটি রোগা ছেলে কাকতাড়ুয়া সেজে বসে আছে। তার হাতে দড়িতে বাঁধা বাঁখারির ধনুক, পাটকাঠির তির। তিরের আগায় ছোট জং ধরা পেরেক কিংবা তার ঢোকানো। টিপ করতে বারণ নেই, কিন্তু পাখি-পাখালি ছাড়া আর কোনও দিকে ছোড়া বারণ। তার ঠাকুমা মাসকলাই কিংবা ডালের বড়ি রোদে দিয়ে তাকে বারান্দার ছায়ায় ওইভাবে বসিয়ে গেছে। সে বসে আছে সারা দিনমান। একা একা কথা বলছে নিজের সঙ্গে।

বয়স বাড়ে। তার নিজের বলা কত কথা হারিয়ে যায়। দু'-একটা মনে থাকে মাত্র। হাতে খেলার তির-ধনুক নিয়ে সে ভাবে আর ভাবে। পুবের কুয়োপাড়ের পেয়ারা গাছের নিচু ডালে নেমে আসে একটা রক্তচোষা। মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে থাকে। পায়ের ঘা থেকে চুমটি তুলতে নিচু হয়ে ছেলেটি তখন হঠাৎ ভাবছে, সে একদিন হবে পৃথিবীর সেরা লড়িয়ে। এক দিন সে তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের শেষ করে দেবে। সে কি রোগা থাকবে চিরকাল! থাকবে দলছুট! এবার সে কাছারিঘরের বারান্দায় রিঙে দোল খাবে, বালির বস্তায় ভোর রাতে উঠে ঘুষি চালাবে, তুলবে ওজন—যেমন কাকা করে। সে আর সহজে হাঁপিয়ে পড়বে না। লেঙ্গি মেরে ফেলবে পশ্চিমপাড়ার ডানপিটে ঝগড়ুকে—যার সঙ্গে তার বয়সি কেউ পারে না। বড় হয়ে এই সব কাণ্ড করবে কুকু। ভীষণ কাণ্ড করবে। চোখ তুলে হঠাৎ সে চমকে দেখে তার মুখের দিকে স্থির চেয়ে আছে রক্তচোষা—মুহুর্মুহু রং পালটাচ্ছে, চোখ পিটপিট করছে। ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে কুকু, চেঁচিয়ে ঠাকুমাকে ডাকে, তার হাত থেকে ধনুক খসে পড়ে। এতক্ষণ তার অন্যমনস্কতায় যে-সব শালিখ এসে খুঁটে খাচ্ছিল কলাইয়ের দানা, তার চিৎকারে এবারে তারা ওড়ে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়,

রক্তচোষার পেটটা ওই যে হঠাৎ লাল হয়ে যাচ্ছে—ওটা তারই রক্তে। সে দুর্বল বোধ করে। অসহায় আর্ত বোধ করে নিজেকে। সে তার রক্তপাতের এবং রক্তচোষার শোষণের কাল্পনিক শব্দ শোনে।

ঠাকুমা এসে তার ধনুক কেড়ে নেয়। পিঠে সেই ধনুকেরই দু'-একটা ঘা দিয়ে বলে, রক্তচোষা তোর রক্ত খাচ্ছে। আর ও দিকে মাসকলাই নিয়ে যাচ্ছে শালিক—সে দিকে খেয়াল নেই! দেখ কী রকম ছিটিয়ে গেছে—হাঁ-করা ছেলে।

ঠিক সেই সময়ে তুলারানী গুটি গুটি এসে বসে দক্ষিণের খালি বারান্দায়। রুখু চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে চুলকোয়। উকুন এনে ছোট, কচি হাতের নখে পুট করে মারে। পাকা মুখ করে বলে, ইস, দেখো কী রকম মাছের ডিমের মতো লিক হয়েছে মাথায়।

কুকু কান্না ভুলে চেয়ে থাকে।

সেবার শীতকালে আমাদের গোয়ালঘরের চালের ওপর লকলকিয়ে উঠল কচি, সবুজ লাউডগা। পদ্মের পাপড়ির মতো প্রকাণ্ড পাতাগুলো উত্তুরে হাওয়ায় দোল খায়। দাদু সকালের রোদে চোখ মিটমিট করে দেখে বললেন, গাছটার বড্ড বাড়ন হয়েছে, ফলন ভাল হবে না। ডগাগুলো কেটে দিতে হবে। ওরে সুদর্শন—

নিচু চাল। চাল ঘেঁষে একটা গুলঞ্চ ফুলের গাছ। অনায়াসে গাছ বেয়ে চালে ওঠা যায়। আমি কখনও গাছ বাই না, চালে উঠি না, শক্ত কাজ কিছুই করতে পারি না। কাকতাড়ুয়া সেজে যখন বসে থাকি, তখনও আমার অন্যমনস্ক চোখের সামনে শালিখেরা কলাই খুঁটে খেয়ে যায়। তাই বড় লোভ হয় এক বার চালে উঠতে। দাদুর কাছ ঘেঁষে বলি, আমি উঠি দাদু।

দাদু ভ্রূ কুঁচকে দেখেন আমাকে, তুমি কি পারবে? যদি মাথা ঘুরে পড়ে যাও?

এইটুকু নিচু চাল তো! পড়ব না। আমার তো সাত দিন জ্বর আসেনি!

ওঠো তবে। সাবধানে উঠো। আস্তে আস্তে সবই অভ্যেস করো। কেউ তো বসিয়ে খাওয়াবে না।

চালে উঠেই আলাদা জগতে চলে আসি। নিচু একচালা, তবু মনে হয় কত উঁচুতে যে উঠেছি! কত উঁচু! দূরে ব্রহ্মপুত্র দেখা যায়, প্রবর্তক স্কুলের ইটের দেয়াল, কদমগাছের তলায় দু'-তিনজন ভবঘুরে বসে আছে, রজব আলি চটের থলি আর হেঁসো নিয়ে ঘাস কাটতে নেমেছে ধোপাদের নাবাল মাঠে, ওই দেখা যায় বড় পুকুরের নীল জল যেখানে রাখী-পাখিদের গায়ের সুগন্ধ আজও রয়ে গেছে, জমিদার বাড়ির উঁচু দেয়ালের ও-পাশে দেখা যাচ্ছে তাদের অন্দরমহলের একটু অংশ—একটা চওড়া বারান্দা, তাতে মোটা মোটা থাম, বড় বড় জানালায় গোলাপি পরদা। পরাত সাজিয়ে তরকারি কুটতে বসেছে তিনজন দাসী। কত দূর পৃথিবীকে দেখা যায় গোয়ালঘরের চাল থেকে। উঁচুতে ওঠার তীব্র আনন্দে আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখি। হাওয়া দেয়। লাউপাতার রোঁয়া পায়ে লাগে। এমন চমকে উঠি! এক ধরনের রোমাঞ্চকর শীতে শিউরে ওঠে গা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, এক অদ্ভুত অচেনা জগতে দাঁড়িয়ে আছি। লাউডগার বনে—চারধারে অপার্থিব মায়াবী সবুজ। আমার বুক সমান উঁচু সব পাতা বাতাসে দোলে। চালের ওপর কত শিশি, কৌটো, ন্যাকড়ার পুঁটুলি পড়ে আছে! এক আঁটি খড় বর্ষায় পচে কালো হয়ে আছে। একটা শ্যাওলাধরা ভাঙা কলসি। কালির দোয়াত, বাঁশের টুকরো। মনে হয়, কী ঐশ্বর্য ছড়ানো চারিদিকে! আনন্দে দু'হাত তুলে নাচতে ইচ্ছে করে। চোখ বুজে আমি এক প্রকাণ্ড অরণ্যে একাকী গভীর চলার মধ্যে ডুবে গেছি।

ঠিক দুপুরবেলায় মাঝে মাঝে ঘরে শুয়ে শুনি, সাপওয়ালার ভেঁপু বাজতে বাজতে দূরে চলে যাচ্ছে। শুনি, বাঁদর নাচের ডুগডুগির আওয়াজ। বারবাড়িতে ছুটে যাই। দেখি, বাঁদরওয়ালার পরনে একশো রঙের একশো তালি দেওয়া জোব্বা, লাল নীল জামা গায়ে, গলায় ঝুমঝুমিওলা দু'টো বাঁদর পিটির পিটির চায়। বাঁদরওয়ালার শীর্ণ পা দু'খানা রাঙা ধুলোয় মাখা। সে বসে আমাদের কদমতলায়। মাথার গামছা খুলে মুখ মোছে। বাঁদরের দড়ি দু'গাছা কোমরে জড়িয়ে বসে বসে ঘুমোয়। জেগে থাকে তার দু'টি দুঃখী বাঁদর। রাখাল আর গণনাথ তাদের ঢিল ছুড়ে মারে। তারা লাফায়, কাঁদে, বকে। সিতিকণ্ঠের বাঁদরটাকে যদি পেতাম তবে আমি ঠিক হতাম ও রকম এক ঘরছাড়া বাঁদরওয়ালা। পায়ে রাঙা ধুলো মেখে চলে যেতাম দেশ-দেশান্তর।

এক দিন গণাদা বলল, সিটে চড়া যদি শিখতে হয় তো সিতিকাকার সাইকেলে, ওর সিটটা সবচেয়ে নিচু। কুকু, সাইকেলটা এক বার চেয়ে আনবি?

দূর! দেবে না।

তোকে দেবে। তুই ওর বিয়েতে যে নিতবর ছিলি!

সাইকেল চাইতে দুপুরে সিতিকণ্ঠের বাড়িতে গিয়ে নিঝুম উঠোনটায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হয়, এ-জায়গায় অসুখী লোকেরা বাস করে এখন। সুখী সিতিকণ্ঠ নয়। বাঁদরটার কিচিমিচি নেই, বেজিটার ঘোরাফেরা নেই। উঠোনে কয়েকটা রঙিন শাড়ি রোদে ঝলসায়। উঠোনের আনাচে-কানাচে জঙ্গল জমেছে, পুরনো হয়ে গেছে ঘরের বেড়া। টিনের বেড়ার গায়ে গোবরের চাপড়ায় লাগানো কড়িগুলো খসে গেছে। সিতিকণ্ঠের মায়ের গলার স্বর আর শোনা যায় না। সিতিকণ্ঠের ঘরের দরজা আগে বরাবর খোলা থাকত, বাইরে থেকেই দেখা যেত তাঁর বিছানার শৌখিন চাদর আর বাবু-বালিশের ভেলভেটের ঝালর। আমরা কাউকে জিজ্ঞেস না করে কত বার তাঁর ঘরে ঢুকেছি! এখন দেখি, তাঁর দরজায় খিল। বারান্দায় সিতিকণ্ঠের সাইকেল থামের সঙ্গে অবহেলায় ঠেস-দেওয়া পড়ে আছে। সেই সুন্দর নীল রং আর চেনা যায় না। ধুলোয় মলিন দেখায় সাইকেলটাকে। জায়গায় জায়গায় রং চটে গেছে, চামড়ার সিটটা ফুটিফাটা হয়ে ফেটেছে।

ভয়ে ভয়ে সিতিকণ্ঠের জানালায় উঁকি দিই। দেখি, সিতিকণ্ঠ বেড়ার দিকে মুখ করে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছেন—দ-এর মতো ভেঙেছে শরীর। তাঁর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছেন কাকিমা। শরীরটা ছেড়ে-দেওয়া, চোখের ওপর চাপা ডান হাত, শাড়ির লম্বা আঁচল মেঝেয় গড়াচ্ছে। তাঁদের দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি চলছে টক-টক, টক-টক।

কে রে!

চমকে উঠে দেখি, কাকিমা চেয়ে আছেন। অবাক, বিরক্ত চোখ।

এই, সিতিকাকার সাইকেলটা—

সিতিকণ্ঠ হাই তুলে পাশ ফেরেন। তাঁর চোখে একতিল ঘুমের আভাস নেই।

কে রে! কুকু নাকি তুই?

হুঁ।

সাইকেল নিবি? নিয়ে যা, ওই তো বারান্দায় আছে। চাবি ওর গায়েই লাগানো আছে, খুলে নে।

যখন সাইকেল নামাচ্ছি তখন ঘর থেকে তাঁর উদাসীন গলা শুনি, সাবধানে চড়িস। ভাঙিস না যেন!

তারপর সারা দিন কাছারির মাঠে আমি আর গণাদা সিতিকণ্ঠের সাইকেল দাবড়াই। সিটে উঠতে গিয়ে কত বার সাইকেলটা আছাড় খায়। উদাসীন সিতিকণ্ঠ উঠে এসে এক বার দেখেনও না। কেবল শেষ দুপুরে দোকানে যাওয়ার সময়ে আমাদের কাছ থেকে সাইকেল চেয়ে নিয়ে যান। দেখি, সিতিকণ্ঠের দাড়ি কামানো থাকে না আজকাল। জামার কলার উল্টে থাকে। প্রায়ই আধময়লা পোশাকে তাঁকে যেতে দেখি।

খুব সুন্দর মানুষেরা কি কখনও তেমন সুখী হয় না!

রাখালের আষাঢ়ে শালিখটা হরিনাম করে, মাখনকাকা বারান্দায় উবু হয়ে বসে উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। তাঁর জীবনে আর কোনও সুদিন বা সুসময় আসে না। হয়তো আর আসবেও না। একটা বিড়ির জন্য মাঝে মাঝে বড় উতলা হন তিনি, কিন্তু খাওয়া বারণ বলে কেউ এনে দেয় না। সকালে দাদুর যে-সব মক্কেল আসে তারা বারান্দায় বসে লুকিয়ে চুরিয়ে হাতের তালুতে ঢেকে বিড়ি টানে, মাখনকাকার চোখ-জোড়া তাই দেখে নিষ্পলক হয়ে যায়। কখনও-সখনও সর্বেশ্বরের আধ-খাওয়া বিড়ি হাতে পায়ে ধরে চেয়ে নেন। টানতে টানতে চোখ আরামে বুজে আসে। বাদবাকি সময় তাঁর ঘরের ঝাঁপ বন্ধ থাকে। যখন উত্তুরে হাওয়া দেয় তখনই আষাঢ়ে শালিখটা হরিনাম করে, আর তাই শুনে মাখনকাকা বেরিয়ে এসে বারান্দার ধারটিতে বসেন। আপনমনে বলেন, বাঃ, বেশ শিখেছে তো ব্যাটা! অ্যাঁ! ওটা কি ময়না নাকি রে কুকু? মরন্ত মানুষকে হরিনাম শোনাচ্ছে—ওর বড় ভাগ্য।

আঁতুড়ঘরটা মাঝখানে অনেক দিন ফাঁকা গেল। শীতের শেষ দিকে এক দিন ঠাকুমা লোক লাগিয়ে

সেটা পরিষ্কার করালেন। রোজ সন্ধ্যাবেলায় সেখানে সাঁজাল দেওয়া হতে লাগল। রোজ সকালে মাটি দিয়ে লেপে দেওয়া হতে লাগল তার ভিত।

এক দিন শুতে এসে মা আস্তে আস্তে কোঁকাতে লাগল। ঘুম ভেঙে সেই শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে উঠে বলি, মাগো, কী হয়েছে তোমার?

মা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, চেঁচাস না, শ্বশুরমশাই, মেজো ভাশুর সব এখনও জাগা। তুই যাবি একটু কুকু? মেজো জেঠিমাকে গিয়ে বল, মা একটু ডাকছে। চুপি চুপি বলিস, ভাশুরঠাকুর যেন শুনতে না পান।

খবর পেয়ে মেজো জেঠিমা এলেন, এলেন ঠাকুমা, নিবারণ জেঠিমা, সুনীতির মা।

জেঠিমা বলেন, এ সময়ে শুয়ে থাকতে নেই। উঠে হাঁটাচলা করো।

তারপর মাকে হাঁটিয়ে সবাই নিয়ে গেল দক্ষিণের ঘরের পিছনে দোচালা আঁতুড়ঘরে। একা ঘরে আমি জেগে রইলাম। মাঝে মাঝে মা'র ককিয়ে ওঠার শব্দ পাই। দেখি উঠোনের এধার থেকে ওধারে কে হ্যারিকেন হাতে ছুটে যাচ্ছে। মনে হয়, আমাদের বাড়িতে বড় বিপদ। হয়তো মা আর বাঁচবে না। একা ঘরে নানা অপার্থিব ছায়া পড়ে আছে। সেই দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই, শক্ত মুঠোয় ধরে থাকি জানালার শিক। আধা-ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। খোলা জানালা দিয়ে গারো পাহাড় ছুঁয়ে ধারালো বাতাস আসে আমার জামার ভিতরে গিয়ে বুক জাপটে ধরে। ভয়ে আর শীতে আমি কাঁপতে থাকি।

অনেক রাতে নিবারণ জ্যাঠা মন্ত্র পড়ে বাড়িবন্ধন করেন। খুব চেঁচিয়ে বলেন, ফটাস। সেই শব্দ যত দূর যায় তত দূর চোরেরা আসে না। সেই শব্দ শুনে বুঝতে পারি, রাত অনেক হয়েছে। গলায় মাফলার জড়িয়ে সাইকেল চেপে একটু আগেই আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ কুসুম ধাইকে ডেকে এনেছেন। তারপর বাড়িটা আস্তে আস্তে নিঝুম হয়ে আসে। শিশু-জন্ম এ-বাড়ির নিত্যকার ঘটনা, তাই কেউ গা করে না। কুসুমের হাতে মাকে ছেড়ে দিয়ে সবাই ঘুমোতে গেছে। আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, কী হয়েছে, ও ঠাকুমা!

ঠাকুমা বলেছে, কিচ্ছু না। তুমি শুয়ে পড়ো। ভয় পেয়ো না, মেজো জেঠি তোমার কাছে শোবে'খন।

কিন্তু তারপর সবাই আমার কথা ভুলে যায়। আমি জানালার গরাদে মাথা রাখি, তারপর খাটের বাজুতে, তারপরে ঢলে পড়ি বিছানায়। অনেক রাতে কখন মেজো জেঠিমা আসে, টের পাই না।

পরদিন সকালবেলায় ঘুম চোখে উঠে গিয়ে বোন দেখি, ইঁদুরছানার মতো লালচে, ন্যাকড়ায় জড়ানো, কাঠকয়লায় আংরা জ্বেলে তাকে সেঁকছে কুসুম ধাই। বোন হওয়ার জন্যই আমরা এতকাল আটকে ছিলাম ময়মনসিংহে! এবার আর-কিছু দিন পরেই আমরা সেই অচেনা জায়গা মাল জংশনে চলে যাব, বাবার কাছে।

অপেক্ষা করে থাকি। দিন গুনি। আমার ছোট বোনটার দৃষ্টি এল। তাকে তেল মাখিয়ে ছোট্ট খাটিয়ায় রোদে ফেলে রাখা হয়। আমি তাকে পাহারা দিই। সে আমাব মুখের দিকে চেয়ে আপনজনের মতো হাসে-কাঁদে। ছোট্ট দু'টি হাতে আমার আঙুল ধরে। কী অবিশ্বাস্য নরম আর অসহায় দেখায় তাকে!

আমি এক পাশে শুই, বোন অন্য পাশে, মাঝখানে মা। এক রাত্রে ছোট্ট বোনটি আমার গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। কাঁদল খুব কিন্তু চোট লাগল না। সুনীতির মা সকালে তকলিতে সুতো কাটতে কাটতে বলে, ওরা যখন পড়ে তখন মা ষষ্ঠী এসে ধরেন, তাই চোট লাগে না। আমার টুনু কি কম পড়েছে! প্রায় রাত্রেই পড়ে গিয়ে চেঁচাত —আর আমার যা ঘুম ছিল তখন—সারা দিন খাটাখাটুনির পর নিঃসাড়ে ঘুমোতাম।

উত্তরে সিতিকণ্ঠের বাড়ির দিক থেকে মাঝে মাঝে তক্ষক ডাকে। তাঁদের ঘরের পিছনে একটা সবজির খেত ছিল, সেটা আগাছায় ভরে গেছে। ঘাটের পথে ঘেঁটু আর ভাঁট গাছের জঙ্গল, ভাঙের গাছ গজিয়েছে তাঁদের ছেঁচ-বেড়ার গা ঘেঁষে। আগে কামলা ডেকে সিতিকণ্ঠ জঙ্গল পরিষ্কার করাতেন, খেত কুপিয়ে দিতেন, সিতিকণ্ঠের মা সেখানে লাগাতেন টক পালং, থানকুনি কিংবা আলু। এখন দেখি সিতিকণ্ঠের মা বড় জবুথবু হয়ে গেছেন, সারা দিন শুয়ে থাকেন, কখনও বা মুড়িসুড়ি দিয়ে এসে উঠোনের রোদে বসেন। শুনতে পাই তাঁর ছেলের বউ তাঁকে চেঁচিয়ে বকাবকি করছে। চার দিকের জঙ্গলে বাতাস শ্বাস ফেলে ঘোরে। সিতিকণ্ঠ কি এ-সব দেখেও দেখেন না! নাকি তাঁব সব উজ্জ্বলতা নিভে আসছে।

ভাঁট-ঘেঁটুর আড়ালে আবডালে, কলাঝোপের পিছন দিয়ে সুঁড়ি-পথে মাঝে মাঝে কাপ্তান কিষ্টাকে দেখি নিঃশব্দে যাতায়াত করতে। আগে তার চুলে তেল গড়িয়ে পড়ত, গড়ানো তেলে চকচক করত কালো কপাল, সে হাঁটত শিস দিতে দিতে। এখন তার যাতায়াত চোরের মতো সতর্ক। চার দিকে চেয়ে দেখে হাঁটে। আমার কাকা নগেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে খালি পায়ে, কাঁধে লাল গামছা ছড়িয়ে রেখে, দাঁতন করতে করতে বাগানের উত্তরের বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়ান। নতুন কাকিমা জানালার একটি পাট বন্ধ রেখে তার আড়াল থেকে কাকার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করেন।

সিতিকণ্ঠ এ-সব বোধ হয় টেরও পান না! নাকি পান! দেখি তাঁর শরীর রোগা হয়ে গেছে অনেক। মাথার সামনের চুল পাতলা হয়ে ফুরফুর করে হাওয়ায় ওড়ে। রংচটা সাইকেলে বিষণ্ণমুখে দোকানে যান তিনি। মাথা নোয়ানো, চোখে অন্যমনস্ক দৃষ্টি।

একসময়ে সিতিকণ্ঠের বউ নতুন কাকিমার বড় আদর ছিল আমাদের বাড়িতে। তাঁকে দেখেছি দুপুরে এসে ঠাকুমার পাকাচুল বাছতে, জেঠিমাদের সঙ্গে লুডো খেলতে, কিন্তু এখন আর তিনি আসেন না। তাঁকে নিয়ে কানাঘুষো হয় আমাদের বাড়িতে। ঠাকুমা দুঃখ করে বলেন, সিতিটাও তো পুরোপুরি পুরুষ না। আমাদের বাড়ির পুরুষ হলে জুতোপেটা করত দু'বেলা।

প্রবর্তক ইস্কুলের বাড়িটা শেষ হয়ে এল প্রায়। দেয়ালে পলেস্তারা পড়ছে এখন। জানালায়-দরজায় কপাট লাগানো হচ্ছে। দু'-একদিনের মধ্যেই চেয়ার-বেঞ্চি এসে পড়বে। কলকাতা থেকে আসছেন রাগী হেডমাস্টার। গণাদার খুব উৎসাহ, বলে, দেখিস কুকু, এই স্কুলে আমি ক্লাস সেভেন-এ ভরতি হব।

স্কুল বাড়িটার জন্য আমার দুঃখ। বিকেলের আলো যখন পড়ে আসে তখন ইস্কুলের নির্জন চাতালে সাদা ছোট্ট একটু কাপড় পেতে নীরবে নমাজ পড়ে রাজমিস্ত্রি রফিকুজ্জমান। সেই একাকী লোকটির দীর্ঘ ছায়ার দিকে চেয়ে থেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত লুকোনো মনোরম জায়গাগুলো আস্তে আস্তে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই স্কুলবাড়িটায় দুপুরে আমি রফিকের কাছে ভূতের গল্প শুনেছি কত! গা ছম-ছম করেছে। আর ঠিক সেখানে একশো ছেলের হল্লা হবে এক দিন।

মিত্তিরদের পোড়ো ভিটের সেই দু'খানা পুরনো দেয়ালের মাঝখানে আমার গোপন জায়গাটুকু— তার জন্যও আমার বড় ভয় করে। রাখাল আর গণাদা শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনের সন্ধানে যায়নি সেখানে। কিন্তু জানি ঠিক, এক দিন কেউ-না-কেউ আসবে। আসবেই। ভেঙে পড়বে পুরনো দেয়াল। আমি তাই ভৌতিক ছায়ার মতো সেই ভাঙা বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরি। এখানে সেখানে হাত রাখি। কথা বলি, দেয়াল, আমার পুরনো দেয়াল, যদি চলে যাই মাল জংশনে, আবার যেন ফিরে এসে তোমাদের দেখি। হুবহু ঠিক এই রকম থেকো তোমরা। আর কেউ যেন না আসে এখানে।

## ॥ বারো ॥

দক্ষিণের বাগানের বেড়া ভেঙে পুলিনের গোরু ঢুকে আমাদের চালকুমড়োর চারাগাছ খাচ্ছে দুপুরে। মেজো জ্যাঠামশাই ভারী বিরক্ত হয়ে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আমাকে ডেকে বললেন, যা তো কুকু, গণার সঙ্গে গিয়ে গোরুটাকে খোঁয়াড়ে দিয়ে আয়। খোঁয়াড়ে না দিলে ব্যাটারা গোরু ঠিকমতো বাঁধবে না।

জ্যাঠামশাই নিজে খাটো দড়ি দিয়ে গোরু বেঁধে দিলেন। আমি আর গণাদা চললাম গোরু খোঁয়াড়ে দিতে। অনেকটা দূরে খোঁয়াড। চারি দিকে উঁচু বেড়া একটা ঘুপচি ঘরে গোটাকয় ধূর্ত চেহারার লোক বসে আছে। আমরা যেতেই একটা ছোটখাটো, সবুজ লুঙ্গি আর ময়লা জামা-পরা লোক বিড়ি মুখে বেরিয়ে এল। একটিও কথা না বলে গোরুর দড়ি আমাদের হাত থেকে নিয়ে আগল ঠেলে গোরুটাকে ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। চলে আসছি, লোকটা ডেকে দু'আনা পয়সা দিল গণাদার হাতে। ভারী বেকুব বনে গেলাম আমরা। পয়সা কীসের! পয়সা কেন! পয়সা নিয়ে নানা দুশ্চিন্তায় একটু ভয় ভয় করছিল বটে, তবু কালীবাড়ির দোকান থেকে দু'জনে প্যাঁড়া কিনে খেলাম। বিকেলে ব্যাপার শুনে রাখাল বলল, তোদের ঠকিয়েছে। আসলে চার আনা রেট। আমি গেলে ঠিক তাই আনতাম।

পরদিন থেকে রোজ দুপুরে গণাদা এসে আমাকে ডাকত।

চল কুকু, গোরু ধরি।

প্রত্যেক দিন তো আর বাগানে গোরু ঢোকে না। আমরা তাই যেতাম ধোপাদের নাবাল মাঠটাতে। বিস্তর গোরু সেখানে খোঁটায় বাঁধা হয়ে চরত। দু'দিক থেকেই ইটের ঘা মেরে খোঁটা আলগা করত গণাদা। তারপর আমরা যেতাম খোঁয়াড়ে। সামনে দড়ি ধরে গণাদা, পিছনে একটা লাঠি হাতে গোরু তাড়া করতে করতে আমি। দু'আনার জায়গায় দরাদরি করে আমরা দশ পয়সা পর্যন্ত রেট তুলতে পেরেছিলাম। খোঁয়াড়ের লোকটা এক দিক থেকে ভালই ছিল। কোত্থেকে গোরু ধরে এনেছি তা জিজ্ঞেস করত না! যেন বা কম কথার মানুষ সে, এ-রকম গম্ভীরভাবে নীরবে পয়সা দিয়ে দিত। বড় রাস্তায় তার মুদির দোকান থেকে ললিত আমাদের দেখত, রোজ আমরা গোরু ধরে নিয়ে যাই। হেঁকে বলত, কী খোকা, খোঁয়াড়ে যাচ্ছ? বাগান খেয়েছিল নাকি!

গণাদা রেগে বলত, খেয়েছিল তো! তাতে তোমার কী?

এলাহাজুদ্দীনের গাভীন গাইটাকে ধরছি একদিন, গণাদা খোঁটা ওপড়াতেই গোরুটা ডাকতে ডাকতে ছুটছে। সেই ডাক শুনে এলাহাজ নদীর ঘাট থেকে উঠে এল। কাণ্ডটা দেখল খানিক দাঁড়িয়ে—আমরা তার গাভীন গোরুর খোঁটা উপড়িয়ে তার পিছনে ছুটছি। ডেকে বলল, কী খোকা, খোঁয়াড়ে দেবে নাকি! কী করেছে বলো তো! অবোধ জীব, কথা বলতে পারে না। গত সপ্তাহে এক বার খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়েছি—তা সে তোমাদেরই কাজ বোধ হয়! দাঁড়াও আজ এক বার যাব মোক্তারমশাইয়ের কাছে—

ভয় পেয়ে আমরা আর ধোপাদের মাঠ থেকে গোরু ধরতাম না। সেটা বড় রাস্তার ধারে, প্রকাশ্য জায়গা। নিরীহ নির্দোষ গোরুগুলোকে ধরে খোঁয়াড়ে দেওয়ার মতো সেই নিষ্ঠুর কাজে আমরা একটা নেশা পেয়েছি তখন। আমাদের কেউ খেলায় নেয় না, আমরা দলছুট—তাই গোরু ধরার মধ্যে একটা খেলা পেয়েছিলাম আমরা। আর ছিল লোভ। দক্ষিণের আমবাগানে, জেলেপাড়ার মাঠে, জমিদার বাড়ির পুবদিকে পড়ে-থাকা জমিতে, যেখানে একটা-দুটো ছাড়া গোরু চরে, আমরা সেখানে যাই। দৌড়াদৌড়ি করে গোরু ধরি। সিতিকণ্ঠের বাড়ির পিছন দিক দিয়ে পগারের গা ঘেঁষে, আঁকাবাকা পথে রেল স্টেশনের কাছ বরাবর গিয়ে উঠি। সেখানে আমাদের কেউ চেনে না। গোরু তাড়িয়ে দুই ভাই চলে যাই খোঁয়াড়ে।

ফেরার সময়ে কখনও-সখনও মেছোবাজারের পথ দিয়ে ফিরি। গলিঘুঁজিতে রাস্তাঘাট তেমন খেয়াল থাকে না। হঠাৎ হয়তো গণাদা দাঁড়িয়ে পড়ে মিটমিট করে হেসে বলে, বল তো এটা কাদের পাড়া!

দেয়ালির রাত্রে কুপির দাউ-দাউ জ্বলা মশাল-আলোয় যে জমজমাট মাইফেলি দৃশ্য দেখেছিলাম এ-গলির, দিনদুপুরে তার চিহ্নও নেই। চার দিকে সুমসাম্ নির্জনতা। রাস্তায় লোক চলাচল নেই। নিজেদের ঘরের দরজার সামনে সিঁড়িতে মেয়েরা বসে আছে। স্নানের পর তারা এলোচুল শুকোচ্ছে রোদে, কিংবা স্নানে যাবে বলে চুলের জট ছাড়াচ্ছে, মন দিয়ে আলতা পরছে পায়ে। গিন্নি ধরনে কালো-পেড়ে শাড়ি পরেছে, সিঁদুর ছুঁইয়েছে মাথায়, শরীর ছেড়ে বসেছে—যেমন দুপুরের আলস্যে বসে গৃহস্থের মেয়েরা। রাস্তার এ-ধার থেকে ও-ধারে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে তারা।

পাড়াটা চিনতে পেরে ভয় পেয়ে বলি, এ তো হারাণীদের পাড়া। চল গণাদা, ফিরে যাই। হারাণী দেখলে দাদুকে বলে দেবে—

দূর! তাই বলে কখনও? চল দেখতে দেখতে যাই।

আমি চোখ বুজে হাঁটি, দম বন্ধ করে রাখি। ক্রমে এসে পড়ি বাজারের রাস্তায়। রুক্মিণীর মিষ্টির দোকানে খুব ভিড়। আমাদের পয়সা কম বলে ঢুকি না। কাচের বাক্সে সাজানো বালুসাই, চমচম আর প্যাঁড়া দেখি কিছুক্ষণ। একটু এগিয়ে সিতিকণ্ঠের খেলার সরঞ্জামের দোকান। হকিস্টিক, ক্রিকেটের ব্যাট, ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটে বোঝাই হয়ে আছে দোকান। দড়িতে ঝুলছে হলুদ রঙের টি-শেপ ফুটবলের খোল। আমাদের পা আপনা থেকেই থেমে যায়।

গণাদা বলে, গোরু ধরার পয়সা যদি জমাই তো এক মাসে একটা দু'নম্বর ফুটবল কিনতে পাবি—না রে কুকু?

সিতিকাকাকে দাম জিজ্ঞেস করি?

কর না। তুই তো নিতবর ছিলি, তোকে কমে দেবে।

সিতিকণ্ঠ একজন মফস্‌সলি লোককে একটা কাপ বিক্রি করছেন। লোকটা কাপটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আর বলে, এ তো দস্তার জিনিস, ওপরটা এনামেল করা—রংফং চটে গেলেই আমাদের মুশকিল। একই কাপ বছর বছর দেওয়া হবে তো—

সিতিকণ্ঠ আমাকে দেখে চোখ ছোট করেন, কী চাস?

মফস্‌সলের খদ্দেরটা তক্ষুনি আবার জিজ্ঞেস করে, এর ওপরে বিনোদিনী চ্যালেঞ্জ কাপ কথাটা খোদাই করে দিতে পারবেন না?

খদ্দেরটি চলে গেলে সিতিকণ্ঠ নামানো কাপ গুছিয়ে আলমারিতে তোলেন।

একটা দু'নম্বর ফুটবলের দাম কত সিতিকাকা?

ফুটবল নিয়ে কী করবি? তুই তো বারো মাস ভুগিস। এক বছরেও সাইকেলের সিটে উঠতে পারলি না—

আমি সে-কথায় কান দিই না। বলি, আমাদের একটা ফুটবল কম দামে দিতে হবে কিন্তু।

সিতিকণ্ঠ বিষণ্ণ চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন, তারপর মিটমিট করে হাসেন, একটা ফুটবল তোকে এমনিতেই দিতে পারি, যদি একটা কাজ করিস।

কী কাজ?

কয়েকটা ছেলে আসে বল পাম্প করে নিয়ে যেতে। সিতিকণ্ঠ তাদের পাম্পার আর লেস ভরার যন্ত্র দেন। তারা বারান্দায় বসে বল পাম্প করে, হুসহাস শব্দে বলটা নিটোল হয়ে ফুলে ওঠে, টোকা দিলে টং টং শব্দ হয়। লোভে আমার গা শিরশির করে।

কী কাজ বলুন না সিতিকাকা, ঠিক করব।

সিতিকণ্ঠ হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলেন, রোজ দুপুরে গিয়ে আমার বাসাটা একটু পাহারা দিতে পারবি? বড্ড চোরের উৎপাত, সেদিন উঠোন থেকে তোর নতুন কাকিমার একটা শাড়ি নিয়ে গেছে, আমার একটা গেঞ্জিও। ও সময়টা তোর কাকিমা ঘুমোয় তো—কে দেখে তখন! আড়ালে আবডালে থেকে দেখবি, তোর কাকিমা যেন টের না পায়! পারবি না?

উৎসাহে বলি. পারব। আমি আর গণাদা আছি—

সিতিকণ্ঠ উদাস গলায় বলেন, দেখিস তো কেউ আসে-টাসে কি না দুপুরে! চেনা লোকরাই তো চুরি করে। চিনতে পারলে আমাকে নাম বলিস।

মাঝে মাঝে কিষ্টাকে দেখি তো!

সিতিকণ্ঠ খুব অবাক হন, কোন কিষ্টা? মেছোবাজারের?

বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর আস্তে শ্বাস ছেড়ে বলেন, আচ্ছা যা। ক'দিন পরে এসে বল নিয়ে যাস। কলকাতার চালানটা আসুক।

টি-শেপ্ নেব কিন্তু!

সিতিকণ্ঠ উদাস, সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার মতো গলায় বলেন, নিস।

অদূরেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। বারান্দায় উবু হয়ে বসে দুই হাঁটুর ভিতর দিয়ে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে কুঁজো হয়ে বসেছে বুড়ো অল্লু। প্রকাণ্ড কাঁচি রোগা হাতে ধরে কাপড় কাটছে। দোকানে কাকা নেই। সুরেশ একা বসে পেতলের গজকাঠি দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে। আমরা বারান্দায় লাফিয়ে উঠি। অল্লু মুখ তুলে তাকাল।

অল্লুচাচা, তুমি বলেছিলে কাঠের রিল দেবে। কই?

আমাদের রুমাল বানিয়ে দেবে বলেছিলে যে! আমাদের একটাও রুমাল নেই।

বুড়ো অল্লু চাঁদির চশমার ভিতর দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। আমাদের চিনতে পারে না ঠিকঠাক! বড় ভুলো মন তার। যত বার দেখা হয়, তত বার নিজেদের চেনাতে হয় তার কাছে। অথচ কত পুরনো দিনের গল্প তার মনে আছে!

একটু চেয়ে থেকে সে বলে, তোমরা নগেনবাবুর ভাইপো না!

আমি ভাগনে। বলে গণাদা।

বুড়ো অল্লু মাথা নাড়ে, ঠিক ঠিক। তোমার মাকে আমি এইটুকু দেখেছি।

আমার দিকে চেয়ে বলে, বীরেনবাবুর খবর কী? চিঠিপত্র পাও?

আমি সে-সব জানি না, শুনে অল্লু হাসে, বীরেনবাবু ভাল লোক ছিল, এই সুরেশটাই যত নষ্টের গোড়া। তা তোমার বাবা কাজ পেয়েছে শুনলাম—কোথায় যেন—সেখানে যাবে না?

শিগগিরই যাব। তার আগেই আমাকে রুমাল দিয়ো। আর পুন্নিদির পুতুলের কাপড়। ঠাকুমা তার রাধাশ্যাম আর পেতলের গোপালের জন্যে মশারি চেয়েছিল—দাওনি তো? ঠাকুরদের মশা কামড়ায় না?

অল্লু হাসে, তাই কামড়ায় যদি তো মশার পয়দা দিতে ঠাকুরকে কে বলেছিল? ঠাকুমাকে বোলো, দেব। আমি বুড়ো মানুষ তো—কেবল ভুলে যাই।

আমরা ঘন হয়ে বসি তার কাছে, বলি, তবে আমাদের সেই পঁচিশ মন ওজনের লাউয়ের গল্পটা বলো যেটা তোমাদের গাঁ থেকে শহরে নিতে তিনটে গোরুর গাড়ি লেগেছিল! সেটা কাটা হয়েছিল যেন কী দিয়ে?

অল্লু হাসে, করাতি ডেকে কাটানো হয়েছিল কিন্তু কেউ খেতে পারেনি—অত বড় লাউ তো, পেকে ঝানু হয়ে গিয়েছিল। অনেকে তার বিচি নিয়ে লাগিয়েছিল বাগানে, কিন্তু গাছ হয়নি। আমাদের গাঁয়ের মাটিই আলাদা।

আমাদের সেই নীলমণির গল্পটা শোনাও।

বুড়ো অল্লু মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে বলে, বড় গরিব ছিল নীলমণি। দিন চলত না, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। লোকে বলত, নীলমণি বড় ভক্ত। যদি কোনও লোক কখনও নীলমণিকে সাহায্য করত তো নীলমণি ধন্যবাদ দিত ভগবানকে। জমিদার এক দিন তাকে ডেকে বলল, তুমি বড় নেমকহারাম হে নীলমণি, মানুষের সাহায্য পাও, আর পেয়ে ভগবানের দয়ার কথা বলো। সেই শুনে কী আনন্দ নীলমণির। সে যে সত্যিই অমন নিমকহারাম হতে পেরেছে সেই জন্যই আনন্দ। তা সেই নীলমণি এক দিন দুপুরে খেটেখুটে ফিরেছে, বউ কাছে এসে বলল, কী কাণ্ড হচ্ছে জান গো! আমাদের পাশের বাড়ির পতিতপাবন সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে। নীলমণি বিরক্ত হয়ে বলল, ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না, তেল গামছা নিয়ে আয়, কিন্তু বউ চুপ করে না। রোজ দুপুরে নীলমণি ফিরলে বউ কাছে এসে চোখ বড় বড় করে ফিসফিস করে বলে, দ্যাখোগে কাণ্ড, ও-বাড়িতে কত সাধু সন্ন্যাসী এসেছে, যাগ-যজ্ঞ হোম হচ্ছে দিনরাত, কত গেরুয়া ছোপানো হচ্ছে, পতিতপাবন আর সাত দিন পরেই সন্ন্যাসী হবে যে গো! নীলমণি বিরক্ত হয়ে উঠে যায়। পরদিন আবার বউ বলে, তুমি তো বিশ্বাস করো না! দ্যাখোগে পতিতপাবনের বউ নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে, কুকুর বেড়ালটা পর্যন্ত মুসড়ে পড়ে আছে, পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে দেখতে! ভিন-গাঁ থেকে পর্যন্ত লোক আসছে। পতিতপাবন সব সম্পত্তি-টম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে ফেলেছে এর মধ্যেই। খড়ম কিনেছে, চিমটে, কমণ্ডলু, রুদ্রাক্ষের মালা, ঝোলা—কত কী? এরপরেও কি লোকটা সন্ন্যাসী হচ্ছে—এ তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না! নীলমণি বলে, ওইভাবে সন্ন্যাসী হয়! বউ অবাক হয়ে বলে, তবে কীভাবে হয়! নীলমণি রক্তচোখে চেয়ে বলে, দেখবি! বউ বলে, দেখব না কেন—কীভাবে হয়! নীলমণি গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খাচ্ছিল, থামিয়ে হাতের গামছা কাঁধে ফেলে বলে, এইভাবে হয়। বলে সেই যে বেরিয়ে গেল নীলমণি, আর ফিরলই না।

দোকানঘর থেকে সুরেশ বেরিয়ে এসে আমাদের ডাকে। ভিতরে নিয়ে গিয়ে নিচু চৌকিতে বসিয়ে বলে, অল্লুটার সঙ্গে অত কথা কী তোমাদের! মহাপাজি ও—বারান্দাটা খামোখা আটকে আছে, কত লোক এসে ভাড়া করতে চায় জায়গাটুকু। তা কী খাবে তোমরা, রুক্মিণীর দোকানের বালুসাই?

এই বলে ক্যাশবাক্স থেকে টাকা বের করে নিয়ে চলে যায় সুরেশ।

সুরেশের জন্য বড় দুঃখ হয়। শুনেছি, মুখের শ্বেতি ঢেকে বিয়ে করেছিল সে। বিয়ের পর যখন বউ তার শ্বেতি দেখতে পেল, তক্ষুনি চলে গেল বাপের বাড়ি। আর ফিরল না। এখন মুখের সাদা দাগ আরও অনেকটা ছড়িয়েছে সুরেশের। ঠোঁটে, গালে, গলায়, চোখের কোলে শ্বেত কাজলের মতো শ্বেতির দাগ দেখা যায়। এই সব নিয়ে দুঃখিত চিত্তে বাস করে সুরেশ।

বালুসাই খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, কাকা হঠাৎ করে এসে পড়বে না তো!

সুরেশ হাসে, কোথায় কাকা! কাকা কি আর এখন দেশে আছে। কোনও ভয় নেই।

যখন বেরিয়ে আসি, তখন বুড়ো অল্লু কাছে ডেকে বলে, তোমার দাদু মোক্তার মানুষ, ভেবেছিলাম বুঝি বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু তা মোটেই নয়! হলে কি কেউ এ-রকমভাবে হাতিপোষার মতো দোকান পোষে! আর ওই সুরেশ—ওটা কি মানুষ! বীরেনবাবুকে মাল সরানোর বুদ্ধি কে দিয়েছিল, জিজ্ঞেস করি!

রমজান বিরক্ত হয়ে বলে, তোমার অত কথায় কাজ কী বাজান! ওরা ছেলেমানুষ—

অল্লু থতিয়ে যায়। তারপর আমার হাতে একটা করে জিনিস দিয়ে বলে, এই নাও কাঠের রিল, আর ভাঙা ছুঁচ। এই পুন্নিদিদির পুতুলের কাপড়। ঠাকুমাকে বোলো, বিলিতি নেট দিয়ে মশারি করে দেব, তাতে আলগা ফ্রিল লাগিয়ে দেব। গঙ্গাজলে কেচে নিয়ে যেন ঠাকুরকে টাঙিয়ে দেন। মশারি বানিয়ে দিলে কিন্তু এক দিন গিয়ে পাটিসাপটা খেয়ে আসব। বলে রেখো—

আর রুমাল!

দেব, দেব।

কোণে নাম লিখে দিয়ো।

আচ্ছা।

বাড়িতে ফেরার পথে বড় রাস্তা থেকেই দেখতে পাই, আমাদের কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু বারবাড়িতে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অমনি আনন্দে ধক করে ওঠে বুকের ভিতরটা। নিশ্চয়ই দেশের বাড়ি থেকে লোক এসেছে। সঙ্গে এনেছে পিঠে-পুলি, পাটালিগুড়, খোয়া ক্ষীর, তক্তি আর নাড়ু। মন প্রত্যাশায় ভরে যায়, কেউ এলে। সেই কেউ যখন ফিরে যাবে আবার আমরা যাব স্টেশন পর্যন্ত, গাড়িতে তুলে দিতে। ফেরার সময়ে পকেটে আনি কি দু'আনি, কিংবা চাই কি আধুলিই নিয়ে ফিরে আসব। ঘোড়ার গাড়ি দেখে তাই বড় রাস্তা থেকেই আমি আর গণাদা ছুটতে থাকি।

দেখি, কিছু পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে আধ-ময়লা কাপড়-পরা একজন কালোমতো বউমানুষ ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে কাছারিঘরের বারান্দায় বসে আছে অসহায় মুখে, সঙ্গে গোটা দুই কালো কালো ছেলেমেয়ে। বউমানুষটির হাতে কেবল শাঁখা, আর কালো তাগায় বাঁধা একটি তাবিজ। তারা চার দিকে চাইছে, ভিতর-বাড়িতে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। তাদের দেখেই কেমন হতাশ হই। কেন যেন বুঝতে পারি, আমার অন্তর থেকেই কে যেন বলে দেয় যে, এদের কাছ থেকে কিছু নিতে নেই।

খোকা, এইটাই তো কালীমোক্তারের বাড়ি! তা এখানে একজন রুগি থাকে—তাঁর ক্ষয়কাশ—আমরা তাঁকে দেখতে এসেছি। তিনি কোথায় বলতে পারো?

মাখনকাকার বন্ধ ঝাঁপটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই, ওই তো। মাখনকাকাকে খুঁজছেন তো!

হ্যাঁ হ্যাঁ তিনি! বলে ঘরটার দিকে চেয়ে বউমানুষটি হায়-হায় করে, আ পোড়াকপাল! এই তবে ঘর! কিন্তু প্রতি চিঠিতেই লেখেন—এখানে কোনও অসুবিধা নাই। বেশ সুখে আছি। চিকিৎসা ভালই হইতেছে....! এ-ঘরে তো দেখছি আলো-বাতাস নেই! ও খোকা, একটু ডাকবে মানুষটাকে? ঘুমোচ্ছে টুমোচ্ছে বোধ হয়! তোমরা একটু দেখো না।

তখন বিকেলের দিক। মাখনকাকার জ্বর আসবার সময়। অনেক ডাকাডাকির পর তিনি বেরোলেন। মাথায় ফণা-ধরা রুক্ষ চুল, গালে বিজবিজ করে দাড়ি, গায়ের সবুজ র‍্যাপারটায় আলগা ময়লা লেগে আছে। বেরিয়ে এসে তিনি কিছুক্ষণ দেখলেন সেই রোগা দু'টি ছেলেমেয়ে আর বউমানুষটিকে। তারপর হঠাৎ কপালে হাত চেপে উবু হয়ে বসে পড়লেন। টসটস করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। শেষমেষ হাউ-হাউ শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

রাত্রে যথারীতি মাখনকাকার সেই ছেলেমেয়ে দু'টি রান্নাঘরে ভাত খেয়ে বড় ঘরের মেঝেতে ঢালাও বিছানায় শুতে গেল। সেই বিছানায় এখন জায়গা খালি পড়ে থাকে। শুতে বাধা নেই। আর মাখনকাকার বউ, সেই কালো রোগামতো বউমানুষটি অনেক রাত অবধি পা ঝুলিয়ে বসে রইল কাছারিঘরের বারান্দায়। ঘরে বিছানায় বসে মাখনকাকা। অনেক রাত অবধি তারা কথা বলতে লাগল চেঁচিয়ে। সে-শব্দ আমরা ভিতর-বাড়িতে বসেও শুনতে লাগলাম। সেই কথার মধ্যে অধিকাংশই ছিল সুপুরির

হিসেব, কলার হিসেব, বর্গাদারদের জোচ্চুরি—আরও কত কী! কত কথা বললেন তাঁরা। ভালবাসার কথা কিছু নয়, কেবলই বিষয়ের কথা। কে জানে, হয়তো সেই বিষয়ের কথাই ছিল তাঁদের ভালবাসার কথা। অন্য কোনও ভালবাসা তাঁরা জানেন না। অনেক অনেক রাত ধরে কথা চলল তাঁদের। কত কথা জমে ছিল যে। শুনে, ভিতর-বাড়িতে সবাই হাসল।

পরদিন পার্শ্বনাথ এসে মাখনকাকাকে দেখেটেখে বললেন, দেশের বাড়িতে যেতে চাচ্ছ যাও, বরং ওখানে ঘরেরটা খেয়ে-পরে ভালই থাকবে। সঙ্গতি হলে বরং এক বার কলকাতায় গিয়ে দেখিয়ো।

বড় খুশি হলেন মাখনকাকা। পরদিনই সকালে উঠে ক্ষৌরি হলেন, দুপুরে গন্ধলেবু আর পাতলা মুসুরির ডাল দিয়ে মেখে মাছভাজা দিয়ে ভাত খেলেন। তাঁর বউ সামনে বসে হাতপাখা নাড়লেন। শিশু ছেলেমেয়ে দু'টি বসে রইল কাছাকাছি। তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায় দীর্ঘ অদর্শনে বাপকে তারা ভুলে গিয়েছিল। সভয় দৃষ্টিতে আবার নতুন করে চিনে নিচ্ছে!

পরের দিন দুপুরের গাড়িতে তাঁরা যাবেন, কথা ছিল। ঘোড়ার গাড়িও ডাকা হয়েছিল সময় মতোই। কিন্তু মাখনকাকার জ্বর এল হুহু করে। তিনি বিছানায় আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন। পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বারান্দায় বসে ছিল তাঁর বউ। মাখনকাকার জ্বর আসায় তাকে খুব অসহায় দেখাল। খুব অনুনয় করে ঠাকুমাকে বলল, মাঐমা, আমি কি আর ক'টা দিন দেখে যাব? এ-যাত্রায় না হলে আবার কে এসে নেবে—ক্ষয়কাশ রুগি তো—কেউ সঙ্গে নিতে চায় না—

ঠাকুমা বললেন, থাকো না যত দিন খুশি। তোমরা তো আর পর নও।

কিন্তু মাখনকাকার যাওয়া হল না। তাঁর জ্বরটা একটানা থেকে গেল। কয়েক দিন পর তাঁর সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেই বিদায় নিল তাঁর বউ-ছেলেমেয়ে। দেশে তারা ফিরে না গেলে বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি হবে। মাখনকাকা আধচেতনায় দু'-একটা অস্পষ্ট কথা বলে তাদের বিদায় দিলেন। প্রবল চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঘোড়ার গাড়িতে উঠল তাঁর বউ। ঠিক তখনই মাখনকাকার আধ-ময়লা বালিশের ওয়াড়ে মুখের সামনে একটি তরতাজা লাল গোলাপ ফুটে উঠছে। অনেক দিন পর সেই রক্তপাত। ভাগ্যক্রমে একটুর জন্য তাঁর বউ সেটা দেখল না।

এরপর মাখনকাকা আবার বারান্দায় এসে বসেছেন কয়েক বার। শীর্ণ, খড়ি-ওঠা, সাদা মুখ, গভীর বসা চকচকে চোখ, তার কোলে গভীর মেঘের ছায়ার মতো কালো রং। মাকড়সার জালের মতো আঁকিবুকি মুখের চামড়ায়। তাঁকে দেখে মনে হত তাঁর জীবনের শেষ সুদিন এসে চলে গেছে।

তিনি অন্যমনে ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে থাকতেন।

## ॥ তেরো ॥

শেষ বারের মতো বিদায় নিই মিত্তিরদের পোড়ো ভিটেয় সেই দেয়াল দু'টির কাছ থেকে। অশ্বত্থের শিকড় বেয়ে একটা কাঠবেড়ালি নেমে আসে। ল্যাজ উঁচু করে আমাকে দেখে। কুঁদো কুঁদো কয়েকটা ছুঁচো ব্যস্তভাবে আনাগোনা করে। দেয়ালের ওপর লাফিয়ে বেড়ায় কাক। শালিকের কিচমিচ শুনতে পাই। নিঝুম দুপুরে কেমন গা ভরে আলস্য আসে! চার দিকে ভাঙা দরজা জানালা দিয়ে রোদের আলো-ছায়া এসে পড়ে আছে। বাতাসে পুকুরের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়। বসে থাকি, কেবল বসে থাকি। আস্তে আস্তে আমাব শিকড় গজায়, শরীর ডালপালা আর পাতা মেলে দেয়, মৃদু হাওয়ায় আমি দুলতে থাকি। কখনও বা হয়ে যাই ভাঙা বাড়ির এক পুরনো দেয়াল। আমার শরীরের নোনাধরা ইট থেকে চুন-বালি খসে পড়ে। ভাঙাচোরা ছায়া ফেলে আমি নিথর দাঁড়িয়ে থাকি। কী যে সব ঘটতে থাকে, সেই আশ্চর্য নির্জনতায়। শেষ বারের মতো বিদায় নিই। বিদায় হে পুরনো দেয়াল, বিদায় হে অশ্বত্থের ছায়া, বিদায় হে আমার গোপন নির্জনতা। আবার আমাদের দেখা হবে কোনও দিন। দূরের মাল জংশন থেকে যখন ফিরে আসব তখন তোমরা আমার জন্য থেকো। ঠিক এই রকম, অবিকল থেকো।

শেষ বেলার রেলগাড়িতে জানালার ধারে বসে আছি। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাদু। তাঁর হাত জানালার চৌকাঠে রাখা আমার হাতখানা ধরে আছে। বড় অন্যমনস্ক তাঁর মুখখানা। থম ধরে আছে কান্না।

বারকয়েক তাঁর ঠোঁট কেঁপে উঠল, কণ্ঠের অস্থি ওঠা-নামা করল ঘনঘন। ফিসফিস করে বললেন, ভাই, তুমি কোথায় যাও? অ্যাঁ! ভাই, তুমি কোথায় যাও?

জানালা দিয়ে যত দূর সম্ভব মুখ বের করে আমি বলছি, আবার আসব দাদু, পুজোর ছুটিতে। এবারকার মূর্তি যেন খুব বড় হয়। আর যেন চালচিত্তির থাকে—

আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ?

বলতে বলতে ময়মনসিংহের ডাকসাইটে মোক্তার শেষ বেলার রোদটুকু দেখলেন প্লাটফর্মের মোরম আর পাথরকুচিতে। দিশেহারার মতো চেয়ে দেখলেন চার দিকে। রেল কুলিদের মাল 'লোড' করার শব্দ হচ্ছে। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং। এইসব দেখলেন দাদু। তারপর চার দিকে বিদায়ের সেই অদ্ভুত ইঙ্গিতবহ দৃশ্যাবলী দেখে হঠাৎ কাঁদলেন। তাঁর ফোলা ফোলা চোখের কোলে আঙুরের রসের মতো টসটসে জল জমতে লাগল। দাদুকে আমি কখনও কাঁদতে দেখিনি। দেখে, শরীর-মন কেমন নিংড়ে যেতে লাগল। কে যেন শক্ত মুঠিতে ধরে আমার সমস্ত অস্তিত্ব মুচড়ে দিচ্ছে।

দাদু চেঁচিয়ে বললেন, নগেন, সাবধানে ওদের স্টিমার পার করিস। রাস্তায় দেখেশুনে খাওয়াবি কিন্তু। খুব সাবধানে নিবি—শীতকাল—ঠান্ডা যেন না লাগে –

কাকা দাদুকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠে এলেন। বুনু কাঁদছে জানালার কোলে মাথা রেখে। মা ফোঁপাচ্ছে। তার কোলে ঘুমোচ্ছে আমার ছোট বোনটি—উলের টুপিতে তার মাথা-গলা ঢাকা, কেবল টুলটুল করছে মুখখানি। দাদু জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে আদর করছেন, বলছেন, দিদি পুজোয় আসিস। বউমা, কেঁদো না। কুকু বুনুর গায়ে হাত তুলো না—আর দেখো, মুরগি-টুরগি খাইও না ওদের—আচার বিচার মেনে চলো—

সেই বিদায়ের মুহূর্তটিতে হঠাৎ মনে হল, দাদু বড় ভালবাসতেন আমাকে। কিন্তু আগে তা কখনও বুঝতেই পারিনি। তাঁর ভালবাসা হয়তো আলাদা আলাদা করে বোঝা যায় না। তাঁর ভালবাসা ছিল সবাইকে নিয়ে। সংসারের একটা ভরভরন্ত রূপে সে ভালবাসা তৃপ্তি পেতে পারত। কিন্তু অমোঘ বিচ্ছেদগুলি আসে। কিছুতেই ঠেকানো যায় না। তখন দাদু ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে এক অন্ধকার নদীকে প্রত্যক্ষ করেন। কূলে কূলে পরিপূর্ণ সেই ভয়াল নদী। তার ও-পারে দপদপিয়ে জ্বলছে-নিভছে আলেয়া। দাদু কুমারনাথের গীতা থেকে অস্ফুট আবৃত্তি করতে করতে একটু ঝুঁকে অন্যমনে হাত বুলিয়ে দেয় সিতিকণ্ঠের বিবাগী বেজিটার গায়ে। তার বেশি কিছু বোঝা যায় না তাঁর ভালবাসা। শেষ বেলার রেলগাড়ি আমাকে ছিঁড়ে নিয়ে গেল তাঁর কাছে থেকে।

ভোর রাত্রে ঘুম থেকে তুললেন কাকা। আলোময় এক জংশন স্টেশন। ঘুমচোখে উঠে তীব্র শীত টের পেয়ে, আলো আর ভিড় দেখে আমি কাঁদছি। কাকা কুলি ডেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছেন। মা ছোট বোনটিকে মুড়েসুড়ে কোলে নিয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে, তার আঁচল ধরে জড়োসড়ো বুনু আমার কান্না দেখছে।

কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে কাকা এক বার আমাকে চেয়ে দেখলেন। তারপর কী ভেবে টপ করে কোলে নিলেন আমায়। ঘুমচোখে দেখি, সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওভারব্রিজের ওপরে উঠছি। কী তীব্র ঠান্ডা বাতাস ঝাপটা দিচ্ছে! কান কটকট করে, চোখে জল এসে যায়। নীচে মার্শালিং ইয়ার্ডে চওড়া চওড়া আলো পড়ে আছে। শান্টিং ইঞ্জিন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে একসারি মালগাড়ির দিকে। ঠিক দেয়ালির মতো আলোর মালা ছড়িয়ে আছে বহু দূর অবধি।

ওভারব্রিজের সিঁড়ির নীচ থেকে কে যেন কাকাকে ডাক দিল, নগেন, এ দিকে।

লোকটি ছিপছিপে লম্বা এক সাহেব যেন। গায়ে সুট, মাথায় ফেল্ট টুপি, পায়ে ফিতে বাঁধা স্যু। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। অবাক চোখে তাঁকে দেখছি, মা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। দেখাদেখি বুনু। আমার কিন্তু অনেকক্ষণ সময় লাগল মুখটা চিনতে। কে বলবে যে এই আমার বাবা— যাঁর অবিন্যস্ত চুল হাওয়ায় উড়ত, পায়ের ছেঁড়া চ'টি কত দিন সারানো হয়নি। যাঁর গায়ে আধময়লা শার্ট দেখেছি আর মুখে নির্লিপ্ততা!

সেই জংশনে গাড়ি বদল। ছোট্ট সেলুন গাড়িটি বাবার। তার ভিতরে রান্নাঘর, মুরগির খাঁচা, এক দিকে রেলিং দেওয়া একটু বারান্দা। কী চকচকে গদি! কেমন মদ রঙের কাঠের পালিশ। আমি আর বুনু

হাঁ করে দেখি আর গায়ে গা ঘেঁষে বসি। সেই সেলুন-গাড়িতে বাবার পাশে আমাদের সবাইকে কেমন বোকা মফস্সলের লোকেদের মতো দেখাচ্ছিল। যেন বাবা আমাদের পরিবারের লোক নয়, সেলুন গাড়িটিও নয় আমাদের, আমরা এক অচেনা সাহেব-লোকের গাড়িতে উঠে পড়েছি, এক্ষুনি আমাদের নামিয়ে দেওয়া হবে।

তখন ভোরবেলা। গাড়ি চলেছে গভীর গাছপালার সবুজের ভিতর দিয়ে। ফাঁকে ফাঁকে নীল পাহাড় দেখা যায়। পাখি-পাখালির ডাক। কুয়াশার আবছায়ায় একটা ঝকঝকে সরু নদী ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। কী শীত, কী নির্জনতা! গাড়ির মেঝেয় বিছানা পেতে রাত্রির অনিদ্রা পুষিয়ে নিতে ঘুমিয়েছে মা, বুনু, আমার ছোট বোনটি। গদির বিছানায় দু'ধারে মাথা রেখে বাবা আর কাকা। আমি চেয়ারে বসে আছি। একা আমার শ্বাস জানালার কাচে লেগে মুছে মুছে যায়। কী যে মায়া পৃথিবীর, সবুজের কী বৈরাগ্যের রং লেগে আছে দূরের বিস্তারে! কোথাও পৌঁছতে ইচ্ছে করে না। চলুক এই রেলগাড়িটা অনন্ত যাত্রায়। এই ভোরবেলাটি স্থির থাকুক তার কুয়াশার আবছায়া নিয়ে। সামনে কোথাও মাল জংশন বলে কিছু নেই, যেমন নেই পিছনের ময়মনসিংহ।

কাঠের খুঁটির ওপর আমাদের মাচান-বাড়িটি। ওপরে লাল টিনের ছাউনি, দেয়াল জোড়া কাচের শার্সি, ভিতর থেকে মনে হয় ঠিক জাহাজের মধ্যে রয়েছি। চাব দিকে বাগানের সীমানায় কাঁটাগাছের বেড়া। বাড়ির নীচে কাঠের খুঁটির আড়ালে আবডালে আমি আর বুনু লুকোচুরি খেলি। মা ডাক দেয়, বুনু, বোনকে একটু ধর। কখন থেকে কাঁদছে। রান্নাঘরে আমার হাত জোড়া—

পিছনের নিচু সমানভাবে ছাঁটা চা-বাগানে কখনও মেঘ নেমে আসে যেন! গাছের ডালে ডালে কুয়াশার বল আটকে থাকে বুঝি! পাশের খেলার মাঠে দুপুরে মোষ চরে। তার পিঠে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোয় কালো রাখাল ছেলে। বাগানের শেষ সীমায় প্যানট্রিতে বাস করে খানসামা পাঁচু শেখ। তার বউ বাগান থেকে নিচু হয়ে পুদিনার পাতা তোলে। পেঁয়াজকলি তুলে নিয়ে যায়। আমি একটা লাল রবারের বল ছুড়ে দিই মাঠের মধ্যে, সেটা গড়িয়ে যায়—আর আমি ছুটতে থাকি। যত দূর ছুটি তত একা হয়ে যাই, কেবল একা হয়ে যাই। থমকে দাঁড়াই হঠাৎ। কান পেতে শুনি। ঠিক দুপুরেও কোনও মানুষের শব্দ শোনা যায় না। সকালেও না, বিকেলেও না। কেবল পাখি-পাখালির ডাক, কেবল পোকাদের পিড় পিড়। আমি বল ছেড়ে দিয়ে কখনও মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ি। উপভোগ করি সেই একাকিত্ব, দুর্লভ স্বাধীনতা যা আমাদের ময়মনসিংহের বাড়িতে খুব কমই টের পেয়েছি। শুয়ে থেকে একা একা কথা বলি। চোখের সামনে দিয়ে ধীর, অন্তহীন দীর্ঘ মালগাড়ি চলে যেতে থাকে। দূরে শান্টিং ইঞ্জিন শিস দেয়। মেটেলির ছিমছাম শাটল গাড়িটি দুপুরে স্টেশন ছেড়ে গেলে মোরমের প্লাটফর্মে ঘুরি। সোরাবজির জালে-ঢাকা দরজা দিয়ে মাংস রান্নার গন্ধ আসে। বুড়োসুড়ো স্টেশনমাস্টার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেন, বেড়াচ্ছ খোকা? এসো টরেটক্কা দেখে যাও।

গিয়ে তাঁর ঘরে বসি। গালা আর কেরোসিনের গন্ধ পাই, গঁদের আঠা আর বেলেকাগজের গন্ধ। একটু পরেই সোরাবজি বেয়ারা এসে চা দিয়ে যায়, সঙ্গে কেক।

হাটবারের বিকেলে বট গাছ তলায় অনেক গোরুর গাড়ির ভিড় দেখি। চা-বাগানের সাঁওতাল মেয়েরা আসে। রঙিন কাপড় পরা লোক ভিড় করে। কাচের গেলাসে চা খায় খোলা জায়গায় বসে। রেলের কুলি বুড়ো মুকুন্দরের সঙ্গে হাটের দোকানে ঘুরি। টিনের হুইসল কিনি। দো-ফলা ছুরি, পেনসিল-কাটা কল। সন্ধের আগেই রাতকানা মুকুন্দর তাড়া দেয়, জলদি চলো, আঁধারে আমি পথ চিনতে পারি না—

মাল গুদামের পিছনের রাস্তায় ডাক্তার বক্কর খান সাইকেলে ভিজিটে যান। আমাকে দেখে নাক কুঁচকে বলেন, ইস, তোর শরীরে যে একটুও রক্ত নেই। মাকে বলিস যেন মুরগির ঝোল খাওয়ায়— বলতে বলতে পেরিয়ে যান আমাদের। তাঁর বিবি মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন আমাদের বাসায়, তাঁর হাতে মেহেদির ছোপ, গায়ে আতরের গন্ধ, চোখে সুর্মা। বলেন, আমার বড় শাঁখা পরতে ইচ্ছে হয় দিদি। মুসলমানদের কি ও-সব পরতে নেই?

স্টেশনের ওপর দিয়ে সন্ধের পর ফেরার সময়ে দেখি, ঢাউস গোল লণ্ঠন জ্বলছে, তার চিমনির ওপরে কাগজের ঠোঙা পরানো। টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে আছেন তরুণ এ এস এম। তাঁর চশমার

কাচে ম্লান আলো ঠিকরে ওঠে। সোরাবজির ফরসা মোটা অবাঙালি ম্যানেজার বাইরে এসে হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে, আঙুল মটকায়। আমাকে ডাক দিয়ে বলে, আমার টর্চটা সঙ্গে দেব? বড় অন্ধকার। যা তো মগন, খোকাবাবুকে এগিয়ে দিয়ে আয়—

বাবা গেছেন কোনও দূরের লাইনে। তিন দিন চার দিন কেটে যায়। আমরা চারজন ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যারাতে দরজা-জানালা বন্ধ করি। বুড়ি ঝি এতোয়ারী কাঠকয়লার আগুন করে বোনটিকে কোলে নিয়ে দেহাতি গান গায়। রাত বাড়ে, পাঁচু শেখের বাসা থেকে বাসন ধোয়ার শব্দ একসময়ে শেষ হয়। নিঝুম অন্ধকারে ঝিঁঝি ডাকে। মশারির মধ্যে আমি আর বুনু ঝগড়া করি, কে মাঝখানে শোবে। তারপর আধোঘুমের মধ্যে মায়ের গায়ের সঙ্গে দলা পাকিয়ে যাই। হঠাৎ কুকুরকান্নার মতো বহু দূরে দীর্ঘ বিষণ্ণ ফেউয়ের ডাক শুনি। অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার সেই বিষণ্ণ দীর্ঘ ডাক। ভয় পাই। তবু সেই ডাক তো আমাদের সতর্ক হতেই শেখায়। পয়েন্টসম্যান দশরথ আমাদের বাগানে তার গোরুর ঘাস কাটতে এসে বলে, ও তো আসলে শেয়ালের ডাক। শেয়াল বাঘের পিছু নেয় যখন, তখন ল্যাজ মুখে নিয়ে ডাকে—সেটাই ফেউয়ের ডাক।

এক দিন একটা গাড়ি এসে সাইডিঙে সেলুন কাটে। সিঁড়িতে জুতোর মসমস শব্দ করে বাবা ঘরে আসেন। বড় ব্যস্ত মানুষ। কথা বলার সময় থাকে না। এক-একদিন বাইরের ঘরে দু'-একজন দেহাতি লোক এসে জড়সড় হয়ে দাঁড়ায় পয়েন্টসম্যানের ইন্টারভিউ দিতে। বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী কী লাগে পয়েন্টসম্যানের? কৌন সা চিজ?

রাখালের আষাঢ়ে শালিখটার মতো তারা মুখস্থ বলে, চাবি-খিলাপ-বাত্তি-ঝান্ডি।

স্লো শান্টিং কী ভাবে করতে হয়? কোন ঝান্ডি দেখাবে?

এক-একদিন রাত্রে ইঞ্জিনের বাঁশি আর্তস্বরে দুর্ঘটনার খবর জানাতে থাকে। দু'টো হ্রস্ব, তারপর একটা দীর্ঘ সুর। ইঞ্জিন কাঁদতে থাকে। আমরা কান খাড়া করে শুনি। বাবা রাতের খাওয়া মাঝপথে ফেলে উঠে পোশাক পরতে থাকেন। বিড়বিড় করে বলেন, কোথাও শান্তি আছে? ধোঁয়াটে লণ্ঠন হাতে একজন পোর্টার আসে স্টেশন থেকে, নিঃশব্দে ভূতের মতো সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ায়। বাবা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ হাতে তার সঙ্গে বেরিয়ে যান। বাড়ি নিঝুম হয়ে যায়। আমরা সদর দরজা বন্ধ করে সেই ইঞ্জিনের কান্না শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

খেলার মাঠটা শূন্য পড়ে থাকে। সেখানে কেউ খেলে না। ঘাস বড় হয়ে গেছে। গোল-পোস্টে শ্যাওলা ধরেছে, বুনোলতা লতিয়ে উঠেছে তার গায়ে। 'বার' বাঁকা হয়ে উলটো ধনুকের মতো নেমে এসেছে। সেই মাঠে আমি একা একা খেলি। পায়ে বল নিয়ে ছুটতে থাকি। চক্কর দিই। অদৃশ্য সব খেলোয়াড়দের কৌশলে কাটিয়ে গোলপোস্টের কাছে চলে যাই, তারপর গোলে শট করি। দেখি, অদৃশ্য গোলকিপার শূন্যে লাফিয়েও গোল বাঁচাতে পারল না। আমি একা একা দু' হাত তুলে 'গোল, গোল' বলে লাফাই।

আমার ছোট বোনটি এখন ঘাড় সোজা করতে পারে, ডাকলে মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। মা তাকে ঘুম-কোলে নিলেই সে হাই তুলতে থাকে, আর মায়ের বুকের কাপড় হাত দিয়ে সরাবার চেষ্টা করে। মা চোখ বড় করে বলে, দেখেছ কী বুদ্ধি!

এক দিন শুনতে পাই, খেলা হবে। হায়পাথাড় চা-বাগান ভাবসাস দোমোহানীর লোকো টিম। তারিখ ঠিক হয়। দুপুরের রোদে গিয়ে শূন্য মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে থাকি। রেল কুলিরা মাঠে চুনের দাগ দেয়, তাদের সর্দার মগন আমাকে দেখে বলে, খেলার এখনও অনেক দেরি। তা ছাড়া ময়নাগুড়িতে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, রেলের টিম নাও আসতে পারে। রোদে দাঁড়িয়ে থেকো না খোকাবাবু, বাড়ি যাও।

বিকেলে একটা লরি এসে থামে। নীল-সাদা জার্সি-পরা চা-বাগানের কালো কালো সাঁওতাল খেলোয়াড়রা ঝুপঝাপ করে লাফ দিয়ে নামে। হাতে পাঁচ নম্বরের বল নিয়ে সাদা কলারওলা গেঞ্জি গায়ে গোলকিপার। আউটার সিগন্যালের কাছে যে সাহেবি ধরনের মনোহারী দোকান আছে তার থলথলে মোটা পার্শি মালিক আসে কেডস পায়ে, হাতে হুইসল। চারটে দশের গাড়িতে শেষ পর্যন্ত লোকো টিম কিন্তু আসে না। চা-বাগানের খেলোয়াড়রা বল পেটাপেটি করে, বিড়ি টানে, আবার লরিতে বোঝাই হয়ে

চলে যায়। মাঠ শূন্য হয়ে পড়ে থাকে। খেলা হয় না, কবে খেলা হবে, সেই আশায় বসে থাকি। কিন্তু খেলা হয় না। কিছুতেই খেলা হয় না।

রেল লাইনের ও-পারে স্টেশন মাস্টার, এ এস এম আর মাল-গুদামবাবুদের কোয়ার্টার। লাল ইঁটের কেমন খুপরি খুপরি বাড়িগুলো, ছোট ছোট জানালায় মোটা গরাদ। গরিব চেহারার বাড়িগুলো গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। সেইখানে খোয়া ওঠা ছোট্ট মাঠটিতে নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে তাদের ছোট ছেলেমেয়েরা। মাঝে মাঝে লাইন পার হয়ে সেইখানে চলে যাই। দেখি বিকেলে আঁচ দেওয়া উনুনের ধোঁয়া নিচু মেঘের মতো ঝুলে আছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ। শাড়ি পরা দু'-একটি মেয়েকে দেখি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল বাঁধে। আমাকে দূর থেকে দেখলেই তাদের ছেলেরা চেঁচিয়ে পরস্পরকে বলে, সাহেবের ছেলে, টি আই সাহেবের ছেলে...

কেমন সাড়া পড়ে যায়। বড় মেয়েরা কৌতূহলে আমাকে দেখে, বউ-ঝি উঁকি মারে। গুদামবাবুর ছেলে হরিদাস হাতের র‍্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলে, খেলবে? খেলো না?

আমি একটু-আধটু খেলি। অল্পেই হাঁপিয়ে যাই। রোজ খেলে বলে ওদের দম বেশি। ঘেমে-চুমে লাল হয়ে যখন ফিরে আসি ঠিক তখন হরিদাসের কিশোরী দিদিটি আমাকে ডাক দেয়, শোনো খোকা, শোনো। ভিতরে এসো না! বাব্বাঃ, তুমি যা লাজুক।

ঠিক ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। তাদের আধো-অন্ধকার খুপরি ঘরে নিয়ে বসায়। প্লেটে করে সুজি দেয়, বিস্কুট সাজিয়ে আনে, আর চা।

গুদামবাবুর বউ এসে বলেন, রোজ ভাবি তোমাদের বাড়ি যাব খোকা, তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করে আসব—তা সংসারে এমন জবরজং হয়ে আছি যে সময়ই হয় না। তোমার মাও তো আসতে পারেন এই দিকে মাঝে মাঝে—

হরিদাসের কিশোরী দিদিটি মিটমিট করে হাসে। কী পুরন্ত ঠোঁট দু'টি, দীঘল চোখ, শ্যামলা রঙের ওপর কোমল লাবণ্য ছড়িয়ে আছে। সে দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধে, বলে, তুমি অত রোগা কেন? তোমার বাবার মতো চেহারা কেউ পাওনি। কী সুন্দর টি আই সাহেবকে দেখতে—না মা?

তার মা বলে, আর কী ভাল লোক! হরিদাসের বাবা তো বলেন, এমন টি আই সাহেব আর হয় না। এর আগে ছিল একজন আধবুড়ো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। কী বাঁদর ছিল তার ছেলেরা! সবসময়ে এয়ারগান ছুড়ছে, গুলতি ছুড়ছে, বল খেলছে, দৌড়চ্ছে, চেঁচাচ্ছে—আমাদের পোষা একটা মুরগিকে গুলতিতে মেরে খেল—সাহেবের ছেলে, তাই কিছু বলতে পারলাম না।

একটু চুপ করে থেকে বলে, তোমরা চলে গেলে এ-জায়গা অন্ধকার হয়ে যাবে। আবার কে না কে আসবে। শুনছ নাকি কোনও বদলি-টদলির কথা?

আমি কিছুই জানি না। তাই মাথা নাড়ি। না।

উনি বলেন, কী জানি, হরিদাসের বাবার কাছে শুনছিলাম যেন, তোমরা আর বেশি দিন থাকবে না। ভাল লোককে কি ওরা এক জায়গায় বেশি দিন রাখে! আমাদেরও তিন বছর হয়ে গেল এখানে, এখন আবার কোন ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে পাঠায় কে জানে!

যুদ্ধের আগের বছর। এক বিকেলে বাবা লাইন থেকে ফিরে এসে মাকে বললেন, ট্রান্সফার অর্ডার পেলাম।

কোথায়?

কাটিহারে।

মা খুশির শ্বাস ফেলে বলে, বাঁচি তা হলে। এখানে একটা স্কুল-পাঠশালা নেই, বাড়িতে পড়ানোর লোক পাই না, ছেলেটা একটা ছোটলোক হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

কেমন জায়গা কাটিহার কে জানে! কিন্তু আর দূরে আমার যেতে ইচ্ছে হয় না। কেবলই মনে হয়, ময়মনসিংহ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছি।

চলে যাওয়ার কথা শুনে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরোই। মন্থর পায়ে আসি খেলার মাঠটিতে। কোনও দিনই সেখানে খেলা হল না। বুড়ো গোলপোস্টে ফাটল ধরেছে, রং গেছে চটে, 'বার' ঝুলে পড়েছে আরও। জোর হাওয়া দিলে মটমট শব্দে করে দোলে। কত বার আমার লাল বলটা দিয়ে গোল দিয়েছি

তাদের। তারা সেই স্মৃতি নিয়ে ক্রমে আরও বুড়ো হবে, কোমর ভাঙা মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে কিছু দিন। তারপর নিজের ভারে মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে। এ-মাঠে একটা খেলা দেখার বড় ইচ্ছে ছিল আমার। খেলা হল না। নিবিড় বড় বড় ঘাস গজিয়েছে মাঠে। চলতে গেলে পা আটকে যায়। সেই মাঠ পেরিয়ে আমি রেল লাইনের ঢালু জমি বেয়ে উঠি। অদূরে গাড়ি শান্টিং করায় নীল জামা পরা পয়েন্টসম্যান দশরথ। হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফর্মে চলে আসি। লাল মোরমের ওপর জুতোর ছাপ রেখে যেতে চেষ্টা করি। প্রবাসী তরুণ এ এস এমটি হয়তো তার বাড়ির কথা ভাবে, ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ মুখে চশমার ভিতর দিয়ে অন্যমনে দেখে আমাকে। বুড়োসুড়ো স্টেশন মাস্টার পানের পিচ ফেলতে বেরিয়ে আমাকে দেখে কাছে ডাকে। বলে, চলে যাচ্ছ তোমরা! যাও, এ কি একটা জায়গা নাকি! কিছু পাওয়া যায় না, জঙ্গল। কাটিহারে মাছ মাংস দুধ খুব সস্তা, আর কী সুন্দর কাটারিভোগ চাল—

বট গাছের তলায় হাটবারের নানা চিহ্ন পড়ে আছে। ঘুরে-ফিরে দেখি। উত্তরের দিকে এক ঝাউবন। কবে যেন একটা ছোট্ট এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছিল, তারই দু'-একটা যন্ত্রপাতি আজও পড়ে আছে। তাদের গায়ে শ্যাওলা ধরেছে, জং পড়েছে, লতিয়ে উঠেছে বুনোলতা। সেইখানে যাই। এরোপ্লেনের ধ্বংসাবশেষ একটি ছোট্ট যন্ত্রের ওপর বসে থাকি। চার দিকে পাখি-পাখালি ডাকে। ভেজা মাটির ভাপ উঠে এসে ঘিরে ধরে। হরিদাসদের কোর্টে বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় রোজকার মতোই, তার ঢলঢলে মুখের কিশোরী দিদিটি দাঁতে ফিতে চেপে অহংকারে চুল বাঁধে। মানুষের আসা-যাওয়া অনেক দেখেছে তারা, তাই উদাস গলায় বলে, তোমরা চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

দেখো, আবার কোনও জায়গায় হয়তো ঘুরে ফিরে দেখা হবে। আমরাও হয়তো চলে যাব। হয়তো কাটিহারেই।

হরিদাস প্রথম দিনের মতোই সাহেবের ছেলেকে খাতির করে র‍্যাকেটখানা এগিয়ে দেয়। বলে, এবার তোমাদের জায়গায় সেনসাহেব আসছেন। তাঁর দুই ছেলে আমাদের বয়সি। আমরা একটা ফুটবল টিম করব। বড় মাঠে খেলা হবে—

বাবার ফেয়ারওয়েলের হাততালির শব্দ তখনও কানে বাজছে, আমি আর বুনু সেলুনে এক বিছানায় ঘুমোতে যাই। বুনুর ঘুমন্ত হাত থেকে ফেয়ারওয়েলের আধ-খাওয়া কেক গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। চেয়ে দেখি, ঘুম আসে না। সেই আধ-খাওয়া কেকটির দিকে চেয়ে কান্না আসে। মানুষ কত কী ফেলে রেখে চলে যায়! গভীর রাতে রেলগাড়ি মাল জংশন ছেড়ে যায়। নাট-বল্টুর শব্দ, কাপলিঙের শব্দ, জটিল ইয়ার্ড পেরোনোর শব্দ আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় ঠিক এক ছোট্ট দ্রুতগামী নদীর মতো।

ময়মনসিংহের কথা আমি কখনও ভুলি না। ঘুম চোখে হঠাৎ তড়বড় করে আচমকা জিজ্ঞেস করি, মা, কবে আমরা ময়মনসিংহে যাব?

মা বলে, কী জানি। এক বার বাহাদুবাবাদেও যাওয়া হল না। বাবা বদলি হলেন বগুড়ায়, সেখানেও যাওয়া হবে না। আর কিছু দিন পরেই রিটায়ার করে কলকাতায় চলে যাবেন, কিংবা দেশের বাড়িতে, আর কি দেখা হবে?

এক বিশাল উন্নত বৃক্ষের মতো ময়মনসিংহ উঁচু হয়ে তার দীর্ঘ ছায়া দিয়ে দূরবর্তী, দূরগামী আমাকে স্পর্শ করে। আমি ফিরে তাকাই। হয়তো বা স্বপ্নে, সেই গাছের ডালে ডালে ফলের মতো নানা দৃশ্য দেখি। ওই তো দাদু ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে বসে আছেন, তাঁর জুতো চেটে দিচ্ছে সিতিকণ্ঠের বেজি। তুলারানী উঠোনের রোদে বসে গুটি খেলে, মাঝে মাঝে মাথার উকুন বেছে এনে মারে। মাখনকাকা বারান্দায় বসে আছেন সুদর্শনের ভাত আনার প্রত্যাশায়। রজব আলির ঘোড়া ধরেছে রাখাল, ধোপাদের মাঠে ঘোড়া চালাচ্ছে—হ্যাট, হ্যাট। গামছা মাথায় পুকুরের দুই পাড়ে ছিপ ফেলে বসেছেন মেজো জ্যাঠামশাই আর সুরেন গার্ড। মিত্তিরদের পোড়ো ভিটেয় দুপুরের রোদ বিচিত্র সব রূপবান ছায়া ফেলেছে।

## ॥ চোদ্দো ॥

স্কুলে প্রথম দিন। প্রথম পিরিয়ডে নাম ডাকছেন ছোটনাগবাবু।

রোল নম্বর টোয়েন্টি ওয়ান—মধু—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—মধুসূদন—

আমি অন্যমনে জানালার বাইরে চেয়ে আছি। আমার বোধের মধ্যে সে-নাম পৌঁছয় না। যেন বা অচেনা ছেলের নাম।

ছোটনাগবাবু ডাকতে থাকেন, টোয়েন্টি টু—সুবল হালদার—টোয়েন্টি থ্রি—থার্টি...

আমি আস্তে উঠে দাঁড়াই, স্যার, আমি—আমি মধুসূদন—

তিনি অবাক হন, তুমি! রোল নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান? তোমার নাম আমি তিন বার ডেকেছি। কী করছিলে?

আমি কথা খুঁজে পাই না। কিছু দিন আগে বাবার এক বন্ধু বেড়াতে এসে নাম জিজ্ঞেস করায় অকপটে বলেছিলাম, আমার নাম কুকু। বাবা ধমক দিয়ে বললেন, কুকু কী? তোমার একটা ভাল নাম আছে না!

আমি থতিয়ে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ভেবে অস্পষ্ট একটা নাম মনে পড়েছিল। মধু—হ্যাঁ, মধুই তো—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়! এ যেন মা যেমন প্যাঁটরা খুলে বিয়ের পুরনো বেনারসিখানা মাঝে মাঝে বের করে দেখে। অব্যবহৃত বলে আবার তুলে রেখে দেয়। তারপর আর মনে থাকে না।

ছোটনাগবাবু চেঁচিয়ে বললেন, কী হয়েছিল? নিজের নাম ভুলে গিয়েছিলে?

আমার বলতে ইচ্ছে করে, হ্যাঁ স্যার, ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে আমি মধুসূদন নই। আমি কুকু। কুকু বলে ডাকলে আমার ভেতর থেকে সাড়া দেয়।

টিফিনের সময়ে সেই বদমাশ ছেলেটা—সুবল আমার কাছে এসে সবাইকে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করে, নিজের বাবার নাম মনে আছে তো তোমার?

স্কুল থেকে স্টেশনের ওপর দিয়ে ফিরি, ওভারব্রিজ পার হয়ে। বিশাল প্লাটফর্মে পাথরকুচি ছড়ানো, শেড-এর তলায় শানবাঁধানো জায়গা। বহু লোক কাজ করে। কাটিহারের বিশাল রেলস্টেশনে কেউ আমাকে চেনে না, ডেকে বলে না, এসো খোকা, টরেটক্কা দেখে যাও। স্টেশন পার হলে সাহেব পাড়া। খুব উঁচু দেবদারু গাছের ছায়ায় নির্জন পথটি। পাশ দিয়ে পূর্ণিয়ার লাইন গেছে। দুপুরে শাটল ট্রেনটি ঝিক ঝিক করে চলে গেলে আবার কেবল নির্জনতা। দেবদারু গাছে সারা দিন ঝড়ের মতো বাতাস লাগে।

আমাদের বিশাল কম্পাউন্ড ঘেরা পাকা বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ঘর। সেইসব ঘরে আমরা কয়েকটি প্রাণী হারিয়ে যাই। বুনু পুতুল খেলে, ছোট বোনটি হামা দেয়, টেবিলের পায়া ধরে দাঁড়ায়। মা তার ফ্রক সেলাই করে সিঙ্গার মেশিনে। হাজারি নামে যে মোটাসোটা হাসিখুশি চাকরটি ছিল আমাদের, সে আমাকে বিশাল শিমুল গাছতলায় নিয়ে গিয়ে গুলতির টিপ করতে শেখায়।

সকালে মাঝে মাঝে খুব কুয়াশা হয়। ঘুম ভেঙে শুনি ফগ সিগন্যালের আওয়াজ। ভোরের প্রথম গাড়ি ঢুকছে কাটিহার স্টেশনে। আলো-আঁধারিতে মশারির জাল দিয়ে ঘরখানা চেয়ে দেখি। কেমন উদাস লাগে। এ-ঘরবাড়ি এক দিন আবার আমরা ছেড়ে যাব। যাব অচেনা জায়গায়। এমনিই চলতে থাকবে। কত চেনা বন্ধু ফেলে যাব। ছেড়ে যাব বাড়ির প্রিয় একটি কোণ, বাগানের দক্ষিণে ভুট্টা খেতের আড়ালে আমার নিজ হাতে কাটা গর্তটি। সুড়ঙ্গ তৈরি করব বলে খুঁড়েছিলাম, এখন তাতে বাচ্চা নিয়ে বসবাস করে টেমি নামে দেশি কুকুরটি।

পেরেরা সাহেবদের বাংলোর ঝোপে একটা বুলবুলিকে গুলতিতে টিপ করেছিলাম। পাথরটা ছিটকে যেতেই বুলবুলিটা উড়ে পালায়। আর ঝোপের ও-পাশে কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। পেরেরা সাহেবের ছেলে জেরি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের বুক চেপে ধরে ইংরেজিতে কী একটা গাল দিল। মুখখানা লাল। তারপর উঠে এল সে। গেট খুলে বেরিয়ে এল। সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে বলল, তুমি আমাকে মেরেছ।

আমি মারিনি। আমি ঝোপের বুলবুলটিকে মারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে-সব কথা ভাল করে বলাই গেল না। জেরি দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে।

প্রথম ঘুষিটাই আমি আটকাতে পারলাম না। সেটা লাগল পেটে। দম বন্ধ করে আমি বসে পড়েছি, জেরি বাঁ হাত কাঁধের সমান উঁচু করে ঘুরিয়ে আবার মারল চোয়ালে। আমি ছিটকে পড়লাম পাথরকুচির ওপর। জেরি তার বুটসুদ্ধ পা তুলল লাথি মারবে বলে। আমি শুয়ে অবাক হয়ে দেখছি—শরীরের কোনও বোধ নেই তখন, শব্দ করতে পারছি না। ঠিক সেই সময়ে স্বপ্নের মতো, বাতাসে ভেসে আসা পালকের মতো ছুটে আসে জেন— সে জেরির বোন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে জেরিকে। ঠেলে সরিয়ে দেয়। হাঁটু গেড়ে বসে আমার পাশে। দু'টি সুগন্ধী হাতে মাথাটি তুলে দিয়ে নরম গলায় বলে, খুব ব্যথা পেয়েছ কি?

রোগা ছিলাম বলে আমাকে কেউ কখনও তেমন মারেনি। জেরির সেই মার খেয়ে আমার দীর্ঘকাল বাদে আবার জ্বর এল। বিছানায় শুয়ে ছটফট করি আক্রোশে, প্রতিহিংসায়। বিকেলের দিকে আসে জেন। সেই স্বপ্নের মতো মেয়েটি। কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে আমাকে খাওয়ায়। বালিশের পাশে 'টফি' রেখে যায়। তার গা থেকে সুগন্ধ ভেসে আসে। অর্গান্ডির ফ্রকের ভিতর থেকে তার গায়ের গোলাপি আভা দেখা যায়। নীল চোখের তারার মাঝখানে দু'টি কালো ফুটো অবাক হয়ে দেখি। সে আমার পাশে কিছুক্ষণ থেকে যায় বুনুর পুতুল দেখতে। দেখে খুশি হয়। খুব হাসে। আমার রোগা দিদি বুনু নির্বিকার মনে মেম-মেয়ের সঙ্গে তার আলুর পুতুল নিয়ে খেলা করে।

ভাল হয়ে এক দিন আমি আমার দো-ফলা ছুরিটা বের করি। শানে ঘষি সারা দুপুর। ছুরির ফলাটা আগুন গরম হয়ে চকচক করে। সেটা ভাঁজ করে পকেটে পুরি। তারপর সাহেব পাড়ার নির্জন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি জেরিকে সুযোগ মতো পাওয়ার জন্য। দূর থেকে দেখি, কাঠের জাফরিতে ঢাকা বারান্দায় বালির বস্তা ঝুলছে। অবিকল আমার কাকার মতো ঘুরে ঘুরে ঘুষি মারছে জেরি। কাকার দস্তানা ছিল না, জেরির হাতে চামড়ার চকচকে দস্তানা। ঢিপ ঢিপ ঘুষির শব্দে কেমন যেন আমার রোগা শরীর হতাশায় ভরে আসে। জানি, আমি পারব না। তবু ঘুরে বেড়াই।

ল্যাংড়া আম-বাগানের ধারে একটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। সেইখানে একটা তিন নম্বর ফুটবল নিয়ে একা একা লাথি মারে জেরি। দৌড়ে গিয়ে বল ধরে। কী জোর তার দৌড়! কেমন শরীর হেলিয়ে আঁকাবাঁকা দৌড়য়! সেই মাঠের ধারে এক দিন বিকেলে আমি গিয়ে দাঁড়াই, প্যান্টের পকেটে হাত, হাতে ছুরির হাতল। জেরি মাঠময় দৌড়য়। সারা মাঠ ঘুরতে থাকে। হঠাৎ একসময়ে আমাকে দেখে দাঁড়ায়! স্থির চোখে চেয়ে থাকে। কোমরে দু' হাত, একটা পা বলের ওপর। চেয়ে দেখে আমাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত—বলটা আমার দিকে পায়ের ছোট্ট টোকায় গড়িয়ে দিয়ে বলে—শুট।

আমাদের ভাব হয়ে গেল।

স্কুলে সবাই 'মধু মধু' বলে ডাকে। আমি সাড়া দিই। আস্তে আস্তে মধু নামটা আমার শরীরের রক্তে মজ্জায় ঢুকে যায়। আমি 'মধু' হয়ে উঠি। রেল কোম্পানির লালচে কাগজের মোটা বাঁধানো খাতায় হাতের লেখা লিখি, অঙ্ক কষি। ওপরে কলমের হ্যান্ডেলের পিছন দিক দিয়ে মোটা অক্ষরে নাম লিখি—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। রেলের টালিক্লার্ক কৃষ্ণকিশোর পড়াতে আসেন। তাঁর চুল থেকে মহাভৃঙ্গরাজ তেলের গন্ধে গা গুলোয়। তাঁর কাবলি জুতোর শব্দ শুনলে ভীষণ হতাশ বোধ করি। কৃপণ টি আই অম্বুজাক্ষ মিত্রের দুই ছেলে টকু আর বুধো খেলতে আসে। তাদের চুল খুব ছোট করে ছাঁটা বলে কেমন চোর-চোর দেখায়। তাদের বাড়িতে গেলে অম্বুজাক্ষ বলেন, তোমাদের নাকি মাসে পাঁচ সের তেল লাগে! তোমাব মা কি তেল দিয়ে আঁচান? টকু বুধোদের বাড়িতে খুব শাসন। টকু বুধোকে উঠতে বসতে কথা শুনে চলতে হয়।

টকু বুধো ওঠো। তাদের বাবা ডাকেন।

টকু বুধো সকালে বিছানা ছেড়ে টপাটপ উঠে পড়ে।

মুখ ধুয়ে পড়তে বোসো।

টকু বুধো মুখ ধুয়ে পড়তে বসে।

জোরে পড়ো।

তারা দুলে দুলে জোরে পড়ে।
খেতে যাও।
তারা টপাটপ উঠে খেতে যায়।
শুতে যাও।
তারা গিয়ে শুয়ে পড়ে।

বিকেলে চারটের আগে তাদের বেরোনো বারণ। যদি কোনও দিন সাড়ে তিনটেয় তাদের ডাকতে গেছি, অমনি তাদের দিদি শেলি বেরিয়ে এসে বলেছে, মধু, এখন যাও। চারটের আগে ওরা বেরোবে না।

রেলের স্কুলে বয়সের তুলনায় অনেক নিচু ক্লাসে পড়ত তারা। বছর বছর খারাপ ফল করত পরীক্ষায়। আমাদের বাড়িতে এসে পেনসিল চুরি করে নিত, নিয়ে যেত পেনসিল কাটা কল, রবার। প্রতি রবিবার ছিল তাদের মার খাওয়ার দিন। সারা সপ্তাহের নানা দোষ জমা হত। রবিবার বিকেলে দেখতাম, তাদের পায়ে বেতের দাগ দাগড়া হয়ে ফুলে আছে। মার খেয়ে কাঁদা বারণ ছিল বলে তারা কাঁদত না। তারা মন দিয়ে খেলতে চাইত না। আমাদের ঘরে ঢুকতে চাইত।

জেরির সঙ্গে এয়ারগান ছুড়ি ওদের বারান্দায় গদির বিছানায় শুয়ে। ল্যাংড়া আম বাগানের মাঠে ফুটবল খেলি। দৌড়ই। চামড়ার দস্তানা পরে ঘুষি মারি বালির বস্তায়। জেন আমাকে 'হানি হানি' বলে খ্যাপায়। একটা কাশির পেয়ারার গাছ আছে ওদের বাড়িতে। জেন তাতে তরতরিয়ে উঠে যায়। 'ক্যাচ ইট, ক্যাচ ইট' বলে ছুড়ে দেয় নীচে। আমরা লুফি। কিন্তু অনেকক্ষণ সে-পেয়ারা আমি খেতে পারি না। কেন না, তাদের গায়ে জেনের হাতের সুগন্ধ লেগে থাকে। সে কি সেন্ট বা পাউডারের গন্ধ! না কি জেনের হাতের গন্ধই ও-রকম সুন্দর! হবেও বা, কোনও কোনও হাতে কিছু জন্মকালীন সুগন্ধ থেকে যায়। হয়তো জেনের হাতেও ছিল। পেয়ারাগুলো অনেকক্ষণ পকেটে রাখি। মাঝে মাঝে বের করে তুলে গভীর শ্বাস টেনে নিই।

জেরিদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে নির্জন রাস্তায় হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। দত্তদের বাগানের আলো করা ফুলের কেয়ারি। তারই ভিতরে ভিতরে সবুজ ঘাসের 'বেড'। সেখানে খঞ্জনার মতো তিরতির করে ঘুরে বেড়ায় তিনটি মেয়ে। অবাক হয়ে দেখি। দুর্লভ দূরত্বে বাস করে তারা। আমাদের বাড়ির পশ্চিম সীমানায় আম গাছটার ডালে দোলনায় দড়ি বাঁধতে উঠে তাদের দেখেছি প্রথমবার। মাথায় ফগ্‌গে জড়ানো বুড়ো মালী একা কাজ করে তাদের বাগানে। আর অজস্র ফুল আর ফুল আর গাছপালার মধ্যে তারা ভেসে বেড়ায়। পরদা সরানো জানালা দিয়ে দেখা যায়, কী সুন্দর সব দামি আসবাব তাদের ঘরে। কত দিন শুনেছি, তাদের বাড়ি থেকে অর্গান বাজানোর শব্দ। দেয়ালির দিন ছাদে উঠে দেখেছি, তারা তারাবাতি আর রং মশালের আলোয় কেমন অন্য পৃথিবীর মানুষের মতো হাসে। আমার দিদি বুনুর সঙ্গে তারা কখনও ভাব করতে আসেনি। তারা কালো দেহাতি আয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে টুকটুক করে হেঁটে কোনও অফিসারের বাড়ির ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলতে যায়। দুর্লভ দূরত্বে থাকে তারা। তাই তাদের গেটের সামনে বে-খেয়ালে থেমে যায় আমার পা। আমি হাঁ করে দেখতে থাকি। পাপি ফুলের বাগান পেরিয়ে ছোঁয়াছুয়ির খেলা খেলতে খেলতে তারা ছুটে ছুটে আসে, তারপর হঠাৎ আমাকে দেখে তিনজন বিস্মিতভাবে খেলা থামিয়ে দাঁড়ায়, ভয় পেয়ে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখে আমাকে। বুড়ো মালীটা উঠে এসে বলে, কী চাও খোকা? ভীষণ ভয় পেয়ে মাথা নেড়ে জানাই, কিছু না। পালিয়ে আসি। বুনুকে জিজ্ঞেস করি, দত্তদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে খেলতে যাস না, না? বুনু তার খেলার কুরুশকাঠিতে মনোযোগ রেখে সুতোর জাল বুনতে বুনতে বলে, ওরা কারও সঙ্গে খেলে না। ওদের বারণ আছে। লোভ হয় ওরা এক দিন আসুক রোগা বুনুর সঙ্গে খেলতে, ওরা এলে আমাদের বাড়িটা খুব সুন্দর হবে কিছুক্ষণের জন্য।

## ॥ পনেরো ॥

পূর্ণিয়ার দিকে লাইনে গেলে বাবা মাঝে মাঝে তাঁর সেলুনে করে দাতাবাবাকে নিয়ে আসতেন। সন্ন্যাসী ফকির মানুষ। শোনা যায়, পূর্ণিয়ার কোনও এক নবাবকে ঘোর বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর নামডাক, লোকে জানত, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

দাতাবাবাকে দেখে তেমন কিছু বোঝা যেত না। কাটিহারে আমাদের বিশাল বাগান দিয়ে ঘেরা বাংলো বাড়িটার একটা বাঁধানো চাতাল ছিল, মাঝে মাঝে বিকেলের খেলা সেরে ফিরে আসার সময়ে দেখতে পেতাম, সেই চাতালটায় কাঁঠালকাঠের পিঁড়ির ওপর দাতাবাবা বসে আছেন। থল থল করছে চর্বি, শরীরে থাকে থাকে খাঁজ পড়েছে, নাদা ভুঁড়িটা ঝুলে এসে পা দু'টিকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। প্রসন্ন মুখচোখ, গালে পানের ঢিবি, চারপাশের বাতাস ম ম করছে জর্দার গন্ধে। পিছনে দাঁড়িয়ে পাঁচুশেখের ছেলে ফকরুদ্দিন—তার ময়লা পাজামা বুকের কাছে তুলে বাঁধা, খালি গায়ে জির জির করছে পাঁজরা, একটু চিতিয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে হাতপাখা টেনে বাতাস করছে দাতাবাবাকে।

আমাকে দেখলেই দাতাবাবা ডাকতেন, আও, বাবা। বলে তাঁর প্রকাণ্ড হাত দিয়ে আমাকে কাছে টেনে বসাতেন। অমনি আমি তাঁর শরীর ছুঁয়ে দেখতাম কী ঠান্ডা তাঁর শরীর। তাঁর চার ধারে ছিল পানজর্দা, আতরের সুগন্ধ আর তাঁর শরীরের শীতলতা মেশানো এক ধরনের পরিমণ্ডল। তাঁর কাছে বসলে সবসময়েই মনে হত যেন নদীর পাড়ে, প্রকাণ্ড এক গাছের ছায়ায় বসে আছি। চার ধারে নির্জনতা জুড়ে অনেক সুগন্ধী ফুল ফুটেছে। কিন্তু বস্তুত তার চারধারে নির্জনতা কখনও দেখিনি। দাতাবাবা এসেছেন—এই খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ত। সন্ধের আগেই লোকজন আসতে শুরু করত। টি-আই মিত্র সাহেব, টকু বুধোর বাবা, দত্তসাহেব আসতেন তাঁর বুড়ি মাকে নিয়ে। চারধারে লোকজনের ভিড় লেগে যেত। সকলেই তাঁদের নিজেব নিজের দুঃখের কথা বলতে চাইতেন দাতাবাবাকে। দাতাবাবা প্রসন্নমুখে চুপ করে থাকতেন। সামনেই রেকাবে ভিজে ন্যাকড়ায় ঢাকা পানের খিলির রাশ। তা থেকে দু'টি-তিনটি খিলি তুলে একসঙ্গে মুখে দিতেন। নিমীলিত চোখে চেয়ে থাকতেন পশ্চিমের শিমুল গাছটার ডগার দিকে। আমার বরাবর মনে হত, তিনি সেখানে নেই। তিনি কয়েক শ' যোজন দূরে এক নদীর পাড়ে, গাছের ছায়ায় বসে আছেন, তাঁর চার ধারে সুগন্ধী ফুল ফুটে আছে, নিজের ভিতর থেকে উৎসারিত এক প্রসন্নতা তাঁকে মানুষের সুখদুঃখ থেকে বর্মের মতো ঘিরে আছে।

আমার মনে হত, তাঁর শরীরের কোনও তাপ ছিল না, ছিল শীতলতা। তবু তাঁর পছন্দ ছিল খুব ঝাল মাংস, রসুন পেঁয়াজ, কড়া জর্দা। শীতকালেও প্রয়োজন হত হাতপাখার বাতাস।

দাতাবাবা এলে বাবার সেলুনের খানসামা—দীর্ঘ শুষ্ক শরীর, প্রকাণ্ড নাক আর বিষণ্ণ মুখের পাঁচুশেখ বাড়ির পিছন দিকের চৌবাচ্চার শানবাঁধানো চাতালে বসে শান্তভাবে চারটে মুরগি জবাই করত। মা'র রান্নাঘরে মুরগি ঢোকা বারণ। আম গাছের তলায় আমাদের বাবুর্চিখানাটি সারা বছর খালি পড়ে থাকে। উঁচু বেদির মতো যে উনুন তাতে ঢুকে বসত করে মাকড়সা আর কাঁকড়াবিছে। দাতাবাবা এলে সেই উনুন ঝাড়পোঁছ করে তাতে আগুন দিত পাঁচুশেখ। টকটকে লাল মাংস রান্না করে দু'টি ডাব্বাই সুপ প্লেট ভরতি করে খাবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যেত।

সম্ভবত আমার কথা ভেবেই বাবা বারবার দাতাবাবাকে নিয়ে আসতেন বাড়িতে। মনে মনে তাঁর আশা ছিল, দাতাবাবা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে আমাকে রক্ষা করবেন। কারণ জ্বরে জ্বরে আমার শরীর সাদা, রোগা।

কখন যে জ্বর আসবে তার কোনও ঠিকই ছিল না। জ্বর আসত ক্লাসঘরে, রাস্তায়, খেলার সময়ে। হু-হু করে বয়ে আসত শীত। শরীরে কাঁটা দিত, কাঁপতে থাকত। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে, কিংবা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ উলটো দিকে ঘুরে, কিংবা খেলার মাঝখানে খেলা থামিয়ে আমি বাড়ির দিকে দৌড়তে থাকতাম। গায়ে লেপ দিয়ে চেপে ধরত মা। কাঁপুনি থামত টই-টম্বুর জ্বর এসে গেলে। বাইরে তখন হয়তো উত্তুরে হাওয়া মর্মর শব্দ তুলেছে দেবদারু গাছে। বারান্দায় কাঠের জাফরির তলায় ক্ষয়ে যাওয়া সিমেন্টের খাঁজে হেলে সাপ এসে ব্যাঙ ধরেছে। মর্মন্তুদ শেষ 'কঁ-কঁ' শব্দ করছে ব্যাঙটা। ভুট্টা খেতের ও-পাশে বাবুর্চির কোয়ার্টার থেকে মোটা লাঠি হাতে ছুটে এসেছে ফকরুদ্দিন, তার হাতে লণ্ঠন।

জ্বরের মধ্যে সেই ব্যাঙের ডাক, সাপ মারবার শব্দ, উত্তরের বাতাস—আমার আচ্ছন্নতার মধ্যে তীব্র ভয় হয়ে দেখা দিত। মনে হত, আমি বাঁচব না।

আমি যে বাঁচব না, এমন ধারণা অনেকেরই ছিল।

অনেক গরিব দুঃখী মানুষ পেটের দায়ে সাধু তান্ত্রিক সেজে ঘুরে বেড়ায়। তাদের প্রায়ই ডেকে আনত মা। তাদের অনেকে অনেক জলপড়া, মাদুলি, যজ্ঞের ছাই দিয়েছিল আমাকে। একজন বলেছিল, এর জন্ম যখন শনিবারে তখন এর শনিরই দশা। শনির চোখ বড় খারাপ। ভেবেচিন্তে সে একটি নিদান দিয়ে গেল। প্রতি শনিবারে একটি কালো কুকুরকে নারকেলের দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসত আমাদের বাচ্চা চাকর টুনটুনিয়া। সেটাকে বাঁধা হত আম গাছের তলায়। একটা তেলে ভাজা আটার লুচিতে সিঁদুর লাগিয়ে বাঁ হাতে ধরে লুচিটা কুকুরকে খাওয়াতে হত আমাকে। কুকুরটা খেতে চাইত না, চেঁচাত। এ-সব ঘটনার পর থেকেই আমি আমার স্কুলের বন্ধুদের কাছে প্রায়ই বলতাম, জানিস, আমি বেশি দিন বাঁচব না!

কেন?

ঠোঁট উলটে বলতাম, কী জানি! দেখিস আমি বাঁচব না।

দাতাবাবার পুজো-আর্চা ছিল না, ঝাড়ফুঁক তাবিজ কবচ ছিল না। হাত বা কোষ্ঠীও বিচার করতেন না। জর্দা দেওয়া পান মুখে হাসতেন। লোককে পরম স্নেহে কাছে ডাকতেন, বলতেন পুরনো দিনের কথা। খেতে ভালবাসতেন বলে লোকে তাঁকে মাছ, মাংস, ডিম, তরকারি, দুধ, মিষ্টি ভেট দিয়ে যেত। তিনি খুশি হতেন, এইমাত্র। দাতাবাবার কোনও ক্ষমতা আমি কখনও দেখিনি। আমার ভাল লাগত তাঁর শরীরের চার দিকে শীতল, সুগন্ধী বাতাসটি, আর তাঁর ওই ডাক—আও বাবা। কেবল এক বার—যখন দেবদারু গাছের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আমাদের বাড়ির চাতালে বসে সেই গোধূলির আলোয় তাঁর দূরলগ্ন চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত আমার মুখ নিরীক্ষণ করে তিনি বাবাকে বলেছিলেন, তোমার ছেলের পয়া সংখ্যা হল পাঁচ। মনে রেখো, পাঁচ। এই বলে তিনি অপার্থিব হাসি হেসেছিলেন। চর্বির স্তূপের মধ্যে ঢেকে গিয়েছিল চোখদু'টি।

বুঝিনি, কিন্তু পাঁচ সংখ্যাটির কথা আমি মনে রেখেছিলাম।

রেল লাইন বরাবর রাস্তা ধরে, শান্টিং ইয়ার্ড পার হয়ে, প্লাটফর্মে উঠে, ওভারব্রিজ পার হয়ে, বাজার ছাড়িয়ে দেড় মাইল দূরের মাইনর স্কুলে যাওয়ার সময় আমি সেই দীর্ঘ পথ পার হতাম খেলতে খেলতে। রেল লাইন থেকে পাথর কুড়োতাম, ছুড়ে মারতম টেলিগ্রাফের পোস্টে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম মালগাড়ির শান্টিং। ধীর গতির ইঞ্জিন আস্তে এগিয়ে এসে গুপ করে ধাক্কা মারছে মালগাড়িতে, নীল জামা পরা পয়েন্টসম্যান, দু' হাত তুলে চেঁচিয়ে বলছে—হো-ও-ও-ওপ। দেখতাম, মুখে কয়েকটা মালগাড়ি নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ—যেন খেলার ছলে—থেমে গেছে ইঞ্জিন, অসহায় মালগাড়িগুলো একা একা ভেসে যাচ্ছে লাইনের ওপর দিয়ে। গাড়ির গায়ে লেখা টনেজ নম্বর, দ্রুতবেগে মনে মনে যোগ করতাম। দেখতাম যোগফল পাঁচ হয় কি না। হলে, ছোটনাগবাবু—সেই রাগী মাস্টার আজ স্কুলে আসবেন না।

কখনও বন্ধ করা বই হঠাৎ মাঝখানের পাতায় খুলে ফেলতাম। পৃষ্ঠাসংখ্যা বিরানব্বই। নয় আর দুই যোগ করতাম। এগারো। আবার এক আর এক যোগ করতাম—দুই। না, পাঁচ হল না। বিমর্ষ হয়ে যেতাম। কিন্তু আবার কখনও একচল্লিশ বা বত্রিশের পাতা খুলতে পারলে খুশি হয়ে উঠে কোনও সৌভাগ্যের আশা করতাম। অবশ্য ঘটত না কিছুই। তবু খেলা। সারা দিন যত বার যত সংখ্যাই আসে চোখের সামনে তত বার যোগ করে দেখি। পাঁচ সংখ্যাটি মাথার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাসা নিল।

বুড়ো কালীনাথ ঘোষ আমাকে বাড়িতে পড়াতেন। এক দিন একটা শক্ত সরল অঙ্ক কষে দিচ্ছিলেন তিনি। অঙ্কটা বুঝবার চেষ্টাও করছিলাম না আমি, নিজের মনে অঙ্কটার মধ্যে পাঁচের খোঁজ করছিলাম। অঙ্কের সংখ্যাগুলো যোগ করতে করতে হঠাৎ আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলে ফেললাম, পাঁচ! পাঁচ! তা হলে ময়মনসিং যাওয়া হবে! স্তম্ভিত কালীনাথ আমার মুখের দিকে চেয়ে, গলার বাদামি মাফলারটার স্খলিত প্রান্ত কাঁধে ফিরিয়ে দিয়ে অবাক গলায় বললেন, কী বললে? উত্তরে কিছুই বলিনি। সেই অল্প

বয়সেই লক্ষ করেছি, মনের মধ্যে যে-সব অদ্ভুত জটিলতা থাকে তা বাইরের লোকের কাছে বোঝানোই যায় না। কিছুতেই বোঝানো যায় না।

যেমন আমার কেবলই মনে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার পৃথিবী ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। যেন একটা আলাদা গ্রহ, স্বপ্নে বা কল্পনায় দেখা জায়গার মতো ছিল তার অলীক সৌন্দর্য। মনে হয়, তখন পৃথিবীতে নিবিড় উদ্ভিদ জন্মাত। ঘন ঘাসে ছেয়ে থাকত মাঠ। তখনও পৃথিবীতে অনেক নিস্তব্ধ জায়গা ছিল। দেবদারু গাছে প্রবল হাওয়ার শব্দ শোনা যেত সারা দিন। সাহেব পাড়ায় পপি, মোরগ, গ্যাঁদা আর গোলাপের বাগানের নিস্তব্ধতায় আমাদের বাড়িটি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকত। যুদ্ধের আগেকার সেই পৃথিবী। তখনও অতিকায় কুস্তিগিরের মতো চেহারার ডবলিউ-ডি ইঞ্জিন আসেনি! ছোট্ট ইঞ্জিন ছিমছাম গাড়ি টেনে নিয়ে যেত। দূর থেকে বেতবনে বাতাস বয়ে যাওয়ার মর্মর ধ্বনি উঠত পূর্ণিয়ার শাটল গাড়ির। সারা দিন রাস্তায় লোক দেখা যেত না। ক্বচিৎ কখনও দীন গ্রাম্য চেহারার দু'-একজন ভবঘুরে উদাস চোখে চেয়ে হেঁটে যেত। তখনও পৃথিবীতে দাতাবাবার মতো কিছু মানুষ ছিল যাদের শরীর শীতলতা বিকিরণ করে।

সারা বছর নানাসময়ে আসত বগরী পাখির দু'টো খাঁচা বাঁকে ঝুলিয়ে একটা লোক। তার গায়ে চামসে গন্ধ। কিন্তু খুব বিশুদ্ধ হাসি ছিল তার। টাকায় কুড়িটা বগরী পাখি বেচত সে যুদ্ধের বছর পর্যন্ত। পালক আর ছাল ছাড়িয়ে মাথা সুদ্ধু পাখি সে কুটে দিয়ে যেত। এইটুকুন টুকুন পাখি, এক-একটায় এক টুকরো মাংস হত। সুস্বাদু সেই পাখি আমি বড় ভালবাসতাম। যুদ্ধ লাগার পর সেই পাখিওয়ালা আর এল না। মৃত পাখিদের ধূসর পালকের স্তূপ আর বাতাসে ওড়াউড়ি করেনি।

শীতকালে দুপুরবেলা আমি আর টুনটুনিয়া শিকারে বেরোই। সাহেব পাড়া ছাড়িয়ে, পূর্ণিয়ার রেল লাইন ডিঙিয়ে একটা খাদ। শুকনো সেই খাদের ও-পাশে দ্বীপের মতো একটা জায়গা। কোথা থেকে সেখানে রাজ্যের পাখি আসত। ছায়ায় ঢাকা, শ্যাওলায় শীতল সেই বনভূমিতে পড়ে থাকত গোখরোর খোলস, শামুক। লজ্জাবতী লতার ঝাড় হাতের স্পর্শে নিভিয়ে দিতে দিতে আমরা সেই গাছপালার গভীর ছায়ার ভিতরে চলে যেতাম। গুলতিতে টুনটুনিয়ার হাত ছিল পরিষ্কার। শিমুল গাছের মগডাল থেকে সে ঘুঘুর মাথা ভেঙে নামিয়ে আনতে পারত। পায়ের তলায় কড়া পড়েছিল বলে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত সে। রাতকানা ছিল, তবু তার ছিল ওই ক্ষমতা। পাখি মেরে সে প্রায়ই রক্ত চুষে খেত। তার ধারণা ছিল, রক্ত খেলে রক্ত হয়। টুনটুনিয়ার হাতে ঘাড় লটকানো পাখি—আমি নিথর হয়ে দেখতাম। টুনটুনিয়া হাত বাড়িয়ে বলত, দেখো, এখনও বুকটা চলছে। পাখির বুক ছুঁয়ে তার নরম বুকের উষ্ণতা টের পেতাম, দুর দুর করে কাঁপছে বুক, বোঝা যেত। রক্তমাখা ঠোঁটে টুনটুনিয়া হাসত।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে আমার মন খারাপ থাকত। ল্যাংড়া আমের বাগান ঘুরে সাহেব পাড়ার নির্জন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম টুনটুনিয়ার সঙ্গে। টুনটুনিয়া নিপুণ হাতে গুলতি ছুড়ত, আমার ভাল লাগত না। বিকেলের রং ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে লাগত আমার কাছে। মনে হত— আমি মরে যাব। অনেকক্ষণ বাদে যখন বাসায় ফিরতাম তখন শীতের বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আমাদের সাঁওতাল মালী বাগানের কোণে শুকনো পাতা, কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে তখন। মাঠের ছুঁচো কিংবা ধনুকে মারা পাখি পোড়াচ্ছে আগুনে। খাবে। মুখে-গায়ে লাল আগুনের আভা পড়েছে তার, চুলে পড়েছে ছাই, মাটি, মাটিমাখা হাতে লম্বা পিকা ধরিয়ে টানছে সে। সেই ধোঁয়ার আড়ালে তার উদাসী মুখখানা অতীতের কথা ভাবছে। ওই দৃশ্য দেখলেই মনটা আবার ভাল হয়ে যেত। পাতাপোড়ার মিষ্টি তীব্র গন্ধে চনমন করে উঠত আমার মন। হঠাৎ মনে হত, এ বহু পুরনো কালের চেনা গন্ধ আমার। আমি বহুকাল ধরে পৃথিবীতে আছি। আমি আরও বহুকাল থেকে যাব।

সে-বার টুনটুনিয়া নিশুতরাতে মেমসাহেবের জুতোর শব্দ শুনতে পেল। বাড়ির পিছন দিকের বাগানের শেষে ছিল একটা মরচে-ধরা তালা লাগানো গেট। সেই দিকে কেউ যেত না। ফলে, ভাট জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছিল সেদিকটা। সাপের খোলস পড়ে থাকত, ছড়িয়ে থাকত ইঁটের টুকরো। নিশুতরাতে ঘুম ভেঙে টুনটুনিয়া শুনতে পেল সেই গেট পার হয়ে জঙ্গলের ভিতরে কবেকার হারিয়ে যাওয়া বাগানের পথ চিনে এক মেমসাহেবের হাই হিল-এর শব্দ হেঁটে আসছে। ডাইনিং হলের বন্ধ

দরজা ভেদ করে ভিতরে ঢুকল সেই শব্দ। তারপর আমাদের সেকেন্ডহ্যান্ডে কেনা ডাইনিং টেবিলটার চার পাশে হেঁটে, কয়েক বার ঘুরে আবার ফিরে গেল আগাছায় হারিয়ে যাওয়া পথ ধরে তালা লাগানো গেটের দিকে। খাওয়ার ঘরের কোণে চটের বিছানায় শুয়ে টুনটুনিয়া মাঝরাতে 'বাপরে ভূত' বলে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতি লাগল তার। এরপর থেকে প্রায় দিনই সে শুনতে পেত মেমসাহেবের জুতোর শব্দ, আর তার দাঁতি লাগত। ক্রমে তাকে সরিয়ে আনা হল আমাদের খাটের তলায়। কিন্তু তবু সে ওই শব্দ শুনতে লাগল। গুণিন ডেকে ঝাড়-ফুঁক করা হল তাকে। বাড়িতে পুজো দেওয়া হল। তবু অবশেষে টুনটুনিয়ার স্থায়ী মৃগীরোগ ঠেকানো গেল না। দেশে ফিরে গেল সে।

এই ঘটনার পর এক্স-ই-এন সাহেবের আরদালি অনিল ভাদুড়ি প্রায়দিনই সন্ধেবেলার পর এসে মেঝেয় ঠ্যাং ছড়িয়ে বসত। কালীনাথ মাস্টারমশাই চলে গেলে শুরু হত ভূতের গল্প। মা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলত, ও বাবা অনিল, ভূতের গল্প বলিস না। ওদের হাগতে মুততে আঁচাতে সঙ্গে একজন দাঁড়ানোর লোক লাগে। অনিলদা চেঁচিয়ে বলত, না মা, সে-গল্প নয়। এ অন্য ভূত। গলা নামিয়ে বলত, আমার মাসি কলকাতায় সেবার পুরনো বাসা বদলে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের একটা বাড়িতে গেল। নতুন বাসাটা ছিল ভূতের আড্ডা। গিসগিস করছে ভূত। এই জিনিস ফেলে, সেই জিনিস ভাঙে, খোনা গলায় কথা বলে, মাছ চুরি করে খায়। মাসি ভড়কে গিয়ে মেসোকে বলল। মেসো কথাটা গায়ে মাখলেন না। তারপর এক দিন মেসোকেও টের পেতে হল ভূতের উপদ্রব। বাঁধানো দাঁতের পাটি রাখলে হাওয়া হয়ে যায়, চটি খুঁজে পান না, রাতে শিয়রের কাছে বেড়াল কাঁদে। মেসো হেঁকে মাসিকে বললেন, এ-সব কী হচ্ছে? মাসি বললেন, ভূত। মেসো মহা রেগে চেঁচিয়ে বললেন, ভূতগুলোকে তাড়াতে পারো না? খবরদার, যেন ভূত আর আমার জিনিসপত্র না ধরে। শুনে মাসির বড় রাগ হয়ে গেল—কুকুর বেড়ালের ওপর যেমন মাঝে মাঝে গেরস্তর রাগ হয়। ফলে মাসি সারা দিন সেই ভূতের পালকে তাড়া করে ফিরত। কখনও গরম শিক, কখনও বঁটি নিয়ে। তা ছাড়া মাসি আবার নিমতেঘোলা-ওতরপাড়ার মেয়ে, দারুণ ঝগড়াটে। তার মুখের সামনে ভূতগুলো দাঁড়াতেই পারত না। এইভাবে ভূত তাড়াতে তাড়াতে মাসির এমন অভ্যাস হয়ে গেল যে, বাসার কোথাও একটা ভূত একটু নড়লেই টের পেত। শোবার ঘরে হয়তো বাক্স খুলছে মাসি, কোথাও কোনও শব্দ হয়নি, কিন্তু মাসি হঠাৎ উঠে 'তবে রে ভাতারখাকি, পান্তাভাতগুলো গিলতে এয়েছিস' বলে রান্নাঘরে ছুটে যেত। ভূতগুলো দারুণ ভয় পেত মাসিকে। মাসিও তাদের প্রত্যেককে চিনে গিয়েছিল, আলাদা আলাদা নাম ধরে ডেকে বকাবকি করত। আমার ছোট মাসতুতো ভাইবোনগুলো পর্যন্ত ভূতগুলোকে ভয় পেত না। সবচেয়ে ছোট বোনটা শুনি এক দিন সিঁড়ি থেকে ডেকে বলছে, দ্যাখো না মা, চোখখেগো আমাকে ভয় দেখানোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে— 'তবে রে অলপ্পেয়ে' বলে মাসি খুন্তি হাতে ছুটে গেল। আর ভূতের পালানোর কায়দা দেখে বোনটা হেসে কুটিপাটি। তা সেই ভূতগুলো কিন্তু পরের দিকে মাসির সঙ্গে ভাবসাব করে নিয়েছিল। মাসিও আর তাদের বেশি তাড়া করত না। মাসির ছিল বাতের ব্যামো, শোনা যায় তারা চুপি চুপি এসে মাসির পা টিপে দিত। ঠিকে ঝি না এলে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে যেত। ভূতের ছোঁয়া বলে মাসি সেগুলো আবার জলে ধুয়ে ঘরে তুলত। আমরা যখন মাসির বাড়িতে যেতাম তখন গলির মুখ থেকেই চেঁচিয়ে রাম নাম করতে করতে যেতাম। অনেক সময়ে আমাদের সেই রামনাম শুনে মাসি দোতলার জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলেছে, ওরে তোরা রামনাম করিস না, রামনাম করিস না। আজ আমার ঝি আসেনি। মুখপোড়াগুলোকে খয়রা মাছ ভাজা খাইয়ে বাসন মাজতে বসিয়েছি। ও-নাম শুনলেই পালিয়ে গিয়ে ছাদে বসে ঠ্যাং দোলাবে, আর টিকিও দেখাবে না এ বেলা...

দত্তদের বাড়ির তিন মেয়ে 'আলভেট' সিঁথি কাটে, গায়ে দেয় মেম-জামা। তাদের মা গানে গীতশ্রী, হানিকম্ব করা হাতার ব্লাউজ পরেন তিনি। সারা দিন তারা সবাই সাজগোজ করে ফিটফাট থাকে। আমি ময়মনসিংহের বড় পরিবারে অযত্নে বেড়ে ওঠা কুকু, আমি তাই সাজগোজ দেখলে, ফিটফাট কিছু দেখলে ভয় পাই। দত্তদের বাড়িতে নিচু একটা পেয়ারা গাছ আছে। কাশীব পেয়ারা।

নতুন চাকর হাজারী আমুদে লোক। প্রায়ই সাহেবগঞ্জ কি ভাগলপুর থেকে কলসিভরা দুধ কাঁধে করে নিয়ে আসে পায়েসের জন্য। তার সঙ্গেও আমি সাহেব পাড়ার আনাচে-কানাচে ঘুরি। গুলতিতে তার

হাত নেই, সাঁওতাল মালীটা যখন তির-ধনুকে পাখিপক্ষী বা ছুঁচো মারে তখন তার চোখ ছলছল করে। হত্যা বা রক্তপাত সে সহ্য করতে পারে না।

এক দিন বিকেলে দত্তদের বাড়ির কম্পাউন্ড ঘেঁষে যাওয়ার সময়ে দেখতে পাই ফুটফুটে তিন বোন পেয়ারা গাছের তিনটে নিচু ডালে ছবির মতো বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিই। হাজারী আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, খোকাবাবু, পেয়ারা চাও না ওদের কাছে, ওরা তো চেনে তোমাকে। কিন্তু আমার ভীষণ লজ্জা করতে থাকে। তাই হাজারীই এগিয়ে বলে, ও মেমসাহেব, খোকাবাবু পেয়ারা মাঙছে। দেবে? তিন বোন খুব অবাক হয়ে তক্ষুনি টপাটপ পেয়ারা পেড়ে ছুড়ে দেয় আমাদের দিকে। আমরা লুফে নিতে থাকি। আমরা যত খেতে পারি, তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছিল তারা। ভদ্রতাবশত, করুণাবশত। সম্ভবত তারাও জানত, টি-আই সাহেবের ছেলেটা বেশি দিন বাঁচবে না। পেয়ারা দেওয়া শেষ করে সবচেয়ে ছোট বোনটি গাছের ডাল ধরে লাফ দিয়ে নেমে মুখ ফিরিয়ে আমাকে বলল, একটু দাঁড়াও। তারপর ছুটে গেল তাদের ঘরে। আমরা জড়সড় হয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে যখন ফিরে এল তখন তার পিছনে বাচ্চা একটা চাকর। তার হাতে ট্রে, ট্রেতে একটা কাচের গ্লাসে দুধ। কাছে এসে মেয়েটি বলল, খাও। মা পাঠিয়ে দিল। লজ্জায় তখন আমার ঘাম দিচ্ছে। কী আশ্চর্য সুগন্ধ আসছে তার গা থেকে! কী সুন্দর তার মুখ-চোখ আর রং, লালচে রঙের ববচুল কী মসৃণ ভাবে ঘাড়ে নেমে এসেছে! সে উগ্র আগ্রহে আমাকে দেখছে। বাড়ির বাইরের অচেনা মানুষজন সে বড় একটা দেখেনি। অনুনয়ের সুরে সে বলছে, খাও।

আমি একটাও প্রতিবাদের কথা বলতে পারলাম না লজ্জায়। সে অত সুন্দর বলে চোখ তুলতে পারলাম না, বলতে পারলাম না, আমি দুধ খাই না। আমার গন্ধ লাগে। বরং হাত বাড়িয়ে আমি গ্লাসটা তুলে চুমুক দিলাম। কী সুন্দর, সুস্বাদ সেই দুধ। আমার ভিতরটা লজ্জায় আর আনন্দে ভরে গেল।

ওই ভাবেই কি সেই বাচ্চা মেয়েটি আমার ভিতরে প্রথম সঞ্চার করল নারীপ্রেম! কে জানে! এ-সবই সেই অন্য পৃথিবীর কথা— যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি, যখন নিবিড় গাছপালা জন্মাত পৃথিবীতে...

আমাদের বাড়ির এক পাশে ছিল পি-ডব্লিউ ইন্সপেক্টর চৌধুরী সাহেবের বাংলো। এক বিকেলে দেখি চৌধুরীদের বারান্দায় বসে আছেন দাতাবাবা, তাঁর সামনে অনেক লোক। আমি এক ছুটে গিয়ে তাঁর সামনে পড়লাম, দাতাবাবা, আপনি এখানে? তিনি 'আও বাবা' বলে দু' হাতে আমাকে কোলে নিলেন। তখন দেখি, তাঁর পায়ের কাছে মেঝেয় বসে চৌধুরী সাহেব কাঁদছেন। দাতাবাবা আমার কানে কানে বললেন, মুশকিলে পড়লেই এরা আমাকে ধরে আনে। আমি কি জাদু জানি?

শুনলাম, পুলিশের লোক মার্চেন্টের ছদ্মবেশে চৌধুরী সাহেবকে সই-করা নোট ঘুষ দিয়েছে। তিনি ধরা পড়েছেন। কয়েক দিন বাদে পুলিশ এল। প্রকাশ্যে চৌধুরী সাহেবকে ধরে নিয়ে গেল। সাহেব পাড়ার রাস্তায় অনেক লোক দাঁড়িয়ে দেখল দৃশ্যটা। পুলিশ পরিবেষ্টিত চৌধুরী সাহেব হেঁটে চলেছেন। পিছনে দাতাবাবা, দাতাবাবার মুখ-চোখ তখনও প্রসন্ন। জর্দার গন্ধে ম ম করছে বাতাস। লোকে বলাবলি করল, দাতাবাবা বাঁচিয়ে দেবেন।

কিন্তু তা হল না। চৌধুরী সাহেবের চাকরি গেল। জেল হল। ফাঁকা বাড়িটায় এল ভোলা সিং নামে এক পাঞ্জাবি শিখ।

দাড়ি ছিল, পাগড়ি ছিল, হাতে ছিল বালা, তবু সেই প্রৌঢ় ভোলা সিংকে নিতান্ত নিরীহ আর ভিতু দেখাত। তাঁর তিন ছেলের নাম ছিল নির্মল, বিমল, অমল। তারা পাগড়ি বাঁধত না, অনর্গল বাংলায় কথা বলত। এক দিদি ছিল তাদের— দেবী। সবাই বাঙালি চেহারার। কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের এমন ভাব হয়ে গেল যে, ভোলা সিং কম্পাউন্ডের কাঁটাতার আর গাছের বেড়া কেটে দু' বাড়ির লোকদের যাতায়াতের জন্য আলাদা দরজা করে দিলেন। আমি একা ছুটে নির্ভয়ে তাদের অন্দর মহলে চলে যেতাম। স্বামী নিত না তাই দেবীদি বাপের বাড়িতে নির্বাসনে, সারা দিন বসে তৈরি করতেন শালগম আর লঙ্কার আচার, সাগুর পাঁপড়, জাঁতায় ভাঙতেন ডাল। ভাইরা সবাই ছিল আমার চেয়ে অনেক বড়। সেই পরিবারে বোধ হয় শিক্ষার প্রসার কম ছিল, কেননা, অমল সেবার ম্যাট্রিকের টেস্টে অ্যালাউ হলে বিয়েবাড়ির মতো ভোজ দিয়েছিলেন ভোলা সিং। ফাইনাল পরীক্ষার পর

আমাদের দুই পরিবারের মহিলা আর ছেলেমেয়েরা গেলাম কুশী নদীর ধারে বনভোজন করতে। সঙ্গে গেল বিপুল জিনিসপত্র, কয়েকজন ঠাকুর-চাকর, আর দু'টো বন্দুক। এক দিকে রান্নাবান্নার আয়োজন, গাছতলায় শতরঞ্জি পেতে উলবোনা আর গল্পের আসর বসল, অন্য দিকে সিং-রা তিন ভাই কলার বনের মধ্যে ঢুকে বন্দুক ছুড়ে পাখি মারার চেষ্টা করতে লাগল। একটাও পাখি পড়ল না, কিন্তু বন্দুকের শব্দ আর ধোঁয়ায় ভরে গেল চার দিক। আমি তাদের পিছু-পিছু ঘুরে দেখতে লাগলাম, তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে বার বার। রোগা, সাদা, দুর্বল, ন্যাংলা আমি সেই তিন ভাইয়ের হাতে দু'টো চকচকে বন্দুকের দিকে তৃষিত চোখে সারা দিন চেয়ে থাকলাম। বন্দুক—বন্দুকের মতো এমন লোভনীয় আর কী আছে। একটা বন্দুক হাতে পেলেই আমার সব দুর্বলতা, রোগ-ভোগ ঝরে যাবে।

সারা দিন রোদে ঘুরে, ঘেমেচুমে তিন ভাই যখন কাহিল, তখন হঠাৎ নির্মলদা ডেকে বললেন, আয় তো কুকু, ছোড় তো বন্দুক।

আমি অবিশ্বাসের হাসি হাসলাম। কী করে ছুড়ব? ওই প্রকাণ্ড, ভারী বন্দুকের ভারই যে সহ্য করতে পারব না। দাতাবাবা, তান্ত্রিক আর সাধুদের দয়ায় আমি বেঁচে আছি। বন্দুক ছোড়া কি আমার কাজ? তবু নির্মলদা জোর করে আমাকে নদীর ধারে টেনে নিয়ে গেলেন। বললেন, ছোড় না, দেখি। কোনও ভয় নেই, ফাঁকা টোটা ভরে দিয়েছি। এই বলে আমার কাঁধে বন্দুকের কুঁদো লাগিয়ে নলটা ধরে তিনি হাসলেন, চিরকাল কি বুরবক হয়ে থাকবি? ঘোড়া টিপে দে, সবাই চমকে যাবে।

নদীর জল তখন স্থির, শান্ত। বহু দূর পর্যন্ত শান্ত মহা নীলাকাশ। দিগ্‌বলয়ে হস্তীযূথের মতো মেঘখণ্ড চলে যাচ্ছে। ও-পারে কাশবনে বাতাসের খেলা। বন্দুকের মাছিতে চোখ রেখে সেই শেষ বার আমি বিশ্বযুদ্ধের আগেকার পৃথিবীকে দেখে নিলাম। বন্দুকের ঘোড়ায় আমার বাঁকানো তর্জনী ক্রমে শক্ত হচ্ছে। কানের কাছে এক পুরুষ গলা বলছে, টিপে দে, ঘোড়াটা টিপে দে, দ্যাখ, কেমন চমকে যায় সবাই...

ভয়ংকর শব্দে আমার ভিতরটা চৌচির হয়ে গেল। বন্দুকের ধাক্কায় আমি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। আর সেই শব্দ চরাচরে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে উচ্চাবচ বয়ে যেতে লাগল।

আমি বন্দুক ছুড়লাম। আমার সেই অসম্ভব কৃতিত্ব তারা কেউ দেখল না যারা আমাকে করুণা করত। দেখল না তুলারানী, দত্তবাড়ির সেই করুণাময়ী মেয়েটা, দেখল না হরিদাসের কিশোরী দিদিটি, দেখল না আমার মা'ও। কিন্তু আমার বন্দুকের শব্দ ঠিকই শুনেছিল পৃথিবীর যুযুধান মানুষেরা। তারা যেন এই সংকেতের অপেক্ষায় ছিল এত দিন। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ।

## ॥ ষোলো ॥

দাতাবাবাকে বহুকাল আর দেখি না।

কে যেন এক বার পূর্ণিয়া থেকে খবর আনল, পূর্ণিয়ার লোকেরা দাতাবাবাকে ভীষণ মেরেছে। গলায় কাপড় দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে রাস্তা দিয়ে। তারা গালাগাল দিয়ে বলেছে যে, দাতাবাবা জোচ্চোর, ঠগবাজ, লোকে তাকে খাওয়ায় দাওয়ায়, কিন্তু সে কারও কোনও উপকার করতে পারে না। দাতাবাবা এর কোনও উত্তর দেননি, মার খেয়ে নীরবে কেঁদেছেন। রাস্তা দিয়ে যখন তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে, তখন লোকে তাঁকে ঢিল মেরেছে, থুথু দিয়েছে গায়ে। দাতাবাবা প্রতিবাদ করেননি।

দাতাবাবার অলৌকিক ক্ষমতার সব কাহিনী হঠাৎ নিভে গেল। বাবা পূর্ণিয়ার দিকে লাইনে যেতেন। কিন্তু আর কখনও দাতাবাবাকে আনতেন না। আমি মাঝে মাঝে সেই প্রসন্ন, হাসিমুখ মানুষটির কথা ভেবে দুঃখ পেতাম। কখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ত তাঁর শরীরের চার ধারে সুগন্ধী শীতলতা। যেন নদীর পাড়, গাছের ছায়া, চার ধারে গাছে গাছে গন্ধকুসুম। ভাবতে ভাবতে আনন্দে বুক ভরে যেত। খেলা সেরে বিকেলে ফেরার সময়ে প্রায়ই ভাবতাম. আজ যদি বাড়ি ফিরে দাতাবাবাকে দেখি বসে আছেন?

বছরের শেষে সেবার এক দিন কালীনাথ মাস্টারমশাই দুপুরেই এসে হাজির। তখন বার্ষিক পরীক্ষা

হয়ে গেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই ফল বেরোনোর কথা। মাস্টারমশাই ভীষণ উত্তেজিতভাবে আমাকে ডেকে বললেন, তোমার স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে জানতে পারলাম, তুমি অঙ্কে ফেল করেছ। অথচ পরীক্ষার সব অঙ্কগুলো তোমার বাড়িতে করা ছিল। কেন ফেল করলে? অ্যাঁ! কেন?

আমি ভয় পেয়ে কুঁকড়ে যাই। কী করে বলব যে পরীক্ষার হলে আমি একদম সময় পাইনি। আমি কেবল সমস্ত অঙ্কগুলো যোগ করে দেখেছিলাম, যোগফল পাঁচ হয় কি না। কিন্তু মনের এইসব জটিল কথা বলাই যায় না। বললেও বুঝবে না কেউ।

যুদ্ধের কথা শুনি, কিন্তু তেমন কিছু টের পাই না। আমরা আগের মতোই কাটারিভোগ চালের ভাত খাই। পাতে ভাত ফেলি। সে ভাত হাজারী ঢেলে দিয়ে আসে টমি কুকুরকে। ভেলভেটের প্যান্ট, পরিষ্কার জামা, পায়ে মোজা-জুতো, পাট করে আঁচড়ানো চুল— এই বেশে ঘুরে বেড়াই। স্কুলের বন্ধুরা 'সাহেব' বলে ডেকে খ্যাপায়। টিফিনে চিনেমাটির কেটলিতে ঘোল কিংবা দুধ আর টিফিন-বাটিতে মাখন মাখানো পাঁউরুটি নিয়ে আসে হাজারী। ফাঁকা ক্লাসঘরে বসে অনিচ্ছায়, লজ্জায় তাড়াহুড়ো করে খাই, দু'-একটা লোভী মুখ উঁকি মারে। চেঁচিয়ে সবাইকে ডাক দেয়, দেখে যা, সাহেব খাচ্ছে।

যুদ্ধ চলে দূরে। সাহেব পাড়ায় ভিখিরির আনাগোনা বাড়তে থাকে। আগে যারা ভিক্ষে করতে আসত তাদের সবাই ছিল আমাদের মুখচেনা। আমরা জানতাম কে রোজ আসে, কে আসে সপ্তাহে দু' দিন, কার কোন দিন আসার কথা। কিন্তু ক্রমে অচেনা ভিখিরিরা আসতে থাকে। আগে বেলা বারোটার পর ভিক্ষুকরা ফিরে যেত, তারপর আর কেউ আসত না। এখন দেখি, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উলিঝুলি পোশাক পরা মানুষেরা আসছে। তারা সবাই খোঁড়া কানা আতুর নয়। কিন্তু বড় রোগা। তারা ভাত চায়, ফ্যান চায়, রুটি চায়। আর কিছু না পেলে, বাগানের গাছ থেকে ভুট্টা দিতে বলে। কিছু না পেলে যেতে চায় না। আসা-যাওয়ার পথে দেখি নির্জন সাহেব পাড়ার দেবদারু গাছের তলায় ছেঁড়া মাদুর কিংবা চটের ওপর বহু লোক, মেয়ে, শিশু শুয়ে-বসে আছে। তারা আমাকে দেখে ডাকে, লোক দেখলেই ডাকে। সেই ডাকে সাড়া দেওয়া বারণ বলে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাই। খাবার নিয়ে বাইরে বসে খেতে মা বারণ করে। খেতে গেলে দেখেছি গেটের বাইরে থেকে একজন-না-একজন জুলজুলে চোখের ভিখিরি ঠিক চেয়ে আছে। বাড়ির পিছনে বাঁশ দিয়ে খাটানো তারে জামা-কাপড় শুকোয়। সেখান থেকে মাঝে মাঝে শাড়ি জামা প্যান্ট চুরি যায়। ভুট্টা ছিঁড়ে নিয়ে চলে যায় কে যেন। রাতে ঘুমের মধ্যেও হঠাৎ শুনতে পাই তাদের চিৎকার। আগে ভিখিরি ফিরত না আমাদের বাড়ি থেকে। এখন একটা লোহার নাল পরানো লাঠি হাতে হাজারী সবসময়ে পাহারায় থাকে। ভিখিরি এলেই তাড়িয়ে দিয়ে আসে। যখন সহজে যেতে চায় না তখন ধাক্কা দিয়ে সরায়, ঠেলতে ঠেলতে রেল লাইনের ও-পারে দিয়ে আসে। তাবা তেমন রুখে দাঁড়ায় না, ঝগড়া করে না। আমার সাহস বাড়ে। এক দিন হাজারীর সঙ্গে দু'টো ভিখিরিকে লাইন পার করে এসে অদ্ভুত এক উত্তেজিত আনন্দ বোধ করি। তারপর থেকে রোজ হাজারীর সঙ্গে ভিখিরি তাড়াই। হাতে চামড়ায় বাঁধানো একটা শখের হান্টার থাকে, তার আগায় চামড়ার কান পরানো। জোরে চালালেই বাতাসে সেই কান দুটো ফটাস করে শব্দ করে। ভিখিরিরা ভয় পায় সেই শব্দে। কাকুতি মিনতি করে। মাঝে মাঝে গুলতি টিপ করি। হাজারী বারণ করে, মেরো না। গুলতি খেলে মরে যায় যদি!

ক্রমে আমার সাহস এতটা বাড়ে যে হাজারী বাড়িতে না-থাকলেও আমি একাই ভিখিরিদের তাড়া করে আসি। নেশার মতো সেই খেলা জমে ওঠে।

তখন দুপুরবেলা, হাজারী গেছে ভাগলপুরে পায়েসের জন্য দুধ আনতে। বুনু এক্কাদোক্কা খেলছে টকু বুধো বেলীর সঙ্গে। তির-ধনুক দিয়ে আমি জাম গাছের কাণ্ডে টিপ করছি। সেই সময়ে আমাদের বাবুর্চিখানার বারান্দার সামনে গাছতলায় এসে দাঁড়াল দু'জন ভিখিরি। অল্পবয়সি একটি যুবা। রোগা সে, খুব লম্বা, হাতের লাঠিতে ভর করে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, সঙ্গে এক বুড়ি, তার কোমর ধরে দাঁড়িয়ে—বোধ হয় তারা মা আর ছেলে। আমি দৌড়ে গিয়ে আমার হান্টার নিয়ে এলাম, মজা দেখতে আমার পিছু নিল বুনু আর বেলী।

বুনু পিছন থেকে ডাকল, যাস না কুকু, লোকটা কেমন বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে দ্যাখ। বোধ হয় মারবে—

আমি তাকে জিব ভেঙিয়ে দৌড়ে গেলাম ভিখিরিটার কাছে, হান্টার তুলে চেঁচিয়ে বললাম, যাও— ভাগো—

লোকটার হাতে কলাইকরা বাটি, হাঁটুর ওপরে তোলা ধুতি, তার নীচে রোগা বকের ঠ্যাং। তার হাত এত রোগা যে তার কনুইয়ের হাড় গিঁটের মতো উঁচু হয়ে আছে। আমার দিকে সে স্থির চোখে চেয়ে দেখল মাত্র। নড়ল না।

তার তাকানো দেখে আমার একটু কেমন করল বুকের ভিতরটা। তবু বেলী তাকিয়ে আছে বলেই আমার অহংকার প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি তাকে যত চলে যেতে বলি, তাড়িয়ে দিই, সে তত স্থির চোখে আমাকে দেখে।

পিছন থেকে বুনু এসে আমার হাত টানল, চলে আয় কুকু, লোকটা ভাল না।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিলাম রাগে, অভিমানে।

লোকটা কিছুতে যাচ্ছে না। সেইরকম ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। রোগা, জেদি, বোকার মতো। একটিও কথা নেই মুখে। কেবল তার বুড়ি মা বিড়বিড় করে বলছে, চলি-চল হিঁয়াসে—

আমি চেঁচিয়ে বলতে থাকি, যাও, ভাগো—আভি যাও—

রাগে আমার গা গরম হয়ে যায়। ঘাম ছোটে।

লোকটা কিছুই বলে না, কিছুই করে না। অনড় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি অসহায় বোধ করি। অক্ষম মনে হয় নিজেকে। রাজ্যের কাক হুটোপাটি করছে গাছে, ঝাউগাছে বাতাস লাগার শব্দ। আমার পিছনে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুনু আর বেলী, সামনে সেই রুগ্‌ণ যুবা জেদি ভিখিরি। মাঝখানে আমি— অসহায়, দুর্বল, আমি একটা ভিখিরিকে ভয় পাই! আমি কি অনেক ভিখিরিকে লাইনের ও-ধারে পার করে দিয়ে আসিনি! আমি কি এয়ারগান চালাই না! ফুটবল খেলি না জেরির সঙ্গে ল্যাংড়া আমের বাগানে! আমি কি ঘুঁষি চালাইনি বালির বস্তায়। তবে কেন ভিখিরিকে ভয় পাব। কেন এই জেদি ভিখিরিটা দাঁড়িয়ে থাকবে আমার সামনে, কেন কথা শুনবে না!

আমার হান্টার খুলতেও সে ভয় পেল না, হান্টারের কানের ঝাপটা লাগল তার হাতের বাটিটায়। ঠং করে পড়ল বাটিটা মাটিতে। খুব অল্প, আধমুঠো চাল কিংবা চালের খুদই হবে—ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

মুহূর্তের মধ্যে ভিখিরি পালটে গেল। যেন বা ভিখিরির ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে এল রাজার মূর্তি। জ্বলজ্বল করে উঠল তার দুই চোখ। রোগা মুখের চোয়ালে ঢেউ খেলে গেল। পলকের মধ্যে সে তার রোগা দুই হাতে প্রকাণ্ড লাঠিটা মাথার ওপর তুলে ফেলল—থরথর করে সে কাঁপছে—খিদেয়, উত্তেজনায়। আকাশ-পাতাল ব্যাপ্ত বিশাল গলায় চেঁচিয়ে বলল, তোলো। একটা একটা করে চাল কুড়িয়ে দাও, কুকুর—তোলো তোলো শিগগির—খুঁটে খুঁটে তুলে দাও—

আমি ভীষণ অবাক হয়ে সেই সুমহান দৃশ্য দেখি। রোগ এবং ক্ষুধায় জীর্ণ ভিখিরির হাতে উদ্যত আকাশ-ছোঁয়া লাঠি, থরথর করে হাত কাঁপছে, টলছে পা। ক্ষোভে আক্রোশে তার চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। তার চিৎকারে ভয় পেয়ে খা-খা করে ডেকে ঘুরে ঘুরে উড়ছে কাকের পাল! বুনু আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলছে, কুকু, পালিয়ে আয়— দৌড় দে— ও মা, দেখে যাও— কুকুকে মেরে ফেলল—

আমি আস্তে আস্তে ভেঙে যাই তার সামনে। হাতের হান্টার খসে পড়ে। সেই আধ-ল্যাংটা, ক্ষুধার্ত, রোগা রাজাধিরাজের মতো ভিখিরির সামনে ভেলভেটের প্যান্ট পরা আমি ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে ধুলোয় বসি। আমার ঠোঁট কাঁপে, কান্নায় কেঁপে ওঠে বুক, ভয়ে ঝিমঝিম করে শরীর। ভিখিরির সামনে বসে আমি তার বাটিতে চাল কুড়িয়ে দিতে থাকি।

ঠিক সেই সময়ে তাদের কালো দেহাতি আয়ার সঙ্গে দত্তদের বাড়ি থেকে খঞ্জনা পাখির মতো তিনটি মেয়ে ভাব করতে এসেছে বুনুর সঙ্গে। তারা এসে দাঁড়িয়েছে চৌবাচ্চার পাড়ে ঝুমকো জবা গাছটার পাশে। পাশাপাশি গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তারা তিন বোন ভারী অবাক চোখে দেখছে—উদ্যত লাঠি হাতে রোগা ভিখিরির সামনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আমি তার ছড়ানো চাল কুড়িয়ে দিচ্ছি।

সেই সময়ে পূর্ণিয়ার শাটল গাড়িটি গেল ঝিকঝিক করতে করতে।

দূরের যুদ্ধ চলতে থাকে। দেখতে পাই সেই যুদ্ধ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। গোরা সৈন্যরা চলেছে ট্রেনের কামরা বোঝাই হয়ে। তাদের খালি গা থেকে আলো ঠিকরে স্টেশন আলো হয়ে থাকে। তারা আমাকে ইস্কুলের পথে দেখতে পায়। ডাকে। দূর থেকে বিস্কুটের প্যাকেট ছুড়ে দিয়ে যায়। সেই বিস্বাদ আটার বিস্কুট কুড়িয়ে আনি টমি কুকুরটার জন্যে।

রেল-ব্রিজের তলায় খালাসিটোলার রাস্তার পাশে, হাসপাতালের বাগানের তারের ধারে মরে পড়ে থাকে ভিখিরির দেহ। আমরা দল বেঁধে দেখতে যাই।

এক-এক দিন স্কুল থেকে ফেরার দীর্ঘ রাস্তায় একা হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। হঠাৎ কেমন সেই আগেকার জ্বর আসার মতো গা শিউরে ওঠে। রাস্তায় কেউ নেই। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত সেই শূন্য রাস্তাটি দেখি, হঠাৎ চোখ তুলে আকাশে অপরাহ্ণের চিল দেখতে পাই, দেখি দেবদারুর সবুজ। কিন্তু হঠাৎ কেমন মাথার ভিতরে সব ঘোলা জলের ঘূর্ণির মধ্যে তলিয়ে যায়। মনে হয়, এ-সব ধুলোমাটির খেলনা, অবাস্তব। একা একা হঠাৎ মনে হয় আমি এখানে কেন? আমি কে? কোথায় চলেছি আমি?

মনে হতে থাকে—মনে হতে থাকে। আর আমি ভীষণ ভয় পেয়ে নিজের নাম মনে করতে পারি না, মনে করতে পারি না কোন বাড়িটা আমাদের, পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, ভুল পথে এসেছি। কয়েক মুহূর্তের জন্য শরীর অবশ হয়ে আসে। শূন্য হয়ে যায় মাথা। একটা দমকা হাওয়ায় স্মৃতি থেকে সব চিহ্ন উড়ে যায়। আমি দেবদারু গাছের গায়ে হাত চেপে ধরি। পাথরে হাত রেখে আর-একটা পাথর দিয়ে ঠুকি।

ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসি নিজের কাছে। কিন্তু কেবলই মনে হয়, আমার চারি দিকে যে-সব দৃশ্য, তারই আড়ালে আবডালে মাঝে মাঝে উঁকি মারে আর-একটা পৃথিবীর ছবি। সেখানেও আছে গাছপালা, শস্যক্ষেত্র, মাটি ও আকাশ। কোথাও কোনও একটা বন্ধ দরজা রয়েছে আমার চোখের আড়ালে। সেই দরজা খুলে দু' ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামলেই সে-জগৎ থেকে ঘুরে আসা যায়।

স্কুলের মাঠে দুরন্ত ছেলেরা খেলা করে। আমি উদাসীন ভাবে মাঠের পাশ ঘেঁষে যাই। অভ্যাসবশত জানি, আমাকে কেউ খেলায় নেবে না। আমি তো দলছুট কুকু। কেবলমাত্র জেরি দয়া করে বল এগিয়ে দেয় লাথি মারার জন্য, সঙ্গে দৌড়য়, ঘুষি মারতে দেয় বালির বস্তায়। আমার দুর্বল শরীরের সেই সব চেষ্টা দেখে হাসে হি হি করে। কেবল জেন তার ছবির বই থেকে মুখ তুলে ধমক দেয়, কেন তুমি হানিকে খ্যাপাচ্ছ? ওকে খেলতে শেখাও।

স্কুলের মাঠ থেকে ছিটকে আসে বল। আমার সামনে দিয়েই গড়িয়ে যায়। ছেলেরা চিৎকার করে ডাকে, সাহেব, এই সাহেব, বলটা দাও তো—

আমি ঘুরে দাঁড়াই, নটিবয় শু-পরা পায়ে বলটা ছিটকে দিই মাঠের মধ্যে।

আরে বাঃ। সুবল চেঁচিয়ে ওঠে, তোমার শট তো বেশ ভাল সাহেব, চলে এসো তো দেখি, খেলো আমাদের সঙ্গে—এই হারু, তুই বোস তো, সাহেব খেলুক রাইট-আউটে—

লজ্জায় শরীর অবশ হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি বলি, আজ না, আর একদিন— আজ হারু খেলুক—

মাঠ ছাড়তে অনিচ্ছুক হারু খুশি হয়।

তোমার শট খুব ভাল কিন্তু সাহেব, তুমি খেল নাকি কোথাও?

ভীষণ আনন্দে, উত্তেজনায় বুক ভরে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না।

পরদিন সুবল বলে, আজ যদি মিলন না আসে তবে সাহেব খেলবে আমাদের টিমে।

বুক খামচে ধরে ভয়। মিলন না এলে আমি খেলব? আমি কি পারব! আমি কি পারব!

খেলার আগের মুহূর্তটিতে সেই আনন্দ বুকে নিয়ে আমি চুপিসারে পালিয়ে যাই। রেল ইনস্টিটিউট ছাড়িয়ে গিয়ে দৌড়ে উঠি রেলের ওভারব্রিজে। প্লাটফর্ম পার হয়ে চলে আসি সাহেব পাড়ার রাস্তায়। নিশ্চয়ই মিলন এসেছিল। মিলন না এলেই আমার খেলার কথা। বিড়বিড় করে এই বলতে বলতে বাসায় ফিরে আসি।

পরদিন সবাই বলে, কোথায় গিয়েছিলে সাহেব! কাল যে আমরা তোমার নাম লিখলাম! তুমি এলে না তো!

আবার খেলার তারিখ পড়ে এক দিন। সবাই বলে, সাহেব খেলবে—

মিলন গম্ভীরভাবে বলে, খেলবে যদি কুণ্ডু না আসে— কুণ্ডু আমাদের বাঁধা ব্যাক—সাহেব তো নতুন—

তখন এমন একটা সময়, যখন যে-কোনও দিন আমার খেলায় নামার কথা। আজ কিংবা কাল! এক দিন কুণ্ডু কিংবা মিলন কিংবা সুবল—কেউ-না-কেউ না-এলে আমি খেলব। আশায় আশায় থাকি। এইবার খেলব—খেলায় নামব—যে-কোনও দিন—যে কোনও দিন—

অনেক রাতে টেলিগ্রাম এল।

সদ্য-আসা ঘুম থেকে মা ডেকে তুলল, কুকু! ওঠো— ওঠো তো বাবা— বাইরের ঘরে বাবার কাছে যাও। তোমার বাবা খুব কাঁদছে—

কী হয়েছে মা?

তোমার দাদু মারা গেছেন।

## ॥ সতেরো ॥

কে বলবে এই ময়মনসিংহে আমরা কোনও দিন ছিলাম!

এই নাকি আমাদের বাড়ি! কী হতশ্রী টিনের চালা সব! কী জঙ্গলে ভরতি বাগান! শ্যাওলায় সবুজ হয়েছে উঠোন, কেউ পা পিছলে পড়েছিল সদ্য—সেই লম্বা দাগ পড়ে আছে। কচুরিপানায় ঢেকে গেছে পুকুর— জলের আঁশটে গন্ধে গা গুলোয়। বড় ঘরের বারান্দা থেকে খসে পড়ছে সিমেন্টের চাপড়া, বৃষ্টির ছাট আটকানোর জন্য যে কেরোসিন টিন কেটে ঝাপটা লাগানো হয়েছিল বারান্দায় তা দড়ি ছিঁড়ে বাঁকা হয়ে ঝুলছে।

কাছারিঘরের বারান্দায় মাখনকাকার ঘরটা নেই। খোলা বারান্দা নিকোনো হয়ে তকতক করছে। অনেক আগেই মারা গেছেন মাখনকাকা, দাদু কোনও চিঠিতে সে-কথা জানিয়েছিলেন। মৃত্যুর সংবাদ শিশুদের দেওয়া উচিত নয় বলে মা-বাবা আমাদের জানাননি। মাখনকাকার চৌকিটা গরম জলে ধুয়ে আবার পুবের ঘরে আনা হয়েছে। তার ওপর স্টেজ খাড়া করে এখনও মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখায় রাখাল। কাছারিঘরের বারান্দায় কিংবা পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় মাখনকাকার কোনও চিহ্নই নেই আর।

দাদুর শূন্য ইজিচেয়ারে বাতাস খেলা করে। মাঝে মাঝে তার ওপর উঠে পুঁটলি পাকিয়ে শুয়ে ঘুমোয় তুলারানীদের সাদা বেড়ালটা।

বারবাড়িতে ঘোড়ার গাড়ি এসে থামে। চকচকে চামড়ার সুটকেস হাতে নামেন বড় জ্যাঠামশাই, সঙ্গে কেবল বিষ্ণুপদ। বড় জ্যাঠামশাইয়ের গায়ে নতুন কোরা কাপড়, রুক্ষ চুল, মাটিতে পা দিয়ে ডুকরে কাঁদেন, বাবা গো!

ভিতর-বাড়ি থেকে কান্নার রোল ওঠে।

দেখতে পাই, ঠাকুমাকে ঘিরে বসে আছেন পিসিমারা। সাদা থান পরা ঠাকুমা অস্বচ্ছ চোখে চার দিকে টালমাটাল চেয়ে দেখেন কেবল। সারা দিনমান কান্নার শব্দ ওঠে।

দেশের বাড়ি থেকে একে একে আসেন আত্মীয়রা. দাদুর বন্ধুরা আসেন বিষণ্ণ মুখে, অমনি কান্নার ঢেউ ওঠে। বাদবাকি সময় কেউ-না-কেউ পালাক্রমে একটানা, একঘেয়ে সুরে কাঁদে। সেই ভিড় এবং কান্নার মধ্যে দিশেহারা আমি কোনও শোক-দুঃখকে বোধ করতে পারি না। কেবল হাঁফ ধরে। কেবল একা হতে ইচ্ছে করে।

গণাদা চোখ কুঁচকে আমাকে দেখে, তুই কুকু! ইস, তোকে চেনাই যায় না।

গণাদার ওপর ঠোঁটে গোঁফের কালচে ভাব দেখা যায়, গালে দু'-একটা চুল বেড়ে উঠেছে। বুকে দু'ধারে দুটি গুটলি, স্নানের সময়ে গামছায় বুক ঢেকে গণাদা জলে নামে। দুপুরবেলা কাছারিঘরের পুব ধারে রাখাল আর সে বসে চোখ গোল করে আমার কাছে মাল জংশন আর সাহেব পাড়ার গল্প শোনে। রাখাল আমার দো-ফলা ছুরিটা চেয়ে নেয়, বলে, তুই আবার কিনে নিস কুকু। দাদু মারা গেছে, এখন আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এখন তো সব জিনিসের দাম—

কে বলল?

বাবা। শ্রাদ্ধের পর সব ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আরও দু'টো রান্নাঘর উঠবে, উঠোনে উঠবে বেড়া—দেখিস—

প্রবর্তক স্কুলের ছেলেরা হল্লা করে টিফিনে রাস্তায় বেরোয়, আমাদের টিউবওয়েলের মুখে হাত চেপে জল পাম্প করে, মুখ লাগিয়ে জল খেয়ে যায়।

রাখাল, গণাদা সব আগের মতোই এক থালায় ভাত মেখে খায়, খাইয়ে দেন মেজোজেঠিমা। আমার ঘেন্না করে। মেজোজেঠিমা আদরের গলায় বলেন, তুই তো এভাবে খেতে পারবি না কুকু, তোর অভ্যাস নেই। আলাদা বোস—

তুলারানীকে দেখা যায় না আজকাল। সে ঘরের বাইরে কম আসে। এক-একবার তাকে চকিতে দেখি—উঠোন পেরিয়ে ঢেঁকিঘরের পিছন দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিংবা ঢেঁকিশাক তুলে আনছে পগারের পাড় থেকে, ছোট্ট একটি ভাই হয়েছে তার—সন্ধেবেলা তাকে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াচ্ছে, কৃশ হয়ে গেছে তার শরীর, লম্বা টান দিয়েছে, তার চুল আর থোপাথোপা অযত্নে রুক্ষ হয়ে থাকে না, দুই বিনুনিতে চুল বাঁধে সে, হাসে কম। সম্ভবত সে এখন সংসারের রকম-সকম বুঝতে শিখেছে। মুখোমুখি হলে নিঃশব্দে আমাকে দেখে, পেরিয়ে যায়। তার ডান পায়ের গোড়ালিতে এখনও দাদুর দা-এর দাগ রয়ে গেছে।

শোকের বাড়ি ছেড়ে আমরা দূরে দূরে থাকি। বারবাড়ির মাঠে, কাছারিঘরের বারান্দায়, দক্ষিণের বাগানের কোণে। গণাদা ছোট্ট একটা শিশি বের করে পকেট থেকে, তাতে নস্যির গুঁড়ো। বলে, নিবি একটু?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না।

গণাদা হাসে, তুই শিখিয়েছিলি।

তারপর হঠাৎ চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শোনে, গলা নামিয়ে বলে, শোন।

কান পেতে শুনি, সিতিকণ্ঠ ঘরে বসে অশ্লীল গান গাইছেন, রাম গেল বনবাসে. বেহুলা হল রাঁড়ি—

দেখবি গিয়ে! গণাদা জিজ্ঞেস করে।

চল। বলে উঠে পড়ি।

সিতিকণ্ঠের বাড়ি আকণ্ঠ জঙ্গলে ডুবে আছে। ভেঙে পড়েছে বাগানের বেড়া, উঠোনে মস্ত ঘাস। বৃষ্টির জলের দাগ জানালা-দরজায় নানা ধূসর নকশা এঁকে রেখেছে। জানালার পাশে সিতিকণ্ঠের শীর্ণ মুখখানা দেখা যায়। তাঁকে আর সুন্দর দেখায় না। জ্বলজ্বল করে জ্বলে দুই চোখ। তীব্র সন্দেহের বিষ ভরা তাঁর লাল মুখশ্রী। তিনি আগাছার জঙ্গল ভেদ করে প্রেত-দৃষ্টিতে চারি দিক দেখার চেষ্টা করছেন। তাঁর দরজায় তালা। সাড়া পেয়ে রান্নাঘর থেকে নতুন কাকিমা বেরিয়ে আসেন, তাঁর কোলে পুঁটুলির মতো একটা রাঙা শিশু। আমাদের দেখে ধমক দিয়ে বলেন, কী চাও এখানে! পাগল দেখতে এসেছ, না? যাও-যাও—

আমরা চলে আসি। গণাদা হাসে, ওই বাচ্চাটা হওয়ার পর থেকেই বুঝলি—সিতিকাকা কেবল বলত, ওটা আমার বাচ্চা নয়—

তবে কার?

বলত, হয় ওটা মেছোবাজারের কিষ্টার, নয়তো চাটুজ্জেবাড়ির নগেনের—

কাকার?

গায়ে কাঁটা দেয় আমার। মাত্র কয়েক দিন আগে আমি জেনেছি কী করে বাচ্চা হয়। সুবল আমাকে শিখিয়েছিল। এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না সে-সব। তাই এখন গায়ে কাঁটা দেয়। কেমন অশ্লীল অসভ্য মনে হয় সবকিছু।

সুন্দর মানুষ সিতিকণ্ঠের জন্য গলায় কান্না ভেসে আসে।

ঘাটের পথে একজন কুঁজো বুড়ো মানুষকে দেখি। স্নান করে উঠে বিড়বিড় করে মন্ত্র বলতে বলতে চলে যান। প্রথমে চিনতে পারি না। যখন নিজের ঘরের পথে বুকসমান উঁচু আগাছার জঙ্গল ভেদ করে চলে যেতে থাকেন তখন বুঝতে পারি, ওই অনাদিনাথ। তিনি আর কোনও দিকেই তাকান না। পৃথিবীর সব রং মুছে গেছে তাঁর চোখে—এমনই ঘোলাটে তাঁর দুই চোখ। ঘাড়ের দু'টো নলের মতো রগ উঁচু হয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা যখন ভূতের বাড়ির মতো ছন্নছাড়া অন্ধকার নামে উঠোনে, তখন আমি বড় ঘরের বারান্দায় দাদুর পুবমুখো ইজিচেয়ারটায় গিয়ে বসি। পুরনো চেয়ার, বসলে মচমচ শব্দ হয়। দাদুর মাথার তিল তেলের গন্ধ এখনও তার গদিতে লেগে আছে। বসে দু'টি পা তুলি চেয়ারের ওপর, থুতনিতে হাত রেখে অন্যমনে চেয়ে দেখি। তখন স্পষ্ট পরিষ্কার, সন্ধ্যার আবছায়া ভেদ করে আমি দূরের একটি প্রবহমান তীব্র কালো নদীকে দেখতে পাই। তার ও-পারে এক পরপারের জগতে সবুজাভ আলেয়া বাতাসে লাফিয়ে উঠে অন্ধকার চেটে নিয়ে মিলিয়ে যায়। খুব দূরে শেয়াল ডাকে। দাদু এইখানে বসে সেই কালো নদীকে দেখেছেন কত বার। দেখেছেন মাখনকাকাও। তাঁদের মুখে এক অদ্ভুত অন্যমনস্কতা এসেছে তখন। দাদু কুমারনাথের গীতা আবৃত্তি করতেন। মাখনকাকা উৎকর্ণ হয়ে শুনতেন রাখালের আষাঢ়ে শালিখটার অস্পষ্ট হরিনাম। আমি সেই কালো নদীটাকে প্রত্যক্ষ করি, তার রেল গাড়ির মতো অন্তহীন প্রবাহকে টের পাই। তখন মনে হয়, দাদু সেই গোপন দরজাটা খুঁজে-পেতে দু'ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়ে সেই ভিন্ন জগৎটিতে পা রেখেছেন। সব মৃত মানুষেরাই রয়ে গেছে পৃথিবীতে। আমাদের খেত খামার শহরের মধ্যেই রয়েছে তাদেরও শহর খামার খেত। যখন দক্ষিণমুখে যায় আমাদের নদী, তখন হয়তো তাদেরটা উত্তরে।

হঠাৎ তড়বড় করে লাফিয়ে উঠি। রাখালকে ডেকে জিজ্ঞেস করি, দাদুর কী হয়েছিল রে রাখালভাই?

রাখাল ঠোঁট উলটে উদাস গলায় বলে, কী জানি! জমিদার বাড়ির মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে খুব অসুখ হয়েছিল দাদুর— পার্শ্বনাথ ডাক্তার এসে কত ইঞ্জেকশন দিল—

আমি আর কিছু শুনতে পাই না। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করি, কার বিয়ে বললি!

ওই তো বোকেনবাবুর ছোট মেয়ে পাখি—কলকাতায় পড়ত—

আমার ভিতরে ভাঙচুরের শব্দ হতে থাকে। জিজ্ঞেস করি, আর বড় মেয়ে রাখী—তার বিয়ে হয়নি?

কবে! সে তো পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে— শুনিসনি!

একটু চুপ করে থাকি। সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়া গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যায়। তারপর কদম গাছের আড়াল থেকে চাঁদ ওঠে। জ্যোৎস্নায় বারবাড়ির মাঠে হাঁটি। জ্যোৎস্নায় ভিজে যাই। বুড়ো পাখির মতো আমার শরীর থেকে এক-একটি পালক খসে পড়ে যেন। জ্যোৎস্নায় উড়ে যায় পালক। বুকের ভিতরে চাপ হয়ে জমে থাকে ব্যথা-বেদনা।

শ্রাদ্ধের দিন উঠোনে সামিয়ানা খাটিয়ে নিবারণ জ্যাঠামশাই ভুজ্যি উৎসর্গ করাচ্ছেন। দুই জ্যাঠামশাই, বাবা আর কাকা ন্যাড়া মাথায় বসেছেন উৎসর্গ করতে। চারি দিকে ভিড়। হঠাৎ সেই ভিড় থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন ঠাকুমা। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন বারবাড়ির দিকে, চোখে-মুখে দিশেহারা একটা ভাব। দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরল সিন্ধু, ও ঠাকুমা, কোথায় যাচ্ছেন?

ঠাকুমার দুই চোখ ভীষণ ঘোলাটে, টপ টপ করে জল পড়ছে, আকুল হয়ে বলছেন, ও কী মন্ত্র পড়ায় নিবারণ! প্রেত—প্রেত—তিনি কি প্রেত—অ্যাঁ! তিনি কি প্রেত হয়ে গেছেন?

আমার ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বলি, আমি জানি দাদু কোথায় আছে। কেবল সেই দরজাটা খুঁজে বের করতে হবে—দরজার ও-পাশে আছে দু' ধাপ সিঁড়ি—নামলেই সেই জগৎ— যেখানে আছেন সব মৃত মানুষেরা—

পরদিন জ্ঞাতিভোজনের পর বারবাড়ির মাঠে ফুটবল নামাল রাখাল। রাজ্যের ছেলেরা এল ভিড় করে। রাখাল চেঁচিয়ে বলতে লাগল, কুকু আমাদের দলে—কুকুকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না কিন্তু—ওকে বাদ দিয়ে পার্টি করো তোমরা—

গণাদা চেঁচিয়ে বলে, কেন কুকু তোমার দলে? কুকু নিজেই বলুক ও আমার দলে কি না—

আমি বিষণ্ণ মনে আমার প্রথম খেলায় নামি।

মিত্তিরদের পোড়ো ভিটে কিনে নিয়েছে জমিদারেরা। এখানে হাসপাতাল হবে বোকেনবাবুর বাবার নামে।

আগের দিন চার ফেলে রেখেছিল রাখাল। পরদিন দুপুরে ছিপ ফেলল সে আর গণাদা। আমাকে ডেকে বলল, আয় কুকু। বোস—মাছধরা তো দেখিস না খোট্টাদের দেশে—

আমি বসলাম না। পায়ে পায়ে হেঁটে চলে আসি মিত্তিরদের ভিটেয়। গণাদা চেঁচিয়ে বলে, যাস না কুকু, ওখানে খুব সাপ—

সে-কথা আমার কানে আসে মাত্র। আস্তে আস্তে ইঁটের স্তূপ বেয়ে উঠে আসি। বিছুটির ঘন বন, আশশ্যাওড়া, কণ্টিকারি—কত আগাছার জঙ্গল! আরও কত ভেঙে পড়েছে বাড়িটা। দেয়াল হেলে পড়ছে। আমি রাস্তা করে নিই। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি বারান্দার ভিতে। খুঁজে খুঁজে আসি সেই দু'টো পুরনো দেয়ালের মাঝখানে সরু গলিটাতে। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখি গত বর্ষায় অনেক ধুয়ে গিয়েও শানের ওপরে কোথাও লেখা আছে—কুকু, কুকু, কুকু।

বাইরের ঘন রোদ থেকে গলির নির্জন ছায়ায় পা দিয়ে হঠাৎ বাতাস লাগে আমার শরীরে। কুটোকাটা খসে পড়তে থাকে, যেন বা পাখির বাসা ছিল কোথাও। পাখি আর থাকে না এখন, উঠে গেছে নতুন বাসায়। তার পরিত্যক্ত বাসা উড়ো বাতাসে খসে পড়ছে এইখানে।

অশ্বত্থ গাছটার শিকড় নেমেছে মাটি অবধি। তার সতেজ যুবক চেহারাটি অনেক দূর বিশাল একটা ফাটল তৈরি করেছে দেয়ালে। মেঝে ফুটিফাটা হয়ে উদ্ভিদেরা দখল নিয়েছে তাদের জমির।

সেইখানে ছায়া এবং স্তব্ধতায় আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কেন আমি এখানে এসেছি! কেন! কী আছে এখানে!

বড় মায়ায় আমি দেয়ালে হাত রাখি, আমার বুট জুতো ঘষি মেঝেতে। এক দিন—খুব শিগগিরই এই দেয়াল দু'টি ভেঙে পড়বে। কেউ এসে ভেঙে ফেলবে তাদের। এ জায়গাটিকে আর চেনা যাবে না।

কেন যে পুরনো দেয়াল, এ-রকম হয়! দাদু মরে যায়, রাখী-পাখির বিয়ে হয়ে যায়, পুরনো দেয়াল ভেঙে পড়ে!

অনেকক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

ছবিটা অনেকটা এ-রকম: দুপুরের রোদ মরে অপরাহ্নের ছায়াগুলি দীর্ঘতর হয়েছে। সেই সব ছায়া ভাঙা জানালা, দরজা, থাম, খিলান এবং উদ্ভিদের। সেই ছায়া এবং আলোর মাঝখানে ঘন নীল ভেলভেটের প্যান্ট, পরিষ্কার জামা, সাদা মোজা আর কালো জুতো পরা একটি কিশোর ছেলে কুকু—যে মাঝে মাঝে দূরবর্তী এক কালো নদীকে বয়ে যেতে অনুভব করে— অনুভব করে পৃথিবীর গভীর বিচ্ছেদ এবং আনন্দগুলি—অনুভব করে কাছেই কোথাও লুকোনো আছে এক গোপন দরজা— যার ও-পারে আর-একটি জগৎ— সেই ছেলেটি অপরাহ্নের ম্লান আলোয় হঠাৎ দাদুর জন্য, মাখনকাকার জন্য, সিতিকণ্ঠ এবং অনাদিনাথের জন্য, ঘরছাড়া জ্যাঠামশাইয়ের জন্য, কিংবা এই পুরনো দেয়াল দু'টির জন্য, হয়তো বা কবেকার দুর্ভিক্ষে পীড়িত এক রোগা উদ্যত লাঠি হাতে ভিখিরির জন্য, রাখী-পাখি এবং নিজের জন্য এবং হয়তো বা পৃথিবীর অমোঘ পরিবর্তনশীলতার জন্য আদিগন্ত এক দুঃখকে অনুভব করতে করতে ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে। দু'টি হাত রাখে দেয়ালের খাঁজে। তার মাথায়, কাঁধে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে জরাজীর্ণ দেয়ালের চুনবালি। সে কেঁপে কেঁপে কাঁদে তার অকারণ গোপন কান্না।

তার সেই কান্নার মধ্যে ছিল ছুঁচের মুখের মতো ছোট্ট একটু সুখ।

রঙিন সাঁকো

দু'জনের হাতে দু'টো সুটকেস। একজন লম্বা ফ্যাকাশে চেহারার যুবক, অন্যজন একটু বেঁটে। মাথার চুল পাতলা, স্বাস্থ্যটা একটু থলথলে।

দুপুরে স্টেশন ফাঁকাই বলা যায়, চেকার-ফেকার কিছু নেই, প্লাটফর্মেও কোনও বেড়া নেই, উদোম প্লাটফর্মটা দু'জনে মন্থর পায়ে পার হল। হাতে ধরা টিকিট, কিন্তু টিকিট নেওয়ার কেউ নেই দেখে লম্বাজন টিকিটটা দুমড়ে ফেলে দিল, তারপর দু'জনেই প্লাটফর্ম থেকে রেল লাইনে নেমে এল। লাইনের পাশ দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি হাঁটা যায় না, এর সুটকেসে ওর হাঁটু লাগে, তাই লম্বাজন সামনে আর বেঁটেজন পিছনে হাঁটতে থাকে।

লম্বাজন মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করে, সিগারেট আর আছে নাকি রে গনফট?

দাঁড়া, দেখি।

বলে বেঁটেজন পকেট হাতড়ে একটা দোমড়ানো প্যাকেট বের করে, সুটকেস নামিয়ে রেখে প্যাকেটটা খুলে দেখে বলে, মাইরি, ঠিক দু'টো আছে, লাস্ট দু'টো।

লম্বাজন বাতাসে তার উড়ন্ত দীর্ঘ চুল হাত চেপে ঠিক করতে করতে বলে, কপাল। দে।

দু'জনে সিগারেট ধরায়, আবার হাঁটতে হাঁটতে বেঁটেজন বলে, কতদূর রে সিন্ধু?

বলেছি তো মাইলখানেক।

হাঁটবি? না রিকশা নিবি?

লম্বা ফ্যাকাশে জন আপনমনে একটু হাসে, গনফট, কী কথা ছিল?

বেঁটেজন বিড়বিড় করে কী যেন বকে, তারপর বলে, হার্ডশিপ।

তবে ফের রিকশার কথা বলিস কেন?

আমার সুটকেসটার ওজন বেড়ে গেছে। মাইরি, দ্যাখ।

কোনও সোনাদানা এনেছিস?

কিছু না রে, তবু মাঝে মাঝে ওজন বেড়ে যায়।

কী রে?

বওয়ার ক্ষমতা কমে গেলে।

ফ্যাকাশে জন এবার মুখ ফিরিয়ে হাসে, বলে, বুঝেছি। আচ্ছা, রাস্তায় রিকশা পেলে নিয়ে নেব।

সেই ভাল, রিকশা ভাড়া তো কোম্পানিই দিচ্ছে।

ফের? ফ্যাকাশে জন ধমক মারে, কোম্পানি আবার কী? তুই আর আমিই তো কোম্পানি।

ঠিক। তবু খাতায় এন্ট্রি দেখাতে পারব।

দেখালেও লাভ নেই। ইনকাম ট্যাক্স অফিস ঠিক টিক মেরে বাদ দিয়ে দেবে। রিকশাওয়ালা তো ভাউচার দেবে না।

বেঁটে একটু শ্বাস ছেড়ে বলে, সিন্ধু, আমি শালা সাতপুরুষে ব্যবসা করছি বাংলাদেশে, পুরো মেড়ুয়াবাদি, কিন্তু তুই শালা যে বিজনেসে আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। হাড়কেপ্পন শালা!

লম্বাজন মুখ গম্ভীর করে বলে, গনফট, তুই আমাকে চার বছরে কিছু চিনলি না। আমার বিজনেসের পলিসিটা হচ্ছে হার্ডশিপ।

বেঁটেজন জিভ কাটে হঠাৎ, এক হাতে কান ধরে বলে, মাইরি, ওই কথাটা আমি বরাবর ভুলে যাই।

ভুলে যাস কেন?

স্মরণে থাকে না। তুই যদি হার্ডশিপ কথাটা বুকে একটা বোর্ড ঝুলিয়ে তাতে লিখে রাখিস তা হলে সবসময়ে চোখে পড়বে।

রেল লাইনটা পেরিয়ে ওরা বালি দুর্গাপুরের রাস্তা ধরল। মফস্‌সলের কাঁচা রাস্তা, দু'ধারে কিছু কিছু বাড়িঘর উঠেছে, দু'-চারটে দোকান চোখ মেলেছে। গমকল, মিঠাই, পান, টেলারিং, মনোহারী, তিন-চার ঘর মুদি। রিকশা, গো-গাড়ি, সাইকেল অনবরত চলছে।

চার দিক দেখে বেঁটেজন বলে, জায়গাটা একদম মফস্‌সল রে সিন্ধু!

ফ্যাকাশেজন অন্যমনস্কভাবে হুঁ দেয়।

লম্বাজনের রকমসকম দেখে বেঁটেজন যেন ভরসা পায় না, সন্দেহের গলায় বলে, রিকশা নিবি না নাকি?

নেব, আর-একটু এগিয়ে ধরব, এখান থেকে ভাড়া বেশি।

তখন থেকে কেন টিকটিক করছিস? সাড়ে পাঁচশো মাইল ট্রেন জার্নি করে এসেছি, রাতে ঘুমোতে জায়গা পাইনি, খেয়াল আছে? চুলে যা কয়লা জমেছে তাতে একটা উনুন ধরানো যায়। দাঁত মাজিনি, স্নান করিনি, ভাত খাইনি—

লম্বাজন উদাস গলায় বলে, সাড়ে পাঁচশো মাইল নয় গনফট, কিলোমিটার।

ওঃ কিলোমিটার, তাতে যেন গদিশটা কিছু কম গেছে! ভাড়া যা বেশি লাগে আমি দেব। এই রিকশা—

বলে বেঁটেজন একটা খালি রিকশা থামায়। রিকশাওয়ালা স্তিমিত চোখে চেয়ে নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

সমবায় পল্লি, কত নেবে?

দেড় টাকা।

দেড়? বলে কী রে সিন্ধু? দেড়?

লম্বাজন ধমক দেয়, তুই দর করতে যাস কেন? বারো আনা রেট আমি বরাবর জানি। উঠে বসবি, গিয়ে পয়সা দিয়ে দিবি, রা করবে না।

কত দিবেন? রিকশাওয়ালা নিরুৎসাহিত গলায় বলে।

তুমি কাটো বাপু, রিকশা ঢের পাওয়া যাবে। লম্বাজন বলে।

উঠুন, লিয়ে যাচ্ছি। চা খাইয়ে দিবেন কিন্তু। আর বারো আনা।

উঠি সিন্ধু? বেঁটেজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

লোকটা হারামি, ঠিক আছে ওঠ। লম্বাজন চাপা স্বরে বলে। তারপর বেঁটেজনের পাশে রিকশার সিটে উঠে বসে। কাঁচা রাস্তায় ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশা ধীরে এগোয়।

জায়গাটা দিব্বি সবুজ। তাজা বাতাস বইছে। শীতের এখনও তেমন টান নেই এ দিকে, তবু বাতাসটা দিয়েছে জোর। ডান ধারে একটা বাঁশবন, মড়মড় করে মাথা নুইয়ে দিচ্ছে। একটা ঘাটহীন পুকুরের পাশে অশ্বত্থ গাছ। রাস্তাটা বেঁকে গেছে। রাংচিতার বেড়া, ভাঁটবন, পুরনো পুরনো সব গ্রাম্য বাড়ি, শীতলা মায়ের থান, একটা চণ্ডীমণ্ডপ। বেঁটেজন মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। উত্তর বাংলার যে শহর থেকে তারা এসেছে সেটাতেও এমন ঘন ঝোপঝাড়, সবুজ গাছপালা, পুকুর বা গ্রাম্য বাড়ি নেই।

লম্বাজন যত দূর সম্ভব পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে ছিল। ওইভাবেই বলল, গনফট, টেন্ডারটা যদি না পাই তবে রাহা খরচটা গচ্চা গেল।

বেঁটেজন চুপ করে রইল খানিক, তারপর আস্তে আস্তে বলল, সিন্ধু, আমার কী মনে হয় জানিস?

কী?

মনে হয় তুই একটা মাড়োয়ারি, আর আমিই বাঙালি।

লম্বাজন হাসে। কিছু বলে না। বেঁটেজনই আবার বলে, ব্যবসার সঙ্গে লাইফটাকে পাঞ্চ করতে শেখ সিন্ধু! তোর বদস্বভাব হচ্ছে এই যে, তোর নেশাটা নিট নেশা, পাঞ্চ করতে জানিস না।

লম্বাজন চোখ বুজে থাকে। ভাবে। তারপর বলে, তোর বদস্বভাব কী জানিস?

কী?

তুই যে একসময়ে কলকাতায় পড়তে এসে নাটক নাটক করে পাগল হয়েছিলি সেইটে ভুলতে পারিস না। বাংলা নাটকের দল করে কালচারাল মুভমেন্ট করে তোর ব্যবসার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে।

গেছে তো গেছে।

মাড়োয়ারি যখন বাঙালি হয় তখন তার বড় ঝামেলা।

আর বাঙালি যখন মাড়োয়ারি হয় তখন?

তখনই তো বাঙালির উন্নতি।

বেঁটেজন অবিরল হাসল। দুলে দুলে। চোখে জল এসে গিয়েছিল, রুমালে চোখ মুছে বলল, তা হলে আয়, আমি তোর বোনকে বিয়ে করি, তুই আমার বোনকে বিয়ে কর। আমাদের পরের জেনারেশনটা খিচুড়ি হয়ে যাক। ও হো, তোর তো আর বোনও নেই!

দূর শালা মেড়ো, থাকলেই তোর হাতে দিতাম নাকি?

ওরে ব্যাটা ভেতো বাঙালি, দিলেও নিতাম নাকি?

লম্বাজন স্মিতমুখে চোখ বুজে ছিল। হঠাৎ দেশলাইয়ের শব্দে চোখ খুলে দেখে বেঁটেজন সিগারেট ধরাচ্ছে। লাফিয়ে উঠে বলে, এই শালা, বললি যে শেষ দু'টো সিগারেট ছিল, এখন পেলি কোথা?

কোথায় আবার! রেল লাইনের ওই বাতাসের মধ্যে কেউ সিগারেট খেতে পারে? তাই নখ দিয়ে টিপে নিভিয়ে কানে গুঁজে রেখেছিলাম, সেই আদ্দেকটা খাচ্ছি।

লম্বাজন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে, গনফট!

উঁ?

তুই মাড়োয়ারিই বটে।

বটেই তো, কে বারণ করেছে? চাস তো দু'টো টান দেব'খন।

দিস। শ্বাস ছেড়ে লম্বাজন আবার চোখ বোজে।

কিছুক্ষণ পর বেঁটেজন বলে, সিন্ধু!

উঁ?

তোর দাদা মরতে এ কোথায় বাড়ি করেছে? রাস্তা যে ফুরোয় না।

একটু দূর।

একটু দূর! বলিস কী? তোর দাদা এত দূর থেকে রোজ যায় কী করে?

দাদার সাইকেল আছে।

থাকলেই বা।

লম্বাজন চুপ করে থাকে।

বেঁটেজন আবার বলে, এ-জায়গাটা হাওড়া থেকে কত দূর বললি?

আট কিলোমিটার।

কলকাতার এত কাছে তবু কোনও ডেভেলপমেন্ট হয়নি তো?

হয়নি কী করে বলছিস? চাঁদপুরের উদ্বাস্তুরা যখন কো-অপারেটিভ কলোনি করেছিল তখন পুরো জায়গাটা ছিল জলা আর জঙ্গল। হাসিল করে পত্তন করেছিল। তখনকার চেয়ে এখন তো দশগুণ ডেভেলপড। আরও হবে।

বেঁটেজন সিগারেটের শেষ অংশটা এগিয়ে দিয়ে বলে, হুঁকো করে টানিস।

লম্বাজন বেঁটেজনের কথামতো সিগারেটটা মুখে না-ছুঁইয়ে হাত মুঠো করে টানতে থাকে।

বেঁটেজন, সিন্ধু, তোর দাদা ইচ্ছে করলে কলকাতাতেও বাড়ি করতে পারত। এত দূরে বাড়ি করার মানে হয় না।

লম্বাজন চোখ বুজে বলে, পারত। তবে যে-টাকায় এখানে দশ কাঠা জমি কিনেছে সে-টাকায় কলকাতায় দেড় কাঠাও হত কি না সন্দেহ। তখন দাদার অবস্থা এত ভাল ছিল না।

দশ কাঠা তো অনেক জমি! তোর দাদার তো ছোট্ট ফ্যামিলি।

হলে কী হবে! দাদার বাতিক গোরু পুষবে, খেতখামার করবে, একটা পুকুর কাটারও কথা ছিল, তা সেটা আর হয়নি।

বলতে বলতে লম্বাজন একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তারপর আপনমনে বলে, বুঝলি গনফট, দাদা শেষ পর্যন্ত এদিককারই লোক হয়ে গেল। পরিবারটা আর জোড়া লাগবে না।

কেন, তোর দাদা তো শিলিগুড়িতে যায়।

সে কদাচিৎ অতিথির মতো গিয়ে থেকে চলে আসে। বাবা খুব দুঃখ করে বলে, এত কষ্ট করে বাড়িটা করলাম, তা বড় ছেলেটা সে-বাড়ি ভোগ করল না। পর হয়ে গেল। এ-দিকে জমি-জায়গা করে শেকড় গেড়ে ফেলেছে।

ভালই করেছে রে সিন্ধু। আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিতে যা চেঁচামেচি, টেঁকা যায় না।

আমাদের পরিবার তো তোদের মতো নয়। আমরা মোটে দুই ভাই। দু' বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাড়িতে কেবল মা, বাবা আর আমি। বাড়িটা ফাঁকা পড়ে থাকে।

বাঃ, এ-রকমই চিরকাল থাকবে? তোর দাদা বিয়ে করেছে, তুইও করবি, তোদের ছেলেপুলে হবে, তখন ফ্যামিলি বাড়বে, খিটিমিটি হবে, ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কাজিয়া হবে। তার চেয়ে তোর দাদা আগে থেকে আলাদা হয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে।

লম্বাজন চোখ বুজে চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে করে বলে, সেই কথা ভেবেই আমি মা-বাবাকে বলে দিয়েছিলাম যে আমি বিয়েই করব না। বাড়ির স্বত্বও ছেড়ে দেব বলেছিলাম। সেটা শুনে দাদা বাবাকে জানাল যে সেও বাড়ির স্বত্ব আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। দুই ভাইয়ে ত্যাগের কম্পিটিশন লাগে আর কী!

বেঁটেজন, তোদের খুব মিল।

লম্বাজন, ছিল। এখন আর তেমন নেই।

কেন?

দাদাটা বদলে গেছে।

দু' দিক থেকে গাছপালার ডাল আর পাতা এগিয়ে এসে রাস্তাটাকে চেপে ধরেছে। রিকশার হুডে ছটছট লাগছে। ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। বুনো গন্ধ।

জায়গাটা মন্দ নয় রে সিন্ধু। তবে দূর। তোর দাদার ইস্কুল তো কালীঘাটে, এখান থেকে যেতে অনেক সময় লাগে নিশ্চয়ই!

তা লাগে। তব বড্ড কষ্টসহিষ্ণু। একসময়ে তো দাদা কালীঘাটে বাসা করে ছিল। সেই বাড়িওয়ালা দাদাকে তুলবার জন্য রোজ বউকে লেলিয়ে দিত, ছোটলোক বউটা দাদা-বউদিকে না হক খারাপ গালাগাল দিত ওপরতলা থেকে, দাদা তখন কবি মানুষ, দু'টো বই ছেড়েছে বাজারে, পত্রপত্রিকায় ওর লেখা ছাপা হয়। আড্ডাবাজ মানুষ, সংসারে মন নেই, সঞ্চয় নেই, টাকাপয়সা চেনেই না, তার ওপর ভিতু, ইমপ্র্যাক্টিক্যাল, কাজেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। কম ভাড়ায় ছিল, বাড়িওয়ালার গুন্ডা ভাইপো দাদাকে প্রায়ই শাসাতে লাগল। ভয় পেয়ে দাদা তখন উঠে যায়, বাসা পাওয়া গেল না, কসবার দিকে একটা প্রায় বস্তির মতো বাড়িতে উঠে গেল। এই ঘটনা থেকেই দাদার পরিবর্তন শুরু হয়, বউদিরও। বাড়িওয়ালার অত্যাচার দেখে দু'জনেই ঠিক করল যেখানে হোক, যেমন করে হোক একটা বাড়ি করবে। বাড়ি বাড়ি করে দু'জনেই তখন পাগল। না খেয়ে কষ্ট করে একটি-দু'টি করে টাকা জমাতে থাকে, দাদা টিউশনি করত, সে-সব ছেড়ে দিল। এক বন্ধুর সঙ্গে ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে তার কোম্পানিতে ভূতের মতো খাটত, তার ওপর ইস্কুল। পেটে খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। দু'বছর বাড়ি গেল না, রেল ভাড়ার টাকা জমাল। কবিতা টবিতা তখন ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে মাথা থেকে। টানা তিন-চার বছর ওইভাবে খেটে গেল দাদা, উড়ু উড়ু উদাসী মানুষটা হয়ে গেল বস্তুবাদী সঞ্চয়ী। সমবায় পল্লিতে ওর দূর সম্পর্কের এক মামাশ্বশুর আছে, সে-ই দাদাকে অবশেষে জমি কিনে দিল। সস্তায়। দাদা বাড়ি করল। গৃহপ্রবেশে আমরা এসেছিলাম, বাড়ি দেখে কান্না পেল, মাটির ভিতরে ইট সাজানো, সিমেন্টের পয়সা কুলোয়নি, টিনের চাল, টিনের বেড়া, তবু দাদা-বউদির মুখে যে কী বিজয়ীর আনন্দ! তারপর দাদা সে-বাড়ি ভেঙে এখন দোতলা তুলেছে। হরিয়ানার গোরু কিনেছে দেড় হাজার টাকায়। গুছিয়ে বসেছে। বন্ধুর কোম্পানিটাও দাঁড়িয়ে গেছে। সি এম ডি এ-র কাজ করে বিস্তর কামায়। ইচ্ছে করলে ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিতে পারে, তবু

দেয়নি কেন তা ও-ই জানে। তবু বুঝলি গনফট, দাদার এই উন্নতি আমরা কেউ চাইনি।

কেন?

এর চেয়ে সেই দাদাই ভাল ছিল। ধারকর্জ করে সংসার চালাত, বছরে দু'টো ছুটিতে বাড়ি গিয়ে হইচই করত, বড় বড় কাগজে দাদার কবিতা বেরোত। কবিতা বেরোলে আমাদের বাড়িতে একটা উৎসব পড়ে যেত। সেই গরিব, উদাসী, কবি দাদা আর কোথায় পাব?

বেঁটেজন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলে, তবে সিন্ধু, তুই আমাকে খামোকা গাল পাড়িস, আমি ব্যবসাদার নই বলে। আমার মাথায় যে কালচারাল মুভমেন্ট ঢুকেছিল আজও তার ভূত আমাকে ছাড়েনি। আমি আমার বাপ-দাদার মতো হতে চাইছি, পারছি না। কীভাবে ভূতটা তাড়ানো যায়, তোর দাদার কাছে শিখে যাব।

ডান ধারে 'বনমালীর তেলেভাজার দোকান', তারপর একটা মুদিখানা, তারপর আরও দু'টো মোড় ঘুরে রিকশা ফাঁকা জায়গায় উঠে এল। হঠাৎ চোখের সামনে প্রকাণ্ড দু'টো দিঘি ভেসে ওঠে। দিঘির চার ধার ঘিরে সব বাড়ি জলে ছায়া ফেলে আছে। চমৎকার দৃশ্যটি দেখে বেঁটেজন বলে ওঠে, আরে বাঃ সিন্ধু, এ তো বিলিতি টাউনশিপ!

হুঁ। তবে এখানকার জল পেটে গেলেই আমাশা, আর মশার হোলসেল আড়ত।

জোড়াদিঘির মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তা বেয়ে রিকশাটা পশ্চিম ধারের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

## ॥ দুই ॥

গোরু দোয়ানো হচ্ছে বাড়ির পিছন দিকটায়। সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিল কমলা। মুখখানা গম্ভীর, অন্যমনস্ক। কাজ করার বাচ্চা মেয়েটা এসে বলল, বউদি, কে এসেছে দেখো গে!

কে রে?

আমি চিনি নাকি? দু'জন, হাতে বাক্স।

যে লোকটা দোয়াচ্ছিল সে বালতি এগিয়ে হাঁটুর গামছা খুলতে খুলতে বলল, এবার দুধ কম হচ্ছে মা। তিন সেরও হবে না। গাহেক কমাতে হবে।

কমলা একটা শ্বাস ফেলল। নিজেদের দুধ একটা আলাদা আলুমিনিয়ামের ডেকচিতে তুলে রেখে বালতি সুদ্ধু দুধে খানিকটা পরিষ্কার জল ঢেলে বাচ্চাটাকে বলে, পুনি, দুধ নিয়ে বেরো। গাঙ্গুলিবাড়ি আর মহলানবিশদের বলিস সামনের হপ্তা থেকে দুধ আর এক সের করে দেওয়া যাবে না।

পুনি গম্ভীর মুখে বলল, কাল মহলানবিশদের বউ আবার বলেছে, তোরা বড্ড জল দিস।

বিরক্ত হয়ে কমলা বলে, তা হলে ছেড়ে দিতে বলিস। অনেক গাহেক আছে।

দোয়ানোর লোকটা হাসল, তবে দুধ যত কম তত ঘন, বটের আঠার মতো। ঢের জল খাবে।

তুমি যাও তো বাপু! সাঁজালটা দিয়ে যেয়ো আর জাবনা।

দুধের ডেকচি রান্নাঘরের মিটসেফে রেখে কমলা সদরে এল। কাউকে দেখতে পেল না। ছেলেমেয়েরা খেলতে গেছে। বাড়িতে কেউ নেই এখন। লোক দু'টো কোথায় গেল তা কাকে জিজ্ঞেস করবে ভেবে না পেয়ে বাগানের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেখল কেউ নেই। বাক্স হাতে যখন, নিশ্চয়ই তখন দূরের মানুষ।

ওপরতলা থেকে কে ডাকল, বউদি!

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে কমলা দোতলার বারান্দায় সিন্ধুকে দেখতে পায়। লম্বা চেহারাটা ঝুঁকে আছে রেলিঙের ওপর, মুখে মস্ত হাসি।

ওমা! সিন্ধু এসেছিস? খবর দিসনি তো, যাচ্ছি দাঁড়া।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কাউকে না দেখে আমরা দোতলায় উঠে এসে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছি।

আহা, ঢং! চোরের মতো আবার কী? এটা তোর দাদার বাড়ি না? গোরুটা দোয়াচ্ছিল, সামনে ছিলাম।

গাঁয়ের বধূ হয়ে গেলে বউদি?

কমলা হাসল। মনে একটু মেঘ থেকেই গেল তবু।

উঠে এসে বারান্দায় মুখোমুখি হতে সিন্ধু এসে প্রণাম করে। তার সঙ্গে অচেনা লোক দেখে কমলা একটু জড়সড় হয়ে যায়।

সিন্ধু বলে, ওকে তুমি চেনো বউদি? বাজুরিয়াদের ছেলে গনপত। অনেককাল শিলিগুড়ি যাও না তো, তাই ভুলে গেছ বোধ হয়।

না না, মনে আছে। আয়, জামা-কাপড় ছাড়। ওপরের বাথরুমে জল দিতে বলছি।

বাথরুম! বাথরুম দিয়ে কী হবে? সামনে দু'টো প্রকাণ্ড দিঘি থাকতে—

অবেলায় স্নান করবি?

বলো কী! করব না! সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার ট্রেনজার্নির পর শরীরটা কয়লা হয়ে আছে।

বাইরের ঘর পেরিয়ে ভিতরে আরও দু'টো ঘর। সব ঘরেই কিছু কিছু ফুলের টব বসানো। সামনের দিকের কোণের ঘরখানায় সবচেয়ে বেশি। নানা বিচিত্র লতাপাতা গাছ ঘরের বাতাস স্যাঁতস্যাঁতে করে রেখেছে। মেঝে ভেজা ভেজা, দরজা-জানালায় বিচিত্র সব পরদা। প্রতিটি ঘরের চার দেয়াল চার রকম রঙের। সিন্ধু হাঁ করে দেখছিল। অনেক পয়সার ব্যাপার। তা ছাড়া সে বুঝতেও পারছিল না ঘরে এত গাছগাছালি কেন!

বউদি, ঘরবাড়ি যে এগ্রিকালচারের শো-রুম হয়ে আছে। কী ব্যাপার?

এমনিই। তোর দাদার শখ।

অনেক টাকার ব্যাপার দেখছি। অনেক নতুন ফার্নিচার—

কমলা অন্য কথা বলে, কী খাবি? লুচি করে দেব?

করো, অনেকগুলো ভেজো, দারুণ খিদে।

ওরা গামছা আর সাবানের বাক্স নিয়ে পুকুরে গেল । কমলা ঘরের বাতি জ্বেলে এক বার চেয়ে দেখল চার দিকে। সব ঘর ঘুরে দেখে নিল। কত দূর অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে তা বিচার করার চেষ্টা করল। অস্বীকার করার উপায় নেই, যে-কোনও বাইরের লোকের চোখে খটকা লাগবেই, তাই আজকাল উপরতলায় কাউকে আনে না কমলা। কেউ এলে নীচের তলায় বসায়।

কিন্তু ঘরে গাছপালা লাগিয়ে, দেয়ালে বিচিত্র রং করেই যদি ক্ষান্ত থাকত সাগর তবে কমলার বিপদ হত না। বাড়ির পিছন দিকে বাগানের এক কোণে সাগর যে-কুটির তৈরি করছে সেটাতে যখন সাগর বসবাস শুরু করবে তখন সত্যিকারের বিপদে পড়বে কমলা। কী বলবে মানুষকে?

সিন্ধু এক পলক দেখে। এখনও কিছু তেমন লক্ষ করেনি। কিন্তু করবে। সামনের কোণের দিকের ঘরটায় সাগরের আলাদা খাট, তাতে বিল্ট-ইন অ্যাকুরিয়াম, সেই অ্যাকুরিয়ামে ফাইটার, অ্যাঞ্জেল, গোল্ডফিশ এবং আরও বিচিত্র মাছেরা সামুদ্রিক শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু' হাজার টাকা দামের খাট। অনেক খরচ করে ঘরটা সাউন্ড প্রুফ করিয়েছে সাগর, লাগিয়েছে এয়ারকুলার। প্রতি ঘরে অন্তত সাত-আট রকমের বিচিত্র রঙের খাট। আলোর ডুম। সানমাইকা লাগানো বিশাল একটা লেখার টেবিল কিনেছে সাগর। গোছা গোছা দামি বন্ড কাগজ। পাঁচ-সাতটা মহার্ঘ বিদেশি কলম, চমৎকার কয়েকটা টেবিল-ল্যাম্প। টেবিলের টানায় লুকোনো থাকে দেশি বিলিতি মদের বোতল, পাঁচশো পঞ্চান্ন নম্বরি সিগারেটের গোটাকয়েক প্যাকেট। সিন্ধু সবই দেখবে। এ-সব লুকোনো যায় না।

তোর চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে সিন্ধু। খাওয়ার টেবিলে ওদের খেতে দিয়ে কমলা বলে।

গোগ্রাসে খেতে খেতে সিন্ধু এক বার মুখ তুলে হাসল, আমার ছোট ব্যবসা, বড্ড খাটতে হয়। তার ওপর যেখানে-সেখানে খাই সময়ের ঠিক থাকে না—

ব্যবসাই করবি?

চাকরি দাও না, এক্ষুনি ব্যবসা ছেড়ে দেব।

চাকরি পাস না? তুই তো এল এম ই পাস!

বি ই-রাই বসে আছে তো এল এম ই। আমাদের ব্যাচের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া তিনজন বসে আছে এখনও।

বিয়ে করবি না?

কে মেয়ে দিচ্ছে! যদি কেউ দেয় খোঁজ রেখো। করব।

গণপতিবাবু বিয়ে করেছেন?

সিন্ধু হেসে বলে, গণপতি নয়, গনপত। আমি ওকে গনফট বলে ডাকি। যে কাজে হাত দেয় সে কাজ হয়ে যায় গন অ্যান্ড ফট।

মানে?

মানে কাজটা বিলা হয়ে যায়। ফ্লপ করে।

কমলা হাসে, বুঝেছি।

গণপত লজ্জা পেয়ে মাথা নামায়, বলে, ওর কথা!

বিয়ে করেছিস কি না বউদিকে বল। সিন্ধু ওকে কনুইয়ের ঠেলা দেয়। গণপত হাসে। সিন্ধু বলে, করেছে, বুঝলে বউদি! তোমার খাটনি বেঁচে গেল। মেড়ো মেয়ে খুঁজতে বিস্তর ঝামেলা হত। বিয়ে করে বেঁচে গেছে ব্যাটা, নইলে ওর বাবা ওকে জুতোপেটা করে বাড়ির বার করে দিয়েছিল প্রায়। ঘরে বউ আছে বলে একেবারে বার করতে পারেনি।

ওমা, কেন?

বাবু একসময়ে কলকাতায় কালচারাল মুভমেন্ট করত যে! নাটকের দলকে ফিনান্স করত। এখনও গোছা গোছা কাগজ খরচ করে নাটক লেখে। অখাদ্য সব লেখা।

না বউদি, ও-সব কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি সিন্ধুর কাছে ব্যবসা শিখি।

কমলা মুখে আঁচল তুলে হেসে ফেলে, ওর কাছে শেখেন? ও ব্যবসার কী জানে?

গনপত মুখখানা করুণ করে বলে, কী করব! আমার বাপ-জ্যাঠা-খুড়ো আমাকে ব্যবসায় নেয় না যে। তাই সিন্ধুর সঙ্গে ভিড়ে পড়েছি।

লুচির টাল শেষ করে খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে সিন্ধু বলে, গনফট, কলকাতায় যাবি তো তুই একা যা। আমি নড়তে পারছি না।

গনপত বলে, কে যাবে বাবা! এখন আমি ছাদে গিয়ে চিতপাত হয়ে ভুঁড়ি ভাসিয়ে শুয়ে থাকব। কলকাতা তো পালাচ্ছে না। বরং তোর যদি হার্ডশিপের ইচ্ছে থাকে তো তুই যা।

হার্ডশিপ নিয়ে ঠাট্টা নয় গনফট। টাকা থাক বা না-থাক হার্ডশিপ থাকলে ব্যবসা থাকবে। আমার ব্যবসার মূলধন হল ক্লেশসুখপ্রিয়তা, হার্ডশিপ।

কী বলছিস রে সিন্ধু! কী প্রিয়তা? কমলা জিজ্ঞেস করে।

গনপত উত্তর দেয়, ওর কথা বাদ দেন বউদি। যেখানে কষ্ট করার দরকার নেই, সেখানে ও খামোকা কষ্ট করবে। বালি স্টেশন থেকে এই এক মাইল রাস্তা ও সুটকেস হাতে হেঁটে আসতে চেয়েছিল। ব্যাটা হাড়কেপ্পনও বটে। খাবে না, গাড়ি চড়বে না, পোশাক পরবে না, কেবল কষ্ট করতে করতে দেখুন, ওর শরীরের রক্ত সব জল হয়ে গেছে। ফ্যাকাশে চেহারা। আমি বলি— মরবি সিন্ধু, খা খুব করে মাংস ভাত পরোটা। খায় না। হাসে।

বটে সিন্ধু! কমলা চোখ কপালে তোলে, এত কৃপণ তুই ছিলি না তো।

ও ব্যাটা বাড়িয়ে বলছে। অতটা না। তবে একটু বুঝে সমঝে চলি। বাড়ির অবস্থা বোঝই তো। একা আমার ওপর সব।

কথাটা বলেই সিন্ধু মুখটা লুকোবার জন্য ঘুরিয়ে নেয়। কথাটা বেরিয়ে গেছে, সে বলতে চায়নি। অন্তত তার দাদার প্রতি কোনও ঠেস দেওয়ার কথা সে কল্পনাও করেনি। তবু বেরিয়ে গেছে।

সিন্ধু লম্বা দুই পদক্ষেপে বাথরুমে ঢুকে যায়।

কমলা একটা শ্বাস ফেলে রান্নাঘরে চলে আসে। পড়ার ঘর থেকে তার দুই ছেলেমেয়ের পড়ার শব্দ আসছে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ নিয়ে বয়ে যায় একঝলক বাতাস। গোরুটা গোয়ালে পা দাপিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। খোয়া-ওঠা রাস্তায় ঝপাত করে লাফিয়ে ওঠে সাইকেল, তার শব্দ পায়। চুপ করে বসে থাকে

কমলা। মাসে মাসে সাগর মোটে পঞ্চাশটা টাকা পাঠায় বাবার নামে। কমলার শ্বশুর-শাশুড়ি কখনও টাকার কথা লেখেন না। না লিখলেই কী! তাঁদের অবস্থা সাগর বা কমলার অজানা নয়। একা সিন্ধুর ভরসায় তাঁরা সংসার চালান, শ্বশুরের পেনশন কিছু পাওয়া যায়, আর ব্যাঙ্কে রাখা মোটে কয়েক হাজার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। তা সেই টাকাও সিন্ধুর ব্যবসাতে মাঝে মাঝে তুলে দিতে হয়। সাগর সবই জানে তবু সব ভুলে থাকে। কমলার বুকটা একটু দুরদুর করে। যদি সিন্ধু শিলিগুড়িতে গিয়ে সব বলে দেয়! তার দাদার বাড়িতে কেমন মোজাইক করা ঘর, ঘরে বাগান, দু' হাজার টাকা দামের খাট! বড় লজ্জার কথা হবে সেটা।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ছিল কমলা। চা করে পুনিকে ডেকে পড়ার ঘরে মাস্টার মশাইকে চা পাঠাল। হপ্তা বাজার থেকে বিকেলে বড় মাছ আনিয়েছে। কুটতে বসল। মনটা বুকটা থম ধরে আছে।

দরজার কাছ থেকে সিন্ধু ডাকল, বউদি!

কমলা একটু চমকায়, হাসিমুখে বলে, আয়। একটা চেয়ার টেনে বোস।

সিন্ধু খাওয়ার ঘর থেকে চেয়ার টেনে রান্নাঘরের চৌকাঠ ঘেঁষে বসে।

বউদি, তোমার সামনে সিগারেট খাব?

খা। কত দিন তো বলেছি খেতে। এখন তো আর ছোটটি নোস।

সিন্ধু চওড়া করে লজ্জার হাসি হেসে সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, ছাদে গিয়ে শুতে-না-শুতেই গনফটটা ঘুমিয়ে পড়ল। একা লাগছিল বলে নেমে এলাম।

বেশ করেছিস। শিলিগুড়ির কথা সব বল, শুনি।

কী আর শুনবে! বাবার প্রেশার কমে বাড়ে। বাঁ চোখটা কাটাতে হবে ডিসেম্বরে। মা'র বড্ড খাটুনি বেড়ে গেছে, আজকাল বিয়ের জন্য জ্বালায়।

মন্তির ক'মাস চলছে?

কে জানে ও-সব! শুনেছিলাম তো সাত মাস।

নন্দদের যে ভাইটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তার খবর পাওয়া গেল?

না। আজকাল যে সংসার ছেড়ে পালায় সে-ই সুখে থাকে। বলে হাসল সিন্ধু।

শরীরটা একদম শেষ করেছিস। আমার কাছে ক'দিন থাক, ভাল করে খাওয়াই তোকে। এমন ফ্যাকাশে লাগে কেন চেহারাটা?

সিন্ধু চুপ করে থাকে, সিগারেট খায়। তারপর বলে, জিয়াডিয়া।

চিকিৎসা করাস না?

কবাই মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে কী রে? জিয়াডিয়া সহজে সারে না জানিস?

জানি। তার ওপর জন্ডিসের মতোও হয়েছিল।

কই, জানাসনি তো! বাবাও তো লেখেনি।

কাউকে জানাইনি। কিছু দিন লুকিয়ে ওষুধপত্র খেলাম, মা ঝাল-তেল ছাড়া রান্না করে দিত। জানিয়ে লাভ কী, বুড়োবুড়ি ভেবে মরবে। আমি এখন তাদের অন্ধের নড়ি। কাছছাড়া করতেই চায় না। কিছু হলে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পড়বেই তো। তুই কাছে-থাকা কোলপোঁছা ছেলে। তোর দাদা তো কবে তাদের পর করে দিয়েছে!

সিন্ধু ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, সে-কথা বলিনি।

কমলা ফিরে অকপট চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে বলে, তুই বলিসনি, আমিই বলছি। কথাটা একটুও মিথ্যে নয়!

দাদা তো বরাবরই কাছ-ছাড়া। পড়াশুনার জন্যে ছেলেবেলা থেকে হস্টেলে থাকত, তারপর চাকরি করতে কলকাতায় এল। দাদার ওপর তার জন্যে কারও রাগ নেই। শুধু মা-বাবা দুঃখ করে স্কুলের বন্ধের সময়ে বাড়ি যায় না বলে। আমি তাদের বোঝাই, স্কুলের চাকরিটা দাদার কিছু না, ব্যবসাটাই আসল। ব্যবসাতে তো ছুটি নেই, তাই আসে না।

কমলা সহসা উত্তর দেয় না। তার চোখের পাতা হঠাৎ ভিজে আসে। বঁটির ওপর মাথা নিচু করে থাকে সে।

সিন্ধু একটা হাই তুলে বলে, দাদা কাছে না থাকায় আমারই যা একটু বিপদ। গত বছর মাদ্রাজে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসার পর বুড়োবুড়ি আর রাতে ঘুমোতে পারে না। সারা দিন তাদের মুখ শুকনো। কয়েক দিনে চোখের কোল বসে, চামড়া শুকিয়ে কেমন হয়ে যেতে লাগল। মুখে বলত, যাক সিন্ধু চাকরি পেয়েছে, একটা দুশ্চিন্তা কাটল। আমি মনে মনে হাসতাম। দুশ্চিন্তা কাটল না বাড়ল সে আমি ছাড়া ভাল আর কে জানে! বুড়োবুড়ির জন্যই শেষ পর্যন্ত নিলাম না চাকরিটা। কোনওখানে যাওয়ার উপায় নেই ওদের ছেড়ে। দাদা কাছে থাকলে এ-রকমটা হতে পারত না।

কমলা স্খলিত গলায় বলে, এখানে এসেও তো ওঁরা থাকবেন না!

তাই থাকে! তা হলে লঙ্কা গাছের গোড়ায় জল দেবে কে? কাঁঠাল পেঁপে কলা পাহারা দেবে কে? এক ডাঁই দামি বাসনপত্র যদি চুরি হয়। বাড়িটায় যদি আগাছা জন্মায়? বুড়োবুড়ির অনেক সমস্যা বউদি। বাড়ির বড় মায়া। নিজেও তো বোঝো। নইলে আমি তো কত বার বলি, দাদার কাছে গিয়ে পার্মানেন্টলি থাকো, আমাকে ছেড়ে দাও। শোনে না। বলে, তোর কাজে তুই যা না, আমরা একলা থাকব।

তা বলে নিজের ভবিষ্যৎ ভাববি না সিন্ধু?

ভাবা ছেড়ে দিয়েছি। নিজেকে এখন মা-বাপের বিধবা মেয়ে ভাবি।

ব্যবসা কেমন চলছে তোর?

নর্থ বেঙ্গলে ব্যবসা আর চলে? প্রথম প্রথম কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়েছিল। সেই গন্ধে হাজারটা কন্ট্রাক্টর কলকাতা থেকে গিয়ে মাছির মতো পড়ল সেখানে। তাদের জন্য নতুন নতুন হোটেল খুলল শিলিগুড়িতে, মদের বার বসল, বাঙালি অবাঙালি ব্যবসাদার আর ফড়ে এখনও থিক থিক করছে শহরে। জোর কম্পিটিশন। পঁচিশ-ত্রিশ পারসেন্ট লেস দিয়ে সবাই টেন্ডার ধরছে। আমাদের সেই ক্ষমতা কোথায়? বেকার ইঞ্জিনিয়াররা একটা অ্যাসোসিয়েশন করে কন্ট্রাক্ট নিচ্ছিলাম, কিন্তু জয়েন্ট কোম্পানি চালানোর মতো মাথা আমাদের নয়। ঝগড়াঝাঁটি করে সব আলাদা হয়ে গেল। যে-লোকটা আমাদের কন্ট্রাক্ট ধরে দিত সে কন্ট্রাক্টের জন্য মোটা কমিশন নিত, এইসব কারণে ঝগড়া। ইলেকট্রিক সাপ্লাই আর ইউনিভার্সিটি যা টুকটাক কাজ দেয় তাইতে এখন চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আসলে চলে না। যা খাটি সে তুলনায় কিছু পাই না।

কমলা অন্যমনস্ক গলায় বলে, কত ছেলেই তো বাইরে চাকরি করতে যায়, তাদের মা-বাবা একা থাকে না? আমার শ্বশুর শাশুড়িই কেন পারবেন না?

সিন্ধু সিগারেটটা চটির নীচে ঘষে নেভায়। বলে, ঠিক কথা। এ-কথাটা মা-বাবাকে এক বার গিয়ে বুঝিয়ে এসো। তা হলে আমি বেঁচে যাই। অবশ্য মা-বাবা রাজি হলেই যে চাকরি পাব তাও নয়। মাদ্রাজেরটা হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম কপালজোরে। আর কি সে-রকম হবে? তবু যদি বোঝাতে পার বা নিজেদের কাছে এনে রাখতে পার তা হলে বড় ভাল হয়। নইলে বুড়োবুড়ি না-মরা পর্যন্ত বুঝলে— আমি খালাস হচ্ছি না।

বলে সিন্ধু একটু থমকে গেল, বলল, কথাটা খুব ক্রুয়েল হয়ে গেল বউদি, মাঝে মাঝে ফ্রাস্ট্রেশন থেকে বলে ফেলি। নইলে আমি কিন্তু জান দিয়ে বুড়োবুড়িকে ভালবাসি।

জানি সিন্ধু। কমলা দীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলে।

বউদি, তোমার তেল পুড়ে গেল, মাছ ছাড়ো!

কমলা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি রান্না চাপাল।

সিন্ধু হেসে বলে, যতই চেষ্টা করো, মা-বাবাকে পার্মানেন্টলি আনতে পারবে না তোমাদের কাছে। বৃথা চেষ্টা। ওরা দশ-পনেরো দিন কি জোর মাসখানেকের জন্য আসবে, তারপর ঠিক শিলিগুড়িতে ফিরে যাবে। বুড়ো মনে করে ওটাই এখন তার দেশ, তার বাড়ি। নিজের টাকার বাড়ি কী রকম জানো তো!

কমলা ম্লান হাসল। বলল, জানি।

সিন্ধু বলে, কেবল আমারই জানা হবে না।

কেন রে?
নিজের টাকায় বাড়ি! ভাবতে পারি না।
তোর আর বাড়ি দিয়ে কী হবে? শ্বশুরমশাইয়েরটাই তুই নিস।
সিন্ধু হাসে, সেটা তো বাবার টাকায় বাড়ি।
তাতে কী রে হাঁদারাম? বাবা কি তোর পর?
সিন্ধু একটু চুপ করে থেকে বলে, বাবা আমি নই। তফাত থাকেই। এগুলো পুরুষমানুষদের ফিলিং, বিশেষত ফ্রাস্ট্রেটেড পুরুষদের। তুমি বুঝবে না।
বলে সিন্ধু সিগারেট ধরায়।
কমলা একটু দেখে বলে, এত সিগারেট খাস কেন রে? তোর না জিয়াডিয়া, জন্ডিস?
টেনশনের জন্য খাই। সবসময়ে এত চিন্তা আর উদ্বেগ থাকলে একটা নেশা দরকার। তাই বেশি খেয়ে খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। খেলে টেনশন কমে যায়।
টেনশন তো কমে কিন্তু ব্যামো বাড়বে না? আর ওই কড়া সিগারেট, ওগুলো মানুষে খায়? তোর দাদাকে বকে ঝকে ওই হলদে প্যাকেটের বিচ্ছিরি গন্ধের সিগারেট ছাড়িয়েছি। ওগুলো খাস কেন?
সস্তা।
পেটে আলসার-টালসার হবে শেষে দেখিস।
হলে হবে। মানুষ এখন চায় ইমিডিয়েট রিলিফ। মাথা ধরেছে তো অ্যাসপ্রো বা অ্যানাসিন খেয়ে নাও, অম্বল হলেই অ্যালুড্রক্স, জ্বর হলেই নোভালজিন। মানুষ একদম অসুখ-বিসুখ ব্যথা-বেদনাকে সময় দিতে চায় না, সময় নেই, তেমনি টেনশন হলেই সিগারেট। পরে কী হবে-না-হবে তা নিয়ে মানুষ একদম ভাবা ছেড়ে দিয়েছে।
তা হলে কিন্তু সিগারেট খাওয়ার যে অনুমতি দিয়েছি তা ফিরিয়ে নেব!
সিন্ধু একটু হাসল।
পড়ার ঘর থেকে দুদ্দাড় দৌড়ে আসে জয়া আর সৈকত। 'কাকা কাকা' বলে ঘিরে ধরে সিন্ধুকে। তাদের শরীরের সুঘ্রাণ বুকে টেনে নেয় সিন্ধু। শৈশবের গন্ধ কী সুন্দর রোদ বাতাসের গন্ধের মতো শুদ্ধ।
ওই যাঃ বউদি! সিন্ধু বলে, মা ওদের জন্য কী সব তৈরি করে সুটকেসে দিয়ে দিয়েছে দিতে ভুলে গেছি।
সিন্ধু উঠে গিয়ে কৌটো বের করে আনে। নাড়ু, তক্তি, ক্ষীরের ছাঁচ, গোকুলপিঠে নিয়ে ওরা হই হই করতে থাকে। সিন্ধু এসে আবার রান্নাঘরের দরজায় বসে।
বউদি, দাদা কত রাতে ফেরে?
অনেক রাতে। পৌনে দশটা, দশটা, কখনও এগারো-বারোও হয়।
খুব ব্যস্ত, না?
খুব।
ব্যস্ততাই ভাল, আমি হার্ডশিপে বিশ্বাস করি।
কমলা শ্বাস ফেলে। বলে, আমিও করি।
জানি, তোমরা বাড়ি বাড়ি করে দু'জনে কম কষ্ট করোনি। আমরা প্রথমে হাসাহাসি করেছি, তারপর ক্রমে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি। দাদা যে এ-রকম হতে পারে তা ভাবতেই পারতাম না। হার্ডশিপ থেকেই আসে সুখ।
কমলা হঠাৎ অপলক চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে। তার ফরসা রঙে উনুনের আঁচ লেগে লালচে দেখায় মুখ। সুন্দরী না হোক কমলার শ্রী ছিল, আছে। তবে কমলার শ্রীর মধ্যে বরাবর একটু রুক্ষতা ছিল। জেদও বলা যায়। কিংবা অহংকার কি? সিন্ধু তা সঠিক নির্ণয় করতে পারে না।
কমলা চেয়ে থেকে বলে, তুই কি ভাবিস সিন্ধু, আমি খুব সুখে আছি।

## ॥ তিন ॥

ক্লাসঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সাগর বাইরের দিকে চেয়েছিল। তিনতলায় ক্লাস, আকাশ অনেকটা দেখা যায়। শরতের কাশফুলি মেঘ ভেসে যাচ্ছে, অনেক উপরে কয়েকটা বিন্দুবৎ চিল, একটা ঘুড়ি একা অনেক উঁচুতে থম ধরে আছে। ঘুড়িটা হলুদ। আচমকা বাতাসের টানে একটা নীল সাদা প্রকাণ্ড বেলুন ধীরে জেগে ওঠে। হিলিয়াম বেলুন, তার সঙ্গে সুতোয় বাঁধা বিজ্ঞাপন— আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট ফ্রম ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া! কালো লেখাটা ঘন নীল আকাশের গায়ে স্থির হয়ে ভাসে।

ছেলেরা সাগরের দেওয়া টাস্ক করছে। করছে কি না কে জানে! কাটাকুটিও খেলতে পারে কেউ কেউ, গল্পের বই পড়তে পারে। মোটের ওপর চুপ করে থাকে, গোলমাল করে না সাগরের ক্লাসে। টাস্ক না করলে কোনও ক্ষতি নেই। ঘণ্টা পড়ার সময় পর্যন্ত কাটিয়ে দেয় সাগর, টাস্ক দেখে না।

আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট ফ্রম ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লেখাটার দিকে চেয়ে থাকে সাগর। হিলিয়াম বেলুনটা কত উঁচুতে উঠেছে। ঘুড়িটা সরে যাচ্ছে ডান থেকে বাঁয়ে, তারপর চমৎকার একখানা বাঁক নিয়ে গোঁত্তা খেয়ে আবার ওপরে উঠল। একটা কালো ঘুড়ি কোথা থেকে বেড়ে কাছাকাছি আসে। হলুদ ঘুড়িটা দু'টো পাক খায়, এগোয়। লড়বে। সাগর আবার আকাশের গায়ে লেখাটা দেখে। একটা কবিতার লাইন ভেসে আসতে থাকে মনের ভিতর। স্পষ্ট নয়, কেবল গুনগুন একটা ধ্বনি তোলে মাত্র। সে উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শোনে— দীর্ঘ খোয়াই... তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী... রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো... ও পাশে স্বপ্নের বাগান... ছন্দ নেই, একটা দোলাচল আছে শুধু। একটু শব্দের আলোড়ন মাত্র। এখনও কবিতার শরীর স্পষ্ট নয়। সময় দেবে।

স্যার!

উঁ?

হয়ে গেছে।

হুঁ। বোসো।

দেখবেন না স্যার?

দেখব। রেখে দাও।

ছেলেটা বসে পড়ে।

সাগর আবার উৎকর্ণ হয়। গুঞ্জনটা শুনবার চেষ্টা করে। দীর্ঘ খোয়াই... কথাটা হারিয়ে যায়। নীল আকাশের বুকে আবার একটু বাতাসের টানে উঠে আসছে লেখাটা— আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট... হলুদ ঘুড়িটা ভেসে যাচ্ছে ঢেউয়ের নৌকোর মতো। দীর্ঘ খোয়াই... তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী...

আসছে না। সাগর ক্লাসঘরের দিকে চেয়ে থাকে! নামানো সব মাথা, কালো চুল... রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো... ও পাশে স্বপ্নের বাগান...

ঘণ্টা বাজে। এক, দুই, তিন। সাগর দরজার দিকে ফেরে। হারিয়ে যাওয়ার আগে ক'টা লাইন নোটবইতে লিখে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি।

স্যার, দেখলেন না? নাছোড় ছেলেটা উঠে দাঁড়ায়।

পরের দিন দেখিয়ো। সাগর বলে। ফিরে তাকায় না আর; দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

থার্ড পিরিয়ডেই সাগরের ক্লাস শেষ হয়ে যায় রোজ। রুটিনে ওই পর্যন্তই তার ক্লাস। গত বছর থেকে নিয়মটা চলে আসছে।

গতবারই সাগর স্কুলকে দু' দফায় হাজার ছয়েক টাকা ডোনেট করেছে। আর ন' হাজার টাকা ডোনেশন তুলে দিয়েছে। একটা চ্যারিটি জলসা আর গোটা দুই ফিল্ম শো করেছিল। গরিব স্কুলটা খানিকটা বেঁচে গেছে। স্যালারি অ্যাকাউন্টের ছ'হাজার টাকারও সংস্থান হত না বলে একসময়ে মাস্টারমশাইরা পুরো বেতন পেতেন না, যা পেতেন তাও দু'-তিন দফায়। এখন পনেরো হাজার টাকার একটা ক্যাপিটাল থাকায় মাস-মাইনের ভাবনা নেই। স্কুল তাকে খাতির করে। গত বছর থেকেই তার ক্লাস কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। কেউ কিছু বলে না। টিফিনের এক পিরিয়ড আগেই সে চলে যেতে পারে।

আজ যায় না সাগর। বসে বসে লাইন ক'টা সাজায়। মোটে চারটে পঙ্‌ক্তি। বেয়ারা এসে পাশে চা রেখে যায় সসম্ভ্রমে, ডিসটার্ব করে না কেউ। লাইন ক'টা নিয়ে বসে থাকে সাগর। একজন মাস্টারমশাই প্রবল কাশি চাপছেন, পাছে সাগরের অসুবিধে হয়। গত মাসেও ওই মাস্টারমশাইটি সাগরের কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছেন। প্রায়ই নেন। প্রায় সবাই এখানে সাগরের অধমর্ণ।

সাগর লাইন ক'টার দিকে চেয়ে থাকে হতাশায়। পুরো কবিতা নয়, ছিন্ন শরীর মাত্র। এই হচ্ছে মুশকিল। কবে যে বাকি অংশটা ধরা দেবে তার কোনও ঠিক নেই।

শুদ্ধ কবিতাগুলি নির্মিত হয়েই আছে। হয়তো অন্তরীক্ষে বা আবহমণ্ডলের কোথাও এক রহস্যময় আলো-আঁধারিতে বাস করে কবিতাগুলি। মাঝে মাঝে কদাচিৎ তারই অংশগুলি ধরা দেয়। শুধু কবিতা কখনওই কবির নিজের রচনা নয়, কবি উৎকর্ণ উন্মুখ থাকলেই মাত্র অন্তরীক্ষের ইঙ্গিতগুলি তার কাছে পাখির মতো উড়ে আসে মাঝে মাঝে। সাগরের এ-রকমই ধারণা।

সাগরবাবু, আপনার টেলিফোন! বেয়ারা এসে বলে যায়।

টেলিফোনটা হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। সাগর উঠে অন্যমনস্ক ভাবে বারান্দা পার হয়।

হেডমাস্টার মশাইয়ের মুখখানা ভারী আহ্লাদি। ভালমানুষি এবং নিরীহতায় মাখানো। সাগরকে দেখে হাসলেন, সম্ভ্রম ফুটে ওঠে চোখে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা হাতে দেওয়ার সময়ে বললেন, মানিকবাবু কথা বলছেন মনে হল।

মানিক রোজই দু'-তিন বার ফোন করে। হেড স্যার গলা চিনে গেছেন।

কে, সাগর?

বলছি।

তোর তো এখন ছুটি! একবার মজুমদারের কাছে যা।

মজুমদার রাজি হয়েছে?

হয়েছে।

দশ হাজার দেবে?

দেবে, তবে বেগরবাঁই করছে। আমরা সবসুদ্ধু ছ'জন টেন্ডারার আছি কর্পোরেশনের ওই অর্ডারটার জন্য। আগামী কাল লাস্ট ডেট। মনে হচ্ছে আর-কেউ টেন্ডার দেবে না, যদি না দেয় তা হলে ছ'জনের মধ্যেই বন্দোবস্ত হবে।

কী রকম বন্দোবস্ত?

জানিসই তো, মজুমদার কী রকম উঁচু রেট দেবে!

সাগর বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ, সেটা জানব না কেন? আমি কি বাচ্চা ছেলে? বলছি, মজুমদার অন্য চারজনকেও দশ হাজার করে দিচ্ছে কি না।

না, আমাদেরই দিচ্ছে, সিক্রেটলি। হাতে পায়ে ধরে বলেছে যেন অন্য চারজনকে টাকার পরিমাণটা না জানাই।

বাকি চারজন টেন্ডারার কারা?

বিশ্বাস, কৃষ্ণা কোম্পানি, লিঙ্ক এন্টারপ্রাইজ আর চক্রবর্তী।

মজুমদার টাকা কবে দেবে?

কাল বেলা বারোটায়। ক্যাশ ডাউন তুই আজ তবু একটু কথা বলে আয়। ও বলছে যদি কালকের মধ্যে নতুন কোনও টেন্ডারার আসে তা হলে অত টাকা দেবে না। নতুন টেন্ডারারকেও খাওয়াতে হবে তো।

সাগর একটু ভেবে বলল, তবু তুই টেন্ডারটা টাইপ করিয়ে রাখ। মনে হয় শেষ পর্যন্ত মজুমদার কষাকষি করবে। যদি করে তো আমরা টেন্ডার সাবমিট করব, প্যাক্টে যাব না।

তবে বাকি চারজনের কী হবে? আমরা যদি শেষ পর্যন্ত টেন্ডার দিই তো ওদের বিট্রে করা হবে। তুই বরং মজুমদারকে আজ একটু বুঝে আয়।

মজুমদারের সঙ্গে যখন প্যাক্ট তখন সবাই নিজের টেন্ডার পকেটে নিয়েই যাবে। ভাবিস না, আজ আমি একটু ব্যস্ত।

কী নিয়ে?

কয়েকটা লাইন মাথায় এসেছে।

ওঃ! কিন্তু কারখানাতেও তোর একবার যাওয়ার কথা ছিল যে। গানমেটালের বুশগুলো ডেলিভারি দেয়নি।

তুই যা।

আমি তো যাচ্ছিই হাওড়ায়। স্লুইস গেটের প্লেট আজ বেন্ডিং হবে, ভুলে গেছিস?

সাগর একটা শ্বাস ফেলল, সেই শ্বাসটা বোধ হয় শুনতে পেল মানিক। হাসল. বলল, আচ্ছা যা, আজ তোকে ছুটি দিচ্ছি; কিন্তু কাল সকালে স্কুলে আসার সময়ে কারখানাটা ঘুরে আসিস। ওদের বড্ড লেবার ট্রাবল। গোলমাল হলে আমাদের কনস্ট্রাকশন পিছিয়ে যাবে। একটা কথা বলি সাগর, স্কুলটা এবার ছাড়।

সাগর ফোনটা কান থেকে সরিয়ে রিসিভারটার দিকে একটু চেয়ে থাকে। কালো টেলিফোনটা থেকে এখনও মানিকের কথা ভেসে আসছে, বুঝলি, বারো লাখ টাকার কাজ, তিন লাখ খাওয়াতে হবে, ওরা বলছে বারো লাখের বিল করবেন, আমরা ছয় কেটে নেব। অর্ডারটা নেওয়া কি ঠিক হবে?

পুরো কথাটা শোনেনি সাগর। তবু তার অসুবিধে হয় না বুঝতে। অভ্যেস হয়ে গেছে। কোনও সরকারি ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাঁকিবাজির কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে। বিনা কাজে টাকা। ফোনটা কানে ধরে বলে, পাগল! ছয় লাখ টাকা খরচ দেখাবি কী করে? ছেড়ে দে।

যদি স্টাফ বাড়াই? এস্টাব্লিশমেন্টের খরচ দেখাই?

দূর বুদ্ধু! অত টাকা ঢোকানো যাবে না। দম-সম হয়ে যাবি। ছেড়ে দে।

ঠিক আছে, তোর কি গাড়ি দরকার? বল তো স্কুলে পাঠাই?

না। তুই হাওড়ায় যা।

আমি আচার্যির গাড়িতে যাচ্ছি।

আমার দরকার নেই।

আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি—

মানিক ছেড়ে দিল।

স্টাফরুমে এসে সাগর তার নোটবইটা খুলল। দীর্ঘ খোয়াই... তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম... নদী রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো. . ও পাশে স্বপ্নের বাগান। অর্থহীন লাগল লাইন ক'টা কিছুক্ষণ। মজুমদার কাল ডাউন-পেমেন্ট করবে কি না সন্দেহ হতে থাকে সাগরের। হয়তো আরও দু'-একজনকে জুটিয়ে এনে শো দেবে। বলবে, দেখুন, এরাও আজ টেন্ডার দিতে এসেছে। কী করি? ক্যাশ এত টাকা দিচ্ছি, আপনারা ভাগ করে নিন। নতুন লোকগুলো হয়তো মজুমদারেরই ভাইপো ভাগনে কেউ হবে। ভাগের টাকা নিয়ে মজুমদারের বাড়িতেই তুলে দিয়ে আসবে।

নোটবইটা খুলে বসেই রইল সাগর। কলমের মুখটা শুকিয়ে গেল। বুশগুলো এখনও দেয়নি, ইরেকশনটা যদি পিছিয়ে যায়। অনেক চিন্তা। তবু আরও কিছুক্ষণ সাগর হতাশভাবে একটা রঙিন সাঁকোর দিকে চেয়ে রইল। 'বাগান' শব্দটা বড় বেমানান বাজে শব্দ। সেটা বদলে এক বার লিখল 'দেশ'। আবার কাটল। পরের লাইনগুলো আর আসছে না। কিন্তু সাগর স্পষ্টই অনুভব করে অন্তরীক্ষে রহস্যময়তায় অস্পষ্ট হয়ে আছে তারা। নৃত্যপর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। আসছে না।

আবার ফোন আসে।

ভট্টাচার্য বলছি।

কোন ভটচায?

সমীর।

ও।

আপনি আমাকে একটা অ্যাপার্টমেন্টের জন্য বলেছিলেন, মনে আছে?

হ্যাঁ।

একটা পেয়েছি। আলিপুরে। সত্তর হাজার।

ডাউন পেমেন্ট কত?

আটাশ হাজার। মাসিক কিস্তি তিনশো সত্তর।

ঠিক আছে। কিন্তু বাড়িটা কত উঁচু?

দশতলা। আপনার ক'তলায় চাই? গ্রাউন্ড ফ্লোরটা কেবল গ্যারেজ, ফার্স্ট ফ্লোর থেকে পাবেন।

আমি দশতলায় চাই।

ভটচায চুপ করে থাকে, বলে, দশতলায়?

হ্যাঁ। আরও উঁচুতে হলে আরও ভাল হত।

ভটচায হাসে। বলে, দশতলায় পাবেন। অত ওপরে ডিম্যান্ড কম। যদি বাইচান্স লিফট কোনও দিন গড়বড় করে তবেই কিন্তু মুশকিল!

হোক। আমি দশতলায় চাই। পজেশন কবে থেকে দেবে?

দেরি আছে। আন্ডার কনস্ট্রাকশন। জানাব।

ফোন রেখে দেয় সাগর।

স্টাফরুমে বসে সে কিছুক্ষণ এক অগাধ ক্লান্তি বোধ করে। চোখ বুজে থাকে। শুনতে পায়, বাইরে কারা তার খোঁজ করছে। বেয়ারাটা বলল, বিশ্রাম নিচ্ছেন, একটু ঘুরে আসুন।

আমরা কালও এসে ফিরে গেছি।

সাগর চোখ খুলে বলল, কে রে ভানু? পাঠিয়ে দে।

তিনটি অল্পবয়সি ছেলে এসে দরজায় দাঁড়ায়।

সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জি—?

আমিই। কী চাই?

ছেলে ক'টা চটপট পায়ে এগিয়ে আসে। একটা চটি পত্রিকা সাগরের সামনে টেবিলে রেখে বলে, কাগজটা দিতে এসেছি।

কাগজের নাম 'কল্পনালতা'। কবিতার কাগজ। প্রচ্ছদে চমৎকার একখানা স্কেচ। প্রাণবন্ত একটি মেয়ের মুখ। ছবিটা চেনা চেনা লাগে সাগরের। কোথাও এর আগে দেখেছে।

প্রচ্ছদ কার আঁকা?

তিনজনের একজন এগিয়ে বলে, আমার। কেমন হয়েছে?

সাগর ছেলেটার রুক্ষ মুখখানার দিকে তাকায়। কী বলবে সাগর! হুবহু এ-রকম একটা স্কেচ সাগর দেখেছিল। পিকাসোর আঁকা। ভাবল ছেলেটাকে একটু ধমক দেবে। দিল না। এখন আর শুদ্ধতা কার ভিতরে আছে! বলল, ভালই।

একজন বিনীতভাবে বলে, আপনার কাছে একটা কবিতার জন্য এসেছিলাম। নেক্সট ইসু ডিসেম্বরে বেরোবে—

কবিতা! বলে সাগর একটু চেয়ে থাকে ছেলেগুলোর দিকে। তার বুকে অজান্তে জমে যায় শ্বাস। আস্তে সেই শ্বাসটুকু অনেকক্ষণ ধরে ছাড়ে সাগর। বুকটা হঠাৎ খালি খালি লাগে। সাগর বলে, আমি তো ভাই এখন আর লিখি না।

কেন লেখেন না? আর্টিস্ট ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

পারি না। হয় না। বলে সাগর অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর রাখা নিজের দু'খানা হাতের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলেগুলোর মুখের দিকে না-তাকিয়েই বলে, আমার শেষ কবিতা ছাপা হয়েছিল বছর দুয়েক আগে, তারপর আর বেরোয়নি। আপনারা আমার খোঁজ পেলেন কোথায়?

তৃতীয় ছেলেটি কথা বলেনি এতক্ষণ, এবার সে বলে, আপনার নাম অনেকের মুখে শুনি। একটা সংকলনে পড়েওছি আপনার কবিতা।

তীব্র সন্দেহে সাগর ছেলেটির দিকে তাকায়। একবার ভাবে ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে! ওকে দু' একটা লাইন বলতে বলবে নাকি সাগর! তার মুখটাতে তীব্র বিদ্রূপ ঝলসায়। কিন্তু সামলে গেল। নিস্পৃহ গলায় বলে, কবিতার কথা থাক। আমি লিখতে পারছি না। আর কিছু দরকার আছে?

যে প্রথম কবিতা চেয়েছিল সেই ছেলেটি বিনীতভাবে বলে, একটা বিজ্ঞাপন যদি দিতেন। জানেন তো লিটন ম্যাগাজিন কী ভাবে চলে!

সাগর ছেলেটার মুখ থেকে সাদা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় চট করে। এটা সে জানত। বহু লিটল ম্যাগাজিনকে সে এখনও মায়াবশে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দেয়। স্মিতমুখে নিজের আঙুলগুলির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, বিজ্ঞাপন পাবেন। যদিও আমার কোম্পানি ছোট, আর পাবলিসিটির জন্য আমরা কিছু খরচা করি না, তবু দেব। এক দিন আমার ধর্মতলার অফিসে যাবেন সন্ধের পর।

ব্যাক কভারটা রেখে দেব?

সাগর উদাসীনভাবে বলল, রাখবেন।

কবিতা না দিলে কিন্তু ছাড়ছি না। সেই ছেলেটা বলে। তারপর তারা তিনজন পিছোতে থাকে, বলে, চলি তা হলে!

আসুন ভাই।

ক্লান্ত সাগর চোখ বুজে থাকে একটুক্ষণ। কবিতা কথাটাই কি মদের মতো? বিদ্যুৎ চমকের মতো ও-কথাটা যত বার শোনে তত বার সে শিহরিত হয়। হতাশ হয়। উত্তেজিত হয়। নেশার ঘোরে এক অপার্থিব আলো-আঁধারি জগতের দিকে মনে মনে চেয়ে থাকে।

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই ছেলেদের দৌড়পায়ের আওয়াজ আর হো হো চিৎকার শোনা যায়। স্টাফরুমে ভিড় বেড়ে যাবে। সাগর উঠল।

দুপুরের আকাশে বাতাসের টানে হিলিয়াম বেলুনটা হেলে আছে। আর্ন মান্থলি ইন্টারেস্ট— লেখাটা শূন্যে শুয়ে আছে। ভেঙে পড়েছে দুপুরের রোদ কলকাতায়। সাগর কিছু দূর হাঁটল, তারপর ট্রামে উঠল। আজকের দুপুরটা মানিক তাকে ছুটি দিয়েছে। কিন্তু আসলে সাগরের ছুটি নেই। এক বার মজুমদারের কাছে যাওয়া খুবই দরকার। শেষ মুহূর্তে লোকটা বেগরবাঁই করতে পারে।

ম্যাঙ্গো লেনে কী করে যে মজুমদার অফিস খুলেছে সেটাই অবাক লাগে সাগরের। ধর্মতলায় সাগরের অফিসটা ছোট্ট আর ঘিঞ্জি। একটা বড় ঘরে তিনটে টিক প্লাইয়ের পার্টিশন দিয়ে তিনখানা অফিস ঘর, তারই একটা বহু কাঠখড় পুড়িয়ে জোগাড় করেছে সাগর আর মানিক। সেখানে তিন-চারজনের বেশি লোক এলে ঠাসাঠাসি হয়। কিন্তু অফিসটা বড় কথা নয় বলে এবং তাদের দু'জনেরই বাইরে বাইরে ঘোরার কাজ বলে তারা অফিস নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু মজুমদার মাথা ঘামিয়েছে। ঢুকতেই অফিসের ছোট্ট কিন্তু বাহারি রিসেপশন রুম। দু'টো ডানলোপিলোর কৌচ আছে মেঝেতে দড়ির কার্পেট। দেয়ালে লাগানো শীতলপাটির ওপর পটুয়াদের হাতের কাজ। চমৎকার একখানা কাঠের কাউন্টারের মতো, তার ও-পাশে চলনসই চেহারার রিসেপশনিস্ট মদিরা দত্ত। মদিরার আসল নাম ছিল মন্দিরা, মজুমদার 'ন'টুকু ছেঁটে নিয়ে নামটাকে একটু 'হট' করে নিয়েছে। মন্দিরার পিছনে ঘষা কাচ লাগানো পার্টিশন, স্প্রিং লাগানো ফ্লাশডোর। ওটা মজুমদারের ঘর, মদিরাকে পার না হয়ে মজুমদারের ঘরে ঢোকা যায় না। পার হওয়াটা বেশ শক্ত।

সাগরের মাথার ভিতরে তখনও খোয়াইয়ের শেষে ঝিরঝিরে নদীটি এবং তার ওপর রঙিন সাঁকোর দৃশ্যটা আবছা লেগে আছে, সে মজুমদারের রিসেপশনে ঢুকে মদিরাকে লক্ষ না করে মজুমদারের ঘরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল।

মদিরা মিষ্টি হেসে বলল, নেই।

সাগর তার লম্বা চুলগুলোর ওপর অন্যমনস্ক হাত বোলাতে বোলাতে মদিরার দিকে চাইল। বাক্সম যাকে বলে মদিরা ঠিক তাই। একটু ভারী চেহারা, চৌকো থুতনি, রংটা খারাপ নয়। ঠোঁট অতিরিক্ত পাতলা বলে মুখ বুজে থাকলে হঠাৎ মনে হয় ওর ঠোঁট বলে কিছু নেই। ঠোঁট না থাক লিপস্টিক আছে ঠিকই, তাতে এইটুকু সুবিধে হয়েছে যে ঠোঁটের অবস্থান বোঝা যায়। চোখ দু'টো বোধ হয় একটু গোল ধরনের, তাতে ম্যাসকারা, কাজল, রং দিয়ে দিব্যি বড় আর টানা করে ফেলেছে। ডোনারে বাঁধা খোপা। পরনে বম্বে ডাইং-এর চমৎকার ছাপা শাড়ি, হাতে পুরুষদের ঘড়ি। সামনে একটা টাইপরাইটার আর টেলিফোন। বস্তুত কোনও কাজ নেই বলে সারা দিন হাই তোলে, ঝিমোয় আর ভাবে মদিরা।

মজুমদারের সঙ্গে লাঞ্চে যায় মাঝে মাঝে। মজুমদারের কাছে দু'রকম পার্টি আসে, দেনেওয়ালা আর লেনেওয়ালা। এক দল মজুমদারকে বিজনেস দেয়, অন্যদল মজুমদারের কাছে পেমেন্ট নেয়। এই দু'টো দলকে খুব সতর্কতার সঙ্গে চিনে নিয়েছে মদিরা। সাগর লেনেওয়ালা। কাজেই নেই কথাটাকে বিশ্বাস করবে কি না ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেছে?

মদিরা মিষ্টি হেসে বলে, ইনকাম ট্যাক্সের হিয়ারিং আছে। বসুন না, এসে যাবে।

সাগর কৌচে বসে পড়ল। বলল, চা হবে মদিরা?

বাঃ, নিশ্চয়ই। কলিং বেলটা টিপতেই এক ঝাঁক মিষ্টি ঘুঙুরের শব্দ হল।

সাগর বলে, মজুমদার কলিং বেলটা পর্যন্ত পয়সা খরচ করে করেছে! না মদিরা?

মদিরা হাসে। হাসাটাই কাজ তার। বেয়ারা কোথা থেকে এল কে জানে। ভুঁইফোড়ের মতো সামনে এসে দাঁড়াল মুশকো একটা সাদা জিনের ইউনিফর্ম-পরা লোক। সে চায়ের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

সাগর মদিরার দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, বলল, অফিসের ডেকরেশনের জন্য মজুমদার এত মাথা ঘামায় কেন বলুন তো?

অনেকে ডেকরেশন পছন্দ করে।

সাগর মাথা নেড়ে বলল, আমরা যে দরের কন্ট্রাক্টর মজুমদারও সেই দরের। খুব বড় কন্ট্রাক্টরের কথা ছেড়ে দিন, আমাদের মতো লোকের একটা ঠিকানা আর একটা টেলিফোন নম্বর হলেই হল। ফর করেসপন্ডেন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ব্যস। যদি কাউকে কখনও এন্টারটেন করতেই হয় তো তার জন্য হোটেল রেস্টুরেন্ট বার আছে, কিন্তু তবু মজুমদার না হোক হাজার দশেক টাকা ঢেলেছে ডেকরেশনের জন্য। আপনিও অফিস ডেকর মদিরা।

মদিরা তার অদৃশ্য ঠোঁট বিস্তৃত করে হাসে। দাঁতগুলো একটু হলদেটে হলেও বেশ মজবুত, আখের গোড়া কিংবা খাসির ঠ্যাং চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলতে পারবে। চোয়ালও বেশ জোরালো। তবু হাসিটা দেখল সাগর। ওই হাসির আড়ালে মদিরার মনোভাব বুঝবে এমন সাধ্যি কার আছে! মদিরা সাগরের চোখ থেকে লজ্জার ভান করে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, মেয়েরা তো তাই!

কী?

সব জায়গাতেই মেয়েরা ডেকরেশন! ওইভাবেই তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

সাগরের এক বার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, মজুমদার আপনাকে কীভাবে ব্যবহার করে? শুধুমাত্র ডেকরেশন! এক বছর আগে মজুমদার তার বউকে ডিভোর্স করেছে, তারপর আর বিয়েও করেনি, এই সিচুয়েশনে আপনাকে কি কেবলমাত্র অফিসে সাজিয়ে রেখেছে মজুমদার বাঁকুড়ার ঘোড়া বা কেষ্টনগরের পুতুলের মতো? ব্যবহার করেনি?

আপনাদের বিজনেস তো দারুণ চলছে, মিস্টার মজুমদারের কাছে শুনি আপনারই এখন রোরিং! মদিরা তার মুখখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ কেটে তেরছা চোখে সাগরের দিকে চেয়ে বলে।

ওই একরকম।

মদিরা হাসিটা বজায় রেখেই বলল, আপনারা সি এম ডি এ-র অর্ডারটা বড্ড কম রেটে ধরেছেন। আরও টু পারসেন্ট হাই দিলেও অর্ডারটা আপনারাই পেতেন, বেশি প্রফিট থাকত। অত কম দেওয়ার দরকার ছিল না।

সাগর একটু হাঁ করে রইল। মদিরার কাছ থেকে কথাটা আশা করেনি। বলল, ঠিকই। মজুমদার কত রেট দিয়েছিল?

আপনাদের চেয়ে অনেক হাই।

সাগর একটু হাসল, কেন হাই দিয়েছিল জানেন?

কেন?

ফর দিস অফিস অফ হিজ। এস্টাব্লিশমেন্টের খরচের জন্য। ও বড্ড গ্ল্যামার চায়। কম দিলে ওর পোষাত না। আপনার মাইনে, অফিসের ভাড়া, মেনটেনেন্স, ডেকরেশন এ-সব মিলিয়ে ওর খরচ অনেক, তাই মজুমদার সবসময়ে রেট বেশি দেয়, কন্ট্রাক্টও পায় না, আমরা কম রেট দিতে পারি, প্রফিটও করি।

করপোরেশনে আপনারা কত রেট দিচ্ছেন?

অনেক কম। এত কমে মজুমদার কখনও নামতে পারবে না। তাই আমরা হাশ-মানি নিয়ে অর্ডারটা ছেড়ে দিচ্ছি মজুমদারকে।

মদিরা গম্ভীর হয়ে গেল একটু। নিজের নখ দেখল খানিকক্ষণ। সাগর কৌচের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মদিরার কাউন্টারের আরও একটু নিকটবর্তী হয়ে বলল, মজুমদারকে বলবেন এস্টাব্লিশমেন্টের খরচ আর-একটু কমাতে। ও যে পাঁচশো টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া দেয় সেটাও বড্ড বেশি টাকা। একা মানুষের অত বড় ফ্ল্যাট দিয়ে কী হবে!

চা এসে গেল, মুশকো লোকটা কাবার্ড খুলে চিনে ডিজাইনের অন্তত দশ-পনেরো টাকা দামের পাতলা পোর্সিলিনের পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে গেল। কাপটির গায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজ মুগ্ধ হয়ে দেখল সাগর।

মদিরা হঠাৎ বলল, এটা ওর নেশা।

কোনটা? সাগর চায়ে প্রথম চুমুকটা দিয়ে বলে।

সবসময়ে এই সুন্দর থাকার চেষ্টা, এটাই নেশা। এর জন্য মাঝে মাঝে খুব কষ্ট পায়।

সাগর চুপ করে থাকে। ভাবে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার হঠাৎ খেয়াল হয়, মজুমদারের সঙ্গে তার কোথায় যেন একটা মিল আছে। নিজের বাড়িতে কত অগাধ টাকা খরচ করে সাগর কত ডেকরেশন করেছে, দেখলে বোধ হয় মজুমদারেরও মাথা ঘুরে যাবে।

সাগর চা শেষ করে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা সবে বের করে নাড়াচাড়া করছে, ঠিক সে সময়ে বাইরে একটা চমৎকার পিঙ্ক রঙের গাড়ি এসে থামল। নতুন স্ট্যান্ডার্ড গাড়ি। পিছনের দরজা খুলে যেতেই প্রথমে এক জোড়া পা বেরিয়ে এল, পায়ে কাথবার্টসনের কম্বিনেশন, তার ওপরে হালকা ধূসর রঙের দামি প্যান্ট, তারও ওপরে একটা বম্বে ডাইং-এর চেকার্ড শার্ট দেখল সাগর। এ-সব সত্যিকারের পয়সায় কেনা জিনসের মোড়কে রয়েছে মজুমদার। নেমে দরজা বন্ধ করে কাকে যেন নিচু হয়ে বাই জানাল মজুমদার, হাতটা তুলল, মুখে পেটেন্ট হাসি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল।

আরে চ্যাটার্জির কী খবর?

সাগর সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল।

মজুমদারের বয়স চল্লিশ সবে পেরিয়েছে। ক'দিন আগেও পঁচিশ-ছাব্বিশ বলে চালিয়ে দেওয়ার মতো চেহারা ছিল মজুমদারের। মাজা গায়ের রং, অত্যন্ত মোলায়েম ব্রনহীন টান গায়ের চামড়া, মাথায় ঢেউ খেলানো ঘাড় পর্যন্ত চুল, কাটা-কাটা চোখা বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। একটু বেঁটে, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। বেঁটে বলে মজুমদারের বিন্দুমাত্র হীনম্মন্যতা কেউ কোনওকালে দেখেনি। সেই চেহারা এখনও আছে। তবু কোথায় যেন একটা ধস নেমেছে মজুমদারের। চোখের সেই চিকিমিকি বুদ্ধির জোনাকি যেন হঠাৎ নিভে গেছে। চমৎকার লালচে মধু রঙের চুলের রাশিতে ভেসে উঠেছে কয়েকটা রুপো রঙের চুল। একটু অন্যমনস্ক দেখায় মজুমদারকে। আর ঘাড়টায় একটু ঝুঁকে পড়া ভাব। আজকাল মজুমদার পিছন থেকে কেউ ডাকলে টক করে ঘাড় ঘোরায় না।

কথা আছে মজুমদার। সাগর বলল।

মজুমদার মুখের একটু ঝাঁকুনিতে কাচের দরজার ও-পাশে নিজের ঘরটা ইঙ্গিত করে চমৎকার ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে দরজাটা ঠেলে ধরে রইল। মুখে সেই হাসিটি। একটু ম্লান, তবু সাদা দাঁতের জন্য হাসিটা এখনও ভালই দেখায়।

সাগর মজুমদারের ঘরে ঢুকেই শীত তাপনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া আর মৃদু একটা ঘর-সুগন্ধির গন্ধ পেল। লাঙলের মতো আকৃতির বড় গ্লাস-টপ টেবিল, টেবিলের মুখোমুখি ঘন সবুজ নরম গদির চেয়ার। টেবিলের কাচের নীচে আমস্টারডাম, সুইজারল্যান্ড আর কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের রঙিন কয়েকটি ছবি।

মজুমদার তার সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসল। ফিলটার টিপড গোল্ডফ্লেক ধরাল। তারপর বলল, চ্যাটার্জি, চা?

এইমাত্র খেলাম।

মজুমদার চাবির রিঙের ছোট্ট একটা উকো দিয়ে একটা নখের আগা ঘষে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতখানা দেখল, একটু অস্বস্তি বোধ করছে সন্দেহ নেই। বোধ হয় মজুমদারের আত্মবিশ্বাস অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর অকপট সত্যের মতো অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে পারত, আর চোখ-মুখে হাসির সিনক্রোনাইজড খেলা দেখাত মজুমদার। ঘোরানো ঘাড়টা আর আজকাল সহজভাবে রাখতে পারে না সে।

সাগর একদৃষ্টে চেয়ে ছিল।

মজুমদার শব্দ করে চাবির গোছা টেবিলে ফেলে দিয়ে একটা শ্বাস ফেলল। বলল, চ্যাটার্জি, বলুন।

সাগর চোখে চোখ রেখে বলল, আমাদের কালকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটার ব্যাপার কনফার্ম করতে এসেছি।

ও তো মানিকবাবুর সঙ্গে ঠিক হয়েই আছে চ্যাটার্জি। মুশকিল হচ্ছে আরও দু'-একজন টেন্ডারার নাক গলাতে পারে বলে আন্দাজ করছি।

নাক গলালে কী হবে?

কী হবে আপনি বলুন!

আমরা হাশ্‌মানি কার্টেল করব না মজুমদাব।

মজুমদার শ্বাস ফেলল। কথা বলল না।

ও কে? সাগর জিজ্ঞেস করল।

মজুমদার নোয়ানো ঘাড়টা তুলবার একটা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তল চোখে সাগরকে দেখে নিল একটু। তারপর আস্তে বলল, চ্যাটার্জি, আপনারা তো আমার অবস্থা জানেন।

সাগর নিষ্ঠুর হাসির সঙ্গে বলল, ইট ইজ এ টাফ ওয়ার্ল্ড মজুমদার।

ইনডিড! মজুমদার নিরাসক্ত উত্তর দেয়। সিগারেটের ধোঁয়াটা বুঝিবা বিস্বাদ লাগে তার। হাঁ করে ধোঁয়াটা ছেড়ে মুখটা বিকৃত করে মজুমদার। তার কপালের ঘাম দামি সাদা রুমালে মুছে নেয় এবং এই প্রথম ঘর-সুগন্ধি আর সিগারেটের গন্ধ ভেদ করে এক ঝলক অ্যালকোহলের গন্ধ পায় সাগর।

সাগর একটু চাপা স্বরে বলে, মজুমদার, আজকাল দুপুর থেকেই মাল চালানো হচ্ছে?

মজুমদার কাঠ-হাসি হাসল, বলল, ইনকাম ট্যাক্সের একটা ছোকরাকে খাওয়ালাম। স্কচ। খাওয়াতে গিয়ে একটু খেতেও হল। সেইটেই বিপদ করেছি, একটু খেলে তেষ্টা বাড়ে।

বলে একটা পেপারওয়েট তুলে নিয়ে টেবিলের কাচের ওপর একটুক্ষণ গড়িয়ে দিল মজুমদার। তারপর হঠাৎ বলল, যাবেন চ্যাটার্জি?

কোথায়?

নিরিবিলিতে কোথাও গিয়ে গেলাস নিয়ে একটু বসি। দি বিল ইজ অন মি!

সাগর একটু দ্বিধা করল। ভরদুপুর, এ-সময়টায় সে কখনও খায় না। নানা রকম পার্টি ভিজিট করতে হয়। দ্বিধাটা বেশিক্ষণ অবশ্য রইল না। হঠাৎ তার মনে পড়ল কবিতাটা আটকে আছে। রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো, ও পাশে স্বপ্নের... তারপরই রুদ্ধ দুয়ার। কবিতার বদ্ধ অর্গল আর খুলবে না সহজে। কত বার ব্যর্থ করাঘাত করবে সাগর! কিন্তু দূরে অন্তরীক্ষে, যেখানে এক মায়াময় জগতে কবিতার শরীর নির্মিত হয়, সেখান থেকে সাবলীল সরীসৃপের মতো বাদবাকি পঙ্‌ক্তি ক'টা আর নেমে আসবে না বহু দিন। আধখানা কবিতা কোলে নিয়ে বসে থাকবে সাগর অপেক্ষায়। এই একটানা অপেক্ষা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই সে বলল, চলুন।

খুশি হল মজুমদার। উঠে বলল, দেন লেট আস কল ইট এ ডে!

বাইরে এসে মদিরাকে লক্ষ্য করে মজুমদার সংক্ষেপে বলল, আর ফিরছি না আজ মদিরা, সময় হলে বন্ধ করে চলে যেয়ো। কাল টেন্ডারের দিন, একটু তাড়াতাড়ি এসো।

মদিরা কথা বলল না। কেবল উৎসুক চোখ তুলে দু'জনকে দেখে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করল।

সাগর মদিরার দিকেই অপলক চেয়ে রইল একটু। ও কি মজুমদারের প্রতি একটু...? কে জানে বাবা! এ-সব মেয়েদের হৃদয় বড় একটা থাকে না। নির্মম ঔদাসীন্যে দেহ দান করে। দুর্বল হয় না। কিন্তু মদিরা? সাগর ঠিক বুঝতে পারে না।

বাইরে এসে দুপুরের ফাঁকা একটা ট্যাক্সি ধরে মজুমদার। পিছনের সিটে পাশাপাশি বসে গোল্ডফ্লেক এগিয়ে দিয়ে বলে, আজ মাছের মতো গিলব; বুঝলেন চ্যাটার্জি?

কেন?

এমনিই।

মজুমদার, আপনাকে দেখে একটা ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয় আজকাল। কেন বলুন তো?

মজুমদার উত্তর দিলে না। একটু চুপ করে থেকে মাথার চুল আঙুল দিয়ে ঠেলে পিছনে টান করতে করতে বলল, কেন মনে হয় চ্যাটার্জি? আমার কি টাক পড়েছে? নাকি চোখের নীচে কাকের পা দেখা যাচ্ছে? বুড়ো দেখাচ্ছে? না তো কী!

কী জানি! শরীর-টরির কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। তবু কী একটা হয়েছে।

মজুমদার ঠোঁটে একটা অবহেলার ভঙ্গি করে বলল, ও কিছু না। দু' দিন ফুর্তি করলেই ঠিক হয়ে যাবে। টেন্ডারের জন্য একটু ভাবতে হচ্ছে তো। ভয়ও হচ্ছে। লাখ দুয়েক টাকার কাজ, হাশমানি চলে যাচ্ছে বিশ হাজার, তারপর খাওয়ানো টাওয়ানো আছে। কী তুলে আনতে পারব কে জানে!

সাগর মাথা নেড়ে বলে, কাজটা নিট। কোনও ঝামেলা নেই। আপনি মাল কিনতে শুরু করুন, দরকার হলে আমরা মাল সাপ্লাই দেব। ভাববেন না।

থ্যাঙ্ক ইউ। বলে মজুমদার। তবু অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে চুলে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকে। বোধ হয় নিজের অস্তিত্বে ভাঙচুরের শব্দ শোনে। ভেঙে পড়ছে মিনার, স্তম্ভ, দেওয়াল, ভেঙে পড়ছে বিশ্বাস ও ভালবাসা। সাগর ভাবে।

একটা অখ্যাত বার-রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করল মজুমদার। জায়গাটার একটাই গুণ, নিরিবিলি। একটার পর একটা কেবিন ফাঁকা পড়ে আছে। মজুমদার আর সাগর তারই একটায় মুখোমুখি বসল।

কী খাবেন চ্যাটার্জি?

বিয়ার।

দূর! স্কচ খান। যত খুশি। দি বিল ইজ অন মি!

সাগর হাসল।

স্কচেরই অর্ডার দিয়ে মজুমদার সিগারেট ধরাল। বলল, চ্যাটার্জি, একটা কথা বলবেন?

কী?

আমি শুনেছি, আপনি মাস্টারি করেন আর কবিতা লেখেন!

ঠিক।

কিন্তু আবার আপনিই একজন টাফ বিজনেস-ম্যান। কন্ট্রাক্টরির লাইনে আমি আপনার চেয়ে ক্রুয়েল লোক দেখিনি। আপনার মাস্টারি আর কবিতা কি একটা ক্যামোফ্লেজ চ্যাটার্জি?

সাগর ভ্রূ কুঁচকে বলে, আমি ক্রুয়েল?

মজুমদার শ্বাস ফেলে বলে, যারা ক্রুয়েল তারা অনেক সময়ে টের পায় না তারা কতখানি ক্রুয়েল। চ্যাটার্জি, আপনি যখন বিজনেস টার্মসে আসেন তখন কেউ আপনার ওপর এক পয়সা বারগেইন করতে পারে না। আপনার হৃদয় নেই। কী করে হল এই মেটামরফসিস?

স্কচ এসে গেল। নামে স্কচ, আসলে ভেজাল মাল। গেলাসটা মুখে তুলেই বুঝতে পারে সাগর। তবু অনেকটা একেবারে গিলে সিগারেট টেনে আস্তে করে বলে, লোকে আমাকে ও-রকম তৈরি করেছে মজুমদার।

মজুমদার একটু চাপা গলায় বলে, চ্যাটার্জি, আপনার পার্টনার মানিক সেন বিজনেস ভালই বোঝে। লোকটার সাহস আছে, চটপটে, এফিশিয়েন্ট। কিন্তু ও আপনাকে যমের মতো ভয় পায়, কোনও কাজ আপনাকে না-জানিয়ে করে না। অথচ ক্যাপিটালও ওর, আপনি শুধুমাত্র ওয়ার্কিং পার্টনার ছিলেন।

সাগর গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, ও-সব কথা থাক।

আমি কথাটা অন্য সেন্সে বলছি। আমি জানতে চাইছি, হাউ টু বি ক্রুয়েল লাইক ইউ? আমি কোনওকালে টাফ হতে পারিনি। আমার নেচারটা বড্ড উইক চ্যাটার্জি।

গ্লাসটা হাতের মুঠোয় ঘুরিয়ে সাগরর গ্লাসের গায়ে নিজের সরু আর লম্বা একটা মুখচ্ছবি দেখল। বলল, আমি সত্যিকারের বিজনেসম্যান নই মজুমদার। আমি আসলে বোধ হয় একজন ব্যর্থ কবি। আর ব্যর্থ কবিরা খুব ডেঞ্জারাস হয়।

মজুমদার কথাটা ঠিক বুঝল না। কিন্তু হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর মতো কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনি এ-লাইনে এলেন কী করে?

সাগর মজুমদারের মুখের দিকে চেয়ে বুঝবার চেষ্টা করল লোকটা ইয়ারকি করছে কি না। না, করছে না। মজুমদারের অর্ধেক মন এখন স্কচের ভিতর ডুবে আছে। আধো-মাতালরা কিছুটা অকপট হয়।

সাগর বলল, আমার বাড়িওয়ালা এক বার আমাকে তুলে দিয়েছিল। যে পদ্ধতিতে তুলে দিয়েছিল সেটা বড্ড মিন। লোকটা খুব একটা খারাপ ছিল না, কিন্তু ওর একটা কালো বেঁটে ঝি টাইপের বউ ছিল। সেই বউটা দিনরাত ওপর থেকে গালাগাল করত। অশ্রাব্য গালাগাল। বউকে বোধ হয় লোকটাই লেলিয়ে দিয়েছিল। যাকগে, বিস্তর ঝামেলা শুরু হওয়ার পর আমি বাড়িটা ছেড়ে দিই। একটা বস্তি ধরনের বাসায় গিয়ে উঠি। আর তখন থেকেই আমি আস্তে আস্তে পালটে যেতে থাকি। আগে কবিতা লিখতাম, টাকা পয়সা সুখ সচ্ছলতা এ-সব চিন্তাও করতাম না। কবিতা সব ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন কবিতাই ভেসে গেছে।

মজুমদার শুনছিল। একটু হাসল। তারপর বলল, ইজ ইট? তারপর পিছনে হেলে চোখ বুজে একটু ক্লান্ত হয়ে বলল, কিন্তু চ্যাটার্জি, আপনার নিষ্ঠুরতা অর্জিত নয়। ওটা জন্মগত।

সাগর মাথা নাড়ল না। বাড়িওলা ব্যাপারটা শুরু করেছিল, তারপর ক্রমশ ব্যবসায় নেমে আরও অনেক ফড়ে, চিট আর দালালদের পাল্লায় পড়ে আমার স্বভাব পালটেছে। নইলে আমি ভারী ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলাম মজুমদার।

মজুমদার আবার অদৃশ্য মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়ল। বলল, আমি ব্যবসাতে আছি আজ বিশ বছর। ফড়ে, চিট আর দালাল আমার নিত্যসঙ্গী। তবু আমি ক্রুয়েল হতে পারি না কেন?

আপনি ক্রুয়েল হতে চান কেন?

মজুমদার দীর্ঘ সময় ধরে মদ্যপান করল নিঃশব্দে। তারপর নিঃশব্দে মুখ তুলে বলল, আই ওয়ান্ট টু টিচ হার এ লেসন!

কাকে?

আমার বউকে।

সে তো কেটে গেছে শুনেছি। এভাবে কথাটা বলে সাগর লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু মজুমদার মাইন্ড করল না।

ইয়াঃ! বলে ম্লান একটু হাসে মজুমদার, বলে, উইমেনস আর এ করাপ্ট রেস চ্যাটার্জি। এতকালের বউ, দশ বছর বিয়ের পর ক্লিন হেঁটে বেরিয়ে গেল একটা কমবয়সি ছোকরার জন্য।

ও-সব কথা থাক না মজুমদার।

আরে দূর, থাকবে কেন? গোপন ব্যাপার তো কিছু নয়, সবাই জানে। ছোকরাটা স্মার্ট ছিল, হ্যান্ডসাম ছিল। অনেক পরিবারেই দেখবেন এ-রকম এক-আধটা ছোকরা আসা-যাওয়া করতে করতে আত্মীয়ের মতো হয়ে যায়। দাদা বউদি বলে ডাকত, ফাইফরমাশ করে দিত। ওদের মধ্যে যে রিলেশন গ্রো করছে তা অবশ্য আমি বুঝতে পারতাম। বউয়ের চোখই সে-কথা বলে দিত। তবু গা করিনি। কাজকর্ম নিয়ে আছি, বউ যদি একটু এনজয় করে করুক না। আই ডিড নট মাইন্ড! আচমকা বউ ডিভোর্স চাইতেই আমি বোমকে গেলাম। ডিভোর্সের কোনও দরকার ছিল না, বুঝলেন চ্যাটার্জি? ডিভোর্স ছাড়াই চলত। কিন্তু ছোকরাটার বোধ হয় সেন্স অব পজেশন খুব প্রবল, দখলদারি বা স্বামিত্ব চায়। কিন্তু কী যে মুশকিল! ছোট ছেলেটা একটু নুলো মতো, একটু হাবা, আমার ভারী আদুরে ছিল। বড় ছেলেটাও বাপকে ভালই বাসত। বউ পরের মেয়ে, কিন্তু বাচ্চাগুলো তো আর তা নয়। বউকে অনেক বোঝালাম। বুঝল না। এমনকী আমার শাশুড়ি পর্যন্ত এসে বউয়ের পক্ষ নিল, আমাকে বলল, তুমি মাতাল, মেয়েমানুষের দোষও আছে, আমার মেয়ে যদি আবার বিয়ে করতে চায় তো তাই দেব।

বিয়ে করেছে? সাগর সামান্য কৌতূহল দেখায়।

না, এখনও করেনি। ছোকরাটা ভাল চাকরি করে, প্রচুর ঘুষ পায়। আমার বউ আর শাশুড়ি একটা বাসায় থাকে, সেটার সব খরচা ও দেয়। আমার শ্বশুরবাড়ির তরফটা একটু ইয়ে... বুঝলেন... ছোটলোক আর কী! পয়সা খুব চেনে। শাশুড়িরও এই মেয়ে ছাড়া কাছের মানুষ কেউ নেই, আর-এক মেয়ে দিল্লি না কোথায় যেন থাকে! যাকগে, তারা এখন সেই আলাদা বাসায় আছে। ছোকরাটা খরচ দিচ্ছে, ভাল খাচ্ছেদাচ্ছে, বুঝলেন?

সাগর মাথা নাড়ল।

সেই বাসায় ছোকরা রোজই যায়, সিনেমা টিনেমা দেখে বেড়ায়। বলে একটু চুপ করে ভাবল মজুমদার। তারপর শ্বাস ফেলে বলে, আমিও যাই।

যান? সাগর অবাক হয়।

ওটাই আমার উইকনেস চ্যাটার্জি, বলেছিলাম না কী করে আপনার মতো ক্রুয়েল হওয়া যায়, আমিও হতে চাই! এইজন্যই বলছিলাম। নুলো ছেলেটার জন্য চকোলেট, জামা প্যান্ট কি খেলনা না নিয়ে গিয়ে পারি না। এক বার না দেখলে ভারী খারাপ লাগে। এখনও গেলে বাবা বলে ডাকে, বুঝলেন!

আপনি যে যান, আপনার বউ আপত্তি করে না?

না। এখনও খোরপোশ পাচ্ছে তো, তাই আপত্তি করে না। তবে আমি যে-সময়টায় যাই সেই সময়টায় অর্থাৎ রাত সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা, তখন ও বাসায় থাকে না। শাশুড়ি থাকে, চা করে দেয়, নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে দু'-চারটে কথাবার্তাও বলে।

নাকে আঁচল চাপা দেয় কেন?

মদের গন্ধ পায় যে! আমি ঘণ্টাখানেক আমার ছেলে দু'টোর মধ্যে ডুবে থাকি। বুঝলেন চ্যাটার্জি, ছেলেদু'টো ছাড়া আমার আর কোনও পিছুটান নেই। সেদিক দিয়ে আমি মুক্তপুরুষ।

সাগর বোধ হয় একঝলক কমলার কথা ভাবল। বিষণ্ণ হয়ে গেল মনটা। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, স্ত্রীর জন্য আপনার কষ্ট হয় না?

মজুমদার একটু ভ্যাবলা চোখে চেয়ে রইল সাগরের মুখের দিকে। তারপর গ্লাস তুলে অনেকক্ষণ ধরে স্কচ খেল। পাঁপড় ভাঙল এক টুকরো, হাতটা কাঁপছে, পাঁপড়টা মুখের কাছে তুলে আবার কী ভেবে অ্যাশট্রের ভিতরে গুঁড়ো করে ফেলে দিল। বলল, চ্যাটার্জি, কেবলমাত্র সেক্সুয়াল রিলেশন থাকলে মেয়ে পুরুষ কখনও সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী হতে পারে না। আমার হয়েছিল তাই। আমাদের রিলেশনটা কেবল ওটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উই নেভার বিকেম রিয়াল হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। কিন্তু তবু বলি, বউটার জন্য একটু কষ্ট কখনও সখনও হয়। মাঝরাতে হঠাৎ নেশা ছুটে জেগে উঠলে, বা যখন শাড়ির দোকানের পাশে হাঁটি বা যখন বন্ধুবান্ধবদের দেখি বউয়ের নামে বাড়ি টাড়ি করছে তখন হয়। কিন্তু সেটা কাটিয়ে ওঠা শক্ত নয়। বউ ছেড়ে চলে গেছে বলে একটা রাগ তো আছেই, সেটাকে চাগিয়ে তুলি মনের মধ্যে, চিড়বিড় করে গাল দিই অশ্রাব্য সব ভাষায়— বেশ্যা ফেশ্যা বা ওই ধরনের সব কথা। রাগটা চাগিয়ে উঠলে কষ্টটা একটু কমে। রাগের ঝাঁজটা কিন্তু ভারী ডিলিশাস। একা একা বউয়ের ওপর রাগ করে মনে মনে নানা রকম ডায়ালগ তৈরি করে দেখবেন, বেশ সময় কেটে যায়, ভাল লাগে।

সাগর হেসে ফেলল।

ভুল বললাম চ্যাটার্জি?

সাগর মাথা নেড়ে বলে, না। ভুল বলেননি।

বউয়ের ওপর রাগ করতে ভাল লাগে না?

লাগে।

ডিলিশাস।

বলে চুপ করে থাকে মজুমদার। দু'জনে কিছুক্ষণ নীরবে মদ খায়।

মজুমদার একসময়ে হঠাৎ বলে, আমাকে আপনার ঘেন্না হচ্ছে?

ঘেন্না হবে কেন?

আমার জায়গায় আপনি হলে চ্যাটার্জি, আপনি কিন্তু কিছুতেই বউয়ের বাসায় যেতেন না। যেতেন?

না। সাগর তার ভরাট গলায় নিশ্চিত স্বরে কথাটা বলে।

জানতাম, আপনার ক্রুয়েলটিটা ভারী সুন্দর। হিংসে হয়। আমি না-গিয়ে পারি না।

এ-সব ব্যাপারে একটু শক্ত হতে হয় মজুমদার। নিজেকে সহজপ্রাপ্য করে তুললে দাম থাকে না।

জানি চ্যাটার্জি, তবে নিজেকে বদলাবার সময় মানুষের একসময় পেরিয়ে যায়। আমি সোমনাথ মজুমদার আর কোনও দিনই সাগর চ্যাটার্জি হতে পারব না।

বিল মিটিয়ে দিয়ে যখন তারা উঠল তখন বিকেল পড়ন্ত। এ-সময়ে বেলা বড় তাড়াতাড়ি ফুরোয়। সাগরের ঝুমঝুমে একটু নেশা হয়েছে। মজুমদার একটু বেশি অনর্গল কথা বলছে তবে মাতলামি করছে না। সাগর ওর কথায় আর কান দিতে পারছিল না। কবিতার দুষ্প্রাপ্য পঙ্ক্তি তার মাথার ভিতরকার এক গাছকে নাড়া দিচ্ছে। টুপটাপ ফুলের মতো অসংলগ্ন কিছু শব্দ ঝরে পড়ে। কষ্ট হয় সাগরের।

এ-সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। অফিস ভেঙেছে সদ্য। সাগর একটা ওষুধের দোকান থেকে অফিসে ফোন করল। ড্রাইভার মুকুন্দ এ-সময়ে ফোন ধরে। সে-ই ধরল।

গাড়িটা নিয়ে এসো মুকুন্দ।

কোথায় আছেন আপনি?

সাগর জায়গাটা বলল।

তারপর দু'জনে কথা বলতে বলতে চতুর্দিকের উলটোপালটা জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

সাগর জিজ্ঞেস করল, কোথায় পৌঁছে দেব মজুমদার? আমার গাড়ি আসছে।

কোথায় যাব? এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব খানিক, তারপর সন্ধে হয়ে গেলে ছেলে দু'টোকে দেখতে যাব। একটু রাত হবে। বেরিয়ে এসে আর খানিকটা গিলে বাসায় ফিরব।

আমি আপনাকে কিছুক্ষণ কম্প্যানি দিতে পারি।

মজুমদার একটু চুপ করে থেকে বলে, অলরাইট চ্যাটার্জি, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কালকের পেমেন্টের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই তো?

আপনি তো দিচ্ছেন!

দিচ্ছি, ক্যাশ ডাউন। এই অর্ডারটা না-পেলে আমি টিঁকে থাকতে পারব না।

তা হলে আর সন্দেহ কী?

চ্যাটার্জি, আর কোনও পার্টি যেন না আসে।

আসবে কেন?

এর আগে সাপ্লাইয়ের অর্ডারটার সময়ে মানিকবাবু কয়েকজন উটকো লোককে ধরে এনেছিলেন টেন্ডারার হিসেবে। ওরা তা নয়, বেকার বন্ধু টন্ধু হবে। কিছু মুফত পাইয়ে দেওয়ার জন্য ওদের ভেড়ানো। ও-রকম কিছু যেন না হয় দেখবেন।

মানিকটার কোনওকালে আক্কেল নেই। ও মাঝে মাঝে দু'-চারজন বন্ধুকে টেন্ডারার বলে চালিয়ে হাশমানি আদায়ের চেষ্টা করে। সাগর ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত চোখে সামনের দিকে চেয়ে রইল একটু। লজ্জা করছিল তার। বলল, হবে না, কিন্তু পেমেন্টের ব্যাপারে যেন কোনও—

মজুমদার হাত বাড়িয়ে সাগরের হাত ধরল, তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, যে-ছোকরাটার জন্য আমার বউ ভেগেছে সেও একজন কবি, বুঝলেন চ্যাটার্জি?

সাগর চমকে বলে, কী নাম?

কিছু একটা হবে। বলে হাসল, তারপর বলল, কবিরা খুব ডেঞ্জারাস হয় চ্যাটার্জি। একটা জীবন আমি কবি-টবিদের পাত্তাই দিইনি। কিন্তু এখন কবি শুনলেই আমার ভিতরটা চমকে ওঠে।

বটে?

তাই আজকাল আমি কবিতা পড়ি।

সে কী?

মজুমদার হাসে, মাইরি পড়ি। রাশি রাশি বই কিনেছি। পড়ি, কিছু মাথায় ঢোকে না। শব্দগুলো মাথার ভিতরে খটাখট করে নড়েচড়ে, ঘুঁটির মতো। তবু পড়ি, বোঝবার চেষ্টা করি।

আশ্চর্য। খামোকা অত কষ্ট করেন কেন?

আই ওয়ান্ট টু বি এ পোয়েট চ্যাটার্জি! কবিরা খুব নিষ্ঠুর হয় চ্যাটার্জি।

নতুন একটা সবুজ ফিয়াট সামনে এসে দাঁড়াল, মুকুন্দ দরজা খুলে দেয় ভিতর থেকে।

চলুন মজুমদার। বলে সাগর। দু'জনে ওঠে।

॥ চার ॥

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে। ন'টার গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা এসে গেল। সাগর ফিরল না।

দোতলার বারান্দা থেকে কমলা পুকুরপাড়ের রাস্তায় চলন্ত লোকজন দেখে ঘরে এল।

সিন্ধু ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে মেঝেয় বসে গল্প ফেঁদেছে, গনপত এখনও ছাদে ঘুমোচ্ছে।

কমলা বলে, তোর দাদা সেই দশটার গাড়িতে আসবে হয়তো। অনেকটা জার্নি করে এসেছিস, তোদের ভাত দিই, খেয়ে শুয়ে পড়।

সিন্ধু মুখ তুলে বলে, খিদেই নেই, খাব কোন পেটে? দাদা আসুক।

কমলার বুক একটু কাঁপছিল। সাগর যদিও কখনও মাতাল হয়ে ফেরে না, তবু মাঝে মধ্যেই আজকাল একটু-আধটু খেয়ে ফেরে। একটু লালচে দেখায় তখন সাগরের মুখ, চোখ জ্বলজ্বল করে, ভলকে ভলকে অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া যায়। সিন্ধু কখনও তো দাদার এ-অবস্থা দেখেনি। যদি দেখে তা হলে কী ভাববে! কমলা তাই চায় না আজ রাতে দুই ভাইয়ে দেখা হোক।

বলল, শুধু শুধু বসে থাকবি কেন? নীচের ঘরে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'টো যা পারিস খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। দাদা তো পালাচ্ছে না।

বড্ড জ্বালাও বউদি, বলছি দাদা আসুক! কতকাল দাদার সঙ্গে দেখা নেই।

আহা, দেখা তো ভারী! তোরা দু' ভাইয়ে তো কথাই বলিস না। দাদার সামনে কেন কাঠ হয়ে থাকিস সিন্ধু, দাদা কি ভালুক?

সিন্ধু হাসল, বলল, আমাদের সম্পর্কটা ও-রকমই দাঁড়িয়ে গেছে। দাদা আমার চেয়ে কত বড় জানো? বারো বছরের। তা বলে ভেবো না যে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নেই!

তা ভাবি না রে, সবই জানি। তোদের সংসারে আমি তো নতুন বউটি নই। আমাদের বাপের বাড়িতে দাদাদের কিন্তু তোদের মতো সম্পর্ক নয়। হই-হুল্লোড় করে, ঠাট্টা-ইয়ারকি করে, ঠিক বন্ধুর মতো। তোরা দু'ভাই যেন দুই আধচেনা ভদ্রলোক, বহুদিন বাদে দেখা।

কমলা আবার বাবান্দায় আসে। নীচের রাস্তার দিকে তাকায়। ভয় করে। সিন্ধু তার দাদাকে কত গভীর ভালবাসে, সেখানে সামান্য মাত্র কোনও আঘাত কমলাও সহ্য করতে পারবে না।

আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট পর সিন্ধু হাই তুলতে লাগল। চোখ দু'টো রক্তাভ। জয়া আর সৈকত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দায় বউদির কাছে এসে সিন্ধু বলে, দাদা বড্ড ঝোলাচ্ছে তো আজকে। কাল সারাটা রাত ঠায় জেগে এসেছি। আর পারা যাচ্ছে না।

গনপতকে ডাক, খেতে দিই।

তাই দাও। কাল সকালেই দাদার সঙ্গে দেখা হবে দেখছি।

কমলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ওরা খেয়ে শুতে চলে গেল।

অবসর পেয়ে আবার অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়াল কমলা। উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে থাকে।

এগারোটার ঘণ্টি পড়ল দেওয়ালঘড়িতে। ঝি মেয়েটা খাওয়ার ঘরের মেঝেয় পড়ে ঘুমোচ্ছে। বড্ড মশা কামড়ায়। ঘুম চোখেই চটাং চটাং মশা মারছে।

একটা সাদা আলো বাঁক ফিরে রাস্তায় পড়ল। খুব উজ্জ্বল আলো। ফিয়াট গাড়িটা মোড় ঘুরে বাঁক নিতেই কমলা অনেকক্ষণ চেপে থাকা একটা শ্বাস বুক থেকে ছাড়ে। তারপর গ্রিলের গেটের তালার চাবি নিয়ে নীচে নেমে আসে।

নেশা সামান্য বেশি হলে সাগর গাড়িতে আসে।

গেট খুলে কমলা দাঁড়িয়ে থাকল। সাগর যখন গাড়ি থেকে নামল তখন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করল কমলা। না, ভয়ের কিছু নেই। স্বাভাবিকই আছে সাগর। পা টলছে না। গাড়ির জানালায় ঝুঁকে মুকুন্দকে চলে যেতে বলল। গলাটা পরিষ্কার, জড়ানো নয়।

মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু কথা বড় একটা হয় না। আজও হত না, কেবল কমলা চাপা স্বরে বলল, সিন্ধু এসেছে।

সিন্ধু!

সিঁড়ির আলোটা মাত্র ষাট পাওয়ারের। এ-অঞ্চলে বিদ্যুৎ বড় কমজোরি, তাই সেই আলোতে কারও মুখের ভাবান্তর বোঝা কষ্টকর। তবু কমলা দেখল 'সিন্ধু' উচ্চারণ করেই সাগরের মুখের রুক্ষ রেখাগুলি সহজ নম্রতায় ডুবে যায়। স্নিগ্ধ হয়ে আসে মুখশ্রী।

কোথায়?

ঘুমিয়েছে।

বাড়ির খবর কী?

ভাল।

আর কথা হল না। নিঃশব্দে তারা আবার ওপরে আসে। সাগর পোশাক ছাড়ে। বাথরুমে যায়। খেতে বসে।

সবই অফিসের কাজের মতো নিয়মমাফিক হয়ে যায়।

সারা রাত মোষের মতো ঘুমিয়েছে সিন্ধু। একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোত, কিন্তু পারল না গনপতের জন্য। ভোর ভোর উঠে গনপত আজকাল এক্সসারসাইজ করে ভুঁড়ি কমানোর জন্য। গনপতের দোষ নেই। সিন্ধুই তাকে বলে বলে ব্যায়াম ধরিয়েছে, বলেছে, গায়ের চর্বি কমা রে মেড়ো, নইলে তোর দ্বারা হার্ডশিপ হবে না। মাড়োয়ারিদের গুণগুলো কিছু পাসনি, দোষগুলো আছে পুরোমাত্রায়।

সে কেমন? জিজ্ঞেস করেছে গনপত।

এই যে তোর থলথলে ভুঁড়ি, গায়েগতরে চর্বির থাক, এ-সব হচ্ছে মাড়োয়ারির দোষ। আর মাড়োয়ারির যে ব্যবসার মাথা, কষ্টসহিষ্ণুতা, এ-সব গুণ তোর নেই, তুই একটা কিম্ভূত। পুরো মাড়োয়ারি হতে না পারিস, রোগাভোগা চালাক-চতুর বাঙালি অন্তত হ', নইলে তোকে নিয়ে করব কী?

সেই থেকে গনপতের এই ব্যায়াম। সকালে সে প্রাণপণে শরীর ভেঙে, দাঁড়িয়ে উপুড় হয়ে হাতের আঙুলের ডগায় পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করে। পিছনে হেলে আর্চ করে। আরও নানা রকম কসরত করে। কিন্তু কোনওটাই ঠিকঠাক হয় না। তবু চেষ্টা আছে।

আজও ঘুম ভেঙে সকালে সে এইসব প্রাণপাত ব্যায়াম করছিল। দমফাট হয়ে বিকট শ্বাসের শব্দ তুলে হাঁফাচ্ছে, সেই হ্যাঁদানো শুনেই সিন্ধুর ঘুম ভাঙল। গনপত আবার কোঁকানির শব্দও তুলছিল।

কীরে গনফট?

বেমক্কা কোমরটায় চোট লেগে গেল রে, মট করে গেছে!

একসারসাইজ করছিলি?

তা নয়তো কী? মেলা হার্ডশিপ করাচ্ছিস আমাকে দিয়ে।

সিন্ধু হাসল, উঠে বসে বলল, মেড়ো ভূত, এক দিনে কি দারা সিং হতে চাস? ও-সব সইয়ে সইয়ে করতে হয়। তোর সাতপুরুষে কেউ ব্যায়াম করেনি তা জানিস? তোর শরীরের ধাতই আলাদা।

দেখিস, এক দিন ফিঙে পাখির মতো রোগা হয়ে যাব।

যাস, আর হ্যাঁদাস না। এখন একটু দম নে। ওটা কী পরে আছিস?

স্পোর্টস প্যান্ট। বলে গনপত লজ্জায় একটু হাসে।

সিন্ধু মশারি তুলে গনপতের পোশাক দেখে হেসে বাঁচে না। খাটো প্যান্ট পরা, খালি গা, মোটা গনপতকে এক প্রকাণ্ড চেহারার খোকার মতো লাগছে।

কাপড় পর হারামজাদা। তোর এই পোশাকে বউ তোকে দেখেছে কোনও দিন?

রোজ দেখে তো।

তবু ডিভোর্স করেনি?

দূর শালা, ডিভোর্স করবে কী, এই শরীরের তেজই সামলাতে পারে না।

পাছায় দু'টো লাথি কষাব, শিগগির কাপড় পর। হার্ডশিপের দরকার নেই।

গনপত ছাড়া ধুতি পরে নিতে নিতে বলল, মাইরি, কোমরটায় মচাং করে গেছে।

সিন্ধু বাথরুম ঘুরে এল, বলল, চল চায়ের জোগাড় দেখি। সকালের পয়লা কাপ পেটে না গেলে দিনটা আমার শুরুই হয় না।

বাঙালির ওই দোষ। আমাদের সকাল শুরু হয় বড় রুপোর গেলাস-ভরা দুধ দিয়ে। এই পুরু সরওলা দুধ, শরীরে তক্ষুনি তাকত এসে যায়।

তোর তাকত বিস্তর দেখা আছে। বেশি বকিস না, দুধ না-খেয়েও আমি তোর দশ গুণ খাটতে পারি।

জন্ডিস তো বাঁধিয়েছিলে বাবা, চা খেয়ে খেয়ে। বেশি বোকো না।

ওরা ওপরে এসে দেখল বাচ্চারা পড়তে বসেছে বুড়ো এক মাস্টারমশাইয়ের কাছে, বউদি রান্নাঘরে খুটখাট করছে, দাদা ওঠেনি। খুব বেলা হয়নি এখনও। বড়জোর সাত, সাড়ে সাত।

খাওয়ার টেবিলের ধারে বসতে বসতে সিন্ধু বলে, দাদা কত রাত্রে ফিরেছিল বউদি?

এগারোটা হবে।

শেষ ট্রেনে?

না। গাড়িতে।

কোম্পানির?

হ্যাঁ।

কাল রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি, কিছু টের পাইনি! দাদাকে বলেছ আমরা এসেছি?

বলব না!

দাদা ওঠে কখন?

বেশি রাতে ফিরলে বেলায় ওঠে। তোরা বোস! ওকে আজ আগেই ডেকে দেব।

না না, ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। দাদা ভীষণ খাটে।

কমলা হাসল। করুণ মধুর হাসিটি। দাদা আর ভাইয়ের নীরব গভীর ভালবাসার কথা সে যে জানে তা তার হাসিতেই প্রকাশ পায়। বলল, তোর দাদা তোর কথা শুনেই কেমন হয়ে গেল। মুখে কেমন যে ভালবাসা মায়ামমতা ফুটে উঠল। তুই যেমন তার মতো দাদা দেখিস না, সেও তেমনি তোর মতো ভাই দেখে না।

সিন্ধু হাসে। বলে, তা নয়। আসলে আমরা তো মোটে দুই ভাই। তার ওপর দাদার বারো বছর পর আমার জন্ম, তাই একটু বেশি টান আর কী!

কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তবু ভাই তুই এসেছিস, এবার ওর মুখটা ক'দিন একটু হাসিখুশি দেখব। নইলে আজকাল বড্ড কাঠখোট্টা হয়ে থাকে।

কেন?

কে জানে! ব্যবসা করে করে মানুষটা কেমন হয়ে গেছে। সিন্ধুকে একটু অন্যমনস্ক দেখাল। কিছু বলল না।

গনপত হাই তুলে বলল, বউদি, আমাকে পাতলা লিকারের চা দেবেন। কড়া চা খেতে পারি না।

চা খাওয়ার দরকার কী, বরং এক গ্লাস দুধ খান। বাড়ির খাঁটি দুধ।

গনপত ভারী অবাক হয়ে গেল, অপ্রত্যাশিত দুধের কথায়। বলে, বউদি, আপনি হাত গুনতে জানেন বোধ হয়। আমি বাড়িতে দুধই খাই। চা যদি কখনও-সখনও হয় তো সে মালাই-চা।

সেটা আবার কী? কমলা জিজ্ঞেস করে।

সিন্ধু আগ বাড়িয়ে বলে, সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড বউদি, চায়ের সঙ্গে তেজপাতা সেদ্ধ করে, ঘন

দুধ আর চিনি দিয়ে দুধের সরফর মিশিয়ে এলাচ লবঙ্গ দারচিনি দিয়ে এক অখাদ্য হয়। মেড়োরা ছাড়া কেউ খেতে পারে না।

হ্যাঁ, খেতে পারে না। চা আবার একটা খাদ্য নাকি? মালাই-ফালাই না দিলে ও তিতকুটে জিনিস কেউ খায়? গনপত বলে।

কমলা বলে, সিন্ধু, তুই গনপতের পিছনে লাগিস না। অভ্যাস নেই যখন তখন ওকে চা দেব কেন? ও দুধ খাক, তুই বরং ওই চা গুচ্ছের গিলে লিভারের বারোটা বাজা।

সিন্ধু টেবিলের তলা দিয়ে গনপতকে একটা লাথি কষাল। চাপা স্বরে বলল, ব্যাটা, ঠিক ম্যানেজ করলে!

গনপত হাসে। বলে, বউদি, চা খেয়ে খেয়ে ওর চোখ হলদে হয়ে গেছে। তবু খাবে।

কমলা সিন্ধুর দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, তোমাকেও চায়ের পর গেলাসে করে দুধ দেব। চুপটি করে খেয়ে নেবে। যা চেহারা করে এসেছ!

দুধ-টুধ বহুকাল খাই না, ও কি পেটে সইবে?

দেখা যাক। কিন্তু খেতে হবেই।

* * *

সাগর খুব বেলা করল না। আটটা নাগাদ উঠে পড়ল! চায়ের টেবিলে আসতে আসতে সাড়ে আটটা। পরনে দামি ড্রেসিং গাউন, মুখে চুরুট। মুখশ্রীতে একটা খুশির ভাব।

কিন্তু সিন্ধু লক্ষ করে, দাদার চেহারাটা কেমন কর্কশ আর চোয়াড়ের মতো হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে একরকম হতাশ ভাব। সাফল্যের অভাবজনিত যে-ক্লান্তি নিম্নমধ্যবিত্ত প্রৌঢ় মানুষের চোখে দেখা যায় সেইরকম একটা ক্লান্তি। অথচ সাগর তো অসফল নয়! বরং খুবই খারাপ অবস্থা থেকে এখন সে প্রায় লক্ষপতি। যৌবন এখনও তার যাওয়ার কথা নয়, সিন্ধুর ছাব্বিশ চলছে, সাগরের তা হলে এখন বড়জোর আটত্রিশ বছর বয়স। এ-বয়সে ক্লান্তি আসবে কেন?

সিন্ধু প্রণাম করবার সময়ে পিঠে দাদার হাতখানার মৃদু সস্নেহ ভাবটি টের পেল। উঠতেই দাদা বলে, শরীর-টরীর কেমন রে? রোগা দেখছি!

ও কিছু না।

মা বাবা?

ভালই।

ক'দিন থাকবি তো?

টেন্ডারের জন্য এসেছি। আর. পি. ডব্লিউ. ডি-র রেজিস্ট্রেশনটা কত দূর কী হল, তা জানতে।

রেজিস্ট্রেশন পাসনি এখনও?

না। ওটা নইলে গভর্নমেন্টের অর্ডার পাওয়া মুশকিল।

সাগর ভ্রূ কুঁচকে একটু কী ভেবে বলে, ভটচাযকে ফোনে বলে রাখব'খন, হয়ে যাবে। একটা চিঠিতে আগে থেকে যদি লিখতিস আমাকে তবে কবে করিয়ে রাখতাম।

ওটার জন্য ফুড কর্পোরেশনের দু'টো টেন্ডার দিতে পারলাম না।

আমাকে জানাসনি কেন?

সিন্ধু চুপ করে থাকে। দাদাকে এ-সব ছোটখাটো ব্যাপারে সে জড়াতে চায় না। ব্যবসাদার দাদাকে সে মনে মনে পছন্দ করে না তেমন, কবি দাদাই এখনও তার মন জুড়ে আছে, তাই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সে দাদাকে এড়িয়ে চলে বরাবর।

সাগর গনপতকে চিনতে পারল, বলল, ঘনশ্যামজির ছেলে না তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গনপত উঠে প্রণাম করে।

গণপতি! বাঃ, বেশ বড় হয়ে গেছ। কী করো এখন?

সিন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করছি।

সাগর হাসল। বলল, সবাই ব্যবসাদার এখন!

অন্তত ত্রিশ টাকা কিলো দরের চায়ের সুঘ্রাণে ঘর ম-ম করে ওঠে। বউদি তৃতীয়বার চা করল। গোলাপের মতো সুগন্ধী এমন চা সিন্ধু কখনও খায়নি। দাদার বাড়িতে যে এস্টাব্লিশমেন্ট খরচা বহুগুণ বেড়ে গেছে তা টের পাচ্ছিল সিন্ধু। চতুর্দিকে একটা অপব্যয় এবং বেপরোয়া খরচের চিহ্ন ছড়ানো। সে নিজে অপব্যয় অপছন্দ করে। হার্ডশিপ আর বীজমন্ত্র; সে তাই চতুর্দিকে এত আসবাব, ঘরের মধ্যে বাগান, দামি  দামি আলো, দাদার ড্রেসিং গাউন কিংবা খুব দামি চায়ের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না এবং বুঝতে পারছিল না যে এত সচ্ছলতার মধ্যে থেকেও তার দাদা অত ক্লান্ত কেন!

এলাহি ব্রেকফাস্টের আয়োজন করল বউদি। পুরু মাখন মাখানো টোস্ট, সঙ্গে দু'টো করে ডিম সেদ্ধ, কাটা আপেল, ভাল কেক, প্রোটিনেক্স মেশানো দুধ এক গ্লাস। সাগর দিনে বাড়িতে ভাত খায় না, বাইরে স্কুলের পর লাঞ্চ করে কোনও হোটেলে। ব্রেকফাস্টটা তাই একটু ভারী খায়। কিন্তু সিন্ধু অত খেতে পারছিল না। বউদি তাড়া দিয়ে খাওয়াল— না খেলে বেরোতে দেব না, সারা দিন টো টো করে সেই কোন দুপুর হয়ে যাবে ফিরে ভাত খেতে।

স্টেশন প্রায় এক মাইল। সোয়া ন'টায় দাদার মাসিক বন্দোবস্তের রিকশা এসে গেল। সিন্ধু দাদার সঙ্গে এক রিকশায় যেতে একটু সংকোচ বোধ করে, তার ওপর গনপত রয়েছে— একটা রিকশায় হবেও না। সাগর আর-একটা রিকশা ডাকতে ঝি-মেয়েটাকে পাঠাচ্ছিল। সিন্ধু বারণ করে বলল, দু'জন হাঁটতে হাঁটতে এটুকু রাস্তা চলে যাব, নতুন জায়গাটা দেখাও হয়ে যাবে। তা ছাড়া, বেরোবও একটু পরে। রাইটার্সের কাজ তো এগারোটার আগে শুরু হয় না।

সাবধানে যাস। কলকাতা আজকাল যা হয়ে উঠেছে। এই বলে সাগর বেরিয়ে যায়।

বেরুবে বেরুবে করেও দেরি করতে থাকে সিন্ধু। খবরের কাগজটা উলটেপালটে দেখে, আর-এক বার চায়ের অর্ডার দেয়। জয়া আর সৈকত এসে বাঙালি আর মাড়োয়ারি কাকুর সঙ্গে একটু হুড়োহুড়ি করে। তারপর স্কুলের বেলা বুঝে স্নান করে খেতে চলে যায়।

বউদি সেই সুগন্ধী চা নিয়ে এসে খাওয়ার টেবিলে রেখে বলে, বেলা যখন করলিই তখন একেবারে স্নান করে খেয়ে যা। রান্না ততক্ষণে হয়ে যাবে।

সিন্ধু বলে, দূর! ফিরে এসেই খাব।

অবেলা হয়ে যাবে। খেয়ে হজম করতে পারবি না। রাতে আবার তোর দাদা কী সব খাবার আনবে, আমাকে রান্না করতে বারণ করে গেছে, সে-সব গুচ্ছের দামি খাবার কে খাবে?

সিন্ধু অবাক হয়ে বলে, কী খাবার আনবে?

বউদি একটু হাসে, বলে, চিনে রেস্টুরেন্টের কী সব যেন আনবে বলেছিল। সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন, ফ্রায়েড রাইস, রোল, রোস্ট আর নকুড়ের মিষ্টি-টিষ্টি। হট-বক্সে ভরে গাড়িতে করে আনে মাঝে মাঝে। আজ তোদের অনারে আমার এক বেলার খাটুনি বেঁচে গেল, মুখটাও বদল হবে।

সিন্ধু মনে মনে একটু হিসেব করল। বলল, সে বেশ অনেক টাকার ব্যাপার বউদি। না?

টাকাকে টাকা মনে করে নাকি তোর দাদা? আজ তোদের জন্য আনছে তাতে কিছু বলার নেই। কিন্তু এ-রকম প্রায়ই করে তোর দাদা, বেশির ভাগ দিন দু'বেলার এক বেলাও বাড়িতে খায় না।

বলতে বলতে কি বউদির চোখ একটু ছলছলে হয়ে এল? গনপত গেছে জয়া আর সৈকতের সঙ্গে পুকুরে হুড়োহুড়ি করতে। বউদি তাই চোখের রাশ টানল না। জলটা একটু পরেই গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল।

সিন্ধু একটু অবাক হল। কিন্তু মনের কোন গুপ্ত গভীরে সে প্রত্যাশা করছিল, দাদা ঠিক আর স্বাভাবিক নেই। বউদির সঙ্গে দাদার সম্পর্কটা যেন বা এক গোলমেলে হয়ে গেছে।

স্বভাব-চাপা সিন্ধু চুপ করে থাকল একটু। তারপর আস্তে করে বলল, কেঁদো না, বরং যদি কোনও গোলমাল হয়ে থাকে তবে খুলে বলো।

কমলা আঁচলে চোখটা মুছে কান্নাটা সামলে নিয়ে বলে, বাঙালি মেয়েদের কথায় কথায় চোখে জল আসে!

বুঝলাম। কিন্তু ট্রাবলটা কী?

ট্রাবল আবার কী! কিছু না।

ভাঁড়িয়ো না বউদি। বলো।

কমলা অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, সিন্ধু, তোর দাদার ধারণা আমিই তার সর্বনাশ করেছি।

কী রকম?

সে আর কবিতা লিখতে পারছে না। তার বিশ্বাস, আমার জন্যেই পারছে না।

সিন্ধু অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

একসময়ে যখন কেবলমাত্র ইস্কুলমাস্টারি করত, যখন আমাদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোত না, তখন সেইসব অভাবের দিনে তোর দাদা বুকে বালিশ চেপে কবিতার পর কবিতা লিখে যেত স্বচ্ছন্দে। খুব নামডাক তখন তার। বড় বড় সব কাগজে তখন সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জির কত সুখ্যাতি বেরোত, সে-সব দিনেই ও ছিল ভাল।

সিন্ধু কি এটাই প্রত্যাশা করেনি? উগ্র আগ্রহে সে জিজ্ঞেস করল, তারপর?

তারপর এক দিন তো কবিতা ছেড়ে তোর দাদাকে ব্যবসায় নামতে আমিই বাধ্য করলাম বলে কয়ে। টাকা ছাড়া যে কিছুতেই এই সমাজে মানুষের মতো বাঁচা যায় না তা তোর দাদাও বুঝেছিল। নইলে নামকরা একজন তরুণ কবি, যার প্রশংসায় মস্ত মস্ত লোকেরা পঞ্চমুখ, যাকে সাহিত্যসভায় লোকে চেয়ার ছেড়ে উঠে সম্মান দেখায়, তাকে কেন একটা অশিক্ষিত ইতর বাড়িওলা যা নয় তাই বলে অপমান করার সাহস পায়? সেই থেকে তোর দাদা লাগল কবিতা ছেড়ে টাকার পেছনে। টাকা এল বটে কিন্তু কবিতা সেই যে ছেড়ে গেল আর ধরতে পারল না।

কেন বউদি?

তার আমি কী জানি! শুধু তোর দাদাকে দেখে দেখে একটা জিনিস বুঝতে শিখেছি যে, কবিতা লেখা যতটা সহজ বলে লোকে ভাবে তত সহজ ওটা নয়। কবিতার রহস্য বোঝে একমাত্র কবিরাই। তোর দাদা যে কবিতা লিখতে পারছে না তার কারণ কি ওর শব্দ জানা নেই, না ছন্দ মেলাতে পারে না, না কি কবিতার টেকনিক ভুলে গেছে! ও-সব কিছুই নয়। যে-মনটা কবিতা লেখে ওর সেই মনটা হয়ে গেছে ব্যবসাদার। ওর এই পরিবর্তন আমিই ঘটিয়েছি বলে ওর বিশ্বাস। মিথ্যেও নয়, আমি-ই অনেকটা দায়ী। সেই জন্যই ওর কাছে আমি আজকাল বিষ। দু'হাতে এত যে টাকা ওড়ায়, গাছগাছালি, আলো, ফার্নিচারে ঘর যে ভরতি দেখছিস এ-সবের কারণ হল কবিতা। কবিতার মেজাজ আনবার জন্য কত কী করে। এমনকী কিছু দিন পরে নাকি বাড়ি ছেড়ে কুটিরে বাস করবে। আবার বলে দশতলার ওপর একটা ফ্ল্যাট কিনবে যেখানে বসে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কীভাবে কবিতা ওর মনে আসবে তা তো আমি জানি না। কিন্তু এই নিয়েই আমার সঙ্গে যত অশান্তি। আমার মরতে ইচ্ছে করে রে সিন্ধু।

সিন্ধু বেপরোয়াভাবে হেসে টেবিলে চাপড়ে বলল, দূর! এটা কোনও গোলমালই নয়। তুমি একেবারে আনস্মার্ট। দাঁড়াও সব ঠিক করে দিয়ে যাব।

এই বলে সিন্ধু উঠে বলল, ঠিকই বলেছ, বেলা যখন হয়ে গেল তখন ভাতটা খেয়েই বেরোই। কিন্তু সকালে যা খাইয়েছ...

যা পারিস দু'মুঠো খেয়েই যা।

খেতে বসে সিন্ধুকে গনপত বলল, দ্যাখ সিন্ধু, আমি কিন্তু ব্যবসাদার নই তোর মতো। আমাকে বেশি ব্যবসাতে টানবি না, আমি কলকাতায় এসেছি নাটক দেখতে। নট্ট কোম্পানির 'নটী বিনোদিনী', থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'চাকভাঙা মধু', নান্দীকারের 'তিন পয়সার পালা', থিয়েটার গিল্ডের 'যদুবংশ', এ ক'টা দেখে যাবই। পারি তো আরও কয়েকটা। বাগড়া দিবি না। তারপর বউদির দিকে ফিরে বলল, বউদি, আপনি যাবেন নাটক দেখতে?

সিন্ধু যদি যায় তো যেতে পারি। সবাই একসঙ্গে যাব। কতকাল থিয়েটার-সিনেমা দেখি না।

সিন্ধুটা মাড়োয়ারি হয়ে গেছে বউদি। আর্ট-ফার্ট বোঝে না, ব্যবসা একটু-আধটু বোঝে। আমি হয়ে গেছি বাঙালি, ব্যবসা মাথায় ঢোকে না, আর্টটা একটু একটু বুঝি।

বউদি খুব হাসে।

বহুকাল বুঝি এমন হাসেনি।

সিন্ধু বেরোল অনেক বেলায়, দুপুরের খাওয়াটা বড্ড ভারী হয়ে গিয়েছিল, কমলাও ঠুসে ঠুসে খাইয়েছে, খেয়ে উঠে গড়াতে গিয়ে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, দু'টো নাগাদ ঘুম ভাঙতেই সিন্ধু তড়বড়িয়ে ওপরে উঠে এল, 'বউদি, বউদি' বলে চেঁচাতেই কমলা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বলল, ডাকিনি বলে বকবি তো?

বকবই তো! কত কাজ ছিল, এখন যেতে যেতে সব জায়গার অফিস আওয়ার্স পার হয়ে যাবে।

কমলা বলল, ইচ্ছে করেই ডাকিনি, কী চেহারাটা করেছিস! একটু বিশ্রাম নিলে সারবে ভেবে আর ডাকিনি।

খুব ভাল করেছ, সিন্ধু রাগ করে বলে, আর গনফটটাকেও আমি পার্টনারশিপ থেকে ভাগাচ্ছি। হারামজাদা খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কিছু জানে না দুনিয়ার।

মোটা মানুষ, ও অত খাটতে পারে নাকি তোর মতো! তা ছাড়া ওর তো ভাতকাপড়ের তাড়া নেই!

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই বলেছ। শালার বাপ-ভাই দেখতে পারে না বটে কিন্তু গাড্ডায় পড়লে খরচাপাতি চালিয়ে নেবে, ব্যাটা এখনও দু'-পাঁচশো টাকা যখন তখন বের করতে পারে। ওর সুটকেস খুঁজলে কম করেও হাজার দুই-তিন টাকা পাবে। ব্যাটা টাকা ওড়াতেই কলকাতায় এসেছে।

তুই ওর পিছনে অত লাগিস কেন?

লাগব না? দেখ গে, এখনও কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! তিন-চার জোর ঝাঁকি মেরেছি, গোটা দুই লাথি, সব হজম করে ন্যাদসটা তাকিয়া হয়ে পড়ে আছে।

কমলা এলো চুল পিঠের দিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, চা করি? একেবারে চা খেয়ে একটু ঘুরে আয়। কাল থেকে কাজ করিস।

না, না, আজ এক বার বেরোতেই হবে। ছুটি কাটাতে তো আসা নয়, তিন দিন মোট থাকব বলে এসেছি। শিলিগুড়িতেও দু'-তিনটে কাজ পড়ে আছে। নষ্ট করার মতো সময় নেই।

তোরা সবাই এত কাজের হলে আমি কোথায় যাই বল তো! তোর দাদার মুখে কাজ আর কাজ শুনে কাজের ওপর অরুচি ধরে গেল। সিন্ধু, যদি কখনও খুব কাজের মানুষ হয়ে উঠিস তা হলে বিয়ে করিস না। বিয়ে করে পরের মেয়েকে একঘরের মতো করে রাখার মানে হয় না।

বিয়ে! সিন্ধু হেসে বলে, কী ভাবো তুমি বলো তো বউদি! এ জন্মে বিয়ে-টিয়ে আর হল না। আমার জন্য বউয়ের কোনও প্রভিশনই নেই, অ্যালটমেন্ট হয়নি।

কমলা হাসল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকল চা করতে।

সেই ফাঁকে সিন্ধু একটু এঘর-ওঘর করে। দাদার লেখার ঘরে ঢুকে সে খুব নিবিষ্টভাবে চারধার দেখে। দেখে অসম্ভব অবাক হয়। দাদা যে কত টাকা আয় করে তার কোনও হিসেব করতে পারে না সে। চারটে দেয়াল চার রঙে এনামেল করা। কী বিপুল দামের একটা খাট! খাটের এক ধারে অ্যাকুয়ারিয়াম ফিট করা, তাতে শ্যাওলা রয়েছে, স্পঞ্জ রয়েছে, একটা পাথরের ব্যাঙ বসে আছে এক ধারে, এক-একবার তার মুখটা হাঁ হচ্ছে আর একটা করে বাতাসের গোলা মুখ থেকে বেরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। কাচের ভিতরে নানা রঙের আলোয় দামি মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্য ধারে দাদার লেখার টেবিল। টেবিল বটে, তবে তা সাধারণ টেবিল নয়। সম্ভবত মহার্ঘ্য। বার্মা সেগুন দিয়ে তৈরি। আয়নার মতো ঝকমকে অর্ধচন্দ্রাকার বিশাল সেক্রেটারিয়েট, তার ওপর টেবিল-বাতি, ছাইদানি, কাগজের প্যাড, কলম, সিগারেট সবকিছুই যেন বিদেশের গন্ধমাখা। কী বিশাল অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের তৈরি টেবিল-বাতি, পার্কার পঁচাত্তর, লাইফ-টাইম শেফার, মন্ট ব্লাঁ, চোদ্দো ক্যারেট সোনার পাইলট, পেলিক্যান,এইসব দামি কলম একটা হাতির দাঁতের কৌটায় খাড়া করে রাখা আছে। দাদার লেখার টেবিলের চেয়ারটা রিভলভিং। সিন্ধু বসে দেখল কোনও শব্দ হয় না। কাত হয়ে, চিত হয়ে, ঝুল খেয়ে দেখল, চেয়ারটা সব দিকে অনায়াসে হেলে যায়। টেবিলের ডান দিকে সবচেয়ে তলার ড্রয়ারটা আধ ইঞ্চি খোলা ছিল, সিন্ধু সেটা টেনে আর-একটু খুলল কৌতূহলবশে, এবং ব্ল্যাক নাইটের বোতলটা দেখতে পেল। বুকটা ধক করে ওঠে তার। বোতলটা তুলে এনে দেখে, তলানি দু' ইঞ্চি পরিমাণ হুইস্কি

এখনও আছে। মদ খাওয়া খুব খারাপ বলে কোনও সংস্কার নেই সিন্ধুর। তবু দাদা এ-সব আগে খেত না, এটুকু সে জানে। খুব আদর্শবাদী, একটু গোঁড়া আর দৃঢ়চেতা লোক ছিল দাদা।

বোতলটা সাবধানে যথাস্থানে রেখে সিন্ধু আবার চার ধারে চেয়ে দেখে। দেয়ালে অনেকগুলো তেলরঙের ছবি, কয়েকটা জলরঙে আঁকা। উঠে ঘুরে ঘুরে সে ছবিগুলো দেখল। ছবির ফ্রেমে দাদা আবার ছোট্ট কার্ড এঁটে রেখেছে, তাতে আর্টিস্টদের নাম। যামিনী রায়, হোসেন, গণেশ পাইন, গুজরাল, সুনীল দাস এ-রকম প্রায় আট-দশটা ভারতের বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা আধুনিক ছবি। ছবির দাম সম্পর্কে যেটুকু ধারণা আছে সিন্ধুর তাতে সে আন্দাজ করল, ছবিগুলোর মোট দাম বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা হবে। বেশিও হতে পারে। ছবির ফাঁকে ফাঁকে বিশাল সব বুককেস ভরতি বই। নতুন বা চকচকে বই সব, এখনও অনেক বই ভাল করে বোধ হয় খোলাও হয়নি। মেঝের খাট থেকে দরজা অবধি এক টুকরো আসল পশমের কার্পেট পাতা। টমেটো রঙের কার্পেটটার গায়ে বিলিতি কুকুরের মতো লম্বা নরম লোম। খুব কম করেও ওই এক টুকরো কার্পেটের দাম হাজার দুয়েক হবে।

কেন? এ-সব কেন? এত ঐশ্বর্য দাদার কবে থেকে হল? এ-সব প্রশ্নের কোনও জবাব সিন্ধু জানে না। শুধু এইটুকু জানে, এত টাকা এত অল্প সময়ে কখনওই খুব সাদামাটা উপায়ে হয় না। সিন্ধু নিজেও চাকরি না পেয়ে ব্যবসা করছে। সে জানে, ব্যবসা করতে গেলে একদম সৎ থাকা যায় না। অন্তত এদেশে সৎ ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সে নিজেও কত সময়ে কত অসৎ উপায় নিয়েছে, কিন্তু দাদার এই বড়লোক হওয়ার ব্যাপারটায় কোথায় যেন একটা সৃষ্টিছাড়া কিছু আছে।

সিন্ধু দাদার টেবিলের টানাগুলো খুলে খুলে দেখল একটু, প্রায় সব ক'টাই চাবি দেওয়া। মোট তিনটে ড্রয়ার খোলা গেল। ফের কয়েক বোতল বিদেশি মদ দেখতে পেল। অন্যটায় দাদার পুরনো সব কবিতার ফাইল কপি, কবিতা মুসাবিদা করা খুচরো কাগজের ডাঁই, আর সেই সঙ্গে প্রায় আট-দশ প্যাকেট কেনট রথম্যান, ডানহিল, প্লেয়ার্স থ্রি, বেনসন অ্যান্ড হেজেস, আবদাল্লা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, এইসব সিগারেটের প্যাকেট দেখতে পেল, এক প্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভ খোলা ছিল। তা থেকে একটা ধরিয়ে সিন্ধু আপনমনেই নিজেকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা সিন্ধু, দাদাকে কি তোমার হিংসে হয়?

অনেক ভেবে সে নিজেই উত্তর দিল, না তো, হচ্ছে না।

তা হলে কী হচ্ছে বলো তো। দাদার এই অসম্ভব বড়লোকি দেখে কিছু প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নাকি মনে?

হচ্ছে।

কী সেটা?

দাদার জন্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

বউদি ডাকল, সিন্ধু, কোথায় গেলি? গণপতিকে নিয়ে আয়।

সিন্ধু উঠে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। বউদি ডাইনিং হল থেকে তার দিকে চেয়ে ছিল। একটু যেন কেমন বউদির তাকানো। মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলল, দাদার ঘর দেখছিলি?

হ্যাঁ।

বউদি একটা চাপা স্বরে বলল, ও-ঘর কিন্তু আমার নয়। আমি ওটায় থাকি না।

তুমি কোথায় থাকো?

পাশের ঘরে, ছেলেমেয়ের সঙ্গে। আমরা দু'ভাগ হয়ে গেছি।

কবে থেকে?

চা খা সিন্ধু, গণপতিকে ডাক।

## ॥ পাঁচ ॥

আজও স্কুলে গিয়েছিল সাগর। ক্লাস-ট্লাস নিল না, হাজিরা খাতায় সই করে সোজা হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে গিয়ে বলল, একটু কাজ আছে, যাচ্ছি।

হেডমাস্টার মশাই খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওজন্য বলার কী?

বলে হেডমাস্টার মশাই একটু চোখের ইশারা করলেন। সাগর ইশারাটা ধরে একটা চেয়ার টেনে বসল। মর্নিং-এর গার্লস সেকশনের হেডমিস্ট্রেস এখনও যাননি, মস্ত একটা খাতা খুলে কী যেন দেখছিলেন। এক বার চোখ তুলে সাগরকে দেখলেন, একটু হাসলেনও, উনি উঠে না-গেলে ঘরটা ফাঁকা হয় না। আর ফাঁকা না-পেলে হেডমাস্টার মশাই সাগরের সঙ্গে গোপন কথাটাও বলতে পারেন না। সাগর অবস্থাটা একটু ভেবে দেখল। মজুমদারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বারোটায়। ঘড়িতে এখন এগারোটা পাঁচ। ট্যাক্সিতে গেলে মিনিট দশেক সময় লাগবে কর্পোরেশন বিল্ডিঙে পৌঁছতে। একটু সময় হাতে করেই যাওয়ার ইচ্ছে সাগরের। মজুমদার কাল স্কচ খাইয়েছে। অনেক খোলামেলা ব্যক্তিগত কথা বলেছে, বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করেছে, তবু সাগর জানে যে মজুমদার লোক ভাল নয়। প্যাক্টের টাকা শেষ পর্যন্ত পুরো দিতে চাইবে না। মানিকটাও হাঁদারাম, হয়তো বিশ্বাস করে টেন্ডারটা আনবেই না। নগদ দশ হাজার টাকা মুফতে পাওয়ার লোভে নয়, সাগরের কোথাও হেরে যেতে ইচ্ছে করে না। তার হারের জীবন শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল জয় আর জয়।

হেডমিস্ট্রেস নন্দিতা দাশগুপ্তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বিয়ে-থা করেননি। সাগর শুনেছে, ভাইদের সংসারে থাকেন। দেখতে খারাপ ছিলেন না, কিন্তু এখন মুখশ্রীতে কেমন এক কুটিলতা এবং ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। খাতাখানা রেখে সাগরের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো শুনি বড় কন্ট্রাক্টর। আমার একটা ভাইপোকে চাকরি দেবেন? খুব ভাল স্বভাবের ছেলে।

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল, এ-সব সময়ে ফ্যাক করে হেসে ফেলতে নেই। ভ্রূটা একটু তুলে বলল,কোয়ালিফিকেশন কী?

বি এ পাস।

সাগর এবার খুব ক্ষীণ একটু হেসে বলে, বি. এ. পাস ছেলেতে দেশ ভরে আছে। কোনও টেকনিক্যাল কোলিফিকেশন নেই?

না তো। ওর বরাবরই আর্টসে মাথা, ইংরিজিতে বেশ ভাল। দশটা নম্বরের জন্য ডিস্টিংশন পায়নি।

সাগর তেমনি ভ্রূ তুলে বলল, অনার্স নেয়নি কেন?

ইংরিজিতে নিয়েছিল। পরীক্ষার আগে ছেড়ে দিল— ওর চোখটা খারাপ, তাই আমিই ছাড়িয়েছি অনার্স। খুব পড়তে হয় তো— একটু দেখবেন তো ভাই। ওই ছেলেটার একটা গতি হলে স্বস্তি পাই। ওর আবার মা নেই, আমিই পালছি পুষছি।

সাগর মাথা নেড়ে বলল, দেখব।

এক দিন আপনার অফিসে পাঠিয়ে দেব?

দেবেন।

হেডমিস্ট্রেস উঠে যান।

হেডমাস্টার মশাই সাগরের দিকে একটু ঝুঁকে বলেন, লাস্ট মিটিঙে ম্যানেজিং কমিটিতে আপনার বিষয়ে কথা উঠেছিল।

সাগর অবাক হয়ে বলে, কী কথা?

উনি ঈষৎ ম্লান হেসে বলেন, এই আপনার ক্ষেত্রে ক্লাস অ্যালটমেন্ট কম কেন, গত বছর কেন আপনার প্রায় তিরিশ দিন উইদাউট পে হল, পরীক্ষার খাতা আপনি কেন দেখেন না, এইসব।

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল। এটা সে আশা করেনি। সে জানে, এই স্কুল তার কাছে নানাভাবে ঋণী।

আপনি কী বললেন? সাগর জিজ্ঞেস করে।

হেডমাস্টার মশাই বিনয়ের সঙ্গে বলেন, আমি যথাসাধ্য ডিফেন্ড করেছি। কিন্তু টিচার্স রিপ্রেজেনটেটিভরাই তো আপনার বিরুদ্ধে। এজেন্ডাতে আপনার প্রসঙ্গ ছিল না। স্কুলের নানা প্রবলেমের

কথায় ওঁরা আপনার কথা তুললেন। বিশেষ করে হিমাদ্রিবাবু খুব ড্যামেজিং কথাবার্তা বলছিলেন।

ও। বলে সাগর একটু ভাবে। হিমাদ্রি ঘোষই শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র লোক যে কখনও সাগরের কাছ থেকে টাকা ধার চায়নি। অল্পবয়সি হিমাদ্রি ঘোষ একটু ঠোঁটকাটাও বটে, একজন মস্ত ট্রেড ইউনিয়নিস্টের ছেলে। বাড়ির অবস্থা ভাল। ছাত্রমহলে বেশ জনপ্রিয়। অবশ্য সাগরের তাতে কিছু যায় আসে না। হিমাদ্রিকে গ্রাহ্য করার তেমন কোনও কারণ নেই। তবু বছরের প্রথমে যখন রুটিন টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন ওই হিমাদ্রিই সবচেয়ে বেশি চেঁচামেচি করেছিল বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাসের সংখ্যার সঙ্গে সাগরের চূড়ান্ত অসাম্য দেখে। কিন্তু হিমাদ্রি ছাড়া আর কেউ চেঁচামেচি করেনি। কারণ সবাই সাগরের অধমর্ণ। আর এ-কথাও সবাই জানে যে, সাগরের ধার শোধ না দিলেও কোনও ক্ষতি নেই, সাগর ধার দিয়ে ভুলে যায়।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, অবশ্য ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায়নি। কমিটির প্রেসিডেন্ট নিজেই বললেন, আমরা সাগরবাবুর কাছে নানাভাবে ইনডেটেড। আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ডেফিসিট এখনও পঞ্চান্ন হাজার টাকা, ইলেকট্রিক বিল প্রায় দু হাজার বাকি পড়েছে, স্কুল এখনও রানিং থ্রু ক্রাইসিস। এ-রকম অবস্থায় সাগরবাবু আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। সুতরাং তাঁর কেসটা আমরা কনসিডার করব।

সাগর চুপ করে রইল। বুকটা জ্বালা করে। কোথায় যেন একটা হার হয়ে যাচ্ছে।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, অবশ্য এতে কমিটির সবাই খুব খুশি হয়নি। গার্জিয়ানরা জয়েন্ট পিটিশন করবে আপনার বিরুদ্ধে এমন কথাও হিমাদ্রিবাবু বলছিলেন। অলোকবাবুও সাপোর্ট করছিলেন।

অলোক হল আর-একজন শিক্ষক প্রতিনিধি। ছেলেটার ব্যক্তিত্ব নেই, বড্ড বেশি কথা বলে, এবং অধিকাংশই মিথ্যে কথা। অলোক ঘোষাল অবশ্য সাগরের কাছ থেকে ধার নেয়, সিগারেট চেয়ে খায়। তবু ওকে বিশ্বাস করা যায় না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাগর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি না হয় রিজাইন করব।

হেডমাস্টার মশাই একটু চমকে উঠে বলেন, কী বলছেন? আপনার রিজাইন করবার কথাই তো ওঠে না। হিমাদ্রি বা অলোককে কেউ সাপোর্ট করছি না আমরা। সব টিচারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সবাই আপনার পক্ষে। শুধু পরিস্থিতিটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।

মনে মনে সাগর যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিল। স্কুলের চাকরিটা নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। উপরন্তু একটা জরুরি কাজে যাওয়ার সময়ে এইসব গোলমালের কথা মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বিরক্তিটা বজায় রেখেই সে একটু রুক্ষ গলায় বলল, আমি স্কুলকে যথেষ্ট কাজ দিই না এ তো সবাই জানে। আমার চাকরি ছেড়ে দেওয়া অনেক আগেই উচিত ছিল। আমি কালই রেজিগনেশন লেটার দেব।

হেডমাস্টার মশাই একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। বলেন, আপনি বসুন। আমি ব্যাপারটা আপনাকে আর-একটু খুলে বলি। আপনার রাগ করার মতো কথা নয়। হিমাদ্রির অ্যাটিচুড আমরা কেউ সাপোর্ট করছি না।

সাগর তার ওমেগা হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, আজ তো সময় নেই। কাল-পরশু বরং ব্যাপারটা শুনে নেব। হিমাদ্রির সঙ্গেও একটু কথা বলা দরকার। আমি শুনেছিলাম এর মধ্যে ছাত্রেরা কবে যেন একটা জয়েন্ট পিটিশন করেছিল আপনার কাছে। তাতে আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল।

হেডমাস্টার মশাই একটু অপ্রতিভ হেসে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে সেই দরখাস্ত তো চেপে দেওয়া হয়েছে, আপনার বিব্রত হওয়ার কারণ নেই। আমি সিগনেটারিদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। এক-একজন করে ইন্টারভিউ নিই। ওরা তাতে খুব ভয় পেয়ে প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে যে ওরা নিজের থেকে দরখাস্ত করেনি। হিমাদ্রি আর অলোকই ওদের দরখাস্ত করতে ইনস্টিগেট করে। আপনার বিরুদ্ধে ছাত্রদের কারওই কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই।

সাগর গম্ভীর-মুখে বলে, দরখাস্তটা চেপে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করেননি। আমাকে তখনই যদি জানাতেন তা হলে আমি নিজের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক হতে পারতাম।

হেডমাস্টার মশাই মাথা নেড়ে বললেন, এ-সব নেগলিজিবল্ ব্যাপার নিয়ে খামোকা আপনি ভাবছেন। আমার প্রায় ত্রিশ বছরের সার্ভিস লাইফে এর চেয়ে কত বেশি সিরিয়াস ঘটনা ঘটেছে। আমি বরং হিমাদ্রি আর অলোকের সঙ্গে আজই এক বার কথা বলব।

সাগর উদাস গলায় বলল, বলবেন, দেখা হলে আমিও বলব। তবে কারও বিরাগভাজন হয়ে থাকাব ইচ্ছে আমার নেই।

হেডমাস্টার মশাই খুব আন্তরিকভাবে বলেন,আরে না, না। আপনি ও-সব নিয়ে ভাববেন না। প্রেসিডেন্ট আপনার পক্ষে, আর আমিই তো সেক্রেটারি। আপনার কোনও চিন্তা নেই। আমরা তো জানি, আপনার স্কুলের চাকরির কোনও দরকারই পড়ে না। বরং স্কুলের প্রতি মমতাবশেই আপনি আছেন এখনও। আপনার ওপর স্কুল অনেকটা ডিপেন্ড করছে।

সাগর একটা অনিশ্চিত 'আচ্ছা' বলে চিন্তিতভাবে বেরিয়ে এল। সে হিমাদ্রি বা চাকরিটার কথা ভাবছিল না, এমনকী সে মজুমদারের কথাও ক্ষণেক ভুলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে ফুটপাথে নামতেই আজও সে হিলিয়াম বেলুনটিকে দেখতে পেল। থমধরা বাতাসে বেলুনটা বেশ সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিকে চেয়ে আবার তার দীর্ঘ খোয়াই...মনে পড়ে।

ফুটপাথে নেমে দাঁড়াতেই বেয়ারা ভানু তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে বলে, ট্যাক্সি তো। আপনি বসুন গিয়ে ঘরে, আমি ডেকে আনছি।

সাগর তার ঘড়ি দেখে বলে, একটু তাড়াতাড়ি আনিস। সময় কম।

ভানু জোর কদমে বড় রাস্তার দিকে গেল। সাগর এদের প্রায় কিনে ফেলেছে। অজস্র বকশিস পেয়ে এরা এখন সাগরেরই কথা শোনে, অন্য মাস্টারমশাইদের তেমন মানতে চায় না।

সাগর টিচার্স রুমে এসে বসল। ঘরটা ফাঁকাই প্রায়। সবাই ক্লাসে গেছে। শুধু বুড়ো সুবোধবাবু আপনমনে খৈনি বানাচ্ছেন। গত বছরও সিগারেট খেতেন, এ-বছর বাজেটে সিগারেটের দাম বাড়ায় খৈনি খাচ্ছেন আজকাল। সাগর বসে বাংলা খবরের কাগজটা তুলে নিল। খবরের কাগজ দেখার সময় তার বড় একটা হয় না, ইচ্ছেও করে না, তবু নিল, কাগজের দিকে চেয়ে থেকেই তার মনে হল, আজ টিচার্স রুমটা বড় বেশি ফাঁকা। এত ফাঁকা হওয়ার কথা নয়। সবাই ক্লাসে গেলেও বাড়তি অন্তত পাঁচজনের থাকার কথা, বোধ হয় আজ অনেকেই অ্যাবসেন্ট।

সাগর যখন কবি ছিল, যখন তার ব্যবসা এত বড় হয়নি, তখন এই স্কুলে তাকে প্রচুর প্রভিশনাল ক্লাস করতে হয়েছে। রুটিনেও তার সপ্তাহে বত্রিশ-তেত্রিশটা করে ক্লাস থাকত। দিনে সাত পিরিয়ডে সাতটা ক্লাস করে গলা ভার হয়ে উঠত, শরীর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ত, আজ চারজন অ্যাবসেন্ট, তবু সাগর আজ একটাও ক্লাস না নিয়ে চলে যেতে পারে কত অনায়াসে। আগের দিনে পারত না। এখন তার বদলে অন্যেরা প্রভিশনাল ক্লাস করে মরে।

খবরের কাগজের দানা অক্ষরগুলির দিকে চেয়ে ছিল সাগর, কিছু দেখছে না। ভাবছে। স্কুলটা তার এখন নৈতিক দিক থেকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। খামোখা সে একটা চাকরি আটকে বসে আছে। বোধ হয় এই কারণেই হিমাদ্রি বা অলোক তাকে ভাল চোখে দেখে না। সে অবশ্য কলিগদের কারও প্রতিই তেমন মনোযোগ দেয় না আজকাল। কোনও দিনই দেয়নি। যখন কবিতা লিখত তখন নিজেকে এদের চেয়ে অনেক বেশি স্পর্শকাতর আর বুদ্ধিধর বলে জানত, আজকাল সে ভাবে, এরা খুবই তুচ্ছ, অস্তিত্বের লড়াই এদের সপ্রতিভতা কেড়ে নিচ্ছে। এদের পাত্তা না দিলেই হয়। কিন্তু আজ সে ব্যাপারটা একটু অন্য রকম করে ভাববার চেষ্টা করল।

একটা অত্যন্ত খর পদশব্দে চোখ তুলেই সাগর হিমাদ্রিকে দেখতে পেল, ঘরে ঢুকছে। হিমাদ্রি বেঁটে, রোগা, কালো, চেহারা সাধারণ, তবু ওর চোখেমুখে একটা তুখোড় ভাব আছে। বড্ড বেশি কথা বলার অভ্যাস, ওকে দেখেই সাগরের বুকটা নড়ে ওঠে একটু। আজ একটু অন্য চোখে দেখল হিমাদ্রিকে। প্রায়দিনই কথা বলে না, আজ হিমাদ্রি ঘরে ঢুকে সই করার খাতা খুঁজছে দেখে সাগর নিজের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, এগারোটা একত্রিশ হিমাদ্রিবাবু।

হিমাদ্রি সাগরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল।

সাগর অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বলে, তাই দেখছি। লাস্ট রিজোলিশানে আমরা প্রস্তাব নিয়েছিলাম যে এগারোটা ত্রিশের পর অ্যাটেন্ডেন্স চলবে না।

হিমাদ্রি একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, এই স্কুলে সবই চলে। ক্লাস না-করেও অ্যাটেন্ডেন্স হয়। দেখছি তো।

সাগর রেগে যায় না, শুধু মৃদু হাসি সহকারে দাবার আর-একটা চাল দেয় মাত্র। বলে, খাতা

হেডমাস্টার্স রুমে চলে গেছে। যান, গিয়ে সই করুন। উনি যদি সই করতে দেন তা হলে আমার আপত্তি কী? কিন্তু আমার পরামর্শ হল, আজ আর সই না-করে বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।

হিমাদ্রি বোধ হয় একটু সামান্য মাত্র পিছিয়ে যায় মনে মনে। তবু হালকা চালে বলে, আপনার ঘড়িটাই যে ঠিক তা কে বলল?

সাগর বাঁ হাতের কবজিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, ওমেগা ক্রোনোমিটার, বাইশশো টাকায় কেনা। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী আজ সকালেও রেডিয়োর টাইম সিগন্যালের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিলেছে।

হিমাদ্রি সাগরের উলটো দিকের চেয়ারে বসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, ঠিক আছে, আজ না হয় সই না করলাম, আমার ক্যাজুয়াল লিভ এখনও সাত দিন পাওনা আছে।

সাগর মাথা নেড়ে বলে, আমার এক দিনও পাওনা নেই। আমি বড় বেশি ইররেগুলার, আপনার ক্যাজুয়াল লিভগুলোকে আমার হিংসে হয়, কয়েকটা ধার দেবেন?

হিমাদ্রি সাগরের চোখে চোখ রেখে লড়াই বুঝতে পেরে বলে, আপনার ধার নেওয়ার দরকার কী? ম্যানেজমেন্ট তো আপনার সব ছুটিই দরখাস্ত ছাড়াই গ্র্যান্ট করছে। আমরা কেউই আপনার মতো ভাগ্যবান নই।

সুবোধবাবু খৈনির থুথু ফেলে এলেন। চেয়ার টেনে বসবার আগেই হিমাদ্রির কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, হিমাদ্রিবাবু, কাজটা ভাল করেননি, লাস্ট মিটিঙের খবর আমরা পেয়েছি, টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভরা তাদের কলিগের বিরুদ্ধে বলবে, এটা ঠিক না। সাগরবাবুর কেসটা মিটিঙে ডিসকাস করা উচিত হয়নি।

হিমাদ্রি একটু থমকে গেল। তারপর বলল, কারও বিরুদ্ধে বলা তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। স্কুলের ওয়েলফেয়ার দেখতে গেলে এ-সব ব্যাপার তুলতেই হয়। আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই।

ভানু এসে গেছে। দরজার ফাঁক দিয়ে ফুটপাথের কাছ ঘেঁষে ট্যাক্সি দাঁড়ানো দেখে সাগর উঠল। খুব সাদামাটা ভাবে হিমাদ্রির উদ্দেশে বলল, আপনার তো স্কুল করা হল না। চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই। আমি কর্পোরেশনে যাব।

হিমাদ্রি একটু ইতস্তত করে হঠাৎ খুব স্পোর্টসম্যানশিপ্ দেখিয়ে উঠে বলল, চলুন, বড়লোকদের সঙ্গ করা ভাল।

কামড়টা গায়ে মাখল না সাগর। ট্যাক্সির কাছে এসে আগে হিমাদ্রিকে উঠতে দিয়ে পরে নিজে উঠল। এক প্যাকেট বিদেশি সিগারেট ছিল পকেটে। নতুন প্যাকেটটা বের করে সেলোফেনের মোড়ক খুলে এগিয়ে দিল হিমাদ্রির দিকে। গ্যাসলাইটারে ধরিয়ে দিল। ট্যাক্সি হাজরা ছাড়িয়ে যাওয়ার সময়ে প্রথম কথা বলল, যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? কী ভাবে টাকা রোজগার করতে হয় দেখে আসবেন!

বলে হাসল সাগর।

হিমাদ্রিও হাসে। বলে, আপনি খুব মাইন্ড করেছেন বোধ হয়? মিটিঙে কথাটা আমি কিন্তু খুব ক্যাজুয়ালি তুলেছিলাম।

সাগর যেন সে-কথায় কান দিল না। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, আমি একজন খুব অসুখী মানুষ। জানেন? খুব আনসাকসেসফুল।

সাগর কথাটা সাজিয়ে বা বানিয়ে বলেনি, এমনি হঠাৎ যেন তার হৃদয় কথা বলে উঠল। তার খুব একটা ভাবপ্রবণতা নেই, এমনকী সমব্যথী বা সংবেদনশীল মানুষও তার আজকাল আর দরকার হয় না। তবু তার হৃদয় থেকে কথাটা উঠে এল।

হিমাদ্রি একটু ফচকে হাসি হেসে বলে, আপনি যদি আনসাকসেসফুল তবে তো আমরা কোন গভীর গাড্ডায় পড়ে আছি। আর কী চান বলুন তো দাদা, বাড়ি হাঁকড়েছেন, গাড়ি দাবড়াচ্ছেন, ভাল ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, আর কী চাই!

সাগর গম্ভীর হয়ে রইল। বা ঠিক গম্ভীর নয়, যেন বড় চিন্তায় ক্লিষ্ট, অন্যমনস্ক। অনেকক্ষণ বাদে বলল, আমার ব্যর্থতাটা কেউ বোঝে না। সাকসেস বলতে লোকে আজকাল বাড়ি-গাড়ি বোঝে। এটাই একটা প্যারাডক্স।

তা হলে সাকসেস বলতে আপনি কী বোঝেন?

সাগর একটু ভেবে বলে, ধরুন একজন লোক একটা মাটির পুতুল তৈরি করছে। পুতুলটার বাজারদর সে জানে না, কিন্তু অনেক যত্নে অনেক পরিশ্রমে সে ঠিক যেমনটি চেয়েছিল তেমনটিই তৈরি করতে পেরেছে। আর কাজ শেষ হওয়ায় তার এক দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্লান্তির সঙ্গে এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে যখন তার মন কানায় কানায় ভরা সেই সময়টুকুই তার সাকসেস, এরপর পুতুলটা লক্ষ টাকায় বিক্রি হল না দু' পয়সায় তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

ওঃ! বলে হিমাদ্রি সেই ফচকে হাসি হেসে বলে, এ-সব তো রবি ঠাকুর অনেক আগেই বলে গেছেন। ও-সব তো শিল্প-টিল্পর কথা। দেশের বারো আনা লোকেরই ও-সবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। আমরা পেটের চিন্তা থেকেই সাফল্য আর অসাফল্য বিচার করতে শিখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনার অসাফল্য কোথায়।

ওইখানেই। ও ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না।

আপনি কি কবিতার কথা চিন্তা করে বলছেন?

সাগর মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

ধুস! হিমাদ্রি বলে, কবিতা দিয়ে কী হয়? আমাকে লক্ষ টাকা দিয়ে দেখুন, সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি। এমনকী প্রেমিকা বা সিগারেট—যা ছাড়তে বলুন। আমি কিন্তু জগুবাজারের কাছে নেমে যাব দাদা।

সাগর খুব হাসছিল। ড্রাইভারের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, ভাই সামনে রাখবেন একটু।

জগুবাজারের কাছে হিমাদ্রি নেমে গেল। বাকি পথটুকু সাগর একা, গম্ভীর।

কর্পোরেশনের গেটের কাছেই মানিক দাঁড়িয়ে ছিল। বারোটা বাজতে আর পনেরো মিনিট বাকি। সাগর নামতে নামতেই জিজ্ঞেস করল, কী রে? মজুমদার আসেনি?

রোগা লম্বা আর ফরসা মানিককে দেখেই বোঝা যায় যে ও খুব ছটফটে স্বভাবের ছেলে। মুখশ্রী খুব সুন্দর। একমাথা চুল। বড় জুলপি আর ঝোলানো গোঁফ দিয়ে অবশ্য চেহারাটা ঢেকে রেখেছে, চোখে কালো চশমা, গায়ে হলুদ আর টকটকে লাল রঙের ডোরাওলা জামা, পরনে খয়েরি আর বেগুনি চেকওলা বেলবটম, পায়ে উঁচু হিলওলা চিনেবাড়ির জুতো, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কে বলবে! দু-চারটে চুল আর গোঁফ পেকেছে, শুকনো কলপ দিয়ে সে-সব ঢেকে চেপে রাখে। ওর একটা দারুণ সুন্দরী বউ আছে। মানিক নিজে বড়লোকের ছেলে, বউও বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু বউকে বাগে রাখতে পারে না একদম। ওর বউ ছবি সিনেমায় যায়, মার্কেটিংয়ে যায়, এগজিবিশন দেখে বেড়ায়, নয়তো বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে পুরী, ওয়ালটেয়ার, সিমলা ঘুরে আসে। এবং এ-সব ব্যাপারে মানিকের মতামতের তোয়াক্কা করে না। অর্থাৎ, মানিক তার বউয়ের কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব রাখতে শেখেনি। বরং এখন বউয়ের পক্ষ টেনেই ওকালতি করে। সাগর এক দিন ঠাট্টা করে বলেছিল, কী রে, বউ তোকে একা রেখে দেরাদুন চলে গেল! মানিক খুব সমবেদনার সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, আমিই যেতে বলেছি। সারা দিন আমি কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ও খুব লোনলি ফিল করে তো। ব্যবসাতেও মানিকের বুদ্ধি কম, দায়িত্ব-সচেতনতাও তেমন নেই। প্রায় সময়েই ও মানুষকে কথা দিয়ে কথা রাখে না, পেমেন্ট বাকি রাখে, বড় অর্ডার পেলেও গা করে না। তার কারণ, ওর বাবার অনেক টাকা এবং ওর খাওয়া-পরার অভাব নেই, কিছু করতে হয় বলে ব্যবসা করতে শুরু করেছিল। যখন অনেক টাকা লোকসান খেয়ে ব্যবসা গোটাতে বসেছে তখনই এক দিন সাগরকে বলেছিল, আমি ব্যবসাটা ছেড়ে দিচ্ছি, তুই পারলে কর। সাগর তখন শক্ত হাতে ব্যবসার হাল ধরল। সবাই জানে এই ব্যবসাটায় সাগরই আসল লোক, মানিক লোক দেখানোর জন্য আছে। ক্লায়েন্টরা সাগরকেই বেশি চেনে, সাগরের মুখ চেয়েই মহাজনরা মালপত্র দেয়। মানিকও গা ছেড়ে বসে থাকে। তবে সাগরের উদ্যোগ দেখে মানিক ইদানীং কিছু তৎপর হয়েছে। দু'জনেই দু'জনকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে. ভাল তো বাসেই।

মানিক মাথা চুলকে বলল, বেলা এগারোটায় মজুমদারকে ফোন করেছিলাম। তখনও কনফার্ম করল যে ক্যাশ নিয়ে আসছে। কিন্তু এখনও যে কেন এল না!

সাগর তার স্বাভাবিক শান্ত গলায় বলে, তুই টেন্ডারটা এনেছিস তো!

মানিক সাগরের চোখের দিকে না তাকিয়ে বলে, ধরকে কাল টেন্ডার রেডি করতে বলে গেছি। আমি তো আজ আর অফিসে যাইনি, বাড়ি থেকে সোজা আসছি। ধরেরও এখানেই আসার কথা। তো সেও এখনও আসেনি! প্যাক্টের অন্য সবাই ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বসে আছে। বারোটা বাজবার পাঁচ মিনিট থাকতে সবাই টেন্ডার সাবমিট করবে বলে শুনলাম।

অন্য কেউ হলে এই পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড রেগে যেত, চেঁচিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ত। সাগর তা করল না। শুধু একটু বিরক্তির 'হুঁ' বলে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলল, চল, ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি। মজুমদার হয়তো পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে গেছে।

ওরা ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, শেষবারের মতো রাস্তাটা দেখে নিতে গিয়ে সাগরই উঁকি দিয়ে দেখে, একটা ট্যাক্সি উলটো দিকের ফুটপাথের ধার ঘেঁষে থেমেছে, আর ট্যাক্সির জানালা দিয়ে হাত তুলে সাগরকে 'উইশ' করে মজুমদার নেমে আসছে, বাদামি রঙের সুট পরনে, গলায় একটা দারুণ বাহারি আর চওড়া টাই। রাস্তাটা উদভ্রান্তের মতো পেরিয়ে এল সে, হাতে একটা পেটমোটা পোর্টমেন্টো। এ-ধারের ফুটপাথে পা দিয়েই হেঁকে বলল, হ্যালো ভালচারস, আই হ্যাভ কাম টু বি ইটন্ বাই ইউ, আর সব কোথায়?

মানিক হাসছিল। বিনা পরিশ্রমে মজুমদারের অনেক টাকা খসানো যাচ্ছে। সাগর একটু গম্ভীর হয়ে গেল। 'ভালচারস' শব্দটা তার ভাল লাগেনি।

মজুমদার কাছে আসতেই অবশ্য বোঝা গেল যে সে আজ মেজাজে আছে। কোনও শুঁড়িবাড়ি থেকে কয়েক পাত্র চাপিয়ে এসেছে।

আজও টেনে এসেছেন মজুমদার? মানিক জিজ্ঞেস করে।

মজুমদার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, এত টাকার হাস্ মানি কি আর নরমাল অবস্থায় পে করা যায়? হুইস্কি দিয়ে ভিতরটা একটু হড়হড়ে করে নিয়েছি, যাতে দেওয়ার সময়ে মেজাজে থাকতে পারি। আর সব শকুনেরা কোথায়?

ভিতরে। মানিক উত্তর দেয়।

অ্যাম আই লেট?

মানিক বলল, একটু।

ঘড়ি দেখে মজুমদার একটা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলে, ইটস জাস্ট দি টাইম।

সাগর ভ্রূ কুঁচকে মজুমদারের দিকে চেয়ে ছিল। মজুমদারকে সঠিক বিশ্বাস নেই। টাকাটা দেবে তো! মানিকটা হাঁদার মতো টেন্ডারটা সঙ্গে আনেনি। মজুমদার টাকা না দিলেও ওদের টেন্ডার জমা দেওয়ার উপায় রাখেনি। কন্ট্রাক্টটা খুবই ভাল। কাজটা করতে পারলে, সাগরের আন্দাজ, লাখ দেড়েক তুলে ফেলা যাবে। কাজটা করারই ইচ্ছে ছিল সাগরের, সে পরিশ্রম দিয়ে রোজগার করতে ভালবাসে। দাঁতে দাঁত দিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে লড়াই, আর সেই নিজেকে নিষ্পেষিত করে কাজ দিয়ে পয়সা রোজগার, তার স্বাদই আলাদা, কিন্তু মানিক সবসময়ে ফোকটে রোজগার করতে ভালবাসে, খাটতে চায় না। যে-কাজটা সাগর না দেখে তাই গোলমাল হয়ে যায়। আজকে যে-রকম টেন্ডারটা সঙ্গে আনেনি।

সাগর একটু উঁচু গলায় বলল, মজুমদার, আমাদের পেমেন্ট এখানেই হয়ে যাক। বাকিরা ডিপার্টমেন্টে অপেক্ষা করছে। আমাদের ছেড়ে দিয়ে আপনি ওদের কাছে যান। তাড়াতাড়ি করবেন, দে আর ভেরি মাচ ইগার টু সাবমিট টেন্ডার...

মজুমদার একটু ভ্যাবলা চোখে সাগরকে দেখল। কোনও কথা বলল না। পোর্টমেন্টোর মুখ খুলে একটু খুঁজে বেছে একটা বাদামি মোটা খাম বের করে আনল, খামের মুখটা সিল করা। যেভাবে ভদ্রলোকেরা নাছোড় ভিখিরিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দু-দশ নয়া পয়সা তাদের হাতে ফেলে সরে পড়ে, ঠিক সেভাবেই মানিকের বাড়ানো হাতে খামটা তাচ্ছিল্যভরে ফেলে দিয়ে বলল, হিয়ার ইউ আর। গোনা আছে। নিট দশ।

এই বলে মজুমদার আর তাকালও না। চটপটে পায়ে কর্পোরেশনের বিশাল পুরনো ফটক দিয়ে ভিতরের আবছা আলোর ভিতরে হারিয়ে গেল।

মানিক বলল, হুররে! মাইরি, খুলে দেখব ভিতরে নোট আছে না সাদা কাগজ?

সাগর মাথা নেড়ে বলল, দরকার নেই। খামটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নে।

অফিসে এসে সাগর নিস্পৃহভাবে চেয়ারে বসে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে রইল। ও দিকে মানিক আনন্দে আপনমনে মাঝে মাঝে 'শালা' ধ্বনি দিতে দিতে খামটা ছিঁড়ে একগোছা একশো টাকার নোট বের করেছে। সাগর এক বারও না তাকিয়েও শুধু শুনে টের পাচ্ছিল, জিভের জলে আঙুল ভিজিয়ে মানিক টাকা গুনছে। একশোটা একশো টাকার নোট গুনতে বেশি সময় লাগল না।

সাগর জানে, গুনবার দরকার ছিল না। মজুমদার আজ তার কথার খেলাপ করেনি। কথার খেলাপ করার সাহস মজুমদারের আর নেই। ম্যাঙ্গো লেনের অফিসের মেইনটেনেন্স, মদিরা, বউয়ের খোরপোশের টাকা এবং তা ছাড়া মজুমদারের নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু 'ভালচারস' কথাটা সাগর কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার কান দু'টো গরম হয়ে আছে সেই থেকে, চোখ দু'টো টনটন করছে। অপমান টের পেলে সাগরের এ রকম হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন নোট, স্টেপল করা। মানিক কাগজ কাটা ছুরির ডগা দিয়ে স্টেপলের পিন খুলে টাকা দু'ভাগ করল। সাগরের দিকে একটা ভাগ এগিয়ে দিয়ে বলল, খুব হল আজ, বুঝলি সাগর! মুফত টাকা। কী কিনবি?

সাগর টাকাটা ধরল না। টেবিলের ওপর পড়ে রইল। অফিসটা বন্ধ বলে গরম। তাই পাখা চলছে ধীরে। সাগরের ভাগের টাকার গোছা থেকে নোট উড়ু উড়ু করছে। মানিক একটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে বলে, ফেলে রাখিস না, ঢুকিয়ে নে। কে এসে দেখে ফেলবে।

সাগর বিরক্তির সঙ্গে বলল, লোহার আলমারিতে রেখে দে।

রেখে দেব! খরচ করবি না?

কীসের খরচ?

মানিক বোকা হাসি হেসে বলে, এ-টাকা তো ওড়াবার জন্য। রেখে-টেখে কী হবে? বউকে বলে এসেছি আজ মার্কেটিংয়ে যাব। দেদার ওড়াব টাকা। এটার তো এন্ট্রি দেখাতে হবে না।

সাগর চোখ খুলল, মানিকের দিকে না-চেয়েই বলল, সাধে কি তোকে মাঝে মাঝে আমার লাথি মারতে ইচ্ছে হয়!

কেন? করলামটা কী?

তোর বুদ্ধি কবে হবে মান্‌কে? অর্ডারটা ছেড়ে দেওয়ার বুদ্ধি তোকে কে দিয়েছিল? দশ হাজার হাস মানি পেয়ে লাফাচ্ছিস, আর অর্ডারটা ধরে কাজ করলে কত লাভ হত জানিস?

জানি। কিন্তু তাতে রিসকও ছিল, খাটুনিও ছিল।

সাগর উঠে পড়ে বলল, বিনা পরিশ্রমে টাকা রোজগার করতে লজ্জা করে না বেলাজা কোথাকার?

মানিক বেকুবের মতো হাসছিল। হাসিমুখেই বলল, তুই শালা কেমন যেন অন্য রকম! টাকাটা নিয়ে নে। এর পরে না হয় আর এ-রকম করব না।

সাগর টাকাটা তুলে নিল। একটু ভাবল। 'ভালচারস' কথাটা এই টাকার গায়ে গন্ধের মতো লেগে আছে। মজুমদারের কি খুব কষ্ট হল টাকাটা বের করতে? কাল ও স্কচ খাইয়েছে।

মানিকের মুড দেখে সাগর বুঝতে পারছিল যে আজ আর কাজকর্ম হবে না। গানমেটালের বুশগুলোর ব্যবস্থা করতে সাগর বেরিয়ে পড়ে। মনটা বড় খারাপ। টাকা রোজগার করে এত খারাপ কখনও লাগেনি।

## ॥ সাত ॥

প্রায় এক মাস হয়ে গেল বুকুন কলকাতায় এসেছে চিকিৎসা করাতে।

সিন্ধু মাঝে মাঝে অথই জলে পড়ে গিয়ে ভাবে কেন বুকুনের সঙ্গে তার চেনা হল! কেন বুকুনের সঙ্গেই!

ছেলেবেলা থেকেই সিন্ধুর এক রোগ, তার মেয়েদের বড় লজ্জা। সে শুনেছে, তার দাদাও খুব লাজুক ছিল অল্পবয়সের কালে। বাড়িতে অচেনা অতিথি এলে দাদা বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াত, পাছে অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। দাদার সঙ্গে তার খুব মিল। কিন্তু সিন্ধু তা বলে সবাইকে লজ্জা পায় না। একমাত্র মেয়েদেরই লজ্জা পায় সে। অন্য যে-কোনও মানুষের সঙ্গে যে-কোনও পরিবেশে সিন্ধু খুবই অনায়াস। অবশ্য সিন্ধুকে দেখলেও তা বোঝা যায়। বেশ লম্বা, সুন্দর চেহারা। ইদানীং চেহারাটা একটু ভেঙে গেছে। গায়ের বর্ণ তামার মতো পোড়া-পোড়া, হনু আর কণ্ঠার হাড় জেগে থাকে। গাল ভাঙা, চোখের নীচেটা দেবে গেছে অনেক। নানা দুশ্চিন্তা, খাটুনি, অনিশ্চয়তা। তবু তার চেহারার মূল কাঠামোটাই চমৎকার। একটা পৌরুষের ছায়া আছে। তার চোখ-মুখ খুবই বুদ্ধির আলো বিকিরণ করে। সব মিলিয়ে দেখলে তার চেহারায় মেয়ে পটানোর লক্ষণ আছে। লাজুক বা মুখচোরা ভাবের কোনও চিহ্ন নেই। অবশ্য এখন আর ততটা নয়ও সে আগেকার মতো। তবুও সিন্ধুর এই চেহারাটার ভিতরে ভিতরে আসল সিন্ধুটা লুকিয়ে আছে। তাকে শুধু সিন্ধুই চেনে, আর কেউ নয়।

সেই মেয়ে দেখলেই মুখচোরা সিন্ধু কোনও দিনই মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি। বাল্যকাল থেকেই তার কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাব হয় না। এক-একজনের একরকম গ্রহের গুণ থাকে। সিন্ধুরও সেই রকম। অথচ এই যৌবন বয়স পর্যন্ত সে খুবই তৃষ্ণার্ত হয়েছিল নারীসঙ্গের জন্য। ঘটেনি কখনও। সে একরকম ভালই ছিল বুঝি। যখন ভাব হল তখন বুকুনের সঙ্গে।

বুকুনও, আশ্চর্য, সেই রকমই মেয়ে যার সঙ্গে সহজে কোনও ছেলের ভাব হয় না। ভারী একটেরে নির্জন মেয়ে। সে যে এই পৃথিবীতে জন্মেছে, প্রাণ ধরে বেঁচে আছে, তা জানে মাত্র কয়েকজন। সিন্ধু জানত না।

সে বার জলপাইগুড়ির পলিটেকনিকে মেকানিকাল পড়বার সময়ে হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে শহরের গুন্ডাদের হাঙ্গামা হল খুব। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সোশ্যাল ফাংশনে বরাবরই শহরের মস্তান ছেলেরা এসে হাঙ্গামা করে, মাতলামির চূড়ান্ত সীমায় চলে যায়। তা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে শহরে আসার দূরত্ব অনেকটা। সেই নির্জন রাস্তায় একা দোকা পেলে হোস্টেলের ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে ছিনতাইও করত মস্তানরা। এটা দীর্ঘকাল চলে আসছিল। হোস্টেলের ছাত্ররা বাইরে থেকে পড়তে গেছে, শহরের মস্তানদের বিরুদ্ধে লাগতে সাহস পেত না। সিন্ধুও শিলিগুড়ি থেকে পড়তে গেছে, হোস্টেলে থাকে। বাবা চাকরি করে তখন, টাকা পাঠায়। সিন্ধু বরাবরই বাবার দুঃখ খুব বুঝত। পড়াশুনো যদিও তার ভাল লাগত না, তবু বাবাকে বিপাকে না-ফেলার জন্য সে পরিশ্রম করত। কিন্তু বরাবরই সে কিছু দাঙ্গাবাজ গোছের ছেলে, সহজে ভয়টয় পেত না, দরকার মতো সে বহুবার বহুক্ষেত্রে রুখে দাঁড়িয়েছে।

সে বার কলেজের সোশ্যালে বাইরের আর্টিস্টরা গেছে অনেকে। জমজমাট ফাংশন। যথারীতি শহুরে মস্তানরা ঢুকেছে দর্শকদের জায়গায়। ভাল ভাল সিট থেকে নিরীহ ছেলেদের সরিয়ে দিয়ে সিট দখল করেছে। এ-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। যা হচ্ছে হোক, প্রতি বারই তো হয়। কিন্তু একজন টপ মস্তান যখন স্টেজে উঠে মাতাল অবস্থায় একজন গায়িকার মুখের সামনে থেকে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে অকথ্য খিস্তি দিল কয়েকটা তখনই একটা গোলমালের সূত্রপাত হয়। সূত্রপাতটা অবশ্য সিন্ধু করেনি, করেছিল ধূপগুড়ির ছেলে অঙ্কুর সেন। ব্যায়াম-ট্যায়াম করত, আবার সাধারণ ব্যায়ামবীররা যেমন শরীর বাঁচিয়ে চলে সে সে-রকম ছিল না। স্টেজে উঠে সে উঠে ছেলেটাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে আনল। মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের আসন থেকে উঠে এল মস্তানরা, তাদের হাঁকডাকে বাইরে থেকে জুটে গেল বহু। অঙ্কুর প্রথম রাউন্ডটায় স্টেজের কাছ বরাবর কয়েক বার ঘুঁষি-টুঁষি চালিয়ে ছিল, কিন্তু ঘেরাও

মার খেয়ে জমি ধরে নিল দশ মিনিটের মধ্যে। মস্তানরা তখন স্টেজ থেকে তক্তা তুলে, মাইক ভেঙে, চেয়ার আছড়ে পুরো ভন্ডুল লাগিয়ে দিয়েছিল। একা গিয়ে ওদের প্রতিরোধ করার মতো বোকামি দেখায়নি সিন্ধু, কিন্তু ব্যাপারটা মনে রেখেছিল। সেই রাতেই সে নেতৃত্ব নিয়ে হোস্টেলের ছেলেদের মিটিং ডাকে। আধ ঘণ্টার মিটিং, কোনও বাদ-প্রতিবাদ হয়নি। সকলেরই রক্ত আগুন হয়ে আছে। শুধু কী করতে হবে তার প্ল্যানটা সিন্ধু বাতলে দিল। সেই ঘটনার পর পুলিশ এল অনেক রাতে। হোস্টেলে গিয়ে তারা আহত অঙ্কুরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কেউ কোনও প্রতিবাদ করেনি। পুলিশ চলে গেলে দু'-তিনজন অধ্যাপকও এসে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করলেন। সিন্ধু তাঁদের ব্যাপারটা বলল, সিন্ধুর প্ল্যান তাঁরাও ইঙ্গিতে সমর্থন করে যান।

এ-রকম পরিকল্পিত ও ভয়ংকর দাঙ্গা সিন্ধু আর কখনও করেনি। হোস্টেল থেকে সিকি মাইল দূরে বড় রাস্তার কালভার্টের ওপর মস্তানদের একটা মদ খাওয়ার আড্ডা ছিল, রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোস্টেলের চল্লিশজন ছেলে গিয়ে তুলে আনল তাদের। অবশ্যই বিনা প্রতিরোধে নয়। সিন্ধু নিজে অন্তত পাঁচ-ছ'জনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল রড দিয়ে। এতটা নিষ্ঠুর সিন্ধু নয়। যে দশজনকে তারা ধরে এনেছিল তাদের হোস্টেলে আনার পর বাকি ছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক এসে তাদের পিটিয়ে যায় প্ল্যান মাফিক। অবশ্য দশজন অনেক আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সেইখানেই অবশ্য ঘটনার ইতি হয়নি। প্রায় একশো জন ছেলের একটা দল নিয়ে সিন্ধু গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত শহরের উত্তর ভাগের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে কয়েক বারে আরও অন্তত চল্লিশজন মস্তানকে জমি নেওয়ায়। এমন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সেই আক্রমণ যে কেউ ভাল করে আত্মরক্ষাও করতে পারেনি। সিন্ধু কত জনকে মেরেছিল তা সে আজও হিসেব করতে পারেনি। তবে মনে আছে, ভোরবেলা তার হাত ব্যথায় অবশ হয়ে এসেছিল রড চালিয়ে। পরদিন নতুন ব্যাচ গেল শহরে। মস্তানরা কেউ তখন আর প্রকাশ্যে নেই, সবাই গা-ঢাকা দিয়েছে, তবু নিরীহ কিছু ছেলে মার খেল হোস্টেলের ক্রুদ্ধ ছেলেদের হাতে।

শহরের পুলিশ এটা আশা করেনি। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে তাদের খানিক সময় গেল। যে-সব অধ্যাপক সিন্ধুর কাণ্ডটা জানতেন তাঁরাই এসে সেদিন সিন্ধুকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার পালাও। না পালালে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। বাড়ি যেয়ো না, অন্য কোথাও চলে যাও।

সিন্ধু পালাল, শিলিগুড়ি রোড থেকে এক ভদ্রলোকের জিপ থামিয়ে সোজা শিলিগুড়ি। বাবুপাড়ায় এক বন্ধু থাকত, মনোজ। সোজা তার বাসায় গিয়ে ঝোড়ো তপ্ত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল, মনোজ, আমাকে লুকিয়ে রাখ।

মনোজের বাড়িতে নাগাড়ে প্রায় এক মাস লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। সেই বাড়িতেই সে বুকুনকে প্রথম দেখে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর পলিটেকনিকের গণ্ডগোলের মূলে যে সিন্ধুই ছিল এটা তত দিনে পুলিশ জেনে গেছে। বার দুই তাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে পুলিশ হানাও দিয়েছে তার খোঁজে। হোস্টেলে তো রোজই খোঁজখবর হয়েছে। সিন্ধুর মন তখন ভাল নেই, সবসময় দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পালিয়ে থাকতে তার ভাল লাগছিল না, অপরাধবোধ পেয়ে বসে তাতে। অন্যের বাড়িতে অনাহূত থাকার লজ্জাও আছে। মনোজদের বাড়িতে কেউই যে তার লুকিয়ে থাকাটাকে ভাল চোখে দেখবে না, এ তো জানা কথা। মুখে কেউ কিছু বলত না বটে, কিন্তু সন্দেহের চোখে তাকাত, ফিসফিস করে নানা কথা বলত। উপায় নেই বলেই সিন্ধু পালিয়েছিল, বাড়ির বাইরে খুব একটা বেরোত না, শিলিগুড়ির সবাই তাকে চেনে, মুহূর্তের মধ্যে পুলিশে খবর হয়ে যেতে পারে। এইসব নানা কারণে মনোজদের বাড়িতে সময়টা তার খুব ভাল কাটেনি। কেবল একটাই সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল, বুকুনের সঙ্গে চেনা হওয়া।

মনোজের দু'টি বোন। বড় বুকুন, ছোট টুকুন। দু'জনকেই ধিঙ্গি মেয়ে বলা যায়। বুকুনের বয়স তখন আঠারো-উনিশ, টুকুনের ষোলো-সতেরো। টুকুন ছিল বেশ সুন্দর দেখতে। ফরসা গোলগাল, লম্বা, চোখমুখে চুম্বক আছে। নিজের চেহারা সম্পর্কে সে ছিল খুব সজাগ। অবসর সময়টা টুকুনের কাটত আয়নার সামনে, সাজগোজের নানা রূপ টান নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাজত। সিন্ধু দেখেছে, টুকুন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে একা একা কটাক্ষ করে, হাসে, নিজের সঙ্গে বিড় বিড় করে

কথাও বলে। ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে মিশবার একটা তীব্র বেহায়া নেশাও ছিল তার। একটু স্মার্ট বা ভাল চাকরি করে এমন ছেলের দেখা পেলে সে তার সর্বস্ব নিয়ে নেমে পড়ত। ওই অল্প বয়সেই টুকুনের অনেক ভক্ত, গোছা গোছা প্রেমপত্র পায়, রাজরাজেশ্বরীর মতো অহংকার ভরে চলাফেরা করে। সিন্ধুকেও তার ভালই লেগে থাকবে। বিকেলের দিকে সিন্ধু গিয়ে পৌঁছেছিল মনোজদের বাড়িতে, হা-ক্লান্ত, উত্তেজিত, এবং অবসন্নও। গায়ে হাতে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, অল্প একটু জ্বরভাব। তাকে নিশ্চয়ই খুব ভাল দেখাচ্ছিল না। বাইরের ঘরে বসে সে মনোজ আর তার বাবাকে পুরো ঘটনাটা বুঝিয়ে বলছিল। সেই সময়ে দুই বোন ইস্কুল থেকে ফিরল। বয়স অনুপাতে ওদের পড়াশুনা বেশ পেছোনো। বড় জন বুকুন, ঘরে ঢুকেই অচেনা লোক দেখে মাথা নামিয়ে ভিতর-বাড়ি চলে গেল। টুকুনের সে-সব নেই, সে বেশ বড় বড় চোখ করে দেখল সিন্ধুকে, বুকুন না চিনলেও টুকুন সিন্ধুকে চেনে। তাই বলল, ইস সিন্ধুদা, দেখাই নেই যে! সিন্ধু একটু হেসেছিল, তখন মেয়েদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো মনের অবস্থা নয়। টুকুন চট করে ভিতরে গিয়ে ইস্কুলের সাদা খোলের শাড়ি পালটে, রঙিন শাড়ি, ফাউন্ডেশন মেক-আপ, কাজলের টিপ দিয়ে সেজে এল, গলায় দার্জিলিঙের মুরগির ডিমের মতো লাল পাথরের মালা। এসে বাবা আর দাদার সামনেই সিন্ধুর মুখোমুখি বসে হাঁ করে চেয়ে রইল। কী বেহায়ার মতো চেয়ে থাকা! ভিতর-বাড়ি থেকে বার বার পরদার আড়ালে এসে ওর মা আর দিদি ডেকে যাচ্ছে, ও টুকুন, খাবি আয়। টুকুন গ্রাহ্যও করছে না, বলছে, দাঁড়াও বাবা যাচ্ছি।

তখনই সিন্ধু বুঝেছিল, এ-বাড়িতে থাকা তার পক্ষে একটু মুশকিল হবে। ওই লোভী চোখ দেখেই সে বুঝে গিয়েছিল যে, টুকুনের ভিতরটা চাকুম-চুকুম করছে। এ-ধরনের মেয়েরা যখন তখন যা খুশি করে ফেলতে পারে। সিন্ধু কোনও ফাঁদে পড়ে যেতে নারাজ। যেখানেই লোভ সেখানেই সে কিছু সন্দেহপ্রবণ। এই তার স্বভাব; ব্যবসাতেও সিন্ধু তাই কোনও দিনই রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি। স্বপ্ন বা কল্পনা জিনিসটার কিছু খামতি তার আছে। টুকুনকে দেখে সে মনে মনে সতর্ক হয়ে গেল।

তার সন্দেহ মিথ্যে নয়। ধিঙ্গি মেয়ে-ওলা বাড়িতে অজ্ঞাতবাস করতে গিয়ে তার যে-ভয়টা হয়েছিল সেটা সত্যিকারের ভয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম নয়।

বাড়ির ভিতরে একটা উঠোন, উঠোনকে ঘিরে টানা বারান্দা আর বারান্দার সঙ্গে সারি দিয়ে ঘর। বাড়িটায় কোনও শ্রীছাঁদ নেই, তবে বেশ আলো-বাতাস আছে, বাগান-টাগানও রয়েছে। উত্তর দিককার সর্বশেষে একটা ছোট ঘরে একটা মাঝারি চৌকিতে সে আর মনোজ শুত। মনোজ একটু ভালমানুষ গোছের বেকার ছেলে। খুব সোশ্যাল ওয়ার্ক করে বেড়ায়। ফাংশন, বিয়ে, বন্যা, দুর্ঘটনা, সব জায়গাতেই মনোজের হাজিরা থাকে। সংসারের কোনও দায় বা দায়িত্ব তাকে বইতে হয় না। বাবা উকিল, তা ছাড়া চা-বাগানের শেয়ার, জমিজায়গা, ধূপকাঠি তৈরির কারখানা এ-সব থেকে ভাল আয় হয় ওদের। মনোজ একটা মোমবাতি তৈরির ব্যবসা শুরু করবে, সেই নিয়ে খুব ব্যস্ত। 'এ বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে গেড়ে যা', এই বলে মনোজ সারা দিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। সিন্ধু একা বইপত্র নাড়াচাড়া করত, শুয়ে সিগারেট খেত, মনোজের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথা প্রায় বলতই না। এ-ব্যাপারটায় তার খুব লজ্জা, অচেনা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সে কথা-টথা বলতে পারে না তেমন। মনোজের মা এসে মাঝে মাঝে গল্প করতে বসতেন। সে-সব সাংসারিক কথা, সিন্ধু শুধু শুনত আর হুঁ দিত। আসত এক বুড়ি দিদিমা, তার ছিল ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ সকলের বিরুদ্ধে। সংসারের অনেক গুহ্য কথা বুড়ি অকপটে সিন্ধুকে বলে দিত। তার ভাল লাগত না।

মনোজের দুই ভাই ছিল, সরোজ আর দাদা পঙ্কজ। পঙ্কজ বাইরে চাকরি করত, সরোজ ইস্কুলে পড়ে তখন। সে বড় কাছে ঘেঁষত না। আর কখনওই তার কাছে আসত না বুকুন। বুকুন যে ও-বাড়ির মেয়ে, ও-বাড়িতেই থাকে তা টেরই পেত না সিন্ধু। কদাচিৎ একটা রঙিন শাড়ির বিলীয়মান আঁচল দেখতে পেত কোনও দরজায় বা বারান্দায় এক ঝলক। এর বেশি বুকুনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত না। তার গলার স্বর সিন্ধু তখনও শোনেইনি। কিন্তু প্রায় সময়েই দমকা বাতাসের মতো আসত টুকুন। তার কোনও শারীরিক লজ্জা ছিল না। মনের তো বালাই-ই নেই। সিন্ধুর ঘরে একটা চেয়ার-টেবিল ছিল, তবু টুকুন এসে বিছানায় সিন্ধুর গা ঘেঁষে এসে বসত, গায়ে হাত দিয়ে কথা বলত, মাথায় পাকা

চুল খুঁজত, যদিও সিন্ধুর বয়সে কারও মাথায় পাকা চুল থাকার কথা নয়। কিন্তু টুকুন বলত, অনেক ছেলেদের এ-বয়সেই চুল পেকে যায়। ওই অছিলায় সিন্ধুর গা ছুঁয়ে শরীরে গরম শ্বাস ফেলে টুকুন নিজের যৌবনের জানান দিত। এক দিন বিকেলে, কী সাহস, দৌড়ে এল ঘরে। পিছনে বোতামওয়ালা একটা ব্লাউজ পরনে। এবং সেটার নীচের দিকের দু'টো হুক তখনও খোলা। এসেই পিঠ ফিরিয়ে বলল, দিন তো হুকগুলো লাগিয়ে, কখন থেকে চেষ্টা করছি, পারছি না। সিন্ধু খুব বিব্রত, আবার কিছু আগ্রহও বোধ করছিল, হাত কাঁপছিল, গলা শুকনো, তবু এই অদ্ভুত আবদার রেখেছিল সিন্ধু। হুক লাগিয়ে দেওয়ার পর এক তীব্র গুপ্ত উত্তেজনায় অবশ লেগেছিল তার। টুকুন মুখ ঘুরিয়ে হেসে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, এ-রকম লক্ষ্মীছেলের মতো বরাবর হুক লাগিয়ে দেবেন তো? মনোজের বাড়িতে তখন মাত্র দিন পনেরো কেটেছে, তার মধ্যেই এই ঘটনা। লোকজনে ভরতি বাড়ি, কে কোথায় কী লক্ষ করছে কে জানে। সিন্ধু তাই কাঁটা হয়ে রইল। সে তখন বেশ হিরো হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ির সেই ঘটনা খবরের কাগজে ফলাও হয়ে বেরিয়েছে। তার নামের উল্লেখ অবশ্য কাগজে ছিল না। কিন্তু কয়েকজন অধ্যাপকসহ পলিটেকনিকের বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়েছে এবং আরও কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে বলে কাগজে জানিয়েছিল। কিন্তু সবাই জেনে গেছে যে সিন্ধু সেই ঘটনার মধ্যমণি ছিল। টুকুনও জানত। প্রায় সময়েই এসে মুগ্ধ বিহ্বলতায় তাকিয়ে থাকত মুখের দিকে, বলত, আপনি না একটা ডাকাত! কী করে ও-রকম কাণ্ড করলেন বলুন তো! এমনিতে দেখলে তো কিছু বোঝা যায় না, খুব ভালমানুষের মতো দেখতে। এই বলে টুকুন সিন্ধুর খুব কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করত। সিন্ধুই বা এড়ায় কী করে? বয়সের দোষ তারও কি থাকতে নেই? তবু প্রাণপণে কিছুটা সংযত রাখত নিজেকে। কিন্তু এ-কথা সত্যি যে ইচ্ছে করলে সে যা-খুশি করতে পারত টুকুনের সঙ্গে। যা-খুশি। টুকুন একটুও বাধা দেবে না। এটা বুঝতে পারার পর সে খুবই দুর্বল বোধ করতে থাকে। মেয়েদের শরীর সম্পর্কে যে দুর্লভ অভিজ্ঞতাটা তার কোনও দিনই হয়নি সেই মহার্ঘ্য জিনিস টুকুন যেন ডিসে সাজিয়ে তার মুখের সামনে ধরে আছে। খেলেই হয়।

কিন্তু বাধা ছিল টুকুনের স্বভাব। শুধু সিন্ধুকে নিয়ে থাকলে না হয় বোঝা যেত। কিন্তু গোপনে খবর পেয়ে সিন্ধুর যে-সব অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসত তাদের প্রত্যেকের প্রতিই একটা হাঘরে লোভ ছিল তার। বাছাবাছি ছিল না, সিরিয়াসনেস ছিল না। এক দিন দুপুরে সিন্ধু যখন চিতপাত হয়ে পড়ে ঘুমের চেষ্টা করছে তখন টুকুন একটা ইংরিজি কথার মানে জিজ্ঞেস করার অছিলায় ঘরে এসে ইঙ্গিতে পূর্ণ হাসিতে দরজা বন্ধ করে দিল, আর প্রায় সিন্ধুকে চেপে ধরে শ্বাসরোধকারী অবস্থায় বুকে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে হেলে বসে বলল, 'বলুন তো ওয়েডলক কথাটার মানে কী!' তখন সিন্ধু খুবই সুবিধাজনক অবস্থায় পেয়েও টুকুনকে চুমু খায়নি। মনে হয়েছিল, ও যা মেয়ে, ঠোঁটটা নিশ্চয়ই বারোয়ারি হয়ে আছে, কত জন না জানি চুমু খেয়েছে ওই ঠোঁটে! ভাবতেই একটা অনিচ্ছা, একটা বিবমিষা তার মনকে দূরে ঠেকিয়ে রাখল। একটা মেয়ে যত ছলবলেই হোক, নিজের থেকে সহজে কোনও পুরুষকে চুমু খায় না বা জড়িয়ে ধরে না। কিন্তু কেউ তাকে খেলে বা ধরলে যে সে খুশি হয় তার জানান দেয় নানাভাবে। সেই দুপুরে টুকুনও বারংবার নানাভাবে তাকে জানিয়েছে। পাগলের মতো তার বুকে কনুই চেপে ধরেছে, মাথার চুল ধরে টেনেছে মুঠো করে, কিল মেরেছে, চিমটি দিয়েছে। সিন্ধু ওকে তাড়িয়ে দেয়নি, আবার গ্রহণও করেনি। মনটা বড় আড় হয়েছিল সেই দুরন্ত দুপুরে। বলেছিল, তুমি এবার যাও, কেউ এসে পড়বে।

অবাক হওয়ার ভান করে টুকুন বলল, এসে পড়লে কী! গোপন কিছু তো করছি না!

সিন্ধু এর কী জবাব দেবে? এত নির্লজ্জতার পরও ওর নাকি গোপন করার কিছু নেই। সিন্ধু হেসে বলল, যা করছ তা দেখলে লোকে তোমাকে পাগল ভাববে।

আপনাকেও ভাববে, পাগল ছাড়া কেউ ও-রকম পাথর হয়ে থাকতে পারে! আপনি খুব বীর, না? ছাই!

বীর কে বলেছে?

লোকে বলে, সিন্ধু খুব জোর ঠান্ডা করেছে জলপাইগুড়ির গুন্ডাদের। আমিও তাই ভাবতাম। এখন দেখছি ভিতুর ডিম।

সিন্ধু এ-সব শুনে পৌরুষবশত এক বার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। হয়তো ধরত টুকুনকে, একটা কিছু করত।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে খুব সতর্ক নরম গলায় বুকুন ডাকল, টুকুন, চা নিয়ে যা।

দুধে ছানা কেটে গেল, অবস্থাটা পালটে গেল তৎক্ষণাৎ। টুকুন নিঃশব্দে সিন্ধুকে জিভ ভেঙিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে খুব অসংকোচে, একটুও ধরা পড়ার জন্য ঘাবড়ে না-গিয়ে বলল, তুই দিগে যা। আমার বয়ে গেছে।

চা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল বুকুন। টুকুন চলে গেলে সে বাধ্য হয়ে ভিতরে এল। লজ্জায় নতমুখী, সমস্ত শরীর আঁচল ঘুরিয়ে ঢাকা দেওয়া। সেই প্রথম সিন্ধু তাকে ভাল করে দেখল। ম্লান গায়ের রং, ছোটখাটো, রোগা, শুধুমাত্র তার মুখশ্রীটি ভারী সুন্দর ডৌলের। চোখ দু'টি মায়াবী লজ্জায় ভরা। মুখে একটা ভয় সংকোচের ছাপ। টেবিলে চা রেখে সে চলে যাচ্ছিল, ভদ্রতাবশে সিন্ধু কিছু বলতে হয় বলে বলল, মনোজ এখনও ফেরেনি বুকুন?

বুকুন কেমন দেখতে তা বিচার করা ভারী মুশকিল। বোধ হয় খুবই সাদামাটা মিষ্টি মুখশ্রী, এর বেশি কিছু বলা যায় না। তার ওপর ছোটখাটো বলে তেমন নজরও পড়ে না ওর দিকে। টুকুনের সঙ্গে তুলনাই হয় না, এর ওপর ও আবার ভীষণ লাজুক ঘরকুনো, নতমুখী। নিজেকে অত লুকিয়ে রাখে বলেই সিন্ধু ওকে এতকাল লক্ষই করতে পারেনি। এখন করল আর এক ধরনের ভালই লাগল তার। সে যেমন হেমন্তের বিকেল দেখলে একটা উদাস ভাল লাগা ঠিক তেমনি। পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে যেমনটা হয় বয়সকালে, তেমন নয়। বরং মনে হয় আমার যদি এ-রকম নরম-সরম বাধুক একটা বোন থাকত, বেশ হত। অন্তত সিন্ধুর এ-রকমই কিছু মনে হয়েছিল।

দরজার কাছ বরাবর বুকুন থেমে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে সিন্ধুর প্রশ্নের জবাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কথা বলে চমকে দিল সিন্ধুকে। বলল, টুকুনকে অত লাই দেবেন না, ও ভীষণ গায়ে-পড়া।

সিন্ধুর কান গরম হয়ে গেল, বুকটাও ঢিপ ঢিপ করছিল। জোর করে একটু হেসে বলল, তাই দেখছি। ওকে তোমরা সামলে রাখতে পার না, না?

না। সবাই ওকে নিয়ে ভাবে। সবসময়ে একটা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে।

সিন্ধু আস্তে করে বলল, যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তা হলে বরং আমি অশোকদের বাড়িতে চলে যাই। কাল ও বলছিল, ওদের বাসায় থাকবার জায়গা আছে।

বুকুন তখন ফিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলে, বা, তাই বলেছি বুঝি! আমি বললাম, বা রে!

এই বলে বুকুন ভীষণ অপ্রতিভ। গুছিয়ে কথা বলার মতো মেয়েমানুষিও ওর নেই, সিন্ধু বুঝে গেল।

তাই বলল, না, সে-কথা তুমি বলোনি। আমিই ভাবছি।

কেন? ও কি আপনাকে খুব জ্বালাতন করে?

সিন্ধুর মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করল না, অপকটে বলল, করে একটু। ও যে কী চায় তা তো বুঝি না। আমি ভাবছি, আমি তো বড় ছেলে, তোমাদের বাসায় আছি, তোমাদের আবার তার জন্য কোনও বদনাম না হয়।

বুকুন নখ দিয়ে দরজার গা খুঁটছিল। সেই দিকেই চেয়ে বলল, আপনার জন্য বদনাম হবে কেন? টুকুনকে সবাই চেনে। পাড়ায় কেউ ওকে ভাল বলে না। নিজের বোন তবু বলছি। আপনি সাবধানে থাকবেন।

সিন্ধুর বেশ অপমান জ্ঞান আছে। এই কথা শুনেও তার ভিতরের অপমান-বোধটা ঠান্ডা হয়নি। বলল, আমি আর কীরকম সাবধানে থাকব বলো! ঘরের দরজায় হুড়কো লাগিয়ে তো আর সবসময় ঘরে থাকা যাবে না। তার চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভাল।

বুকুন দরজা খোঁটা শেষ করে আঁচল আঙুলে জড়াতে থাকে। এগুলো স্মার্টনেসের অভাব থেকে হয়। যারা নিজেদের অক্ষমতা বা অযোগ্যতা নিয়ে সবসময়ে সচেতন তাদের লোকসমক্ষে নানা মুদ্রাদোষের অভ্যাস থাকে। আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বুকুন বলে, টুকুনকে বরং আমি বকে দেব। আপনি যাবেন না।

সিন্ধু হেসে ফেলল। টুকুনকে যে বুকুন বকবে এ-কথা ভাবতেই তার হাসি পাচ্ছিল। টুকুন মা বা বাবা কিংবা দাদাদের কাউকেই কেয়ার করে না, বুকুনের বকাকেই কি করবে? তা ছাড়া টুকুনকে বকবার মতো ক্ষমতাও তো এই রোগা নরম ভিতু মেয়েটার নেই।

সিন্ধু বলল, না তার দরকার নেই। তা হলে ও ঝগড়া করবে। খুব বিশ্রী সিচুয়েশন হবে। বকতে যেয়ো না।

আচমকা আবার সিন্ধুকে চমকে দিয়ে বুকুন তার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, আপনি হাসলেন কেন?

প্রশ্নটার মধ্যে কোনও চ্যালেঞ্জ ছিল না, রাগ বা বিরক্তিও ছিল না। বরং যেন খুব অসহায়তা ছিল। যেন হাসি দেখে তার বড় অভিমান হয়েছে কিন্তু প্রতিশোধের সাধ্য তার নেই!

সিন্ধু বলল, তুমি রাগ করলে নাকি! এমনি হাসি পেল। টুকুন তো ভীষণ ঝগড়াটে মেয়ে তাই ওকে বকতে গেলে তুমিই বরং বকুনি খেয়ে আসবে, এই ভেবে হাসলাম।

বুকুন কথাটা শুনল। হাসল না। গম্ভীর থেকেই বলল, মাও বলছিল টুকুনটা সিন্ধুকে খুব জ্বালাচ্ছে। আমাকে মা বলছিল যেন আমি আপনাকে সাবধান করে দিই।

ঠিক আছে সাবধানেই থাকব।

দুপুরবেলা ও অনেকক্ষণ আপনার ঘরে ছিল। মা একটু আগে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে গেছে। গিয়ে বলল, টুকুন ছেলেটাকে রেস্টও নিতে দিচ্ছে না।

সিন্ধু এ-কথা শুনে চমকে উঠল। ভীষণ লজ্জা আর ঘেন্নায় পেল তাকে। টুকুনের মা এসে কোন অবস্থায় তাদের দেখে গেছে, ছি ছি! নিশ্চয়ই তারা খুব সাধু ভঙ্গিতে ছিল না! সারাক্ষণ তো টুকুন তার গায়ে শ্বাস ফেলেছে আর কনুই রেখেছে বুকে। দু'জনেই দেহ স্পর্শ করেছিল দু'জনের। এঃ মা!

সিন্ধু আর মুখ তুলতে পারে না লজ্জায়। কোনওক্রমে বলল, বিশ্বাস করো আমি কিছু করিনি।

কথাটা ভুল বলা হল। ওভাবে বলা সিন্ধুর উচিত হয়নি। ওরা তো তাকে দায়ী করেনি যে সাফাই গাইতে হবে।

বুকুন তখন খুব ভাল গলায় বলল, না, না, আপনি করবেন কেন! আমরা তো টুকুনকে জানি। ভীষণ পাজি, বাবা আর মা'র লাই পেয়ে পেয়ে এ-রকম হয়ে গেছে, দাদাও কিছু বলে না।

সিন্ধু তখন মুখ তুলতে পারল, বলল, কেন ওকে সবাই তোমরা প্রশ্রয় দাও?

ও যে সুন্দর দেখতে! পড়াশুনোতেও ভাল, সেই কারণে সবাই ওকে মাথায় তুলে রেখেছে, ও যা করে কেউ কিছু বলার নেই মুখের ওপর। বললেই এমন ঝগড়া করবে।

তোমরা ওকে ভয় পাও?

অপমানকে সবাই ভয় পায়। এক দিন না আবার আপনার সঙ্গেও ঝগড়া লাগিয়ে দেয়! ওকে বিশ্বাস নেই।

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলল, আমি ঝগড়া করি না। কারও সঙ্গে করিনি কখনও, ভয় নেই।

বুকুন আবার তাকে চমকে দিয়ে বলে, করেননি, না! তবে কেন পালিয়ে আছেন? সবাই বলছে আপনি জলপাইগুড়িতে দাঙ্গা করে এসেছেন, পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।

দাঙ্গা! বলে সিন্ধু অবাক। বলে, দাঙ্গা নয়। সেটা অনেক বড় ব্যাপার।

আপনি তো খুব গম্ভীর আর শান্ত, তবে ও-রকম মারপিট করলেন কেন?

এ পর্যন্ত সেই মারপিটের গল্প কারও কাছে করেনি সিন্ধু। ওই মারপিটের মধ্যে যে তার কিছু বীরত্ব ও সাহসের ব্যাপার আছে তাও তার মনে হয়নি। তাড়া খেয়ে, পালিয়ে থেকে আর দুশ্চিন্তা করে সে সেই ঘটনার মধ্যে তার অসমসাহসী ও মরিয়া কাণ্ডকারখানার ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল। এখন হঠাৎ এই শান্ত মেয়েটির কাছে নিজের বীরত্বের কথা প্রথম তার বলতে ইচ্ছে করল।

এই ইচ্ছেই কি ভালবাসার বীজ?

সিন্ধু একটু আগ্রহের সঙ্গে বলল, বোসো না ওই চেয়ারটায়।

বুকুন হাসল আর তার সুন্দর ঝিকিমিকি দাঁত দেখে আবার একটু ভাল লাগল সিন্ধুর। বুকুন বলল, দাঁড়ান কথায় কথায় চা-টা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবার করে এনে দিয়ে বসছি।

চায়ের কাপ নিয়ে বুকুন চলে গেল। এবং কথা রাখল। ফিরে এসে গরম চায়ের কাপ হাতে দিয়ে চেয়ারে বসল। খরগোশের মতো ভিতু আর উৎসুক চোখের দৃষ্টি। সিন্ধুর ক্রমশই ব্যাপারটা ভাল লাগতে থাকে।

সেই বিকেলে অনেক কথা বলেছিল সিন্ধু। অঙ্কুরের মার খাওয়া থেকে সব। নিজের কাণ্ডকারখানার খুবই ফলাও বিবরণ দিয়েছিল সে। সেই বয়সে গায়ের জোরের গল্প বলতে খুবই ভাল লাগার কথা। বীরত্ব জিনিসটা তখনও তো খুবই সুস্বাদু।

ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বুকুন। একেই তো ছেলেদের সঙ্গে একদম মেশেনি তার ওপর সিন্ধুর মতো ডাকাবুকো ছেলেকে প্রথম দেখেই সে অবাক। একটু প্রশ্রয় পেয়ে সে বুঝি ধন্য হয়ে গেল। ভক্তিভাব ফুটে উঠল চোখে-মুখে।

সবশেষে করুণ মুখ করে বলল, মা গো। ওরা যদি মারত আপনাকে?

সিন্ধু বলল, তা হলে এতক্ষণে হাসপাতাল না হয় মর্গ ঘুরে শ্মশানে গিয়ে ছাই।

ইস, বলবেন না! ভীষণ দুষ্টু আপনি!

সিন্ধু বোকা হয়ে গেল, বলল, হ্যাঁ, একটু দুষ্টুই।

কেন ও-সব করতে গেলেন? এখন যদি পুলিশ আপনাকে ধরে তা হলে কী করবে?

কী আর করবে! জেলে দেবে।

না না, কেন জেলে দেবে! আপনি তো ঠিকই করেছেন।

পুরনো আমলে বিপ্লবীরা এ-রকম অ্যাকশনের পর লুকিয়ে থাকত আর সে-সময়ে তাদের নানা বিপদের মধ্যেও প্রেম-ট্রেম হত, সিন্ধু এ-রকম ঘটনা নভেলে পড়েছে। তারও নিজেকে সে-রকমই একজন মনে হচ্ছিল। খুব হিরো-হিরো লাগছিল নিজেকে। বুকুনের করুণ চোখ তাকে উদ্বেগভরে লেহন করছিল তখন।

তবু দেবে। সিন্ধু বলল।

বুকুন বলে, এইমাত্র খবরের কাগজ দিয়ে গেল, মা পড়ছিল একটু আগে, বলল, জলপাইগুড়ির পলিটেকনিকের ছেলেদের সব ছেড়ে দিয়েছে মুচলেকা নিয়ে।

তাই নাকি? সিন্ধু লাফিয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ।

আপনাকেও দেবে তো?

দেবে দেবে। সিন্ধু অস্থির হয়ে বলে, কাগজটা আনো তো।

মনোজদের বাসায় প্রায় কুড়ি দিন থাকবার পর এইভাবে প্রথম বুকুনের সঙ্গে আলাপ হল, অবশ্য আলাপ করতে বুকুন জানত না, কথা বলার চেয়ে সিন্ধুর কথা শুনবার আগ্রহই তার বেশি ছিল। টুকুনও দখল ছাড়েনি সিন্ধুর ওপর, দামাল হাওয়ার মতো সে যখন-তখন এসে ঢুকত ঘরে, খোলা ব্লাউজ আটকাতে বলেছে কয়েক বার। সিন্ধু দিয়েছেও আটকে। কখনও পড়া বুঝবার নাম করে এসে আজেবাজে প্রেম সংক্রান্ত সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করেছে, শেষ দিকে গোটা দুই চিঠিও দিয়েছিল। যখন টুকুন আসত তখন বুকুন কখনও আসত না। টুকুন বিকেল বা সন্ধ্যাবেলায় থাকত না, তখন খুব ভয়ে ভয়ে এসে উঁকি দিত। ভারী খুশি হত তাকে দেখে সিন্ধু। বুকুন যে বোকা তা নয়। কিন্তু ভারী সরল তার মন। সিন্ধু যা বলত তা সে মধুর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করত। সিন্ধু ভয়ের গল্প বললে তার গায়ে কাঁটা দিত। করুণ কথা বললে চোখে জল আসত তার। প্রথম আলাপের পর আর মাত্র এক সপ্তাহ ছিল সিন্ধু মনোজদের বাড়িতে। ওই সাতটা দিন বড় অদ্ভুত। ওই সাত দিনে সিন্ধু নিশ্চিত বুঝে গিয়েছিল এই বুকুন হচ্ছে তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। কোথা থেকে যে এই বোধ এল, কেন এল, তা সিন্ধু ভেবে পায় না। হয়তো ওই নরম, নতমুখী, মুগ্ধা ও বিহ্বলাকে দেখে যে-কোনও পুরুষেরই ও-রকম দখলদারি প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। ওই সাত দিনে ভিতু মেয়েটা দৌড়ে দৌড়ে সিন্ধুর জন্য নানা কাজ করেছে। ছোট বোনেরা যেমন দাদার জন্য মায়াবশে করে, তেমনই ডাকলেই এসেছে, যা বলেছে সিন্ধু তাই শুনেছে। এত বাধ্য মেয়ে হয় না।

সিন্ধুর বাবা আগেই খবর পেয়েছিলেন যে সিন্ধু মনোজদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। পুলিশ পাছে তাঁকে 'ফলো' করে সিন্ধুর হদিস পেয়ে যায় সেই ভয়ে তিনি মনোজদের বাড়িতে সিন্ধুর খোঁজে আসতে পারেননি। প্রায় পঁচিশ দিন বাদে বাবা এক দিন এলেন। সিন্ধু গিয়ে তাঁকে প্রায় জড়িয়ে ধরল 'বাবা' বলে। আসলে বাবাকে জড়িয়ে ধরার মতো সম্পর্ক বাপ-ছেলের নয়। বাবা সবসময় সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রেখে চলেন, ছেলেদের সঙ্গে কখনও সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব রাখতে তাঁর ভুল হয় না। কিন্তু সেই আবেগের মুহূর্তে

দূরত্বটা রইল না। সিন্ধুকে তিনিও একটু বুকে চেপে ধরে রইলেন। পরে বললেন, এস-পির সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তুমি জলপাইগুড়িতে গিয়ে থানায় সারেন্ডার করো। ওরা একটা মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেবে। তোমার হয়ে আমিও একটা মুচলেকা দিয়ে এসেছি।

মনোজদের বাড়িতে থাকা শেষ হয়ে গেল। সেই দিনই সিন্ধু ও-বাড়ি থেকে চলে যাবে। প্রায় এক বস্ত্রে এসেছিল। সেই বস্ত্রগুলো তখন ধোপাবাড়িতে, সিন্ধু মনোজের জামা-কাপড় কষ্টেসৃষ্টে পরে থাকে। ধোপাবাড়ির জামা-প্যান্টের জন্যই আরও একটা রাত থেকে যেতে হয়। রাতটাই ছিল অদ্ভুত। টুকুন খুব কান্নাকাটি জুড়ে দিল। সে বড় নির্লজ্জ, দাদার বন্ধু চলে যাচ্ছে বলে তার পাড়া জানান দিয়ে কান্নাটা খুবই দৃষ্টিকটু। আর এমন তো নয় যে, তাদের বাড়িতে সিন্ধু অনেক দিন ধরে সম্পর্ক পাতিয়েছে! বুকুন কাঁদেনি প্রকাশ্যে। কিন্তু সন্ধে পার হয়ে যাওয়ার কিছু পর এক নিরালা সময়ে সে তার ম্লান মুখখানা নিয়ে সিন্ধুর ঘরে এল।

সিন্ধু বলল, চলে যাচ্ছি।

বুকুন ছলছলে চোখে চেয়ে বলল, টুকুন কেমন কাঁদছে। ও বড় ভালবাসত আপনাকে। আমি ওর মতো কাঁদতে পারি না। তাতে আপনি যেন ভাববেন না যে আমার মনখারাপ হয়নি।

সিন্ধু বুকুনের দিকে তাকাল। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছিল। বাড়িটা নিস্তব্ধ। আর ঘরের মধ্যে তারা মাত্র দু'জন। বুকের মধ্যে একটা ঢেউ উঠে ভাঙল সিন্ধুর। সে চোখ সরাল না, একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সেইদিন পর্যন্ত সিন্ধু কোনও মেয়ের চোখে ও-রকমভাবে চোখ রাখতে পারেনি দীর্ঘ সময় ধরে। কারও চোখেই সে চোখ রাখতে পারে না, বড় লজ্জা করে, অস্বস্তি হতে থাকে। কিন্তু সেদিন কিছু হল না। নিঃসংকোচে সে তাকিয়ে থাকতে পারল। বুকুন, সেই লুকিয়ে-থাকা-স্বভাবের মেয়েটিও উলটে তাকিয়ে থাকল। সিন্ধু ফের টের পেল যে এই মেয়েটির ওপর তার কবে থেকে বেশ এক অমোঘ-দাবি-দাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। এ যেন তার নিজস্ব সম্পত্তি। এটাকে কি ভালবাসা বলা যায়? কে জানে? তবু ওইরকমই হল একটা ব্যাপার। এ-মেয়েটিকে তার একটুও লজ্জা করল না।

সিন্ধু বলল, বুকুন, কেন এত লুকিয়ে থাকতে তুমি এত দিন? প্রথম যখন তোমাদের বাড়িতে এলাম তখন তুমি সামনেই আসতে চাইতে না।

বুকুন বলল, আমি কারও সামনে যাই না। লজ্জা করে।

কেন, লজ্জা করবে কেন?

আমি তো টুকুনের মতো সুন্দর নই।

সিন্ধু তখন খুব একটা স্মার্ট জবাব দিল, তুমি কেন টুকুনের মতো সুন্দর হবে? তুমি তোমার মতো সুন্দর।

ইস্, আমি আবার সুন্দর! আমি তো রোগা, বারোমাস অসুখে ভুগি। আমার বাড়ির লোকেও আমাকে ঠাট্টা করে বলে অমলা।

অমলা কেন?

ডাকঘরের অমল তো অসুখে ভুগত। আমাকে তাই মেয়ে-অমল বলে খ্যাপায়। অমল থেকে অমলা।

তুমি খুব ভোগো নাকি?

ভুগি। আমার তো অ্যাজমা আছে, ব্রঙ্কাইটিসও। টনসিল সেই ছেলেবেলা থেকে খারাপ, দু'বার অপারেশন হয়েছে। আরও দু'-একটা আছে, সে-সব আপনার শুনে কাজ নেই।

শুনে সিন্ধুর একটু মনখারাপ হয়ে গেল। এ-কথা ঠিকই যে বুকুন বারোমেসে রুগি। শীতকালে প্রায়দিনই হাঁফ-এর টান উঠত বলে বিছানা নিত। একটু বেশি স্নান করে ফেললেই সর্দি আর প্রবল কাশি, গলায় কম্ফর্টার আর পায়ে মোজা পরে থাকতে হত। মেয়েলি রোগ ছিল বোধ হয় কয়েকটা। যে-মেয়েটাকে সিন্ধু নিজস্ব বলে চিহ্নিত করেছিল সেই হল কপালের দোষে এইরকম।

তাই সিন্ধু ভাবে, এত মেয়ে দুনিয়ায় থাকতে তার কেন মরতে বুকুনের সঙ্গেই ভাব হল!

সিন্ধু পরদিন তার হোস্টেলে ফিরে গেল। পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে সে আবার ক্লাস করতে শুরু করল। কিন্তু তখন সিন্ধুর মধ্যে একটুখানি কী যেন পালটে গেছে। এমনিতে খুব আড্ডাবাজ বলে সে

ছুটিছাটায় শিলিগুড়িতে বড় একটা আসত না। কিন্তু বুকুনের সঙ্গে ভাব হওয়ার পর তার শিলিগুড়ির ওপর একটা আলাদা টান জন্মায়। প্রায় শনিবারই সে শিলিগুড়ি রোডে লরি থামিয়ে অল্প পয়সায় চলে আসত শিলিগুড়ি। তেরাস্তার মোড় থেকে ব্যাগ কাঁধে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসত মনোজদের বাড়ি। মনোজ থাক বা না-থাক, টুকুন পাড়া বেড়াতে যাক বা না-যাক, বুকুন ঠিক অপেক্ষা করে থাকত। এমন নয় যে বুকুনের সঙ্গে অনেক কথা তার। বরং সে এলে বাড়ির অন্য লোকই তার সঙ্গে কথাবার্তা বলত। বুকুন এসে চা দিয়ে যেত, ডিমভাজা বা চিঁড়েভাজা যা হোক একটা খাবারও দিত সঙ্গে। দূর থেকে চেয়ে দেখত সিন্ধুর দিকে। সেই চোখের দৃষ্টি ছিল অদ্ভুত উদ্দীপ্ত আনন্দে ভরা। সে বুঝতে পারত প্রায় শনিবারই যে সিন্ধু আসে, তা আসে তার জন্যই। একটু রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে সিন্ধু বাড়িতে চলে যেত। আবার আসত রবিবার সকালে। আবার সেই লঘু দেখা হওয়া। জলপাইগুড়িতে ফিরে যেতে হত রবিবার বিকেলেই।

এইভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই রুগ্ণ মেয়েটার সঙ্গে শক্ত-সমর্থ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সিন্ধুর কী করে যে সম্পর্ক হল তা ভগবান জানেন। কিন্তু হল। দু'খানা মস্ত চোখ আর সুকুমার মুখশ্রী ছাড়া বুকুনের মেয়েমানুষের যৌবনোচিত শরীর বলতে তেমন কিছু নেই। আর সেই মুখশ্রী আর চোখের দৃষ্টি দিয়েই সিন্ধুর বুকের মধ্যে একটা কোমল বঁড়শি সে গেঁথে দিতে পেরেছিল। কিন্তু বুকুনের শরীর প্রায়ই ভাল যায় না। সারা বছর মুড়িমুড়কির মতো ট্যাবলেট খেয়ে বেঁচে ছিল।

যে বছর সিন্ধু এল.এম.ই. ফাইনাল দিয়ে পাকাপাকিভাবে চলে এল শিলিগুড়ি। চাকরির তখন বড় আকাল। প্রথম কয়েক ব্যাচের এল.এম.ই-র ছাত্ররা মোটামুটি ভদ্রগোছের চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বহু পলিটেকনিক থেকে প্রতি বছর ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্র বেরোচ্ছে, অত ছেলেকে চাকরি দেবে কে? সিন্ধু প্রথম দিকে খুব দরখাস্ত পাঠাত এখানে-সেখানে, রাজ্যের রেফারেন্স আর সার্টিফিকেট জোগাড় করা ছিল। ইচ্ছে ছিল চাকরি পেলে সে বুকুনকেই বিয়ে করবে, আর বিয়ে করেই খুব ভাল করে একটা থরো ট্রিটমেন্ট করাবে তার, আর খুব ভালবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে সুস্থ করে তুলবে।

চাকরিই পেল না সিন্ধু। না, কথাটা ঠিক হল না। মাদ্রাজে একটা পেয়েছিল। গেল না। অত দূর যাবে বুড়োবুড়ি মা-বাবাকে ছেড়ে! আর রোগা বুকুনও বুকভাঙা কান্না কেঁদেছিল যে। এইসব মেয়েমানুষি সেন্টিমেন্ট দেখলে সিন্ধু বড় বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মন বড্ড নরম। তাই শিলিগুড়িতে সে ঠিকাদারির ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসা ভাল চলে না। সিন্ধু হাল ছাড়ে না কখনও! তার দায়দায়িত্ব বেশি নয়। বাবার পেনশনে সংসারটা টেনেটুনে চলে যায়, তার হাতখরচটা উঠে আসে ব্যবসা থেকে। বাড়িটা নিজেদের বলে নিরাশ্রয় হওয়ার ভাবনা নেই। তবু জীবনটা তো শুধু কোনও রকমে বেঁচে থাকা নয়। কত স্বপ্ন দেখে সিন্ধু। আর স্বপ্নভঙ্গের নৈরাশ্য থেকে তার শরীরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। মনটা ধূসরতার রঙে ভরা। বুকুনও নিজের শরীরের বৈরিতায় বন্দি হয়ে থাকে ঘরে। সিন্ধুর জীবনে সেও পারেনি তার হৃদয় ঢেলে দিতে। শুধু বড় বড় চোখে সিন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে।

এই তো কিছু দিন আগে বড় বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুকুনের। ক'বছর ধরেই কথা হচ্ছে এক বার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে বড় ডাক্তার দেখানো হবে, এবং দরকার হলে ট্রপিক্যাল বা কোনও নার্সিং-হোমে রাখা হবে কিছুকাল। হবে-হবে করে হচ্ছিল না। এইবার সত্যিই হল। আসবার সময়ে বুকুন বার বার সিন্ধুকে বলেছে, এই যে যাচ্ছি, আর ফিরব না দেখো।

কেন, তোমার তো তেমন কিছু অসুখ নয়! অত ভাবছ কেন?

আমার অসুখ কী তা আমিই জানি।

আমিও জানি!

বলো তো আমার কী অসুখ?

তোমার অসুখের নাম সিন্ধু চ্যাটার্জি।

খুব হেসেছে বুকুন। বলেছে, মাগো! তুমি যা মজা করো না! কিন্তু তুমি কেন আমার অসুখ হতে যাবে? আমার যখন খুব শরীর খারাপ থাকে তখন তোমাকে দেখলেই আমার অসুখ অর্ধেক যেন কমে যায়। সত্যি বলছি।

বোকা মেয়ে। ওইসব কথা বলত বলে সিন্ধুর বড় বেশি মায়া। প্রেম বা ভালবাসা কীরকম তা তো জানে না সিন্ধু। টুকুনের প্রতি যেমন আলটপকা এক বার আকর্ষণ জন্মেছিল সিন্ধুর, কিংবা সুন্দরী মেয়ে

দেখলে যেমন শরীর-গন্ধে মন নেচে ওঠে, বুকুনকে দেখলে তেমন হয় না, বরং খুব একটা মায়া হয়, মনটা 'আহা' বলে ওঠে।

সিন্ধুকে একা রেখে বুকুন চলে এল কলকাতায়। তার পর থেকেই সিন্ধুর মনটা বড় আনচান করে। বার বার মনে হয়যাই, গিয়ে বুকুনকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে আসি।

একটা টেন্ডার দেওয়ার দরকার পড়ল, সাপ্লাইয়ের জন্য কিছু ভাল কোম্পানির রংও কিনতে হবে, পি ডবলিউ ডি-র রেজিস্ট্রেশনটার জন্যও একটু চেষ্টা করা দরকার—এ-রকম কয়েকটা কারণই জুটে গেল কলকাতায় আসার। নইলে বাস্তববাদী সিন্ধু এককাঁড়ি গাড়ি-ভাড়া দিয়ে কলকাতায় আসত না। কলকাতা এমনিতে ভালও লাগে না তার। বড় ভিড়। বড্ড বেশি গাড়ি-ঘোড়া, আর কী ভয়ংকর গোলমালের শব্দ চার দিকে। শিলিগুড়ির নিরিবিলি শান্ত-শ্লথ জীবন থেকে এখানে এলে হঠাৎ যেন বড় দিশেহারা আর বোকা লাগে নিজেকে। দু'দিনেই হাঁফ ধরে যায়। কী করে যে তার দাদা কবি সাগর এ-রকম একটা হিজিবিজি শহরের প্রেমে পড়ে গেল কে জানে!

যেদিন এল সিন্ধু তার পরদিন বিকেলে সে একা বেরিয়ে পড়ল। শরৎকালের বিকেল, আলো মরে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। বেরোনোর সময়ে কমলা বার বার বলছিল, এখন বেরোচ্ছিস, ফিরতে তোর রাত হয়ে যাবে দেখিস। আজ না হয় না গেলি!

সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে, না, তাড়াতাড়ি কাজগুলো সেরে নিই। বেশি দিন থাকা যাবে না।

কমলা বলে, কাজ তো অফিসের কাজ! এই বিকেলে কোন অফিসটায় যাবি শুনি?

সিন্ধু হেসে বলে, এই রকম করে রোজ যদি আটকাও তো এ-যাত্রা খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে।

যাবিই, তা হলে তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর দাদা রাজ্যের চিনে খাবার এনে বসে থাকবে।

ফিরব।

বালি স্টেশন থেকে গাড়ি ধরে হাওড়া আসতে খুব বেশি ধকল পেল না। কেবল এক মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে স্টেশনে আসাটা যা একটু কষ্টের। কিন্তু হাওড়ায় এসে সেই গোলমেলে অব্যবস্থা চার দিকে। কোথায়, কোন দিকে যে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাস পাওয়া যাবে কে জানে! এত লোকের উলটোপালটা স্রোতে দম আটকে আসে।

বহুকষ্টে সে একটা পনেরো নম্বর বাস ধরল। বাড়ির নম্বর টুকে এনেছে, বুকুন আছে তার এক মাসির বাড়িতে। কিন্তু কোথায় নামলে বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না, কোনও গলিঘুঁজিতে ঢুকতে হবে কি না এ-সব কিছুই সে জানে না! কাঠ হয়ে বাসের মধ্যে বসে রইল।

কন্ডাক্টরকে বলে রেখেছিল দীনেন্দ্র স্ট্রিট এলে যেন বলে দেয়। তবু সংশয়ে হাওড়া ব্রিজ পেরোতেই কয়েক বার সিট ছেড়ে উঠবার উপক্রম করল সে। পাশের ভদ্রলোক বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন?

সিন্ধু বলে, দীনেন্দ্র স্ট্রিটে।

সে এখনও দেরি আছে। আমি বলে দেব।

তবু সন্দেহ যায় না। যা গোলোকধাঁধা শহর। তার ওপর এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। গনফটটার ঘুমের বায়নার জন্য এটা হল।

দীনেন্দ্র স্ট্রিটে নেমে সে নম্বর খুঁজতে থাকে। অনেক হাঁটা অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর বড় রাস্তা থেকে একটু গলির মধ্যে ধোঁয়াটে অন্ধকারে বাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেল। গলির মুখেই একটা মস্ত দোকানে এক কড়াই দুধ জ্বাল হচ্ছে। সিন্ধুর খিদে পেয়েছিল, এক ভাঁড় দুধ কিনে চায়ের মতো চুমুক দিয়ে দিয়ে খেল। দুধ তার ভাল লাগে না, কিন্তু পেটটায় একটা চিনচিনে ব্যথা উঠছে। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছে যেন কখনও খালি পেটে না থাকে, আর প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর কিছু খেতেই হবে। সে অবশ্য খায় না, অনিয়ম করে। কিন্তু এখন পেটের ব্যথাটা উঠতেই এক কড়াই দুধ দেখে সামলাতে পারল না। তা ছাড়া দুধওলা পশ্চিমা লোকটাই বাড়ির হদিস দিয়ে দিল তাকে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলা। বন্ধ দরজা। সিন্ধু ভয়ে ভয়ে কড়া নাড়ে। যদি এ-বাড়ি না হয়? যদি চোর বলে তাকে পুলিশে দেয়? কলকাতা বড় ভয়ংকর শহর, কেউ কারও আপন নয়।

দরজা খুলে একটি শাড়ি-পরা মেয়ে মুখ বার করল। মুখে একটা স্বভাবজাত হাসি। বেশ স্বাস্থ্য তার। লম্বার ওপর চাবুক চেহারা। মুখশ্রীর মধ্যে ব্রনহীন অল্প বয়সের লাবণ্য। লম্বা চুলের মস্ত বেণিটা বাঁ বুকের ওপর ঝুলছে। সেই বেণিটারই শেষটুকুতে রিবন বাঁধছিল।

সিন্ধু বলল, আমি শিলিগুড়ি থেকে এসেছি, মনোজের বন্ধু। ওর বোনের সঙ্গে দেখা করে যাব।

বুকুনদি?

হ্যাঁ।

মেয়েটি যেন একটু বিব্রত হয়ে হঠাৎ বলল, আচ্ছা ক'টা বাজে বলুন তো!

সিন্ধু ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে ছয়।

এঃ! তা হলে তো সময় নেই। আমরা আজ সিনেমায় যাচ্ছি। তবু আসুন ডেকে দিচ্ছি।

খুব অপ্রস্তুত লাগছিল সিন্ধুর। অসময়ে এসে পড়েছে সে। কিন্তু সে তো জানত না যে ওরা সিনেমায় যাবে!

সামনের ঘরটা বড্ড ছোট। তার মধ্যে গাদাগাদি একটা খাটের বিছানা, দু'টো বহু পুরনো গদিআঁটা চেয়ার, টেবিল, বুক কেস, মেহগিনি কাঠের আলনা— সব রয়েছে। একটা মস্ত আলমারিও। মনে হয় এরা বহু বছর ধরে এ-বাড়িতে আছে। কয়েক পুরুষ ধরে। আর এ-সব জিনিসও পুরুষানুক্রমের পুরনো। বুকুন আসবে। বহু দিন বাদে বুকুনকে দেখবে সিন্ধু। বুকটার মধ্যে একটু এলোমেলো হাওয়া পাক খেল।

সেই সুন্দর মেয়েটা ভিতরে চলে গিয়ে একটু বাদে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। খাটের ওপর থেকে দু'টো ফেলে-রাখা সেফটিপিন খুঁজে নিয়ে চলে যাচ্ছে। শাড়িতে গা ঢাকা। তবু পাতলা শাড়ির ভিতর দিয়ে দেখতে পেল সিন্ধু, মেয়েটার পিঠের দিকে ব্লাউজ হাঁ হয়ে আছে, ব্রেসিয়ারের সাদা স্ট্র্যাপ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার শরীরের গঠন অদ্ভুত সুন্দর। গায়ে এক বিন্দু বাড়তি চর্বি নেই। কোমর সরু, অন্যান্য জায়গা চমৎকার সুডৌল, উন্নত। গায়ের ত্বক মসৃণ চিক্কণ। তাকিয়ে দেখলে বেশ ভাল লাগে।

বহুকালের পুরনো আসবাবে সাজানো পুরনো ঘরটায় বসে সিন্ধু নানা কথা ভাবে। এরা সিনেমায় যাচ্ছে, বড় অসময়ে এসে পড়েছে সে। লজ্জাও করছে একটু একটু। বুকুন ছাড়া এ-বাড়িতে সে কাউকে চেনে না। আর বুকুনের সঙ্গেও তো তার সম্পর্কটা অন্য রকম। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না তো? এই মেয়েটা কে? বুকুনের মাসতুতো বোন কি? ভারী সুন্দর দেখতে তো।

ভিতরের ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসে। স্পষ্ট নয়। কারণ পরদার আড়ালে দরজা ভেজানো রয়েছে। তবু সিন্ধু শুনতে পায়, উচ্চকণ্ঠে কে একটা মেয়ে বলল, যাও না বুকুন, তাড়াতাড়ি দেখা করে এসো, বেশি কিন্তু সময় নেই। গল্প করতে বসে যেয়ো না আবার, ভদ্রলোককে বিদেয় করে চলে এসো।

আর একটা মেয়ে বলল, কে গো বুকুনদি?

এবার বুকুনের গলা শোনা গেল, সে দরজার কাছ থেকেই বোধ হয় মৃদুকণ্ঠে বলল, শিলিগুড়ির ছেলে, দাদার বন্ধু।

এই বলতে বলতে বুকুন ঘরে এল।

এ-ঘরে জোরালো আলো নেই। একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে। এ-বালবটাও বোধ হয় খুবই পুরনো। আলোর মধ্যে মাকড়সার জালের মতো আঁকিবুকি। সেই আলোতে যেটুকু বুকুনকে দেখা গেল তাতে চমকে উঠল সিন্ধু। একেই বুঝি রূপান্তর বলে! যেন গুটিপোকা থেকে মথ বেরিয়ে এসেছে। না, এতটা নয় ঠিকই। এ যে বুকুন তা চেনা যাচ্ছে, কিন্তু সেই রোগা রুগ্‌ণ ভাসা-ভাসা-চোখের বুকুন তো এ নয়! অল্প ক'-দিনেই কলকাতার জল আর গঙ্গার হাওয়ায় একটা বুকুন দু'টো বুকুনের সমান মোটাসোটা হয়েছে। অসম্ভব সেজেছেও। সিনেমায় যেতে হলে অত সাজে মেয়েরা? পুরনো কিন্তু ভীষণ দামি খয়েরি রঙের একটা বেনারসি পরেছে, শাড়িটার সর্বাঙ্গে এক বিঘত বড় বড় জরির কলকা আর বুটি। এত বেশি জরি যে জমি প্রায় দেখাই যায় না। বুকুনের চোখে লেপটানো কাজল, মস্ত ভুয়ো খোঁপা, গলায় বকলসের মতো সেঁটে আছে সোনার চৌখুপিওলা চিক। ভ্রূ নিশ্চিত প্লাক করেছে, নইলে ওর ভ্রূ তো অত সরু আর টানা-টানা ছিল না? বাঁ কবজিতে ঘড়ি, নখে ন্যাচারাল কালারের পালিশ।

সিন্ধু এত অবাক হয়েছিল যে কথা বলতে পারল না।

বুকুন একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল, কবে আসা হল?

ভাববাচ্যে কথা। 'তুমি'ও না 'আপনি'ও না। সিন্ধুও একটু সতর্ক হয়ে বলল, এই তো কাল।

আমি কিন্তু এর মধ্যেই একটু মোটা হয়েছি, না?

একটু? সিন্ধু মাথা নেড়ে বলে, আয়না দেখ না?

ঘরের মধ্যে আরও কয়েক পা এগিয়ে এল বুকুন, খাটের কানা ধরে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, ক'দিন থাকা হবে?

ঠিক নেই। সিন্ধু বলল, কাজে এসেছি, কাজ মিটলেই ফিরে যাব। তোমার অসুখের কী হল?

হচ্ছে। তবে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়নি।

একটা অপারেশন হওয়ারও কথা ছিল না?

বুকুন অত সাজগোজে আড়ষ্ট হয়ে আছে, না সিন্ধুকে লজ্জা পাচ্ছে এত দিন পরে দেখে তা বোঝা গেল না। কিন্তু খুব কাঠ হয়ে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে এক ধরনের নিস্পৃহ গলায় বলল, দরকার হয়নি। ওরাল ট্রিটমেন্টেই কাজ হয়েছে। সামনের মাসে মাসিদের সঙ্গে চুনার যাব।

সিন্ধু যেন শুনে খুশি হল না। খবরটা তো ভালই। বুকুনের অপারেশন হবে না, শরীর সেরে যাচ্ছে, এ-সব তো ভাল খবরই। তবু যেন মনে ভয় আসে, যে-বুকুনকে সে নিজের সম্পত্তি মনে করত সে বুঝি এ নয়। এ-বুকুনকে সে কি ও-রকম নিজের মেয়েমানুষ বলে বোধ করতে পারে!

সিনেমায় যাচ্ছ? সিন্ধু বলল।

হ্যাঁ। এমন সময়ে তুমি এলে—

তাতে কী? দেখে গেলাম, শিলিগুড়ি গিয়ে বলব।

রোজ সিনেমা আর থিয়েটার! একটু ভ্রূ কুঁচকে বুকুন বলল, যেন বা তার এত ফুর্তি ভাল লাগে না।

বেশ মজায় আছো তা হলে।

মজা মনে করলে মজা।

তোমার ভাল লাগে না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বুকুন হঠাৎ বলে, টুকুনের সঙ্গে দেখা হয় বুঝি রোজ?

সিন্ধু হেসে ফেলল। খুব ছেলেমানুষ ছাড়া এভাবে কেউ জিজ্ঞেস করে?

সিন্ধু বানিয়ে বলল, হয়।

বলে সিন্ধু উঠল। বলল, আজ তো সিনেমায় যাচ্ছ, দেরি করিয়ে দিয়ে গেলাম।

আবার কবে আসবে?

এ-যাত্রায় বোধ হয় আর নয়। সময় হবে না। তুমি কি শিলিগুড়ি ফিরবে শিগগির?

বুকুনের মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল। বড় লাজুক অপ্রতিভ মেয়ে। মাথা নত করে বলল, এখান থেকে ফিরতে দিচ্ছে না কেউ। কথা চলছে, আমার বিয়ে ঠিক করে এখান থেকেই বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে।

সিন্ধুর বুক চমকে উঠল। সে এ-দিকটা কখনও ভাবেনি, কিন্তু ভাবা উচিত ছিল না কি!

মুখে জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে সে বলল, ভালই তো। বাঃ, বেশ! সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে?

বুকুন একঝলক তাকাল, বলল, হচ্ছে। শোনো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক জরুরি কথা আছে। পরশু বিকেলে এক বার আসবে?

কী কথা বুকুন?

সে-কথা বলার সময় তো এখন নেই। পরশু আসবে?

উদাস হয়ে সিন্ধু বলে, দেখি।

আজ চা-ও খেয়ে গেলে না!

পরশু যদি সময় হয় তো আসব। তখন চা খেয়ে যাব। কিন্তু যদি আসতে না পারি, তবে ধরে নিয়ো আর দেখা হল না।

না, ও-সব বুঝব না। আসতে হবেই। খুব জরুরি কথা।

সিন্ধু অন্যমনস্কভাবে একটা 'হুঁ' দিয়ে বেরিয়ে এল। রাস্তায় এসেও অনেকক্ষণ ঘোর-ঘোর লাগছিল

তার। এত অন্যমনস্ক যে চারপাশে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না। তার মন থেকে একটা কুয়াশা উঠে চারপাশ ঘিরে রেখেছে। এত যে বুকুনকে নিজের বলে ভেবেছিল সিন্ধু, সেটা যে সত্যি নয় তা যেন বিশ্বাস হয় না। প্রেম কিংবা ভালবাসা কী রকম সিন্ধু তা জানে না। সে জানে কেউ কারও জন্য হয়তো জন্মায়। যেমন বুকুন। বুকুনের সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল সে।

আবার সিন্ধু ভাবল, রোগাভোগা ছিল বলেই বুঝি বুকুনকে খুব সহজলভ্য ভেবেছিল সে। এখন বুকুন কেমন সুন্দর হয়েছে, বিশ্বাস হতে চায় না বুকুন বলে। এখন এই সুন্দর বুকুনের জন্য সিন্ধুর চেয়ে ঢের যোগ্য ছেলে জুটে যাবে।

লড়াইটা কি বোকার মতো হেরে গেল সিন্ধু?

॥ আট ॥

সাগর তার পোর্টম্যান্টো পাশে রেখে ট্যাক্সির পিছনের সিটে ঘাড় এলিয়ে বসে ছিল। চোখ বোজা। খুব ক্লান্ত লাগে আজকাল। যেন অনেক অনেক পথ হাঁটা হয়েছে। বহু দূর এসে পড়েছে সে। এবার কখন হয়তো ফিরতে হবে।

কোথায় ফিরবে সাগর?

জবাবটা বড় অস্পষ্ট। ঠিক বুঝতে পারে না। তবু ক্ষীণ মনে হয়, বড় দীর্ঘ পথ চলে এসেছে বিপথে, এবার ফিরতে হবে। ফেরা দরকার।

ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে ওয়েলিংটনে এসে পড়তেই সাগর ট্যাক্সি ডাইনে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে ঢোকাল। একটু এগিয়েই থামে। এখানে খালাসিটোলায় পার্থ রায়, অবনী চৌধুরীরা আড্ডা মারত। এখনও কি আসে ওরা? মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে আসত সাগর। এক গেলাসের ওই সব ইয়ার-দোস্তরা ছিল তার কবিবন্ধু। কী বিপুল কবিতার স্বপ্ন তারা এক দিন দেখেছিল। সাগর জানে, পার্থর তিনটে কবিতার বই বেরিয়েছে। অবনীর বোধ হয় পাঁচটা। অবনী খুব গভীর কবিতা লিখত। সাগরের সবচেয়ে প্রিয় সমকালীন কবি অবনী এখন ভয়ংকর নাম করে ফেলেছে। বিখ্যাত কবি, বিখ্যাত মাতাল। অনেক দিন দেখা হয়নি। বছরখানেক আগে এক বার এসে দেড়শো টাকা ধার নিয়ে চলে গিয়েছিল সাগরের অফিস থেকে, আর আসেনি।

দুপুরে খালাসিটোলায় ভিড়ভাট্টা কম। মস্ত ঘরটায় কিছু নিঝুম ধ্যানমগ্ন লোক বসে আছে। তারা অধিকাংশই বয়স্ক মানুষ। নিম্নশ্রেণীর। কাউন্টারের কাছে দু'জন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে সাগর চেনে। তুলু সেন। তুলু একসময়ে ভাল ছবি আঁকত। এখন একটা মস্ত কোম্পানির আর্ট ডিরেক্টর। অল্প বয়সে অসম্ভব উন্নতি করেছে।

তুলু সাগরকে চিনল। মাথা নেড়ে বলল, কী খবর?

খুবই আলগা প্রশ্ন। কোনও আন্তরিকতা নেই।

সাগর বলল, ভাল।

নগদ পাঁচ হাজার টাকার গর্ভবতী পোর্টম্যান্টোটা কাউন্টারে রেখে সাগর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটা একনম্বরি বোতল কিনল! মনটা আজ একদম ভাল নেই। কোথায় যেন ফিরতে হবে। কত দূর যেন যাওয়ার আছে। দীর্ঘ খোয়াই...তারপর ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী...রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো পার হয়ে যাই এক স্বপ্নের উদ্যানে।

সাগর গেলাসটা রাখল। এক গেলাস অল্প সোডা মেশানো তীব্র দিশি মদ তার ভেতরে হাঁচোর-পাঁচোড় করছে। মাথাটা চাঁই করে পাক মারল। উত্তেজনাবশে সে বড় তাড়াতাড়ি পান করেছে। আরও একটু সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে খাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি খাওয়ার দরুন শরীরে ও মাথায় যে ঘুলিয়ে-ওঠা ভাব সেই মন্থনে একটা লাইন চলে এল। পার হয়ে যাই এক স্বপ্নের উদ্যানে! লাইনটা ভাল না যাচ্ছেতাই তা এ-অবস্থায় বুঝতে পারল না সাগর। কিন্তু লিখে ফেলতে হবে। নইলে যদি নেশা কাটলে লাইনটাও হারিয়ে যায়!

পোর্টম্যান্টো খুলে সাগর তার নোটবই আর ডটপেন বার করতে গিয়ে পাঁচহাজারি প্যাকেটটা দেখতে পেল। ফালতু পাঁচ হাজার। এক পয়সার পরিশ্রম নেই, ট্যাক্স নেই, ঝুঁকি নেই। মজুমদার বলেছিল 'ভালচারস'। কথাটা এখনও সাগরের মধ্যে বিঁধে আছে।

মাথাটা টাল খাচ্ছে। তবু সাগর কাউন্টারে নোটবই রেখে লাইনটা লিখে ফেলল। একটু আঁকাবাঁকা আর ঢেউ-ঢেউ হল লেখাটা। হাতটা কেঁপে যাচ্ছে।

তুলু এগিয়ে এসে বলল, ইন্দ্রাণীর খবর জানেন?

অন্যমনস্ক সাগর মুখ তুলে বলল, কে ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্রাণী ঘোষাল। আপনার ফ্যান ছিল, মনে নেই?

সাগরের মনে পড়ল বটে, কিন্তু ভারী অবাকও হল সে। ইন্দ্রাণী বার তিনেক বিয়ে করেছিল, কোনও বারই বিয়ে টেঁকেনি। কিন্তু বিস্ময়কর হল, ইন্দ্রাণী প্রথমবার বিয়ে করেছিল এই তুলুকেই।

হতভম্ব ভাবটা সামলে সাগর বলে, কী হয়েছে ইন্দ্রাণীর?

তুলু খুব জোরে একটা 'হাঃ' শব্দ করে কাউন্টারে ভর দিয়ে একটু হেসে বলে, স্যাড! দিন দুই আগে ঘুমের বড়ি খেয়েছিল, হাসপাতালে পড়ে আছে এখনও। ডিপ কোমা, আশা নেই।

সাগর আবার অনেকটা দিশি গেলাসে ঢেলে অল্প একটু সোডা মিশিয়ে খেতে যাচ্ছিল। তুলু বলল, অতটা কনসেন্ট্রেটেড খাবেন না। আর-একটু ডাইলিউট করুন। দূর থেকে দেখছিলাম, খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছেন। কী হয়েছে?

আমি এ-রকমই খাই।

বলে সাগর দু'টো বড় চুমুক মারল। আর-একটা গেলাস চেয়ে নিয়ে তুলুর দিকে বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খান!

তুলু ঢেলে নিয়ে মেশানো শেষ করে গেলাস তুলে বলে, চিয়ার্স!

চিয়ার্স! বলে সাগর।

পরমুহূর্তেই মনে হয়, চিয়ার্স! চিয়ার্স মানে কী? চিয়ার্স কেন? এই এখন ইন্দ্রাণীর খবর শুনবার পর আনন্দিত হওয়ার কিছুই তো নেই। মদ্যপান করার সময়ে সহপায়ীকে চিয়ার্স বলার যে বিদেশি রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে সেটাকে কুসংস্কার বলা যায় না কি ? আর এই যে লোকটা তার সঙ্গে মদ খাচ্ছে এর তো আনন্দিত হওয়ার কোনও কারণই নেই। শত হলেও ইন্দ্রাণী একসময়ে এর বউ ছিল। তারপর ছেড়ে গিয়ে পর্যায়ক্রমে আরও দু'জনকে বিয়ে করেছিল ঠিকই, তবু তো বিবাহের কিছু স্মৃতি, কিছু বিষণ্ণতা থাকবে।

তুলুর মুখে কিছুই লেখা নেই। না হর্ষ, না বিষাদ, না কোনও ভাবের প্রকাশ। তুলু বড় বেশি মদ খায়, জানে সাগর। এত বেশি মদ খায় বলে ওর মুখে কি একটা ভ্যাবলা ভাব! না কি ওর বোধ-বুদ্ধি কম? এই কথা মনে হতেই সাগর নিজের মুখটাও মনে করার চেষ্টা করে। তার মুখও কি ওই তুলুর মতোই বোধ ও বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে? সেও তো খুব মদ্যপান করে। আজকাল বড় বেশি খায়। মনটা ভাল লাগে না।

সাগর বলল, ইন্দ্রাণীর কথা একটু বলবেন?

তুলু গালে হাত রেখে বসেছিল, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে গেছে একটু। অন্যমনস্কভাবে চেয়ে ছিল, বলল, ওর তো এ-রকমই কিছু হওয়ার কথা ছিল, আমি বরাবরই এ-রকম কিছু এক্সপেক্ট করতাম। শেষ পর্যন্ত বাদল ঘোষকে বিয়ে করেছিল। কোম্পানি ডিরেক্টর, চেনেন নাকি?

চেনে সাগর। অর্ডারের জন্য মাঝে মাঝে গেছে। খুব স্মার্ট চেহারার লোক বাদল। কিন্তু ওই বুদ্ধিমান চেহারার ভিতরে বরাবরই একটা পিছল শয়তানি চাপা আছে, এটা ওর চোখ দেখলেই টের পাওয়া যেত। সাগর মাথা নাড়ল।

তুলু বলে, বাদলকে বিয়ে করার পরও আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ওদের বাসায় এই সেদিনও গিয়ে ড্রিঙ্ক করেছি। ইন্দ্রাণী অনেক ঠাট্টা করল পুরনো সব কথা নিয়ে। বাদলকে খুব স্পোর্টিং লাগছিল।

সাগরের মাথাটা ভাল লাগছিল না। সে যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না তুলুর কথা। বলল, ইন্দ্রাণীর কাছে যেতেন?

যাব না কেন?

ঠিকই তো। যাবে না কেন? সাগর ভাবল, সে বুঝি বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে। মাথাটা ঝাঁকাল। তারপর খুব ক্ষীণ শুকনো গলায় বলল, আজ উঠে পড়ি।

আর-একটু খান। আমি একটা বোতল নিচ্ছি।

না, আর নয়। কাজ আছে।

আমারও অফিসে ফেরার কথা। কিন্তু আর যাব না। ইন্দ্রাণীর সম্মানে আজকের দিনটা হাফ-ডে নিয়েছি। অনেকক্ষণ ড্রিঙ্ক করব। সিরিয়াস ড্রিঙ্কিং।

তবে কি একটা দুঃখু-টুঃখুও হচ্ছে তুলুর? সারা দিন ড্রিঙ্ক করবে কেন তবে ইন্দ্রাণীর সম্মানে? না কি এ-সবই ওর চরিত্রগত ফেরেব্বাজি। ফেরেববাজ কিছু কম দেখেনি সাগর। তার লাইনে ফেরেববাজ গিজগিজ করছে। তুলু বোধ হয় প্রায়ই সারা দিন ড্রিঙ্ক করার জন্য এ-রকম একটা অছিলা খুঁজে নেয়। তাই ইন্দ্রাণীর সম্মানে ওর ড্রিঙ্ক করাটাকে সাগর তেমন গায়ে মাখতে পারল না।

কিন্তু উঠে চলেও যেতে পারল না সাগর। উঠতে যাবে, মাথাটা ফের এক বার চাঁই করল। বড্ড তাড়াতাড়ি মদটা খেয়েছে সাগর। কাজটা ঠিক হয়নি। না কি স্ট্রোক-ফোকের পূর্বলক্ষণ?

মাথাটা চেপে সে একটু বসে থাকে।

তুলু বোতল নিল। সাগরের বোতলেও একটু ছিল। দু'টো গেলাসে তুলুই সোডা মিশিয়ে মনের মতো করে মদটা তৈরি করে একটা গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলল, চ্যাটার্জি, এই যে অ্যালকোহল জিনিসটা এটা কে আবিষ্কার করেছিল বলুন দেখি? তার জবাব নেই। এ-জিনিসটা না থাকলে কবে দুঃখ চাপা পড়ে মরে যেতাম।

সাগর গেলাসটা তুলে নিয়ে একটু একটু করে খেতে লাগল। সঙ্গে বেশি টাকাকড়ি থাকলে সাগর কখনওই বেশি মদ্যপান করে না। মাতালদের ট্যাঁকের টাকা প্রায়ই হাপিশ হয়ে যায়। কিন্তু এখন তার সে-খেয়াল রইল না। বুকটা খামচে আছে একটা দু'টো তিনটে অস্পষ্ট দুঃখে।

সাগর আরও দশ বছর আগে বেশ নামকরা কবি ছিল। তখন সাগরের ছিল ভাত-কাপড়ের টানাটানি, অভাবের সংসারে কমলা আর সে দু'জনে মিলে-সয়ে-বয়ে থাকত। সেই অভাববোধটা সাগরকে কখনও মলিন করেনি। অহংকারী তরুণ কবি সাগরশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তখন যেখানে যেত সেখানেই অল্প-বেশি সম্মান পেত। অবশ্য কবিতা লিখে তেমন খ্যাতি, দেশজোড়া নাম আর ক'জনের হয়? সাগরেরও তেমন নাম ছিল না, কিন্তু কবিমহলে সে একসময়ে রাজার সম্মান পেয়েছে। তরুণ কবিরা ঈর্ষা করত, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে প্রতি বছরই একদল সাহিত্যপাগল ছেলেমেয়ে আসে—তারা সাগরের দিকে সমীহ-ভরা চোখে চেয়ে দেখত। ইন্দ্রাণী ছিল বাংলার এম-এ-র ছাত্রী। কফি হাউসে ইন্দ্রাণী অনেক প্রেমিক নিয়ে বসে থাকত, মাঝেমধ্যে তার কিছু কিছু ছদ্ম দুঃখে ভরা কবিতা কয়েকটা লিটল ম্যাগাজিনে বেরিয়েও ছিল। ইন্দ্রাণীর প্রেমিকদের মধ্যে একজন ছিল সাগরের চেনা, সে-ই এক দিন ইন্দ্রাণীর কাছে বুঝি ডাঁট নেওয়ার জন্যই সাগরের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়।

বড্ড বেশি চোখা চালাক মেয়ে ইন্দ্রাণী। মেয়েদের অত চালু ভাব সাগরের পছন্দ ছিল না। ঠোঁটকাটা ইন্দ্রাণী যখন-তখন যৌনপ্রসঙ্গ তুলে আলোচনা করত। ছেলেদের সঙ্গে ছিল তার জলের মতো মেলামেশা। তার চেহারাটা ছিল একটু ভারী, ফরসা, বেশ লাবণ্যে ভরা মুখ, আহ্লাদ তার সমস্ত শরীরের পাত্রে উপচে পড়ত, চুল ঈষৎ রুক্ষ, বড় বড় চোখ, চমৎকার দাঁত। বোম্বাইয়ের এক চিত্রতারকার সঙ্গে মুখের আদল ছিল বলে তাকে সবাই গীতাবালি বলে ডাকত। সাগর একনজরেই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল বুঝি। কিন্তু ইন্দ্রাণীর প্রেমে রোজ এত লোক পড়ত যে সাগর সেই প্রেমটা হজম করে যায়। পরিচয় হওয়ার কিছুকাল পরেই সাগর এর-তার মুখে শুনতে পায় ইন্দ্রাণী বলে বেড়াচ্ছে, আমি সাগর চ্যাটার্জির প্রেমিকা!

অবশ্য নিতান্তই প্রতীক অর্থে বলা। সাগরের প্রেমিকা অর্থে তার কবিতার প্রেমিকা। তবু সংবাদ শুনে সাগরের হৃৎপিণ্ড কিছু বেশি রক্ত তুলে ফেলে। ঝাঁ করে ওঠে সর্ব অস্তিত্ব। ও-রকম সুন্দর আর বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে নিজেকে তার প্রেমিকা বলে প্রচার করছে।

উৎসাহভরে ঘটনাটা কমলাকে শুনিয়েছিল সাগর, কিন্তু তার ফল ভাল হয়নি। একটু গ্রাম্য-স্বভাবের

কমলা ঘটনাটার মধ্যে অন্য রকম গন্ধ পেয়ে রাগারাগি করে। সেই রাগের উত্তাপ মরে যেতে-না-যেতেই একটা করুণ ও নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে যায়। ইন্দ্রাণীর মধুচক্রে যারা রোজ বসত তাদের মধ্যে ইদানীং কিছু লোফার ছেলেরও আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তারা রূপসুধা পান করা বা ইন্দ্রাণীর কথামৃত শুনে ঠান্ডা থাকার ছেলে নয়। তাদের মধ্যেই তিনজন এক দিন ঘোর সন্ধেবেলা ইন্দ্রাণীকে ট্যাক্সিতে তুলে জোর করে নিয়ে গিয়ে তিলজলার দিকে কোন ফাঁকা বাড়িতে বলাৎকার করে। দিন দুই আটকেও তাকে রেখেছিল তারা, তারপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পালিয়ে যায়।

ইন্দ্রাণীদের মতো মেয়ের জীবনে যে-কোনও সময়েই এ-রকম ঘটনা ঘটতে পারত। এত দিন যে ঘটেনি সেটাই আশ্চর্য। সেই ঘটনার পর অল্প কিছু দিন নার্সিং হোমে কাটিয়ে ইন্দ্রাণী দিল্লি চলে যায়। কিছুকাল থেকে ফিরে আসে। কফি-হাউসে আসত না, কিন্তু প্রায় সময়েই ধর্মতলার দিকে একটা খুব চালিয়াত বড় রেস্টুরেন্টে বসে কফি বা ওয়াইনের সঙ্গে সিগারেট খেত বলে শোনা গেছে। সেই সময়ে ইন্দ্রাণীকে এক-আধবার দেখেছে সাগর। মুখ খুব রুক্ষ, পুরুষের মতো একটা কঠিন ভাব এসে গেছে চেহারায়।

এক দিন দুপুরবেলা ইন্দ্রাণী কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে বসে ছিল। সঙ্গে যথারীতি কিছু ছেলে। কয়েকটা মেয়েও। হঠাৎ কোত্থেকে তুলু এসে ঢুকল। সোজা ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়ে বলল, কতগুলো ভেড়ার সঙ্গে সবসময়ে বসে থাকতে তোমার লজ্জা করে না? চলো, আজ তোমাকে বাঘ দেখাব।

সবাই হেসে অস্থির। তুলু গ্রাহ্য করল না, ইন্দ্রাণীর হাত চেপে ধরে টেনে তুলে ফেলে বলল, চলো। যেতেই হবে।

এ-রকমধারা পুরুষ হয়তো ইন্দ্রাণীর মতো মেয়েদের বেশ পছন্দ। এদের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক বন্য প্রেমের গন্ধ আছে। তুলু তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির, বিয়ের ফর্মে সই করিয়ে তবে ছাড়ল।

বিয়েটা দু'-তিন বছর টিকেছিল হয়তো বা। পরের খবর সাগরের অত ভাল জানা নেই। তবে সেদিন তুলু যে ইন্দ্রাণীর ভক্তদের কাছে ঈর্ষণীয় হিরো হয়ে উঠেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সেই হিরো এই এখন সাগরকে কাতরভাবে মদ খাওয়াচ্ছে।

একটা আধমাতাল রিকশাওয়ালাকে দিয়ে তুলু বাইরে থেকে এক ঠোঙা ঝালবড়া আর ঘুঘনির চাট আনাল। বলল, খান।

সাগর ছুঁল না। গেলাস ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখে মদের মধ্যে শ্বাস ছেড়ে বলল, ইন্দ্রাণীকে কি আপনি শেষ পর্যন্ত ভালবাসতেন?

তুলু কথাটা বুঝতে পারল বোধ হয়। বলল, অফ কোর্স! ডাইভোর্সের পরে আরও বেশি ভালবাসতাম। তারপর ও যেমন বিয়ে করেছে আবার, আমিও তেমনি করেছি। দ্যাট ডাজনট ম্যাটার।

ঠাট্টার সুরে নয়, খুব আকুলতার সঙ্গেই যেন সাগর জিজ্ঞেস করল, ভালবাসা কাকে বলে, একটু বুঝিয়ে দেবেন?

তুলু ভাবল ঠাট্টা। খুব হাসে সে। বলে, ভালবাসা হল শরীরের ভিতরে একটা কেমিক্যাল সিক্রেশন। হরমোন-টরমোন কিছু একটা হবে, তার সঙ্গে খানিকটা হার্ট-ট্রাবল, উইথ এ মেন্টাল অ্যানরম্যালসি।

ভুল বকছে মাতালটা।

সাগর পোর্টম্যান্টোটা আঁকড়ে ধরে খুব সাবধানে আস্তে উঠে পড়ল। পা টলছে, মাথাটা একপাক চাঁই করে থেমে গেল, তবু টলমল করছে। চোখের দৃষ্টি তেমন স্বচ্ছ নয়। তবু সাগর তুলুকে এক বার 'যাই' বলে বেরিয়ে আসতে পারল।

বিস্তর খেয়েছে সাগর। দুপুরেই এত খাওয়া ঠিক হয়নি। 'বুশ'গুলোর জন্য একটু তাগাদা দিতে যাওয়ার কথা ছিল। সে আজ আর হবে না। চুলোয় যাকগে কাজ। এখন নিজেকে সামলানোই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

কাউন্টারে খানিকটা ভর রেখে, খানিকটা অবলম্বনশূন্য জায়গায় টলে পড়ে যেতে যেতে সাগর বাইরে এল। শরীরটা এ-রকম করছে বটে, কিন্তু সে যে মাতাল হয়নি এখনও তা বুঝতে পারছিল সাগর।

বুদ্ধি এখনও ঘুলিয়ে যায়নি, মাথাটা হালকা হয়ে মত্ততার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি এখনও।

সাগর ট্যাক্সি খুঁজছিল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কষ্টে একটা পেয়ে গেল। আজ আর কোনও কাজ হবে না। কাজ তো নেই কিছু। বাড়ি ফিরে যাবে? কিন্তু বাড়ি গিয়ে হবে কী? এই অবস্থায় ছেলেমেয়ের সামনে যেতে তার রুচি হয় না। মাতাল হলে সে রাত করে ফেরে। তা ছাড়া এখন সিন্ধু আর তার বন্ধু গনপত রয়েছে বাড়িতে। সিন্ধু তার দাদার এ-চেহারাটা দেখেনি কখনও। আজ দেখলে হতভম্ব হয়ে যাবে। সেখানে ফেরা অসম্ভব। কিন্তু এ-অবস্থায় আর কোথাও যাওয়ারও নেই!

ট্যাক্সি নিয়ে সে এল ম্যাঙ্গো লেনে। কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। মজুমদারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার পাওয়ার পর থেকেই মনটা এ-রকম বেচাল হয়ে আছে।

বাইরের ঘরে মদিরা নিজের প্রস্তরমূর্তি হয়ে বসে আছে। এতটা স্থির ও গম্ভীর সে কখনও ছিল না। একটু তাকায়, একটু হাসে। গলার পাথরের মালা দাঁতে কামড়ে তলচোখে চায়—এ-সবই তার অভ্যাসজাত। কাকে কীভাবে রিসিভ করতে হয় তা তার জানা আছে। তাই আজ তার স্থির ও বিষণ্ণ চেহারাটা ও-রকম দেখাল।

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সাগর মদিরাকে অকপট চোখে দেখছিল। নিজের শরীরের ভারসাম্যহীনতার দরুন ঘরের অবলম্বনহীন মেঝে পেরিয়ে সোফার কাছে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল আর মদিরার মুখ থেকে কিছু পড়ে নেওয়ার চেষ্টাও করছিল। না, সে মাতাল নয়। তবু শরীর যখন টাল খাচ্ছে, বোধ-বুদ্ধিও একটু টাল খাচ্ছে। মদিরাকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?

মদিরা তাকিয়ে সাগরকেই দেখছিল। বলল না—আসুন।

সাগরই বরং একটু অস্বস্তির হাসি হেসে জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল, মজুমদার আছে?

মদিরা আরও একটুক্ষণ জবাব না দিয়ে দেখল তাকে। তারপর হঠাৎ মাথাটা একধারে অল্প একটু নেড়ে জানাল, আছে।

খুব একটা নিশ্চিন্ত হল সাগর। মজুমদার আছে এটা যেন এক মস্ত শুভ সংবাদ। অথচ সে জানেও না মজুমদারের কাছে এই আসার মানে কী?

এক পা দু' পা টাল খেয়ে সাগর আবার একটু স্বাভাবিকভাবে পা ফেলতে পারল। সোজা গিয়ে মজুমদারের দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঢুকল ভিতরে। ভিতরে সুন্দর গন্ধ, আধো অন্ধকার, এক শূন্যগর্ভ আভিজাত্য। মজুমদার তার চেয়ারে চিত হয়ে পড়ে আছে, চোখ বোজা।

সাগর বসল।

অনেক দূর চলে এসেছে সাগর, বিপথে। এখন আবার কোথায় যেন ফিরে যেতে হবে।

এ-রকমই সব মনে হয় আজকাল।

সাগর ডাকল, মজুমদার!

মজুমদার ঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল। বসে থেকেও শরীরটা সোজা রাখতে পারছে না।

বলল, অ্যাঁ?

আপনার কী হয়েছে?

কোনও শালা আমাকে স্পেয়ার করে না। সবসময় আমাকে লোকে খাবলাচ্ছে। খাবলে কী হবে বাবা! আমার সব চুলোয় গেছে।

সাগর একটা শ্বাস ফেলে চুপ করে রইল খানিক। তার তেমন নেশা হয়নি। হলেও শরীরে যে-প্রতিক্রিয়া তা মনটাকে কবজা করতে পারেনি। মাথা পরিষ্কার আছে।

সাগর বলল, প্যাক্ট তো আপনিই করেছেন মজুমদার। আমরা তো প্রোপোজ করিনি।

মজুমদার মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করে বলল, সব শালা ভিখিরি। আপনারা সব আউটরাইট বেগারস। আপনাদের কোনও অফিস নেই, ডেকরেশন নেই, স্ট্যাটাস নেই। লোটা-কম্বলওয়ালাদের মতো নাঙ্গা হয়ে ব্যবসা করে বেড়ান। সেইজন্যই আপনাদের কস্টিং অত কম, টেন্ডারে যাচ্ছেতাই লো রেট দিয়ে পেয়ে যান। আই হেট ইউ পিপল। যাদের আত্মমর্যাদা নেই, আভিজাত্য নেই এখন তাদেরই যুগ! আমার এ-রকম ভিখিরি ভাল লাগে না। আই লাইক স্ট্যাটাস, আই লাইক ডেকরেশন। তাই আমি

ভিখিরিদের মতো কম রেট দিতে পারি না। সেটা কি আমার দোষ? তাই আপনাদের মতো ভালচারদের সঙ্গে প্যাক্ট করতে হয়।

সাগর রাগ করতে পারছে না। রাগ আজকাল খুব সহজেই হয় সাগরের। তবু এই ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়া ফোঁপরা লোকটাকে তার ঘেন্না হয় না।

সাগর বলল, আই অ্যাডমিট।

মজুমদার সম্পূর্ণ বেহেড নয়। মদ খাওয়ার দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আজকাল তারও বোধ হয় তেমন নেশা হয় না। শরীর টলে বটে কিন্তু মাথা সাফ থাকে। একটা বোতল আর দু'টো গেলাস বের করে হুইস্কি ঢেলে সাগরকে দিল মজুমদার। নিজেও চোঁ চোঁ করে খেতে লাগল অনন্ত পিপাসায়।

মজুমদার বলল, আপনাদের সেলফ-রেসপেক্ট নেই কেন? আফটার অল ইউ ওয়্যার এ পোয়েট। কবিদের সম্মানবোধ তো খুব টনটনে হয় বলে শুনেছি।

হায়! মজুমদার কেন তার কবিত্বের কথা তোলে! ফড়ে, দালাল, ব্যবসায়ীরা কেন কবিতা শব্দটা উচ্চারণ করে! ওতে কবিতার শুদ্ধতা নষ্ট হয়, সতীত্ব আঘাত পায়। পৃথিবীতে অলিখিত নিয়ম আছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কবিতা আর কারও জন্য নয়। কেবলমাত্র ঈশ্বরের চিহ্নিত কয়েকজন রোগা, জীর্ণ প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, অসফল মানুষই জানে কবিতার গুপ্ত সৌন্দর্য। তার শব্দের সম্মোহন। তবে কেন মজুমদার বার বার কবিতার কথা তোলে?

সাগর বলল, কবিতার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই মজুমদার। আমি যখন ব্যবসা করি তখন পুরো ব্যবসাদার, যখন কবিতা লিখি তখন কবি।

মজুমদার বোধ হয় কেঁদেছিল একটু আগে। ঘরের কম আলোটা চোখে সয়ে যাওয়ার পর সাগর মজুমদারের মুখের খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছে এখন। ফোলা-ফোলা, সজল, লাল, গলাটাও সামান্য বসা।

মজুমদার সাগরের কথা শুনতে পেল বলে মনে হল না। বলল, চার দিকে শেয়াল আর শকুন। একটা মানুষ মরে যাচ্ছে শুনলে সব চার দিকে ঘিরে এসে বসে থাকে আর ঠোঁট চাটে। যখন পুরোটা মরে যাব তখন খুবলে খুবলে খেয়ে নেবে।

সাগরের তবু রাগ হয় না। আশ্চর্য, আজকাল দমকা রাগের বাতাসে সে যেমন প্রায়ই নড়ে ওঠে তেমন হচ্ছে না কেন?

সাগরের বড় সাধ, সে একটা চমৎকার দেশ তৈরি করবে? সেখানে থাকবে কেবল কবি আর শিল্পীরা। ভাত-কাপড়ের আলোচনা সেখানে নিষিদ্ধ, ব্যবসা অচল, কোনও ফড়ে দালাল ব্যবসাদার রাজনীতির লোক সেখানে থাকবে না। যে কবিতার লোক নয় তার সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানে গাছে গাছে কবিতা টাঙাবে সাগর, সেখানকার নদীর স্রোতেও কবিতারই শব্দ বয়ে যাবে। বাতাস এসে বলে যাবে কবিতার নতুন নতুন জন্মের কথা। সেখানে ডাকপিয়ন ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে কবিতার খবর।

নেশাটা কি এতক্ষণে ধরেছে তাকে?

আই হেট পোয়েটস। মজুমদার হঠাৎ বলল।

সাগর বলল, গেট আউট।

তারপরই তার মনে হল, মজুমদারকে সে বেরিয়ে যেতে বলে কোন অধিকারে? এটা তো মজুমদারেরই অফিস, তার নিজের অফিস তো এটা নয় যে বের করে দেবে।

কিন্তু মজুমদার সে-সব কথা খেয়াল না করে থমথমে মুখে বলল, না, আমি বেরোব না। আপনি ইচ্ছে করলে দারোয়ানকে ডাকতে পারেন, কিন্তু আমাকে জোর করে বের না করলে আই ওনট গো।

সাগর টেবিলে একটা চাপড় মেরে বলল, ইউ মাস্ট।

যদিও তখনও সাগর বুঝতে পারছিল যে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কোথায় যেন প্রোটোকলের ভুল হচ্ছে।

মজুমদারেরও সেই ভুল। খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে, ডোন্ট ইনসাল্ট মি চ্যাটার্জি। আমাকে বের করে দিলে আমি কোথায় যাব? সবাই কী ভাববে?

সাগর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেন আই শ্যাল কিক ইউ আউট।

ওঃ নো। বসুন চ্যাটার্জি। কফি খাবেন?

না। ভবিষ্যতে যদি তুমি ফের কবিতার নাম মুখে আনো তবে জুতো মেরে, বলে সাগর বসে পড়ে ফের।

প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছে সাগর এখন। ঝলকে ঝলকে রাগ আসছে। আমাকে যা খুশি বলো, কবিতা নিয়ে ইয়ারকি কেন? হু হ্যাজ গিভেন ইউ দ্য রাইট টু টেল অন পোয়েটস? অ্যাঁ! তা হলে তো ঠেলাওয়ালারাও এর পর জীবনানন্দের সমালোচনা করবে!

মজুমদার ভয় খেয়ে কলিং বেল টেপে। মদিরা খুব আস্তে দরজা খুলে চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়ায়। কথা বলে না।

মজুমদার তার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলে, শোনো মদিরা, চ্যাটার্জি আমাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। বলছে, জুতো মারবে। তুমি লালবাজারে একটা ফোন করো তো!

মদিরা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। সাগর ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে বলে, হ্যাঁ, ফোন করুন। তাদের বলবেন যে মজুমদার মাতাল অবস্থায় কবিতা নিয়ে কথা বলছে। বলছে, ও নাকি কবিদের ঘেন্না করে। টেল দেম, অ্যান্ড দে উইল টেক প্রপার অ্যাকশনস।

মদিরা খুব ক্লান্ত স্বরে বলে, কফি আসছে। আপনারা বরং কিছুক্ষণ চোখ বুজে ঠোঁট বন্ধ করে বসে থাকুন।

মজুমদার অবাক হয়ে বলে, কেন? বসে থাকব কেন? উই ক্যান ডান্স।

সাগরেরও কথাটা পছন্দ হল। হ্যাঁ, কফি আসছে। ততক্ষণ চুপচাপ বসে না থেকে খানিকটা নাচলেও তো হয়। নাচা তো উচিতই। সব মানুষেরই দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ খুব মনের আনন্দে নাচা উচিত।

ভেবেই সাগর উঠতে উঠতে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসে থাকার মানেই হয় না। চলুন একটু নাচি। মদিরা, চলে আসুন। জয়েন আস।

মজুমদারও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, হু উইল গিভ দ্য মিউজিক?

হেভেন উইল সেন্ড দ্য মিউজিক। নাচ শুরু করুন, দেখবেন অন্তরীক্ষ থেকে বাজনার শব্দ আসছে।

এই বলে সাগর নাচ শুরু করতে যায়। মজুমদারও দুই পাক বেহেড নাচ নাচতে চেষ্টা করে। তারপর দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মদিরা স্থিরচোখে দৃশ্যটা দেখে দাঁড়িয়ে। খুব গম্ভীর। সশব্দ একটা শ্বাস ফেলে সে বলল, দেখবেন, মারপিট করবেন না। তা হলে কাচ ভাঙবে।

এই বলে সাবধানে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয় সে।

॥ নয় ॥

গনপত নাটক দেখে বেড়াতেই এসেছে। কাজকর্মে তার বড় গা নেই। সেই দেখে সিন্ধু বলে, তুই বরং নাটকের একটা দল খোল। আজকাল নাটকের ব্যবসাতেও পয়সা আছে।

গনপত রাগ করে বলে, ধ্যুৎ শালা, তুই আর্টের সঙ্গে পয়সা গুলিয়ে ফেলিস, খুব পয়সাখোর হয়েছিস সিন্ধু। আর্ট পেটের জন্য নয় রে!

তবে কীসের জন্য?

মগজ আর হৃদয়ের জন্য। তুই পয়সা-ফয়সা করে চিমড়ে মেরে গেছিস, এ-সব তুই বুঝবি না।

তোর মগজ আছে বলে জানতাম না তো। কখনও টের পাইনি এতকাল কাছাকাছি থেকেও। মগজটা কবে স্মাগল করে আনালি? সিন্ধু বলে।

গনপত হাসে। বলল, গেলি না তো কাল। 'চাকভাঙা মধু' দেখলে তোরও তাক লেগে যাবে। 'তিন পয়সার পালা' আগে তিন বার দেখে গেছি, ফের যাচ্ছি, জবাব নেই।

সিন্ধু একটা শ্বাস ফেলে বলল, তুই নাটক দেখে বেড়াবি, আর আমি এদিকে কেবল এ-অফিসে টেন্ডার সেই অফিসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ঘুরে বেড়াব, খুব চালাকি পেয়েছ মেড়ো ভূত! আজ গলায় গামছা দিয়ে তোকে আমার সঙ্গে দৌড় করাব।

গনপত হাঁ-হাঁ করে উঠে বলে, বলিস কী, আজও আমার টিকিট কাটা আছে। তুই তো জানিস বাবা, আমি কোনও জায়গায় গিয়ে ভাল করে কথা বলতে পারি না, কেউ ইংরিজি বললে ভয়ে ভিরমি খাই। আমাকে এ-সবের মধ্যে রগড়াচ্ছিস কেন? তুই স্মার্ট আছিস, লড়ে যা। আমাকে একটু আর্টের জলে ঘুবে বেড়াতে দে।

সিন্ধু গনপতের মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, গনফট, তোর-কোনও প্রবলেম নেই, না?

সকাল পৌনে আটটা বাজে। এ-সময়টায় গনপতের মেজাজ ভাল থাকে। তবু সে খুব ভয়ে ভয়ে সিন্ধুর মনোভাব আঁচ করার চেষ্টায় তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, হুঁঃ, প্রবলেম তুই কাকে শিখাচ্ছিস? আমার বলে সমুদ্রে শয়ান!

ফের লাথি খাবি শালা। সমুদ্রে শয়ান। ইঃ! টাকার নয়, প্রেমের নয়, কাজকারবারে নয়, তোর কোনও একটা প্রবলেম আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। পেট ভাসিয়ে খাওয়া, পাথরের মতো ঘুমোনো, নাটক দেখা, আর মাঝে মাঝে মেড়ো বাংলায় নাটক লেখার হাস্যকর চেষ্টা— তোর প্রবলেম কী?

আছে বাবা, সে-সব তুমি বুঝবে না।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে দু'জন প্রাতঃকৃত্য সেরেছে। গনপত অবশ্য কিছু আগেই উঠে ব্যায়াম সেরে নিয়েছে। এক্ষুনি চা খেতে ওপরে যাবে। এই অবসরে বসে কথা হচ্ছিল।

ওপর থেকে বাচ্চা ঝিটা এসে বলল, চা কি নীচে দেব?

সিন্ধু মুখ তুলে বলে, দাদা উঠেছে রে?

মেয়েটা হঠাৎ একটু যেন হাসি চেপে বলল, না। তানার উঠতে এখনও দেরি হবে।

সিন্ধু গম্ভীর হয়ে যায়। খানিকটা বুঝতে পারে। কোথায় যেন একটা মস্ত গোলমাল চলছে দাদার। কাল রাতেও দাদা অনেক দেরিতে ফিরেছে। সিন্ধুর মন কাল রাতেও খুব খারাপ ছিল। কেন যে এত বুকুনের কথা মনে পড়ে! ভাবছিল বলে ঘুম আসেনি।

অনেক রাতে একটা রিকশা এসে থামল। রিকশায় বসে দাদা খুব গান গাইছে, শুনেছিল সিন্ধু। মাতাল গলা চিনতে ভুল হয় না। রিকশা থামতে-না-থামতেই গ্রিলের গেট খুলে বউদি গিয়ে দাদাকে ধরল। একটা চাপা ধমক দিয়ে বলল, কী হচ্ছে! সিন্ধু রয়েছে, ভুলে যেয়ো না।

সিন্ধু! বলে দাদা একটু থমকে গিয়েছিল ঠিকই। তারপর বউদির কাঁধে ভর দিয়ে রিকশা থেকে নেমে হঠাৎ বলল, কমলা, কেন তুমি আমার এমন সর্বনাশ করলে?

কী করেছি? আমি তোমার কী করেছি? বলে বউদিও বুঝি কেঁদে ফেলে।

দাদা বউদিকে ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে যখন ওপরে উঠছিল তখন কয়েক বার কাতরতার শব্দ করেছিল। কী গভীর ব্যথাবেদনা থেকে মানুষ ও-রকম শব্দ করে! সিন্ধু লজ্জাবশত উঠে যায়নি দাদার কাছে। কিন্তু যেতে খুব ইচ্ছে করছিল। সিন্ধু বিছানা ছেড়ে উঠে এল জানালার কাছে, তারপর গভীর রাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে।

অনেক রাত পর্যন্ত ওপরে নানা রকম শব্দ হয়েছে। কে যেন আসবাবপত্র টানাটানি করছে। বউদির একটা নাতিউচ্চ চিৎকারও শুনেছিল সে, যেন বউদি বলল, আঃ, ওগুলো পুড়িয়ো না! তারপর একটা কাচভাঙার বিকট শব্দ হয়েছিল, আর অনেক জল গড়ানোর। ওপরে কীরকম নাটক অভিনয় হচ্ছে তা বড় জানতে চাইছিল সে। কিন্তু এ যেন তার পরের বাড়ি। এদের গুহ্য সংসারজীবনের মধ্যে তার প্রবেশ করতে নেই, এ-রকমই মনে হয়েছিল তার। তাই যায়নি।

মন ভাল নেই বুকুনের জন্য, দাদার জন্য।

চল রে গনফট!

বলে সিন্ধু উঠল। গনপতকে নিয়ে উঠে এল ওপরে। বুকটা কাঁপছিল একটু। ওপরে উঠে কী দেখবে কে জানে!

সামনের ঘরটা স্বাভাবিকই আছে। বউদি রান্নাঘর থেকে বলল, তোরা বোস।

বউদির মুখটা একঝলক যা দেখল সিন্ধু তাতে বুঝল, কালকে ঘটনা মুখটায় খুব গভীর ছাপ রেখে

গেছে। রোজই বোধ হয় আজকাল এ-রকম সব ঘটনা ঘটছে। বউদির চেহারায় তাই একটা লাবণ্যহীন রুক্ষ ছাপ পড়েছে।

সিন্ধু যখন বিয়ে করবে তখন বউকে কষ্ট দেবে না। তাদের মধ্যে খুব সুন্দর বোঝাপড়া থাকবে। বউ কে হবে সিন্ধুর!

এই প্রশ্নের একটাই অমোঘ উত্তর আছে। বুকুন। কেন বুকুন তা বোঝা যায় না। কিন্তু এ যেন গতজন্ম থেকে ঠিক হয়ে আছে। এ যেন প্রকৃতির নিয়ম যে বুকুন সিন্ধুর বউ হবে। এ ঠিক বুকুনের সঙ্গে তার প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার নয়। তারা যেন পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হওয়ার জন্যই জন্মেছে। বউয়ের কথা ভাবলেই বুকুন বা বুকুনের কথা ভাবলেই বউ মনে পড়ে।

অথচ তা তো হওয়ার নয়। সিন্ধু যদি উপযুক্ত পাত্র হত তো কথা ছিল না। কিন্তু এখনও সিন্ধুর ব্যবসা দাঁড়াল না। কোনও স্থির আয় নেই। কোনও মাসে দু'হাজার টাকা লাভ হল তো বাকি ছ'মাস বসে থাকা। কোথাও কেউ চাকরি দেওয়ার জন্য বসে নেই। একটা মাঝারি চাকরি পেলেও সে বিয়ের কথা ভাবতে পারত।

ওদিকে মনোজদের বাড়ির লোকেদের উচ্চাশা বলবতী। তারা হেঁজিপেঁজি পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারে না। সেই জন্যই বুকুনের অসুখ সারাতে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। শরীর সারলে কলকাতায় কোনও অতি সুপাত্রের সঙ্গে অনেক খরচ করে তার বিয়ে দেবে তারা। বলতে নেই বুকুনের শরীর সেরেছে। বিয়ের ফুলও ফুটল বুঝি এবার। সিন্ধু কে? সিন্ধুর কথা তারা ভাববে কেন?

খাওয়ার টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে মাথা নত করে বসেছিল, সিন্ধু। আজ বড় অন্যমনস্ক সে। মনটা বড় খারাপ।

জলখাবার খেয়ে গনফট হুশহাস শব্দ করে গরম দুধ খাচ্ছে। সিন্ধু খাবারের প্লেট ছোঁয়নি। .

সিন্ধু বিস্বাদ মুখে চা শেষ করল। অত দামি চা, তবু সে তেমন স্বাদ পেল না। এক বার দু' বার কয়েক বার চেয়ে দেখল, দাদার ঘরের দরজাটা পাথরের মতো বন্ধ হয়ে আছে। বার বারই দরজাটা তার চোখকে টানে। বড় মায়া হয়। এক বার দাদার ঘরে যেতে ইচ্ছে করে।

দুধ খেয়ে গনফট বলল, যাই এক বার খোলা হাওয়ায় চক্কর মেরে আসি। বউদি যাবেন নাকি আজ নাটক দেখতে? আমি তিনটে টিকিট কেটে রেখেছি।

বউদি উঠে আসে, বলে, ওমা, গনপত তো দিব্যি তার জলখাবার খেয়ে ফেলেছে। সিন্ধু খাসনি যে বড়!

ও ওইরকম। গনপত বলে, চা ওর অমৃত। চায়ে কারও দেহে রক্ত হয় বলে শুনেছেন? ওর হয়।

সিন্ধু বলল, তুই যা তো গনফট, হেঁটে হেঁটে খিদে বাড়াগে যা। যারা বেশি খায় তাদের বুদ্ধি মোটা হয় জানিস?

তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধি তো বাবা শরীরের রসকষ টেনে নিচ্ছে। এরপর বিছানায় পড়ে যখন চিঁচিঁ করবে তখন তোমার বুদ্ধি বোধ হয় তুঙ্গে উঠবে। বউদি, ওর কথা ছাড়ুন। চলুন আজ নাটকটা দেখে আসি।

কমলা বলল, এই আমার নাটক দেখার সময় বটে! আপনি টিকিট ফেরত দিয়ে দেবেন। নাটক এমনিতেই কত দেখছি!

গনপত অত বুঝল না। বলল, আচ্ছা।

তারপর বেরিয়ে গেল।

সিন্ধুর মুখ তুলে বউদির দিকে তাকাতে লজ্জা করছিল। কমলা অবশ্য দাঁড়াল না, রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে যেতে শুধু বলল, খাবার খেয়ে নে সিন্ধু। বেলা হল।

অস্ফুট স্বরে সিন্ধু বলল, দাদা উঠুক।

সে আজ কখন ওঠে ঠিক নেই।

বউদি চলে গেলে সিন্ধু অনেকক্ষণ একা বসে থাকে। সামনে টোস্ট, ডিম, প্রোটিনেক্স দেওয়া দুধ, কাটা আপেল, খুব ঐশ্বর্যবানেরা এ-রকম খায়। এই ঐশ্বর্যের একশো ভাগের এক ভাগ থাকলেও সে বুকুনকে বিয়ে করতে পারত। নয় কি?

সিন্ধু ফের নিজেকে নিজেই একটা প্রশ্ন করে, দাদাকে কি তোমার হিংসে হয় সিন্ধু?

নিজেই উত্তর খুঁজে পায়, না তো, মোটেই না।

তবে দাদাকে দেখে, দাদার এত উন্নতি দেখে কেমন লাগছে?

দাদার জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি সবসময়ে মনে মনে একটা কথা ভাবি।

কী কথা সিন্ধু?

ভাবি, দাদার অবস্থা পালটে যাক। ও আবার আগের মতো হয়ে যাক। তখন ও বড় সুখী হবে। আমরাও দাদাকে ফের ফিরে পাব।

তাই কি হয়?

হয় না? কেন হয় না? এই যে দাদা ঘুমোচ্ছে, এই ঘুম থেকে উঠেই ও যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। যেন ওর টাকার কথা, ব্যবসার কথা আর মনে না পড়ে। তখন যেন ও কেবল কবিতার কথা ভাবতে পারে।

একটু পরে কমলা এসে মুখোমুখি বসে। কিছু বলে না প্রথমে, চুপ করে থাকে। সিন্ধু কালকের ঘটনা টের পেয়েছে কি না তার আন্দাজ করার চেষ্টার বুঝি করে একটুক্ষণ।

তারপর বলে, কাল তোর দাদার ফিরতে অনেক রাত হল। আজ উঠতে দেরি করবে। তুই বরং খেয়ে নে, তোকেও তো আবার বেরোতে হবে।

সিন্ধু বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না বউদি, এ-সব তুলে নিয়ে যাও। আমাকে বরং আরও এক কাপ চা দাও। সকালের দিকে তরল জিনিস ছাড়া কিছু গলা দিয়ে নামে না।

কমলা বাচ্চা ঝিটাকে চা করতে বলে এসে আবার বসে। বলে, সিন্ধু, দাদার ঘরে ঢুকে কাল কী দেখলি?

সিন্ধু মুখ তুলে চেয়ে বলে, অনেক কিছু। দেখাটা বোধ হয় উচিত হয়নি বউদি, না?

তা কেন, সব নিজে দেখেশুনে যা। নইলে পরে পরের মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপবে। মা-বাবাকে কিছু বলিস না, কিন্তু নিজের চোখে দেখে যাবি না কেন?

বলতে বলতে কমলার চোখে জল এল।

চোখ মুছে সে বলল, আমরা কীরকম হয়ে গেলাম রে সিন্ধু! কবিতার জন্য মানুষের যে এত বড় সর্বনাশ হয় জানতাম না তো। জানলে কখনও ভুলেও কি ওকে টাকা রোজগার করতে তাগাদা দিতাম?

তুমি তো অন্যায় কিছু করোনি।

সে আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের সঙ্গে কি ওর মেলে? তোর-আমার হিসেব দিয়ে কি ওর ভালমন্দ মাপা যায়? যখন ও মাস্টারি করত তখন কত আমুদে ছিল। ঘরে ফিরে কত হইচই করত। এক-আধদিন মদ-টদ খেত বটে, কিন্তু এসে পায়ে ধরে ক্ষমাও চাইত। আমার পুজোর শাড়ি কিনতে পারত না, নিজের অনেক ধারকর্জ ছিল, কত কষ্টে সংসার চালাতাম, তবু যেন খুব বেঁচে ছিলাম তখন, সুখে না থাকলেও। কিন্তু এটা কী হল রে?

সিন্ধু একটু অধৈর্যের গলায় বলে, দাদাকে ডাকো বউদি, একটু কথা বলে যাই।

ডাকব? বলে কমলা অবাক। তারপর ধাতস্থ হয়ে বলে, কাকে ডাকব? আয় দেখে যা!

বলে উঠে গিয়ে সাগরের ঘরের দরজা আস্তে ঠেলে খুলে দিয়ে বলে, আমিই ভেজিয়ে রেখেছিলাম তোদের চোখে পড়বার ভয়ে। আয় এখন দেখে যা।

সিন্ধু স্বপ্নোত্থিতের মতো ওঠে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখে, ঘরময় জল গড়াচ্ছে। জলের মধ্যে কয়েকটা রঙিন মাছ মরে পড়ে আছে মেঝেয়। সারা ঘরে সেই সব লাল, রামধনুরঙা, নীল, সাদা মাছ ছড়ানো। মৃত। তার ওপর এখানে-সেখানে অনেক অনেক আধপোড়া একশো টাকার নোট ছড়িয়ে আছে। নোট-পোড়া-ছাই জলে মিশে গলে যাচ্ছে। এ-সবের মাঝখানে টম্যাটো রঙের ভেজা কার্পেটটার ওপর সাগর শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। গায়ে এখনও বাইরের পোশাক। মুখের কাছে মাছি ভনভন করছে।

এত সবের মধ্যে মেঝের মৃত মাছগুলোই বড় বেশি চোখে পড়ল সিন্ধুর। কেন অ্যাকরিয়াম সাগর ভেঙেছে, কেন টাকা পুড়িয়েছে এ-সব জানতে চাইল না সে। জানার দরকার নেই। সিন্ধু জানে এ-সবের পিছনে রয়েছে কবিতা আর কবিতা।

সাগরের ডান হাতটা কেটে গেছে কাচে। রক্ত জমাট, শুকনো। হাতের তেলোটায় এখনও রক্ত জমা বলে ক্ষতটার পরিমাণ বোঝা যাচ্ছে না।

সিন্ধু গিয়ে সাগরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। হাতটা তুলে দেখল, থকথকে হয়ে রক্ত জমে আছে।

বউদি, তুমি দেখনি দাদার হাতটা কতখানি কেটে গেছে?

কমলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিন্ধুকে দেখছিল। বোবা দৃষ্টি। বলল, না তো! বোধ হয় কাল যখন অ্যাকুরিয়ামটা রাগ করে ভাঙল তখন কেটেছে।

কমলা গিয়ে ডেটল, তুলো আর স্টিকিং প্লাস্টার নিয়ে এল। সিন্ধু রক্ত মুছে দেখে এখনও ক্ষতস্থানে কাচের টুকরো বিঁধে আছে। সেই বেঁধা কাচের টুকরোয় নাড়া পড়তেই যন্ত্রণায় অতল ঘুমের মধ্যেও ককিয়ে ওঠে সাগর। এক বার রক্তাভ চোখ দু'টো খুলে বুঝি সিন্ধুকে চিনতে পারল। অস্ফুট জড়ানো গলায় বলল, ছেড়ে দে।

অ্যাকুরিয়ামটা খাটের সঙ্গে লাগানো ছিল। বিল্ট ইন। সেটা ভেঙে যাওয়ায় সারা বিছানা ভিজে সপ সপ করছে। বিছানা চুঁইয়ে খাটের নীচে এখনও ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। কমলা গিয়ে জানালাগুলো খুলে দিল। ঘরটার মধ্যে প্রলয়ের চিহ্নগুলি আলোতে দেখা গেল ভাল করে। কত মৃত মাছ পড়ে আছে চারধারে!

সাগরের সারা শরীর ভিজে সপ সপ করছে। সিন্ধু সাগরকে পাঁজাকোলা করে তুলল, বলল, বউদি, তোমাদের ঘরের বিছানায় দাদাকে শোওয়াতে হবে। দৌড়ে গিয়ে বালিশ-টালিশ ঠিক করো।

কমলা গেল।

সিন্ধু আবার সাগরকে শুইয়ে দিয়ে গায়ের ভেজা জামা কাপড়গুলো খুলল। আন্ডারওয়ারটা শুধু ভেজেনি, সেটা খুলল না। সাগর যে-ধারে কাত হয়ে শুয়ে ছিল সে-ধারের শরীর জলে অনেকক্ষণ ভিজে ছিল বলে সাদা। শরীরটা ঠান্ডা হয়ে আছে।

সিন্ধু ইচ্ছে করে কাঁদেনি, কিন্তু হঠাৎ তার দুই চোখ বেয়ে অবিরল ধারা নামল। আন্ডারওয়্যার পরা সাগরকে আবার পাঁজাকোলা করে তুলল সিন্ধু। সাগরের সামান্য চেতনা ফিরে এল, এক বার মাথাটা তুলবার চেষ্টা করে, সিন্ধুর কাঁধটা ধরতে হাত বাড়ায়। তারপর ফের অবশ হয়ে শরীর ছেড়ে দেয়।

কমলা খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেডকভার তুলে দু'টো বালিশ দিয়ে বিছানা করে ফেলেছে। সিন্ধু সাগরকে শুইয়ে দেওয়ার সময়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন যে কাঁদছিল!

কাঁদিস কেন সিন্ধু? বলতে গিয়ে কমলা নিজেও সিন্ধুর মতোই কাঁদতে লাগল।

সারাদিন সিন্ধুর খুব খাটুনি গেল। গনপত সঙ্গে নেই, একা সিন্ধু এ-অফিস সে-অফিস করে বেড়াল। টেন্ডার জমা দিতে গিয়ে বুঝল, এ-অর্ডারটা তাব পাওয়ার আশা নেই। প্রায় এক লাখ টাকার অর্ডার, পেলে বেশ কিছু মার্জিন থাকত। কলকাতার ঠিকাদাররা অনেক বেশি সুলুকসন্ধান জানে। শিলিগুলি থেকে এসে তার কস্টিং যা পড়বে সেইমতো রেট দিয়েছে সিন্ধু। অনেক হাই রেট!

একই সময়ে টেন্ডার জমা দিতে এসেছিল তারই বয়সের আর-একটি ছেলে। ছেলেটির সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। কথায় কথায় সিন্ধু জিজ্ঞেস করে, কী রকম রেট দিয়েছেন?

এ-সব ব্যাপার সবাই গোপন রাখে বা ইচ্ছে করে বেশি রেট বলে। এ-ছেলেটা সে-রকম নয়। বলল, মার্কেট প্রাইসের থেকে টু পারসেন্ট বেশি। আপনি?

সিন্ধু তেতো মুখে বলল, ফাইভ পারসেন্ট।

রেজিস্ট্রেশনের খোঁজ করতে রাইটার্সেও গেল সিন্ধু। কিন্তু কাজ হল না। আজকের দিনটাই খারাপ। তার ছোট্ট ঠিকাদারি কোম্পানির অনেক পয়সা শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাতায়াতে খরচ হয়ে গেল। আজকাল সিন্ধু খুব হিসেব করতে শিখেছে। কারও পাওনাগণ্ডা বাকি রাখে না, ইনকাম ট্যাক্স যত কমই হোক ঠিকমতো দেয়। বেশ কিছু টাকা ঘুষ বাবদ দিতে হয় একে-ওকে, সে-টাকা সিন্ধু ব্যবসার খাতাপত্রে অন্য খাতে এন্ট্রি দেখাতে বড় লজ্জাবোধ করে। এই কারণেই সে হার্ডশিপে বিশ্বাসী। সে জানে, সততা বজায় রেখে চলে যদি বড় হতে হয় তবে হাড়ভাঙা শ্রম ছাড়া কিছু হওয়ার নয়। আর সেই কারণেই সে

খুব হিসেবি। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে কৃপণ। বলুক গে! সিন্ধুকে নিজের মতো করেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

বিকেলের দিকে কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বাবার জন্য ফুটপাথ থেকে একটা গামছা কিনল। বাবার গামছাটা ছিঁড়ে গেছে দেখে এসেছে। মায়ের চটিটা বড্ড পুরনো হয়েছে, মা বলে দিয়েছিল— যদি পয়সায় কুলোয় তবে একজোড়া ফুটপাথের চটি আনিস। দোকানের দামি জিনিস আনিস না যেন। তাই কিনল সিন্ধু। মা'র পায়ের মাপ আনা হয়নি, চটিটা ঠিকমতো পায়ে লাগবে কি না কে জানে? আরও দু'-একটা জিনিস কেনার ইচ্ছে ছিল সিন্ধুর। স্টেনলেস স্টিলের কয়েকটা গেলাস, একটা অ্যালুমিনিয়ামের স্টোভ, বাবার একটা পাঞ্জাবির কাপড়। এগুলো কেউ ফরমাশ দেয়নি, কিন্তু সিন্ধু নানা সময়ে সংসারের নানা কথা থেকে প্রয়োজন আন্দাজ করতে পারে। ভেবেছিল কিনবে। চাঁদনিতে আর গ্র্যান্ট স্ট্রিটে ঘুরে দরদস্তুর জানল। বড্ড দাম। পয়সার কথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত কিনল না।

অফিস-ভাঙা ভিড়ে উপচে পড়ছে ট্রাম-বাস। এ-সব যানবাহনে এভাবে ওঠার অভ্যাস তার নেই। চাঁদনির সামনে দাঁড়িয়ে সে অসহায়ভাবে ভিড় দেখল কিছুক্ষণ। আজ কি একবার বুকুনের সঙ্গে দেখা করবে?

তার ভিতরকার এক মহৎ সিন্ধু তাকে ডেকে বলল থাকগে, যেয়ো না। বুকুনের যদি অন্য কারও সঙ্গেই বিয়ে হয় তবে কেন ও তোমার স্মৃতি নিয়ে অন্যের ঘর করতে যাবে? ওকে বরং সেই বিপদে ফেলো না। কেউ কারও জন্য জন্মায় না সিন্ধু, পৃথিবীতে কেউ কারও নিজস্ব জিনিস নয়।

সিন্ধু খুব একটা বড় গভীর শ্বাস ছাড়ল। ঠিক কথা! তবু তার মন কেবলই বলে, বুকুন আমার ছিল, কেন অন্য কারও হবে?

সিন্ধু নিজেই উত্তর দিল, বুকুনকে তুমি তো ভালবাসো সিন্ধু, তবে কেন তার সুখের কাঁটা হবে? যত বার তোমাকে দেখবে বুকুন তত বার তার মনখারাপ হয়ে যাবে। নিজেকে সরিয়ে নাও সিন্ধু। বুকুনকে ছাড়াও তুমি বেঁচে যাবে। হয়তো মাঝে মাঝে স্মৃতির ভয়ংকর শীত বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠবে তুমি চোখে জল আসবে, বুক ভার হবে। তবু এইটুকু মেনে নাও।

সিন্ধু গেল না। বহুদূর হেঁটে হেঁটে হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেন ধরল।

সাগর আজ বেরোয়নি।

সিন্ধু দোতলায় উঠতেই কমলা সদর দরজায় তাকে ধরল। তার চোখ-মুখ অস্বাভাবিক। চাপা গলায় বলল, সিন্ধু, তোর দাদা ঘরে বসে ভীষণ মদ খাচ্ছে। আমি বারণ করতে গিয়েছিলাম, তেড়ে এল। তুই এক বার যা। অত খেলে ও মরে যাবে।

সিন্ধু মাথা নাড়ল।

সাগরের ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল, একটা ঘোর লালরঙের বাতির আলোয় ভূতের মতো বসে আছে দাদা। টেবিলে গেলাস, ব্ল্যাকনাইট আর সোডার বোতল। ঘর ম ম করছে অ্যালকোহলের গন্ধে। সাগরের সামনে খোলা পড়ে আছে প্যাড আর কলম।

সিন্ধু ডাকল, দাদা!

সাগর প্রথমবার শুনতে পেল না। দ্বিতীয়বার ডাকতে খুব আস্তে মুখ ঘোরায় সাগর। তার ঠোঁটে একটা প্রায় নিঃশেষিত নেভানো সিগারেট ঝুলছে।

সাগর বলে, কে তুই?

আমি সিন্ধু!

ও! সাগর অস্ফুট একটা কাতর শব্দ করে বলে, আয়।

সিন্ধু চার দিকে তাকায়। ঘরটা গোছানো হয়েছে। বিছানা নতুন করে পাতা, কার্পেট নেই, মৃত মাছ বা জল নেই। শুধু খাটের সঙ্গে লাগানো অ্যাকুরিয়ামের জায়গাটা ফাঁকা ও ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

সিন্ধু এগিয়ে গিয়ে বলে, কী করছ দাদা?

সাগর বলে, ফিরে যাচ্ছি!

কোথায়?

সে অনেক দূর। যত দূর এসেছি তত দূর ফিরে যেতে হবে। সে-সব তুই বুঝবি না। মা-বাবাকে দেখে রাখিস সিন্ধু। আমি তো তাদের ভাল ছেলে নই।

সাগর হাসল। আর তখন সিন্ধু টেবিলের ওপর বোতলের পাশে একটা ছোট্ট শিশি দেখতে পেল। শিশিতে অনেকগুলো ট্যাবলেট। মনে পড়ে, এ-শিশিটা সাগরের কোনও ড্রয়ারে সে যেন পড়ে থাকতে দেখেছে। ওটা কি ঘুমের ওষুধ?

খুবই সন্দেহ হতে থাকে সিন্ধুর। এখন দাদার কোনও মানসিক ভারসাম্য নেই। যা খুশি করে ফেলতে পারে।

সিন্ধু টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। ঘোর লাল আলোয় সবকিছুই বড় অবাস্তব কাল্পনিক দেখায়।

সিন্ধু এগিয়ে এসে প্যাডের কাগজে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন লেখা আছে দেখল, কিন্তু এ-আলোতে পড়া গেল না।

কোথায় ফিরে যাবে দাদা?

সাগর মাতাল হাসি হাসল। তারপর জড়ানো গলায় বলে, সে একটা ভারী রংচঙে সাঁকো। এ-পৃথিবী থেকে ও পারে গেছে, সেখানে স্বপ্নের বাগান। আমি আগে কত বার সাঁকোটা পেরিয়ে গেছি। সাঁকো ধরে ছোটাছুটি করেছি। এখন সাঁকোটা অনেক দূরে সরে গেছে। দেখতে পাই, কিন্তু কিছুতেই কাছে যেতে পারি না। কত বার চেষ্টা করি, ঠিক দেখি আমার রাস্তা সাঁকো থেকে বহু দূরে গিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। কী যে কষ্ট না!

সিন্ধু তার চতুর হাতে শিশিটা তুলে নিল। সাগর দেখতে পেল না।

সিন্ধু বলল, দাদা, আমি কাল চলে যাব।

সাগর উদাস গলায় বলল, সবাই তো চলে যায়, মা-বাপ, ভাই, বউ, ছেলেমেয়ে, টাকা, কবিতা। কেউ থাকে না। আমিও যাব।

সাগর তার গেলাস শেষ করে কিছুক্ষণ লাল আলোর ধাঁধার ভিতর দিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। বিড়বিড় করে বলে, সব ছেড়ে যাব। বহু দূর। সেখানে আশ্চর্য রঙিন ও ধনুকের মতো বাঁকা একখানি সাঁকো, ঝিরঝিরে স্বচ্ছ ঘুম নদী, ও পাশে স্বপ্নের বাগান...

সিন্ধু একটু কেঁপে ওঠে। শিশিটা মুঠোয় নিয়ে বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে। দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

## ॥ দশ ॥

দুপুর পার করে সাগর ঘুমিয়ে উঠল।

একা ঘরে ঘুম ভেঙে খুব ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল সামনের দিকে, মাথা চিন্তাশূন্য, মন ভাবলেশহীন। এত নিস্তরঙ্গ লাগে নিজেকে তার যে সন্দেহ হয়, সে বুঝি বেঁচে নেই। মাথাটা এক টন লোহার মতো ভারী, চোখের ডিমে টনটনে ব্যথা। শরীরে প্রত্যেকটা হাড়ের জোড়ে খিল ধরে আছে। জেগে বিনা আয়াসে তার গলা থেকে গভীর ব্যথা সহ্য করার কোঁকানি উঠে আসছিল।

সেই শব্দে কমলা ঘরে এল, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক, ঠান্ডা হাতের তেলোয় কপালটা চেপে ধরল একটু।

ক'টা বাজে? সাগর জিজ্ঞেস করে।

দেড়টা। তুমি উঠবে না? ওঠো, স্নান করে খাও। কাল রাত থেকে কিছুই খাওনি।

সাগর মুখ বিকৃত করল খাওয়ার কথায়। জিভটা খসখসে, কাঁটা-কাঁটা, বিস্বাদ। পেটে একটা গোঁতলানি। বলল, একটা অ্যাসপিরিন-টিরিন দাও। ভীষণ ব্যথা।

কমলা একটা ট্যাবলেট আর জল এনে দিল, সাগর খুব কষ্ট করে উঠে ওষুধ খেল। বলল, আর আধঘণ্টা রেস্ট নিতে দাও।

কমলা মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

খুবই ভাল ব্যবহার করছে কমলা। এত ভাল ব্যবহার এ-সব অবস্থায় সাধারণত করে না। আবার

কালকের মতো এত বেহেড নেশা সাগর কখনও করেনি। স্মৃতি অন্ধকার হয়ে আছে, মাতাল হওয়ার পর সে কী করে বাড়ি এল তা তার একদম মনে পড়ছে না।

কমলা তাকে শুইয়ে দিয়ে কপালে হাত রাখল, বসল পাশে। বলল, শোনো, আমি সিন্ধুর সঙ্গে শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছি।

সাগর চোখ খুলে কমলার দিকে তাকায়, চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ। সিন্ধু নিয়ে যেতে চাইছে। আমিও মত দিয়েছি।

কেন?

একটু বাইরে যাওয়া ভাল।

ক'দিনের জন্য?

সে কি বলতে পারি? শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন থাকব, তারপর একটু বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আছে। অনেক দিন যাই না।

আমাকে জিজ্ঞেস না করে মত দিলে?

দিলাম। তোমার অনুমতি নেওয়ার কথা মনে হয়নি। তুমি তো আমাকে সহ্যই করতে পারো না।

তার মানে তুমি আর ফিরে আসতে চাও না!

না। তোমার এভাবে নিজেকে শেষ করা চোখে দেখবার জন্য এখানে থাকব নাকি? আমি যখন তোমার ভাল করতে পারলাম না, তোমার কবিতার সর্বনাশ করলাম, তখন আর আমার এখানে থাকার মানেও হয় না।

সিন্ধু কোথায়? ওকে ডাকো।

ও বেরোবে, তৈরি হচ্ছে।

ওকে ডাকো।

কমলা উঠে গেল। একটু বাদে বাইরে যাওয়ার প্যান্ট-শার্ট পরে সিন্ধু ঘরে আসে।

দাদা, ডাকছ?

সাগর চোখ খুলে ভাইকে দেখে বলে, তোর বউদি যাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ। তুমি যদি বলো তো ক'দিনের জন্য নিয়ে যাই।

সাগর একটু ভাবল। তার মনখারাপ লাগছিল না একটুও। বলল, নিয়ে যা। কিছু দিন থাকুক শিলিগুড়িতে।

আচ্ছা।

সকলের জন্য ফার্স্ট ক্লাসে রিজার্ভেশন করে নিস। টাকা নিয়ে যা।

ফার্স্ট ক্লাসে কেন?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সাগর বলে, কবে যাবি?

যেদিন গাড়িতে রিজার্ভেশন পাব সেদিনই।

আচ্ছা। বলে সাগর চোখ বুজল।

দিন দুই পর বেলভিউ ক্লিনিকে বিকেলের দিকে ইন্দ্রাণীকে দেখতে গেল সাগর। দুপুরে ফোন করে জেনেছিল, ইন্দ্রাণী বেঁচে আছে, তবে জ্ঞান নেই। অবস্থা সংকটজনক।

ইন্দ্রাণীকে কেন দেখতে এল সাগর তা সে নিজেও সঠিক জানে না। বহুকাল দেখা হয়নি। সম্পর্কও কিছু নেই। তবু খুব একটা ইচ্ছে হচ্ছিল মনে মনে।

সাততলার সুইটে ইন্দ্রাণীকে রাখা হয়েছে। সুইটের ভিতরে ঢুকতেই প্রবল গোলাপ, রজনীগন্ধা আর চন্দনের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার জো। সামনের ঘরটাতেই রাশি রাশি ফুলের তোড়া সেন্টার টেবিলে রাখা। অল্পবয়সি নার্স একটা সুগন্ধি স্প্রে করছে ঘরে।

ডান দিকের বিছানায় শুয়ে আছে ইন্দ্রাণী, নাকে অক্সিজেন, চোখ বোজা। বিছানার পাশে তিন-চারজন পুরুষ ও মহিলা চেয়ারে বসে। তাদের একজন বাদল ঘোষ, ইন্দ্রাণীর বর্তমান স্বামী।

বাদল ভ্রূ তুলে তাকে দেখে বলল, আরে! কী খবর?

সাগর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, ইন্দ্রাণীকে দেখতে এলাম।

বাদল একটু বিস্ময়ের সুরে বলে, ওকে চিনতেন নাকি?

চিনতাম, অনেককাল হয়ে গেল।

বলেননি তো কখনও। বলে হাসল। বউয়ের এই মর্মান্তিক অবস্থায় যে স্বামী ও-রকম স্মার্ট হাসি হাসতে পারে তা জানা ছিল না সাগরের।

বাদল ঘোষের সাজগোজও চমৎকার। বাদামি চেকার্ড সুট পরে আছে, গলায় সরু জুতোর ফিতের মতো টাই। দাড়ি নিখুঁত কামানো। চেহারাটা একদম ফিল্মের স্টারের মতো। লম্বা, ফরসা, স্বাস্থ্যবান, বয়সও চল্লিশের অনেক নীচে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

বাদল উঠে ইন্দ্রাণীর পাশে বিছানায় বসল। সাগর লক্ষ করে, বিছানার ও-পাশে একটি ছলবলে সুন্দর মেয়ে বসে আছে। বয়স বেশি না, খুব হাসছে সে নানা কথা বলে। পোশাক দেখলেই বোঝা যায়, উচ্চবিত্ত সমাজের মেয়ে। দামি খদ্দরের এক্সক্লুসিভ প্রিন্টের শাড়ি পরেছে, গায়ে ব্লাউজের বদলে ওই প্রিন্টেরই একটা চওড়া কাঁচুলির মতো কিছু পরা, সেটা আবার পিঠের দিকে গিঁট দেওয়া। কাঁধ, হাত সব নগ্ন। নাভির অনেক নীচে কাপড় নামানো। আঁচল খসে যাচ্ছে বারে বারে।

আরও দু'জন একজিকিউটিভ চেহারার লোক বসে আছে ঘরে। সবাই ইংরিজিতে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছে। এক বার লন্ডন আর নিউইয়র্ক শব্দ দু'টো সাগর শুনতে পেল।

আচমকা সাগর জিজ্ঞেস করল, ও কি বাঁচবে?

একটা শ্বাস ফেলে বাদল বলে, চান্স আছে, তবে রিমোট। কেন যে সেন্টিমেন্টাল হতে গেল! ম্যাড।

ঘুমের ওষুধ পেল কোথায়?

বাদর ভ্রূ তুলে বলে, পাবে আর কোথায়! ঘরেই অজস্র রয়েছে, প্লেন্টি। সেডেটিভ না খেলে আমাদের কারওই ঘুম হয় না। নার্ভ-টেনশন!

ডাক্তাররা কী বলছে? সুইসাইডের চেষ্টা?

বটেই তো। একটা নোট লিখেছিল— আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় গোছের। খুব সেন্টিমেন্টাল নোট। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামাতে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলে চিঠিটা দেখে দৌড়ে ওর ঘরে গিয়ে দেখি, ডিপ কোমায় পড়ে আছে।

সেই মেয়েটা ও-পাশ থেকে করুণ মুখ করে বলল, কী সুইট ছিল ইন্দ্রাণী, না বাদল?

সুইটেস্ট! আমি তো রোজ নতুন করে ওর প্রেমে পড়তাম। সাগর হঠাৎ খুব গেঁয়োর মতো জিজ্ঞেস করল, তবে কেন ও ঘুমের ওষুধ খেতে গেল?

ওই তো বললাম, বড্ড সেন্টিমেন্টাল ছিল। মে বি শি হ্যাড-এ লাভার, কিংবা কোনও ব্যাপারে ডিসগাস্টেড হয়ে পড়েছিল। কী করে বলব বলুন! শি লেড হার ওন লাইফ। আমি তো ওর ব্যাপারে কোনও দিন ইন্টারফিয়ার করিনি যে জানব। আই অ্যাম নট এ নোজি পার্কার। চার মাসের জন্য স্টেটসে গিয়েছিলাম, ফিরে আসার এক মাসের মধ্যেই এই স্যাড ব্যাপার। এখন এই চার মাসে কী ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল তা কে জানে! ও আমাকে কিছু বলেওনি। তবে ইদানীং খুব ডিপ্রেসড থাকত।

সাগর ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে ছিল। আগে যেমন মোটাসোটা ছিল ইন্দ্রাণী এখন আর তেমন নেই। হয়তো স্লিমিং করে রোগা হয়ে গেছে। তার ওপর তীব্র বিষ এখন ওর শরীর জুড়ে। খুব সাদা, ফ্যাকাশে চেহারা। ঠোঁট শুকনো। নীল শাড়িতে জড়ানো শরীর প্রায় নিস্পন্দ। চেয়ে রইল সাগর। ইন্দ্রাণী কি আর কোনও দিন কথা বলবে?

বাদল মেয়েটাকে নিয়ে সামনের ঘরটায় গিয়ে বসল। নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা। এ দিকের একজিকিউটিভ দু'জন উঠল। বাদলকে উইশ করে চলে গেল। ঘর ফাঁকা, মৃত্যুপথযাত্রী ইন্দ্রাণীর মুখোমুখি বসে রইল সাগর। বহুকাল আগে ইন্দ্রাণী বলত, আমি সাগরশঙ্কর চ্যাটার্জির প্রেমিকা।

সেই কথাটাই আজ এত দিন বাদে সাগরকে টেনে এনেছে ইন্দ্রাণীর কাছে।

সুগন্ধে দম আটকে আসছে। সাগর তাই উঠল। দেয়াল জোড়া মস্ত জানালা, পরদা সরানো। এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্তব্ধ উঁচুতলার ঘর থেকে দেখা যায়, নীচে ছবির মতো সাজানো মিন্টো পার্ক! মাঝখানে চৌকো পুকুর। পুকুরের এক ধারে একটা রঙিন কাঠের নৌকো বাঁধা। আর বহুদূর পর্যন্ত

কলকাতাকে কী সুন্দর দেখায় ওপর থেকে। এ-রকম বা এর চেয়ে আরও উঁচু একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকবার শখ সাগরের অনেক দিন ধরে। অত উঁচুতে থাকলে কবিতার বীজাণুরা বাতাসে বাহিত হয়ে আসবে ঘরে। কবিতার পরাগ সঞ্চারিত হবে মাথার গর্ভকোষে। অন্তরীক্ষে অদৃশ্য কবিতার পাখি উড়ে এসে বসবে সাগরের ডালপালায়।

চললেন? বাদল জিজ্ঞেস করে।

সাগর অন্যমনস্ক চোখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বলল, ডাক্তার কী বলছে? বাঁচবে না?

বাদল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ডেফিনিট কিছু নয়। আর বাঁচলেও শি উইল নট বি দি সেম এগেইন। থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং। সো কাইন্ড অফ ইউ।

মাথা নেড়ে সাগর বেরিয়ে এল। লিফটে নীচে নেমে সে রিসেপশনের পেছনে চমৎকার ওয়েটিং হল-এর একটা সোফায় বসে রইল একটু। শরীরটা ভাল লাগছে না। প্রায় তিন দিন সে মদ খায়নি। না খেলে এ-রকম হয় আজকাল। বসে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেট শেষ হয়ে এল যখন, হঠাৎ দেখতে পেল সেই ছলবলে মেয়েটা রিসেপশনের পাশ দিয়ে একা বেরিয়ে যাচ্ছে।

সাগর হঠাৎ উঠে এল। খুব জোর কদমে হেঁটে সে ফ্লাইওয়ের মাঝামাঝি সঙ্গ ধরে ফেলল মেয়েটির। কাছে গিয়ে বলল, এক্সকিউজ মি, আপনি বাদল ঘোষের কে হন?

মেয়েটা একটু অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে হেসে বলল, ওঃ. আপনি! আপনি না কিছুক্ষণ আগেই চলে এলেন?

যাইনি। শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে রিসেপশনে বসে ছিলাম।

মেয়েটা বিনা দ্বিধায় বলল, বাদল আর আমি— উই আর ফ্রেন্ডস। ইন্দ্রাণীও আমার বন্ধু ছিল।

ছিল? এখন নেই?

এখনও আছে। বলে হাসল মেয়েটি, বলল, দেয়ার ইজ নো মিস্ট্রি! ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড দ্যাটস অল।

আপনি ভিজিটিং আওয়ার শেষ করে এলেন না?

না, আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে। বাদল ইন্দ্রাণীর কাছে তো রয়েছেই। আপনি কি ইন্দ্রাণীর ফ্রেন্ড?

ও-রকমই। আপনাকে একটা কথা বলি, বাদল ঘোষ ভাল লোক নয়।

মেয়েটা থমকে গেল। মুখটা কিছু কঠিন, থমথমে। বলল, দেখুন—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সাগর বলে, ইন্দ্রাণীও ভাল মেয়ে ছিল না। শি ইজ পেয়িং হার পেনাল্টি। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনও আপন।র জীবন অনেকখানি বাকি। সে-জীবনটা বাদলকে দেবেন না। ইন্দ্রাণীর পরিণতি মনে রাখবেন।

লঘু পায়ে সাগর বেরিয়ে এল। তার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল ব।ইরে। উঠে মুকুন্দকে গাড়ি ছাড়তে বলল। মনটা একটু হালকা লাগল তার।

তিন দিন মদ খায়নি, আজ একটু খাবে নাকি? বুকে একটা ব্যথা খোঁচা মারছে। শরীরটা ভাল নেই।

সিদ্ধান্তটা নিয়েই ভুল করল সাগর। এসপ্ল্যানেডে একটা পুরনো মদের আড্ডায় গিয়ে সবে একটা বড় হুইস্কি নিয়ে বসে গোটা-দুই চুমুক দিয়েছে, আচমকা বুকের কপাটে জোর ধাক্কা লাগল। ব্যথা নয়, কিন্তু একটা প্রবল থরথরানি। তারপর আর কিছু মনে রইল না তার।

## ॥ এগারো ॥

অনেক রাত পর্যন্ত সাগর এল না। সাগর রাত করেই ফেরে, তাই কেউ চিন্তা করছিল না। কিন্তু রাত প্রায় এগারোটার সময়ে মুকুন্দ গাড়ি করে একা এসে হাজির। খবর দিয়ে গেল— সাগরবাবুর স্ট্রোক হয়েছে। মেডিকাল কলেজে ভরতি করা হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

তক্ষুনি সে-গাড়িতে উঠে কমলা যাবে। মুকুন্দ বলল, বউদি, এত রাতে তো ঢুকতে দেবে না

হাসপাতালে। সকালে যাবেন। ভয়ের কিছু নেই, আমি নিজে গিয়েছিলাম, মানিকবাবু গিয়েছিলেন। ভাল ডাক্তার দিয়ে দেখানো হয়েছে।

সিন্ধু এসে কমলাকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল, বলল, ভেবো না বউদি, রাতটা পোয়াতে দাও।

কমলা অঝোরে কাঁদল। ঘুমোতে গেল না। সিন্ধুও বসে রইল ওপরের খাওয়ার ঘরে, কমলার কাছাকাছি। বুকে অজানা ভয়, অদ্ভুত এক মৃত্যু-অনুভূতি।

খুব ভোরের ট্রেন ধরে কমলা আর সিন্ধু এল কলকাতায়। মেডিকাল কলেজে ভিজিটিং আওয়ার্স তখনও শুরু হয়নি। দু'জনে হাসপাতালের চত্বরে বসে রইল অসহায়ের মতো। অনেকক্ষণ। একটু বেলায় জেনারেল ওয়ার্ডের অজস্র বেডের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে যখন সাগরের বিছানা খুঁজে পেল তখন সাগর কাউকে চিনতে পারছে না। মুখটা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে খানিকটা, বাঁ চোখটার পলক নেই, শরীরে অসাড় ভাব। একটা গোঙানির শব্দ করছিল থেমে থেমে। শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। পাশের বেডে একটা লোক ভোররাতে মারা গেছে, তার সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে ঢাকা, চার দিকে একটা পরদার আড়াল এইমাত্র দিয়ে গেলে লোক এসে। আত্মীয়রা এসে কান্নাকাটি করছে দূরে দাঁড়িয়ে।

কমলা কত কষ্টে যে সচেতনতা ধরে রেখেছে, কেন যে এখনও অজ্ঞান হয়ে যায়নি তা কেউ বুঝতে পারবে না। সাগরের পাশটিতে বসে বুকের ওপর মাথা রেখে সে বলল, কেন চলে যাচ্ছ এত তাড়াতাড়ি? আমার টাকাপয়সা কিছু চাই না, শুধু তুমি থাকো।

সাগর গোঙায়।

সিন্ধু বউদিকে সরিয়ে আনে সাগরের বুক থেকে। বাস্তব জ্ঞান থেকে সে জানে বুকে ভার পড়া সাগরের পক্ষে ক্ষতিকর। কমলা সাগরের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে রইল।

একজন কমবয়সি নার্স এসে বলল, পেশেন্টকে ডিস্টার্ব করবেন না। উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ক্ষতিকর।

সিন্ধু সাগরের মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। এ-রকম কিছু একটা সে প্রত্যাশা করছিল। দাদা বড় বেশি টেনশনে আছে, বড় ভেঙে পড়েছে ইদানীং। গরিব অবস্থা থেকে এত তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়া তার উচিত হয়নি। এই বিশাল রূপান্তরটা কোনও দিনই সাগরের সহ্য হয়নি।

তারা আসবার পনেরো-বিশ মিনিট বাদেই এল মানিক। মানিকের সঙ্গে তার বউ ছবি। এই সকালেও দু'জনেই খুব ফিটফাট সেজে এসেছে। মানিকের পরনে স্ট্রেচ-এর বেলবটম, জাপানি ছাপা বুশ শার্ট গায়ে। ছবির পরনে সামু সার্টিন শাড়ি, নাকে হিরের নাকছাবি, ইন্টিমেট সেন্টের গন্ধে জায়গাটা মাত হয়ে গেল। একগোছা রজনীগন্ধা বিছানার পাশে রাখল ছবি। মানিকের পিছনে পেতলের দু' বাটির টিফিন ক্যারিয়ার আর ফ্লাস্ক হাতে মুকুন্দ এল। বলল, সাগরবাবুর ব্রেকফাস্ট।

ছবি নাক কুঁচকে বলল, এ কোথায় সাগরদাকে রেখেছ? শিগগির নার্সিং-হোমে ট্রান্সফার করো। এ-রকম নোংরা ওয়ার্ডে তো ভাল লোকই অসুস্থ হয়ে যায়।

মানিক বলে, আজই ব্যবস্থা হবে, কাল ডাক্তার পালিতের সঙ্গে কথা বলে গেছি, উনিই ব্যবস্থা করবেন। সাগর অসুস্থ হয়ে পড়লে মুকুন্দ বুদ্ধি খাটিয়ে এখানে ভরতি করে, তারপর আমাকে ফোন করেছিল। তখন সন্ধে হয়ে গেছে, কিছু করার ছিল না।

ছবি নিচু হয়ে কমলার গায়ে হাত দিয়ে বলল, বউদি উঠুন তো। আপনার কর্তা বড্ড দুষ্টু হয়েছেন আজকাল, কোনও বাধানিষেধ মানেন না। একটু শাসন করবেন তো! ডাক্তার বলেছে, ভয় নেই।

মানিক সিন্ধুর দিকে চেয়ে বলল, তুমি সিন্ধু না?

হ্যাঁ।

তুমি এ-সময়ে কলকাতায় থাকায় ভালই হয়েছে। এ-সময়টায় লোকজন দরকার। এখন কয়েক দিন থাকতে হবে কলকাতায়।

থাকব। বলে সিন্ধু চুপ করে থাকে।

কমলা উঠে বসেছে এখন, বলল, মানিকবাবু, ওঁকে খুব ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে। দরকার হলে আমার সব গয়না বিক্রি করে দেব।

শুনে মাণিক হেসে বলল, গয়না! আরে দূর, আমরা এত ভিখিরি হয়ে গেছি নাকি? গয়না-টয়নার দরকার নেই বউদি, ও-সব নিয়ে ভাববেন না। আজ বিকেলেই সাগরকে নার্সিং-হোমে নেওয়ার ব্যবস্থা

হবে। রোগটা বাধিয়ে সাগর বড় ঝামেলায় ফেলল আমাকে। ব্যবসা আমার চেয়ে ও ঢের ভাল বোঝে। ও পড়ে থাকলে একা আমি কী যে করব!

একটু বাদেই সাগরের বিছানার চারপাশ ভরে গেল। ডাক্তার নার্স তো বটেই, অনেক ক্লায়েন্ট, সাপ্লায়ার, দু'-চারজন সরকারি লোকও এসে ভিড় করল। তিন-চারজন পুরনো বন্ধু।

ডাক্তার রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করে মানিককে বললেন, একটু সময় লাগবে। তবে আজ নার্সিং-হোমে নিতে পারবেন।

কমলা বলল, কত দিন লাগবে?

এক মাস বা দু' মাস। ইট ডিপেন্ডস— বলে ডাক্তার হেসে যোগ করলেন, ভয়ের কিছু নেই। মাইলড স্ট্রোক। কিন্তু এর পর ডিসিপ্লিনড না হলে মুশকিল। একবার স্ট্রোক হয়ে গেলে আর নরমাল-এ ফেরা যায় না।

দুপুরের রোদ মাথায় করে ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে সমবায় পল্লিতে ফিরে এল কমলা আর সিন্ধু। কমলা আসতে চায়নি, বলেছে, বিকেল পর্যন্ত থেকে যাই, অত দূর থেকে যদি আসতে ফের দেরি-টেরি হয়, গাড়ি যদি বন্ধ থাকে।

সিন্ধু সে-কথায় কান দেয়নি। জোর করে নিয়ে এসেছে।

এসে দেখে গনফট বাচ্চাদের নিয়ে খুব খেলছে। জয়া আর সৈকত জানে ওদের বাবার খুব অসুখ। কিন্তু শৈশব বয়স দুঃসংবাদ বহন করতে পারে না। বাবার অসুখের কথা ভুলে ওরা মোটা-কাকুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

বাবাকে একটা চিঠি দেওয়া দরকার আজই। খেয়ে উঠে চিঠিটা লিখেও ফেলল সে। দাদার স্ট্রোকের খবর দিল না, শুধু লিখল, দাদার শরীর ভাল নয়। আমি ক'দিন পরে যাব।

প্রায় পনেরো দিন নার্সিং-হোমে রইল সাগর। তারপর ডাক্তারের মত নিয়ে কমলা আর সিন্ধু মিলে সাগরের অফিসের গাড়িতে করে নিয়ে এল তাকে। এখনও হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই, কথা স্পষ্ট হয়নি, বাঁ চোখের পাতা ভাল করে বোজাতে পারে না সাগর। খুব অল্প বয়সেই তার স্ট্রোক হয়ে গেল।

বাড়ির ব্যবস্থা একটু পালটানো হয়েছে। সাগরের ঘরের মস্ত খাটে এখন সৈকত আর জয়া শোয়, মেঝেয় বিছানা পেতে পুনি। কমলার ঘরে রাখা হয়েছে সাগরকে। সেখানে কমলা দিনরাত যক্ষীর মতো তাকে পাহারা দেয়। ঘরসংসার এখন খানিকটা শ্রীহীন। পুনিই রান্নাবান্না করে। বাগানে আগাছা জন্মেছে খুব। গোয়ালে বাছুরটা প্রায়ই ছাড়া পেয়ে গোরুর দুধ খেয়ে ফেলে।

ইস্কুল থেকে সাগরের সহকর্মীরা এসে এক দিন দেখে গেল। চাঁদা করে তারা কিছু ফুল ফল নিয়ে এসেছে। মানিক প্রায়ই গাড়ি করে আসে, সঙ্গে বড় ডাক্তার। কমলার হাতে সে প্রায়ই কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে যায়। সে অনেক টাকা। এক-এক বারে তিন হাজার, চার হাজার। এক মাসেই প্রায় বিশ হাজার টাকা এসে গেল কমলার হাতে। সাগরের রোজগার যে এত বেশি, অংশীদারী ভাগ যে মাসে কত হয় তা আগে জানা ছিল না কমলার। ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করে।

টাকাটা লোহার আলমারিতে লুকিয়ে রাখে কমলা। বুঝতে পারে, এত টাকাই ছিল ওর সর্বনাশের মূলে। ভগবান জানেন, এত টাকা কমলা কোনও দিন চায়নি। সে সচ্ছলতা চেয়েছিল, একখানা নিজস্ব ছোট বাড়ি চেয়েছিল, দু'-একটা বড়লোকি জিনিস চেয়েছিল। তা বলে রাশি রাশি টাকার বৃষ্টি নয়। বেশি টাকার মধ্যে অভিশাপ থাকে।

সাগর আজকাল একটু-আধটু চলাফেরা করতে পারে। প্রায় সময়েই সিন্ধুকে ডেকে দাবা খেলতে বসে। খেলাটা নতুন শিখেছে সিন্ধুর কাছে। একটা বোর্ড আর ঘুঁটি কিনে আনা হয়েছে। দুই ভাই মিলে খেলে। কখনও বা বই পড়ে সাগর। বহুকাল বইপত্র পড়ার সময় ছিল না। কখনও বা একটা প্যাড আর কলম কোলে নিয়ে বসে।

এক দুপুরে তেমনি বসে ছিল সে। কমলা বেদানার রস করছিল মেঝেয় বসে। তখন কমলা বলল, শোনো, তোমার শেয়ারের অনেক টাকা মানিকবাবু আমার হাতে দিয়ে গেছেন।

সাগর গম্ভীরভাবে বলল, হুঁ।

কত টাকা বলো তো! কমলা হেসে জিজ্ঞেস করে।

সাগর প্যাডে চোখ রেখেই বলে, কত আর হবে! হাজার বিশ-ত্রিশ!

ঠিক বলেছ তো। ত্রিশ নয়, কাল গুনে দেখলাম তেইশ হাজারের কিছু বেশি। তোমার প্রতি মাসে অত রোজগার হয়?

সাগর একটু বিরক্ত হয়ে বলে, হয়, কেন?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম। রাগ করলে?

এখন টাকার কথা শুনতে ভাল লাগছে না।

তবে আর বলব না। রসটুকু খেয়ে নাও তো।

সাগর তেতো মুখ করে রসটা গিলে কাপ ফিরিয়ে দিয়ে বলে, কমলা, তুমি নামে লক্ষ্মী!

তাই তো।

সেইজন্য টাকার কথা তোমার মুখে মানায় না।

এটা হয়তো একটা ভালবাসার কথা। এই ভেবে কমলা খুশি হল।

তখন আচমকা সাগর বলে, আমি কিন্তু লক্ষ্মীর চেয়ে সরস্বতীকেই বেশি চেয়েছিলাম।

কোলের ওপর খোলা প্যাড আর হাতে কলম নিয়ে সাগর অন্য মনে বসে থাকে অনেকক্ষণ। এক অক্ষরও লেখে না, লিখতে পারে না। আড়াল থেকে কমলা দেখে যায়, সিন্ধু দেখে যায়।

## ॥ বারো ॥

বুকুনের কথা সিন্ধুর কি মনে হয় না?

খুব হয়। কিন্তু সিন্ধুর চরিত্রে একটা খুব জোরালো কপাট আছে, যেটা সে বন্ধ রাখতে পারে। ভাবপ্রবণতার হাওয়া তাকে বড় একটা ভাসিয়ে নিয়ে যায় না কাটা ঘুড়ির মতো। আর আছে তার প্রবল আত্মসম্মান বোধ।

সাগর কিছু সুস্থ হয়ে উঠলে এক দিন সিন্ধু ভাবল, যাই তো, বুকুনকে এক বার দেখে আসি!

বিকেলের আলো থাকতে থাকতেই একদিন সিন্ধু দীনেন্দ্র স্ট্রিটের সেই বাড়িতে এল। আশ্চর্য, দরজা খুলল সেই মেয়েটাই যে আগের বার খুলেছিল। সাদা খোলের একটা শাড়ি পরনে, লাল ব্লাউজ, এলোচুলের অন্ধকারের মাঝখানে মুখখানা ফুলের মতো ফুটে আছে। এক পলক তাকালেই মন ভাল হয়ে যায়।

বুকুন নেই?

মেয়েটা সিন্ধুর দিকে একটু তাকিয়ে একটু চেনা-অচেনার দ্বন্দ্বে পড়েছিল বোধ হয়। সিন্ধুকে দেখেছে, কিন্তু মনে করতে পারছে না।

বুকুনদি? ওঃ, আপনি সেই শিলিগুড়ির, না?

হ্যাঁ।

আসুন।

সিন্ধু গিয়ে সেই ঘরটায় বসল। মেয়েটা চলে গেল ভিতরে।

অনেকক্ষণ কেউ এল না। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ লাগছে। একা বসে থাকতে সিন্ধুর খুব অস্বস্তি লাগছিল। আর বার বার সে কেন যেন যে-মেয়েটি দু'দিন তাকে দরজা খুলে দিল তার কথাই ভাবছে। বড় শ্রীময়ী মেয়েটি।

অনেকক্ষণ বাদে পরদার আড়াল থেকে আচমকা বুকুন একদম সামনে এসে দাঁড়াল। কোনও শব্দ হয়নি, তাই বড় চমকে গিয়েছিল সিন্ধু।

এত দিন পরে এলে? বুকুন কেমন এক স্বরে বলল। যেন ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে তার জীবনে, সিন্ধু বড় দেরিতে এসেছে।

সিন্ধু মুখ তুলে অবাক। বুকুন আরও কি সুন্দর হয়েছে দেখতে! হলুদে মাখানো চমৎকার গায়ের রং

হয়েছে তার। হয়তো রোজ স্নানের সময়ে হলুদ মাখে। স্বাস্থ্য ঝলমল করছে। সেই রোগা মেয়েটাকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়াই যায় না।

সিন্ধু বলে, দাদার খুব অসুখ গেল বুকুন। আমি সেই থেকে কলকাতায় আছি। কিন্তু আসবার সময় হয়নি।

অসুখ! বলে ভ্রূ কুঁচকে যেন একটু ভাবল বুকুন। তারপর বলল, আমার যা হওয়াব তা হয়ে গেল।

একটা হতাশ ভাবে মাখানো এই কথা শুনে সিন্ধুর বুকটা এক বার চমকে ওঠে। সে বলল, কী হয়েছে?

শুনতে চাও? বলে ম্লান হাসল বুকুন। বলল, সে একটা গল্প!

বলো, শুনি!

তুমি রাগ করবে না বলো?

কী জানি? তবু বলো, রাগ আমি চেপে রাখতে পারি বুকুন। কিন্তু আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি কি অন্য কারও সঙ্গে ইনভলভড হয়ে গেছ?

বুকুন মুখটা নামিয়ে নিল। খাটের বিছানায় বসে রইল নতমুখী। তারপর আঁচল তুলে চোখ মুছে অস্পষ্ট গলায় বলল, আমার খুব দোষ নেই। সবাই এমন করে রাজি করাল।

কী হয়েছে বুকুন?

আমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল ক'দিন আগে।

সিন্ধু থমকে যায়। এমনটা সে আশা করেনি। হয়ে গেল! অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল, কার সঙ্গে?

এ-বাড়িতে আসত ও। পারিজাত রায়। একসঙ্গে সিনেমায় গেছি, বেড়িয়েছি। ওর ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। এম বি বি এস পাশ করেছিল দু' বছর আগে, এখন এফ আর সি এস করতে যাচ্ছে। ওর মা-বাবার ইচ্ছে বিয়ে করে যায়। ও তাই এক দিন আমাকে সব খুলে বলল। বিশ্বাস করো, আমি রাজি হইনি। কিন্তু কথাটা উঠতেই এ-বাড়ির সবাই হই হই করে ধরল আমাকে। সকলের বিরুদ্ধে যেতে আমি কি পারি? সোশ্যাল ম্যারেজের সময় ছিল না, মলমাস পড়ে গেছে। তাই রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। এক বছর বাদে এসে সামাজিক মতে বিয়ে করে নিয়ে যাবে আমাকে।

বুকুনের গলায় যথেষ্ট দুঃখের ভাব ছিল, চোখে জল ছিল, একটা অসহায়তাও ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। তবু সিন্ধুর কেবলই মনে হয়, ভিতরে ভিতরে বুকুনের একটা আনন্দের বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। সিন্ধুর বুকটা অন্ধকার হয়ে গেল।

তবু হেসে বলল, বাঃ, এ কেমন বিয়ে! খাওয়ালে না তো!

বুকুন জলভরা চোখ তুলে বলে, ঠাট্টা করছ? করো। তোমার তো ঠাট্টা করারই কথা।

সিন্ধু কাঠ-হাসি হেসে বলে, বুকুন, আমার তো এমনিতেও চান্স ছিল না। যাকগে, ভেবো না। আজকাল কেউ এ-সবের জন্য গলায় দড়ি দেয় না। আজ উঠি।

বলে উঠতেই যাচ্ছিল সিন্ধু, ঠিক এ-সময়ে পরদাটা সরিয়ে সেই মেয়েটা ঘরের মধ্যে আসে। মনে হয় এতক্ষণ পরদার ও-পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। ঘরে এসে সিন্ধুকে বলল, একটু বসুন। চা আনছি।

না, তার দরকার নেই।

মেয়েটা সামান্য হেসে বলল, ওমা, আপনি কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

সিন্ধুর ভিতরে তৎক্ষণাৎ এক হিংস্রতা জেগে ওঠে। সে ফুঁসে উঠে রুক্ষ গলায় বলল, কেন, রাগের কী দেখলেন?

দেখছি, খুব রেগে গেছেন। আগের দিন যখন এসেছিলেন তখন আমরা ভাল আপ্যায়ন করতে পারিনি বলে রাগ করেননি তো?

সিন্ধু তার রাগী চোখে চেয়ে থাকে একটু।

মেয়েটা ভয় পায় না। বলে, আপনার রাগের গল্প অনেক শুনেছি। জলপাইগুড়িতে এক বার নাকি ভীষণ কাণ্ড করেছিলেন!

সিন্ধু নিভে যায়। বসে বলে, ওঃ, সে-সব বলেছে বুঝি বুকুন?

হ্যাঁ। আরও অনেক কথা বলেছে। আমি কিন্তু ভীষণ দুঃখ পেয়েছি বুকুনদির ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায়।

সিন্ধু কিছু বলল না। এই মেয়েটা বড্ড পাকা।

বুকুন একটু সামলে নিয়ে বলে, সিন্ধুদা, এ হচ্ছে আমার মাসতুতো বোন গৈরিকা। পার্ট টু দিচ্ছে। ভাল নাচতে জানে। সি-এল-টিতে একসময়ে—

গৈরিকা বলল, যাঃ!

বলে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই এক প্লেট মিষ্টি আর চা হাতে এসে বলল, বুকুনদি তেমন স্ট্রং-মাইন্ডেড নয়। ওর জায়গায় আমি হলে এ-বিয়েতে কেউ রাজি করাতে পারত না। কিন্তু বুকুনদি কেঁদে কেটে, ভয় খেয়ে কীরকম যেন হয়ে গেল। অবশ্য পারিজাত খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে!

সিন্ধু এ-সব ঘটনার অর্থ জানে। বুকুনের যে ব্যক্তিত্বের জোর নেই এটাও কি সে আগেই জানত না?

সিন্ধু খাবারের প্লেট ছুঁল না। কয়েক চুমুক চা খেয়ে সে উঠে পড়ল। জীবনটাকে এবার অন্য এক রকম করে গড়তে হবে। বুকুনকে ঘিরে সে জীবনের একটা ছক তৈরি করেছিল। এখন বুকুন তার জীবনে রইল না। ছকটা না পালটে কী করে সিন্ধু! তার খুব ইচ্ছে করছে শিলিগুড়ি ফিরে যেতে। গনফট রোজ তাগাদা দিচ্ছে। ওর বাড়ি থেকে চিঠি আসছে রোজ।

বাড়িতে ঢুকবার সময়ে সিন্ধু দেখে ওপরের বারান্দায় দাদা বসে আছে বেতের চেয়ারে। মুখ নিচু করে বোধ হয় কোলের ওপর প্যাডে কিছু লিখছে গভীর মনোযোগে। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। দাদা আলো না জ্বেলে এই প্রায়ান্ধকারে লিখছে কী করে?

সিন্ধু উঠে এল ওপরে। বারান্দায় এসে আলোটা ফট করে জ্বালতেই চমকে উঠে সাগর বলে, কে?

আমি।

সাগর মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল একটু। বলল, আলোটা নিভিয়ে দে।

সিন্ধু নিভিয়ে দিল। সাগর আর তার দিকে চেয়েও দেখল না। বেশ জমাট অন্ধকার নেমে আসছে। তবু সাগর একমনে প্যাডে কী লিখে যাচ্ছে।

সিন্ধু দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখল একটু। বহুকাল আগে দাদা এইভাবেই লিখত। হাঁটু তুলে বসে, কোলে প্যাড নিয়ে। বাহ্যজ্ঞান থাকত না। বউদি কত বকে বকে সংসারের কাজে পাঠাত, বাজার করতে বা লন্ড্রির কাপড় আনতে।

সিন্ধু ঘরে এসে দেখল বউদি নিঃসাড়ে চলাফেরা করছে। সিন্ধুকে দেখে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নিচু গলায় বলে, সিন্ধু, চুপ! ও আজ লিখছে।

কী লিখছে?

কবিতা। বলে খুব উজ্জ্বল হাসি হাসল কমলা।

সিন্ধুর ভারী মজা লাগে। সাগর কবিতা লিখলে আগে কোনও দিন খুশি হত না কমলা। আজ ভিন্ন পরিস্থিতিতে দান উলটে গেছে।

লিখছে মানে? সিন্ধু জিজ্ঞেস করে কবিতা আসছে তো? নাকি পরে আবার কবিতা হল না বলে পাগলামি করবে?

না রে, ওর মুড আমার চেয়ে কেউ ভাল চেনে না। কবিতা যখন ওর মাথায় আসে তখন এ-রকম নিঃঝুম পাথরের মতো হয়ে যায়। বহুকাল এ-রকম মুড দেখিনি ওর। এতকাল কেবল কবিতার পাগলামি করেছে। কিন্তু আজ ও অন্য রকম, ঠিক সেই আগের মতো।

সিন্ধু একটু তাকিয়ে থাকল কমলার দিকে। হঠাৎ বলল, বউদি, আগের মতো সব কিছু কিন্তু নেই। তুমি খুব পালটে গেছ।

কী বলছিস!

শোনো, দাদা কবিতা লিখছে বলে তুমি অমন কাঁটা হয়ে থেকো না। দাদা যদি টের পায় যে তোমরা দাদার কবিতা লেখার জন্য সবাই শ্বাস বন্ধ করে আছ তবে আবার ওর মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। ওর কবিতাকে প্রকাশ্যে অত ইমপর্ট্যান্স দিতে যেয়ো না। বরং মাঝে মাঝে ওকে ডিস্টার্ব কোরো। কবিতার

মাঝখানে গিয়ে এক-আধটা ফরমাশ করে দেখো, তাতেই ও আগের মেজাজটা ফিরে পাবে।

একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়ে কমলা বলে, বলছিস!

হ্যাঁ, বউদি। একটু ভয় করছে তোমার, তবু ও-রকম করাটা দাদার পক্ষে দরকার।

কমলা ভাবল।

সন্ধের পর সাগর বারান্দায় বাতি জ্বেলে নিবিষ্ট হয়ে বসে আছে কবিতার খাতা নিয়ে। তখন কমলা এসে বলল, ওগো, যাও তো ইলেকট্রিক মিস্তিরিকে একটু ডেকে আনো। হিটারটা গোলমাল করছে!

সাগর একটা বিরক্তির 'আঃ' করল। রাগী চোখে তাকাল কমলার দিকে।

যাও না গো! কমলা বলে। ভিতরে ভিতরে ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ করে।

সাগর উঠে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে মিস্তিরি নিয়ে ফিরে আবার লিখতে বসে গেল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, সে যেন খুশি হয়েছে। সে যেন কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছে জীবনের মধ্যে। খুব চিকমিক করছে চোখ। সমস্ত মুখে বিষয়চিন্তার যে রেখাগুলি পড়েছিল তা মুছে গিয়ে এক কোমল কল্পনাপ্রবণতার লাবণ্য ফুটে উঠেছে।

কমলা একটা খেলা খুঁজে পেয়েছে। পরদিনও সে সাগরের কবিতা লেখার মাঝখানে তাকে ডেকে মাছ কিনতে পাঠাল।

সাগর আজকাল চলাফেরা করতে পারে। তা ছাড়া বাঁধা রিকশা এসে নিয়ে যায়।

মাছ এনে সাগর লিখতে বসে।

কমলা এসে বললে, ইস্কুলে কবে থেকে যাবে?

কেন?

বাঃ, চাকরি না করলে, কাজ না করলে সংসার কি এমনিতে চলবে?

ঠিক এ-রকম করে কতকাল কমলা কিছু বলেনি। সাগর বিরক্তির সঙ্গে বলে, বলো তো আজই যাই। পরে শরীর খারাপ করলে কাঁদতে বোসো না।

না, না, আজ নয়। কমলা ভয় পেয়ে বলে। তারপর হেসে বলে, তবে চাকরিটা ছেড়ো না যেন।

আচ্ছা। বলে সাগর দ্রুত লিখতে থাকে। সিগারেট ধরায়।

সাগরের ঘর থেকে সিন্ধু চুপিচুপি ভাল আসবাবপত্র সরিয়ে দিয়েছে নীচের ঘরে। পুরনো খাট, ডেস্ক দিয়ে নতুন করে সাজিয়েছে। অবশ্য এ-ঘরে এখন সাগর থাকে না। থাকে জয়া আর সৈকত। সাগর কমলার ঘরে শোয়।

সিন্ধু কমলাকে বলেছে, বউদি, এই সিস্টেমই বজায় রেখো। ছেলেমেয়েরা ওই ঘরেই থাকবে। তুমি দাদাকে আলাদা থাকতে দিয়ো না।

কমলা সিন্ধুর দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল, বলল, তুই এত পাকা মাথার লোক কবে থেকে হলি সিন্ধু! সেদিনের পুঁচকে ছেলে, কিন্তু যেন জ্যাঠামশাইয়ের মতো সব বুঝে গেছিস!

আমি কবি নই বউদি। নিতান্তই প্রোজ।

তোর খুব ভাল হবে সিন্ধু, দেখিস। খুব ভাল হবে তোর।

সিন্ধু ঠাট্টা করে বলে, যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই...

টানা পনেরো দিন সাগর অজস্র কবিতা লিখল। যেন পাথর কাটিয়ে নির্ঝরিণীর মুক্তি ঘটেছে। তার জলধারার শেষ নেই। এই পনেরো দিন কমলা কবিতার মাঝে মাঝে এসে ফরমাশ করেছে, বাইরে পাঠিয়েছে সাগরকে। সাগরের মুখে সেই সম্মোহিত কবিতামুগ্ধতা আবার ফিরে এল বুঝি।

তারপর সাগর ইস্কুলে যাওয়া শুরু করল। ব্যবসার দেখাশুনোও আবার শুরু হল।

এক দিন রাত্রিবেলা কমলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে সাগর বলল, শোনো কমলি, আর আমি কিন্তু রাশি রাশি টাকা রোজগার করব না।

কেন?

ব্যবসা ভাগ করে নিলাম। এখন মানিক আর আমি আলাদা। মানিকের ক্যাপিটালে ব্যবসা করতাম। টাকা রেখে আর টাকা চেখে লোভ বড় বেড়ে গিয়েছিল। এখন ব্যবসা করব ছোট্ট করে, কম টাকায়।

সারা দিন টাকা রোজগার করার মানেই হয় না। কবিতা লেখার সময়ও তো চাই।

ঠিক কথা। এত দিনে সেটা বুঝলে!

তবু তো বুঝলাম। কমলি, আমার কবিতা আবার ছাপা হচ্ছে। একটা বই বেরোবে।

কমলা গাঢ় গলায় বলে, শোনো, সিন্ধুকে কেন ব্যবসা ছেড়ে দাও না! ওর মতো পাকা মাথা তোমারও নেই। তুমি আগের মতো মাস্টারি আর কবিতা নিয়ে থাকো।

সাগর অবাক হয়ে বলে, এ কী বলছ? তোমার মুখে এই কথা?

নয় কেন? অনেক কষ্ট পেয়ে তো বুঝেছি আমার টাকার চেয়ে তোমাকে অনেক বেশি দরকার।

সাগর উঠে বসল উত্তেজনায়। বলল, সিন্ধুটার কথা কখনও মনে হয়নি। ঠিক বলেছ তো। আমি তো ওকেই পার্টনার করে নিতে পারি।

নেবে?

নিশ্চয়ই। ওকে এক্ষুনি ডাকি।

আজ থাক না। সকালে বরং—

না, না। এক্ষুনি। সিন্ধু! সিন্ধু! বলে ডাকতে ডাকতে সাগর মশারি থেকে বেবিয়ে গেল।

বড় সুখে শুয়ে চেয়ে থাকে কমলা। সেই পাগলাটে, খ্যাপাটে সাগর আবার ফিরে এসেছে তার কাছে! যখন যা মনে হবে তখনই তার করা চাই। এক বার জ্যোৎস্নায় বসে ভাত খেয়েছিল, রাত বারোটার পর কমলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল অন্য বার। সেই লোকটা মাঝখানে খুব হিসেবি হয়ে গেল, বড়লোক হল, ঠান্ডা মেরে গেল। ভগবান আবার সেই কবি স্বামীটিকে তার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

কমলা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে। এত সুখের কান্না কোনও দিন কাঁদেনি।

# ফেরা

বন্ধুগণ, হাওয়া ঘুরছে।

বাতাস এখন ওলটপালট। সামলে। ভয় নেই, সংকট মানেই পরিত্রাণ। বাতাস ঘুরছে। ঘোরার মুখটাতেই যা একটু গোলমাল। ঘরের চাল উড়ে যায়, মাথার ওপর আকাশ বেরিয়ে পড়ে। মড়মড় করে ভেঙে পড়ে গাছের ডাল। মেঘ চমকায়, কড়াত করে বাজ পড়ে। তবু মনে রাখবেন, হাওয়া ঘুরছে। হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে। হাত বদল হচ্ছে পৃথিবীর অধিকার। দেরি নেই।

প্রিয় বন্ধুগণ, হে চলাচলকারী জনসাধারণ, এক দিন আমি বিপ্লবের অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে ফুলেব মালা হাতে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ওপরের ব্যালকনি থেকে উৎসাহ ভরে দেখেছি কত না মিছিল। মিছিলে আমি হেঁটেওছি কত বার, পতাকা বহন করেছি। চেঁচিয়ে বলেছি, আমাকে এটা দাও, সেটা দাও। কিংবা বলেছি— তুমি নিপাত যাও, অমুক নিপাত যাক। পুলিশের কালো গাড়ির ভিতরে বসে জালে আবদ্ধ কলকাতাকে দেখতে দেখতে গেছি জেলে। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক— এই কথা চেঁচিয়ে বলেছি, বলেছি মনে মনে।

সন্ত্রাসবাদের আমলে আমার বয়স হয়নি, আমার বাবার হয়েছিল। কিন্তু তিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, অসহযোগীও না। তিনি ছিলেন খুবই সফল এক রেল-কেরানি। বড় ইংরেজ-ভীরু লোক, আবার স্বদেশিদেরও সম্মান করেছেন বরাবর। কাজে কাঁকি দেননি, তাঁর ক্যাজুয়্যাল লিভ বছর বছর পচে যেত। জ্ঞান-বয়সে একমাত্র দাদুর শ্রাদ্ধের সময়ে, আর দিদির বিয়ের জন্য দু'টি দিন তিনি স্বেচ্ছায় ছুটি নিয়েছিলেন। একেবারে চাকরির শেষ দিকটায় তাঁর প্রমোশন হয়েছিল। শেষ একটা বছর তিনি স্বাধীন ভারতীয় রেলে কমার্শিয়াল ইন্সপেকটর ছিলেন। তাঁর সেই উজ্জ্বল সাফল্যের কথা তিনি এখনও লোককে ডেকে শোনান। এখনও তিনি ইংরেজদের গুণগান করেন। লক্ষ করে দেখেছি, ভারতের স্বাধীনতা কিংবা তজ্জনিত আন্দোলন, কিংবা গান্ধী বা ওই রকম নেতারা, তাঁর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি, যতটা পেরেছিল তৎকালীন ইংরেজ ডি. টি. এস. কিংবা ওপরওয়ালা অন্য কোনও সাহেব।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার এই বাবাটির জন্যই আমি বরাবর মনে মনে বিপ্লবী। দিনশেষে বাবা বাসায় ফিরে রুটি খেতেন, তখন আমরা ছয় ভাইবোন তাঁকে ঘিরে ধরতাম। বাবা ভাগ দিতেন। মা আমাদের তাড়া দিলে তিনি দুই বাহু বাড়িয়ে বলতেন, আহা, থাক, থাক! রাতে পড়া করার সময়ে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে হঠাৎ শুনতে পেতাম, রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বাবা মাকে বলতেন, এবারও হল না, বুঝলে! সান্যাল আমার কত জুনিয়ার, অথচ ও বেরিয়ে গেল প্রমোশন পেয়ে। শুনতাম, মা ঝেঁঝে উঠে বলছেন, তা তুমি করো কী? বাবা উত্তর দিতেন না। ভাবতেন। কখনও বা পড়ার ঘরে এসে বলতেন, ইংরিজিটা ভাল করে শেখো। চাকরিতে কাজে লাগবে। এক বার রেলের এক ফুটবল ফাইনাল দেখতে গেছি। সুন্দর তাঁবুর নীচে ভাল ভাল চেয়ারে সাহেবরা বসে, পাশে মেম, সামনের টেবিলে কাচের গেলাস, অ্যাশ-ট্রে, বেয়ারারা ছোটাছুটি করছে। সেই তাঁবুর পাশে বাবা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে খেলা ছেড়ে, চোর-চোখে, সেইসব সাহেবসুবো দেখছিলেন। আমি বাবাকে দেখছিলাম। সেই বোধ হয় প্রথম আমি বাবার তুচ্ছতা বুঝতে পারি। সেই দৃশ্যটা, বাবার সেই মুখ, একটা বিষ-বিছের কামড়ের মতো লেগে আছে আমার বুকে। খেলার শেষে সাহেবসুবো, খেলোয়াড়দের জন্য লেমনেডের ক্রেট এসে পৌঁছল। বাড়তি বোতলগুলোর জন্য শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। সেই ভিড়ের মধ্যে আমি আমার অসহায় অক্ষম বাবাকে আর-এক বার লক্ষ করি। ঠেলা-ধাক্কায় তাঁর চশমা পিছলে যাচ্ছে নাক থেকে, কোঁচা খুলে পড়ছে, অতি কষ্টে তিনি, যে-লোকটা লেমনেডের বোতল বিলি করছে তার দিকে

দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, তারকদা, আমাকে একটা। এই যে আমি—আমাকে—। অবশেষে একটা বোতল তিনি অতিকষ্টে পেয়েছিলেন। অর্ধেক খেয়ে আমার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে বললেন, খা। খুব মিষ্টি। তাঁর মুখখানায় তখন সেই মিষ্টি স্বাদ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু লেমনেডের বোতলে মুখ দিয়ে সেই প্রথম আমি জীবনের তিক্ততার স্বাদ পাই।

তেতো স্বাদের সেই শুরু। তারপর মাঝে মাঝে আমি ক্রমান্বয়ে সেই তিক্ত স্বাদ পান করেছি। আমাদের ছেলেবেলা খুব সুখের হওয়ার কথা নয়। সুখের ছিলও না। কাটিহারে যে রেল কোয়ার্টারে আমার শৈশবের অনেকটা সময় কাটে, সেটা ছিল খুপরি, অন্ধকার। লালারাম ইনস্টিটিউটের উলটো দিকে রেল ইয়ার্ডের গা ঘেঁষে সেই মোটা দেওয়াল, ছোট্ট ছোট্ট জানালার ঘর। সারা দিন শান্টিং ইঞ্জিনের ধোঁয়া আমাদের বাড়িটার ভিতরে জমে থাকত। সেই কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার আবছায়ায় আমরা দীনভাবে প্রতিপালিত হতাম। ময়লা মশারি, ময়লা বিছানা, রংচটা আয়না, তুচ্ছ আসবাব, অতি নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরে যেমনটা দেখা যায়। সারা বাড়িতে ঝুল ঝুল অন্ধকার বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। অবশ্য আমাদের বেশিরভাগ সময়ই কাটত বাজারের রাস্তায়, প্লাটফর্মে, খালাসিটোলায়, ল্যাংড়াবাগানে। বাইরে থেকে কখনও বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করত না। যতক্ষণ বাইরে থাকা যায় ততক্ষণ আমরা থাকতাম। পড়তে বসেছি, মা হয়তো মশলা আনতে পাঠাল। মশলা আনতে গিয়ে কত বার রাস্তায় বাজিকরের খেলা, কুষ্ঠরোগীর ভিক্ষে চাওয়া, বাঁদরনাচ, খালাসির ছেলেদের মারামারি, নিদেনপক্ষে ইঞ্জিনের শান্টিং দেখে খামোখা খানিকটা সময় কাটিয়ে আসতাম। আমার দুই দিদি সারা দিন ঘুরেফিরে ছোট্ট জানালার মোটা মোটা গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে থাকত। তাদের বাইরে বেরোনোর নিয়ম ছিল না। মনে পড়ে, সে-সময়ে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পেলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না।

এ. টি. এস. সাহেবের ছেলেকে বাবা দশ টাকা মাইনেয় পড়াতেন। সেই বাড়িতে এক বার আমি বাবার সঙ্গে জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে যাই। সেটা ছিল গার্ডেন পার্টি। বিশাল লনে ফুলের কেয়ারি ছিল, কুঞ্জবন ছিল, পাথরে বাঁধানো চাতাল ছিল। তখন শীতকাল, পপি ফুলের বাগানে প্রজাপতির মতো ক্ষীণজীবী ফুলেরা আলগোছে ফুটে আছে। ক্রিসেনথিমাম, সূর্যমুখী, মোরগ ফুল, আর গোলাপের ফাঁকে ফাঁকে রঙিন আলোর ডুম জ্বলছে। দুধের মতো সাদা ঢাকনায় ছোট ছোট টেবিল ঘিরে দু'টো-চারটে করে চেয়ার। টেবিলের ওপর গেলাসে, পাকানো সাদা তোয়ালে, কী সুন্দর সব ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারধারে। সে যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। সেই সব সুন্দর সুগন্ধী শিশুরা যেন বড় হবে বলে পৃথিবীতে আসেনি, তাদের নেই জীবন-যাপন। তারা স্বপ্নরাজ্য থেকে নিমন্ত্রণে এসেছে, আবার ফিরে যাবে। কালো প্যান্ট, বুট আর সাটিনের কোট পরা একটা ছেলে এগিয়ে এসে বাবাকে বলল, মাস্টারমশাই! বাবা তাকে রিবনে বাঁধা একখানা গল্পের বই উপহার দেবেন বলে সঙ্গে করে এনেছিলেন। বইটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই হচ্ছে হিমাদ্রি, সাহেবের ছেলে। ওর জন্মদিন, বইটা ওকে দাও অতনু। আমি দেখেছিলাম জন্মদিনে ও এয়ারগান থেকে শুরু করে অনেক দামি উপহার পেয়েছে, এক সেট ক্রিকেটের সরঞ্জামও। তুচ্ছ বইটা সুন্দর ছেলেটির হাতে দেওয়ার সময়ে আর-এক বার আমার মনে হল, আধ-খাওয়া মিষ্টি একটা লেমনেডের বোতলে মুখ দিয়ে আমার সমস্ত শরীর তেতো স্বাদে ভরে গেল। সেই সুন্দর বাগানের চারপাশে চেয়ে মনে হয়েছিল—এখানে কোথাও আমাকে মানায় না। খবরের কাগজের জামা পরে বসে পশ্চিমা নাপিতের কাছে মাসে এক বার খুব ছোট করে চুল ছাঁটতে হয় আমাদের, পুজোর সময়ে কেনা বছরের বরাদ্দ একজোড়া জুতো কদাচিৎ কালি করা হয়। আমার সবচেয়ে ভাল জামাটি সস্তা রামধনু মার্কা জাপানি সিল্ক থেকে তৈরি, পরনে সাদা মোটা জিনের হাফপ্যান্ট। গায়ে কালো মোটা কুটকুটে কোট—গতবার আমার পিসতুতো দাদার ছোট হয়েছিল বলে আমি পেয়ে যাই। তার ওপর আমরা উপহার এনেছি মাত্র আট আনা কি বারো আনা দামের গল্পের বই। চার দিকের বিস্ময়ের মাঝখানে আমি দিশেহারা। লজ্জায় নিজের ভিতরে ডুবে যাচ্ছি। সেই সময়ে হিমাদ্রির মা এসে বাবাকে বললেন, ওমা, মাস্টারমশাই, আপনি এখানে কেন? আপনি তো বাইরের লোক নন। আমাদের ঘরের লোক। যান ভিতরে গিয়ে বসুন গে। এইটি ছেলে বুঝি। বড্ড রোগা তো—

শ্রেণীবৈষম্যের সেটা হয়তো প্রাথমিক বোধ। একটা স্বপ্নের বাগানে পৃথিবীর ধুলোমাখা পায়ে দু'টি

লোক ঢুকে পড়েছে— আমার শৈশবের শ্রেণী চেতনা ওই দৃশ্যটি থেকে জন্মলাভ করেছিল হয়তো। সেই বাড়িতে আমাদের কোনও অনাদর হয়নি— কেবল সেই বাগানের দৃশ্যটি নিখুঁত রাখার জন্য আমাদের খুবই ভদ্র এবং বিনীতভাবে হিমাদ্রির পড়ার ঘরে সরিয়ে নিয়ে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সে-ঘরটিও সুন্দর। এবং সেখানে হিমাদ্রির দিদির গানের মাস্টারমশাই, হিমাদ্রির বাবার অফিসের বড়বাবু, এ-রকম দু'-চারজন লোক ছিলেন। ছিল তাঁদের ছেলেমেয়েরা। সেখানে আমাদের আদর করে প্রচুর খাবার দেওয়া হয়েছিল। সেই খাবার থেকে আমি গোপনে কোটের পকেটে সন্দেশ আর চানাচুর প্লেট থেকে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে, মা আর ভাই-বোনের জন্য নিয়েছিলাম। কত কী যে খেয়েছিলাম তা আর খেয়াল নেই। তবু তারপর অনেক দিন ধরে আমার কেবলই মনে হত—অত খাবার, অত আপনকরা আদরের চেয়েও যেন ওই স্বপ্নের বাগানটির একটি টেবিল-ঘেরা চেয়ারে এক বার বসতে পাওয়া অনেক বেশি সৌভাগ্যের ছিল। ওই সুন্দর দৃশ্যটি থেকে কেন যে আমাদের বাদ দেওয়া হল। স্কুলের ফুটবল টিমের গ্রুপ ছবি উঠছে এক বার, কালো কাপড়ে ঢাকা সেই রহস্যময় ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়াতে খুব একটা ইচ্ছা ছিল ছেলেবেলায়। তাই অনাহূত আমি সেই ফুটবল টিমের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। বড় ছেলেরা তখন আমাকে বার করে দেয়। সেই দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে কোথাও যেন এই ঘটনার মিল ছিল। যদিও আমাদের বের করে দেওয়া হয়নি, অপমানও করা হয়নি। কেবলমাত্র বাইরের সুন্দর বাগানটির দৃশ্যকে নিখুঁত রাখা হয়েছিল। এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপমান আমার বাবা হয়তো বুঝতে পারতেন না। আমি পারতাম। পারতাম বলেই আমার জীবন ঠিক আমার বাবার মতো হয়নি।

আমার দশ-বারো বছর বয়সে এক বন্ধু জুটেছিল। খুবই রোগা সে। তার কানে পুঁজ, দাঁতে পোকা, হাঁটু আর কনুইয়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘা, পেছনের বেঞ্চে বসা ছেলে। সে পড়া পারত না, মিথ্যে কথা বলত। তার নাম ছিল প্রকাশ। টিফিনের পর প্রায় দিনই সে স্কুল পালাত। কিন্তু বাড়ি ফিরত না। তার বাবা ছিল খালাসি। ঘরে-বাইরে এবং ইস্কুলে সে বেদম মার খেত রোজ। কিন্তু তবু তার স্বভাব পালটাত না। স্কুল পালিয়ে সে প্রায়দিনই গিয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে রেল-ওয়ার্ডে গাড়ির শান্টিং দেখত অনেকক্ষণ। রাস্তায় রাস্তায় মার্বেল খেলত, কিংবা ডাংগুলি। বাজারের মোড়ে যে চোখে ছানিওলা বুড়ো ঢ্যাপের মোয়া বিক্রি করত, তাকে ফাঁকি দিয়ে ঢ্যাপের মোয়া চুরি করত সে। সে স্কুলের ছেলেদের পেনসিল, রবার, পয়সা চুরি করত প্রায়ই। সবাই জানত প্রকাশ চোর। তার পাশে কেউ বসতে চাইত না। টিফিনের সময়ে বা ছুটির পর স্কুলের ছেলেদের খেলাই ছিল প্রকাশকে খ্যাপানো। তার নাম বলতে গিয়ে কেউই শুধু নামটা বলত না। বলত, চোট্টা প্রকাশ, ঘেয়ো প্রকাশ, গান্ধা প্রকাশ। সমস্ত স্কুলটা, নিজের বাড়িটা, বাইরের জগৎটা, সবই ছিল প্রকাশের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রকাশের একটা অদ্ভুত গুণ ছিল এই যে, সে কখনও কাউকে ভয় পেত না। যখন স্কুলের রাস্তায় দশ-বিশজন ছেলে তার পিছনে লাগত, তখন রেগে গিয়ে প্রকাশ বরাবর ঘুরে দাঁড়িয়েছে। একা রোগা প্রকাশ প্রায়দিনই দশ-বিশজনের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে প্রচুর কিল চড় লাথি খেত। কাঁদত। কিন্তু পরদিনও আবার মারপিট করত। খালাসিটোলায়, ল্যাংড়াবাগানে, বাজারে এ-রকম ঘটনা ঘটত হামেশাই। কেউ গাল দিলে, খ্যাপালে, মারলে প্রকাশ ঘুরে দাঁড়াত, মারপিট করত। মার খেত রোজ তবু মারপিট করতে ছাড়ত না। খালাসিটোলার ছেলেরা তাকে রাস্তায় ধুলোয় পিষে দিয়েছিল প্রায়, তবু সে আবার লাগত তাদের সঙ্গে।

প্রকাশের ওই একটিই গুণ ছিল। তার সাহস। বড় দুর্লভ গুণ। মারকুটে, গুন্ডা বদমাশ অনেক ছেলে থাকে, কিন্তু প্রকৃত সাহসী ছেলে কম থাকে। প্রকাশের ওই গুণ আমাকে তার দিকে টানত। আমি গান্ধা, ঘেয়ো, চোর প্রকাশের পাশাপাশি বসতাম। একসঙ্গে স্কুল পালাতাম। ল্যাংড়াবাগানে, সাহেবপাড়ায়, খালাসিটোলায় রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াতাম। প্রকাশের সঙ্গে থাকার ফলে প্রায়ই আমাকে হাঙ্গামায় পড়তে হত। প্রথম প্রথম কিছু দিন মারপিট লাগলে প্রকাশকে একা ফেলে পালিয়ে যেতাম। প্রকাশ তার জন্য কখনও আমাকে দোষ দিত না। সে জানত, তার লড়াই তার একার। একাই সে দশ-বিশটা ছেলের মার হজম করত। তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মারপিট দেখলেই আমার বুক কাঁপতে থাকত, হাত পা যেত অবশ হয়ে, দিশেহারা বোধ করতাম। প্রকাশ সেটা বুঝত। মারপিটের সম্ভাবনা দেখলেই সে চেঁচিয়ে বলত, অতনু, তুই পালা—

আর কোনও বন্ধু ছিল না বলেই প্রকাশ আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। ল্যাংড়াবাগানে গ্রীষ্মের প্রথম সময়ে, দুপুরবেলায়, ছুরিতে কাঁচা আম ছাড়াতে ছাড়াতে প্রকাশ বলত, তোর গায়ে যদি কখনও কেউ হাত দেয় তো তাকে আমি দেখে নেব।

আমি ভেবে পেতাম না, কেউ কখনও কেন আমার গায়ে হাত দেবে। আমি মারকুটে নই, কেউ আমাকে খ্যাপায় না। তাই আমি বলতাম, আমাকে কেউ মারবেই না।

তবু যদি মারে—

আমি তখনই বড়াই করে বলতাম, সাহসই হবে না কারও।

প্রকাশ আমার সেই বৃথা অহংকার দেখে একটুও হাসত না। গম্ভীরভাবে বলত, তা অবশ্য ঠিক।

এক-এক দিন সে গভীরভাবে চিন্তা-টিন্তা করে আমাকে বলত, অতনু, তোর সঙ্গে আমার কখনও আড়ি হবে না।

কেন?

হবে না—দেখিস। আমাদের জন্মের মতো ভাব।

বুঝতাম, তার মন চাইছে আমার সঙ্গে তার জন্মের মতো ভাব থাক। আমি তার একমাত্র বন্ধু, তার আর কেউ নেই। সে বলত, আমার দিদি রেণুদির সঙ্গে সই পাতিয়েছে। তাদের জন্মের মতো ভাব হয়ে গেল, আর কখনও আড়ি হবে না।

তারপর খুব লজ্জার সঙ্গে প্রকাশ বলত, অতনু, সই পাতাবি?

দূর। পুরুষেরা কি সই পাতায়?

তবে? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করত প্রকাশ। তার বন্ধুকে বাঁধবার আর কোনও কৌশল তার মাথায় আসত না।

আমি বরাবর তার বন্ধু থাকব কি না এ-বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারত না বলেই, ঘুরে ঘুরে আমার কাছে আসত। সকালবেলায় পড়তে বসেছি, হঠাৎ জানালায় প্রকাশের হাসি মুখখানি উঁকি মারত, পড়ছিস?

হুঁ।

পড়। এবার দেবীকে হারিয়ে ফার্স্ট হওয়া চাই।

আসলে দেবীকে হারিয়ে ফার্স্ট হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। আমি লেখাপড়ায় নিতান্তই সাধারণ, ফার্স্ট-সেকেন্ডদের ধারেকাছেও নই। তবু প্রকাশ ওই কথা বলত, আমাকে খুশি করার জন্য। আমি হাসতাম।

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলত, তুই খেটে পড়লে ওরা পারবে নাকি?

প্রকাশ আমার জানালার বাইরে থেকে রোজই কথা বলে যেত। কিন্তু বাড়ির ভিতরে আসত খুবই কম। সে এলে আমার দিদিরা, ভাই-বোনেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। সে লজ্জা পেত খুব।

আবার বোকার মতো সে আমার দিদিদের ফাই-ফরমাশও খেটে দিত।

সারা দিন শহরময় ঘুরে বেড়াত প্রকাশ। খালি পায়ে হাঁটত বলে পায়ের নীচে কড়া পড়েছিল, পায়ের পাতাটা পুরো ফেলতে পারত না প্রকাশ। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই সারা শহরে ঘুরত সে। কোথায় কী চুরি করত, কাকে গাল দিত, কার সঙ্গে লাগত কে জানে। এক বার তার সঙ্গে বাজারের ও-ধারে বেল পাড়তে গেছি, ভুঁইয়াদের দশ-বারোটা ছেলে এসে প্রকাশকে ধরল, তুই শালা আমাদের খেতি থেকে শালগম উপড়ে নিয়ে গেছিস।

প্রকাশ উদাস গলায় বলল, আমি না।

আমি পালাব বলে পা বাড়িয়েছি, একটা ছেলে এসে আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরল, এ শালা ভি চোট্টা, এই গান্ধাটার সঙ্গে এটাও ঘোরে।

মার শালাকে—

ভুঁইয়াদের মারকুটে স্বভাব আমার জানা ছিল। ভয় পেয়ে আমি হাত-পা ছুড়ে চেঁচিয়ে বলছি, আমি না। ওই প্রকাশ চোর। ও চুরি করেছে।

কিন্তু ছেলেগুলো ছাড়বে না কিছুতেই। প্রকাশকে দু'জনে ধরে রেখে, একজন তার পিছন থেকে

বগলের নীচে দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘাড়ের ওপর ধরে কুঁজো করে রেখেছে, অন্যজন ধরেছে চুলের মুঠি, চারপাশ থেকে আর সবাই গাল দিচ্ছে আর কিল চড় মারছে। সেই মারের দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে অবশ হয়ে গেলাম, সারা শরীরে ঘাম, তিন-চারজন আমাকে ঘিরে ধরেছে তখন। গাল দিচ্ছে। আমি বোবা হয়ে, বোকার মতো চেয়ে আছি। মারবে! এরা আমাকে মারবে! আমি জীবনে কখনও বাড়ি কিংবা স্কুলের বাইরে এ-রকম হাটুরে মার খাইনি। কিন্তু তারা মারবার আগেই কী কৌশলে প্রকাশ পাঁচ-সাতটা ছেলের হাত ছটকে ছাড়িয়ে এল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এসে রোগা কনুইয়ের ধাক্কায় আমার চারপাশের ছেলেগুলোকে দু'হাতে হটিয়ে দিয়ে বলল, খবরদার, ওর গায়ে হাত দিবি না, আমি চুরি করেছি তো আমার সঙ্গে লড়। বলেই সে দুই হাত আর পা চালাতে লাগল কাঁকড়ার মতো। ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। ওই অবস্থাতেই দৃশ্যটা দেখলাম আমি। পায়ের তলায় কড়া বলে একটু খোঁড়া প্রকাশ, মাথায় আ-ছাঁটা চুলের জন্য তার প্রকাণ্ড মাথাটা রোগা শরীরের ওপর ঝুল-ঝাড়ুনির মতো দেখাচ্ছে, হাতে-পায়ে ঘা, চিট ময়লা নোংরা জামা-কাপড়। তাকে দেখলে এমনিতে হাসি পায়। তবু হাস্যকর চেহারার সেই ছেলেটির তীব্র রাগ আর লড়িয়ে তেজ আমার ভিতরটায় উপর্যুপরি কয়েকটা ছ্যাঁকা দিয়ে দিল। আমি লাফিয়ে উঠলাম। মারধরের কিছুই জানি না। তবু হাতে-পায়ে-দাঁতে-নখে আমি সেই দশ-বারোটা ছেলেকে এলোপাথাড়ি মারতে লাগলাম। মুহূর্ত পরেই আমার মারগুলো ফিরে আসতে লাগল। ঠোঁটে, নাকে, মাথায়, পিঠে। ঠোঁট কেটে রক্তের নোনতা স্বাদ পাচ্ছি, চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে আসছে, টানের চোটে পটাপট ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথার চুল। তবু লড়ে যাচ্ছি। আমার দুর্বল হাত দিয়ে, পা দিয়ে যত দূর সম্ভব মারছি। ক্রমে শিথিল অবশ হয়ে আসছে সারা শরীর, ঘাম দিচ্ছে। পড়ে যাচ্ছি। সেই সময়ে বাজারের দিক থেকে লোকজন ছুটে এসে আমাদের আলাদা করল।

আমার তখন দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অসম্ভব কাঁপছে হাত-পা। রি-রি করে শরীর কাঁপছে। ঘামে ভেজা শরীরে বাতাস লাগতেই শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছি। একটা দোকানের বারান্দায় বসে মুখে চোখে জল চেপে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। পাশে প্রকাশ। সে আমার তিন গুণ মার খেয়েছে। কপালে বিরাট কালশিটে, ঠোঁট কাটা, চুল খাড়া হয়ে আছে, কনুই-হাঁটু ছড়ে গেছে। তবু হাসছে সে। অনাবিল আনন্দের হাসি। আমিও টের পাচ্ছি, আমার ভেতরে কোনও দুঃখ নেই! বড় ঝরঝরে লাগছে ভেতরটা। মার খাওয়ার ভয় এতকাল রোগজীবাণুর মতো আমার ভিতরে ভিতরে ক্ষয় ধরাচ্ছিল। প্রকৃত মার খাওয়ার পর হঠাৎ সেরে গেছে। ফাটা, কাটা, ব্যথার শরীর জুড়ে কোথায় যেন একটা টলটলে জ্বর সেরে যাওয়ার আনন্দ জমে উঠছে। আমি প্রকাশের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। প্রকাশ ফিস ফিস করে বলল, মার খেতে খেতে আমার হাড্ডিগুড্ডি পেকে গেছে—এখন আর লাগে না। তোর বড্ড লেগেছে—না রে?

আমি মাথা নাড়লাম, ও কিছু না। আমারও আর লাগবে না—দেখিস।

এইভাবেই আমার আর-একটা জীবনের শুরু। প্রায় সময়েই আমরা মারপিট করতাম। বেশিরভাগ সময়েই মার খেতাম। তবু একটা নেশার মতো ছিল সেটা, ছিল রোমহর্ষক, আনন্দ।

স্কুলে, পাড়ায় ক্রমশ মারকুটে ছেলে বলে সবাই চিনতে লাগল আমাকে। আমি আর প্রকাশ গোপনে মারপিটের নানা কৌশল আয়ত্ত করতাম! দেয়ালে ঘুষি মারা, দৌড়, নানা রকম প্যাঁচ, হঠাৎ লেঙ্গি মেরে ফেলে দেওয়া—এইসব নানা ছেলেমানুষি কায়দাকানুন। পকেটে গুলতি থাকত, পাথর থাকত, থাকত পেনসিল-কাটা ছুরি। কার্যকালে অবশ্য কেবল হাত-পা-ই চলত। তাতেই আনন্দ ছিল বেশি। আদিম মানুষের হিংস্রতার যেটুকু আমাদের ভিতরে আজও আছে, দাঁতে-নখে লড়াইতেই তার সর্বাধিক তৃপ্তি।

আমার দশ-বারো বছরের জীবনে সেই প্রথম আমি আমার বাবার অসফল হীন জীবনের জন্য পৃথিবীর জন্য পৃথিবীর ওপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করি। কথাটা হয়তো এভাবে বলা ঠিক হল না। কারণ আমার ওই বয়সে প্রতিশোধের কথাটা অমন স্পষ্টভাবে আমিও বুঝতাম না। তবে নিজেদের সংসারে হীনতা, দারিদ্র্য, বছরের পর বছর কেরানি থেকে যাওয়া এবং তার জন্য আক্ষেপ, উপরন্তু সেই ফুটবল মাঠে লেমনেডের বোতলের স্বাদ, এ. টি. এস. সাহেবের ছেলের জন্মদিনে সেই স্বপ্নের বাগান থেকে নির্বাসন— এ-সব কিছুই আমার ভিতরে একটা রাগের ধোঁয়াকে পুঞ্জীভূত করে তুলত। মনে হত, আমাদের চারি দিকে যা-কিছু আছে সবই আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি।

এ-কথা সত্য, আমার ভিতরে সেই বয়সেই মান-অপমানের বোধ বড় প্রবল ছিল, প্রবল ছিল জেদ।

এই জেদের বশেই আমি কিছু কিছু অঘটন ঘটিয়েছি। প্রকাশের সঙ্গে মিশে মারপিট করে তখন আমার বদনাম হয়ে গেছে। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় তিন বিষয়ে ফেল। রাগী মাস্টার ছোটনাগবাবু প্রায়দিনই কান মলে বেত মেরে বলে যেতেন, তোরা যদি পাশ করিস তো আমার হাতের তেলোয় চুল গজাবে। কথাটা আমার হীনম্মন্যতায় গুলির মতো সেঁধিয়ে গিয়েছিল। জেদের বশে আমি পড়াশুনো শুরু করলাম। পড়া দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। তবু এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে মাস্টারমশাইদের বাড়ি গিয়ে পড়া বুঝে আসতাম। অ্যানুয়েল পরীক্ষার তখনও মাস চারেক বাকি। প্রথম মারপিট করার উত্তেজনার মতোই এক উত্তেজনা আমাকে রাতে জাগিয়ে রাখত, ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। খুব পড়তাম। জলের মতো মুখস্থ হয়ে যেত পড়া। তবু ইচ্ছে করেই ক্লাসে পড়া বলতাম না। মাস্টারমশাইরা গাল দিতেন; মারতেন। আমি মনে মনে হাসতাম। সকলের ওপর গোপনে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আড়ালে তৈরি হতাম। দেবীপ্রসাদ চৌবে নামে যে ছেলেটি আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হত, সে যথার্থ ভাল ছেলে ছিল। অ্যানুয়েল পরীক্ষায় তাকে মারতে পারলাম না বটে, কিন্তু অনেকগুলো ছেলেকে ডিঙিয়ে হয়ে গেলাম সেকেন্ড। সমস্ত স্কুলে, পাড়ায়, বাড়িতে হইচই পড়ে গিয়েছিল। ছোটনাগবাবু ভ্রূ তুলে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিলেন, টুকিসনি তো! সবচেয়ে খুশি প্রকাশ। সে নিজে সেকেন্ড হলেও এত খুশি হত না। সে তখন প্রায়ই আমাকে বলত, এবার থেকে তুই ফার্স্ট বেঞ্চে বসবি— না রে? কিন্তু বাইরে আমরা একসঙ্গে ঘুরব তো? ওদিকে আমি সেকেন্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারে একটা প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল। বাবা প্রায়ই মাকে বলতেন, গরিবকে ভগবান দেখেন, বুঝলে? ছেলেটা দেখো, ঠিক মানুষ হবে।

আমাদের গরিবের সংসারে সেই প্রথম একটা গৌরবের ঘটনা ঘটেছিল। সেই গৌরবের স্বাদ পেয়ে আমি পরের বছরও সেকেন্ড হই। হয়ে মাইনর স্কুল ছেড়ে যাই হাই স্কুলে। প্রকাশ সে-বছর পাশ করতে পারল না। হাইস্কুলে আমি তখন হিমাদ্রির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ি। অনেক নতুন বন্ধু আমার। রাস্তায় ঘাটে প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়, সে মুখ গোঁজ করে থাকে। কথা বলতে চায় না। কিন্তু আবার বাসায় আসে, জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলে। সে-সবই অভিমানের কথা। বলে, তুই আমাকে ভুলে গেছিস।

প্রকাশকে সেই বয়সে তখন মাঝে মাঝে আমার ভয় হত। আমার প্রতি তীব্র এক অধিকারবোধ ছিল তার। সেটা সে কখনও ভুলতে পারত না। আমি ভাল ছেলে হয়ে গেছি, চলে গেছি অন্য স্কুলে, আমার অনেক বন্ধু—এইসব দেখেই বোধ হয় তার চোখেমুখে এক তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠত। সে ডাকলে তখনও আমি তার সঙ্গে গেছি ল্যাংড়াবাগানে, খালাসিটোলায়, কুশী নদীর ধারে। কখনও সখনও এক-আধটা মারপিটেও অংশ নিয়েছি। কিন্তু কোথায় যেন দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হচ্ছিল। ব্যবধানটা বোধ হয় এইখানেই যে প্রকাশ তখনও বন্ধুহীন, সঙ্গীহীন, একা। আর, আমার অনেক বন্ধু। মাঝে মাঝে দেখি, প্রকাশ আমার স্কুলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনও কথা নেই. কেবল একটু সতৃষ্ণ চোখে দাঁড়িয়ে থাকা। আমি জিজ্ঞেস করলে লজ্জা পেয়ে, মাথা নেড়ে চলে যেত। কখনও বা এক-আধটা অদ্ভুত কথা বলত। তার কোনও মানে হয় না।

এক দিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি, সে দাঁড়িয়ে আছে। উড়োখুড়ো চুল, খুব বিষণ্ণ মুখ।

কী রে প্রকাশ, কিছু বলবি?

প্রকাশ একটু অপ্রস্তুত হাসল। বলল, অতনু, মা কাল মারা গেছে।

সেই বয়সে মা ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। আমি দুঃখ পেয়ে ওকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, ও একটু রাগের স্বরে বলল, ভালই হয়েছে। মা আমাকে ভীষণ মারত, খুব মারত। মরে গিয়ে ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, মারত কেন?

বলতে বলতে প্রকাশের চোখে জল এসে গেল। তবু শব্দ করে কাঁদল না সে। যেন বা মায়ের ওপর কোনও প্রতিশোধ নেওয়া যায়নি বলেই আক্রোশে সে দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, রোজ মারত আমাকে, জলখাবার কম দিত। বাবার কাছে নালিশ করত রোজ। কেন মারবে? আমার লাগে না? মরে গিয়ে ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে—কেন মারত আমাকে?

অনেকক্ষণ ধরে আমরা রাস্তায় রাস্তায় হাঁটলাম, আর প্রকাশ অনর্গল তার মায়ের ওপর সেই সব আক্রোশের কথা অসংলগ্নভাবে বলে গেল। কিন্তু বার বার তার চোখে জল আসছিল। রাস্তায় ঘাটে

রোজ অবিরল মার খেয়ে যার হাড় পেকে গেছে সেই প্রকাশ তার কনুই তুলে আমাকে খুব অস্পষ্ট একটা দাগ দেখিয়ে বলল, এইখানে এক বার পাখার ডাঁট দিয়ে মেরেছিল, জানিস? কী ভীষণ লেগেছিল আমার! আজও দাগ রয়ে গেছে, দ্যাখ। কখনও আদর করত না—কখ্খনও না।

এইসব কথা বলতে বলতে প্রায় প্রলাপ বকছিল প্রকাশ। ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছিল তার কথা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে আমি তার হাত ধরে বাসার দরজায় যখন পৌঁছে দিলাম সে তখন বলল, জানিস, বাবা মাকে বড্ড মারত। খালাসির রাগ বড় ভীষণ। আমার মনে হয়, মারের চোটেই মা মরে গেছে। তিন-চারদিন আগে ভীষণ মেরেছিল বাবা—

বলতে বলতে একটু থমকে গেল সে। একটু ভাবল। তারপর বলল, কিন্তু বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে, খুব ভাল। কেন মারত—কেন মারত আমাকে?

বলতে বলতে আবার কাঁদতে লাগল প্রকাশ।

তিন-চার মাস বাদে আবার এক দিন স্কুলের রাস্তায় আমাকে ধরল প্রকাশ, অতনু।

কী রে? সস্নেহে বলি। প্রকাশ খুব লাজুক হাসি হেসে বলল, আমার নতুন মা এসেছে।

শুনে চুপ করে থাকি। সৎমায়েরা ভালবাসে না, এইরকম জানা ছিল।

প্রকাশ পায়ের আঙুলে মাটি খুঁটতে খুঁটতে মুখ নিচু করে বলল, নতুন মা খুব সুন্দর। আমাকে ভীষণ ভালবাসে।

আমার বিশ্বাস হল না। মনে হল, প্রকাশ মিথ্যে কথা বলছে।

তবু প্রকাশ বলল, বাবা বলেছিল, তোর তো লেখাপড়া হবে না, সাহেবকে বলে তোকে পোর্টারের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিই। নতুন মা তাতে রাজি হয়নি। বলেছে, আমি যদি পরীক্ষায় সেকেন্ড হতে পারি তো একটা হাওয়া বন্দুক কিনে দেবে। নতুন মা আমাকে খুব ভালবাসে।

প্রকাশ আবার লজ্জা-টজ্জা পেয়ে বলল, আমি নতুন মাকে বলেছি, এবার আমি সেকেন্ড হবই।

আমি অবাক হয়ে বলি, সেকেন্ড কেন প্রকাশ! হলে তুই ফার্স্ট হবি। লোকে তো ফার্স্ট হতেই চেষ্টা করে, সেকেন্ড হয়ে যায়।

প্রকাশ মাথা নেড়ে বলে, না। ফার্স্ট না। ফার্স্ট হয়ে কী হবে! আমি সেকেন্ড হব। তোর মতো।

খুব অবাক হয়েছিলাম। সেই অবাক হওয়ার ঘোর কাটতে-না-কাটতেই আমাদের বদলির অর্ডার এসে গেল। প্রকাশ সেকেন্ড হতে পেরেছিল কি না, তা আর আমার জানা হয়নি। আমাদের চলে যাওয়ার আগে পুরনো বন্ধুরা সবাই দেখা করল। প্রকাশ এল না। দু'দিন তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলাম, সে নেই। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হল না বলে খুব মন খারাপ লাগছিল।

বিকেলের গাড়িতে আমরা কাটিহার ছেড়ে যাচ্ছি। তখন ম্লান আলোয় চরাচর জুড়ে এক অপরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। জানালার ধারে বসে এক পুরনো জগতের হারিয়ে-যাওয়া দেখছি। সরে যাচ্ছে চেনা প্লাটফর্ম, সাহেবপাড়ার রাস্তা, দেবদারুর সারি, ল্যাংড়া আমের বাগান। ক্রমে অচেনা এক জগতের দিকে রেলগাড়ি ঘুরে যাচ্ছে! ইটখোলার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি, সেইসময় হঠাৎ আমার জানালার ধারে ঠং করে জোর একটা ঢিল এসে লাগল। পলকে মাথা সরিয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম। তাকিয়ে দেখি, খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে ছুটছে প্রকাশ। ছুটে রেলগাড়ি থেকে আমার কাছ থেকে দূরে— আরও দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকাশ ওইভাবেই আমাকে বিদায় জানিয়েছিল।

লিচু গাছে ছাওয়া দোমোহানী একটা ঘুমন্ত গঞ্জ। সারা দিন রাস্তায় বাতাস ধুলো ওড়ায়, লোক-চলাচল দেখাই যায় না। একটা স্টেশন, একটু বাজার, রেলের অফিস, আর কোয়ার্টার—এইটুকুতেই দোমোহানী ফুরিয়ে যায়। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের ও-ধার থেকে ঘন বন শুরু হয়ে গেছে। সেইখানে, কাছে গৃহস্থের গোয়ালে মাঝে মাঝে হানা দেয় চিতাবাঘ। একটা নিঝুম ভাব ঘিরে থাকে চার ধারে। পলহোয়েল সাহেবের স্কুলে তখনও ম্যাট্রিকের সিট পড়ে না।

ছুটির দিনে ডি. টি. এস. হুদা সাহেব বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোন। সঙ্গে থাকে আরও দু'-চারজন বন্দুক-হাতে মানুষ, কুকুর, আর্দালি। আমরা পিছু নেই। বেশি দূর যেতে হয় না। দোমোহানীর উপকণ্ঠে গাছগাছালি জুড়ে পাখিদের মেলা। হুদা সাহেব ঘুঘু মারেন, বেলেহাঁস নামিয়ে আনেন, মারেন বনমুরগি। বন্দুক-হাতে মানুষদের পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিমান বলে মনে হয় তখন।

নিজেকে লাগে তেমনি অসহায়। নিরস্ত্র। নির্জীব। একটা খেলনা-বন্দুকের জন্য কত বায়না করেছি। বাবার কিনে দেওয়ার সাধ্য ছিল না। ভারতবর্ষ জুড়ে তখন যে অর্ধনগ্ন ফকির এক অস্ত্রহীন আন্দোলন গড়ে তুলছেন, বাবা আমাকে সেই গল্প বলতেন। বলতেন, ব্রিটিশদের কত কামান-বন্দুক-সৈন্য, গান্ধীর তো কিছুই নেই। যাদের চরিত্র আছে, তাদের অস্ত্র লাগে না।

বাবা মুখে গল্প বলতেন বটে, কিন্তু কার্যত তিনি ছিলেন রাজভক্ত। ব্রিটিশের গুণমুগ্ধ, তাঁর কাজকর্মে তাই বিন্দুমাত্র অসহযোগ থাকত না। রেলের ইউনিয়নকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন বাঙালিদের সহিংস আন্দোলনকে। সন্ত্রাস তাঁর দু' চোখের বিষ ছিল। ব্রিটিশরা চলে যাবে— এ ছিল তাঁর কল্পনার অতীত।

আমি গুলতি তৈরি করে নিতাম, বানাতাম টিনের তলোয়ার। বাখারির ধনুক আর তির। পশু-পক্ষীর ওপর আমার শত্রুতা ছিল না। ছেলেবেলাতেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম আমাদের শত্রু এক ধরনের মানুষ। তারা দেখতে শুনতে অনেকটা আমাদের মতোই, আবার পুরোপুরি আমাদের মতো নয়। আমার অদৃশ্য লড়াই ছিল তাদের সঙ্গে কল্পনায়। তাই আমার তির ছুটত না। গুলতির পাথর পকেটেই থেকে যেত।

আমার বাবা তখন স্টোরের বাবু। স্টোরের বাবুদের কিছু আয় থাকে। আমার বাবারও হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। ওই আয়টুকুর জন্য বাবা বড় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। রেলের গুদামে এক ধরনের লোহার রিং পাওয়া যেত। সেই রিং-এ চাকা চালানো ছিল মজার খেলা। চাকা চালানো আমাদের ছেলেবেলায় যত প্রিয় ছিল, এখন আর তত নেই। সেই রিং কত দিন বাবার কাছে চেয়েছি। বাবা ভয়ে দেননি, পাছে লোকে সন্দেহ করে। আবার হয়তো দিয়েছেন, খুব চুপেচাপে। সাবধান করে দিয়েছেন, খুব সাবধান বাবা, চালাতে হয় তো নির্জন নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে চালাবে।

বলতে গেলে এই ভীরুতাই তাঁর উন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল। সৎ বা অসৎ—মানুষ যা-ই হোক না কেন, জোরের সঙ্গে না হলে তার কোনও মূল্য নেই। আমার বাবাকে দেখে তা আমি বুঝেছি।

অপর দিকে, ছেলেবেলায় প্রকাশের সঙ্গে মিশে আর তার সঙ্গে নানা জায়গায় মারপিট করে আমার ভীরুতা ঝরে গিয়েছিল। সাহসী ছেলে বলে আমার খ্যাতি ছিল। সেই ছেলেবেলাতেও আমার অনুকারী সঙ্গীর অভাব ছিল না। আমি ছিলাম স্কুলের মনিটর।

ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমার পড়াশুনোর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কাছাকাছি কলেজ নেই! হোস্টেলে থাকবার সামর্থ্য নেই। বাবা দরখাস্ত করলেন, এমন জায়গায় তাঁকে বদলি করা হোক যেখানে কলেজ আছে। অনেক দরবার করলেন বাবা, সাহেবদের ঢাকা খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। অবশেষে তাঁকে শিলিগুড়িতে বদলি করা হল। জলপাইগুড়ির কলেজে আমি ভরতি হলাম।

জলপাইগুড়িতে আমি আমার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের স্বাদ পাই। তখন সদ্য দেশ ভাগ হয়েছে। পশ্চিমবাংলা. আসাম জুড়ে পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়ছে মানুষ। আমরা ভলান্টিয়ার হয়ে খাটি, আশ্রয়শিবিরে গিয়ে শরণার্থীদের তদারক করি। প্রায়দিনই বাসায় থাকি না। লেখাপড়া চুলোয় যাচ্ছে। নিজের বাসা, স্কুল বা কলেজের সীমাবদ্ধতা থেকে হঠাৎ এক বৃহৎ মানব পরিবারের ভিতরে গিয়ে পড়েছি তখন। মানুষকে দেখার একটা নেশা আছে, সহজে তা ছাড়া যায় না। আমার ভিতরে তখন সবসময়ে এক উত্তেজনা, একটা আক্ষেপ ফেটে বেরোতে চায়। রেলস্টেশনে একটা বউকে দেখেছিলাম যে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে খাওয়াতে হত। তার সঙ্গীরা বলত, বউটা বাঁচবে না। গ্রামে যখন লুঠেরা আগুন দেয় বউটার ছেলে তখন বিছানায় ঘুমোচ্ছে। ঘরে আগুন লাগতেই বউটা ঘরে ঢুকে ছেলে কোলে নিয়ে দৌড়তে থাকে। প্রায় মাইলখানেক দূরের রেল স্টেশনে এসে দেখে খুব অবাক হয়ে যায়--- কোলে ছেলে তো নেই। ছেলের কোলবালিশটা বুকে করে নিয়ে

এসেছে সে। দিশেহারা হয়ে ছেলের বদলে...। বউটা কথা বলত না, খেতে চাইত না, বিরক্ত হয়ে তার স্বামী তাকে মারত। আমরা গিয়ে লোকটাকে ধমক-চমক করলে লোকটা হাউ মাউ করে বলত, বাবু, ছেলে গেছে, এখন বউটাও যদি যায় তবে আমার থাকে কী? আপনারা ওরে একটু কাঁদান। নইলে ও বাঁচবে না।

মনে পড়ে, বীথি নামে একটি মেয়েকে দেখতাম, যে ছিল ধর্ষিতা। অল্পবয়সেই সে তাই বড় উদাসীন আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। জল-কাদার মধ্যে অতি নড়বড়ে বাঁশের ঘরে যে-সব অসুবিধার মধ্যে উদ্বাস্তুরা থাকত, তার মধ্যেই সে ছিল। যখন রিলিফের জিনিস আমরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে যেতাম সে কখনও এসে হাত পাতেনি। যেন বা এ-জন্মের মতো তার খাওয়া-পরার সাধ ঘুচে গেছে। এক দিন সে লজ্জায় আমাকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞেস করেছিল, এখানে খারাপ মেয়েছেলেরা কোথায় থাকে। আমার বয়স তখন কম, একটি যুবতী মেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলাম, তা দিয়ে কী হবে? মেয়েটা হেসে বলল, এদের সঙ্গে থাকা ভাল দেখায় না। আমি তো নষ্ট হয়ে গেছি, খারাপ মেয়েদের সঙ্গেই থাকা ভাল।

উদ্বাস্তু শিবিরগুলি ছিল সরাইখানার মতো। সেখানে কেউ দু'-চার-ছ' মাসের বেশি থাকত না। পাকাপাকি আস্তানার সন্ধান পেলেই চলে যেত কাছাড়ে, উত্তরবাংলা, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার কোথাও, কিংবা উত্তর বা পূর্ব আসামে। কিন্তু শিবিরগুলো খালি থাকত না বড় একটা। কাতার দিয়ে মানুষ আসত। সেই অল্প বয়সেই তাই আমি আকণ্ঠ মানুষের বহমান এক ধারাতে নিমজ্জিত ছিলাম। প্রাণপণ খাটতাম আমরা। কিন্তু মানুষের তুলনায় রিলিফ নেহাত অল্প পাওয়া যেত। এমনও হয়েছে, নিজেদের বাড়ি থেকে পুরনো কাপড়, চাল ডাল পয়সা এনে দিয়েছি। কিন্তু তাতে কিছু হত না। মানুষের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে অসহায় লাগত নিজেকে। দেখতাম, আড়কাঠিরা মেয়ে ধরার জন্য ঘুরছে, উত্তর আসামের চা-বাগানের জন্য নিয়ে যাচ্ছে মজুর, ডোলের চাল বেশি দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে মহাজন। সোনাদানার সন্ধানে আসে লোক, ঘটিবাটির জন্য আসে চোর। আর সবার অলক্ষ্যে মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে আসে কলেরা। এ-সবের মধ্যেও এক ধরনের লোক এসে উদ্বাস্তুদের জড়ো করে বক্তৃতা দিয়ে বলত, সরকার অনেক টাকা দিচ্ছে, চাল ডাল কাপড় দিচ্ছে তোমাদের। কিন্তু ভাইসব, দালাল আর আমলাদের জন্য তোমরা তা পাচ্ছ না। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তোমরা সজাগ হও, কেড়ে নাও—ইত্যাদি। এ-সবের ফলে মাঝে মাঝে রিলিফ বিলি করতে গিয়ে আমরা মুশকিলে পড়ে যেতাম। উদ্বাস্তুরা দল বেঁধে আসত, জোচ্চোর, তোমরাই সব মেরে দিচ্ছ। আমরা পাচ্ছি না।

মাঝে মাঝে মনে হত এইবার রিলিফের কাজ ছেড়ে আবার কলেজের ক্লাসঘরে পালিয়ে যাই। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় জীবনের তিক্তস্বাদ পেতাম। কিন্তু নেশা। মানুষের নেশা বড় মারাত্মক। রিলিফের কাজে আমার তখন বেশ নাম-ডাক। কংগ্রেস নেতারা পরিদর্শনে এসে আমার খোঁজ করেন। সভা হলে আমাকেও মঞ্চে ডাকা হয়। রিলিফের রিপোর্ট তৈরি করি, টাকাপয়সার হিসেব রাখি। কেউ কেউ চোর বলে মনে করে, কেউ কেউ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায়, খাতির রাখে। এমন কিছু খারাপ লাগে না। রিলিফের অফিসঘরেই মাঝে মাঝে রাতে শুয়ে থাকি। বাসায় মা ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে জেগে উঠে হয়তো অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করেন, অনু, এলি নাকি! বাবা বিরক্ত হন। ভাইবোনেরা হতাশ। বাসার ভাল ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক নষ্ট বলা যায় না, তবে কী রকম যেন!

বাবা এক দিন আমাকে ডেকে বললেন, অনু, মানুষের জন্য তুমি করো, এ ভালই। কিন্তু মানুষের ওই দুঃখ-দুর্দশা যেন তোমার বা তোমার পরিবারের ভাগ্যে না ঘটে, তোমাকে বা তোমার পরিবারকে যেন পরের দয়ায় বা সাহায্যে বেঁচে থাকতে না হয়—এ তুমি নিশ্চয়ই চাও। আমি গরিব, তোমাদের ভালভাবে মানুষ করতে পারছি না, কিন্তু যেটুকু সুযোগ আছে তা কাজে না লাগালে এক দিন তোমাদেরও পরের দয়ার জন্য বসে থাকতে হবে। সে বড় ভয়ানক। আজ তুমি পরিত্রাতা হয়েছ—ভালই, কিন্তু এক দিন যখন তুমি নিজেই আর্ত হবে তখন?

আমি বাবার মুখের দিকে চেয়ে সেই পুরনো ভয় এবং ভবিষ্যৎচিন্তা দেখলাম। কী জানি কেন নিজেকে নিয়ে আমার কোনও ভয় বা ভবিষ্যৎচিন্তা ছিল না। বাসার সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভিতরে ভিতরে ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-শোওয়ার কোনও ঠিক ছিল না। দীন-দরিদ্র

ভিখিরিদের সঙ্গেই তখন আমার সারা দিন ওঠাবসা। তাদের দেখে নিজের ভবিষ্যতের ভয় আমার কখন কেটে গিয়েছিল। প্রবহমান এক মনুষ্যধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারতাম না। স্কুলবাড়ির একটা ঘরে বেঞ্চ জোড়া দিয়ে আমরা কয়েকজন ভলান্টিয়ার শুয়ে থাকতাম। ছারপোকা কামড়াত, মশার জ্বালায় ঘুম হত না। বাইরে এসে নিঝুম চরাচরের দিকে চেয়ে বসে থাকতাম। স্নিগ্ধ রাত্রিটি ঘিরে ধরত আমাকে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অনুভব করার সেই ছিল সবচেয়ে সুন্দর সময়। বহু লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে প্রাচীন নক্ষত্রের আলো এসে স্পর্শ করত আমাকে, শীতল চাঁদের আলোয় ছিল স্বপ্নময় অবগাহন। আকাশের হিম অন্ধকারের দিকে চেয়ে এক শব্দহীন মহাসমুদ্রের অন্তহীনতাকে অনুভব করতাম। কখন আমার আমি হারিয়ে যেত। মনে হত কে আমাকে ডেকে বলছে, শোনো যতি, শোনো সন্ন্যাসী, পৃথিবীতে তোমার শয়ন হবে এই ভূমিশয্যা। তোমার গৃহের ছাদ হবে ওই আকাশ, তোমার আহার ভিক্ষালব্ধ অন্ন। তোমাকে আমি দেব না কিছুই, তুমি চলো দেখি। এক-একদিন সেই নিঝুম মহাশূন্যের মাঝখানটিতে বসে রাত গভীর হয়ে যেত। আমার মনে হত আমার জীবন, মাটি ও আকাশের মাঝখানে যে সহজ প্রসার সেইখানে গড়ে উঠবে। সহজ মানুষের মধ্যে। আমি আর কিছুই চাই না।

আমার বাবা তাঁর গৃহকে ভালবেসেছিলেন, গৃহস্থালী ছিল তাঁর প্রিয়, তিনি ঘরের বাইরে মানুষের প্রবহমানতায় কখনও গা ভাসাননি। তাই তাঁর সুখ-দুঃখের পরিমাপও ছিল ছোট, সীমাবদ্ধ। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি কিছুতেই তাঁর মতো হব না। কী জানি কেন, ঘরের চেয়ে বাইরেটাই ক্রমে আমার প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সারা দিন কাজের অবধি ছিল না। কাজ চাইলেই কাজ এসে ঘাড়ে পড়ে। জমি দখল করে উদ্বাস্তু বসতি গড়ে তুলতে চলে যাই ডুয়ার্সের কোন গর্ভে, কোথায় কোথায় যে। ডাবগ্রাম, মাটিগাড়া, বীরপাড়া, আমবাড়ি। যেখানেই যাই, চেনা মানুষেরা ছেঁকে ধরে। জঙ্গল কেটে বসত হচ্ছে মাত্র, কিন্তু চাষের জমি নেই, খাবার নেই, রুজি নেই, ব্যবসার মূলধন নেই, সমস্যা বিশাল এবং ব্যাপক। লোকেরা আমাকে উদ্বাস্তু শিবিরে কাজ করতে দেখেছে, তারা দেখেছে আমাকে নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে, বক্তৃতা দিতে। তাদের ধারণা আমি সরকারের লোক। কাজেই তারা রাজ্যের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আসে। সমাধান চায়। আমার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু চেষ্টা ছিল। অবিরল সেই চেষ্টা। লড়াই। কিন্তু মানুষের অসহায়তা বরাবর তার কাছে ফিরে আসে। এইসব কাজে ডুবে থাকতে থাকতেই খবর আসে, বড়দির বিয়ে হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে আমার যাওয়া হল না। জামাইবাবুকে দেখলামই না।

আলিপুরদুয়ারে তখন সদ্য এক রেলওয়ে জংশন গড়ে উঠেছে। আসাম লিঙ্কের নতুন রেল লাইনের কাজ প্রায় শেষ। কোর্টে একটা মামলার সাক্ষী দিয়ে ফিরছিলাম। তখন হঠাৎ ইচ্ছে হল, রেল-কলোনিটা দেখে যাই। একটা জনপদ তৈরি হচ্ছে, কত লোকের বসত হবে। দেখে যাই।

সন্ধে হয় হয়। নির্জন রেল-কলোনির অনেক বাড়ি খালি পড়ে আছে, রাস্তায় চাঙড় চাঙড় পাথর সাজানো হয়েছে মাত্র। সে-রাস্তায় চলা যায় না, পাশের মেঠো পথ দিয়ে চলতে হয়। চারি দিকে জল-কাদা। বাজারের দিকে কিছু লোক চোখে পড়ে মাত্র, আর সব নিরালা, নিঝুম। বাজারের পাশে ছোট্ট একটা মাঠ। তখন ঝুঁঝকো আঁধার নেমে আসছে। দেখি, সেই মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা সভা বসেছে। কুড়ি-পঁচিশজন কুলি-কামারি গোছের লোক, দু'-চারজন বিড়ি-বাঁধিয়ে। কিছু পিওন-আর্দালি খালাসি বসে আছে। মঞ্চ নেই, একটা ন্যাংটো টেবিলের পাশে দুটি লোহার চেয়ার। বাঁশের উপর একটা লাল ঝান্ডা উড়ছে। একটা চেয়ারে একজন চশমা পরা লোক বসে আছে। একজন রোগা, লম্বা, কালো লোক খুব চেঁচিয়ে মেঠো গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে। হ্যাজাক নেই, কোনও আলো নেই, দিনের আলো মরে আসছে, সেই মরা আলোয় বক্তার মুখখানা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। কয়েক পলক সেই হাস্যকর সভাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলাম সভাস্থলীতে। শুনি, লম্বা রোগা কালো মানুষটা তার শ্রোতাবৃন্দকে একটা সংগ্রামে নামতে আহ্বান জানাচ্ছে। তখন তার বক্তৃতার শেষ পর্যায়। খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল সে। বুঝতে পারছিলাম, হ্যাজাক জ্বালার সংস্থান তাদের নেই। দিনের আলো ফুরোবার আগেই তাই সভা শেষ করতে হবে। সভা ঘেঁষে আমি ঘাসে বসে পড়লাম। বক্তার মুখখানা শেষবেলার আলোতে তখনও সামান্য দেখা যাচ্ছে। কুয়াশায় আবছা হয়ে গেছে স্মৃতি, তবু

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে হঠাৎ মনে হল, মুখখানা প্রকাশের। লোকটা ঘাসের ওপর থেকে একটা চোঙা তুলে নিয়ে সভাশেষে স্লোগান দিচ্ছে তখন, বলছে, কহিয়ে আপলোক, ইনকিলাব—

সবাই বলল, জিন্দাবাদ।

সভা শেষ হল! লোক দু'টো তাড়াতাড়ি টেবিল, চেয়ার, চোঙা, ঝান্ডা গোছাতে লাগল। ধরাধরি করে তুলল পাশের দরজির দোকানে। শ্রোতৃবৃন্দ নির্বিকার বসে রইল, কেউ কেউ বিষয়কর্মে উঠে গেল, কেউ গিয়ে বসল মাঠের ধারে পেচ্ছাপ করতে।

আমি গিয়ে লোকটাকে ধরলাম, প্রকাশ না তুই?

বড় চমকে গেল লোকটা।

রেলের চাকরির এই এক সুবিধে। কোনও মানুষই হারিয়ে যায় না। ঘুরে-ফিরে দেখা হয়ে যায়। পুরনো মানুষ ফিরে আসে, পুরনো জায়গায় ফিরে যাওয়া যায়।

দেখি ঝগড়াটে, ঘেয়ো, গান্ধা প্রকাশ আর নেই। ছিপছিপে, টান টান চেহারার ছেলেটির মুখে-চোখে বাড়ন্ত বয়সের কাঁচা লাবণ্য। যদিও সে রোগা তবু একটা সতেজ দীপ্তি গোটা মানুষটা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে। প্রকাশ দু' হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল, অতনু, তোকে আমি একটুও ভুলিনি। একটুও না।

একসঙ্গে হুড়মুড় করে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। কাটিহারের পাড়ায় পাড়ায় আমাদের দু'জনের কীর্তি, কত মারপিট, প্রকাশের সেকেন্ড হওয়ার ইচ্ছে, এ টি. এস. সাহেবের বাগানে সেই জন্মদিনের বিকেল, প্রকাশের অদ্ভুত বিদায় জানানো— সব একসঙ্গে ঠেলে উঠছিল বুকের ভিতরে। যন্ত্রণাময় একটা আবেগ টের পেয়ে আমি প্রকাশের দুই হাত জোরে চেপে ধরলাম। আমার হারানো পৃথিবী, আমার শৈশব ঝড়ের মতো ফিরে আসছিল। বললাম, প্রকাশ মনে পড়ে? সব মনে পড়ে?

প্রকাশ মাথা নাড়ে, সব। আমি কিছুই ভুলিনি।

তুই এখানে কী করছিস?

চল, বলছি।

প্রকাশ তার লোকজনদের কাছে বিদায় নিয়ে এল।

আলিপুরদুয়ার জংশনের নিঝুম রেল-কলোনিতে অন্ধকার নেমে আসছে। ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে অনেক। বালি, ইট, সুরকি আর লোহালক্কড় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। গোধূলির কুয়াশা ঝুলে আছে মাঠে-ঘাটে। রাস্তার পাথরে, গর্তে হোঁচট খেতে খেতে দু'জনে হাঁটছি। প্রকাশ বলছে, বাবা মারা গেল। তাড়াতাড়িই মরার কথা ছিল তার। অত মদ খেলে লোকে বেশি দিন বাঁচে না। তার ওপর ওই খাটনি, খেতেও পেত না তেমন। আমার মা মরে যাওয়াতে বাবা খুব খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। নতুন মাকেও ভীষণ মারত, আমাকেও। সৎমা সম্পর্কে কত কথা শোনা যায়। কিন্তু আমার সৎমা খারাপ হওয়ার সুযোগই পায়নি। তার ছেলেপুলে হয়নি বলে আমাকে ভালবাসত খুব। তার ওপর বাবার ওই অত্যাচার আমাদের দু'জনকে আরও এক করে তুলেছিল। বাবা আমাকে মারলে নতুন মা এসে বুক দিয়ে পড়ত, নতুন মাকে মারলে আমি গিয়ে ঠেকাতাম! অতনু, অত্যাচার এবং দুঃখকষ্ট চিরকাল মানুষকে একতাবদ্ধ করছে—আমার ঘরে সেটা আমি নিত্য দেখতাম। তারপর যথারীতি বাবা মারা গেলে আমরা হাঁফ ছাড়লাম! তখন দেখি আমার নিস্পর, রক্তের সম্পর্কহীন নতুন মা কবে আমার আসল মা হয়ে গেছে। আমাদের দু'জনের আমরা দু'জন ছাড়া কেউ নেই। তখন আমাদের অবস্থা বড় খারাপ। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের সামান্য টাকা পেতে কী যে কষ্ট গেছে। তার ওপর রেল থেকে তখন বার বার তাগাদা দিচ্ছে কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে। আমরা মাহাতোদের বস্তিতে উঠে গেলাম, মা'র দু'-একটা গয়না বেচে কিছু দিন চলল। তারপর মাকে নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরে সাহায্য চাইলাম। এমনকী স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছেও গিয়ে কত বার চেয়েছি। স্কুলের ছেলেরা চাঁদা তুলে সাহায্য করত। ক্রমে ক্রমে আমরা একেবারে সমাজের নিচু তলায় নেমে যাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমরা এইভাবে ভিখারি হয়ে যাব। একএকদিন মাকে লুকিয়ে পূর্ণিয়ার শাটল ট্রেনে উঠে, অচেনা লোকজনের কাছে ভিক্ষে করেও এসেছি। মা ঘোমটায় মুখ ঢেকে আমাকে নিয়ে সাহেবদের বাড়ি বাড়ি যেত, বলত, আমার এই ছেলেকে চাকরি দিন, নইলে আমরা মরে যাব। অতি কষ্টে একটা ক্লিনারের চাকরি পেলাম। কয়েক বছর পর এখন ফায়ারম্যান হয়ে এসেছি। মা আর আমি—আমরা বেঁচে গেলাম।

বলে হাসল প্রকাশ। বলল, অনু, এখনও বেঁচে আছি রে। মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। আমার ছেলেবেলাটা বড় অন্ধকার। ছেলেবেলার কথা ভাবলে এখনও শিউরে উঠি। মাতাল বাবা সন্ধেবেলা ফিরে কত কাণ্ড করত। ভাতের হাঁড়িতে পেচ্ছাপ করত, বিছানায় বমি, মা'কে ভীষণ মারত! আমার মা ওই মার সইতে না পেরেই মরে যায়। বেঁচে থাকতে কত কষ্ট পেত। তার ওপর আমি ছিলাম ওইরকম—সারা দিন বাইরে বাইরে ঝগড়া করে বেড়াতাম, মারধর খেতাম, চুরি করতাম। ঘরে ফিরলে মা মারত, মারত মাতাল বাবা, খেতে পেতাম না। এখনও কী করে বেঁচে আছি—ভাবলে অবাক লাগে। নতুন মা'কে নিয়ে আমার সংসার, চাকরি করে পয়সা হাতে পাই, খাই পরি নিজের মনের মতো থাকি—এ যেন আমার জীবনই নয়। এই জীবনযাপন করতে করতে মাঝে মাঝে যখন সেইসব দিনের কথা ভাবি তখন বড় অস্থির লাগে। আমার শিশুকালটা কেন অমন অন্ধকার, ভয়ংকর ছিল? কেন শৈশবের কোনও সুখস্মৃতি আমার নেই— যা সকলের থাকে! কেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে আমার জীবন থেকে আমার সবচেয়ে ভাল সময়টা! ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারি, এ-জগতে অভাবের মতো দুঃখ নেই। জটিল কার্যকারণসূত্রে সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের আচার-ব্যবহার, চরিত্র, মনুষ্যত্ব। এখন আমি এইসব নিয়ে খুব ভাবি। আমার ছেলেবেলা, দেশের অর্থনীতি, মানুষের ভবিষ্যৎ—এই সবকিছুর সম্পর্ক আবছাভাবে বুঝতে পারি। ভিতরে ভিতরে অস্থির হই, কখনও রাগে ফেটে পড়ি, কখনও শান্তভাবে সমাধানের উপায় ভাবি। এক দিন রেলের ইউনিয়নের সুপ্রিয় গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাকে ট্রেড-ইউনিয়ন বোঝালেন, বোঝালেন মানুষের মৌলিক অধিকার, শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণীযুদ্ধ, দাবি আদায়, স্বার্থ-সচেতনতা। আমার এলোমেলো চিন্তাগুলি সাজিয়ে দিলেন তিনি। এখন বুঝতে পারি— কেন নিচুতলার পরিবারে মানুষে মানুষে ভালবাসার গিঁট আলগা হয়ে যায়, ভাগ্যনির্ভর মানুষ সুদিনের অপেক্ষা করতে করতে কী করে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, কী করে অদেখা শ্রেণীর লড়াইয়ে উঁচুতলার মানুষ গরিবের সংগ্রাম করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। অতনু, আমি ইউনিয়নে নেমেছি। চোঙ ফুঁকে মিটিং করি। মিটিঙে লোক হয় না! কিন্তু দেখিস, আমি এটুকু করেই ছাড়ব না, আমি মানুষের জন্য বিরাট লড়াই করব। মার খাব, মরে যাব, তবু লড়বই।

রেল লাইন পেরিয়ে প্রকাশের বাসা। সেইখানে ছোট্ট হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে প্রকাশের নতুন মা প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে বসে আছেন। প্রকাশ বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে বলল, মা, দ্যাখো, কাকে এনেছি।

শান্ত চোখে তিনি আমাকে দেখলেন। চিনতে পারলেন না। কিন্তু ছেলের মতোই আদরে নিলেন ঘরে। একখানাই ঘর, ভিতরে বারান্দা আছে, সেই বারান্দাটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে প্রকাশ তার স্টাডি বানিয়েছে। সেখানে ছোট্ট তক্তাপোশে সে শোয়। কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের ওপর রাজ্যের রাজনীতির বই, ইশতেহার, ইউনিয়নের সার্কুলারের খসড়া, প্রকাশের লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি।

দু'দিন আমি প্রকাশের কাছে রইলাম। দু'টো দিন আমার কাটল প্রকাশের রাজনৈতিক বই আর ইশতেহার পড়ে। প্রকাশের সঙ্গে পুরনো কথা যত না হল তার চেয়ে ঢের বেশি হল ট্রেড ইউনিয়ন এবং রাজনীতির কথা। এতকাল মানুষ নিয়ে আমি যত ভেবেছি, মানুষের জন্য আমার আবেগ বা ভালবাসা, মানুষের প্রতি আমার রাগ বা ঘৃণা, অভিমান বা উপেক্ষা— সবকিছুই ওই দু'দিনে অন্য রকম চেহারা নিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, রাজনীতি নামে এক বিশাল রহস্যময় জগৎ আছে। প্রকাশের জীবনে একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে। সে আর তার নিজের পরিবারে আটকে নেই। সে ক্রমে মানুষের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে। আমার বড় লোভ হল।

দু'দিন পর যখন চলে আসব তখন খেতে বসিয়ে প্রকাশের নতুন মা বললেন, বাবা, পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই আমার, যা আছে আমার সব নিজের হাতে গড়ে নেওয়া সম্পর্ক। ওই যে প্রকাশ— ও আমার ছেলে— ভালবাসাই ওকে আমার ছেলে করেছে, নইলে কেউ না। তুমি আমার প্রকাশের চেয়ে পর নও—তাই আপন বলে আমার কাছে এসো।

দেখলাম, প্রকাশ যা করে তার সব তাতেই তার মায়ের সায় আছে। বুঝলাম, প্রকাশের হবে। ওর নতুন মা ওর কমরেড। ওর বাসা, ওর সংগ্রামেব ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়।

সে-বয়সটা আশা-ভরসা করার পক্ষে সুন্দর বয়স। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথটা

আমি গভীর চিন্তায় ডুবে রইলাম। মানুষের বৃহৎ পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমার ছিল না কেবল সুবিন্যস্ত, অস্তিবাচক চিন্তাশক্তি। প্রকাশ আমাকে এইটে ধরিয়ে দিয়েছে। বড় নেশার মতো লাগছিল।

ফিরে এসে শুনি, আমার বাবা প্রমোশন পেয়েছেন। শিগগিরই তিনি পাণ্ডুতে বদলি হয়ে যাবেন। বাড়িতে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

কেন জানি না, এই পারিবারিক আনন্দে আমি নির্বিকার রইলাম। আমার মন বলছিল, ছোট 'পাওয়া' মানুষকে তার বৃহৎ 'পাওয়া'র সংগ্রাম থেকে দূরে নিয়ে যায়।

বিপ্লব, লড়াই, অধিকারের জন্য সংগ্রাম, মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক মুক্তি, সাম্য—এইসব শব্দ সেই বয়সে কী ভীষণ মাদকতাময় ছিল। আমাদের বুকের ভিতরের বাতাস এইসব শব্দে বাঙ্ময় হয়ে উঠত। শরীর মনকে মুচড়ে বেজে উঠত বৃহৎ পৃথিবীর ডাক। মনে হত, আমি লেনিন।

সুপ্রিয় গুপ্ত আমাদের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম গুরু। কিন্তু তিনি নিজে ট্রেড-ইউনিয়নের বাইরে আসতে চাইতেন না। বাইরের রাজনীতি তোমরা করো— এই কথা বলতেন প্রায়ই। প্রকাশও ট্রেড ইউনিয়নে আটকে ছিল। আমার সে-রকম কোনও বাধা ছিল না। আমার দু'টি চমৎকার গুণ ছিল। আমি যা নিজে বুঝতাম তা সহজেই অন্য সবাইকে বোঝাতে পারতাম, আর আমি সহজেই অন্যের মাথায় আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে পারতাম। রাজনৈতিক নেতারা আমার কার্যকলাপে মনোযোগী হতে শুরু করলেন। উত্তরবাংলা এবং আসামে আমি দ্রুত সংগঠন শুরু করি। সুপ্রিয় গুপ্তর দল আমাকে তাদের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে বাবা যে-বাসা পেয়েছিলেন আমি সেখানে মাঝে মাঝে যেতাম। দুই-একদিন থেকে আবার বেরিয়ে পড়তাম। তখন আমার অল্পস্বল্প নাম-ডাক হয়েছে, এম-পি, এম-এল-এ, মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার মেলামেশা অবাধ, বড় অফিসাররাও আমাকে একটু-আধটু খাতির করে। এইসব দেখেই বোধ হয় বাবা বুক বেঁধেছিলেন। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করতেন না। কেবল মা আমাকে বাসায় গেলেই চেপে ধরতেন, অনু, তুই যে পার্টি করিস, এ-সব কিন্তু ভাল না। লোকে নানা কথা বলে।

কী বলে?

বলে ও-সব বিয়ে করার পার্টি। যে-সব ছেলেদের চাকরি হয় না, আর যে-সব মেয়েদের বিয়ে হয় না তারাই নাকি পার্টি করে। একসঙ্গে ওঠে-বসে, তারপব হুট হাট নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে ফেলে। আজকাল নাকি যে-সব কুচ্ছিত মেয়ের বিয়ে হয় না তাদের বাবারা তাদের পার্টিতে ভিড়িয়ে দেয়। পার্টি করতে করতে তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

শুনে আমি মায়ের ওপর ভীষণ রাগ করি।

কিন্তু মা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সন্তানের স্বার্থরক্ষায় কোন মা কবে পিছ-পা হয়েছে। আমি রাগ করলে মা'ও শাসিয়ে বলে, যদি কোনও দিন তুমি পার্টির মেয়ে বিয়ে করে আনো, তবে আমি গলায় দড়ি দেব—মনে রেখো!

আমি তখন মা'কে খ্যাপানোর জন্য বলি, পার্টির মেয়ে খারাপ হবে কেন! আমাদের সঙ্গে অনেক মেয়ে কাজ করে, তারা বেশ সুন্দর লেখাপড়া জানা মেয়ে, কেমন বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে!

শুনে মা'র চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলে, ও, এইসব হচ্ছে! তাই বলি, অনু আমার এত বাউন্ডুলে হয়ে গেল কেন! দাঁড়াও, তোমার বাবাকে বলছি।

মাকে ওইরকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রেখে আমি আবার বেরিয়ে পড়তাম।

লামডিং-এর কালী মিত্র ছিলেন আমাদের দলের একজন বড় ট্রেড ইউনিয়নিস্ট। তিনি চাকরি করতেন না, ছিলেন পার্টির হোল-টাইমার। তাঁর কাজ ছিল, প্রায়দিনই থানার মাঠে ঝান্ডা পুঁতে একটা টেবিল. একজোড়া চেয়ার পেতে চোঙা ফুঁকে বক্তৃতা করা। রেল-কর্মচারীদের স্বার্থ-সচেতন করে

তুলতেন, অফিসারদের দুর্নীতির বিবিধ উদাহরণ দিতেন তথ্য সহযোগে। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন। পার্টিতে তাঁর সুনাম ছিল না। শোনা যেত, ক্লাস থ্রি এবং ক্লাস ফোর কর্মচারীদের বদলি রদ করা, সাসপেনশন অর্ডারের প্রত্যাহার, বিশেষ জায়গায় বদলি করা, ইত্যাদি কাজের জন্য তিনি টাকা খেতেন। উপরন্তু বুকিং ক্লার্ক, স্টেশন মাস্টারদের ঘুষ এবং হ্যান্ডলিং থেকে তাঁর নিয়মিত রোজগার ছিল। কিন্তু তাঁর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি নিপুণ গোয়েন্দার মতো রেলের দপ্তর থেকে সব গোপন তথ্য জোগাড় করতে পারতেন। এইটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। প্রতিটি কর্মচারী থেকে অফিসাররাও তাঁকে ভয় পেতেন। কালী মিত্রের কোপ কখন কার ওপর পড়ে তার ঠিক ছিল না! কিন্তু যার ওপর পড়ত তার দুর্গতি হতই। কারণ, কালী মিত্র সঠিক তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে প্রকাশ্য সভায় সব ফাঁস করতেন। হইচই পড়ে যেত। অন্তত তিনজন জেলা অফিসারকে তিনি লামডিং থেকে তাড়িয়েছিলেন। ফলে অফিসাররাও তাঁকে খাতির করতেন। পার্টিও তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করত না।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কালী মিত্র আমাদের ইউনিয়ন ছেড়ে সরকারি ইউনিয়নে যোগ দিয়েছেন। আমি রেলের ইউনিয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। আমার কাজ ছিল চা-বাগানের শ্রমিক, চাষি, স্কুল শিক্ষক, উদ্বাস্তুদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করা। তবু সুপ্রিয় গুপ্ত আমাকে ডেকে বললেন, অতনু, কালীদার মতো ওয়ার্কার চলে গেলে ক্ষতি হবে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, তিনি থাকতে চাইছেন না। তোমার আইডিয়াগুলো খুব ফ্রেশ, বলতে কইতেও জানো, তোমার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও আছে। দ্যাখো তো কালীদাকে ফেরাতে পারো কি না। কিন্তু মনে রেখো, লোকটা ঝুনো ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, পলিটিকাল থিয়োরির ধার ধারেন না। যত দূর সম্ভব নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে লোকটাকে পটাতে চেষ্টা করবে, আদর্শের কথা বেশি বোলো না।

লামডিং সুন্দর টিলার শহর। রেল লাইনের পশ্চিম ধারে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। সেই মাঠে ক্রিকেট খেলা হয়, ফুটবল, বেসবল নামে, সাহেবসুবোরা একসময়ে এটাকে গলফ্ লিঙ্ক বানিয়েছিলেন। লেভেলক্রসিং পার হলেই দেখা যায়, একটা চওড়া সুরকির রাস্তা মাঠকে ডাইনে ফেলে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে। টিলার পর টিলা, ঝাউ আর শাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্নের মতো বাংলোবাড়ি সব। সেখানে নীলাভ আলো জ্বলে, অর্গ্যান্ডির পরদা ওড়ে হাওয়ায়, অফিসার্স ক্লাব থেকে ইংরিজি বাজনা ভেসে আসে, হুল্লোড়ের শব্দ শোনা যায়। সেই রাস্তায় হাঁটলে মনে হবে এ যেন বিদেশ। এখানে যে-সব সুখী মানুষ বাস করে তারা কেউ ভারতের অর্থনীতির শরিক নন, তাঁরা বিদেশি, তাঁরা অন্য পৃথিবীর মানুষ।

অন্য দিকে রেল লাইনের পূব ধারে কয়েকটা টিলার ওপর বাবুদের বাস। আরও এগোলে ক্রমে শহরটা ছোট ঘিঞ্জি আর নোংরা হয়ে এসেছে। কাঁচা ড্রেনের গন্ধ, ইট-ওঠা সরু রাস্তা, বস্তির মতো বাড়ি, মাতালের এলোমেলো পদক্ষেপ, রাস্তায় ন্যাংটা ছেলেমেয়ে। এ দিকে এলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, এই শহরের অন্য দিকটাই এক অবিশ্বাস্য সুন্দর বিদেশ, যেখানে বিদেশি সুখী মানুষেরা বাস করে। প্রতিটি শহরেরই আলাদা চরিত্র থাকে।

এই ঘিঞ্জি এলাকায় একটা ছোট্ট কাঠের বাড়িতে পা দিয়ে দেখি, সামনের বারান্দায় একটা ময়লা তেলচিটে ইজিচেয়ারে একজন একা মানুষ আধশোয়া হয়ে আছে। হাড়-বের-করা রুক্ষ চেহারা, গালে গর্ত, চোখে চশমা। অনেক লড়াইয়ের চিহ্ন তার শরীরে ফুটে আছে। কঠিন বাস্তব তার রক্তরস নিংড়ে একটা ছিবড়ে মানুষকে ফেলে রেখে গেছে। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে দেখি লোকটা বড় অন্যমনস্ক, হাতে সিগারেট জ্বলে যাচ্ছে, লম্বা হয়ে ঝুলে আছে সিগারেটের পতনোন্মুখ ছাই। দেখি লোকটা পশ্চিম দিকের সেই স্বপ্নের সুন্দর শহরটার দিকে চেয়ে আছে যেন। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে হল, লোকটা স্বপ্ন দেখছে। ওই যে পশ্চিমের সুন্দর শহর, ওইখানে কোনও দিন তার যাওয়া হয়নি, সুখী মানুষদের একজন সে হয়নি কখনও, তার ঘরে ওড়েনি অর্গ্যান্ডির পরদা। অভিশপ্ত কিছু মানুষের একজন সে হয়ে রইল চিরকাল, লড়াই করেছে অনেক—কিন্তু স্বপ্নের শহর রয়ে গেল দূরে। যাওয়া হল না! ক্রমে বয়স বেড়ে গেল, পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যায় বিশাল হাহাকারের গহ্বরে ভরা একটা জীবন তার, মুঠো খুললে দেখা যায় প্রাপ্তি—শূন্য। তাই এই ভর সন্ধ্যায় একা নির্জন মানুষটি স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখছে, সে পশ্চিমের ওই শহরটিতে চলে যাবে।

কালী মিত্র মুখ তুলে আমাকে দেখলেন। সিগারেটের ছাই খসে পড়ল। আমাকে চিনতে পেরে হাসলেন, এসো অতনু।

নির্দেশ ছিল, যেন রাজনৈতিক আদর্শের কথা না তুলি। যেন ব্যক্তিগত প্রভাব দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু তার কিছুই দরকার হল না। দলত্যাগী কালী মিত্র যেন তাঁর সব কথা কাউকে বলার জন্য তৈরিই ছিলেন। আমাকে পেয়ে বেঁচে গেলেন।

পরিপাটি কথায় যিনি ওস্তাদ সেই কালী মিত্র সেই সন্ধ্যায় খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। যেমন, প্রথমেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, অতনু, বিয়ে করেছ?

আমি মাথা নাড়লাম।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন, তোমার আর বয়স কী! বিয়ে করার অনেক সময় পাবে। কিন্তু আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ। আমি এখনও বিয়ে করিনি। অতনু, তুমি কাউকে ভালবাসো?

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন, আমি একজনকে ভালবাসি। বিশ বছর ধরে বাসি। তার বয়স এখন উনচল্লিশ। বিশ বছর আগে সে যেমন সুন্দর দেখতে ছিল, এখন আর তেমন নেই। মোটা হয়ে গেছে, মুখে মেচাতা পড়েছে, চামড়া ঝুলে গেছে। খুব এক ঢাল চুল ছিল তার, এখন সে-সব কিছুই নেই। গত বিশ বছরে আমরা আমাদের সুন্দর বয়সটা হারিয়েছি। কিন্তু আর না। অতনু, তোমার বাবা এখনও চাকরি করেন, বোধ হয় কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর। না?

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি বললেন, তা হলে তোমাকে কখনও তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তেমন চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু সেই ষোলো-সতেরো বছর বয়স থেকে আমাকে সংসার টানতে হয়েছে। কী করে টেনেছি তা ভগবান জানেন। বিড়ি বেঁধেছি, বোকাজানে গুড়ের কারবার করেছি, কাপড়ের গাঁট ফিরি করেছি। আমার পড়াশুনো বেশি না। মার্কস-লেনিন-গান্ধী— আমি কিছুই বুঝি না। যারা বোঝে তারা আমার চেয়ে বেশি কাজ করেনি। আমি হার্ডেনড পলিটিশিয়ান। বিশ বছর আগে ছিলাম ফার্স্ট ফায়ারম্যান। আর ক'দিন পরেই ড্রাইভার হওয়ার কথা। সেই সময়ে রেল ইঞ্জিনের বড় টানাটানি, মালগাড়ির বগির খুব চাহিদা। আসামের এই অঞ্চলে তখন রাস্তাঘাট হয়নি, একমাত্র রেলওয়েই ভরসা। এই চাহিদার সুযোগে মার্চেন্টদের কাছ থেকে সাহেবরা দু'হাতে পয়সা লুটত। একটা পুরো মালগাড়ির জন্য কয়েক হাজার টাকার লেনদেন হত। সেইসময়ে আমাদের ইঞ্জিনের স্টিম ব্রেকটা গড়বড় করছিল। ইঞ্জিন 'শেড'-এ দেওয়া হয়েছে, মেরামতি তখনও হয়নি—সেই সময়ে ইয়ার্ডে একটা গাড়ির অর্ডার হয়েছে। গাড়ি তৈরি, ইঞ্জিন নেই। খবর পেয়ে সাহেবদের মাথায় হাত। তক্ষুনি সাহেবরা লোকোশেডে ফোন করে সেই ডিফেকটিভ ইঞ্জিন বের করতে বললেন। আমরা আপত্তি করলাম, সাহেব ধমক দিলেন, ওইটুকু ডিফেকট কিছুই না। আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমার চেয়ে তোমরা বেশি জানো? আমাদের উপায় ছিল না, ইঞ্জিন বের করলাম। তিনসুকিয়ার কাছে সিগন্যাল না পেয়ে গাড়ি থামাতে গিয়ে টের পেলাম স্টিম ব্রেক কাজ করছে না, ওদিকে গাড়িটাতে ভ্যাকুয়ামও দেওয়া হয়নি। গাড়ি সিগন্যাল পেরিয়ে দুটো পয়েন্ট ফাটিয়ে ডিরেল হল, পাঁচ-ছ'খানা বগি উলটে গিয়ে মালপত্র সব নষ্ট। ইনসপেকশন হল, ইঞ্জিনের গলদ ধরা পড়ল, রিপোর্ট গেল। আমরা সাসপেনশন অর্ডার পেলাম। সাহেব যে ওই ইঞ্জিন নিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করেছিলেন তা আমরা লিখিতভাবে জানালাম। কাজ হল না। সাহেব স্বীকার করলেন না। আমরা আন্দোলন শুরু করলাম, অ্যাকসিডেন্টের জন্য চিরকাল ড্রাইভার-ফায়ারম্যান কিংবা পয়েন্টসম্যানদের চাকরি যায়, এবার থেকে অ্যাকসিডেন্টের জন্য সাহেবদেরও কৈফিয়ত তলব করা হোক। সেই আন্দোলনে কেউ গুরুত্ব দিল না। জীবনের শুরুতেই ওই রকম ঘা খেয়ে কেমন হয়ে গেলাম। এক দিন রাতে সোজা চলে গেলাম সাহেবের বাংলোয়। বললাম, দেখা করতে চাই। সাহেব বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমার হাতে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ছিল, সেইটে দিয়ে মাথায় মারলাম। অফিসার মানুষ—ভাল খায়দায়, জীবনীশক্তি বেশি, কিছু হল না। আমার জেল হল, চাকরি গেল। জেল থেকে বেরিয়ে আমি ইউনিয়ন করা শুরু করি। অতনু, আসামের এই অঞ্চলে আমি প্রায় একা রেলের ইউনিয়নকে জোরদার করে তুলি। তুমি জানো?

আমি মাথা নাড়লাম।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বললেন, ইউনিয়ন করতাম, বিড়ি বাঁধতাম, গুড় বেচতাম, কাপড়ের গাঁট ফিরি করতাম। আমার পরিবার প্রতিপালন এবং আন্দোলন—দুই-ই এই দুই হাতে করেছি। বিশ বছর প্রতিশোধের নেশা ছিল, আন্দোলনের নেশা ছিল। বিশ বছরে—আমি বিয়ে করিনি, বিশ বছর একটি সুন্দর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। অপেক্ষা করতে করতে তার যৌবন কেটে গেল, ঝরে গেল রূপ, এক ঢাল চুল পাতলা হয়ে গেল। বিশ বছর ধরে আমি কী আন্দোলন করেছি— হিসেব করতে গিয়ে দেখি—বিশ বছরে আমি কিছু স্বার্থপর লোভী লোকের বদলি আটকেছি, সাসপেনশন রদ করেছি, ঘুষ ধরেছি কিংবা আরও অনেক কিছু করেছি— কিন্তু তাতে কী হয়েছে? কিছু না, অভাবে অভাবে আমার চরিত্র নষ্ট হয়েছে, টাকা খেয়েছি, বদনাম কিনেছি। এর বেশি আর কিছু হওয়ার নেই আমার। বলেছি তো, আমি মার্কস-লেনিন-গান্ধী বুঝি না। আমি সহজ হিসেব-নিকেশ করে দেখেছি— আমার যা পাওয়া উচিত ছিল আমি তা পাইনি। কিন্তু অন্যেরা আমাকে ভাঙিয়ে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। অতনু, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এখন হঠাৎ আমার নিজেকে বড় বোকা-বোকা লাগছে। অতনু, সুপ্রিয়দাকে বোলো, আমার লড়াই আমি করেছি। আর আমার কিছু করার নেই। এখন জীবন থেকে আমি কিছু পেতে চাই। মরবার আগে যেন অন্তত এক বার মনে হয়— জীবনটা সুন্দর ছিল।

নিমেষে আমি ছোবল তুললাম। দেখলাম ব্যক্তিগত স্বার্থের দুর্বলতম স্বপ্নে নুয়ে পড়েছে একটি শক্ত-সমর্থ লোক। কাঠ-জোয়ান, লড়াকু একটা মানুষ—মানুষের বৃহৎ লড়াই, সামগ্রিক সংগ্রাম, যৌথ স্বার্থ ভুলে পশ্চিম লামডিঙের টিলার সুন্দর শহরের স্বপ্ন দেখছে। এমন একটা মানুষ যদি এইভাবে সকলের চোখের সামনে ভেঙে পড়ে তবে বহু ছেলেই আত্মবিশ্বাস হারাবে। আমি কালী মিত্রকে বললাম, দাদা, আমিও এই কাজে নেমেছি। আমারও সুখের সংসার নয়...ইত্যাদি।

কালী মিত্র কেবল মিটিমিটি হাসলেন, বললেন, আমি জানি অতনু, তোমার মতো সৎ কর্মী পার্টিতে বেশি নেই। তুমি অনেক দূরে উঠবে। কিন্তু সকলেই এ-রকম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। আমি যা করেছি তা একটা প্রতিশোধের জন্য। তা পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাকে ছেড়ে দাও। বিপ্লবের অর্থ প্রতি বছর পালটে যাচ্ছে, পার্টি কেবলই তার সংগ্রামের দিক পালটাচ্ছে। বড় দামাল সময় এখন। এত ওলট-পালটের মধ্যে আমি বড় বেমানান। আমি তো কবে থেমে গেছি। আমার সাধ্য নেই তোমাদের সঙ্গে চলি। কাজেই আমাকে ছুটি দাও। চাকরিতে রিটায়ারমেন্ট আছে, রিটায়ার করার পর মানুষ তার নিজস্ব জীবনযাপন করে। তেমনি আমাকে রিটায়ার করতে দাও। আমাকে ভুলে যাও।

আমি যত বার ছোবল তুলি, তিনি তত বার মিষ্টি হেসে ধুলোপড়া মন্ত্র দিয়ে দেন। তারপর একসময় হঠাৎ উঠে বললেন, চলো, আমার সঙ্গে এক জায়গায়।

বেশি দূর না। ঘিঞ্জি পাড়ার আর-একটু ভিতরে একটা দরিদ্র বাড়িতে তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে। বাইরে থেকে ডাক দিলেন, বিভা বিভা—

বিভা এসে সামনে দাঁড়ালেন। ময়লা শাড়ি, দেহে গার্হস্থ্যের নির্ভুল ছাপ। এককালে সুন্দরী ছিলেন— বোঝা যায়। আমাদের ঘরে নিয়ে বসালেন। হ্যারিকেনের আলোটা উসকে দিয়েই বিভা আমার দিকে তীব্র চোখে তাকালেন। সেই চোখে অনেক প্রশ্ন ছিল এবং সংশয় আর ভয়। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করলেন না। কালী মিত্র বললেন, পার্টির ছেলে। খুব চোখা। ওর নাম শুনেছ বোধ হয়, অতনু সেন। চারটে চা-বাগানে একনাগাড়ে পনেরো দিন ধর্মঘট করিয়েছিল একা। খুব হইচই হয়েছিল।

বিভা বললেন. শুনেছি।

কালী মিত্র বললেন, ও আমাকে ফেরাতে এসেছে।

বলে হাসলেন। বিভা কথা বললেন না, কিন্তু অনেকক্ষণ সংশয়ের চোখে দেখলেন আমাকে। বুঝলাম, তিনি খুব ভয় পেয়েছেন।

কালী মিত্র বললেন, তুমি চা করে আনো, আমরা বসছি।

বিভা চলে গেলে কালী মিত্র বললেন, এটা ওর দাদার সংসার। বিশ বছর ও এই সংসারে পড়ে আছে। দাদারা সামান্য দোকানদার। সংসারে অনটন, বউদিরা ভাল ব্যবহার করে না। অনেক ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সব ও ভেঙে দিয়েছে বলে কেউ ওকে ভাল চোখে দেখে না। আমার সঙ্গে

মেশে বলে পাড়াতেও যথেষ্ট নিন্দে আছে ওর নামে। এই সংসারে ও কাপড় কাচে, বাসন মাজে, ছেলে মানুষ করে, খেতে-পরতে পায় না, আদর-ভালবাসা নেই। বিশ বছর ধরে ও এই জীবনযাপন করছে। অতনু, এটা কত বড় স্বার্থত্যাগ তা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল।

আমি বললাম, আপনি পার্টিতে থেকেও তো বিয়ে করতে পারেন—

কালী মিত্র হাসলেন, শুধু বিয়ের জন্য পার্টি ছাড়ছি—কে বলেছে! ওকে এতকাল ইচ্ছে করেই কষ্ট দিয়েছি। বিয়ে করবার কথা মনেই হত না। কথা উঠলে বলতাম—অপেক্ষা করো, এখন অনেক কাজ। কাজে কাজে বেলা বয়ে গেল। কত কাজ করেছি এতকাল! তারপর হঠাৎ মনে হল, পুরোটাই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকির হাত থেকে বাঁচতে হলে দু'টো কাজই একসঙ্গে করব। পার্টি ছাড়ব, বিয়েও করব। রেল থেকে অনেক দিন ধরে আমাকে অফার দিয়েছে। সরকারি ইউনিয়নে গেলে আমাকে ওরা বড় চাকরি দেবে। আমি হব ওয়েলফেয়ার অফিসার, ইচ্ছেমতো জায়গায় পোস্টিং পাব, আমার বাংলো হবে। আমি ওদের বড় জ্বালাচ্ছি, তাই আমাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা ওদের খুব দরকার।

আমি কিছু বলার জন্য মাথা তুলেছিলাম। তুলে দেখি, কালী মিত্র ছোট চোখে আমাকে তীক্ষ্ণভাবে দেখছেন। আমি মুখ তুলতেই প্রসন্ন, শান্ত হাসি হাসলেন, বললেন, রাগ কোরো না। আমি বিস্তর মানুষ দেখেছি। একটু প্রমোশন, একটা বদলি, একটু অপরাধের মার্জনা—এ-সবের জন্য মানুষ কী প্রচণ্ড ছোটাছুটি ধরাধরি করে। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো, বুড়ো বয়সে কমার্শিয়াল ইন্সপেকটর হতে তাঁর কী রকম ধকল গেছে। সব মানুষই সুখে থাকার জন্য এ-সব করছে— আমার অপরাধ কোথায়? তা ছাড়া ভেবে দেখো, অ্যাকসিডেন্ট করে অন্যায়ভাবে চাকরি না গেলে আজ আমার ফোরম্যান কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা। চাকরি না গেলে আমি পার্টিতে কিংবা ট্রেড ইউনিয়নে আসতাম না, ফোবম্যান বা অফিসার হতাম। হলে কি কেউ আমার দোষ দেখত? তা হলে এখন ওয়েলফেয়ার অফিসার হলেই বা তোমরা আমার দোষ দেখবে কেন?

বিভা চা নিয়ে এলেন। তারপর চুপচাপ ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কালী মিত্র বললেন, বিভা, তুমি অতনুকে কিছু বলো।

বিভা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন এসেছেন?

বললাম, এমনিই। দেখা করতে।

বিভা মাথা নাড়লেন, না। পার্টি থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম, না, ঠিক তা নয়।

বিভা হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে বললেন, আমি জানি। আপনি—আপনি এসেছেন ওকে—

কালী মিত্র হেসে উঠলেন। বিভা ওঁর দিকে চেয়ে ধমক দিলেন, তুমি হেসো না। তারপর আমার দিকে ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, আপনি ওকে খুন করতে এসেছেন।

ভীষণ চমকে উঠে বললাম, সে কী?

কালী মিত্র হাসছিলেন। বললেন, ওর ওই এক ভয়। ও কেবলই ভাবে, দলকে বিট্রে করছি বলে আমাকে খুন করা হবে। এর আগে পার্টি থেকে যারা এসেছে তাদেরও ও এই কথা বলেছে।

কালী মিত্র একটু শ্বাস ছেড়ে বললেন, না বিভা, আমাকে কেউ খুন করবে না। এখন কেউ আর আদর্শের জন্য খুন করার রিস্ক নেয় না, স্বদেশি আমলে যেমন নিত। এখনকার রাজনীতি আলাদা। তোমার ভয় নেই, অতনু খুন করতে আসেনি।

বিভা নতমুখ হলেন। মুখ তুলে সজল চোখে বললেন, আমার এক দাদা স্বদেশি করতে করতে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশিরা তাঁকে সন্দেহ করে খুন করেছিল। সেই থেকে আমার ভয়।

আমার ভিতরটা রাগে, ঘেন্নায় ফেটে যাচ্ছিল। চায়ের কাপ রেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আমি খুন করতে আসিনি। খুন করার দরকারই বা কী? মানুষটাকে তো মরতেই দেখে গেলাম।

কালী মিত্র হাসছিলেন। অবিরল হাসছিলেন।

বেরিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। বললেন, অতনু, তোমাকে দু'-একটা ইনফর্মেশন দিয়ে রাখি। আমরা সবাই ক্যারিয়ারিস্ট। একটা বয়সের পর আমরা কেউ খামোখা রাজনীতি করি না। সুপ্রিয় গুপ্ত বড় ট্রেড ইউনিয়নিস্ট। তাঁর ত্যাগও অনেক। আমি খবর রাখি, তিনি অফিস করেন না বলে

মাসের শেষে মাত্র বাইশ-তেইশ টাকা মাইনে পান। সার্ভিস রুল অনুযায়ী খুব শিগগিরই তাঁর চাকরি যাবে। তখন কী হবে জানো? এক দিকে রেলের কর্মচারীরা চাঁদা তুলে তাঁর হয়ে মামলা লড়বে, অন্য দিকে পার্টি তাঁকে খুব ভাল কনস্টিটুয়েন্সি থেকে পার্লামেন্টারি সিটের জন্য দেবে নমিনেশন। তিনি রিটার্নড হবেন। সব ঠিক হয়ে আছে। এম-পি হওয়াটা একটা মস্ত ক্যারিয়ার অতনু, সারা ভারতবর্ষে মাত্র শ' পাঁচেক লোক হতে পারে। সেই তুলনায় একটা সামান্য ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি কিছুই না।

বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

আমি জ্বলতে লাগলাম।

ছ' মাসের মধ্যেই কালী মিত্র ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে গোরক্ষপুরে চলে গেলেন। বিয়ে করেছেন, তাও শুনলাম। লামডিঙের রেলের ইউনিয়ন বেশ একটা ঘা খেল।

বছরখানেক পর। এক দিন মাল জংশনে একটা চা-বাগানে মিটিং করে ফিরছি। স্টেশনে প্রকাশের সঙ্গে দেখা। বিমর্ষ মুখে সে বলল, অতনু, সুপ্রিয়দার চাকরি গেছে।

অবাক হলাম না। কালী মিত্র ঝানু লোক। ঠিক খবর রাখত।

স্টেশনের স্টলে দাঁড়িয়ে দু'জনে চা খাচ্ছিলাম! প্রকাশ বলল, আমরা চাঁদা তুলছি, মামলা করব।

আমি হাসলাম, বললাম, চাকরি গেলেই বা কী! পার্টি তাকে পার্লামেন্টারি সিটে নমিনেশন দেবে।

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল, কী করে জানলি?

এক বছর আগে থেকেই জানি।

প্রকাশ অবিশ্বাসে বলল, যাঃ। মোটে দু' দিন আগে পার্টির মিটিঙে এ-রকম একটা কথা উঠেছিল। এখনও কথাটা পাকা নয়। এক বছর আগে কেউ জানতই না যে এমন হঠাৎ সুপ্রিয়দার চাকরি যাবে।

আমি বললাম, প্রকাশ, আমরা অনেক কিছুই জানি না। আমাদের জানানো হয় না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই ছক-বাঁধা হয়ে আছে এক-দেড় বছর আগে। কালী মিত্র ঠিক এইটাই আমাকে বলেছিল।

প্রকাশ ঠোঁট উলটে বলল, কালী মিত্র। ও নিজেই তো আসামের অ্যাসেম্বলির সিটে নমিনেশন চেয়েছিল। জোচ্চোর লোক, ওকে নমিনেশন দিলে পার্টির বদনাম হবে বলে দেয়নি। সেই জ্বালায় আজেবাজে বলত।

আমি হেসে বললাম, তোর কথাই হয়তো ঠিক। তবু, সুপ্রিয়দার যে চাকরি যাবে, আর পার্টি তাঁকে পার্লামেন্টে পাঠানোর চেষ্টা করবে— এটা কালী মিত্র খুব আন্দাজে বলেনি। একটা কিছু আঁচ করেছিল। আমরা যারা ফিল্ড ওয়ার্কার বা সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নিস্ট তারা অনেক কিছুই জানি না, প্রকাশ।

প্রকাশ কথাটা মানতে চাইছিল না। কিন্তু তাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম, তোরা খামোখা মামলা করছিস কেন! যদি সুপ্রিয়দা পার্লামেন্টে যায়, তা হলে আর মামলা করে কী হবে? তোরা জিতলে সুপ্রিয়দা আবার চাকরিতে ফিরে আসবেন?

প্রকাশ মাথা নাড়ে, তা কেন? তাঁর সংগ্রামের ক্ষেত্র অনেক দূর বিস্তৃত হল। আমাদের দাবি-দাওয়া তিনি সরাসরি পার্লামেন্টে তুলতে পারবেন। তিনি ফিরবেন না, কিন্তু তাঁকে যে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা আমরা সবাইকে বুঝিয়ে দেব।

আমি বললাম, খামোখা। সার্ভিস রুল অনুযায়ী তাঁর চাকরি গেছে। লড়ে জিতলেও তিনি ফিরবেন না। তবে কেন গরিব কর্মচারীদের টাকার অপব্যবহার করব!

শুনে প্রকাশ রেগে গেল, বলল, তুই এ-সব কী বলছিস? সুপ্রিয়দার জন্য আমরা লড়ব না! তিনি সারা জীবন আমাদের জন্য লড়েছেন!

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। কিন্তু বার বার দুশ্চরিত্র, দলত্যাগী কালী মিত্রর কথাটা আমার মনে পড়ছিল— একটা বয়সের পর আমরা কেউ আর খামোখা রাজনীতি করি না। আমরা সবাই ক্যারিয়ারিস্ট। সুপ্রিয়দার ব্যাপারটা এমনিতে দেখতে গেলে খুবই সাধারণ। কোনও অন্যায় নেই এর

মধ্যে, চুরি নেই, চরিত্রহীনতা নেই। কিন্তু আমার মন কেবলই বলছিল, ব্যাপারটা যেন গোপনে ছক বাঁধা হয়েছিল! তবে কি পার্টি কাউকে কাউকে গোপনে লোভ দেখিয়ে জিইয়ে রাখে! প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমার চাকরি গেলে তোমাকে এম-পি বা এম-এল-এ বানাব? যদি তাই হয় তবে আমরা সুপ্রিয়দা বা কালী মিত্রর মতো লোককে চিরকাল হারাব। প্রকাশের চোখে হয়তো কালী মিত্রর অফিসার হওয়া আর সুপ্রিয় গুপ্তর এম-পি হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমার কাছে আবছাভাবে দু'টিই এক কার্যকারণসূত্রে বাঁধা বলে মনে হচ্ছিল।

প্রকাশের সঙ্গে আর খুব বেশি কথা হল না। আসাম লিঙ্ক এসে পড়ল। সে চলে গেল আলিপুরদুয়ারের দিকে। আমি রাতের গাড়িতে শিলিগুড়ি রওনা হলাম। আমার ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন ছোট্ট পোকার কামড়ের মতো যন্ত্রণা হচ্ছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, মানুষের জন্য আমরা যে-সব সংগ্রাম এতকাল ধরে করেছি— সব বৃথা যাবে। গৃহসুখ, অর্থসুখ, ভবিষ্যৎ— এই সব ভেবে যোদ্ধারা যুদ্ধ শেষ না-করেই রণক্ষেত্র ছেড়ে যাচ্ছেন, মানুষের সংগ্রাম পড়ে থাকছে। বিপ্লবের পথ বেঁকে যাচ্ছে গার্হস্থ্যের দিকে। বনের সন্ন্যাসী ফিরে যাচ্ছে ঘরে।

সেবার সুপ্রিয় গুপ্ত বিহারের একটা বাই-ইলেকশনে জিতে পার্লামেন্টে গেলেন। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়। দু'জনে রাত জেগে গল্প করি। কত গল্প করি। কত গল্প হয়। সে তার ট্রেড ইউনিয়নের কথা বলে, আমি বলি ফিল্ডওয়ার্কের কথা। বলতে বলতে কখন অলক্ষ্যে আমাদের কথাবার্তায় একটা বিষণ্ণতা আর হতাশার সুর চলে আসে। তার রাজনীতির গুরু সুপ্রিয়দা চলে যাওয়াতে একটু ভেঙে পড়েছিল প্রকাশ। আবার সামলে গেছে। এখন তার দায়িত্ব অনেক। তার পিছনে গোয়েন্দা ঘোরে, গুন্ডা পিছু নেয়, কর্তৃপক্ষ শত্রুতা দেখায় প্রকাশ্যে! তবু তার গুরুত্ব বেড়েছে অনেক। কিন্তু সেই সঙ্গে বেড়েছে বয়স, তার অভিজ্ঞতা। ফলে, আশা করার, স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা গেছে কমে।

ক্রমে আমার ভিতরেও আসছে হতাশা। মনে হচ্ছে পৃথিবী জোড়া মানুষের বিপুল সমস্যার ভার আমরা কী করে ঠেলব! প্রতি বছর বিপ্লবের অর্থ পালটে যাচ্ছে, পালটাচ্ছে সংগ্রামের স্ট্র্যাটেজি। তবু বছরের ছয় মাস অবসাদে কাটে, বাকি ছয় মাস, বুনো মোষ তাড়িয়ে ফিরি। তখনই মনে হচ্ছিল, যে বিশেষ দলটিতে আমি আছি তাতে থেকে খুব একটা লাভ নেই। এই দল সত্যিকারের বিপ্লব চায় না, চায় সমঝোতা, কিংবা মীমাংসা, কিংবা দাবি-আদায়।

প্রকাশকে বলি, প্রকাশ, ট্রেড ইউনিয়ন করে কিছু হবে না।

কেন?

ট্রেড ইউনিয়ন কেবল লোকের অসৎ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিচ্ছে। মানুষের দাবি আদায় করে দেওয়াই কেন আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হবে। দাবি আদায় বরং মানুষগুলোকে আরও নষ্ট করে দিচ্ছে, ওরা লড়াইয়ের শরিক হচ্ছে না, ইউনিয়ন বলতে ওরা বোঝে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র। ওরা খারাপ জায়গায় বদলি হতে চায় না, বা ভাল জায়গায় পোস্টিং চায়, অন্যায় করে শাস্তি এড়াতে চায়, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ চায়— এইসব বিচিত্র চাওয়াকে পূরণ করে গেলে কিন্তু মানুষগুলো কেবলই পিছলে যাবে। ওদের মূল স্বভাব পালটাবে না। ওরা কাজ কম করবে, ফাঁকি দেবে, চুরি করবে, নিজেরটা গুছিয়ে নেবে, কখনই বৃহত্তর স্বার্থের লড়াইতে নামবে না। এইসব লোভী, নীচ, স্বার্থপর মানুষদের শুদ্ধ করবে কে?

প্রকাশ গম্ভীরভাবে বলে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে ওরাও পালটাবে।

আমি বলি, দূর। তা হলে অফিসারেরা চুরি করত না, মন্ত্রীরা সৎ হত, ক্যাপিটালিস্টরা আয়কর ফাঁকি দিত না। অভাব নষ্ট করলে স্বভাব যায় না। তুইও জানিস।

প্রকাশ ভাবে। কথা বলে না। হয়তো দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সেও বুঝতে পারছিল বাইরে থেকে মানুষের অবস্থা পালটে দিয়ে কোনও লাভ নেই। মানুষের ভিতরে পচন। সেই পচন নালী ঘায়ের মতো সমাজের শরীরে ফুটে উঠছে। আমার মন বলত, দল নয় মানুষ। মানুষই মূল কথা। মানুষের জন্য হাজার বার দল পালটানো যায়, হাজার বার দল গড়া যায়। কিন্তু কথাটা যেন মনে থাকে— মানুষের জন্য, মানুষের জন্য, মানুষের জন্য।

এইসব কথা আমি কিছু কিছু প্রকাশ্যেও বলতাম। দলের কাজের প্রকাশ্য প্রতিবাদও করি কয়েক

বার। কর্মী হিসেবে আমার নাম-ডাক ছিল। ডুয়ার্সকে আমি চিনতাম আমার হাতের নখের মতো। আমার অনুগত ছিল দলের সবচেয়ে ভাল কর্মীরা। কাজেই আমার সমালোচনা পার্টি মুখ বুজে সয়ে গেল। আর সাধারণ নির্বাচনে আমাকে বিধানসভায় দিল নমিনেশন।

পুরনো কায়দা। অবাধ্য কর্মীকে বশে রাখার চেষ্টা। যে কনস্টিটুয়েন্সি আমাকে দেওয়া হল তা ছিল নিশ্চিত হারের জায়গা। আমার প্রতিপক্ষ একজন উপমন্ত্রী। সেই কনস্টিটুয়েন্সিতে কেউ আমাকে তেমন চেনেই না।

তবু লড়াইটা আমি লড়েছিলাম খুব। পার্টি আমাকে যে চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দিয়েছিল, সেটা লুফে নিয়ে আমি নির্বাচনে প্রচণ্ড খাটি। আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশ এসে আমার পাশে দাঁড়াল। বহু জায়গায় আমাদের সভায় ইটপাটকেল পড়েছিল, ভাড়াটে গুন্ডা করেছিল তাড়া। প্রকাশ আমাকে বলল, পার্টি তোকে এ কী কনস্টিটুয়েন্সি দিয়েছে! এখানে জেতার কোনও আশা নেই। তোর মতো কর্মীকে অনেক ভাল জায়গা দেওয়া যেত। তুই কেন রিফিউজ করিসনি!

আমি ম্লান হেসে বললাম, প্রকাশ, ছেলেবেলায় তুই আর আমি যখন মারপিট করতাম তখনকার কথা মনে আছে? তখন আমরা লোক বেছে মারপিট করিনি। যার সঙ্গে লাগত লড়ে যেতাম। কত মার খেয়েছি, পিছিয়ে যাইনি। আমি সে-লড়াই আজও ভুলিনি।

শুনে প্রকাশ গুম হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ঠিক আছে। আমিও ভুলিনি। অতনু, আমি চিরকাল তোর রইলাম! আমি আছি, মনে রাখিস।

নির্বাচনে আমি হাজার দু'য়েক ভোটে হেরে গেলাম। কিন্তু খাটুনির এত ধকল গেল যে নির্বাচনের পরদিনই আমার একশো চার ডিগ্রি জ্বর উঠে গেল। জ্বর আর নামে না। খবর পেয়ে বাবা আর মা এসে আমাকে পাণ্ডুতে নিয়ে যান।

মাসখানেক টাইফয়েডে ভুগে উঠলাম। তখনও ভাল চলতে পারি না। চিন্তাশক্তি যেন কমে গেছে। বারান্দায় মা ইজিচেয়ার পেতে দেন। একটা বই হাতে সারা দিন সেখানে বসে থাকি। সামনে পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে গাদাবোট নোঙর ফেলে দাঁড়ায়, মালগাড়ি লোড হয়। আর তার পিছনে বিপুল গৈরিক জলরাশি নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নিরন্তর বয়ে যায়। ও-পারে আমিনগাঁওয়ের টিলাগুলো দেখা যায়, দূরে নীলাভ ধূসর পাহাড়। ডাইনে নীল পর্বতে কামাখ্যার মন্দির, নদীর ওপর ওঁ বাবার আশ্রম। নির্জন চার দিকে সবকিছু সারা দিন স্থির থাকে। শুধু অবিরল নদী চলে। তার নিরন্তর চলা সারা দিন দেখি, তবু দেখা ফুরোয় না। একটা জীবন আমি এ-রকম অবসর ভোগ করিনি। বসে থেকে থেকে চিন্তারাশি মাথায় মেঘ করে আসে। মনে হয়, রাজনীতি না করলেও পারতাম। মানুষের প্রতি আমার স্বাভাবিক ভালবাসা ছিল—সেটাই ছিল ভাল। মানুষের মুক্তির সংগ্রাম করতে গিয়ে আমি এক সংকীর্ণ অন্ধ রাস্তায় চলে এসেছি। ওই নদীর মতোই আমি এক দিন বহমান ছিলাম, আজ আর নেই। নিজেকে স্থবিরের মতো লাগে। নদীর বয়ে যাওয়ার দিকে তাই মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি। ফেরি স্টিমারের ভোঁ বাজে, ইঞ্জিন শিস্ দেয়, চমকে উঠি— মনে পড়ে— বয়স হল। ঢের বয়স হয়ে গেল। কত মুখ ভিড় করে আসে মনে। অসহায় দুঃখী মুখ সব। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে— বেশ্যা হতে চেয়েছিল। একটি বউয়ের মুখ মনে পড়ে— লুঠেরাদের তাড়া খেয়ে যে আগুনের ঘর থেকে ছেলে কোলে নিয়ে এক মাইল দৌড়ে গিয়ে দেখেছিল— তার কোলে ছেলের বদলে ছেলের পাশ-বালিশ। একটা দুঃখী মেয়ে কবে যেন ভাঙা পুতুলের একটি হাত মাত্র কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার অন্য খেলনা ছিল না বলে সারা দিন সেই হাতখানা রাখত বুকে করে। এ-রকম মুখ আসে যায়। মনে হয়, মানুষের বৃহৎ সমাজের বিচিত্র ধারাকে রাজনীতি খুব সামান্যই দিতে পারে। নদীর দিকে চেয়ে থাকি, মনে মনে পথ হাতড়াই। মানুষ দেখে আমার এই বিশ্বাস স্থির হয়েছে যে, মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তির আকর রয়েছে। তাকে গতি দিলে, তাকে শক্তি দিলে সে অনায়াসে নিজের দুই কূলের সীমা উপচে প্লাবিত হতে পারে। মানুষ দুঃসহতম ক্লেশ অক্লেশে করতে পারে বহন। রাজনীতি সেই শক্তিকে উপেক্ষা করে কেবলই তার জন্য দাবি-আদায় করার চেষ্টা

করছে, খুশি রাখার চেষ্টা করছে তাকে। মরে যাচ্ছে তার ভিতরকার শক্তি। সে আর্ত হয়ে পড়ে থাকছে চিরকাল, অথচ তার ভিতরে ছিল মানুষকে ত্রাণ করার অমোঘ ক্ষমতা।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙলে আবার চেয়ে থাকি। আবার ঘুমোই। সারাটা দিন কেটে যায়। ধর্ম-বিষয়ে লেনিনের গ্রন্থখানা অপঠিত থেকে যায়, কিংবা কোনও দিন আমার কোলের ওপর খোলা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বইখানার পাতাগুলি হাওয়ায় উলটে যায় কেবল। বই ভাল লাগে না। বরং ইচ্ছে করে তীর্থযাত্রীর মতো বেরিয়ে পড়ি মানুষের মেলায়। সে-মেলায় বড় ধুম। সে-মেলায় একশো মজা।

সামনের রাস্তাটা দিয়ে একটা মেয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে যায়। বড় কমনীয় তার মুখশ্রী। গায়ের রং শ্যামলা। ছিপছিপে শরীর। সদ্য কৈশোর পার হয়ে সে শাড়ি ধরেছে। যেতে যেতে কখনও বা একপলক আমাকে দেখে যায়। রোগা এক পুরুষ সারা দিন শুয়ে শুয়ে কী করে— তাই দেখে বোধ হয়। তার চোখে সরল কৌতূহল লক্ষ করি। মাঝে মাঝে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে যায়, মাঝে মাঝে একা একা। তাকে রোজ লক্ষ করি। ক্রমে লক্ষ করতে ভাল লাগে। আমার দীর্ঘ অবসর সহজে কাটতে চায় না। মাথা অলস লাগে। সেই আলস্যের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটি ক্রমে আমার শূন্য মাথায় বাসা নেয়। বড় সুন্দর তো মেয়েটা!

অল্প অল্প করে হাঁটাহাঁটি শুরু করি। প্রথমে বাগানের গেট পর্যন্ত। কিছু দিন পরে সামনের রাস্তায়। এ-অঞ্চলটা খুব নির্জন। কয়েকটা বাংলো বাড়ির পরই নদীর ঢাল, শান্টিং লাইন। হাঁটতে হাঁটতে পাড়ার শেষ সীমা পর্যন্ত চলে যাই। দেখি, শেষ বাড়িটার লনে বিকেলবেলা নেট টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে কারা। খেলা দেখতে এগিয়ে গিয়ে বাগানের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াই। দেখি, সেই মেয়েটা, তার ভাই, আরও দু'টি ওই বয়সের মেয়ে নিতান্ত অপটু হাতে খেলছে। আমাকে দেখে তারা লজ্জা পায়। র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সরে আসি! অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধার পর্যন্ত চলে যাই। জলে পা দিয়ে দাঁড়াই। বড় অন্যমনস্ক লাগে, চিন্তাগুলি এলোমেলো হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের শব্দ হঠাৎ পালটে যাচ্ছে— শুনতে পাই।

মায়ের কেবল এক কথা। বিয়ে কর। আগে কথাটা শুনলে বড় রেগে যেতাম। আজকাল রাগি না। কিন্তু বড় অসহায় লাগে। তাই মাকে ঝেঁঝেঁ উঠে বলি, যাও তো মা, আমাকে একা থাকতে দাও।

মা কাকুতি মিনতি করে। বলে, এখন বয়সের জোরে ওইসব বলিস। কিন্তু যখন বয়স হবে তখন তোকে দেখবে কে? যে নিজেকে নিয়ে ভাবে না, তার জন্য ভাবনা করার একজন লোক চাই।

আমি চুপ করে থাকি। মা অনর্গল বকে যায়।

এক-একদিন মা চুপি চুপি এসে বলে, যদি পার্টির কোনও মেয়েকে তোর পছন্দ তো বল স্বজাত স্বঘর হলে আমার আপত্তি নেই।

বিরক্ত হয়ে বলি, বিয়ে করে আমি খাওয়াব কী?

অমনি শুনি বাবা ভেতরের ঘর থেকে গম্ভীর গলায় বলেন, যে দেশসুদ্ধ লোকের খাওয়া পরার ভার নিয়েছে তার নিজের বউকে খাওয়াবার প্রবলেম থাকা উচিত নয়।

শরীরটা সারলে কিছু দিনের জন্য আবার বেরিয়ে পড়ি। আসাম আর উত্তরবাংলার মাঠ-ঘাট জঙ্গল ভেঙে কিছু দিন পর আবার ফিরে আসি।

এসে দেখি সেই মেয়েটা আমার বোনের বন্ধু হয়ে গেছে। দু'জনে দুপুরবেলা একসাথে উল বোনে, সন্ধেবেলা হারমোনিয়াম বাজিয়ে একে অন্যের কাছ থেকে গান তুলে নেয়। দেখা হলে মেয়েটি হরিণীর মতো ভিতু চোখে আমার দিকে তাকায়। মেয়েটা সম্ভবত শুনেছে, আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অল্প ভোটে হেরে গেছি, আমি পার্টির একজন স্তম্ভ, আমি নেতা। আর কিছু না থাক এইসব গ্ল্যামার তো আমার আছেই। মেয়েটি তাই ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়।

আমার চিন্তার রাজ্য ব্যাপক। সেখানে একটি মেয়ের স্থান কতটুকুই বা! হাজার মুখের ছবির মধ্যে, হাজার সমস্যার চিন্তার মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তবু হারায় না।

পাঁচ নম্বর ফেরিঘাট জায়গাটা বোধ হয় ভাল না। এই জায়গা মানুষের মনকে নরম করে ফেলে। চার দিকে আকাশ আর নীলাভ পাহাড়ের মায়া, রেলের মন্থর শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের বিষণ্ণ ভোঁ আর

সবকিছুর ভিতর দিয়ে অবিরল জলের শব্দ তুলে ব্রহ্মপুত্রের বয়ে যাওয়া— এইসবের ভিতরে কী যেন রয়েছে। মন এলিয়ে পড়ে। দু'দণ্ড বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। অবসর ভোগ করতে বাসনা জাগে। ভাবতে ভাল লাগে একটি কমনীয় মুখশ্রীকে।

সেবার বাড়িতে আসতে এক দিন মা মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, ওই মেয়েটা, ওর নাম দুলু। ওকে আমার বড় পছন্দ। স্কুল ফাইনাল পাশ করে এবার কলেজে পড়ছে—

না শোনার ভান করেই উঠে যাই। তবু বুকের মধ্যে একটা চমক খিচ ব্যথার মতো চেপে ধরে থাকে। আবার পালাই। চা-বাগানের শ্রমিক, উত্তরবাংলার চাষিদের নিয়ে মেতে থাকি, মিটিং করি, রাত জেগে বই পড়ি, ডুয়ার্সের মাঠ-জঙ্গল ভেঙে অবিরল ঘুরতে থাকি। রোদে জলে পোড় খেয়ে শরীরটা রুক্ষ কঠিন হয়ে আসে। কিন্তু যখনই একটু অবসর পাই, যখনই কর্মহীন একটু সময় যাপন করি, তখনই পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটের মায়াবী প্রকৃতি মনে পড়ে, মনে পড়ে— শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের ভোঁ, নদীর বয়ে চলা। শুনতে পাই, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ আস্তে আস্তে পালটে যাচ্ছে।

এই সময়ে এক দিন প্রকাশ এসে আমাকে ধরল, অতনু, মা কিছুতেই ছাড়ছে না। তুই মাকে একটু বুঝিয়ে বল, আমি কিছুতেই এখন বিয়ে করতে পারব না।

আমি বললাম, কেন?

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে বলে, বিয়ে করা আমার ঠিক হবে না অতনু। নতুন মা যে আমার সৎমা তা আমি ভুলেই গেছি। অনেক দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে, অনেক মারধর খেয়ে আমরা দু'জন—মা আর ছেলে হয়েছি। আমার আর বেশি কিছু চাওয়ার নেই। অন্যের মেয়ে এসেই আমাদের সম্পর্কের ভিতর ফাটলটা খুঁজে বের করবে। সে আমাকে দখল করতে চাইবে মা'র কাছ থেকে। এইভাবে আমার মা আস্তে আস্তে সৎমা হয়ে যাবে। না অতনু, যত দিন মা আছে তত দিন বিয়েতে আমার কাজ নেই।

শুনে ভারী অবাক হলাম। আমি ভেবেছিলাম, প্রকাশ বিয়েতে আপত্তি করবে অন্য কারণে। সে বলবে রাজনীতিই তার প্রতিক্ষণের শ্বাসপ্রশ্বাস, ট্রেড ইউনিয়ন করে বলে তার উন্নতি বন্ধ, তা ছাড়া সে হয়তো পার্টির হোল টাইমার হয়ে এক দিন বৃহত্তর রাজনীতিতে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তাই বাঁধা পড়তে চায় না। তার বদলে প্রকাশ এ কী বলছে! আমার নিজের মাকে, কই এত ভালবাসতে পারিনি তো!

কিন্তু প্রকাশের বিয়ে ঠেকানো গেল না। মাসিমা জেদি বাচ্চা মেয়ের মতো মুখের ভাব করে বললেন, আমি মরে গেলে প্রকাশের আর কেউ থাকবে না। পরের মেয়ে ওর বউ হয়ে আসবে বলে ও ভয় পায়। কিন্তু একজন পরের মেয়ে যে ওর মা হয়ে এসেছে তার বেলা?

খুব সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে প্রকাশের বিয়ে হয়ে গেল। সে বিয়েতে প্রকাশ দানসামগ্রী প্রায় কিছুই নিল না। না ঘড়ি-আংটি-বোতাম না খাটপালঙ্ক। নিজের খরচে দীনভাবে বউভাত সারল। বরকর্তা হয়ে আমি খুব ছোটাছুটি করলাম। নেমন্তন্ন মিটতে খুবই রাত হয়ে গেল। তারপর একা আমি সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে সামনের মাঠটায় গিয়ে বসলাম। অমনি মহাশূন্যের একটি নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ আমার চারধারে নেমে এল। তখন আমার ভরা যৌবন। টলটল ছলছল এক নদীর মতো আমার কূল ছাপিয়ে যাচ্ছে বানের জল। বড় একা লাগল। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো বসে বসে শুনতে লাগলাম আমার অবাধ্য হৃৎপিণ্ডের শব্দ পালটে যাচ্ছে।

পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে আমাদের বাসায় যাওয়া হয়নি বহুকাল। মা চিঠি লিখছে বারবার, লোক পাঠাচ্ছে, মাঝে মাঝে টিফিন ক্যারিয়ারে চেনা গার্ড সাহেবের সঙ্গে পিঠে-পায়েস তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়! আমার যাওয়া হয় না। ইচ্ছে করেই যাই না। বুকে একটা খিচ ধরে মাঝে মাঝে। সব চেপেচুপে দাঁত টিপে নিজেকে সামলাই। কয়েক বছর আগে জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে বি এ পাশ করেছিলাম। তারপর থেকেই ইচ্ছে ছিল, আইন পড়ব। উত্তরবাংলার কৃষি-আইন নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাতে হয়, জানতে হয় লেবার রেগুলেশনস্। ইচ্ছে ছিল কলকাতায় গিয়ে পড়ব। সেটা হয়ে ওঠেনি। কয়েকটা ভূমি-সংক্রান্ত আইনের বই জোগাড় ছিল। সেগুলো দিনরাত পড়তাম, যেন কালই আমার পরীক্ষা। বস্তুত কিছুই পড়া হত না। একা লাগত। একা একা দম বন্ধ হয়ে আসত মাঝে মাঝে। বার বার ঘর ছেড়ে মাঠে-ঘাটে বেরিয়ে পড়তাম। চিরকাল বাইরের টান আমার। মাঠ-ঘাট-জঙ্গলেই ভাল থাকতাম বেশি।

সেবার শীতকালে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বীরপাড়ার কাছে এক ধানকলের মাঠে কৃষকদের সভা

ছিল। যখন বীরপাড়ায় বাস থেকে নামলাম তখন শীতের বেলা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। মাঠ-ঘাট থেকে দ্রুত রোদের চাদর গুটিয়ে নিচ্ছে আকাশ। বীরপাড়া থেকে মাইলখানেক দূরে সেই ধানকল। বাসস্ট্যান্ডের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে, মেঠো পথে নেমে পড়লাম। চার দিকে খেত। খেতে ধানের গোড়া পড়ে আছে, শুকনো খড়ের গন্ধ। রবিশস্যের চাষ দিয়েছে কেউ কেউ। গাঢ় সবুজ হয়ে আছে খেত। মাঠ থেকে ভাপ উঠে আসছে, কুয়াশা জমছে। নিচু মেঘের মতো ধোঁয়া জমে আছে এখানে সেখানে। চার দিকে অপার্থিব নির্জনতা। একা একা হেঁটে যেতে বড় ভাল লাগছিল। রাঙামাটির রাস্তা। গোরুর খুরের ধুলো তখনও উড়ছে। কিন্তু কী এক কার্যকারণসূত্রে কোথাও কোনও লোক নেই, গোরু-বাছুর নেই, রাস্তায় নেই শিশুরা। শুধু মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে গাছে গাছে তীব্র হুলুধ্বনির মতো তাদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চরাচরে কুয়াশার মেঘ, গাছগাছালিতে ঘনায়মান অন্ধকার, আর মাটির গন্ধ, শুকনো খড়ের গন্ধ। দূরে কোথাও পাতা জ্বেলে আগুন করেছে কেউ— সেই ঝাঁঝালো গন্ধ। অন্যমনে আমি হাঁটছিলাম।

সামনেই একটা ঘন ঝোপ, ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা মোড় নিয়েছে। পড়ন্ত বেলায় সেই ঝোপটা তার দীর্ঘ ও গাঢ় ছায়া ফেলেছে রাস্তার ওপর। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ সেই গাঢ় ছায়াময় জায়গাটিতে পা দিতেই ধুলো থেকে ধুলোটে রঙের একটা সাপ পলকে ফণা তুলে দাঁড়াল। এত কাছে যে হয়তো বা তার ছায়া আমার গায়ে পড়েছিল, তার শ্বাস স্পর্শ করেছিল আমার শরীর। দু'টি পুঁতির দানার মতো চোখ আমার ওপর স্থির, তার শরীরে একটা মৃদুমন্দ দোল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার শরীরে বর্ম নেই, হাতে নেই অস্ত্র। উদোম আকাশের নীচে, খোলা জায়গায় তার আর আমার মধ্যে একটুমাত্র শূন্যতার ব্যবধান।

ডুয়ার্সের মাঠে-জঙ্গলে সাপ আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এমন মুখোমুখি উদ্যতফণা প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো কখনও দেখা হয়নি। তখন আমার চারপাশে ঘনায়মান পড়ন্ত বেলার কুয়াশা, ফসল-কেটে-নেওয়া মাঠ, কুয়াশার মেঘ ঝুলে আছে এখানে ওখানে। এক নির্জনতার ছায়াচ্ছন্ন কোণে সকলের অগোচরে সে আর আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, পিছু ফেরার উপায় নেই, চোখ সরাতে পারছি না। অপলক চোখে তার দুই চোখে চেয়ে আছি। কেবল চার পাশে পাখিরা চিৎকার করছে, ঝোপে-ঝাড়ে মাঠে তাদের ঝগড়ার শব্দ, আমাদের চার পাশে কেবল পাখির ডানার আওয়াজ। একটু আগেই এই রাস্তা দিয়ে মানুষ হেঁটে গেছে, ফিরেছে গোরুর পাল, রাখাল ফিরেছে, হাটুরেরা গেছে দল বেঁধে। তখন সাপটা কোথায় ছিল কে জানে! কে জানে. কী করে আমাদের এ-রকম দেখা হয়ে গেল। নইলে আমি আর সে— আমরা দু'জন দুই আলাদা পৃথিবীর বাসিন্দা। কোথায় ছিলাম আমি! কত দূরে। ডুয়ার্সের চাষিদের সাথে, আসামের জঙ্গলে, চা বাগানে। কত মিছিল, মিটিং, আন্দোলন, ধর্মঘট শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে পথ হাঁটা। বহুদূরে বিস্তৃত এক কর্মক্ষেত্র জুড়ে ছিল আমার ছড়িয়ে থাকা। আর সে তখন ঘাস ও তৃণভূমি ছেড়ে জলায়, কখনও ফসলশূন্য খেত পার হয়ে নাবালে তার সুন্দর পিছল শরীর গুটিয়ে ঘুমিয়েছে গাছের ছায়ায়, ইঁদুরের সন্ধানে সতর্ক চোখে ফসলের খেতের ভিতরে গর্ত খুঁজে ফিরেছে, লাফ দেওয়া ব্যাঙকে শূন্য থেকে মুখে লুফে নিয়েছে। তার এক রকমের জীবন, আমার অন্য রকমের। কোথাও আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল না। এই তো একটু আগে বাস থেকে নেমে কত নিশ্চিন্তে চায়ের দোকানে বসে এই শীতে আরামে এক কাপ গরম চা খেয়েছি। তার স্বাদ এখনও জিভ আর ঠোঁটে জড়িয়ে আছে। তখন এই পথে হাটুরেরা হেঁটে গেছে, গেছে রাখাল, চাষি, গ্রামের শিশুরা ফিরেছে দূরের ইস্কুল থেকে। তখন কোথায় ছিল সে! এই গভীর শীতের শেষ বেলায় সে হয়তো তার গর্তের উষ্ণ আরামে শুয়ে ছিল। তবে কে আনল তাকে এই পথের ওপর। এই ঝোপের ছায়ায়, ধুলোয় সে কেন অপেক্ষা করে ছিল? আমারই জন্য কি?

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়েছে। কপালে ঘাম ফুটছে চিনচিন। হাত-পা খিল ধরে শক্ত হয়ে আছে। বুঝতে পারি, একটা জীবন মানুষের জন্য আমার সব সংগ্রাম বৃথা গেছে। বৃথা হয়ে গেছে যৌবনের কূলে কূলে পরিপূর্ণ ঢল। বৃথা জন্ম, বৃথা ভালবাসা। হঠাৎ নেমে এল শূন্য মুহূর্ত। মূল্যবান— মহামূল্যবান কয়েকটি ক্ষণ মাত্র আছে আর— তাও বয়ে যাচ্ছে। এত সহজে মানুষ মরে যায়? এমন অগোচরে, অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে? প্রতিবাদহীন এ আমার কেমন মৃত্যু হচ্ছে? এই গভীর শীতে কোথা থেকে এল

সাপটা! কেনই বা?

মাথা থেকে সমস্ত স্মৃতি মুছে যায়, মুছে যায় স্বপ্ন। ভাষা ভুলে যাই, প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে না। শুধু সবিস্ময়ে দেখি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটুমাত্র শূন্যতার ব্যবধান। আলো আঁধারময় সেই শূন্যতাটুকুই মাত্র আমার জীবন। অতি তুচ্ছ তা, মূল্যহীন। সতেজ সাপটি তার বুকের সাদাটুকু তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পথ বন্ধ, সমস্ত সঞ্চিত বিষ সে তুলে আনছে মুখে, শিকড়ের মতো তার জিভ লোভী আগ্রহে চেটে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে তার ও আমার মাঝখানের শূন্যতাটুকুকে। সে দুলছে, সে আসছে।

আমার শরীর হাহাকার করে ওঠে। কত রহস্য অজানা রয়ে গেল পৃথিবীতে, জীবন ও মৃত্যুর অর্থ বোঝা গেল না, পথের মাঝখানেই ফুরিয়ে গেল পথ। কেন জন্মেছিলাম, কেনই বা মরে যাচ্ছি?

সাপটা দুলছে। শূন্যতাটুকু পার হয়ে আসছে সে।

হঠাৎ টের পাই, আমার জিভ নড়ছে, আমার ঠোঁট নড়ছে। চার দিকে শীতার্ত নির্জনতা। তার ভিতরে হঠাৎ শুনতে পাই অন্য মানুষের অচেনা কণ্ঠস্বর। কে যেন বলছে, দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো...

আস্তে আস্তে বুঝতে পারি, এ আমারই গলা। আমার দুই হাত বুকের ওপর জড়ো হয়েছে কখন। জলে ভেসে যাচ্ছে আমার চোখ, গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা খসে যাচ্ছে পথের ধুলোয়। জলে আবছা চোখে অদ্ভুত দেখাচ্ছে চরাচর। আস্তে আস্তে আমি ধুলোয় পথের ওপর হাঁটু ভেঙে বসি। আমার কপালের সমান্তরাল সেই সাপটার সাদা বুক, তার ফণা, তার মিটমিটে চোখ। আস্তে আস্তে সেই ফণার সামনে নত হয়ে যাই আমি। অচেনা মানুষের গলায় বিকারগ্রস্তের মতো বলে যাই, দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো—

সাপটা স্থির হয়ে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। তার তীব্র শ্বাসের শব্দ ধীরে ধীরে কমে আসে। শ্লথ হয়ে যায় শরীর। ধীরে ধীরে সে মাথা নিচু করে আনে। আবার ধুলোয় মিশিয়ে দেয় মাথা। শেষ বেলার আলো মরে গেছে। ঝোপের ছায়াটা আরও গাঢ় হয়েছে। সে অবহেলায় আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তার রহস্যময় আলাদা জীবনের অন্ধকারে চলে যায়।

চার দিকে এক বিপুল মহাপৃথিবীর শূন্যতার মাঝখানে আমি বসে থাকি। পথের ধুলোয়। অনেকক্ষণ আমার কোনও চেতনা থাকে না। তখনও আমি বিড় বিড় করে কেবলই বলছি, দয়া করো। দয়া করো। দয়া করো...

কিছুক্ষণ পরে চাষিদের সেই মিটিঙের কয়েকজন সভা ভেঙে ফেরার পথে আমাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়। সাপের কথা শুনে আমার শরীরে তার দাঁতের দাগ খুঁজল। এক চাষির বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গরম লোহা দিয়ে নুন পুড়িয়ে খাওয়াল। টর্চ জ্বেলে পৌঁছে দিল বাসের রাস্তায়। বলল, শীতকালে সাপ বড় একটা দেখি না আমরা। ওই শালা যে কোথা থেকে এল!

কোথা থেকে এল তা আমিও জানি না। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে আমি ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে যাই। মাঝে মাঝে অকারণে গা শিরশির করে, খেয়ে উঠে বমি পায়, ঘুমে দুঃস্বপ্ন দেখি। কেবলই মনে হয়, সাপটার কাছ থেকে পাওয়া ভিক্ষালব্ধ আমার এই জীবনটা যেন বা ঠিক আমার নয়। অতনু সেন নামে একজন বীরপাড়ার রাস্তায় সেই সন্ধ্যাবেলায় পথের ধুলোয় সর্পদষ্ট হয়ে পড়ে আছে। তার পরের এই যে আমি— এই আমি অন্য একটা লোক— ভিক্ষালব্ধ আয়ু পেয়ে বেঁচে আছি। আমি ঠিক অতনু নই।

চিন্তার স্রোত মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়। একা থাকতে ভয় পাই। রাতে যথার্থ ঘুম হয় না। কেবলই মৃত্যুর কথা ভাবি। এইভাবে আমার মেলাঙ্কলিয়ার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষের যে স্বার্থের সংগ্রাম চলেছে পৃথিবী জুড়ে, তার বাইরে পড়ে আছে এক রহস্যময় অচেনা জগৎ। তার খোঁজ আমি কখনও করিনি। মৃত্যুর অর্থ আমার অজানা রয়ে গেছে, কেন মানুষের জন্ম— তাও জানি না। ভিক্ষালব্ধ এই যে আমার দ্বিতীয় জীবন— এই জীবনটায় আমি সেইসব রহস্য মোচন করে যাব।

বহুকাল বাদে পাণ্ডুব পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটের বাসায় ফিরে আসি। সেই ব্রহ্মপুত্র বয়ে যাচ্ছে, ডাইনে নীল পর্বত, ওপারে আমিনগাঁওয়ের টিলার সৌন্দর্য, মালগাড়ি শান্টিঙের শব্দ, স্টিমারের ভোঁ। কিন্তু তবু ঠিক আগের মতো লাগে না। মনে হয়, সব অন্য রকম। ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে নিরালা তীরে বসে

থাকি। বীরপাড়ার সেই সন্ধ্যার দৃশ্যটি কত অসংখ্যবার ভেবেছি, তবু আবার ভাবি। কোন কার্যকারণসূত্রে সাপটা আমার পথের ওপর অপেক্ষা করে ছিল! কী করে আমার দয়াভিক্ষার ভাষা সে বুঝতে পেরেছিল! সে সময়ে কে আমার মুখে ওই কথা সঞ্চার করেছিল. দয়া করো!

সমাধান পাওয়া যায় না। অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসতে থাকি। শেষ বাংলো বাড়িটার লনে আগের মতোই 'নেট' টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা হচ্ছে। খেলছে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে। সেই মেয়েটি নেই। তারা দু'মাস আগে বদলি হয়ে গেছে বদরপুরে। দু'-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে খেলা দেখি। একটা শূন্যতা ভর করে মনের ভিতর। আর হয়তো দেখা হবে না। বাবা এক্সটেনশনে আছেন। সামনের বছর তাঁর রিটায়ারমেন্ট। কলকাতার বেহালায় জমি কিনে রেখেছেন। রিটায়ার করার পর বাড়ি তুলে চলে যাবেন।

দুপুরে মা ঘুমোতে পারে না। আমার পাশটিতে এসে বসে। বলে, অনু, তুই কী করবি? আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবি না?

অন্যমনে বলি, দেখি।

মা শ্বাস ছেড়ে বলে, একটা জীবন তোকে কাছেই পেলাম না। আমার কোলছাড়া হয়ে কত দূরে চলে গেছিস! আমার যে একটা বড়সড় ছেলে আছে তা বুঝলামই না।

আমার ছোট এক বোন, আর দুই ভাই। তাদের সঙ্গে বস্তুত আমার তেমন পরিচয়ই নেই। দাদা বাড়ি এলে তারা কৌতূহলী হয়ে দেখে। কিন্তু বড় একটা কাছে ঘেঁষে না। ভয় পায়, সমীহ করে। আমার দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। একজন দিল্লিতে, অন্যজন কলকাতায়। বহুকাল দেখা হয়নি। ছোট বোনটার বিয়ের চেষ্টা চলছে।

বাবা ডেকে বললেন, অনু পাত্রটি কেমন বুঝছ! অ্যাসিস্ট্যান্ট আই-ও-ডব্লিউ, বেশ স্মার্ট। বাড়ির অবস্থা...

শুনে যাই মাত্র। বাবা বিরক্ত হয়ে বলেন, কোনও বিষয়েই তোমার গা নেই। আমি এখন বুড়ো হয়েছি. বিয়ের খাটাখাটনি কি আমার পোষাবে! তুমি বড় ছেলে, সংসারের দায়িত্ব একটুও নিলে না। তোমার দুই দিদির বিয়েতে এক বার উপস্থিতও থাকলে না! এ-সব কেমন দেখায় পাঁচজনের চোখে!

অপরাধী মুখ করে বসে থাকি।

বাবা বলেন, এই বিয়েটা আর ফাঁকি দিয়ো না। অনুষ্ঠানে অনেক কাজ। এবারটা থেকো।

বললাম, থাকব।

বিয়ের তিন দিন আগে আমার কলকাতার দিদি এল। সঙ্গে তার প্রফেসর বর। লাজুক, অন্যমনস্ক মানুষটি। মেজদি তার বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে বলল, এই আমার ভাই, একজন হতে পারত এম-এল-এ। দেশোদ্ধারে ব্যস্ত ছিল বলে আমার বিয়েতে আসেনি।

জামাইবাবু মিষ্টি হাসলেন। বিয়ের সময়ে তিনি ছিলেন স্কুলমাস্টার, বিয়ের পর দিদির তাড়নায় এম এ পাশ করে প্রফেসর হয়েছেন। দিদির সেইজন্য খুব অহংকার, জামাইবাবুরও দেখি দিদির ওপর খুব টান।

আমার দিল্লির দিদি আসতে পারল না। তবু বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন এল। বাড়ি গমগম করে সবসময়ে। সারা দিন হাসি-ঠাট্টা চলে। আমাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি। মেজদি, মা সবাই ঠাট্টা করে বলে, অঞ্জুর বড় ভাগ্য। একমাত্র ওর বিয়েতেই অনু বাড়িতে আছে।

পারিবারিক আবহাওয়া আমার ঠিক সহ্য হয় না। তবু কী কারণে যেন এই পারিবারিক সম্মেলনটি আমার বড় ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, অঞ্জুর বিয়ের পর এবার আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বোধ হয় একটু কষ্ট হবে।

বিয়ের আগের দিন। সোনার দোকানে তাগাদা দিয়ে, গৌহাটি পার্টি অফিসে আড্ডা দিয়ে, মালিগাঁওয়ে রেল হেড কোয়ার্টার্সে দু'-চার জন দলের লোকের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল। ফিরে অবাক হয়ে দেখলাম, সামনের বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে অঞ্জু আর দুলু বসে আছে। সামনেই একটা সুটকেস আর বেডিং, তখনও তোলা হয়নি ঘরে। আমাকে দেখে দুলু উঠে দাঁড়াল তটস্থ হয়ে।

*এক-একটা সময় আসে যখন নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। নির্ভুলভাবে টের পেলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ পালটে যাচ্ছে, বুকে একটা খিঁচ ধরছে হঠাৎ, কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।*

সম্ভবত দুলুর এইসব দুর্বলতা নেই। তার বন্ধুর দাদা, আর রাজনীতিতে নামডাকওলা লোকটির প্রতি হয়তো তার সহজাত শ্রদ্ধা ছিল। আমি বারান্দায় উঠতেই সে আমাকে প্রণাম করল। পায়ে সামান্য স্পর্শ। সেই স্পর্শটুকু যেন আমাকে হাজার মাইল আনন্দে দৌড় করাতে পারে।

বন্ধুর বিয়েতে এসে সে চার দিন রইল আমার বাসায়। সেই চার দিন আমি তার কাছে ঘেঁষবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। নিইনি। কিন্তু আমার মন কাঁটার মতো ঘুরে ঘুরে একটা সিদ্ধান্তে স্থির হয়েছিল।

প্রায়দিনই মা আর মেজদি আমাকে বিয়ের কথা বলত। বিয়ের পরের পরদিন বাসা যখন অনেক ফাঁকা, এক দুপুরে আবার সেই কথা উঠল। মেজদিকে আড়ালে ডেকে বললাম, বিয়ে করব। দুলুকে বল, ও যদি রাজি থাকে—

মেজদি একটা লাফ দিল আনন্দে। চেঁচিয়ে ডাকল, মা!

দৃশ্যটা আমি দেখেছিলাম। পরদিন বউভাত, বউভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে তার পরের দিন দুলু চলে যাবে। বউভাতের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা একটা লুডো খেলার আসর বসেছিল। মা, দুলু, মেজদি ও আমার এক পিসিমা। আমি বারান্দায় অন্ধকারে বসে আছি। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। বাগানে ফুলের গাছগুলি ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি ছায়া ফেলেছে। লুডোর আসর ভেঙে উঠবার সময়ে মেজদি দুলুর হাত ধরে টেনে বলল, চলো দুলু, বাইরে চাঁদ উঠেছে, একটু বাগানে ঘুরে আসি।

ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। বারান্দা পার হয়ে ওরা দু'জন বাগানে নেমে গেল। গেটের কাছে দাঁড়াল। হাসি আর কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর একসময়ে মেজদি বলে, তোমার সঙ্গে কিন্তু একটা সিরিয়াস কথা আছে।

এই কথা বলে মেজদি ঝুঁকে কী একটু গোপনে বলল দুলুর কানে। হঠাৎ দেখি, দুলুর মাথা নুয়ে পড়েছে বুকের ওপর। একটু পরে আবার মুখখানা ধীরে ধীরে তুলল সে। জ্যোৎস্নায় ভাল দেখা যায় না, কিন্তু মনে হল বোধ হয় একটু হাসল।

বউভাতের পর দুলু চলে গেল।

দিন সাতেক বাদে বাবা আমাকে ডেকে বললেন, বাসুবাবু আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে তাঁর মেয়ে দুলুর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করেন। আমি মত দিয়েছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন, বাসুবাবুর ধারণা, তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, একদিন তুমি দেশের গণ্যমান্য মানুষ হবে। চিঠিতেও সেই কথা লিখেছেন। আর আমাদের সকলেরই দুলুকে পছন্দ।

আমি চুপ।

বাবা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, বিয়ের পর কী করবে ভেবেছ?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, না।

বাবা বললেন, ভাববার অবশ্য কিছু নেই। বিয়ে করতে আজকালকার ছেলেরা যত ভয় পায়, আসলে তত ভয়ংকর নয়। তোমার কথা অবশ্য আলাদা। বিয়ে করা তোমার কাছে কোনও সমস্যাই হওয়া উচিত নয়। তুমি রাজি থাকলে যখন যে-কোনও ফার্মে চাকরি পেতে পারো। এমনকী আমাদের রেলেই তোমার ভাল চাকরি হতে পারে। তুমি একটু রাজি হলেই হয়।

বাবার ধ্যান-ধারণা খুব সাধারণ মানুষের মতোই। সুযোগ মতো গুছিয়ে নাও। আর দেরি কেন! পলিটিক্স অনেক করেছ, এইবার কিছু ঘরে আনো।

বাবা অবশ্য অন্য কথা বললেন। একটু ভেবেচিন্তে বললেন, সামনের বছর আমি রিটায়ার করছি। তুমিও আমাদের সঙ্গেই কলকাতায় চলো। তোমার ল' পড়ার ইচ্ছে ছিল, সেটা পড়ে নাও। তোমার পার্টির কাজকর্ম ওখানে হতে পারবে। তারপর ওখানেই গুছিয়ে বোসো। তুমি কাছে থাকলে আমার

একটু বল-ভরসা হয়। তোমার ছোট ভাই দু'টি এখনও বলতে গেলে নাবালক। একটা জীবন তোমার জন্য দুশ্চিন্তা করে আমরা কাটিয়েছি। এই শেষ বয়সটা তুমি না হয় কাছে থাকলে!

বললাম, ভেবে দেখি।

মনে মনে কেন যেন বুঝতে পারছিলাম, আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসছে। সেটা ভাল কি মন্দ কে জানে। ডুয়ার্স আমার এত চেনা, এত বেশি জানা, এত প্রিয়— তবু কেন যেন আর এখানে ভাল লাগছিল না। সমস্ত আসাম, উত্তরবাংলা, বিহারের কিছু অংশ, সিকিম, ভুটান, নেপাল জুড়ে আমি ঘুরেছি কম নয়, কাজও করেছি। তবু মনে হচ্ছিল, এখানে থাকলে ক্রমে আমি ঝিমিয়ে পড়ব। নতুন জায়গায় নতুন মানুষদের মধ্যে গেলে বোধ হয় আবার নতুন করে প্রাণ পাওয়া যাবে।

ছয় মাস পরে দুলুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

আমার নিজের বিশ্বাস, রাজনীতিতে আমি ইচ্ছে করে আসিনি। আমার ছিল বাউন্ডুলের মতো বাইরের টান, আর মানুষ দেখার নেশা। ওই দুই থেকে আমি রাজনীতিতে চলে এসেছি। প্রত্যক্ষভাবে দলের কাজে আমাকে টেনে নামিয়েছিল প্রকাশ। ফলে আমার স্বাধীন ইচ্ছেয় বাইরের জগতে ঘোরবার সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মানুষ দেখার নেশা। ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়েছিল ক্ষমতার লোভ।

বিয়ের কিছু দিন পরেই উত্তরবাংলায় দু'টো বাই-ইলেকশন হল। তার একটাতে পার্টি আবার নমিনেশন দিল আমাকে। আমি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলাম। প্রকাশ আগের মতো সব কাজ ছেড়ে চলে আসতে পারল না, কিন্তু তবু এল। মিটিং করল, ঘরোয়া সভায় বসল। কলকাতা থেকে দলের প্রাদেশিক সেক্রেটারি এসে ঘুরে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে ডেকে বললেন, যদি আপার হাউসে যেতে আপত্তি না থাকে তো বলুন। নেক্সট টাইমে—

আমি মাথা নাড়লাম। না। জেতার স্বাদ আলাদা। আমি জিততে চাই। এ-নেশাটা ক্রমে ক্রমে আমার ভিতরে তৈরি হয়েছিল।

আমার প্রতিপক্ষ এবারেও শক্ত। লোকটার বিস্তর দান-ধ্যান আছে। একটা এলাকার উদ্বাস্তুদের জন্য সে করেছেও খুব। প্রতিপক্ষ আরও দু'জন ছিল। তারা ভোট ভাঙাতে দাঁড়িয়েছিল। দেখেশুনে এবারও প্রকাশ বলল, অতনু, তুই জিতবি না। পার্টি তোকে হারাতেই দাঁড় করিয়েছে।

কেন?

এমনি মনে হল।

বুকটা দমে গেল খুব। পার্টির ওপরমহলের সঙ্গে আমার মাখামাখি নেই। আমি চিরকাল তাদের মাঠ-ঘাটের কর্মী। কিছুটা অবাধ্য। কিন্তু একটা অংশের ওপর আমার প্রভাব বেশি। তারা আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। নমিনেশনও দেয়।

প্রকাশ বলল, অতনু, সময় থাকতে তুই নাম উইথড্র করে নে।

কেন?

পার্টিতে তোকে বেইজ্জত করার জন্যই নমিনেশন দিয়েছে।

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রকাশ বলল, পর পর দু'বার হেরে গেলে পাবলিক ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। এর পরের বার তোকে নমিনেশন না দিলে কারও কিছু বলার থাকবে না। তোর রাইভ্যাল রাঙাবাবু কত টাকা ঢালছে দ্যাখ। কুলি বস্তিতে হাঁড়িয়ার বান বয়ে যাচ্ছে, রিফিউজি কলোনিতে ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য দেড়শো খুঁটির দাম দিচ্ছে রাঙাবাবু। রাস্তা মেরামত হচ্ছে, রাঙাবাবুর তিনটে লরি ফেলছে মাটি আর কাঁকর। আর তুই কেবলই ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নিয়ে আছিস। মিটিং করে বলছিস আদর্শের কথা। পার্টি টাকা ঢালছে না কিছুই, তোরও টাকা নেই। উত্তরবাংলার মানুষ এখনও বড় গরিব, তারা টাকাটা চেনে।

আমি যে জানি না তা নয়। তবু কেন জানি না, কবে থেকে যেন বুকের ভিতরে আমার অলক্ষ্যে জমে উঠেছে লোভ।

সেই রাত্রে একা একা অনেকক্ষণ বিছানায় জেগে শুয়ে রইলাম। দলছুট যখন ছিলাম তখন আমার অকারণ আনন্দ ছিল, ছিল মানুষের প্রতি পক্ষপাতহীন ভালবাসা। আমি মাঠে-ঘাটে মুক্তির আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছি। তখন আমার প্রতিপক্ষ ছিল না কোনও মানুষ, কোনও দল, কোনও মতবাদ। আমি তখন কত ভাল ছিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক শিক্ষা, মতাদর্শ আমার বাহুল্য আবেগগুলো ছেঁটে-কেটে ফেলে দিল, হরণ করল আমার নিরপেক্ষ ভালবাসা। তৈরি করল প্রতিপক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষের প্রবহমান ধারাটি আমার চোখে কবে যেন খণ্ডিত হয়ে গেছে।

গভীর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুললাম। বাইরে অন্ধকার। অদূরে চা-বাগানের ভেজা তীব্র মাদকতাময় গন্ধ নাকে এল। আমার অনেককালের চেনা গন্ধ। গাছগাছালিতে বাতাসের শব্দ। মনে হল, চলে যাই। আর-একবার পুরনো অতনু সেন হয়ে চলে যাই মানুষের কাছাকাছি।

আবার ফিরে এসে শুই। বহু দূরে, পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটের বাসায় দুলু অপেক্ষা করে আছে। বড় আশা তার স্বামী এম-এল-এ হবে। এক দিন হয়তো বা হবে মন্ত্রী, দেশের অন্যতম প্রধান। সেই আশায় সে আজ বিছানার শূন্য অংশটিতে তার হাতখানা বাড়িয়ে রেখেছে। ওই হাতে সে আমাকে জড়িয়ে রাখেনি। রাখলে ভাল করত।

নির্বাচনের শেষ ক'টা দিন আমি আর তেমন ঘুরলাম না। যেটুকু না হলে নয় সেটুকুমাত্র কাজ করলাম। সেই কবে ছেলেবেলায় ফুটবল মাঠে বাবার আধ-খাওয়া লেমনেডের বোতল মুখে দিয়ে জীবনের তিক্ত স্বাদ পেয়েছিলাম, টের পেলাম— আমার সেই তিক্ত স্বাদে আমার শরীর ভরে গেছে।

ভোট হয়ে গেল। আমি অনেক ভোটে হেরে গেলাম।

আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই হতাশ হন। আমার বউ দুলু একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

আমি পার্টির মেম্বারশিপ ছেড়ে দিলাম।

বেহালায় আমাদের বাড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই বাড়িতে চলে গেলাম।

বন্ধুগণ, বিপ্লবের অর্থ প্রতি বছর একবার করে পালটায় তবু নেশা যায় না। কারও কারও রক্তে রাজনীতির নেশা থেকে যায়। পোকার মতো কেটে কেটে ক্ষয় করে মানুষটাকে।

উত্তরবাংলার এক চা-বাগানের মালিক বিপদ বুঝে আমাকে খুশি করার চেষ্টায় ছিলেন। কলকাতায় তাঁর অন্য কারবার ছিল। আমি পার্টি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসছি শুনে তিনি আমাকে ডেকে তাঁর কলকাতার কারবারে আমাকে লেবার অফিসারের চাকরি দিতে চাইলেন। আমি স্বভাবতই সে-চাকরি প্রত্যাখ্যান করি।

শুনে বাবা খুব রেগে গেলেন। বললেন, তুমি পার্টি ছেড়েছ, এখন কে তোমাকে মূল্য দেবে? যেটুকু সুযোগ ছিল তা কাজে লাগালে না, তোমার মতো এমন বোকা কেউ আছে? পার্টি না ছাড়লে কোনও দিন হয়তো বা অ্যাসেম্বলিতে যেতেও পারতে—

আমার বউ দুলু বাইরে কখনও রাগ দেখায় না। এখনও তার মুখ তেমনই লাবণ্যে ঢল ঢল করে। কৈশোর ছেড়ে সে ক্রমে যৌবনের ভর-ভরাট চেহারা নিয়েছে। তবে তার মুখের হাসি কমে এসেছে। সারা দিন সে ঘরের কাজ করে, কথা বলে কম। ক'দিন আগেও শ্রমিক, চাষি, শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং করে, রাত জেগে বই পড়ে, বহু দূরে দূরে সংগঠন করে ফিরেও তার মুখে হাসি আর অভিমান দুই-ই দেখেছি। এখন সে হাসে কম, অভিমান করেই না। নীরবে শরীর দেয়। কলকাতায় এসেই সে কলেজে ভরতি হল। সকাল বিকেল দু'টো অল্প টাকার টিউশনি শুরু করল। সে বুঝতে পেরেছিল অকর্মণ্য লোকের স্ত্রী হয়ে থাকতে গেলে সংসারে তার আদর হবে না। সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

আমিও দু'টো টিউশনি করি। সকালের ল' কলেজ করি। সারা দিন ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেদের সঙ্গে বসে থাকি। দু'-চার দিনের মধ্যেই আমার নাম ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ে। ল' কলেজে তখন ছাত্রদের দুটো দল। একটা দলের খুব রমরমা, অন্যটা টিমটিম করে চলছে। দু'টো দলকে

যাচাই করে আমি দ্বিতীয় দলে যোগ দিই। তারপর ভূতের মতো খাটতে থাকি ইউনিয়ন ইলেকশনে। রাত জেগে পোস্টারের বয়ান লিখি, বক্তৃতার খসড়া তৈরি করি, দিনে বক্তৃতা দিই, ঘরোয়া সভা করি, অন্য দলের ছাত্র ভাঙাই। এ-সব কাজ আমার কাছে ছেলেখেলার মতো লাগে। তবু সেই ছেলেখেলার মধ্যেও মৌতাত জমতে থাকে। তার ওপর আমার গ্ল্যামার তো ছিলই। আমি রাজনীতি করা লোক, বিধানসভার নির্বাচনে দু'-বার নমিনেশন পাওয়া। ছাত্র-ছাত্রীরা আমার পিছনে ঘোরে।

ইলেকশনে সেবার দ্বিতীয় দলটা রই রই করে জিতল। আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেনারেল সেক্রেটারি হলাম। ফলে ছাত্রদের এই দলের পিছনে যে রাজনৈতিক দলটি ছিল তার সঙ্গে আমার অনায়াসে যোগাযোগ হয়ে গেল। আমি বছর দুয়েকের মধ্যে মেম্বারশিপ পেয়ে গেলাম।

তারপর আবার নেশা। আইন পাশ করে আমি সম্পূর্ণভাবে পার্টির কাজে নেমে গেলাম। এ-দল আমার আগের দলের চাইতে অনেক বড়। প্রায় একটি সর্বভারতীয় দল। আন্তর্জাতিক দলের শরিক। ফলে কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি। ভাল কর্মীর অভাব নেই। এই দলে প্রাধান্য পাওয়া শক্ত। তবু কলকাতা এবং চব্বিশ-পরগনায় ধীরে ধীরে আমার আন্তরিক কাজ স্বীকৃতি পেতে লাগল, প্রায় সারা দিন পার্টি-অফিসে পড়ে থাকি। কল-কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করি। ছোট-বড় সভায় বক্তৃতা করার সুযোগ জুটে যায়। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নাম বেরোয়। পুলিশের খাতায় নাম ওঠে। রাজভবনের সামনে কর্ডন ভেঙে এক বার গ্রেপ্তার হই। আর-এক বার খাদ্য আন্দোলনে।

বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ভাই দু'জনের একজন বি এ, অন্যজন বি-কম পাশ করে বসে আছে। কিংবা ঠিক বসেও নেই। একজন একটা ক্ষীয়মাণ পাবলিসিটি ফার্মে কপি লিখে আশি টাকা রোজগার করে, অন্যজন একটা সিনেমা কাগজে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে সামান্য কমিশন পায়। দুলু বি এ পাশ করে বি টি দিল। নিজের চেষ্টায় পাশ করে স্কুলের একটা চাকরির জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগল। আমাদের তখন দু'টো বাচ্চা হয়েছে। বড়টা মেয়ে, ছোটটা ছেলে। তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে দুলুর চোখে ঘুম নেই। একটা চাকরি তাকে পেতেই হবে। আমার টাকা ছিল না। কিন্তু প্রভাব ছিল বেশ। সেই জোরে বেহালার একটা স্কুলে দুলু চাকরি পেল। রাত জেগে, খেটে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম এ দিল। পাশও করল। সকাল বিকেল ছাত্রী পড়াতে লাগল। জেদের বশবর্তী হয়ে সে আর-এক বার এম এ দিল অর্থনীতিতে এবং ভাল সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে গেল। তিন-চার বছরের মধ্যেই সে হল অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস। শিখল অঙ্ক, মৌখিক ইংরিজি, সাধারণ বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার জোরে বাড়ির বারান্দায় একটা টিউটোরিয়ালও খুলল। পরের বছর সেই টিউটোরিয়ালের ছাত্রী-সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেল। প্রতিজন মাথা পিছু কুড়ি টাকা-- এই হিসেবে দু'বেলার টিউটোরিয়াল থেকে দুলুর মাসিক আয় দাঁড়াল হাজার টাকা। অবশ্য এর জন্য তাকে খাটতে হয় প্রচুর। আমার অবসর থাকলে আমি, বাবা এবং ছোট ভাই দুলুকে সাহায্য করতাম। সেই টিউটোরিয়াল এবং দুলু-ই তখন আমার পরিবারে একমাত্র ভরসাস্থল। আমরা সবাই এই দু'টিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। আমার দল আর-এক বার আমাকে নমিনেশন দেওয়ার কথা ভাবছে তখন। দুলু যখন ধীরে ধীরে দুই পায়ে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড় করিয়ে রাখছে সংসার, তখন অন্য দিকে আমি ডুবছি। দল বদল করার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত আমাকে নমিনেশন দেওয়া হল না। আমি ঝিমিয়ে পড়লাম।

দুলু আর আমি তখন এক ঘরে দুই খাটে শুই। অনেক রাত জেগে দুলু পরীক্ষার খাতা দেখে, শক্ত অঙ্ক কষে, প্রশ্নের উত্তর লিখে রাখে, প্রকাশকদের নির্বন্ধে নোটবই লিখে দেয়। শুয়ে থেকে দেখি টেবিল ল্যাম্পের আলো ওর চশমায় ঝিকিয়ে উঠছে। বড় ভয় করত দুলুকে। কতকাল ওর শরীর ছোঁয়া হয়নি! ও যে আমার বউ তা প্রায় ভুলে গেছি। দেখতাম, দুলু তখনও শ্রীময়ী আছে, বরং বয়সের সাথে সাথে ওর চরিত্রের দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য আর জেদ ওকে আরও সুন্দর করেছে। আত্মপ্রত্যয় মানুষকে সুন্দর করে। অন্য দিকে নিজের মুখখানা কল্পনা করি, মাথায় অল্প টাক, ভাঙা মুখ, অগভীর, চিন্তাকুটিল চোখ। হীনম্মন্যতার দরুন দুলুর কাছাকাছি যাওয়ার সময় হত না। দুলু কত রাত কেঁদে বালিশ ভিজিয়েছে। আর এখন রাজনৈতিক হতাশায় ক্লান্ত আমি দুলুর দিকে চেয়ে থাকি। আমার ভিতরে এক পুরুষ জেগে ওঠে। কিন্তু বড় ভয় করে দুলুকে। অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করে ও ওর ছেলে-মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ে। এক বারও আমার বিছানার দিকে চেয়ে দেখে না। দিনের পর দিন কথা বলে না দুলু, সময় হয় না। আমি

চেয়ে দেখি, সেই মধ্যযৌবনে আমার ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে সেই যে গাম্ভীর্যের ছাই মেখেছিল দুলু আজও সেই ছাই তাকে সন্ন্যাসিনী করে রেখেছে। বাড়ির সবাই তাকে ভয় পায়। বাচ্চারা তার সামনে কাঠ হয়ে থাকে। ছাত্রীরা টুঁ শব্দ করতে সাহস পায় না। বুঝতে পারি, ব্যক্তিত্বময়ী মধ্যযৌবনা দুলুকে আমিও ভয় পাই।

অভ্যাসবশত আমি তখনও সকালে বেরিয়ে যাই। বিভিন্ন আড্ডায় ঘুরি, পার্টি অফিসে সময় কাটাই, এক বন্ধুর দোকানে বসে থাকি। দুপুরে এসে খেয়ে আবার বেরোই। কখনও-সখনও ঘরোয়া মিটিং কি জনসভা হয়, সেই পুরনো বিপ্লবের কথা বলি— যার অর্থ তখনও আবছা। কাগজে ছোট্ট করে কখনও-সখনও নাম বেরোয়। কিছু ছেলে-ছোকরা তখনও আশেপাশে ঘুরঘুর করে। তাদের তালিম দিই, পথসভা করাই, কিন্তু বুঝতে পারি একটা জীবন শেষ হয়ে এল, বিপ্লবের অর্থ বোঝা গেল না। না যাক, ক্ষতি নেই। এবার অন্তত এক বার নিজের কাছে ফিরি। বাবার দুঃখ দেখে পৃথিবীর দুঃখমোচন করতে গিয়েছিলাম। সেই দুঃখের পাহাড় আমাকে ঠেলে দিয়েছে এবার। একটা জীবন আমি কম খাটিনি। কিন্তু বয়স এবং হতাশার ভাব আছে, আছে গৃহপালিতের মতো ব্যক্তিগত দুঃখগুলি। এক বার খোলামেলা মন নিয়ে নিজের কাছে বসা ভাল। নিজের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা আর আমি কবে করব! দুলু আর আমার দিকে ফিরেও চায় না। বাবা-মা এক-আধবার চেয়ে দেখে। ছোট ভাই সমীহ করে বরাবর দূরত্ব রেখে চলে। আমি রাতের ঢেকে-রাখা খাবার একা বসে খাই। সারা দিন চা আর সিগারেটের ফলে শরীরে ঢক ঢক করে অম্বল। খেতে পারি না, অর্ধেকের বেশি ভাত পাতে পড়ে থাকে। কেউ লক্ষ করে না। রাতে শুয়ে থেকে দূর থেকে দুলুকে দেখি, শরীরে পুরুষ জেগে ওঠে। নিপুণ সাপুড়ের মতো সেই উদ্যত পুরুষকে ঝাঁপিতে ভরে রাখি। তারপর ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে মশার শব্দের মতো আমার নানা ব্যর্থতার চিন্তা বিনবিন করে সারা মাথায় ঘোরে। এক-একদিন পেটে একটা উৎকট ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে বমি পায়। মাথা ঘোরে, শরীর দুর্বল লাগে। অভ্যাসবশত কাউকে কিছু বলি না। কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে উৎকট ব্যথায় ককিয়ে ককিয়ে উঠতাম, তারপর বালিশে মুখ গুঁজে চাপা দিতাম শব্দটা। দুলু টের পেত কি না জানি না। টের পেলেও উঠে আসত না। আমার সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করে স্বভাবতই সে একটু নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে আমার অভিমান ছিল না। কারণ রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থতার তীব্রতর অভিমান এইসব ছোটখাটো ভাবপ্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখত। দুলু উঠে আসত না, আমি ব্যথা চেপে শুয়ে থাকতাম। হয়তো দুলুরও ঘুম হত নিঃসাড়ে। সারা দিনে তারও তো খাটাখাটনি কম ছিল না।

রবিবার রান্নাঘরের ভার নিত দুলু। ওই তার একটা শখ। ছুটির দিন সে তার পছন্দমতো খাবার রান্না করত। কখনও শুঁটকি মাছ, কখনও তেল-কই, কি পোস্ত-চচ্চড়ি। জলখাবারও করত সে-ই। সেদিন রান্নাঘরে কেউ বড় একটা যেতে সাহস পেত না। আমি বরাবর দেরিতে উঠি, আমি উঠলে আমাকে আমার চা দেওয়া হয়। কিন্তু রবিবার দুলু তার নিয়মে সংসার চালায়। সকালে চায়ের পাট চুকে যায়। রবিবার আর চা হয় না। তাই আমাকে লুঙ্গির ওপর শার্ট চাপিয়ে ঝন্টুর দোকানে যেতে হয়।

সবদিন সমান যায় না। একটা রবিবার সকালে উঠে আমার শরীর খুব দুর্বল লাগছিল। সারা রাত জেগে থেকে সকালের দিকে ঘুমিয়েছিলাম। সেই শরীরে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল না আমার। ঘরে বসে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছিল। দুলুর সঙ্গে বহু দিন হল কথা নেই। সেই সকালে ইচ্ছে হচ্ছিল একটু কথা বলি। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বললাম, এক কাপ চা দেবে?

দুলু তার গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে আমাকে এক বার দেখল। আমি মুষড়ে পড়লাম। দুলু আস্তে করে বলল, চায়ের দোকানের অভাব নেই। আমি ভাত চাপিয়েছি, নামালে নষ্ট হয়ে যাবে।

চলে এলাম। মাথা ধরেছিল খুব। সকালে চা না পেলে এ-রকম হয়। জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরোতে যাচ্ছি, দেখি আমার দু'টি ছেলেমেয়ে সিঁড়ির কাছে মুড়ির বাটি হাতে বসে আছে। আমার মেয়ে ঝিমলির বয়স বছর সাতেক, ছেলে তিতুর বয়স সাড়ে চার। সংসারে তখনও এ দু'টি প্রাণীর কাছে আমার কিছু মূল্য ছিল। খুব সাবধানে, মায়ের চোখের আড়ালে, তারা আমার কাছে আসত। তাদের প্রিয় ছিল তাদের ব্যর্থ বাবা। আমি তাদের কত বার উত্তরবাংলার জঙ্গলে বাঘ দেখাব গল্প বলেছি, বলেছি সিকিমের পাহাড়ের গল্প, চা-বাগানের কুলি-কামিনদের গল্প। সেইসব গল্প আর কেউ কখনও শুনতে চায়নি,

আমিও কাউকে বলিনি। নইলে উত্তরবাংলার পাহাড়ে জঙ্গলে যে-সব দিন আমি কাটিয়েছি, তার কিছু বলার মতো গল্প ছিল। এক বার জিপ উলটে আমি প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে গড়িয়ে যাই, আর-এক বার ঝড়ে গাছ পড়েছিল আমার মাথার ওপর। আমার এই দুই প্রায়নিশ্চিত অপঘাতের কথা কখনও কাউকে বলা হয়নি। জিজ্ঞেসও করেনি কেউ। সে-সব গল্প জানে কেবল ঝিমলি আর তিতু। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় বন্ধুর। বাচ্চা তিতু আমাকে দেখলেই উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতখানা পিছনে নিয়ে গম্ভীরভাবে আমার বক্তৃতা নকল করতে থাকে, 'বন্ধুগণ, আজ এই সভায়'... ইত্যাদি। ঝিমলি তাকে ধমকায়, 'অ্যাই, বাবা গুরুজন না!' আমি তাদের সামলাই। আমাকে নিয়ে কেউ একটু-আধটু ঠাট্টা করলে তখন আমার খারাপ লাগে না। বস্তুত কেউ আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকে, এটা আমি চাই না। তার চেয়ে ঠাট্টা বরং ভাল। কিন্তু মায়ের সামনে তারা আমার দিকে তাকায়ও না। মায়ের বারণ আছে বোধ হয়।

সেই রবিবার সকালে হতাশ মন আর ক্লান্ত শরীরে চায়ের দোকানে বেরোবার মুখে দুই শিশুমুখ দেখে থমকে দাঁড়ালাম। সকালের রোদে তারা মুখ তুলে ঝকমকে দাঁত দেখিয়ে নীরবে হাসল। বাবাকে তারা ভালবাসে। তারপর সতর্ক চোখে চার দিকে দেখে নিল। আমিও হাসলাম। তারপর অবসন্ন শরীরে বসলাম তাদের কাছে। সিঁড়ির শেষ ধাপটায়। তিতু উঠে দাঁড়াল। হুবহু আমায় নকল করে বলতে লাগল, বন্ধুগণ, আজকের এই সভায়—

চিড়িক করে মাথায় একটা বদ মতলব খেলে গেল।

তিতুকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে বললাম, বাবা আজ একটা নতুন খেলা খেলবে?

কী খেলা?

চলো, একটা মিছিল বের করি।

তারা দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে হাসল।

ঝিমলি তার চুলের ঝাপটা সরিয়ে বলল, কীসের মিছিল বাবা?

আমি হাসলাম, ভুখ্‌খা মিছিল। তোমার মা আমাকে আজও চা দেয়নি।

কয়েকটা পুরনো জুতোর বাক্সের পিচবোর্ড কাটা হল, তাতে লেখা হল স্লোগান—বাবাকে চা দিতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে। নইলে গদি ছাড়ো! ইত্যাদি। কাঠিতে সেই প্ল্যাকার্ড উঁচু করে ধরে আমাদের তিনজনের ছোট্ট মিছিল ধ্বনি দিতে দিতে রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছিল। মা বেরিয়ে এসে বললেন, এ কী?

তারপর সবাই হেসে খুন।

রান্নাঘরে দুলু তখন গনগনে আঁচের মতো লাল হয়ে ভাতের ফেন গালছে। উনুনে চেপেছে মাংসের হাঁড়ি, আওয়াজ শুনে মুখ তুলে অনেকক্ষণ হাঁ করে রইল! আমরা নীরবে তিনজন দরজা জুড়ে দাঁড়ালাম। হাতে প্ল্যাকার্ড। বহুকাল দুলুর সঙ্গে এ-রকম ঠাট্টা করা হয়নি। তাই ঠাট্টাটা ধরতে দুলুর সময় লাগল।

বুঝে খুব ক্ষীণ একটু হাসল সে। ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল, এ-সব শিখতে হবে না। বরং কাজ করতে শেখো। নিষ্কর্মারাই মিছিল মিটিং করে।

তারপর একটু ভেবে বলল, আচ্ছা যাও, তোমাদের দাবি আমি মেনে নিলাম।

নিজের ঘরে এসে একা বসলাম। একটু পরেই দুলু নিজেই চা নিয়ে এল। চা দিয়েই চলে গেল না। একটু দাঁড়িয়ে থাকল। বলল, লিকার পাতলা করেছি।

বললাম, ঠিক আছে।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার লজ্জা করে না?

ঠাট্টা কীসের?

ঠাট্টা নয়! মিছিল তো তোমার প্রাণ। তুমি তো কেবল বোঝ মানুষের মুক্তি-যুদ্ধ মানেই মিছিল করা, বিপ্লবের পথও ওই মিছিল। তবে সেই মিছিলকে নিয়ে ঠাট্টা কেন?

চুপ করে রইলাম।

চলে যাওয়ার আগে দুলু বলল, ছেলেমেয়েদের ও-সব শিখিও না। ওরা যখন বড় হবে, তখনকার সময়ে তোমাদের এই মিছিলের ধাপ্পা আর চলবে না।

বলে, চলে গেল দুলু।

আমি একটুও রাগ করলাম না। মিছিলের ভাবপ্রবণ দিকটা নিয়ে তখন আমিও ভাবি। সারা জীবন মিছিল মিটিং ছাড়া লোকশিক্ষার জন্য আমরা তো আর তেমন কিছু করিনি। সত্যিকারের কর্মঠ লোকের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয় না। দুলু নিজেই তার প্রমাণ আর আমার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে, আমি ভুল পথে চলেছি এতকাল।

দুলুর ওপর তাই রাগ করার কিছু নেই। বরং দীর্ঘকাল পর দুলুর নিজের হাতে করা চা-টুকু আমি বেশ উপভোগ করছিলাম।

সেদিন যথারীতি দুপুরের খাবার হজম হয়নি। অনেক রাত পর্যন্ত মাংসের ঢেকুর উঠল। পেটের উৎকট ব্যথাটা উঠল চাগিয়ে। বালিশে মুখ চেপে ধরে অস্ফুট আর্তনাদ করছি, হঠাৎ টের পেলাম ও-পাশের বিছানা থেকে মশারি তুলে দুলু বেরিয়ে এল। পরমুহূর্তে চুড়ি আর শাড়ির শব্দ করে, একঝলক মারকোলাইজড ওয়াক্স-এর সুগন্ধ ছড়িয়ে দুলু আমার বিছানায় ঢুকে এল। হাত বাড়িয়ে আমার মাথা ছুঁয়ে বলল, কী হয়েছে?

কিছু না।

কিছু না? বলে আমার চুলের মুঠি আলতো চেপে ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি তাকাল। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না আবছায়ায়। কিন্তু দুলুর মুখখানা আমার মুখস্থ, যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, অভিমানে তার নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, কাঁপছে ঠোঁট, চোখ নিষ্পলক হয়ে আছে। এ-রকম দেখতে দেখতে আমি ব্যথা ভুলে দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার ভিতরকার পুরুষটি জেগে উঠল। দুলুও বাধা দিল না। কিংবা দিয়েছিল হয়তো, আমি বুঝতে পারিনি।

দীর্ঘকাল পরে আমি দুলুর স্বাদ নিলাম। আমাদের মাঝখানের বাঁধ ভেঙে গেল। পর পর কয়েক দিন দুলু আদর করতে করতেও আমাকে গাল দিত, অপদার্থ, বাউন্ডুলে, ছোটলোক—

কিন্তু সেই গালাগালের মধ্যেও তীব্র আশ্লেষ ছিল। তখন যৌবনের শেষ ঢল ভাঁটিতে নেমে যাচ্ছে। পিছনে মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পর টাল সামলে নিচ্ছিলাম। দুলু বলত, এটা কীরকম দাবি আদায়?

কয়েক দিন পর দুলু তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফিরে পেল আবার। তবে সম্পর্ক তেমন শুকনো রইল না। মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে দেখত। কখনও বলত, চুলগুলো বড় হয়েছে, ছেঁটে এসো। কখনও ঝিমলিকে বলত, সন্না দিয়ে তোর বাবার সামনের পাকা চুলগুলো তুলে দে তো। সপ্তাহে এক-দুই দিন অন্ধকার আবছায়ায় আমার বিছানায় আমরা পরস্পর কাছে থেকে দেখতাম!

মাস দুই পর এ-রকম এক আবছায়ায় আমাদের দেখা হলে দুলু খুব গম্ভীর তেতো গলায় বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চমকে উঠে বলি, কী রকম?

সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, বোঝ না? সর্বনাশ তুমিই করেছ?

আমি বুঝলাম। বললাম, তুমি তো ছেলেমানুষ নও। জেনেশুনেই যা করার করেছ। এতে সর্বনাশের কী? আর-একটা বাচ্চা কি হতে নেই?

দুলু ঝেঁঝে উঠল, না, হতে নেই।

কেন?

এই বুড়ো বয়সে লোকে কী বলবে!

তোমার কি খুব বয়স হয়ে গেছে?

হয়েছেই তো! আমার সারা দিনে দম ফেলার সময় নেই, দেখছ না? এতসব সামলে এ-সব ঝামেলা কে পোয়ায়! আমি পারব না।

আমি চুপ করে ওর মেরুদণ্ডের ওপর হাত বুলিয়ে দিলাম।

ও একটু চুপ করে থেকে বলল, তা ছাড়া, ছাত্রীদের সামনে বেঢপ পেট নিয়ে ঘোরা—মাগো, সে আমি পারব না। লজ্জায় মরে যাব।

কেন, মিস্ট্রেসদের বাচ্চা হয় না?

হোক গে। আমি পারব না। তোমার কী, হওয়ার যে কী কষ্ট তা তুমি কী বুঝবে! আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলো কাল সকালেই। আমি এটা নষ্ট করে ফেলব।

অবাক হলাম না। এ-রকমটা আশা করেছিলাম। বললাম, ঠিক আছে।

ডাক্তার দেখানো হল। অনেক ওষুধ খেল দুলু। কিন্তু বাচ্চাটার প্রাণশক্তি ছিল বটে। সে-সব ওষুধ হজম করল সে। পাঁচ মাসের মাথায় মাতৃগর্ভে সে প্রথম নড়াচড়াও শুরু করল। আতঙ্কে দুলু এক রাত্রে ছুটে এল আমার বিছানায়, ওগো, ওটা এখনও বেঁচে আছে মরেনি।

তা হলে, বেঁচে থাকতে দাও।

দুলু রাগ করল, তুমি তো বলবেই! তোমার আর কী?

যথাসময়ে আমার দ্বিতীয় পুত্র জন্মলাভ করে। তার নাম ছোটন। ওষুধপত্রের জন্যেই কি না জানি না, ছেলেটা খুব রোগা হল, তার মাথায় ছিল জন্মাবধি দীর্ঘস্থায়ী ঘা। বালিশে মাথা রাখলে ব্যথায় কেঁদে কেঁদে উঠত। তাকে নিয়ে দুলুর কষ্টের শেষ ছিল না। সারা দিন সে অবশ্য পিসি আর ঠাকুরমার কাছে থাকত, কেবল রাত্রে থাকত মায়ের কাছে। কিন্তু ঘায়ের ব্যথায় তার ঘুম হত না বলে মাঝে মাঝে জেগে উঠে কাঁদত, সারা দিন খাটুনির পর দুলু ঘুমোতে পারত না। গাল দিত আমাকে। ডেকে তুলে বলত, তোমার ছেলে তুমি গিয়ে দেখো। আমার না ঘুমোলে চলবে না।

আমার পেটের ব্যথাটা তখন ক্রনিকে দাঁড়িয়ে গেছে। গোপনে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাই। ব্যথাটা কমে যায়। আবার বাড়ে। রাত্রে কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। তবু আমি কষ্ট চেপে দুলুর বিছানায় গিয়ে তার জায়গা নিতাম। দুলু শুত একা, আমার বিছানায়।

শিশুরা মায়ের গন্ধ চেনে। ছোটন আমার কাছে থাকতে চাইত না। ঝিমলি একটু বড় হয়েছে তখন। মাঝরাতে উঠে সে-ও আমার সঙ্গে ছোটনকে সামলাত।

ছোটন আর-একটু বড় হল। যখন তার আড়াই বছর বয়স, তখন দেখা গেল, সবাইকে ছেড়ে সে তার মায়েরই ভক্ত হয়ে উঠেছে। সে পেটে থাকতে মা ছিল তার বড় শত্রু। ছোটন তা জানত না। সে তার গম্ভীর এবং কাজের মানুষ মাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসত। মায়ের মতোই সে ছিল গম্ভীর।

ছোটন হওয়ার পর থেকেই দুলু নানা রকম অসুখে ভুগছিল। তবু খাটত খুব।

রাজনৈতিক জীবনে আর আমার কিছুই করার ছিল না। চেষ্টা করছিলাম কী করে সব গন্ধ ঝেড়ে ফেলা যায়। একটা ব্যবসার কথা প্রায়ই ভাবতাম। লরির পারমিটের জন্য ঘোরাঘুরিও করলাম কিছু দিন।

চশমার পাওয়ার পালটাতে হল। কষের দাঁত দু'টো উপড়ে ফেললাম। বয়স হচ্ছে। কিংবা সঠিক বয়স হওয়া এ নয়। এ হচ্ছে বুড়িয়ে যাওয়া।

কিছুকাল আগে আমার দলটি একটি জাতীয় সংকট উপলক্ষ করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আমার মেম্বারশিপের চাঁদা বাকি পড়েছিল অনেক। সে চাঁদা আর দিতে ইচ্ছে করছিল না। পুঁথিপত্র ঘেঁটে তখনও বিপ্লবের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি। বোঝা যায় না। মাথা ধরে যায়। চোখে জল চলে আসে।

আমার বন্ধু দীপ্তিনাথ দল ছেড়ে একটা ছোট্ট দলে চলে গিয়েছিল। তার বুদ্ধি ছিল না, কিন্তু খাটত খুব। সে এসে এক দিন আমাকে বলে, অতনু, তোমার দল কি তোমাকে নমিনেশন দিচ্ছে এবার?

আমি মাথা নাড়ি, আমার চাঁদা বাকি পড়েছে। মেম্বারশিপ রিনিউ করা হয়নি।

দীপ্তিনাথ বলে, ওই দল তোমাকে নমিনেশন দেবে না কোনও দিন। দল ছাড়ো। তোমার মতো এফিশিয়েন্ট ওয়ার্কার পড়ে থাকবে কেন? ইলেকশনে আমার দল তোমাকে নমিনেশান দেবে। আমরা প্রাণ দিয়ে খাটব। তোমাকে আমি চিনি—বিধানসভায় তোমাকে পাঠাবই।

বুকটা কেঁপে ওঠে হঠাৎ। প্রত্যাশা জাগে। তবু ইতস্তত করতে থাকি।

দীপ্তিনাথ হেসে বলে, বয়স হল না অতনু? আর কবে আমরা অ্যাসেম্বলিতে যাব?

আমার বাবা-মা ভাইরা বহুকাল আমার দিকে চেয়ে আছে। কবে আমি এল এল এ বা এম পি হই,

*কবে হয়ে উঠি নেতা, অপেক্ষা করতে করতে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে, তারা আমার কাছ থেকে কিছু আশা করতে ভরসা পায় না। তাদের জন্য একবার অন্তত আমার কিছু হয়ে ওঠা দরকার।*

কয়েকটা দিন ভেবেচিন্তে আমি দল বদল করলাম। দলটা নতুন, একটা বড় দল ভেঙে কয়েকজন নেতা বেরিয়ে এসে এটা তৈরি করেছেন। উৎসাহী কর্মী আছে। আমাকে তারা সাদরে নিল। খবরের কাগজে আমার দল-বদলের খবর বেরোল। বাবা খবরের কাগজ হাতে সকালেই আমার ঘরে এসে বললেন, আবার দল পালটালে? বরং এবার জীবনটা পালটাও, বউমা মুখে রক্ত তুলে রোজগার করছেন, আমরা খাচ্ছি—ছিঃ ছিঃ—।

নতুন দলটা আমাকে বাই-ইলেকশনে নামিয়ে দিল। কিন্তু দক্ষিণ-পরগনার প্রত্যন্ত প্রদেশে কেউ আমাকে তেমন চিনত না। উপরন্তু দলত্যাগীর ওপর মানুষের বিশ্বাস নেই। হারলাম।

বাড়িতে একটু হাসাহাসি হল। দুলুর মুখ থমথম করতে লাগল। পুরনো দলের কর্মীরা এসে আমাকে ধরল, দাদা, এখন দল ভাঙার সময় না। আমরা বিরাট পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। আপনার মতো কর্মী চলে গেলে আমরা কোথায় দাঁড়াব? আপনি চলে আসুন। আমরা আপনার মেম্বারশিপ রিনিউ করে দিচ্ছি।

বার বার তিন বার হেরে গেছি আমি। তবু বুঝতে পারি, আমার পাবলিক ইমেজ না থাক, দলে আমার কাজের সুখ্যাতি আছে এখনও। আমায় তারা বলল—দাদা, পোলারাইজেশন হবেই, তখন ওই সব ছোট দল হয় ভেসে যাবে, নয়তো বড় দলের সঙ্গে জোট বাঁধবে, ওদের আলাদা এনটিটি থাকবেই না। আপনি কেন পরগাছা দলে পড়ে থাকবেন? আমাদের নেতারা জানেন আপনি ভুল করেছেন। তাঁরা এখনও আপনাকে চান।

ভাবি। ভাবতে থাকি। বিপ্লবের অর্থ বোঝা গেল না এখনও। অথচ বুঝতেই হবে। দিশেহারা বোধ করি। নির্বাচনে হারলেই দলের মধ্যে প্রভাব একটু কমে যায়ই। নতুন দলেও আমার আদর কমেছিল! তারা জানত, আমি কাজ করার জন্য তাদের দলে আসিনি, এসেছি নমিনেশনের জন্য। তারা আমাকে সঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কিছু দিন পর আবার আমি পুরনো দলে ফিরলাম। আবার খবরের কাগজে খবর বেরোল। বাবা কেবল বললেন, হুঁ!

সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। খুব খাটছিলাম। এবার নমিনেশন পাইনি ঠিকই, তবু নিভে যাওয়ার আগে শেষ জ্বলে ওঠার মতো আমি মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করছিলাম। দল ভেঙে দু'ভাগ হয়েছে। পুরনো সহকর্মীরা এখন প্রতিপক্ষ। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাংঘাতিক। কোন দল থাকবে কোন দল প্রাধান্য পাবে— এই নিয়ে অস্তিত্বের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সেই চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেই এক দিন কাগজে উত্তরবাংলার প্রার্থীদের নাম বেরিয়েছে দেখলাম। দেখি, উত্তরবাংলায় আমার পুরনো দল প্রকাশকে নমিনেশন দিয়েছে। যে-জায়গায় আমি দ্বিতীয়বার হেরে যাই সেই জায়গায়। এবারও প্রতিপক্ষ রাঙাবাবু।

হঠাৎ আবেগে আমার চোখে জল আসছিল। প্রকাশ! সেই প্রকাশ, ছেলেবেলায় যে প্রথম আমার সব ভয় হরণ করে লড়াই করতে শিখিয়েছিল। সেই প্রকাশ, যে আমার নির্বাচনে খেটেছিল বুক দিয়ে। বলেছিল, অতনু, আমি তোর আছি। চিরকাল তোর পক্ষে রইলাম।

চোখে জল নিয়েও হাসি আসে। প্রকাশ আমার সারা জীবনের বন্ধু হতে চেয়েছিল এক দিন। বলেছিল, আয়, আমরা একটা কিছু পাতাই। ভালবাসার আক্রোশে আর অভিমানে সে ঢিল ছুড়ে মেরেছিল আমাদের রেলগাড়ি লক্ষ্য করে। পৃথিবী তার অতনুকে কেড়ে নিচ্ছে কেন? সেই আক্রোশেই সে এক দিন সেকেন্ড হওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছিল।

যাব? গিয়ে প্রকাশের নির্বাচনী এলাকায় প্রাণ ঢেলে কাজ করে আসব? প্রকাশ তো আমার জন্য করেছিল! খুশি হবে প্রকাশ। বড় অবাক হবে। যাব?

কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। প্রকাশ এক দলের, আমি অন্য দলের। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ। বহুকাল দেখা হয় না প্রকাশের সঙ্গে, প্রথম প্রথম কিছু দিন চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছিল, তারপর কবে সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রকাশের সঙ্গে দেখা হলে কী করবে?

নির্বাচনের ফল বেরিয়ে গেল। প্রবল উত্তেজনায় দেখি, কাগজে উত্তরবাংলার ফলে রাঙাবাবুকে চার হাজার ভোটে হারিয়ে প্রকাশ জিতেছে।

বিধানসভার অধিবেশন বসল। আমি গেলাম। গ্যালারি থেকে দেখলাম প্রকাশকে। পিছন হেলে বসে আছে। চোখে চশমা, একটু রোগা হয়ে গেছে বুঝি! তবু সেই অকপট মুখ, আন্তরিকতা মাখানো চেয়ে থাকা, রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক হচ্ছিল। প্রকাশও বলল। থেমে থেমে ভেবেচিন্তে বলার ভঙ্গি। আগের মতো ঝোড়ো বক্তৃতা নয়। যেন দ্বিধা এসে গেছে, সংশয় এসেছে। একটু বলেই বসে পড়ল।

বেরিয়ে এসে লবিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নতুন এম এল এ-রা ঘোরাফেরা করছে, চা-শিঙাড়া কিনে খাচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার চেনা। একটু দাঁড়াতেই আমার চারধারে জনাকয় জড়ো হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে কথা বলি কিছুক্ষণ। আবার লবিতে ঘুরি, প্রকাশকে খুঁজি।

অনেকক্ষণ বাদে প্রকাশ বেরিয়ে এল। সেই প্রকাশ— গাব্বা, চোর, মারকুটে। এখন দেখা যায়— চিন্তায় ভারাক্রান্ত মুখ। অন্যমনস্ক চোখ, চোয়ালে ধারালো ভাব। মুখোমুখি হতেই দু'হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, এই শালা।

দু' পক্ষের দু'জন। চার দিকে কৌতূহলীদের ভিড় জমে গেল! কী ব্যাপার সবাই জানতে চায়। সেই ভিড় থেকে প্রকাশকে টেনে আনলাম, এখানে না। বাসায় চল।

কাটিহারের সেই ছোট্ট ছেলেটি এত উন্নতি করেছে দেখে বাবা বড় খুশি হলেন। উন্নতিশীল মানুষ দেখলেই তিনি খুশি হন। প্রকাশকে সামনে বসিয়ে সব জেনে নিলেন। বললেন, তোমারও আগে অনু তিন বার নমিনেশন পেয়ে জিততে পারল না। কপাল। এখন তোমরা দেখো, ওর জন্য কিছু করে দিতে পারো কি না! বুড়ো হতে চলল—কিছুই হল না। আমরা কত আশা করেছিলাম— ও কিছু একটা হবে! এখন দেখো, দুলু রোজগার করে বলে খেয়ে পরে আছি। তোমরা ওকে একটু দেখো—

আমি মনে মনে হাসি। বাবা বোঝেন না, আমরা বন্ধু হলেও দু'জনে দু'দলের। এখন আমাদের জীবন যার যার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা আর একে অন্যের জন্য কিছু করতে পারি না।

কথায় কথায় প্রকাশ বলল, চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে। রেলের কোয়ার্টার এখনও ছাড়িনি কিন্তু শিগগিরই ছাড়তে হবে। মাকে নিয়ে যে কোথায় উঠব ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে মনে হয়, নমিনেশন না নিলেই ভাল হত। বাঁধা চাকরিটাই ভাল ছিল। এখন এই এম এল এ হয়ে থাকাটা বড় অনিশ্চয়ের কাজ। বড় ভয় করে রে। এই বয়সে নতুন কিছু করতে ভরসা পাই না।

জিজ্ঞেস করি, প্রকাশ, তুই কী করে জিতলি? রাঙাবাবু এবার টাকা ঢালেনি?

প্রকাশ হাসল, বলল, ঢেলেছিল। কিন্তু সব মানুষেরই ওঠা-পড়া আছে। রাঙাবাবু পড়তির দিকে এখন। তা ছাড়া, মানুষের রাজনৈতিক চেতনার চোখ খুলছে। অতনু, এই কাজ তুই-ই করে এসেছিস। তুই কী করেছিস তা তোর জানা নেই। জমি চষার শক্ত কাজটা তোরই করা। লোকে তোকে ভোট দেয়নি ঠিকই, কিন্তু তোর তারিফ করেছে বারবার। এখনও পার্টিতে তোর কথা হয়। আমরা তোর কথা বলি। লোকেও বলে। কাগজে তোর দল ছাড়ার খবর পেয়ে সবাই দুঃখ করে।

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। উত্তরবাংলার মাঠ-ঘাট-জঙ্গলের ছবি ফুটে উঠে। অভ্যস্ত মানুষের মুখ ভেসে যায় চোখের ওপর দিয়ে।

প্রকাশ একটু ভেবে বলে, কেউ কেউ আছে বাউল-বৈরাগীর মতো, দলে তারা বেমানান। তোকে দেখে আমার মনে হয় তোর সব কাজ বৃথা যায়নি— তুই যতটা ভাবিস ততটা নয়, দলীয় রাজনীতি আলাদা ব্যাপার— সেটা তোর হয়নি বলে আমার দুঃখ নেই। তুই মানুষের জন্য অনেক করেছিস।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকি। প্রকাশের সব কথা বিশ্বাস হয় না। তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

প্রকাশ বলে, অতনু, মানুষ তোকে ভোলেনি। বিশ্বাস কর, ভোলেনি। তুই দেখিস।

বিধানসভার প্রথম সেসন শেষ হলে প্রকাশ উত্তরবাংলায় ফিরে গেল। পরের সেসনে এল আবার। দেখা হল। কত কথা হয় দু'জনে। কথায় কথায় রাজনীতির কথা এসে পড়ে। তর্ক হয়। দলীয় আদর্শের তফাত নিয়ে ঝগড়া করি দু'জনে। এক-এক সময়ে প্রকাশ আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে

মিটিমিটি হাসে, বলে, অতনু, আমার বিশ্বাসই হয় না যে তোর ব্রেনওয়াশ হয়েছে। তোর তা হতে পারে না। আমার মনে হয় তুই কোনও দিনই কোনও দলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসিসনি।

আমি চুপ করে থাকি। ভাবি। হয়তো প্রকাশ ঠিকই বলছে। কিন্তু আমি কিছু ভেবে পাই না।

প্রকাশ আবার বলে, কোনও কোনও মানুষ আছে, মানুষের ভাল করতে গিয়ে পলিটিক্স করে, কেউ কেউ বা সাধু-সন্ন্যাসী-সন্ত হয়। তুই দ্বিতীয় দলের। আমরা জোর করে তোকে পলিটিশিয়ান বানিয়েছি।

হেসে উঠি।

আবার প্রকাশ চলে যায়। আবার আসে। বিধানসভায় কতগুলো বিল-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তার বক্তৃতা বেশ সুখ্যাতি পেল। একটু নাম করল প্রকাশ।

পরিষ্কার টের পাচ্ছিলাম, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া পালটে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতাসীন দল চাল মাত হয়ে বসে আছে। নতুন কিছু করার নেই। পুরনো আদ্যিকালের কাঠামো রয়ে গেছে সমাজের চেহারায়। সেই ঘুণধরা কাঠামোর ওপরে মাটি চাপিয়ে প্রতিমা গড়ার চেষ্টা। বার বার ভেঙে যাচ্ছে মূর্তি। কারিগর বুঝতে পারছে না কী করতে হবে।

মিহির নামে একটা ছেলেকে চিনতাম। বাঁকুড়ার গ্রামে তার বাড়ি, কলকাতায় থেকে চাকরি করত। মিহিরের বড় ইচ্ছে ছিল, তার গাঁয়ে একটা পোস্ট-অফিস হয়। সে সেইজন্যই অনেক ঘোরাঘুরি করেছে। বহু দরখাস্ত পাঠিয়েছে পি-এম-জি-র কাছে। সেই সব দরখাস্ত যাতে গুরুত্ব পায় সেইজন্য সে যথাবিহিত নামের পাশে এম এ কথাটা উল্লেখ করে দিত। কখনও বা গ্রাম থেকে গণ-দরখাস্ত পাঠাত। পত্রিকায় অন্তত তার 'পোস্ট-অফিস চাই' শিরোনামায় চারটে চিঠি বেরিয়েছিল। কিছুই হয়নি। তখন সে এক অদ্ভুত পন্থা নেয়। গাদা গাদা খাম পোস্টকার্ড কিনে সে তার গ্রামের বিভিন্ন লোকের নামে চিঠি দিতে শুরু করে। তার বিশ্বাস ছিল, যদি তার গ্রামে বহুসংখ্যক চিঠি যেতে শুরু করে তবে সরকার বাধ্য হয়ে পোস্ট অফিস খুলবে সেখানে। এত চিঠি একা লেখা সম্ভব ছিল না বলে সে চেনা-জানা যাকে পেত তাকেই একখানা ঠিকানা লেখা পোস্টকার্ড দিয়ে বলত, কয়েক লাইন লিখে দাও। যা খুশি।

সে কী! অচেনা লোককে কি লেখা যায়?

অন্তত একটু শুভেচ্ছা জানিয়ে দাও। চিঠি যার কাছে যাবে সেও জানে— এ চিঠি নয়, এ আসলে হচ্ছে লড়াই। যেমন করেই হোক পোস্ট-অফিস আমাদের চাই।

মিহিরের গ্রামে ও-রকম চিঠি আমিও পাঠিয়েছি।

বেশ কয়েক মাস গাঁটের কড়ি খরচ করে চিঠি লিখেও যখন পোস্ট-অফিস হল না তখন সে ভারী মুষড়ে পড়ে। তার গ্রাম থেকে একজন বুড়ো-সুড়ো মোড়ল গোছের লোক প্রায়ই মিহিরের কাছে আসতেন। তাঁর সঙ্গে গভীর পরামর্শ করত সে। কলকাতায় মিহির আমাদের দলের হয়ে খাটত। কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে সে ক্যাম্পেন করত সরকারের পক্ষে। আমার কাছে স্বীকার করত সব, বলত, দাদা, এখনও গাঁয়ের মেইন রাস্তাটা পাকা হয়নি। তিনটে টিউবয়েল বসানোর কথা চলছে, ইলেকট্রিক আসার কথা, আর ওই পোস্ট অফিসটা... বিরাট একটা ফিরিস্তি দিয়ে যেত সে। তারপর বলত, এগুলো আগে আগে আমরা গুছিয়ে নিই, তারপর দেখবেন রাজনীতি পালটে যাবে।

আমি তার কাণ্ড দেখে খুব হাসতাম।

অবশেষে এক দিন মিহির সেই বুড়ো মানুষ ভদ্রলোককে নিয়ে আমার কাছে এসে বলে, দাদা, হল না। অনেক করে দেখলাম। এবার আমরা উলটো পার্টির লোক দাঁড় করাব। আপনি চলুন আমাদের গাঁয়ে, মিটিং করবেন।

এই কথা শুনে হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা পরদা সরে যায়। রাজনীতির চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষেরা ডিপ্লোম্যাট হয়ে যাচ্ছে! চালছে উলটো কূটনৈতিক চাল! ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোতে মানুষের স্বার্থই কি একটা পরিবর্তন আনবে!

মিহিরের গ্রামে গিয়ে আমি মিটিং করলাম। পরে নির্বাচনের সময়টা ধীরে ধীরে এসে গেল।

সেই নির্বাচনে সরকার পালটাল। স্টেটসম্যান লিখল— এ ভোট অব অ্যাংগার। ঠিক কথা। এ হচ্ছে রাগের ভোট। মিহিরের গাঁয়ের লোকেরা বড় আশায় ছিল। পাকা রাস্তা, টিউবয়েল, বিজলি বাতি, একটা পোস্ট-অফিস— কিছুই হয়নি। মিহির কলকাতায় একটা দল করত আন্তরিকভাবে, গাঁয়ের স্বার্থে

সেখানে গিয়ে করত অন্য দল। এই ছোট্ট বাঁকুড়ার গ্রামখানিই বাংলাদেশের ছবি, ভারতবর্ষের চেহারা। রাগের ভোট! ঠিকই তো! আমিও জানি, বাংলাদেশে বামপন্থীরা কিছু গঠনমূলক কাজ করেনি।

ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ করেছে মাত্র। তাতে কিছু যায় আসে না। পার্টি পার্টির কাজ করে গেছে। তাতে জনগণের আস্থা বাড়েনি। বিশ্বাস আসেনি। তবু তারা যে দান উলটে দিল তার কারণ তাদের সরকারের উপর রাগ। সেই নেতিবাচক ভোট পেয়ে বাম দলগুলি লাফাতে থাকে। কলকাতায় সেই সন্ধ্যাবেলা বাসে ট্রামে টিকিট কাটেনি কেউ, কন্ডাক্টর পয়সা চায়নি। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আমি শহর দেখলাম। কিন্তু কেমন যেন নিস্পৃহতা এসে গেছে আমার। আমি আর সে-রকম আনন্দ পাই না।

প্রকাশ আবার জিতে এল। জড়িয়ে ধরল। তার দল আর আমার দল এবার মিলেমিশে সরকার তৈরি করছে। খুশি হয়ে বলল, অতনু, যদি সত্যিই আমরা এ-রকম মিলতে পারি, যদি মিশে যাই, তা হলে কী ভীষণ কাণ্ড হবে!

তেমন উৎসাহ বোধ করি না। কেমন যেন লাগে! প্রকাশ যে বলেছিল, তুই দলের জন্য নয়—সেই কথাটা মনে পড়ে। কেবলই মনে হয়, গণ্ডি ভেঙে বেরোনো দরকার। খুঁজে দেখা দরকার সব দলকে গ্রাস করে নেওয়ার মতো কোনও আদর্শ কোথাও জন্ম নিয়েছে কি না। মানুষ পালটাল না, কেবল রাজনীতি পালটে গেল—- এ কেমন কথা?

প্রকাশ বড় আশাবাদী। তর্ক করে। ঝগড়া হয়। বলে, মানুষ পালটাচ্ছে অতনু।

আমি উত্তর দিই, কে তাদের পালটাল? কবে? হাজারটা দল হাজার রকমের কথা বলছে, করছে নীতির লড়াই, আমাদের বক্তৃতার অধিকাংশ জুড়ে থাকে এর ওর তার নিন্দে, গালাগাল, অভিশাপ। আমাদের মিছিলের স্লোগানে থাকে আক্রোশ। মানুষকে আমরা ওইসব শেখাচ্ছি। তার মুখে বসিয়ে দিচ্ছি দলের কথা, চিন্তায় ঢুকিয়ে দিচ্ছি দলের স্বার্থ। আমরা মানুষকে শেখাচ্ছি দাবি আদায় করতে-— এর বেশি কিছু না। প্রকাশ, এ ভাবে মানুষ পালটায় না। মানুষের ভিতরে কবে আমরা সততা, দয়া, কর্মনিষ্ঠা জাগাবার চেষ্টা করেছি? ক'জন মানুষকে শিখিয়েছি আলস্য ত্যাগ করতে? ক'জনকে মদ ছাড়িয়েছি, সচ্চরিত্র করেছি ক'জনকে? যখন রিফিউজি কলোনিতে ভলান্টিয়ার হয়ে প্রাণপণে খাটতাম, ঘরের চালডাল পয়সা কাপড় এনে দিতাম, তখন থেকেই রাজনীতির লোকেরা এসে রিফিউজিদের স্বার্থসচেতন করত, বলত সরকারি সাহায্য দালালরা মেরে দিচ্ছে, তোমরা পাচ্ছ না... ইত্যাদি। রিফিউজিরা খেপে গিয়ে আমাদের মারতে আসত। অথচ ওই রিফিউজি ক্যাম্প থেকে কয়েকটা মেয়ে বেশ্যা হয়ে যায়— তাদের কেউ ঠেকাতে পারেনি। কত ছেলে চোর, পকেটমার হয়ে গেল, কত মানুষ দুঃখ ভুলতে ঘটিবাটি বেচে মদ্যপ হল— কেউ তখন তাদের সচেতন করেনি। মানুষের চরিত্র যখন অন্ধকারের দিকে বেঁকে যায় তখন কে আমাদের মধ্যে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছি। প্রকাশ, মানুষের ভাত-কাপড়ের অভাব আমি মানি— তার জন্য লড়াই আমিও করি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে বড় লড়াইটা ছিল মানুষের ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার নেই। ধর্ম আর চরিত্র পেলে মানুষ আপনি দাঁড়ায়। এত হাঁকডাকের দরকার হয় না। মানুষ আমাদের আদর্শকে বিশ্বাস করে এবার ভোট দেয়নি, দিয়েছে রাগের ভোট— ক্ষমতাসীন দলকে তারা অবিশ্বাস করে। আমরা সেই অবিশ্বাসের ভোট পেয়েছি।

প্রকাশ হাসে। গুরুত্ব দেয় না।

আমি তবু বলি, দ্যাখ, সে-বার দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে মানুষের কী ভীষণ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। এক দিন রেলের কম্পার্টমেন্টে উঠে এক চেকার প্রথমেই হাতজোড় করে বলল, ভাইরা, দিন পালটে গেছে। আমি টিকিট চাইবার আগে বলে নিই— যাঁরা টিকিট কাটেননি, তাঁরা জরিমানা দেবেন, এবং প্রতিজ্ঞা করবেন যে আর বিনা টিকিটে কখনও যাবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আর ঘুষ নেব না। শুনে আমরা ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়লাম। কোনও চেকারের মুখে এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি। কামরার অনেকের টিকিট ছিল না, তারা কেউ কেউ জরিমানা দিল, প্রতিজ্ঞাও করল অনেকে। দু'-একজন আবেগে চোখের জল ফেলল। সেই চেকার ভদ্রলোক কাঁদছিলেন। জনে জনে হাতজোড় করে বলছিলেন, ভাইসব, আমি অনেক ঘুষ নিয়েছি। মহাপাপ করেছি। কিন্তু আর না। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করবেন। শুনে সকলে মূক হয়ে গেল। কেউ কেউ বিড়বিড় করে আশীর্বাদ করল।

এক বুড়ো তাঁকে চেপে ধরে আর ছাড়তেই চান না, কেবল বলছেন—তুই আমার পোলা। তুই আমার সোনার গোপাল—। সেই কামরাটায় কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এক স্বর্গীয় আবহাওয়া। আমার বুক ঠেলে উদ্বেল আবেগ উঠে আসছিল। সেই চেকার ভদ্রলোককে কী যে মহান মনে হয়েছিল! ভেবেছিলাম এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের জনগণের প্রতীক। সেই কামরাটা যেন ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট ছবি।

প্রকাশ চুপ করে ভাবে।

আমি বলি, সেইদিনও আমার মনে হয়েছিল, জনগণ পালটে যাচ্ছে। সুদিন এল বুঝি। কিন্তু মানুষের আবেগ—তাকে বিশ্বাস নেই। আবেগ দু' দণ্ড থাকে অতিথির মতো। তারপর চলে যায়। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এক বছরের মধ্যেই সেই চেকারকে আমি নিজের চোখে ঘুষ নিতে দেখেছি। মানুষ সহজে পালটায় না প্রকাশ, তাকে পালটানোর জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম পড়ে আছে। কেউ সেই লড়াই লড়ছে না। কেবল দাবি আদায় করে দিয়ে সন্তুষ্ট রাখছে তাকে, তপ্ত করে তুলছে স্বার্থের লড়াইতে, জোরদার করছে দলের শক্তি। মানুষ ছিন্নবিচ্ছিন্ন উদভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কেবল। তাদের ঘরের দরজায়-জানালায় কেবল চোর-গুন্ডার উঁকিঝুঁকি, আড়কাঠিদের ছায়া, তার বিপদের রাস্তায় পুলিশের বাড়ানো হাত, চারি দিকে লুট অরাজকতা, তার বেঁচে থাকা মানেই আত্মরক্ষা। ট্রেনের কামরায় দেখা সেই দৃশ্যটা স্বপ্নের মতো মনে হয়।

উত্তরবাংলায় একটা বড় রকমের গন্ডগোল হয়ে গেল। কৃষক বিদ্রোহ। চারি দিকে হইচই পড়ে গেল খুব। চাষিদের সশস্ত্র সংগ্রামের বৃত্তান্ত কাগজের হেডিং।

প্রথমটায় চমকে উঠলাম। উত্তরবাংলার মাটিতে আমি মিশে আছি। সেই স্নিগ্ধ মাটি থেকে এই অগ্ন্যুৎপাত!

দৌড়ে গেলাম প্রকাশের কাছে। প্রকাশ খুশি নয়, বিমর্ষও নয়। চিন্তিত। আমাকে বলল, অতনু, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।

আমি বললাম, আমারও না। এটা গণতন্ত্রের পথ নয় ঠিক। কিন্তু আমি জানতে চাই, এটা বিপ্লবের পথ কি না! এদেশে মানুষ দীর্ঘকাল বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করেছে। এটা কি তারই পূর্বাভাস?

প্রকাশ ম্লান হেসে বলে, সেটা তোরই ভাল জানার কথা। তোর দল বিপ্লবের কথা সবচেয়ে বেশি বলে।

একটু চুপ করে থেকে প্রকাশ আবার বলে, মানুষ এত সহজে পালটায় না— এ তো তোরই কথা!

দীর্ঘকাল রাজনৈতিক ব্যর্থতার রোগে ভুগে আমি খিটখিটে হয়ে গেছি। মনে হয়, সমস্ত শরীরে আমার জ্বালা, দাঁতে-মুখে বিষ। হাত-পা নিশপিশ করে। আমি প্রকাশকে বললাম, ভাল হোক মন্দ হোক, তবু একটা কিছু হয়ে যাক। একটা চূড়ান্ত কিছু হওয়া দরকার। একটা বড় ঝাঁকুনি, ওলটপালট বড় দবকার।

কথাটা স্বস্তির মুখে পড়ল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঝড় এসে গেল হঠাৎ। বার বার বিধানসভা ভেঙে যায়। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃক্ষপতনের মতো লাশ পড়তে শুরু করল। প্রথমটায় খুব চমকে গেলাম! কিন্তু খুনের সেই শুরু। খুনের পর দেয়ালে লেখা হয় অমুক খতম তমুক খতম। নতুন রাজনৈতিক মতবাদ লেখা হতে লাগল চার দিকে। এর আগে বেলেঘাটায় একজন পলাতক নেতা রাস্তার ওপর পুলিশের তাড়া খেয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালাবার সময়ে জনতার হাতে মারা পড়েছিলেন। আমার আর প্রকাশের খুব চেনা লোক। আমরা দু'জনেই খবর পেয়ে মুষড়ে পড়লাম। এমনটা না হলেও পারত। এতটা যেন এদেশের মাটিতে মানায় না।

বিপ্লবের ডাক কারা লিখে যায় দেয়ালে। স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে আসার আহ্বান করে ছাত্রদের। লেখে— শ্রেণীশত্রুর রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয়নি সে কমিউনিস্টই নয়। আরও কত কথা! পড়তে অবাক লাগে। বিপ্লব! এই কি তবে বিপ্লব!

আবার পুথিপত্র খুলে বসি। মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি। কিছু মেলে, কিছু মেলে না। বরাবর এই এক ব্যাপার দেখে আসছি। পুথিপত্রে যা লেখা আছে তার কিছু মেলে, কিছু মেলে না।

তবু সশব্দে চারদিকে লাশ পড়তে থাকে।

খুব অবাক হয়ে ভাবি, উত্তরবাংলার গ্রামে যে বিপ্লবের শুরু তা গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে না পড়ে কেন শহরে এসে বাসা নিয়েছে! গ্রাম দিয়ে তবে এরা কী করে শহর ঘিরবে! বড় অবাক লাগে।

রাত-বিরেতে একা একা ফিরতে গা ছমছম করে। বার বার পিছু ফিরে দেখে নিই। বাতাসকে বিশ্বাস হয় না, গাছটাকেও সন্দেহ করি। যদিও রাজনীতিতে আমি মরা ঘোড়া হয়ে গেছি, তবুও গায়ের গন্ধ বহু দূর যায়। আমাদের রাস্তায় চৌমাথায় পাড়ার ছেলেরা আড্ডা মারে। চেনা ছেলে, তবু তাদের সেই দঙ্গল দূর থেকে দেখে হঠাৎ ভয় লাগে। চেনা ছেলে বটে, কিন্তু যদি ভিতরে ভিতরে রং বদলে থাকে! নীচের তলার ঘরে শুই, শিয়রের জানালা খোলা থাকে। রাতে ভাল ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসি। তারপর মাঝরাতে সিগারেট জ্বেলে জানালায় দাঁড়িয়ে নির্জন চরাচর দেখি। দূরে গাঢ় নীল হিম আকাশের দিকে অপলক চেয়ে থাকি। মৃত্যুর কথা ভাবি। পরকালে আমার কি বিশ্বাস আছে? কে জানে! তবে চিরকাল আমি বস্তুবাদী। নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে গেলেই বীরপাড়ার রাস্তায় ঝোপের গাঢ় ছায়া থেকে আজও ধূসর রঙের একটা সতেজ সাপ উঠে তার বুকের সাদা রং আমাকে দেখায়। শরীর শিউরে ওঠে, ভয় করে।

কিন্তু বস্তুত মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমার, আমার পারিবারিক সম্পর্ক আলগা, বাইরের জগৎ থেকেও কিছু পাওয়ার নেই। বেঁচে থাকার আর কী অর্থ? মরলেই বা ক্ষতি কী? নিছক বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকাটা কোনও কাজের নয়। কেঁচো, কীট, পশুরাই ও রকম বাঁচে। এ-সব কথা নিজেকে বলেছিও কত বার। যখন রাজনীতিতে প্রথম নেমেছিলাম, তখন অন্তত মৃত্যুভয় আমার ছিল না, সেইসব দিনে কত বার ভাড়াটে গুন্ডা, গোয়েন্দা পুলিশ, অন্য দলের মারমুখো সমর্থকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি অনায়াসে। তবে কি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে? আয়ুর প্রতি ভালবাসা? যদি আমি রোজগেরে মানুষ হতাম, যদি আমার ওপর নির্ভর করত আমার ছেলে-মেয়ে-বউয়ের ভবিষ্যৎ, তবে হয়তো বেঁচে থাকার প্রতি ভালবাসা স্বাভাবিক হত। কিন্তু তাও তো নয়।

সেই আন্দোলনের প্রকাশ্য নিন্দে করল প্রকাশ। কাগজে ওর লেখা বেরোল। গিয়ে প্রকাশকে সাবধান করে দিলাম, দিনকাল ভাল না প্রকাশ। সাবধান।

প্রকাশ মুখ গম্ভীর করে আমাদের সেই চেনা নিহত পলাতক রাজনৈতিক নেতার কথা উল্লেখ করে বলে, ও মারা যাওয়ার পর থেকে আমার মন চার দিকটার ওপর বিষিয়ে গেছে। ওর আর আমার দল আলাদা ছিল, তবু আমাদের কাজ আসলে তো আলাদা নয়। এখন এইসব যা হচ্ছে এই-ই বা কী অতনু? বাচ্চা ছেলে সব— এরা কী বোঝে? কেন এ-সব—! প্রটেস্ট করে রাখলাম অতনু, ভবিষ্যতের মানুষ যখন এই অন্যায়ের নিন্দা করবে তখন তারা খুঁজে দেখবে, কেউ সাহস করে এর প্রতিবাদ করেছিল কি না, আমি সেটা করে রাখছি—

সুখের বিষয়, আমার অভিজ্ঞতা প্রকাশের চেয়ে বেশি। আমি ভবিষ্যতের ভাবনা কম ভাবি। আমার চিন্তা বর্তমানকে নিয়ে। এইসব ঝোড়ো দিনগুলো মাথা নুইয়ে কাটিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সুযোগ যদি আসে আসবেই— তখন দেখা যাবে। প্রকাশ তা বোঝে না। তর্ক করে। ঝগড়া হয়।

রাশি রাশি ছেলে ধরা পড়েছে। তবু খুন কমছে না। অবাক হয়ে দেখি বাংলাদেশের নরম মাটি থেকে এ কারা জন্মাল! তিনটি-চারটে ছেলে গিয়ে স্কুল জ্বালায়, পুলিশ ব্যারাকে আক্রমণ করে, সশস্ত্র এস-আইকে খুন করে। দিনের বেলায় হাজার লোকের চোখের সামনে ট্রাফিক পুলিশ মারে। এক-আধজন এম এল এ-ও খুন হয়।

থানার ও-সি চেনা লোক। একটু খাতির করেন। কেস মারাত্মক না হলেও আমার ক্যাডারদের অযথা আটকে রাখেন না। আমি গেলে ছেড়ে দেন। হেসে বলেন, আমাদেরও জায়গা নেই। দেশসুদ্ধ ছোকরারা ক্রিমিনাল হয়ে গেলে আমরা রাখি কোথায়। মাঝে মাঝে থানায় যাই। আড্ডা মারার জন্য নয়। পরিস্থিতি বোঝবার জন্য। থানার খবর সবচেয়ে পাকা। ও-সি বসান, চা খাওয়ান, অল্পস্বল্প

ইনফর্মেশন দেন। আর বার বার বলে দেন, সাবধানে চলাফেরা করবেন। আমাদের দেশে এক রকম কাঁঠাল হত। মাটির নীচে ফলত। পেকে গন্ধ ছড়ালে আমরা টের পেতাম। আপনারা হচ্ছেন সে কাঁঠালের মতো। লুকিয়ে থাকলেও গন্ধে লোকে টের পাবে ঠিক।

আগেই বলেছি, জীবনের প্রতি আমার তেমন গাঢ় অনুরাগ থাকার কথা নয়। তবু দেখি এত হেলাফেলা করে যে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম. যে আমি সংসারে কারও কাজে লাগলাম না, যে আমাকে এই সংসারও বড় বেশি হেলাফেলা করেছে, তারও রয়েছে মৃত্যুচিন্তায় প্রগাঢ় কাপুরুষতা।

নাকি এ স্বাভাবিক বাঁচার আকুতি!

সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। বীরপাড়ার রাস্তায় ধুলোয় হাঁটু গেড়ে বসে একদা আমি প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম একটি সাপের কাছে। সে অবহেলা ভরে ছুড়ে দিয়ে গিয়েছিল আমার আয়ু। সেই কথা মনে পড়ে।

আমাদের বাড়ির পিছন দিকে একটু উঠোন, একটু বাগান। দেয়াল ঘেরা। সারা দুপুর সেখানে খেলা করে তিতু আর ঝিমলি। আমি আজকাল একটু বেশি ঘরে থাকি। দুলু স্কুলে চলে যায়, ভাইরা বেরোয়, বাবা আর মা ঘরে শুয়ে-বসে থাকে। আমি একা বারান্দায় বসে থাকি। একা আমি চিরকালই। ঘরের প্রবাস আমার। দুলু কয়েকটা দিন শুধু আমার কাছে এসেছিল। খানিকটা ভালবাসায়, খানিকটা আক্রোশে। ঘৃণা আর ভালবাসার দূরত্ব বুঝি বেশি নয়। মানুষের মনে তারা পাশাপাশি দু'টি পাখির মতো বাস করে। একজন ডাক দিলে অন্যজনও ডেকে ওঠে। দুলুব সঙ্গে বাস করে আমার এখন এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। দুলুর উদাসীনতায় আমি বাস করি। এক-এক সময় দুলু সচেতন হয়ে আমাকে ভালবাসে কিছু, কিছু ঘৃণা করে।

ওই যে তিতু আর ঝিমলি— ওরা কি ঘৃণার ফসল, না কি ভালবাসার তা আমি বুঝি না। চেয়ে থাকি। বুঝতে চেষ্টা করি। সারাটা দুপুর ওরা উঠান আর বাগানময় খেলাঘর তৈরি করে, আর ভাঙে। এক এক সময়ে আমাকেও ডাকে। আমি তাদের পুতুলের কাপড় পরিয়ে দিই, পাহাড় বানাই, মিছিমিছির নেমন্তন্ন খাই। ছোটন সাধারণত এইসব খেলায় থাকে না, ছয় বছর তার, তবু বাড় নেই। তিন কি চার বছরের শরীর তার, কথা আধো আধো, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, মাথায় ঘা, সারাটা দিন দাদু আর ঠাকুমার মাঝখানে শুয়ে থাকে। কোনও কোনও দিন সেও উঠে এসে খেলা করে। খেলা শেষ হয় একসময়ে। তখন গল্প বলার পালা। বারান্দায় তারা আমাকে ঘিরে বসে। আমি জঙ্গল আর পাহাড়ের গল্প বলি। বলতে বলতে একসময়ে তাদের কথা আর খেয়াল থাকে না। আমি গল্প বলে চলি নিজেকেই। সাপ, বাঘ, পাহাড়, জঙ্গল, আর মানুষ— উত্তরবাংলার সেই জীবনের বিচিত্র আলো-আঁধারিতে কখন হারিয়ে যাই। তিতু, ঝিমলি আর ছোটন হাঁ করে শোনে। শিউরে উঠে আমার গা ঘেঁষে আসে।

বিকেলে দুলু ফিরে এসেই তাদের সরিয়ে নেয়। আমাকে চাপা ধমকের সুরে বলে, ছেলেমেয়েদের নষ্ট কোরো না, ওদের ভিতরে তোমার মাঠ-ঘাট-পাহাড় আর রাজনীতির বাউন্ডুলেপনা ঢুকিয়ো না।

বুকের ভেতরটা এখনও খিচ ধরে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ পালটে যায়। রাগে, হতাশায়। বড় নিষ্ঠুর তুমি দুলু। তোমার মায়া নেই।

চারি দিকে প্রতিদিন লাশ পড়ছে। তবু কেউই আমাকে সাবধান করে না। কারও উদ্বেগ নেই আমার জন্য। মনে হয়, তারা সবাই আমাকে চোখের সামনে দেখেও প্রতিদিন ভুলে যাচ্ছে। এর চেয়ে মৃত্যু খুব বেশি মর্মান্তিক নয়। দুলু নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে, তুমি কেন বেরোও না? তুমি বেরোলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

মর্মান্তিক! তবু ঘটনাটা ঘটে যায়।

মধ্য কলকাতার পার্টি অফিসের ঘরে থাকত প্রকাশ। বিধানসভার অধিবেশন শেষ হলে উত্তরবাংলায় ফিরে যেত। এবারও যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগের দিন ঘুরে ঘুরে কিছু বাজার করছিল। বাচ্চাদের জন্য খেলনা, বড়বাজার থেকে ডালের বড়ি, হাওড়াহাট থেকে ছিটকাপড়। ফিরতে বিকেল হয়েছিল। পার্টি অফিসের সামনের গলিতে চারজন তাকে ঘিরে ধরে।

প্রকাশের হার্ট ভাল ছিল না, সম্ভবত ডায়াবেটিসও ছিল। খুব মিষ্টি খেত প্রকাশ। উত্তেজিত হলে

ইদানীং থর থর করে কাঁপত। বলতাম, ডাক্তার দেখা, একটা জীবন শরীরের দিকে তাকাসনি, এখনও সময় থাকতে—

প্রকাশ বলত, বাদ দে। শরীরটা পুষে রাখার জন্য নয়, কাজে লাগাবার জন্য। যত দিন কাজে লাগবে লাগুক, তারপর ফেলে দেব।

কখনও বা বলত, ডাক্তারের কাছে যেতে মাইরি ভয় করে। ফায়ারম্যান ছিলাম, কত ধকল গেছে। পার্টি করতে গিয়ে শরীরের ওপর কত অত্যাচার করেছি। কোথায় কী হয়ে আছে শরীরের ভিতর কে জানে! হয়তো ক্যান্সার, যক্ষ্মা, প্রেশার, ডায়বেটিস কি হার্টের ব্যামো। ডাক্তার দেখালেই সব ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে না জেনে এই বেশ আছি—

প্রকাশের বউ দুলুর মতো সুন্দর ছিল না। ছিল না দুলুর মতো নিষ্ঠুরও। সে প্রকাশকে ভালবাসত খুব। বউয়ের কথা বলতে প্রকাশ বলত, যা ভয় করেছিলাম, বউটা সে-রকম হয়নি! আমার নতুন মা'কে কেড়ে নেয়নি। বরং আমি বারমুখো বলে তারা শাশুড়ি-বউ জোট বেঁধে থাকে। মা বাচ্চাগুলোকে সামলায়, বউ ঘরদোর দেখে। ভারী লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রেখেছে ঘরে— গরিবের ঘরে যতটা ফোটানো যায়। কিন্তু আমি কেমন লক্ষ্মীছাড়া দ্যাখ, সেই ঘরে আমার থাকাই হয় না। এত দূর পার্টি অফিসে পড়ে আছি, টেবিলে পেতে শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে থাকি, পাউরুটি আর জল খেয়ে কত দিন কেটে যায়।

আমাদের বাড়িতে কত বার প্রকাশকে থাকতে বলেছি, থাকেনি। বলেছে, দূর! লোকে কী বলবে! আমাদের দল আলাদা—সেটা ভুলিস না।

বড় একটা চমক লাগত। প্রকাশের দল আলাদা। হায় ঈশ্বর, কাটিহারের রাস্তায় রাস্তায় আমরা যে একসঙ্গে কত বার মার খেয়েছি!

যত দূর জানি, প্রকাশ শব্দটিও করতে পারেনি। চারজন তাকে ঘিরে ধরেছিল। খোলা রাস্তায় তার পার্টি অফিসের সামনেই। খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, খুব ভিড়। পুলিশ সদ্য এসেছে। মেডিকাল কলেজের এমার্জেন্সিতে প্রকাশের দেহটা শোয়ানো।

কিন্তু এ কে? একে তো কখনও চিনতাম না আমি। এই কি প্রকাশের চেহারা! তার মাথাটা প্রায় নেই-ই। আকারহীন, ফাটা ভাঙা একটা মাথা, চোয়াল ভেঙেছে। সমস্ত শরীর ছোরায় ছোরায় লন্ডভন্ড। একটা বয়স্ক, দুর্বল দেহের ওপর এ কেন আক্রোশ ওদের! এতটার দরকার ছিল না। প্রকাশের হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে, পেটের ভিতর থেকে একটা নাড়ি বেরিয়ে এসে ঝুলছে। আমি চোখ ফেরাতে পারি না, তাকাতেও চোখ ফেটে যাচ্ছে।

পুলিশ আমার কাছে একটা বিবৃতি চেয়েছিল। কিছুই বলতে পারি না। কথা এলোমেলো হয়ে যায়। আবোল-তাবোল কী সব বলি। মাঝে মাঝে শরীরে কাঁপুনি উঠে যায়। হিক্কা ওঠে। অনেকক্ষণ শূন্য লাগে মাথা, পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরটি আমাকে বললেন, আপনার শরীর বোধ হয় ভাল নেই। যাকগে, পরে হলেও চলবে।

পত্রিকার লোক দু'-একজন আমাকে ধরে। আমি ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, তারা সরে যায় অবশেষে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উবু হয়ে বসে এক কোষ জল বমি করি।

দেয়ালে দেয়ালে লেখা হল— প্রকাশ খতম।

মাসখানেক ভাল করে খেতে পারি না। বরাবর মন অস্থির হলে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে মন ঠিক হয়ে যায়। এখন আর তেমন বাইরেও যাওয়া হয়ে ওঠে না। ঘরেই বেশির ভাগ থাকি। অবিরাম পায়চারি করি। মাথার ভিতরে চিন্তার ঘূর্ণিঝড় ওঠে। মাঝে মাঝে বসে থাকি, বসেই থাকি।

পৃথিবীতে সুখকর বিস্মৃতি আছে। মানুষের দুঃসময়ে যা সবচেয়ে বড় বন্ধু। একটু দেরিতে আসে ঠিকই। আস্তে আস্তে ক্রমশ বিস্মৃতির প্রলেপ পড়তে থাকে।

একদিন রাত দু'টো নাগাদ দরজার কড়া নড়ল। ঘুমের মধ্যে সেই শব্দ তিরের মতো বিঁধে কাঁপতে লাগল। জেগে উঠেও বুকের দুরদুর আর থামে না। দুলুও তার বিছানায় উঠে বসেছে, টের পেলাম। কিন্তু কিছু বলল না, জানালা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

কয়েকটা ছেলে জানালার সামনে এগিয়ে বসে বলল, অতনুদা, আমরা।

চিনলাম। পাড়ারই ছেলে, যারা চৌরাস্তার মোড়ে আড্ডা মারে। দেখে ভয়ও পেলাম একটু।

তাদের মধ্যে একজন জানালার কাছে এসে বলল, আমাদের মণিকে আজ পুলিশে তুলে নিয়ে গেছে। ওর কোনও দোষ নেই। ও-সি আপনার চেনা, যদি একটু বলে দেন।

এ-কাজে আমি অভ্যস্ত। অতীতে বহু বার বহুজনকে ছাড়িয়ে এনেছি। কিন্তু এবার একটু ইতস্তত করতে থাকি। বলি, এত রাতে?

বলেই মনে মনে হাসলাম। কোনওকালেই আমার কাছে দিন-রাতের কোনও ভেদ ছিল না। এখন এইসব গৃহস্থের সংস্কার আমার আসছে। ভয় খামচে ধরেছে বুক। এইসব ছেলেরা চেনা হয়েও আমার অচেনা। কোনও অছিলায় বার করে নিয়ে গিয়ে যদি মারে। মেরে ফেলে?

সামনের ছেলেটা বলল, এত রাতে আসতাম না। কিন্তু ওকে যদি মারধর করে। একটা নির্দোষ ছেলে সারা রাত মার খাবে!

হঠাৎ সাহস এল। ভাবলাম, এদের নিয়েই বাস। যদি এরা আমাকে পেতে চায়, তবে পাবেই কোনও না কোনও দিন। তাই তর্ক করলাম না। বুঝলাম, যদি পিছিয়ে যাই তবে এরা হয়তো বা চিরকালের মতো আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এগোলে যদি বিপদ থাকে তো পিছোলেও বিপদ আছে। তাই বললাম, চলো, দেখা যাক।

গায়ে জামা চড়াতে চড়াতে অন্ধকারেই দুলুকে লক্ষ্য করে বললাম, সদরটা দিয়ে দিয়ো। আমি ঘুরে আসছি।

অতীতে দুলু বহু বার রাতবিরেতে উঠে ঘুম-চোখে সদর দিয়েছে কিংবা খুলেছে, একটিও কথা বলেনি, এবার বলল, ওরা কারা?

পাড়ার ছেলে।

চেনো তো?

চিনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, কী রকম চেনো? ভাল করে?

চাপা গলায় বললাম, ওরা জানালার কাছেই আছে। শুনতে পাবে।

দুলু উদাস গলায় বলল, দেখতে পাচ্ছি।

তারপর উঠে এসে আমার পিছু পিছু সদর পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে বলল, ওদের জন্য আমার ছাত্রীরা আসতে ভয় পায়। রাস্তার মোড়েই ওরা থাকে। ওদের কাউকে যদি পুলিশ ধরে থাকে তো বেশ করেছে, তুমি ছাড়িয়ে এনো না।

উত্তর না দিয়ে দরজার হুড়কো খুললাম। ছেলেগুলো গম্ভীর নিস্তব্ধ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বললাম, চলো।

আপনাকে কষ্ট দিলাম অতনুদা, বউদি হয়তো রাগ করছেন।

একটু কেঁপে উঠে বললাম, না না, রাগের কী। মানুষের বিপদে-আপদে দেখতে হয় না।

ওরা আর কিছু বলল না। কয়েকজন আমার আগে, কয়েকজন পিছনে হাঁটতে লাগল। বড় অদ্ভুত অবস্থা হল আমার। আগের দলকেও বিশ্বাস হচ্ছে না, পিছনের দলকেও না। রাস্তার মোড়ে একটা তেঁতুল গাছ, আর ঝুপসি ছায়া। ছায়াটা পেরোবার সময়ে চোখ বুজে বিড় বিড় করে বললাম, বোধ হয় এইবার—এইখানে—।

কিন্তু ছেলেগুলো আমার দিকে তাকালও না। পিছনে কয়েকজন একটু দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, দেশলাইয়ের শব্দ পেলাম। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। সারাটা রাস্তায় আমি হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে ঘেমে গেলাম। অদূরে থানার আলো যখন দেখা যাচ্ছিল তখনও আমার ভয় কাটেনি।

থানার দেউড়ির একটু দূরে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে বলল, আপনি যান। আমরা এখানে রইলাম।

বললাম, তোমরাও এসো না।

একজন একটু হেসে বলল, আমাদের অনেকের নামেই ওয়ারেন্ট আছে। ঝামেলায় কাজ কী? এ-সব ব্যাপারে আপনি একাই একশো।

খুবই বিপন্ন বোধ করলাম এই ভেবে যে, এদের সঙ্গেই হয়তো এতটা পথ আবার আমাকে একা ফিরতে হবে। আজকাল পথ আর আমার ফুরোয় না।

চেনা ও-সি মুখ তুলে ভ্রূ তুললেন, আপনি!

আমি হাসলাম, ওই যে মণি নামে ছেলেটা—

ও-সি অবাক হয়ে বললেন, সে তো আপনার দলের ছেলে নয়। বরং বোধ হয় উলটো পার্টির।

আমি উদাস গলায় বললাম, না। আমার পাড়ার ছেলে, আমি চিনি।

ও-সি মাথা নাড়লেন, এ-ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার খবর বেশি পাকা। বরং আপনি ছেলেটিকে এক বার দেখুন ভাল করে, আপনার ভুল হতে পারে—।

আমি ইতস্তত করছি দেখে ও-সি হাসলেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন, এ আপনার দলের নয়। আসুন—

ও-সির সঙ্গে সঙ্গে উঠে লক-আপে গেলাম। ভিতরে একটি ছেলে মেঝের ওপর বসে আছে। ঘাড় পর্যন্ত তার লম্বা রুক্ষ চুল, গালে না-কামানো দাড়ি, বেশ লম্বা ছেলেটা, কাঁধের হাড় চওড়া। গায়ে মাংস নেই, কিন্তু হাড়গুলো মজবুত। দু'টো চোখ লালচে। আমাকে দেখে সেই লাল চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তাকে আমি আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।

শান্ত গলায় সে বললে, কী চাই?

আমি ও-সির দিকে তাকালাম, তাঁর মুখে সন্দেহের ছায়া।

মুখ ফিরিয়ে ছেলেটার সঙ্গে নকল পরিচিতের সুরে বললাম, কী হয়েছিল মণি? কী করেছিলে?

ছেলেটি একটু চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল, আপনি কেন দালাল মশাই?

একটু থেমে গেলাম। বুঝলাম, ছেলেটা আমাকে চেনে। 'দালাল' কথাটা প্রমাণ করে যে, ছেলেটি আমার দলেব নয়। বরং ও-সির কথাই ঠিক। ছেলেটা উলটো পার্টির।

তবু মুখ বাঁচানোর জন্য চাপা স্বরে বললাম, মণি, কী হচ্ছে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভারী অবাক হল ছেলেটা। তারপর ধীরে ধীরে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, মুখে দেখা দেয় রাগের রক্তিমাভা। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, কে চায় ছাড়া পেতে? আপনি কোন পার্টির দালালি করেন আমি কি তা জানি না।

তার গলা হঠাৎ খ্যাপা কুকুরের চিৎকাবের মতো তুঙ্গে উঠে যায়। সে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, যাদের দালালি করে এসেছেন এত দিন, তাদের জন্য দারোগার কাছে নাকে কাঁদুন গে। সাচ্চা বিপ্লবী চোখে দেখেছেন একটাও? আমি যখন বেরোব, এই থানার দেয়াল ভেঙে বেরোব, আপনার মতো দালাল কুত্তার হাত ধরে নয়। এই দারোগা! এটাকে বের করে দিন, আমার ঘেন্না করছে।

রাজনীতি করার একটা শিক্ষা হচ্ছে এই যে, নিজের রাগ অনুভূতি, ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে, অপমান সহ্য করার মতো সহনশীলতা জন্মায়। আমি রাগলাম না। ও-সিকে একটু তফাত হতে বললাম। তিনি একটু হেসে সরে গেলেন।

আমি সেলের কাছে গিয়ে ছেলেটিকে বললাম, তোমার বন্ধুরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে তারা নিয়ে যেতে চায়।

ছেলেটার চোখ আবার ঝিকিয়ে উঠল। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, কারা আমার বন্ধু? তাদের নাম কী?

সকলের নাম আমার জানা ছিল না। দু'-একজনের ডাক-নাম জানতাম। বললাম, ভুলু, মণ্ডল, শচী, এরা সব।

ছেলেটা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে সন্দেহে কুটিল হয়ে গেল তার মুখ, গরাদের শিক ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে হঠাৎ আমার গায়ে এক ঝলক থুথু ছুড়ে দিল সে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, ওরা আমার বন্ধু? কুকুরের বাচ্চা, আমি তোমার মতলব বুঝি না?

থুথুর ভয়ে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম। তা ছাড়া ছেলেটার রাগের তাপও আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার ভয় করছিল। আমি অবাক হয়ে বললাম, ওরা তোমার বন্ধু নয়?

ছেলেটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, ওরা আমার কী রকম বন্ধু আপনি জানেন না? না-জেনেই এত কষ্ট করে মাঝরাতে বউয়ের কোল ছেড়ে উঠে এসেছেন?

হঠাৎ আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল কোথাও একটা ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবু আমি ঐকান্তিকভাবে বলার চেষ্টা করলাম, ওরা তোমার বন্ধু কি না জানি না। তবে ওরা ভয় পাচ্ছে পাছে তোমাকে পুলিশে মারধর করে, তাই আমাকে ডেকে এনেছে।

ছেলেটা দুই শক্ত হাতে এত জোরে গরাদ চেপে ধরল যে তার আঙুলের মাথাগুলো সাদা হয়ে গেল। তেমনি ঠান্ডা রাগের গলায় বলল, আমাকে মারধর করার সাহস এদের নেই। যদি করে, তবে নির্বংশ করে দেব। কিন্তু ওই যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তারা কেন দাঁড়িয়ে আছে, আমি জানি। আপনি ওদের হয়ে কেন এসেছেন তাও জানি। দালাল আর কুত্তার দল কেউ থাকবে না। আপনার দিন শেষ হয়ে এসেছে— ওদেরও।

এই বলে হঠাৎ সেলের দরজাটা ঝনাৎ করে খুব জোরে নাড়া দিয়ে ছেলেটা ডাকল, এই দারোগা—

ও-সি ধীরে-সুস্থে এলেন! আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে চোখে ইঙ্গিত করলেন। আস্তে বললেন, বলেছিলাম কি না!

ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, এ-লোকটা এখানে কেন এসেছে জানেন?

ও-সি বললেন, অতনুবাবুকে আমি চিনি।

ছেলেটা শিকের ওপর জোর একটা ঘুঁষি মেরে বলল, ছাই চেনেন! বাইরে কতকগুলো কুত্তা দাঁড়িয়ে আছে, আর এটা হচ্ছে সেই কুত্তাদের এজেন্ট। আমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে, বাইরে নিয়ে গিয়ে— হিসহিস— বলে ছেলেটা হাত তুলে নিজের গলায় নলিটার ওপর চালিয়ে দেখাল। তারপর হাসল। বলল, গলাটা কেটে ফেলবে।

ও-সি তাকিয়ে ছিলেন।

ছেলেটা গনগনে মুখে বলল, একে আপনি কিছুই চেনেন না।

ও-সি আমার দিকে ফিরে বললেন, বাইরে কারা দাঁড়িয়ে আছে?

আমার ভয়ংকর বুক কাঁপল। আমার বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্রই আমি ধরতে পারিনি। মনে হচ্ছিল বেশিরভাগ মানুষই আমার চেয়ে চালাক। আমি বড় বোকা রয়ে গেছি।

নামগুলো ও-সিকে বললাম।

তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন, এতক্ষণ বলেননি কেন? ওদের আমরা খুঁজছি—

বলতে বলতে তিনি হাতে স্বয়ংক্রিয় রিভলবার টেনে বের করে ব্যস্তভাবে চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে বলে গেলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। ওরা কোথায় আছে?

বাদামতলায়।

মুহূর্তের মধ্যে বুটের শব্দ ঝড়ের মতো ছোটাছুটি করল। একটা জিপের শব্দ পেলাম। ব্যস্ততা।

শরীরে ভয়ংকর অবসাদ টের পেয়ে আমার পা ভেঙে আসছিল। আমি অজান্তে আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে মেঝেতে বসে পড়লাম।

মুখোমুখি সেলের ভিতরে শিকের ফাঁক দিয়ে ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে আছে। তেমনি জ্বলজ্বলে চোখ। আমাকে বসে পড়তে দেখে একটু হাসল। বলল, খুব খারাপ লাগছে? লাগবেই— প্ল্যানটা ভেস্তে গেল।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, আমি কিছুই জানি না।

ছেলেটা ব্যঙ্গের হাসি হাসল, জানেন না।

না।

ছেলেটা মুখে জিভ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করে বলল, আমার দলের ছেলেরা যখন আপনার পাত্তা নেবে তখন এ-কথা বলবেন।

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে টের পেলাম, আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক অদ্ভুত অসহনীয় ভয়।

আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। আমি সম্মোহিতের মতো ছেলেটার দিকে চেয়ে রইলাম। এ-রকম রাগ আর তীব্রতা আমি আর কোনও মানুষের মধ্যে দেখিনি। ছেলেটার রাগ, ব্যঙ্গ, ঠাট্টা, শান্তভাব— সব যেন এক সুরে বাঁধা। একটা চরম বা শেষ কিছু করার জন্যই যেন জন্মেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, এর আয়ু বেশি না। খুব অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এর-তার হাতে খুন হয়ে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ ও বেঁচে আছে, ততক্ষণ ওর বেঁচে থাকার তীব্র স্পন্দন চারি দিকে ছড়িয়ে আছে। ওকে ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

আমার গলার স্বর ভেঙে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল, কাঁপছিল বুক, হাত, পা। মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে বোধবুদ্ধি। আমি বললাম, আমি তোমাকে চিনতাম না মণি।

ঠান্ডা গলায় সে বলল, চিনবেন! সময় যায়নি।

বুঝলাম, ওর কোনও মায়াদয়া নেই।

আমি মিনমিন স্বরে বললাম, আমাকে ওরা ভুল বুঝিয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি যে, তুমি ওদের দলে নও।

ছেলেটা শরীর ঝাঁকি দিয়ে বলল, আমি কুত্তাদের দলে কেন যাব। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের শিস্ দেওয়া কি কাজ? সাচ্চা বিপ্লবীরা ও-সব ঘেন্না করে— বলে ছেলেটা সেলের মধ্যে থুথু ফেলল।

তারপর আবার হাসল, আপনি চিরকাল এর-ওর পা চেটে এসেছেন, বিধানসভার নমিনেশনের জন্য। আজ আবার এদের পা চাটছেন— কীসের জন্য? আমি আপনাকে এবং আপনাদের চিনি, এবার আপনারা একটু আমাদের চিনুন। আমার নাম মণি বোস— এঞ্জিনিয়ারিঙের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিলাম। ভাল ছাত্র— পরীক্ষা দিলে ফার্স্টক্লাস পেতাম। মাদ্রাজে আমার বাবা আমার জন্য ভাল চাকরি ঠিক করে রেখেছিল। আমাকে বিয়ে করার জন্যে ছেলেবেলা থেকে একটি খুব সুন্দর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে। সবকিছুই ছিল আমার ফেভারে। সে-সব ছেড়ে আমি বিপ্লবে নেমেছি কেন?

আমি ভীতমুখে তাকিয়ে ছিলাম। প্রশ্ন করলাম, কেন?

ছেলেটা হাসল, বলল, কারণ বিপ্লব মানে আমি মিছিল-মিটিং বুঝি না। বিপ্লবের মানে ক্যাডারদের লক-আপ থেকে ছাড়িয়ে আনাও নয়। বিপ্লব মানে বিধানসভার সিট পাওয়াও নয়। আর বিপ্লবী বলেই আমি বউয়ের পয়সায় বসে খাব— এও হয় না। লরির পারমিটের জন্য ঘুরব তাও হয় না।

এই পরিণত বয়সে আমি এই প্রথম একটি বাচ্চা ছেলের কাছে বিপ্লবের মানে শুনছিলাম। বেশ উৎকর্ণ হয়েই শুনছিলাম।

ছেলেটি লকআপের ভিতর থেকে এমনভাবে আমাকে দেখছিল, যেন আমিই লকআপে আছি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বলল, সত্যিকারের বিপ্লব এ-সব কিছুকেই ধুয়ে-মুছে দিয়ে যাবে। আমি সব ছেড়েছি কাজেই সব কিছুব শেষ দেখে যাব!

বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

জিপের শব্দটা ফিরে এল।

ছেলেটা উৎকর্ণ হয়ে শব্দ শুনল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, পুলিশ আপনার কুত্তাদের কয়েকজনকে বোধ হয় ধরে এনেছে। এবার যান, দারোগার পা চেটে খালাস করুন গে।

আমি উঠলাম। দুর্বল লাগছিল খুব।

বাইরে থানার হাতায় তখন জিপটা থেমেছে! ও-সি নামলেন। গম্ভীর মুখ। জিপের পিছন থেকে সিপাইরা ধরাধরি করে একজনকে নামাচ্ছিল। তার শরীর থেকে রক্ত পড়ছে টপ টপ করে। ছেলেটার মুখ আমি দেখলাম না। চোখ ফিরিয়ে বাইরের রাস্তায় ম্লান ল্যাম্পপোস্টের আলো, ঝুপসি গাছের ছায়া, এবং দূরবর্তী বিরাট, ব্যাপক অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও-সি আমাকে ডাকলেন, অতনুবাবু, ভিতরে আসুন। কথা আছে।

টেবিলে মুখোমুখি বসে আমি ও-সিকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম। যেমন বরাবরই দিই। উনি সিগারেট নিলেন না। হাতটা নেড়ে বললেন, একজনকে ধরেছি, কিন্তু আনহার্ট নয়। এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তবে আগে আপনি একটু দেখুন। আইডেন্টিফাই হওয়া দরকার।

আমি চুপ করে রইলাম।

সিপাইরা ছেলেটাকে বারান্দায় শুইয়ে প্রাথমিক ওষুধপত্র লাগাচ্ছিল। আমি উঠে গিয়ে দেখলাম। মাথার একটা দিক থেঁতলে গেছে প্রায়, পায়ের দিকটা গুরুতর জখম। মুখটা দেখে চিনলাম, যে-ছেলেটো সবার আগে-ভাগে ছিল সে-ই, নাম জানি না।

ও-সিকে বললাম, নাম জানি না। তবে ওই দলে ছিল।

ও-সি আবার হাত নাড়লেন, ঠিক আছে। নাম-ধাম আমরা পেয়ে যাব। দলে ছিল কি না সেটাই বড় কথা।

তিনি আবার আমাকে ঘরে এনে বসালেন। কিছু একটা লিখলেন ডায়েরিতে, তারপর পেনসিলটা তুলে মুখের সামনে আড়াআড়ি ধরে বললেন, মনে হচ্ছে, আপনি ওদের ভাল করে চেনেন না।

আমি মাথা নাড়লাম, না। তবে পাড়ার ছেলে, চিনি।

ও-সি শ্বাস ছেড়ে বললেন, সেই মুখ চেনার ওপর নির্ভর করে এত রাত্রে ওদের সঙ্গে আসা আপনার ঠিক হয়নি। ওরা আপনাকে কাজে লাগিয়েছিল। আপনার কথায় আমি মণিকে ছেড়ে দিলে আজ রাত্রেই মণি মার্ডার হত ওদের হাতে। তখন আপনি কী করতেন?

আমি নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলাম।

উনি আবার বললেন, কতখানি ঝুঁকি নিয়েছিলেন, বুঝতে পারছেন?

আমি মাথা নাড়লাম, পারছি।

উনি হাসলেন, আপনাদের আমলে রাজনীতি এক রকম ছিল। এখন অন্য রকম। একটু বুঝে চলবেন।

আমি মাথা নাড়লাম!

উনি শ্বাস ছেড়ে বললেন, এখন আপনি একটু বিপদের মধ্যে আছেন কিন্তু। ওই দলের যারা পালিয়েছে, তারা পাড়ার রাস্তাতেই বোধ হয় অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

আমি শীতলতা অনুভব করলাম শরীরে।

উনি বললেন, আমাদের প্রিজন ভ্যান ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। আপনি ওই ভ্যানে চলে যান। হাসপাতাল ঘুরে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসবে।

কথা বলতে পারছিলাম না। কেবল আবার মাথা নাড়লাম।

দুলু জেগে অন্ধকার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থামতেই আস্তে দরজা খুলল। আমি ঢুকতে সাবধানে আবার দরজা দিয়ে বলল, তুমি পুলিশের গাড়িতে এলে?

হুঁ।

কেন?

ওরাই পৌঁছে দিল।

দুলু শ্বাস ছেড়ে বলল, একটু আগে দু'টো ছেলে এসে খোঁজ করে গেছে তুমি ফিরেছ কি না।

আমি অন্ধকারে কেঁপে উঠলাম। বললাম, কেন?

কেন তা তো আমিই জানতে চাইছি। তুমি তো ওদের সঙ্গেই গিয়েছিলে, তবে ওরা তোমার খোঁজ করছিল কেন?

তুমি ওদের জিজ্ঞেস করোনি?

করেছিলাম। ওরা কেবল বলল, কাজ আছে!

ঘরে ঢুকে দুলু বাতি জ্বালাতে হাত বাড়িয়েছিল। আমি নিষেধ করলাম, বাতি জ্বেলো না।

কেন?

দরকার কী! আলো জ্বাললে ছোটনটা হয়তো জেগে যাবে। অন্ধকারে জামাটা ছেড়ে শুয়ে পড়ব এক্ষুনি।

দুলু আলো জ্বালল না। একটু চুপ করে হঠাৎ বলল, জানালাটা বন্ধ করে দেব?

আমি থমকে গেলাম। দুলু বোধ হয় বুঝতে পেরেছে কিছু।

একটু ইতস্তত করে বললাম, দাও।

জানালাটা শীত-গ্রীষ্ম সবসময়ে খোলা থাকে। আবছা একটু রাস্তার আলোর আভা ঘরে আসে। দুলু জানালাটা বন্ধ করতেই নিবিড় অন্ধকার আর গুমোটে ঘর ভরে গেল। তবু নিশ্চিন্ত। এখন আর বাইরে থেকে আমাকে দেখা যাবে না।

শোওয়ার কোনও মানে হয় না। ঘুম অসম্ভব। একটা সিগারেট জ্বেলে বিছানায় বসলাম মশারি সরিয়ে। দুলু তখনও শোয়নি। অন্ধকারেই জল খেল। তারপর তার হাই তোলার শব্দ পেলাম।

তুমি কতক্ষণ জেগে থাকবে? দুলু জিজ্ঞেস করে।

বেশিক্ষণ না! সিগারেটটা শেষ করেই শোব। তুমি শুয়ে পড়ো।

অন্ধকারে ওকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু টের পেলাম, ও আমার কাছে আসছে! শাড়ির শব্দ, চুড়ির শব্দ, মারকোলাইজড ওয়াক্স-এর গন্ধ। আমার গা ঘেঁষে বসল এসে। তারপর হাত বাড়িয়ে আমার সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে বলল, আমি একটু খাই।

অন্ধকারেই দেখলাম, ও সিগারেট টানছে। আগুনের আভায় মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মুখ। বাধা দিলাম না। অনেকক্ষণ সিগারেটটা খেল দুলু, শেষ ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে বলল, মাথা ধরেছিল খুব। সিগারেটে সেরে গেল। বেশ জিনিস তো! এবার থেকে মাঝে মাঝে খাব।

খেয়ো।

বকবে না?

হাসলাম। দুলুকে তো কখনও আমি বকি না।

নিবিড় অন্ধকারে দুলুর একখানা নরম ভারী হাত আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল, পরমুহূর্তে আর একখানা হাত জড়াল আমার পিঠ। ওর উষ্ণ দুই ভেজা ঠোঁট চুম্বকের মতো লাগল এসে আমার ঠোঁটে। আমি ওকে দুই হাতে ধরে বললাম, আস্তে, মশারি ছিঁড়বে।

ছিঁড়ুক।

দুলুকে আমি ঠিক বুঝি না! মুহূর্তে মুহূর্তে ও পালটে যায়। কখনও আমাকে চেনেই না, কখনও বা এত বেশি চেনে যে, আমার হাঁফ ধরে যায়।

ঠাট্টা করার মতো মন নেই! তবু বললাম, হয়তো আবার ছোটনের মতো কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

ও ঘন শ্বাসের সঙ্গে বলল, ঘটুক।

আমি মশারি তুলে দুলুকে বিছানার ভিতরে আনলাম। দুলু আমাকে তার আদর সোহাগ দিয়ে যথেষ্ট আক্রমণ করছিল। খুবই সুখের ঘটনা সেটা! কালেভদ্রে আমি দুলুর স্বাদ পাই। কিন্তু এই মুহূর্তে দুলুকে শরীরে জড়িয়েও আমি ওর স্বাদ পাচ্ছিলাম না। অন্ধকারে আমার চোখের সামনে তখন সেলের গরাদের ফাঁক দিয়ে তীব্র একখানা তাম্রাভ মুখ ধক ধক করে জ্বলছে। কেবলই টের পাচ্ছি, শিয়রের বন্ধ জানালার ও-পাশে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

আমার অনিচ্ছা বোধ হয় বুঝতে পারল দুলু। হঠাৎ আদর থামিয়ে বলল, কোনও দিন তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, আজ করছি, ওই ছেলেদু'টো তোমার খোঁজ করছিল কেন?

কী জানি!

তুমি কেন পুলিশের গাড়িতে ফিরলে?

হাসলাম।— বললাম তো ওরা এদিকেই আসছিল, আমাকে পৌঁছে দিল। একটু চুপ করে থেকে দুলু আবার জিজ্ঞেস করে, আমার আদর তোমার ভাল লাগছে না কেন?

লাগছে তো!

না। তুমি খুব অন্যমনস্ক। সেই ছেলেটা ছাড়া পায়নি বুঝি?

আমি অবসন্ন গলায় বললাম, না।

কেন? ও-সি তোমার কথা শুনলেন না?

তা নয়। ছেলেটা ছাড়া পেতে চাইল না।

জামিনেও না?

না।

কেন?

এখনকার ছেলেদের ধাত আলাদা। ওরা কষ্ট পেতে ভালবাসে। কষ্ট দিতেও।

দুলু আমার কাছেই শুয়ে রইল। অন্য বিছানায় গেল না। আমি তাকে মাঝে মাঝে আদর করছিলাম, যান্ত্রিকভাবে। আদর না করলে পাছে ও কিছু মনে করে। ও দিকে আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি কখন আমার শিয়রের জানালায় টোকা পড়ে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য টোকা পড়ল না। বোধ হয় আমাকে পুলিশের গাড়িতে ফিরতে ওরা দেখেছে। হয়তো পুলিশের গন্ধেই ওরা আসছে না। কিন্তু আসবে। আজ না হয় কাল। দেখা হয়ে যাবে। হয় এ-দলের সঙ্গে নয়তো ও-দলের। কোথায় পালাবে বাবা— হুঁ! হুঁ!

আমার কোলের কাছেই দুলু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরের আবছা আলোয় তার ঢলঢলে মুখখানা মন দিয়ে দেখলাম। দুলু আমাকে ভালবাসে? কেউ কি ভালবাসে? কারও কাছে কি এখনও আমার কোনও মূল্য আছে? ভাবতে ভাবতে ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেলায় ঘুম ভাঙল। টের পেলাম, ঘুমের মধ্যে আমি অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখেছি। সারা শরীরে জ্বরের অবসাদ। মুখ তেতো। সবচেয়ে ক্লান্ত মন। কিছু ভাবতে পারছি না। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা গুলিয়ে যাচ্ছে। সে দিনটা আর বেরোলাম না। শুয়ে রইলাম। ঝিমলি মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে এসে আমার মাথা টিপে দিল। অনেকক্ষণ ছোটনকে বুকে নিয়ে তার শরীরের গন্ধ নিলাম। ভাল লাগছিল।

বিকেলের দিকে দুলু স্কুল থেকে ফিরল। ওর মুখ-চোখ সাদা দেখাচ্ছিল। স্কুল থেকে ফিরে ও রোজ দুটো ভাত খায়। আজ খেল না। শাড়ি-টাড়ি পালটে, বাথরুম ঘুরে এসে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়াল। আমি অপেক্ষা করছিলাম, হয়তো ও আমাকে কালকের ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে।

কিন্তু সে-ব্যাপারে কোনও কথা না বলে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, তুমি আজ বেরোওনি?

না।

সে কী। সূর্য আজ কোন দিকে উঠেছিল?

হাসলাম, বললাম, শরীরটা ভাল নেই। বয়সও হচ্ছে।

সেটা বুঝতে এত সময় লাগল।

চুপ করে রইলাম।

ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শরীরটা আমারও ভাল যাচ্ছে না। ভাবছি কিছু দিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে কেমন হয়! যাবে?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি যেতে চাও? কিন্তু তোমার স্কুল আর টিউটোরিয়াল?

তারা পালাবে না। ছুটি নিচ্ছি।

একটু ভেবে বললাম, আমার তো অনন্ত ছুটি। কবে যাবে?

কালই চলো।

অবাক হয়ে বলি, এত তাড়াতাড়ি?

ও আয়নার দিকে তাকিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে বলল, তাড়াতাড়িই ভাল! দেরি করলে উৎসাহ নিভে যায়। তা ছাড়া আবার কোন বাধা আসে ঠিক কী!

ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু যাওয়ার তো একটা প্রস্তুতি আছে। রিজার্ভেশন নেই, কোথায় যাওয়া ঠিক নেই, তা ছাড়া পার্টি অফিসে আর দু'-চার জায়গায় খবরও দিয়ে যেতে হবে—

ও দৃঢ় গলায় বলল, না। কোথাও খবর দিতে পারবে না। আমরা চুপ করে চলে যাব, বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানবে না, কোথায় যাচ্ছি তা বাড়ির লোককেও বলে যাব না।

অবাক হয়ে বললাম, কেন?

আমার ইচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা শখ ছিল কারও সঙ্গে পালিয়ে যাবার। যাওয়া হয়নি। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, তাই শখটা মিটিয়ে নিই। তোমার সঙ্গে কাল আমি পালাব।

ক্লিষ্ট হাসলাম। বললাম, ছেলেমেয়েরা?

ওরাও যাবে।

কোথায় যাওয়া হবে?

এখন বলব না। স্কুলের বেয়ারাকে টিকিট কাটতে পাঠিয়েছি, সন্ধে নাগাদ এসে দিয়ে যাবে।

কিন্তু থাকার জায়গা?

ও হাসল, ব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করে দেখিয়ে বলল, যেখানে যাচ্ছি সেখানে সারা বছর অনেক বড়লোকের বাড়ি খালি পড়ে থাকে। তাদের একজনের কাছ থেকে এই চিঠি এনেছি। ওখানে মালী থাকে। চিঠি দেখালেই সে বাড়ি খুলে দেবে।

এত অল্প সময়ে এত ব্যবস্থা দুলু করেছে দেখে খুবই অবাক হলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। উত্তরবাংলা ছাড়ার পর দশ বছর হয়ে গেছে কোথাও যাওয়া হয়নি। গাছপালা, পাহাড়-জঙ্গলের জন্য মন কাঁদে। তাই হঠাৎ এ-অবস্থায় ভালই লাগছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। দুলু কি টের পেয়েছে আমার খুব বিপদ!

আমার বাবা এই বুড়ো বয়সেও মেরুদণ্ড সোজা রেখে রোজ বিকেলে অনেকটা হেঁটে আসেন। সেদিনও এলেন। এসেই উত্তেজিতভাবে বাইরের ঘরে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, অনু কই? বাইরেটাইরে যায়নি তো?

মা বললেন, না বোধ হয়। বিকেলেও ঘরে শুয়ে ছিল। শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই।

না বেরিয়ে ভাল করেছে! দিনকাল বড় খারাপ।

কেন?

বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল দেয়ালে কারা ওর নামে কী সব লিখছে। অনেকগুলো দেয়ালেই লেখা।

কী লিখেছে?

চোখে ভাল দেখি না, ঠিকমতো পড়তে পারি না। তবে মনে হল লিখেছে— বিশ্বাসঘাতক, মুণ্ডু চাই, আরও কী কী যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে ঠিক সাহস হল না।

ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছিল। মশার জন্য টেকা যাচ্ছিল না। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। দুলু কেন কালকেই আমাকে নিয়ে পালাতে চাইছে তা খানিকটা বোঝা গেল।

মা তখনও ব্যগ্রকণ্ঠে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, ওর নামে লিখবে কেন? ও তো কিছু করেনি।

বাবা তেতো গলায় বললেন, আর কিছু না করুক পলিটিক্স তো করেছে।

কিন্তু কারও ক্ষতি করেনি। আমি ওকে জানি।

আর কারও না করুক, নিজের ক্ষতি যথেষ্ট করেছে। কাল রাতে যারা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের একজন ধরা পড়েছে, শুনছিলাম।

তাকে কি ও ধরিয়ে দিয়েছে?

কী জানি!

মা চুপ করে রইল।

অন্ধকারে বসে নিঃশব্দে আমি এইসব শুনলাম। মনটা বিস্বাদে ভরে গেল। কারা বিশ্বাসঘাতক তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি. কাল রাতে নিজের অজান্তে আমি একটি ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবা কি মনে করেন, বিশ্বাসঘাতক আমিই! আর দুলু? সে কী ভাবছে? আমার ওপর কি এদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! এতক্ষণ আমি এদিকটা ভাবিনি। ভেবে মন বড় খারাপ হয়ে গেল!

কাউকে কিছু জানানো হল না। পরদিন সন্ধের পর ট্যাক্সি ডাকা হল। স্তব্ধতা, ভয়, সন্দেহের মাঝখানে আমি, দুলু আর আমার তিন ছেলেমেয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলাম।

রওনা হওয়ার সময়ে বাবাকে বলেছিলাম, সাবধানে থেকো।

বাবা গম্ভীর চিন্তিত গলায় বললেন, আমরা বুড়ো হয়েছি! আমাদের জন্য আর চিন্তা কী! তোমাদের এখনও বয়স আছে, সাবধানে তোমরা থেকো। বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলো না। চার দিকে বিপদ।

'বিপদ' কথাটা সারা রাত গাড়ির শব্দের সঙ্গে নূপুরের মতো বাজল। সারা রাত দুলু আর ছেলেমেয়েরা থার্ডক্লাসের ভিড়ে শুয়ে-বসে ঝিমোল, আমিই কেবল অপলক চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম।

ভোর-রাত্রে যশিডি জংশনে গাড়ি থামল। আমরা নামলাম।

আবছা অন্ধকারে টাঙ্গা চড়াই-উতরাই ভেঙে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের কপ কপ শব্দ। আমার গা ঘেঁষে দুলু। দুলুর কোলে ছোটন ঘুমোচ্ছে। তিতু টাঙ্গাওয়ালার পাশে জড়সড় হয়ে বসে ভোরবেলার দেওঘর দেখছে। ঝিমলি টাঙ্গার ছইয়ের তলায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে! ওর মুখে-চোখে ভয়। যেতে যেতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। স্তব্ধ, হিম আকাশ! মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছিল। আজকাল দেখছি আকাশের দিকে তাকাতে ভাল লাগে।

দুলুকে সে-কথা বললাম।

সে হাসল, আকাশ সংসারের বাইরের জিনিস, তাই তোমার ভাল লাগে। সংসারের কিছু তো কোনও দিন ভাল লাগল না তোমার।

এই কথা শুনে দুলুর দিকে তাকালাম। আবছায়ায় দেখলাম, সেই মুখে প্রশান্ত ভাব। কলকাতা থেকে হঠাৎ বাইরে এলে বিশাল প্রকৃতির মধ্যে মানুষের খুব অবাক লাগে। সেই বিস্ময় ওর মুখে ফুটে আছে।

বললাম, সংসারের বাইরে এসে তোমার খারাপ লাগছে?

না। ও মাথা নাড়ল, তারপর হেসে বলল, আমিও আকাশ দেখছি। বুড়ো বয়সে বোধ হয় এইসব ভাল লাগে। আমরা বুড়ো হলাম।

হঠাৎ আমার বুক মুচড়ে উঠল একটা দুঃখে। আচমকা বললাম, দুলু, তুমি আমাকে সন্দেহ করো না তো?

ও অবাক হয়ে বলল, কেন?

আমি বললাম, ওই ছেলেটাকে কিন্তু আমি ধরিয়ে দিইনি!

দুলু চুপ করে রইল।

খানিকটা ভেবে আমি আস্তে আস্তে শ্বাস ছেড়ে আবার বললাম, দুলু, আসলে ওকে বোধ হয় আমি ধরিয়ে দিয়েছি।

দুলু একটু শিউরে উঠল। তারপর অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, তুমি পরশু থেকে ঘরের বার হওনি। তাই কোনও খবর জান না। ছেলেটা কাল হাসপাতালে মারা গেছে। আজ সকালে শোক-মিছিল বেরোনোর কথা। দেয়ালে তোমার নামে পোস্টার পড়েছে।

একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম, জানি।

দুলু তাড়াতাড়ি বলল, কিন্তু আমি জানি, ওরা বাজে ছেলে। তুমি কিছু অন্যায় করোনি।

আমি চুপ করে আকাশের দিকে তাকালাম। ওখানে বড় শান্তি মনে হল।

এখানে আমি আগে আর কখনও আসিনি। ভোরের আলোয় প্রথম দেখে জায়গাটি বড় ভাল লাগল। ছোট টিলা, পাহাড়, ছোট্ট নদী ধারোয়া, নানা চড়াই-উতরাই জুড়ে নির্জন শহরের প্রসার। ক্যাস্টর টাউন খুবই নির্জন জায়গা। ইউক্যালিপটাস গাছ, আর বোগেনভেলিয়ার লতানে রঙিন ফুলের ভিতরে বাগান ঘেরা বিরাট বাড়িগুলো ঝিমিয়ে আছে। বেশিরভাগ বাড়িতেই কেউ থাকে না। কালে-ভদ্রে লোকজন আসে। আমাদের বাড়িটা পুরনো, বাগানে খুব আগাছা জন্মেছে।

গেটের কাছে একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে। আমাদের টাঙ্গা থামতেই দু'-এক পা এগিয়ে এল। লক্ষ করলাম, খোঁড়া। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ডান পায়ের পাতাটা অর্ধেক নেই। তার উঁচু দাঁত পুরু দুই ঠোঁটে ঢাকা পড়ে না। তার ওপর সে আবার সবসময়েই হাসে।

জিজ্ঞেস করলাম, মালী নেই?

সে ঘাড় নাড়ল, আছে।

ডাকো তো।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে ভিতরে গেল। একটু পরেই বুড়ো মতো একটা লোককে নিয়ে এল! অবাক হয়ে দেখি খালি গা আর ময়লা হেঁটো ধুতি পরা লোকটার চোখে ভারী একটা চশমা। একটা কাচ আবার ঘষা। বুঝলাম, হয় ও চোখটা নেই, নয়তো ছানি আছে।

আমাদের চিঠিটা সে হাত বাড়িয়ে নিল। তারপর ভাঙা বাংলায় বলল, আমার চোখ কমজোরি। এ কি দাশবাবুর চিঠি?

হ্যাঁ। ঘর-দোর খুলে দাও।

জি।

তারপর সেই খোঁড়া ছেলেটাকে বলল, সামান উতরো।

টাঙ্গাওয়ালা আর সেই খোঁড়া ছেলেটাতে মিলে আমাদের মালপত্র ধরাধরি করে বারান্দায় তুলতে লাগল।

কাঠের জাফরি দেওয়া বারান্দা, তারপর বিশাল ঘরগুলি। প্রকাণ্ড দরজা খুলতেই পুরনো বাতাস বেরিয়ে এল।

বারান্দায় পা দিয়েই বললাম, দুলু, এ-বাড়ি এক পুরুষের নয়। ক্ষুধিত পাষাণ।

দুলু উত্তর দিল, হুঁ।

তারপর মালীকে বলল, ঘর-দোর ভাল করে পরিষ্কার করে দাও। কত পোকামাকড় বাসা বেঁধে আছে কে জানে।

বন্ধুগণ, ওই যে দেখুন, একটা গুবরে পোকা দেয়ালে ঠোক্কর দিয়ে চিত হয়ে পড়ল। যেমন বোকা স্বভাব, তেমনি বেঢপ শরীর। হাত-পা নেড়ে প্রবল চি-র-র শব্দে চিত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, চেষ্টা করছে উপুড় হতে। ওকে লক্ষ করুন। উপুড় হয়ে ও করবে কী? আবার করবে কী? আবার সেই ওড়া, উড়ে উড়ে দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে চিত হয়ে পড়ে আবার উপুড় হওয়ার চেষ্টা। নিরন্তর, অর্থহীন, একঘেয়ে এই চেষ্টা থেকে ওকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই পোকাটির ওপর স্প্রে-গানের মুখটা ধরলাম আমি। নাক পর্যন্ত আমার মুখের অর্ধেক রুমাল বাঁধা। রুমালের আড়ালে আমি সামান্য একটু হাসলাম। বন্ধুগণ, পোকাটার জন্য আমার একটু মায়াও হচ্ছে। আমার হাতে নতুন কেনা স্প্রে-গান, তার মধ্যে তীব্র কীটাণুনাশক বিষ। যন্ত্রটার হাতল টেনে আমার হাত একটু থেমে আছে। বস্তুত এই পোকাটা মরতে চায় না। যতই অর্থহীন হোক তার বাঁচা, তবু সে বাঁচতেই চায়। বন্ধুগণ, স্প্রে-গানের ওপরে আমার হাত থেমে আছে, মুখ রুমালে ঢাকা, আমি এখন কী করতে পারি?

সামান্য একটু সময়। দ্বিধা বা মনুষ্যত্ব— যা বলুন। ওইটুকু সময় পোকাটা বেঁচে রইল। তারপর আস্তে হাতলটায় চাপ দিই। চিড়বিড় করে ওঠে পোকাটা, লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেতে থাকে। এবার দ্বিধাহীনভাবে জোরে স্প্রে করি আমি। তীব্র ঝাঁঝালো কীটনাশকের গন্ধে ভরে গেল ঘর। ধোঁয়ার মতো তা ঢেকে ফেলল পোকাটাকে। শুনতে পাচ্ছি, পোকাটা চিৎকার করছে। ভাষাটা বোঝা যায় না। কিন্তু এ সময়ে সকলেরই ভাষা এক আমি তা বুঝতে পারি, কিন্তু তা বলে থামি না। তীব্র ঝাঁঝ বিষে ভিজিয়ে দিই তাকে। হঠাৎ পোকাটা উলটে গেল। উড়ল। ভাবলাম, পালাবে বুঝি। পারল না। এক চক্কর ঘুরল ঘরের ভিতরে, তারপর দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ল। শেষ কয়েকটা চির-শব্দ। তারপর চুপ।

হাতের উলটো পিঠে কপালের চুল সরিয়ে রুমালের আড়ালে একটু হাসি। নতুন কেনা পোকাদের বিষ, তার প্রথম শহিদ একটা গুবরে পোকা। হত্যাকারী অতনু সেন, একজন হতে পারত এম এল এ।

পা দিয়ে পোকাটাকে জোর একটা লাথি কষাই। খাটের দু' পায়ার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল সেটা। গো-ও-ল! গোলদাতা অতনু সেন— দুলুর স্বামী, তিতু-ঝিমলি-ছোটনের বাবা।

রুমালের আড়ালে আমি হাসি। হত্যাকাণ্ডের সবে তো শুরু। এখনও অনেক বাকি। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি খাটের নীচে। বহুকাল ধরে বন্ধ পড়েছিল ঘর। যদিও সকালেই আজ ভাল ঝাড়পোঁছ হয়েছে, জলের দাগ এখনও মুছে যায়নি, তবু বন্ধ ঘরের একটা গন্ধ আছেই। আর কে জানে, ফাটা মেঝে কিংবা দেয়ালে, কোন ঘুপচিতে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কাঁকড়া তেঁতুল বিছে। আরশোলাই কি কম! আর ছারপোকা! সবচেয়ে বেশি অবশ্যই মশা। কাজেই হত্যা-হাহাকারের সবে শুরু। রুমালের আড়ালে আমি হাসি। পিচ পিচ করে বিষের ঝরনা ছড়াই। ধুন্ধুমার লেগে যায় কীটের জগতে। চোঁ-ও-ও, চিড়িক, পিড়পিড়— কত রকম সর্বনাশের শব্দ ওঠে তাদের জগৎ থেকে! রুমালের উপর আমার দু'টি চোখ উগ্র কৌতূহলে তাদের লক্ষ করে। বিষে ভিজিয়ে দিই বাতাস। মশা আর শ্যামাপোকা, কয়েকটা বাচ্চা

মথ দেয়ালে উড়ে উড়ে বসে, বিনবিন করে পাগলের মতো ঘোরে। আমি স্প্রে-গান তুলে ধরি। মেঘের মতো বিষ উড়ে যায় পোকাদের কাছে। নম্র স্পর্শ করে তাদের শরীরে। দেয়াল থেকে একটি একটি করে খসে পড়ে মশা, শ্যামাপোকা, মথ। দরজা-জানালা বন্ধ, কোথাও পালানোর উপায় নেই। বড় জোর চেষ্টা করে সিলিং পর্যন্ত উঠতে পারে। তবে তাই ওঠে। তাতে পড়াটা হবে আরও চমৎকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কীটাণুনাশকের কণায় তেলতেলে হয়ে গেল ঘরের মেঝে। মেঝের ওপর মরা-আধমরা পোকা গিজগিজ করছে। একটা লালচে ফড়িং বোধ হয় উত্তরের ঘাসফুলের জঙ্গল থেকে এসে বেভুলে ঢুকে পড়েছিল। সে এখনও মরেনি। চিত হয়ে পড়ে থেকে শরীরের সরু নিম্নাংশ আমার দিকে আঙুলের মতো এক বার তুলল। হাঁটু গেড়ে ফড়িংটাকে একটু দেখি। ভারী সুন্দর তো! এমন লাল ফড়িং কখনও দেখিনি। আগে দেখলে জানালা খুলে তাড়িয়ে দিতাম। এখন আর কিছু করার নেই। সুন্দর ফড়িংটার দিকে চেয়ে বললাম, গিলটি মিলর্ড। শান্তভাবে ফড়িংটা তার শরীর নামিয়ে নিয়ে মারা গেল। যত দূর দেখা যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত। একটি পোকারও ওড়া-উড়ি নেই। বিষের ঝাঁঝে চোখে জল আসছে, সুড়সুড় করছে নাক। বাতি নিভিয়ে ঘর বন্ধ করি আমি।

বাইরের ঘরটায় সোফা, টেবিল, চেয়ার, ফুলদানি, একটা ক্যাম্প-খাট। এই ঘরেও স্প্রেটা ভালই ছড়ালাম আমি। অভ্যাসে মানুষের লক্ষ্য স্থির হয়। প্রায় পঞ্চাশটা আরশোলা মরল আমার হাতে, একটা বাচ্চা ইঁদুর পালাল বটে কিন্তু একঝাঁক বিষ খেল সে-ও। একটা টিকটিকির বুকেও ঢুকে গেল খানিকটা বিষ। একটা উড়ন্ত বোলতাকে কয়েক ঝাঁক বিষ খাওয়ালাম আমি। সেটা মরল। ক্রমে বাইরের ঘরটাও স্তব্ধ, বিষপূর্ণ হয়ে গেল।

এতক্ষণ প্রবল এক উত্তেজনা বোধ করছিলাম আমি। সেটা এবার থিতিয়ে এল। স্প্রে-গানটা রাখলাম উদোম টেবিলের ওপর। টসটসে ঘাম জমেছে কপালে। রুমালের আড়ালে ভারী শ্বাস। ওষুধের গন্ধে গুলোচ্ছে পেট। শরীর ক্লান্ত।

বাতি নিভিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় পা দিতেই একঝলক পরিষ্কার ঠান্ডা বাতাসে শীত করে উঠল। রুমালটা খুলে ফেলতেই পরিষ্কার বাতাসে ভরে গেল বুক।

বারান্দার সিঁড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে দুলু। বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে। ঝিমলি বসে আছে সিঁড়ির শেষ ধাপটায়, ওর পায়ের কাছে বুড়ো মালীর ছেলে বুধিয়া। বুধবারে জন্ম হয়েছিল বলে ওর এ নাম। দুপুরবেলা আমার ঘুম হয় না। খাওয়া-দাওয়ার পর দুলু যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিতরের ঘরে ঘুমোচ্ছিল, তখন বাইরের ঘরে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে আমি বুধিয়ার গল্প শুনছিলাম। গত বছর রেল ইয়ার্ডে কয়লা কুড়োতে গিয়েছিল, সে সময়ে খালাসিদের বড় বড় ছেলেরা তাড়া করে। পালাবার সময়ে লাইন ডিঙোতে গিয়ে আই বাপ— এক শান্টিং ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটা ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। পায়ের জন্য ওর খুব একটা দুঃখ নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে হাত-পা চোখ সব যে সবসময়ে ঠিকঠাক থাকবেই তার কোনও মানে নেই। ওর বাবার একটা চোখে ছানি বেশি পেকে গিয়েছিল, ডাক্তাররা ছুরি চালাতেই খানিকটা পুঁজ বেরোল— ব্যস, চোখটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। আর-একটা চোখেও ছানি আসছে, ওটা কাটলেও যদি পুঁজ বেরোয় তো পুরো দুটো চোখ অন্ধকার হয়ে যাবে— তা বলে কি বাবা কাঁদতে বসবে? ভিখমাঙ্গা সুরদাসেরা কি বেঁচে নেই? তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে বুধিয়ার এই হল জীবন-দর্শন।

এখন ঝিমলির পায়ের কাছে বসে সে ভূতের গল্প বলছে। দক্ষিণের ওই শিমুল গাছের ডাল বেয়ে দু'-একটা পরি এসে নামে পিছনের গোলাপ-বাগানে। সুযোগ পেলে তারা মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাদের রাজ্যে। দু'-চারদিন খুব তোয়াজ করে, নানা সুখাদ্য খাওয়ায়, গোলাপ জলে স্নান করায়। সুন্দর ফুলের বিছানায় শুতে দেয়। তারপর আবার ফিবিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যাকে পরিতে নেয় সে ফিরে এলেও তার আর পৃথিবীর কিছুই ভাল লাগে না। না খাবার, না বিছানা, না ঘর-সংসার। সে তখন কেবলই পরির রাজ্যের কথা বলতে থাকে। বলতে বলতে আর ভাবতে ভাবতে হয়ে যায় পাগল। খাবার খেতে পারে না বলে, না খেয়ে খেয়ে হয়ে যায় কাঠির মতো রোগা। তারপর একদিন মরে যায়। কত দিন বুধিয়ার বাপ রাতবিরেতে গোলাপ বাগানে জ্যোৎস্নার মতো গায়ের রংওয়ালা পরিদের দেখেছে।

দুলুর দিকে চেয়ে বললাম, আর আধঘণ্টা। তারপর দেখো, আর একটাও পোকামাকড় নেই।

দুলু অন্যমনস্কভাবে গেটের দিকে চেয়ে ছিল। আমার কথায় চমকে উঠে মুখ ফেরাল। একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কয়েকটা ছেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল। এইমাত্র।

তাতে কী হয়েছে।

দুলুর মুখ গম্ভীর। বলল, এ দিকে খুব তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল।

ভিতরে ভিতরে একটু চমকে উঠলাম। অজান্তে আমার মুখের রক্ত সরে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে হাসলাম, কত ছেলে আছে। এখানকার লোকাল ছেলেই হবে হয়তো।

তা হলে তাকাবে কেন?

বাঃ! খালি বাড়িতে নতুন লোক এলে তাকায় না?

দুলু তবু স্বস্তি পেল না। ওর কোলে ছোটন ছটফট করছে। তবু আঁকড়ে ধরে আছে দুলু। সে অন্যমনস্ক।

আমি ছোটনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, আয় বাবা, চল বেড়িয়ে আসি।

ছোটন হাত বাড়িয়ে আসছিল। দুলু তাকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে থমকে বলল, হাত ধুয়েছ?

না তো!

পোকা-মারার ওষুধ বিষ— জান না?

খেয়াল ছিল না।

খেয়াল রাখতে হয়। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—

ছোটন হওয়ার আগে এক রাতে বিছানায় শুয়ে জেগে থেকে দেখছিলাম, দুলু ভ্রূণ নষ্ট করবার বড়ি জল দিয়ে গিলে খাচ্ছে। মুখে জল নিয়ে হাঁ করে ঊর্ধ্বমুখ দুলু যখন বড়িটা মুখে ফেলতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কী নির্দয় দেখিয়েছিল দুলুকে! আজ দুলু ভাবতেও পারে না সেই সব দৃশ্য। অথচ এখনও ছোটন বয়সের অনুপাতে রোগা, তার মাথায় দীর্ঘস্থায়ী ঘা।

আমি বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে এলাম।

সাবধানে যেয়ো। বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই। বেরোবার আগে দুলু সাবধান করে দিল।

কোলে ছোটন, দু'ধারে ঝিমলি আর তিতু, আগে আগে খোঁড়া বুধিয়া, তার হাতে একটা বেতের লাঠি। আমরা ক্যাস্টর টাউনের নির্জন রাস্তায় বিকেলের পড়ন্ত রোদে ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় পা দিই। সুগন্ধি নির্জনতা, লাল কাঁকরের পথ, বহু দূর পর্যন্ত কাউকে চোখে পড়ে না। শেষ বর্ষায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে দুপুরে, তাই বহু দূরে কুয়াশার মতো ভাপ উঠছে। মৃদু বাতাস বইছে। ঘরে ফেরা পাখি ডাকছে খুব। ঝিমলি আর তিতু এই সৌন্দর্যে মূক হয়ে যায়। জন্মাবধি তারা কলকাতার বাইরের জগৎ দেখেনি। আমার গা ঘেঁষে হাঁটতে থাকে তারা। ছোটন আমার কোল থেকে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে।

একটা ঢালু বেয়ে পথটা নেমেছে, আবার চড়াই বেয়ে উঠেছে অনেকটা ওপরে। ঢালু বেয়ে নামতেই একটা কালভার্ট। কয়েকটা হনুমান বাচ্চা বুকে নিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। ভয়ে ঝিমলি আর তিতু আমাকে জড়িয়ে ধরে। হেসে গড়ায় বুধিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে একসাথে তিতু আর ঝিমলি এগিয়ে গিয়ে বুধিয়ার সঙ্গে হাঁটে। রাজ্যের গল্প করে বুধিয়া। আমার কোলে ছোটন তার হাত তুলে এটা-ওটা দেখায়। প্রশ্ন করে। অন্যমনস্কভাবে আমি হাঁটি।

চৌরাস্তার মোড়ে কয়েকটা দোকানপাট। তিন-চারটে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনের চলাচল দেখা যায়। চার প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য দাঁড়াই। ততক্ষণে বুধিয়া, ঝিমলি আর তিতুকে নিয়ে কোন রাস্তায় চলে গেল খেয়াল করিনি। সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ভরে ফেরত পয়সার জন্য হাত বাড়াতেই হঠাৎ খেয়াল হয়, ওরা কোন রাস্তায় গেল লক্ষ করিনি তো।

চিন্তার কিছু নেই। সঙ্গে বুধিয়া আছে, জায়গাটাও নিরিবিলি, ওরা হারাবে না। তবু একটু খুঁজে দেখা দরকার। যে-পথটা সোজা গেছে, সে-পথটাতেই যাওয়া সম্ভব। এই ভেবে আমি চৌরাস্তা পার হয়ে সোজা

হাঁটি। কিন্তু রাস্তাটা সোজা গেছে, বহু দূর পর্যন্ত কাউকে দেখা যায় না। আমি আবার ফিরে আসি চৌরাস্তায়।

পান-সিগারেটের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করি, দু'টো বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর একটা খোঁড়া ছেলেকে যেতে দেখেছ?

লোকটা মাথা নাড়ে, খেয়াল করিনি।

একটা ছোকরা রিকশাওয়ালা তার রিকশার সিট থেকে টপ করে নেমে বলল, লেংড়া বুধিয়ার সঙ্গে দুটো খোকাখুকি তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ—

এই তো এই রাস্তায় গেছে। চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

না, রিকশার দরকার নেই।

ডান দিকের রাস্তাটাই দেখাল রিকশাওয়ালা। পথটা একটা চড়াই ভেঙে বেঁকে গেছে। আমি আস্তে আস্তে এগোই। ছোটনকে কোল বদলে নিই। ছেলেটাকে ক্রমশ ভারী লাগছে, ঘেমে যাচ্ছে আমার গা।

বাঁক পেরোতেই আবার উতরাই, আবার একটা বাঁক। ওদের দেখা গেল না। দিনের আলো আস্তে আস্তে মরে আসছে। একটা ধোঁয়াটে মেঘ ঢাকা দিয়েছে পশ্চিম আকাশ। বাড়ি থেকে বহু দূর চলে এসেছি। অন্ধকার হয়ে আসছে। আমার ভাল লাগছে না।

বাতাসে তীব্র ফুলের গন্ধ। ভেজা মাটির গন্ধ। সিগারেটের জন্য আনচান করছে শরীর। কোলে ছোটনকে ক্রমশ ভারী লাগছে।

ছোটনকে বললাম, একটু নামবে বাবা?

সে মাথা নেড়ে আমাকে জোরে আঁকড়ে ধরল।

নিজেকে একটু হালকা করো বাবা, অত জোরে আঁকড়ে ধরো না।

ছোটন গম্ভীরভাবে আমাকে ধরেই রইল।

ডান দিকে প্রকাণ্ড একটা ভুতুড়ে বাড়ির বাগান পেরিয়ে একটা ছোট্ট পরিষ্কার মাঠ। সেইখানে ছায়াহীন স্পষ্ট দিনের আলো পড়ে আছে।

একটু জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। সিগারেটের জন্য আনচান করছে শরীর। ছোটনকে মাঠের ওপর ছেড়ে দিয়ে বললাম, একটু হেঁটে এসো তো বাবা!

ছোটন হাঁটল না! আমার হাঁটু খামচে দাঁড়িয়ে রইল। আমাকে বসতে দেখেই কাঁদতে লাগল, মা'র কাছে যাব।

বিরক্তিতে একটা থাপ্পড় তুলেছিলাম। অমনি সেই দৃশ্যটা মনে পড়ল— ঊর্ধ্বমুখে দুলু জল নিয়ে বড়ি গিলছে। আর মারা হল না। কোলের কাছে টেনে বসিয়ে বললাম, কাঁদে না, এক্ষুনি দাদা আর দিদি আসবে এই রাস্তা দিয়ে দেখো।

গোটা দুই সিগারেট শেষ হয়ে গেল, সামনের রাস্তাটা দিয়ে কেউ ফিরল না। মাঠের ওপর আলো নিস্তেজ হয়ে এল। ভেজা মাটির ভাপ উঠে কুয়াশার মতো ঢেকে দিয়েছে চারধার। মাটি ভিজে উঠছে। বাতাসে হিমভাব! বার বার বিরক্তিতে কেঁদে উঠছে ছোটন— বাড়ি যাব, মা'র কাছে যাব।

তিতু আর ঝিমলির জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে উঠলাম। কোলে ছোটন। রাস্তায় ভাল আলো নেই। দু'ধারে অন্ধকার সব বাগান। বাগানের মধ্যে নিঝুম বড় বড় বাড়ি। কদাচিৎ কোনও বাড়িতে আলো চোখে পড়ে। দুশ্চিন্তা নিয়ে হাঁটলাম। চড়াইটা ভাঙছি, হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখি চড়াইয়ের মাথায় চারটে ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ওদের মাথার ওপর একটা ল্যাম্প-পোস্ট। তার ম্লান আলোতে দেখা যাচ্ছে, পরনে সরু প্যান্ট, গায়ে চেক শার্ট, কিংবা গেঞ্জি। স্থির দাঁড়িয়ে চারজন আমাকে দেখছে। সিগারেট জ্বলছে তাদের হাত এবং মুখে।

আমার পাঁজরে দ্রুত হাতে ধাক্কা মারল হৃৎপিণ্ড। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এত তাড়াতাড়ি ওরা খবর পাবে, আমি জানতাম না। কত সহজেই ওরা পেয়ে গেল আমাকে! আমার বন্ধু প্রকাশ মরার সময় টুঁ শব্দটিও করতে পারেনি। তার সমস্ত শরীর ছোরায় ছোরায় লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল, উপর্যুপরি রডের আঘাতে সমস্ত মাথাটা দুমড়ে গিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল!

অতটা করার দরকার ছিল না। একটা রডের ঘা, দু'-চারটে ছোরার আঘাতই যথেষ্ট। প্রকাশ দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিল ডায়াবেটিসে, হার্টও তার ভাল ছিল না। তবু যে অতটা করা হয়েছিল তার শরীর নিয়ে— আমার মনে হয়— তার কারণ দু'টো। এক, ঘৃণাকে যতখানি সম্ভব প্রকাশ করা। দুই, লোকের মনে ওই বীভৎসতার দ্বারা প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করা। দু'টো উদ্দেশ্যই সফল। প্রকাশের মৃতদেহে আমি কাঁধ দিয়েছিলাম। তার ফলে আজও সেই ভাঙা চৌচির মাথা আর ছোরার ঘায়ে হাঁ হয়ে থাকা তার এলানো শরীর যত বার ভাবি তত বার আমার ভিতরে কী একটা রি-রি করে ওঠে। মৃগী রুগির মতো আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরি হাত মুঠো হয়ে যায়! চিন্তা-ভাবনা গুলিয়ে যায়।

ঢালুর ওপর চারটে ছেলে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। জ্বলছে সিগারেট। অপেক্ষা করছে হয় আমি তাদের কাছে উঠে যাব, নয়তো তারাই আমার কাছে নেমে আসবে। আমি তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তারা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার কোলে যে ছোটন রয়েছে সে-কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতার মধ্যে ছোটন আমাকে পায়ের ধাক্কা দিয়ে বলল, চলো বাবা বাড়ি যাব।

হ্যাঁ চলো।

তারপর আমি ফিস ফিস করে নিজেকে বললাম, ঠিক আছে। কেন বললাম, তা জানি না। ছোটনকে আমি আর-একটু জোরে চেপে ধরলাম বুকে। এক বার পিছন ফিরে দেখলাম, অন্ধকার সর্পিল রাস্তা। নির্জন। আমার দু'টো ছেলেমেয়ে আর বুধিয়া গেছে এই পথে। ফেরেনি। কোথায় গেল ওরা, শেষবারের মতো ওদের মুখ যদি দেখতে পেতাম!

প্রকাশের কথা মনে না-করার চেষ্টা করছিলাম। তবু মনে এল। অমনি সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল, আমার শীত করল। ঘাম দিল। অবশ লাগল। মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে ওরা খড়কুটোর মতো চিন্তারাশি এলোমেলো উড়তে লাগল। মাথা নিচু করে আমি আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম। ছোটন বাড়ি যাবে। যতটা পথ সম্ভব তাকে এগিয়ে দিই।

ল্যাম্প-পোস্টের কাছাকাছি উঠে এলাম। মুখ তুলে দেখি চারটে ছেলে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখছে। তাদের জুলপি বড়। মাথায় লম্বা চুল! লম্বাটে তাদের চেহারা। তাদের স্থির-নিশ্চিত ভঙ্গি দেখে আমার আর কিছুই বোঝবার বাকি রইল না। কী জানি কেন আমি তাদের দিকে চেয়ে একটু কাঠ-হাসি হাসলাম। তারা হাসল না। তাকিয়ে রইল।

ঢালুটা সম্পূর্ণ উঠে তাদের মুখোমুখি হতেই আমার ভুল ভাঙল। দলে তারা চারজন নয়। ছয়জন। অদূরে রাস্তার পাশে এক বাগানবাড়ির বাগানের দেয়ালে পেচ্ছাপ করে বাকি দু'জন প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে আসছে। তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল,— বুঝলি পরিতোষ, এদের বাগানে যা জল দিয়ে গেলাম, দারুণ ফলন হবে—

এরা চারজন হাসল। এরা ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।

আমি ছোটনকে কোলে নিয়ে তাদের পেরিয়ে গেলাম। তারা ঢাল বেয়ে নামতে লাগল।

বেঁচে থাকা কী রকম ভাল। মানুষ কত বন্ধুর মতো একে অন্যকে পেরিয়ে যায়, আক্রমণ করে না।

ঢালুর ওপর দাঁড়িয়ে আমি এক বার পিছু ফিরে চাইলাম। নেমে যেতে যেতে ছয়জনের একজন এক বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

ছোটন বাড়ি যাবে। আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। সামনেই চৌরাস্তা। কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে, আলো, লোকজন। আমি ডাকলাম, এই রিকশা—

গেটের কাছে দুলু দাঁড়িয়ে, তার পাশে ঝিমলি, তিতু। রাস্তায় খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায়-অন্ধ মালীটা। রিকশা থামতেই তিতু আর ঝিমলি চেঁচিয়ে উঠল, এই তো বাবা— ছোটন সোনা—

দুলু গেট খুলে এগিয়ে এল, বলল, এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেলো।

কেন?

উঃ, চিন্তায় চিন্তায় আমার মধ্যে আমি নেই! রোগা ছেলেটাকে নিয়ে গেছ— ইস— কখন থেকে না খেয়ে আছে ছেলেটা—

ওরা কখন এল?

অনেকক্ষণ, ওরা একটা শর্টকার্ট ধরে এসেছে। এসে বলল, তুমি ওদের পেছন পেছন আসছ। তারপর অনেকক্ষণ আসছ না দেখে, একটু আগে, বুধিয়াকে পাঠালাম আবার— দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে—

তিতু আর ঝিমলি আমার দু'হাত ধরে ঝুলে পড়ে, বাবা আমরা কী রকম শালজঙ্গলের ভিতর দিয়ে এলাম! আমরা তো ভেবেছি তুমি পিছনেই আসছ, জানতাম না তো যে তুমি হারিয়ে গেছ!

সন্ধে পার করে চাঁদ উঠল। আমি বাইরের সিঁড়িতে একা বসে। সামনে চরাচর জ্যোৎস্না। বড় বেশি নির্জনতা এখানে। এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না ও দূরের বিশাল প্রসার, তার একাকিত্ব আমি সহ্য করতে পারছি না। একসময়ে মাঠ-ঘাট আমার প্রিয় ছিল, ভাল বাসতাম অরণ্য, পাহাড়। কী জানি, নিজের অজান্তে কবে কলকাতার বুক-চাপা ভিড়, ভাল লেগে গেছে। ভিতরে এক বাঘের আস্তানা। সেই বাঘের নাম ভয়, নিঃসঙ্গতা, দুশ্চিন্তা। একা হলেই সেই রঙিন বাঘ লাফ দিয়ে ধরে এসে। ছিঁড়ে খায় অস্তিত্ব। এখন আর গাছের ছায়া ভাল লাগে না, ভাল লাগে না বিশাল ফাঁকা বাড়ি, জনহীন রাস্তাঘাট, কিংবা অন্ধকার।

ওই যে ছয়জন, ওদের একজন আমাকে পিছন ফিরে দেখেছিল। দু' বার। ও কি চিনেছিল আমাকে? হবেও বা। আমি যে জীবন যাপন করেছি, তাতে অনেকেই চিনে রেখেছে আমাকে, চিহ্নিত করে রেখেছে। অথচ, তাদের অধিকাংশকেই আমি চিনে রাখিনি। চিনে রেখে তারা মনে মনে ভাবছে, কোথায় পালাবে বাবা! হুঁ হুঁ!

দুলু নিঃশব্দে এসে ভরা জ্যোৎস্নায় দাঁড়াল সিঁড়ির মাঝের ধাপে! কয়েক পলক মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখল চাঁদ। শ্বাস ফেলল একটা।

জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেমেয়েরা খেয়েছে?

হুঁ। ঘুম পাড়িয়ে এলাম।

তা হলে এ বার বোসো এখানে।

দুলু বসল। বসে বলল, বাড়িটা বড্ড পুরনো। একটু আগে একটা বিছে মারলাম রান্নাঘরে। বড় বিছে। বাচ্চাদের যদি কামড়ায় তো শেষ হয়ে যাবে।

সাবধানে থেকো। ও-সব প্রকৃতির জীব, সব জায়গায় আছে। খামোখা কামড়ায় না।

তবু, ভয় করে।

ভয় করে— কথাটা শোনামাত্র আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেল। স্নায়ুমজ্জায় সেতারের ঝংকারের মতো বাজতে লাগল! ভয় করে, আমাদের বড় ভয় করে।

দুলু বাইরের দিকে চেয়ে থেকে অন্যমনস্কভাবে আস্তে আস্তে বলল, তুমি পোকামারা ওষুধ দিয়েছিলে ঘরে। আধঘণ্টা পর যখন ঘর ঝাঁট দিলাম তখন— মাগো— কত পোকা যে বেরোল। ওজন করলে কয়েক সের হবে। তার মধ্যে কয়েকটা আবার বেঁচে ছিল। অত পোকা একসঙ্গে দেখে গা শিরশির করছিল!

এখন আর পোকা নেই। হলে, আবার ওষুধ দেব।

দুলু আমার দিকে তাকিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো লাজুক হাসি হেসে বলল, সে-কথা না। ভাবছিলাম, আমরা অত পোকা মারলাম, পোকারা যদি কখনও তার শোধ নেয়।

আমি হো হো করে হেসে বললাম, দুলু, ভয় পেতে পেতে ভয় তোমার বিকারে দাঁড়িয়ে গেছে!

দুলু মাথা নিচু করে বলল, বুধিয়া পোকাগুলো কাগজে করে নিয়ে বাইরে ফেলতে যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে তো! বোধ হয় কষ্ট হয়ে থাকবে। বলল, এতগুলো জীব মেরে ফেললেন! এমনভাবে বুকটা কেঁপে উঠল!

আমার আর হাসি পেল না! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, দুলু তোমার ছুটি ক'দিনের।

এক মাস।

এক মাস পর কি আমরা ফিরব?

দেখি। কলকাতার চিঠি আসুক। অবস্থা বুঝে ফিরব।

যদি অবস্থার উন্নতি না হয়?

ছুটি বাড়াব।

এভাবে কত দিন চলবে?

দুলু অনেকক্ষণ ঝিম মেরে থেকে খুব হতাশার গলায় বলল, কী জানি। আমি অত ভাবতে পারি না।

আমি আস্তে করে বললাম, তোমার জমানো টাকা খরচ হয়ে যাবে। সোর্স অফ ইনকাম বন্ধ। এভাবে চলে না। এখানকার নির্জনতাও আমার খুব একটা সহ্য হচ্ছে না। তার চেয়ে চলো ফিরে যাই—

দুলু চকিত মুখ তুলে বলল, কী বলছ। কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে— দুলু বাকিটুকু বলল না। থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কী? আমি জিজ্ঞেস করি।

কেন তুমি জান না?

আমি চুপ করে রইলাম। সামনে এক ভয়াবহ বন্য জ্যোৎস্না, নিস্তব্ধ চরাচর। ছয়জনের মধ্যে একজন আমাকে মুখ ফিরিয়ে দু' বার দেখেছে। ও কি চেনে আমাকে। আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম।

তিতু একটি ফড়িং ধরে দু'হাতে তার পাখনা ছিঁড়ছে! তার মুখ নির্বিকার। এই সাংঘাতিক দৃশ্য আমি এক আশ্চর্য প্রকাণ্ড জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তিতু বাগানে, খেজুর গাছের মতো, কিন্তু আরও সুন্দর এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। যে-ফড়িংটার পাখনা সে ছিঁড়ছে সেটা একটা সুন্দর লাল ফড়িং। আমি তার মুখের নিষ্ঠুরতা দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে বলছি, তিতু— তিতু-- তোর মায়া-দয়া নেই! ও তুই কী করছিস!

তিতু নিষ্ঠুর চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো বের করে আনল। মুঠো খুলতেই দেখলাম, এক মুঠো মরা মশা, মথ, একটা বোলতা। মুঠোর সেই পোকাদের বাগানের মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল তিতু, চেঁচিয়ে বলল, বাবা পোকাদের গাছ হবে। দেখো।

একটা গাঢ় লাল আলো এসে পড়ল বাগানে। সূর্যের আলো অত লাল হয় জানতাম না। সেই লাল আলো এসে পড়তেই দেখি ঘাসের ফল থেকে বীজের মতো জন্ম নিচ্ছে পোকামাকড়, বোলতা। উড়ে আসছে— উড়ে আসছে— আমাদের ঘরের দিকে।

দুলুর ডাক শুনে আমার ঘুম ভাঙল। ঘুম ভেঙে দেখি বাইরের ঘরে ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছি। গায়ে ঘাম।

ও-ঘর থেকে দুলু বলল, জেগেছ?

হ্যাঁ।

ইস তোমাকে বোবায় ধরেছিল। ঠিক হয়ে শোও।

ঠিক আছে।

এমন ভয় পাইয়ে দাও না! খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি?

দুলু ঘুম গলায় বলল। তারপর আমার উত্তর না পেয়ে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল, টের পেলাম।

এ-বাড়ির বেশির ভাগই কাচের শার্সিওলা পাল্লা। কাঠের পাল্লা প্রায় নেই। তাকিয়ে দেখি, কাচের শার্সি দিয়ে বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নায় বাগান দেখা যাচ্ছে। রাতে আবার কখন এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে বুঝি। বাইরে জ্যোৎস্নায় একটা সাদা ধোঁয়াটে ভাব মিশে আছে।

অস্বস্তিকর ঘুমহীনতা নিয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলাম। যত বার চোখ ফিরিয়ে নিতে চাই, যত বার চোখ বুজি, তত বার আপনা থেকে চোখ খুলে যায়। সম্মোহিতের মতো শার্সিটার দিকে চেয়ে থাকি। বাইরে বন্য, ভয়ংকর, রহস্যময় জ্যোৎস্না। বিশাল নিস্তব্ধ চরাচর। ভয় করে। বড় ভয় করে।

চেয়ে আছি। চেয়ে থাকাই আমার নিয়তি। হঠাৎ একটা ছায়া লাফ দিয়ে উঠল শার্সির গায়ে। চিৎকার করে উঠতে গিয়েও করলাম না। একটা বেড়াল। একটু দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ভাঙা শার্সির ভিতর

দিয়ে সন্তর্পণে ঘরে এল। অন্ধকারে সে একপলক তাকাল মশারির দিকে। সবুজ ফসফরাস জ্বলজ্বল করে উঠল। নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম। একটু পরে আমাদের এঁটো বাসনকোসনের কাছে তার চপচপ খাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

কখনও ঘুম, কখনও জাগরণের মধ্যে রাত কেটে গেল। ভোররাতে যখন মোরগ ডাকছে, তখন শার্সির রং উজ্জ্বল। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

আউট হাউসের দিকে বুধিয়াদের একটা ছোট্ট ভুট্টার খেত। সকালে বাজারে বেরোবার সময় চোখ পড়ল, ভুট্টার খেতে লুকোচুরি খেলছে ঝিমলি, তিতু আর বুধিয়া। ঘাসের জঙ্গলে উদাসভাবে বসে বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো মালী, হাতে ঘাস নিড়োবার হেঁসো। তার চশমার কাচে রোদ ঝিকিয়ে উঠেছে। চারি দিকে আলোয় আলো।

মনটা আবার হঠাৎ ভাল হয়ে গেল।

ভুট্টা-খেত থেকে মুখ বার করে তিতু চেঁচিয়ে বলল, বাবা, প্যাঁড়া এনো—

ঝিমলি দৌড়ে আসে, বাবা, দু'গজ লাল রিবন। আমার রিবন আনতে মা ভুলে গেছে।

তিতু ঝিমলির এইসব আনন্দিত চিৎকার আমার মনের মধ্যে রিন রিন করে বাজতে থাকে। অনেক বেলা হয়েছে, তবু একটা কুয়াশার মতো ভাব চারি দিকে। ছায়াহীন রোদ পড়ে আছে। আমি হাঁটতে থাকি।

বাজারের মুখে পুরনো একটি মিনার। মিনারের তলায় দোকান। দোকানের সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সেদিকে একপলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল সেই জটলা থেকে লম্বা মতো একজন— তার চোখে কালো চশমা— ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। গতকালের সেই ছয়জনের একজন কি? কে জানে! আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

বাজারে ঢুকতেই বুড়ো এক পাণ্ডা সঙ্গ ধরল, চলো, বৈদ্যনাথজি দর্শন করিয়ে দিই।

আমি মাথা নাড়ি, আমার ভগবানে বিশ্বাস নেই বাপু।

লোকটা অবাক মানে, বিশ্বাস নেই। সাক্ষাৎ বৈদ্যনাথজিকে বিশ্বাস নেই। তুমি কি ম্লেচ্ছ?

হবে তাই।

তুমি হিন্দু না?

উহুঁ। আমার বাবা হিন্দু, আমি নই।

লোকটা অবাক হয়, তুমি কি তবে ধর্মত্যাগী?

তাও না। আমি মোটে ধর্মেই বিশ্বাস করি না। আমি ম্লেচ্ছ।

সে হাসে, তোমার বাপ যখন হিন্দু তুমিও হিন্দুই। ম্লেচ্ছ কী করে হবে?

আমি তর্কের মধ্যে না গিয়ে পাশ কাটাই। মেছোবাজার পর্যন্ত লোকটা আমার পিছু পিছু আসে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

দিন কেটে যায়। একই ভাবে। সাতটা দিন।

মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে স্টেশনে যাই। একটা খবরের কাগজ কিনি। একটা চায়ের স্টলে বসে এক ভাঁড় চা নিয়ে তন্ন তন্ন করে কাগজটা খুঁজি। বেহালার খবর খুব একটা নেই। তবে লাশ পড়েছে নানা জায়গায়। মৃতদের নাম দেখি, চেনা নাম চোখে পড়ে না।

এখানকার ঠিকানা জানিয়ে বাবাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার কোনও উত্তর নেই। সাত দিন হয়ে গেল, আমাদের বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে। এখানকার ঠিকানা বাবাকে জানানোর ইচ্ছে দুলুর ছিল না। বাবা বুড়ো মানুষ, যদি কেউ বাবাকে ভয় দেখিয়ে ঠিকানাটা জেনে নেয়।

মাঝে মাঝে লক-আপে গরাদের ও-পারে একখানা ধারালো উগ্র মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

বিকেলের দিকে যশিডি থেকে একটা শাটল ট্রেন আসে। অমনি খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে চোখ জ্বালিয়ে যাত্রীদের লক্ষ করি। দেহাতিরা নামে, নামে বৈদ্যনাথধামের তীর্থযাত্রীরা। অল্প কয়েকজন যাত্রী, কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশন আবার ফাঁকা হয়ে যায়। সন্ধের ঘোর লাগবার আগেই আস্তে আস্তে হেঁটে ক্যাস্টর টাউনের ইউক্যালিপটাসের ছায়ায় পা দিই। একটা চড়াই ভেঙে উঠলেই দেখা যায় দূরে মাতৃকুটিরের বাগানের গেট। তখন নিশ্চিন্ত লাগে।

শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যার পর চাঁদ ওঠে না। ঘোর এক অন্ধকার কালো বেড়ালের মতো লাফ মেরে নামে বাইরের বাগানে। সিঁড়িতে আমরা বসি। আমি, দুলু, ঝিমলি আর তিতু, দুলুর কোলে ছোটন। সিঁড়িতে শেষ ধাপে বসে বুধিয়া বলে, ওই যে আকাশের তারা— ওগুলো হচ্ছে ভগবানের চোখ। যতগুলো মানুষ পৃথিবীতে আছে ততগুলো চোখ আছে ভগবানের। এক-এক চোখে ভগবান এক-একজনকে নজরে রাখেন। যেই পৃথিবীতে একটা মানুষ মরে যায়, অমনি নিভে যায় আকাশের একটা তারা, আবার যখনই কেউ জন্মায়, তখনই নতুন একটা তারা ফুটে ওঠে।

ঝিমলি আর তিতু অবাক হয়ে শোনে।

সত্যি বাবা? ঝিমলি জিজ্ঞেস করে।

অন্যমনস্কভাবে বলি, হুঁ।

একটু রাত হলে ওরা খেয়ে ঘুমোতে যায়, আমি তখনও বাইরে বসে, ভগবানের অলীক চোখে ভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। জল বয়ে যাওয়ার শব্দের মতো অবিরল শালবনে বাতাস লাগবার শব্দ ভেসে আসে।

বাচ্চারা ঘুমোলে দুলু বাইরে আসে। বলে, আজও কলকাতার চিঠি এল না।

হুঁ।

কী যে হচ্ছে ওখানে!

আমি চুপ করে থাকি।

দুলু হঠাৎ বলে, আজ তুমি যখন বিকেলে বেরিয়েছিলে তখন একটা ছেলে এসেছিল। একটু চমকে উঠি।

কী রকম ছেলে?

ফরসা, লম্বা, ছিপছিপে, খেলোয়াড়ের মতো দেখতে, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। জিজ্ঞেস করল, এ-বাড়িতে অতনু বলে কেউ থাকে কি না।

তুমি কী বললে?

বললাম না! এখানে এ-নামে কেউ নেই।

শুনে চলে গেল?

না। একটু হেসে ক্ষমা চেয়ে বলল, রাস্তায় ঠিক অতনু সেনের মতো একজনকে সে দেখেছে। একটু খোঁজ নিতেই একজন রিকশাওয়ালা এই বাড়ি দেখিয়ে দেয়।

কেন খোঁজ করছে জিজ্ঞেস করলে না?

করলাম। তখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি অতনু সেনের নাম শুনেছি কি না। আমি বললাম, শুনিনি। ও বলল অতনু সেন খুব বড় লিডার হতে পারতেন। এত পড়াশুনা ছিল তাঁর। বাংলাদেশে অনেকেই অতনু সেনকে তাঁর রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মান করে। অতনু এক বার বিধানসভায় দাঁড়িয়েছিলেন। যে কনস্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানের এক চা-বাগানের ডাক্তার হচ্ছে ছেলেটির বাবা। এক বার সে-বাগানে মিটিং করতে গিয়ে ঝড়ের রাতে অতনু সেন ফিরতে না পেরে ওদের বাসায় ছিলেন। আর তখন, সেই রাতে অতনুর সঙ্গে ছেলেটির খুব ভাব হয়ে যায়। অতনু তাকে অনেক গল্প বলেছিলেন। তারপর আর অতনুর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। কাগজে অবশ্য মাঝে মাঝে নাম দেখেছে।

আমার আবছা মনে পড়ছিল, এক ঝড়ের রাতে আমি হায়পাথাড় চা-বাগানে আটকে পড়েছিলাম। ডা. আশুতোষ রায়ের বাড়িতে ছিলাম এক রাত্রি। তার একটি ফুটফুটে ছেলে ছিল। খুব ভাল লেগেছিল আমার।

আমি আস্তে বললাম, ছেলেটা বোধ হয় সত্যি কথাই বলে গেছে।

দুলু বলল, আমারও সেটা মনে হচ্ছিল। তবু আমি কিছুই স্বীকার করিনি। বলেছি, অতনু সেন না, আমার স্বামীর নাম মিহির দাশ যগুপ্ত। বেসরকারি অফিসের কেরানি। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এসেছি। অবশ্য আমি ছেলেটিকে আবার আসতে বলেছি। যদি আসে তবে তুমি ছেলেটিকে ভাল করে দেখে নিয়ো। সাবধানের মার নেই। স্বীকার কোরো না যে তুমিই অতনু সেন।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, কেন দুলু, আমি কি নেই?

দুলু গম্ভীর গলায় বলল, না, আমরা নেই। আমরা আমাদের কথা ভুলে যাব।

আমরা নেই, আমরা নেই, ভাবতে ভাবতে সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বুড়ো মালী ঘাস-জঙ্গলের অনেকটা নিড়িয়ে দিয়েছে। ছাতিমতলা এখন পরিষ্কার। দুপুরে আমি জাফরি-ঢাকা বারান্দায় বসে বইপত্র পড়ি। চেয়ে দেখি, ছাতিমতলায় ছোট একটা জনসভা বসেছে। শ্রোতা দু'জন— ঝিমলি আর বুধিয়া। বক্তা তিতু। অবিকল আমার মতো বাঁ হাতখানা পিছনে নিয়ে সামনে ঝুঁকে তিতু বলছে, বন্ধুগণ, আজ এই সভায়...

অপলক তাকিয়ে থাকি। একসময়ে হঠাৎ চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তিতু যেন কখনও রাজনীতি না করে। বরং চিরকাল ও আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করুক।

এখানে এসে ক্রমে ক্রমে আমি গৃহী হয়ে যাচ্ছি। রোজ বাজার করি। স্নানের সময় নিজের গেঞ্জি রুমাল কেচে দিই। ঘরের কাজে দুলুকে সাহায্য করি। অনেক সময়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বলি, দুলু, মা যে পোস্তবাটা দিয়ে ডাঁটার চচ্চড়ি রাঁধে— ও রকম এক বার রেঁধে খাওয়াবে?

শুনে দুলু খুশি হয়। চিরকাল আমি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে উদাসী। যা পাই খাই। পাঁউরুটি আর জল খেয়ে কত দিন কেটে গেছে। আমার যে কোনও কিছু ইচ্ছে হয় তা জানতামই না। এখন নিজের পছন্দমতো অনেকক্ষণ ধরে বাজার করি। পুঁইশাক কিনলে কুমড়ো কিনতে ভুলি না। খেতে বসে নুন কম, কিংবা ঝাল বেশি— এইসব মতামত দিই। এখন জানি, ঝোল শুষলে ডালনার স্বাদ হয়।

দুলুর মুখে চিরকাল আমার প্রতি এক নিরক্ত নিষ্ঠুরতা দেখে এসেছি। এখন আমি ওর কাছাকাছি থাকলে ওর মুখে লাজুক রক্তাভা দেখা যায়। আমি মাঝে মাঝে ভাবি— এখনও বোধ হয় আমাদের খুব বেশি বয়স হয়ে যায়নি। বোধ হয় খুব বেশি সময় আমি নষ্ট করিনি জীবনের।

আয়নায় দেখি, অবিরল দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করেও আমার গালে মাংস লেগেছে, ঢেকে গেছে কণ্ঠার হাড়। পুরনো গেঞ্জিগুলো শরীরে আঁট হয়ে বসে। দুলুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়, ওই রক্তাভাটুকু কেবল লজ্জার নয়, ওতে স্বাস্থ্য আছে। ব্লাউজের হাতার নীচে ওর হাতের ডৌল ফেটে পড়ছে। ছোটন আর তেমন ঘ্যানঘ্যান করে না তো; একা বসে বারান্দায় রাজ্যের খেলনা নিয়ে খেলে। মাথার ঘা শুকিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। এখন মামড়ি খসছে। তিতু বহুদূর দম ধরে দৌড়ায়, অবিরাম স্কিপিং করে ঝিমলি। কেউই সহজে হাঁপায় না। কখনও বা তিতু আর ঝিমলির সঙ্গে চোর-চোর খেলি। ফাঁকা, প্রকাণ্ড বাড়ি, একটা টু দিলে দশটা ফিরে আসে।

আমাকে চমকে অবাক করে দিয়ে প্রায় রাত্রেই দুলু বাইরের ঘরে চলে আসত। ও-ঘরে বড় বিছানায় ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়। রাত গভীর হয়। তখন দুলু আসে। অন্ধকারে তার কলপ দেওয়া শাড়ির খসখস শব্দ পাই, চুড়ির শব্দ হয়, তার শরীরের সুগন্ধে ভরে যায় ঘর। মশারি তুলে সে বিছানায় চলে আসে। ক্যাম্বিসের ছোট খাটে শব্দ। দু'ধার থেকে ক্যাম্বিসের ঢালু নেমে এসে ঝুলে থাকে, মাঝখানটায় অপরিসর একটা গর্তের মতো। দুলু সেই চাপা জায়গায় আমার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকে। ঘন শ্বাস ফেলে আমার মাথার চুল মুঠো করে ধরে চাপা গলায় বলে, বুড়ো, বুড়ো। মাথায় টাক পড়ছে, দাঁত নেই— বুড়ো বর। এই বর নিয়ে আমি কী করব! কী করব!

মাথার ভিতরে মেঘ করে আসে স্মৃতি। পাণ্ডুর পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটে বিয়ের পর কয়েকটা দিন মনে পড়ে। দুলু আমাকে দু'হাতে আঁকড়ে জিজ্ঞেস করত, তুমি কে? তুমি কে গো? চিনি না তো! অচেনা মানুষের এ কেমন ব্যবহার একটা মেয়ের সঙ্গে! আমাব কিছুই রাখলে না তুমি? সব নিয়ে নিলে?

অন্ধকারে দুলু হাসত। সেই হাসি তার বুকের গভীর থেকে উঠে আসত। মাঝখানে খরা গেছে বহুকাল। আজকাল আবার দুলু সে-রকম হাসে! কিন্তু আমি যে-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরি সেই হাত শিথিল হয়ে গেছে অনেক। তেমন শক্ত হাতে ধরতে পারি না। যেন বা আমার দাবি দাওয়ার সাহস নেই আর। ভিখিরির হাত বাড়িয়ে যতুটুক পাই নিই! তাই জোর আসে না। বরং আ বার উলটে বলতে ইচ্ছে

করে, তুমি কে? তুমি কে গো! চিনি না তো! অচেনা পুরুষের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার?

দুলু ঠাট্টা করে, তুমি ধরতেও শেখোনি আমাকে!

আমি হাসি, অভ্যেস নেই কিনা!

দুলু পায়ে পা ঘষে বলে, অভ্যেস নেই কেন! কে অভ্যেস করতে বারণ করেছিল? তুমিই তো ছেড়ে দিলে আমাকে, ফিরেও তাকাওনি!

আমি মৃদু কণ্ঠে বলি, জীবনে আমি নিজের জন্যে খুব বেশি কিছু চাইনি দুলু। যে দু'-একটা জিনিস মুখ ফুটে চেয়েছিলাম তার মধ্যে তুমি একটা।

দুলু গভীর গলায় বলে, চেয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু নাওনি।

আমি চুপ করে থাকি ভয়ে। পাছে পুরনো কথা উঠে পড়ে।

কিন্তু দুলু ছাড়ে না, বলে, নিলে আমার দিন এত দুঃখে কাটত না। কত দিন দুধ জোটেনি বলে তিতু আর ঝিমলিকে শটিফুড খাইয়েছি, কিংবা বার্লির জল। সে-সব কি পেটে থাকে। সারা দিন খিদেয় কাঁদত। পাড়া-প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে বলত, হবু এল এল এ-র বউ। কী লজ্জা! রাত জেগে পড়ে, টিউশানি করে আমার শরীর গেল কর্কশ হয়ে, বয়স গেল বয়ে। কারও আদর পাইনি কখনও, কী দিয়েছ তুমি আমাকে, বলো তো?

উত্তর দিই না। দুলু আক্ষেপে আমার বুকে তার হাত দিয়ে ঘন ঘন চাপড় দিয়ে বলে, নষ্ট করেছ। নষ্ট করেছ আমাকে। কিছুই দাওনি।

বলতে বলতে সে আমাকে আবার আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে। প্রবল চুমু খায়! আবার চুমু খেতে খেতে কাঁদতে থাকে, কেন একটা জীবন আমাদের বয়ে গেল! তোমার লজ্জা করে না? কোন লজ্জায় তুমি আমার মুখোমুখি হও?

অনেকক্ষণ কাঁদে দুলু, তারপর হঠাৎ বলে, আমাকে আদর করো। শিগগির।

আদর খেতে খেতে বলে, শত্রু। মহাশত্রু তুমি আমার।

বুঝতে পারি, এইসব আবেগ আর আদরের পিছনে পরোক্ষে প্রকাশের মৃত্যু কাজ করছে। দুলু হঠাৎ সচেতন হয়ে বুঝতে পেরেছে, তার স্বামীর আয়ু বড় অনিশ্চিত। কোথায়, কোন লুকানো জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আমার অপ্রত্যাশিত ঘাতক তা কেউ জানে না। কেন মারবে— তার কারণ স্পষ্ট নয়। জীবনযাপন করতে করতে আমরা কেবলই ভুলে যাই যে মানুষ মরণশীল। ভুলে যাই বলেই এই দুর্লভ জীবন আমরা হেলাফেলায় যাপন করি! অবহেলা করি কাছের মানুষকে, চোখের সামনে দেখেও ভুলে যাই। নিষ্ঠুর উদাসীন আমাদের মুখ ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু যখন হঠাৎ মৃত্যুর ছায়া এসে পড়ে, মরণশীলতা অমোঘ হয়ে দেখা দেয়, তখনই বোধ হয় এইরকম ক্ষতিপূরণ করে নিতে চেষ্টা করি। কেড়ে নিতে চাই শেষ সময়টুকু।

আজকাল রোজ সকালে স্নান করে দুলু। লালপেড়ে গরদ পরে বাগানের ফুল তোলে মন দিয়ে। বুধিয়া কোথা থেকে বেলপাতা আর কাঁচা দুধ নিয়ে আসে। রিকশাওয়ালার সঙ্গে বাঁধা বন্দোবস্ত করেছে দুলু। সকালে আটটার মধ্যে রিকশা এসে ভেঁপু বাজাতে থাকে।

দুলু যায় বৈদ্যনাথের মন্দিরে পুজো দিতে! রোজ। অনেকক্ষণ ধরে পুজো দেয়। ফিরতে দুপুর হয়ে যায়। যাওয়ার সময় বলে যায়, উনুনে ডাল চড়িয়ে গেলাম। সম্বার দিয়ো। চার কৌটো চালের ভাত চাপিয়ে দিয়ো। চাল ধুয়ে নিয়ো ভাল করে। আমার ফিরতে দেরি হবে।

আমি হাসি। দুলুর কথামতো ডালে সম্বার দিই। ভাত চাপাই। তারপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করতে থাকি।

দুলু ফিরে আসে। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। উপোস করে থাকে বলে ঠোঁট শুকিয়ে থাকে, চোখ বসে যায়। সকলের হাতে প্রসাদি সন্দেশের টুকরো দেয়, প্রসাদি ফুল মাথায় ঠেকায়। আমাকে প্রণাম করে।

খেতে বসে প্রায় দিন বলে, বরটা বুড়ো হলে কী হবে, ভারী কাজের তো! ডালে কী সুন্দর সম্বারের গন্ধ হয়েছে! ওমা! আবার শুকনো লঙ্কা ভেজে দেওয়া হয়েছে! বুদ্ধি দেখো।

শুনে তিতু আর ঝিমলি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কখনও কখনও প্রকাশকে দেখি।

দুপুরে দুলু তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে ঘুমোয়। আমি দুপুরের হা-হা বাতাসে বারান্দায় এসে বসি। কী নির্জন চারধার। লোক চলাচল নেই কোথাও। একটা কুকুরও হাঁটে না। কেবল বাতাস খেলা করে, রোদ ভেসে যায়। হঠাৎ দেখতে পাই প্রকাশ গেটের ও-পাশে দাঁড়িয়েছে। মুখে হাসি, অবিন্যস্ত চুল। ডান হাতের মুঠি ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ করে বলে, লড়াই অতনু। লড়াই!

বাড়িটা বিশাল। বহু ঘর বন্ধ পড়ে থাকে। এক-একদিন একা ভূতের মতো সময় কাটাতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াই। একা একা কথা বলি। মাঝে মাঝে এমন হয়, একটা ঘরের দরজা খুলতেই দেখি, মেঝের ওপর প্রকাশ বসে আছে উবু হয়ে। আমাকে দেখে মুখ তুলে বলে, অতনু, আমার মা-বউ-বাচ্চাদের খোঁজ নিলি না? কেমন আছে ওরা সব? কী করে চলছে ওদের? দ্যাখ, এক দিন হঠাৎ বাবা মারা গিয়েছিল বলে আমি আর মা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। ভিখিরি হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। আমার ছেলেমেয়েগুলোরও ও-রকম হয়নি তো? বড় ভয় করে। তোরা দেখিস।

আমার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। বুক চেপে ধরে স্মৃতি। আমি সেই ফাঁকা ঘরে একা দাঁড়িয়ে গোপনে বাঁধ ভাঙা কান্না কাঁদি। প্রকাশ, যারা খুন করে তারা জানে না, একটা মানুষ মানে একটা জগৎ। কত সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে একটা মানুষ— বউ-বাচ্চা-মা-বাবা-ভাই-বোন-বন্ধু— ওরা তা ভুলে যায়। ওরা মারে বিচ্ছিন্ন একটা মানুষকে। সেই মার সেই লোকটাকে ছাড়িয়েও ছড়িয়ে যায়। এক জন মানুষের সঙ্গে আরও কত মানুষ শেষ হয়। যারা খুন করে তারা কি তা জানে?

সারা বাড়িময় আমি উদ্দেশ্যহীন স্মৃতিতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াই আর বলি, আমি নিরপরাধ ফেরারি প্রকাশ। এই অজ্ঞাতবাসে আমি এ রকম সুখেই আছি। সারাটা যৌবনকাল দুলু ফিরেও তাকায়নি। এখন দ্যাখ, মৃত্যুর ছায়া পড়েছে বলে সে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। পৃথিবীতে কার কত দিন আয়ু তা কে বলতে পারে। পৃথিবীর অধিকার কার হাতে যাবে তার মীমাংসার সংগ্রামে কত লোক চলে যাবে! সময় তাই আমাদের বড় কম। বড় মূল্যবান। আমাকে এই সময়টুকু ভোগ করতে দে প্রকাশ। আমরা যারা লড়াই করেছিলাম তাদের পরিবার বরাবর ভেসে গেছে। তাদের ভাগ্যই দেখেছে তাদের। আমাকে তোর পরিবারের কথা ভাবতে বলিস না। আমি পারব না। আমাকে ছেড়ে দে। নতুন উদ্বেগ নতুন দায়িত্ব— এ বড় ভয়ের ব্যাপার এখন। আমাকে ক্ষমা কর। আমাদের ভালবাসার সময় সকলের আগে শেষ হয়।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হলে নিঃঝুম হয়ে কোনও গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। বনস্থলীতে বিচিত্র ছায়া পড়ে। পাখি ডাকে, উড়ে যায়। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি কখন। স্বপ্ন দেখি, পাখি হয়ে মানুষের অস্ত্রাঘাত থেকে উড়ে যাচ্ছি অনায়াসে। বন্দুকের শব্দ এড়িয়ে শরতের আকাশ লক্ষ্য করে তিরের মতো ছুটে যাচ্ছি। আকাশ নিরবধি, অনন্ত। কোনও ভয় নেই। পালাবার পথ সেখানে শেষ হয়ে যায় না।

সন্ধে হয়ে এলে দুলু আর ছেলেমেয়েরা ডাকতে ডাকতে আমাকে খোঁজে। তাদের গলার স্বরে উদ্বেগ। খুঁজে পেয়ে দুলু বড় বড় চোখে আমাকে দেখে, তুমি কী গো। জানো না, ভয়ে বুক শুকিয়ে থাকে আমার! একটা সময়ও নিশ্চিন্ত থাকি না।

ঝিমলি দুলে দুলে একটা ছড়া বলে প্রায়ই, পাটের শাড়ি বের করো মা, দখিন যাব গো। তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো।

ছড়াটা শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে যায়। এক-একটা সময়ে যখন গভীর অন্যমনস্কতা আসে, তখন আপনমনে আমি ওই ছড়াটার একটা লাইন বিড় বিড় করে বলি, তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো... তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো।

বলতে বলতে দেখতে পাই, কাটিহারে খালাসিটোলার নোংরা ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে রোগশয্যায় শুয়ে আছে। ধূম জ্বর উঠছে তার। বিকারের ঘোরে ঘোর লাগা চোখে চেয়ে আছে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মায়ের মুখ। সে বলছে, তালতলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো... তাল তলা দিয়ে জল যাচ্ছে মা, ডুবে মরি গো...

আমার শরীরে রোমকূপ শিউরে উঠে। আমার কোলের ওপর ছায়া ফেলে প্রকাশ সামনে দাঁড়ায়। বলে, অতনু, শোধ নিবি না?

মুখ ফিরিয়ে নিই।

সংসার আমার ভাল লাগে আজকাল। ভাল লাগে দুলু, ঝিমলি, তিতু, আর ছোটনের সঙ্গে মেখে-জুখে থাকতে। বাগানের এক দিকে খানিকটা জমি বেছে নিয়ে আমি মাটি কোপাই। দুলু ফুলের চারা লাগাতে চায়। আমি চাই রাইশাক হোক। কিন্তু সে জন্য নয়, আসল কথা মাটি কোপানো আমার ব্যায়াম। শরীরটাকে ঠিক করে নিতে হবে। অম্বলের ব্যথাটা আর টের পাই না। বর্ষা শেষ হয়ে এল। শরতের সাদা মেঘখণ্ড আকাশে ভেসে বেড়ায়। সকালে গেটের পাশে শিউলি ফুল ঝরে থাকে।

বুড়ো মালীটা নির্বিকার বাগানে বসে থাকে। সে কথা বলে কম, উদাসভাবে বসে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু তার মুখে কোনও দুঃখের ছায়া নেই। মাঝে মাঝে আগাছা নিড়োয়, তারপর গাছপালা মাটির সঙ্গে মিশে ঝিম মেরে এই প্রকৃতির বৈরাগ্যকে নিজের ভিতরে অনুভব করে। নিজের চোখের কথা ওর বোধ হয় বেশি মনে পড়ে না। বেঁচে থাকার কিছু কিছু মূল্য দিতে হয়— এ-রকমই সে জানে! ওর কাছ থেকে ওই বৈরাগ্যটুকু সারা দিন ধরে অল্প করে শিখে নিই। আমার একটা জীবনে বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা ভুলতে ওই বুড়ো মালীর বৈরাগ্যটুকু আমার বড় দরকার।

শিমুল গাছের তলায় একটা মসৃণ পাথর পড়ে আছে! নির্জনে সেখানে গিয়ে বসি। ডান দিকে ঢালু মসৃণ সবুজ, চার দিকে ভাঙের জঙ্গল, ভাটফুল কণ্টিকারী। পাখি-পাখালির অবিরল তীব্র ডাক। নিস্পন্দ বসে থাকি। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীর অধিকার হাতবদল হচ্ছে। বিনা বিপ্লবে, নিঃশব্দে। পুরনো বাড়িটার মাথায় ফাটা দেয়ালে ওই যে অশ্বত্থের গাছ উঠছে নিশানের মতো। ওই নিশান বলছে, এক দিন পৃথিবীর মানুষের সব সংগ্রাম শেষ হলে তারা আসবে। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে আসবে উদ্ভিদ জগৎ। অধিকার করে নেবে সবকিছু। তারাই ভেঙে ফেলবে বাড়ি-ঘর, ঢেকে ফেলবে রাস্তাঘাট, কলকারখানা চাপা দেবে মাটিতে। এইভাবে নিঃশব্দে হাতবদল হচ্ছে পৃথিবীর। শিমুল গাছের তলায় পাথরে বসে মাঝে মাঝে আমি এই বোধ করি। নিস্তব্ধতার মধ্যে অনুভব করি উদ্ভিদের পদসঞ্চার, আমার গায়ে রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কাঁটা দেয়।

দু'-একদিন পর পর আবার ঘর ভরে যায় পোকামাকড়ে। তীব্র কীটাণুনাশক ছড়িয়ে দিই ঘর বন্ধ করে। অবিকল হত্যাকারীর মতো দেখায় আমাকে। মুখে রুমাল ঢাকা, তার আড়ালে আমি হাসি। পোকাদের ডেকে বলি— বন্ধুগণ, আমি জানি, মানুষের হাত থেকে এক দিন পৃথিবীর অধিকার যাবে তোমাদের হাতে। আমার এ-সংগ্রাম বৃথা। চিন্তাশূন্য আমার এই আক্রমণ, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সুন্দর প্রতিশোধ।

লক্ষ করি পরিশ্রমী পিঁপড়েদের সারিবদ্ধ চলাচল। মুগ্ধ চোখে দেখি। পৃথিবীর অধিকার কার হাতে যাবে? পিঁপড়েদের? তবে তাই হোক। আমেন। মানুষ হিসেবে আমাদের আর কিছু করণীয় নেই।

রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে। ক্যাম্প-খাটের পাশে টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস তুলে খাই। বাথরুম সেরে আসি। বাইরের জ্যোৎস্না দেখি নির্ভয়ে। সিগারেট ধরাই। কাশি। অনেকক্ষণ চুপ করে জেগে বসে থাকি। তখন কখনও চার পাশে অদৃশ্য কীটাণুজগৎ অনুভব করি, বাতাসে জীবাণুদের যাতায়াত। আমার গা শিউরে ওঠে।

বন্ধুগণ, পৃথিবীর অধিকার হচ্ছে হাতবদল। নিঃশব্দে, বিনা বিপ্লবে।

টের পাচ্ছি, ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসছে আমার মাথা। চিন্তা-ভাবনা হয়ে আসছে সীমাবদ্ধ। টের পেয়ে আমি আনন্দিত হই।

আনন্দিত মনে সকালের রোদে খালি গায়ে, খালি পায়ে, আমি মাটি কোপাচ্ছিলাম। মাটির ঢেলা ভেঙে চৌরস করছিলাম জমি। সেই সময়ের তির্যক রোদে একটা লম্বা ছায়া পড়ল সামনের জমিতে। চোখ তুলে দেখি, একজন বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে! লম্বাটে, ফরসা চেহারা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে কৌতূহল।

আমি মুখ তুলতেই হাতজোড় করে বলল, আমার নাম শচীন রায়। এক দিন ভুল করে এ-বাড়িতে

ঢুকে পড়েছিলাম। সেদিন বউদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল! আজ আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

কোদাল ফেলে আমি বললাম, আসুন।

মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার যে নকল নামটা দুলু একে বলেছিল সেটা কিছুতেই মনে পড়ছে না।

বারান্দায় তাকে বসিয়ে হাত-পা ধুয়ে আসার ছল করে আমি প্রথমেই গেলাম রান্নাঘরে দুলুর কাছে।

সেই ছেলেটা এসেছে।

কোন ছেলেটা?

ওই যে অতনু সেনের ভক্ত, যে আর-এক দিন এসেছিল।

ও।

কিন্তু আমি তো অতনু সেন নই।

দুলু ঠোঁট টিপে হেসে বলল, ঠিকই তো।

কিন্তু তা হলে আমি কে! যে-নামটা বলেছিলে তা মনে আছে?

খুব মুশকিলে পড়ে গেল দুলু। ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ ভাবল তারপর জিভ কেটে বলল, যাঃ, ভুলে গেছি।

চিন্তিতভাবে বললাম, তা হলে বরং ছেলেটিকেই জিজ্ঞেস করি।

দুলু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, আহা! ঢং!

তারপর একটু ভেবে বলল, তুমি এত লোকজনের সঙ্গে মিশেছ, আর এই একটুখানি ব্যাপার সামলে নিতে পারবে না?

হেসে বললাম, পারব বোধ হয়।

বাথরুমে ছোট্ট হাত-আয়নাটা পেরেকে টাঙানো। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে হাসলাম। বললাম, তুমি আর তুমি নও। সাবধান! মনে রেখো। তুমি তুমি নও।

বাইরে এসে ছেলেটির মুখোমুখি বসলাম। বললাম, আমার স্ত্রী না জানলেও আমি কিন্তু অতনু সেনের নাম জানি।

ছেলেটি হাসল। বলল, আপনার সঙ্গে তার চেহারার আশ্চর্য মিল। আমি আপনাকে কয়েক দিন রাস্তায় দেখেছি। চেহারাটা চেনা। ভাবতে ভাবতে অতনু সেনের কথা মনে পড়ল।

আমি নিস্পৃহভাবে বললাম, অতনু সেন কোথায় আছে জানেন?

ছেলেটি মাথা নাড়ল, না।

আমি একটু চিন্তিত মুখে বললাম, বোধ হয় ওঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেছে।

ছেলেটি চুপ করে থেকে বলল, হতে পারে। রাজনীতিতে সকলে টেকে না। কিন্তু আমার মনে হয় উনি থেমে নেই। কাজ করছেন।

এ-রকম কেন মনে হয় আপনার?

রাজনীতিতে একটা ক্যারিয়ার আছে। সেখানে তিনি আনসাকসেসফুল হতেও পারেন। সেই বড় কথা নয়। বড় হচ্ছে অতনু সেন মানুষটা। আমি তাঁকে এক রাত্রির জন্য দেখেছিলাম। তাতে আমার চোখ খুলে যায়।

কী রকম? আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করি।

আমি তখন ছোট। উনি তখন নামকরা নেতা। তবু মিটিঙের পর অনেক রাত পর্যন্ত তিনি আমাকে নানা গল্প বলেছিলেন। সেগুলো সবই ছিল মানুষের দুঃখের গল্প। তিনি একটা শাকওয়ালা বুড়ির গল্প বলেছিলেন, তার অনেক বয়স, ঘরে উপোসি কয়েকটা নাতি-নাতনি রেখে সে হাটে এসেছে শাক বেচতে। দু' পয়সা আঁটির শাক। সে বয়ে আনতে পেরেছে মাত্র বিশ-ত্রিশ আঁটি। শাক বেচে চল্লিশ কি ষাট পয়সা নিয়ে চাল কিনতে দেখে চালের সের টাকা, তখন সেই বুড়িটা ভাঙা হাটে পয়সা ক'টা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে! তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বুড়িটা কী ভাবছে বলতে পার? আমি পারিনি। তিনি বলেছিলেন, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুতেই বুড়ির সেই ভাবনা চিন্তার নাগাল পাবে না। এই গল্প বলতে বলতে তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি একটি চাষি পরিবারকে দেখেছিলেন এক বার,

বোলপুর স্টেশনে সেই চাষি পরিবার ডাউন দার্জিলিং মেলে উঠতে এসেছিল, যাবে বর্ধমানের এক মেলায়। চাষা, চাষার বউ, আর বাচ্চা একটা মেয়ে। তারা যথাসাধ্য নতুন রঙিন জামা-কাপড় পরে এসেছে, মেলায় যাওয়ার আনন্দ উত্তেজনায় মেয়েটি অধীর, বউটি ঘোমটা সরিয়ে চার দিক দেখছে। সেই ট্রেনে অসম্ভব ভিড় ছিল, দরজার হাতলে ঝুলছিল লোক। চাষা তার বউ আর মেয়ের হাত ধরে এক দরজা থেকে আর-এক দরজায় ছোটাছুটি করছে, কেউ তাদের উঠতে দিচ্ছে না। বাচ্চা মেয়েটা তার প্রথম ট্রেনে চড়ার আনন্দে দুহাত বুকের কাছে জড়ো করে ক্লিষ্ট একটু হাসি মুখে নিয়ে অধীর আগ্রহে কাঁপছিল। তারা উঠতে পারছিল না। উগ্র আগ্রহে একটা দরজায় ওঠবার জন্য তারা যখন প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, তখন একটা লোক যে ঘাট থেকে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল, ভীষণ বিরক্ত হয়ে চাষা লোকটাকে একটা লাথি মেরেছিল। অমনি চাষা পরিবার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অসহায় অপমানে, নিরুপায় দুঃখে চাষা তাকিয়ে আছে, চাষি-বউ লজ্জায় আবার ঘোমটায় ঢেকেছে মুখ, মেয়েটা তখন কাঁপছে— তার হাসিটা বদলে আস্তে আস্তে কান্না হয়ে যাচ্ছে— এই দৃশ্যটুকুর ওপর দিয়ে ডাউন দার্জিলিং মেল সরে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। ওই শিশু মেয়েটিকে মানুষের সভ্যতা কী দিল?

অতনু সেন না হয়ে অন্য কেউ হলে আমি নিশ্চয়ই এই গল্প শুনে হেসে উঠতাম। কিন্তু বস্তুত মুশকিল এই যে, আমি অতনু সেন। এইসব ঘটনা আমার বুকে লেগে আছে, যেমন লেগে আছে ছেলেবেলায় খেলার মাঠে দেখা আমার বা বার অসহায় মুখখানা।

আমি হাসলাম না।

ছেলেটি বলল, অতনু সেন জানতেন কী করে গল্প বলতে হয়। মানুষকে ভাল না বাসলে ওই সব তুচ্ছ গল্প ওইভাবে কেউ বলতে পারে না, যাতে চোখের জল আসে, বুকে কান্না জমে ওঠে। সেই শিশু বয়সেও যা শুনে আমার রাতে ঘুম হয়নি। সেই প্রথম আমি মানুষেব কথা ভাবতে শুরু করি আজও অতনু সেনের সেইসব গল্প স্পষ্ট মনে আছে। এখনও চোখ বুজলেই ভাঙা হাটে সামান্য পয়সা হাতে এক বুড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, বোলপুরের প্লাটফর্মে অপমানিত বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে এক শিশু মেয়ে। তাই, এখনও মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার মতো জোর আমি পাই। অতনু সেন আমার জন্য অনেক করেছেন. কতখানি করেছেন তা তিনিও জানেন না। আমার বিশ্বাস তিনি থেমে নেই। সেই বুড়ি বা সেই চাষি মেয়ের জন্য, বা ও-রকম আরও অনেকের জন্য পৃথিবী তোলপাড় না করে ছাড়বেন না।

আমি কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে ধরা গলায় বললাম, অতনু সেন অনেক বার দল বদল করেছিল।

তাতে কী? আমাদের কোনও দলই উপযুক্ত নয়। এক দিন মানুষ আপনা থেকেই তাঁর চার দিকে দলবদ্ধ হবে। আমি নিজে তাঁর সন্ধানে আছি।

চমকে উঠলাম। চুপ করে রইলাম। দুলুর সতর্কবাণী মনে পড়ল। আমরা আর আমরা নই। আমি নই আমি। আমি আমাকে ভুলে যাব। যেতেই হবে।

পৃথিবীর অধিকার হয়ে যাচ্ছে হাতবদল। বৃথা মানুষের সংগ্রাম। আসছে উদ্ভিদ কীট, আসছে জীবাণুরা। হুররে!

দুলু চা নিয়ে এল। ছেলেটির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, ভুল ভেঙেছে তো? ছেলেটি হেসে মাথা নাড়ল কেবল। অন্যমনস্ক ছিল বলে উত্তর দিল না। তেমনি অন্যমনস্কভাবেই বসে বসে আস্তে আস্তে চাটুকুও শেষ করল। ততক্ষণ আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর এক সময়ে শচীন বলল, আপনাকে প্রথম দেখে ঠিক যেন মনে হয়েছিল এই অতনু সেন। তারপর জানলাম আপনি অতনু সেন নন। কী যেন আপনার নামটা বউদি বলেছিলেন কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না—

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, হিরণ্ময় চৌধুরী।

ছেলেটা হাসল, ঠিক!

তারপর উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ দেখি সকালের তীব্র আলোয় তার চোখ দু'টো হঠাৎ ঝলসে উঠল, একটু হেসে সে বলল, অতনু সেনের আর-একটা গল্প আপনাকে শুনিয়ে যাই। এটা ভৌতিক গল্প। একটা

লোক তার নিজের ছায়াকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিল। ছায়াটা ঘড়ি ঘড়ি বদলে যায়। কখনও দেখে তার ছায়াটা একটা বাঘের ছায়া কখনও বা দেখে একটা বেড়ালের। কখনও বা দেখে ফণা তোলা একটা সাপের চেহারা নিয়েছে আবার কখনও বা একটা ঝুপসি গাছের মতো হয়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে। লোকটা ওইসব দেখে আর ভাবে তাই তো। তবে কি আমি মাঝে মাঝে হয়ে যাই বাঘ, কিংবা বেড়াল। হয়ে যাই সাপ কিংবা গাছ? লোকটা ভাবত আর দিন-রাত ছায়া দেখত। দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে সে ক্রমে ক্রমে ছায়ার মতোই হয়ে যেতে লাগল। বাঘের ছায়া দেখলে সে বাঘের মতো গর্জন করত, সাপের ছায়া দেখলে করত ফোঁস ফোঁস, আবার গাছের ছায়া দেখলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুবহু এক গাছের মতো বাতাসে দোল খেত। শেষ জীবন পর্যন্ত লোকটা বুঝতেই পারল না, সে আসলে কী।

আস্তে আস্তে তার মুখ থেকে স্খলিত হয়ে আমার চোখ নীচে নেমে এল। নুয়ে এল মাথা।

সে বলল, চলি।

আমি উত্তর দিলাম না।

সে চলে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে তাদের খেলা সেরে রাঙা মুখে তিতু আর ঝিমলি এসে আমাকে একই ভাবে বসে থাকতে দেখল। তারা চিৎকার করে আমাকে হনুমান আর কাঠবেড়ালি দেখার গল্প বলল।

তারপর ঝিমলি বলল, কে একটা লোক এসেছিল না বাবা। ওই লোকটা ঢুকবার সময়ে আমাদের ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করছিল।

কী জিজ্ঞেস করেছিল?

তোমার নাম কী, তুমি কী কর।

তোমরা বললে?

বললাম। আমার বাবার নাম অতনু সেন। আমার বাবা নেতা। ঠিক বলিনি বাবা?

আমি কষ্টে হাসলাম।

রাত অনেক। ছেলেমেয়েরা ঘুমোতে গেছে। শোওয়ার আগে দুলু তার শরীরে পাউডার ছড়াচ্ছিল।

আমি সেই সুন্দর দৃশ্য দেখছিলাম। দুই বাহু উর্ধ্বে তোলা। আধখোলা বুক উন্নত হয়ে পাতলা শাড়ি ভেদ করে আসছে। পিছল মসৃণ শরীর। লাবণ্যময়। একটু দেখে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার মাথায় মধ্যে আবার ঝড় উঠেছে। স্মৃতি আর স্মৃতি। অনন্ত দুঃখের স্মৃতিগুলি শূন্য থেকে উড়ে আসে। মানুষের জন্য— মানুষের জন্য— মানুষের জন্য এখনও সংগ্রাম বাকি রয়ে গেছে। কে করবে? কে আছ কোথায়? কে করবে?

আমি বিড়বিড় করে বললাম, দুলু, আমরা উদ্ভিদের হাতে পৃথিবীকে ছেড়ে দেব না।

দুলু চমকে ঘুরে বলল, কী?

আমি বিভোর হয়ে বললাম, কীট-পতঙ্গের হাতেও না।

কী বলছ? কী ছেড়ে দেবে না?

পৃথিবীর অধিকার। দুলু, আমাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমি ছাড়া আর কে করবে?

# বৃষ্টির ঘ্রাণ

## ॥ সোমসুন্দর ॥

দীর্ঘ শীর্ণ কালো মানুষটা নৌকোর ওপর বসে আছে। হাতে জুতমতো ধরা গাঁজার কলকে। চোখের দৃষ্টি একটু উদাস। রুক্ষ লম্বা চুল ওড়ে হাওয়ায়। পাশে রাখা লাঠিগাছ। তীব্র গতিতে উড়ে যাচ্ছে ছিপ নৌকো। বোঠে মেরে ঘেমে যাচ্ছে বিশ জোয়ান। বিশ গাছ লাঠি নিরীহের মতো পড়ে আছে নৌকোর খোলে—শীতকালের সাপের মতো নির্জীব। আগে পেছনে আরও কয়েকখানা ছিপ। উড়ছে। দক্ষিণপুর আর বেশি দূর নয়। বেলাও শেষ হয়ে এল। সিংপাড়ার কাছে নদী বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে প্রকাণ্ড পুরনো অশ্বত্থ। সেই বুড়ো গাছের তলা ক্ষয় করেছে নদী, গভীর মাটির নীচেকার শিকড় অজগরের পরিবারের মতো দেখায়। বুড়ো গাছটার কোমরের জোর গেছে, এখন ঝুঁকে নদীতে নিজের ছায়া দেখে। সেই অশ্বত্থের পিছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। রাঙা আলো ঢেলে দিচ্ছে। ওই আলো সরে গেলে দক্ষিণপুর গাঁয়ে ঠিক ওই রকম আলো জ্বলে উঠবে। কিংবা ওর চেয়ে কিছু বেশি। আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠে আকাশ চাটবে। একখানা ঘরও থাকবে না দাঁড়িয়ে। তখন ওই দীর্ঘ শীর্ণ কালো মানুষটি আর তার একশো জোয়ান লাঠি হাতে পাহারা দেবে সেই আগুন, যেন কেউ এক ঘটি জলও ঢালতে না পারে আগুনে। দক্ষিণপুর আর বেশি দূর নয়। সূর্যও নিভে এল। মানুষটি উদাস চোখে সামনে তাকিয়ে আছে। কপ কপ বোঠের শব্দ। নিঃশব্দে মানুষটি গাঁজা টানে। ছিপ নৌকোগুলো উড়ে যাচ্ছে। মানুষটা স্বপ্ন দেখছে। আগুনের স্বপ্ন।

হয়তো বা দৃশ্যটা সত্য নয়। হয়তো বা সত্য। আমি কল্পনায় দৃশ্যটা মাঝে মাঝে দেখি। ওই দীর্ঘ মানুষটি আমার ঠাকুরদা কুমুদবন্ধু রায়। আমি যখন খুব ছোট, তিনি তখন খুব বুড়ো। সেই বয়সেও তাঁর শরীরে একবিন্দু মেদসঞ্চার হয়নি। শ্বাস নিলে পাঁজরের মোটা হাড় ফুলে উঠত, তার ওপর দিয়ে কেঁচোর মতো শিরা উপশিরা। মল্লের মতো কাপড় পরতেন। খালি গা, হাতে গাঁজার কলকে। দুটি কোটরগত চোখে প্রেতের মতো চেয়ে থাকতেন। যখন হাঁটতেন মনে হত মানুষটি রণপায়ে চলেছে। মাঠ ঘাট পার হতেন কোনাকুনি। রাস্তাঘাটের তোয়াক্কা না রেখে। কেউটে গোখরোরা সমঝে চলত। পারতপক্ষে তাঁর রাস্তায় শরীর বাড়াত না। শেষ যৌবনে গাঁজায় নেশা হত না বলে আফিং ধরেছিলেন। ডেলা ডেলা খেতেন। ওই মানুষকে কামড়ালে রক্ষে আছে!

বুড়ো বয়সে লোকটা কিংবদন্তির মানুষ। তখন বাঙালির হাতের লাঠি খসে পড়েছে প্রায়। তবু শৌখিন লেঠেলরা আসত শিখতে। পাখসাট মেরে উঠোনে তারা কসরত করত। দাদু তাঁর প্রেতচোখে উদাস চেয়ে দেখতেন।

জাতে ছিলেন কুলীন কায়স্থ। কিন্তু বৃত্তি বর্ণানুসারে গ্রহণ করেননি বলে তাঁকে অনেকেই ব্রাত্যদোষে দুষ্ট মনে করত। তিনি জমিদারের তাঁবে লেঠেলদের সর্দারি করতেন। হুড় দিয়ে গিয়ে পড়তেন গাঁ গ্রামে। পূর্ববঙ্গে ডাকাবুকো, সাহসী, কুশলী নমঃশূদ্ররাই তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিল।

কুলগুরুর বংশের শেষ সন্তান পুলিনবিহারী দেবশর্মনঃ। তাঁর অবস্থা ভাল ছিল। জমি, পুকুর, বাগান ছিল বিস্তর। আমার ঠাকুরদার বাবা তাঁর পুকুরে মাঝরাতে গোপনে জাল ফেলেছিলেন বলে পুলিনবিহারী তাঁকে সকলের সামনে খড়মপেটা করেন। দাদু তখন ভরা জোয়ান। নীরবে দৃশ্যটা দেখে প্রেতচোখে চেয়ে কেবল বলেছিলেন, তোমার মুখে পেচ্ছাপ করব।

তাই করেছিলেন। পুলিনবিহারী পাশের গাঁয়ে তাগাদা সেরে ফিরছিলেন। সঙ্গে একজন লাঠিধারী পাইক। পাইকের হাতে হ্যারিকেন। পুবের মাঠে দাদু ওঁত পেতে বসে ছিলেন, হাতে রামদা। সেটা

হ্যারিকেনের আলোতে ঝলকাতেই পাইক হ্যারিকেন ফেলে দৌড় দিল। পুলিনবিহারীকে কাটলেন দাদু। সকালে সবাই এসে দেখল পুবের মাঠে এক কবন্ধ মূর্তি হাঁটু মুড়ে বসে আছে, দুই হাঁটুর মাঝখানে তখনও ধোঁয়াচ্ছে হ্যারিকেনটা। একটু দূরে মাথাটা পড়ে আছে। হাঁ-করা মুখে তখনও এককোষ পেচ্ছাপ। গড়িয়ে পড়ছে কষ বেয়ে।

আমার ঠাকুরদার গায়ে কুলগুরুর রক্তের ছিটে এসেছিল। বুড়ো বয়সে তিনি গায়ের জ্বালার কথা বলতেন, 'গা বড় জ্বলে। গা জ্বলে যায়।' কে জানে, গায়ের এই জ্বালার জন্যই লাঠি সড়কি ধরেছিলেন কি না!

আমার বাবা কদমসুন্দর রায়ের শরীরে অল্পবয়সেই মেদসঞ্চার হয়েছিল। লাঠি সড়কি জীবনে ধরেননি। মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করতেন। পড়াশুনোয় ভালই ছিলেন। বাপের ব্রাত্যদোষ স্খালনের জন্য তিনি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত ধারণ করেন। তিনি ঠাকুরদাকে বোঝাতেন বর্ণহিন্দুদের প্রত্যেকেরই উপবীত ধারণ অবশ্য কর্তব্য।

দাদু সবই শুনতেন, তবু উদাসভাবে চেয়ে থাকতেন।

আমরা তিন ভাই। সকলেরই পৈতে হয়েছিল।

ঠাকুরদার উপার্জন মন্দ ছিল না। নিষ্কর জমিও ছিল বিস্তর। কিন্তু সঞ্চয়ী ছিলেন না বলে আমরা বাবা কদমসুন্দর ঠাকুরদার কিছুরই উত্তরাধিকার পেলেন না। তাঁকে পোস্ট অফিসের চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যেতে হল। ঠাকুরদার মৃত্যু হলে আমরাও বাবার কাছে চলে গেলাম। ফরিদপুরের সেই গ্রামের কথা এখন আর আমার কিছুই মনে নেই।

ঠাকুরদার পাপ পাছে আমাদের ওপর বর্তায় সেই ভয়ে আমার বাবা সবসময়েই ধর্মপথে আছেন। বাড়িতে পুজো-আর্চা লেগে থাকে। বাবা অবসর সময়ে শাস্ত্রপাঠ করেন। যদিও আমাদের অবস্থা ভাল নয়, তবু আমাদের বাসা থেকে ভিখিরি ফেরে না। আমার দুই দাদার এক জন একটা কারখানার হাইস্কিলড অপারেটর, অন্য জন কেরানি।

আমি সোমসুন্দর রায়। ডাকনাম নেনটু। আমার দুই দাদাই ভাল ছেলে, নিরীহ। তাদের শরীরের গড়ন বাবার মতোই মেদবহুল। আমি লেখাপড়ায় তেমন কিছু পারিনি। বছর চারেক আগে আমি বি-এ পাশ করি। তারপর থেকে বসে আছি। খেলাধুলোয় একসময়ে আমার খানিকটা নাম ছিল। আমার প্রিয় ছিল বক্সিং। এস ও পি সি-তে আমি বেশ কিছুকাল শিখি। কিন্তু ব্যাপারটা আমার বাবার মনঃপূত ছিল না। স্কুল কলেজে আমি বিস্তর ঘুঁষোঘুঁষি করেছি। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে আমার যাওয়ার কথা ছিল, বাবা যেতে দেননি।

খেলাধুলো আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের বাসা দোতলায়। সামনের দিকে একটা বারান্দা আছে। একটা একসময়ে ছিল আমার জিমনাশিয়াম। যন্ত্রপাতি এখন আর কিছুই নেই। সবই পাড়ার ক্লাবে দিয়ে দিয়েছি। এখন বারান্দায় কেবল ঘুঁষি মারবার থলিটা ঝুলে থাকে। ওটা আমি দিইনি। ঘুঁষি মারবার জন্য নয়, আমার অন্য কাজে লাগে।

আমার চেহারাটা বাবা এবং দাদাদের তুলনায় একটু খাপছাড়া। লম্বা, শীর্ণ, কালো। যে কেউ আমার ঠাকুরদাকে দেখেছে সে আমাকে দেখলেই চমকে উঠতে পারে। ঠাকুরদা হাঁটলে দূর থেকে মনে হত, রণপায়ে মানুষ চলেছে। আমি অতটা লম্বা নই। কিন্তু আমার গড়ন হুবহু আমার ঠাকুরদার মতো। সেইরকম নিঃশব্দ পায়ে আমি হাঁটতে পারি। আমার চোখ কোটরগত না হলেও একটু গর্তে ঢোকানো। অনেকেই বলে আমার চোখে ক্রূরতা আছে।

এ-সবই বাইরের মিল। এগুলো কিছু না। কিন্তু আমার সঙ্গে ঠাকুরদার অন্য একটি গভীর মিল আছে। সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক। ঠাকুরদা বুড়োবয়সে তাঁর গায়ের জ্বালার কথা বলতেন। সেই জ্বালা কেমন তা আমি জানি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমার নিজেরও এক জ্বালা আছে। সেটা শরীরে, সেটা মনেও। এই জ্বালাই হিংস্রতা কি না তা আমি জানি না। কাউকে আমি এ-জ্বালার কথা বলিনি কখনও। কিন্তু আমার নিরন্তর ছটফটানি, চঞ্চলতা, এগুলো গোপন করা যায় না। খেলা হিসেবে বক্সিং আমার কতটা প্রিয় ছিল কে জানে। কিন্তু যখন বালির বস্তায় নাগাড়ে ঘণ্টা দুই ঘুঁষি মারতাম তখন তার ভিতর দিয়ে আমার এই অস্বস্তির একটা উপশম হত। আমি প্রতিপক্ষকে খুবই হিংস্রভাবে আক্রমণ

করতাম। তার কারণও ওই। কিন্তু এমনিতে কারও বিরুদ্ধেই আমি কোনও আক্রোশ বোধ করি না। রিং-এর বাইরে আমি কদাচিৎ কাউকে মেরেছি।

এখন ঘুঁষোঘুঁষি ছেড়ে দেওয়ার পর আমি যখন সেই জ্বালা টের পাই তখন আপনা থেকেই আমি দাঁতে দাঁতে শূন্যতাকে চিবিয়ে ফেলতে থাকি। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। শরীর রি-রি করে, চোখ আধবোজা হয়ে আসে। তখন ফাঁকা বারান্দায় এসে আমি প্রকাণ্ড ভারী বালির বস্তাটা খুব জোরে দুলিয়ে দিই। দুলতে দুলতে বস্তাটার ঝুল বাড়ে, বাড়ে আঘাত করার শক্তি। তখন আমি বস্তাটার ঝুলপথে দাঁড়াই। প্রচণ্ড সেই বস্তা এসে আমার মুখে লাগে, আমি মাটিতে ছিটকে পড়ি, আবার উঠি। বস্তাটা তার প্রচণ্ডতা নিয়ে ফিরে আসে। বুকে লাগে, পড়ি। আবার উঠি। এইভাবে আমার ঠোঁটে, মুখের এখানে-ওখানে ফুলে ওঠে, রক্তবর্ণ হয়ে যায় মুখ। কিন্তু তার ফলে আস্তে আস্তে আমার অস্বস্তি কমে যায়। শরীর সহজ হয়ে আসে, মন স্থিরতা ফিরে পায়।

আমার আর-একটি প্রিয় খেলা হচ্ছে দাবা। খুব বেশি অভিনিবেশ দরকার হয় বলে এই খেলায় আমি নিজেকে ভুলে থাকতে পারি।

নিজেকে ভুলে থাকা। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। নিজেকে ভুলে থাকবার কী-ই বা দরকার আমার? কিন্তু কথাটা সত্যি। আমি মনে মনে জানি, নিজেকে ভুলে থাকা আমার একটু দরকার।

যদিও আমি এমনিতে নিরীহ, শান্ত, তবু আমার মাঝে মাঝে কেন যেন মনে হয়, আমি লোকটা বিপজ্জনক।

## ॥ মঞ্জু ॥

আমি মঞ্জু।

এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা পোস্ট অফিস। বুক-চাপা ভিড়। রাসবিহারী পোস্ট অফিসে মাসের প্রথম দিকটায় এ-রকমই ভিড় হয়। মনিঅর্ডারের লাইনটা বেড়ে বেড়ে, ঘুরে ফিরে বাইরে চলে গেছে। ভিড় রেজিস্ট্রেশনে, স্ট্যাম্পে, ভিড় সব জায়গায়। এই ভিড়ে কিছু ভাবা যায় না। লেখা যায় না। অথচ অদ্রিকে আমার চিঠিটা লেখা খুব দরকার। আধঘণ্টা ধরে চিঠি লেখার হেলানো বোর্ডের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সামনে খোলা ইনল্যান্ড। ইনল্যান্ডের পাশে আমার ভ্যানিটি ব্যাগ আর রোদ-চশমা। আমার পিছনেই স্ট্যাম্প কাউন্টার। আমার গা ঘেঁষে লোক আসছে-যাচ্ছে। আমি কিছু লিখতে পারছি না, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

অদ্রিকে চিঠি লেখা এত শক্ত ছিল না মোটেই। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে চার বছর আগে থেকেই। তখন ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র।

ইতিহাসটা একটু আগে থেকে বলি। এক সময়ে আমরা খুব গরিব ছিলাম। আমার বাবা ছিলেন রেলের ডি-টি-এস অফিসের সামান্য কেরানি। কিন্তু চিরদিন কারও সমান যায় না। বাবা অনেক চেষ্টায় কেরানি থেকে মালবাবু হলেন। উত্তরবাংলার একটা ছোট্ট স্টেশনে তাঁর পোস্টিং হল। স্টেশন ছোট কিন্তু কমলালেবু, চা, কাঠ এইসব বুকিং-এর জন্য স্টেশনটির নাম ছিল। সেখানে যাওয়ার পর থেকে আমরা ভাল থাকতে লাগলাম। ভাল খাই, ভাল পরি। বাবার মুখটা তখন থেকেই ভারী ভারী হয়ে এল। মাকে দেখাত হাসিখুশি।

পাঁচ বছর পর বাবা চাকরি ছেড়ে দিলেন। বাবার নামে ওয়ারেন্ট নিয়ে পুলিশও এল। কিন্তু বাবা ছাড়া পেলেন। আমরা বুঝতে পারলাম না বাবা কী এমন ঘুষ খেয়েছেন যাতে এত গোলমাল হল। ঘুষ সবাই খায়। আমরা বাচ্চারাও তা জানতাম। চাকরি ছেড়ে বাবা আমাদের কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতার বাড়িতে পা দিতেই বুঝতে পারলাম চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া বাবার আর কিছুই করার ছিল না। কারণ আমাদের বাড়িটা বাবা করেছেন বালিগঞ্জে, বিরাট বাড়ি। তার ঘরে ঘরে ফ্যান ঘুরছে, টিউবলাইট জ্বলছে। সোফা কোচ, ইংলিশ খাট—ঠিক সিনেমায় দেখা বড়লোকের বাড়ির মতো সব কাণ্ডকারখানা। বাবা সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে বললেন—এই হচ্ছে তোমাদের বাড়ি। সেই থেকে আমরা

নিজেদের বড়লোক বলে জানি। বাবা অবশ্য বসে থাকলেন না। আরও বড়লোক হওয়ার জন্য ব্যবসা শুরু করলেন। এখন সেইসব ব্যবসাই চালু। লোহার কারখানা, অর্ডার সাপ্লাই, কনস্ট্রাকশন।

আমরা তিন বোন। আমি ছোট। কলকাতায় আসার পরই এক বছরের মধ্যে আমার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে যায়। আমি তখন দশ-বারো বছরের। মা-বাবার কোল পোঁছা মেয়ে। খুব আদরের। যখন যা চেয়েছি পেয়েছি। আমার স্বভাব তাই একটু একগুঁয়ে, জেদি।

আমাদের পাশের বাড়িতে ফ্ল্যাটে ভাড়াটে এল অদ্রিরা। না, প্রথমে অদ্রি নয়। অদ্রি তখন তার মামার বাড়ি বোম্বেতে। অদ্রির মা-বাবা আর দুই বোন এল ফ্ল্যাটটায়। একটা বোন আমারই বয়সি। ওরা দুই বোন জানালা খুলে প্রায়ই আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকত। ওদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল না, কিন্তু আমাদের তুলনায় কিছু না। তাই ওরা আমাদের বাড়ির রেডিয়োগ্রাম, ফ্রিজিডেয়ার, আসবাব এইসব লোভীর মতো দেখত। দেখত আমি রোজ আলাদা শাড়ি পরি। চোখাচোখি হতে হতে ভাব। আমি ওদের বাসায় যাই, ওরা আমাদের বাড়িতে আসে।

তখন ওরা মাঝে মাঝে ওদের দাদা অদ্রির গল্প আমাকে বলত। অ্যালবাম খুলে দেখাত দাদার ছবি। আমি দেখতাম, খুব জোরালো চেহারার একটি সুন্দর ছেলে। ঠোঁট আর চোখে একটু নিষ্ঠুরতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব আকর্ষণ করে। ওদের ঘরে একটা আলমারি বোঝাই করা কাপ, মেডেল, নানা রকম প্রাইজ। এই সবই অদ্রি পেয়েছে খেলাধুলোয়। সত্যি বলতে কী, অদ্রিকে না-দেখেই মনে মনে তখন থেকে আমি তাকে চাইতে শুরু করি। সে বোম্বেতে গেছে আই-এস-সি পরীক্ষার পর দীর্ঘ ছুটিতে। যাওয়ার আগে অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে গেছে। বুঝতাম, অদ্রি হচ্ছে ওদের পরিবারের একমাত্র রঙের টেক্কা। বাবা দীর্ঘকাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানি থেকে বুড়ো বয়সে এস এস এ পরীক্ষা দিয়ে অফিসার হয়েছেন। আয় যেমন ব্যয় তেমনই। অদ্রি ওদের পরিবারের ভবিষ্যৎ দেখবে। এটাই ওদের বিশ্বাস।

অদ্রির যেদিন বোম্বে থেকে ফেরার কথা সেদিন সকালে ইচ্ছে করেই আমি শোয়ার ঘরের পরদা সরাইনি। খাটে বসে বই পড়েছি সারা সকাল! আমি যে খুব সুন্দর তা আমি জানি। অদ্রিকে আমি এমনভাবে দেখা দেব যাতে প্রথম পলকেই ওর পলক স্থির হয়ে যায়।

অবশ্য অতটা হয়নি। অদ্রি সেই কম বয়সেও সুন্দর মেয়ে কিছু কম দেখেনি। অদ্রির আসার দিন রাণু আর সুনু আমার খোঁজখবর নিলই না। সারা দিন তারা তাদের দাদাকে নিয়ে ব্যস্ত। মাংসের গন্ধে ভুরভুর করছিল বাতাস। চিৎকার করে হাসি, ঠাট্টা—এইসব শব্দ পাচ্ছিলাম ঘরে বসে।

সারা দিন আমি অপেক্ষা করলাম। রাণু আর সুনু আমার খোঁজ করল না। পরদিন রাণু পরদা সরিয়ে জানালা দিয়ে দু'-একটা কথা বলল, বাসায় এল না, আমাকেও ডাকল না। মনে মনে বুঝতে পারছিলাম, ওরা ওদের মূল্যবান দাদাকে সবরকম আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে চলতে চায়।

কিন্তু অদ্রি আমাকে দেখেছিল ঠিকই। পাশাপাশি বাড়ি হলে ঠিকই দেখা হয়ে যায়। সত্যিকারের অদ্রি ফটোর চেয়েও সুন্দর। টকটক করছে ফরসা রং। তার ওপর সে ছিল খুব চালাক, চতুর, ব্যবহারে তার কোনও সংকোচ লজ্জা ছিল না।

তিন-চার দিন পর সে রাণুর সঙ্গে আমাদের বাসায় এল। হাতে একটা টেনিস বল, সেটা ক্রমান্বয়ে মাটিতে ফেলে লুফছে। চোখে সরল কৌতূহল। আমার মুখোমুখি হতেই বলল, আমাদের বাসায় আসেন না কেন? আমি আছি বলে?

ওইটুকু ছেলের পক্ষে খুবই পাকা কথা। তবু আমার ভালই লেগেছিল। কিন্তু রাণুর মুখের চেহারা ভাল না। কাঠ কাঠ হাসছে, যেন অদ্রির প্রস্তাবটা তার পছন্দ নয়।

রাণুর ওই মুখভারটুকু আমি গায়ে মাখিনি। যা আমি চেয়েছি, বরাবর তা পেয়ে আসছি। তাই আমি ওদের বাসায় গেলাম। দশ-বারো দিন মেলামেশার পরই অদ্রি আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল এবং খেতে লাগল। রোজ। মাসখানেক পর গেল হোস্টেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। সপ্তাহে দু'টো চিঠি দিত। দু'সপ্তাহে এক দিন আসত।

ব্যাপারটা এ-রকমই সহজ এবং রোমান্টিক। দুই পরিবারে ব্যাপারটা জানাজানিও হয়ে গেল যথাসময়ে। কোনও ঝামেলা হল না। অদ্রির বাবা আর আমার বাবা একদিন এক বৈঠকেই দু'জনের

বিয়ে ঠিক করলেন। অদ্রি পাশ করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়ে চলে গেল দুর্গাপুর। চার বছর আগে রাণুর বিয়ে হয়ে গেছে, সুনুরটা বাকি। ছেলে দেখা হচ্ছে, পছন্দমতো পেলেই বিয়ে হয়ে যাবে। সুনুর বিয়েটা হয়ে গেলেই আমাকে বিয়ে করে দুর্গাপুরে নিয়ে যাবে অদ্রি।

নিশ্চিন্ত এবং সুন্দর জীবন আমার। কোনওখানে কোনও গোলমাল নেই। সব যেন খাবারের মতো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা, আমি একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি, খেয়ে যাচ্ছি।

এখন এই সকাল দশটায় রাসবিহারী পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে অদ্রিকে চিঠি লেখা যে কী শক্ত। বার বার রুমাল তুলে মুখে চেপে চেপে ঘাম মুছতে হচ্ছে। এ-বছর একটুও বৃষ্টি হয়নি। পত্রিকায় রোজ খরার কথা থাকে। কলকাতায় কলেরা লেগেছে খুব। এত গরম আমারও সহ্য হয় না। অদ্রিকে চিঠিটা লিখেছি মাত্র তিন লাইন। লিখেই ভারী অবাক হয়ে দেখছি—এই তিন লাইনের যা কথা তা আমি অদ্রিকে আরও বহুবার লিখেছি।

গত সাত-আট বছর ধরে অদ্রিকে আমি সপ্তাহে দু'টো চিঠি দিই। হিসেব করলে প্রায় সাত-আটশো চিঠি দাঁড়ায়। অত চিঠিতে অদ্রিকে আমি ইনল্যান্ড আর খামে কেবল ভালবাসার কথা লিখেছি, কখনও অভিমানের কথা, শরীরের যত্ন নেওয়ার কথা। নিঃসঙ্গতার কথা, কলকাতার কথা, মা-বাবার কথা, সুনু-রাণুর কথা। ঘুরেফিরে একই কথা। আর কেবল ভালবাসা, চুমু, গভীর ভালবাসা, নিবিড় চুম্বন।

সপ্তাহে অদ্রিরও দু'টো করে চিঠি পাই। সেই একই রকম। এখন ব্যাপারটা এমনই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে যে মা-বাবাও অদ্রির চিঠি আমার হাতে এনে দেন। আমি আর লজ্জা পাই না। কখনও মা জিজ্ঞেস করেন—কী লিখেছে? শরীর-টরীর ভাল তো? আমি একটুও লজ্জা না পেয়ে বলি, ভালই। ষাঁড়ের মতো মোটা হচ্ছে। রবিবারে এসেছিল—দ্যাখোনি? মা বলে. ষাট ষাট! নজর দিস কেন? আমি লজ্জা পাই না। কেবল মুখটা ফিরিয়ে নিই।

গত সপ্তাহেও অদ্রি এসেছিল তার গাড়ির ডেলিভারি নিতে। ক্রিমরঙা নতুন মার্ক টু। ওর নতুন গাড়িতে আমি খানিকটা বেড়ালাম। দিনকাল খারাপ বলে দূরে কোথাও যাওয়া গেল না। গড়ের মাঠের চারপাশে চক্কর দিয়ে গাড়ি রেখে ঘাসে বসলাম। অদ্রি আরও মোটা হয়েছে। একটু ভুঁড়ি হয়েছে, সুন্দর সব বাহারি জামা প্যান্ট পরে আজকাল। সুন্দর দেখায়। আমাদের মধ্যে অনেক কথা হল। কথা বলতে বলতে এক সময় আমি থেমে গেলাম। মনে হল আমার বুকে একটা গোপন টেপ রেকর্ডার আছে। সেই যন্ত্র থেকে কথাটা উঠে আসছে—যে-সব কথা অদ্রিকে আমি মাসখানেক আগেও বলেছি। তখন অদ্রির দিকে চুপ করে চেয়ে রইলাম। অদ্রি জিজ্ঞেস করল, কী হল? কথা বলছ না যে! চমকে উঠলাম, এ-প্রশ্ন ও আগেও কতবার করেছে। আমি হাসলাম, কথা বললাম। দুটি টেপ রেকর্ডার ঘাসের ওপর বসে ঘুরে ঘুরে কথার ফিতে শেষ করে গেল।

গাড়িতে উঠেছি, অদ্রি গাড়ি ছেড়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে খুব নতুন একটা কথা বলল, গাছপালাগুলো দেখেছ! কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে সব।

বললাম, হুঁ।

এ-বছরটা একদম বৃষ্টি নেই, খুব খরা।

হুঁ।

চাষবাসের যে কী হবে এবছর। দুর্গাপুরের ওদিকটাও—

আমি হেসে বললাম, গাড়ির রংটা সত্যিই সুন্দর হয়েছে। সামনের বছর এই রংটাই থাকবে তো?

অদ্রি খুশি হয়ে বলল, তুমি বললেই থাকবে। আমি কি নিজের পছন্দে রং করব? তোমার যা পছন্দ—

এ রংটাই ভাল।

এই রকমই সব কথাবার্তা আমাদের। কথার কিছু ঠিক থাকে না। বড় জংশন স্টেশনে ঢুকবার সময়ে গাড়ি যেমন এক লাইন থেকে ক্রমান্বয়ে আর-এক লাইনে সরে সরে যায়। তবু আমাদের কথাগুলো কেবলই ঘুরপাক খায়। একই কথা ফিরে ফিরে আসে।

শিগগিরই আমার আর অদ্রির বিয়ে হয়ে যাবে। আর কী লেখার আছে অদ্রিকে? কী লিখব? আরও ভালবাসার কথা? আরও চুমু?

চিঠিটা শেষ করা সত্যিই এমন কিছু নয়। সব আমার মুখস্থ আছে। লিখে গেলেই হল। কিন্তু কেন যেন ইচ্ছে করছে না। তিন লাইন লিখে আটকে আছে চিঠিটা। খোলা কলমের মুখে শুকিয়ে যাচ্ছে কালি। আমার কিছু মনে পড়ছে না। কিছু ভাবতে পারছি না। এ-বছর একদম বৃষ্টি নেই। খুব গরম। পোস্ট অফিসের ভিতরটা ভেপে আছে। গায়ে গায়ে ভিড়। এই ভিড়ের মধ্যে কিছু লেখা যায়? এই গরমে? হেলানো বোর্ডটার ও-পাশে এক জন মাঝবয়সি লোক মনি-অডার্র ফর্ম ফিল-আপ করতে করতে আড়চোখে আমাকে দেখছে। কখনও মুখ নিচু করে দেখার চেষ্টা করছে চিঠিটাও। ইচ্ছে হচ্ছে, লোকটার হাতে চিঠিটা তুলে দিয়ে বলি—পড়ুন।

বিরক্তিকর। লোকটা চিঠিটা দেখছে বলে নয়। লোকটা দেখছে, আমি তিন লাইন লিখে আটকে গেছি, আর লিখতে পারছি না। খুব অন্যমনস্কভাবে আমি এক বার চোখ তুলে চারদিকের ভিড় দেখছি, কখনও চিন্তান্বিতভাবে চেয়ে দেখছি চিঠিটার দিকে। বুকের ভিতরে চলছে টেপ-রেকর্ডার। কথাগুলো উঠে আসছে। লিখতে ইচ্ছে করছে না। লিখতে চাইছি না।

ঠিক এই সময়ে ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, মিলেছে! মিলেছে! সই মিলেছে!

চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি এক ভিড় লোক সেভিংস অ্যাকাউন্টের কাউন্টারের দিকে তাকাচ্ছে।

ছেলেটা কালো, হিলহিলে লম্বা চেহারা, একটু গর্তে ঢোকা চোখ, পরনে ভাঁজহীন প্যান্ট আর আধ-ময়লা হাওয়াই শার্ট। মুখখানা দেখার মতো নিষ্ঠুর। নাকটা কেমন যেন ভাঙা, বাঁকা, মুখে কিছু কাটাছেঁড়ার দাগ। ছেলেটা হাত উঁচু করে উইথড্রয়াল ফর্ম জনসাধারণকে দেখাচ্ছে। মুখে সরল হাসি।

ভিড় থেকে গলা বাড়িয়ে কে একজন জিজ্ঞেস করল, কী মিলেছে দাদা?

ছেলেটা সরল মুখে বলল, সই। গত চার দিন চেষ্টা করছি। প্রায় কুড়িটা ফর্ম নষ্ট করে এইমাত্র মিলল। বুঝলেন মশাইরা, আমি টাকাটা পাচ্ছি—

খরার গরমে বিরক্তিকর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা এই প্রথম একটু হাসল।

আমি হাসলাম না। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলাম। ছেলেটিকে আমি কোথাও দেখেছি।

টাকা পেয়ে ছেলেটা আবার হাতের টাকা উঁচু করে জনসাধারণকে দেখিয়ে বলল, পেয়েছি! টাকা পেয়েছি!

একজন বলল, বাকআপ!

দাদা, একটা ভোজ দিন আমাদের।

উইথড্রয়াল ফর্মে সই মেলানো যে কী শক্ত তা আমি জানি। কিন্তু এ-রকম চেঁচামেচি করার কী আছে! পাগল। কিন্তু ওকে আমি কোথায় দেখেছি!

ভাবতে ভাবতে আমি আবার চিঠিটার দিকে তাকাই। অদ্রিকে আমি কী লিখব? ও-পাশে মনিঅর্ডার ফর্ম ফিল-আপ বন্ধ রেখে মাঝবয়সি লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে মজা দেখছে। মজা দেখা হয়ে গেলে আবার আমাকে দেখবে। চিঠিটা পড়ার চেষ্টা করবে।

তার চেয়ে এইভাবেই চিঠিটা শেষ না করে ডাকে ফেলে দিলে কেমন হয়? ইতি-টিতি কিছু লিখব না, নাম লিখব না। অদ্রি চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই ভীষণ অবাক হবে, দুশ্চিন্তা করবে। ভাববে, নিশ্চয়ই চিঠিটা এই পর্যন্ত লেখার পর কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নয়তো আমি মারা গেছি। ভাবতে ভাবতে অদ্রি চলেও আসতে পারে।

লম্বা কালো ছেলেটা ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে; অনেকেই দেখছে ওকে। ভাবছে, পাগল নয় তো! পাগল বড় বেড়ে গেছে আজকাল। আমিও ছেলেটাকে ভ্রূ কুঁচকে দেখলাম। কোথায়, কবে দেখা হয়েছিল আমাদের?

ছেলেটা বেরিয়ে গেলে আমি সত্যিই চিঠিটা বন্ধ করলাম। ডাকবাক্সে ফেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। চারপাশে চেয়ে দেখলাম, কোথাও সেই কালো লম্বা ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে কি না। না, নেই।

ফুটপাথে পা দিতেই একঝলক খরার রোদ এসে গায়ে পড়ে। সমস্ত শরীর চিড়বিড়িয়ে ওঠে। রোদ-চশমা পরে আকাশ দেখলে মেঘলা লাগে। কিন্তু আমি জানি আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। বহুদিন ধরেই নেই। এমন অদ্ভুত আবহাওয়া আমি বহুকাল ধরে দেখিনি। একেই কি আকাল বলে?

খবরের কাগজে এই নিয়ে খুব লেখালেখি হচ্ছে আজকাল, অদ্রিও বলছিল। কিন্তু কলকাতায় নিজের চারদিকে তাকালে আকালের কোনও চিহ্ন দেখি না।

একটু অন্যমনস্কভাবে হেঁটেছিলাম। অদ্রিকে লেখা অসমাপ্ত চিঠি, কিংবা পোস্ট অফিসের সেই কালো লম্বা ছেলেটা কিংবা এবারকার গরম—এ-রকম কিছু একটা ভাবছিলাম। লক্ষ করিনি কিছু দূরে একটা চায়ের দোকানের সামনে গাছতলায় বসে-থাকা কয়েকটা অল্পবয়সি ছেলে আমাকে দেখছে। এ-রকম কত ছেলে বসে আছে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়—কে অত লক্ষ করে? আমিও করিনি। কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ দেখি, আমার যাওয়ার রাস্তা জুড়ে দু'টো ছেলে মারামারি করছে। সত্যিকারের মারামারি নয়, ওদের ঠোঁটে সিগারেট, মুখে হাসি। আমার রাস্তা আটকানোই উদ্দেশ্য। এ ওর দিকে লাথি ছুড়ে গালাগাল দিচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাছতলায় বসে-থাকা ছেলেদের একজন চেঁচিয়ে বলল, এই হাবু, রাস্তা ছেড়ে দে। দেখছিস না দাঁড়িয়ে আছে—

অমনি দু'জন দু'দিকে সরে দাঁড়াল। তাদের এক জন দেখতে ভারী সুন্দর। পরনে দামি জামা-কাপড়, চোখে চশমা। সে আমার দিকে সোজা তাকিয়ে একটু হেসে বলল, এই যে রাস্তা। কিছু মনে করবেন না। ওই শিবুটা এক নম্বরের হারামি।

আমি জায়গাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাই। শুনি, পিছনে, শিবু বলছে, এই শুয়োরের বাচ্চা হাবু, মেয়েটার সামনে আমাকে হারামি বললি কেন? সিগারেট দে তা হলে।

গাছতলায় হাসির শব্দ হয়। হাবু উত্তরে বলে, আর শুয়োরের বাচ্চা বললে চা খাওয়াতে হয়—তা জানিস?

খুব অসভ্যতা না করলে এ-রকম একটু আধটু ইয়ার্কি আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু আজ একদম ভাল লাগল না। কী জানি কেন। হয়তো এই ভয়ংকর গ্রীষ্মের জন্য, হয়তো অদ্রিকে লিখতে না-পারা চিঠিটার জন্য।

ডান দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা সাদার্ন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। মোড়টা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ খেয়াল হল, এই রাস্তায় মণিকা থাকে। মণিকার বাসায় অনেককাল যাওয়া হয়নি। বাড়ি ছাড়া আমার কোথাও যাওয়ার নেই, কোনও কাজ নেই হাতে। অদ্রিকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে। আমি তাই ডান দিকে মোড় ফিরলাম।

দোতলায় উঠে কড়া নাড়তেই মণিকা এসে দরজা খুলল। মুখে জ্যাবজ্যাবে ঘাম, চোখ দুটো ফোলা ফোলা। মুখ ভার, আঁচল লুটোচ্ছে, চুলে জট।

চমকে উঠে বললাম, কী রে?

ও হাসল, কতদিন পরে এলি!

তুই যেন কত যাস!

বাঃ, আমার পরীক্ষা না!

সত্যিই তো। তোর এবার এম-এ পরীক্ষা, খেয়াল ছিল না।

ও বলল, আয়। সারাদিন ঘরে বসে বসে মাজা ব্যথা হয়ে গেল। এসে ভাল করেছিস। বাইরের কোনও খবরই পাই না।

বিছানাভরতি বই আর খাতা ছড়ানো, চাদর কুঁচকে, বালিশ দুমড়ে লন্ডভন্ড হয়ে আছে।

বললাম, খুব পড়ছিস!

ধুস। কিছু মনে থাকে না। দশ বার পড়ছি, দশ বার ভুলে যাচ্ছি। লাইব্রেরি থেকে গাদা গাদা নোট করে এনেছিলাম—সেগুলো নিয়ে আরও ঝামেলা।

বিছানাটা একটু টেনেটুনে দিল মণিকা।

বোস। পাখাটা বাড়িয়ে দিই। এবার যা গরম পড়েছে!

আমি মণিকার সঙ্গেই বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলাম। পাশ করলাম টেনেটুনে কিন্তু আর পড়তে ইচ্ছে করল না। কী হবে পড়ে? আমার জীবন এতই ছকবাঁধা যে খামোখা ডিগ্রি বাড়িয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া অনার্স ছিল না, পাশকোর্সেও নম্বর খারাপ, এম-এতে ভরতি হতে ঝামেলা হত। মণিকা অনার্সে হাই সেকেন্ড

ক্লাস পেয়েছিল, এম-এ-তেও ভালই করবে মনে হয়। ওর ছড়ানো বইখাতা থেকে একটা পুরনো চেনা গন্ধ আসছিল। কাগজের গন্ধ।

বললাম, তুই ফার্স্টক্লাস পাবি।

হ্যাঁ, আমাকে ফার্স্টক্লাস দেওয়ার জন্য সব ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে। কিন্তু পাশ আমাকে করতেই হবে। বাবা এ বছর রিটায়ার করছে। জানিস তো, দাদা আলাদা হয়ে গেছে।

ও মা! কেন?

সে অনেক কথা, বাদ দে। তুই কোথায় বেরিয়েছিলি?

অদ্রিকে একটা চিঠি লেখার ছিল। পোস্টঅফিসে গিয়েছিলাম।

ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অদ্রির নাম উল্লেখে অনেক মেয়েরই এ-রকম হয়। আমার একটুও হিংসে হয় না।

কী লিখলি?

আমি ঠোঁট উলটে বললাম, লেখা হলই না। তিন লাইন লিখে ফেলে দিয়ে এলাম। পরীক্ষার আগে মানুষ মোটা হয় জানতাম না। তুই কিন্তু হয়েছিস।

মণিকা নিজের হাতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর মুখ তুলে বলল, ভাবী হেডমিস্ট্রেসের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

চল, বেরো। ঘরে বসে বসে মুটিয়ে যাচ্ছিস।

কোথায় যাবি?

দোকানে। শাড়ি কিনব।

ও হাসল, তার মানে তোর মেজাজ ঠিক নেই। বরাবর দেখেছি, মেজাজ বিগড়োলে তুই শাড়ি কিনিস।

লজ্জা পেয়ে বলি, মেজাজটা ঠিক নেই ঠিকই। চিঠিটায় কী সব আবোল তাবোল লিখলাম, রাস্তায় কতকগুলো ছেলে পেছনে লাগল—

লাগতেই পারে। আমাদেরই ইচ্ছে করে।

চল না বাবা।

ও পোশাক পরে এল। রাস্তায় পা দিয়েই বলল, এ-বছর একটুও বৃষ্টি নেই দেখেছিস!

রোদ-চশমা চোখে দেওয়ার আগে আমি মুখ তুলে আকাশ দেখলাম। পিঙ্গল আকাশ। ধুলোয় আকাশের নীল ঢেকে গেছে। আমি রোদ-চশমাটা পরে নিলাম। অমনি মেঘের ছায়ার মতো চারদিক স্নিগ্ধ হয়ে গেল।

বৃষ্টি না হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। এ-বছরই বাবা রিটায়ার করছেন—

এ-সব কথা আমার ভাল লাগে না। গড়িয়াহাটার বিরাট দোকানটায় ঢুকে হাজারটা শাড়ির ভিতরে ডুবে না গেলে আর নিস্তার নেই।

ও ফের বলল, তোর জীবনটা কী সুন্দর। বিয়ে ঠিক হয়ে আছে—অদ্রির মতো সুন্দর ছেলে—তার ওপর ইঞ্জিনিয়ার—আর আমি! আমি তো বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না। এম-এ পাশ করেই চাকরি খুঁজব হন্যে হয়ে—

আমি ঠোঁট ওলটাই, ও সবাই বলে। আবার ঠিক বিয়েও হয়ে যায়।

মণিকা ম্লান হাসে, না রে! দাদা বউদি আলাদা হয়ে গেল— এখন সংসারের খরচ অনেক। একা বাবা কী করে সামলাবে? টুকুনটার জন্য যা কষ্ট হয়। যাওয়ার সময় গড়িয়ে কেঁদেছে। ওইটুকু ছেলে, ও তো সংসারের ন্যায় অন্যায় বোঝে না। দু'মাস হয়ে গেল, এক দিনও দাদা বউদি আসেনি, টুকুনকে আমরা দু' মাস দেখি না।

মণিকার চোখ ছলছল করছিল। হাতের রুমালে চোখ মুছে নিল। চোখ মুছেই আবার হাসল, তোদের বিয়ে কবে?

জানি না। ঠিক নেই।

ঠিক তো হয়েই আছে বাবা।

তা আছে। বলে শ্বাস ছাড়ি। তারপর বলি, তবু আসলে কিছু ঠিক নেই। কী হতে কী হয়ে যায়!

বাতাসে রহস্যের গন্ধ পেয়ে মণিকা টুকুনের দুঃখ ভুলে গেল। মুখ উঁচু করে বলে, তার মানে?

অদ্রির সঙ্গে যে বিয়ে হবেই তা কে বলবে! অন্য কোথাও তো হতে পারে।

কী করে হবে! অদ্রি তোর কিছু বাকি রেখেছে!

ব্যাগটা তুলে ওকে তাড়া করি। ও মাথা নিচু করে হাসে।

গড়িয়াহাটার প্রকাণ্ড দোকানটায় ঢুকতেই রঙের জগতে হারিয়ে যেতে থাকি। একটার পর একটা শাড়ি দেখি। মনটা আস্তে আস্তে ভাল হয়ে ওঠে।

## ॥ সোমসুন্দর ॥

টাকাটা দেওয়ার সময়ে বড়দার মুখখানা ভারী অপ্রতিভ হয়ে গেল, দেখলাম। বলল, টাকা কোথায় পেলি? আমাকে দিচ্ছিস কেন?

একটা ব্যাঙ্ক লুট করেছি।

বড়দা হাসে, যা দিনকাল পড়েছে, তোরা আর চাকরি পাবি না। ওইসবই করতে হবে। টাকা নিয়ে আমি কী করব?

তোর লাগে না টাকা? নে, ধার হিসেবে নে। পরে শোধ দিস।

বরং বাবার হাতে দে।

টাকাটা আমার। আমি যাকে খুশি দেব।

বড়দা একটু ভেবে হাত বাড়াল, বড়ই সংকোচের সঙ্গে।

এখানে কত আছে?

দেড়শো।

তোকে নদু দিয়েছিল একটা স্যুট করাতে—সেই টাকাটা, না? স্যুটটা তো করালি না।

স্যুট পরলে আমাকে ভাল দেখায় না।

আর কত রইল তোর?

পাঁচশো দিয়েছিল, আরও কিছু আছে। মাঝেমধ্যে তুলেছি তো।

টাকাটা ভেঙে ফেললি, স্যুটটা আর হবে না।

বলে বড়দা ক্ষণকাল বাইরের দিকে চেয়ে রইল। নদু অর্থাৎ নন্দরানীর কথা এখনও সংসারে মাঝেমধ্যে নানা কথার মধ্যে এসে পড়ে। সে ছিল আমাদের একমাত্র বোন। বছর চারেক আগে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেছে। তার কথা উঠলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। আমার আর বড়দার মধ্যে নন্দরানী হঠাৎ একটুক্ষণের জন্য একটা শূন্যতার বলয় তৈরি করল। বড়দার হাতে ধরা নন্দরানীর দেওয়া টাকা। বড়দা বাইরের দিকে চেয়ে আছে। দোতলার জানালা দিয়ে কলকাতার পিঙ্গল আকাশ অনেকটা দেখা যায়।

জামাটা জবজবে হয়ে ভিজেছে। সেটা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখছি, এমন সময়ে বড়দা মুখ ঘুরিয়ে বলল, নেনটু, সব পরিবারেই একটা পারিবারিক বৃত্তি থাকা ভাল। পেট-ভাতের যেন অভাব না হয়। ভারতবর্ষের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একদিন হুড়মুড় করে সবটা ভেঙে পড়বে।

হুঁ।

বড়দা আকাশ দেখতে দেখতে অন্যমনে আবার বলে, কথাটা কিছুতেই কাউকে বোঝানো যাচ্ছে না। অথচ ওই দ্যাখ...

কী?

আকাশ দ্যাখ। মেঘের নামগন্ধ নেই। এ-মাসটা এ-রকম চললে মাটি জ্বলে যাবে। চাষা ভিক্ষে করতে আসবে শহরে। সামনের বছর ট্র্যানজিস্টার রেডিয়ো কিংবা রেফ্রিজারেটরের দাম কমতেও পারে। কিন্তু

চালের দাম কমবে না। ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে কী হয় তবে? ভারতবর্ষের ইকনমি কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে আছে—হা ভাত জো-ভাত করে মরছে মানুষ—আর বাজার ছেয়ে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গুডসে। বলদকে দুয়ে কি দুধ পাওয়া যায়? গত তিন-চার মাস আমি গ্রামে গ্রামে কম ঘুরিনি।

খামোখা ঘুরেছিস। আর ঘুরিস না। গ্রামের লোকেরা এখন বাইরের অচেনা লোক পছন্দ করে না।

বড়দা শ্বাস ফেলে বলল, ঠিকই। ওরা এখন সবকিছুকে সন্দেহ করে। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করে পলিটিক্সের কথা। ওদের নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। কিছু হয়নি।

তাতে তোর কী?

বড়দা হাসে, কিছু না। আমি গ্রামে ঘুরেছি কমিউন তৈরি করার জন্য নয়। আমি গেছি অন্য কারণে।

কী কারণ?

ভাবছিলাম, গ্রামে একটু জমি-টমি নিয়ে কিছু করা যায় কি না। যদি চাষ করা যায়, কি হাঁস মুরগি নিয়ে পোলট্রি করা যায়, কি কয়েকটা তাঁত চালানো যায়, তা হলে হয়তো না খেয়ে মরব না। সবাই মিলে করব। আস্তে আস্তে একটা পারিবারিক বৃত্তি তৈরি হয়ে যাবে।

আমি হাসলাম, আমাদের একটা পারিবারিক বৃত্তি তো আছে।

কী?

দাদু যা করত।

বড়দা হাসে, দাদুর যা ছিল তা আমাদের মধ্যে কার আছে? থাকলে কি এত ভয় পেতাম! সেই চোখ, সেই শরীর আর সাহস—ওগুলোও তো মানুষের অ্যাসেট। যার আছে সে আমার মতো একটা ধাক্কায় বসে যায় না।

তুই কি বসে গেছিস? ভাবছিস কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বড়দা মাথা নাড়ে, নেনটু, আমার সাহস নেই। দাদুর কিছুই আমি পাইনি। পেলে কি আমরা চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে থাকি?

তোর চাকরি তো যায়নি। ইউনিয়নের লোকেরা হয়তো এক দিন তাদের ভুল বুঝতে পারবে।

পারবে, কিন্তু ততদিনে হয়তো একশো বছর আর চারটে জেনারেশন পার হয়ে যাবে। তত দিন অপেক্ষা করতে বলিস?

কে যে ওর মাথায় কৃষির ব্যাপারটা ঢুকিয়েছে কে জানে! পারিবারিক বৃত্তি, কৃষি, পোলট্রি এইসব নিয়ে ও সারা দিন ভাবে। ভাবে, ভারতবর্ষের অর্থনীতির বৈষম্যের কথা, ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে ওর টাক পড়ে গিয়েছিল একসময়ে। এখন আর শহুরে ট্রেড ইউনিয়ন ওর পছন্দ নয়।

আমাদের বাসাটা দক্ষিণ কলকাতায় হলেও, পুরনো। বাবার মাসতুতো ভাই—আমাদের গিরিশকাকা উনিশশো ত্রিশ সাল থেকে এই তিন ঘরের দুই বারান্দাওয়ালা ফ্ল্যাটটায় পঁয়তাল্লিশ টাকার ভাড়াটে ছিলেন। বাবা রিটায়ার করে কলকাতায় এলেন যখন, তখন গিরিশকাকা পুঁটিয়ারিতে নিজস্ব বাড়ি তুলে ফেলেছেন। বাবাকে বললেন, তোমার যে চালচুলো কবে হবে কে জানে! যত দিন না হয় এ-বাড়িটা দখল করে থাকো। আমি থাকতে থাকতেই ঢুকে পড়ো। আমার নামেই ভাড়া জমা দিয়ো। বাড়িওয়ালা মামলা করে করুক, মামলা চলতে চলতে তোমার একখানা বাড়ি উঠে যাবে। আমরা এইভাবে এ-বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়িওয়ালা বিস্তর শাসিয়ে মামলা তুলল। মামলা এখনও চলছে। মাকালতলায় আমাদের জমিতে বাড়িটার ভিত গাঁথা হয়ে গেছে। বাড়িটা উঠেও যেত বর্ষার আগেই। কিন্তু বড়দা হঠাৎ বসে যাওয়ায় বাড়ির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যা বলছিলাম, এই বাড়িটার কথা। দোতলায় এই তিন ঘরের ফ্ল্যাট যদিও মন্দ না। তবু এর দেয়াল, দরজা আর ফাঁক-ফোকর দিয়ে এ-ঘরের কথা হাওয়ায় ভেসে অন্য ঘরে যায়। গত কয়েক রাত ধরে শুনি। পাশের ঘরে মাঝরাতে বড়দা বড়বউদির ঝগড়া হয় খুব। কাল রাতেও হচ্ছিল। বড়দা ছিল হাইস্কিলড অপারেটর, ওভারটাইম নিয়ে মাসে হাজার টাকার মতো রোজগার। তার প্রায় সবটাই ঢেলে দিত সংসারে। এক পয়সাও জমায়নি। হঠাৎ রোজগার একদম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সম্পর্কগুলো ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। কিছুদিন আগেও বড়দা রাত জেগে বউদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কুফলের কথা বোঝাত। আমি ঘুম ভেঙে শুনতাম বড়দা বক্তৃতা দিচ্ছে- ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল ভারতবর্ষের বাজার। আমরা তৈরি করি রুম এয়ারকন্ডিশনার।

এ-জিনিসের চাহিদা আছে, কোম্পানিও আছে অনেক। চাহিদা মতো জোগান দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু দেশটা উন্নত নয়, সেই হেতু এটা ঘরে ঘরে লোক কিনবে না। কিনবে কিছু বড়লোক, অফিস-কারখানা, সিনেমা হল। দশ-বিশ বছর পরে বাজার যাবে স্যাচুরেটেড হয়ে, চাহিদা কমে যাবে। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারেই তখন মালিক হয় প্রোডাকশন কমাবে, নয়তো বন্ধ করবে। তখন ছাঁটাই হবে শ্রমিক, হবে লক আউট, বেকারে ভরে যাবে দেশ। ভারতবর্ষে হাজারটা ইন্ডাস্ট্রির ওপর ওই খাঁড়া ঝুলছে। ফলে ইউনিয়ন শ্রমিককে ডেকে বলছে—কাজ কম করো, প্রোডাকশন কমাও, বাজার যাতে স্যাচুরেটেড হয়ে না যায়, এটা তোমারই স্বার্থে। কিন্তু এটা হল নেতিবাচক পন্থা। এখন বলো তো রাণু, ইতিবাচক পন্থাটা কী?

বউদি শিশুর মতো জিজ্ঞেস করত, কী গো?

বড়দা তৃপ্ত গলায় বলত, কৃষি, গ্রাম। গ্রাম শুষে তৈরি হচ্ছে শহর। শহরে জড়ো হচ্ছে যাবতীয় মূলধন। তৈরি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেট। শহর ছাড়া ইন্ডাস্ট্রির বাজার নেই। অথচ যার চোখ খোলা আছে সেই দেখতে পায়, ভারতবর্ষের সমস্ত ইকনমিটা দাঁড়িয়ে আছে কৃষির ওপর, এর মেরুদণ্ড হচ্ছে গ্রাম। তবু আমাদের গ্রামগুলিতে কিছুই নেই। কৃষিপণ্য চলে আসে শহরের বাজার ধরতে, কামার কুমোর বৃত্তি ঘুচিয়ে ছোটে শহরে, কারখানায়। শহর থেকে গ্রামে কী যায়? কিছু আয়না, চিরুনি, টর্চবাতি, বড়জোর কিছু জামাকাপড়। অর্থাৎ গ্রামে ইন্ডাস্ট্রির কোনও বাজার নেই। বাজার তৈরি হয়নি, কারণ এখানে হয়নি কৃষি বিপ্লব, কুটিরশিল্প মেরে ফেলা হয়েছে। পেটে ভাত না থাকলে হাতপাখার কথাই ভাবা যায় না তো এয়ারকন্ডিশনার।

ভয় পেয়ে বউদি জিজ্ঞেস করেছে, তা তুমি কী করতে চাও?

বড়দা বিষণ্ণ গলায় বলেছে, আমি পার্টি মিটিঙে এইসব বলতে চেয়েছিলাম। ওরা মনে করল, আমি উগ্রপন্থী। ওদের ধারণা হল, আমি হয়তো স্ট্রাইক বানচাল করব। মালিকের সঙ্গে হাত মেলাব। ওরা স্পষ্টই বলল, কৃষি ফ্রন্টের জন্য ভাববার লোক আছে। আমি যেন ও-সব নিয়ে মাথা না ঘামাই। আমি তবু বললাম, পার্টির সব ক্ষমতা নিয়ে আগে কৃষি বিপ্লব করে নেওয়া দরকার। তাতে বাজার বড় হবে, শহরে ও গ্রামে আসবে অর্থনৈতিক সমতা। দেশের প্রয়োজনমতো ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে না, হচ্ছে বিদেশের অনুকরণ—গ্রামীণ ভারতবর্ষকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কৃত্রিম অর্থনীতির দিকে। এইসব কথা শুনে ওরা আমাকে প্রথমে ওয়ার্নিং দিল। কিন্তু আমি আমার কথা বলতে লাগলাম। ইউনিয়নের কিছু লোক আমার দলে এল। সেই হল সর্বনাশ।

বউদি তখন খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, ওরা তোমাকে খুব মেরেছিল। মাগো! ভাল কথা বললেও লোকে আজকাল উলটো বোঝে।

বড়দা হাসে, ওরা আমাকে কারখানার ছায়া মাড়াতে দেবে না আর। না দিক। আমি হাইস্কিলড অপারেটর, ইচ্ছে করলেই চাকরি পেয়ে যাব। কিন্তু রাণু, আমি আর ইন্ডাস্ট্রিতে থাকছি না। আমি চলে যাব গ্রামে। তাই আমি ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলো দেখছি।

বউদি তখন আর কথা বলে না।

আমাদের বাসাটার এই হচ্ছে দোষ। এ-ঘরের কথা ও-ঘরে শোনা যায়। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। ওরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকত। আবার কখনও এক রাতে শুনতাম, বউদি বলছে, তার চেয়ে দাদাকে চিঠি লিখি। দুর্গাপুরে তোমার একটা চাকরি হয়ে যাবে।

বড়দা রেগে গিয়ে বলত, তোমাকে এতদিন বোঝালাম কী? চাকরি করলে তোমার ইঞ্জিনিয়ার দাদার লেজ ধরতে হবে কেন? আমাকে চাকরি দেওয়ার লোক আছে।

বউদি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকত, তারপর একসময়ে হঠাৎ ফোঁপানির শব্দ পেতাম। বউদি বলত, তোমার চার বছর বিয়ে হয়েছে। দু'টো ছেলেমেয়ে—কোন আক্কেলে তুমি পলিটিক্স করতে যাও? আমি তোমার সঙ্গে গ্রামে জঙ্গলে যেতে পারব না, আমি বাপের বাড়ি যাব। তুমি যেখানে খুশি যাও।

এইভাবে সম্পর্ক ওলট-পালট হতে লাগল।

এক ঘরে দুটি চৌকিতে ছোড়দা আর আমি শুই। রাতে খাওয়ার পর ছোড়দা চৌকিতে বসে সিগারেট শেষ করে বোধহয় কিছুক্ষণ মালার কথা ভাবে। তারপর নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমার ঘুম

বরাবর পাতলা। একটু শব্দেই জেগে যাই। রোজ রাতে পাশের ঘরের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে গেলে আমি অন্ধকারে শুয়ে সম্পর্ক বদলের নাটকটি শুনি। শুনতে পাই, বউদি আর বড়দার ভিতরে টাকা নিয়ে কথা উঠেছে। আগে টাকার কথা থাকত না, আদর্শের কথা থাকত।

গতকাল রাত্রে বউদি বলছিল, তুমি কতদূর ছোটলোক হয়ে গেছ জানো না? পশু না হলে কেউ ওটুকু বাচ্চাকে বেবি ফুডের বদলে শটি কিংবা বার্লি খাওয়াতে বলে? ওর শরীরে আছে কী দেখ তো। আগে আপেল সেদ্ধ খেত, ভিটামিন ড্রপস খেত—এখন কী খায়?

বড়দা উত্তর দিতে পারছিল না। বিড়বিড় করে কী বলল।

বউদি ঝেঁঝে উঠল, দেশের হাজার হাজার বাচ্চা কী খাচ্ছে তা দেখে আমার কী হবে! আমি আমার বাচ্চা বুঝি। ও-সব বোলো না—যাদের মুরোদ নেই তারা বলে।

আমি শুয়ে শুয়ে ভাবি। বড়দার দুই ছেলেমেয়ে। বাবা রিটায়ার করেছেন দশ-বারো বছর। ছোড়দা শিগগিরই মালাকে বিয়ে করবে—চলে যাবে আলাদা বাসায়। নন্দরানীর দেওয়া পাঁচশো টাকার মধ্যে আর মাত্র শ'দুই অবশিষ্ট আছে—স্যুটটা হবে না।

বরাবর বড়দা একটু খোলামেলা সরল মানুষ। নাদুসনুদুস চেহারা—অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যায়। যে রাতে ও মার খেয়ে এল সেই রাতে ওর অসহায় মুখখানা আমার বরাবর মনে থাকবে। সমস্ত মুখটা ফেটে কেটে একাকার, মাথার চুল রক্তে জড়িয়ে আছে। রক্তবর্ণ দুটো ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। শ্লিং-এ বাঁধা হাত। খুব মার খেয়েছে, পালাতে পারেনি। দুই চোখে আতঙ্ক, দিশেহারা ভাব।

কাল সারা রাত খুব ছটফট করেছি ঘুমের মধ্যেও। আজ টাকাটা তুলে আনলাম। আর পঞ্চাশ টাকা রইল।

বড়দা আজকাল খরার পিঙ্গল আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকতে ভালবাসে।

বেরোতে যাচ্ছিলাম, সিঁড়ির মুখে বউদি এসে ধরল।

শোনো, দাদাকে টাকা দিলে?

নীরবে হাসলাম।

আমি দেখেছি। কিন্তু কাজটা ভাল করোনি নেনটু।

কেন?

এ-সময়ে ওর হাতে টাকাটা পড়া ঠিক হয়নি। ওর চোখ-মুখের ভাব ভাল না। ও নেশা করবে।

কী করে বুঝলে?

আগে একটু-আধটু করত। তোমরা টের পাওনি, কিন্তু আমার কাছে তো লুকোনো চলে না।

উলটে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলাম, লুকোনো চলে না কেন?

বউদি হাসল, তুমি বড় পাজি নেনটু।

আমরা সবাই পাজি। জানো না এটা ডাকাতের বাড়ি! আমরা ডাকাতের বংশ।

এখন জানি। আগে জানতাম না।

জানলে কী করতে?

বউদি হাসল, সত্যিকারের ডাকাত জানলে খুশি হয়ে বিয়ে করতাম। কিন্তু তোমার দাদা তো তা নয়।

তুমি খুশি হয়ে বিয়ে করোনি?

বউদি ভ্রূ কোঁচকায়, বাব্বাঃ, অত জেরার উত্তর দিতে পারি না আমি।

দাদার নেশার কথা কী বলছিলে?

বলছিলাম আগে খেত। ইদানীং পলিটিকসের নেশা ছিল, তাই খেত না। কিন্তু এখন নিষ্কর্মা, কিছু করতে পারছে না, মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তা। এখন ওর নেশা করা দরকার।

চিন্তা করতে দাও কেন?

কী করব?

খুব আদর করতে পারো না—আদরে আদরে ডুবিয়ে দিয়ো। চিন্তা করার ফাঁক পাবে না।

বউদি হাসে, খুব আদরের স্বপ্ন দেখছ যে!

তারপর একটু শ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মুখে বলল, আমাদের আগের কি সে তেজ আছে! আমরা পুরনো হয়ে গেছি।

তবে দাদার আর-একটা বিয়ে দিই।

দিয়ো। কিন্তু এখন তার চেয়ে জরুরি কাজ, চাকরিতে তোমার দাদাকে রাজি করানো। আমি দুর্গাপুরে চিঠি দিয়েছি। দাদা হয়তো একবার আসবে। ও তোমার দাদাকে বোঝাবে, কিন্তু তার আগে তোমাদেরও উচিত ওকে একটু বোঝানো। কৃষি বিপ্লব করতে এই বুড়ো বয়সে ও সাপ জোঁক শেয়ালের রাজত্বে যেতে চাইছে—মাগো, ভাবতে পারি না।

দাদা বুঝবে না, আমি জানি।

বউদি অসহায়ভাবে রেলিংটা চেপে ধরে বলল, তবে কী হবে?

অদ্রিকে লিখে দাও, যেন না আসে। এসে লাভ নেই।

এই বলে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। অদ্রি! কেন যে অদ্রির ওপর আমার একটা রাগ তা আমি বলতে পারব না। ওর সঙ্গে প্রথম দেখা দাদার বিয়ের দিন। ফুটপাথের ওপর প্যান্ডেল, চেয়ারে বসে অনভ্যস্ত ধুতি পাঞ্জাবি পরে ঘামছি। সেই সময়ে ভারী সুন্দর স্বাস্থ্যের চটপটে একটি আমার বয়সি ছেলে ঘুরে ঘুরে সবাইকে কোকোকোলা আর সিগারেট দিচ্ছিল। ধুতি আর ক্রিমরঙা পাঞ্জাবিতে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল কী বলব! কিন্তু সুন্দর কিছু দেখলেই আমার মন শক্ত হয়ে ওঠে। সে আমার কাছে কোকোকোলার ট্রে আনল, আমি নিলাম না। সে টপ করে একটা সিগারেট আমার বুক পকেটে ঢুকিয়ে মৃদু হাসল, বাইরে গিয়ে খাবেন। আমি শান্তভাবে সিগারেটটা তাকে ফিরিয়ে দিই। ছেলেটা একটুও অপমান বোধ করল না। বলল, মাপ করবেন, ঠিক বুঝতে পারিনি। মেয়েদের ভিড়ে সে দিব্যি ঘুরে ফিরে এল। অচেনা ভদ্রলোকদেরও আপ্যায়ন করল সুন্দর বিনয়ের সঙ্গে। সবাই তাকে দেখছিল তখন। হয়তো অদ্রির অসম্ভব সৌন্দর্য আর স্মার্টনেস আমি ভুলেই যেতাম। কালক্রমে তার সঙ্গে আমার ভাব হলেও হতে পারত। কিন্তু গোলমাল করল একটি সুন্দর মেয়ে। লাল বেনারসি, উঁচু খোঁপায় মালা পরা মেয়েটি বার বার ভিতর থেকে ছুটে আসছিল অদ্রির দিকে। কী একটু কথা বলে আবা র দৌড়ে চলে যাচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম ওদের আত্মীয়া। বোন-টোন কেউ হবে। খেতে বসে সেই ভুল ভাঙল। আমরা বরযাত্রী বেশি ছিলাম না। বরযাত্রীদের ব্যাচে অনেক জায়গা খালি দেখে নিমন্ত্রিতরা বসে পড়ল। উলটো দিকে একটা টেবিলে মেয়েরা। তাদের মধ্যে সেই মেয়েটিও। আমার ডান পাশে কয়েকজন ছেলে। পরে জেনেছিলাম, তারা অদ্রির বন্ধু। তারা বসেই মেয়েদের আলোচনা করছিল। একজন বলল, আজ অদ্রির জিত। মঞ্জুকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি শুনে মেয়েদের সারিতে কোন জন মঞ্জু তা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে অদ্রি মাংসের বালতি নিয়ে এক পা এক পা করে হেঁটে আসছিল। কাছে আসতেই একজন বন্ধু বলল, মঞ্জুকে ঠিকমতো দিয়েছিস অদ্রি?

দিয়েছি।

কখন দিলি, দেখলাম না তো!

সব জিনিস কি সবাইয়ের সামনে দেওয়া যায়!

কথাটা অশ্লীল এবং চাপা গলায় বলা। তবু আমার কানে এল। অমনি সেই জ্বালা। সারা গায়ে শুঁয়োপোকার রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। রি-রি করছিল শরীর। শক্ত হয়ে এল হাত পা। ইচ্ছে হল উঠে ঠাস করে একটা চড় দিই। কিন্তু সামলে গেলাম। নিজেকে বললাম, সোম, তোমার কী? তোমার কী?

মাংসের বালতি নিয়ে অদ্রি এগোতে পারছিল না। বন্ধুরা ওর হাত ধরে তখনও কী সব ঠাট্টা করছে। অদ্রি তখন মুখ ফিরিয়ে সেই সুন্দর মেয়েটিকে বলল, মঞ্জু, এরা কী সব বলছে!

মেয়েটি সপ্রশ্ন চোখে একটু তাকাল। তারপর হঠাৎ কী বুঝে মাথা নামিয়ে নিল লজ্জায়। মেয়েদের সারিতে হাসির ধুম পড়ে গেল। আমি বুঝলাম, ওই সুন্দর মেয়েটি—ও অদ্রির জন্য।

দু' পা এগিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল অদ্রি। প্রকৃত ভদ্র গলায় বলল, আপনি ভীষণ ঘামছেন। পাখার তলায় বসলেন না কেন?

আমি উত্তর দিলাম না।

অদ্রি এক হাতা মাংস আমার পাতে দিতেই আমি হাত চাপা দিয়ে বললাম, আর না।

অদ্রি অবাক হল, কী, মাংস খাবেন না? মাংস ছাড়া এ-বয়সে আর খাওয়ার কী আছে?

মাংস! কথাটা বিঁধে গেল আমার কানে। ওর বন্ধুরা হাসছিল। একজন গলা বাড়িয়ে বলল, খান মশাই। মাংসই তো আসল জিনিস।

আমি বললাম, আমি মাংস বেশি খাই না।

অদ্রি ঠাট্টা করে বলল, সেই জন্যই তো রোগা।

বুঝলাম, অদ্রি আমাকে খুব বেশি লক্ষ করছে। ওর দেওয়া কোকোকোলা আর সিগারেট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সেইজন্যই কী? ও কি আমাকে আঘাত করতে চেষ্টা করছে?

আমি চোখ তুললাম। আমার ঠাকুরদার সেই ক্রূর চোখ—যা আমি জন্মসূত্রে পেয়েছি। যে চোখ আগুনের স্বপ্ন দেখত।

শান্ত অবাক গলায় বললাম, রোগা!

চোখ বড় করে অদ্রি বলল, আপনি রোগা নন! তবে কি মোটা?

ঠাট্টা, কিন্তু কথাটা সে বেশ জোরে বলল। এত জোরে যে মেয়েদের সারি থেকে মেয়েরা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। সেই সুন্দর মেয়েটাও।

অমনি আবার সেই জ্বালা। শুঁয়োপোকার রোঁয়া সারা গায়ে। রি রি করছে শরীর। রাগে অন্ধ জন্তুর মতো হয়ে যাচ্ছে আমার ভিতরটা।

আমি আর-এক বার শান্ত অবাক গলায় বললাম, রোগা! তারপর তার দিকে চেয়ে রইলাম স্থিরভাবে। গর্তে ঢোকা আমার ক্রূর চোখে। ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু হচ্ছিল। কিন্তু আমার কিছুই খেয়াল ছিল না। আমি শুধু অদ্রির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আমার পাশে বসেছিল আমার পিসতুতো ভাই। সে আমার হাত চেপে দিয়ে বলল, নেনটু, এই নেনটু, কী হচ্ছে?

আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। চোখ নামিয়ে নেওয়ার পরই আমার ভীষণ লজ্জা করছিল। আশেপাশের লোকজন তখনও আমায় দেখছে। ঠিক তখনই অদ্রি সপ্রতিভভাবে আমার সামনে থেকে সরে গেল। অমনি যেন সব আড়াল খসে গেল আমার ক্রূর ফণা-তোলা মুখের সামনে থেকে। মেয়েদের সারি থেকে মেয়েরা কৌতূহলে আমাকে দেখছে। চোখ না তুলেও আন্দাজ করছিলাম সেই সুন্দর মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার অদ্রির দিকে কে এমন লোক নিষ্ঠুর চোখে তাকায়?

বিদায় নেবার সময়ে আমি ইচ্ছে করেই সবার আগে বেরিয়ে আসছিলাম। কিন্তু গেটের মুখে অদ্রি দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে পান আর সিগারেটের ট্রে। আমি নিঃশব্দে তাকে পেরিয়ে আসতেই সে অন্য একটি ছেলের হাতে ট্রে-টা ধরিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে আমাকে ধরল।

আমাকে মাপ করবেন।

কেন?

অদ্রি হাসল, আমি জানতাম না যে, ইউ হ্যাভ বিন এ রেপুটেড বক্সার।

তাতে কী?

কিছু না? বলুন, আপনি কিছু মনে করেননি।

আমি শান্ত গলায় বললাম, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

শুনে খুশি হল অদ্রি।

বলল, আমার দু'জন জ্ঞাতি ভাই এসেছে। তারা আপনাকে চেনে, লড়াই দেখেছে। তারা বলছিল। শুনে খুব অবাক হলাম। আমি নিজে স্পোর্টসম্যান।

এই রকম অনেক কথা বলেছিল অদ্রি। আমার অত মনে নেই। কিন্তু অদ্রি বোধহয় আজও আমার একটা কথার অর্থ বুঝতে পারেনি। ওই যে বলেছিলাম, আমি কিছু মনে করিনি কিংবা আমি সব ভুলে যাব। প্রকৃতপক্ষে কথাটা আমি বলেছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আমি বলতে চেয়েছিলাম—যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, এখন আর কিছুই ফেরানো যাবে না। আমি ভুলব না। আমি শোধ নেব।

সেই দিন রাতে সবাই ঘুমোলে আমি চুপি চুপি বাইরের বারান্দায় এসে আমার বালির বস্তাটা দুলিয়ে দিলাম। অন্ধকারে দানবের মতো বস্তাটা দুলছিল। আমি তার মুখোমুখি শরীর দিয়ে দাঁড়ালাম।

চার বছর আগের ওই বাক্যের যা অর্থ ছিল আজ অবশ্য আর তা নেই। কথাটা এভাবেই বলা যায় যে, অদ্রির ওপর আমার শোধ নেওয়ার আর কিছু নেই। চার বছর আগে আমার বয়স কম ছিল, তখন অদ্রি আর আমি প্রায় সমকক্ষ। তখন শোধ নেওয়ার কথা ভাবতে ভাল লাগত! এখন অবস্থা পাল্টে গেছে। অদ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেই চাকরি পেয়ে দুর্গাপুরে গেল। দু' বছরের মধ্যেই উন্নতি করল। কয়েক সপ্তাহ আগে গাড়ি কিনে নিয়ে গেল। সেই গাড়িতে বউদি আর তার ছেলেমেয়েকে একদিন ঘুরিয়ে দিয়ে গেল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। বউদি আর বাচ্চাদের মুখের সেই উজ্জ্বলতা আমার এখনও মনে আছে। সুন্দর ক্রিমরঙা গাড়ি। অদ্রি আরও মোটা আর সুন্দর হয়েছে। একটুক্ষণের জন্য এসে বসেছিল আমাদের বারান্দায়। বালির বস্তাটা দেখিয়ে বলল, এখনও ভোলোনি?

কী?

বক্সিং।

ভুলিনি। মনেও রাখিনি। কী ভেবে বললাম, কে জানে!

তবে ওটা কেন?

অভ্যাস। স্মৃতিচিহ্ন। ওটা ছাড়া আমার কিছু নেই।

অদ্রি খুব হাসল। উঠে গিয়ে খালি হাতে দুটো ঘুঁষি মারল বস্তাটায়। মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি সব ভুলে গেছি। কী ভেবে বলল, কে জানে?

কী?

খেলাধুলো। সেদিন ক্রিকেটে নামলাম অফিসের ম্যাচে। দশ রানের মাথায় বোলড। বল দেখতেই পাচ্ছিলাম না। সব গেছে।

এ-রকমই দু'-চারটে কথা। তারপর অদ্রি চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ নিজের মনের অন্ধকারে ডুবে রইলাম। রিঙের বাইরে আমি কদাচিৎ কাউকে মেরেছি। অদ্রি আমার রিঙের অনেক বাইরে চলে গেছে।

প্রতিশোধের কথাটা আর মনে রেখে লাভ নেই। ওটা এখন ছেলেমানুষি। তবু কেন যে অদ্রির ওপর আমার একটা রহস্যময় রাগ রয়ে গেছে! হাতে কাজকর্ম না থাকলে মাথায় এ-সব ভূত এসে বসে। বসে বসে ঠ্যাং দোলাই!

আকাশের রং পাঁশুটে। নীল দেখা যায় না। খুব ধুলো ওড়ে আজকাল। শুকনো দমকা হাওয়া বয়ে যায়। সেই হাওয়ায় মালার রুক্ষ চুল উড়ছে। মোড়ের মাথায় রাস্তা পার হচ্ছে মালা, হাতে স্বরবিতানের দুটো খণ্ড। এলোমেলো শাড়ি, ফোলা-ফোলা মুখ। গোলাপি রঙের বাড়িটার দোতলায় ওরা থাকে। বাড়িতে ঢুকবার মুখে একবার অলস ভঙ্গিতে ঘাড় ঘোরাতেই আমাকে দেখল।

দাঁড়াল।

আমাকে দেখে দাঁড়ানোর কথা নয় মালার। অনেকদিন আগে এক মালা ছিল যে বক্সিং-এর কিছুই বুঝত না, তবু বক্সিং ভালবাসত। নাকি উলটো বললাম? বক্সারকে ভালবাসত বলে বক্সিংকেও? কে জানে! এ-সব রহস্যের কোনও কিনারা হবে না। তবু একদা এক মালা ছিল যে বক্সিংকে ভালবাসত, বক্সারকেও। তখনও এ-রকম রাস্তায় দেখা হত, কিংবা হয়তো মালা থাকত দোতলার বারান্দায়, আমি রাস্তায়। দেখা হত, যেমন কলকাতায় সচরাচর হয়। তখন ভারী সুন্দর এক বিচিত্র ববছাঁটে চুল ছাঁটত মালা, বাঁকা সিঁথি করত, কম্বিনেশন ফ্রকের নীচে দু'টো মসৃণ পা জুতো-মোজা পরে হেঁটে যেত। মুষ্টিযোদ্ধার মজবুত হৃৎপিণ্ডও ধক ধক করে নড়ে উঠত।

সেই মালা ওই দাঁড়িয়ে আছে, হাতে স্বরবিতানের দুটো খণ্ড। আমার ছোড়দা রবীন্দ্রসংগীত ভালবাসে। মালা দক্ষিণীতে শিখছে।

আমাকে দেখে মালার দাঁড়ানোর কথা নয়। তবু দাঁড়াল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওকে দাঁড়াতে বা তাকাতে দেখলে এখনও আমার হৃৎপিণ্ড ধক ধক করে। বেলা সাড়ে এগারোটার রোদে ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টকটকে ফরসা রং লালচে আভা দেয় রোদে। কপালের ওপর আঠা-ঘামে আটকে আছে চুলের গুচ্ছি। একদা ও নন্দরানীর সঙ্গে ভাব করে আমাদের বাসায় এসেছিল বক্সারকে দেখতে। মুগ্ধ

হয়েই দেখত, আমি বালির বস্তার চারধারে নানা স্ট্যান্স নিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুঁষি মারতাম। লহরার তবলায় যেমন চলে দ্রুত আঙুল, তেমন দ্রুত চলত আমার দুই হাত। কিন্তু বাস্তবিক ঘুঁষি ছাড়া মালাকে আর কিছুই দেখাবার ছিল না। তখন মাঝে মাঝে কাগজে আমার নাম থাকত, গ্রুপ ফোটোতে বেরোত ছবি। সেইসব কাটিং এখনও মালার কাছে আছে হয়তো। সেগুলো আর সে বোধহয় খুলে দেখে না। স্বরবিতান খুঁজে ছোড়দার প্রিয় গানগুলি হয়তো চিহ্নিত করে রাখে সেইসব বাজে কাগজে।

মুখোমুখি হতেই মালা বলে, সোম, মা তোমাকে এক বার ডেকেছে। সময়মতো যেয়ো।

কেন?

কে জানে! ও উদাস গলায় বলল। মুখ ফিরিয়ে নিল। দরজা পেরিয়ে ভেতরের অন্ধকারে চলে গেল, সিঁড়ি ভাঙতে লাগল আস্তে আস্তে।

কোনও কিছু না-ভেবেই আমি ওর পিছু পিছু ঢুকলাম। সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম আস্তে আস্তে।

চার সিঁড়ি ওপর থেকে ও একবার মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখল।

কিছু বলার নেই, তবু ডাকলাম, মালা।

উঁ! ও দাঁড়াল। মাঝ-সিঁড়িতে।

এরপর কী বলব? না ভেবে তাড়াতাড়ি বললাম, নতুন গান তুলেছ?

হুঁ।

কী গান?

ও হাসল। দুটি গজদন্ত, গালে টোল। একটু ভারী হয়েছে মালা। আর কিছু পালটায়নি। বলল, কী ভাগ্য!

কেন?

তুমি গানের খোঁজ করছ।

কেন, আমি গান বুঝি না?

বোঝো?

বুঝি।

ভালবাসো?

বাসি।

কী ভাগ্য! এসো, শোনাব।

মালা মুখ ফিরিয়ে উদাসিনীর ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। ওর চার সিঁড়ি পিছনে আমি—সতর্কভাবে উঠতে লাগলাম। শেষ ধাপে পা দেওয়ার আগে মালা এক বার দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বলল, একটা কথা বলি।

কী?

বিয়ের পর কিন্তু আমাকে মালা বলে ডেকো না। বিশ্রী শোনাবে।

ডাকব না। বউদিই ডাকব, যদি চান্স পাই।

তার মানে?

বিয়ের পর তো তোমরা আমাদের সঙ্গে এক বাসায় থাকবে না।

মালার ভ্রূ কুঁচকে গেল। দাঁতে ঠোঁট চাপল সে। তারপর বলল, সে-সব তোমার ছোড়দা জানে।

বলে মালা বারান্দায় উঠে তেমনই অসল উদাস ভঙ্গিতে তার ঘরের দিকে চলে গেল, ফিরেও তাকাল না।

আনাজের খোসা ফুটপাথে ফেলে মালার মা ফিরে আমাকে দেখলেন।

সমু, সত্যর কী খবর বলো তো! ও কি আর চাকরি করবে না?

কী জানি! ঠিক নেই।

ওমা, জানো না কী! বিয়ে করেছে, দু'টো ছেলেমেয়ে, ঘরে আর রোজগেরে মানুষ তো একমাত্র নিতু—সংসার চালাতে হবে না?

তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ আমি অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ আমার বড়দা সত্যসুন্দর যদি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকে তবে সংসার ভদ্রতাবশে চালাতে হবে আমার ছোড়দা নিত্যসুন্দরকে। যদি তাই হয়, তবে আমার ছোড়দা নিত্যসুন্দর কোন ভরসায় আগামী মাঘ মাসে মালাকে বিয়ে করবে? এতটা অনুমান করে আমি তাঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বললাম, বড়দা এখানে থাকবে না। গ্রামেটামে চলে যাবে হয়তো। সেইরকমই শুনেছি।

ওমা, সেটাই বা কীরকম কথা! তা হলে মা-বাবাকে দেখবে কে? সংসার তো ওর ভরসাতেই চলত, মোটা মাইনের চাকরি। নিতু কীই বা পায়, তার নিজেরই চলে না।

এ-সব কথার কোনও উত্তর হয় না। বুঝলাম, আমার ছোড়দা নিত্যসুন্দর খুব মুশকিলে পড়েছে। এখন এ-অবস্থায় মালাকে বিয়ে করে আলাদা হওয়াটা বড় দৃষ্টিকটু। মুশকিলে পড়েছেন মালার মা-বাবাও। ভেবে দেখলে, সত্যসুন্দর—আমার বড়দা—একটা আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কলকাতা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত বিস্তর মানুষকে বিপদে ফেলেছে। তার কাণ্ডজ্ঞানের এই অভাব নিয়ে নিত্যসুন্দর—আমার ছোড়দা—প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার সময়ে মালাদের বাড়িতে বিস্তর অভিযোগ জানিয়ে যায় বোধহয়!

মালার মা বললেন, এই বয়সে সত্যর এ-সব কী কাণ্ড! তোমরা ওকে বুঝিয়েসুঝিয়ে দেখো না। ছেলেমেয়েগুলোর মুখ চেয়ে যদি মনটা ফেরে!

আমি উত্তর দিলাম না।

তখন তিনি বললেন, তোমার জন্য একটু পায়েস রেখেছি। কাল মালার জন্মদিন গেল। আজকাল তো তোমাকে দেখিই না। খুব রাস্তায় রাস্তায় ঘোরো বুঝি? চাকরিবাকরির চেষ্টা করছ না! খেলোয়াড়রা তো খুব চাকরি পায় শুনি। এসো, ঘরে এসো।

জালের আলমারি থেকে পায়েসের বাটি বের করে একটু শুঁকে বললেন, না, নষ্ট হয়নি। জলের বাটিতে বসিয়ে রেখেছিলাম, তবু ভয় করছিল যদি নষ্ট হয়ে যায়! যা গরম পড়েছে, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। খাও, পুরু সর পড়ে আছে।

বেরোবার সময়ে মালার মা আমাকে বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। ফাঁকা বারান্দাটা পার হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে হঠাৎ দেখি মালার ঘরের সামনে বারান্দার রেলিঙে বসে ঝগড়া করছে কয়েকটা চড়াই। তার ও-পাশে বিবর্ণ গাছপালা, আর ধু ধু আকাশ। মালার ঘরটা একটেরে, নির্জন। হলুদ পরদা উড়ছে হাওয়া। ওই ঘরে, নির্জনে, একাকিত্বে কী করছে মালা?

দেখব? এক বার দেখা করে যাব? বহুকাল মালার সঙ্গে একা কথা বলিনি।

মালা একটুও চমকাল না। মুখ ফিরিয়ে বলল, এসো।

অবাক হয়ে বললাম, আসব?

মালা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে স্বরবিতানে গান খুঁজছিল। শাড়ি গুছিয়ে উঠে বসে বলল, ওমা! আসবে না কেন? তোমাকে যে গান শোনানোর কথা ছিল আমার!

হাসলাম, তাই তো!

মালা ভ্রূ কুঁচকে হেসে বলল, তার মানে, গানের কথা তোমার মনে ছিল না।

পাছে গান ভালবাসি না ভেবে মালা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার না-করে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, না, না, ভুলিনি। মাঝখানে হঠাৎ বড়দার কথাটা এসে পড়ল বলে একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। তার ওপর অমন সুন্দর পায়েস! বাসি পায়েসের সর আমি বরাবর ভালবাসি। আমাদের বাসায় বহুদিন ও-সব হয় না, কতকাল খাইনি—

মালা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মা মাথা ঘামান তা আমার পছন্দ না। তবু কেন যে মা—

আমি আবার তাড়াতাড়ি বললাম, তা কেন মালা? আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার মাসিমার আছে। কারণ এর সঙ্গে তোমার ভালমন্দ জড়িয়ে।

মালা একটা শ্বাস ফেলে বলল, কী জানি সমু, নিজেকে সবসময়ে আমার অপরাধী ভাবতে ভাল লাগে না।

তুমি নিজেকে অপরাধী ভাববে কেন?

ও আবার উদাস হয়ে গেল, বলল, কী জানি!

বললাম, তুমি বরং গান গাও।

মালা দাঁতে ঠোঁট চেপে একটু বাইরের দিকে চেয়ে রইল। অন্যমনস্ক। সেইরকম অন্যমনস্ক হাতেই হারমোনিয়ামের রিডে চাপ দিল। দামি হারমোনিয়ামের মিঠে আওয়াজে ভরে গেল ঘর। কিন্তু মালা গান গাইছিল না, বাজিয়েই যাচ্ছিল, বাজিয়েই যাচ্ছিল। অন্যমনে। শ্লথ বসবার ভঙ্গি। রুক্ষ চুল কাঁপছে ফ্যানের বাতাসে। ফরসা মুখখানায় খরার আকাশের আভা এসে পড়েছে। চোখের পাতা আধা বুজে আছে।

বাজাতে বাজাতে এক সময়ে ও আমার দিকে তাকাল। একটু হাসল। তারপর হাসতে লাগল। হাসতেই লাগল। হারমোনিয়াম ছেড়ে হঠাৎ আঁচল চাপা দিল মুখে। বলল, মাগো!

অপ্রস্তুত মুখে বললাম, কী হল?

অনেকক্ষণ হেসে মালা সামলে নিয়ে স্মিতমুখে বলল, ওইরকমভাবে চোরের মতো বসে, শরীর কাঠ করে, ভয়ে ভয়ে বসে কেউ গান শোনে? তুমি যে গানের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছ। থাক গে, তোমার শুনে কাজ নেই। গান তোমার প্রিয় নয়, সমু। আমি জানি। শুনতে চেয়ে বিপদে পড়েছ।

কথাটা সত্যি। আমি কাঠ হয়ে বসে আছি। গানবাজনার আমি তেমন কিছু বুঝি না সত্যি। কিন্তু সেজন্য নয়। মালার সঙ্গে এমন একা কিছুক্ষণ আমি বহুকাল কাটাইনি। কিন্তু আর বসে থাকার মানে হয় না। আমি ধরা পড়ে গেছি।

উঠে বললাম, চলি।

আমার সামান্য একটু অপমান বোধ হচ্ছিল। চলি—এই কথাটার মধ্যে বোধহয় সেই অপমানের রেশ থেকে থাকবে।

মালা তার সুন্দর মুখখানা ফিরিয়ে বিপন্ন গলায় অসহায়ভাবে বলল, সত্যিই আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে না সমু।

একটু হেসে বললাম, ঠিক আছে।

মালা গলায় ঝাঁঝ দিয়ে বলল, না, ঠিক নেই। তুমি কেন গান শুনতে চাইলে? তোমাকে কি ও-সব মানায়?

অবাক হয়ে বললাম, মানায় না কেন?

মালা মাথা নেড়ে বলল, সবাইকে সবকিছু মানায় না। তুমি ভরদুপুরে একটা মেয়ের সামনে অসহায়ভাবে কাঠ হয়ে গান শোনার জন্য বসে আছ—মাগো—ভাবতেই পারি না।

তবে আমাকে কী মানায়?

মালা হাসল। একদৃষ্টে একটুক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপরই হঠাৎ আবার উদাস হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, কী জানি!

কী জানি! ওই কথাটা মালার একটা রোগ।

মালা মুখ ফিরিয়ে ছিল। কিছু না-ভেবে আমি হঠাৎ নিখুঁত একটা স্ট্যান্সে দাঁড়ালাম। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতের আড়ালে মুখ, বাঁ হাত ফণা তুলে একটু এগিয়ে দুলছে, ডান পা বাড়ানো, শরীর গোল হয়ে ঝুঁকে আছে। ডান হাতের আড়ালে আমার দুই ক্রূর চোখ অপলক চেয়ে আছে প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্যতার দিকে।

ওইভাবে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, মালা! মালা মুখ ফেরাল।

আমাকে এইরকম মানায়?

ভেবেছিলাম মালা আমাকে ওই ভঙ্গিতে দেখে হেসে উঠবে। এক সময়ে তার প্রিয় ছিল আমার এইসব ভঙ্গি। এখন তার প্রিয় হচ্ছে গান। সে এইসব ভুলে গেছে। তাই ভাঁড়ের ভঙ্গিতে তাকে হাসাতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু মালা হাসল না। অপলক চোখে চেয়ে রইল।

এক ঝটকায় ভঙ্গিটা ঝেড়ে ফেলে আমি হাসলাম।

মালা হাসল না। চেয়ে রইল। চেয়েই রইল।

তারপর হঠাৎ বিড়বিড় করে মালা বলল, আমার ভাল লাগে না সমু, আমার কিছুই ভাল লাগে না।
কী?
এই গান, এই ভালবাসা, ঘর-সংসার।
বলতে বলতে মালা মুখ ফিরিয়ে নিল। উদাস হয়ে গেল আবার।
উদাস গলায় বলল, ছেলেবেলায় বেশ ছিলাম...বেশ ছিলাম, কেন যে বড় হতে গেলাম...
জ্বালা। সমস্ত শরীরে শুয়োপোকার রোমরাজি কাঁটা দিয়ে ওঠে।
মুখ ফিরিয়ে নিলাম।
চলি মালা।
উদাস গলায় ও বলল, এসো।
বারান্দার রেলিঙে চড়াইগুলো নিশ্চুপ বসে আছে ছায়ায়। বাইরে খরার আকাশ গলিয়ে দিচ্ছে রুপো। আমি আস্তে আস্তে বারান্দাটা পেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম।
আজ দুপুরে এক বার বারান্দায় বালির বস্তাটা আমাকে দোলাতে হবে!

## ॥ মঞ্জু ॥

ওভাবে নয়, আর-একটু ঘুরে দাঁড়াও। মুখটা অত ঘুরিয়ো না। শরীর সহজ করে দাও।
বাব্বাঃ! আমি অত পারি না। এইবার দ্যাখো, হয়েছে?
এইবার সুন্দর হয়েছে।
এবার তবে বলো, তুমি কী সুন্দর!
তুমি কী সুন্দর!
হি হি। হল না। আরও সুন্দর করে বলো।
ধ্যাৎ, আমি কি অদ্রি?
ভারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে তুমি কে?
হা-হা। আমি এক অচেনা পুরুষ।
ঠোঁট টিপে হাসলাম, বটে!
ইয়াঃ। এবার নাচো। কিন্তু মনে থাকে যেন, নাচতে নাচতে বসন খুলে পড়া চাই। এখন নাচ!
বাব্বাঃ। তাই হবে।
আমি হাত দু'টো দুই সুন্দর ভঙ্গিতে শূন্যে ছড়িয়ে দি। শরীর ভেঙে দিই পিছনে, ডান পা বাড়াই।
এক...
রুপোর ঘুঙুর বেজে ওঠে।
দুই...তিন...এক...দুই...তিন...
পাক খেয়ে আসি। দাঁড়াই।
সুন্দর হয়েছে।
ছাই।
তবে?
অভিমানে বলি, কিছু হয়নি! এ-নাচ তোমার ভাল লাগতেই পারে না।
কিন্তু এই তো গ্রামাটিক্যাল নাচ। ছন্দোবদ্ধ।
মুখ টিপে হাসি, কিন্তু এ-নাচে বসন খোলে না যে!
তবে কী নাচব?
দাঁড়াও দেখাচ্ছি। আর-এক রকমের নাচ আছে যা ঝড়-বাদলের মতো। পাগল-নাচ। শিব নেচেছিল।
তাতে গ্রামার নেই?
পাগল! শিব সতীর দুঃখে পাগল হয়ে নাচছে—সে-নাচে কে তবলা বাজাতে যাবে সাহস করে?

তুমি কি শিব?

না। কিন্তু ওইরকম একটা ছন্নছাড়া নাচ আমার শরীরে লুকিয়ে আছে দেখবে?

দেখি।

আমি বেণি খুলে দিলাম। আলগাভাবে শাড়িটা জড়িয়ে দিলাম শরীরে।

আয়নার কাছ থেকে পিছিয়ে এলাম। হাসলাম। কী মাদক আমার হাসি।

আমার একটা ঘরে আমি নাচতে লাগলাম। ঘুঙুর পাগলের মতো যা-তা বলছে। বলুক। আমি নাচছি। ঘুরে যাচ্ছি। ফিরে আসছি। এই আমি পাহাড় বেয়ে উঠছি, লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি ঝরনার জল, আলগা পাহাড়ের ওপর একটুক্ষণের জন্য আমি টলমল...পেরিয়ে গেলাম...আমি পাহাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছি গড়িয়ে...বাতাস হয়ে ছুটছি মাঠের ওপর দিয়ে...এখন সমুদ্রের ঢেউ আমার পায়ের ঘুঙুর...নাচছি...খুলে পড়ছে বসন...খুলে পড়ছে...আমার দুই চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে, মুখে হাসি...নাচছি...আমি নাচছি...সতীর দুঃখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নাচের আনন্দ...মিশে যাচ্ছে ভালবাসা আর প্রতিশোধ...শেষে কেবল ভালবাসা থাকবে...এই নাচ সেইখানে শেষ।...আমাকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে...নাচছি...আমি নাচছি...

দেখলে?

সারা শরীরে ঘাম, কপালের ঘাম পড়ছে টপ টপ করে। এলো চুল ফেঁপে ছড়িয়ে আছে চারধারে। মেঝের ওপর পড়ে আছে আমার স্খলিত শাড়ি। আয়নায় আমার পাগলিনী চেহারার প্রতিবিম্ব পড়েছে।

ফাঁকা ঘর। আমি শূন্যতার দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হেসে প্রশ্ন করি, দেখলে অচেনা পুরুষ?

মাঝে মাঝে দুপুরটা আমার এইরকম কাটে। আমার শূন্য ঘরে এক অচেনা পুরুষের গন্ধ পাই যেন। অমনি উঠে বসি। সাড়া দিই। আমাদের কল্পনার কথাবার্তা হতে থাকে। কিন্তু তাতে টেপ রেকর্ডারের ফিতে ঘুরে শেষ হয় না। কত কথা আসে বুক জুড়ে। পাগল-পাগল কথা সব, কাউকে বলা যায় না, কেবল তাকে বলা যায়। সে সব শোনে। ক্ষমা করে। ভালবাসে।

নাচের পর আমি মেঝেতে শুয়ে থাকি, গায়ে শাড়ি নেই, মেঝের ঠান্ডা শরীরময় আরাম ছড়ায়। চোখ বুজে থাকি। অচেনা পুরুষ আমাকে স্নেহভরে দেখে। আমি লজ্জা পাই না। তার কাছে লজ্জা কী? আমি শিশুর মতো নির্লজ্জ হয়ে শুয়ে থাকি। মুখ টিপে হাসি।

ঘরের দরজাটা কে যেন আস্তে আস্তে খুলে দিল। আলোর আভা পড়ল ঘরে। আমি চোখ খুললাম না। কেউ না নিশ্চয়ই। বোধহয় বাতাস। এ সময়ে দোতলায় আমি একা থাকি। তিনতলায় ঘুমোয় মা, নীচের তলায় চাকর ঠাকুর আর ঝি। দোতলায় আমি একদম একা থাকি ভরদুপুরে। আর থাকে এক অলীক অচেনা পুরুষ, আয়নায় থাকে আমার ছায়া।

দরজায় কার ছায়া পড়ল। আমি আধো বোজা চোখে চাইলাম। চমকে উঠলাম। অদ্রি!

যাঃ! টোকা দাওনি কেন? তুমি কী!

অবাক হয়ে অদ্রি তাকিয়ে চাব দিক দেখল।

কী হচ্ছিল এ-সব? পাগলা ষাঁড় ঢুকেছিল নাকি?

আমি উঠে উবু হয়ে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাসতে লাগলাম।

নাচছিলে?

হুঁ।

ও।

অদ্রির গলা খুব ক্লান্ত শোনাল। আমার রাগ হচ্ছে খুব। ও কোনও দিন আমার ঘরে টোকা দিয়ে ঢোকে না। ও হয় চোরের মতো আসে নয়তো ডাকাতের মতো। কেন এ-রকম করবে?

কাপড়টা পরে নাও। আমি পাশের ঘরে আছি! বলে অদ্রি বাইরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

কত সাধু পুরুষ! তুমি যদি এতই লাজুক তবে কেন দরজা খুলেছ? দুপুরে একা ঘরে মানুষ পাগল পাগল হয়ে থাকে জানো না?

শাড়িটা পরতে পরতে আমি ঘরের চার দিকে চেয়ে দেখলাম, সত্যিই পাগল নাচ নেচেছি। ড্রেসিং

টেবিলের ওপর থেকে আমার কসমেটিকসের শিশি আর কৌটো সব গড়িয়ে পড়েছে নীচে। একটা ক্লিনজিং ক্রিমের শিশি চুরচুর হয়ে ভেঙেছে। বিছানার চাদর লন্ডভন্ড। নাচের সময়ে কী যে করেছি, আর কী করিনি তা খেয়াল নেই। আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলাম।

খাওয়ার ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলে মাথা রেখে অদ্রি একা বসে আছে। ওর চুল এলোমেলো, তাতে ধুলো পড়েছে। গায়ে একটা সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি। তাতেও লাল ধুলো। সারা গায়ে ধুলো। মুখে ঘাম। ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে।

কী হয়েছে অদ্রি?

অদ্রি তার অপরিসীম ক্লান্ত মুখখানা তুলল। একটু হাসল। তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে দেখে অবাক হওনি?

একটু ভাবলাম। ঠিক। কেউ একজন ঘরে হুট করে ঢুকে পড়েছে বলে আমি চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু অদ্রিকে দেখে একটুও অবাক হইনি। বললাম, অবাক হওয়ার কী আছে! দুর্গাপুর তো আর বিলেত নয়। তুমিও প্রায়ই আসো।

অদ্রি ক্লান্ত গলায় বলল, আজ তো আমার আসার কথা ছিল না।

ভ্রূ কুঁচকে একটু হাসলাম। বললাম, এমন ধুলো মেখে কোথা থেকে এলে পাগল?

অদ্রি উত্তর না দিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে একটা দোমড়ানো ইনল্যান্ড বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, এটা তোমার শেষ চিঠি, গত মঙ্গলবার পেয়েছি।

আমি মুখ নিচু করে হাসতে লাগলাম। ওটা সেই চিঠি—যাতে মাত্র তিন লাইন লেখা, ইতি নেই, নাম নেই।

অদ্রি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আজ শনিবার। গতকাল তোমার একটি চিঠি পাওয়ার কথা ছিল, পাইনি।

মাথা নিচু রেখেই বললাম, লিখিনি।

কেন?

চিঠি না-পেলে তুমি চলে আসবে বলে। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।

বানিয়ে বলা। কিন্তু তবু অদ্রির ধুলোমাখা ক্লান্ত মুখে হাসি দেখা গেল। পরমুহূর্তেই আবার গম্ভীর হয়ে বলল, মঞ্জু, তুমি এখনও আমাকে জিজ্ঞাসা করোনি আমি কিছু খেয়েছি কি না।

খাওনি?

অদ্রি মাথা নাড়ল। অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে লাগল।

খাওনি কেন?

একটানা গাড়ি চালিয়ে এসেছি। কোথাও থামতে ইচ্ছে করছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, হয় তোমার গুরুতর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, নয়তো তুমি মরে গেছ।

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম, আচ্ছা পাগল! কী করে বুঝব যে তুমি খেয়ে আসোনি?

বুঝলে খুশি হতাম।

আমি অত বুঝতে পারি না।

অদ্রি হাসতে লাগল। আমি রাগ করে বললাম, বাবু নিজের বাসায় না গিয়ে সোজা শ্বশুরবাড়িতে এসে উঠবেন, তা কী করে জানি?

মঞ্জু, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

দাঁড়াও, ঠাকুরকে ডাকছি। ঘরে ডিম আছে, মাখন পাউরুটি পুডিং আছে, মাছ আছে। একটু বোসো, পাঁচ মিনিট—

আমি ঠাকুরকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, অদ্রি ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে বিস্বাদ হাসল, বলল, থাক থাক, ঠাকুর বেয়ারাকে এই দুপুরে কাঁচা ঘুম থেকে তোলার দরকার নেই। আমি বাসাতেই যাচ্ছি। তুমি ভাল আছ দেখে গেলাম। এখন নিশ্চিন্ত।

বলে ও উঠে দাঁড়াল। মুখে রাগ অভিমান থমথম করছে। একটা মেয়ের কাছ থেকে পুরুষেরা যে কত কিছু চায়।

বললাম, বুঝেছি। আমাকে নিজের হাতে করে দিতে হবে, এই তো? উঠতে হবে না, বোসো। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

ও হাই তুলল। আঙুল মটকাল। তারপর অপরাধীর মতো একটু হেসে বসে পড়ল আবার। ছেলেমানুষের মতো মুখ করে বলল, ও-সব ডিম পাউরুটি নয়, আমি ভাত খাব মঞ্জু।

আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

রান্নাঘরে কোথায় কী আছে আমার জানা নেই। ফ্রিজ খুলে, আলমারি হাটকে, জিনিসপত্র পেতে আমার অনেক সময় লাগল। ডালসেদ্ধ, ভাত, ওমলেট আর মাছের ঝোল বেড়ে নিয়ে খাওয়ার ঘরে এসে দেখি, অদ্রি টেবিলে মাথা রেখে গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে ওর।

আমি ডাকলাম। ও লালচোখে তাকাল। তারপর হাসল। বলল, বাঃ, দাঁড়াও বাথরুম থেকে আসি।

ফিরে এসে টেবিলে বসল যখন, ওর ধুলোটে ভাবটা তখন আর নেই। কালো, মিশমিশে চুলের সীমারেখায় ওর মুখের ফরসা রং সুন্দর দেখাচ্ছে।

আজ অফিস করোনি?

না।

কেন?

ও মুখ তুলে হাসল। বলল, ও-রকম ভুতুড়ে চিঠি পেলে অফিস করা যায়! তার ওপর কাল চিঠিই পেলাম না।

ওর চোখ অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছে। আমি জানি আমার কথা নয়। আমার দিকে খুব একটা তাকাচ্ছে না।

আমার জন্যই দৌড়ে এলে?

অদ্রি একটু ইতস্তত করে বলল, হুঁ।

আমি আর কিছু বললাম না। চুপ করে ওর খাওয়া দেখতে লাগলাম।

ও নিজে থেকেই আবার বলল, তোমার জন্যই। তবু, আর-একটা কারণও আছে মঞ্জু। কয়েকদিন আগে রাণুর একটা চিঠি পেয়েছি, ও বড় অশান্তিতে আছে।

শ্বাস ফেলে বললাম, শান্তিতে কেই বা আছে! এই তো আমি। ভাবছিলাম কোথায় দুপুরে একটু ভাতঘুম ঘুমোব, না বাড়িতে ডাকাত পড়ল।

অদ্রি হাসল, সারা ঘর লন্ডভন্ড করে ও তোমার কেমন ঘুম? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনও পরপুরুষ এসে তোমার সর্বনাশ করে গেছে।

শ্বাস ফেলে বললাম, করেছেই তো। ওটা ছিল সর্বনাশের পর কালঘুম।

অদ্রি গম্ভীরমুখে বলল, সর্বনাশ যা করার আমিই করব, আর কেউ না।

আচ্ছা। রাণুর কথা কী বলছিলে?

ওর বর সত্য চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

তাতে কী? আবার চাকরি পাবে।

ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ও বলছে, চাকরি করবে না। চাষবাস করবে।

কেন?

কী জানি! রাণু অত কিছু লেখেনি। চাকরি গেলে, ও আবার চাকরি পাবে, হাইস্কিলড অপারেটাররা বসে থাকে না। তা ছাড়া, আমিও আছি। কিন্তু ও চাকরি করতে চাইছে না অন্য কারণে। ও নাকি বলছে, রুরাল ফ্রন্টে রিভোলিউশন করবে।

সেটা আবার কী?

রিভোলিউশন কথাটা এ যুগের শ্বাসপ্রশ্বাস। ছেলে-ছোকরাদের এই বাতাস লাগছে আজকাল খুব। কিন্তু সত্য ছেলে-ছোকরা নয়, ওর কেন এই বাতাস লাগল বুঝতে পারছি না।

তা তুমি এসে কী করবে?

রাণু আমাকে লিখেছে, যেন আমি এসে সত্যকে বোঝাই। কিন্তু আমি জানি, তাতে লাভ নেই। এমনিতে সত্য খুব ভাল মানুষ। নিরীহ, শান্ত। কিন্তু অসম্ভব জেদি আর একগুঁয়ে। যা ঠিক করবে তা

করবেই। ওর সব ক'টা ভাই একই রকমের। ছোটজনকে তুমি বোধহয় দেখনি। নেনটু। একসময়ে নামকরা বক্সার ছিল। ওর চোখ বড় সাংঘাতিক। ভাল করে চোখে চোখ রাখা যায় না। ও যদি মনে করে কলকাতার এক নম্বর গুণ্ডা হবে, তবে তাই হবে, কেউ আটকাতে পারবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, যার যা হতে ইচ্ছে হয় হোক। আমাদের কী?

ঠিক। কিন্তু সত্যর কথা না-ভেবে যে উপায় নেই। রাণু কোথায় যাবে? চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।

চাষবাস তো ভালই। খেতের চাল, পুকুরের মাছ, গোরুর দুধ, পোষা মুরগি...

বলতে বলতে হাসতে লাগলাম।

অদ্রি মাথা নাড়ল, শহরে বসে সবাই ও-রকম ভাবে। কিন্তু এ দেশে চাষবাস কী রকম আনসার্টেন, তা জানো?

তুমি যেন কত জানো!

অদ্রি আমার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর ক্ষীণ হেসে বলল, আমি কিছুটা জানি মঞ্জু। কিন্তু তুমি একেবারেই জানো না। দুর্গাপুর থেকে গাড়ি চালিয়ে আসার সময়ে দেখলাম হাজার হাজার মানুষ কাতার দিয়ে চলেছে। মাথায় পোঁটলা, তোরঙ্গ, বাক্স, কোলে ছেলে। কিছু যাচ্ছে দুর্গাপুর আসানসোলের দিকে। কিছু আসছে বর্ধমান, কলকাতায়। গ্রাম খালি করে শহরে যাচ্ছে। শহরে যদি কাজকর্ম পায় ভাল, না পেলে ভিক্ষে করবে।

কেন যাচ্ছে?

অদ্রি হাসল, বললাম তো তুমি কিছুই খবর রাখো না। দেখছ না বর্ষাকাল শেষ হয়ে এল, তবু এ-বছর একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি! খেত জ্বলে গেছে, খাওয়ার জল শুকিয়ে গেছে, কলেরা লাগছে। আর কয়েকদিন পরেই দেখবে শহর ভরে গেছে ভিখিরিতে।

অদ্রি একটু চুপ করে থেকে বলল, ভীষণ গরম আর চড়া রোদের মধ্যে খালি পায়ে বুড়ো বাচ্চা সব মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে—কোথায় যাচ্ছে, সেখানে কী হবে, কিছু ঠিক নেই। আর আমি তোমার চিঠি পাইনি বলে ষাট-সত্তর মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আসছি। এত খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা ভাবতে। ওদের মধ্যে যারা একটু সাহসী তারা খালি গাড়ি দেখে হাত তুলে থামাতে বলছিল। চেঁচিয়ে বলছিল, আমাদের পৌঁছে দিন বাবু। দয়া করুন।

তুমি গাড়ি থামালে?

পাগল। আমার ছোট্ট একটু গাড়ি। আর ওরা হাজার হাজার। কতজনকে পৌঁছে দেব? ভাবলাম, ওদের এক যাত্রা, কারও কারও পৃথক ফল হয়ে লাভ কী?

বাচ্চাদের কিংবা মেয়েদের কয়েকজনকে তো নেওয়া যেত' কিছু করলে না? অদ্রি, তুমি বড় নিষ্ঠুর।

অদ্রি মিটিমিটি হাসতে লাগল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, ভাবী স্বামীকে নিষ্ঠুর বলে ভাববার মধ্যে কষ্ট আছে। কিন্তু কষ্ট পেয়ো না মঞ্জু। আমার গাড়ি থেমেছিল।

সত্যি?

সত্যি। দুই বুড়ো, চারটে মেয়েলোক, গোটা দশেক বাচ্চা, তিনজন বুড়ি, জনা দুই জোয়ান। এ ওর কোলে, সে তার ঘাড়ে বসে এল। লাগেজ বুটেও একজোড়া স্বামী স্ত্রী আর তাদের কোলের বাচ্চা ছিল। সবাই ঠিকমতো কলকাতায় পৌঁচেছে। আমি তাদের হাওড়া স্টেশনে, ডালহৌসি আর এসপ্ল্যানেডে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। সেই জন্যই এত দেরি হল। নইলে অনেক আগে পৌঁছতাম।

অদ্রির প্রতি মমতায় আমার হঠাৎ চোখ ছলছলিয়ে এল। কী ভাল তুমি অদ্রি! খুব ভাল তুমি।

অদ্রি হাসছিল, বলল, তাই বলছিলাম, চাষবাসের ব্যাপারটা খুব আনসার্টেন। এর পর অসময়ে বৃষ্টি নামবে। একনাগাড়ে বৃষ্টি হবে। বন্যা হবে। আমাদের দেশে বাঁধের জলেও বন্যা হয়। রেল লাইন পাতলেও তাতে জল আটকে বন্যা হয়। মানুষ গাছে উঠে সাপের সঙ্গে বসে থাকে। ঘরদোর ভেসে যায়, বউ-বাচ্চা মরে। জল নামলে ফের আবার গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে চলতে থাকে মানুষ। ভিখিরিতে ভরে যায় শহর। তবু সত্য গ্রামে যেতে চাইছে। বিপ্লব করবে।

আমি চুপ করে রইলাম।

অদ্রি শ্বাস ছেড়ে বলল, গাঁয়ের মানুষ এখন আর বাইরের লোক পছন্দ করে না। সন্দেহ করে। তা ছাড়া জমির স্বার্থ আর দখল বড় সাংঘাতিক জিনিস। একটু বেচাল দেখলেই মানুষ খুনে হয়ে ওঠে। কারণ জমি ছাড়া তাদের আর কিছু নেই। সে-জমিও কখনও খরিয়ে যায়, কখনও ভাসে। ওরা মরিয়া হয়ে ওঠে। সেইখানে শুধু চাষবাস নয়, বিপ্লব করতে যাবে সত্য। তার মানে, খুব শিগগিরই ও খুন হবে। খুব শিগগিরই—

আধ-খাওয়া ভাত ফেলে অদ্রি উঠল। আমি ওকে খাওয়ার জন্য জোর করলাম না।

আঁচিয়ে এসে মুখ মুছতে মুছতে অদ্রি বলল, যাবে মঞ্জু? চলো না, রাণুকে দেখে আসবে।

অসুখী রাণুকে দেখতে ইচ্ছে করছিল আমার। অনেককাল দেখিনি। বললাম, যাব।

রোদ-চশমা পরে গাড়ির ভিতরে বসে আছি। তবু বুঝতে পারছি চারদিকে রোদের ছুরি ঝলসাচ্ছে। ঝাপটা লাগছে গরম বাতাসের। যত দূর দেখা যায়, আকাশ মেঘহীন। খরা, বড় খরা। পৃথিবী জ্বলে যাচ্ছে। তবু আমার তেমন কিছু খারাপ লাগছে না।

অদ্রিকে বড় ভাল লাগছে আজ। খুব ভাল লাগছে। হয়তো শিগগিরই একদিন অদ্রিকে আমি কিশোরী মেয়ের মতো ভালবাসতে পারব।

অদ্রি কথা বলছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে সামনের দিকে, উগ্র চোখে চেয়ে স্টিয়ারিংয়ের ওপর সাপের মতো ঝুঁকে আছে। ওর ভিতরে তীব্র উত্তেজনা, অস্থিরতা। এত জোর স্টিয়ারিং চেপে ধরে আছে যে আঙুলের ডগাগুলো সাদা দেখাচ্ছে। কেন জানি না, পুরুষের এই অস্থিরতার প্রচণ্ড চেহারাটা আমার ভাল লাগে। কী ভাবছে ও? রাণুর বরের কথা? নাকি খরার কথা? কিংবা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে ঘর ছেড়ে পথে বেরোনো মানুষের সারির কথা? যাই ভাবুক, আমার কথা ভাবছে না। সেই ভাল! কখনও কখনও পুরুষের অমনোযোগিতা মেয়েমানুষের কাছে বড় সুস্বাদু। যেমন এখন। উদাসীন থাকো অদ্রি, এখন আমার দিকে ফিরেও চেয়ো না, আমি ততক্ষণ তোমাকে ভালবেসে নিই।

দুপুরের ফাঁকা রাস্তায় খুব জোরে গাড়ি ছেড়েছিল অদ্রি। ওর সুন্দর উগ্র ভঙ্গিটা চোখ ভরে দেখা হল না। রাস্তা ফুরিয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে অদ্রি বলল, নামো মঞ্জু।

আমি ইতস্তত করে বললাম, ওপরে যাব? রাণুর শ্বশুর শাশুড়ি কিছু মনে করবেন না তো! বিয়ের আগেই জোড়ে যাচ্ছি।

অদ্রি ক্লিষ্টভাবে একটু হাসল, অত ভাববার সময় নেই। তুমি এসো। একা আমি সব ট্যাকল করতে পারব না।

আমি নামলাম।

দরজা খুলল রাণুই, বড় রোগা হয়ে গেছে। দু' চোখের কোলে জলের দাগ। দিশেহারাভাবে আমাদের দেখল।

দাদা! মঞ্জু! আয় ভিতরে, আয় তোরা—

সত্য কোথায়?

ঘরের ভিতরে ঢুকেই রাণু ফিরে তাকাল অদ্রির দিকে। ঠোঁট কাঁপছে।—ও নেই।

মানে?

তিন দিন ধরে নেই। কোথায় গেছে জানি না।

সেকী!

রাণু মাথা নাড়ল, তিন-চার দিন আগে নেনটু কোথা থেকে কিছু টাকা এনে ওর হাতে দিয়েছিল, সংসার খরচের জন্য। টাকা পেয়ে রাতে নেশা করে এল। খুব বকলাম। সকালে উঠে কোথায় চলে গেছে।

উত্তেজিতভাবে অদ্রি বলল, পুলিশে খবর দিয়েছিস?

দিয়েছিলাম। জানতে পারলাম, পুলিশও ওকে খুঁজছে।

কেন?

ওয়ারেন্ট আছে। কারখানা থেকে ওর নামে ডায়েরি করেছে। পরশু বাড়ি সার্চ করল পুলিশ।

কিছু পেয়েছে?

রাণু মাথা নাড়ল, না। নেনটুকে ধরে নিয়ে গেছে।

কেন?

সার্চ করার সময়ে একজন পুলিশ জুতো পায়ে বাবার পুজোর ঘরে ঢুকেছিল। নেনটু জুতো পায়ে ঢুকতে বারণ করেছিল, পুলিশটা শোনেনি। নেনটু তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। সেইজন্য।

অদ্রি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও চুপ। কেবল চৌকির বিছানা থেকে ঘুম ভেঙে দুই-তিন বছরের ছেলেটা মাথা তুলে ঘুমচোখে এক বার ডাকল, মা! তারপর আবার বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাণু একবার অদ্রির দিকে, একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে ভাঙা গলায় বলল, মঞ্জু, কিছু মনে করিস না ভাই, কিছু মনে করিস না, আমি একটু কাঁদব—একটুখানি—

বলতে বলতে ও ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল বিছানায়। কাঁদতে লাগল। অদ্রি অস্বস্তি বোধ করছিল। কেবল বলল, কী হচ্ছে রাণু—এই রাণু—

এগিয়ে গেল রাণুর কাছে।

ওদের ভাইবোনের এখন একটু একা থাকা দরকার। আমি বাইরের লোক।

সামনে বারান্দার দরজাটা খোলা। আমি এক পা এক পা করে বারান্দায় এলাম। কী চড়া রোদ! গরম বাতাসের ঝাপটা বয়ে যাচ্ছে।

আমি রেলিঙে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু। ভিতর থেকে রাণুর কান্নার শব্দ আসছে! আমি আর-একটু সরে দাঁড়ালাম। বারান্দার ওই প্রান্তে ওটা কী? দড়ি দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা বস্তা। কী আছে ওতে?

আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। হাত দিয়ে দেখি, বস্তাটা খুব ভারী। এটা দিয়ে কী হয়? ভারী মজা তো!

আমি বস্তাটা ঠেললাম। ওটা দুলতে লাগল অল্প অল্প।

## ॥ সোমসুন্দর ॥

থানার হাতায় একটা বেলগাছ। তার তলায় একটুখানি ছায়া। চারপাশে তীব্র রোদ। ছায়াটুকুতে গা বাঁচিয়ে দু'-তিনজন জড়োসড়ো হয়ে বসে। তাদের মধ্যে একজন আমার বাবা কদমসুন্দর রায়। ছাতাটা জীবনসর্বস্বের মতো ধরে আছেন। আমাকে দেখে একটু নড়লেন। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। রোদে শুকিয়ে গেছেন বাবা, মুখ-চোখ তাম্রাভ, অসুস্থ, অসুখী এক চেহারা। দূর থেকে আমাকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলেন।

কাছাকাছি হতেই জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, বড়দা?

বাবা মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, কোনও খবর নেই।

কথা না বলে আমরা দু'জন আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। বাবা একটু আগে, আমি পিছনে। আমার ভয়ংকর খিদে পেয়েছে। ঠিক দুপুরে জামিন দিল। তাই খেতে দিল না। হাঁটতে আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল। কোমরে খুব ব্যথা। কিছু নয়। সেরে যাবে। বড়দা যে কোথায় গেল! বড়দার এখন শত্রু অনেক। আমরা ওকে খুঁজে পাওয়ার আগে তারা যদি ওকে খুঁজে পায়?

কী জানি কেন, ভাবতে ইচ্ছে করছে না। খিদে পেলে আমার চিন্তাগুলি ঠিক থাকে না। এক গ্লাস জল যদি পাওয়া যেত!

থানার গেট ছেড়ে প্রায় বিশ গজ নীরবে নতমুখে হাঁটলেন বাবা। তারপর দূরত্বটা নিরাপদ নয় মনে করে ফিরে তাকালেন।

তোর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

না।

বাবা চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থেকে বললেন, খুব মেরেছে নাকি?

তেমন কিছু না। বড়দার খবরটা ওরা চায়।

কিছু বলিসনি তো?

কী বলব?

দুপুরের ফাঁকা রাস্তা ধু ধু করে জ্বলে যাচ্ছে। বাবা রাস্তার দু' দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। একটা ট্যাক্সি নিই।

একটুখানি রাস্তা, ট্যাক্সির কী দরকার? হাঁটতে পারব। তেমন কষ্ট হচ্ছে না।

এই রুটে বাস খুব কম, দুপুরবেলাটায় একদম থাকে না।

দূরে একটা টিউবওয়েল দেখা যাচ্ছে। তেষ্টা পেয়েছে খুব। কলকাতার বেশির ভাগ টিউবওয়েল সারা বছর খারাপ থাকে। এটাও তাই কি না কে জানে! বললাম, তুমি একটু দাঁড়াও। জল খেয়ে আসছি।

বলে বাবাকে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পেছনে বাবার চটির শব্দ সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। যেন বা আমি দামাল শিশু ছেলে তাঁর। হারিয়ে যাব, বাবা সেই ভয়ে সঙ্গ ছাড়তে চাইলেন না।

টিউবওয়েলটায় জল আছে। বাঁধানো চত্বরটা ভেজা এখনও। কেউ একটু আগে জল নিয়ে গেছে।

আমি হাতলটা ধরার আগেই বাবা এসে ধরলেন।

খা, আমি পাম্প দিচ্ছি।

একপলক বাবা-ব্যাটায় চোখাচোখি হল। তারপর আমি হাঁটু গেড়ে বসে টিউবওয়েলের মুখে আঁজলা পাতলাম। ঠান্ডা সুস্বাদু ধাতুগন্ধী জলে শরীর ভরে গেল।

বাবা ক্লিষ্ট একটু হেসে বললেন, আমিও একটু খাই। বহুক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল ওরা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

হাতলটায় চাপ দিতে দিতে বললাম, কী দরকার ছিল? আমি একা ফিরতে পারতাম না?

কী জানি! ভাবলাম, খুব যদি মারধর করে থাকে তবে একা হয়তো ফিরতে পারবি না।

জামিন কে দিল?

বাবা কোনও দিন রুমাল রাখেন না। জল খেয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জামার হাতায় মুখ মুছতে মুছতে বললেন, সুধাংশুবাবু।

সুধাংশুবাবু?

মালার বাবা। উকিল মানুষ, অনেক ঘাঁতঘোঁত জানা আছে। নিতুই বন্দোবস্ত করেছে সব।

কেস দিয়েছে?

বাবা খানিকটা তটস্থ হয়ে বললেন, দেবে বোধহয়। তারপর একটু ভেবে সান্ত্বনার সুরে বললেন, কোর্টে ও-সব ফলস কেস তো টেঁকে না। সারা বছর ও-রকম কত কেস দিচ্ছে পুলিশ!

আমি একটু হাসলাম। হাঁটতে লাগলাম। বাবা একটু আগে, আমি পিছনে।

বাবা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, রোদে হাঁটছিস কেন? ছাতার নীচে আয়।

ছাতা জিনিসটা আমি দু'চোখে দেখতে পারি না! মাথার ওপর ও একটা অস্বস্তি। তবু ছাতার নীচে গেলাম। বাবা বেঁটে, আমি লম্বা। ছাতার শিক মাথায় লাগছিল, আমি হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে ছাতাটা নিয়ে নিলাম।

বাবা, থার্ড জেনারেশন সম্পর্কে তুমি যেন কী বলো?

বাবা অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে তাকালেন।

কী বললি?

থার্ড জেনারেশন।

ও! বলে সামান্য একটু হাসলেন।

মানুষের থার্ড জেনারেশন তার দোষ-গুণগুলো পায়। না?

বাবা শ্বাস ফেললেন একটু জোরে।

আমরা সেই থার্ড জেনারেশন।

বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, বাবা যাই করুন তাঁর স্থিরবুদ্ধি ছিল। তিনি বিপদে পড়তেন, কাটিয়েও উঠতে জানতেন। কিন্তু তোরা অস্থির, চঞ্চল। কী করতে কী করে ফেলিস।

পিছনে বাসের শব্দ হচ্ছিল। বাবা দাঁড়িয়ে বললেন, দ্যাখ তো স্টপটা কোথায়।

ওই তো সামনে। দেখা যাচ্ছে।

চল, দৌড়ো।

বাবা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন। আমরা প্রায় দৌড়তে লাগলাম। টের পেলাম, আমার কোমরের চোটটা খুব সামান্য নয়।

দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমটা যখন পাতলা হয়ে এসেছে তখন পাশ ফিরতে গিয়ে টের পেলাম আমার মুখের কাছে কার একখানা হাত। আমার কপাল ছুঁয়ে সরে গেল। বালিশের পাশে পড়ে রইল হাতখানা। ঘুমচোখে দেখে চোখ বুজে রইলাম। হয়তো বাবা, কিংবা মা, বউদিও হতে পারে। কিংবা আমার তিন বছরের ভাইঝি টিকুটাই হবে হয়তো। হাতখানা ধরার জন্য হাত বাড়িয়েও ধরলাম না।

আধোঘুমের মধ্যে ভাবছিলাম যদি হাতখানা বড়দার হয়! বড়দার হাত নরম। মায়ের মতো মন ওর। অল্পেই গলে যায়। ব্যথা-পাওয়া, আহত নেনটুর পাশে বড়দাই বসে আছে হয়তো। আমার দুপুরের ঘুমের মধ্যে একসময় ও ফিরে এসেছে বোধহয়।

চোখ খুললাম না। অলস শরীরে বড়দার কথা ভাবছিলাম আধোঘুমে। হঠাৎ শুনলাম, পরিষ্কার মেয়েলি গলায় কে বলল, দি বক্সার ইজ ডেড।

ঘুমের আঁশ জড়ানো চোখে চেয়ে দেখি, মালা। আমার শিয়রে বসে আছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। অপরাধীর মতো বললাম, খুব ঘুম পেয়েছিল। লক-আপে বড্ড মশা, ঘুম হত না।

মালা হাসছিল। সেই গজদন্ত, গালে টোল। আবার বলল, দি বক্সার ইজ ডেড।

হাসলাম। মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক।

মালা কথা বলল না। অল্প অল্প করে ও আবার উদাস হয়ে যাচ্ছিল। বলল, ঘুম আমারও হয় না।

কেন?

আমার লক-আপেও বড্ড মশা।

কী বলছ?

মালা থিরথিরে হাসি হাসল, আমি যে লক-আপে আছি, সেইখানে—

এই সংকেত বুঝতে না পেরে ব্যগ্রভাবে বলি, কীসের মশা, মালা?

ও উদাস হয়ে বলল, চিন্তার। দুশ্চিন্তার।

বলেই উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে পর্যন্ত চলে গিয়ে ফিরে বলল, তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। এসে দেখি ঘুমোচ্ছ। ওভাবে তোমার শিয়রে বসে থাকা আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু এসে দেখি ঘুমের মধ্যে খুব ঘামছ তুমি। এ-ঘরে ফ্যান নেই, হাতপাখাও পেলাম না, তাই খবরের কাগজ দিয়ে একটু বাতাস করছিলাম।

বলে মালা দরজার ও-পারে চলে গেল উদাস ভঙ্গিতে।

একটা ব্যগ্রতা বুক খামচে ধরল। তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিলাম। মাঝ-সিঁড়িতে এখনও মালাকে ধরা যায়।

উঠতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেলাম। মনে পড়ল, ছোড়দা এই বেশি বয়সে আবার পড়াশুনো করে ল পাশ করেছে। এ-বছর সে জুডিশিয়ারিতে ডব্লিউ-বি-সি-এস পরীক্ষা দিচ্ছে। পড়াশুনো ছেড়েই দিয়েছিল। আবার যে শুরু করেছে তা মালার কিংবা তার মা-বাবার তাড়নায় আমরা জানি। ছোড়দা অনেক স্বপ্ন দেখে, সেই সব স্বপ্ন মালাকে নিয়ে।

আমি উঠলাম না।

কিন্তু বিকেলে আমি আমার পেটমোটা, ভোঁদড়ের মতো চেহারার বস্তাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হেসে তাকে বললাম, কী মক্কেল, এক হাত হবে নাকি?

বিকেলের বাতাসে বস্তাটা একটু একটু দুলছে। সেটার পেটে সুন্দর একটা জ্যাব করলাম আমি। কোমরের ব্যথা খচ করে উঠল। কিছু না। সেরে যাবে। একটু পিছিয়ে এলাম। আর একটা জ্যাব। বস্তাটা দুলে গেল। হেসে বললাম, কেমন? এখনও ঠিক আছি। না?

বস্তাটা দুলল। দুলতে লাগল। লহরায় তবলায় যেমন চলে আঙুল তেমনি আমার অবিরল ঘুঁষি তার ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে যেতে লাগল।

নন্দরানী মারা যাওয়ার পর থেকে আশু একা আছে। তার মা-বাবা পাকিস্তানে, নন্দরানীকে তাঁরা দেখেননি। একা আশু নন্দরানীকে বিয়ে করে প্রথম ঘরসংসারের স্বাদ পেয়েছিল। সংসার ভেঙে গেছে নন্দরানী মারা যাওয়ার পর। তবুও আশু এখনও কালীঘাটের ফ্ল্যাটটায় আছে। যত দূর জানি, নিজেই রান্না করে খায়, প্রতিদিন নন্দরানীর ছবিতে মালা দেয়! বাবা বহুবার তাকে আমাদের বাড়িতে এসে সকলের সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন, আশু রাজি হয়নি।

সন্ধেবেলা হঠাৎ মনে হল, একবার আশুর কাছে যাই। বড়দার সঙ্গে আশুর খুব ভাব। বলা যায় না, সে হয়তো বড়দার খোঁজ রাখতেও পারে। কে জানে বড়দা তার ফ্ল্যাটেই লুকিয়ে আছে কি না!

ভেবেচিন্তে বেরিয়েছিলাম। রাসবিহারী আর ল্যান্সডাউনের মোড়ের কাছে বাঁধানো গাছতলায় মনোতোষের সঙ্গে দেখা। বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, হাতে রেসের ছোট বই। ভাবছে। আমাকে দেখে হাসল। বলল, বলুন তো আজ রাতে বৃষ্টি হবে কি না!

নির্মেঘ ধুলোট আকাশে তারা ফুটেছে। একবার চোখ তুলেই বললাম, হবে না।

মনোতোষ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল, সব শালা মশাই ওই এক কথা বলছে। বৃষ্টি হবে না।

হবে বললে কী করতেন?

টেন টু টুয়েন্টি বাজি ধরতাম।

আপনার কী মনে হয়, বৃষ্টি হবে?

না। মনোতোষ শ্বাস ছেড়ে বলল।

তবে?

ওই তো হয়েছে মুশকিল। বৃষ্টি হবে না, আমিও জানি। সকলেই জানে। তাই কেউ চান্স নিচ্ছে না। অথচ শনিবার টল বয় আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। পাকা খবর পেয়ে সর্বস্ব ধরেছিলাম। হারামজাদা স্টার্ট নিল না। এখন পয়সাকড়ি নেই, তাই বাজি ধরছি।

বেটার লাক নেক্সট স্যাটারডে!

মনোতোষ মাথা নাড়ে, বউ আর ঘোড়া দুই-ই খচ্চর। কারও কাছে কিছু এক্সপেক্ট করতে নেই। বলুন তো আকাশে সপ্তর্ষি আছে কি না। না—না, আকাশের দিকে না-তাকিয়ে বলুন।

আবার হাসলাম, অর্থাৎ বাজি ধরতেই হবে?

ক্ষতি কী! সময়টা তো কেটে যায়।

আমার কাছে টাকা নেই।

আনা আস্টেক ধরুন না।

আমি চোখ বুজে একটু ভাবনার ভান করে বললাম, সপ্তর্ষি আছে।

মনোতোষ ঠোঁট উলটে বলল, আছে কি না আমিও জানি না। দেখিনি। কিন্তু আমারও মনে হচ্ছে, আছে।

তা হলে তো বাজি হয় না।

মনোতোষ মাথা নেড়ে বলল, হয়। আছে জেনেও আমি বলছি নেই। আট আনা।

আট আনা।

মনোতোষ গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে আকাশ খুঁজতে লাগল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম না। পকেটে হাত দিয়ে একটি টাকা বের করে হাতে ধরে রইলাম।

মনোতোষ মাথা নেড়ে বলল, নেই।

টাকাটা বাড়িয়ে দিতেই মনোতোষ খুচরো আট আনা পকেট থেকে বের করতে করতে বলল, এক

কাপ চা আর এক প্যাকেট চারমিনার এতক্ষণের চেষ্টায় হল। বেটার লাক নেক্সট টাইম।

আমি হাসলাম।

কিছুদূর চলে এসেছি, পিছন থেকে মনোতোষ ডাকল, সোমবাবু, ও মশাই, এই যে বকসারদা—

ফিরে তাকিয়ে দেখি রাস্তা পার হয়ে মনোতোষ আসছে। হাতে আমার টাকাটা। কাছে এসে বলল, হল না।

কী?

সপ্তর্ষি আছে। গাছের ও-পাশটা লক্ষ করিনি। আপনি জিতেছেন।

রাখুন না।

সে মাথা নাড়ল, তা হয় না। জিত জিত, হার হার।

ধার হিসেবে রাখুন, পরে শোধ দেবেন।

তবে টাকাটা ধরুন। আমার খুচরোটা ফেরত দিন।

ধরলাম। খুচরো ফেরত দিলাম।

এবার বলছি, আমাকে আট আনা ধার দিন।

হেসে বললাম, ফর্মালিটি?

অভ্যাস রাখা ভাল। আমি পাঁড় জুয়াড়ি, ধার আর জুয়া এক করতে ভালবাসি না।

আমি জানতাম আকাশে সপ্তর্ষি আছে। তাই তাকাইনি। মনোতোষকে টাকাটা আবার দিতে ওর মুখ উজ্জ্বল হল। আবার আট আনা ফেরত দিতে দিতে বলল, অন্য কোনও আইটেমে খেলবেন?

না। আমার সময় নেই।

কেন?

বড়দা বাড়ি থেকে চলে গেছে, ওর খোঁজ পাচ্ছি না। এক জায়গায় যাচ্ছি খোঁজে।

চলে গেছে? কী আশ্চর্য! কোথায়?

কী জানি।

মনোতোষ মুখে চুকচুক শব্দ করে বলল, হায়! দেখুন তো, এক পাড়ায় থাকি, অথচ কেউ কারও খোঁজই রাখি না।

চলি।

আচ্ছা। চিন্তা করবেন না, আমার মন বলছে, আপনার বড়দা সামনের সোমবারের মধ্যে ফিরবে।

কী করে বুঝলেন?

আমার মন বলছে। আজ এক সোমবার, সামনের সোমে হয় সাত দিন। সাত দিনের মধ্যে ফিরবে। বাজি!

কত?

দশ।

অত না। পাঁচ।

আমার দশই রইল। আপনার পাঁচ। টেন টু ফাইভ।

আমি হাসলাম, ঠিক আছে।

খুশি হয়ে মনোতোষ গাছের তলায় বাঁধানো জায়গায় ফিরে গেল।

একটি যুবতী মেয়ে দরজা খুলল। তার হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর।

অবাক ভাবটা সামলে জিজ্ঞেস করলাম, আশু আছে?

আছে। ভিতরে আসুন।

ভেতরে সবই সেই আগের মতো আছে। খাটে বিছানা, জোড়া বালিশ, দেয়ালে নন্দরানীর ছবি, তাতে টাটকা মালা। তবু ঘরের গন্ধটা কেমন যেন অন্য রকম।

আশু বাথরুমে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে একটু থমকাল।

আশু সম্পর্কে আমার ছোট, কিন্তু বয়সে বড়। ফলে আমি তাকে দাদা ডাকি, সেও আমাকে দাদা ডাকে। তুমি করে বলি দু'জনেই।

আশু থমকে আমাকে ভাল করে দেখল একটু, বলল, জামিন পেলে?

অবাক হলাম। বললাম, তুমি খবর পেলে কোত্থেকে?

নিতু আমাকে ফোন করে প্রায়ই।

তা হলে বড়দার খবরও জানো?

জানি।

খোঁজ রাখো?

আশু মাথা নাড়ল, না।

হতাশায় ভিতরটা ভরে গেল।

খুব মারধর করেছে নাকি? আশু জিজ্ঞেস করে।

একটু-আধটু।

আশু শ্বাস ছেড়ে বলল, তোমরা গ্রহের ফেরে পড়েছ নেনটুদা। এবার একটা স্বস্ত্যয়নী করাও। এই বয়সে বড়দার নিরুদ্দেশ হওয়ার মানে হয় না। তুমিই বা কেন পুলিশের গায়ে হাত দিতে গেলে?

উঠতে উঠতে বললাম, আজ চলি আশুদা।

আরে দাঁড়াও। চা খাও। ভেবে আর কী করবে, বরং এক চাল দাবা খেলে যাও। গজ নৌকোর একটা নতুন চাল শিখেছি।

নন্দরানী বেঁচে থাকতে আশুর বাসায় প্রায় দিনই আমরা দাবা নিয়ে বসতাম। খেলতে খেলতে রাত হয়ে যেত। নন্দরানী বকাবকি করত দু'জনকে। কখনও বা নিবিষ্ট মনে আশুর পিঠ ঘেঁষে বসে চাল দেখত। নন্দরানী মরে যাওয়ার পর আমি আর আসিনি, আশুও দাবা খেলত না।

বললাম, চাল-টাল সব ভুলে গেছি।

আশু বলল, আমিও। কতকাল খেলি না।

দাবার ছক বিছানার ওপর পাততে পাততে আশু মুখ ঘুরিয়ে ডাকল, পারুল, চা দিয়ে যাও।

মেয়েটি কে তা জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না। লজ্জা করছিল। আশুও আমার চোখ এড়াচ্ছে. চোখে চোখে তাকাচ্ছে না। তার ভাবসাবে একটা চোর-চোর ভাব।

দাবা নিয়ে বসার একটু পরেই নিঃশব্দে মেয়েটি চা নিয়ে এল। মুখ তুলে তাকে দেখলাম। দেখতে মন্দ না। শ্যামলা রং, ভাল স্বাস্থ্য, মুখখানায় লক্ষ্মীশ্রী আছে। আমাকে তাকাতে দেখে খুব লজ্জা পেল। মুখ নামিয়ে বলল, আপনাকে একটা ডিম ভেজে দিই?

বললাম, দিন।

আশু বলল, দাও। নেনটুদা ডিম বড় ভালবাসে। যখন বক্সিং করত তখন কাঁচা ডিম খেত। ডবল ডিম ভেজে আনো।

মেয়েটি চলে গেল। মেয়েটি কে তা জিজ্ঞেস করার আর-একটা লোভ সংবরণ করলাম। আশুর বাঁ হাতে কোনাচে একটা বোড়ে ওত পেতে বসে আছে। সেটার দিকে চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ আশু বলল, নেনটুদা, তোমরা আমার ওপর রাগ কোরো না ভাই। একটা কথা বলব।

কী?

আশু হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নিচু করে বলল, আমি বিয়ে করেছি।

ভারী অবাক হলাম। নন্দরানীর ফোটোতে এখনও টাটকা মালা।

বলল, সেকী! খবর পাইনি তো!

একমাত্র নিতু জানে। খবর দেওয়ার মতো বিয়ে তো এটা নয়। রেজিস্ট্রি করেছি, আর বাড়িতে পুরুত ডেকে যজ্ঞটা করিয়ে নিয়েছি।

ছোড়দা তো আমাকে বলেনি! কবে করলে?

দিন কুড়ি হল। তোমাদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করছে।

কেন?

আশু হঠাৎ আকুলি-ব্যাকুলি হয়ে বলল, বিশ্বাস করো, নন্দরানীর জায়গা কেউ কখনও নিতে পারবে না। সেই ঘর-দোর সে যেমন গুছিয়েছিল সব ঠিক সে-রকম আছে, কুটোটিও নাড়াইনি। পারুলকেও বলেছি, আমি সত্যিকারের ভালবাসি নন্দরানীকে, সে ভালবাসা আর কাউকে দেওয়া যাবে না। পারুলও মেনে নিয়েছে। তাকে বলেছি, সে যেন এই সংসারে নন্দরানীর ছায়া হয়ে থাকে।

বড় রাগ হল। বললাম, সে কী কথা আশুদা, একজন আর-একজনের ছায়া হয়ে থাকবে কেন? এ-সব তোমার ভারী অন্যায়। তবে বিয়ে করলে কেন?

নেনটুদা, বিকেলে ঘরে ফিরে ভীষণ ভয় করত। স্বপ্ন দেখতাম, একটা গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে যাচ্ছি—পড়েই যাচ্ছি। মাঝে মাঝে রাতে বোবায় ধরত, ঘুম ভেঙে দেখতাম, ঘামে সারা গা ভেজা। বোবায় ধরলে আগে নন্দরানী ঠিক ঠেলে জাগিয়ে দিত। এখন কে দেয়?

আশুর আবোল-তাবোল কথা শুনে আমি হাসছিলাম। তাতে আশু আরও লজ্জা পেতে লাগল।

আশু ব্যগ্র হয়ে বলল, না নেনটুদা, তুমি বুঝতে পারছ না। নন্দরানী আমাকে প্রথম সংসারের স্বাদ দিয়েছিল। বিশ-বাইশ বছর মা-বাপ ছাড়া হয়ে শেষে হস্টেলে আমার জীবন কেটেছে। সংসার কেমন, ভালবাসা কী জিনিস, যত্ন কাকে বলে, জানতামই না। পেটে আলসার নিয়ে বুড়িয়ে যাচ্ছিলাম। নন্দরানীকে বিয়ে করার পর হঠাৎ বন্যার মতো সব পাওয়া পেতে লাগলাম। সে যে কী ছিল আমার—সে যে কী ছিল—পারুলকে সব বলেছি। ওই দেখো, পারুল নিজের হাতে মালা গেঁথে নন্দরানীকে পরিয়ে রেখেছে। রোজ রাখবে।

ওমলেটের প্লেট সামনে রেখে পারুলও দাঁড়িয়ে গেল। অপরাধীর মতো মুখ করে বলতে লাগল, সত্যিই, দিদির কোনও তুলনা হয় না। নতুন সংসার করতে এসে দেখি, ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি সাজানো আছে। হাতের কাছে সব পেয়ে গেছি। মশলার কৌটোগুলো ভবভরতি, ট্রাঙ্ক বাক্স কী সুন্দর গোছানো। আমি কিচ্ছু নাড়িনি। দিদি এই সংসারে নেই হয়েও কতখানি যে আছেন!

আশু পারুলের দিকে চেয়ে বলল, পারুল, তোমাকে বলেছি কিনা যে আমার সব ভালবাসা নন্দরানীর প্রতি, তুমি তার ছায়া হয়ে থাকবে। বলেছি কিনা?

পারুল সমস্বরে আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগল, আমাদের ওপর আপনারা একটুও রাগ রাখবেন না দাদা, আমরা দিদিকে একটুও অসম্মান করব না। বলুন, আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করবেন!

বড় বিরক্তি বোধ করছিলাম। আমার কাছে ওরা কোনও অপরাধই করেনি, তবু দু'জনে চোরের মতো কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইছে। আশুর মতো আহাম্মক দেখি না।

একটা শ্বাস ছেড়ে বললাম, আমাদের বাসায় নন্দরানীর কথা বড় একটা কেউ ভাবে না। তার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও নেই। তোমাদের বাড়িতে নন্দরানী যদি বেঁচে থাকে তো থাক। ভালই তো।

সঙ্গে সঙ্গে পারুল আবদারের গলায় বলে, তা হলে আমি কিন্তু আপনার ছোট বোন। সেই সম্পর্কই রইল। ঠিক তো?

হাসলাম, আচ্ছা!

আগের মতো এসে দাবা খেলবেন ওঁর সঙ্গে। যত রাত হোক, আমি কিছু মনে করব না।

আমি হাসলাম। একজনের পরিপূরক হয়ে ওঠা আর-একজনের পক্ষে কত শক্ত! নন্দরানী হলে কিছুতেই বেশি রাত পর্যন্ত দাবা খেলার প্রস্তাব মানত না। বকত। দরকার হলে ধমকে বের করে দিত—যা তো ছোড়দা। বাড়ি যা।

এরপর দাবাটা আর জমল না। আশুর গজ নৌকোর নতুন চালটা আমি লক্ষই করলাম না। মাত হয়ে গেলাম। ওরা ফুটপাথ পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল।

রাতে একা শুয়ে মৃত নন্দরানীর কথা ভাবতে ভাল লাগছিল! ওর দেওয়া পাঁচশো টাকার আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। স্যুটটা হল না। না হোক, তার জন্যে আমার দুঃখ নেই! কিন্তু এই যে আশু বিয়ে করল, এর মানে হচ্ছে নন্দরানীর স্মৃতির ওপর রবার ঘষা শুরু হয়ে গেল। ওকে আর বেশিদিন কেউ মনে রাখবে না।

সকালে উঠে টের পেলাম, সারা রাত ঘুমের মধ্যেও নন্দরানীর কথা ভেবেছি। আশুর বিয়ের কথা কাউকে বললাম না। থাক, মা-বাবার একটা জীবন দু'-একটা সত্য না-জেনেই কেটে যাক।

## ॥ মঞ্জু ॥

আকাশের রং ধুলোটে। রোজ সকালে উঠেই দেখি রোদ, তারপর সারা দিন কেবল রোদ আর রোদ। একটু মেঘও কখনও ছায়া ফেলে না। সারা দিন রাস্তায় হাঁটে ভিখিরিরা। অনেক রাত পর্যন্ত তারা চলাচল করে। গভীর রাতেও তাদের চিৎকার শোনা যায়। ভয় করে।

ভয় করে। আমার আজকাল একটু-আধটু ভয় করে।

বাবা-মার শোওয়ার ঘরে এয়ারকুলার লাগানো হল। আমারটাতে লাগাতে চেয়েছিলেন বাবা। আমি রাজি হলাম না। থাকগে, গরমে একটু কষ্ট করি, কষ্ট তো বড় একটা পায় না আমাকে।

এই যে ভয় আর অস্বস্তি—এটা আমার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল অদ্রি। সারা দিন ভিখিরির চিৎকার শুনি, মেঘহীন আকাশে সূর্যের আলোর তীব্রতা দেখি। ভয় পাই। কী দরকার ছিল অদ্রির আমাকে ও-সব কথা বলার? জানি ইঞ্জিনিয়ারমশাই, পুরুষেরা কখনও চায় না তার মেয়েমানুষটি সুখে থাকুক। আমাদের কষ্ট কিংবা কান্না এ-সবই পুরুষের প্রিয়। মঞ্জুকে ভয় দেখিয়ে তুমি সুখ পাও ইঞ্জিনিয়ারমশাই। তাই আমি এখন ভিখিরির চিৎকার মন দিয়ে শুনি, অনুভব করি খরার দহন। ইঞ্জিনিয়ারমশাই, তোমার মেয়েমানুষটির আর সুখ নেই।

অদ্রিকে এ-সপ্তাহে দুটো চিঠিই দিয়েছি। পরিপূর্ণ ভালবাসার চিঠি। আজ শনিবার, আজ আমার একটা চিঠি তার পাওয়ার কথা। যদি চিঠি পেয়ে অদ্রি আজ আসে? এলে বড় ভাল হয়। অদ্রিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। অদ্রির আসা উচিত। আমার জন্য না হলেও রাণুর জন্য। রাণুর বরের এখনও কোনও খোঁজ নেই। রাণু কয়েকদিন এসে থেকে গেল বাপের বাড়িতে। রোজ যেতাম। সারা দিনই কাঁদত রাণু। বলত, আমার জন্য ও চলে গেছে।

আমি বোঝাতাম, তা কেন? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কত রাগ অভিমান হয়। তা ছাড়া গিয়ে তো ভালই হয়েছে, নইলে পুলিশ ঠিক ধরে নিয়ে যেত।

রাণু কেবল মাথা নাড়ত, না রে। পুলিশকে বুঝিয়ে আমি ঠিক ছাড়িয়ে আনতাম তাকে। নেনটুকে তো ছেড়ে দিল। জানিস, নেনটুকে খুব মেরেছে ওরা। ওকে ধরলেও হয়তো মারত।

এ-রকম উলটোপালটা কথা বলত রাণু। বেশিদিন বাপের বাড়িতে থাকতে পারল না। বলল, ও যদি এর মধ্যে আসে! আমাকে না দেখে খুব রেগে যাবে।

বরকে সত্যিই ভালবাসে রাণু। আমি বাপু অত ভালবাসতে পারব কি না কে জানে। ইচ্ছে হয় খুব ভালবাসতে। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার কেমন যেন মন ঝিমিয়ে পড়ে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। মনে মনে আমি অদ্রির জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু অপেক্ষা করতে আর একদম ভাল লাগে না। অস্থির লাগে, চঞ্চল লাগে, ছটফট করি। যা চাই তা এক্ষুনি না পেলে এ-রকম হয়। দাঁত দিয়ে আঁচল ছিঁড়ে ফেলি। নখ কামড়াই। পাগল-পাগল লাগে।

পাঁচটা বেজে গেল, তবু এখনও ঠিক দুপুরের মতো খর রোদ। অদ্রি এল না। আসবে না বোধহয়। ঘরে থাকতে আমার আর ইচ্ছে করছে না। এক্ষুনি রঙের মধ্যে আমাকে ডুব দিতে হবে। রং—রং ছাড়া এখন আর কিছুই আমাকে ভোলাতে পারবে না।

পোশাক পালটে আমি বেরিয়ে পড়লাম। যাই, গড়িয়াহাটার সেই চেনা শাড়ির দোকানটা থেকে ঘুরে আসি। শাড়ির স্তূপের মধ্যে ডুব দিয়ে এলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

বুকে ধরা শাড়ির প্যাকেট, চোখে রোদ-চশমা, দোকানের বাইরে পা দিতেই একটি ছেলে পথ আটকাল। তার হাতে সাদা একটা কৌটো, বুকে কোনও ক্লাবের ব্যাজ। খটাখট কৌটোটা নেড়ে বলল, কিছু সাহায্য করুন।

কীসের সাহায্য?

খরাক্লিষ্টদের জন্য চাঁদা তুলছি।

চাঁদার টাকা কোথায় যাবে কে জানে! ব্যাগ থেকে একটা সিকি তুলে বিরক্তভাবে দিয়ে দিই। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই আবার ওই রকম ছেলেরা মুখের সামনে কৌটো নাড়ে। বলতে থাকে, খরাক্লিষ্ট—

সাহায্য করুন, কিছু সাহায্য করুন।

'খরাক্লিষ্ট' শব্দটা বড্ড বইঘেঁষা। শক্ত শব্দ। আমার মাথার মধ্যে গিয়ে শব্দটা খটাখট ধাক্কা খেতে লাগল। ভারী বিরক্তিকর কথাটা।

বাড়ি এসে দেখি সেখানেও 'খরাক্লিষ্ট' শব্দটা আমার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। মায়ের ঘরে দক্ষিণ কলকাতা মহিলা সমিতির মিটিং বসেছে। মা সমিতির সম্পাদিকাদের একজন। তাঁর ঘরে প্রায়ই মিটিং বসে।

কিছু কিছু লোক থাকে তারা উভয়লিঙ্গ। হাবুলদা বোধহয় তাদেরই একজন। নইলে মহিলা সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কীসের? অথচ দেখেছি মহিলা সমিতির প্রতি মিটিং-এ তিনি উপস্থিত আছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, মঞ্জু, তুমি তো গান জানো?

জানি। তাতে কী?

কাল আমরা দল নিয়ে সাহায্যের জন্য রাস্তায় বেরোচ্ছি।

কীসের সাহায্য?

খরাক্লিষ্টদের।

খট করে শব্দটা গুলির মতো কান দিয়ে মাথার মধ্যে খটাখট নড়তে লাগল।

আভা মাসি মুখ ফিরিয়ে বললেন, কাল আমাদের প্রসেশন বেরোচ্ছে। গানের দল নিয়ে।

রাস্তায় গান গাইতে আমি পারব না।

হাবুলদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, হাঁটতে হবে না। গানের দল থাকবে লরির ওপর। মাইক্রোফোন থাকবে—কষ্ট হবে না। তা ছাড়া গান তো হবে কোরাসে, গলা না ছাড়লেই হবে।

মা বলল, আমার শরীরটা ভাল নেই, অথচ এরা খুব ধরেছে। আমি বলছিলাম আমার বদলে বরং তুই যা মঞ্জু। এই রোদ আমার সহ্য হবে না, প্রেসার বেড়ে যাবে।

মহিলা সমিতির ফাংশনে আমি অনেকবার গান গেয়েছি, নৃত্যনাট্যে পার্ট করেছি, গতবারেও চণ্ডালিকা সেজেছিলাম। স্টেজ-ফ্রাইট আমার নেই। কিন্তু এখন আর আমার ধরাবাঁধা নাচ-গান ভাল লাগে না। আমার আছে গোপন এক পাগল নাচ। আমার আছে কথাহীন খ্যাপা গান। অচেনা এক অলীক পুরুষের জন্য!

হাবুলদা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, প্রসেশন বেশ বড় হচ্ছে। অনেকগুলো সংস্থা একসঙ্গে মিলেমিশে করছি। ফিল্ম আর্টিস্টস গিল্ড আছে, সবুজ সংঘ আছে, মিলন সমিতি আছে। কয়েকজন ফিল্মস্টারও থাকছেন প্রসেশনে। নামকরা গায়ক-গায়িকারা থাকবেন।

আমি মুখ গোঁজ করে বললাম, ও-সব ব্যাপার আমার ভাল লাগে না।

খুব অ্যামেজিং এফেক্ট হবে, দেখো। তা ছাড়া খরাক্লিষ্টদের কথা একবার ভাবো মঞ্জু। গাঁ গ্রাম ছেড়ে সব চলে আসছে। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু করার আছে—

কথাগুলো আমি শুনছিলাম না। কিন্তু নিশুতি রাতে শোনা ভিখিরির চিৎকার আমার কানে আসছিল। কল্পনার চোখে আমি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে খর রোদে খালি-পায়ে হেঁটে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। অদ্রি আমার ভিতরের সব সুখ নষ্ট করে এই ছবি স্থাপন করে গেছে।

হাবুলদা বললেন, কাল সকালে আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। কষ্ট হবে না। যেয়ো কিন্তু—

আভা মাসি বললেন, যাবে, যাবে। মঞ্জু আবার কবে এক কথায় রাজি হয়! ওকে সব সময়ে সাধাসাধি করতে লাগে আমাদের। তাই না মঞ্জু?

হাসলাম।

যাস কিন্তু।

অদ্রি এল না। হয়তো কালও আসবে না। মন ছটফট করে। তার চেয়ে কিছু একটা করা ভাল। মেতে থাকা যাবে।

শ্বাস ফেলে বললাম, যাব।

আভা মাসি ঠাট্টা করে বললেন, আজ কিংবা কাল আবার অদ্রি আসবে না তো! দেখিস বাপু, শেষে

শাপ-শাপান্ত করবি।

হাবুলদা তাড়াতাড়ি বললেন, অদ্রিবাবু এলে তাঁকেও নিয়ে নেব প্রসেশনে। তা হলেই তো হল!

লজ্জা পেয়ে পালিয়ে আসি। অদ্রির কথা সবাই জানে। বিয়ে ঠিক হয়ে আছে—কাজেই ঠাট্টা করতে কারও আটকায় না।

অদ্রি এল না।

পরদিন রবিবার সকালে আমাদের মিছিল বেরোল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ফিল্মস্টারদের গন্ধে বিস্তর রবাহুত লোক জুটেছে। প্রথমে কথা ছিল ফিল্মস্টাররা হাঁটবেন। কিন্তু ভিড় দেখে সে-সিদ্ধান্ত বদলাতে হল। লরির মাথার ওপর গদি পেতে তাঁরা বসলেন। তাঁদের দু'জনের মাথায় শোলার টুপি, একজনের মাথায় ঘোমটা, চোখ সান-গ্লাসে ঢাকা। লরির পিছনে শতরঞ্চি পেতে গায়ক-গায়িকারা বসে, পিছনে মাইক্রোফোন। লরিতে আমাদের আশেপাশে অগায়ক-অগায়িকারা বিস্তর উঠে বসে আছে। সামনে লাল শালুতে মিছিলের উদ্দেশ্য লেখা। পিছনে বেশ কয়েক হাজার মানুষ। ভলান্টিয়ারদের হাতে চাঁদার কৌটো, বুকে ব্যাজ, আবার কাপড় পেতে ধরেও যাবে কিছু লোক।

'দারুণ অগ্নিবাণে...' গানের সঙ্গে সঙ্গে মিছিল চলতে শুরু করল। আমি ঘামতে লাগলাম। এত লোক একসঙ্গে দেখে কেমন ভয়-ভয় করছিল। প্রাণপণে চোখ বুজে কোরাসে গলা মিলিয়ে দিলাম।

রাস্তার দু'ধারে লোক দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, রাস্তার দু'ধারে আগে থেকে কাতার দিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে। এই মিছিলের খবর আজ খবরের কাগজে বেরিয়েছে। তাই এত ভিড়। মিছিল যত এগোয় ততই রাস্তার দু'পাশে চাপ-ভিড় বাড়তে থাকে। এত লোকের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। হারিয়ে যাওয়া বলে মনে হয়। কানের কাছে মাইক্রোফোনের চোঙা। আমাদের গলার স্বরেই কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কেমন হঠাৎ দিশেহারা, বিশৃঙ্খল, অদ্ভুত লাগছে সবকিছু। খোলা রাস্তায় আমি কোনও দিন গান গাইনি।

চার দিকে লোকজন। তার ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ফিল্মস্টারদের নাম ধরে কেউ কেউ ডাকছে। আনন্দে চিৎকার করছে। লরির ওপর থেকে স্টাররা হাত নাড়ছেন মাঝে মাঝে। দেখতে পাচ্ছি, গলদঘর্ম ভলান্টিয়াররা তাদের ভরা কৌটো লরিতে ফেলে দিচ্ছে, হাত বাড়িয়ে হাবুলদার কাছ থেকে খালি কৌটো নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভিড়ে। পয়সার ভারে ঝুলে প্রায় রাস্তা ছুঁয়েছে চারজনের হাতে-ধরা কাপড। রাসবিহারী ধরে ধীরে ধীরে মিছিল এগোতে থাকে পশ্চিম দিকে।

গান গাইতে গাইতে হঠাৎ আমার চোখে জল আসছিল। আবেগে, উত্তেজনায়। এত লোকের ভিড়, বিশাল মিছিলে মানুষের পদযাত্রা, গানের সুর, মানুষের ব্যগ্র হয়ে পয়সা দেওয়া—এ-সবের মধ্যে কী একটা মহত্ত্ব রয়েছে, ঠিক বোঝানো যায় না। আমি যেন এই প্রথম রাস্তায় নেমেছি, এই প্রথম আমি এক হয়ে গেছি সর্বসাধারণের সঙ্গে, আর পাঁচজনের সঙ্গে কোরাসে গাইতে গাইতে এই প্রথম আমি দুঃখী মানুষেব জন্য একটা কিছু করছি।

আমি গলা ঢেকে গাইতে লাগলাম। আমার গাল বেয়ে চোখের জল নামল।

মিছিলটা আটকাল দেশপ্রিয় পার্কের কাছে। প্রথমটায় বুঝতে পারলাম না কেন। রাস্তার মাঝখানে অল্পবয়সি ছেলে-ছোকরা আর ফোটোগ্রাফাররা লরির আগে আগে হাঁটছে অনেকক্ষণ। তাই মাঝে মাঝে লরি আটকাচ্ছিল, থেমে থেমে চলছিল। কিন্তু এবার একদম দাঁড়িয়ে গেল। আমরা ঘুরে-ফিরে "বাংলাদেশের হৃদয় হতে..." গেয়ে যাচ্ছিলাম। গানের তীব্র শব্দ ভেদ করে চিৎকার ভেসে আসছিল। অবশেষে আমাদের গান থামাতে হল। মিছিল আটকে গেছে। কে যেন মিছিল যেতে দিচ্ছে না।

লরির সামনে ছুটে যাচ্ছে লোকজন, ভলান্টিয়াররা চিৎকার করছে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

আমি তখনও আমার চোখের জল মুছিনি। উঠে লরির ধার থেকে গলা বাড়িয়ে দেখি, রাস্তার মাঝখানে লরির সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ছেলে। পা ফাঁক করে দু' হাত দু' দিকে ছড়িয়ে তারা পথ আটকে আছে। মাঝখানের ছেলেটার ভঙ্গি অন্য রকম! সে চিৎকার করে কিছু বলছে। শোনা যাচ্ছে না। লম্বা, রোগা, কালো ছেলেটা, কিন্তু তার দুই চোখ ধক ধক করে জ্বলছে। সে কী বলছে

তা শোনার জন্য অনেক দূর গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, পিছন থেকে হাবুলদা আমার হাত টেনে বললেন, মঞ্জু, পড়ে যাবে, দেখো। আমি সেদিকে খেয়াল করলাম না। হাত ছাড়িয়ে নিলাম। ছেলেটাকে আমি দেখেছি। কোথায় যে দেখেছি, কবে যে!

ছেলেটা এক পা এক পা করে এগিয়ে এল। ভলান্টিয়াররা তার পথ আটকাচ্ছে। ছেলেটা তার আগুনে চোখে লরির মাথার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, এটাও কি অভিনয়?

চারদিকে লোকের চিৎকারে কিছু শোনা যাচ্ছিল না। আমি উগ্র আগ্রহে ছেলেটার দিকে মুখ করে শোনার চেষ্টা করছিলাম। ছাড়া ছাড়া ভাবে শুনতে পেলাম, এটা তো তামাশা। ...রাস্তায় নেমেছেন যখন, রাস্তাতেই নামুন... মানুষের দুর্দশা বাংলাদেশ ঘুরে দেখে আসুন, নইলে বাড়ি ফিরে যান... এটাই কি স্থায়ী ব্যবস্থা যে যত বার বন্যা বা খরা হবে তত বার আপনারা রংমিছিল নিয়ে বেরোবেন... এটাই বাংলাদেশের মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান? ডোল আর দয়া? ...ঘেন্না করে না? ...ফিরে যান, নতুন কিছু ভেবে বার করুন... তামাশা করবেন না... বাংলাদেশের মানুষ কেন আপনাদের দয়ার জন্য বসে থাকবে? কালকের খবরের কাগজে আপনারাই বা কোন ঘেন্নায় নিজেদের ছবি দেখবেন, আর দয়ার কথা পড়বেন? ...মানুষকে ভালবাসা এত সহজ নয়...

কথাগুলো সে বলছিল তীব্রতার সঙ্গে, রাগে আক্রোশে তার মুখটা তামাটে। রোদ জ্বলছে তার চোখে। গায়ে হাওয়াই শার্ট, পরনে ভাঁজহীন রংহীন প্যান্ট, পায়ে চপ্পল। এই তুচ্ছ পোশাকের সামান্য ছেলেটা একা মিছিল আটকে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে তার কয়েকজন মাত্র সঙ্গী। এত বড় মিছিলের সামনে এটা কোনও প্রতিরোধই নয়। প্রকাণ্ড লরিটা অনায়াসে ওদের গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে পারে। হাজারটা মানুষ ছিঁড়ে ফেলতে পারে ওদের। ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল। যদি সত্যিই মানুষজন ও-রকম কিছু করে? ছেলেটা কেন ভয় পাচ্ছে না? কেন সরে যাচ্ছে না? আমি যে ওকে দেখেছি। সেই সামান্য চেনাটুকু মায়া হয়ে আমার বুকের ভিতরে ঢেউ তুলছে।

কয়েকজন সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক এগিয়ে ছেলেটার সঙ্গে নিচুস্বরে কথা বলছেন। ছেলেটা মাথা নাড়ল। পথ ছাড়বে না। একজন ওর হাত ধরতেই ছটকে হাত ছাড়িয়ে নিল। কোনও কথাই ও মানল না। মিছিল ও আটকাবেই। ওর ধারণা, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষদের নিয়ে এ এক রংতামাশা।

আশ্চর্য এই, আমার আবেগ হঠাৎ কোথায় উবে গেল। একটু আগে মহত্ত্বের ভাব চারপাশে অনুভব করে আমি কাঁদছিলাম। এখন হঠাৎ কেঁদেছি বলে আমার লজ্জা করতে লাগল। ঠিক। মানুষকে ভালবাসা অত সহজ নয় বোধহয়। হঠাৎ আমার ভয়ংকর ক্লান্ত লাগছিল। গান গাওয়ার কষ্ট, রোদ, ঘাম এতক্ষণ এ-সব টেরও পাচ্ছিলাম না। অসম্ভব আবেগ। হঠাৎ গলার দু'ধারে ব্যথা করছিল, অসহ্য লাগছিল রোদ আর ভিড়। খুব তেষ্টা পেয়েছে আমার। দিশেহারার মতো আমি চারদিকে চেয়ে দেখছিলাম। এই মিছিল থেকে পালাবার কি কোনও পথ নেই?

কে যেন চিৎকার করে আমার কানের কাছে বলল, পুলিশ আসছে। পুলিশ—

সেই মুহূর্তেই ভিড়ের ভিতর থেকে দুটো গুণ্ডা চেহারার লোক বেরিয়ে এল। এতক্ষণ ওদের আমি দেখেছি লরির পিছনের পাল্লায় বসে চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাবুলদার সঙ্গে চোখের ইশারায় কী কথা বলে হাসছিল। নিঃশব্দে কখন লরি থেকে নেমে গেছে। তাদের একজন এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে কিছু বলল। ছেলেটা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে আগুনে চোখ তুলে তাকাল। উত্তর দিল। শোনা গেল না। তারপরই দু' জন দু' দিক থেকে হঠাৎ ছেলেটার দুই হাত ধরল। রোগা ছেলেটা, গুণ্ডাদের হাতে এবার মার খাবে। আমার সমস্ত অস্তিত্ব দুই চোখে এনে আমি দৃশ্যটা দেখছিলাম! ছেলেটা কিন্তু সামান্য হাসল। লোক দু'টোর দিকে তাকালও না। কেবল শরীরটায় একটু মোচড় দিয়ে হাত দু'টো অনায়াসে ছাড়িয়ে নিল। তারপর আঙুল তুলে, ছেলেটা শাসাল। আমি শুনতে পেলাম, সে বলছে, তোমাদের দিন শেষ হয়ে আসছে।

শুনে লোক দু'টো থমকে গেল। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। তারপর শুধু হাত, আর পা, আর মানুষের শরীর জড়িয়ে গিয়ে কী একটা হতে লাগল, আমি তার কিছু বুঝলাম না। ভিড় ঢেকে দিল সবকিছু।

গোলমালের মধ্যেও হাবুলদা আমাকে চোখে চোখে রেখেছেন। তিনি এসে আমার হাত ধরলেন

আবার, মঞ্জু, ভয়ের কিছু নেই।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু না ভেবেই হঠাৎ বললাম, ওই লোক দু'টোকে আপনি পাঠিয়েছেন হাবুলদা?

তিনি সবিস্ময়ে বললেন, কোন লোক দু'টো?

ওই যে যারা ছেলেটাকে মারছে?

না তো। মারবে কেন, সরিয়ে দিচ্ছে, ছেলেটা পাগল।

আমি বললাম, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। আমি চলে যাব।

সে কী! মিছিল তো সবে শুরু হয়েছে। নার্ভাস হয়ো না। এ-সব কিছু নয়। কত রকমের ছেলে-ছোকরা বদমাশ আছে কলকাতায়। এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

না। আমি পারছি না। আর একটুক্ষণ থাকলেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। আমাকে নামিয়ে দিন।

সিরিয়াসলি বলছ?

সিরিয়াসলি।

আমি থাকতে তোমার কিন্তু ভয় নেই।

না, আমি ভয় পাচ্ছি না। আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব না। আমি বাড়ি যেতে চাই।

হাবুলদা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কী একটু ভেবে বললেন, তুমি যখন চাইছ না—

প্লিজ, আমাকে নামিয়ে দিন।

ঠিক আছে। দাঁড়াও।

ভিড় আর গোলমালে কেউ আমাদের লক্ষ করছিল না। আমি হাবুলদার হাত ধরে খানিকটা ঝুলে, হেঁচড়ে লরি থেকে ঝুপ করে নামলাম। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। পিছন পিছন এসে হাবুলদা বললেন, তুমি একা যেতে পারবে?

পারব।

মিছিলটার সঙ্গে আমাকে থাকতেই হবে, নইলে তোমাকে ঠিক পৌঁছে দিতাম মঞ্জু।

হাবুলদা ফিরে গেলেন। আমি উদভ্রান্তের মতো লোকজন ছাড়িয়ে ফাঁকার দিকে হাঁটতে লাগলাম। পিছনে তখন খুব চিৎকার, গোলমাল শোনা যাচ্ছে। মিছিলটা বোধহয় শেষ পর্যন্ত ভেঙেই যাবে।

আমি আর ফিরে তাকালাম না। হাঁটতে লাগলাম, দিশেহারা উদভ্রান্তের মতো। আমি যেন একটা সঙের দলে ছিলাম এতক্ষণ। আমার বিশ্রী লাগছিল।

ভিড় ছেড়ে ফাঁকায় পড়লাম। রাস্তাঘাট এখন স্বাভাবিক। উত্তেজনা নেই, আবেগ নেই, শান্ত মানুষেরা হাঁটছে। খুব ভাল লাগছিল আমার। যেন খুব জ্বর উঠেছিল, নেমে গেছে। শরীরটা দুর্বল, ঘাম দিচ্ছে, বুক জুড়ে তেষ্টা।

সামনেই একটা টিউবওয়েল। একটা পশ্চিমা লোক হাতল লাগানো টিনে জল ভরছে। কোনও দ্বিধা না-করে তার সামনে গিয়ে বললাম, ভাই, একটু জল খাব।

জি।

সে সসম্ভ্রমে তার টিন সরিয়ে পাম্প দিতে লাগল। আমার দু' আঁজলা ভরে অনেক জল খেলাম। লোকটা, গরিব পশ্চিমা লোকটা স্নিগ্ধ চোখে আমাকে দেখল। এই হচ্ছে দয়া, ভালবাসা। কাছাকাছি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক মানুষ অন্যজনের আঁজলা ভরে দেয় তেষ্টার জল। এর তুলনায় ওই মিছিল কী ভীষণ কৃত্রিম। মিছিলের শেষে ক্লান্ত হয়ে যে যার বাড়ি ফিরে আবার নিজস্ব জীবন যাপন করে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ আবার পথে বেরোবে ভিটে ছেড়ে, মাইলের পর মাইল হাঁটবে শহরের দিকে ভিক্ষের আশায়। ছেলেটা ঠিকই বলেছিল।

রাস্তাটা চেনা লাগছে। এ-রাস্তাতেই রাণুর বাড়ি না! ওই তো পুরনো দোতলা বাড়িটা, রেলিং থেকে গোলাপি শাড়ি ঝুলছে। কেমন আছে রাণু কে জানে! ওর বর ফিরল কি! যাই এক কাপ চা চাই রাণুর কাছে, তারপর মনপ্রাণ দিয়ে ওর কান্না শুনব, ওর বরের ভালবাসার কথা শুনব। সেই ভাল। কারও দুঃখের কথা শুনতে বড় ইচ্ছে করছে আমার।

খুব খুশি হল রাণু, তার অবস্থায় যতখানি খুশি হওয়া যায়। কাল রাতের চোখের জলের চিহ্ন এখনও চোখের কোল ভরে আছে।

বলল, ওমা! আয় মঞ্জু, ভিতরে আয়। বুকে আয় মঞ্জু—

বলে জড়িয়ে ধরল। বলল, কী চেহারা রে তোর! রোদে বেরিয়েছিলি বুঝি?

রাণু, এক কাপ চা খাওয়াবি?

ওমা! খাওয়াব না! আর কী খাবি বল।

কিছু না।

মুখপুড়ি, তোর বুঝি খিদে পায়নি?

রাণু চা করে আনল, তেল দিয়ে মেখে আনল একবাটি মুড়ি। খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। কতকাল মুড়ি খাই না।

বারান্দার দিকে জানালা দিয়ে সেই দড়িতে ঝোলানো ভারী বালির বস্তাটা দেখা যাচ্ছিল। অদ্ভুত বস্তাটা।

রাণু, ওটা কী রে?

রাণু হাসল, নেনটুর কাণ্ড। মন মেজাজ খারাপ থাকলে ওই ভারী বস্তাটা নিয়ে কী হুটোপাটি করে! এক-একদিন বস্তাটা দুলিয়ে সামনে দাঁড়ায়, ওই ভারী বস্তা এসে শরীরে লাগে, পড়ে যায়, মুখ-চোখ ফেটে রক্ত পড়ে।

কেন?

পাগলামি। ওদের তিন ভাইয়ের মধ্যে দু'টোই পাগল। বড়টা আর ছোটটা। সেই জন্য দু'টোতে খুব ভাব। বড়দার চাকরি গেল বলে ছোটজন তার পোস্ট অফিসে জমানো টাকা তুলে এনে বড়দার হাতে দিল।

রাণু অন্যমনস্ক হয়ে গভীর শ্বাস ছাড়ল একটা, সেই টাকা থেকেই যত অশান্তি।

তোর ছোট দেওরকে আমি কখনও দেখিনি।

না। ও আমাদের বাড়ি যায় না।

কেন?

কী জানি। লজ্জা পায় বোধহয়। কিন্তু খুব যে লাজুক তাও নয়। দশজনের সামনে রুখে দাঁড়াতে পারে। সেদিন বাবার ঠাকুরঘর থেকে পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল, আর তার জন্য খেটে এল জেল। মামলাও চলছে। নেনটু ওই রকমই। আগে বক্সিং করত। বাবা বকে বকে ছাড়িয়েছে। কিন্তু এখনও বক্সিংয়ের সেই রোখটা রয়ে গেছে ওর ভিতরে। ওদের দু'জনকে নিয়ে বড় জ্বালা এ-সংসারে।

অনেকক্ষণ বসলাম রাণুর ঘরে। কথায় কথায় ক্লান্তি কেটে গেল। ভর দুপুরে উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, সঙ্গে রাণু। এ-সময়ে নীচে থেকে সিঁড়ি বেয়ে একজন উঠে আসছে। তাকে দেখে আমার ভিতরটা চমকে উঠল। রোগা, লম্বা, কালো সেই ছেলেটা।

নেনটু। রাণু আমাকে বলল, তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, নেনটু, এই আমার বন্ধু মঞ্জু।

সে ভ্রূক্ষেপও করল না। গভীর চিন্তান্বিত তার লম্বাটে মুখ। একবার মুখ তুলে বলল, ও।

তারপর আমাদের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেল।

রোদ-চশমাটা পরে নিয়ে বাইরের খরার পৃথিবীর দিকে চেয়ে বললাম, চলি।

আসিস। যখন খুশি আসিস। বড় ভাল লাগে রে।

আসব।

মনোতোষ বোধহয় বাজিটা হেরেই গেল। আজ তার বাজির সাত দিন। বড়দা আসেনি। বাজিটা জিতে যাচ্ছি বলে কিন্তু আমি একটুও খুশি নই। বড়দা এলে আমি দৌড়ে গিয়ে মনোতোষের বাজির পাঁচটা টাকা দিয়ে আসি।

পরশুদিন আর-এক বার বাড়ি সার্চ হয়ে গেল। ঠিক সার্চ নয়, খোঁজখবর। থানা থেকে কয়েকজন লোক এসে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। তখন বেশ রাত। অফিসার আর কয়েকজন কনস্টেবল এসে কড়া নেড়ে ঘরে ঢোকে। বড়দার ঘরে তারা এক বার মাত্র উঁকি মারে। তারপর বাসার সব লোককে ছেড়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কেন জানি না, আমার ওপরই তাদের রোখটা বেশি।

অফিসার হাসিমুখে বললেন, খবর আপনারা ঠিকই জানেন। বলছেন না।

আমি ধীর গলায় বললাম, সত্যিই জানি না।

উনি উলটে তখন জিজ্ঞেস করলেন, জানলে কী করতেন? বলতেন? চুপ করে থাকি।

উনি হাসেন, বলেন, হাজত জায়গাটা খারাপ হলেও নিরাপদ। সেখানে প্রাণের ভয় কম। হাজতের বাইরে বাংলাদেশটা কিন্তু নিরাপদ নয়। আপনার দাদা আমাদের হাতে ধরা না পড়লেও অন্য কারও হাতে ধরা পড়তে পারেন।

উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায় আমার ভিতরটা কেমন হয়ে গেছে। বড়দার এই পরিণতির কথা আমিও ভাবি। ভিতরটা কাঁপে, দুর্বল লাগে।

অফিসার বললেন, তাই বলছিলাম, জানা থাকলে বলে দিন। ওঁর প্রাণের ভয়টা অন্তত আমাদের কাছে নেই।

ঠিক এই সময় বাবা আমার পিছন থেকে বললেন, প্রাণের ভয় আবার কী? প্রাণে কি ও বেঁচে আছে নাকি! মেরে ফেলেছে নিশ্চয় এতদিনে—

অফিসার কৌতূহলে বাবাকে দেখলেন, বললেন, তার মানে? কে মেরে ফেলেছে?

বাবা হঠাৎ কথাটা বলে পরমুহূর্তেই ঘাবড়ে গেছেন। আমতা আমতা করে বললেন, যে-কেউ মেরে ফেলেছে। এখন তো সবাই খুনে।

অফিসার শ্বাস ফেলে উঠে বললেন, কারেক্ট কোনও ইনফর্মেশন থাকলে আমাদের জানাবেন।

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি চলে যেতে যেতে ফিরে এক বার আমাকে দেখলেন। বললেন, আপনার কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কিছু নেই তো!

না।

উনি ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, কয়েকদিন আগে এ-পাড়ার কয়েকটা ছেলে একটা মিছিলের ওপর হামলা করে। মিছিলটা ছিল খরাক্লিষ্টদের জন্য সাহায্যের মিছিল। বড় বড় লোকেরা তাতে ছিলেন। তাঁরা ডায়েরিও করে রেখেছেন, কিন্তু ছেলেগুলোকে আমরা কিছুতেই আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। তারা কারা জানেন?

আমি মাথা নাড়লাম।

উনি হাসলেন, ওঁদের দেওয়া একটা ছেলের বর্ণনার সঙ্গে কিন্তু আপনার বেশ মিল। সেই ছেলেটা তিন-চারটে ছেলেকে ঘুঁষি মেরে ফেলে দেয়, তারপর ঘুঁষি চালাতে চালাতে ভিড় কেটে বেরিয়ে যায়। অতগুলো লোক তাকে ধরতে পারেনি।

আমি চুপ করে থাকি।

উনি ঠান্ডা গলায় বললেন, যত দূর জানি আপনি বক্সার ছিলেন। না?

আমি একটা শ্বাস ফেলি।

উনি সেটা লক্ষ করলেন। বললেন, সোমসুন্দরবাবু, মিছিলটা কিন্তু কোনও পলিটিক্যাল মিছিল ছিল না। মিছিলটার উদ্দেশ্যও ভালই ছিল। তবু কেন তার ওপর কয়েকটা ছেলে হামলা করেছিল? আপনি

একটু ভেবে দেখবেন, ছেলেগুলো কাজটা ঠিক করছিল কি না। একটা নন-পলিটিক্যাল মিছিলের ওপর এই অ্যাগ্রেশনের কোনও মানে হয় না।

এই সব প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না। সুন্দর অদ্রিকে দেখে দাদার বিয়ের আসরে আমার যেমন অযৌক্তিক রাগ রাগ হয়েছিল, এও তেমনি একটা ব্যাপার। মিছিলটায় অনেক সুন্দর ছেলেমেয়েরা ছিল, চিত্রতারকারা ছিলেন, গায়ক-গায়িকারা ছিলেন। মিছিলের ওই অভিজাত সৌন্দর্যটা আমার সহ্য হয়নি। পরিণতি কী হবে না-ভেবেই আমি আমার রাস্তার বন্ধুদের ডাক দিয়ে ছুটে গিয়ে মিছিল আটকাই। আমার বন্ধুরা ব্যাপারটার মাথামুন্ডু বুঝতে পারেনি। তারা আমাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে হুজ্জতে খানিকটা জড়িয়ে পড়ে। তারপর গোলমাল দেখে পালায়। তিন-চারজনের সঙ্গে নয়, মাত্র দু' জনের সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়েছিল। তারা দিলীপ আর বাবু। এই এলাকার সবাই ওদের চেনে। নামকরা গুণ্ডা। দিলীপের সঙ্গে এক সময়ে গড়িয়াহাটায় আমি বিস্তর আড্ডা দিয়েছি। পুলিশের কাছে দিলীপ আমার নাম অনায়াসে বলতে পারত। বলেনি দেখে অবাক লাগছিল। বস্তুত ওই ঘটনার পর প্রতিমুহূর্তেই আমি পুলিশের জন্য অপেক্ষা করেছি।

অফিসার আমার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলেন। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

চলে যাওয়ার আগে উনি বললেন, আপনি একটু বেশিমাত্রায় অ্যাগ্রেসিভ।

পুলিশ চলে গেলে বাবা আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন। তারপর খুব হতাশ গলায় বললেন, মিছিলের ওপর হামলা করেছিস নাকি?

আমি হাসলাম, ও কিছু না।

বাবা বললেন, তোদের গায়ে কীসের জ্বালা কে জানে! তোরা দু'টো ভাই আমাদের শান্তি দিবি না নাকি?

আমি অপরাধী মুখ করে চুপ করে থাকি।

বাবা বড় শ্বাস ফেলেন, ভেবেছিলাম, বাবার গায়ের জ্বালা যখন আমার মধ্যে নেই তখন আমার ছেলেদের মধ্যেও থাকবে না। কিন্তু ঠিক থার্ড জেনারেশানে বাবাই আবার ফিরে এসেছেন। তোকে দেখলে আমার বুক কাঁপে।

বারান্দায় অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন বাবা। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলাম। পুলিশ এসে চলে যাওয়ার পরও একমাত্র ছোড়দাই স্বাভাবিক আছে। বই নিয়ে আইনের ধারা মুখস্থ করছিল। ওর সামনে এখন আমরা কেউ নেই। আছে সুন্দর মেয়ে মালা, আছে ভবিষ্যৎ। পুলিশের বুটের শব্দে বাচ্চাটা উঠে পড়েছিল, তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে বউদি এসে বারান্দায় বসল। মা ছোড়দার বিছানায় বসে আছে, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর পিঠে। ছোড়দাকে এ সময়টায় মশা কামড়ায়। অন্য হাতে মা চোখের জল মুছছে—একটু আগে দেখে এসেছি।

বাবা মাথা টিপে ধরে বললেন, তোমাদের সংসারটা ভেসে যাচ্ছে বউমা। সামাল দিতে পারবে না। ওই নেনটুকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশে। খুব মারবে। মেরেই ফেলবে। আর-এক জনকে তো মেরে ফেলেছেই।

বউদি চাপা ধমক দিয়ে বলল, কী বলছেন? অলক্ষুণে কথা—

বাবা মাথা নাড়েন, না হলেই ভাল। কিন্তু সত্য বাড়ির বাইরে কোথাও এতদিন থাকেনি। বড় ভিতু ছেলে, খুঁতখুঁতে। ও কি কোথাও গিয়ে থাকতে পারে? মেরেই ফেলেছে, লাশ সরিয়ে ফেলেছে কোথায়—

বাবা! বউদি আর্তনাদ করে।

মা উঠে এসে বলে, আস্তে কথা বলো। নিতু পড়ছে।

আমরা চুপ করে যাই। তারপর বারান্দায় তিন জন নিজেদের তিন রকম ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন হই। একা হয়ে যাই। গভীর রাত পর্যন্ত আমরা কেউ শুতে যাই না। ঘুমের কথা মনেই আসে না। রেলিঙে ভর দিয়ে আমি সামনের দিকে চেয়ে থাকি। বউদি নিঃশব্দে কাঁদে। বাবা চুপ, পাথরের মতো। সেই নিস্তব্ধতায় কেবল ছোড়দার বই পড়ার গুনগুন শব্দ হয়।

মা কোন দলে তা ঠিক বোঝা যায় না। মা এখন যেমন নির্বিকারভাবে ছোড়দার পিঠে হাত বুলিয়ে

দিচ্ছে, ঠিক ওইরকম দরকার হলে আমার পিঠেও দেবে। বড়দা ফিরে এলে বড়দার পিঠেও হাত বোলাবে। মাঝে মাঝে মাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করি, আমাদের মধ্যে কাকে বেশি ভালবাসো মা? মা ফোকলা মুখে হাসে। আমার মা ওইরকমই। নন্দরানী ছিল মার কোল-পোঁছা মেয়ে। সে মরে যাওয়ার পর থেকেই মার বোধবুদ্ধি যেন-বা কমে গেছে।

অনেক রাত পর্যন্ত আমি মাকে নিয়ে ভাবলাম।

এ-সবই পরশুদিনের কথা। মনোতোষ বলেছিল, সাত দিনের মধ্যে বড়দা ফিরবে। আমার মন বলছিল, মনোতোষ জিতে যাবে। কিন্তু আজ সেই সাত দিনের দিন। বড়দা ফেরেনি।

পুলিশ আমাদের কাছে বড়দার খোঁজ নেয়। আবার আমরা নিই পুলিশের কাছে। আজ সকালেই মালার বাবা সুধাংশুবাবু এসে আমাকে ডেকে নিলেন। ফরসা বেঁটেখাটো লোকটি, দু'টো চোখে খুব বুদ্ধির ঝিলিক। সন্ধের পর একটা পকেটওলা ফতুয়া আর লুঙ্গি পরে যখন নীচের তলার ঘরে এসে বসেন তখন মক্কেলদের ভিড় লেগে যায়। আস্তে আস্তে ফতুয়ার পকেট টাকায় ফুলে ওঠে। গোনার সময় পান না। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এক আই-এ-এস অফিসারের সঙ্গে। দুই ছেলের একজন পুনায় চাকরি করে, অন্যজন নেপালের ভদ্রপুর থেকে বিদেশি জিনিস কিনে এনে কলকাতায় বেচে। বাড়িতে থাকে কমই। মোটামুটি সুধাংশুবাবুর মতো সুখী লোক দেখা যায় না। সে-কথা তিনি পাঁচজনের কাছে স্বীকারও করেন। সন্তোষপুরে দুই বিঘা জুড়ে বাড়ি করেছেন। পুকুর আছে, বাগান আছে, গোরু আছে। বারান্দায় গ্রিল, প্রতি ঘরে বাথরুম, মেঝেয় দামি মোজাইক। সেখানে কেউ থাকে না, একমাত্র মালি আর গোরু দেখাশুনো করার লোক ছাড়া। মাঝে মাঝে কেবল তাঁরা ওখানে বেড়াতে যান। তিন-চার দিন থেকে আসেন। রোজ সকালে সন্তোষপুর থেকে প্রথম বাসে তাঁদের দুধ আসে, ফুল আসে, তরিতরকারি, এমনকী মাছও আসে। সেই বাড়ির ছবি তুলে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছেন। মক্কেলরা দেখে, আমরাও দেখেছি। মক্কেলদের মাঝে মাঝে কেস হিস্ট্রির ফাঁকে ফাঁকে বলেন, লোকে বলে পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গোরু, এ-সব সত্যযুগের কথা। কিন্তু আমার সন্তোষপুরের বাড়িতে যদি যান দেখবেন অবিকল তাই। পুকুরে মাছ, তিনটে হরিয়ানার গাই চব্বিশ সের দুধ দেয়, বাগানে তরিতরকারি, আম-জাম-কলা, ছেলে দু'টো বাইরে থাকে, ছোট মেয়েটা তো খাওয়ার নামে মুখ সিঁটকোয়, আমরা বুড়োবুড়ি—তা খায় কে?

কোনও মক্কেল পরামর্শ দেয়, বেচে দেন না কেন?

শুনে ভারী রেগে যান, বেচব কেন? বেচার জন্য তো করা নয়! আমার বড়লোক বাপ অল্প বয়সে একবার তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নিজের রোজগারে বাপকে ছাড়িয়ে যাব। বলে হাসলেন। সে হাসিতে তৃপ্তি ফুটে ওঠে। বলেন, বাগানে তরিতরকারি শুকিয়ে যায়, গাছের ফল পেকে পচে পড়ে যায়, গোরুর দুধ খেয়ে নেয় বাছুর, মাছের গায়ে শ্যাওলা পড়ে—মশাই, এ আমার ভালই লাগে।

বেঁটে মানুষ। ট্রামে-বাসে মানুষের বগলের গন্ধ শুঁকতে হয়। তাই একটা গাড়ি কেনার কথা ভাবছেন ইদানীং। ভাতঘুমটা এই বয়সে বড্ড জ্বালায়। ফলে ট্রামে ঘুমের ঝোঁকে মাথাটা গোঁত্তা খেয়ে অন্যের গায়ে লাগে, লোকেরা ব্যঙ্গ করে। গাড়ি হলে দিব্যি নিরিবিলিতে গাড়ির কোণে মাথা রেখে ঘুমটি পরিপাটি সেরে নেবেন।

সুখী সুধাংশুবাবু গম্ভীর মুখে আমাকে ডেকে বললেন, নেনটু, গত রাত্রে থানায় কিছু লোক ধরে এনেছে। একবার যাবে নাকি? যদি সত্য ওর মধ্যে থেকে থাকে!

তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে একটুও দেরি হয় না যে, আমার বড়দার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা নেই। আছে বিরক্তি। তাঁর সুখের জীবনে কোথাকার কে এক সত্যসুন্দর—কাক যেমন গেরস্তর বাড়িতে মরা ইঁদুর ফেলে যায়—তেমনি এক অদ্ভুত সমস্যা ফেলে গেছে। সত্যসুন্দর ফিরে এসে যতক্ষণ না আগের মতোই সংসারের ভার নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিত্যসুন্দরকে কেড়ে নেওয়া যাচ্ছে না। মালা বড় একগুঁয়ে জেদি। অবিমৃশ্যকারীও বলা যায় তাকে। নিত্যসুন্দর পাত্র হিসেবে কিছুই না। জুডিশিয়ারি পাশ করে মুনসেফ হলেও তাঁর বড় জামাইয়ের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। নিত্যসুন্দরের আছে কেবল চেহারাটা। লম্বা ছিপছিপে ফরসা, টেনিস খেলোয়াড়ের মতো ফিগার আর অসম্ভব সুন্দর মুখশ্রী।

মুখখানা লম্বাটে, কালো মিশমিশে ভ্রূ, টানা চোখ, সুন্দর নাক, ঠোঁট। সিনেমার পরদা থেকে নেমে আসা চেহারা। তবু সুধাংশুবাবুর বিষয়ী চোখ জানে, এ-সব জীবনে খুব একটা কাজে আসে না। এবং সুন্দর চেহারার বখেরা অনেক, দাবিদার জুটে যায়। তবু মালার এই পছন্দকে তাঁদের মেনে নিতে হয়েছে। নিত্যসুন্দরের অবাধ যাতায়াত ও-বাড়িতে। ওই পরিবারের সঙ্গে সন্তোষপুরের বাড়িতেও কখনও কখনও চড়ুইভাতি করে আসে নিত্যসুন্দর। ফিফটি পার্সেন্ট জামাই হয়ে গেছে। লোকে জানে, আত্মীয়স্বজনরাও জেনে বসে আছে। সংসারের এই সব পাকা ঘুঁটি আর কাঁচানো যায় না। তাই নিত্যসুন্দরকে আলাদা হওয়ার পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন তাঁরা। আমরাও জানি। সামনে মাসে বিয়েটা হয়ে গেলে নিত্যসুন্দর আলাদা হতেও পারে। গোল বাধিয়েছে সত্যসুন্দর। এই বুড়ো বয়সে কেউ যে এমন ছেলেমানুষি করতে পারে তা সুধাংশুবাবুর জ্ঞান অভিজ্ঞতায় আসেই না। ছোট জামাই জালে পড়ে ছটফট করছে, সুধাংশু টেনে তুলতে পারছেন না।

তাঁর গম্ভীর, চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে আমার একটু কষ্ট হল। ক'দিন আগে ভাবী আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তিনি জামিন দিয়ে নিয়ে এসেছেন। সত্যসুন্দরের এখনও খোঁজ নেই।

আমি বিনীতভাবে বললাম, বড়দা বোধহয় কলকাতায় নেই। থাকলে একটা খবর দিত ঠিকই। ছেলেটাকে বড্ড ভালবাসে। তাকে ছাড়া থাকতেই পারে না। তারও একটা খবর নেওয়ার চেষ্টা করত।

বড়দা তার শিফট ডিউটির শেষে যখন তখন ফিরত। ফেরার ঠিক ছিল না। কিন্তু যে সময়েই ফিরুক নীচের তলায় সিঁড়ির প্রথম ধাপটিতে পা দিয়েই ছেলের নাম ধরে চিৎকার করতে করতে উঠত। বাচ্চা বুবলা সাড়া দিত। ছুটে যেত সিঁড়ির মুখে। আনন্দে কেঁপে কেঁপে হাসত। আজকাল বুবলা ঘুমের মধ্যেও চমকে জেগে উঠে পরিষ্কার রাগের গলায় জিজ্ঞেস করে, মা, বাবা কোথায়? তার মা তাকে ভোলায়, এই তো আসবে। তোমার জন্য কত কী আনবে। পুতুল, বল, চকলেট—কত কী—! ছেলেটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। পৃথিবীর সর্বত্র একই নিয়মে বাচ্চাদের স্তোক দিয়ে, ভুলিয়ে রাখা হয়। বাচ্চারা ভুলে থাকে। কিংবা হয়তো মনে রাখে। আমরা জানি না। তবে, বুবলা তার বাবাকে ভুলে যাচ্ছে এ-কথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়।

সুধাংশুবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, তবু একবার দেখে আসা ভাল। যদি সত্য থেকে থাকে তো জামিন দিতে হবে।

ও-সি মানুষটি ভালই। যদিও মুখে অবিরল খারাপ কথা লেগে আছে। তবু তাঁর মাথা ঠান্ডা, হাসিটি সহৃদয়তায় ভরা। কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, দর্শনশাস্ত্রে এম এ। আমাকে দেখে মুখ তুলে হাসলেন, বললেন, কী, গায়ের ব্যথা কেমন?

আমি চুপ করে রইলাম। গায়ের ব্যথা মরে গেছে। কিন্তু আমি কিছুই ভুলি না।

উনি গলা নিচু করে বললেন, কনস্টেবলরা মুখ্যসুখ্যু মানুষ, গাঁওয়ার, ওদের ব্যবহার মনে রাখবেন না। মারধরের নিয়ম চলে আসছে, আমরা ঠেকাতেও পারি না। সারা দিন চোরচোট্টা পকেটমার নিয়ে কারবার—বোঝেন তো! অটোমেটিক্যালি মুখ খারাপ করে ফেলি, হাত উঠে যায়। বসুন না, বসুন।

বললেন, দাদার কোনও খবর পেলেন?

মাথা নাড়লাম, না। খবর নিতেই এসেছি। কাল রাত্রে কয়েকজনকে নাকি ধরে এনেছেন আপনারা।

উনি মাথা নাড়লেন, ওর মধ্যে নেই। সকলের বয়সই কুড়ির নীচে বা একটু ওপরে। একটা বাড়িতে পাঁচ-সাত জন ছেলে আর তিন-চারটে মেয়ে একসঙ্গে ছিল। একটা ছেলে বোমা ফেটে মরণাপন্ন, আমরা যখন রেইড করি তখন ছেলেটা চেঁচাচ্ছে—আমাকে মেরে ফেললে এরা, আপনারা বাঁচান।

বলেই হেসে ফেললেন তিনি। খিক খিক করে ইঙ্গিতময় একটা অশ্লীল হাসি। বললেন, সেই বিপ্লবের ডেরায় আমরা কী কী পেয়েছি জানেন? বোমা, রিভলবার, শটগান, কার্তুজ, কুভুল, ছোরাছুরি আর প্রচুর পরিমাণে কনট্রাসেপটিভস।

আমি চুপ করে রইলাম।

উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটুক্ষণ। মুখে সেই হাসি। বললেন, অবশ্য খবরের কাগজে কনট্রাসেপটিভসের কথা আমরা জানাব না। কিন্তু আমরা জানি এই রোমান্টিক বিপ্লবের পিছনে

সেক্স অনেকটাই কাজ করছে। বিপ্লবের মানে অনেকের কাছেই ফ্রিডম অফ সেক্স। বয়সের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে থাকছে, উঠছে, বসছে, এনজয় করছে—কারও কিছু বলার নেই। এরা বেশির ভাগ গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে। ছাত্রছাত্রী কিংবা বেকার, ভবিষ্যতের আশা ভরসা কিছু নেই, বাড়িতে আদর নেই, বিয়ে-শাদির কথা ভাবতেও পারে না। এইভাবে পুষিয়ে নিচ্ছে। আর কিছু আছে বড়লোকের ছেলে, পার্ক হোটেল ব্লুফক্স বা ট্রিঙ্কাতে মদ খায়, নাচে, ইংরিজি গান গায়, বাজনা বাজায়, ইংরিজি স্কুল বা ভাল কলেজে পড়ে—তাদেরও কিছু ফ্রাস্ট্রেশন আছে। তাদের কাছে জীবনটা বড্ড সিকিওরড। একঘেয়ে, ঝুঁকিহীন জীবন। পাশটাস করলেই বাপ-দাদা বড় চাকরিতে বসিয়ে দেবে। কিংবা বিলেত ঘুরে আসতে পাঠাবে। ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, অঢেল ব্ল্যাকমানি, মাথা চিন্তাশূন্য। তারা জীবনটাকে আর-একটু ইন্টারেস্টিং করার জন্য বিপ্লবে নেমে পড়ে। ধরা পড়লে বাপ-দাদা খালাস করে নিয়ে যায়। বড় উকিল ব্যারিস্টার লাগায়, মিনিস্টারদের ধরা-করা করে।

উনি মিটমিটে চোখে আমার মুখখানায় কী একটু খুঁজে বললেন, এইসব চ্যাংড়াদের দলে আপনার দাদা যে কেন ভিড়তে গেলেন!

এর কোনও উত্তর আমি জানি না।

উনি শ্বাস ফেলে বললেন, দেশের রাজনীতি এবং বিপ্লব টিপ্লবের পিছনকার সবচেয়ে সত্যি কথাগুলো পুলিশেরই জানা আছে। পাবলিক পুলিশকে যতই ঘেন্না করুক, পুলিশের চেয়ে জ্ঞানী দেশে আর কেউ নেই। আপনার দাদাকে পেলে তাঁকে আমি এমন কিছু ইনফরমেশন দিতে পারতাম যে রাতারাতি তাঁর রাজনীতি ঘাম দিয়ে ছেড়ে যেত, তিনি পুনর্মূষিক হয়ে যেতেন। যদি দাদাকে পান আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

উঠতে যাচ্ছিলাম। উনি হাত তুলে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ঘরের মধ্যে অবিরল লোকের যাতায়াত। তিনি অফিসের কাজকর্ম দু'-একটা সেরে নিচ্ছেন। বোঝা যায় গপ্পে লোক। অনেক কথা জমে আছে বুকে।

তারপর মুখ তুলে বললেন, আমরা খবর রাখি, ক'দিন আগে আপনি একটা মিছিলে হামলা করেছিলেন। আপনার নামে একটা ডায়েরিও করা আছে। কিন্তু যত দূর মনে হয়, আপনি কাজটা করেছিলেন অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে, ভেবেচিন্তে করেননি। তা ছাড়াও আমাদেরও এ-সব ছোটখাটো হামলা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। রোজ খুন জখম ডাকাতি আর বিপ্লব সামলাতে হিমসিম খাচ্ছি। চুরি ছিনতাই মারধরের গাদা গাদা ডায়েরি পড়ে আছে—অ্যাকশন নেওয়া যাচ্ছে না। আপনার বিরুদ্ধেও নিচ্ছি না। কিন্তু বলে রাখি, শরীর যখন খুব ছটফট করবে তখন বাইরে কোথাও চলে যাবেন। স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে ক'দিন থাকলে লিভার স্টম্যাক সব ঠিক হয়ে যাবে। উত্তেজনা কমে যাবে। এবং স্বাভাবিক বোধ করবেন। খামোখা কারও ওপর হামলা করতে ইচ্ছে হবে না।

কোনও উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লাম। উনি হাসলেন। বললেন, আসবেন মাঝে মাঝে। এখানে এলে জ্ঞান বাড়ে।

আকাশ পিঙ্গল। খুব ধুলো উড়ছে চার দিকে। কেঁচোর মতো ঘামের ফোঁটা নেমে যাচ্ছে শরীর বেয়ে। ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে নেমে এসে চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে। রুমালটা বড্ড ময়লা, চোখ মুছলে চোখ জ্বালা করে। আগে বউদি রুমাল কাচত, গেঞ্জি কেচে দিত। আজকাল দেয় না। যেমন ছেড়ে রাখি, তেমন পরে বেরোই। ঘামে ভেজা গেঞ্জি থেকে উৎকট গন্ধ পাওয়া যায়। কাঠকয়লা দিয়ে দাঁত মাজি বলে মুখটা বিস্বাদ লাগে সারা দিন। গালেব দাড়ি বেড়ে যায়, কামানোর কথা খেয়াল থাকে না। প্যান্টের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে, গ্রীষ্মকালে তিন-চার দিনের পরা শার্ট, ন্যাতার মতো গায়ে ঝুলছে, চটির রং ঢেকে গেছে ধুলোয়। নিজেকে নোংরা লাগে, দীনদরিদ্রের মতো মনে হয়। এই দীনদরিদ্র নোংরা চেহারাটা কেবল আমার নয়, সারা কলকাতার। ওই ধু ধু জ্বলে যাচ্ছে আকাশ, পার্কের গাছগুলোর পাতায় পাতায় ধুলোর আস্তরণ, মাঠে ঘাস নেই, পথে ভিখিরির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে খুব। কলকাতা পুড়ছে, ধুলোয় ডুবে যাচ্ছে, মুমূর্ষু এই শহরের নিঃশব্দ চিৎকার ভিখিরিদের গলায় উঠে আসছে।

আমি আমার বড়দার মতো রোমান্টিক নই। বিপ্লব করিনি। কিন্তু মনে হয় কিছু একটা ওলট-পালট

আমারও করার ছিল। কী করব তা ভেবে পাই না। কিন্তু শরীর জ্বলে, হাত-পা নিশপিশ করে। এইরকম এক অর্থহীন উত্তেজনায় সেদিন মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে যাই। লরির মাথায় চিত্রতারকারা বসে আছেন, মাইক্রোফোনে বাজছে গান। দুরন্ত রোদে ওই সাজানো মেকি মিছিলটা ভেঙে দেওয়া দরকার—এইরকম একটা বিশ্বাস হঠাৎ এসেছিল আমার ভিতরে। কিন্তু কাজ হয়নি। তাড়া খেয়ে আমি পালিয়ে যাই, মিছিলটা যথারীতি তার গন্তব্যে পৌঁছোয়, চিত্রতারকারা তাঁদের সুন্দর শীতল আবাসে নিরাপদে ফিরে যান, আর এদিকে আমাকে বাচ্চা ছেলে ঠাউরে নিয়ে থানার ও-সি, কিংবা পুলিশ অফিসার ধমক দেন, চোখ রাঙান। এমনই কঠিন এই শহরের আস্তরণ, মানুষের হৃদয় এবং ঘটনাবলী—এর কোথাও আমার আঁচড়-কামড়ের দাগ বসে না, বৃথা চেষ্টা।

দুপুরের বাস, তবু ভিড়ে অন্ধকার হয়ে আছে। এত লোক যে কোথায় যায়! ভিতরে মানুষের শরীরের ঘাম, তাপ, গন্ধে বাসটা পচে আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস গায়ে লাগে, কটু গন্ধ পাওয়া যায়। উঠতেই রোগা, হলদে চামড়াওয়ালা কন্ডাক্টর তার শীর্ণ নোংরা হাতটা বাড়িয়ে দেয় টিকিটের জন্য। সেই হাতটায় শিরা জেগে আছে, বড় নখ, নখের নীচে নীল ময়লা। তার ঘেমো গা থেকে, ঘামে ভেজা পয়সার ব্যাগ থেকে কটু চামসে গন্ধ আসছে। বিরক্ত হয়ে ভিড় ঠেলে ভিতরে এগিয়ে যাই। দু'-একজন ফিরে তাকায়। মুখগুলো—আশ্চর্য—একই রকম দেখায়। সেইসব মুখে বিরক্তি, রাগ, হতাশা। আগুনের মতো হালকা বাতাস মানুষকে নির্জীব করে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বাইরে। আর বাসের ভিতরে দমবন্ধ বায়ুহীনতা। ঘাম—বড্ড ঘাম মানুষের শরীরে। গায়ে গা লাগলে শরীরগুলোকে মাছের পিছল শরীরের মতো মনে হয়।

এই দুপুরেও রড ধরে গায়ে গায়ে মানুষ দাঁড়িয়ে। একজন রগচটা ক্ষয়া চেহারার লোককে ঠেলে খানিকটা সরিয়ে ফাঁকে দাঁড়ালাম। লোকটা বোধহয় বিরক্ত হয়েই মুখ তুলে তাকাল। গ্রাহ্য করলাম না। দাঁড়াতেই দেখি, সামনের সিটটা খালি হচ্ছে। বসে থাকা লোকটা উসখুস করছে, উঠি-উঠি ভাব, শরীরটা ঘাই দিচ্ছে। আমাদের দু'পাশ থেকে দু'-তিনজন লোক তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। ডান পাশের জন আমাকে সরানোর জন্য কনুই দিয়ে একটু ঠেলা মারে, বাঁ পাশের জন হাত বাড়িয়ে আমার পথ আটকাতে চেষ্টা করে। এ-সব ক্ষেত্রে আমি বরাবরই পিছিয়ে যাই, জায়গা ছেড়ে দিই। কিন্তু আজ আমাব ভিতরে খরার জ্বালা, বড়দা পুলিশ বিপ্লব বাবা মালা খরা—সব কেমন ঘুলিয়ে ওঠে। মাথাটা ঠিক নেই। বুঝতে পারছি, জায়গাটা আমার পাওয়া উচিত না, যে ক্ষয়া চেহারার লোকটা আমার বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে, জায়গাটা ওরই ন্যায্য পাওয়া উচিত। কিন্তু বসা লোকটা উঠে দাঁড়াতেই আমি শরীরটা বাঁ দিকে মুচড়ে ক্ষয়া চেহারার লোকটাকে সরিয়ে দিই। এমন বিশ্রীভাবে যে আশপাশের লোক আমাকে লক্ষ করে। ক্ষয়া মানুষটার চেহারা খেঁকি ধরনের—যেন টোকা লাগলেই খ্যাঁক করে উঠে মেয়েলি গলায় ঝগড়া করবে। কিন্তু ঝগড়ার জন্য আমিও প্রস্তুত। কিছু বললেই আমি লোকটার ঘাড় ধরব। লোকটাকে সরিয়ে আমি তাই আমার আগুনে রাগের চোখে লোকটার দিকে রুখে তাকিয়েছি।

কিন্তু লোকটা—আশ্চর্য—একটুও রাগ নেই মুখে—আমার মুখের দিকে অকপটে তাকিয়ে বিনীতভাবে বলল, বইসুন না, বইসুন।

কথার টানে বুঝি, সে পশ্চিমা। তার ভাঙা মুখে দুপুরের দারুণ গ্রীষ্মের কষ্ট ফুটে আছে। ফুটে আছে খিদের চিহ্ন, অপুষ্টি। তবু তাব মুখখানা ভারী নম্র, ভিতু, লাজুক। বসতে লজ্জা হতে লাগল। তবু বসলাম। লোকটা আবার উদাস চোখে বাইরের জ্বলন্ত কলকাতা দেখতে লাগল। আমি বেশি দূরে যাব না। মাত্র কয়েকটা স্টপ। না বসলেও আমার চলত। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ভারী একটা কষ্ট হতে থাকে বুকের মধ্যে। ওর বয়স আমার বাবার বয়সের সমান। নিজের ওপর ভারী রাগ হতে থাকে। পশ্চিমা, ভিতু ও ভদ্র লোকটা একটা ময়লা রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এক পলক আমার চোখে চোখ রাখে। একটু হাসে! কী সহৃদয়তার হাসি!

সেই হাসিটা সহ্য করতে পারলাম না। তখনও দু'টো স্টপ বাকি। হঠাৎ বুক থেকে একটা দলা গলার কাছে উঠে আটকে যায়। আমি উঠে দাঁড়ালাম। লোকজন ঠেলে এগিয়ে, ঘণ্টি মেরে নেমে পড়লাম।

চারি দিকে কলকাতা জ্বলছে। নিজেকে মনে মনে বলি, নেনটু, এটুকু হেঁটে যাও। এই কষ্টের শাস্তিটুকু নাও। ওই লোকটাকে তুমি বড় নিষ্ঠুরভাবে বসতে দাওনি। কষ্টটুকু তোমার ভালই লাগবে।

আশ্চর্য, ভালই লাগছিল। বাতাসের হলকা বুক পর্যন্ত সব রস শুষে নিচ্ছে। রোদের থাপ্পড় চড়াত

করে মুখে এসে পড়ে। চোখ জ্বালা করে। ধুলোয় কিরকির করে দাঁত। হাঁটতে তবু ভালই লাগে। ভিতরের গরমটা কমে যায়।

এই রকম ছোটখাটো ঘটনায় আমার মন কখনও কখনও ভীষণ চমকে ওঠে। অস্থির লাগে। কিছুদিন আগে কলেজ স্ট্রিটে এক বিকেলে হাজার লোকের ভিড়ে আমি দু'টি মানুষকে দেখেছিলাম। একজন খুব লম্বা, সুন্দর, হিলহিলে শরীরের যুবাপুরুষ। শ্যামলা গায়ের রং, তীক্ষ্ণ সুন্দর বুদ্ধিমান মুখশ্রী—খুব শিক্ষিত মানুষের ছাপ তার মুখে। সে একটা ফরসা পায়জামা আর লক্ষ্ণৌ চিকনের পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তবু তার চোখে ছিল কালো চশমা। তার পাশে দাঁড়িয়ে অন্যজন, কোলকুঁজো এক বুড়ি। সাদা থান তার পরনে, মুখে বিষণ্ণতা। একটা ইতর রিকশাওয়ালার সঙ্গে বুড়ি দরদস্তুর করছিল। দরে বনছিল না। কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম বুড়ি হিন্দিতে বলছে, এত ভাড়া চাইছ! ওই ভাড়ার চেয়ে কমে ট্যাক্সিতে আসা যেত। রিকশাওয়ালা তাকে অপমান করার জন্যই চেঁচিয়ে বলছিল, পায়দলে আরও সস্তা হয়। হেঁটে আসলেই পারতে!

বুড়ি তবু তর্ক করতে থাকে, বলে, তোমরা ঠক, জোচ্চোর। কলকাতায় আমরা নতুন এসেছি বলে—। ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বুড়ির হাত একবার ছুঁয়ে বলল, ছোড় দিজিয়ে না মা-জি। তার গলা এমন ভদ্র, এত সুন্দর ক্ষমার সুর তাতে. এত নরম, যেন এই পৃথিবীর কারও ওপর সে কখনও রাগ করেনি। বুড়ি তখন হঠাৎ চুপ করে গেল। একবার লম্বা যুবাপুরুষের মুখখানার দিকে চাইল মাত্র। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আমি আমার অন্ধ ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছি বলে সবাই যা খুশি করে। আমি বুড়ি, আমার বেটা অন্ধ—বলতে বলতে হাতের বটুয়া খুলে বুড়ি আরও পয়সা দেয় রিকশাওয়ালার হাতে। তখন আমি রিকশাওয়ালাকে ধমকাতে পারতাম, ভাড়া ঠিক করে দিতে পারতাম, কিন্তু কিছুই পারিনি। একটা কান্নার দলা ঠেলে উঠেছিল গলায়, ঠোঁট থির থির করে কাঁপছিল। কলকাতার দয়াহীন রাস্তায় এক দেহাতি বুড়ি তার সুন্দর অন্ধ ছেলেটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে, সামনে এক ইতর ঝগড়াটে রিকশাওয়ালা—আমি দ্রুত পায়ে এই দৃশ্যটার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

এই রকম হয়। এইসব দুর্বল মুহূর্তে আমি আর স্বর্গত কুমুদবন্ধু রায়ের থার্ড জেনারেশন থাকি না। অন্য রকম হয়ে যাই। ওই সুন্দর অন্ধ ছেলেটির ভগ্ন কণ্ঠস্বর আমার পেতে ইচ্ছে করে। বাসের ওই পশ্চিমাটার মতো আমারও ইচ্ছে করে সহজে, স্বাভাবিকভাবে সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করতে। কিন্তু কী যে হয়। কিছুতেই ও-রকম হতে পারি না।

বাড়ির রাস্তায় ঢুকতেই দূরবর্তিনী মালাকে দেখতে পাই। বুকের কোথাও একটু ব্যথা আজও লেগে আছে। মালা এলোচুলে তাদের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। দূরের দিকে চোখ। যেন কার অপেক্ষা করছে। মালা কোনও দিনই আর আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। বড় দূর লাগে তাকে। দুপুরের রাস্তা থেকে ওই ঝুলবারান্দার এলোচুল মালা বড়ই দূরের।

ঝুলবারান্দার তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে এক বার মুখ তুলে চেয়ে দেখি। চমকে উঠি। মালা ঝুঁকে আমাকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই হাসল। জিজ্ঞেস করল, এই দুপুরে কোথায় বেরিয়েছ? আড্ডা বুঝি?

স্বরটা ভারী ভাল লাগে। মুখ তুলে বলি, না। থানায়। মেসোমশাইকে বোলো, থানায় যাদের ধরে এনেছে তাদের মধ্যে বড়দা নেই।

বলব।

কথা ফুরিয়ে যায়। মালার সঙ্গে বলার মতো কথা আমার কত কম। তবু জোর করে কথা বানিয়ে বলতে ইচ্ছে করে। একটু সময় তবু ওর দিকে চেয়ে থাকার অধিকার।

রাস্তা থেকে ঘাড় উঁচু করে ভিখিরির মতো বললাম, তুমি কিন্তু গান শোনাওনি।

ও ঝুঁকে রেলিংয়ের ওপর থেকে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে হাসে। বলে, পরশুদিন রেডিয়োতে তিনটে প্রোগ্রাম আছে। শুনে নিয়ো।

মালা রেডিয়োতে গায়! একটু চমক লাগে। তবে তো মালা আমার সমস্ত সীমা ছাড়িয়েই গেছে।

তুমি রেডিয়োতে চান্স পেয়েছ? বলোনি তো!

ও ম্লান হেসে বলে, সমু, আমি রেডিয়োতে এর আগে আরও চার বার গেয়েছি। তুমি খবর রাখো না। যে খবর রাখে না তাকে আমার বলার দরকার কীসের?

রেডিয়োর গান তো জনসাধারণের জন্য মালা!

মালা উদাসীন চোখে চেয়ে বলে, তুমি জনসাধারণ নও? নিজেকে তার বেশি ভেবো না সমু। দি বক্সার ইজ ডেড।

কথাটা আজকাল মালা বার,বার বলে। আমি ঠিক অর্থ বুঝতে পারি না। কিন্তু বুকের ভিতরে এক ব্যাকুলতা জন্মায়। বলতে ইচ্ছে করে, এখনও মরেনি। একবার বলো, আমি দুই হাতের অবিরল আঘাতে সব ভেঙেচুরে দিয়ে যাব।

কিন্তু তা আমি বলি না। আমার রিং-এর পরিধি বড় ছোট হয়ে গেছে। মারবার পরিসর আর নেই। কোণ ঘেঁষে আমি দুই হাতের আড়ালে কেবল মার বাঁচানোর চেষ্টা করছি। খুঁজছি পালানোর সুযোগ। তাই শুষ্ক মুখখানা তুলে নরম, ভদ্র গলায় বলি, চলি, মালা।

সে উদাস গলায় বলে, এসো। তোমাদের বাসার সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর ক্রিমরঙা গাড়ি। তোমাদের বাড়িতে বোধহয় কেউ এসেছে।

অদ্রি! নিশ্চয়ই অদ্রি। অমনি আমার মন গুটিয়ে যায়। গাড়িওয়ালা, সুখী ও সুন্দর অদ্রির মুখোমুখি কিছুতেই দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না এখন। দু' পা এগিয়েও ফিরে আসি।

অসহায়ের মতো মুখ তুলে মালার কাছে প্রকৃত ভিক্ষুকের মতো বলি, এক গ্লাস জল খাওয়াবে মালা?

সে অবাক হয়। বাসা এত কাছে, তবু তার কাছে জল চাওয়া কেন! মালা হয়তো ভাবল, এটা একটা অছিলা, অজুহাত। এইভাবে তার কাছে যেতে চাই। সে তাই হেসে ফেলল। বলল, এসো। এ-বাড়ির সিঁড়ি তো তোমার চেনা। এলেই পারো।

লজ্জা পেলাম। তবু আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলাম ওপরে। মালা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। আন্তরিকভাবে বলল, এসো। রোদে একদম পুড়ে গেছ।

মালার বড় সাহস। আমাকে একা এই দারুণ দুপুরে তার ঘরে নিয়ে এল। ছায়ার ঘর। বিছানায় তানপুরা শুয়ে আছে। দেয়ালে প্লাস্টারের রবীন্দ্রনাথ। সুন্দর বুককেসে সুন্দর বই। বুককেসের ওপর সদ্য কেনা একটি হাই-ফাই রেডিয়ো, রেকর্ড প্লেয়ার। গানের খাতা ছড়িয়ে আছে চার দিকে। চার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই ঘরে যে থাকে তার বাস বাইরের রুক্ষ ওই পৃথিবীতে নয়। তার বাস পৃথিবীর ধুলো-মাটির আস্তরণের একটু ওপরে—একটা স্বপ্নের জগৎ—যেখানে অবিরল পৃথিবীর সব দুঃখ ও হতাশা, ব্যর্থতা এবং প্রত্যাখ্যান গান হয়ে যায়। অবিরল সবকিছু গলে যায় গানে। মালার ঘর তাই বহু উঁচুতে বলে মনে হয়। একশো কি দু'শো তলা ওপরের এই ঘর। জানালায় মেঘ ভিড় করে, চাঁদ ছোঁয়া যায়, একটু মুখ বাড়ালেই দেখা যায় দক্ষিণের সমুদ্র, আর উত্তরের পর্বতমালা। কলকাতার কোনও কোলাহল এখানে পৌঁছোয় না।

মালা অবহেলায় বলল, বোসো।

তারপর ঘরের কোণে রাখা বেলেমাটির কুঁজো থেকে জল গড়াল। আমার সামনে আনতেই দেখি, এত পরিষ্কার কাচের গ্লাস আমি কদাচিৎ দেখেছি। স্বচ্ছ, সুন্দর, ঠান্ডা জল। বুক কাঠ হয়ে আছে। জলটা শুষে নিই, বলি, আর-এক গ্লাস। মালা গ্লাস ভরে আনে। চুমুক দিয়ে চোখ তুলে গ্লাসের কানার ওপর দিয়ে দেখি, মালা নিবিষ্ট চোখে আমাকে দেখছে। মুখে দয়ালু হাসি। গ্লাসটা নামিয়ে বলি, মালা, বাংলাদেশের সব ঐতিহ্য মরে যাচ্ছে।

কেন?

আমাদের মা-মাসিরা এই ভরদুপুরে বাইরের লোককে শুধু জল খেতে দিত না। একখানা বাতাসা হলেও দিত।

মালা হাসল না। ভ্রূ কুঁচকে বলল, তোমার এত দাবিদাওয়া কীসের সমু?

কথা ঘোরাবার জন্য বলি, জনসাধারণের কি দাবিদাওয়ার শেষ আছে?

মালা হাসে আবার। বলে, দুপুরে খাওয়া হয়নি বুঝতে পারছি, কিছু খাবে সত্যি? এখন খেলে তো ভাতের খিদে নষ্ট হয়ে যাবে—

কিছু থাকলে দাও, আমার বড় খিদে পেয়েছে।

মালা প্রশ্রয়ের হাসি হেসে চলে যায়। আমি তার সুন্দর ঘরখানা দেখতে থাকি। দেখতে দেখতে ঘুম পেয়ে যায়। ইচ্ছে করে মালার সুন্দর সুগন্ধী নরম বিছানায় শুয়ে থাকি। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই।

কিন্তু তা হয় না। হাই তুলে উঠে একটু পায়চারি করি। দেয়ালে একটা পারিবারিক গ্রুপ ছবি। একমুহূর্ত তার সামনে দাঁড়াই। বহুকাল আগেকার দেখা মুখ সব। ছ'-সাত বা দশ-বারো বছর এদের আর দেখিনি। মালার বাবা তখন আরও রোগা ছিলেন, ডান দিকে কাটা সিঁথি, একমাথা চুল, মুখে বিষয়কর্মের তেমন ছাপ পড়েনি। মালার মা এখনকার মতোই—কেবল সে-আমলে জমকালো শাড়ি পরতেন, এক গা গয়না ছিল। ডানদিকে মালার দিদি মণিমালা—বড় সুন্দরী ছিলেন, খুব সরল। পাঁপরভাজা খেয়ে ঠোঁট মুছতে ভুলে যেতেন, তেল লেগে থাকত। মাথার সিঁথি হত আঁকাবাঁকা। বিয়ের সম্বন্ধ হতে দেরি হচ্ছিল, সুধাংশুবাবুর তখন তেমন টাকার জোর নেই, অথচ মণিমালা সুন্দরী—তাই কম খরচায় তার ভাল বিয়ে দেবার আশায় তিনি অপেক্ষা করতেন। গেজেটেড অফিসার বা ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য পাত্রপক্ষের সঙ্গে আলাপই করতেন না। বরং মেয়ের কোয়ালিফিকেশন বাড়াবার জন্য সেতার কিনে দিলেন, ভরতি করলেন বাজনার স্কুলে। কিন্তু সেতারে মণিমালার মন ছিল না। সকাল-বিকেল টুং টাং করতেন, আমরা গেলে লজ্জায় হেসে বলতেন, দ্যাখ, কী বিচ্ছিরি যন্ত্র, দু'টো হাত দু'ভাবে নাড়তে নাড়তে আমার শরীর ব্যথা হয়ে গেল। অবশেষে মণিমালার আই-এ-এস বর জুটে যায়।

পিছনে দাঁড়িয়ে মালার বড়দা রতন—গম্ভীর মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা নেই। শুধু জানতাম, তিনি অনেক ইন্টারভিউ দেন। চাকরি পান না। আমরা তাঁদের ছাদে উঠলে ভারী বিরক্ত হতেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মানিক। আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। ছোড়দার বন্ধু। লেখাপড়া তেমন হয়নি। তবে ভাল ফুটবল খেলত ছেলেটা। সেই জোরে রেলে চাকরি পেয়েছিল। এ-পাড়ার বিস্তর মারপিট করেছে সে। মার খেয়েছেও অনেক। একবার নন্দরানীর ইস্কুলে যাওয়া সে প্রায় বন্ধ করেছিল রাস্তায় রোজ দাঁড়িয়ে থেকে। বোধহয় নিজেদের বাসায় সে কখনও নন্দরানিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কিছু করেছিল। নন্দরানি মা'র কাছে এসে একদিন মানিকের নামে নালিশ করে কেঁদে ফেলে। রিঙের বাইরে আমি কদাচিৎ কাউকে মেরেছি। যে দু'-একজনকে মেরেছি তার মধ্যে মানিক একজন। দেশপ্রিয় পার্কের গোড়ায় তাকে ধরেছিলাম। সে আমার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, লাথি ছুড়েছিল পেটে। কিন্তু তখন আমি ছমছমে লড়িয়ে। আমার শরীর প্রজাপতির মতো হালকা, লোহার মতো শক্ত। তাকে জমি নিইয়েছিলাম। সে লজ্জার কথা মানিক কাউকে বলেনি কখনও। কেবল ছোড়দা বোধহয় টের পেয়েছিল। তাই আমাকে খুব বকেছিল—বয়সে বড় ছেলের গায়ে হাত দাও—খুব বক্সিং শিখেছ! তার ওপর মানিক আমার বন্ধু—ওদের বাড়িতে মুখ দেখানোর উপায় নেই, ছিঃ ছিঃ! ছোড়দার জন্যই মানিক মার খেয়েও দমেনি। নন্দরানীর স্কুলের পথে দাঁড়িয়ে থাকত, চিঠি দিত, নববর্ষে বিজয়ায় পাঠাত কার্ড। নন্দরানীও ক্রমশ নালিশ করতে ভুলে যাচ্ছিল, কারণ সেটা স্তাবকতা গ্রহণ করারই বয়স। বাধ্য হয়ে আমরা নন্দরানীর বিয়ে দিয়ে দিই। মানিকের ছবিটার দিকে চেয়ে ছিলাম। বহুকাল দেখা হয় না। রেলের চাকরিতে পয়সা নেই বলে সে ব্যবসায় নেমেছে। তিন-চার বছর আগে সে ভদ্রপুর থেকে আমাকে টেরিলিন শার্ট এনে দিয়েছিল। পুরনো শত্রুতা আর নেই। নন্দরানিও মরে গেছে। ছবির সামনে মাটিতে বসে আছে মালা। ঘাড় পর্যন্ত বব চুল, চোখে কাজল, পায়ে জুতো-মোজা। চোখে কৌতূহল—ক্যামেরার দিকে চেয়ে আছে। ঠিক ওই বয়সেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। ওই চোখে সে আমাকেও দেখত। হয়তো বা আমি একটু লাজুক ছিলাম, মালা তা ছিল না। টক টক করে দ্বিধাহীন পায়ে সে সিঁড়ি ভেঙে অনায়াসে উঠে আসত। নন্দরানী বাড়িতে না-থাকলেও সে আসত। একা বাইরের বারান্দার রেলিঙে পিঠ হেলিয়ে দাঁড়াত। দেখত আমার বালির বস্তায় ঘুঁষি মারা। তখনকার দিনে মেয়েদের সঙ্গে আমার মেলামেশা সহজ ছিল না। বন্য ও লাজুক বলে তার সুন্দর মুখ, পরিষ্কার সতেজ শরীর, চোখের কৌতুক—এ-সবের দিকে তাকাতেই পারতাম না। ভয় করত। রেলিঙে হেলে দাঁড়িয়ে মালা হাসত। দু' একটা কথা বলত, ইয়ার্কি দিত। কখনও বা নিবিষ্ট মনে দেখত আমার ছায়া-লড়াই। মালাদের ছাদে উঠলে আমাদের ছাদ দেখা যায়। ভোরবেলা ছাদে যখন স্কিপিং করতাম তখন প্রায়ই পশ্চিম দিকে মালাদের ছাদে দেখতাম মালাকে। দূর থেকে ইশারা করত। এইভাবেই বুকের দুরদুরুনি পার হয়ে

একদা মালার কাছাকাছি হয়ে গেলাম। দুপুরের নির্জনতায় স্কুল পালিয়ে আসতাম। মালাদের ছাদের সিঁড়িতে বসতাম দু'জনে। পাশাপাশি। কথা হত। সে-সব কথা ভালবাসার কথা নয়, কোনও অর্থও হয় না তার। তবু দু'জনে দু'জনের কথা হাঁ করে শুনতাম। মালা বলত, তোমার সত্যিকারের লড়াই আমাকে একদিন দেখাতে নিয়ে যেয়ো। আমার সেই আসল লড়াই মালাকে দেখানো হযনি আজও। আর দেখানো যাবে না। কবে যেন মণিমালার ফেলে-যাওয়া সেতার খেলার ছলে তুলে নিয়েছিল মালা, অনভ্যস্ত হাতে টুং টাং করেছিল। বোধহয় সেই সময়েই অকস্মাৎ সুরের মায়াবী জগৎ হঠাৎ তাকে ধরা দিয়েছিল। তারপর গানই টেনে নিল তাকে। তার পার্থিব ঘরখানা ক্রমশ পৃথিবী ছেড়ে, আমাদের সব নাগালের বাইরে একশো দু'শো হাজার তলা উঁচুতে উঠে গেল। সেই সময়ে আমার ছোড়দা শখের তবলা ঠোকে, ফিল্মের গান গায়। মালার উন্নতি দেখেই বোধহয় সে এক ওস্তাদের কাছে তবলা শেখার জন্য নাড়া বাঁধল। আমার প্রতি উদাসীন হয়ে গেল মালা।

গ্রুপ ছবিটায় সেইসব দিনগুলি স্থির হয়ে আছে। মগ্ন হয়ে দেখছিলাম। ছবি নয়, স্মৃতি।

টেবিলের ওপর প্লেট রাখার মৃদু শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী অবাক হই। মালা নয়, তাদের ঝি। বলল, দিদিমণি পাঠিয়ে দিলেন।

উনি কোথায়?

মাথা ধরেছে খুব। মায়ের বিছানায় শুয়ে আছেন।

মুহূর্তে রক্তের ঝাঁক উঠে আসে চোখে-মুখে। বাসের সেই পশ্চিমা লোকটার ভদ্র ব্যবহারের স্মৃতি ভুলে যাই, ভুল হয়ে যায় সেই দীর্ঘকায় অন্ধ যুবকটির কথা। রাগে মুহুর্মুহু আঘাত করতে ইচ্ছে করে চার দিকে।

খেয়ে নিন। বলে ঝি চলে গেল।

একা মালার এই ঘরে আমি কী করে থাকি! এই ঘর গানের। কিন্তু আমার সব রাগ দুঃখ বা অভিমান কখনও গান হয়ে যায়নি। আমার রাগ বহুকাল থাকে।

টেবিলের সামনের গিয়ে দেখি প্লেটে সাজানো ওমলেট, মিষ্টি, বাটিতে এক টুকরো মাছ, স্টিলের গ্লাসে ঠান্ডা ঘোল। কোনওটাই স্পর্শ করি না। রাগে শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। গায়ে শুঁয়োপোকার রোমরাজি দাঁড়িয়ে যায়। গায়ে সেই জ্বালা। নিজের বা যে-কারও সর্বনাশ করে যেতে ইচ্ছে করে।

মালার সর্বনাশ আমি কী করে করব ভেবে পাই না। অদ্রির মতো সেও আমার রিঙের অনেক বাইরে চলে গেছে। অত দূরে আমার আঘাত পৌঁছাবে না। তবু আমি তার ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াই। কোথায় আঘাত করব মালাকে, খুঁজি। বিছানায় শোয়ানো তার ঝকঝকে তানপুরা, ইস্পাতের তার মৃদু আলোতেও ঝলকাচ্ছে, মেঝের কার্পেটে পড়ে আছে পেতলের ডুগি আর ছোট্ট তবলা। পড়ে আছে হারমোনিয়াম। চার দিকে গানের খাতা। বই। বুককেসের ওপর রেডিয়ো, রেকর্ড প্লেয়ার। খোলা কাঠের বাক্সে রেকর্ডের গাদা। গানের মধ্যেই বেঁচে আছে মালা। তার সব দুঃখ, স্মৃতি, অনুভব—সবই গান হয়ে যায়। এক রকমভাবে সে সুখীই। সেই সুখ নরম গদির মতো ঢেকে রেখেছে তাকে। বাইরের আঘাত পৌঁছোয় না। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে আঘাত করতেই হবে।

তানপুরার তারে আঙুল ছোঁয়াতেই সেটা ঝিনন করে বেজে ওঠে। আমি বাঁকা আঙুলে তারটাকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিই। টং করে ছিঁড়ে যায়। একের পর এক চারটে তার ধনুকের টংকার তুলে ছিঁড়ে পাকিয়ে যায়। ভয়ংকর কাঁপতে থাকে ছেঁড়া তারের ডগাগুলি। জীবনের সবচেয়ে জোরালো ঘুষিতে ডুগির চামড়া দমাস করে ফাটিয়ে দিই। পলকের মধ্যে আমি তার গানের খাতাগুলোর পাতা ছিঁড়ে ফেলি। ফ্যানের জোর হাওয়ায় পাতাগুলি ঘুড়ির মতো উড়তে থাকে। কী হল, কী হল, বলে ঝিটা ছুটে আসতে থাকে। রান্নাঘর থেকে মাসিমা চেঁচিয়ে বলছেন, কী হচ্ছে রে, ও মালা। আমি ততক্ষণে মালার বিছানার বালিশ টেনে ফেলে দিই, দু'টো রেকর্ড ছুড়ে ফেলি মেঝেতে। কিন্তু তবু মালার সাড়া পাওয়া যায় না। মনশ্চক্ষে দেখি, সে ও-ধারের ঘরে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে হাসছে। বিদ্রূপের হাসি। ঝিটা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। পাগল-দেখার মতো ভীত চোখ তার, কী করবে বুঝতে পারছে না। আমি তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসি। সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে নেমে যাই। মালা বেরিয়ে

আসেনি, কিছুই করে না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপরে মাসিমা আর ঝিয়ের গলা পাই—ওমা! কী কাণ্ড! এ কী পাগলামি!

রাস্তা থেকে এক পলক ওপরের ঝুলবারান্দার দিকে তাকাই। না, মালা নেই। এই অবহেলায়, উপেক্ষায় আমার শরীর আবার রাগে কেঁপে ওঠে। অসহায়ভাবে বুঝতে পারি, পৃথিবীতে আমার আঁচড়-কামড়ের কোনও দাগ বসে না। আমি বড় দুর্বল।

ক্রিমরঙা গাড়িটার গায়ে পাতলা চাদরের মতো ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। গাড়িটা পেরিয়ে যেতে যেতে একটু দাঁড়াই। প্রতিশোধের কথা মনে পড়ে। আমি কিছুই ভুলিনি। গাড়িটার কাচ তোলা, ভিতরটা ফাঁকা। সুন্দর একটা নীল তোয়ালে পড়ে আছে স্টিয়ারিং-এর ওপর। মভ রঙের গদির পালিশ কী সুন্দর, তাতে চমৎকার চৌকো নকশা। গাড়ির পিছনে পালকের ঝাড়ন, সুতো দিয়ে ঝোলানো একটা সুন্দর পুতুল। অদ্রির গাড়ি।

কাচটা ভেঙে দিয়ে যাব? একখানা ইট হাতে নিলেই সুন্দর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। আমার প্রতিশোধের নেশা চেপে গেছে। লোভীর মতো গাড়িটার দিকে চেয়ে থাকি। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে, জিনিসপত্রের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার মধ্যে কোনও গভীরতা নেই। মালার মতো উদাসীন উপেক্ষা অনেকের থাকতে পারে। আমার প্রতিশোধ তা হলে আবার আমাকেই ছোবল দেবে মুখ ঘুরিয়ে।

গাড়ির কাচটা তাই ভাঙা হল না। কেবল অন্যমনে একটা আঙুল দিয়ে গাড়ির গায়ের ধুলোর আস্তরণে লিখলাম, নেনটু, প্রতিশোধ।

মুখ ফেরাতেই ভারী অবাক হয়ে দেখি, আমাদের দোতলায় বারান্দায়, বালির বস্তাটার পাশে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে। সেই একটু ঝুঁকে কৌতূহলে আমাকে দেখছে। বড় লজ্জা পাই। ছি ছি, মেয়েটা দেখেছে, আমি অদ্রির গাড়ির গায়ে আঙুল দিয়ে লিখছি। আমাকে পাগল ভাবছে হয়তো।

মুখ নামিয়ে আমি গাড়ির দরজা পেরিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি। মেয়েটা কে, ভেবে পাই না। অদ্রির সঙ্গেই এসেছে কি! কে জানে! একটু পরেই মেয়েটার সঙ্গে এক সমতলে দেখা হবে। ভাবতেই লজ্জা করে। পাগল, আমি একটা পাগল।

উপরে উঠেই প্রথমে বড়দার ঘর। সবুজ পরদা ফেলা। পরদার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, অদ্রির কোলে বুবলা বসে আছে, তার হাতে খেলনা। অদ্রির মুখখানা শুকনো, চুল উড়ছে। তবু তার মুখে একটা স্মিত ভাব। দরজা পেরোতে পেরোতে বউদির ধরা-গলা শুনতে পাই, বেঁচে আছে এই ঢের। এ ক'দিন যে কীভাবে কেটেছে!

থমকে দাঁড়াই। কার কথা বলছে ওরা?

পরদাটা সরাতেই অদ্রি মুখ তোলে, খুশির গলায় বলে, আরে নেনটু, এসো ভাল খবর আছে।

কান্নায় বউদির মুখ ফোলা, তবু তার মুখে একটা নিশ্চিন্তি। খুশির ভাব। বলল, তোমার বড়দা দুর্গাপুর গিয়েছিল। দাদার কাছে।

আমি অদ্রির দিকে তাকাই।

অদ্রি মাথা নাড়ল। বলল, পরশুদিন। ইদানীং ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে বিকেলের দিকে একটু টেনিস খেলি। পরশুদিন টেনিস খেলে ফিরে দেখি, বাসার গেটের কাছে ভিখিরির মতো চেহারায় সত্য দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটায় চিনতেই পারিনি। গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি, চুল জট বেঁধেছে, গায়ে ভীষণ ময়লা, না-ঘুমোনো চোখ খুব লাল। কষ্টে চিনতে পারলাম। প্রথমটায় কোনও কথাই বলে না। জিজ্ঞেস করলে হয় হাসে, নয়তো গম্ভীর হয়ে থাকে। বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ইচ্ছেমতো স্নান করল, দাড়ি-টাড়ি কামাল, বলল, রাতে মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত খাব। সঙ্গে সঙ্গে চাকরকে দিয়ে মুরগি আনালাম। খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেল। পাছে পালায় সেই ভয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে শুলাম। কিন্তু কথাবার্তা হল না। সারা রাত পাথরের মতো ঘুমোল। উঠল অনেক বেলায়। রবিবার ছিল কাল, কাজেই নিজে দেখেশুনে ভাল রান্নাবান্না করালাম। ভাবলাম, তোমাদের কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দিই। সত্য বোধহয় সেটা আন্দাজ করে বলল, বাড়িতে কোনও খবর দেবেন না। সম্ভবত পুলিশ আমাদের বাসার দিকে নজর রাখছে। ফলে সারাদিন সত্য শুয়ে-বসে রইল। দু'-চারটে কথা থেকে যা বুঝতে পারলাম, এ ক'দিন সে পায়ে

হেঁটে হেঁটে ঘুরেছে। যত দূর মনে হল, সে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিল না। সে ঘুরেছে একা একা। কেন ঘুরেছে তা সঠিক বলল না। কেবল বলল, আশপাশটা একটু দেখে নিচ্ছি আর কী! এত বয়স পর্যন্ত তো কলকাতা-চাপা পড়ে রইলাম। আমি রাজনীতির কথাও জিজ্ঞেস করলাম। ও একটু ভেবেচিন্তে বলল, রাজনীতি মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নীতি। সেই নীতি ঠিক করতে একটু সময় নেওয়া দরকার। মনে হল, ওর ভিতরে একটু দ্বিধার ভাব এসেছে। বিকেলের দিকে বলল, আমার জুতো জোড়া ছিঁড়ে গেছে, একজোড়া জুতো কিনে দিন। আর দশটা টাকা। দিলাম। বিকেলে খুব নেশা করে ফিরল। একটু মাতলামি করল, বুবলার কথা বলে কান্নাকাটি করল কিছুক্ষণ। আজ সকালে উঠে দেখি, নেই। তোলপাড় করে আশেপাশে খুঁজলাম। কোথাও নেই। আরও খুঁজবার জন্য লোক লাগিয়ে আমি চলে এসেছি। ভাবছি, রাণুকে নিয়ে যাব। রাণু আমার কাছে কয়েকদিন থাক। যদি সত্য ফেরে বা ওকে খুঁজে পাওয়া যায় তবে ওখানেই রাণুর সঙ্গে ওর দেখা হতে পারবে। আমার মনে হচ্ছে, সত্য ফিরবে ঠিক। আমার বাসাটা সেন্টার করে চার দিকে ঘুরবে। রাণু বা বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা হলে মনটা নরম হবে ওর, ও-সব পাগলামি কমে যাবে।

অদ্রির দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়েছিল বউদি। যেন যত বার অদ্রি গল্পটা বলবে তত বার সমান মনোযোগে সে শুনবে। অদ্রির কথা হয়ে গেলে বউদি আমার দিকে ফিরে ছেলেমানুষের মতো বলল, যাব ঠাকুরপো?

আমি হেসে বললাম, যাওয়াই তো উচিত। মা-বাবাকে খবর দাও। ওঁদের ঘটনাটা জানানো দরকার।

বউদি বলল, যাচ্ছিলাম। তুমি এসে গেলে, দাদা গল্পটা শুরু করল, তাই যাওয়া হল না।

বউদি উঠে গেল। একটু বাদেই হতচকিত বাবা আর মা ঘরে এসে ঢুকল। বাবা নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে গিয়ে লাল হয়ে গেছেন, গাল কাঁপছে। মা কেঁদে ফেলেছে, চেঁচিয়ে বলছে, ও বাবা অদ্রি, আমার ছেলে নাকি বেঁচে আছে! সবাই বলে, মেরে ফেলেছে। বলো বাবা, তার কথা বলো। সে কেমন, কোথায়—

অদ্রি উঠে হাত ধরে মাকে বসাল। বাবা চেয়ারে বসে গলা খাঁকারি দিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন।

ঘরে যখন এই দৃশ্য তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, বারান্দার দরজায় সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। অদ্রি দাদার কথা বলছে, সকলের চোখ তার দিকে। শুধু মেয়েটি একদৃষ্টে আমাকে দেখছে। চোখে ভীষণ কৌতূহল। যেন-বা সে আমাকে গুরুতর কোনও অন্যায় করতে গোপনে দেখে ফেলেছে।

লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলাম। দাদার কথা শুনতে শুনতে মেয়েটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ও দেখেছে, আমি অদ্রির গাড়ির গায়ে ধুলোর আস্তরণে লিখে রেখেছি—নেনটু, প্রতিশোধ।

আর-এক বার মেয়েটির দিকে তাকাই। দেখি, তার ঠোঁটে চাপা কৌতুকের হাসি। পরনে নীল শাড়ি, নীল ব্লাউজ, কানে নীল পাথরের দুল, পায়ে নীল চটি। লালচে রঙের চুল এলো করে বাঁধা। ফরসা, খুব সুন্দর চেহারা তার—এত-সুন্দর কেবলমাত্র ধনীদের ঘরে জন্মায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তাকে আমি কোথাও দেখেছি। কোথায় তা মনে পড়ছিল না। তার চোখে আমার চোখ আটকে গিয়েছিল। ছাড়াতে পারছিলাম না। ঘরের ভিতরে সবাই বড়দার কথা নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে। সিঁড়ির দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি, আর বারান্দার দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে সে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে। কেউ আমাদের এই তুচ্ছ ঘটনাটি লক্ষই করে না। মেয়েটি দেখছে এক গোপন অপরাধীকে—যাকে সে ছাড়া কেউ শনাক্ত করতে পারে না। আমি দেখছি শনাক্তকারীকে—যাকে আমি সঠিক চিনি না—কিন্তু চেনা-চেনা মনে হয়।

কিন্তু মনে না-পড়েও উপায় ছিল না। অত সুন্দর মেয়ে তো আমি খুব বেশি দেখিনি। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল। এই তো অদ্রির মঞ্জু। বিয়ের আসরে এ দেখেছিল আমার অপমান। একটু আগে সে-ই আবার দেখেছে, অদ্রির গাড়ির গায়ে আমি প্রতিশোধের কথা লিখে রাখছি। এর কাছ থেকে আমি কী করে পালাব?

চোখ নামিয়ে আমি আস্তে আস্তে সরে এলাম। জামাকাপড় পালটে কলঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ জল ঢালি গায়ে। গায়ে আজ বড় জ্বালা।

স্নান সেরে, রান্নাঘরে ঢাকা ভাত খেয়ে এসে দেখি বউদি বিস্তর ট্রাঙ্ক-বাক্স খুলে জামা কাপড় বের করে সুটকেস গোছাচ্ছে। মা সামনে বসে বলছে, ওই কমলা রঙের শাড়িটা নিলে না! সত্য ওই রংটা পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল তোমায়।

বউদি লাজুক হেসে বলে, আর জায়গা কোথায় মা?

মা বলে, হবে হবে। দরকার হলে তোমার শ্বশুরের সুটকেসটা নাও না। ওখানে গিয়ে সেজেগুজে থেকো। বেনারসিটা পড়ে রইল।

বউদি বলল, এই গরমে বেনারসি?

তাতে কী? বিয়ের পর তো পরোইনি। মা বলতে বলতে আমার দিকে তাকায়।

নেনটু, একটু মিষ্টি এনে দে। ওরা ভরদুপুরে এসেছে। তোর ঘরে পাখার তলায় বসিয়ে রেখেছি, ও-ঘরে যাস না এখন। মিষ্টিটা এনে দিয়ে বরং আমাদের বিছানায় গিয়ে শো।

মিষ্টি এনে দিয়ে মা'র ঘরের দিকেই যাচ্ছিলাম। অদ্রি বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকল, নেনটু, শোনো। মঞ্জু তোমাকে ডাকছে।

ভীষণ সংকুচিত হয়ে পড়ি। স্নানের পর হঠাৎ স্নানের আগের যাবতীয় অপরাধের বোধ এসে আমাকে চেপে ধরে। জিজ্ঞেস করি, কেন?

অদ্রি চাপা হেসে বলে, এসো না। ও বলছে, তোমাকে ও চেনে।

আমি ভ্রূ কুঁচকে তাকাই।

অদ্রি হাসে, ঘাবড়িয়ো না। এসো।

আমার বিছানাতেই মঞ্জু বসে আছে। গরমের জন্য জানালা বন্ধ। ঘরটা ছায়া-ছায়া। মঞ্জুকে আবছায়ায় আরও সুন্দর দেখায়। হাতজোড় করেই হেসে বলল, বসুন, একটু কথা বলি।

মেয়েদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় আমার অজানা। কাঠের মতো তার সামনে চেয়ার টেনে বসি। একটু বেপরোয়া হওয়ার চেষ্টা করে বলি, আপনি আমাকে চেনেন শুনলাম। গলাটা কেঁপে গেল। একটা নাকি সুর এসে গেল।

মঞ্জু তার মাথায় সুন্দর একটা ঝাপটা মেরে বলে, খুব ভাল চিনি না, একটু একটু চিনি।

অদ্রি সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলে, আমাকে কিন্তু মঞ্জু কিছু বলেনি, নেনটু। শুধু বলেছে, ওই ভদ্রলোককে আমি চিনি, ডেকে আনো, আলাপ করব।

আমার চোখ মেঝেয় নেমে যায়। ঘামতে থাকি। প্রথমত তার গা থেকে খুব দামি বিদেশি সুগন্ধী বাতাস ভরে তুলেছে। দামি শাড়ি পরনে। সে অসম্ভব সুন্দর। এ-সব আভিজাত্যের মুখোমুখি হলে আমার মন শক্ত হয়ে ওঠে। আঘাত করতে ইচ্ছে করে। আমি এ-সব সইতে পারি না। দ্বিতীয়ত, তার মুখের রহস্যময় হাসি দিয়ে সে বোঝাতে চাইছে, সে আমার গোপন খবর রাখে। আমি তাই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে থাকি। মাথাটা এলোমেলো হয়ে যায়। মিষ্টি নিয়ে ফেরার সময়ে আমি বুদ্ধি করে অদ্রির গাড়ির গায়ের লেখাটা মুছে দিয়ে এসেছি। তবু মনটা স্থির হয় না। দোতলা থেকে পরিষ্কার লেখাটা দেখা যাচ্ছিল—নেনটু, প্রতিশোধ। মুছতে বড় দেরি হয়ে গেছে। তার আগেই এই মেয়েটি জেনে গেছে—আমি তার অদ্রির ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই।

মঞ্জু তার ছোট্ট রুমালে থুতনির ঘাম মুছল। বলল, রাণুর বিয়ের সময়ে আপনাকে দেখেছিলাম। বলেই সে হাসতে থাকে।

আমার চোখ-মুখ ঝেঁঝে ওঠে। আমি মুখ তুলি।

আর কোথায়?

একটা পোস্ট অফিসে।

আর?

একটা মিছিলের মুখোমুখি। সেইদিনই আপনাদের এই বাসায় রাণুর সঙ্গে দেখা করতে আসি। চলে যাওয়ার সময়ে সিঁড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা, রাণু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপনি গ্রাহ্য করেননি। খুব অন্যমনস্ক ছিলেন।

একটা শ্বাস ফেলে বলি, মনে নেই।

মঞ্জু খুব হাসে। হাসি মেশানো গলায় বলে, আর একবার—

চমকে উঠে বলি, কোথায়?

সে মাথা নাড়ে, সেটা বলব না। থাক।

বলল না। গোপন থাকল। তার আর আমার মধ্যে। প্রতিশোধের কথাটা খুব বুদ্ধি করে চাপা দিল মঞ্জু। আমি নিশ্চিন্তের শ্বাস ছেড়ে বললাম, কাছাকাছি পাড়ায় থাকলে এ-রকম দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

তার প্রেমিকের সামনেই অপলক চোখে সে আমাকে দেখে কিছুক্ষণ। বলে, মিছিল আটকানোটা কিন্তু অন্যায় সাহস, প্রায় পাগলামি।

অদ্রি মিষ্টির প্লেট হাতে ঝুঁকে পড়ে আমায় বলল, কী করেছিলে?

মঞ্জু হাসি থামিয়ে বলে, সে এক উদ্ভট কাণ্ড। কিন্তু আমার খুব মজা লেগেছিল।

বলে মঞ্জু পা দোলায়। আমার দিকে চেয়ে মিট মিট করে হেসে বলে, আপনি এ-রকম আর কী কী করেছেন তা জানতে ইচ্ছে করে। বলবেন?

আমি হাসি। তার আর আমার মধ্যে এক ইঙ্গিতময় কৌতুকের খেলা চলছে। অদ্রি তাই কৌতূহল বোধ করে না। কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলে, ইস, তিনটে বাজে। রাণুটা দেরি করছে। দিনকাল ভাল না, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। দাঁড়াও, রাণুকে তাড়া দিয়ে আসি।

অদ্রি উঠে যেতেই মঞ্জু আবার আমাকে দেখে। বলে, আমি একটু বেশি কথা বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।

আমি একটা শ্বাস ফেলে হাসি। বলি, না আপনি খুব বেশি বলেননি। ধন্যবাদ।

মঞ্জু হাসে।

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি। বুবলাকে একটু কোলে নিই, মিনুকে একটু আদর করি। বউদির সঙ্গে রসিকতা করতে থাকি। বলি, বউদি, তোমাদের হানিমুন দুর্গাপুরেই হচ্ছে তা হলে!

বউদি ম্লান হাসে। বলে, ইয়ার্কি কোরো না। তোমরা দুইটি ভাই আমাদের যা জ্বালাচ্ছ! ভগবান করুন, তোমার যেন বিয়ে না হয়।

বউদির কানে কানে বলি, তা হলে তোমার আইবুড়ো বোনটার গতি হবে কী করে?

বউদি তেড়ে এসে বলে, থাক, ও-সব মুখের কথা। সুনুকে তো তুমি চোখেও দেখনি।

গোছগাছ করে ওরা রওনা হয়ে গেল। সামনের সিটে অদ্রির পাশে বসা মঞ্জু একবার গলা বের করে মুখ টিপে হাসল মাত্র। কথা বলল না।

মনে মনে নিজেকে বললাম, নেনটু অদ্রির ওপর যদি প্রতিশোধ নিতে হয় তবে ওর গাড়ির ওপর নিয়ো না। প্রতিশোধের জন্য রয়েছে ওর মঞ্জু। মঞ্জুর ওপর নিয়ো। ও অত সুন্দর কেন? সুন্দর যা-কিছু নষ্ট করে দাও।

বড়দার যা-হোক একটা খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু সেজন্য আমি নিশ্চিন্ত বোধ করি না। আমার পাগল-পাগল লাগে। অদ্রির গাড়ির ওপর থেকে প্রতিশোধের কথাটা মুছে দেওয়া গেছে। মালা তার তানপুরা সারিয়ে নেবে, তবলা ছেয়ে নেবে, গানের খাতা বেঁধে নেবে আবার। কিন্তু আমি কি কিছুতেই প্রতিশোধের কথা ভুলব না! থানার ও-সি ভদ্রভাবে আমার গায়ের ব্যথার কথা জিজ্ঞেস করেছেন বন্ধুর মতো। তবু আমি ভুলি না। কিন্তু বাস্তবিক আমি এ-সব ভুলতে চাই। পৃথিবীর যাবতীয় অপমান, ইতরতার উত্তরে সেই দীর্ঘকায় অন্ধ যুবকটির মতো নম্র গলায় বলতে ইচ্ছে করে—ছোড় দিজিয়ে না মা-জি। কিংবা সেই পশ্চিমা বুড়োর মতো সহজে স্বার্থ ত্যাগ করে বলতে ইচ্ছে করে, বইসুন না, বইসুন।

॥ মঞ্জু ॥

মা'র প্রেশার খুব বেড়ে গেছে। হার্টও ভাল না। এমনিতে প্রেশার তো ছিলই, তার ওপর পরশুদিন দুপুরে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে দক্ষিণে গলির মধ্যে একটা স্কুল আছে। নীল প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা ছেলেরা পিঠে ব্যাগ নিয়ে গুট গুট করে স্কুলে যায়। সকাল সাড়ে দশটায় রোজ তাদের প্রেয়ারের সুর আমাদের ঘরে ভেসে আসে—আগুনের পরশমণি...। আমার মায়ের খুব ছেলের শখ ছিল। পর পর আমরা তিন বোন মাকে হতাশ করি। শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় মা আর বাচ্চা পেটে ধরতে সাহস পাননি। এই বয়সে মার ওই ইচ্ছে আর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মার মনে সাধটা কিন্তু রয়ে গেছে। আমি তা টের পাই। কতদিন দেখেছি, মা রেলিং ধরে ঝুঁকে তিনতলা থেকে সকাল দশটায় স্কুলের বাচ্চা ছেলেদের নিবিষ্ট মনে দেখে। পুঁটে পুঁটে ছেলেরা হল্লা করতে করতে যায়। তাই দেখে মা'র মুখে এক বিহ্বলতা ফুটে ওঠে। টিফিনের সময়ে ছেলেগুলো সর্ষেদানার মতো পিলপিল করে এধার ওধার ছড়িয়ে পড়ে। মা নীচের তলায় নেমে যায় তখন। কত ছেলে এসে আমাদের বাড়ি থেকে জল আর বিস্কুট খেয়ে যায়। শীতকালে অন্তত একদিন মা ওই স্কুলে চার ঝুড়ি কমলালেবু পাঠায়, গ্রীষ্মকালে একদিন পাঠায় ল্যাংড়া আম। আমি বাড়াবাড়ি দেখে কখনও-সখনও রাগ করে বলি, অত প্রশ্রয় দিয়ো না, ছেলেগুলো পেয়ে বসবে। মা ম্লান মুখে হেসে বলে, আমার বড় ইচ্ছে করে বাড়িতে একদিন বাল-ভোজন করাই। কিন্তু তাতে তো আরও রাগ করবি। সে যাই হোক, ওই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। মা যখন রেলিঙে দাঁড়ায় তখন ওই ছেলেদের অনেকেই মুখ তুলে মাকে ডেকে যায়, আ-ন্টি! কেউ বলে, মাসিমা—আ! মা হাত নাড়ে। তারা চলে যায়। মা কখনও-সখনও আমাকে ডেকে ছেলেদের চিনিয়ে দেয়—ওই যে ফরসা ছেলেটা—ওর মা নেই, বাবা আবার বিয়ে করেছে। আর ওই যে রোগামতন—ও হচ্ছে বাবলু—ভীষণ দুষ্টু। আর ওই যে—। মা বলে যায়। আমি কখনও বা কৌতূহল বোধ করি, কখনও বা করি না। কিন্তু ছেলেগুলো আমাকেও চেনে ঠিক। রাস্তায় কখনও-সখনও চমকে উঠে শুনি, অচেনা ছেলে ডেকে বলছে, দিদি, কোথায় যাচ্ছ? চমকে উঠে হেসে ফেলি। একরকম ভালই লাগে। একদিন গড়িয়াহাটায় একটা বাচ্চা আমার হাত জড়িয়ে ঝুলে পড়েছিল, দিদি, ও দিদি! সঙ্গে তার বাবা আর মা। সে আমার হাত ধরে টেনে তার মা'র কাছে নিয়ে যায়, আর বলে, আন্টির মেয়ে আমার দিদি। কী লজ্জায় পড়েছিলাম! ছেলেটির মা-বাবা দেখলাম, মা-র কথা খুব জানে। ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার মা'র কথা শুনে শুনে কান কালা হয়ে গেছে। শুনে লজ্জা পাই। ছেলেরা আমাকে যে রাস্তায়-ঘাটে দেখে ডাকে, খুশি হয়, মা-বাবার কাছে নিয়ে যায়, সে তো আমার জন্য নয়। আমার ভালবাসা তারা পায়নি। তবু তাদের আন্টির মেয়ে বলে আমার এত আদর। টিফিনের সময় আমাদের নীচের তলায় রাজ্যের ছেলেরা এসে মাকে ঘিরে ধরে বসে। জল খায়, বিস্কুট নিয়ে পকেটে পোরে। গল্প করে কত! মা প্রত্যেকের নাম, বাড়ির খবর রাখে। কিন্তু আমি তাদের অধিকাংশকেই চিনি না। রাস্তায় ঘাটে তাই আমাকে লজ্জা পেতে হয়। তবু ভালই লাগে। কখনও-সখনও রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আমিও তাদের দেখি। তারা হাসে, হাত নাড়ে, ডেকে যায়।

যা বলছিলাম। পরশুদিন দুপুরে রোজকার মতো মা বিছানা ছেড়ে উঠে সিঁড়ির মুখে গিয়ে মদনকে ডেকে বলল, ও মদন, জলের ড্রামটায় বরফ ফেলেছিস তো! বিস্কুটের প্যাকেটগুলো খুলে প্লেটে রাখ। সময় হয়ে এসেছে। এই বলে মা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। সেই সময়ে হঠাৎ রাস্তায় একটি চেঁচামেচি শোনা গেল, কয়েকটা দৌড়-পায়ের শব্দ। বারান্দায় মা উৎকর্ণ হয়ে টিফিনের ঘণ্টার শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, কী হয়েছে রে? ওরে, কী হয়েছে? ওই বড় বড় ছেলেগুলো দৌড়ে পালাচ্ছে কেন? ও মঞ্জু, দেখে যা! আমি উঠতে উঠতেই দু'টো বোমার শব্দ শোনা গেল।

আমি বেরিয়ে দেখি, মা রেলিঙের ওপর দিয়ে আধখানা শরীর বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। মাকে টেনে আনি। দেখি, মা'র মুখ সাদা, কপালে ঘাম, ঠোঁট কাঁপছে। আমার দিকে বড় বড় আতঙ্কের চোখে চেয়ে মা বলল, কতগুলো বড় ছেলে স্কুলটার দিক থেকে দৌড়ে এল—ওরা স্কুলের ছেলে নয়—হাতে বড় বড় ছোরা, ছোট টিন। দৌড়ে পালিয়ে গেল। ওই শোন, স্কুলের দিকটায় খুব গোলমাল শোনা যাচ্ছে।

আমি শুনলাম। ঠিকই, স্কুলের দিকটায় গোলমাল, লোকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ টিফিনের ঘণ্টার শব্দ পাগলা-ঘণ্টার মতো বাজতে শুরু করল। বাতাসে এক ঝলক ধোঁয়ার গন্ধ, বারুদের গন্ধ, কেরোসিনের গন্ধ এল। মা ঝুঁকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, স্কুলটায় আগুন লেগেছে!

মা'র কথা শেষ না হতেই দেখি, নীল প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা বাচ্চারা গলি দিয়ে দিশেহারার মতো দৌড়ে আসছে। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল দু'-একজন, উঠে আবার দৌড়োচ্ছে। ব্যাগ খসে যাচ্ছে কাঁধ থেকে, প্যান্টে গোঁজা জামা বেরিয়ে পড়েছে, মুখ রক্তাভ। আতঙ্কে তাদের চোখ বড় হয়ে গেছে।

দৌড়ে নীচে নেমে গেলাম। সদর খোলাই ছিল। পিলপিল করে বহু ছেলে ঢুকে পড়ল বাড়িতে। আমি দু'হাতে তাদের টেনে আনতে লাগলাম। তারা দিশেহারার মতো চেঁচাচ্ছে, আন্টি! আন্টি! দিদি...

কয়েকটা বাচ্চা কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল। স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারি না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল, কয়েকটা বাইরের বড় ছেলে ছোরা নিয়ে স্কুলে ঢুকেছিল। তারা বলে গেছে, ছেলেরা স্কুলে এলে খুন করা হবে। মাস্টারমশাইদের বলেছে, স্কুল বন্ধ করে দিতে। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা যেন না হয়। এই সব বলে তারা স্কুলবাড়িতে কেরোসিন আর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দিয়ে গেছে। বোমা মেরেছে। কাঁদুনে ছেলেগুলোকে কোলের কাছে টেনে এনে চুপ করালাম, তারপর বাচ্চাদের মধ্যে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। তাদের মধ্যে অনেকেই আন্টির খোঁজ করছিল। তখন আমার খেয়াল হল, মা নীচে আসেনি। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গিয়ে দেখি, মা মাঝখানের ঘরে মেঝের কার্পেটের ওপর শুয়ে আছে। মুখটা টকটকে লাল, কপালের দু'ধারে শিরা ফুলে উঠেছে। জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না, কেবল কাঁদছে।

পরশুদিন থেকে বিছানা নিয়েছে মা।

আমাদের বাড়িটা বড্ড ফাঁকা। বাবা সকালে বেরোয়। ফিরতে রাত হয়ে যায়। সারা দিন কেবল আমি আর মা। আমাদের বাড়িতে কারও অসুখ-বিসুখ হলে আমরা সেবা করি না। ভাড়া করা নার্স আসে। এবারও এসেছে। কাজেই আমার কিছু করার নেই। কেবল সারাদিন কয়েকবার মার ঘরে যাই। মা কেবলই জিজ্ঞেস করে, মঞ্জু, ওদের কারও কিছু হয়নি তো?

না।

ঠিক বলছিস, না লুকোচ্ছিস!

হয়নি। বিশ্বাস করো। হলে হইচই শুনতে পেতে।

মা একটু চুপ করে থাকে। বলে, জলের ড্রামে মদনকে বরফ ফেলে রাখতে বলিস। দেরিতে বরফ ফেললে জল ঠান্ডা হবে না, আর বিস্কুটের প্যাকেটগুলো খুলে রাখিস। তুই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে—

আমি হেসে বলি, কার জন্য? স্কুল বন্ধ আছে, ছেলেরা কেউ আসছে না দু'দিন।

মা চুপ করে থাকে। চোখ বোজে। বোধহয় শিশুদের স্বপ্ন দেখে।

অল্পবয়সি চটপটে নার্স-মেয়েটির সঙ্গে দু'-একটা কথা বলি। সে খুব সংকুচিত হয়ে উত্তর দেয়। ইচ্ছে ছিল, এই দুপুরের নির্জনে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে একটু গল্প করব। কিন্তু তার সংকোচ দেখে বুঝতে পারি আড্ডা জমবে না। তাই বেরিয়ে আসি। তারপর একা ভূতের মতো সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াই। কখনও গান গাই, কখনও কোনও পুরনো হাসির কথা ভেবে আপনমনে হেসে উঠি, কখনও বা কান্না পায়।

সব জানলা দরজায় ভারী পরদা কিংবা খসখস ঝুলছে। ঘরগুলো ছায়া ছায়া অন্ধকার। বাইরের বেলা বোঝা যায় না। সুগন্ধী ভেজা খসখস সরিয়ে এক পলক বাইরে তাকাই। দমকা গরম বাতাস শরীরে লাফিয়ে পড়ে। খরশান দুপুর বিশাল পুরুষের মতো জ্যোতির্ময়। রুপো রঙের দুপুরের দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকি।

কোথাও যাওয়ার নেই। এই খরার দুপুরে কোথাও যেতে ইচ্ছেও করে না। অদ্রি কাছে নেই। রাণুকে নিয়ে গেছে, কাজেই আর শিগগির আসবেও না। সেদিন ওদের বাড়ি থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার সময়ে সেইরকমই বলে গেল অদ্রি, সাবধানে থেকো, রাণুকে নিয়ে যাচ্ছি। এখন ভুতুড়ে চিঠি লিখলেই চলে আসতে পারব না।

রাণু অনেকবার বলল, তুইও চল মঞ্জু, ওখানে আমার খুব একা লাগবে চল, কয়েকদিন থেকে আসবি।

ধ্যাৎ! লোকে কী বলবে?

রাণু চোখ বড় বড় করে বলল, কী বলবে! একা তো যাচ্ছিস না, আমি আছি।

হেসে বললাম, তুই থাকলেই কী? বিয়ের আগে এত মাখামাখি ভাল নয় রাণু, ওতে চার্ম নষ্ট হয়ে যায়।

কথাটা সত্যি। অদ্রি আর আমার সম্পর্কটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। এমন নয় যে অদ্রিকে আমি ভালবাসি না। কিন্তু ইচ্ছে করে অদ্রি খোলস পালটে নতুন হয়ে আসুক। ওই রুপো রঙের দুপুরের মতো এক অচেনা পুরুষ হয়ে দাঁড়াক আমার সামনে। আমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলুক।

রাণুর ওই যে দেওরটা—নেনটু, ও পাগল। ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু দূরের এক বাড়ির বারান্দায় একটা সুন্দর মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। হঠাৎ দেখি নেনটু রাস্তা থেকে সে মেয়েটার সঙ্গে কী কথা বলছে। তারপর ওপরে উঠল, মেয়েটার ঘরে গেল। ভারী অবাক হয়েছিলাম, রাণুর দেওর এই ভরদুপুরে ওই মেয়েটার ঘরে কেন! একটু পরে মেয়েটা বেরিয়ে গেল, খাবারের প্লেট হাতে ঝি ঢুকল। তারপরই দেখি, নেনটু দৌড়ে নেমে আসছে, আর ওই বাড়ির ঝি আর গিন্নি ছোটাছুটি করছে। কিছু একটা কাণ্ড করে এসেছে ছেলেটা—সন্দেহ নেই। তারপরই দেখি, অদ্রির গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কী বিড়বিড় করল, আঙুল দিয়ে গাড়ির গায়ে লিখল—নেনটু, প্রতিশোধ। ভীষণ মজা লাগছিল আমার। অদ্রির ওপর ও কী প্রতিশোধ নিতে চায়? কেন? না কি ও প্রতিশোধ নিতে চায় নিজের ওপর?

পরে রাণুকে জিজ্ঞেস করেছি, তোর ছোট দেওরের মাথায় কি একটু ছিট আছে?

রাণু বলল, একটু আছে বোধহয়। তবে আমার কর্তাটির মতো নয়। দুই ভাইয়ে মিল আছে অনেক। কেন?

এমনিই। তোদের বাড়ির পূব দিকে একটা লাল বাড়ি আছে, সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ, ওই বাড়িটার দোতলায় একটা খুব সুন্দর মেয়ে থাকে, মেয়েটা কে?

রাণু একটু ভেবেচিন্তে বলল, ও, তুই মালার কথা বলছিস। মালা দত্ত, রেডিয়োতে গান গায়। ওর সঙ্গে আমার মেজো দেওয়রের বিয়ে হবে সেই কথা আছে। বলে হাসল রাণু, আসলে বিয়ে হবে কি না কে জানে!

কেন?

রাণু কুলকুল করে হাসল, বলল, ও মেয়েকে একদম বোঝা যায় না। শুনি, একসময়ে নেনটুর সঙ্গেও সেই কথা ছিল। মেয়েটা কেমন যেন! আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, ও বোধহয় গানকেই একমাত্র ভালবাসে, আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়।

সেই থেকে আমি মাঝে মাঝে নেনটুর কথা ভাবি। মালার কথাও। ওদের দু'জনের সম্পর্ক কী তা বুঝতে চেষ্টা করি। নেনটু ওই বাড়ি থেকে দৌড়ে নেমে এসেছিল কেন—সেই রহস্য নিয়েও মনে মনে নাড়াচাড়া করি। কয়েকটা ঘটনার টুকরো আমাকে দেওয়া হয়েছে যেন, গল্পটা সাজাতে হবে। সেই থেকে চেষ্টা করছি সাজাতে, হচ্ছে না। হচ্ছে না নেনটুর জন্যই। ও যদি স্বাভাবিক মানুষ হত তবে গল্পটা আমি অনায়াসে সাজাতে পারতাম। কিন্তু যখনই রাণুর বিয়ের আসরে অদ্রির দিকে ওর সেই চোখ তুলে তাকানো মনে পড়ে, কিংবা পোস্ট অফিসের সেই লোক হাসানোর চেষ্টা, মিছিলের সামনে দাঁড়ানো কিংবা অদ্রির গাড়ির গায়ে লেখা প্রতিশোধের কথা, তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি অবাক লাগে সেদিন রাণু যখন ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল তখন ও আমার দিকে তাকায়নি। আমার দিকে তাকায় না এমন মানুষ আমি দেখিইনি। তাই গল্পটা ঠিকঠাক খাপ খায় না, এখানে ওখানে সুতো ঝুলে থাকে। আশ্চর্য হই, পুরুষের আমি কিছুই জানি না। এক অদ্রি তো আর সমস্ত পুরুষ নয়! অথচ পুরুষ বলতে আমি মাত্র তাকেই জানি।

বিকেলের দিকে হাবুলদা এলেন। মা'র অসুখের খবর পেয়ে এসেছেন। আমার দিকে একবার চোখ নাচিয়ে 'কী খবর' বলে মা'র ঘরে ঢুকে গেলেন। হাবুলদা এ-রকমই আসেন। বাতাস বা চড়াই পাখির মতোই তাঁর অবাধ যাতায়াত। সকলের বাড়িতেই। আমার বাবা হাবুলদাকে সহ্য করতে পারেন না। বলেন, ওটা একটা মাদি পুরুষ। বাস্তবিক হাবুলদা বড্ড সাজানো-গোছানো পুতুলটির মতো। রোজ দাড়ি

কামান, কেয়ারি করে চুল আঁচড়ান, ধুতিটি পাঞ্জাবিটি রোজ পরিপাটি, জুতোয় পালিশ, আয়না দেখলেই সামনে একটুক্ষণ দাঁড়াবেনই। হাবুলদার চোখের নীচে একটু কাজলটানার ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ে, পাউডার-স্নোর গন্ধ পাওয়া যায়। গড়িয়াহাটার দিকে কিছু ছেলে সন্ধেবেলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়। তাদের মুখে স্নো পাউডার, ঠোঁটে ন্যাচারাল কালারের লিপস্টিক লাগানো। এ-সব বুঝতে মেয়েদের কষ্ট হয় না। গা জ্বালা করে। ওরা জানেই না একটু এলোমেলো একটু অন্যমনস্ক হলে ওদের কত সুন্দর দেখায়। মেয়েদের চিরকালের প্রিয় উদাসীন পুরুষ। পুরুষের সাজ হবে রুপো রঙের দুপুরের মতো তীব্র, খরার আকাশের মতো গম্ভীর। তার খানিকটা অচেনা থাকবে, খানিকটা চেনা।

আমি ঘরে ছিলাম। মা'র ঘর থেকে বেরিয়ে হাবুলদা আমার ঘরে এলেন।

কী করছ মঞ্জু?

কিছু না।

একটা ফাংশানে যাবে? কার্ড আছে। শাস্ত্রীয় সংগীত।

ইচ্ছে করছে না। বড্ড গরম।

হাবুলদা হাসেন। বলেন, তবে ঠান্ডা ঘরে যাই চলো। এই তো কাছে প্রিয়া সিনেমা।

টিকিট পাওয়া যাবে না। নতুন বই, বড্ড ভিড়।

হাবুলদা চোখ গোল করে বলেন, টিকিট! আমার টিকিটের অভাব! যে-কোনও হলে যে-কোনও শো বলো—

এ রকম রোজই হয়। হাবুলদা রোজ মা'র ঘর থেকে বেরিয়ে আমার খোঁজ করেন। এ-ফাংশন সে-ফাংশনে নিয়ে যেতে চান, কিংবা বেড়াতে। ব্যাপারটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ আমার শরীরের ওপর কাজ করে। আমি একটুও অস্বস্তি বোধ করি না। যে পুরুষ চোখে কাজল দেয় তার চোখকে আর ভয় কী? বরং শরীরটা আরও ছেড়ে দিই। মনে হয়, যদি সব খুলে ফেলে হাবুলদার সামনে দাঁড়াই, তবে হাবুলদা নিশ্চয়ই ভীষণ অসহায়ভাবে কেঁদে ফেলবেন, হাঁটু গেড়ে বসে বলবেন, আমাকে ক্ষমা করো।

মৃদু হেসে বলি, তার চেয়ে আর-একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন?

কোথায়?

পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে। ঠান্ডা বিয়ার খাব।

হাবুলদা হাসেন না, খুব পেকেছ!

শ্বাস ফেলে বলি, ছেলেবেলা থেকেই আমি পুরুষদের ইঙ্গিত বুঝতে পারি। চলুন না, খেয়ে আসি।

বলে হাবুলদার চোখের দিকে চেয়ে থাকি। উনি মনে মনে পিছু হঠছেন। বুঝতে পেরে হেসে ফেলি।

হাসিটাই বোধহয় তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। আমার চোখে চোখ ফেরত দিয়ে বললেন, সত্যিই যেতে চাও? না কি পরীক্ষা করছ?

লাফ দিয়ে উঠে বললাম, সত্যিই যেতে চাই।

হাবুলদা চাপা গলায় বললেন, তবে চলো মঞ্জু। দেখি, কেমন পারো!

এক মিনিট। আমি পোশাক পরে নিই।

ঝড়ের গতিতে আমি পোশাক পালটাই। আমার শরীরে সেই পাগলনাচ রক্ত নাচাচ্ছে। পাগল পাগল লাগছে। আমি সম্পূর্ণ সবুজ সাজ পরলাম। ঘরে এসে দেখি হাবুলদা চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে চিত হয়ে সিলিং দেখছেন। মুখে দুশ্চিন্তা। আমাকে দেখে সোজা হয়ে বসে বললেন, এ যেন গ্রিন রিভোলিউশন! সত্যিই যাবে মঞ্জু?

ভয় পাচ্ছেন?

না, আমার ভয়ের কী? ভয় তো মেয়েদের! অদ্রিবাবু যদি রাগ করেন?

কেউ জানবে না। চলুন।

ট্যাক্সিতে হাবুলদার পাশে বসে পার্ক স্ট্রিটে যেতে আমার একটুও অস্বস্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি একাই যাচ্ছি। সঙ্গে বড় জোর আমার চাকর রয়েছে। একা হওয়ার একটা উগ্র মাতলামি আছে

আমার ভিতরে। চারদিকে খরার কলকাতা, ভিখিরির চিৎকার, ঝরে-যাওয়া পাতার গাছ, ধুলোটে বাতাস আর অন্ধকার ঘর আমার ভাল লাগছিল না। পৃথিবীতে কাউকেই আমার ভয় পাওয়ার নেই। অদ্রি যদি জানেও, ক্ষমা করবে। সবাই ক্ষমা করবে আমাকে।

হাবুলদা অদ্রির কথা জানেন। তবু আমার হাতখানা ধরলেন। বাধা দিলাম না। উনি বললেন, মঞ্জু, সেদিন মিছিল থেকে পালিয়ে না এলেই পারতে!

থাকলে কী হত?

বড় বড় আর্টিস্টরা ছিলেন, ফিল্মস্টাররা। কখন কার নজর পড়ে যেত, ভবিষ্যৎটাই পালটে যেত হয়তো—বলে নিজেই হাসলেন, বললেন, শেষ পর্যন্ত কোনও হাঙ্গামাই হয়নি, সেই গুন্ডা ছেলেটাকে আমরা মেরে তাড়িয়ে দিই।

আমি হেসে বললাম, সেই ছেলেটার সঙ্গে কিছুক্ষণ পরেই আমার দেখা হয়েছিল। তার গায়ে একটুও মারের চিহ্ন ছিল না।

হাবুলদা চমকে উঠে বললেন, তুমি তাকে চেনো?

চিনি।

কে বলো তো?

বলব না।

হাবুলদা একটা শ্বাস ফেলে আমার হাতটা ছেড়ে দিলেন। সেই হাতেই পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছে বললেন, আমি অবশ্য তাকে চিনি।

একটু চমকে উঠে বললাম, কে বলুন তো!

হাবুলদা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, তার নাম সোমসুন্দর রায়। ডাকনাম নেনটু। এক সময়ে নামকরা বকসার ছিল।

চুপ করে থাকি। হাবুলদা আবার হাত ধরার জন্য হাত বাড়ান। আমার একটু ঘেন্না করে, ওই হাতে লোকটা নাক মুছেছেন। আমি হাত কোলের ওপর সরিয়ে নিই। হাবুলদার হাতটা সিটের ওপর একা পড়ে থাকে।

একটু চিন্তিত মুখে উনি বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ মঞ্জু, সেদিন আমরা ওর খুব একটা ক্ষতি করতে পারিনি। খানিকটা বক্সিং জানে বলে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। পুলিশে ডায়েরি করা আছে, আমরাও লোক লাগিয়েছি। ও যাবে কোথায়? আমি যদি ইচ্ছে করি তবে যে-কারও লাশ ফেলতে পারি কলকাতায়। ওকে আমরা ঠিক পেয়ে যাব মঞ্জু।

শুনে আমার হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। যদি এতই তোমার ক্ষমতা, তবে কেন চোখে কাজল পরো? জানো না, কাজল পরা দুর্বলতা? ওই কেয়ারি করা চুল, কামানো গাল, পরিপাটি ইস্ত্রি পাঞ্জাবি—এ-সবই দুর্বলতা। পুরুষ তো ময়ূর নয় যে পেখম ধরবে।

হাবুলদা নিজের মনেই বলেন, ছেলেটা ঠান্ডাই ছিল। হঠাৎ বড্ড নড়ছে চড়ছে। শুনেছি, পুলিশের গায়ে হাত তুলেছিল বলে জেল খেটে এসেছে। সস্তা একটা রংবাজি করে মিছিলটা আটকে আমার প্রেস্টিজ নষ্ট করেছে। ওকে ঠিক পেয়ে যাব মঞ্জু, ভেবো না। হাবুল সেন যে ফাংশনে অর্গানাইজ করে তাতে কেউ মাস্তানি করেনি আজ পর্যন্ত। তুমি বলছিলে চেনো। কীরকম চেনা? আত্মীয়?

আমি মুখটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে নিলাম। বললাম, আপনি কি ভাবছেন, আমি নেনটুর জন্য ক্ষমা চাইব আপনার কাছে?

হাবুলদা থতমত খেয়ে বলেন, না না, তা ভাবব কেন?

বলি, তা হলে অত কথা বলার কী দরকার? আপনারা যা খুশি করবেন ওকে। ও আমার কেউ না। মুখ চিনি মাত্র।

হাবুলদা চুপ করে যান। পলকের মধ্যেই আমি তাঁকে আবার ভুলে যাই। সব ভুলে যাই। ট্যাক্সির বাইরে উদ্দাম বয়ে যাচ্ছে কলকাতার রুপোলি রোদ, জ্যোতির্ময় দুপুর, একা নিঃসঙ্গ স্কাই স্ক্র্যাপার, ধুলোটে আকাশ। এখন কারও কথা মনে থাকে না।

এ জায়গাটার নাম জানো? হাবুলদা ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করেন।

কী? চাপা গলায় বলি।

রেস্টুরেন্টের এই ঘরটার নাম পাগলা-ঘর।

মুখ টিপে হাসি। কী পাথরের মতো ঠান্ডা মেঝে। কী সুন্দর সব ডুম থেকে আলো ঝুলছে। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় স্বর্গের আলোতে নাচছে ছেলেমেয়ে। সে-নাচের বাজনা বাজাচ্ছে যারা, তারা বসেছে দূরের অন্ধকারে। ড্রামের শব্দ, অদ্ভুত গিটারের শব্দ, বোঙ্গো বাজছে, বাজছে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান। আলো থেকে অন্ধকারে নাচিয়েদের মুখ বার বার ভেসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেইসব মুখে মাতাল হাসি, চোখে কুচি কুচি আয়না থেকে ছিটকে পড়া আলোর মতো বিভ্রম। মনে হয়, এখানে কেউ জেগে নেই। স্বপ্নের ভিতরে শুধু ঘুরে যাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে গভীর গদির চেয়ার, লাল রঙের মসৃণ টেবিল। মদের মিষ্টি গন্ধে মাথা ঝিম ঝিম করে। নাচ আর বাজনার শব্দ আমার বুকের ভিতরে দ্রিম দ্রিম করে প্রতিধ্বনি তোলে। সেখানে এক আদিম নাচ লুকিয়ে আছে কবে থেকে। একা ঘরে কতবার নেচেছি। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি। কলকাতার খরা চোখ থেকে মুছে যায়।

হাবুলদা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, কেমন লাগছে?

দারুণ।

হাবুলদা বিয়ারের লম্বা জগটা এগিয়ে দেন।

খাও। আস্তে আস্তে খেয়ো। মাংসের বড়া আসছে।

তেতো বিয়ার। কিন্তু তার গন্ধটা বড় মিষ্টি। আমি আস্তে আস্তে খেতে থাকি। ভাল লাগতে থাকে। মাংসের বড়া মুখে তুলি, পেঁয়াজ খাই, পাঁপরভাজা দাঁতে ভাঙি, বিয়ারে চুমুক দিই। ভাল লাগতে থাকে। বহুকালকার পুরনো অভ্যাসগুলি, স্মৃতিগুলি খুলে পড়ে যেতে থাকে। সেও একরকমের বসন-খোলা। বিয়ারের ওপর আমার মনটা ভাসতে থাকে।

বাজনাটা থামে। নাচের দলটা মিলিয়ে যায় অন্ধকার কোণে কোণে। বাজনাটা থামতেই আমার রক্তের তাল থেমে যায় যেন। দম বন্ধ হয়ে আসে। ঠোঁট থেকে বিয়ারের ফেনা মুছে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলি, বাজাও।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো পালটে সবুজ হয়ে যায়। বাজনা বেজে ওঠে। পাগলের মতো বাজতে থাকে। সমস্ত বিদেশকে, অচেনা পৃথিবীকে, পাহাড়-সমুদ্র-অরণ্যকে, আদিমতাকে ঘুরিয়ে এনে আছড়ে ফেলতে থাকে নাচঘরের মেঝেয়। চার দিকে মানুষেরা দুলতে থাকে, কাঁপতে থাকে। আমি দেখি, এ যেন কয়েক হাজার বছর আগেকার পৃথিবীর আরণ্যক ছায়া, গাছের ফাঁকে ফাঁকে বহ্ন্যুৎসব, মানুষেরা শিকারের চারদিকে ঘুরে ঘুরে জয়ের নৃত্য করছে। এখানে কেউ কারও নয়, যে যাকে চায় সে তার। অধিকারবোধহীন এ এক অবাক উৎসব।

চিতাবাঘের মতো সতেজ একটা ছেলে লাফ দিয়ে ভেসে এল। তার মুখে দাড়ি, চৌকো চোয়াল, বিশাল কাঁধ। মুখে একটা বোধহীন লোল হাসি, মুখের চামড়া এবড়োখেবড়ো, তাতে ব্রোঞ্জের মতো একটা রং, চোখ ঝিকোচ্ছে। কোন অন্ধকার থেকে সে উঠে এল কে জানে! তামাটে রঙের ভীষণ চাপা প্যান্ট ফুঁড়ে ফুলে আছে তার সবল উরু, ঘন নীল শার্টের খোলা বোতামের ভিতর দিয়ে তার রোমশ বুক দেখা যাচ্ছে। সেই বুকে একটা সোনার চেনে ঝুলছে ক্রুশ। সে আমার টেবিলের ওপর ঝুঁকে অনায়াসে বিনা দ্বিধায় স্পর্শ করল আমার কনুই, ফিস ফিস করে আবেগের গলায় বলল, মিস, ও মিস, কম অন—আজ তোমার দিন—আজ তোমার দিন—

এতটুকু দ্বিধা বোধ করি না। স্মৃতি নেই, বোধ নেই, কেবল দ্রিম দ্রিম করে বুকের ভিতরে যুদ্ধের বাজনার মতো কী যেন ডাকে। উতরোল সমুদ্রের মতো তার ডাক, স্তম্ভিত পাহাড়ের মতো তার আকর্ষণ, হাজার বছরের শ্যাওলায় সবুজ অরণ্যের মতো তার টান। অচেনা বিদেশ, অচেনা মানুষেরা চার দিকে। আমি তো কারও নই। আমার তো কেউ নেই। শুধু আছে মুহূর্তগুলি। আমি উঠে দাঁড়াই। বিয়ারটা ধরেছে আমাকে। মাথাটা ঘোরে, পা টলে একটু। ছেলেটা দুই বিশাল হাতে পাখির মতো আমাকে তুলে নেয়।

নাচের চত্বরে সে এনে আমাকে ছেড়ে দেয়। পা টলতে থাকে আমার, মাথা ঝিম ঝিম করে, আমি মাতালের হাসি হাসতে থাকি। ছেলেটার মুখ আমার মুখের ওপর ছায়া ফেলে। তার পরমুহূর্তেই সে আমাকে তার বিশাল বুকের মধ্যে টেনে নেয়। বাজনার শব্দ গভীর কুয়ার ভিতর থেকে উঠে আসতে থাকে। কী গভীর শব্দ! সে আমাকে চরকির মতো ঘোরাতে থাকে। আমি তার পুরুষালি গায়ের স্বেদগন্ধ পাই। মুখ তুলে হাসি। তার গলার ক্রুশটা আমার গালে লাগে, ঠোঁটে লাগে। গভীর তৃষ্ণায় আমি ক্রুশটা দাঁতে চেপে ধরি, মুখে নিই। ঠান্ডা স্বাদ। ছেলেটা চোখে চোখ রেখে হাসে। অচেনা সে, বড়ই অচেনা। তবু পৃথিবীতে কে কার! আমি ক্রুশ মুখে নিয়ে হাসি।

নাচের তালে আমার পা পড়ে না। বাজনা এক দিকে বাজে, আমার পা পড়ে অন্য দিকে। আমি গভীর নির্ভরতায় তার বুকে মাথা রাখি। সবল হৃৎপিণ্ডের ডুব-ডাব ডুব-ডাব শব্দ শুনতে পাই। সেই তালে পা ফেলি।

কে যেন চেঁচিয়ে বলে, দি গ্রিন—দি গ্রিন লেডি—হো—আ—

একটা লোহার বালা-পরা হাত আমার হাত চেপে ধরে, কানের কাছে আর-একটা পুরুষ গলা বলে, কম অন গ্রিন লেডি—

পরমুহূর্তেই ছেলেটার বুক থেকে অন্য একজন কেড়ে নেয় আমাকে। চুমু খায়। উদ্দাম ড্রামের শব্দ সংগীতের সব নিয়ম ভেঙে দিতে যাচ্ছে। কেউ বাজনার সঙ্গে পা ফেলতে পারে না। তার দরকারও নেই। পাগলা-ঘরে কোনও নিয়ম নেই। লজ্জা নেই। রাগ করবে না কেউ, মানা করবে না।

আমি অনায়াসে পা ফেলতে থাকি। নাচের সব সীমাবদ্ধতা ভেঙে দিতে থাকি। এক বুক থেকে আর-এক বুকে চলে যাই। অচেনা সব হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে থাকি। কে যেন এক পলকের জন্য নাচের চত্বর থেকে তার অন্ধকার টেবিলে নিয়ে যায়। তার মুখ দেখতে পাই না। শুধু লাল টকটকে জামাটা দেখি। একটা গভীর খয়েরি রঙের মদ ঝকঝকে গ্লাসে তুলে দেয় আমার মুখে, ফিস ফিস করে বলে, ড্রিঙ্ক গ্রিন লেডি, ড্রিঙ্ক, ইউ হ্যাভ থার্স্ট—

শুনে মুহূর্তেই তাকে গভীর ভালবেসে ফেলি। চেরির গন্ধে ভরা, মিষ্টি ঝাঁঝালো মদ আমার বুকের তেষ্টা ভাসিয়ে নেয়। যুদ্ধের বাজনা দ্বিগুণ হয়ে ডাকে। লাল জামা পরা লোকটা আমাকে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাচের চত্বরে।

কখন হাত-বদল হয়ে যাই। বিভিন্ন পুরুষের ঠোঁট স্পর্শ করে আমার ঠোঁট, গাল, কপাল। শরীরে শরীরে চেপে ধরে। কেউ হিংসে করে না, কেউ চিরদিনের মতো নিয়ে যেতে চায় না। ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে চিৎকার ওঠে—গ্রিন লে ডি—হো—আ—

নাচতে থাকি। ভেসে যায় অতীত। স্মৃতি। সম্পর্ক। আমার সুখের স্থির জীবন। কেবল মুহূর্তগুলি দেখতে পাই। পুঁতির দানার মতো ছড় ছড় করে ছড়িয়ে পড়ছি আমি।

নাচ আর নাচ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বাজনা মৃদু লয়ে নেমে যেতে থাকে। কে যেন টেনে নেয়। অন্ধকার টেবিলে নিয়ে বসায়। পিঠে হাত রাখে। ঠান্ডা সুস্বাদু মদ তুলে দেয় মুখে। আদর করে। আবার ধনুকের টংকারের মতো বেজে ওঠে গিটার। উঠে দাঁড়াই। গভীর ক্লান্তি আসে, শরীর টলতে থাকে। তেষ্টায় বুক পুড়ে যেতে থাকে। তবু নাচতে আমাকে হবেই। এ আমার নিয়তি।

নাচি, নাচতে থাকি। আমাকে ঘিরে কয়েকজন পুরুষ গোল হয়ে একটা বৃত্ত রচনা করেছে। লাল জামা, নীল জামা, হাতে বালা, চওড়া বেলট। তাদের কারও মুখ চেনা মনে হয় না। একটা মুখের আদল আর-একটা মুখের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তারা আমাকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে হাততালি দেয়। আমি নাচতে নাচতে টলতে থাকি, টলতে টলতে নাচি। গভীর ভালবাসায় নীল জামার দিকে হাত বাড়িয়ে বলি—আমাকে নাও। সে এগিয়ে এসে আমার হাত স্পর্শ করে মাত্র, তারপরই হাত ধরে ঘুরিয়ে একা ছেড়ে দেয়। ফিরিয়ে দেয় নীল জামা। ফিরিয়ে দেয় হাতে-বালা। কেউ কথা বলে না। হাসে আর হাততালি দেয়। আমি প্রাণপণে নাচি আর নাচি। দেখতে পাই, আলোগুলো নিভে গেল। পুরুষেরা মিলিয়ে গেল ছায়াবাজির মতো।

চারদিকে লক্ষ বছরের পুরনো গাছ। নিবিড় অন্ধকারে। শ্যাওলায় পিছল মাটি। গভীর অরণ্যের ভেজা গন্ধ। আমি একা। গভীর ক্লান্তিতে শরীর ঝরে পড়ছে। চেনা, প্রিয় কোনও মানুষের নাম ধরে

চিৎকার করে ডাকতে যাই। ভয়ংকর আতঙ্কে দেখি, সব নাম ভুলে গেছি। কারও নাম মনে পড়ে না, কারও মুখ না, কারও স্পর্শ না। গভীর অরণ্যে গম্ভীর বাতাস বয়ে যায়। ফিস ফিস করে বাতাস বলে যায়—গ্রিন লেডি, ড্যান্স অ্যালোন—দিস ডে ইজ ফর ইউ—

আমি চিৎকার করে বলি, ক্ষমা করো। কিন্তু সব ভাষা ভুলে গেছি কবে! কেবল আদিম মানুষের ভাষাহীন শব্দ বুক থেকে বেরিয়ে আসে—হো—আ—

## ॥ সোমসুন্দর ॥

আমি বাজিটা হেরে গেছি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। বড়দা দুর্গাপুরে ফিরেছিল।

মনোতোষ বলে, তাতে কী! বাসায় তো ফেরেননি। আমার বাজি ছিল, বাসায় ফিরলে আমি জিতব।

আমি বলি, না ফিরলেই কী! খবর তো পাওয়া গেছে! তা ছাড়া বাসায় ফেরাটা তখন সেফ নয়।

মনোতোষ মুখটা চকিতে ঘুরিয়ে বলে, কেন?

বেফাঁস কথাটা বলেই বাতাস গিলেছি। মুখটা পাথরের মতো করে বললাম, ও কিছু না।

মনোতোষ তবু বলে, রাজনীতি নাকি?

চুপ করে থাকি। মনোতোষ শ্বাস ফেলে বলে, আমার ভাইটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত যাদবপুরে। সব ছেড়ে এখন ওইসব করে। সারা দিন বাসায় থাকে না, কত রাতে সে ঘুমোতে আসে তা কেবল মা জানে। সকালে দেখি, জামায়, আঙুলে আলকাতরার দাগ।

কিছু বলেন না?

বলতে ভয় করে। ওটা যে ওর নেশা। আমার ঘোড়ার নেশার মতো। আমি যদি ওর রাজনীতি নিয়ে বলি, ও উলটে আমাকে আমার ঘোড়া নিয়ে বলবে। কাজেই ছেড়ে দিয়েছি। কেবল মাঝে মাঝে তারকেশ্বরে আমি আর মা মানত করে রাখি। রবিবার গিয়ে পুজো দিয়ে আসি। বাবা তারকনাথই রেখেছে।

গাছতলায় বাঁধানো বেদিতে দু'জন চুপ করে বসে থাকি। সন্ধের পর একটু বাতাস দিচ্ছে। শুকনো বাতাস।

মনোতোষ একটু কেশে বলে, তা হলে বাজিটার কী হবে?

আমরা কেউ জিতিনি।

মনোতোষ আমাকে কনুইয়ের একটা ঠেলা দিয়ে খক খক করে হাসল। বলল, দূর মশাই! নিয়ম মাফিক বাজিটা আমিই হেরেছি। টাকাটা যদি না নেন তবে চলুন একটু খাওয়া দাওয়া করি। বেশি কিছু না, একটা করে মোগলাই, আর একটু কষা মাংস—

আমি মাথা নাড়ি।

মনোতোষ হাসে, ক'দিন আগে আট আনা ধার নিয়েছিলাম বলে দেখছি আমার ওপর আপনার ধারণা পালটে গেছে। ধারের ওই দোষ মশাই, লোকের কাছে পার্সোনালিটি রাখা যায় না। যে ধার দেয় সে করুণা করতে শুরু করে।

আমি হেসে ফেলি, বলি, তা নয়।

তা-ই। তবে ভাববেন না। গত শনিবার ফ্লোরা আমাকে একশো চল্লিশ টাকা পেমেন্ট দিয়েছে। বুড়ো ঘোড়া, এখন আর কেউ ফ্লোরার ওপর টাকা ধরে না। আমি মরিয়া হয়ে ধরেছিলাম। আমাকে পেমেন্ট দেওয়ার জন্যই ফ্লোরা সেদিন মুখে রক্ত তুলে দৌড়োল। গত ছ'মাসে ফ্লোরার এই প্রথম উইন, আমারও ঘোড়ার মাঠ থেকে প্রথম আয়। চলুন, বেশি কিছু না। একটা করে মোগলাই, একটু কষা মাংস।

খেতে ইচ্ছে করছে না। বলতে গেলে সারা দিন আমার পেটে কিছু পড়েনি। দুপুরে খাওয়ার আগে দুর্গাপুর থেকে বউদির চিঠি এল। আমাকে লেখা। এক জায়গায় লিখেছে—নেনটু, একবার আসবে ভাই? তোমার বড়দাকে এখানে দাদা ছাড়া কেউ চেনে না। তাই কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে

এখানেই ও আছে। কুলি, মুটে, মজুর সেজে, কিংবা চাষাভুষোদের সঙ্গে মিলেমিশে ঠিক লুকিয়ে আছে। দাদার বড় কাজ এখানে, সময় পায় না। তুমি চলে এলে বেশ হবে। তুমি আর আমি মিলে খুঁজব। একা একা আমি পারি না। দাদা বেরিয়ে গেলে বুবলাকে দুপুরে ঘুম পাড়াই। মিনু ঘুমোতে চায় না, কাজেই ওকে নিয়ে চুপি চুপি বেরোই। দাদা জানলে রাগ করবে, তাই কাউকে জানাই না। রাস্তাঘাট চিনি না, বিরাট জায়গায় কোথায় খুঁজব? তবু হেঁটে হেঁটে শহরের সব পাড়া ঘুরি। মিনু অত হাঁটতে পারে না। তাই তাকে কোলে নিতে হয়। মিনু তো রোগা, তবু ওকে টানতে এই দুপুরের গরমে কী যে কষ্ট হয়! তবু হাঁটি, লোকের মুখ দেখে দেখে বেড়াই। গরম একশো দশ পনেরো ডিগ্রি। পরশুদিন মিনু হঠাৎ মাঝরাস্তায় অজ্ঞান হয়ে গেল আমার কোলের মধ্যে। এই গরম কি সইতে পারে! কখনও তো কষ্ট পায়নি! কষ্ট পাওয়া শিখতে সময় লাগবে। মাঝরাস্তায় ওকে নিয়ে কী যে বিপদে পড়লাম! কোথাও একটু জল নেই। রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। শহর ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম তো। বাড়ি-ঘরও নেই সেখানে। কী কষ্টে যে বাসায় ফিরেছি! সেই থেকে মিনুর একশো চার ডিগ্রি জ্বর। ডাক্তার বলছে, সর্দিগর্মি। মিনির অসুখ হওয়াতে দাদা সব টের পেয়ে গেছে। রেগে বলেছে—এ-রকম করলে তোকে কলকাতায় রেখে আসব। দাদার কথার উত্তর দিইনি। কিন্তু আমি যে না খুঁজে পারি না। এখনও অনেক লোকের মুখ দেখা বাকি রয়ে গেছে।...

চিঠিটা পড়ার পর দুপুরের খাওয়াটা হল না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম কেবল। মা বাবাকে জানালাম না কিছু। কিন্তু মিনুর টুলটুলে সুন্দর মুখখানা বার বার দেখি, জ্বরের ঘোরে নিভে যাচ্ছে। শুকনো ঠোঁট, আরক্ত মুখ, তড়কায় চমকে চমকে উঠছে মিনু।

অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। মনোতোষ ঠেলে তুলল, উঠুন মশাই। একখানা করে মোগলাই, আর একটু কষা মাংস—

ভবানীপুরে ফেবারিট রেস্টুরেন্টে চেনা টেবিল-চেয়ারে গিয়ে বসি। বন্ধুরা কেউ আসেনি এখনও। মোগলাই আসে, কষা মাংস আসে। গন্ধে হঠাৎ চনচনে খিদে পায়।

খান। মনোতোষ বলে, একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাবেন। আড্ডাবাজরা এসে গেলে হামলে পড়বে। ফ্লোরার দেওয়া একশো চল্লিশ টাকার কী-ই বা আছে আর!

হাসতে থাকি। বউদির চিঠিটার ওপর একটা বিস্মৃতির প্রলেপ পড়ে।

ফেবারিট রেস্টুরেন্টটা একটু গলির মধ্যে। বাইরের খদ্দের কম। গত দশ বছর আমরাই দখল করে আছি। গলিটা অন্ধকার। টিমটিমে রাস্তার আলো আছে, তবে দোকানের ভিতরের টিউবলাইটে বসলে বাইরেটা অন্ধকার দেখায়।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চায়ে প্রথম চুমুকটা দিয়ে চোখ তুলতেই দেখি দরজার সোজাসুজি বাইরের অন্ধকারে একটা সিগারেট স্থিরভাবে জ্বলছে। প্রথমে একটা দেখি। তারপরেই বুঝতে পারি, একটা নয়। দশ-বারোটা। নিঃশব্দে জ্বলছে সিগারেটগুলো। উঠছে, নামছে, কিন্তু সরে যাচ্ছে না।

চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে টেবিলে দু'টো টোকা দিই। মনোতোষ চোখ তুলতেই বলি, বাইরে কয়েকটা ছেলে। ওদিকে তাকাবেন না।

মনোতোষ হাঁ করে চেয়ে থাকে।

আমি হাসলাম, বললাম, আমি খবর রাখি, কয়েকটা ছেলে আমাকে খুঁজছে। বোধহয় এরাই। যদি আমার কিছু হয় তো—

বলে আমি দাঁতে ঠোঁট টিপলাম। কিছু মনে পড়ল না।

মনোতোষ ক্রমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে খানিকটা। তার চোয়াল নড়ে। কষ্টে বলি, আপনি বসে থাকুন। ভিতরে কিছু করতে সাহস পাবে না।

আমি মাথা নাড়ি, বলি, দশ-বারোজন আছে। আমি না বেরোলে ওরা ভিতরে আসবে। সময় দেবে না।

মনোতোষ হঠাৎ বলল, আপনি তো বক্সিং জানেন!

হাসলাম, বললাম, জানি না। জানতাম। সে অনেককাল আগেকার কথা। জানলেও লাভ ছিল না। মানুষ অতিমানুষ নয়। ওদের দশ-বারো জনের কাছেই আর্মস আছে।

মনোতোষ রুমাল বের করে মুখ মুছল। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বেয়ারা হারুকে ডেকে বলল, বিল দে। তাড়াতাড়ি।

উত্তেজনায় মনোতোষ ভুলে গেছে, এ-দোকানে আমাদের কোনওকালে বিল দেয় না। মুখে মুখে হিসেব।

মনোতোষ তাড়াহুড়ো করে পয়সা দিচ্ছে দেখে বললাম, ব্যস্ত হবেন না। বসে থাকুন। আমি বেরোচ্ছি।

মনোতোষের মুখটা হঠাৎ লাল হয়ে গেল। চাপা হিংস্র গলায় বলল, আপনি কি ভাবছেন আমি পালাচ্ছি! আমি সঙ্গে যাচ্ছি! দাঁড়ান।

ভীষণ অবাক লাগে। মনোতোষের হার্ট ভাল না। চিরকাল অতিরিক্ত খেয়ে তার ডায়াবেটিস দেখা দিচ্ছে। অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারপর ক্লান্ত হয়। বন্ধুরা বিস্তর বকাঝকা করে, তবু মনোতোষ খাবেই। শুনেছি, ডায়াবেটিসের রোগীর কোনও রোগ সহজে সারে না। কেটেকুটে গেলে রক্ত পড়া বন্ধ হতে চায় না। মনোতোষের বয়স চল্লিশ-টল্লিশ হবে। দু'টো ফুটফুটে মেধাবী ছেলের বাবা। ছুটির দিনে সকালে মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে আসে ফেবারিটে, পাশে বসিয়ে ডিমভাজা খাওয়ায়, ঠাট্টা করে বলে, তোদের বাবার কবর দেখে যা। এই রেস্টুরেন্টে বসে বসেই স্কুল-কলেজ ছেড়েছি, ঘোড়া ধরেছি, বাংলা ধরেছি। রোগ-টোগগুলোও সব এখান থেকে পাওয়া। এই রেস্টুরেন্ট থেকেই পাব ফেয়ারওয়েলের উপহার থ্রম্বসিস। বলেই ঝুঁকে পড়ে আমাদের দিকে চেয়ে বলে, কী যেন সেই জসীম-উদ্দিনের কবিতাটা—এইখানে তোর দাদীর কবর..., বলে খক খক করে হাসে। ফুটফুটে ছেলে দু'টো চারদিকে অবাক হয়ে চায়।

আমি ঝুঁকে বললাম, মনোতোষবাবু, এটা আমার ব্যাপার। একা আমি হয়তো বা বেরিয়ে যাব, আপনি পারবেন না।

মনোতোষ তার স্থূল লাল মুখখানা স্থিরভাবে তুলে বলে, আমি আজ আপনাকে এখানে এনেছি। নইলে আপনি হয়তো আসতেন না। আমি আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আসব।

মনোতোষের কথা শেষ করার আগেই চারটে ছেলে ঘরে ঢুকল। চার জনই অচেনা। কিন্তু অচেনা হলেও ওদের চোখ-মুখে এক ধরনের পরিচয় দেওয়া আছে। এরা মারতে জানে। ঢুকে ওরা কোনও দিকে তাকায় না। কেবল চারজন চারটে টেবিলে গিয়ে বসে। বসে থাকে। যেন ভাবছে। রেস্টুরেন্টের ভিতরে কোনও সম্ভাব্য গুপ্ত রাস্তা থেকে থাকলে ওরা সেটা আটকে দিল। আমাকে বেরোতেই হবে।

হারু মনোতোষের ফেরত-পয়সা হাতে দিয়ে সেই চারটে ছেলের একজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী খাবেন?

ছেলেটা মাথা নাড়ল।

এইটুকু দেখে আমরা উঠলাম।

দরজার কাছ বরাবর আমি মনোতোষকে কনুইয়ের ধাক্কায় পিছনে সরিয়ে দরজা জুড়ে দাঁড়াই। আলসেমির ভান করে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলি। ততক্ষণে দেখা হয়ে যায় যা দেখার। বড় রাস্তার দিকেই ওরা দলে ভারী। গলির ভিতর দিকটায় মাত্র দু'জন। সিঁড়ির মুখটাতে বাবু দাঁড়িয়ে আছে, হাতে পাঞ্চ। বাবুর বদলে দিলীপ সামনে থাকলে আমি একটু মুশকিলে পড়তাম। আমি পেশাদার গুন্ডা নই, কাউকে বন্ধু বলে ভাবলে এখনও হাত ঢিলে হয়ে যায়। বাবু আমার বন্ধু নয়, কাজেই আমার অসুবিধে নেই।

সিঁড়িতে পা দিলাম না। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই চকিতে লাফ দিয়ে নামলাম। বাবু হাত তুলবার সময় পেল না। চরকির মতো ঘুরে বাঁ হাতের নিখুঁত মারে শুইয়ে দিলাম ওকে। ওই মারের বেগ থেকেই ঘুরে বাঁ দিকে ছুটতে লাগলাম।

এরা চেঁচিয়ে তাড়া করে না, নিঃশব্দে করে। মারে শব্দ না-করে। বাঁ দিকের ছেলে দু'টো একটু আনাড়ি। বোকার মতো ল্যাং মেরে আমাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। আমি শুধু দৌড়ের মুখে তাদের উরুর ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে যাওয়ার সময়ে দু'দিকে দু'জনকে কনুই ঠেকিয়ে গেলাম। দু'টোই ছিটকে গেল। দু'দিকের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সামলে ছুটতে লাগল।

চেঁচিয়ে লাভ নেই। এ-পাড়ার লোক ওদের চেনে, বেরোবে না। চেঁচালে বরং দমের ক্ষতি। দমটা ধরে রেখে সিধে দৌড়োনো গেল। গলিটা সরু হয়ে এসেছে। হলেই সুবিধে। আমি ঠিক পালাতে চাইছি না। একটা জায়গা খুঁজছি যেখানে জায়গাটা সংকীর্ণ হবে, ওরা এক-দু'জনের বেশি একসঙ্গে মারতে পারবে না। গলিটা আরও একটু সরু হলেই আমি ফিরে দাঁড়াব।

কিন্তু অতটা সময় পাওয়া গেল না। আনাড়ি দু'জনের মধ্যে একজন ভাল দৌড়োয়। গলিটা আরও সরু হওয়ার মুখে সে প্রায় আমার সমান্তরাল অবস্থায় চলে এল। এ-অবস্থায় মারা চলে না, মারতে হলে থামতে হবে। আড়চোখে দেখি, ছেলেটা ডান হাত চালিয়ে দিল আমার পিঠের দিকে। কেবল একটু সরে যাই। তবু ছোরাটা বাঁ কনুয়ের ওপর চামড়া চিরে ফেলে। ছেলেটা আবার ছোরা তোলে। এবার ভুল করবে না আর।

থেমেই ঘুরে যাই। ঘুরতে ঘুরতেই ডান হাতে মারি। এটা আমার পুরনো প্রিয় মার। ছেলেটা পড়ে যায়। একটু দুঃখ হতে থাকে। রিং-এর বাইরে আমি এতকাল কদাচিৎ কাউকে মেরেছি। কিন্তু ইদানীং আমার রিং-এর বাইরের প্রতিপক্ষ বেড়ে যাচ্ছে কেবল।

ঘুরবার সময় পেলাম না। দ্বিতীয় আনাড়ি ছেলেটা দৌড়ে এসে কী একটা ছুড়ল। মাথা চকিতে নিচু করি। সেটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে পিছনে কোনও দেয়ালে ফাটল। ছেলেটার হাত এখন ফাঁকা, আমার নাগালের মধ্যেই। চকিত হাতে তার মুখে মারি। মেরেই চমকে গিয়ে বুঝতে পারি, ছেলেটা বক্সিং জানে। মাথাটা সরিয়ে নিল আচমকা। আমার ঘুঁষিটা হাওয়া কেটে বেরিয়ে গেল। অমনি ভীষণ ভয়ে ভরে গেল বুক। ওদের মধ্যে অন্তত একজন বক্সিং জানে—এ সত্যটা আমাকে পলকের মধ্যে দুর্বল করে দিল। আমি আর একদম জোর পেলাম না। ঘুরে আবার দৌড় দিলাম।

ডান দিকে এলগিন রোডের মুখে। পুলিশের টানা বাঁশি শুনে চোখ তুলে আবছা একটা কালো জিপ গাড়ি দেখতে পাই। ডান দিকের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ি। একটা বুটের শব্দ তেড়ে আসে, চেঁচিয়ে বলে, হল্ট! হল্ট! গোলি মার দুঙ্গা!

গলি থেকে বেরিয়ে আশুতোষ মুখার্জি রোডে পড়ি। তারপর আর দৌড়োতে হয় না। ভিড়ে মিশে যাই।

হাতটা নিয়েই মুশকিল। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। লোকজন তাকিয়ে দেখছে। সন্দেহের চোখ। থেমে কোনও ডাক্তারখানায় ঢুকতে সাহস পাই না। রাস্তাটা পার হয়ে ছোট রাস্তায় ঢুকি। একটা বাস পেয়ে যাই।

পরদিন সকালেই পুলিশ আসে। সেই অফিসার।

গম্ভীর মুখে আমাকে বলেন, কী খবর?

আমি স্থির গলায় বলি, আপনারা তো খবর জানেন।

নির্দ্বিধায় অফিসার আমাকে একটি চড় মারেন। বলেন, হ্যাঁ, জানি। টু নো ইজ আওয়ার প্রফেশন। থানায় চলুন।

ঘটনাটা আমার মা-বাবার চোখের সামনেই ঘটে। বাবা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। মা ভীত চোখে ব্যাপারটা দেখে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে। ছোড়দা শুধু বলে, মারছেন কেন? মারাটা তো আইন নয়। ওয়ারেন্ট থাকলে নিয়ে যান।

থানায় এবারও আটকাল না। ছেড়ে দিল। সেই দার্শনিক ও-সি শুধু বললেন, ব্যাপারটা আমি আন্দাজ করছি। কিন্তু মশাই, আপনাকে আমি ঠান্ডা থাকতে বলেছিলাম কিনা। আপনারা যারা নন-পলিটিক্যাল তারা যদি এখন এমনভাবে পুলিশকে অসুবিধেয় ফেলেন তবে আমরা যাই কোথায়! আপনারা একটু আমাদের অসুবিধেগুলো বুঝুন দয়া করে। আমাদের লক-আপে আর জায়গা নেই।

হাঙ্গামা আমি করিনি। শুধু প্রাণভয়ে পালিয়েছি। কিন্তু সে-সব কথা বলে লাভ নেই। পুলিশ তার নিজস্ব সূত্রে খবর রাখে।

ও-সি বললেন, এখন আর কোথাও যাবেন না। ঘরেটরেই থাকবেন। আর কোনও হাঙ্গামা হলে—

বলে হাসলেন। অর্থপূর্ণ হাসি। কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাই, আগের দিনের তুলনায় তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ বেশি। একটু অস্বস্তির মধ্যে আছেন যে বোঝা যায়। অনেকক্ষণ শূন্য চোখে আমার দিকে চেয়ে কী যেন ভাবলেন। আবার হঠাৎ সচেতন হয়ে বললেন, দিলীপ আর বাবুদের আমি চিনি। ওরা এক সময়ে খুব জ্বালিয়েছে। ওদের সঙ্গে আপনার লাগল কী করে?

উদাসভাবে বলি, লেগে গেল। আমি লাগাইনি।

উনি একটু শ্বাস ছেড়ে বললেন, তবে ওদের ধার কমে গেছে। পুরনো মস্তানদের দিন আর নেই। এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক টিন-এজার। এদের কোনও পরিচয় আমাদের খাতায় নেই। এদের রক্তটাই পাগল। আমরা এদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আছি। দিলীপ কিংবা বাবুদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই নেই।

বলে শ্বাস ছেড়ে আমার দিকে আর-একবার তাকালেন, বললেন, আপনার নামে তিন বার ডায়েরি লেখানো হল। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সাবধানে থাকবেন।

মনোতোষের কোনও খবর জানি না। জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। একটু ঘুরে ফেবারিটে গিয়ে উঁকি দিই। এগারোটা বেজে গেছে। টেবিলের ওপর চেয়ারগুলো উলটে রেখে ঘর ধোলাই হচ্ছে। হারুকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই হাঁউমাউ করে বলল, কাল কী কাণ্ড হয়ে গেল বাবু!

কী কাণ্ড?

যে চারটে ছেলে ছিল এখানে, আপনি পালিয়ে যাওয়ার পর তারা বেরোতে যাচ্ছে হুড়মুড় করে, মনোতোষদা তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে সে কী চেঁচানি! কেবল বলে, বেরোলেই মেরে ফেলব তোদের। ছেলেগুলো প্রথমটায় ভড়কে গিয়েছিল, তারপর মনোতোষদাকে দরজার কাছে ফেলে দিয়ে দারুণ লাথি মেরে অজ্ঞান করে চলে গেল। চেয়ার-ফেয়ার উলটে, কাপ-ডিশ ভেঙে তুলকালাম। মনোতোষদার এমনিতে তেমন লাগেনি, কিন্তু ভয়ে গোলমালে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা ডাক্তার ডেকে আনলাম, বাসায় খবর দিলাম। রাত্রেই হাসপাতালে দিয়ে আসতে হল। খুব অসুখ মনোতোষদার।

দুপুরটা খুব দীর্ঘ লাগছিল। থানা থেকে ফেরার পর বাবা অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

তোর কী হয়েছে আমাকে একটু বল।

কিছুই হয়নি, কী হবে!

তোর মুখ তো তুই দেখতে পাস না। আমরা পাই। তোর চোখ-মুখ অবিকল বাবার মতো হয়ে যাচ্ছে। বাবা যখন খুন করতেন তখন খুব ঠান্ডা হয়ে থাকতেন। কথাবার্তা কমে যেত। ঘন ঘন তামাক খেতেন। গভীর রাত পর্যন্ত শুনতাম উঠোনে খড়মের শব্দ তুলে পায়চারি করছেন। তারপর একদিন সময় হলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতেন। ফিরে এসেই পুজো দিতে যেতেন কালীবাড়িতে। সেইসব সময়ে বাবাকে দেখলেই মনে হত—এ বাবা নয়, অন্য লোক। ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যেতাম। তোকে দেখে আমার আজকাল সে-রকম হয়। তুই কোথায় যাস? কাদের সঙ্গে মিশিস?

কারও সঙ্গেই নয়।

মিশিস, আমি জানি। পলিটিকস করে একজন ফেরার। অন্যজন হাঙ্গামা বাধিয়ে আসছে। কাল থেকে তোর হাতে ওটা কীসের ব্যান্ডেজ?

পড়ে গিয়েছিলাম।

পড়ে গেলে সকালে পুলিশ এসেছিল কেন? থানায় নিয়ে গেল কেন? মিথ্যে কথা বলিস না নেনটু। যা হয়েছে খুলে বল।

কিছু হয়নি বাবা।

বাবা হতাশ গলায় বলেন, আমাকে বলবি না সে আমি জানি। ছেলেরা একটা বয়সের পর বাপকে গ্রাহ্য করে না। মনে করে, তাদের ব্যাপারগুলো বাপ বুঝবে না।

বাবার জন্য একটু কষ্ট হয়। বলি, বললেই বা তুমি কী করবে?

বাবার মুখ রাগে লাল হয়ে যায় হঠাৎ। বলেন, কী করব? কিছুই করব না। তোদের মেরে ফেলুক লোকে, আমার কী?

আমি চুপ করে থাকি।

বাবা অনেকটা সময় নিয়ে সামলে যান। বলেন, মানুষের পীড়ক হয়ো না। বরং সমাজ সংসার থেকে পালিয়ে যাও।

বাঃ, আমি কাকে পীড়া দিলাম?

দিচ্ছ কি না তা তুমিই জানো। তোমার হাতে ব্যান্ডেজ, পুলিশ আসছে প্রায়ই। এ-সব তো এমনিতেই হচ্ছে না?

যদি বলি, আমাকেই লোকে পীড়া দিচ্ছে?

যদি দিয়ে থাকে তো তার নাম বলো। আমি পুলিশে গিয়ে বলব, মিনিস্টারদেরও দরকার হলে জানাব, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দেব। এ-সবই আমি করতে পারি। তবে আমার কাছে লুকোনো কেন?

নৌকো ঘাট ছেড়ে দরিয়ার স্রোতে পড়ে গেছে। একা এক হাটুরে দেরিতে এসে নৌকো ধরতে পারেনি, ঘাটে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে নৌকো ফেরাতে বলছে, দৌড়াচ্ছে নৌকোর সমান্তর আঘাটার জঙ্গল ভেঙে। কিন্তু জানে, নৌকো ফিরবে না, তবু তার আপ্রাণ চেষ্টা। ওই নৌকো আর ঘাটের যা তফাত, আমার আর বাবার মধ্যে তফাতটা সেইরকমই। বাবা তবু প্রাণপণে চেষ্টা করছেন নৌকো ফেরাতে। ফিরবে না জেনেও।

তোমার বড়দার বিরুদ্ধে পুলিশ কী কেস দিয়েছে জানো? খুনের।

জানি। কিন্তু বড়দা খুন করতেই পারে না।

বাবা বড় চোখে আমাকে দেখেন। সেই চোখে একটা অপরিচয়ের আবরণ ভেদ করে আসল মানুষটাকে চেনবার চেষ্টা আছে। যেন বা এই বয়সে বাবা হঠাৎ বুঝতে পেরেছেন, তাঁর ছেলেরা তাঁর সবচেয়ে বেশি অচেনা রয়ে গেছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে গলার কফ সরিয়ে বললেন, কী করে জানব যে খুন করেনি? দেখতে শান্তশিষ্ট ছিল বলে বলছ? ওতে কিছু যায়-আসে না। খুব শান্ত নিরীহ মানুষের মধ্যেও খুনের ইচ্ছা লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা মানুষের মধ্যে তার বংশধারার নানা মানুষের ছায়া থাকে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না হয়তো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মানুষ কখনও-সখনও অন্য মানুষ হয়ে যেতে থাকে। এ-সবই রক্তের দোষ। আমার বাবাকে দেখেছি, কোনও শিশুর কান্না শুনলে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়তেন। কোনওখানে কোনও বাচ্চা কাঁদছে, বাবা অস্থির হয়ে কেবল বলতেন, ওকে চুপ করা, শিগগির! বাচ্চারা কাঁদবে কেন? অ্যাঁ! কাঁদবে কেন? কেমন সংসার করিস তোরা, কেমন তোরা মা-বাপ যে ছেলে কাঁদে? আবার আমাদের উঠোনেই কত বিধবা এসে আছড়ে পড়ে কেঁদেছে, অভিশাপ দিয়েছে, কত মানুষ এসে কেঁদে বাবার পা জড়িয়ে ধরেছে, বাবা সে-সব শুনতে পেতেন বলে মনে হত না। মানুষের এক-আধটা ভাল আচরণ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। একটা মানুষ বংশধারার নানা মানুষের সমষ্টি, তাই তার ভিতরে এক-একসময়ে এক-একজনের প্রবৃত্তির বেগ জেগে ওঠে। একটা মানুষই অবস্থার চাপে, সঙ্গে বা সংঘর্ষে নানা রকমের মানুয হয়ে যায়। তোমার বড়দা সম্পর্কে তাই কিছু স্থির করে বলা যায় না। তাই, একজন মানুষকে বিচার করতে হলে তার পুরো বংশধারাটা খুঁটিয়ে দেখতে হয়, বিচ্ছিন্নভাবে তাকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না।

বলতে বলতে বাবার গলার স্বর একটু একটু ভেঙে যেতে থাকে। বার বার গলা পরিষ্কার করছেন। চোখ-মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারি, বড়দা সম্পর্কে তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাঁরও অভিপ্রেত নয়। বড়দা খুন করেছে—এটা তিনি ভাবতে চাইছেন না, ভাবতে তাঁর ভাল লাগছে না। কিন্তু তাঁর এই বয়সে ছেলেদের বড় অচেনা লাগছে। নৌকো ঘাট ছেড়ে তফাত হয়েছে। মাঝখানে যোজন যোজন দুস্তর জলরাশি চলে এল। এক আবছায়া ভেদ করে তিনি প্রাণপণে নিরীক্ষণ করছেন—কিন্তু নৌকোর গতি-প্রকৃতি আর বোঝা যায় না। দিগন্তের গায়ে নৌকোর দূর মাস্তুল এক মহাপৃথিবীর বিশাল গ্রাসের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সব মা-বাবাই সন্তানদের ছেলেবেলার গল্প তাদের শোনাতে ভালবাসে। আমরা যখন আরও ছোট ছিলাম, কতদিন রাতে মা-বাবাকে ঘিরে বসে আমাদের শিশুকালের গল্প শুনেছি তাঁদের কাছে। শুনেছি,

বড়দা শিশুবয়সে খুব মোটাসোটা আর ভারী ছিল। টেনে কোলে নেওয়া যেত না। তার গা ছিল ঠান্ডা, খুব ঘামত। তেমনি ছিল তার ঠান্ডা স্বভাব। যে-জায়গায় তাকে বসিয়ে রাখা হত সেইখানেই সে বসে থাকত সারা দিন। কখনও কাঁদত না। বসে বসে খেলত, খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ত, জেগে উঠে আবার খেলত। এমনই চুপচাপ ছিল সে, যে মাও কখনও কখনও তার কথা ভুলে যেত। ছেলেটা যে আছে—খেয়ালই থাকত না। আমার ঠাকুরদার সে ছিল খুব প্রিয় নাতি। তাকে বুকে চেপে ঠাকুরদা গাল দিতেন—এই শালা হয়েছে একেবারে জলঘট। কখনও বলতেন—তুই বাঞ্চোৎ শালগ্রামশিলা। মেয়ে-পটানো ছাড়া তোর দ্বারা কিছু হবে না। তোর বাপ হয়েছে পোস্টমাস্টার, তুই হবি মাগিমাস্টার। যাত্রার দলে সখী সাজবি, মিহি সুরে গান গাইবি, কোমর দুলিয়ে হাঁটবি, বড় বড় চুল রাখবি, ঢুলু ঢুলু তাকাবি—তোর দ্বারা আর-কিছু হবে না। তোকে বউ-মাস্টারের অপেরায় ভিড়িয়ে দেব। বড়দার সেই শান্ত স্বভাব বরাবর বজায় রইল। বড় হয়েও সে ঠান্ডা, নড়াচড়া কম করে, একটু আয়েসি, বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে ভারী নেটিপেটি, কারও কষ্ট সহ্য করতে পারে না। কেবল একটা জেদি স্বভাব ছিল তার। যা করবে বলে ঠিক করত, তা করত। কেউ ঠেকাতে পারত না। তখন বাধা পেলে সেই শান্ত মানুষটা খুনে-র মতো খেপে ওঠে। তখন মনে হয়, ও বড় ভয়ংকর। ও যেদিন কারখানায় মার খেয়ে আসে তার কয়েকদিনের মধ্যেই ইউনিয়নের একজন লোক শিবপুরে খুন হয়। ইউনিয়ন থেকে বড়দা এবং আরও কয়েকজনের নামে ডায়েরি করে।

বড়দার কথা ভাবতে ভাবতে বোধহয় বাবা তার শিশুবয়সের কয়েকটা দৃশ্য মনশ্চক্ষে দেখে নিলেন। দেখলেন, দাওয়ায় বসে খেলতে খেলতে তার শান্ত শিশু ছেলেটি মাটির ওপর শুয়ে আছে, হাঁ-মুখের কাছে উড়ে উড়ে বসছে মাছি, টোপা টোপা ঘাম জমেছে গায়ে, শিথিল ছোট্ট মুঠি থেকে আদরের খেলনা খসে পড়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দিশেহারার মতো বাবা চার দিকে এক বার তাকান, চনমন করে ওঠেন, গলা খাঁকারি দিতে থাকেন। আমার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে একটু ভাঙা গলায় অনুতপ্তের মতো বলেন, নেনটু, সত্য খুন করেছে—এ-কথা আমি বলিনি। বলেছি?

আমি বড় মায়া বোধ করে বলি, না।

বাবা ভিতু চোখে মিটমিট করে আমার মুখ দেখে বলেন, আমি বলতে চাইছি, তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের সব সমস্যার কথা আমাকে খুলে বলো তবে আমি ঠিক বুঝতে পারব। তোমাদের রক্তের ধাত আমি চিনি। তোমাদের জন্য এখনও আমি অনেক কিছু করতে পারি। বোলো, আমাকে তোমাদের সব কথা বোলো।

একটা শ্বাস ফেলে মাত্র। বড় মায়া হয়।

বিকেলে হাসপাতালে মনোতোষকে দেখতে গেলাম।

টান হয়ে শুয়ে আছে। গা ঘেঁষে বিছানায় ওর বউ বসে আছে—তার মুখখানা লালচে, সেখানে কান্না থম ধরে আছে। দু'-চারজন আত্মীয়স্বজন দাঁড়িয়ে, বসে থেকে, ঘিরে রেখেছে ওকে। বড় ছেলেটা ভয়-পাওয়া চোখে বাবার মুখের দিকে চেয়ে, মনোতোষ একটা হাতে ছেলেটার হাত ধরেছে। একটু আগেই বোধহয় অক্সিজেনের নলটা খোলা হয়েছে নাক থেকে, সিলিন্ডারটা নল সমেত এখনও বেডের পাশেই। মনোতোষের মুখটা ফুলেছে খুব। চোখ দু'টো বরাবরই একটু ডেলা-পাকানো, এখন সে দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন, চোখে জল জমে আছে, শিরা উপশিরা দেখা যাচ্ছে।

আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। সবাই চোখ তুলে দেখল আমাকে। অপরাধীর মতো তাড়াতাড়ি গিয়ে মনোতোষের মাথায় হাত রাখলাম।

কেমন আছেন?

মনোতোষ খানিকক্ষণ দম নিতে নিতে আমাকে চেয়ে দেখল। একটু হাসল। গলায় নাকি সুর এসে গেছে ওর। বলল, বেঁচে আছেন তা হলে? আমি তো ভেবেছিলাম, এতক্ষণে মর্গে পৌঁছে গেছেন। কাটাকুটি হচ্ছে!

আমি হাসলাম মাত্র।

ও বলল, আজ সকাল থেকে আশেপাশের বেডগুলোতেও খুঁজেছি আপনাকে। যদি নিতান্ত মেরে ফেলতে না পেরে থাকে তবে অন্তত এখানে তো আসবেন!

ওর বউ ধমক দিল, অত কথা বোলো না।

মনোতোষ হাঁফ-ধরা গলায় ওর বউকে বলে, সকাল থেকে আশপাশের বিছানায় নেনটুবাবুকে কেন খুঁজছি জানো?

কেন?

আড্ডা দেব বলে। সারা দিন হাসপাতালে হাজারটা অচেনা লোকের মধ্যে পড়ে থাকা—দূর দূর—এ-সব কি আমাদের পোষায়? আমাদের জান পোঁতা আছে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বাঁধানো গাছের তলায়, ফেবারিটে। এইসবের জন্যেই মরে আবার জন্মাতে ইচ্ছে করে।

কথা বোলো না। তোমার ভাগ্য ভাল যে স্ট্রোকটা হয়নি।

বাগড়া দিয়ো না। নেনটুবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে দাও। দু'-তিনটে কথা। প্লিজ।

ওর বউ ভদ্রতাবশত একটু সরে বসে বলল, বসুন না। তুমি আস্তে আস্তে কথা বোলো কিন্তু।

আমি বসলাম না। খাটের লোহার রেলিঙে বুক দিয়ে ঝুঁকে রইলাম। ওর মুখটা ফুলে ব্যাঙের মতো বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছে। সেই মুখে তবু হাসছে। বলল, আপনি বেরিয়ে গেলে আমি ভিতরের চারটে ছেলেকে আটকানোর চেষ্টা করেছিলাম।

শুনেছি। কিন্তু কাজটা ভাল করেননি।

করিনি? বলেন কী মশাই! রোজ একজন মানুষকে জলজ্যান্ত চোখের সামনে দেখি, চোখের পাতা ওঠে-নামে, হাসে, কথা বলে, রক্তমাংসের তবতাজা একটা মানুষ—তাকে হঠাৎ পাঁচটা ছেলে এসে মেরে দেবে চোখের সামনে? আর আমি ডায়াবেটিস আর প্রেশারের কথা ভেবে চুপচাপ বসে থাকব! অবশ্য আমার ক্ষমতা কিছু নেই, বক্সিং-টক্সিং জানি না। কিন্তু শুনি, মাস্তানের মতো হাঁকডাক করে ফাঁকা আওয়াজ দিলেও আজকাল একভিড় মানুষ পালিয়ে যায়। সেইটেই এক্সপেরিমেন্ট করলাম। কাজ হল না। ছেলেগুলো একটু থমকে গিয়েছিল ঠিকই, তারপরই হাত-পা চালিয়ে শুইয়ে দিল। শকটা মারাত্মক। পড়ে গিয়ে দম নিতে পারি না, অসম্ভব শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। প্রথমটায় ভেবেছিলাম, ছোরাটোরা মেরেছে বোধহয়—আমি টের পাচ্ছি না। তখন মরে যাওয়ার কথা ভাবছি, বউ বাচ্চার কথা ভাবছি, আপনার মুখও মনে পড়ছে, আবার ভাবছি সামনের শনিবার জ্যাকপটে পাঁচটা ঘোড়া বাছা আছে, স্টারডাস্টের ওপর পঞ্চাশ টাকা উইন খেলব ঠিক করেছি—কিছুই হল না।

মনোতোষ হাত বাড়িয়ে আমার গাল ছুঁয়ে বলল, যা-ই বলুন, আপনি বেঁচে আছেন দেখে বড় ভাল লাগছে। বোম্বে ছবির নায়কের মতো বেঁচে আছেন। দেখে আমারও বাঁচতে ইচ্ছে করে।

হেসে বললাম, বাঁচবেন না কেন? কিছুই তো হয়নি।

দাঁড়ান মশাই, ই-সি-জি-র রিপোর্টটা আগে আসুক। হার্ট কী হয়ে আছে কে জানে!

হার্ট ঠিক আছে। না থাকলে চারটে ছেলেকে আটকানোর চেষ্টা করতেন না।

তা হলে বলছেন বাঁচব?

নিশ্চয়ই।

মনোতোষ আমার গলা ধরে মুখটা কাছে টেনে চাপা গলায় বলে, বাজি!

কত?

দশ। বাঁচলে আপনার দশ, মরলে আমার।

দশ।

মনোতোষ আমার মাথাটা ছেড়ে দিয়ে শ্বাস ফেলে বলল, বাঁচতেই ইচ্ছে করে। বাঁধানো গাছের তলায় আড্ডা, ফেবারিটে চা, আর ঘন সবুজ মাঠের ওপর দূর আকাশের গায়ে আঁকা ঘোড়াদের দৌড়! বেঁচে থাকাটা ভালই।

মিটমিট করে হাসতে লাগল। হাসিটা আমার খুব ভাল লাগে। মনোতোষকে পৃথিবীতে আরও বহুকাল বেঁচে থাকতে দেখতে ইচ্ছে করে।

বেরিয়ে আসার আগে মনোতোষ বলে, সামনের শনিবার আমার হয়ে স্টারডাস্টের ওপর দশটা টাকা খেলবেন? সিওর উইন।

ভিজিটিং আওয়ার্স তখনও অনেকটা বাকি আছে। বেরিয়ে এলাম। ঘাসের ওপর ফরফরাসের মতো রোদ জ্বলছে। রোদে গন্ধকের মতো পোড়া গন্ধ। দেয়াল তেতে তাপ দিচ্ছে। এমার্জেন্সির সামনে ভিড়। স্ট্রেচারে কাকে যেন নামাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স থেকে। খুব একটা কৌতূহল বোধ করি না। কেবল চোখের সামনে রোদ ঝলসায়। যতদূর চোখ যায় আকাশ জ্বলে যাচ্ছে। হঠাৎ কাল থেকে ঘটা যাবতীয় ঘটনা ভুলে যাই। মিনুর মুখটা ভেসে আসে চোখে। এই রোদে বউদি দুর্গাপুরের মাঠে-ঘাটে দাদাকে খুঁজে বেড়ায়। অচেনা মানুষের মুখ দেখে দেখে ফেরে। একশো আঠারো ডিগ্রি গরম, জ্বোরো বাতাস, ধুলো, পায়ে-হাঁটা পথ—বড় আশায় তবু বউদি ভিখিরির মতো হাঁটে। মিনু কেমন আছে? ভাল ডাক্তার দেখছে মিনুকে নিশ্চয়ই। তবু কে জানে কী হয়। হাসপাতালের ওষুধের গন্ধ, জীবাণুনাশকের গন্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি খুব জোরে হাঁটতে থাকি।

সন্ধেবেলা একটা ঠান্ডা কোকাকোলা খাওয়াল শ্যামল। বলল, কাল ফেবারিটে খুব গোলমাল হয়েছে তোর জন্য, শুনলাম।

ও কিছু না।

কারা এসেছিল?

সেই মিছিলের পার্টি।

শ্যামল একটু চিন্তিত হয়। বলে, মিছিল আটকানোতে তো আমিও ছিলাম।

তোকে কিছু করবে না। কারণ, তোকে ওরা চেনে না। আমাকে চেনে।

শ্যামল খুচরো পয়সা পকেটের ভিতরেই নাড়তে নাড়তে বলে, কাজটা ঠিক হয়নি নেনটু, তোর মাথায় যে কী ভূত চাপল!

হঠাৎ ঝেঁঝে উঠে বলি, ভূত চাপবে কেন? যা করার ঠিকই করেছি। সারা দেশ জ্বলে যাচ্ছে আর ওরা জাপানি পুতুল সেজে, মিহি গান গাইতে গাইতে ঘুরবেন, লোকে হাততালি দেবে, খবরের কাগজে ছবি বেরোবে—এ-সব যথেষ্ট হয়েছে। তাতে কলকাতার একটা ভিখিরিরও কিছু যায়-আসেনি।

শ্যামল বিমর্ষ হয়ে বলে, সেটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু মিছিলটার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ওটাকে আটকে রেখেই বা কী লাভ হল? আমরা যে মিছিলটা আটকেছিলাম সে-নিউজটা পর্যন্ত পরদিন কাগজে দেয়নি, কিন্তু ওদের ছবি ঠিকই বেরিয়েছে। মাঝখানে তুই ফেঁসে গেলি, মনোতোষ হাসপাতালে। হয়তো আমাদেরও খুঁজে বের করবে। কী লাভ হল? এমনও নয় যে আমাদের মাস্তানি দেখে কোনও ফিল্মস্টার প্রেমে পড়ে গেল।

আমি উদাস গলায় বলি, লাভ হয়নি, কী করে বুঝলি! আমাদের প্রোটেস্টটা আমরা জানিয়েছি, তার এফেক্টও হয়েছে ঠিকই। রং-করা মেকি মানুষরা একটা চমক তো খেয়েছে! হয়তো সেই দিনটা ওদের মাটি হয়ে গেছে। ভাল করে খেতে পারেনি, রাত জেগে অনেকক্ষণ চিন্তা করেছে—যা ওরা কখনও করে না। চিন্তাশূন্য, স্বার্থপর মানুষের ভিতরে কিছু বাস্তব এবং সৎ চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়াটাও মস্ত কাজ।

শ্যামল হাসে, বলে, এ-সব রোমান্টিক কল্পনা। ওরা আমাদের পাত্তাই দেয়নি। একজন ফিল্মস্টার মাইরি, মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হাসছিলও। কী সুন্দর মুখখানা—ওই দিকে চেয়ে আমি পালাতে ভুলে যাচ্ছিলাম।

আমি ভীষণ হেসে উঠে শ্যামলের কাঁধ চেপে ধরে বলি, শালা, আলু!

শ্যামল মুখ গোমড়া করে বলে, নেনটু, তোর ওপর কিন্তু আবার হামলা হবে। এর একটা মীমাংসা করা দরকার।

কী করতে চাস?

একটু ইতস্তত করে শ্যামল বলে, দিলীপের সঙ্গে আমার চেনা আছে। চল একবার ওর কাছে যাই। আমরা হুজুগের মাথায় কাজটা করেছিলাম—এটা বুঝিয়ে বলে মিটমাট করে নিই।

তোর সঙ্গে কী করে চেনা হল?

শ্যামল একটু অস্বস্তি বোধ করে, চোখে চোখ রাখতে পারে না। অন্য দিকে চেয়ে বলে, ওর বোনের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল।

ডাহা মিথ্যে। তাই হো হো করে হেসে উঠি। বলি, তোর সে সাহসই হবে না। দিলীপের বোনের জন্য বড় কলজেওলা লোক চাই।

শ্যামল একটু হেসে বলল, সে যাই হোক, পরিচয় আছে। আমাদের বাড়িতে আসত-টাসত—এখনও গেলে খাতির করবে। যাবি?

হঠাৎ আচমকা ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেল। গত শীতের আগের শীতে একবার শ্যামল একটা ভীষণ মুশকিলে পড়ে যায়। ওর ছোট বোন রাখীকে আমরা দেখেছি। ছোট্টখাট্টো মেয়ে। শ্যামলা রং, মুখখানা ঢলঢলে। দেশপ্রিয় পার্কের সামনে দিয়েই গিটার হাতে গিটারের স্কুলে যেত। সেই কুমারী বোনটার পেটে বাচ্চা এসেছে। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে শুধু এইটুকু বলেই সে কেঁদে ফেলেছিল, তোরা একটা নার্সিংহোম-টোম কিছু ঠিক করে দে। অ্যাবরসন করাতে না পারলে ইজ্জত থাকবে না। অবশেষে ফেবারিটের মালিক তার এক ডাক্তার বন্ধুকে ধরে ব্যাপারটা করিয়ে দেয়। আমি তখন কানাঘুষো শুনেছিলাম। সরাসরি কিছু শ্যামল আমাকে বলেনি। তারপর থেকে শ্যামল কিছুদিন রক্তাভ মুখে পকেটে ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মাথায় তেলহীন পিঙ্গল চুল উড়ছে, চোখে একটা চকচকে ভাব, ঠোঁটে কী যেন বিড়বিড় কথা। প্রায়ই বলত, খুন করে ফেলব। বন্ধুরা ওকে ডেকে বোঝাত, কী করবি, গুণ্ডা-বদমাশদের সঙ্গে আমাদের কী করার আছে? তোর বোনটার রুচি ও-রকম হল কী করে বুঝি না। ইত্যাদি। ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে যায়। ক'দিন পর শ্যামল আবার স্নান করতে শুরু করে, দাড়ি কামায়, চুল আঁচড়ায়, পোশাক পরে অফিস যেতে শুরু করে। তারপর আবার আড্ডা, বন্ধুবান্ধব, হাসিঠাট্টা। ওর বোনও ক'দিন বাদে আবার দেশপ্রিয় পার্কের সামনে দিয়ে গিটারের স্কুলে যেতে থাকে। আমরা দেখলাম মেয়েটা খুব রোগা আর রক্তহীন হয়ে গেছে, মুখে খড়ি-ওঠা ভাব, চোখ ছলছলে। ক্রমে সে স্বাস্থ্য ফিরে পায়। মাত্র ক'দিন আগে তার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়েছি।

সেই ছেলেটা দিলীপ কি না আমি জানি না। তবু আমি হঠাৎ মুখ তুলে বলি, দিলীপের কাছে যেতে তোর লজ্জা করবে না?

কথাটা ঠিক জায়গায় গিয়ে বেঁধে। মুখটা বিকৃত হয়ে যায় ওর, চোয়াল নড়তে থাকে। বলে, লজ্জা কীসের? কী বলছিস?

আমি ওর কাঁধের হাড়টা চেপে ধরে বলি, তোরা কী করে প্রতিশোধের কথা ভুলে যাস? কী করে ক্ষমা করিস?

শ্যামল হঠাৎ ভীষণ রেগে বলল, নেনটু, বাজে কথা বলিস না। কীসের প্রতিশোধ? ক্ষমাই বা কীসের? চুপ কর।

আমার গায়ে শুয়োপোকার মতো রোঁয়া দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। থির থির করে শরীর কাঁপছে। কিন্তু আবার আমি সামলে যাই। একটা নিস্তব্ধ পুকুরে হঠাৎ ঢিল পড়লে ঢেউ ভাঙে ঠিকই, আবার সময় নিয়ে নিস্তরঙ্গ হয়ে যায় জল। মানুষের সমাজ ওই রকম। মানুষের আছে স্বস্তিকর বিস্মৃতি। বিয়ের আসরে রাখী আর তার ভদ্র সুপুরুষ আপার ডিভিশন বরকে দেখেও আমাদের সেই ঘটনার কথা মনে পড়েনি। ভুলে যাওয়াই ভাল।

শ্যামল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এক সময়ে বিবর্ণ মুখখানা তুলে বলল, নেনটু, তোকে মিথ্যে বলে লাভ নেই। তুই জানিস। কিন্তু দিলীপকে আমরা কী করতে পারতাম? আমরা ওকে বিয়ে করার জন্য ধরেওছিলাম, কিন্তু দেখি এর আগে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। বউটা কঙ্কালসার, তিনটে বাচ্চা। বোধহয় কোথা থেকে ভাগিয়ে এনেছিল, তারপর চার্ম চলে যাওয়ায় মারধর করে, বেশির ভাগ দিন বাসাতেই থাকে। দিলীপ বিয়ে করতে রাজি ছিল, কিন্তু দেখলাম রাখীর ভবিষ্যৎ ওই বউটার মতোই হবে। মারধর খাবে। পিছিয়ে গেলাম। ওকে মারব বলে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। প্রথম কথা, ওকে মারবার সাধ্য নেই, দ্বিতীয়ত, মারলে আমার কী হবে? হয় ওর দল মারবে, নয়তো পুলিশ ঝোলাবে। কয়েকদিন ঘুরে বেড়িয়ে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে গেলাম। রাখীর ভাল বিয়ে হয়ে গেছে,

সবাই ভুলে গেছে, মিটে গেছে ব্যাপারটা। এখন আর প্রতিশোধের কথা বলে লাভ কী? সেই ঘটনার পরে এক-দুইবার দিলীপের সঙ্গে দেখাও হয়েছে, সে হেসে কথা বলেছে, আমিও বলেছি। মানুষে মানুষে খার থেকে যাওয়া ভাল না। এখন সেইসব কথা যদি ওঠে, যদি জানাজানি হয় তো রাখীর কী হবে?

ভীষণ লজ্জা পেলাম। ওর হাতটা ধরে বললাম, আমার মাথাটা ঠিক নেই শ্যামল। ক'দিন ধরে দিনকাল ভাল যাচ্ছে না।

জানি। নেনটু, তোর কিছু টাকা চাই? ধার নিবি?

দিস।

আর একটা ঠান্ডা কিছু খা।

নে।

দু'জনে আবার ঠান্ডা অরেঞ্জ খাই। হাসি, কথা বলি।

ওই তো রাস্তার ও-পারে দেশপ্রিয় পার্ক। ওখানে ফুটবল মাঠের ধারে গাছতলায় মানিককে মেরেছিলাম। সে নন্দরানীর যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করত, জোর করে চিঠি গুঁজে দিত হাতে। নন্দরানী কেঁদেছিল মা'র কাছে এসে। তারপর কোথায় চলে গেছে নন্দরানী! কোথায় মানিক! পৃথিবীতে ঘটনাগুলির গভীরতা কত কম! সময়ের দমকা হাওয়া আসে, ধুলোবালির মতো সব উড়ে যায়। ভুলো-মন মানুষের মতো পৃথিবী ঘুরে চলে।

অরেঞ্জটা শেষ করে শ্যামল সতর্কভাবে বলল, নেনটু, যদি বিপদ বুঝিস তো বল, আমি না হয় দিলীপের কাছে যাব।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

শ্যামল শ্বাস ফেলে বলল, একদিন ফুটে যাবি শালা।

হাসলাম।

বেঁচে থাকাটা এক-একজনের এক-একরকম। মনোতোষ যেমন আড্ডার জন্য, ঘোড়ার জন্য, ছেলে-বউয়ের জন্য বেঁচে থাকতে চায়। আমি কেন বেঁচে থাকতে চাই? কার জন্য? মিনুর জন্য কি? নাকি বুবলার জন্য? বড়দার জন্য? নাকি বক্সিংয়ের জন্য? কিছুই ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে কেবল মনে হয়, কয়েকটা প্রতিশোধের জন্যই বেঁচে থাকা বুঝি! কিন্তু কোথাও আমার আঁচড়-কামড়ের দাগ বসছে না। বড় আলগাভাবে লেগে আছি পৃথিবীতে।

বাঁধানো গাছটার তলায় আড্ডার লোকজন জমায়েত হয়ে গেছে। সবাই ডাকে আমাকে, আরে মশাই, কাল ফেবারিটে কী কাণ্ড হয়ে গেল!

ফেবারিটের ঘটনা শুনবার জন্য সবাই ঘিরে ধরে। ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে, উগ্র কৌতূহল চার দিকে। অনুত্তেজিতভাবে উত্তর দিয়ে যাই।

জমায়েত থেকে একটু তফাতে বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে নীতু। অনেককাল ওকে দেখিনি। গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করি, কী খবর নীতু? কোথায় ছিলে?

নীতু উত্তর দেয় না। একটু হাসে মাত্র। বরাবর ওর হাসি একটু বিষণ্ণ। শান্ত, সুশ্রী মুখ। গালে অল্প দাড়ি। নীতুর চেহারাটা দেখার মতো। অনেকটা লম্বা, মেদহীন স্বাস্থ্য, মোটা হাড়। ব্যায়াম করত। পোশাক ঠিকমতো পরলে ওকে নিশ্চয়ই এই চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে ভীষণ ভাল দেখাবে। কিন্তু নীতুর সেই পুরনো পোশাক, ফুলহাতা বুশ শার্ট, তার হাত গোটানো, পরনে প্যান্ট, পায়ে ধুলোটে চপ্পল। দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবারের দিকে কোথায় যেন মাস্টারি করে। অসম্ভব বই পড়ার নেশা, ভীষণ সিগারেট খায়। আগে আড্ডায় রোজ আসত। এখন মাঝে মাঝে। দীর্ঘকাল আসে না। শান্ত স্বভাব, ধীর কথা এবং আবেগহীন হাসির জন্য অনেকে ওকে পছন্দ করে। অনেকে ওই জন্যই করে অপছন্দ। একটা অহংকারী ভাব আছে নীতুর। কিন্তু আমার ওকে ভালই লাগে। ওর স্বভাবে গাছের ছায়ার মতো স্নিগ্ধকর কী যেন আছে। কাছে বসলে টের পাওয়া যায়।

যখন আড্ডা খুব জমে উঠেছে, তখনও মাঝে মাঝে লক্ষ করছিলাম নীতু আড্ডার মধ্যে আসছে না। একটু অন্যমনস্ক, একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছে। মাঝে মাঝে আড্ডায় আসা বা আড্ডা থেকে চলে

যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে এক-আধটা কথা বলছে। আবার একা হয়ে যাচ্ছে। ভাঁড়ের চা খেল দু'বার।

আড্ডা ভেঙে যাওয়ার মুখে সে আমাকে ডাকে, নেনটু, কথা আছে।

দু'জনে লেকের দিকে হাঁটতে লাগলাম। নীতু বলল, তোমার ঘটনাটা শুনলাম। খুব বেঁচে গেছ কাল।

একটু হাসি।

সে বলল, মিছিলের ঘটনাও শুনেছি। মনে হচ্ছে, তুমি একটা কিছু করতে চাইছ, কিন্তু কী করতে চাও তা স্পষ্ট করে জানো না।

নীতুর ওই দোষ। কথাগুলো এমন সরাসরি, স্পষ্টভাবে বলে যে লোকে আহত হয়, ওকে অহংকারী ভাবে। আমি কিছু মনে করলাম না। হাসলাম মাত্র।

ও নিজে থেকেই বলল, তোমার বড়দা কিন্তু জানতেন তিনি কী চান।

একটু থমকে গিয়ে বলি, তুমি বড়দাকে চেনো?

চিনি, কিন্তু তোমার সূত্রে নয়, অন্য সূত্রে।

কীসের সূত্রে?

পার্টি।

তুমি ওই দলে?

নীতু বিষণ্ন হাসিটা হাসে। আমরা হাঁটতে থাকি।

নীতু বলে, কলকাতায় আমাদের আন্দোলনের যে ক'জন পায়োনিয়ার ছিলেন সত্যদা তাঁদের একজন। আমার ঘনিষ্ঠ ছিলেন খুব।

বলোনি তো!

বলার কী? আমাদের ঘনিষ্ঠতা তো বন্ধুর দাদা বা ভাইয়ের বন্ধু বলে নয়। সম্পর্কটা অন্য রকম। সিগারেট লুকোনোর সম্পর্ক আমরা মানি না।

বড়দার কোনও খবর জানো?

নীতু মাথা নেড়ে বলল, না। এখন কেউ কারও খবর রাখি না। সবাই ছড়িয়ে পড়েছি। আমাদের আন্দোলনে কো-অর্ডিনেশনের দরকার হয় না। মোটামুটি আন্দোলনের ধারাটা সকলের জানা আছে। কে কোথায় মরল বাঁচল তার খবর রাখা প্রায় অসম্ভব। তবে জানি সবাই অ্যাকশনে আছে।

লেকের ঝুঁঝকো অন্ধকারে ঘাসে পা দিই। জল ছোঁয়া বাতাস এসে ঝাপটা মারে। জলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে ক'দিন আগেও ছেলে-মেয়ে জোড় বেঁধে বসত। আজকাল লেকে মেয়ে চোখেই পড়ে না। এধারে-ওধারে মদের বোতল, ভাঁড় পড়ে আছে, শালপাতা উড়ছে। আবছায়ায় দেখা যায় তিন-চারজন করে লোক, অল্পবয়সি ছেলে বসে আছে, সামনে মদের বোতল, ভাঁড়, ঠোঁটে সিগারেট। এদের পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে শোনা যায়, নিজেদের মধ্যে অশ্লীল কথা বলছে, খ্যা খ্যা করে হাসছে। হঠাৎ ভুঁইফোড় এক-আধজন মেয়ে হেঁটে যায়— চোখে কাজল, মুখে চড়া পাউডার, মুখশ্রী রুক্ষ, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে যায়, শিস দিলে থামে, ইশারায় কাছে আসে। দর হলে কোনও ঝোপ বা গাছের আড়ালে চলে যায়। আজকাল মেয়েরা আর ঘরে নেয় না পুরুষকে। লেকের পাড়ে খোলা জায়গাতেই সবটুকু হয়। বড় জোর আলো থেকে একটু গাঢ় অন্ধকারে চলে যায়। সকালে মাঝে-মধ্যে এখানে-সেখানে লাশ পাওয়া যায়। কিনারা হয় না। মারপিট লাগে প্রায়ই।

আমরা অনেকটা হেঁটে অন্ধকার দেখে বসলাম।

নীতু বসেই বলল, চার দিকটা কেমন চট করে পালটে যাচ্ছে দেখছ?

দেখছি। আমরাও পালটাচ্ছি।

হুঁ। তুমি কোনও দিন মারকুটে ছেলে ছিলে না, হুজ্জত করোনি। যারা বকসিং-টকসিং করে তারা এককালে একটু-আধটু রংবাজ হয়। কিন্তু তুমি তা হওনি। কিন্তু হঠাৎ ইদানীং তুমি পালটে গেছ।

চুপ করে থাকি।

নীতু নিজেই বলে, একটু অ্যাগ্রেসিভ হওয়া ভাল নেনটু। আমরা তো বহুকাল অপেক্ষা করলাম। এবার ভাঙচুর দরকার। তোমরা বড়দা এতকাল শান্তভাবে সংসার করে হঠাৎ ছেলে মেয়ে বউ ফেলে

চলে গেল কেন—তা কখনও খুব গভীরভাবে ভেবেছ?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না। কিন্তু বড়দার ফিরে আসা খুব দরকার নীতু, বড়দা না এলে আমাদের সংসারের সব হিসেব গোলমাল হয়ে যাবে।

নীতুর সুন্দর দাঁত অন্ধকারে ঝিকোয়। বলে, সব সংসারেরই এক কথা। যারা কাজে নেমেছে তারা জেনেই নেমেছে।

বড়দার নামে খুনের কেস আছে বলে বড়দা পালিয়ে গেছে।

খুনের কেস কার নামে নেই?

তোমার নামে আছে?

দু'-তিনটে।

তুমি খুন করেছ?

অন্ধকারে আবার তার দাঁত ঝলসায়।

দম বন্ধ হয়ে আসে। বলি, বড়দা করেছে?

ও মাথা নেড়ে বলে, জানি না। করে থাকলে কিছু অন্যায় করেনি। পুরনো নীতিবোধ নিয়ে এ-সব দেখো না, তোমার বড়দা হিসেবেও বিচার কোরো না। পারিবারিক মানুষটার চেয়েও সামাজিক মানুষটা বেশি। সমাজের জন্য এ-সব করলে মানুষের কিছু অন্যায় হয় না।

একটু চুপ করে থেকে নীতু বলে, যে-সব এলিমেন্ট তোমাকে মারার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের সুবিধেমতো পেলে তুমি কী করবে? মারবে না?

জানি না।

জানো না কেন? ও-রকম ভাসা ভাসা সিদ্ধান্ত ভাল না। বরং জেনেশুনে ছক বেঁধে কাজ করা ভাল। হয় মারবে, না হয় মারবে না। একটা কিছু স্থির করে রাখো। তাতে কাজের সুবিধে হয়, দ্বিধা আসে না।

একটু হেসে জিজ্ঞেস করি, তুমি হলে কী করতে?

মারতাম।

কেন?

ওইরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে।

তবে তো অসংখ্য লোক মারতে হয়।

নীতু হাসে। তারপর হঠাৎ বলে, লক-আপে পুলিশ তোমাকে মেরেছিল। না?

হুঁ।

নীতু শ্বাস ফেলে বলে, এত মার খাবে কেন নেনটু? একবার ঘুরে দাঁড়াও না। আজ পুলিশ মারবে, কাল গুন্ডা এসে মারবে—এত মার খাওয়ার কী আছে? ওরা কি বিশ্বনিয়ন্তা?

কী করব?

নীতু আবার চুপ করে থাকে। তারপর বলে, তোমার বড়দা কলকাতায় অনেক কাজ রেখে গেছেন। সেগুলো করো। যদি করো তো তোমাকে আমি প্রোটেকশন দেব। দিলীপ কিংবা বাবুরা অমর নয় নেনটু। আমরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি মরিয়া। কিন্তু তুমি আগে সিদ্ধান্ত নাও, ওদের পেলে কী করবে, মারবে না পালাবে?

সিদ্ধান্ত নিতে আমার দেরি হতে থাকে। বুঝতে পারি, নীতু ঠাট্টা করছে না। এ-সব যারা করে তাদের কাছে এইসব সিদ্ধান্তই জীবন।

আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু নীতু ধৈর্য হারায় না। অপেক্ষা করে শান্তভাবে। মাতালের পা আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। দূর থেকে ভাঙা গান ভেসে আসে। হাসির শব্দ। জলে ছলাৎ করে একটা বোতল পড়ে যায়। উদ্দেশ্যহীন, গভীরতাহীন একটা জীবন যাপন করছি বলে মনে হয়। নীতু অপেক্ষা করে। মনে ছবি আসে, লম্বা ছিপ-নৌকায় দীর্ঘকায় শীর্ণ এক মানুষ বসে আছেন। প্রেতের মতো চোখ। পাশে রাখা বশংবদ লাঠি। কুমুদবন্ধু রায়। আমার দাদু। আমার বাবার কথা মনে পড়ে। বড়দার কথা। থানার ভদ্রলোক ও-সির মুখখানা দেখতে পাই। মনে পড়ে, গড়িয়াহাটায় দিলীপের সঙ্গে কত আড্ডা দিয়েছি।

বাঁ হাতের ব্যান্ডেজের ভিতরে হাতটা এখনও টনটন করে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। নীতু অপেক্ষা করে। আজ সকালে অফিসার আমাকে চড় মেরেছিল। আমার মা-বাবার সামনে, ছোড়দার নাকের ডগায়। যেখানে দাঁড়িয়ে চড়টা মেরেছিল তার কয়েক হাত দূরে বারান্দায় আমার বহুকালের সঙ্গী সেই বালির বস্তাটা ঝুলছে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে মনোনীত মুষ্টিযোদ্ধা একটিও শব্দ না-করে চড়টা খেয়েছে। সারা শরীরে রোমরাজি হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে থাকে, গা জ্বালা করে। নীতু অপেক্ষা করে।

মারব।

নীতু শ্বাস ফেলে। যেন এতক্ষণ দম বন্ধ করে ছিল। অন্ধকারে ওর দাঁত ঝিকোয়।

আস্তে করে বলে, তোমাকে একটা জিনিস দিয়ে যাব।

কী?

ও কাত হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে খেলনার মতো ছোট্ট রিভলভার বার করে। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কাছে রাখো।

ইতস্তত করি। ভয় পেতে থাকি।

নীতু আস্তে বলে, ওরা আবার তোমার পিছনে লাগবে নেনটু। কিন্তু তোমার জীবন এই মুহূর্ত থেকে আমাব কাছে মূল্যবান। তোমাকে খালি হাতে ছাড়তে পারি না। রাখো।

আমি হাত বাড়িয়ে নিই না। হাতটা পাতি, নীতু দেয়। হালকা ছোট্ট একটুখানি যন্ত্র। মনেই হয় না, এটা দিয়ে কিছু করা যায়।

কোথায় পাও এ-সব?

নীতু অবহেলার গলায় বলে, জাপানি জিনিস, ভদ্রপুরে ঢেলে বিক্রি হয়। ওখানকার লোক এসে দিয়ে যায়।

অনেক দাম?

বোধহয়। ঠিক জানি না।

নীতু নিঃশব্দে সিগারেট খায়। তারপর বলে, চালাতে জানো?

না।

নীতু শ্বাস ফেলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, সেইটে আন্দাজ করে গুলি ভরে দিইনি। ঠিক আছে, আপাতত ওটা নিরালায় বসে নাড়াচাড়া করো, সময়মতো গুলি পেয়ে যাবে। আমি আবার আসব নেনটু।

নীতু ওঠে, আমিও। উঠতে গিয়ে টের পাই, শরীর ভার লাগছে খুব। ক্লান্ত লাগছে। বিকেল পর্যন্ত আমি অন্য রকম ছিলাম, কিন্তু এখন যেন আর-এক রকম। কীরকম যেন লাগে। গা গুলোয়, ভেতরটা ভয়-ভয় করে, মন চমকায়।

বাসায় ফেরার পথে সারাক্ষণ বার বার কেবলই হাত গিয়ে প্যান্টের ডান দিকের পকেটটা স্পর্শ করে আসে, শরীরে ব্যথার জায়গায় যেমন বার বার মানুষের হাত চলে যায়।

বউদি চলে যাবার পর আমি তাদের ঘরে শুই।

সারা রাত প্রায় ঘুমই হল না। স্বপ্ন দেখে বার বার জেগে উঠলাম। জল খেলাম। আড়মোড়া ভাঙলাম। বাতি জ্বেলে সাবধানে তোশক উলটে জিনিসটা দেখলাম বার বার। ছোট্ট খেলনার মতো। খুব ঝকঝকে, সুন্দর। ছেলেবেলায় একটা খেলনা রিভলভারের কত শখ ছিল। সত্যিকারের রিভলভারটা তার চেয়েও কাল্পনিক লাগছিল।

ভোর রাতে গভীর ঘুম হল। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম হাত পড়ল ব্যথার জায়গাটাতে। তোশক সেখানে খুব সামান্যই উঁচু হয়ে আছে। ওপর থেকে বোঝাই যায় না। আমি উঠলে মা বিছানা ঝাড়তে আসবে। জেগেই তাই যন্ত্রটা হাতে নিলাম। মুঠোয় হাতলটা, চড়াই পাখির মতো ছোট্ট। কেবল বুকের ধুকধুকুনিটা নেই। যখন গুলি ছুড়ব কোনও দিন, তখন কি রিভলভারের বুক ধক করে উঠবে?

আলমারি খুলে বইয়ের পিছনে রেখে দিলাম।

কালকেও আমি অন্য রকম মানুষ ছিলাম। আজ অন্য রকম। বাথরুমে সারাক্ষণ গান গাইলাম আমি।

চায়ের স্বাদ অন্য রকম লাগল। আয়নায় আজ অনেকক্ষণ নিজের মুখখানা দেখি। ওয়ালটেয়ারে সে-বার বেনুধর মেরেছিল, চুল ঘেঁষে এখনও সেই কাটা দাগ। থার্ড রাউন্ডে বেণুধরকে নক-আউট করি। তখন কপালের রক্তে আমার সারা গা ভেসে যাচ্ছে। রেফারি রক্ত দেখে লড়াই থামাতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। বিনীতভাবে বলেছিলাম, ইট ইজ জাস্ট এ মাইনর কাট স্যার, আই অ্যাম নট হার্ট। বলিনি, আমি কখনও লড়াই থামাতে বলিনি। গতকাল শ্যামল দিলীপের কাছে যেতে চেয়েছিল, আমি যেতে দিইনি। লড়াই থামাতে বলি না এখনও। সোমসুন্দর শেষ পর্যন্ত লড়বে।

বারান্দায় রোদ পড়ে আছে। বাতাস নেই। নুয়ে পড়া বুড়োর মতো বস্তাটার কুঁজ দেখা যাচ্ছে। স্থির হয়ে ঝুলে আছে ফাঁসি-দেওয়া লাশের মতো। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। বক্সিং রিং-এ আমার আর কোনও দিনই ফিরে যাওয়া হবে না। তবু শরীর চনচন করে লড়াইয়ের জন্য। কীসের লড়াই তা সঠিক জানি না। তবু বস্তাটার কাছে এসে স্ট্যান্স নিই। বাঁ হাতে ব্যথা। ছিঁড়ে পড়ে হাত। তবু লহরার তবলায় যেমন চলে আঙুল তেমনি দ্রুত ঘুঁষির ঝড় বইয়ে দিতে থাকি। ব্যান্ডেজ উপচে রক্ত পড়তে থাকে হাত বেয়ে। বেণুধর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল সে-বার, ওয়ালটেয়ারে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল শরীর। তবু লড়াই থামাইনি। আজই বা থামাব কেন?

শরীরে ঘাম দিল খুব। একটা জ্বোরো ভাব ছেড়ে গেল শরীর থেকে। ক্লান্ত হয়ে একসময়ে রেলিং ধরে বাতাসে দাঁড়াই। দূরে. মোড়ের কাছে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, সেই গাছে আধো-ঢাকা মালাদের বারান্দা দেখা যায়। অনেককাল মালাকে দেখি না আর। সেই কবে ওর তানপুরার তার ছিঁড়ে, তবলা ফাটিয়ে, গানের খাতা টুকরো করে দিয়ে এসেছিলাম। আশ্চর্য এই, মালা তারপর এসে কোনও দোষারোপ করেনি, দায়ী করেনি আমাকে। বোধহয় কাউকেই কিছু বলেনি মালা। নীরবে হেসেছে। ক্ষমা করেছে কি? কিন্তু ক্ষমা কে চেয়েছিল? মালা ভুলে গেছে। তার গানের জগতের বাইরে থেকে যে-সব মানুষ আসে তাদের কোনও ছায়া মালার ঘরে থাকে না। মালা তাদের অনায়াসে ভুলে যায়। রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে ওদের ঝুলবারান্দার মাথার ওপর দেখি। সেখানে মালা দাঁড়ায় না।

ঘরে এসে আলমারি খুলে রিভলভারটা বের করি। ছোট্ট খেলনা। গুলি নেই। ট্রিগারে আঙুল দিতেই চেম্বারটা ক্লিক করে ঘুরে গেল। বার বার সেই শব্দটা শুনি। আত্মবিশ্বাস বাড়ে। মনে হয়, রিভলভার সঙ্গে থাকলে সবকিছু করা যায়।

প্রায় ন'টা বাজে। রোদে ভেসে যাচ্ছে চারি দিক। শূন্য রিভলভারটা প্যান্টের পকেটে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি।

মালাদের ঝুলবারান্দা পেরোতে গিয়ে একবার ওপরে তাকাই। কৃষ্ণচূড়ার মরা ডালগুলোর ভিতর দিয়ে বারান্দাটাকে খাঁচার মতো দেখায়। শূন্য বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে মালার ঘর। ওই ঘরে আর কোনও দিন যাওয়া হবে কি আমার। সাহস পাব না।

হাতটা ব্যথার জায়গায় চলে যায়। পকেটটা খুব সামান্য ফুলে আছে। বাইরে থেকে দলা পাকানো রুমালের মতো দেখায়। ছুঁতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে থাকি। কোনও কিছু ভাবি না। একটু শিস দিয়ে মালাদের সিঁড়ির দরজার চৌকাঠ ডিঙোই। হালকা পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি।

ডান পকেটে হাত। হাতে নিস্তব্ধ এক চড়াই পাখির বুক। আমি মালার দরজায় দাঁড়াই। দাঁড়িয়েই চমকে উঠি।

মালার বিছানায় ছোড়দা বসে আছে। বাসা থেকে বেরোবার মুখে ওর ঘরটা দেখে আসিনি। ভুল হয়ে গেছে। মালা মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে। তানপুরা কোলে শুইয়ে রেখে ঝুঁকে স্বরলিপি দেখছে।

ছোড়দাকে কখনও মালার ঘরে আমি দেখিনি। মালার ঘরে তো আর আসা হয় না। দেখে কষ্ট লাগছিল খুব।

ছোড়দা আমাকে দেখে একটু ভ্রূ তুলে বলল, কী রে? কিছু বলবি?

মালা তাকাল কি না বুঝলাম না। ঝুঁকেই রইল।

রাত জাগার সুগভীর ক্লান্তি ছোড়দার সুন্দর মুখটাতে গভীর হয়ে বসেছে। মুখের চামড়া রুক্ষ, চোখ ফোলা ফোলা, লাল। সুন্দর লাল দুটি ঠোঁট ফ্যাকাশে দেখায়। কপালের মাঝখানে, যেখানে অনেকের রাজটিকা থাকে, সেখানে দুটো শিরা জড়িয়ে আছে। মাথার চুল ফণা ধরে দুলছে।

পকেট থেকে শূন্য হাত বের করে এনে বলি, দু'-চারটে টাকা দিবি?

কেন?

দরকার।

ছোড়দার সঙ্গে বহুকাল কথাই হয় না ভাল করে। মানুষটাকে আমি তেমন লক্ষ করি না। ভিতরে ভিতরে ছোড়দাও বোধহয় তা জানে। আমি বরাবর টাকা নিয়েছি বড়দার কাছ থেকে, বাবাও বড়দার কাছেই হাত পাততেন। ছোড়দা সেই অবহেলা সহ্য করেছে এত দিন। এখন আমি টাকা চাইতে ওর মুখে একটা চাপা আনন্দ খেলে গেল যেন। সুন্দর ঠোঁটে একটু বোধহয় হাসলও।

প্রশ্রয় দেওয়ার স্বরে বলল, আমার টেবিলের ডান দিকের টানায় আছে। বেশি নেই। যা আছে নিয়ে নে।

টাকার দরকার ছিল না। বাসায় ফিরলাম না। কেবল ওই কথা বলে ছোড়দার কাছ থেকে পালিয়ে এলাম।

ছোড়দা অফিসে। দুপুরে খেয়ে উঠে ওর বিছানার ওপর এসে একটু বসলাম। টেবিলের ওপর রাশিকৃত বই, অজস্র নোটকরা খাতা। অ্যাশট্রে উপচে পড়ছে পোড়া সিগারেটের স্তূপে। টেবিলের তলায় একটা হ্যারিকেন। রাতে মাঝে মাঝে আলো নিভে যায়, তখন ছোড়দা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বসে। বিছানার চাদর পালটানো হয় না অনেকদিন, বালিশের পাশে ময়লা রুমাল, বালিশের তলাতেও বই। একটা খাতা খুলে দেখি, প্রথম পাতার ওপরে লেখা—শ্রীশ্রীতারকেশ্বর সহায়। দেখে বুকের ভিতরে একটা যন্ত্রণা হয়। ছোড়দার এই পরীক্ষা ওর জীবন-বাঁচনের পরীক্ষা। ওকে পেরোতেই হবে। কিন্তু পড়তে পড়তে মাথার শিরা ছিঁড়ে পড়ে, চোখ ফেটে যেতে চায়, তবু পড়ে যেতে হয়। মনে থাকে না। আবার পড়ে। নিজের শক্তিতে সন্দেহ আসে। ভয় করে। তাই গোপনে, লজ্জায়, অসহায়ের মতো আত্মসম্মানের হাত বাঁচিয়ে বাবা তারকনাথের নাম চুপি চুপি খাতার ওপরে লিখে রাখে ছোড়দা।

মালার বাড়িতে আর যাব না। মালার ঘরে ঢোকা আর আমার উচিত হবে না। ছোড়দার এই প্রাণপণ অধ্যবসায় দেখে মনে মনে আমি এইসব সিদ্ধান্ত নিই। মনটা উদাস হয়ে যায়।

দুপুরে ঠিক ঘুম হয় না। কাজ নেই বলে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে থাকি। কাল রাতে ঘুম ভাল হয়নি বলেই বুঝি আজ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যেই একটা সুন্দর গন্ধ পাই।

চোখ চেয়ে দেখি ঘরের মাঝখানে মালা দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে তার অকপট চোখ।

উঠে বসি।

মালা, একটু আগে ভাবছিলাম তোমাকে ভুলে যাব।

মালা সুন্দর চোখে অবাক হয়ে তাকায়, ভুলে যাবে?

ভুলে যেতে হবে।

মালা এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে মিষ্টি গলায় বলে, নেনটু, আমি ভুলতে দেব কেন?

তার মানে?

কোনও মানুষ কি চায় যে তাকে সবাই ভুলে যাক? ভুলে যাওয়াটা ভীষণ নিষ্ঠুর কাজ। ওর চেয়ে মরা ভাল। ভুলবে কেন?

আমি চেয়ে থাকি।

মালা বলে, তোমার কত টাকা দরকার?

দশ হাজার।

মালা হাসে। বলে, অত টাকা একসঙ্গে চোখে দেখলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তার চেয়ে যা এনেছি, রাখো।

দরকার নেই।

রাখো নেনটু। তোমাদের সংসারের অবস্থা আমি জানি।

বিশ্বসংসারের অনেকের অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ। তোমার কাছে আমার দাবিদাওয়া কীসের মালা? আমি তো জনতার একজন।

দাবিদাওয়া না থাকলে কেউ আমার তানপুরার তার ছিঁড়ে, তবলা ভেঙে, খাতা ছিঁড়ে আসবার সাহস পায়?

আমি এক অস্থিরতা বোধ করে বলি, মালা, সকালে যখন তোমার ঘরে গিয়েছিলাম তখন আমার ডান পকেটে পিস্তল ছিল। ছোড়দা না থাকলে—

মালা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, আমার ক্ষতি করার জন্য পিস্তলের দরকার কী নেনটু? তোমার শুধু হাতই যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।

আমি উঠে আলমারি খুলে রিভলভারটা বার করে আনি।

দেখো, সত্যি বলছি কি না। শুনে তোমার বিশ্বাস হয়নি, জানি।

মালা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। নিষ্পলক চোখে আমার হাতে পিস্তলটা দেখে।

আমি ফিসফিস করে বলি, মালা, তুমি গান ছেড়ে দাও।

কেন?

যতক্ষণ তোমার গান আছে ততক্ষণ আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারি না।

তুমি আমার ক্ষতি করতে চাও? কেন?

মনে মনে বলি, আমাকে একবার প্রতিশোধ নিতে দাও। দয়া করো। গান ছেড়ে দাও মালা। গান তোমাকে মন্ত্রের মতো ঘিরে রেখেছে।

মালা শ্বাস টেনে বলে, নেনটু, তুমি পাগল। গান ছেড়ে দিলে মালার কী থাকবে বলো তো? গান ছাড়া আমি কিছু ভাবতেই পারি না।

আমি মনে মনে অবিরল বলতে থাকি, তুমি কেন ঝিয়ের হাতে খাবার পাঠিয়েছিলে? কেন নিজে আসোনি? কেন তুমি তানপুরা, তবলা, গানের খাতার জন্য আমার ওপর এসে রাগ করে যাওনি? এ কীরকম অবহেলা তোমার মালা?

মুখে আমি কিছু বলি না। রিভলভারটা মালার বুকের দিকে তুলে ধরি। মালা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। নড়ে না। চেঁচায় না। ব্যারেলের ওপর মাছিটা ওর দুই চোখের মাঝখানে, কপালের ওপর গিয়ে স্থির হয়। মাছির ওপর দিয়ে নিবিড়ভাবে ওকে লক্ষ করি। হঠাৎ তখন বুঝতে পারি, ওর চোখে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। কেবল বিস্ময় আছে। আর দেখি, ওর দু'চোখ ভরা কেবল গান আর গান। চার দিকের শব্দময় পৃথিবী থেকে, সমুদ্র থেকে, পাহাড় পর্বত আকাশ ও গভীর নিস্তব্ধতা থেকে অদৃশ্য গানের উতরোল ঢেউ উঠে আসে ওর চারি দিকে। ঢেউ ঘিরে ধরে মালাকে। ঘিরে রাখে মন্ত্রের মতো। ওকে ভয় পেতে দেয় না।

আমি ট্রিগার টিপি। শূন্য রিভলভারের একটা চেম্বার শুধু ক্লিক করে ঘুরে যায়।

আমি ফিসফিস করে বলি, মালা, দ্যাখো, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারি না। গান ভুলে যাও। নইলে দেশ জুড়ে আমার মুহুর্মুহু পিস্তলের শব্দ তুমি কোনও দিন শুনতেই পাবে না।

মালা শুধু চেয়ে থাকে। অপলক।

## ॥ মঞ্জু ॥

মানুষের মুখ নাকি তার মনের আয়না? কই, আমার মুখে তো কোনও ছাপ পড়েনি! তেমনই একটু লম্বাটে ধাঁচের মুখ, চোখের কোল ঝকঝকে পরিষ্কার, চামড়া ফেটে রক্তের রং আভা দিচ্ছে। ডান গালে একটা ব্রন। এখনও কাঁচা। টিপলে শাঁস বেরোয় না। আর কিছু বোঝা যায় না। কতকগুলি অচেনা পুরুষের রোমশ বুক, মুখ, চওড়া হাত মনে পড়ে। কিংবা তাদের ঠোঁটের স্বাদ। একটা ক্রুশ। সে-সব কি সত্যিই ঘটেছিল? ঠিক বোঝা যায় না। কী যে হয়েছিল তারপর, জানি না।

দুপুর। দূরের স্কুলে টিফিনের মিষ্টি ঘণ্টা বাজছে। মা আস্তে আস্তে ওঠে। নার্স মেয়েটির কাঁধে ভর রেখে বারান্দা পর্যন্ত যায়। চেয়ারে বসে হাঁফাতে থাকে। আমি আস্তে আস্তে নীচে নেমে যাই। এই সময়ে বাড়িতে ডাকাত পড়ে। কেবল জুতোপরা দৌড়-পায়ের শব্দ আর চিৎকার—দিদি! আ—ন্টি! ক্ষুদে ডাকাতে বাড়ি ভরে যায়। তাদের মুখ লাল, গা রোদে গরম, গায়ে শৈশবের সুগন্ধ। ঠান্ডা জল খায়, বিস্কুট চিবোয়, ঘরে ঢোকে, দোতলায় উঠে জুতো পায়ে কার্পেট নোংরা করে, এটা ধরে ওটা টানে। আধঘণ্টা ছোটাছুটি করে তাদের সামলাই।

যেমন চড়াই পাখির মতো আসে, তেমনি উড়ে যায়। বাড়িটা তখন ভয়ংকর নিঝুম লাগে। বারান্দা থেকে মা আবার নার্সের কাঁধে ভর দিয়ে ঘরের দিকে ফেরে। মা'র সঙ্গে প্রায় দিনই কথাই হয় না। বড়জোর মা কোনও দিন বলে, ওদের রোজ বিস্কুট দিস, রোজ কি এক জিনিস ভাল লাগে? মুখে রোচে না হয়তো। একদিন সন্দেশ দিস।

দেব।

মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলে যায়।

তারপর আমি একা। দুপুর একা। দুই একা মুখোমুখি হই।

পিওন ঠিক আসে। ভুল করে না। চিঠি রেখে যায়। ইচ্ছে হয়, ওকে ডেকে বলি, একদিন ভুল চিঠি দিয়ে যেতে পারো না? খুলে দেখব, অদ্রি নয়, অন্য লোক! তার অন্য ভালবাসা, অন্য কথা। পড়ে দেখব কেমন লাগে। একদিন ভুল চিঠি দিয়ো।

টোপর মাথায় দিয়ে যে আসবে সে তো অদ্রিই। শুভদৃষ্টি যার সঙ্গে হবে সে তো অদ্রিই। অন্য কেউ নয়। তাই হোক; তবু, মাঝে মাঝে আমি পেয়ে যাব ভুল চিঠি। অচেনা হাতের লেখা। মাঝে মাঝে আমার গাল স্পর্শ করবে এক সোনার ক্রুশ। তাতে দোষ নেই। ওই তো আয়নায় আমার মুখ—তাতে কোনও ছাপ পড়ে না। আমি সেই মঞ্জুই তো। অন্য কেউ নই।

অদ্রি খুব বিপদে পড়েছে। সে লেখে '...রাণুকে নিয়েই বিপদ। সত্যকে খুঁজতে এক-একদিন নিজেই বেরিয়ে পড়ে। একা একা এই কাঠফাটা রোদে মাঠে-ঘাটে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। কোথায় সত্যকে পাবে? রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে শুনি, একা একা কাঁদছে। মেয়েটা ভীষণ জ্বরে ভুগে উঠল, ছেলেটার হাম। আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি মঞ্জু।...' চিঠির বাদবাকি কথাগুলো আমি তেমন মন দিয়ে দেখি না। রাণুর বর হারিয়ে গেছে, রাণু তাই কাঠফাটা রোদে, খরায় দুপুরে, অবিরল তাকে খোঁজে। অদ্রি, তুমি কোনওদিন হারাবে না। তবু যদি হারিয়ে যাও, তবে আমি ঠিক ওই রকম করে তোমাকে খুঁজব। একটা কিছু, একজন কাউকে খুঁজে বেড়ানো আমার খুব দরকার। আমি যে সব পেয়ে যাচ্ছি! কিছুই খুঁজতে হচ্ছে না।

একদিন হাবুলদা এলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে। গিয়েছিলেন মা'র ঘরে। বেরোবার সময়ে সিঁড়ির মুখে আমি ধরলাম।

হাবুলদা!

মঞ্জু! বলে তিনি তাকালেন। ভয়-পাওয়া মুখ, অপরাধবোধে মাখা।

আমি গলায় গার্গলের শব্দ করে হেসে বলি, কী খবর?

হাবুলদা ইতস্তত করে বলেন, আমার দোষ নেই মঞ্জু। ও জায়গাটা যে ও-রকম তা জানতাম না।

দোষ কে দিয়েছে? আমি তো নিজের ইচ্ছেয় গিয়েছিলাম।

তা ঠিক। তবু—

আমি বলি, আপনি কোনও কাজের নন।

কেন?

ব্ল্যাকমেলের কেমন একটা সুযোগ ছিল আপনার, কাজে লাগাচ্ছেন না।

ব্ল্যাকমেল?

নয় কেন? আমার বাবা বড়লোক, অদ্রি ভাল চাকরি করে। অন্য কেউ হলে আমাকে শুষে ফেলতে পারত।

হাবুলদা অসহায়ভাবে চেয়ে বলেন, কীসব বলছ?

আমি গি-গি শব্দ করে হাসি। গলায় গার্গলের শব্দ ওঠে। বলি, কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করলে খুশি হতাম।

হাবুলদা ম্লান হাসেন, তোমার সঙ্গে পারা যায় না মঞ্জু।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, সেটাই হয়েছে মুশকিল। কেউই আমাকে শাসন করে না, ভয় দেখায় না, দোষ করলেও সহজেই ক্ষমা করে।

হাবুলদা তেমনি হাসিমুখে বলেন, তোমার ভাগ্য ভালই মঞ্জু।

আমি মাথা নেড়ে বলি, না, এ-রকম হয়ে চললে মানুষ পাগল হয়ে যায়।

তুমি তো পাগলই। নইলে কেউ ও-রকম নাচ নাচে! আমি কতবার চেষ্টা করেছি তোমাকে ফেরাতে, কিন্তু তোমাকে ঘিরে যে-ছেলেগুলো ছিল তারা তোমার কাছে যেতেই দিল না। তোমাকে ও-রকম নাচতে দেখে ভাবলাম, বোধহয় তুমি পাগল হয়ে গেছ। আমার কথা তোমার মনেই নেই।

অকপটে বলি, ছিল না-ই তো।

হাবুলদা আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমি তোমাকে গিয়ে ধরলাম, যখন তুমি পড়ে যাচ্ছিলে। তুমি কী একটা চিৎকার করলে, আমার মনে হল আমার নাম ধরে ডাকছ। তখন তুমি একা—নাচের চত্বরে কেউ নেই, তোমার ওপর একটা সবুজ আলো পড়েছিল। তুমি কি সত্যিই আমার নাম ধরে ডেকেছিলে মঞ্জু?

অবাক হয়ে বলি, না তো!

তবে কাকে ডেকেছিলে?

আমি বলি, হো—আ—

ওর মানে কী?

সাঁওতালরা ওইভাবেই পোষা কুকুরদের ডাকে। ওটা একটা বুনো শব্দ, ওর মানে নেই।

হাবুলদা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। বোধহয় ভাবেন, আমি তাঁকে অপমান করার চেষ্টা করছি কি না। তারপর বলেন, তুমি যাকেই ডেকে থাকো মঞ্জু, আমিই গিয়েছিলাম। আমি তোমাকে ধরে তুললাম, নিয়ে এলাম টেবিলে। কিন্তু তখন তোমার বসবার ক্ষমতা নেই, টলে টলে পড়ে যাচ্ছ। কী যে মুশকিলে পড়লাম! তোমাকে নিয়ে কোথায় যাব! নিজের বাড়িতে হাজার লোক, আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি—সেখানে ঢুকলে পরদিন বাড়ি ছাড়তে হবে। তোমাদের বাড়িতে আনলে মেসোমশাই কাণ্ড দেখে আমাকে পুলিশে দেবেন।

আমাকে সবাই ক্ষমা করত হাবুলদা, কেউ কিছু মনে করত না।

তা তো জানতাম না মঞ্জু। এ-সব কাণ্ড করলে আমাদের বাড়িতে যা হয়, তোমাদের বাড়িতে তা-ই হবে ভেবেছিলাম। তাই সাহস পাইনি। বন্ধুবান্ধব কারও বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রাণপণে ভাবছিলাম, কোথায় যাই। বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, ঘুরতে থাকো। সময় হলে আমরা নেমে যাব। ট্যাক্সিওয়ালারা এ-সব জানে, অভ্যাস আছে। কিন্তু কপাল এমনই খারাপ যে, আমাদের ট্যাক্সিওয়ালাটা একটা ছোকরা পাঞ্জাবি। বোধহয় নতুন চালাচ্ছে কলকাতায়। সে কিছুদুর গিয়েই কাঁইমাই করতে থাকে। তখন তুমি ট্যাক্সির মেঝে, সিট, আমার জামা-কাপড় ভাসিয়ে গল গল করে বমি করছ। দেশপ্রিয় পার্কের কাছ বরাবর ছোকরাটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দিয়ে কেবলই বলতে লাগল—আমার গাড়ি ধুইয়ে দাও, তোমরা নেমে যাও, মিটারের টাকা মিটিয়ে দাও। কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারি না। ভাবলাম, ছেলেটাকে টাকা দেখাই। বিশ-পঞ্চাশ টাকার লোভ দেখালাম, ছেলেটা তবু কেবলই বলে, আমার বাবার অসুখ বলে আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। বাবা যদি জানতে পারে টাকার লোভে গাড়িতে মাতাল-বদমাশ তুলেছি তো কেটে ফেলবে। তোমরা নেমে যাও। বড় রাস্তার ওপর এইসব কাণ্ড। তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। রাস্তায় ভিড়। দেখতে না দেখতে আমাদের ঘিরে ভিড় জমে যাচ্ছিল। একটা গাছের নীচে বাঁধানো চত্বরে আড্ডা মারছিল কয়েকটা ছেলে। তারা মজা দেখতে উঠে এল। বেশ মাস্তান টাইপের ছেলে। ভিড় হটিয়ে জানালার ওপর ঝুঁকে বলল, কী হয়েছে? তাদের মুখ দেখে ঘাবড়ে গেলাম। রাস্তার বকাটে ছেলে, হুজ্জত করে বেড়ায়। মাতাল যুবতীর সঙ্গে মাতাল যুবক দেখলে হাঙ্গামা করবে, আওয়াজ দেবে, কত কী করতে পারে। পাবলিক যাবে ওদের দিকে। কী যে বিপদ তখন, ইচ্ছে করছে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠি।

আমি হাসতে থাকি।

হেসো না মঞ্জু। বিপদটা তুমি টের পাওনি, আমি পেয়েছিলাম। চার দিকে দিশেহারার মতো একজন চেনা লোক খুঁজছি তখন। কোনও রকমে ছেলেগুলোর গাড্ডা থেকে যদি বেরোতে পারি। ওরা ততক্ষণে ট্যাক্সিওয়ালাটাকে ধরেছে। ট্যাক্সিওয়ালা ওদের অকপটে সব বলছে। বুঝলাম, এবার ঝাড় হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তোমাকে ওরা কী করবে! যদি তোমাকে ট্যাক্সি থেকে টেনে নামায়, তবে রাস্তার একভিড় মানুষ তোমাকে মাতাল অবস্থায় দেখবে, কে জানে কোন চেনা মানুষের নজরে পড়ে যাবে তুমি। তারপর মেসোমশাই জানবেন, অদ্রিবাবু জানবেন, একটা মেয়ের জীবন নষ্ট। একটা ছেলে সেই ভিড়ের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, ফুর্তি দ্যাখ শালাদের! দেশের হাজারটা লোক ভিখিরি হচ্ছে, ফেরার হচ্ছে, খুন হচ্ছে, বেকার বসে আছে, তবু শালাদের ফুর্তি! ঝট করে একজন দরজা খুলে আমার জামা ধরল, বলল, নামুন তো মশাই, আপনাকে একটু চিনে রাখি। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, মাথার ঠিক ছিল না, তবু সেই অবস্থাতেই হঠাৎ মনে হল, ছেলেটা আমার চেনা। আমি দু' হাত তুলে বললাম, নেনটুবাবু! ছেলেটা থমকে গেল।

শুনতে শুনতে আমার হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভিতরটা কেঁপে গেল একটু। বললাম, নেনটু!

হাবুলদা হাসলেন, সে-ই। আমি তার নাম ধরে ডাকতেই সে থমকে একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, বলল, আপনাকে তো চিনি না। আমি হাতজোড় করে বললাম, আমাকে চিনবেন না, কিন্তু এই মেয়েটি মঞ্জু, ওকে আপনি চেনেন। বলেই ভয় হল। তুমি বলেছিলে, নেনটুকে চেনো, কিন্তু কী রকম চেনো তা বলনি। আবার, তুমি অনেক সময়েই ইচ্ছে করে লোককে খ্যাপানোর জন্য মিথ্যে কথা বলো। নেনটুর ব্যাপারটাও সে-রকম কি না, তাই ভেবে ভয় পেয়ে গেলাম। যদি নেনটু না চিনতে পারে তো কী হবে। তুমি তখন সিটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছ। নেনটু কী একটু ভেবে ঝুঁকে তোমার মুখ দেখল। ঘেন্নায় মুখটা বেঁকাল একটু, কিন্তু বুঝলাম, চিনতে পেরেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এঁর সঙ্গে আপনি জুটলেন কী করে? আপনি কে? উত্তর কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু নেনটু ব্যাপারটা গায়ে মাখল না। বন্ধুদের কী যেন বলল। ছেলেগুলো ট্যাক্সিওয়ালাকে দুই ধমক দিয়ে গাড়িটা পিছিয়ে গলির মধ্যে অন্ধকারে নিয়ে গেল। কোথা থেকে জোগাড় করে আনল জল, পাখা, লেমন স্কোয়াশ। আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম। যা করার ওরাই করছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, তুমি উঠে বসেছ। টলছ তখনও, কিন্তু সাড় ফিরে আসছে। কেউ আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না। বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্যাক্সিওয়ালাটা ভয় পেয়ে গেছে অতগুলো ছেলেকে দেখে। অবশেষে সেই ট্যাক্সিতেই আমরা ফিরেছিলাম। সঙ্গে নেনটু ছিল। তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি হেঁটে বাড়িতে ঢুকতে পারবে কি না। তুমি বললে, পারবে। ট্যাক্সি বাইরে দাঁড় করিয়ে আমি মদনকে ডাকলাম। সে এসে তোমাকে নিয়ে গেল। তারপর ভয়ে ভয়ে অনেকদিন তোমাদের বাড়িতে আসিনি।

আমার বুকে বাতাস আটকে যাচ্ছিল। হাত-পা ঝিম ঝিম করছে। আঁচলটা দাঁতে তুলে চিবিয়ে ফেলি। জিজ্ঞেস করি, আর নেনটু?

হাবুলদা মাথা নেড়ে বলল, কিছুই করেনি। ট্যাক্সিতে বসে থেকে সে কেবল দেখল, তুমি বাড়িতে ঠিকমতো ঢুকে গেছ কি না। তারপর একটিও কথা না-বলে সে ট্যাক্সি থেকে নেমে চলে যায়। কোনও প্রশ্ন করেনি।

আমি হঠাৎ আত্মবিস্মৃতের মতো জিজ্ঞেস করি, কেন?

কী জানি! বোধহয় বড়লোকদের কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে তার কোনও কৌতূহল নেই। কিংবা, তুমি তো বলোনি মঞ্জু, তোমাদের কী-রকম পরিচয়। আমার মনে হয়েছিল, সে হয়তো বা তোমাকে ভালবাসত, তোমার ওই অবস্থা দেখে অভিমানে সে প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে।

বলে হাবুলদা হাসতে থাকেন। হাসিটা ম্লান। বলেন, তুমি তো জানো না মঞ্জু, কতজন তোমাকে ভালবেসেছে। পাগলা-ঘরে ছেলেরা তোমার জন্য সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল। এমনকী সেখানকার বাজনা গেল পাগল হয়ে, আলো গেল পাগল হয়ে—সে কী নাচ—সে কী কাড়াকাড়ি!

হাবুলদা হাসতে থাকেন। আমি নির্মমভাবে আঁচল চিবোই।

তবু কেউ আমাকে দায়ী করে না। হাবুলদা না, নেনটু না। তবে আমার সময় কাটে কী করে! কী নিয়ে বেঁচে থাকে মঞ্জু?

আমাদের একটা গাড়ি গ্যারেজেই পড়ে থাকে। বড় দেখে কেনা হয়েছিল, যাতে পরিবারের সবাই একসঙ্গে বেড়াতে কি পিকনিকে যেতে পারে। এখন আর কেউ যায় না। গাড়িটা তবু ঝকঝকে, তকতকে, তেল-ভরা হয়ে পড়ে থাকে। বাইরে রুপোরঙের প্রকাণ্ড দুপুরটা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি। বিশাল দুপুর তার জ্বলন্ত বুকের দিকে ইশারা করে ডাকে। আমি বে-খেয়ালে উঠে পড়ি। শাড়ি পালটে রোদ-চশমা পরে নিই। বেরিয়ে পড়ি। গাড়ির শব্দে মদন ঘুম ভেঙে দৌড়ে আসে, দিদিমণি, আমি সঙ্গে যাব?

না, তুই ঘুমো গিয়ে।

বাবা যে তোমাকে গাড়ি নিয়ে বেরোতে মানা করেছিল! মাঝরাস্তায় যদি গাড়ি বিগড়োয় তো তখন একা মেয়েছেলে তুমি কী করবে?

তোকে ফোন করব। তখন যাস।

কোরো কিন্তু ঠিক। বলে সে হাই তুলে শুতে যায়।

গাড়ি ছেড়ে দিই। মসৃণ ছুটতে থাকে গাড়ি। দুপুরের গভীর বুকের মধ্যে চলে যেতে থাকি। গাড়ির কাচগুলো তোলা থাকে। দুপুরের হলকা ঢোকে না, শব্দ আসে না। মনে হয়, শহর বড় নিস্তব্ধ। কলকাতা ছেড়ে মানুষজন জ্যোৎস্না রাতের খোঁজে কোন বনে চলে গেছে। পরিত্যক্ত রাস্তা, জনহীন বাড়ি, নির্জন—গভীর নির্জন একটা শহরে কেবল আমার শ্বাসের শব্দ ওঠে। আর বিদেশি গাড়িটা ভ্রমরের মতো গুনগুন করে।

ওকে কি আমি ভয় করি? কেন করব। ঠিক বুঝতে পারি না, কেন আমার নেনটুকে ভয় করা উচিত! তবু বুকে শ্বাসের বাতাস আটকে যায়, ছলাৎ করে ঢেউ দেয় হৃৎপিণ্ড। আমি স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরি। এদিকে-ওদিকে গাড়ি ঘোরাতে থাকি। আমি কেন ভয় করব? আমার তো লুকোবার কিছু নেই। আমি দশজনকে সাক্ষী রেখে পাগলা-ঘরে নাচতে পারি, আমি বেহেড মাতাল হয়ে সকলের সামনে দিয়ে টলতে টলতে ফিরতে পারি। আমি জানি, সবাই আমাকে রাস্তা ছেড়ে দেবে, ক্ষমা করবে, ভালবাসবে। মঞ্জুর তাই কিছু লুকোনোর নেই। মঞ্জু কাউকে ভয় পায়নি কোনও দিন। এই গাড়িটাতেই এক সকালে কেয়াতলা লেনের মুখে একটা দুধের সাইকেল উলটে দিই। সাইকেলটার আধখানা চাকার তলায় চলে গিয়েছিল, দুধওলা ছেলেটা ধাক্কার চোটে শূন্যে উঠে আছড়ে পড়ল রাস্তায়, দুধের বোতল ভাঙার মুড়মুড় শব্দ হয়েছিল, দুই ব্যাগ ভরতি বোতল থেকে দুধের স্রোত নামল রাস্তায়, ভাঙা কাচে ভরে গেল জায়গাটা। ত্রিশ-চল্লিশটা মারমুখো লোক এসে ঘিরে ধরল গাড়ি, চেঁচাতে লাগল, গাল দিতে লাগল। আমি একটুও ভয় পাইনি। দরজা খুলে শান্ত মুখে নামলাম, সকলের দিকে একবার সরল চোখে অকপটে তাকালাম শুধু। লোকজন মিইয়ে গিয়ে গুনগুন করতে লাগল।

দুধওলা ছেলেটার হাঁটুর চামড়া উঠে গেছে, কনুই কেটেছে, কপালে কালশিটে। দাঁড়াতে পারছে না। তাকে লোকেরা টেনে তুলছিল। আমার দিকে চেয়ে কতজন তখন কত কথা বলছে। স্বাভাবিক মুখে গাড়ির গ্লাভসচেম্বার থেকে ফার্স্ট এইড-এর বাক্স খুলে আমি নীরবে ছেলেটার কাটা জায়গায় ডেটল লাগালাম, তার পিঠে হাত রাখলাম, ব্যাগ খুলে গুনে গুনে একশোটা টাকা দিলাম তার হাতে। জনতার মুখের ছবি পালটে যাচ্ছিল। তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। একজন ছেলেটার পিঠ থাবড়ে বলল, তোমারই কিন্তু দোষ বাপু, মোড়ের মাথায় দেখেশুনে বাঁক নিতে হয়। ইনি বলে গাড়ি থামিয়েছেন, লোক খারাপ হলে এই অবস্থায় পিষে ফেলে পালিয়ে যায়। তোমার কপাল ভাল। এইভাবেই বরাবর সমস্ত বিরুদ্ধতা আমার সপক্ষে এসে যায়। আমি জানি বলেই ভয় পাই না।

তবে নেনটুকে আমার ভয় কীসের! আমার কিছু গোপন করার নেই। আমার মুখে কোনও ছাপ পড়ে না। কিন্তু নেনটু! নেনটুর গোপন করার আছে অনেক। ঝুলবারান্দার সেই সুন্দর মেয়েটি—মালা—ভরদুপুরে একা নেনটু তার ঘরে গিয়েছিল। নেনটু অদ্রির গাড়ির গায়ে লিখেছিল প্রতিশোধের কথা। নেমে এসে দেখি গাড়ির গায়ে লেখাটা কে মুছে দিয়ে গেছে, তখনই জানি—নেনটুর গোপন করার আছে অনেক কিছু। আমি অদ্রিকে কিছু বলিনি, শুধু মনে মনে হেসেছিলাম।

তবু কি ওকে আমি ভয় পাই! ঠিক বোঝা যায় না। এ-কথা ঠিক যে, বহুকাল আগে রাণুর বিয়ের দিন ও অদ্রির দিকে যখন ভীষণ রেগে তাকিয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল, ও একদিন অদ্রিকে খুন করবে। যখন মিছিল আটকে দাঁড়িয়েছিল, মনে হয়েছিল, ও হাজারটা মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। যখন প্রতিশোধের কথা লিখেছিল...। কিন্তু না, এ-সব কারণে আমি ওকে ভয় পাই না। আমার ভয়ের কারণ অন্য। কী যে সেই কারণ তা ঠিক বুঝতে পারি না। আবছা, অস্পষ্ট একটা কারণে আমার বুকে বাতাস আটকায়, শরীর রিমঝিম করে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিই। অলি-গলি পার হয় গাড়ি, একটা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে থাকে। ক্রমে দূর থেকে রাণুদের দোতলার বারান্দা দেখা যায়। রোদে ছেয়ে আছে। দেয়ালে ছায়া ফেলে বালির বস্তাটা ঝুলে আছে। কেউ কোথাও নেই। এক পলক দেখে চোখ নামিয়ে নিই। গাড়িটা একটু টাল খায়। আবার সোজা করে নিই। কোথাও থামি না। কেন ওকে ভয় পাই তা একদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জেনে নিতে হবে।

একদিন মণিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

ভীষণ খুশি হল। জড়িয়ে ধরে বলল, জানিস, আমি চাকরি পেয়েছি।

কোথায়?

একটা স্কুলে। ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সি। কিছুতেই পার্মানেন্ট পোস্ট পাচ্ছি না।

দশ মাস তো সময় আছে। খুঁজে নিস।

কলকাতায় খুঁজলেও হবে না। এক-একটা মেয়ে-স্কুলে একটা চাকরি খালি হলে দু'শো-আড়াইশো দরখাস্ত পড়ে। ডেপুটেশনেও। কপালে চাকরিটা পেয়েছি, কিন্তু দশ মাস পর কী যে হবে! বাবা রিটায়ার করেছেন, দিদি মুখপুড়ির বিয়ে বাকি, ভাই দু'টো পড়ছে...আমাদের কী হবে বল তো! বাবা মোটে একশো টাকা পেনশন পান, বাড়ি ভাড়াই দেড়শো। দশ মাস পর...

শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। যেন নামতা শুনছি।

মণিকা একটু রোগা হয়ে গেছে। তিনটে টিউশনি করে, তার ওপর স্কুল আর এম. এ.-র পড়া। তবু বেশ আছে মণিকা। জীবনে কত রহস্য এখনও অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। একটু একটু করে ও পৃথিবীতে ওর জমি দখল করে, উপভোগ করবে সেই দখলের লড়াইয়ের তীব্র আনন্দ। মণিকাকে যে আমি কী ভীষণ হিংসা করি!

বললাম, চল, একটা শাড়ি কিনব।

তার মানে মেজাজ খারাপ। না? চল, সারা দিন আমারও ভাল লাগে না। কতদিন শাড়ি দেখি না। ফেরিওলা হেঁকে যায়। এক-এক দুপুরে খুব ইচ্ছে করে ডেকে এনে শাড়ি দেখি। কিন্তু আবার ভাবি, কিনব না তো! বেচারা রোদে রোদে কষ্ট করে ফেরি করছে, শাড়ি দেখে ফিরিয়ে দেব? তাই ডাকি না। শাড়ি দেখতে কী ভীষণ ভাল লাগে বল।

রাস্তায় ভিখিরিরা সংসার পেতে বসেছে। কাঠকুটো জ্বেলে রাঁধছে, ঝগড়া করছে। বাচ্চারা হামা দিচ্ছে ফুটপাতে, খেলা করতে করতে হঠাৎ খেলা ছেড়ে ভিখিরির ছেলেরা হাত পেতে দাঁড়ায়। আবার ফিরে যায় খেলায়। ত্রিকোণ পার্কের কাছে কয়েকটা ছেলে আড্ডা মারছে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক কিশোরী ভিখিরির মেয়ে। ছেলেগুলো আমাদের দেখে মেয়েটাকে লেলিয়ে দিল—যা, ওই ওদের অনেক পয়সা, যদি পাঁচ পয়সা আনতে পারিস তো দশ পয়সা পাবি, ওরা যা দেবে তার ডবল দেব, যা।

মেয়েটা দৌড়ে আসে। দাঁতে ঠোঁট টিপে একটু দাঁড়াই। মণিকা হাত ছুঁয়ে বলে, কী করছিস?

একটা মজা করি, দাঁড়া।

বলেই ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে দিই মেয়েটার হাতে। বলি, এবার ওদের কাছ থেকে দশ টাকা চেয়ে নাও!

মেয়েটা লোভে বিহ্বল হয়ে ছুটে যায়। ছেলেগুলো থমকে গেছে। রোদ-চশমার ভিতর দিয়ে ওদের স্থিরভাবে দেখি। ওরাও চেয়ে আছে। বললাম, দিন। দিয়ে দিন।

চার জনের মধ্যে তিন জন পার্কের রেলিং টপকে ভিতরে ঢুকে যায়। যে একজন বাকি থাকে তার মুখ ফ্যাকাশে, তবু পকেটে হাত দিয়ে ব্যাগ বের করে। দশ টাকার নোট বের করে মেয়েটার হাতে দেয়।

দেখতে না দেখতে ভিখিরির পাল চারিদিকে ঘিরে ধরে আমাদের! হাঁটতে পারি না। শাড়িই ধরে টানে, নোংরা হাতে ব্যাকুলভাবে হাত ছোঁয়, চিৎকার করে, দিশেহারা কিশোরী মেয়েটা টাকা কোমরে গুঁজে গাছতলায় সংসারের কাছে সুসংবাদ দিতে ছুটে যায়।

মণিকা রাগ করে বলে, তোর সঙ্গে বেরোনোটাই ঝামেলা। কখন যে কী করিস! গেল তো ছেলেটার দশ টাকা! হয়তো বা কষ্টের রোজগার!

কিন্তু সে-সব আমার কানে যায় না। চারদিকে উদ্যত ভিখিরির হাত, তাদের কালো গায়ের ঘামে ঝলসানো রোদ, সোঁদা শরীরের গন্ধে আমার শরীরের রোমকূপ শিউরে ওঠে। হঠাৎ যেন আমার চারদিকে বয়ে যাওয়া যে জীবন—যা আমি কাছে থেকেও কখনও দেখি না—তা-ই যেন হঠাৎ আমার চারদিকে বৃক্ষ-উন্মোচন করে দিয়েছে। এক পলকের রোমাঞ্চ কেটে যায়। মণিকা হাত ধরে টেনে নেয়। হাঁটতে থাকি।

গড়িয়াহাটার দোকানো দোকানে শাড়ির রঙের মধ্যে হারিয়ে যাই। খেলা, কত খেলা তৈরি করে নিতে হয় সারাদিন আমাকে।

মাসিমা এসে বললেন, মঞ্জু, আজ সুনুকে দেখতে আসবে। ও তো সাজগোজ করতে জানে না, কসমেটিক্সও নেই। তুমি দুপুরের দিকেই তোমার সাজগোজের জিনিসগুলো নিয়ে চলে যেয়ো।

যাব।

তিনি শ্বাস ফেলে বলেন, এ জামাই কেমন হবে কে জানে! বড়জন তো পাগল। বলেই তিনি চোখে আঁচল চাপা দেন।

সুনু দেখতে ভাল নয়। অনেক পাত্রপক্ষ দেখে গেছে। বলতে কী, ওর বিয়ের জন্যই আমাদের বিয়েটা আটকে আছে। কিন্তু কপাল, ওকে কেউ পছন্দ করছে না।

দুপুরে আমার কসমেটিক্সের শিশি বোতল নিয়ে গিয়ে দেখি, সুনু একা ঘরে কাঁদছে।

কী হয়েছে সুনু?

অনেকক্ষণ কাঁদল সে। তারপর চোখ মুছে বলল, ওরা ফবসা মেয়ে চায়। বলেই দিয়েছিল—ফরসা কি না বলুন, নইলে দেখতে গিয়ে লাভ নেই। আমি তো কালো মঞ্জুদি, তবু বাবা ওদের বলে এসেছে আমি ফরসা। এর কোনও মানে হয়? আমি এখন কোন লজ্জায় ওদের সামনে যাব?

চোখ মুছে সুনু সাজতে বসল। মন দিয়ে ওকে সাজালাম। কারিগর যেমন মূর্তি গড়ে। সাজতে সাজতে ও হাসতে থাকে, মঞ্জুদি, নিজের বিয়ের রাস্তা তৈরি করছ? কিন্তু এবারও হবে না, দেখো।

রোদ থাকতেই পাত্রপক্ষ আসে। দু' জন বয়স্ক লোক—তারা পাত্রের বাবা আর মামা, আর দু' জন যুবক—পাত্রের দাদা আর বন্ধু। আড়াল থেকে নিবিষ্টভাবে তাদের লক্ষ করি। সুনু সামনে গিয়ে বসতেই তাদের চোখে হতাশা ফুটে ওঠে। নিজেদের মধ্যে কী একটু কথা বলে তারা। সুনু প্রশ্নের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর বুড়ো দু' জন ভদ্রতাবশত দু'-একটা আলগা প্রশ্ন করে, যুবক দু' জন নিশ্চুপ বসে থাকে। পছন্দ হয়নি।

হঠাৎ একটা খেলা তৈরি করি। মুখ টিপে হাসি। মিষ্টির প্লেট এখনও ঘরে যায়নি। সুনুর ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে তাড়াতাড়ি সেজে নিই। শাড়িটা গোছ করে পরি। তারপর বিনা দ্বিধায় সামনের ঘরে গিয়ে ঢুকে সুনুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াই।

যুবক দু' জন একসঙ্গে বিদ্যুৎ স্পর্শ করে। বয়স্ক দু' জন, মুখের রসগোল্লা চিবানো একটুক্ষণের জন্য বন্ধ করেন। আমার ভাবী শ্বশুর শাশুড়ি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

মেয়েটি কে? এক জন বয়স্ক প্রশ্ন করেন।

আমার ভাবী শ্বশুর আমার দিকে একবার বিরক্তির চোখে চেয়ে দেখেন। সঠিক উত্তর দিতে হলে

বলতে হয়—আমার ভাবী বউমা। কিন্তু তিনি তা বলেন না, কেবল অস্ফুট গলায় বলেন। পাশের বাড়ির, বড় সুন্দর তো। তোমরা কি কায়স্থ মা? কতদূর লেখাপড়া করেছ?

আমি বিনীতভাবে উত্তর দি। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকেন। আমার ভাবী শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করেন, এর বিয়ের সম্বন্ধ চলছে নাকি?

তিনি আমতা আমতা করতে থাকেন।

মনে মনে আমি হেসে গড়াই।

ওঁরা আরও খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। নিতান্ত নির্লজ্জের মতো বলেন, রাস্তা-ঘাটে কত সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় কিন্তু বিয়ের সময়ে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

পরদিনই বাবার কাছে টেলিফোন আসে। বাবা নাকচ করে দেন।

আমি আড়ালে হাসি।

সুনু এসে বলে, মঞ্জুদি, তোমার জন্যই হল না। নইলে ওদের নাকি আমাকে ভীষণ পছন্দ হয়েছিল।

বলে সুনু হাসে। তারপর বলে, মা-বাবাদের যে কী সব অদ্ভুত ধারণা থাকে। জামাইবাবুর জন্য চিন্তা করে করে ওঁদের মাথার ঠিক নেই।

রাতে মাঝে মাঝে ভাল ঘুম হয় না। জেগে থেকে কত শব্দ শুনি! ভিখিরির চিৎকার অনেক রাত পর্যন্ত শোনা যায়। মানুষের রাতের খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলে তারা পাত কুড়োতে বেরোয়। আমাদের বাড়ির সামনে রোজ এক পাল আসে।

রাত গভীর হয়ে গেলে বহু দূর-দূরের শব্দ শোনা যায়। শুনি, পশ্চিমাদের গান, লোকজনের হল্লা, কখনও বোমার শব্দ। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শুনি, দৌড়-পায়ের আওয়াজ, খবরের কাগজে আজকাল খুব খুনের খবর থাকে। বুঝতে পারি, চারধারে কী একটা গোলমাল জল ঘোলা করে দিচ্ছে। ফুঁসে উঠছে মানুষ। কিন্তু সে-সব আমাকে তেমন স্পর্শ করে না।

প্রতি সপ্তাহে অদ্রির চিঠি আসে। তাতে মাঝে মাঝে অদ্রি লেখে, রাণুর বরের এখনও কোনও খবর নেই। এ-খবর অদ্রির বাড়িতেও আসে। কান্নাকাটির শব্দ শোনা যায়।

ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগে না। রাণুর বরের কথা ভাবি, ওর দেওর নেনটুর কথা ভাবি, সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে লাল রঙের বাড়ির ঝুলবারান্দায় দেখা সুন্দর মেয়েটির কথা ভাবি। মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি, একটা মোটা লোক ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে অন্ধকার বারান্দায়। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ বুঝতে পারি, লোক নয়, একটা বালির বস্তা। কোথায় যেন দেখেছিলাম বস্তাটাকে? ওঃ, রাণুর বাড়িতে। ওর দেওর সেই নেনটু বক্সার ছিল। হাবুলদা কি ওর ওপর শোধ নিয়েছে শেষ পর্যন্ত? নিক, আমার কী?

একদিন নার্স মেয়েটিকে গিয়ে বলি, নার্সিং কোথায় শেখা যায় বলুন তো! আমি শিখব।

মেয়েটি তটস্থ হয়ে বলে, অনেক জায়গা আছে।

আমি ভেবেচিন্তে বলি, আপনিই শেখাতে পারেন তো!

কিছুটা পারি।

শেখাবেন?

সে ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

তার কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধতে শিখি, ক্ষত পরিষ্কার করার কলাকৌশল শিখি, জ্বরের চার্ট রাখা থেকে শুরু করে সবই সে আমাকে শেখাতে চেষ্টা করে।

জিজ্ঞেস করি, পচা ঘা বাঁধতে ঘেন্না করে না? রক্ত দেখলে, কাটা ফাটা দেখলে ভয় লাগে না?

প্রথম প্রথম লাগত। তারপর অভ্যাস হয়ে যায়।

আমার হবে না। আমি আজও তেমন রক্তটক্ত দেখিনি।

সে চুপ করে থাকে। নীরবে মুগ্ধচোখে আমাকে দেখে। তার চোখ দেখে বুঝতে পারি, আমার কাছ থেকে একটু ভাল কথা শুনতে পেলে সে বর্তে যায়। মনে মনে হাসি। মেয়েটার জন্য কষ্ট হয়।

এক-একদিন দুপুরবেলা ডেকে এনে বলি, আপনার কথা তো কিছুই বলেন না! আপনার কথা বলুন, শুনব।

সে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে সাহস সঞ্চয় করে বলে, আমাদের কথা শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। আমরা একটুও ভাল না, সুন্দর না।

হেসে চোখ বড় করে বলি, তাই নাকি?

সেও হাসে, মাথা নত করে বলে, সত্যিই।

ঠাট্টা করে বলি, খুব কুচ্ছিত সবাই?

সে লাজুক গলায় বলে, তা কেন! আমার ছোট বোন আমার চেয়ে ফরসা, মার রং পেয়েছে। আমি পেয়েছি বাবার রং, বাবা কালো ছিলেন শুনেছি।

আপনার মা তা হলে সুন্দর।

সে মাথা নাড়ে, মার নাক চাপা, চোখ ছোট। আর গায়ের রং? সেও আপনার তুলনায় কিছুই না। আমাদের মধ্যে ফরসা হলেও আপনার পাশে কালোই।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের হাতখানা একটু ঘুরিয়ে দেখে বলি, আমারও রং কিছু নেই। ঘষা-মাজা হয়ে থাকি, বাইরে বেরোই না বড় একটা। ছায়ায় থেকে থেকে ফ্যাকাশে হয়ে গেছি। আপনার মতো বাইরে বেরোনোর কাজ করলে আমিও কালো হয়ে যাব।

মেয়েটা লজ্জা পেয়ে বলে, ধ্যাৎ! রং বুঝি আমি চিনি না!

ফরসা ছাড়া বুঝি সুন্দর হয় না?

হবে না কেন? আমার দাদা তো কালো, কিন্তু খুব সুন্দর। ভাই-বোনদের মধ্যে শুধু নয়, আমাদের পাড়ার মধ্যেও সবথেকে সুন্দর। সবাই বলে।

বলতে বলতে মেয়েটার গলা হঠাৎ একটু ধরে আসে।

আমি কৌতূহল দেখাই না। শুধু বলি, তাই নাকি?

সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, খুব লম্বা, চওড়া হাড়, দারুণ স্বাস্থ্য। দাদাকে যে দেখে সে-ই দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকে।

ও।

মেয়েটা হঠাৎ বোকার মতো বলে, আপনাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিনই মনে ভেবেছিলাম, আমার দাদার সঙ্গে আপনাকে খুব মানায়। আপনি আমার বউদি হলে আনন্দে আমি নাচতাম।

আমার মুখে-চোখে রক্তের গরম হলকা লাগে। মুখ ফিরিয়ে নিই।

মেয়েটা আবার স্তিমিত গলায় বলে, কিন্তু দাদা অত সুন্দর হয়েও কোনও লাভ হল না।

চকিতে মুখ তুলে বলি, কেন?

মেয়েটার চোখ জলে ভরে আসে আস্তে আস্তে। বলে, ডায়মন্ডহারবারের কাছে মাস্টারি করত। খুব বই পড়ার নেশা ছিল। সারা দিন কেবল বই আর বই। জীবনে উন্নতি করার চেষ্টাই ছিল না। একবার সেলসম্যানের চাকরি পেয়েছিল, ভাল মাইনে, কিন্তু সারা দিন বই পড়ার সময় পেত না বলে ছেড়ে দিল। মাস্টারি করছিল বেশ। কিন্তু তারপর হঠাৎ কী যে হয়ে গেল ওর! স্কুলে বেশির ভাগ দিনই যায় না। বাড়িতেও থাকে না। একটা দলের সঙ্গে মিশে কী সব রাজনীতি করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ফেরে, ভোর হওয়ার আগেই চলে যায়। একদিন পুলিশ এসে বাড়ি সার্চ করে ওর ঘর থেকে একগাদা বইপত্র নিয়ে গেল। ও এখন পালিয়ে বেড়ায়। কোথায় খায়, কোথায় শোয় ঠিক নেই। একগাল দাড়ি রেখেছে, চুলে তেল নেই, রোগা হয়ে গেছে, অসম্ভব সিগারেট খায়। মাসে হয়তো এক দিন বাসায় আসে, অল্পক্ষণ থেকেই চলে যায়। মা বিয়ের কথা বললে এমনভাবে তাকায় যে রক্ত জল হয়ে যায়। সবচেয়ে বেশি বদলে গেছে ওর চোখ। আগে বড়, টানা চোখ ছিল ওর, চাউনি ছিল কবির মতো। এখন সেই চোখ কেমন লালচে, রুক্ষ, জ্বলজ্বলে। আমরা এখন ওর চোখের দিকে তাকাই না। আগে আমাদের দুই বোনকে কত কবিতা পড়ে শুনিয়ে মানে বুঝিয়ে দিত, বই-পড়া আমরা তার কাছেই শিখি। আমরা দুই বোন ছিলাম ওর পাঁজরের মতো। কী ভালবাসত! এখন ফিরেও দেখে না। সবসময় ভিতরে ভিতরে কী উত্তেজনায় যেন ও কাঁপে। ভয়ংকর অন্যমনস্ক থাকে। কবিতার বই পড়েই না।

মেয়েটি লজ্জা ভুলে কাঁদতে থাকে। ওর দুই চোখ ভেসে যায় জলে। আমি হাত বাড়িয়ে ওকে ছুঁয়ে বলি, কাঁদে না—ছিঃ, কাঁদে না।

ও তবু কাঁদতে কাঁদতেই বলে, পাড়ার লোকে বলে, ওকে নাকি মেরে ফেলার জন্য লোক ঘুরছে।

কেন?

কী জানি! কিন্তু যারা মারতে চায়, তারা তো জানে না আমার দাদা কী ভাল ছিল। কী ভীষণ ভাল। কবির মতো চোখ, বড়লোকের ছেলের মতো সুন্দর মুখ, বই ছাড়া বিশ্বসংসারের আর কিছু খেয়ালই থাকত না ওর।

মার ঘর থেকে একটু অস্ফুট শব্দ আসে। ও টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, যাই।

চোখের জল মুছে একটু হাসে, বলে, আমার আর কখনও বউদি হবে না, জানেন! একটা বউদির কত শখ ছিল আমাদের! বউদির সঙ্গে কীরকম ঠাট্টা করব, কত সিনেমায় যাব, কীরকম ভালবাসব—আমরা দুই বোন সব ঠিক করে রেখেছিলাম। বউদির চেহারা হবে ঠিক আপনার মতো। ভীষণ সুন্দর। রাস্তায় বেরোলে সবাই হিংসে করবে। সব রঙের শাড়ি, সব রকম গয়না যাকে মানাবে।

একটু থেমে, স্তিমিত গলায় বলে, যাই, মঞ্জুদি।

এখনও দক্ষিণ কলকাতার রাস্তায় সুন্দর পোশাক পরা ছেলেরা আড্ডা দেয়। গড়িয়াহাটার মোড়ে সেই ছেলেগুলোকে দেখি, মুখে পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিকের ছোঁয়া, টেরিলিন টেরিকটন পরে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখে।

রাসবিহারী পোস্ট অফিসের কাছে চায়ের দোকানের সামনে এখনও বসে থাকে শিবু আর হাবুর দলবল। সুন্দর মেয়ে দেখলে নকল মারপিট করে পথ আটকায়, নকল ভদ্রতায় ক্ষমা চায়। সবই ঠিক আছে। তবে কেন নার্স মেয়েটির দাদা কবিতা পড়া ছেড়ে দিয়ে ফেরার হয়েছে? তবে কেন রাণু তার বরকে খুঁজে পায় না?

প্রতিদিনই বিকেলে আমি আর সুনু আজকাল বেড়াই। আমরা দু'জনেই একা। আমার বাড়িতে আমি, ওদের বাসায় ও। রোদ পড়ে এলে সুনু ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে ডাকে,মঞ্জুদি!

আমি জানালায় মুখ রাখি।

ও হাসে, বেড়াবে না?

বেড়াব। তুই তৈরি হয়েছিস?

হুঁ।

দাঁড়া, আমি গা-টা ধুয়ে নিই।

ওদের ভাড়াটে বাড়ির এজমালি ছাদ। সেখানে বেড়ানোর সুবিধে নেই। একগাদা বাচ্চা বাচ্চা এক্কা দোক্কার কোর্ট কেটে লাফায়। বাড়িওয়ালার ছেলের গোঁফ উঠছে, সে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ছাদের একটা কোণে রোজই এসে দাঁড়ায়। দু'-চারটে আইবুড়ো মেয়ে উঠে গুজগুজ করে, আর হাসে।

সুনু তাই আমাদের ছাদেই রোজ আসে। নিরালা ছাদ আমাদের। নানা রঙের টালি বসানো, পিছল-মসৃণ। সাদা তোয়ালে ঢাকা ইজিচেয়ার পেতে দিয়ে যায় মদন। আমরা অবশ্য কদাচিৎ বসি। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতেই আমাদের গল্প হয় বেশি।

সুনু প্রায়ই আজকাল বলে, মঞ্জুদি, বাবাকে বলে আমার বি-টি পড়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও। আমি চাকরি করব।

জিজ্ঞেস করি, কেন?

বিয়ে তো হচ্ছে না, দেখছই। হবেও না। তার চেয়ে একটি কিছু নিয়ে আইবুড়ো থেকে যাই।

তোর খুব ভাল বিয়ে হবে, দেখিস।

সুনু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, ভাল বিয়ে হবে? তুমি কি হাত গুনতে জানো?

আমার মনে হয়।

আমি দেখতে কুচ্ছিত মঞ্জুদি। কালো, দাঁত উঁচু, বেঁটে। কে নেবে?

নেবে সেই। গোকুলে বাড়ছে।

আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না। যদি বাবা টাকা-পয়সা, জিনিসপত্রের লোভ দেখিয়ে কোনও পাত্রপক্ষকে রাজি করানও, তবু আমি হয়তো স্বামীর ভালবাসা পাব না।

তুই পুরুষের জানিস কী রে মুখপুড়ি? পুরুষরা যে কখন কাকে ভালবাসে। ভালবাসলে একদম অন্ধ হয়ে যায়।

সুনু মাথা নেড়ে বলে, তবু আমি ওই বিয়ে চাই না। ছেলের বাপ টাকার লোভে রাজি হল, খরচ করে বাবা বিয়ে দিলেন—আমার কেমন যেন লাগে। দিদির বিয়েতে বেশি খরচ হয়নি, কিন্তু আমার বিয়ের জন্য বাবা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে মোটা ধার নেবেন বলে ঠিক করেছেন, দাদা মাইনের টাকা থেকে আলাদা করে প্রতি মাসে একশো টাকা রাখেন। এ-সবের অর্থ হল, ওরা দরকার হলে ছেলে কিনবেন। কিন্তু আমার ওইরকম বিয়ে পছন্দ নয়।

তবে কীরকম বিয়ে চাস?

আমি চাই, পাত্র নিজে আমাকে দেখুক। পছন্দ হলে মুখের ওপর বলুক। শাঁখা সিঁদুর দিয়ে বিয়ে করে নিক। সে-পাত্র খুব সামান্য চাকরি করলেও আমার আপত্তি নেই। আমি গরিবের ঘর করতে পারব। কিন্তু ওইরকম বিয়ে আমার পছন্দ না। তার চেয়ে আমাকে বি-টি পড়তে দিক বাবা। আমি মাস্টারি খুঁজে নেব। কোনও গ্রাম মফস্‌সলে চলে যাব। ছোট্ট একটা একার বাসা হবে, সেইখানে থাকব। চারদিক খুব নির্জন হবে, নিঝুম হবে। একা একা একটা নির্জন জীবন, দেখো ঠিক কাটিয়ে দেব।

একটু হেসে বলি, ও বাবা, সব ভেবে রেখেছিস!

রেখেছি। আমি বিয়ে করে কাউকে ঠকাতে চাই না।

তোকে যে নেবে সে ঠকবে না।

কী করে বুঝলে?

তুই যাকে পাবি তাকে খুব ভালবাসবি। তোর মুখ-চোখ সেই কথা বলে।

শুনে ওর মুখ হঠাৎ থমথম করে। কান্না আসার আগের মুহূর্তের মতো একটা থরথর কাঁপুনি ওঠে গালে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সামলায় নিজেকে।

তারপর বলে, ভালবাসা-টাসা আমি বুঝি না।

আমিও না।

বাঃ, তোমার যে সাত-আট বছরের প্রেম!

হলেই কী! ভালবাসা জিনিসটা খুব রহস্যের। আমি ভাল বুঝি না।

মঞ্জুদি, তোমাকে একটা কথা রোজ বলব বলে ভাবি। বলা হয় না। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি।

রহস্যের গন্ধ পেয়ে বলি, বল না। প্রেমে পড়েছিস নাকি?

ও চুপ করে থাকে।

সাহস দিয়ে বলি, বল না। লজ্জা কী?

ও কেমন একরকম করে তাকায়। তারপর অনেকক্ষণ ভ্যাবলার মতো অন্যমনে চেয়ে থেকে বলে, ব্যাপারটা খুবই লজ্জার মঞ্জুদি! তুমি আমার বন্ধুর মতো হয়ে গেছ, তোমাকে তো সব বলা যায়। তবু এটা বলতে লজ্জা করে। ভীষণ লজ্জা।

কী হয়েছে সুনু?

আমি একজনকে ভালবাসতাম।

অবাক হয়ে বলি, সে কী! কখনও টের পাইনি তো। সে কে?

সে কে তা কী করে জানব। পরিচয় বেশি দিনের নয়।

এত কাছাকাছি থাকি, তবু কখনও তো কোনও ছেলের সঙ্গে তোকে দেখিনি! তুই তো বাড়ি থেকে বেশি বেরোসও না।

বাড়ির বাইরেই তার সঙ্গে দেখা হত। সপ্তাহে এক বা দুই দিন।

কী করে ছেলেটা?

কিছুই না। বি.কম. পাশ করে চাকরি পায়নি। তাই টাইপ আর শর্টহ্যান্ড শিখত। নাম অনিন্দ্য সান্যাল।

কোথায় দেখা হয়েছিল তোদের?

সুনু রেলিঙে ভর দিয়ে আলসেতে থুথু ফেলে আবার সেই ভ্যাবলা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, মঞ্জুদি, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

আগে ছেলেটার কথা বল।

বলার কিছু নেই। কালীঘাটে পিসিমার বাড়ি থেকে এক বিকেলে ফিরছিলাম। বাসে ট্রামে তখন অফিসের ভিড়। এইটুকু রাস্তা বলে হেঁটে আসছি, অলিগলির ভিতর দিয়ে, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনের ভিতরে একটা পার্ক আছে, সেখান থেকে ছেলেটা পিছু নিল। রাস্তাঘাটে আমার পিছু বড় একটা কেউ নেয় না। নিলেও ভুল করে নেয়, একটু পরেই ভুল ভেঙে গেলে ফিরে যায়। এই ছেলেটা কিন্তু ফিরল না। ওই পার্কের কাছ থেকে বরাবর আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। ছেলেটা ভুল করছে, খুব ভুল করছে। আমি যে কুচ্ছিত তা বুঝতে পারছে না। বুঝতে দেরি হচ্ছে। ও কি অন্ধ! আমি প্রায় ছুটছি তখন, তবু ছেলেটা ঠিক আসতে লাগল। আমার কপালে ঘাম দিচ্ছে, চোখ-মুখ অপমানে লজ্জায় জ্বালা করছে, কিচ্ছু ভাবতে পারছি না। কেবল পালাতে চাইছি। ভীষণ জোরে হাঁটছিলাম, রাস্তা দেখতে পাইনি, হোঁচট খেয়ে হঠাৎ স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল। পায়ে ব্যথাও পেলাম খুব! কী বিপদ বোঝো! অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছি, স্যান্ডেলটা কুড়িয়ে হাতে নিয়েছি, পা নাড়তে পারছি না, পিছনে হাত দশেক দূরে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, কিছু নেই, আমি ভীষণ একা, অসহায়, দুর্বল—আমার কেউ নেই, কিছু নেই। কেউ নেই...কিছু নেই...ভাবতে ভাবতেই ঠোঁট কাঁপল, শরীরে ঢেউ দিল কান্না, চোখ বেয়ে আপনিই জল পড়তে লাগল। আমি প্রাণপণে কান্না আটকানোর চেষ্টা করছি। পারছি না। অনেক দিনের জমা কান্না বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, সব দুঃখ একসঙ্গে ভিড় করছিল মনে। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে হাতে চোখ মুছছিলাম। সে সময়ে ছেলেটা এগিয়ে এল, খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, আরে, আপনি কাঁদছেন কেন? শুনে হঠাৎ ভয় ভুলে ভীষণ রেগে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। আমার সমস্ত শরীর আক্রোশে রাগে কান্নায় কাঁপছে। আমি বললাম, লজ্জা করে না? কেন আপনি আমার পিছু নিয়েছেন? ছেলেটা খুব অবাক হয়ে বলল—আমি ভাবিনি যে আপনার এ-রকম রি-অ্যাকশন হবে। আসলে হাতে কোনও কাজ ছিল না বলে—কাজ নেই বলে—সময় কাটছে না তাই—আমি ভাবলাম কিছু একটা লক্ষ্য করে হাঁটি। অনেকদিন ধরে আমি কোথাও যাই না, কিছু একটা লক্ষ্য করে হাঁটি না, এমনি এমনি ঘুরে বেড়াই। আজ হঠাৎ মনে হল—আপনার পিছু নিয়ে খানিকটা হাঁটি—একটা কিছু লক্ষ্য করে হাঁটা হবে, কলকাতার মেয়েরা তো এ-সব মাইন্ড করে না। কিন্তু আপনি—দেখুন, রাগ করবেন না, আপনার চটিটা আমার হাতে দিন, ওই মোড়ে একটা বুড়ো মুচি বসে।

আমি হাসতে থাকি। সুনু হাসে না। গম্ভীর চোখে আমাকে দেখে বলে, ওই মুচির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে আমাদের ভাব হয়ে গেল। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

বিশ্বাস করছি। তারপর বল।

সুনু আবার আলসেয় থুথু ফেলে সেইদিকে চেয়ে থাকে। তারপর মুখ লুকিয়ে বলে, মঞ্জুদি, আমি তাকে সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছি।

একটু চমক লাগে। কথাটা ঠিক বুঝতে পারি না।

বলি, কী বলছিস?

বললাম তো। বার বার শুনতে চেয়ো না।

বুঝতে সময় লাগে না! এ-সব এক পলকে বোঝা যায়। তবু হাত-পা শিরশির করে। মনে করতে ইচ্ছে করে, ভুল শুনছি।

সুনু, কী হয়েছে?

কী জানি! আমার শরীর কেমন করে।

কেমন?

যেমন অন্যের হয় বলে শুনেছি, তেমন।

ওর কাঁধে হাত রেখে বলি, কেমন এমন করলি সুনু? অপেক্ষা করা যেত না?

ও মাথা নাড়ে, না। অপেক্ষা করতে আমার ভয় করে। ও তো আমাকে সত্যিই সুন্দর দেখেনি। ও

ভুল দেখেছে। অপেক্ষা করলে যদি ভুল ভেঙে যায়? তুমি যে বললে আমি যাকে পাব তাকে খুব ভালবাসব—সেটা খুব সত্যি কথা। আমি ওকে খুব ভালবেসেছিলাম। ভয় হচ্ছিল, যদি ওর ভুল ভাঙে তবে আমার সেটা সহ্য হবে না। তাই আমার যা আছে সব দিয়ে ওকে খুশি করেছি।

আমি আবার হঠাৎ হাসতে থাকি। বলি, তাতে অবশ্য তেমন কিছু হয়নি। সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই ছোঁড়াটার নাম-ঠিকানা দে। অদ্রিকে চিঠি লিখে আনাই, নেগোশিয়েট করে ফেলি।

ও মাথা নেড়ে বলল, ব্যাপারটা অত সহজ হলে তোমাকে বলব কেন? ওর সঙ্গে আমার মাত্র তিন-চার মাসের পরিচয়। বেশি কিছু জানতাম না। দিন পনেরো আগে যখন প্রথম শরীরের আবল্যি টের পাই তখন ঠিক করলাম, ওকে সব বলে বিয়ে করে ফেলব। সেদিন দেশপ্রিয় পার্কের এক গাছতলায় দেখা হওয়ার কথা ছিল। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ও এল না। মন তখন ভীষণ অস্থির। একা একা এই বিরাট ঘটনাটা বইতে পারছিলাম না। সন্ধে পার করে ফিরে এলাম। সারা রাত ঘুম হল না। কথা থাকলে ও ঠিক আসে, ভুল করে না। তবে এল না কেন? কিছুতেই কিছু ভেবে পাই না। ওদের বাড়িটা নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনে। বেশ বড় বাড়ি। সামনের দিককার একটা ঘরের ভাড়াটে উঠে গেছে। ফাঁকা ঘরে বসে আড্ডা দিতাম দু'জনে, ভিতরবাড়িতে কখনও যাইনি। বাড়ির লোকজন বলতে ওর বিধবা মা, আর এক স্বামী-তাড়ানো দিদি। কাউকেই চিনি না। তবু পরদিন সকালে উঠেই ওর বাড়িতে গেছি। দোতলায় উঠেছি যখন তখন আমার বুক কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, ভয় করছে। কিন্তু অন্য কোনও উপায় তো নেই। আমাকে ওদের মুখোমুখি হতেই হবে। সাড়া পেয়ে ওর মা বেরিয়ে এলেন—রাশভারী চেহারা, মুখটা থমথমে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। ওর মা অনেকক্ষণ দেখলেন আমাকে, তারপর বললেন, ও তো নেই। ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় আছে তাও আমরা জানি না। তুমি কে? আমার তখন বুক খালি খালি লাগছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোনওক্রমে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? উনি বললেন, কী জানি। কোন পুলিশের অফিসারকে প্রিয়া সিনেমার কাছে কারা মেরেছে, পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঘুরে কতজনকে ধরে নিয়ে গেল। আমরা নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছি। ওর দুই দাদাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কী করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না। তুমি কে? ওর সঙ্গে চেনা হল কী করে? কোনওক্রমে দু'-চারটে মিথ্যে কথা বলে চলে এসেছি। দাদার এক সার্জেন্ট বন্ধু আছে, পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে লাল মোটর সাইকেল থামিয়ে ট্র্যাফিক সামলায়। সাত-আট দিন আগে তাকে গিয়ে ধরলাম, অনিন্দ্য সান্যালের খোঁজ এনে দিতে। সে তিন-চার দিন আগে খবর দিল, অনিন্দ্যর কেস খুব খারাপ। পি-ডি অ্যাক্টে চালান দিয়েছে, আলিপুরে আছে। সে-ই ব্যবস্থা করে দিল। পরশুদিন গিয়ে অনিন্দ্যর সঙ্গে দেখা করেছি।

বলে চুপ করে রইল। জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখলি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুনু বলল, চেনাই যায় না। হাঁটতে পারছিল না। দু'জন ধরে ধরে নিয়ে এল। খুব মেরেছে। মুখ-চোখ ফুলে আছে। আমাকে দেখে একটু হাসবার চেষ্টা করল, তারপর কেঁদে ফেলল। কোনও কথাই বলতে পারলাম না মঞ্জুদি। কী বলব? বলেই বা কী হবে? কেঁদে ফেলেই আবার সামলে গেল। বলল, আমার জন্য আর অপেক্ষা কোরো না। করে লাভ নেই। হয় আমি মরে যাব, নয়তো পাগল-খোঁড়া-পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকব...বলতে বলতে আবার কাঁদে। নিজের বিপদের কথা ওকে বলতেই পারলাম না, কাঁদতে লাগলাম। ও যে কত ভাল ছিল, ওকে কত ভালবাসি, সেই কথা মনে করি আর কাঁদি। রাজনীতি ও কখনও করেনি, ও-সব ও বুঝতই না। দাদার বন্ধুকে সে-সব কথা বললাম। সে গম্ভীর হয়ে বলল, দ্যাখ সুনু, পুলিশ খামোখা কাউকে ধরে না। ওর সম্বন্ধে পুলিশের ইনফর্মেশন খুব পাকা। শুনে প্রথমটায় বিশ্বাস হল না। পরশু রাতে অনেকক্ষণ ওকে ভাল করে ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে মনে হল, হতেও পারে।

কী?

হতেও পারে যে ও খুনেদের দলে ছিল। ওর সব ভাল, কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল, ও খুব উদ্দেশ্যহীন। কখন কী করবে তার ঠিক পেত না। যেমন একদিন হাতে কাজ নেই বলে আমার পিছু নিয়েছিল, তেমনি লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন বলে ওর পক্ষে আচমকা হঠাৎ কোনও কাজ করে ফেলা সম্ভব। ওর জীবনের কোনও লক্ষ্যই ছিল না। অনেক বয়স পর্যন্ত চাকরি নেই, পড়াশুনো করে দেখেছে সব পণ্ডশ্রম, ক্রমে অলস নিস্তেজ আর গেঁতো হয়ে যাচ্ছিল, নিজের উপর বিশ্বাস ছিল না। এমনকী, ঘটেনি বলে প্রেমও

করেনি আগে। আমিই প্রথম। তাই আমাকে নিয়ে ওর বাড়াবাড়ি ছিল খুব।

তবে তুই ওকে ঠিক করে নিসনি কেন?

কী করে করব মঞ্জুদি, আমি তো যথাসর্বস্ব দিয়েছি। কিন্তু একটা মেয়ে তো একজন মানুষের সব হতে পারে না। কোনও কোনও ছেলে থাকে, যাদের লক্ষ্যই হল মেয়েমানুষ। ও তো সে-রকম ছিল না। মেয়েমানুষকে ছাড়িয়েও ওর একটা কিছু অস্তিত্ব ছিল। সেটা আমি বুঝতে পারতাম না। আমি ওর যেটুকু চিনতাম না সেটুকুর মধ্যে কী ছিল কে জানে! মাত্র তো তিন-চার মাসের পরিচয়।

সন্ধে উতরে গেছে কখন। লালচে আভার আকাশ। একটা এলোমেলো হাওয়া আমাদের মুখ থেকে কথা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে সুনুর মুখ দেখতে পাই না। ও রেলিঙে ঝুঁকে, শরীর কুঁজো করে, আঁচলে মুখ চেপে কেমন পুঁটুলির মতো হয়ে গেছে। বিস্বাদ মুখে আলসেয় থুথু ফেলছে।

মুখ গুঁজে রেখেই বলল, কী করব মঞ্জুদি?

উত্তর দিতে পারি না। সুনু বড় গৃহস্থ মেয়ে। সাত-আট বছর ধরে দেখে আসছি, মায়ের সঙ্গে ঘুর ঘুর করে সারা দিন কাজ করে। রাণুর কাজের এত গোছ ছিল না। ও সারা দিন ঘর গোছায়, রান্না করে, মেশিন চালিয়ে সেলাই করে। সবাই বলে, যে-ঘরে যাবে সে-ঘরের শ্রী ফিরবে। শেষ পর্যন্ত সুন্দর ঘরই জুটবে না হয়তো। কোনও দিনই সুনুকে তেমন আলাদা করে লক্ষ করিনি। বলতে গেলে, এই প্রথম তার প্রতি আমার মায়া হতে থাকে। সহজে উত্তর দিতে পারি না।

সুনু নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। আমি ওর মাথাটা বুকের কাছে টেনে আনি। মনে মনে বলি, কাঁদ সুনু, আর-একটু কাঁদ। আমি তোর সঙ্গে কাঁদি আয়।

কিন্তু আমার ভিতরে কোনও কান্না জমা নেই। মেঘ ছাড়া তো বৃষ্টি হয় না। আমার ভিতরে মেঘ কই? একটা জ্বালা-জ্বালা ভাব আছে, প্রবল পিপাসার মতো উৎকণ্ঠা আছে, মায়া আছে, কিন্তু কান্না কই! কাঁদতে পারি না বলে আমার কষ্ট আরও বেশি হয়। ওর মাথাটা চেপে চেপে ধরি। ভিতরটা ফেটে যেতে থাকে।

ও মুখ তুলে বলে, মঞ্জুদি, এ-অবস্থায় কারও ওপর নির্ভর করতে হয়। একা মাথায় তো কুলোয় না। আমি আর পারি না। তুমি আমার ভার নেবে? যা করতে বলবে, করব।

ওর কথার মধ্যে কী একটু ছিল। এ-রকম আগে কেউ আমাকে কখনও বলেনি। হঠাৎ আমার মনে হতে থাকে, সুনু ছোট্ট মেয়ে, আমি অনেক বড়—অনেক বড়—যেন ওর মা। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে যায়। আমি একটুও না ভেবে বলি, নেব।

ও অনেকক্ষণ কেঁদে শান্ত হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, ছেলেটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাবে না—না রে?

ও মাথা নাড়ে, গেলে দাদার বন্ধু ঠিক ব্যবস্থা করত।

আমি ঝুঁকে বলি, তুই কি শিওর যে তুই প্রেগন্যান্ট।

ও ইতস্তত করে বলে, শরীরটা কেমন করে যে! এ-রকমই হয় তো শুনেছি। যদি না হয় মঞ্জুদি, তোমাকে আমি খুব খাওয়াব, একটা প্রেজেন্টেশন দেব—

বড় কষ্ট হয়। চুপ করে থাকি।

ও নিজে থেকেই আবার বলে, তারপর নিশ্চিন্ত মনে ওর জন্য অপেক্ষা করব। তুমি আমার ভার নিলে তো মঞ্জুদি?

বাড়ি যা সুনু। ঘুমো। ভাবিস না।

প্রায় সারা রাত ঘুমোইনি। মাথার মধ্যে কী যে সব কুটোকাটা ঘুরপাক খেল। জ্বরের মতো এক প্রবল উৎকণ্ঠা। মাঝে মাঝে আধো ঘুমের মধ্যে কতবার কাতরে উঠে পাশ ফিরলাম, জেগে জল খেলাম, আবার স্বপ্ন দেখলাম। কেউ কখনও এ-রকমভাবে আমার হাতে নিজেকে দিয়ে দেয়নি। আমি কখনও কারও ভার নিইনি। এই প্রথম। কেমন যে লাগে! শরীর ভার হয়ে আসে, নিজেকে বিরাট বলে মনে হয়। আবার দুর্বলও লাগতে থাকে। পথ খুঁজে পাই না। কিন্তু তার মধ্যেও এক সুখবোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে—এক জন আমার ওপর নির্ভর করে আছে। আমার কোলে একদিন আমার শিশু আসবে, সেই ন্যাংটাপুঁটো অসহায় শিশু নির্ভর করবে আমার ওপর। আমার মুখ চেয়ে হাসবে কাঁদবে, ভয় পেলে

জড়িয়ে ধরবে আমাকেই। সেই অসহ্য সুখের মাতৃত্বের মতো একটা বোধ আমাকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করছিল। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলায় নার্স মেয়েটি টুকটুক করে মার বিছানা গোছাচ্ছিল। ধপধপে সাদা তার পোশাক, পরিচ্ছন্ন হাত-পা, চোখ তীক্ষ্ণ সতর্ক, তার চলাফেরায় সহজ একটা পটুত্বের ভাব, চটপটে হাত-পা। তার কাজ করা দেখতে আমার ভাল লাগে।

শুনুন!

সে সসম্ভ্রমে আমার দিকে চায়।

আমার ঘরে একবার আসবেন। দরকার।

সে মাথা নাড়ল। একটু হাসে। একটু দাঁত-উঁচু, কালো মুখখানার দিকে তাকিয়ে ওকে হঠাৎ খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়! ওর মেয়েলিপনা নেই, কাজ বোঝে, কাজ নিয়ে থাকে।

সকালবেলাতে আমাকে সুন্দর দেখায়, আমি জানি। চোখের পাতা ভারী থাকে, ঠোঁট টস টস করে, রস জমে মুখখানা ভরে ওঠে। লালচে আভার এক ঢল চুল এলো হয়ে চালচিত্রের মতো মুখখানা ঘিরে থাকে।

মেয়েটি আমার সামনে বসে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে না। মুখে একটু সম্মোহিতের মতো ভাব।

তাকে চা এগিয়ে দিয়ে বলি, বলুন তো, কেউ প্রেগন্যান্ট হয়েছে কি না তা কী করে বোঝা যাবে!

মেয়েটা একটুও ভ্রূ তোলে না। স্বাভাবিক নরম গলায় হেসে বলে, কতগুলো লক্ষণ আছে। তবে খুব প্রথম দিকের স্টেজ হলে গাইনির ডাক্তার দেখাতে হয়।

আমি তার চোখে চোখ রেখে চা খাই।

সে বিমুগ্ধভাবে চেয়ে থাকে। চোখ সরাতে ভুলে যায়।

জিজ্ঞেস করি, গাইনির ডাক্তার না দেখালে জানা যাবে না? আপনি বলতে পারেন না?

মেয়েটি হাসে, কার জন্য?

আমি একটু আড়মোড়া ভেঙে বলি, আমার জন্য। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি—

মেয়েটা একটুও চমকায় না, চোখ বড় করে না। মুখের বিমুগ্ধ ভাবটা তেমনই লেগে থাকে। যেন বা আমার কোনও দোষ হতে নেই। সবই যেন আমাকে মানায়।

সে তেমনি সুন্দর স্বরে বলল, কেমন লাগে আপনার?

মুখে থুথু আসে, গা কেমন করে, শরীর গুলোয়।

বমি?

বমি পায়।

ক্রিমিও হতে পারে। গাইনোকোলজিস্ট না দেখালে শিওর হওয়া যাবে না। যাবেন? পি-জিতে ভাল ডাক্তার আছে আমার চেনা। দেখিয়ে দেব। কেউ জানবে না। চেম্বারেও দেখাতে পারেন।

যদি দেখা যায় প্রেগন্যান্সি তা হলে কী হবে?

মেয়েটি তেমনই গলায় বলে, আপনি কী করতে চান?

ঠিক জানি না। ঠিক করিনি।

হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙি।

মেয়েটা চেয়ে থাকে স্মিতমুখে, সম্মোহিতের মতো বলে, যা চাইবেন তাই হবে। আমি সব ঠিক করে দেব। আজকাল কোনও অসুবিধে নেই।

আমি আবার হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলি, দেখি। বলব।

সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। নরম গলায় বলে, আসি মঞ্জুদি।

মেয়েটি চলে গেলে আমি একা একা হাসি। আজকাল কত সহজে সব হয়ে যায়। ভাববার কিছু নেই। মিছিমিছি চিন্তা করেছি সারা রাত। একা হাসতে থাকি।

তারপর একা একা সারা সকাল অন্যমনস্ক থাকি। গাড়িটা নিয়ে বেরোই, গড়িয়াহাট থেকে তিন-চারটে শাড়ি কিনে নিই। অদ্রিকে চিঠি লিখি। গ্রামাফোন বাজাই। বেলা বাড়ে। মেঘশূন্য দিনে সূর্য

ক্রমে আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে আসে। খসখসে পিচকিরি দিয়ে জল দেয় মদন। সুগন্ধে ঘর ভরে যায়। একা ভূতের মতো আমি সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াই। যদি এত সহজেই সব মিটে যায় তবে মঞ্জু কী নিয়ে থাকবে? তার কি কিছুই করার থাকবে না? সকলেই ক্ষমা করে তাকে, কেউ দোষ দেখে না। হায়, মঞ্জুর আর কোনও খেলনা থাকছে না। বড় নিশ্চিত তার পরিণতি।

## ॥ সোমসুন্দর ॥

একটা উঁচু ঢিবি পেরোনোর সময়ে আমরা দূর থেকে গ্রামটা দেখতে পাচ্ছিলাম। রোদে থির থির করে বাতাস কাঁপছে। গ্রামটা খাঁ খাঁ করে। চারিদিকের মাঠ-ঘাটে সবুজ রং দেখাই যায় না। চষা মাটির ডেলা রোদে শুকিয়ে বালি হয়ে যাচ্ছে।

নীতু আগে, আমি পিছনে। আল ধরে হাঁটছি। আখের চারা লাগিয়েছিল কে, সেগুলো দড়ি দড়ি হয়ে মাটিতে নুইয়ে আছে। বাতাসে থর থর করে শুকনো শব্দ ওঠে, পোয়াল-নাড়ায় যেমন শব্দ হয়। নীতু সিগারেট ধরানোর জন্য দাঁড়ায়। আমি চারিদিকটা দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু দেখার নেই। গ্রামদেশে এক জায়গার সঙ্গে আর-এক জায়গার বড় একটা তফাত হয় না। একই রকম। এ-সময়টায় গাছে নতুন পাতা আসে। এবার আসেনি। রোদে চোখে ধাঁধাঁ লাগে।

গ্রামটার কাছাকাছি চলে আসি। তবু লোক দেখা যায় না। গোরু ছাগল কুকুর কিছুই না।

নীতু মুখ ফিরিয়ে বলে, কলেরা।

কী?

নীতু হাসে, আমরা আসার আগে এ-জায়গায় কলেরা এসে গেছে।

একটা পত্রহীন গাছের নীচে পাতকুয়া দেখে দাঁড়াই। নীতু কুয়ো না-দেখেই বলে, ওতে কিছু নেই নেনটু। বলে একটা পাথর কুড়িয়ে কুয়োর মধ্যে ছুড়ে মারে। অনেকক্ষণ পরে ঠং করে ক্ষীণ শব্দ উঠে আসে।

নীতু হেসে বলে, শুনেছ?

চার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি গ্রামটা একেবারে অজ। পাকা রাস্তা থেকে অনেক দূর, কাছাকাছি খাল বা নদী নেই। মাটির বাড়ির দেয়াল রোদে টনটনে হয়ে আছে। এর আগের গ্রামটার নাম জপুর। সেখানে হেলথ সেন্টার আছে, হায়াব সেকেন্ডারি স্কুল, একটা ব্যাঙ্ক। ওখানে আমরা গত রাত্রিতে ছিলাম। কিন্তু এ-গ্রামটায় কিছু নেই।

একটা সজনে গাছে সরু সরু কয়েকটা সজনে ঝুলছে। বোধহয় রসকষ নেই। একটা কাক ঝিম হয়ে বসে আছে। উত্তর দিকে একটা খাদের মতো। পচা গন্ধ আসছে। দু' পা এগিয়ে দেখি, এধার ওধার গোরুর পাঁজর আর হাড়ের স্তূপ পড়ে আছে। অনেক শকুন বসে চার দিকে। দু'টো কুকুর রক্তাভ চোখ তুলে তাকাল।

নীতু বলে, ট্যানারি। এটা বোধহয় চামারদের পাড়া। পাতকুয়োর ভিতরে সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে নীতু। আমরা আবার হাঁটতে থাকি।

দাওয়ায় বসে একটা লোক দড়ি পাকাচ্ছে নিবিষ্ট মনে। আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

নীতু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, সোনামুখী কোন দিকে হে?

লোকটা তটস্থ হয়ে দাঁড়ায়, গ্রাম পেরিয়ে পশ্চিমে রেল-বাঁধ পাবেন, সেটা পেরিয়ে ঝিল, দু' ক্রোশ হেঁটে গেলে নদী, তার ও-পারে।

আমি বলি, একটু জল খাওয়াতে পারো?

লোকটা তাকায়। নীতু আমার হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলে, খেয়ো না।

কেন?

কুষ্ঠ।

তখন লোকটাকে দেখি। তেমন কিছু বোঝা যায় না। নাকটা একটু ফোলা. লাল। হাতের আঙুল

বাঁকা। মুখটার এখানে ওখানে ডুমো ডুমো মাংস ফুলে আছে।

লোকটা বলে, জল খাবেন তো—

নীতু মাথা নাড়ে, খাব না।

কোথা থেকে আসছেন?

জপুর। এ-গ্রামের অবস্থা কী?

দেখছেন তো। খরা গেল, তার পর কলেরা। সব পালিয়েছে, মাত্র দশ-বারোটি মনিষ্যি আছি আমরা। সবাই কুঠে। আপনারা কি সেটেলমেন্টের লোক নাকি বাবু?

না।

তবে?

যাচ্ছি আত্মীয়বাড়ি।

লোকটা আমাদের সঙ্গ নেয়। কাছ ঘেঁষে চলতে থাকে।

সুয্যিঠাকুরের ধুন্ধুমার দেখেছেন এবার?

আমরা কথা বলি না। তফাতে থাকার চেষ্টা করি। লোকটা এক নাগাড়ে কথা বলে যায়। বলতে বলতে কাছ ঘেঁষে আসে। আমরা প্রাণপণে তফাত থাকার চেষ্টা করি।

নীতু তবু তার মধ্যেই জিজ্ঞেস করে, মোট দশ-বারোজন আছ তোমরা?

আজ্ঞে। আমরা সবাই কুঠে।

ফাঁকা ফাঁকা লাগে না?

লোকটা মাথা নাড়ে, না। লোকজন বেশি থাকলে তো আমাদের নড়াচড়া, বেড়িয়ে বেড়ানো নিষেধ। কোথায় কার সঙ্গে ছোঁয়া লাগে। এখন আমরা ক'জন কুঠে মনের আনন্দে গ্রাম চষে বেড়াই, ঘরবাড়িতে ঢুকে যাই, সন্ধেবেলা কেত্তন করি ক'জনায়। খারাপ লাগে না।

লোকটার মুখে একটা চাপা আনন্দ দেখা যায়।

নীতু বলে, খাও কী?

ভিক্ষেসিক্ষে আছে। বাঁশের কোঁড় পাই, জঙ্গুলে শাক আছে, চলে যায়—

চাষবাস?

বীজধান ধুলো হয়ে গেল। কোথায় চাষবাস? মাটিতে কোদাল মারলে ফিরে এসে মাথায় লাগে।

গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত সে সঙ্গে এল। আরও আসত। দূরে মাঠের মধ্যে একটা লোক কুঁজো হয়ে কী খুঁজছিল। তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, হেই—

সে লোকটা দূর থেকে হাত তুলে বলে, পেনু রে—

লোকটা মাঠের মধ্যে দ্রুত নেমে গেল।

নীতু বলল, মেঠো ইঁদুর।

কী করবে?

খাবে।

এক ঝলক শুকনো বাতাস গো-ভাগাড়ের গন্ধ ছড়িয়ে যায়। নীতু পিছন ফিরে একবার মাঠের মধ্যে লোক দু'টোকে দেখে। বলে, খুব আনন্দে আছে। পুরো গাঁ-খানা পেয়ে গেছে ক'দিনের জন্য।

মেঠো রাস্তাটা একটু চওড়া। পাশাপাশি হাঁটা যায়। নীতু পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, বাঁকুড়ার কুষ্ঠ হাসপাতাল থেকে মাঝে মাঝে রুগিরা ছুটি পায়। তখন রোগটা ছড়িয়ে দিয়ে আসে।

তুমিও রোগ ছড়াতে বেরিয়েছ।

নীতু একটু থমকে যায়। ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। তারপর হঠাৎ তার সুন্দর মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। শব্দ করে হাসে নীতু। বলে, বাঃ, ঠিক বলেছ তো! খুব ঠিক। রোগ ছড়াতে বেরিয়েছি—বাঃ! বেশ বলেছ।

নিচু জমি ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ চোখ তুলে রেলের রাস্তাকে পাহাড়ের মতো উঁচু মনে হয়। পতিত জমিতে কিছু বাদামি রঙের আগাছা। মাটির ডেলায় পা হড়কে যায়। রেলরাস্তায় উঠতে দম বন্ধ হয়ে আসে—এত খাড়াই। ওপরে দাঁড়াতেই হুস-হাস করে পালকি বেয়ারার মতো বাতাস শব্দ করে ছুটে

আসে। টেলিগ্রাফের তারে শিস দেওয়ার শব্দ হয়। ঝকঝকে দু'ফলা ইস্পাত রোদে পড়ে আছে। এটার ওপর দিয়ে রেলগাড়ি যায়। রেলগাড়ি কলকাতায় যায়। আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। রেলরাস্তার ওপর দু'জনেই একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। বোধহয় নীতুরও ফিরে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। রেলরাস্তা চিরকাল প্রবাসীকে ঘর-সংসারের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

নীতু লাইন পার হয়ে বলে, নেনটু, জামাটা খুলে মাথা ঢেকে নাও। তোমার অভ্যাস নেই, এই রোদে সর্দিগর্মি হয়ে যায় যদি। মাথায় রোদ লাগা ভাল না। তারপর আর কথা হয় না। তেষ্টায় বুক কাঠ হয়ে আছে। কথা বলতে গেলে বুকে গরম বাতাস ঢোকে।

রেলরাস্তার ওপারে এক জলাজমির মতো। জল নেই, কাদা আছে। কোথাও কোথাও কাদা শুকিয়ে পাথরের মতো জমে গেছে। জমির রং লাল। নীতু বলে, ওটা ঝিল ছিল, শুকিয়ে মাঠ হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ধার দিয়ে হাঁটতে থাকি। কোথাও বুক সমান উঁচু ঘাসের মতো ঝোপ। নীতু হাতের লাঠি দিয়ে ঝোপ পিটিয়ে নেয় মাঝে মাঝে। সাপে ব্যাঙ ধরেছে, সেই শব্দ মাঠ-ঘাটকে নিস্তব্ধ করে রাখে।

উৎকর্ণ হয়ে শুনে বলি, দাঁড়াও নীতু, ব্যাঙটাকে ছাড়িয়ে দিয়ে আসি।

নীতু হেসে মাথা নাড়ে, লাভ নেই। ছাড়িয়ে দিলেও ব্যাঙটা মরবে। একবার সাপে ধরলে বড় একটা বাঁচে না।

কথাটা গুরুগুরু করে ওঠে বুকের মধ্যে। একবার সাপে ধরলে বড় একটা বাঁচে না।

একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল। কুঁজো হয়ে বসেছি বলে পকেটের পিস্তল তলপেটে এঁটে বসে।

গাছের ছায়া ঠিক ঠান্ডা নয়, তবু বসা যায়। নদীর ধার বলে জলছোঁয়া বাতাসে সোঁদা মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। এদিকে আবাদ হয়েছে, চোখ চাইলে স্নিগ্ধ সবুজ চোখ জুড়োয়। চোখ চেয়ে দেখি, নীতু বসে ম্যাপ দেখছে। কাঁচা হাতের আঁকা ম্যাপ। ঠিক বোঝা যায় না, রাস্তা ভুল হয়।

আমি বললাম, সোনামুখী নদীর ও-পারে তো!

নীতু অন্যমনস্কভাবে বলে, সোনামুখীতে কে যাচ্ছে?

বললে যে!

ও-রকম বলতে হয়। আমরা যাব হাঁসখালি, আরও পাঁচ মাইল।

উঠে পড়ি। হাঁটতে থাকি। খুব ঘুম পায়, শরীর আলসেমিতে ছেড়ে দেয়। তলপেটে পিস্তলের বাঁট এঁটে বসেছিল ঘুমের সময়ে। ব্যথার জায়গাটায় হাত চলে যায়। তারপর হাত ঘুরে এসে থামে পকেটের ওপর। আমার পিস্তলে এখনও গুলি নেই। গুলির প্যাকেট বাঁ পকেটে। এখনও ভরিনি।

নদীর পাড়ে বলে হাঁসখালি ঠিক আর গাঁ নেই। গঞ্জ হয়ে উঠেছে। নদীতে নৌকো, ঘাটে হাট বসেছে। বুড়ো বটের তলায় বাঁধানো চত্বরে লোকজন বসে আছে। সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরদোর চোখে পড়ে। পুরনো গাছ প্রকাণ্ড অন্ধকার ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে গ্রামখানাকে। তিনতলা সমান উঁচু একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পুরনো দিঘির জলে বহুকালের শ্যাওলা জমে আছে। দিঘির পাড়েই নতুন-ওঠা বি-ডি-ওর অফিস, থানা। একটা ছোট হাসপাতাল, স্কুল। ফাঁকে ফাঁকে ঘন বাঁশবন, কন্টিকারীর ঝোপ, ছাড়া জায়গা। তারপর আবার গ্যাঁদাল লতা-বাওয়া বেড়ার আড়ালে বাড়ির চাল দেখা যায়। পোড়ামাটির কাজকরা একটা সুন্দর শীতলা মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা ঢুকে গেছে। জঙ্গুলে রাস্তা। হাঁটতে গেলে চারপাশের লতা পাতা গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। ছায়া ছায়া রাস্তাটার শেষে বড় একটা গেরস্ত বাড়ি। ঘের দেওয়া উঠোন, উঠোনের চার পাশে ঘর। আমরা বাড়িতে ঢুকি না। বাড়ির বাইরের দিকে একটা আলাদা ঘর। দরজা বন্ধ। নীতু দরজায় ধাক্কা দিতে একটা ছেলে ঘুমচোখে এসে দরজা খুলল।

কাকে চাইছেন?

রূপপুরের ফটিক পাঠিয়েছে। আমার নাম নিত্যানন্দ সেন। আপনি হারু না?

ছেলেটার চোখে একসঙ্গে ভয় আর বিস্ময় ফুটে ওঠে। সরল ভালমানুষের মতো মুখখানা, মালকোঁচা দেওয়া কাপড় আর খালি গায়ে তাকে আরও গ্রাম্য দেখায়। ভারী নিরীহ চোখের দৃষ্টি। নীতুর দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, আসুন, আসুন। আমরা তো আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। ভিতরে আসুন কমরেড।

কমরেড কথাটা কানে খট করে লাগে। বিশ্রী—কী বিশ্রী যে শোনায় মালকোঁচা দিয়ে পরা কাপড় আর সরল চেহারার ছেলেটার মুখে। মনে হয় কৃত্রিম, মেকি একটা শব্দ। যার মধ্যে গভীরতা নেই।

ঘরটা—স্পষ্টই বোঝা যায়—পড়ার ঘর। বড় একটা টেবিলে বই-খাতা ছড়ানো, আলমারি বোঝাই বই। একধারে খাটে বিছানা পাতা। ছেলেটা আমাদের বসিয়ে ভিতর-বাড়ির দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, এখানে এই ঘরটায় আমি একা থাকি। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

আমরা জামা-কাপড় খুলতে থাকি।

নীতু সংক্ষেপে বলে, স্নান করব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সামনেই পুকুর—বলেই সে আবার ঢোঁক গিলে কমরেড কথাটা যোগ করে।

অনেকক্ষণ পুকুরে নেমে স্নান করি। ওপরের জল গরম, গভীরে ঠান্ডা জল। বার বার ডুব দিয়ে উঠে আসি। নীতু সাঁতরায়। ঘাটলায় দাঁড়িয়ে, কিংবা আনাচ-কানাচ থেকে বউ-ঝিরা উঁকি দেয়। কৌতূহলী কয়েকটা ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়ায় পুকুরের পাড়ে।

উঠোনে কামলারা কাজ করছে, একধারে এক বুড়ো দাঁড়িয়ে—গলায় কণ্ঠী হাতে হুঁকো। ছেলেটা চিনিয়ে দেয়, ওই আমার জ্যাঠামশাই। উনিই চাষবাস দেখেন। বাবা গাঁয়ের স্কুলে মাস্টার। দুই কাকা কলকাতায় চাকরি করে...

ঘরে এসে দেখি তিন-চারটে ছেলে এসে গেছে। এ আমার পরিচিত দৃশ্য। যেখানেই নীতু যায় সেখানেই ছেলেরা জোটে। ওদের মিটিং হয়। আমি মিটিংয়ে থাকি না। হয় ঘুরে বেড়াই, নয়তো ঘুমোই। আজ আমার ঘুম পাচ্ছে।

দুধ-মুড়ি, শসা আর আম দিয়ে একপেট খেয়ে নিয়ে বলি, একটু ঘুমানো যাবে?

সরল মুখ, নিরীহ চোখের ভদ্র ছেলেটা ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে আসে, নিশ্চয়ই। আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আর-একটা বালিশ দেব? আমি এক বালিশে শুই—আপনার হয়তো অসুবিধে হবে—

আমার চোখ আঠা-ঘুমে লেগে আসে। তবু ঘুমের আঁশজড়ানো চোখে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ছোট চুল, সুন্দর ছোট্ট কপাল, ভোঁতা নাক, স্বচ্ছ চোখের ছেলেটা। দেখলেই মনে হয়, আদরে মানুষ। এখনও সংসারের কিছুই জানে না। একটু আগেই ওর জ্যাঠামশাই ওকে 'হারু' বলে ডাক দিয়েছিলেন। গম্ভীব সেই ডাকের মধ্যে কী গভীর মমতা ছিল। হারু তটস্থ হয়ে ছুটে গিয়েছিল। যেন বা জন্মাবধি ওই ডাকের সঙ্গে ও সুতো দিয়ে বাঁধা আছে। ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে আমার মায়া হয়।

আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি।

রাতে খাওয়ার আগে নীতু ঠেলে তোলে। রাত হয়ে গেছে। একটা স্বচ্ছ হ্যারিকেন জ্বলছে টেবিলের ওপর। হারু হ্যারিকেনের পাশেই মুখ রেখে বসে আছে। মিটিং ভেঙে গেছে। আর কেউ নেই।

চোখে জল দিয়ে আসি। হারু তখনও হ্যারিকেনের পাশে বসে আছে। চোখ তুলে তাকায় না। মুখখানা গম্ভীর। আরও ভাল করে ওর মুখখানা দেখার জন্য কাছে এগিয়ে যাই। নিচু হয়ে দেখি, বিকেলের দেখা ছেলেটা তো নয়। এ অন্য লোক। এর কপালে ভ্রূকুটি, নিরীহ চোখ দু'টো পালটে গেছে হঠাৎ—জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, চোয়ালে টিপি। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ছেলেটা বদলে গেছে।

নীতুর দিকে তাকাই। চোখে চোখ পড়তেই নীতু হাসে। সাফল্যের হাসি।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। নীতু এইসব পারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় যে বদলে দেয় মানুষকে। ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে দেয় ডালপালা, তীক্ষ্ণধার করে তোলে। তারপর মানুষ নীতুর হাতের অস্ত্রের মতো হয়ে যায়।

অন্ধকার উঠোন থেকে জ্যাঠামশাই গম্ভীর ডাক দিলেন, হারু, ওঁদের খেতে নিয়ে এসো।

হারু একটু চমকায়। কিন্তু ঠিক ছুটে যায় না। নড়েচড়ে বসে।

রাতে শোওয়ার সময়ে নীতু হাই তুলে বলে, কাল কলকাতায় ফিরে যাব নেনটু। এখানকার কাজ হয়ে গেল।

আমি স্তিমিত গলায় বলি, কী কাজ হল!

নীতু হাসে, বলে, যাজন শব্দের অর্থ জানো?

না!

যাজন মানে নিজের আদর্শে অন্যকে টেনে আনা, উদ্বুদ্ধ করা। ব্রাহ্মণদের যাজন ছিল অবশ্য কর্তব্য।

তোমার যাজন হল নীতু? ওরা কথা বুঝল?

বুঝল। বোঝালে বুঝবে না কেন?

চুপ করে থাকি।

নীতু বলে, এদের থিয়োরি বুঝিয়ে লাভ নেই। গ্রামের সরল সোজা ছেলে, থিয়োরি মাথায় ঢোকালে বা বেশি বই পড়তে দিলে ভাবতে ভাবতে ভ্যাবলা হয়ে যাবে। তার চেয়ে কী করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলেই কাজ হয়। আমি শুধু তাই বুঝিয়েছি।

সকালে উঠে দু'জনে বেরিয়ে পড়ি। মাঠ-ঘাট ভাঙি না। বাসে উঠি। যেতে থাকি রেল স্টেশনের দিকে। কলকাতার দিকে। বড় ভাল লাগতে থাকে। প্রায় দশ দিন হল বেরিয়েছি, কিন্তু মনে হয়, কতকাল—কতকাল আমি কলকাতায় নেই।

সকালে যখন এসে পৌঁছোলাম তখন বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। চোখ তুলে বললেন, কোনও খোঁজ পেলে?

না।

কোথায় কোথায় খুঁজলে?

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া—

বাবা শ্বাস ফেলেন।

আমি বড়দাকে খুঁজতে যাইনি। গেছি নীতুর সঙ্গে। আমিও আস্তে আস্তে বড়দা হয়ে যাব। চলে যাব একদিন। কেউ খুঁজে পাবে না।

বাবা বললেন, মেরেই ফেলেছে। নেনটু, খুঁজবার আর দরকার নেই। যারা আছে তারা ঘরেই থাকো। আমাদের বড় একা লাগে।

গাছতলায় বাঁধানো চত্বরে জমজমাট আড্ডা বসেছে। মনোতোষ দু'হাত তুলে চেঁচায়, বকসারদা, কোথায় ছিলেন? আমি পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরছি।

হেসে বলি, কেন?

কেন! চোখ তুলে মনোতোষ বিস্ময় প্রকাশ করে, মনে নেই, বাজি ছিল আমি বাঁচলে আপনার দশ।

সবাই ঘিরে ধরে প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলাম। উত্তর দিই, ঘুরে এলাম একটু। একঘেয়ে একটানা কলকাতায় থাকা ভাল লাগে?

জমাট আড্ডা হয়। সন্ধের পর গঙ্গার বাতাস দেয় খুব। বেলফুলের গন্ধ আসে কোথা থেকে! রঙিন দোকান, সুন্দর মেয়েরা হাঁটে, ডবলডেকারের শব্দ, ট্রামের শব্দ। কলকাতা তার উত্তপ্ত বুকে চেপে ধরে আমাকে। ভীষণ ভাল লাগে বন্ধুদের মুখ। ওই তো মনোতোষ মোড়ের দোকান থেকে পান খেয়ে পিচ ফেলছে—দেখে বোঝাই যায় না ও ব্লাডপ্রেশার আর ডায়বেটিস নিয়েও দশ বারোটা খুনে ছেলের ভিতর দিয়ে আমাকে বাসরাস্তায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। ওই তো শ্যামল—ওই শংকর, বরেন, সতোন, বিভূতি—চেনা মুখ—প্রিয় মুখগুলি। নীতু এদের কেউ নয়। ছিল কোনওদিন, এখন আর নয়। নীতু আড্ডা মারতে আর আসে না। কিন্তু নীতু আসবেই। এই কলকাতার উত্তপ্ত বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে আমাকে। মাঠ-ঘাট ভেঙে আবার যাব। নিয়তি। সরল চেহারা, নিরীহ চোখের ছেলেদের মুখ ক্রমশ কঠিন হয়ে যাবে। বদলে যাবে তাদের মুখ। চোখ বুজলেই দেখতে পাই নীতু বসে বসে ছুরি দিয়ে গাছের ডাল থেকে বাহুল্য ডাল-পাতা কেটে ফেলছে। তার মুখে সাফল্যের হাসি।

নীতু আসবেই। যতক্ষণ না-আসে ততক্ষণ আমি কলকাতায় মগ্ন হয়ে থাকি।

ফেরার সময়ে মনোতোষ সঙ্গ নিল, মশাই, সেদিন স্টারডাস্টের ওপর খেলেননি তো! আপসেট করে অনেক টাকা পাইয়ে দিয়েছে। খেললে ভাল করতেন।

হাসি। মনোতোষ গলা নামিয়ে বলে, ওই পার্টি আবার পিছু নিয়েছিল নাকি?

না।

পুলিশে একটা রিপোর্ট করে রাখুন।

হঠাৎ মনে পড়তে প্রশ্ন করি, আপনার সেই ভাইটা, সে কী করে এখন?

কী জানি। বোধহয় স্কুল-কলেজ বন্ধ করে বেড়ায়, দেয়ালে লেখে-টেখে। আমি ওর দিকে তাকাই না। বাবা তারকেশ্বর ভরসা!

আমি আস্তে আস্তে করে বলি, মনোতোষবাবু, আপনি সেদিন আমার জন্য যা করেছেন তার তুলনা হয় না। কোনও দিন বুঝতে পারিনি তো আপনি আমাকে অতটা ভালবাসেন!

মনোতোষ থমকায় একটু, তারপর বলে, নেনটুবাবু, আমরা কত বছর ধরে ওই গাছতলায়, ফেবারিটে আড্ডা মেরেছি বলুন! শাস্ত্রে আছে, দশ পা একসঙ্গে হাঁটলে বন্ধু হয়, আর আমরা এত বছরে হইনি। বাইরে থেকে সম্পর্কটা যতটা আলগা দেখাক, ভিতরে ভিতরে বাঁধ পড়ে গেছে। দু'দিন একটা চেনা মুখ না দেখলে চিন্তা হয়। বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি। এই সেদিন আপনি ছিলেন না। কতবার খোঁজ নিয়েছি। ভাবি, ওই গুণ্ডাগুলো বুঝি পেয়ে গেল আপনাকে। ঘরে স্ত্রী-পুত্র পরিবার, বাইরে আপনারা—এ ছাড়া আমাদের আছেটা কী? মনে ভাবি, যারা আছে তারা চিরকাল থাক কাছাকাছি, কেউ যেন দূরে না যায়, মরেটরে না যায়।

মনোতোষের গলা কেঁপে যায়। বলে, রথীন বিলেত চলে গেল, তুলসী গেল বোম্বাই— বুকের একটা দিক ঠিক ফাঁকা আছে ওদের জন্য। রাত-বিরেতে ঘুম ভেঙে গেলে আচমকা মনে পড়ে। শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে।

আমি স্বপ্নোত্থিতের মতো হঠাৎ ফিসফিস করে বলি, আমারও কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। যদি কেউ নিয়ে যেতে চায় তাকে ঠেকাতে পারবেন? আমি কোথাও যেতে চাই না—

মনোতোষ বিস্মিত গলায় বলে, কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন? বাইরে চাকরি পেয়েছেন নাকি?

সামলে যাই। হেসে বলি, কিছু না। আপনি যান, আমি একবার আমার ভগ্নিপতির বাড়ি ঘুরে যাই।

পারুল দরজা খুলে চোখ বড় করে বলে, ওমা! ছোড়দা!

ভীষণ চমকে যাই। চেয়ে থাকি। নন্দরানী ঠিক এইরকম বলত।

আশু হইহই করে তেড়ে আসে, মাইরি নেনটুদা, বিয়ে করেছি বলে সত্যিই পর করে দিলে? কতকাল আসো না!

দেখো, ছোড়দা কী রোগা হয়ে গেছে!

ওরা সমস্বরে কথা বলতে থাকে। নন্দরানীর ছবিতে বেলফুলের মালা। ধূপকাঠি জ্বলছে। ঘরটা সুগন্ধময়। মনটা হঠাৎ কেমন যেন ভাল হয়ে যায়। পৃথিবীতে বহুকাল বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

বললাম, দাবাটা পাড়ো আশুদা, একহাত খেলে যাই।

পাড়ছি। পারুল, ডিম ভেজে আনো। ডবল।

পারুল বলে, রাতে খেয়ে যান না ছোড়দা, আমার খুব শিগগির রান্না হয়ে যাবে।

সস্নেহে তার দিকে চেয়ে নন্দরানীকেই দেখি, বলি, দূর পাগল! মা ভাত কোলে করে বসে থাকবে যে!

তবে একদিন খাবেন কিন্তু। সামনের রবিবার মাংস রেঁধে রাখব। এই, তুমি বলো-না ছোড়দাকে।

বলার কী আছে? শুনতে পাচ্ছে তো। পর বলে না-ভাবলে আসবে ঠিক।

দাবার ছক পেতে দু'জনে বসি। আস্তে আস্তে সব ভুলে যাই।

অনেক রাতে উঠি। আশু আর পারুল রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। বলে, পর করে দিয়ো না নেনটুদা। এসো। যা দিনকাল পড়েছে। মানুষগুলো কেমন ছিটকে যাচ্ছে এদিক ওদিক। যারা আছি তারা মোয়ার মতো বেঁধে থাকব, কী বলো? বড়দা যে কোথায় গিয়ে কী করছে! এই বুড়ো বয়সে এ-সব...রোজ বড়দার কথা ভাবি—বুঝলে? বাবাকে বোলো, শিগগির একদিন যাচ্ছি।

পারুলকে নিয়ে যেয়ো।

সে আমি পারব না, সে বড় লজ্জার।

লজ্জার কী? তোমাকে সুখী দেখলে ওঁরা সুখী হবেন। যেয়ো।

ওরা চুপ করে চেয়ে থাকে। আমার চলে-আসা দেখে। ওদের মুখে অকপট অপরাধবোধ। বড় মায়া হয়।

*রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। হাঁটতে থাকি। মনে হয়, এই যে একহাত দাবাখেলা, পারুলের স্নেহ,* মনোতোষের সঙ্গে গাছতলায় বসা, কলকাতার রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়ানো—এর বেশি আমি কিছু চাই না।

কিন্তু নীতু আসবে। আসবেই।

মালাদের ঝুলবারান্দায় একটা সবুজ আলোর আভা এসে পড়েছে। মালার ঘরের সবুজ পরদা উড়ছে হাওয়ায়। মৃদু তানপুরার শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। কৃষ্ণচূড়া গাছটায় এখনও পাতা নেই। শুকনো ডালপালা অন্ধকারে ভিখিরির হাতের মতো এদিক ওদিকে বাড়ানো। চোখ নামিয়ে নিয়ে হাঁটি। গাও। তুমি গাও মালা। আমার কোনও দাবি-দাওয়া নেই। নীতু এসে নিঃশব্দে আমাকে নিয়ে যাবে।

রাতে শোওয়ার আগে দরজা বন্ধ করে পিস্তলটা বের করি। আর গুলির প্যাকেট। টেবিলে পাশাপাশি সাজিয়ে চেয়ে থাকি। নীতু আমাকে বলেছিল, গুলি ভরে রেখো। আমার ইচ্ছে করে না। এখনও শিশুর খেলনার মতো নিষ্পাপ, মেয়েদের গয়নার মতো সুন্দর। যতক্ষণ গুলি ভরা নেই, ততক্ষণ। পিস্তলটার সৌন্দর্য নীতু হয়তো কখনও লক্ষ করেনি।

বারান্দায় এসে দাঁড়াই। হঠাৎ চমকে উঠি—ওধারে একজন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পরমুহূর্তেই হেসে এগিয়ে যাই। বস্তাটার গায়ে হাত রাখি। আদর করে বলি, মক্কেল, বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার খোরাকি জোটে না। বলে হাত বুলোই বস্তাটার গায়ে। বস্তাটা নড়ে। খুব আস্তে আস্তে দোলে।

রেলিঙে ঝুঁকে চেয়ে দেখি। মালার ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। কেউ নেই। না, আছে। ছায়ার মতো, মৃদু আলোর আভা তার গায়ে পড়েছে। আবছা শরীর ঝুঁকে আছে রেলিংয়ের ওপর। মালা একা। কী দেখছে মালা? কী ভাবছে? বোধহয় গান। শ্বাস ফেলি। দু'টো বারান্দার মধ্যে অন্তহীন শূন্যতার ব্যবধান।

কলকাতার মেয়াদ ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। নীতু আসবে। পাঁচ-ছ'টা দিন কলকাতায় কেটে গেল। আমি কৃপণের মতো দিন গুণী। যেন প্রবাসী ঘরে ফিরে ছুটির হিসেব করে।

সকালে বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন বারান্দায় বসে। আমাকে ডেকে বললেন, দ্যাখ তো নেনটু, এই নম্বরটা, সি না জি।

উঁকি দিয়ে দেখি, পশ্চিমবঙ্গ লটারির ফল।

বললাম, সি দুই দুই তিন...

তা হলে হল না। আমারটা জি সিরিজ, নম্বরটা প্রায় লেগে গিয়েছিল।

হাসতে থাকি। সেই সময়ে খবরের কাগজে একবার চোখ ঘুরে এল। মনে হল, একটা নাম যেন দেখলাম। নামটা আমার চেনা। খুঁজে দেখতে থাকি। পেয়ে যাই। হাঁসখালি—এই তো হাঁসখালি। খবরটা ছোট্ট, ভাল কিছু বোঝা যায় না। হাঁসখালিতে একজন খুন হয়েছে। জোতদার।

মনে ভেসে আসে ঝকঝকে হ্যারিকেন, তার পাশে হারুর মুখ। জ্যাঠামশাই গম্ভীর গলায় ডাকেন—হারু...। সেই ডাকের সঙ্গে ও যেন সুতো দিয়ে বাঁধা। তটস্থ হয়ে উঠে যায়। কিছু ডালপালা ছিল হারুর—নিরীহ ভাব, সরলতা, বাড়ির সঙ্গে সুতোর টান। সেগুলো ছেঁটে দিয়েছে নীতু।

পরদিন জপুরের খবর বেরোয়। আমি আর খবরের কাগজ দেখি না।

পিস্তলটা গুলি ভরে রাখতে বলেছিল নীতু। থাকগে।

বালির বস্তাটায় অনেক কাল ঘুঁষি মারা হয় না। বস্তাটা স্থির হয়ে ঝুলে থাকে। ঘুঁষি মারতে ইচ্ছেও করে না। দুটো নগ্ন হাতের চেয়ে অনেক ভাল অস্ত্র আমার রয়েছে। নীতুর দেওয়া পিস্তল। ঘুঁষি মেরে কী হবে?

গাছের বাঁধানো চত্বরে আড্ডা মারি। আশুর সঙ্গে দাবা খেলি। রাত করে ফিরি। সময় কেটে যায়। আবার কাটেও না। নীতু তো আসবেই।

আসে ঠিক। রাত এগারোটা তখন। বাড়িতে ঢুকব, কোথা থেকে এসে পিঠে হাত রাখে নীতু। মুখ ফেরাতেই হেসে বলে, কাল চলো নেনটু।

কোথায়?

কাল বলব। সকালে হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়বে।

বলে হাসতে থাকে। কী সুন্দর হাসি ওর। সাদা দাঁত। কী সুন্দর গলার স্বর। যদি গলা ছেড়ে আবৃত্তি করে, এবার ফিরাও মোরে...তা হলে কান ভরে শুনতে ইচ্ছে করবে।

নীতু গলা নামিয়ে বলে, তোমার একটা উপকার করেছি।

কী?

বাবু খতম।

বিশ্বাস হয় না। বলি, কবে?

কাল। আমার বন্ধুর পিছনে কেউ খামোকা সময় নষ্ট করে, এটা ঠিক না।

কৃতজ্ঞতায়, নাকি ভয়ে আমি তার সামনে নুয়ে পড়ি।

খড়গপুর থেকে বাস। নারায়ণগড়ে নেমে আবার পথ হাঁটি। হাঁটতে থাকি। নীতুর পথ ফুরোয় না। এক-এক জায়গায় থামে। নাম বলে। ছেলেরা জুটে যায়। মিটিং চলতে থাকে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি—মুখগুলো পালটে গেছে। নীতু হাসে। সাফল্যের হাসি।

গভীর রাতে স্বপ্ন দেখি। আমাদের কলকাতার বাসার বারান্দায় অন্ধকারে কে যেন ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। ঘুমের মধ্যে শব্দ করতে থাকি। কে? লোকটা কে? বাবা? বড়দা? নাকি ছোড়দা? চিৎকার করতে থাকি। নীতু আমাকে ঠেলে তুলে দেয়, কী হয়েছে?

ওঃ নীতু, স্বপ্ন...

নীতু হাসে, স্বপ্ন? কীসের?

একটা বালির বস্তা। তাতে আমি ঘুঁষি মারতাম।

নীতু খস করে সিগারেট ধরায়। বাঁশের ঘরে বাতাসের নানা শব্দ হয়। মাটির নীচে ইঁদুরের যাতায়াত। বাইরে ঝিঁঝি ডাকে। শিয়াল কাঁদে দূরে। নীতু হঠাৎ অস্ফুট গলায় কবিতা আবৃত্তি করে, কোনও এক বিপদের গভীর বিস্ময় আমাদের ডাকে। পিছে পিছে ঢের লোক আসে...

তারপর হঠাৎ থেমে যায়। শরীরের গভীর অন্ধকারে সব কবিতা ঢাকা দেয়।

## ॥ মঞ্জু ॥

একটু রক্তশূন্য দেখায় সুনুকে। আর-কিছু বোঝা যায় না। খুব কাঁদে বোধহয় আড়ালে-আবডালে। চোখ ফোলা-ফোলা। মুখখানা ভার। কার জন্য কাঁদে? অনিন্দ্যর জন্য? নাকি পেটের যে অঙ্কুরটা নষ্ট হয়ে গেল—তার জন্য? যে-কারণেই হোক, ও কাঁদে। জিজ্ঞেস করলে স্বীকার করে না। আমার দিকে যখন তাকায় তখন দু'চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। ছাদে বিকেলে যখন বেড়াই, তখন রোজই বলে, মঞ্জুদি, তোমার জন্য বেঁচে আছি।

জিজ্ঞেস করি, শরীর কেমন বুঝিস?

একটু দুর্বল লাগে। আর কিছু না।

পৃথিবীতে কিছুই দাগ কাটে না। কত কিছু ঘটে আবার মুছে যায়। একখানা স্লেটের মতো।

সুনু!

উঁ।

সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা করিসনি?

না। কী হবে দেখা করে?

তবে এখন কী করবি?

বলেছি তো, বি টি পড়ব। মাস্টারি নিয়ে কোনও গ্রামে চলে যাব। একা থাকব। ঝিঁঝির ডাক বড় ভাল লাগে আমার। আর গাছপালা, প্রজাপতি, পুকুরের জল। জানো, আমি কখনও ডুব দিয়ে স্নান করিনি।

নার্স মেয়েটি রোজ আসে। তেমনি স্বচ্ছ মুখ-চোখ, চটপটে হাত-পা। মাঝে মাঝে আমার ঘরে ডেকে আনি। দু'জনে চা খাই। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসি।

একদিন দুপুরে সুনুর মা এলেন। সিঁড়ি ভেঙে উঠে হাঁপাচ্ছেন। বোঝা যায় দৌড়ে এসেছেন প্রায়। হাতে একটা চিঠি।—মঞ্জু!

লক্ষ্মী মেয়ের মতো উঠে দাঁড়াই, আজ্ঞে।

দ্যাখো কী কাণ্ড। ওরা সুনুকে পছন্দ করেছে।

কারা?

যারা দেখে গেল ক'দিন আগে, তুমি গিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলে। মনে নেই?

ও।

লিখেছে, শ্রাবণে বিয়ে। দু' হাজার টাকা নগদ, স্টিলের আলমারি আর দশ ভরি সোনা। পরশুদিন পাটিপত্র করতে আসছে। যেয়ো। তোমার মাকে বলে যাই—

আনন্দে উদ্ভাসিত তাঁর মুখ। দৌড়ে তিনি মা'র ঘরে ঢোকেন।

বেয়ান, ও বেয়ান—

বিকেলে সুনু আসে। ছাদে উঠে যাই দু'জনে।

সুনু!

উঁ।

কী করবি?

সুনু আঁচলটা তুলে মুখ ঢাকে। একটু কাঁদে।

তারপর আঁচল ফেলে দিয়ে বলে, কী করব বলে দাও।

কী বলব?

সুনু বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, আমি এখনও তোমার ওপর নির্ভর করে আছি মঞ্জুদি। তুমি যা বলবে শুনব।

বিয়েটা কর।

সুনু চুপ করে থাকে। একটু পরে বলে, তুমি বলছ?

বলছি।

ও মাথাটা নামিয়ে নিয়ে বলে, করব।

আমি ওর কাঁধে হাত রাখি। কিন্তু মনে মনে হাসি। যদি বলতাম বিয়ে করিস না, অপেক্ষা কর। তা হলে কী হত?

সুনুর মুখটা ভার দেখায় ঠিকই। চোখ ফোলা ফোলা। তবু ওর মুখে কোথা থেকে আজ এক শ্রী এসেছে। এই প্রথম কারও পছন্দ হল ওকে। এই প্রথম পৃথিবীতে আর কোনও দুঃখ নেই এখন।

দুপুরে আমি গাড়ি নিয়ে রোজ বেরোই। কাচ তোলা থাকে। শহরটা জনহীন, নিস্তব্ধ বলে মনে হয়। আমার শ্বাসের শব্দ ওঠে। ভ্রমরের মতো গুন গুন শব্দ করে বিদেশি গাড়ি মসৃণ ছুটতে থাকে। দুপুরের গভীর বুকের মধ্যে চলে যাই।

এক-একদিন রাণুদের বাসার সামনে দিয়ে যাই। কাউকে দেখি না। বস্তাটা ঝুলে থাকে। নেনটুকে আমি কেন ভয় করি? কেন? একদিন মুখোমুখি হলে জেনে নেব। জেনে নিতে হবে।

কোথাও থামি না। চক্কর দিই। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় অকারণ ঘুরে মরে গাড়ি। আমার কোথাও যাওয়ার নেই। শুধু দুপুরের ধাঁধা ভেদ করতে চেষ্টা করি। রুপোরঙের এক অপার্থিব পুরুষের মতো ঘিরে আছে দুপুর। তার দহনজ্বালা। লোকে এই খর-দুপুরের নিন্দে করে। বলে, ফসল হল না। গাঁ ছেড়ে মানুষ শহরে যাচ্ছে ভিক্ষে করতে, কলেরা লাগছে, ভিখিরি বেড়ে যাচ্ছে শহরে। আমার সে-সব কিছু মনে হয় না। কেবল মনে হয়, আমি এই খরসূর্যের চিহ্নিত নারী। কী ভীষণ টান তার! ঘরে পাগল-নাচ নাচায়, ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায় কোথায় কোথায়! তার রুপোরং, তার জ্বালা, তার গভীরতার দিকে তেষ্টায় ঠোঁট বাড়িয়ে দিই, শরীর বাড়িয়ে দিই, সর্বস্ব

দিয়ে দিতে চাই। সে নেয় না, ফিরিয়ে দেয়। গাড়িটা চক্কর খেয়ে ফেরে। তাই কোনও পুরুষই ঠিকঠাক পায় না আমাকে।

বিয়ের ক'দিন আগে অদ্রিরা এল। সঙ্গে রাণু। ওকে আর চেনাই যায় না। হাতে চুড়িগুলো ঢল ঢল করে, মুখখানা বুড়িয়ে গেছে। তবু দেখে হাসল। বলল, সুনুর বিয়ে মঞ্জু, কত আনন্দ! না রে?

মাথা নাড়ি।

ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

জিজ্ঞেস করি, তুই কেমন আছিস?

ভালই। হ্যাঁরে মঞ্জু, এখনও আমি বারো বছর সধবা থাকব! না?

কী বলছিস?

ও চুপ করে থাকে। তারপর বলে, জানিস, আমার শ্বশুরের ফার্স্ট স্ট্রোক হয়ে গেল।

তাই নাকি?

হবে না? কত চিন্তা!

অদ্রি আর ঠিক সেই তরুণ প্রেমিকটি নেই। আবেগ উচ্ছ্বাস অনেক কমে গেছে। মুখে দুশ্চিন্তা। আমাকে একা ঘরে পেয়ে খানিক আদর করে বলল, তুমি বদলে যাচ্ছ।

কী রকম?

কী জানি! গোপনে প্রেম-ট্রেম করছ নাকি?

হেসে বলি, তুমি করছ না তো?

সময় কই! প্ল্যান্টে অনেক কাজ। তারপর সত্যর জন্য ছোটাছুটি।

ওঁকে পাওয়া গেল না?

অদ্রি অন্যমনে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে। মাথা নেড়ে বলে, না।

কী হবে?

অদ্রি হাসে, চিন্তা করে কী করব মঞ্জু? চলো, এই শ্রাবণে সুনুর বিয়ে হয়ে গেলে, সামনের অগ্রহায়ণে আমাদেরটা সেরে ফেলি। বড্ড পুরনো হয়ে যাচ্ছি।

আমি সায় দিয়ে মাথা নাড়ি।

## ।। সোমসুন্দর ।।

তখনও রাস্তার জামা-কাপড় খুলিনি, উপুড় হয়ে বাবার মুখ দেখলাম। নিভন্ত মুখ। মুখখানা লাল। চোখ বোজা।

মা বলে, কী যে ঝড় গেল!

বাবার বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। অসাড়। চোখ চেয়ে আমাকে একবার দেখলেন। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

সত্য কোথায়?

চুপ করে থাকি। বাবা চেয়ে থাকেন। চোখের জল গড়িয়ে নামে।

তোমরা আমাদের কিছু দিলে না। নো পিস। তোমাদের জেনারেশনের কিছু দেওয়ার নেই?

আমি ঝুঁকে বলি, কী দেব বাবা?

বাবা ডান হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরেন, আর কিছু না হোক, অন্তত কাছে থাকো। দূরে যেয়ো না। চলে যেয়ো না। বড় একা লাগে।

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কুমুদবন্ধু রায়ের ছেলে কদমসুন্দর শুয়ে আছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে দেখছে একটা দূর নৌকোর মাস্তুল ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। সামনে এক মহাপৃথিবী।

কিন্তু নীতু আসবে। আসবেই। তাই বাবাকে কাছে থাকব বলে কথা দিতে পারি না।

ঠিক আগের মতোই আড্ডা বসে গাছের নীচে, চত্বরে। সেখান থেকে উঠে যাই আশুর বাসায় দাবা খেলতে। পারুল ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, এলেন না তো! কী সুন্দর মাংসটা রেঁধেছিলাম। আশু নতুন চালে মাত করে আমাকে। রাত বাড়ে। মালার ঘরের তলা দিয়ে বাসায় ফিরি। কৃষ্ণচূড়া গাছটায় আজও পাতা আসেনি। কিন্তু মালার ঘরের পরদা হাওয়ায় উড়লে একটা সবুজ আলো এসে পড়ে শুকনো গাছটার গায়ে। গাছটা সবুজ বলে ভ্রম হয়। ছোড়দা ঠিক পড়ে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত। বারান্দায় স্থির হয়ে ঝুলে থাকে বালির বস্তাটা। পিস্তলে আজও গুলি ভরা হয়নি। রাতে বাতি জ্বেলে চেয়ে থাকি। তার সৌন্দর্য দেখি।

নীতু আবার আসবে।

সকালে বউদি আসে। অদ্রির গাড়ি থামে। ওরা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে। কোনও হইচই হয় না।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই ওদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। বউদিকে চেনাই যায় না। এত রোগা হয়ে গেছে। কপালে আর সিঁথিতে ডগডগ করছে সিঁদুর। এত সিঁদুর বউদি কখনও পরত না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বউদির ঠোঁট কাঁপল।

নেনটু, বাবা?

ভাল আছেন। ঘরে যাও।

মিনু কোলে আসতে লজ্জা পায়।

চিনতে পারিস মিনু? বল তো আমি কে?

মিনু মুখ লুকিয়ে বলে, ছোট কাকা তো।

বুবলা অবাক চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সে এ-বাড়িতে কখনও আসেনি। কোলে নিই। সে আমাকে চিনতে পারে না। কেঁদে ওঠে।

অদ্রির দিকে তাকাতেই হঠাৎ মঞ্জুর কথা মনে পড়ে। মঞ্জু বড় সুন্দর। না, আমি মঞ্জুর কথা অদ্রিকে বলব না।

অদ্রি ম্লান হাসে, নেনটু রোগা হয়ে গেছ।

তুমিও।

দু'-একটা কথা হয়।

বিকেলেই নীতু আসে।

নেনটু, কাল খুব ভোরে ট্রেন, শিয়ালদা থেকে। আমি ভোরে আসব।

এবার কোথায়?

বলব। গাড়িতে।

হাসে। সুন্দর দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে। রোদে পুড়ে গেছে ওর মুখ। চোখের চারদিকে কালি। তবু হাসিটা এখনও অমলিন।

মাথা নাড়ি।

অনেক রাত পর্যন্ত বউদির সঙ্গে গল্প হয়। মিনু আর বুবলা ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোড়দা পড়ছে। আমরা বারান্দায় বসে থাকি। রাতের দিকে একটু শিরশিরে বাতাস দেয়। মশা ওড়াওড়ি করে।

বউদি ডাকে, নেনটু ভাই।

উঁ।

আমার কী হবে বলো তো?

কী হবে?

তোমার দাদা যদি না-ই ফেরে, বড় ঠাকুরপো যদি আলাদা হয়েই যায়, তবে কোথায় যাব? ওই দুটো বাচ্চা। ওদের মানুষ হতে কত দেরি! নেনটু ভাই, কী হবে বলো তো।

চুপ করে থাকি।

বউদি আস্তে আস্তে বলে, যখন বিয়ে হয়ে এ-বাড়িতে এলাম তখন তোমরা কত পর ছিলে। কিন্তু পাঁচ বছরে একটু একটু করে কখন এ-বাড়ি আমার আপন হয়ে গেছে। যদি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়—

বউদি কাঁদে।

ধমক দিই, কাঁদছো কেন?

বউদি মুখ তুলে বলে, আমাকে কখনও তাড়িয়ে দিয়ো না—দেখো—

ভোরবেলা নীতু এসে ডাকে। তখনও সবাই ঘুমে।

পোশাক পরে, ব্যাগ কাঁধে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাই। সদর খুলে রাস্তায় পড়ি।

খুব ভোর। আলো ফোটেনি। কুয়াশার মতো একটা ভাপ চারদিকে। আবছা কলকাতার আকাশ-রেখায় একটা তারা জ্বলে। আমরা নিঃশব্দে রাস্তা পার হই। একটু হাঁটতে থাকি। নীতু সিগারেট জ্বালিয়ে নেয়। আগে আগে হাঁটে। মুখ ফিরিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি হাঁটো নেনটু। দেরি হয়ে যাবে।

আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না। ঘাসে শিশির পড়েছে। ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়। কত লোক এখনও ঘুমে। পৃথিবী কী শান্ত! নিরালা। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে, ফিরে গিয়ে আর-একটু ঘুমোই। বেলা হলে উঠব। চা খাব। খবরের কাগজ পড়ব। মিনু এসে পিঠে ঝুলবে। বুবলা মুড়ির বাটি নিয়ে বসবে বারান্দায়—দেখব। ওর মুখটা বড়দার মতো হয়েছে। এরকম কত কী করার কথা মনে পড়ে! যেতে ইচ্ছে করে না। কেন তোমার সঙ্গে যাব নীতু? কেন যাব? বাবুকে খতম করেছ বলে? আমার হাতে একটি মহার্ঘ পিস্তল দিয়েছ বলে? দেখো, পিস্তলে আজও আমি কার্তুজ ভরিনি।

আমি ধীরে পিস্তলটা টেনে বের করি। নীতু আগে আগে হাঁটছে। এক ঝলক সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসে। আমি পিস্তলটা তুলি। চলন্ত নীতুর মাথার দিকে লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করি। কেন নীতু, তুমি শক্তিমানের মতো এসে দাঁড়াও, আর আমি মাথা নুইয়ে তোমার পিছনে পিছনে চলে যাই? কী আছে তোমার? কী করে মানুষকে জাদু করো তুমি? হারু তার জ্যাঠামশাইয়ের গম্ভীর ডাক শুনতে পায় না আর। মানুষের কাছ থেকে তুমি কেড়ে নাও সব—তার সর্বস্ব। ছেলেরা সম্মোহিত হয়ে যায়। জপুর, হাঁসখালিতে খুন হতে থাকে, কলকাতায় লাশ পড়ে। বন্দুকের শব্দে পাখিরা বাংলাদেশ ছেড়ে উড়ে যায়। কে তোমার কবিতা কেড়ে নেয়? কেড়ে নেয় বাঁচবার সাধ? তুমি কে? আমি যাব কেন নীতু? আমি যাচ্ছি কেন? কে তোমাকে এমন শক্তিমান করেছে?

পিস্তলটা ওর মাথায় স্থির থাকে না। নলের মাছিটা অবিকল আসল মাছির মতো ওর মাথা থেকে উড়ে উড়ে বসে। স্থির হয় না। স্থির থাকে না। নীতু মুখ ঘোরায়। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। চিৎকার করে বলে, নেনটু কী করছ?

আমি বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। কী করছি তা বুঝতে পারি না। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারি না যে পিস্তলটা ফাঁকা। ওতে কার্তুজ নেই। ভরা হয়নি।

রাসকেল। বলে বুকফাটা চিৎকার করে নীতু অন্ধের মতো তেড়ে আসে। বাধা দিই না। নীতু এক ঝটকায় পিস্তলটা কেড়ে নেয়।

আমি আস্তে আস্তে বলি, গুলি ছিল না।

নীতু পিস্তল তুলে দেখে। তারপর আমার দিকে চায়। ওর চোখে গভীর ক্লান্তি আর অনিদ্রার একটা গাঢ় কালো ছোপ পড়েছে। সেই কালোর ভিতরে ওর চোখদুটো গগলস পরা মানুষের চোখের মতো রহস্যময় দেখায়। বুঝতে পারি ওর সন্দেহ এসে গেছে। অবিশ্বাস ভয়।

ও হাঁফ-ধরা গলায় বলে, গুলি ছিল না তো এটা দিয়ে কী করছিলে?

আমি আস্তে বলি, গুলি থাকলেই আমি কী করতাম?

ও ভয়ংকর চোখে আমার দিকে চায়। কিন্তু আমি ভয় পাই না। চেয়ে থাকি। ও বলে, নেনটু, আমাকে নিয়ে খেলা কোরো না।

হঠাৎ অনেকদিন বাদে আমার শরীর জ্বালা করে ওঠে। শরীরে রোমকূপ শুঁয়োপোকার মতো কাঁটা দেয়। দীর্ঘ ছিপ নৌকোয় বসে থাকা এক দীর্ঘকায় শীর্ণ প্রেতচক্ষু মানুষটিকে মনশ্চক্ষে দেখি। কোন অতীত থেকে স্যান্ড ব্যাগে ঘুষির মতো শব্দ ভেসে আসতে থাকে। রিংয়ের ওপরে ঝোলানো

আলোগুলো জ্বলে যায়। প্রতিপক্ষ মাথা নিচু করে, গ্লাভসের আড়ালে দুই ক্রূর চোখে চেয়ে এগিয়ে আসে।

নীতুর মুখ ঘেন্নায় বেঁকে যায়। জাদুকর যেমন সম্মোহনের আঙুল নাড়ে, তেমনি আঙুল নেড়ে সে চাপা গলায় বলে, কী করছিলে? ওয়াজ দ্যাট এ রিহার্সাল?

বুঝতে পারি, আর নীতু বিশ্বাস করবে না। ও স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, আমি ভয় পাচ্ছি না। আমার ওপর থেকে ওর সম্মোহন কেটে গেছে। ও তাই এগিয়ে আসে। ভুলে যায়, আমি জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য মনোনীত মুষ্টিযোদ্ধা ছিলাম।

খুব ক্লান্ত লাগে। তবু এক পা বাড়িয়ে আমি বাঁ হাতে ঘুষিটা মারি। চকিতে। নীতুর ছবিটা ভেঙে পড়ে যায়। আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে ওর স্ট্যাচু। ঘুরে ছুটতে থাকি।

শিস দিয়ে ছুটে আসে নীতুর সীসে। পড়ে যাই। কোথায় লাগে ঠিক বুঝতে পারি না। আবার উঠি। ছুটতে থাকি। আর গুলির শব্দ হয় না।

একটু ডেটল লাগিয়ে দিই ঊরুতে। ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে নিই। ব্যাস, মিটে যায়। বেরোবার সময়ে একবার পাড়ার ডাক্তারের কাছে যাব।

বারান্দায় বসে চা খাই। খবরের কাগজ পড়ি। মিনু এসে পিঠে ঝুল খায়। অদূরে মুড়ির বাটি নিয়ে বসে বুবলা কাক-শালিক-পায়রা দেখে ডাকে। আমি চেয়ে থাকি। অনেকদিন বাদে বাড়িটা ভর-ভরন্ত লাগে।

ছোড়দা অফিসে বেরোনোর আগে গিয়ে বলি, মাংস আনব। টাকা দিবি?

ছোড়দা একটু তাকিয়ে থেকে আবার মোজা পরতে নিচু হয়ে বলে, টেবিলের টানায় আছে। নিয়ে নিস। আগে একদিন চেয়েছিলি, নিসনি তো। এসে দেখি, টাকা রয়ে গেছে।

উত্তর দিই না। একটু হাসি। ড্রয়ার থেকে দশটা টাকা বের করে ছোড়দার দিকে তাকাই। ও শার্ট গুঁজছে প্যান্টে। একটা চুলের ঘুরলি এসে দুলছে কপালে। বড় সুন্দর দেখায় ওকে।

## ॥ মঞ্জু ॥

সুনুকে সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। সারা বিকেল ওকে সাজিয়েছি। যত্নে, একটু একটু করে। ধমকে বলেছি, খবরদার, কাঁদবি না। চোখের জলে সব ধুয়ে যাবে।

ও কাঁদেনি। সেজেছে।

ক'দিন ধরে ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছে। একটু থামে, আবার আকাশ কালো করে আসে। রেলিং থেকে ঝুঁকে দেখি, রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। আজ বৃষ্টিটা বড্ড বেশি। খরার শোধ তুলে নিচ্ছে। বর আসবে দমদম থেকে। আসতে পারবে তো? যা জল! আমাদের দুটো গাড়ি গেছে, আর গেছে অদ্রির গাড়ি। নিয়ে আসবে ঠিক। ছাদ থেকে মাংসের গন্ধ আসছে। মাইক্রোফোনে বিসমিল্লার সানাইয়ের রেকর্ড শেষ হয়ে এল। বৃষ্টির ছাঁট উড়ে এসে গুঁড়ো গুঁড়ো মুখে লাগে, চুলে লাগে। একটু দাঁড়িয়ে থাকি। আমার এখনও সাজ হয়নি। যাই।

সানাইয়ের আর-একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিই। রাণু ডেকে বলে, মঞ্জু যা বৃষ্টি, কেউ আসতে পারবে না দেখিস।

আসবে ঠিক।

নেনটুকে গয়না আনতে পাঠিয়েছি। সেও তো এখনও এল না। স্যাঁকরাটা কী যে করছে! সব সময়ে শেষ মুহূর্তে দেবে।

রাণু, তুই এখনও সাজিসনি?

সাজব, ছেলেটাকে খাওয়ালাম।

যা একটু সেজে নে।

কী পরব বল তো!

আয় না, তোকেও সাজিয়ে দিই।

রাণু হাসে। বলে, দূর মুখপুড়ি, তুই তো আগুনে সাজ সাজাস। আমার কি ও-সব মানায়, সুনুর বিয়ে—কতকাল পর একটা অনুষ্ঠান—তাই সাজব। কিন্তু সে একটুখানি। তুই একটু যা, সেজে আয়। নেনটুটা এখনও এল না।

কী গড়াতে দিয়েছিস?

বেশি কিছু না। একজোড়া ঝুমকো। নিজেরই পুরনো গয়না ভেঙে... একটু থামে রাণু, অন্যমনস্কভাবে বলে, যদি দিন ফেরে তো সুনুকে আবার দেব। একটা নেকলেস দেওয়ার কথা ছিল...

সাজতে আমার আজ ভাল লাগছিল না। একটা লাল রঙের সেট বের করে রেখেছিলাম। সেটা আবার ওয়ার্ডরোবে তুলে রাখি। ক্রিমরঙা একখানা শাড়ি পরে নিই। অল্প একটু স্নো-পাউডার, একটু কাজলের ছোঁয়া। ব্যাস, সাজ হয়ে যায়।

সানাই থেমে গেল। বর এসেছে কি?

উলুর শব্দ। শঙ্খ বাজছে। এসে গেল ওরা।

সাত পাক হয়ে গেল। বরকনে ছাদে চাঁদোয়ার নীচে বসে গেছে। মন্ত্র পড়াচ্ছে পুরুত। সেই ভিড়ে উঁকি দিয়ে একবার সুনুর মুখখানা দেখি। না, কিছু বোঝা যায় না। মুখের সাদা ভাবটা ঢাকা পড়েছে। কোনও ছাপ নেই। প্রথম পুরুষস্পর্শের লজ্জা ওর কুমারীর মতো মুখখানা নুইয়ে রেখেছে। না, কিছু বোঝা যায় না। একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলি। বরটা একটু রোগা হল কি সুনুর? একটু কালো? তা হোক। মুখখানায় কোনও কুটিলতা নেই। চোখ সরল। একটু লাজুক ভাব। ওরা মিলেমিশ যাবে—মনে হয়।

ভিড় থেকে রাণু হাত ধরে টেনে আনল, এ কী সাজ করেছিস মুখপুড়ি?

আজ সাজতে ভাল লাগছিল না।

কেন রে?

এমনিই। রাণু, তোর বর ফিরে এলে তোদের আবার বিয়ে দেব। তোর বরকে বলব—বিয়েটা ঠিকমতো করেননি মশাই, মন্ত্র ভুল পড়েছিলেন, তাই এত ঝামেলা। তোর বরের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব আবার, সেদিন সাজব।

দিস। বলে রাণু হাসে। তারপরই চোখ ছলছল করতে থাকে। বলে, যদি সত্যিই ফেরে তবে তোকে একটা নেকলেস দেব মঞ্জু।

দিস।

রাণু হঠাৎ হাসতে থাকে, কত লোককে কত কী দেব বলে ঠিক করে রেখেছি, কত মানসিক! ডাবের জল আর দুধ দিয়ে সধবার মুখ ধোয়াব, কুমারী ভোজন করাব... কত কী।

রাণুর কাছ থেকে চলে আসি। ভিড়ের মধ্যে একবার অদ্রির সঙ্গে চোখাচোখি হয়। লক্ষ্ণৌ চিকন-এর কাজ করা পাঞ্জাবি পরেছেন বাবু, ফিনফিনে ধুতি। মারাত্মক দেখাচ্ছে। একবার চোখ নাচায়। পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে বলি, মেয়ে-মহলে বেশি ঘুরো না, বঁড়শি আটকাবে।

ও হাসে। হাত ধরবার চেষ্টা করে। পিছলে যাই।

কী হল?

অগ্রহায়ণে।

ও হাসে, খুব ব্যস্ত?

একটু। রিহার্সাল দিচ্ছি।

সিঁড়ির মাথা থেকে সদরটা দেখা যায়। সদরের ওপাশে ফুটপাথ বৃষ্টিতে সাদা হয়ে যাচ্ছে। কলকল করে ছুটছে জল। সেই জলে কালো কালো আবছা কয়েকজন ভিখিরি কোলকুঁজো হয়ে বসে আছে। বাতাসে ম্যারাপের বাঁশ মড়মড় শব্দ করে। ফটাস করে আলগা ত্রিপলের শব্দ হয়। বিসমিল্লার সানাই শেষ হয়ে আসে। আবার শুরু হয়। সদর পার হয়ে কালো লম্বা একজন লোক উঠে আসছে। গায়ের

বর্ষাতি খুলতে খুলতে সিঁড়িতে পা দিল। তার মাথা ভিজে গেছে, জামা ভেজা, প্যান্টেও ছোপ ছোপ জলের দাগ। মুখটা অন্যমনস্ক। সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে ওঠে।

পানের রেকাবটা একটা চলন্ত মেয়ের হাতে দিয়ে দিই। সিঁড়ির মুখটাতে দাঁড়াই। দেখা হয়।

ভিজে গেছেন।

ও কিছু না।

দাঁড়ান, একটা তোয়ালে আনি। বর্ষাতিটা আমার হাতে দিন।

ও চোখে চোখ রাখে না। লজ্জা পায় বোধহয়। বর্ষাতিটা দিয়ে মৃদুস্বরে বলে, বউদিকে একবার ডেকে দেবেন?

দিই। আগে মাথাটা মুছে নিন। মাথায় জল বসা ভাল না। আসুন।

আমার পিছু পিছু বাধ্য ছেলের মতো আসে। আমার বুক কাঁপতে থাকে।

ভিতর-বাড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে ও মাথা মোছে। গা মুছে নেয়। চিরুনি এনে দিই। চুল একটু পাট করে। মুখটা অনেক রুক্ষ হয়ে গেছে। রোদে পোড়া চামড়া। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। চিরুনিটা ফিরিয়ে দিয়ে একটু ইতস্তত করে। কী একটা বলবে-বলবে করে। বলে না।

মুখ টিপে হাসি। বলি, রোগা হয়ে গেছেন কেন?

ও এমনিই।

আর কিছু বলে না। আমিও বলি না। দু'জনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতার বলয় তৈরি হয়। মানুষে মানুষে কত রকমের সম্পর্ক তৈরি হয়। ভালবাসার, ঘেন্নার, প্রতিশোধের। এ-সবের বাইরেও বোধহয় আর-এক রকমের সম্পর্ক আছে। সেটা কেমন তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু আছে। আমি টের পাই।

কেউ কোনও কথা বলি না। এক ভিড় মানুষ কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে, আসছে। তার মধ্যেই কয়েক মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে আমি সম্পর্কটা অনুভব করি। অন্যমনে মুখ টিপে হাসি। নেনটু একপলক আমার মুখ দেখে। চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর মৃদু হাসে।

বলি, দাঁড়ান, রাণুকে ডেকে দিচ্ছি।

সেই রাণুর বিয়ের দিনের মতো অদ্রি মাংসের বালতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। নেনটুর পাতের কাছে এসে দাঁড়াল। দু'জনে চোখাচোখি। দু'জনেই হাসে। বন্ধুত্বের হাসি।

বেশি দিয়ো না অদ্রি। আমি মাংস ভালবাসি না।

আরে খাও, না খেলে ছাড়ব নাকি?

নেনটু হাসে, পাতে পড়ে থাকবে। লোকসান।

হোক।

আমি ছাদ থেকে নেমে আসতে থাকি।

## ॥ সোমসুন্দর ॥

বৃষ্টিটা ধরল না। পড়ছে তো পড়ছেই।

আমি বর্ষাতি গায়ে রাস্তায় নামি। চটিসুদ্ধ গোড়ালি জলে ছপ করে ডুবে যায়। বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষাতির গায়ে ডুগডুগির মতো বাজতে থাকে। অদ্রি গাড়ি করে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। এখন তো বৃষ্টি প্রায়ই হবে। একদিন গাড়িতে গিয়ে লাভ কী? বৃষ্টি হবে, ঝড় হবে, খরার সূর্য পোড়াবে চারদিক। আমাকে তো তবু বেরোতে হবেই।

বৃষ্টি মনের আনন্দে পড়ছে তো পড়ছেই। জলে মাটিতে গভীর ভালবাসার শব্দ হয়।

একটা অন্ধকার শো-কেসের পাশে লম্বা একজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে! চমকে উঠি। নীতু না?

না, নীতু নয়। আমি আবার হাঁটি। আপনমনে হাসি। ভয় কী নেনটু? এ তো জানা কথা যে, হয়তো আবার পুলিশ আসবে। বারবার সার্চ করবে বাড়ি। তোমাকে নিয়ে যাবে হয়তো-বা। বাবু নেই, দিলীপ

রয়েছে। তার দলবল ঘুরছে কলকাতায়। নীতুর গুলি ফসকেছে, কিন্তু সেও আসবে। চারদিকে কোথাও তোমার জন্য কোনও নিরাপদ জায়গা নেই। খোলা রাস্তায় তোমাকে বেরোতে হবেই। তাতে ভয় কী নেনটু? এ-সব তো ঘটেই। এরকম তো হয়।

হয়। জীবন এরকমও হয়। আবার অন্য রকমও হয়। নানা রকমের। আমি আমারটা যাপন করছি। ভয় কী?

চারদিকে বৃষ্টির ঘেরাটোপ। বোধহয় রাত বারোটা বেজে গেছে। লোকজন নেই। গাড়ি নেই। জলে কলকাতার প্রতিবিম্ব ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা হয়ে আসে মাটি। আমার শীত করে। বর্ষাতিটার সব বোতাম নেই। ভিজে যাচ্ছে গা। হু-হু হাওয়া দিচ্ছে। তবু হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে তো হবেই।

# বাসস্টপে কেউ নেই

ঘুমচোখে নিজের ঘর থেকে বেরোবার মুখে পাশের ঘরের পর্দাটা সাবধানে সরিয়ে রবি তার বাবাকে দেখতে পায়। খোলা স্টেটসম্যানের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে, আর সামনে একটা ক্ষুদে টেবিলের ওপর এক জোড়া পা, পায়ের পাশে একটা গরম কফির কাপ। ওই স্টেটসম্যান, পা আর কফির কাপ— ওই তার বাবা। রবি প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলভারটা বের করে আনল। সেটা তুলল, এক চোখ ছোট করে লক্ষ্যস্থির করল। তারপর টিপল ট্রিগার।

ঠিসুং...ঠিসুং...ঠিসুং...তিনটে বুলেট ছুটে গেল চোখের নিমেষে। স্টেটসম্যানটা খসে পড়ে যায় প্রথমে, দামি স্প্রিংয়ের ওপর দুর্ধর্ষ নরম ফোম রবারের গদির ওপর ঢলে পড়ে যায় বাবা, গদির ওপর দুলতে থাকে শরীর। বাবা চমৎকার একটা মৃত্যু চিৎকার দেয়— আঃ আ আ আ...

রবি হাসে একটু। রিভলভারটা আবার পকেটে ভরে দু' পা এগোয়, তার বাবা দেবাশিস শুয়ে থেকেই তার দিকে চেয়ে বলে, শট্! শট!

রবির ঘুমমাখা কচি মুখে চাপা রহস্যময় হাসি। বলে, নাইস অব ইউ টেলিং দ্যাট।

দেবাশিস উঠে বসে। জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠোঁটে নেয়। স্টেটসম্যানটা দিয়ে মুখ ঢাকার আগে বলে, প্রসিড টুওয়ার্ডস দা বাথরুম ম্যান।

ইয়া। বলে রবি হাই তোলে। ডাকে— দিদি!

অমনি অন্য পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে আধবুড়ি ঝি চাঁপার হাসিমুখ উঁকি দেয়— সোনা।

দুহাত বাড়িয়ে রবি ঘুমন্ত গলায় বলে, কোল।

চাঁপা তাকে কোলে নেয়। এই সকালের প্রথম বাথরুমে যাওয়াটা বড় অপছন্দ রবির। একটু সময় সে দিদির কোলে উঠে থাকে রোজ সকালে। কাঁধে মাথা রেখে হাই তোলে।

চাঁপা কানে কানে বলে, আজ রবিবার।

হুঁ।

ছুটি।

ইঁয়া।

সোনাবাবু আজ কোথায় কোথায় যাবে বাবার সঙ্গে?

কচি মুখখানা একরকম সুস্বাদু হাসিতে ভরে যায় রবির। প্রকাণ্ড শার্সিওলা চওড়া জানালার কাছে এসে চাঁপা পর্দা সরিয়ে দেয়। সাত তলার ওপর থেকে বিশাল কলকাতার দৃশ্য ছবির মতো জেগে ওঠে। নীচে একটা মস্ত পার্ক। পার্কের মাঝখানে পুকুর। চারধারে বাঁধানো রাস্তায় লোকজন হাঁটছে।

ও ঘরে টেলিফোন বাজে, রিসিভার তুলে নেওয়ার 'কিট' শব্দ হয়। তারপর দেবাশিসের স্বর— হ্যালো।

রবি বলে, ফোন।

চাঁপা বলে, হুঁ।

কার ফোন বলো তো?

বাবার বন্ধু কেউ!

না, মণিমার। রবি বলে।

চাঁপার মুখখানা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, এবার চলো, মুখখানা ধুয়ে নেবে।

রবি হাই তোলে, বলে, কাল রাতের গল্পটা শেষ করোনি।

চাঁপা হাসে— বলব। দাঁত মাজতে মাজতে।

ও ঘর থেকে দেবাশিসের হাসির শব্দ আসে। বলে, আজই? ...হুঁ...হুঁ...না, না, রবিবার শুধু রবির দিন। এ দিনটা ওর সঙ্গে কাটাই।...আচ্ছা...

রবি উৎকর্ণ হয়ে শোনে। বলে, ঠিক মণিমা।

এখন চলো তো। চাঁপা বলে।

বাথরুমে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে হাই তোলে রবি। চাঁপা তার ছোট্ট ব্রাশে পেস্ট লাগাতে যাচ্ছিল, রবি রাগের স্বরে বলে, না, না পেস্ট না!

তবে কী দিয়ে মাজবে?

তোমার কালো মাজনটা দিয়ে।

ও তো ঝাল মাজন! পেস্ট মিষ্টি।

না, পেস্ট বিচ্ছিরি। ফেনা হলে আমার বমি পায়।

বাবা যদি টের পায় আমার মাজন দিয়ে মেজেছ তা হলে রাগ করবে কিন্তু।

টের পাবে কী করে! চুপ চুপ করে মেজে দাও। আঙুল দিয়ে কিন্তু। ব্রাশ বিচ্ছিরি।

চাঁপার বুড়ো মুখখানা মায়ার হাসিতে ভরে ওঠে। সে রান্নাঘর থেকে তার সস্তা কালো মাজনের শিশি নিয়ে এসে দাঁত মেজে দিতে থাকে।

রবি ভ্রূ কুঁচকে বলে, গল্পটা বলবে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর...কতটা যেন বলেছিলাম সোনাবাবু?

তোমার কিছু মনে থাকে না। শিবুচরণ রাত্তির বেলা একা মাছ ধরতে গিয়েছিল নৌকোয়। জাল টেনে তুলতেই দেখে মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ।

হ্যাঁ হ্যাঁ লালটেমের আলোয় জাল খুলতেই মাছের সঙ্গে একটা কেউটে সাপ বেরিয়ে এল। ছোট্ট নৌকো, চার হাত খানেক হবে। তার এধারে শিবুচরণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে লালটেম জ্বলছে, ওধারে ফণা তুলে কালকেউটে। আর খোলের মধ্যে জ্যান্ত মাছগুলো তখনও দাপাচ্ছে। চারধারে কালিঢালা অন্ধকার নিশুত নিঃঝুম। মাঝগাঙে শিবুচরণের সে কী বিপদ! নড়তে চড়তে পারে না, ভয় বুদ্ধিভ্রংশ হাতে পায়ে সাড় নেই।

রবি প্রথম কুলকুচোটা সেরে নিয়েই বলে, জলে ঝাঁপ দিল না কেন?

চাঁপা একটু থতিয়ে গিয়ে বড় বড় চোখ করে চায়— ঠিক তো সোনাবাবু! কী বুদ্ধি বাবা তোমার ওইটুকুন মাথায়! উঃ!

বলে চাঁপা রবির মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে কোলে তুলে নেয়। মাথাটা কাঁধে চেপে রেখে বলে, সোনাবাবুর মাথার মধ্যে বুদ্ধির বাসা। এমনটি আর দেখিনি।

রবি মুখ টিপে অহংকারের হাসি হেসে মুখ লুকিয়ে বলে, উঃ তারপর বলো না!

হ্যাঁ, তা শিবুচরণেব হাতে পায়ে তো খিল ধরে গেছে তখন। কাঁপুনি উঠছে। ভাবছে এই মলুম, এই গেলুম আর বাপভাই ছানাপোনার মুখগুলো দেখতে পাব না। কালসাপে খেলে আমাকে গো! কে কোথায় আছ মানুষজন, এসে পরাণটা রাখো। কিন্তু কোথায় কে! শীতের মাঝরাতে মাঝগাঙে জনমনিষ্যি নেই। শিবুচরণ বুঝল যে মানুষজনকে ডাকা বৃথা। কেউ তার ডাক শুনতে পাবে না। তখন ভয়ের চোটে শিবু রামনাম করতে থাকে, কিন্তু সাপটা নড়ে না। শিবুর মনে হল, তাই তো রামনাম তো ভূতের মন্ত্র। তখন সে মা মনসাকে ডাকতে থাকল। তাতে যেন আরও জো পেয়ে সাপটা এধার ওধার গোটা-দুই ছোবল মারল। লালটেমটা মাঝখানে থাকতে রক্ষে! কিন্তু সে আর কতক্ষণ। শিবু বুঝে গেল মা মনসা কুপিত আছেন কোনও কারণে তার ওপর। ডেকে কাজ হবে না হিতে বিপরীত হয় যদি! তখন শিবুচরণ মনে করল গাঁয়ের পুরুতমশাই বলেন বটে বাপ পিতেমোর আত্মা...সোনাবাবু বোসো।

চাঁপা ডাইনিং রুমে এনে চেয়ার টেবিলে বসায় রবিকে। রবি বিরক্ত হয়ে চাঁপাকে আঁকড়ে ধরে বলেউঃ! তুমি আগে বোসো, আমি তোমার কোলে বসব।

চাঁপা চারধারে চেয়ে কানে কানে বলেআমি কি চেয়ারে বসতে পারি? বাবা দেখলে যে রাগ করবে!

একটুও রাগ করবে না। উঃ বোসো! কথা শোনো না কেন?

বসছি বসছি। বলে চাঁপা তাকে কোলে নিয়ে বসে। প্লেটে সেঁকা রুটি মাখন, দুধের গেলাস রেখে যায় প্রীতম চাকর। রেখে সে বলে, রবিবাবু, কাল যখন সন্ধেবেলা আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন কে আমার কানে জল ঢেলে পালিয়ে গেল শুনি!

তুই ঘুমোস কেন সন্ধেবেলা? বাবা রাগ করে না?

ও ঘুম নয়। চোখ বুজে তোমার জন্য একটা গল্প ভাবছিলাম আর তুমি জল ঢেলে পালিয়ে গেলে। কানের মধ্যে এখনও জলটা ফচ ফচ করছে। আজ বাবাকে যদি বলে না দিই!

পকেট থেকে গম্ভীর ভাবে রিভলভারটা বের করে রবি তুলেই ট্রিগার টেপে।

ঠিসুং...ঠিসুং...ঠিসুং...আঃ আ আ, বলে প্রীতম টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুধের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রবি বলে, তারপর বলো।

চাঁপা অসহায় ভাবে বলে, কী যেন বলছিলাম!

বড্ড ভুলে যাও তুমি।

বুড়ো হচ্ছি না!

বুড়ো হলে কি ভুলে যেতে হয়?

চাঁপা তার গালে গালটা ছুঁইয়েই সরিয়ে নেয় মুখ, বলে, বুড়ো পুরুতমশাই বলেন বাপপিতেমোর আত্মারা সব সময়ে আমাদের নাকি চোখে চোখে রাখেন। এমনিতে কিছু করতে পারেন না, কিন্তু প্রাণ ভরে ডাকলে তারা এসে আপদ বিপদের আসান করে দিয়ে যান। শিবুচরণ তখন ডাকতে থাকে— ও মোর বাপপিতেমো, তোমরা কে কোথায় আছ, দ্যাখোসে তোমাদের আদরের শিবের দশাখানা। নিশুত রাতে কে বা জানবে শিবেকে দংশেছে নিঘিন্নে জীব, কে ডাকবে ওঝা-বদ্যি, শিবে যে যায়...এইসব বিড়বিড় করে বলছে যখন, তখনই সাপটা হঠাৎ ঠিক মানুষের গলায় বলে, ওহে শিবুচরণ—

ও-ঘর থেকে পর্দাটা সরিয়ে দরজায় দাঁড়ায় দেবাশিস। একটু ভারী গলায় বলে, হারি আপ, হারি আপ—

গী— মুখ ফিরিয়ে হাসে রবি। চাঁপা জড়োসড়ো হয়ে উঠে দাঁড়ায়, কোলে রবি!

দৃশ্যটা দেখে একটু হাসে দেবাশিস, পর্দাটা ফেলে দেয়। ও ঘর থেকে তার গলা পাওয়া যায়— ড্রেস আপ ম্যান, ড্রেস আপ।

ইঁয়া। উত্তর দেয় রবি, তারপর দুটো টেস্ট দু' কামড় করে খেয়ে ফেলে দিয়ে বলে, দিদি, তাড়াতাড়ি করো।

কিছু খেলে না সোনাবাবু!

আঃ খেতে ইচ্ছে করছে না যে।

দুধটুকু তবে দু' চুমুক, দাদা আমার!

ইস্ কী যে যন্ত্রণা করো না!

বলে রবি ঢকঢক করে দুধটা খায়। হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে ডাকে— দিদি, তাড়াতাড়ি।

দেবাশিস ভিতরদিকের দরজা ভেজিয়ে দিল সাবধানে। রবি ও ঘরে পোশাক করছে। ঘড়িতে আটটা বাজে। তৃণা এখন নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে। ও একটু দেরিতে ওঠে। ওদের বাড়ির এখনকার দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখে নিল দেবাশিস। তৃণার বর শচীন এখন বাগানে। এমন ফুল-পাগল, গাছ-উন্মাদ লোক কদাচিৎ দেখা যায়। কেবল মাত্র ওই গাছের জন্য ফুলের জন্য হাজরা রোডের সাতকাঠার মতো জমি সোনার দাম পেয়েও বেচবে না। ওই সাতকাঠার কোনও দরকারই হয় না ওদের, বাড়ির চারধারে বিস্তর জমি। বাড়ি ছাড়িয়ে রাস্তা, রাস্তার ও পাশে ওই ফালতু জমিটায় তার বাগান। এতক্ষণে সেখানে গাছপালার মধ্যে জমে গেছে শচীন। তৃণার এক ছেলে, এক মেয়ে, মনু আর রেবা। মনু টেনিস শিখতে যায় রবিবারে, রেবার নাচগানের ক্লাশ থাকে। আটটা থেকে সোয়া আটটার মধ্যে তৃণার চারধারে চাকর-বাকর ছাড়া কেউ বড় একটা থাকে না। অবশ্য থাকলেও ক্ষতি নেই। সবাই জানে, দেবাশিস আর তৃণার মধ্যে একটা প্লাস চিহ্ন আছে। এমন কী দেবাশিসের বউ চন্দনা আত্মহত্যা করেছিল না খুন

হয়েছিল এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ কাটেনি এখনও। পুলিশ অবশ্য কেস দিয়েছিল কোর্টে খুনের দায়ে দেবাশিসকে জড়িয়ে, তবে দুর্বল কেসটা টেকেনি। কিন্তু জনগণের মধ্যে এখনও সম্ভবত দেবাশিস আসামি।

ডায়াল করার পর নির্ভুল রিং-এর শব্দ হতে থাকে আর দেবাশিসের একটা দুটো হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায়। শ্বাসের কেমন একটা কষ্ট হতে থাকে।

হেল্লো। তৃণা বলে।

দেব।

বুঝেছি।

কথা বলার অসুবিধে নেই তো!

একটু আছে।

ঘরে কেউ আছে নাকি?

হুঁ।

তা হলে দশ মিনিট পরে ফোন করব।

তৃণা একটু হাসে। বলে, না না, ভয় নেই এসময়ে কেউ থাকে নাকি! একে রোববার, তার ওপর বাদলা ছেড়ে কেমন শরতের রোদ উঠেছে। কেবল আমিই পড়ে আছি একা, কেউ নেই।

কী করছিলে?

টেলিফোনটা পাশে নিয়ে বসে ছিলাম, হাতে খোলা জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির; কিন্তু একটা কবিতাও পড়া হচ্ছিল না।

দেবাশিস গলাটা সাফ করে নিয়ে বলে, কী করবে আজ?

কী আর! বসে থাকব। তুমি?

আজকাল রবি ছুটির দিনগুলোয় চাঁপার কাছে থাকতে চায় না।

বড় হচ্ছে তো, রক্তের টান টের পায়। শত হলেও তুমি বাপ।

তুমি বেরোচ্ছ না?

তৃণা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, জানোই তো, চারদিকে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া, একা বেরোলেই শচীন এমন একরকম কুটিল চোখে তাকায়! আজকাল বুড়ো বয়সে বড্ড সাসপিশাস হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও পছন্দ করে না। তাই আটকে থাকি ঘরে।

দুর! ওটা কোনও কথা হল নাকি?

তবে কথাটা কী রকম হলে মশাইয়ের পছন্দ?

আমি বলি, তুমিও বেরিয়ে পড়ো, আমিও বেরিয়ে পড়ি।

তারপর?

কোথাও মিট করব।

তৃণা একটু চুপ করে থেকে বলে, দেব, রবি কিন্তু বড় হচ্ছে।

কী করব?

সাবধান হওয়া ভাল। যা কর ছেলেকে সাক্ষী রেখে কোরো না।

তিনু, তুমি কিন্তু এতটা গেরস্ত মেয়ে ছিলে না, দিনদিন কী হয়ে যাচ্ছ?

বয়স হচ্ছে।

ও সব আমি বুঝি না। গত সাতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

মিথ্যুক।

কী বলছ?

বলছি তুমি মিথ্যুক। তৃণা হাসে।

কেন?

পরশুদিনও তুমি সন্ধের পর গাড়ি পার্ক করে রেখেছিলে রাস্তায়, যেখান থেকে আমার শোয়ার ঘরের জানলা দেখা যায়।

বাঁ হাতে বুক চেপে ধরে দেবাশিস, শ্বাসকষ্ট। হৃৎস্পন্দন হারিয়ে যায় একটা...দুটো...। গভীর একটা শ্বাস টানে সে। বুকে বাতাসের তুফান টেনে নেয়।

দেবাশিস আস্তে করে বলে, কী করে বুঝলে যে আমি।

তোমাকে যে আমি সবচেয়ে বেশি টের পাই।

গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেছ।

না। আবছা গাড়িটা দেখেছি। আর দেখেছি ড্রাইভিং সিটে একটা সিগারেট আর দুটো চোখ জ্বলছে।

যাঃ।

আমি জানি দেব, সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

দেবাশিস দাঁত টিপে চোখ বুজে লজ্জাটাকে চেপে ধরে মনের মধ্যে। গলার স্বর কেমন অন্য মানুষের মতো হয়ে যায়, সে বলে, তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

জানবে কী করে! তৃণা হাসে— তোমাকে যে না চেনে সে কী করে জানবে রাস্তায় কার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে বসে আছে ড্রাইভিং সিটে একা ভূতের মতো! আমি ছাড়া এত মাথাব্যথা আর কার?

তুমি অনেকক্ষণ বড় জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলে। পিছনে ঘরের আলো, তাই তোমার মুখ দেখতে পাইনি। যদি জানতাম যে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ!

তা হলে কী করতে?

তা হলে তক্ষুনি রাস্তায় নেমে ছক্করবাজি নাচ নেচে নিতাম।

দেব, বয়স বাড়ছে।

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ বলে, পাগলামিও।

বুঝলাম। কিন্তু কেন? ওরকম কাঙালের মতো আমার বাড়ির পাশে বসে থাকবার মতো কী আছে? নতুন তো নয়।

দেবাশিস ঠিক উত্তরটা খুঁজে পায় না। রক্ত কলরোল তোলে। বুকে আছড়ে পড়ে অন্ধ জলোচ্ছ্বাস। সে বলে, তিনু, আমি বড় কাঙাল।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে। কিছু বলে না।

দেবাশিস বলে, শুনছ।

কী?

আমি বড় কাঙাল।

কাঙাল কি না জানি না, তবে বাঙাল বটে।

তার মানে?

বাঙাল মানে বোকা। বুঝেছ?

তাই বা কেন?

রবি কোথায়? তোমার এ সব পাগলামির কথা তার কানে যাচ্ছে না তো?

কানে গেলেই কী! ও বাচ্চা ছেলে, বুঝবে না।

তৃণা একটা মৃদু হাসি হেসে বলে, তুমি বাচ্চাদের কিছু জানো না। ওরা সব আজকাল পাকা বিচ্ছু হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া বাচ্চারা কিন্তু সব টের পায়।

দেবাশিস একটু হতাশার গলায় বলে, শোনো, রবির জন্য চিন্তার কিছু নেই। চিন্তা করে লাভও নেই। যদি টের পায় তো পাক। আগে বলো, তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না।

তৃণা মৃদুস্বরে বলে, কোথায়?

তুমি যেখানে বলবে।

আমার লজ্জা করে। তোমার সঙ্গে যে তোমার ছেলে থাকবে!

ও তোমায় চেনে না নাকি! এ সব নতুন ডেভেলপমেন্ট তোমার কবে থেকে মনে হচ্ছে?

রবি বড় হচ্ছে তাই ভয় পাই। বুঝতে শিখছে।

ভয় পেয়ো না। গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছি। ঘণ্টা খানেক চিড়িয়াখানা আর রেস্টুরেন্টে কাটাব। দুপুরে আমার বোনের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ। অবশ্য একা রবিরই নিমন্ত্রণ, ওদের বাড়িতে যে আমি খুব

জনপ্রিয় নই তা তো জানোই, রবিকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আমি ফ্রি।

তার মানে এগারোটা কি বারোটা হবে বেলা। আমি কি তোমার মতো স্বাধীন দেব? দুপুরে সকলের খাওয়ার সময়ে বাইরে থাকলে লোকে বলবে কী?

তা হলে চিড়িয়াখানা বা রেস্টুরেন্টে এসো।

তা হলে রবিকে চোখ এড়ানো যাবে না।

উঃ। তুমি যে কী গোলমাল পাকাও না।

তৃণা হেসে বলে, আচ্ছা না হয় দুপুরের প্রোগ্রামই থাকল। কোথায় দেখা হবে।

তুমি ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে থেকো।

দেবাশিস চোখের কোণ দিয়ে দেখে রবি এসে দাঁড়িয়েছে পর্দা সরিয়ে দরজার চৌকাঠে। ষ্ট্রেচলনের একটা হালকা নীল রঙের প্যান্ট আর দুধ-সাদা একটা টি-শার্ট পরনে, বুকের কাছে বাঁ ধারে মনোগ্রাম করা ওর নামের আদ্য অক্ষর। মাথায় থোপা থোপা চুলের ঘুরলি। একটু হাসি ছিল মুখে। সেটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে এখন।

তা হলে? দেবাশিস ফোনে বলে।

আচ্ছা ছাড়লাম।

সো লং।

ফোনটা রেখে দেয় সে।

হাসিটা আর রবির মুখে নেই, মিলিয়ে গেছে, চেয়ে আছে বাবার দিকে। চোখে চোখে পড়তেই মুখটা সরিয়ে নিল।

দেবাশিস ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ঝড় থেমেছে, ঢেউ কমে এল, শুধু অবসাদ। টেনশনের পর এমনটা হয়, মুখে একটু সহজ হাসি ফুটিয়ে তোলা এখন বেশ শক্ত, টানাপোড়েন এখনও তো শেষ হয়নি। তৃণার সঙ্গে দুপুরে দেখা হবে, ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। তার স্নায়ুর ভিতরে এখনও একটা তৃষ্ণার্ত উচাটন ভাব। দেখা হবে, পিপাসা বাড়বে, তবু এক সমুদ্রের তফাত থেকে যাবে সারা জীবন তৃণার সঙ্গে তার।

রবি মুখ তুলতে দেবাশিস ক্লিষ্ট একরকম হাসি হাসে। রবি কি সব বোঝে! বুকের মধ্যে একটা ভয় আচমকা হৃদ্‌যন্ত্রকে চেপে ধরে তার।

চতুর ভঙ্গিতে দেবাশিস এক পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বলে, দিস ইজ দেবাশিস দাশগুপ্ত।

বাড়ানো হাতখানা রবি ধরে শেকহ্যান্ড করতে করতে বলে, দিস ইজ নবীন দাশগুপ্ত, প্লিজড টু মিট ইউ।

রবির পিছনে চাঁপা দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার শাড়ি পরেছে, চুল আঁচড়েছে। দেবাশিসের চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে ভারী নরম সুরে বলে, বাবা, আমি কি সোনাবাবুর সঙ্গে যাব?

দেবাশিস অবাক হয়ে বলে, কোথায়?

চাঁপা লাজুক গলায় বলে, সোনাবাবু ছাড়ছে না, কেবল সঙ্গে যেতে বলছে!

রবি করুণ মুখভাব করে বলে, দিদি যাবে বাবা?

দেবাশিস একটু ক্ষীণ হাসি হাসে, বলে, তোমার ইচ্ছে হলে যাবে, কিন্তু খাবে কোথায়? ওর তো নেমন্তন্ন নেই।

চাঁপার মুখ একটা হাসির ছটায় আলো হয়ে যায়, বলে, আমি কিছু খাব না, সকালে পান্তা খেয়ে নিয়েছি, সোনাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকব, সেই আমার খাওয়া।

দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দরজা খুলে লিফটের দিকে এগোয়।

## ॥ দুই ॥

প্রেম একরকম, পাপ আর একরকম; কোনটা প্রেম, কোনটা পাপ তা বোঝা যদিও মুশকিল, তবু কতগুলো লক্ষণ তৃণা জেনে গেছে। মনে মনে যখন সে দেবাশিসের কথা ভাবে তখন তার শচীনের দিকে তাকাতে লজ্জা করে, ছেলেমেয়ের দিকে চাইতে পারে না, আর বুকের মধ্যে একরকম তীব্র শুষ্ক বাতাস বয়, গলা শুকোয়, জিভ শুকোয়, বিনা কারণে চারদিকে চোরাচোখে তাকিয়ে দেখে। নিজের ছায়াটাকেও কেমন ভয়-ভয় করে।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোতে গিয়েই তৃণা ভারী চমকে ওঠে। কিছু না, বাইরের বেসিনে শচীন খুবই নিবিষ্টভাবে তার বাগানের মাটিমাখা হাত ধুচ্ছে। বেঁটেখাটো মানুষ, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, চোখে মুখে একটা কঠোর পুরুষালী সৌন্দর্য আছে। শচীন তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি, তবু তৃণা বাথরুমের দরজার পাল্লাটা ধরে নিজেকে সামলে নিল। খোলা শরীরের ওপর কেবল শাড়িটা কোনও রকমে জড়ানো। কেমন লজ্জা হল তার, তাড়াতাড়ি ডানদিকের আঁচল টেনে শরীরের উদোম অংশটুকু ঢেকে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ঘরে চলে এল।

ঘরটা তার একার, সম্পূর্ণ একার। একধারে মস্ত খাট, বইয়ের শেলফ খাটের নাগালের মধ্যেই, অন্যধারে ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব, একটা আলমারি, সবই দামি আসবাব। মস্ত বড় বড় দুটো জানলা দিয়ে সকালের শারদীয় রোদ এসে মেঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে, উজ্জ্বলতা প্রখর। সাধারণ সায়া ব্লাউজ পরে নিল সে, শাড়িটা ঠিক করে পরল, ওয়ার্ডরোব খুলে বাইরে বেরোনোর পোশাকি শাড়ি আর ম্যাচকরা ব্লাউজ বের করে পেতে রাখল বিছানায়। দূর থেকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সেগুলো, তারপর আয়নার সামনে গিয়ে বসে। তার চেহারা ছিপছিপে, ফর্সা, মুখশ্রী হয়তো ভালই, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক তার মুখের সজীবতা। চোখ কথা কয়, চোখ হাসে, নাকের পাটা কেঁপে ওঠে অল্প আবেগে। ঠোঁট ভারী, গাল ভারী, সব মিলিয়ে তার বয়স সত্যিকারের তুলনায় অনেক কম দেখায়। আবার বয়সের তলে তার কোথাও যে কোনও খাঁকতি নেই সেটাও বোঝা যায়। নিজেকে ভালবাসে তৃণা, ভালবাসার মতো বলেই। মাঝে মাঝে সে নিজের প্রেমে পড়ে যায়।

পাশের ঘরে শচীনের সাড়া পাওয়া যায়। সুরহীন একরকম গুনগুন শব্দ করে শচীন। গান নয়, অনেকটা গানের মতো। শচীনের ওই এক মুদ্রাদোষ। ওই সুরহীন গুনগুন শব্দ কি ওর একাকিত্বের?

যদি তাই হয়, তবু ওই একাকিত্বের জন্য তৃণা দায়ী নয়। দেবাশিসও নয়। একদা শচীনই ছিল তৃণার সর্বস্ব। কিন্তু শচীনের কে ছিল তৃণা? তৃণা তার ওই স্বরটা শোনে উৎকর্ণ হয়ে। দু'ঘরের মাঝখানের দরজা রাতে বন্ধ থাকে, দিনে মস্ত ভারী সাটিনের পর্দা ঝুলে থাকে। শচীন অবশ্য বেশিক্ষণ ঘরে থাকে না, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওই পর্দা থাকে অনড় হয়ে। কেউ কারও ঘরে যায় না। এ বাড়ির আর এক কোণে থাকে ছেলেমেয়েরা। তাদের সঙ্গেও হুটহাট দেখা হয় না। হলেও কথাবার্তা হয় বড্ড কম। একমাত্র খাওয়ার সময়ে তৃণা সামনে থাকে। সেও এক নীরব শোকসভার মতো। সবাই চুপচাপ খেয়ে যায়। তৃণার চোখে জল আসে, কিন্তু তাতে লাভ কী? চোখের জলের মতো শক্তিশালী অস্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন মানুষের আর কিছু নেই। সে তখন থাকে না। যেমন তৃণা এ বাড়িতে নেই, এ সংসারে নেই। মৃত্যুর পর বাঁধানো ফটো যেমন ঘরের দেয়ালে, সেও তেমনি। তাই তৃণা দায়ী নয়।

তৃণা ঘাড়ে গলায় পাউডারের নরম পাফ ছুঁইয়ে নেয়। সিঁদুর দেয়। সামান্য ক্রিম দু'হাতের তেলোয় মেখে মুখে ঘসে। এখন আর কিছু করার নেই। সারাদিন তার করার কিছু থাকেও না বড় একটা। যে লোকটা রান্না করে সে দুই হাজার টাকা পাইনে পায়। তার অর্থ, লোকটাকে শেখানোর কিছু নেই। যে সব চাকর বা ঝি ঘরদোর গুছিয়ে রাখে তারাও নিজেদের কাজ বোঝে। তৃণা শুধু ঘুরে ঘুরে একটু তদারক করে। কখনও নিজের হাতে কিছু রাঁধে। সে কারও মুখে তেমন রোচে না, তৃণাও রান্নাবান্না ভুলে গেছে। শুধু কবে কী কী রান্না হবে সেটা বলে দিয়ে আসে। তাই হয়। কেবল নিজের ঘরটাতে সে নিজে বইপত্র গোছায়, বিছানায় ঢাকনা দেয়, ওয়ার্ডরোব সাজায়, ড্রেসিং টেবিলে রূপটানের জিনিস মনের মতো করে রাখে, কাগজ ভিজিয়ে তা দিয়ে আয়না মোছে। এ ঘরে কেউ বড় একটা আসে না। এ তার নিজের ঘর। বড্ড ফাঁকা, বড্ড বড়। রাস্তার দিকে একটা ব্যালকনি আছে, সেখানে একা ভূতের

মতো কখনও দাঁড়ায়। কবিতার বই, পত্র-পত্রিকা, গল্প-উপন্যাস আর ছবি আঁকার জলরং, মোটা কাগজ, তুলি— এই সবই তার সারাদিনের সঙ্গী। ইদানীং সে কবিতা লেখে, দু-একটা কাগজে পাঠায়। সে সব কবিতা দুঃখভারাক্রান্ত, নিঃসঙ্গতাবোধে মন্থর, ব্যক্তিগত হা-হুতাশে ভরা ভাবপ্রবণতা— এখনও ছাপা হয়নি। এক-আধটা কবিতা ছাপা হলে মন্দ লাগত না তার। যে সব ছবি সে এঁকেছে তার অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। নারকোল গাছ, চাঁদ আর নদীতে নৌকো— এ ছবি আঁকা সবচেয়ে সোজা। তারপরই পাহাড়ের দৃশ্য। তৃণা আঁকতে তেমন শেখেনি, তুলি-রঙের ব্যবহারও জানে না। ছবি জ্যাবড়া হয়ে যায়, তবু আঁকে। ভাবে একটা এগজিবিশন করবে নাকি একাডেমি বা বিড়লা মিউজিয়ামে! করে লাভ নেই অবশ্য। কেউ পাত্তা দেবে না। ছবি আঁকার মাথামুণ্ডুই সে জানে না। তৃণা কলেজে ভাল ক্যারাম খেলত। বাড়িতে বিশাল দুই বোর্ড আছে। একা একা মাঝেমধ্যে গুটি সাজিয়ে টুকটাক স্ট্রাইকারে টোকা দিয়ে গুটি ফেলে সে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বলে খেলার কোনও টেনশন থাকে না, ক্লান্তি লাগে। নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে একবার কালো, আবার উল্টোদিকে গিয়ে নিজের হয়ে সাদা গুটি ফেলে কতক্ষণ পারা যায়?

শচীন একটানা গুনগুন শব্দে কথাহীন সুরহীন একটা গান গেয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। বনেদি বড়লোক, তাই নিজের হাতে প্রায় কিছুই করতে হয়নি তাকে। বাবাই করে গিয়েছিলেন। বাবার বিশাল সম্পত্তি চার ভাই ভাগ করে নিয়েও বড়লোকই আছে। বাড়িটা শচীনের ভাগে পড়েছে, সিমেন্টের কারবার নিয়েছে বড় ভাই, ছোট দু ভাই নিয়েছে একজন ওষুধের দোকান, অন্যজন ভাল কয়েকটা শেয়ার। শচীনরা চার ভাই-ই শিক্ষিত। সে নিজে ইঞ্জিনিয়ার। ভাল চাকরি করে বড় ফার্মে। একবার নিজের পয়সায় অন্যবার কোম্পানির খরচায় বিলেত ঘুরে এসেছে! পৃথিবীর সব দেশেও গেছে সে, চীন আর রাশিয়া ছাড়া। এমন মানুষ আর এমন ঘর পেলে কোন মেয়ে না বর্তে যায়! শক্তসমর্থ এবং কিছুটা নিরাসক্ত শচীন ভালবাসে ফুল, সুন্দর রং, ভালবাসে চিন্তাভাবনা, মানুষের প্রতি তার আগ্রহ আছে। তবু এইসব ছুটির দিনে বা অবসরে সে যখন বাগান করে, মন্থরভাবে নিজের ঘরে জার্নাল নাড়াচাড়া করে, যখন গুনগুন করে, তখন তাকে বড় নিষ্কর্মা মনে হয়।

ছুটির দিনে তাই তৃণার বাড়িতে অসহ্য লাগে। একা একরকম আর জন থাকা সত্ত্বেও একা আর একরকম।

বড় অদ্ভুত বাড়ি। সারাদিনেও একটা কিছু পড়ে না, ভাঙে না, দুধ উথলে পড়ে না, ডাল ধরে যায় না। সুশৃঙ্খলভাবে সব চলে। তৃণাকে কোনও প্রয়োজন হয় না কোথাও। একটা অ্যালসেশিয়ান আর একটা বুলডগ বক্সার কুকুর আছে। সে দুটোরও কোনও ডাকখোঁজ নেই। কেবল শচীনের বুড়ো কাকাতুয়াটা কথা বলে পাকা পাকা। কিন্তু সে হচ্ছে শেখানো বুলি, প্রাণ নেই। অর্থ না বুঝে পাখি বলে, তৃণা, কাছে এসো, তৃণা...তৃণা, কাছে এসো...

পাখিটা বুড়ো হয়েছে। একদিন মরে যাবে। তখন তৃণাকে কাছে ডাকার কেউ থাকবে না।

না, থাকবে। দেবাশিস। ও একটা পাগল। এমনভাবে ডাকে যে দেশসুদ্ধু, সমাজসুদ্ধু লোক জেনে যায়। শচীন জানে, ছেলেমেয়েরাও জেনে গেছে। তৃণার বুকের ভিতরটা সবসময় কাঁপে। কখনও নিষিদ্ধ সম্পর্কের উত্তেজনায়। কখনও ভয়ে। শচীন কিংবা ছেলেমেয়েরা তাকে বেশ্যার অধিক মনে করে না। আর দেবাশিস? সে কি তাকে নষ্ট মেয়েমানুষ, ছাড়া আর কিছু ভাবে?

কাকাতুয়াটা ডাকছে, কাছে গিয়ে একটু আদর করতে ইচ্ছে করে পাখিটাকে। মস্ত দাঁড়টা ঝোলানো আছে শচীনের ঘরের বারান্দায়। যেতে হলে ও ঘর দিয়ে যেতে হবে। শচীন না থাকলে যাওয়া যেত। কিন্তু ওঘর থেকে সমানে সুরহীন গুন গুন শব্দটা আসছে। শচীনের চোখের সামনে নিজেকে নিয়ে গেলেই তার নষ্ট মেয়েমানুষ বলে মনে হয় নিজেকে। এ বড় জ্বালা। ভদ্রলোক বলেই শচীন তাকে কিছু বলে না আজকাল। মাস ছয়েক আগে ধৈর্যহারা হয়ে একদিন চড়চাপড় আর ছড়ির ঘা দিয়েছিল কয়েকটা। তাবপর থেকেই হয়তো অনুতাপ এসে থাকবে! কিন্তু তৃণা ওকে জানাবে কী করে যে ওর হাতের সেই মার বড় সুখের স্মৃতি হয়ে আছে তৃণার কাছে আজও! কারণ, তার বিবেক ও হৃদয় একটা শাস্তি সবসময়ে প্রত্যাশা করে।

তৃণা তার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে উপুড়-করা বইটা তুলে পড়তে বসল। কবিতার বই, বহুবার

পড়া, মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু খোলা সনেটটার দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু মন দিতে পারে না, বইটা রেখে প্যাড আর কলম টেনে নেয়। কলম খুলে ঝুঁকে পড়ে, ধৈর্যহীন চঞ্চলতায় কলম উদ্যত করে নাড়ে। কিছু লিখতে পারে না। কয়েকটা রোগা লম্বা লোকের চেহারা এঁকে ফেলে, তারপর সারা কাগজটা জুড়ে হিজিবিজি আঁকতে আর লিখতে থাকে। কাগজটা নষ্ট করে দলা পাকিয়ে ফেলে দেয়। আবার হিজিবিজি করে পরের কাগজটাতে।

কাকাতুয়াটা শচীনকে ডাকছে— শচীন, চোর এসেছে— শচীন চোর এসেছে—

শচীনের ঘর এখন নিস্তব্ধ। কেউ নেই। তৃণা উঠে শচীনের ঘরে উঁকি দেয়। গোছানো ঘর। বাপের আমলের বাড়িটা শচীন আবার নতুন করে একটু ভেঙে গড়ে নিয়েছে। নতুন করে তৈরি করার জন্যই ডাক পড়েছিল দেবাশিসের। সিভিল ড্রাফটসম্যান আর ইন্টিরিয়র ডেকরেটর 'ইনডেক'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কথাটা বড্ড ভারী, ইনডেক এমন কিছু বড় কোম্পানি নয়। কলকাতায় ওরকম কোম্পানি শতাধিক আছে। তবু ইনডেক-এর কিছু সুনাম আছে। ইন্টিনিয়র ডেকরেশন ছাড়াও ওরা ছোটখাটো কনস্ট্রাকশন কিংবা রিনোভেশন করে। বাড়ির প্ল্যান করে দেয়। এত কিছু একসঙ্গে করে বলেই কাজ পায়। দেবাশিস দাশগুপ্ত এক সময়ে আর্টিস্ট ছিল। কমার্শিয়াল লাইনে চমৎকার নাম করেছিল সে। কিন্তু উচ্চাশা বলবতী হওয়ায় সে কিছু দিন সিনেমার পরিচালনায় হাত লাগাল। সবশেষে ইন্টিরিয়র ডেকরেশনে এসে মন লাগাতে পারল। আর্টিস্ট ছিল বলে এবং রং ও ডিজাইনের নিজস্ব চোখ আছে বলে, আর পূর্বতন গুডউইলের জন্য ওর দাঁড়াতে দেরি হয়নি। এখন চৌরঙ্গিতে অফিস করেছে। একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, দু'জন ড্র্যাফটসম্যান এবং আরও কয়েক জনকে মাইনে দিয়ে রেখেছে, একটি মেয়ে রিসেপশনিস্ট আছে। নিজস্ব চেম্বারটা এয়ারকন্ডিশন করা, নিজের কেনা ফ্ল্যাটে থাকে। একটা মরিস অক্সফোর্ড গাড়ি হাঁকায়।

কিন্তু এ হচ্ছে আজকের দেবাশিস, পুরনো দেবাশিসকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।

এ বাড়ি রিনোভেট করতে দেবাশিস যেদিন এল, বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে চতুর পায়ে শচীনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়িটা। চোখে উগ্র স্পৃহা, চলাফেরায় কেজো লোকের তাড়া। শচীন বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল। কোথায় দেয়াল ভেঙে ব্যালকনি হবে, কোথায় মেঝের টালি পালটাতে হবে। কোথায় নতুন ঘর তুলতে হবে, আর কেমনভাবে সাজাতে হবে পুরনো বাড়িটাকে আধুনিক করে তুলতে। শচীনের সঙ্গের এই লম্বাপানা সুগঠন লোকটাকে অহংকারী তৃণা খুব হেলাভরে এক-আধপলক দেখছে, লক্ষ করেনি। শচীনই তাকে ডাকে— তৃণা, তোমার যে কী সব প্ল্যান আছে তা দাশগুপ্তকে বুঝিয়ে দাও—

চায়ের টেবিলে ওরা তখন বসেছে। মুখোমুখি দেবাশিস। তৃণা তার দিকে একপলক তাকিয়েই মুখ নিচু করে প্যাডে একটা স্টাডি রুমের ছবি এঁকে দেখাতে যাচ্ছিল, দেবাশিস একটু ভোম্বলের মতো তাকিয়ে থেকে বলে, তৃণা না?

তৃণা চমকে উঠেছিল। তাকিয়ে একটু কষ্টে চিনতে পেরেছিল দেবাশিসকে। ছেলেবেলার কথা, চিনতে তো কষ্ট হবেই।

শচীন বলে, চেনেন নাকি?

দেবাশিস বড় চোখে চেয়ে বলে, চেনা কঠিন বটে, তৃণার তো এতকাল বেঁচে থাকার কথাই নয়। যা ভুগত, ভেবেছিলাম মরে-টরে গেছে বুঝি এতদিনে।

বটে! বলে শচীন হাসে।

বটেই তো! দেবাশিস অবাক হয়ে বলে, আমাদের মফস্বল শহরে পাশাপাশি বাস ছিল। ওর সবকিছু আমি জানি। ছেলেবেলায় দেখতুম, ও হয় বিছানায় পড়ে আছে, না হলে বড়জোর বারান্দা কি উঠোন পর্যন্ত এসে হাঁ করে অন্য খেলুড়িদের খেলা দেখছে। কখনও আমাশা, কখনও টাইফয়েড, কখনও নিউমোনিয়ায় যায়-যায় হয়ে যেত, আবার বেঁচেও থাকত টিক-টিক করে। আমরা যখন ও শহর ছেড়ে চলে আসি তখন ও বোধ হয় ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। আমার মা প্রায়ই দুঃখ করে বলত— 'মদনবাবুর মেজো মেয়েটা বাঁচলে হয়!'

তৃণা ভারী লজ্জা পেয়েছিল। সত্যিই সে ভুগত। বলল, আহা, সে তো ছেলেবেলায়।

তারপর তো আর তোমাকে দেখিনি। আমাকে চিনতে পারছ তো!

পারছি।

বলো তো কে!

রাজেন জ্যাঠার ছেলে।

দেবাশিস হঠাৎ হা হা করে হেসে বলে, রাজেন জ্যাঠা আবার কী! আমার বাবাকে ওই নামে কেউ চিনতই না। হাড়কেপ্পন ছিল বলে বাবার নাম সবাই দিয়েছিল কেপ্পন দাশগুপ্ত। সেটা সংক্ষেপ হয়ে হয়ে লোকে বলত কেপুবাবু। আমাদেরও ছেলেবেলায় কেউ কোন বাড়ির ছেলে জিজ্ঞেস করলে বলতুম— আমি কেপুবাবুর ছেলে।

তৃণার সবটাই মনে আছে। যারা রোগে ভোগে তাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়। কেপুবাবুর ছেলে দেবাশিসকে সবাই চিনত ডানপিটে বলে। অমন হারামজাদা পাজি ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। যত ছেলেবেলার কথা বলে উল্লেখ করেছিল দেবাশিস তত ছেলেমানুষ তখন তারা ছিল না। তখন রোগে-ভোগা তৃণার বয়স বছর তেরো, দেবাশিসের উনিশ কুড়ি। পাড়ার সব মেয়েকেই চিঠি দিত দেবাশিস, একমাত্র রোগজীর্ণ তৃণাকেই তেমন গুরুত্ব দেয়নি বলে চিঠি লেখেনি। বহুকাল পরে সেই উপেক্ষিত মেয়েটিকে পরিপূর্ণ ঘরসংসারের চালচিত্রের মধ্যে দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হয় না!

বলল, মেয়েদের মুখ আমার ভীষণ মনে থাকে। নইলে তোমাকে চেনবার কথা নয়। বেঁচে আছ, তাই বিশ্বাস হতে চায় না। শচীনবাবুর ভাগ্যেই বোধ হয় বেঁচে আছ। ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন। তুমি বেঁচে না থাকলে শচীনবাবুকে আজও ব্যাচেলার থাকতে হত।

ঘটনাটা এরকম নিরীহভাবেই শুরু হয়েছিল। ইনডেক তাদের বাড়িটা ভেঙে মেরামত করছে, সাজিয়ে দিচ্ছে, ব্যালকনি বানাচ্ছে, জানলা বসাচ্ছে— সেইসব তদারক করতে সপ্তাহে এক-আধবার আসত দেবাশিস। ভারী ব্যস্ত ভাবসাব, চটপটে কেজো মানুষের মতো বিদ্যুৎগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেত। গম্ভীর, পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন দেবাশিস কোনওদিকে তাকাত না। দেখাশোনা শেষ করে কোনওদিন তৃণাকে ডেকে বলত— চলি। কোনওদিন বা দূরত্বসূচক হালকা গলায় বলত— চা খাওয়াবে নাকি কাদম্বিনী?

ও নামটা সে নিয়েছিল রবি ঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্প থেকে। 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।' একদিন লাইনটা উদ্ধৃত করে দেবাশিস বলেছিল— তুমি হচ্ছ সেই মানুষ, মরোনি প্রমাণ করার জন্যেই বেঁচে আছ, কিন্তু কী জানি, বিশ্বাস হতে চায় না।

উল্টে তৃণা এলিয়টের লাইন বলেছে— আই অ্যাম ল্যাজারাস, কাম ফ্রম দি ডেড, কাম টু টেল ইউ অল, আই শ্যাল টেল ইউ অল—

শচীন সবসময়ে বাড়ি থাকে না। রেবা আর মনু বড়লোকের ছেলেমেয়ে যেমন হয় তেমনি নিজেদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তৃণা সারাদিন একা। সে ক্যারাম খেলতে পারে, টেবিল-টেনিস খেলতে পারে, একটু আধটু ছবি আঁকে, কবিতা লেখে! কিন্তু কোনওটাই তার সঙ্গী নয়! বরং কবিতার বই খুলে বসলে একরকম দূরের অবগাহন হয় তার। দেবাশিস নামকরা আর্টিস্ট, দুটো ফ্লপ ছবির পরিচালক, বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী মহলে তার গভীর যোগাযোগ। তৃণার সেইটেই অবাক লাগত। ওই ফাজিল, মেয়েবাজ, এঁচোড়েপাকা ছেলেটির মধ্যে এ সব এল কোত্থেকে!

কখনও চা বা কফি খেতে বসে দেবাশিস বলত— তৃণা, তোমার সত্যিই কিছু বলার আছে?

তৃণা অবাক হয়ে বলেছে— কী বলার থাকবে?

ওই যে বলো, আই শ্যাল টেল ইউ অল।

যাঃ, ও তো কোটেশন।

মানুষ যখন কিছু উদ্ধৃত করে তখন তার সাবকনশাসে একটা উদ্দেশ্য থাকে।

আমার কিছু নেই।

দেবাশিস গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবত।

রেখার জন্মদিনে সেবার দেবাশিসকে সস্ত্রীক নেমন্তন্ন করেছিল তৃণা। দেবাশিসের বউ এল তার সঙ্গে। মানানসই বউ। ভাল গড়ন, লম্বাটে চেহারা। রং কালো, মুখশ্রী খারাপ নয়। কিন্তু সারাক্ষণ কেবল টাকা আর গয়না আর গাড়ি আর বাড়ির গল্প করল। বুদ্ধি কম, নইলে বোঝা উচিত ছিল যে-বাড়িতে

বসে বড়লোকি গল্প করছে সে-বাড়ি তাদের একশোগুণ ধনী। হঠাৎ যারা বড়লোক হয় তারা টাকা দিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না, হা-ঘরের মতো বাজার ঘুরে রাজ্যের জিনিস কিনে ঘরে জঙ্গল বানায়, বনেদি বড়লোকেরা ওরকমভাবে টাকা ছিটোয় না, গরম দেখায় না। দেবাশিসের বউ চন্দনা টাকায় অন্ধ হয়ে চোখের সামনে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। মুখে বেড়ালের মতো একটা আহ্লাদি ভাব, চোখে সম্মোহন, বার বার স্বামীকে ধমক দিচ্ছিল। অনেক অতিথি ছিল বাড়িতে। ওদের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পারেনি তৃণা। অল্প যেটুকু সময় কাটিয়েছিল তাতেই তার বড় লজ্জা করেছিল। দেবাশিসের বউ বস্তুজগৎ ছাড়া আর নিজের সুখদুঃখ ছাড়া কোনও খবর রাখে না।

এ সব বছর-দুই আগেকার ঘটনা। বাড়ি রিনোভেট করা সদ্য শেষ হয়েছে তখন। নতুন হয়ে ওঠা বাড়ি ঝলমল করছে। তৃণা নিজের ঘরটা বেশি সাজায়নি। বেশি সাজানো ঘর তার পছন্দ নয়। তাতে তার মনের ধূসরতা নষ্ট হয়ে যায়। একটু সাদাসিধে নরম রং, আর আলো-হাওয়ার ঘরই তার ভাল লাগে। ভাল লাগে বিষণ্ণতা, একা থাকা, কবিতা।

দেবাশিস বলেছিল— তৃণা, ইনডেক তোমার জন্য কিছু করতে পারল না, একটা ব্যালকনি ছাড়া।

আমার জন্য ইনডেকের কিছু করার নেই যে, আমি ডেকরেশন ভালবাসি না।

জানি। তুমি ক্লায়েন্ট হিসেবে যাচ্ছেতাই!

তৃণা হেসেছিল একটু।

বিপজ্জনক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলল, কিন্তু মেয়ে হিসেবে ইউনিক। ঠিক বয়সটিতে ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে বড় ভাল হত।

তৃণা ভয় পেয়ে বলে, ইস!

দুঃখের মুখ করে দেবাশিস বলে, আমার বউকে তো দেখেছ!

দেখলাম!

কেমন?

সুন্দর।

সুন্দর কিনা কে জিজ্ঞেস করেছে।

তবে?

স্বভাবের কথা বলছি।

বাঃ! তা কী করে বলব! একবার তো মোটে দেখেছি, বেশি কথাবার্তাও হয়নি। তবে স্বভাব খারাপ নয় তো!

ও টাকা আর স্ট্যাটাস ছাড়া কিছু বোঝে না, কোনও অনুভূতি নেই।

তাতে কী! সব মেয়েই ওরকম।

তুমি তো নও?

তৃণা বিষণ্ণ হয়ে বলেছে— আমার কথা ছেড়ে দাও, বহুদিন রোগে ভুগে ভুগে আমি একটু অ্যাবনরমাল। আমি যে বেশি ভাবি, বেশি চুপ করে অন্যমনস্ক থাকি, কবিতা লিখি— এ সব আমার অস্বাভাবিক মন থেকে তৈরি হয়েছে। এ-বাড়ির কেউ আমাকে তাই পছন্দ করে না। ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ইন্টেলেকচুয়াল মা বলে ক্ষ্যাপায়।

হবে।

শোনো, নিজের বউয়ের নিন্দে বাইরে কোরো না। ওটা রুচির পরিচয় নয়। যেমনটি পেয়েছ তেমনটির সঙ্গেই মানিয়ে চলো। তুমি বড় ছটফটে, চঞ্চল, বহু মেয়েকে চিঠি দিতে। অত মন তুলে নাও কী করে? তোমার যাকে-তাকে হুট করে ভাল লাগে, আবার হুট করে অপছন্দ হয়ে যায়। মনটা কোথাও একটু স্থির না করলে সারা জীবন ছুটে বেড়াতে হবে।

দেবাশিস মৃদুস্বরে হেসে বলে, তুমি এত কথা জানলে কী করে? আমি তো এখনও তেমন করে বউয়ের নিন্দে তোমার কাছে করিইনি। কী একটা কী একটা বলতে শুরু করেছিলাম। তুমি আগ বাড়িয়ে এককাঁড়ি কথা বললে।

ভারী লজ্জা পেয়ে গেল তৃণা। আসলে তার মন বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ, একটু কিছু ঘটলেই তার

পিছনে একটা বিশাল কার্যকারণ ভেবে নেওয়া তার স্বভাব। একবার আলমারি আর বাক্সের এক থোকা চাবি হারিয়ে ফেলেছিল সে, তার আগের দিন বাড়ির একটা দোখনো চাকর বিদেয় হয়েছে। চাবিটা চেনা জায়গায় খুঁজে না পেয়েই তৃণা ভাবতে বসল, এ নিশ্চয়ই সেই চাকরটার কাজ। জিনিসপত্র কিছু হাতাতে না পেরে চাবিটা নিয়ে পালিয়েছে। এরপর গাঁয়ের লোক জুটিয়ে একদিন ফাঁক বুঝে হাজির হবে। তৃণাকে মেরে রেখে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে। কাল্পনিক ব্যাপারটাকে এতদূর গুরুত্ব দিয়ে সে প্রচার করেছিল যে শচীন বাধ্য হয়ে থানা-পুলিশ করে। চাকরটার গাঁয়ে পর্যন্ত পুলিশকে সজাগ করা হয়। কিন্তু তিনদিনের মাথায় বাথরুমে সাবানের খোপে চাবিটা তৃণাই খুঁজে পায়।

তার মন ওইরকমই। দেবাশিসকে সে প্রায় অকারণে বউয়ের ব্যাপারে দায়ী করেছে, দেবাশিস তার প্রেমে পড়ে গেছে গোছের চাপা একটা আশঙ্কা প্রকাশ করে ফেলেছে। লজ্জা পেয়ে সে বলে, আমার কেমন যেন মনে হয় তোমাকে! সাধারণ জীবনে তুমি খুশি নও।

দেবাশিস শ্বাস ফেলে বলেছে— তা ঠিকই। তবে খুব ভয়ের কিছু নেই।

যাই বলুক, ব্যাপারটা অত নিরাপদ ছিল না। এটা বোঝা যেতই দেবাশিস তার বউকে ভালবাসে না। অন্য দিকে তৃণাকে ভালবাসে না শচীন। কিংবা তৃণার কল্পনাপ্রবণ মন যেন সেইটাই ভেবে নেয়। মিথ্যে নয় যে তৃণার একথা ভাবতে ভালই লাগত যে শচীন তাকে ভালবাসে না। রেবা ভালবাসে না, মনু ভালবাসে না। সংসারে কেউ তাকে ভালবাসে না। সে একা, সে বড় দুঃখী। তার এই দুঃখের কোনও ভিত্তি থাক বা না থাক, একথা ভাবতে তার ভাল লাগত। এই দুঃখই তাকে সবচেয়ে বড় রোমান্টিক সুখটা দিত। দুঃখের চিন্তা বা চিন্তার দুঃখ কারও কারও কাছে বড় সুস্বাদু।

দেবাশিস সেই রন্ধ্রপথের সন্ধান পেয়েছিল। এ বাড়ির অনেক কাটা ভাঙা দুর্বল স্থান সে যেমন খুঁজে বের করে মেরামত করে ঢেকে সাজিয়ে দিয়ে গেছে তেমনি তৃণার সঠিক দুর্বলতাটুকু জেনে নিল সে অনায়াসে। কিন্তু সারিয়ে দিয়ে গেল না, বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

তৃণার মন এমনই একটা কিছু চেয়েছিল। কোনও অঘটন, একটু পতন, একটু পাপ, সামান্য অপরাধবোধ উজ্জ্বলতম রঙের মতো স্পষ্ট করে দেয় জীবনকে। তার সেই দুর্বলতা দেবাশিস ফুলের মতো চয়ন করে নিজের বাটনহোল সাজাল লাল গোলাপের মতো। গোলাপটা লাল কেন? তৃণা ভেবে দেখেছে। লোকলজ্জার রাঙা আভায় তা লাল। কিছু পাপ কালো, কিছু পাপ রাঙা।

রাঙা শাড়িটা পরে নিল তৃণা। সাজল। ঘড়িতে এখনও বেশি বাজেনি, সময় আছে, থাকগে! তৃণা একটু ঘুরবে। তার পর বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে।

## ॥ তিন ॥

পেট্রল পাম্পে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে দেবাশিস আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। হাই তুলতে তুলতে বলল, বিশ লিটার। বলে পকেট থেকে ক্রেডিট কার্ডটা বের করে দিল।

রবি নেমে আইসক্রিমের স্টলটার কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলে, বাবা, বন্ধ যে!

কী আর করা যাবে!

রবি বুটের শব্দ করে ছুটে আসে— আজ কেন বন্ধ?

একটু পরে খোলে। চলো, তোমাকে ক্যান্ডি কিনে দেব।

গাড়ির ভিতর থেকে চাঁপা ডেকে বলে, সোনাবাবু, তোমার জন্য আমি তো খাবার এনেছি, বাইরের জিনিস তবে কেন খাবে?

রবি তার বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছোট চোখে বাবাকে একটু দেখল। প্যান্ট-শার্ট-পরা দীর্ঘকায় বাবা, গলায় একটা সিল্কের ছাপা সাদা-কালো স্কার্ফ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাবা জুতোর আগাটা তুলছে নামাচ্ছে, পকেটে হাত, ভ্রূ কোঁচকানো।

রবি ডান পা বাড়িয়ে ডান হাত মুঠো করে তুলে মুখ আড়াল করে দাঁড়াল। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে বক্সিংয়ের স্ট্যান্স তৈরি করে এগিয়ে এসে বাঁ হাতটা বাবার পেটে চালিয়ে দিয়ে মুখে শব্দ করে—

হোয়্যাম।

দেবাশিস কোলকুঁজো হয়ে সরে যায়। তারপর সেও ঘুরে দাঁড়ায়। অবিকল রবির মতো স্ট্যান্স নিয়ে এগিয়ে ভুয়ো ঘুসি মারে তার মুখে, রবি চট করে মুখটা সরিয়ে নিয়ে ঘুরে এগিয়ে আসে। নিঃশব্দে দুজন দুজনের দিকে চোখ রেখে চক্কর খায়, ঘুসি চালায়। চাঁপা গাড়ি থেকে মুখ বার করে স্মিত চোখে চেয়ে থাকে। পেট্রল ভরতে ভরতে পাম্পের অ্যাটেনডেন্ট লোকটা খুব হাসে।

দেবাশিস পেটে ঘুসি খেয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে। সামনে তেজি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রবি রেফারির মতো গুনতে থাকে— ওয়ান— টু— থ্রি— এইট— নাইন আউট! বলে শূন্যে আঙুল তুলে রবি।

দেবাশিস উঠে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে বলে, কংগ্র্যাচুলেশন ফর জাস্ট বিয়িং দা নিউ হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন অব দা ওয়ার্ল্ড।

থ্যাংকস। হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়। মৃদু হাসে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, মে আই পুট এ টেলিফোন কল?

টু হুম?

মাই ফ্রেন্ড রঞ্জন।

গো এহেড।

দ্বিধাহীন গটমটে পায়ে রবি কাচের দরজা ঠেলে গিয়ে অফিস ঘরে ঢোকে। ফোন তুলে নেয় চালাক চতুর ভঙ্গিতে। দেবাশিস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। শুনতে পায় রবি বলছে— হেল্লো, ইজ রঞ্জন অ্যারাউন্ড? ইয়েস, রঞ্জন, দিস ইজ রবি— আউট ফর ফান— ফার্স্ট টু জু, দেন টু মণিমা অ্যাট মানিকতলা— ইয়েস। ও নো, নট মহেশতলা, মানিকতলা— এম ফর— এম— ফর—

দরজার কাছ থেকে দেবাশিস প্রম্পট করে— মীরাট।

চোখের কোণ দিয়ে দেবাশিসকে একবার দেখে নিয়ে মাথা নাড়ে রবি। ফোনে বলে...এম ফর মাদার। এ ফর—

এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ। রবি প্রতিধ্বনি করে— অ্যান্ড এন ফর নিউ দিল্লি আই ফর ইন্ডিয়া।

দেবাশিস আস্তে আস্তে সরে আসে। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে বসে। অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরায়। কথাটা কানে বিঁধে থাকে। এম ফর মাদার।

রবি যখন গাড়িতে এসে উঠল দেবাশিস একটু গম্ভীর। গাড়ি ছেড়ে চালাতে চালাতে বলে, তুমি ওভাবে স্পেলিং করছিলে কেন? ফোনে স্পেলিং করতে জায়গার নাম বলাই সুবিধা। মাদার কি কোনও জায়গা?

রবি একটু শিশু হাসি হাসে। বলে, জায়গাই তো!

জায়গা? মাদার আবার কী রকম জায়গা?

যেমন মাদারল্যান্ড।

দেবাশিস হাসে। তারপর শ্বাস ছেড়ে বলে, কিন্তু তুমি তো শুধু মাদার বললে, ল্যান্ড তো বলোনি।

লজ্জায় দু'হাতে চোখ ঢেকে একটু হাসে রবি। বলে, ভুল হয়েছিল।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে দেবাশিস। রবি এখনও ভোলেনি, শুধু চেপে আছে। ওর ভিতরে হয়তো শুধু কষ্ট হয় মায়ের জন্য। কে জানে!

রবি সিটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসেছে, মুখে আঙুল, দুলছে সিটের ওপর, চাঁপা সতর্ক গলায় বলে, পড়ে যাবে সোনাবাবু।

তোমার কেবল ভয়। বলে রবি ইচ্ছামতো দোল খায়। বলে, বাবা, আমি পিছনের সিটে বসব, দিদির কাছে?

যাও। দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে বলে।

চাঁপা হাত বাড়িয়ে সিটের ওপর দিয়ে পিছনে টেনে নেয় রবিকে। সারাক্ষণ এরকমই করে রবি। একবার পিছনে যায়, একবার সামনে আসে। দুষ্টু হয়েছে খুব। দেবাশিস ওকে বকে না। মায়া হয়। ওর কি বড় মায়ের কথা মনে পড়ে?

দেবাশিস চন্দনাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। একটা সময় অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল তার। কাকে বিয়ে করবে তার কিছুই ঠিক ছিল না। চন্দনা ছিল সে সব মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী আর কৌশলী। কুমারী অবস্থায় সে গর্ভে দেবাশিসের সন্তান নেয়। সেই অবস্থায় তাকে ফেলতে পারার সাধ্য দেবাশিসের হয়নি। চন্দনা সন্তান নষ্ট করতে দেয়নি। বলেছে— তুমি যদি বিয়ে না কর না করবে, ও আসুক কুমারী মায়ের কোলে।

সেটাই ছিল ওর কৌশল। দেবাশিস দু' মাসের গর্ভবতী চন্দনাকে বিয়ে করে আনল। যথাসময়ে রবি হল। ওর চার বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল চন্দনা।

বড় রাগি ছিল, ভেবেচিন্তে কিছু করত না।

তৃণার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্কটা তখনও তৈরি হয়নি। তৃণা মাঝে-মধ্যে তাকে ডাকত ছবি আঁকার সুলুকসন্ধান জানতে। ওটা তখন তার বাই। জলরঙা ছবি আঁকতে গিয়ে তুলির জ্যাবড়া দাগ আর অসহিষ্ণু টান দিয়ে হায়রান হত। দেবাশিস তাকে তুলি চালাতে শিখিয়েছিল। দুটো রঙের মাঝখানে কীভাবে একটা রঙের সঙ্গে আর একটাকে মেলাতে হয় তার কৌশল অভ্যাস করাত। কিন্তু তাতে সময় নিত বড্ড বেশি। ব্যস্ত দেবাশিস তার অর্থকরী সময়টা যে নষ্ট করছে তা খেয়াল করত না। বড় ভাল লাগত।

তৃণা দেখতে খুব সুন্দর তা তো নয়, উপরন্তু বিবাহিতা, দুটি বড় বড় সন্তানের মা, এমন মেয়ের প্রতি আকর্ষণবোধ বড় অদ্ভুত দেবাশিসের পক্ষে। সে তো মেয়ে কিছু কম দেখেনি! তৃণার প্রতি এই দুর্বলতার তবে কারণ কী?

কারণ একটাই, কৈশোরকাল। সেই বয়সটায় যাবতীয় স্মৃতি বড় মারাত্মক। তৃণার মধ্যে আর কিছু না থাক, ছিল সেই স্মৃতির সৌরভ তাকে ঘিরে। রোগা দুঃখী সেই কিশোরী মেয়েটাকে সে কবে ভুলে গিয়েছিল। দুরন্ত সময় তাকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছে তার কাছে। আর একটা কারণ চন্দনা নিজে।

তৃণার সুখের ঘর কেন ভাঙতে যাবে দেবাশিস? সে ভাল লোক ছিল না কোনওদিনই। তবু তার তো রুচি ছিল। সুযোগ পেলে সে যে-কোনও মেয়েকেই উপভোগ করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাগল হয় না তো কারও জন্য! আর তৃণা পাগল-করা মেয়েও নয়। যদিও তৃণার বয়স গড়িয়ে যায়নি, তবু তো ছেলেমেয়ের মা, গিন্নিবান্নি। এখন কি আর চোখে রং ছুড়ে দেয়ালা করে কেউ? ছবি-আঁকার ছলে তারা পরস্পরের দীর্ঘশ্বাস শুনেছিল। একজনের ছিল শচীন, অন্যজনের ছিল চন্দনা। তবু এও ঠিক, পৃথিবীতে কেউ কারও নয়।

দেবাশিস একটা জীবন যদি মেয়েবাজি না করত তবে তার চরিত্রে রাশ টানার অভ্যাস হত। কিংবা যদি চন্দনা হত মনের মতো বউ, তবে রাশ টানতে পারত চন্দনাই।

তা হল না। চন্দনা তাকে ঘরে টিকতে দিত না। কেবলই বলত— কোথায় ছবি আঁকা হচ্ছে, সব আমি জানি। তুমি মরো।

তখন সুন্দর ফ্ল্যাটটায় বাস করে তারা। লিফটে ওঠে নামে। গ্যারেজে গাড়ি। রবি তখন অজস্র কথা বলে। সংসারটা তখন সবে জমে উঠেছে।

একদিন ছুটির সকালে চন্দনা দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। রবি ঘুমন্ত মাকে জ্বালাচ্ছিল খুব। উঠেই ঘা কতক দিল রবির পিঠে। যখন মারত তখন বড় নির্মমভাবে মারত, মায়া করত না, আবার একটু পরেই হামলে আদর করত। চন্দনার মাথায় একটু ছিট তো ছিলই।

সেদিন সকাল থেকেই চন্দনা বিগড়ে গেল।

দেবাশিস রোজকার মতো বসেছিল তার বাইরের ঘরে। সামনে খোলা স্টেটসম্যান, টুলের ওপর রাখা পা, পায়ের পাশে কফির কাপ। চন্দনা এসে স্টেটসম্যানটা কেড়ে নিল হাত থেকে। বলল, কী ভেবেছ তুমি?

কী ভাবব? ক্লান্ত দেবাশিস জবাব দেয়।

কত লোক অন্যায় করে ধরা পড়ে। তুমি কেন পড়ো না?

দেবাশিসের মনে পড়ে, সে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা হাত বাড়িয়ে নিয়েছিল। মনে মনে প্রার্থনা করেছিল— হে ঈশ্বর, চন্দনা কেন বেঁচে আছে? মুখে বলেছিল— চুপ করো।

চন্দনা চুপ করল না। অসম্ভব রেগে গেল। উলটোপালটা বকতে লাগল দেবাশিসকে। গালাগাল দিল অজস্র। অবশেষে কাঁদল এবং কাঁদতে কাঁদতেই অসংলগ্ন বকতে লাগল একা— তুমি আমার বাবাকে ঠকিয়েছ...আমার ছেলেকে ঠকিয়েছ— তুমি আমাকে লুকিয়ে টাকা জমাও—

এ সব কথা বাস্তব সত্য নয়। কোনও মানেও হয় না। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার মত দিল— অজস্র মাথাধরার বড়ি, ঘুমের পিল, তার ওপর নিজের নির্ধারিত অসুখের জন্য নিজস্ব প্রেসক্রিপশানে খাওয়া ওষুধ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ— সব মিলেমিশে একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

সেই মানসিক ভারসাম্যহীনতা আর স্নায়ুর বিকার থেকে কোনও দিন সুস্থ হতে পারেনি চন্দনা। একদিন মরল। সাততলা থেকে সোজা লাফিয়ে পড়ল। তখন খুব ভোর। দেবাশিস আর রবি তখনও ওঠেনি।

দেবাশিস অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেল কোর্ট থেকে। কিন্তু বেঁচে চন্দনা যতটা না ছিল, মরে তার চেয়ে ঢের বেশি ফিরে এল জীবনে। তাকে ভুলতেই তখন তৃণার পিপাসা ইচ্ছে করে খুঁচিয়ে তোলে দেবাশিস। যা অবৈধ তার মতো মাদক আর কী আছে!

বাবা! রবি ডাকে।

উঁ। দেবাশিস অন্যমনস্ক উত্তর দেয়।

চিড়িয়াখানায় আমরা কেন যাচ্ছি?

যাবে না?

অনেকবার গেছি তো। ভাল লাগেনি।

বিস্মিত দেবাশিস প্রশ্ন করে— তবে কোথায় যাবে?

রবি লজ্জার সঙ্গে বলে, বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

তবে?

মণিমার কাছে চলো।

ও। দেবাশিস গাড়ি থামিয়ে একটু হাসে। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, ঠিকই তো! সব ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা কি আর ভাল লাগে!

ফিরে যাই চলো।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে, পার্ক স্ট্রিটের কোন রেস্টুরেন্টে কী যেন খাবে বলেছিলে। খাবে না?

রবি তার চালাক হাসিটা হেসে বলে, পিপিং।

দেবাশিস বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলে, যাবে না?

যাব। বুড়োদা, নিনকু, পল্টু, থাপি, ঝুমু আর নানির জন্য নিয়ে যাব। ওদের বলেছিলাম এই রবিবারে পিপিঙের খাবার খাওয়াব।

হ্যাঁ?

হ্যাঁ। রবি হাসে!

স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে দেবাশিস। গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

বাবা।

উঁ।

মণিমা আমাকে খুব ভালবাসে।

জানি তো।

বুড়োদা, নিনকু, পল্টু সবাই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। খুব ভালবাসে। গেলে ছাড়তেই চায় না। বলে, তুই আমাদের কাছে থাক।

ও!

আমি কেন ওদের কাছে থাকি না বাবা? মণিমা সকলের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসে।

দেবাশিস সামান্য গম্ভীর হয়ে যায়। প্রথমটায় কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ রবি নিঃশব্দে বাবার মুখখানা চেয়ে দেখে। মুখ দেখে বোধ হয় বুঝতে পারে, বাবা খুশি হয়নি।

পিছন থেকে চাঁপা বলে, তুমি বাড়িতে না থাকলে আমরা কার কাছে থাকব সোনাবাবু? বাবার যে তোমাকে ছাড়া ভীষণ মন খারাপ হয়।

অল্প ক'দিন থাকব। উত্তর দেয় রবি।

তারপর চলে আসবে? চাঁপা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। আমিও তো বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।

ময়দানের ভিতর দিয়ে গাড়ি উড়িয়ে দেয় দেবাশিস। এম ফর মাদার— কথাটা ভুলতে পারে না সে। তার ফ্ল্যাটবাড়িতে চন্দনার কোনও ফটো নেই। ইচ্ছে করেই চন্দনার সব ফটো সে তার লকারে চাবি দিয়ে রেখেছে, যাতে রবির চোখে না পড়ে। এই বয়সে মাতৃহীনের মায়ের কথা বেশি মনে পড়া বড় কষ্টকর। চন্দনার শাড়ি পোশাক, রূপটানের সব জিনিসপত্র, তার হাতের কাগজ কিংবা যত চিহ্ন ছিল সবই সরিয়ে দিয়েছে দেবাশিস, শাড়িগুলো বিলিয়ে দিয়েছে একে-ওকে। মানিকতলায় বোন ফুলিকে কয়েকটা দামি শাড়ি দিয়েছে, ও নিতে চায়নি তবু জোর করে দিয়েছিল দেবাশিস— পড়ে থেকে নষ্ট হবে, তুই পর।

একদিন মনের ভুলে ফুলি একটা জয়পুরি ছাপওলা সিল্কের শাড়ি পড়েছিল রবির সামনে। রবি হাঁ করে কিছুক্ষণ দেখল শাড়িটা, তারপর মুখখানায় হাসি কান্না মেশানো একরকম অদ্ভুতভাব করে বলল, মণিমা, আমার মায়ের ঠিক এমন একটা শাড়ি ছিল।

শিশুদের মনের খবর রাখা খুবই শক্ত। ওদের স্মৃতি কত দূরগামী, কত ছবির মতো স্পষ্ট ও নিখুঁত তা বুঝতে পেরে একরকম অদ্ভুত যন্ত্রণা পেয়েছিল দেবাশিস। পারতপক্ষে সে তার মায়ের কথা বলে না। জানে, সে মায়ের কথা বললে তার বাবা খুশি হয় না। এতটা বুদ্ধি ওই শিশু-মাথায়।

বুকের ভিতরটা চলকে ওঠে দেবাশিসের। ছেলেটার প্রতি হঠাৎ ভালবাসায় ছটফট করে। পার্কস্ট্রিটের একটা বড় রেস্টুরেন্টে বসে মেনুটা রবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, তোমার যা ইচ্ছে অর্ডার দাও। যা খুশি।

বলে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

রবি অবাক হয়ে বাবার দিকে চায়। মিটমিটে চোখে বাবার মুখখানা দেখে বলে, আমার তো ক্ষিদে নেই।

দেবাশিস হতাশ হয়ে বলে, সে কী!

রবি মাথা নেড়ে বলে, দিদি সকালে কত খাইয়েছে! বলতে বলতে গেঞ্জিটা ওপর দিকে তুলে পেটটা দেখিয়ে বলে, পেট দ্যাখো কেমন ভর্তি।

দিনের মধ্যে একশোবার রবির গায়ে হাত দিয়ে দেখত চন্দনা, টেম্পারেচার আছে কি না! রবির গায়ে হাত দিয়ে আবার নিজের গা দেখত, কখনও বা দেবাশিসকে ডেকে বলত— দেখি তোমার গা রবির চেয়ে ঠাণ্ডা না গরম।

সব মায়েরই এই বাতিক থাকে। তার নিজের মায়েরও ছিল। আরও, দিনে একশোবার রবিকে খাওয়ানোর জন্য মাথা কুটত চন্দনা, খাইয়ে পেট দেখত। খেতে না চাইলে অনুনয় বিনয়, খোশামোদ, তারপর কিলচড় কষাত। বলত— না খেয়ে একদিন শেষ হয়ে যাবি। আমি মরলে কেউ তোর খাবার নিয়ে ভাববে ভেবেছিস?

খাওয়ার ব্যাপারটা হলেই ছোট্ট রবি মাকে পেট দেখাত।

গেঞ্জিটা নামিয়ে করুণ চোখে রবি বলে, খাব না বাবা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে, আচ্ছা।

বাবা।

উঁ।

মণিমা তো মুরগি খায় না।

দেবাশিস খেয়াল করল। বলল, তাই তো! কিন্তু অর্ডার দিয়ে দিলাম যে।

মণিমার জন্য কী নেবে?

তুমিই বলো।

সন্দেশ আর দই, হ্যাঁ বাবা?

আচ্ছা।

রবি খুশি হয়ে হাসল। দেবাশিস রবির কথা শোনে। রবি যা চায় তাই দেয়। রবির যা ইচ্ছা তাই হয়। চন্দনার সময়ে তা হত না। রবি কিছু বায়না করলেই ক্ষেপে যেত চন্দনা। বকত। মারত। তবু সারাদিন চন্দনার পায়ে পায়ে ঘুরত রবি। বকা খেত, মার সহ্য করত, তবু আঁটালির মতো লেগেও থাকত।

ওই রাগি আহাম্মক মেয়েটার মধ্যে আকর্ষণীয় বস্তু কী ছিল? ভেবেই পায় না দেবাশিস। যে অবস্থায় চন্দনার বিয়ে হয়েছিল তাতে তার বাপের বাড়ির দিকের কেউ খুশি হয়নি। চন্দনার বাবা তাকে প্রচুর মারধর করে বেঁধে রেখেছিলেন, মা কাঁদতে কাঁদতে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই গোলমাল হাঙ্গামার ভিতর থেকে চন্দনাকে খুব শালীনতার সঙ্গে বিয়ে করে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। দেবাশিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে একদিন ওদের বাড়ি চড়াও হয়। পাড়ার ছেলেদের আগে থাকতেই মোটা পুজোর চাঁদা দেওয়া ছিল। দেবাশিস চন্দনার বাবাকে শাসিয়ে এল— ফের ওর গায়ে হাত তুলবেন তো মুশকিল আছে।

চন্দনার বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। আজকাল ভদ্রলোক মানেই ভেড়ুয়া। এরপর থেকে চন্দনার ওপর অত্যাচার কমে গেল বটে, কিন্তু বাড়ির লোক তার সঙ্গে কথা বলত না। দেবাশিস তখন মানিকতলায় বোনের বাড়িতে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। একজন গর্ভবতী মেয়েকে বিয়ে করে তোলা ভগ্নীপতি ভাল চোখে দেখেনি। বোনও রাজি ছিল না। চন্দনা প্রায়ই টেলিফোন করে বলত— বেশি কিছু তো চাইনি, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দাও। তা হলেই হবে।

দেবাশিস বলত— তা হবে না। সেটা তো পরাজয় মেনে নেওয়া। আমি তোমাকে ফুল ফ্লেজেড বিয়ে করে নিজের বাসায় তুলব।

তাই করছিল সে। পাগলের মতো ঘুরে যাদবপুরে বাসা ঠিক করে ফেলল। হাতে টাকার অভাব ছিল না। প্রচুর গয়না শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে বিয়েবাড়ি ভাড়া করে পুরুত ডেকে বিয়ে করল। চন্দনার এক দাদা সম্প্রদান করে যান।

চন্দনার মতো একটা অপদার্থ মেয়ের জন্য এত পরিশ্রম আর হাঙ্গামা কেন করেছিল দেবাশিস, তা ভাবতে অবাক লাগে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই চন্দনার তাগাদায় অভিজাত পাড়ায় অনেক টাকা দিয়ে পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট কিনল। এই বিপুল উদ্যোগ বৃথা গেছে। বিয়ের অল্প কিছু পরেই দেবাশিস বুঝতে পারে, বিয়ে কোনও স্বর্গীয় বিধি নয়। চন্দনা তার বউ হওয়ার উপযুক্ত নয়। এত অগভীর মন, এত রাগ, অধৈর্য, এমন অর্থকেন্দ্রিক মন-সম্পন্ন মেয়ের সঙ্গে কী করে থাকবে সে। নিজে চরিত্রহীন হলেও তার কিছু শিল্পীসুলভ নিস্পৃহতা আছে, সামান্য কিছু ব্যবসায়িক সততা, কর্মনিষ্ঠা। তার মনে হত সারাদিন কাজের পর পুরুষ যখন বাসায় ফেরে তখন দগ্ধ দিনে ছায়ার মতো স্ত্রী তাকে আশ্রয় দেয়। স্ত্রী হচ্ছে বিশ্রামের জায়গা।

দেবাশিস প্রায়দিনই বাসায় ফিরে চন্দনাকে দেখতে পেত না। হয় মার্কেটিং, নয় সিনেমা-থিয়েটার, নয়তো বাপের বাড়ি চলে যেত চন্দনা। বিয়ের পর বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে যেন নিদারুণ ভাল হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়ে নিঃসঙ্গ তৃণা এক নিভৃত জলস্রোতে নৌকোর মতো তার কাছাকাছি এসে গেল। উতরোল স্রোত। কিন্তু নিশ্চিত। দেবাশিস কোনওদিনই কারও প্রেমে পড়েনি এতকাল। এবার পড়ল। এক অসহনীয় অবস্থায়। অসম্ভব এক প্রেম।

রবি এখন ওই তার মুখোমুখি বসে আছে। কী চোখে রবি চন্দনাকে দেখেছিল তা ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। ওই রাগি, অপদার্থ, অগভীর মাকে কেন অত ভালবাসত রবি? রবির কাছ থেকে তা জানতে ইচ্ছে হয়! জানতে ইচ্ছে করে, কোনওভাবে না কোনওভাবে ভালবাসার কোনও উপায় ছিল কি না!

বেয়ারা মস্ত একটা বাদামি কাগজের প্যাকেটে মোড়া বাক্স নিয়ে এল ট্রেতে। সঙ্গে বিল। দাম আর টিপস মিটিয়ে উঠে পড়ে দেবাশিস। ঘড়ি দেখল। এখনও অনেক সময় আছে। চিড়িয়াখানার সময়টা বেঁচে গেল।

## ॥ চার ॥

পোশাক যতই পরুক, আর যতই সাজুক, তৃণার মুখের দুঃখী ভাবটা কখনও যায় না। একটা অপরাধবোধে মাখা মুখখানায় করুণ হাসিহীন, শুকনো ভাব ফুটে থাকেই। চোখে ভীরু চঞ্চল ভাব।

বেরোবার মুখে দেখল, হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে এল মনু। চমৎকার লালরঙা স্পোর্টস সাইকেল। মনুর চেহারা বেশ বড়সড়। পরনে সাদা শর্টস, সাদা গেঞ্জি, কাঁধে একটা টার্কিশ তোয়ালে, পায়ে কেডস আর মোজা। হাত পায়ের গড়ন সুন্দর, বুকের পাটা বড়। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। মাটিতে পা ঠেকিয়ে সাইকেলটা গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড় করাল। চোখ তুলে মৌন মুখে মাকে দেখল একবার।

ভারী পাল্লার কাচের দরজার সঙ্গে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল তৃণা। বুকের ভিতরটা কেমন চমকে ওঠে। ছেলের চোখে চোখ পড়তেই, হাত পায়ে সাড় থাকে না। মনু আজকাল কদাচিৎ কথা বলে। দিনের পর দিন একনাগাড়ে উপেক্ষা করে যায়।

কাচের দরজার কাছ থেকে একটুও নড়তে পারল না তৃণা। মনু সাইকেলে বসে থেকেই সাইকেলের ঠেস দেওয়ার কাঠিটা পা দিয়ে নামাল। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে লঘু পায়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। তৃণার দিকে এক পলক দেখল আবার। চোদ্দো বছরের ছেলের আন্দাজে মনুকে বড় দেখায়। চেহারাটা তো বড়ই, চোখের দৃষ্টিতে পাকা গাম্ভীর্য, এটা বোধ হয় ওর বাপের ধারা। বয়সের আন্দাজে ওর বাপও গম্ভীর, বয়স্কজনোচিত হাবভাব।

সামনেই মস্ত কয়েরের পাপোশ পাতা। মনু তার কেডসটা ঘষে নিচ্ছিল, দরজার চৌকাঠে হাত রেখে। ওর শরীরের স্বেদগন্ধ, রোদের গন্ধ তৃণার নাকে এল। সে যে এই বড়সড় সুন্দর চৌখস ছেলেটির মা তা কে বিশ্বাস করবে! চেহারায় অমিল, স্বভাবে অমিল, তার ওপর মনু আজকাল ডাকখোঁজ করেই না। কতকাল 'মা' ডাক শোনেনি তৃণা।

তাকে কাচের দরজায় অমন সিঁটিয়ে থাকতে দেখে মনু আবার একবার তাকাল, ভ্রূ কোঁচকাল। মনে মনে বোধ হয় কী একটু শুঁকে নিল বাতাসে। হঠাৎ চূড়ান্ত তরল গলায় বলল, চ্যানেল নাম্বার সিক্স! না?

তৃণা ভারী চমকে ওঠে। সত্যি কথা। সে যে সেন্টটা আনিয়েছে তা চ্যানেল নাম্বার সিক্স। কিন্তু এত ঘাবড়ে গিয়েছিল তৃণা যে উত্তর দিতে পারল না। কেবল বিশাল দুটি চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল ছেলের দিকে, ভূতগ্রস্তের মতো। কারণ, ছেলের চোখে চোখ রাখতে আজকাল তার মেরুদণ্ড ভেঙে নুয়ে যায়।

মনু অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করে না। চটপটে পায়ে ভিতরবাগে চলে যায়, লবি পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে। ও এখন ঠাণ্ডা জলে স্নান করবে, পোশাক পরবে, তারপর বেরোবে কোথাও।

ওর চলে-যাওয়ার রাস্তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে তৃণা। তক্ষুনি বেরোতে পারে না। আস্তে আস্তে ঘুরে আসে। অনেকখানি মেঝে পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে দোতলায়। একটু বিশ্রাম করে যাবে।

মনু আর রেবার ঘর বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে। মাঝখানে হল, হলে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকের ঘর থেকে সে মৃদু একটা শিসের শব্দ শোনে। এক পা এক পা করে এগোয় দক্ষিণের দিকে। এদিকে সে আজকাল একদম আসে না। এলে ছেলেমেয়েরা বিরক্ত হয়, ভ্রূ কোঁচকায়, সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করে। এ বাড়িতে সে এক পক্ষ, আর ছেলে মেয়ে বাপ মিলে আর এক পক্ষ। মাঝখানে অদৃশ্য কুরুক্ষেত্রের বিচিত্র সব চোখের বাণ ছোটাছুটি করে, আর মৌনতার অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় পরস্পরের দিকে।

মনুর ঘরে মনু আছে। দরজা আধখোলা, পর্দা ঝুলছে। অন্যপাশে রেবার ঘর। ঘরটা নিস্তব্ধ। তৃণা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, ভিতরে কোনও শব্দ নেই। খুব দুঃসাহসে ভর করে সে কাঁপা, ঠাণ্ডা, দুর্বল হাতে পর্দা সরিয়ে ভিতরে পা দেয়। ফাঁকা ঘর। একধারে বইয়ের র‍্যাক, পড়ার টেবিল, ওয়ার্ডরোব, আলমারি, মাঝখানে দামি চেয়ার কয়েকটা। নিচু সেন্টার টেবিলে তাজা ফুল রাখা।

ঘরভর্তি মৃদু ধূপকাঠির সৌরভ। রেবার বয়স বারো, কিন্তু সে একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার মতোই থাকে। তৃণা ফোম রাবারের গদিআলা বিছানাটায় একটু বসে। বুকজোড়া ভয়। পড়ার টেবিলের ওপর স্ট্যান্ডে রেবার ছবি। পাতলা গড়নের ধারালো চেহারা। নাকখানা পাতলা ফিনফিনে, উদ্ধত। টানা চোখ।

সব মিলিয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। সে তুলনায় মনুর চেহারাটা একটু ভোঁতা, রেবার মতো বুদ্ধি মনু রাখে না। রেবা মডার্ন স্কুলের ফার্স্ট গার্ল। সম্ভবত হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করবে। মনু অত তীক্ষ্ণ নয়, সে কেবল টেনিস কিংবা অন্য কোনও খেলায় ভারতের এক নম্বর হতে চায়। হাসিখুশি আহ্লাদি ছেলে, মনটা সাদা। সেই কারণেই বোধ হয় কখনও সখনও মনু এক-আধটা কথা তার মার সঙ্গে বলে ফেলে।

কিন্তু রেবার গাম্ভীর্য একদম নিরেট আর আপসহীন। যেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনই তীক্ষ্ণ তার উপেক্ষার ভঙ্গি। যতরকমভাবে অপমান এবং উপেক্ষা করা যায় ততরকমই করে রেবা। মার প্রতি মেয়ের এমন আক্রোশ কদাচিৎ কোনও মেয়ের মধ্যে দেখা যায়। মনুকে যতটা ভয় করে তৃণা, কিংবা শচীনকে, তার শতগুণ ভয় তার রেবাকে। মেয়েদের চোখ আর মন সব দেখে, সব ভাবে। ফ্রক-পরা রোগা মেয়েটাকে তৃণা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ মানুষ বলে জানে।

ঘরে ধূপকাঠির গন্ধ, স্নো ক্রিম ফাউন্ডেসনের গন্ধ, ঘর-সুগন্ধির মৃদু সুবাস। দেওয়ালের রং হালকা নীল, আর ধূসর। বিপরীত দেওয়ালগুলি একরঙা। নানারকম আলোর ফিটিংস লাগানো, জানালা দরজায় পর্দা, পেলমেটে কেষ্টনগরের পুতুল সারি সারি সাজানো। বুককেসের ওপর একটা রেডিয়ো টেপরেকর্ডার, একধারে মিউজিক সিস্টেম আর সিডি এবং ক্যাসেটের ক্যাবিনেট। সমস্ত বাড়িটাই দেবাশিস সাজিয়েছিল। আসবাবপত্রগুলি সবই সাপ্লাই দিয়েছিল তার কোম্পানি।

ফটো-স্ট্যান্ডে রেবার ছবিটার দিকে ভীত চোখে চেয়ে ছিল তৃণা। তার মনে হচ্ছিল, সে রেবার মুখোমুখি বসে আছে। রেবা তাকে দেখছে। ফটোতে রেবার সুন্দর হাসিটা যেন আস্তে আস্তে পাল্টে শ্লেষ আর ঘৃণার হাসি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণার বুক কেঁপে কান্নার গন্ধ মেখে একটা শ্বাস বেরিয়ে আসে। দূরে বৃষ্টি হলে যেমন জলের গন্ধ আসে বাতাসে তেমনই কান্নাটা ঘনিয়ে উঠছে। গন্ধ পায় তৃণা। কিন্তু বৃথা। কত তো কেঁদেছে তৃণা, কেউ পাত্তা দেয়নি।

তৃণা বহুকাল বাড়ির এদিকে আসেনি। রেবার ঘরে ঢোকেনি। এখন একা চোরের মতো ঢুকে তার বড় ভাল লাগছিল। বারো বছর বয়সে মেয়েরা মায়ের বন্ধু হয়ে ওঠে। এই বয়ঃসন্ধির সময়ে কত গোপন মেয়েলি তথ্যের লেনদেন হয় মা আর মেয়ের মধ্যে, এই বয়সেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় পাকা। মেয়ে আর মেয়ে থাকে না, সখী হয়ে ওঠে।

কিন্তু হায়, রেবার সঙ্গে তৃণার কোনওদিনই আর সখিত্ব হবে না। ভিতু তৃণাকে মানসিক ভারসাম্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দেবে রেবা— বুদ্ধিমতী এবং নিষ্ঠুর ওই মেয়েটা।

তৃণা উঠল, রেবা গানের স্কুলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে, কিন্তু নিঃশব্দে ফিরবে না। ওর ছটফটে দৌড়পায়ের আওয়াজ অনেক দূর থেকেই পাওয়া যায়। তাই সাহস করে তৃণা উঠে ঘুরে ঘুরে ওর ঘরটা দেখে। বুককেস খুলে বই হাতড়ায়। ওয়ার্ডরোবের ভিতরে ওর হরেক ফ্রক, ঘাগরা, প্যারালেলস আর শাড়িতে হাত বুলিয়ে নেয়। বিছানার ওপর একটা নাইটি পড়ে আছে। ভীষণ পাতলা একটা বিদেশি কাপড়ের তৈরি। সেটা গুছিয়ে ভাঁজ করে রেখে দেয়। বেডকভারটা টান করে একটু। পড়ার টেবিলটা সাজানো আছে। তবু একটু নেড়েচেড়ে রেখে দেয়, খুঁজতে খুঁজতে কয়েকটা ড্রইং খাতা পায় তৃণা, তাতে জলরঙা সব ছবি আঁকা। বুকের ভিতরটা ধুপধুপ করে ওঠে। রেবা কি ছবি আঁকে!

বুককেসের মাথায় রঙের বাক্স আর তুলির আণ্ডিল খুঁজে পায় তৃণা। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, রেবা ছবি আঁকে। দরজার পাশে একটা নিচু শেলফে তবলা ডুগি, হারমোনিয়ম, তানপুরা সব সাজানো। হারমোনিয়ামের বাক্সের ওপর একটা কবিতার বইও পেয়ে যায় সে। বুক একটা আনন্দ সদ্যোজাত পাখির ছানার মতো শব্দ করে। রেবা কি কবিতা পড়ে।

আবার গিয়ে বুককেসটা খোলে তৃণা। বইগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রাখা নেই। তাই অসুবিধে হয়। তবু একটু খুঁজতেই তার মধ্যে কিছু কবিতার বই খুঁজে পায় তৃণা। অবাক হয়ে উল্টেপাল্টে বইগুলো দেখে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যায়।

অন্যমনস্কতাবশত সে পায়ের শব্দটা শুনতে পায়নি, যখন শুনল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

পর্দা সরিয়ে রেবা ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রোগা তীক্ষ্ণ মুখখানা হঠাৎ সন্দিগ্ধ আর কুটিল হয়ে

উঠল। ভ্রূ কোঁচকানো, রেবা তার দিকে একপলক চাইল তারপর চোখ ফিরিয়ে পা নেড়ে চটিদুটো ঘরের কোণে ছুড়ে দিল। ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। একপলকে সে তাকিয়েছিল তৃণার দিকে তাতে চোখে একটু বুঝি বিস্ময়, আর একটু ঘৃণা। বাদবাকি ব্যবহারটা উপেক্ষার।

পরনে একটা কমলারঙের হালফ্যাশনের ফ্রক। রোগা হলেও রেবা বেশ লম্বা। গায়ে মাংস লাগলে একদিন ফিগারটা ভালই দেখাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের একটা ব্রণ টিপল। আঙুল দিয়ে ঘষল জায়গাটা।

বলল, কী বলতে এসেছ?

একটু চমকে উঠল তৃণা। এঘরে সে যে অনধিকারী তা মনে পড়ল। বিপদ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, সে তো আর পালাতে পারে না এখন। আস্তে করে বলল, তোর আজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে!

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে রেবা উত্তর দেয়— এ সময়েই ছুটি হয়। তাড়াতাড়ি আবার কী?

বলে আয়নায় মুখ দেখতে থাকে। আয়নার ভিতর দিয়েই বোধ হয় তৃণাকে এক-আধ পলক দেখে নিল। কিন্তু তৃণার সেদিকে তাকাতে সাহসই হল না। অপরাধীর মতো মুখ নিচু রেখে বলে, তুই কি ছবি আঁকিস রেবু?

রেবা একটু অবাক হয় বোধ হয়। বলে, হ্যাঁ আঁকি।

জানতাম না তো!

ক্লাসে আমাদের ড্রইং শেখায়। এ সবাই জানে।

কবিতা পড়িস?

পড়ি।

তৃণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

রেবা একটু ঝাঁজ দিয়ে বলে, আর কী বলবে?

কিছু না।

আমার এখন অনেক কাজ আছে। পোশাক ছাড়ব। তুমি যাও।

যাচ্ছি। তৃণা উঠে দাঁড়ায়। কোনও বয়সের মেয়েই মায়ের সামনে পোশাক ছাড়তে লজ্জা পায় না। তবু তৃণা সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল। এই ঘরে তার উপস্থিতির কোনও জরুরি অজুহাত খুঁজে না পেয়ে দুর্বল গলায় বলে, তুই নতুন কী রেকর্ড কিনলি দেখতে এসেছিলাম।

রেবা উত্তর দিল না। আয়নায় মুখ দেখতে থাকল।

তৃণা একটু শুকনো গলায় বলে, তোর ওয়ার্ডরোবে শাড়ি দেখছিলাম। পরিস না কি?

ইচ্ছে হলে পরি। তুমি যাও।

যাচ্ছি। আমার তো অনেক শাড়ি। তুই নিবি?

না।

কেন?

আমার অনেক আছে। দরকার হলে বাপি আরও কিনে দেবে।

তৃণা শ্বাস ছেড়ে আপন মনে ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ে। এ সত্য তার জানা। প্রয়োজন হলে শচীন রেবাকে বাজারসুদ্ধু শাড়ি কিনে এনে দেবে। রেবা নিজে গিয়েও কিনে আনতে পারে বাজার ঘুরে, পছন্দমতো। তবু বাঙালি ঘরের রেওয়াজ, বয়স হলে মেয়েরা মায়ের শাড়ি পরে। সেটা শাড়ির অভাবের জন্য নয়। নিজের শাড়ি পরিয়ে মা মেয়েকে দেখে। মুখ টিপে মনে মনে হাসে। মায়েরা ওই ভাবেই আবার জন্মায় মেয়ের মধ্যে। কিন্তু রেবার তা দরকার নেই।

মুখশোষ টের পায় তৃণা। হাতে পায়ে শীত, মাথা গরম, শ্বাস গরম। দু-পা হেঁটে যায় দরজার দিকে। একটু দাঁড়ায়। ফিরে তাকায় একবার। তার ভ্রূ কোঁচকানো, চোখে বিশুষ্ক কান্না। ওই শুয়ের গ্যাংলা মেয়েটা কত সহজে তার মা-পনা ঘুচিয়ে দেয়।

এ বাড়িতে দুটো ভাগ আছে। একদিকে তৃণা একা, অন্যদিকে শচীন, মনু আর রেবা। সিন্ডিকেট। ঘরগুলোর মাঝখানে যোজন-যোজন ব্যবধান পড়ে থাকে সারাদিন। তার পক্ষে কেউ নয়। তবু ওর

মধ্যে কি মনু একটু মায়ের টান টের পায়? অনেকদিন ভেবেছে তৃণা। ঠিক বুঝতে পারে না। ন' মাসে ছ' মাসে এক-আধবার মা বলে ডেকে ফেলে মনু। হয়তো কোনও কথা বলে ফেলে। খেতে বসে হয়তো এটা-ওটা চায়। তড়িঘড়ি এগিয়ে দেয় তৃণা। মনু কখনও কিছু বললে বাধ্য মেয়ের মতো তাই করে, তাই দেয়। কিন্তু বুকে এত কাঙালপনা নিয়েও তৃণা জানে, মনুর আসলে টান নেই। ও সোজা সরল ছেলে, দিনরাত খেলার কথা ভাবে, মাকে নিরন্তর ঘৃণা করার কথা মনে রাখতে পারে না। অন্যমনস্কতাবশত ভুলে যায়। একটু আগে কেমন স্মিতমুখে বলেছিল— চ্যানেল সিক্স না?

রেবার ভুল হয় না। নিরন্তর বুকে সাপের মতো পুষে রাখে উপেক্ষা আর ঘেন্না। কখনও তা থেকে অন্যমনস্ক হয় না রেবা। বয়স মোটে বারো বছর, এখনও ঋতুমতী নয় বোধ হয়, তবু কেমন সব গোপন করে রেখেছে মায়ের কাছে। কেমন স্বাধীন, ডাকাবুকো।

তৃণা যাই-যাই করেও খানিক দাঁড়ায়, বলে, আমার লকারে গাদা গয়না পড়ে আছে। পাঠিয়ে দেব'খন, পরিস।

কে চেয়েছে?

চাইতে হবে কেন? ও তো তোর পাওনা!

আমি গয়না পরি না! তার ওপর সোনার গয়না! মাগো! বলে ঠোঁট মুখের একটা উৎকট ভঙ্গি করে রেবা।

তৃণা হ্যাংলার মতো হাসে। বলে, তা অবিশ্যি ঠিক। সলিড সোনার গয়না তোদের বয়সিরা আজকাল কেউ পরে না। বরং ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে নিস।

আমি পরব না। তুমি পরো।

তুই তো একরত্তি মেয়ে, ওই রোগা শরীরে আর ক'খানা গয়নাই বা ধরবে। আমার অনেক আছে। তোকে দিয়েও থাকবে— তোরই তো সব।

তোমার কিছুই আমার নয়। না পরলে বিলিয়ে দিয়ো।

কেন, পরবি না কেন?

ইচ্ছে। শাড়ি গয়নার কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। তুমি এখন যাও।

ভুল অস্ত্র। কিন্তু এ ঠিক তৃণার দিক থেকে লোভ দেখানো নয়। কিছুক্ষণ রেবার ঘরে থাকার জন্য এ হচ্ছে এলোপাথাড়ি কথা কওয়া, নইলে সে জানে, রেবার কিছু অভাব নেই। এখনকার মেয়েরা শাড়ি গয়নার নামে ঢলে পড়ে না।

রেবা খাটের অন্যধারে বসে পা দোলায়। পায়ের আঙুলের রুপোর চুটকিতে ঝুনঝুন শব্দ হয় একটু। খুব অবহেলার অনায়াস ভঙ্গি। তৃণার বারো বছর বয়সটা কেটেছে বিছানায়। ওই সময়ে এত সতেজ, প্রাপ্তবয়স্কতার ভাবভঙ্গি তার ছিল না। ওই বয়সে ছিল কত ভয়, সংশয়, কত আত্ম-অবিশ্বাস! তবু তৃণা মনে মনে একরকম খুশিই হয়। মেয়েটা তার মতো হবে বোধ হচ্ছে। ছবি আঁকে, কবিতা পড়ে, শাড়ি-গয়নার দিকে মন নেই।

ও ঘরের বাথরুম থেকে মনুর সুরহীন হিন্দি গান শোনা যায়। তার সঙ্গে জলের প্রবল শব্দ। সেই জলশব্দে তেষ্টা পায় তৃণার। আসলে বুকটা কাঠ হয়েই ছিল। জলের কথা খেয়াল হচ্ছিল না তার।

ভিখিরির মতো তৃণা বলে, একটু জল খাওয়াবি রেবু?

রেবা ভীষণ বিরক্ত হয়। তার রোগা, তিরতিরে বুদ্ধির মুখখানায় কোনও মুখোশ নেই। সহজেই রাগ, বিরক্তি, অভিমান বোঝা যায়। ভ্রূ, নাক, চোখ কুঁচকে উঠল। তবু পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দেয়ালে পিয়ানো রিডের মতো একটা সুইচ টিপে ধরল।

ঠিন ঠিন করে গোটা-দুই সুরেলা আওয়াজ হল ভিতরে। অমনি ঝি দুর্গার মা এসে দাঁড়ায় দরজায়, নীরবে।

রেবা বলে, এক গ্লাস জল।

এরকমই হওয়ার কথা। রেবা নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবে না, এ কি জানত না তৃণা?

দুর্গার মা হলঘরের কুলার থেকে ঠাণ্ডা জল এনে দিল। ট্রের ওপর স্বচ্ছ কাটগ্লাসের পাত্র, ওপরে একটা কাচের ঢাকনা। জলটা হিরের মতো জ্বলছে। তৃণা সবটুকু খেয়ে নিল।

রেবা বলে, এবার হয়েছে? এখন যাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তৃণা ভাল মেয়ের মতো বলে, এই খাড়া দুপুরে আবার বেরোবি নাকি?

বেরোলেই বা!

কোথায় যাবি?

কাজ আছে।

তুই যে কবিতার বইগুলো কিনেছিস ওগুলোর সব আমার নেই। এক আধখানা দিস তো, পড়ব।

রেবা উত্তর দিল না। ওয়ার্ডরোব থেকে পছন্দমতো পোশাক বের করতে লাগল। একটা লুঙ্গি আর কামিজ বের করে সাজাল বিছানার ওপর। বিশুদ্ধ সিল্কের হালকা জামরঙের লুঙ্গি। সোনালি সিল্কের ওপর ছুঁচের কাজ-করা কামিজ।

বাঃ ভারী সুন্দর তো।

কী সুন্দর! ঝামরে ওঠে রেবা।

পোশাকটা। কবে করালি?

রেবা তার পাতলা ধারালো মুখখানা তুলে তৃণাকে এক পলকের কিছু বেশি লক্ষ করল। তৃণা চোখ সরিয়ে নেয়।

রেবা বলে, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও।

তৃণা হ্যাংলার মতো তবু বলে, বড্ড রোদ উঠেছে আজ। ছাতা নিবি না?

সে আমি বুঝব।

রেবু, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

তুই অমন করছিস কেন?

রেবা উত্তর না দিয়ে তার ঘরের লাগোয়া নিজস্ব বাথরুমে চলে গেল। সশব্দে দরজা বন্ধ করল।

ফাঁকা ঘরে একা তৃণা দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিই তার শরীর খারাপ লাগছিল। খুব খারাপ, যেন বা গা ভরে জ্বর আসছে। চোখে জ্বালা, হাত-পা কিছুই যেন তার বশে নেই। আর মাথার মধ্যে চিন্তার রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা টের পায় সে। পূর্বাপর কোনও কথাই সাজিয়ে ভাবতে পারে না।

শরীরটা কাঁপছিল, খুব ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে তৃণা। হলঘরে হালকা অন্ধকার। ঠাণ্ডা। একটু দাঁড়ায়, তারপর অবশ হয়ে দেয়ালের গায়ে লাগানো নরম কৌচটায় বসে পড়ে। কৌচের পাশে মস্ত রঙিন কাঠের বাক্সে লাগানো পাতাবাহারের গাছের পাতা তার গাল স্পর্শ করে।

ঝিম মেরে একটুক্ষণ বসে থাকে তৃণা। কতকাল সে তার শরীরের কোনও খোঁজ রাখে না, ভিতরে ভিতরে কী অসুখ তৈরি হয়েছে কে জানে! মাথাটা ঠিক রাখতে পারছে না সে। স্খলিত হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি, পারম্পর্যহীন সব এলোমেলো কথা ভেসে আসছে মনে। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে খুব।

একটা তীব্র শিসের শব্দে সে মুখ তোলে। গায়ে ব্যানলনের দুধসাদা গেঞ্জি, পরনে ব্লু-জিন্স্‌ পরা মনু নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ডান হাতের ব্রেসলেটে ঢিলা করে পরা ঘড়িটা দেখল। সময়টা বিশ্বাস হল না বুঝি। তারপর তৃণাকে লক্ষ না করেই আবার চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে।

পাতাবাহারের আড়াল থেকে মনুর সুন্দর চেহারাটা দেখে তৃণা। এই বয়সেই মনু মোটর চালায়, টেনিস খেলে, বিদেশি নাচ শেখে। তৃণার জগৎ থেকে অনেক দূরে ওর বসবাস। বড়সড় স্বাস্থ্যবান ওই ছেলেটা যে তার গর্ভজ সন্তান, তা তৃণার বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হলেও এক এক সময়ে বড় ভয় করে, এক এক সময়ে অহংকার হয়। কিন্তু এ তো সত্যি কথা, মনুর জগতে তৃণা বলে কেউ নেই।

সিঁড়ির মাথায় চলে গিয়েছিল মনু। এক্ষুনি নেমে যাবে।

তৃণার গলায় একটুও জোর ফুটল না। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল— মনু!

ডাকটা মনুর শোনার কথা নয়। মস্ত হলঘরটার অন্য প্রান্তে চলে গেছে সে। তার ওপর শিসে একটা গরম হিন্দি টিউন তুলছে। তা ছাড়া যৌবনবয়সের চিন্তা আছে, আর আছে ঘরের বাইরে জগতের

আনন্দময় ডাক। মায়ের ক্ষীণকণ্ঠ তার শোনার কথা নয়। তবু দ্রুত দু' ধাপ সিঁড়ি চঞ্চল পায়ে নেমে গিয়েও দাঁড়াল সে! একটু এপাশ ওপাশ তাকাল। হয়তো ক্ষীণ সন্দেহ হয়ে থাকবে যে কেউ ডেকেছে।

পাতাবাহারের আড়ালে মুখখানা ঢেকে তৃণা তেমনি ক্ষীণ গলায় বলে, মনু, আমি এখানে।

এবার মনু শুনতে পায়। ফিরে তাকায়। মুখে একটু ভ্যাবলা অবাক ভাব। শরীরটা যত বড়ই হোক, ওর বয়সে এখনও ছেলেরা মায়ের আঁচলধরা থাকে।

মনু তাকে দূর থেকে দেখল। রাঙা শাড়ি পরেছে তৃণা, মেখেছে দামি বিদেশি সুগন্ধ, আর নানা রূপটান। নষ্ট মেয়ের সাজ। একটু আগে বাড়িতে ঢোকার সময়ে তাই কি ঠাট্টা করে মনু বলেছিল— চ্যানেল নাম্বার সিক্স, না? নষ্টামিটা কি তৃণার শরীরে খুব স্পষ্ট হয়ে আছে?

মনু সিঁড়ির দু' ধাপ উঠে আসে। হলঘরটা লম্বা পদক্ষেপে পার হয়ে সামনে দাঁড়ায়। মুখে একটা গা-জ্বালানো ঠাট্টার হাসি। হালকা গলায় বলে, আরে! তুমি তো বেরিয়ে গেলে দেখলাম!

তৃণা তৃষিত মুখখানা তুলে ওকে দেখে। কী বিরাট, কী প্রকাণ্ড সব মানুষ এরা।

মাথা নেড়ে তৃণা বলে, যাইনি।

যাওনি তো দেখতেই পাচ্ছি। কী ব্যাপার?

তুই কোথায় যাচ্ছিস?

বেরোচ্ছি।

আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

শুনে মনুর মুখে খুব সামান্য, হালকা জলের মতো একটু উদ্বেগ খেলা করে গেল কি? বলল, শরীর খারাপ তো শুয়ে থাকো।

মনুর মুখখানা অবিকল তৃণার মতো। মাতৃমুখী ছেলে। ওর চোখে একটা মেয়েলি নম্রতা আছে। এ সবই তৃণার চিহ্ন। মনুর মুখে চোখে তৃণার চিহ্ন ছড়ানো আছে। অনেকদিন বাদে একটু লক্ষ করে তৃণা খুব গভীর একটা শ্বাস ফেলে।

মনু একটু ঝুঁকে তাকে দেখে নিয়ে বলে, খুব সেজেছ দেখছি। তবু তোমাকে খুব পেল দেখাচ্ছে। চোখও লাল। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো।

আমাকে একটু ধরে ধরে নিয়ে যাবি?

এসো। বলে সঙ্গে সঙ্গে মনু হাত বাড়ায়।

ভারী অবাক মানে তৃণা, ও কি তাকে ছোঁবে? ঘেন্না করবে না ওর? তৃণা সঙ্কুচিত হয়ে বলে, তোর দেরি হচ্ছে না তো!

হচ্ছে তো কী? এসো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই ঘরে।

তৃণা উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাকে চমকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মনু তাকে এক ঝটকায় পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে হেসে বলে, আরে! তুমি তো ভীষণ হালকা!

তৃণার মাথা ঘুরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। সে ককিয়ে কান্না গলায় বলে, ছেড়ে দে, ওরে!

তুমি কি ভাবছ তোমাকে নিতে পারব না?

ফেলে দিবি। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে তৃণা।

দূর! আমি ওয়েটলিফটার, জানো না? তুমি তো মশার মতো হালকা। বলে দুহাতে তৃণার শরীরটার ওপরে নীচে একবার দুলিয়ে দেখায় মনু। তৃণা তখন ছেলের শরীরের সুঘ্রাণটি পায়। মৃদু সাবান পাউডার, আর জামাকাপড়ে ওয়ার্ডরোবের পোকা-তাড়ানো ওষুধের গন্ধ। এ সব ভেদ করে মনুর গায়ের রক্তমাংসের একটা গন্ধ, একটা স্পন্দন পায় না কি সে?

অনায়াসে মনু হলঘরটা পার হয়ে যায় তৃণাকে পাঁজাকোলে নিয়ে। তৃণা ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে ছিল, মুঠো হাতে খামচে ধরে ছিল মনুর গেঞ্জির বুকের কাছটা।

নরম বিছানায় মনু তৃণাকে ঝুপ করে নামিয়ে দিয়ে হাসে— দেখলে তো?

তৃণা একটু ক্ষীণ হেসে বলে, নিজের শরীরে অত নজর দিস না। নিজের নজর সবচেয়ে বেশি লাগে।

সবাই আমাকে নজর দেয়। বন্ধুরা আমাকে স্যামসন বলে ডাকে।

বালাই ষাট।

মনু ঠাট্টার হালকা এবং বোকাহাসি হাসে। বলে, চলি?

কোথায় যাবি?

যাওয়ার অনেক জায়গা আছে।

মনু মাথা ঝাঁকায়। দরজার কাছ থেকে একবার সাহেবি কায়দায় হাতটা তোলে। চলে যায়।

মনুর শরীরের সুঘ্রাণ এখনও ভরে আছে তৃণার শ্বাসপ্রশ্বাসে। ছোট থেকেই মনু মোটাসোটা ভারী ছেলে, টেনে ওকে কোলে তুলতে কষ্ট হত। তখন থেকে সবাই ছেলেটাকে নজর দেয়। এখন দেখনসই চেহারা হচ্ছে। পাঁচজনে তাকাবেই তো! ভাবতে এক রকম ভালই লাগে তৃণার। দুঃখ এই যে, ছেলে তার হয়েও তার নয়। একটু বুঝি বা কখনও মনের ভুলে মাকে মা বলে মনে করে। তারপরই আবার আলগা দেয়। দূরের লোক হয়ে যায় সব। তৃণা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। কত রকম যে ভয় তার! সে চুপ করে শুয়ে মনুর কথা ভাবতে থাকে।

শচীন কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে এল। পাশের ঘর থেকে তার সুরহীন গুন গুন ধ্বনি আসে। হলঘরে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ঘোরের মধ্যে শুয়ে থেকে সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনে তৃণা। শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এগারোটা না?

বুকের মধ্যে ধুপ ধুপ করে। উত্তেজনায় নয়। হঠাৎ উঠে বসায় বুকে একটা চাপ লেগেছে। বাসস্টপটা খুব দূরে নয়। দেবাশিস এসে অপেক্ষা করবে। নিজের মানুষ-জনের কাছে বড্ড পুরনো হয়ে গেছে তৃণা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে এমন কাউকে চাই যার কাছে প্রতিদিন তৃণার জন্ম হয়।

সে উঠল। শরীর ভাল নেই। মন ভাল নেই। এই ভরদুপুরে সে যদি বেরিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ফিরে না আসে তবু কারও কোনও উদ্বেগ থাকবে না। কেউ একফোঁটা চিন্তা করবে না তৃণার জন্য।

হলঘর থেকে রেবার উচ্চকিত স্বর পাওয়া গেল— বাপি!

শচীন গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়— হুঁ!

আমি বেরোচ্ছি।

আচ্ছা।

শচীন তার দাঁড়ে সব পাখিকে শেকল পরাতে পেরেছে। এ সংসারে তৃণার মতো পরাজিত কেউ না। শচীন একই সঙ্গে ছেলেমেয়ের মা ও বাবা, ওরা কোথায় কি যায় কী করে, তা তৃণার জানা নেই। যেমন, আজ দুপুরে কে কে বাড়িতে খাবে, বা কার বাইরে নিমন্ত্রণ আছে, তা সে জানে না। কেউ বলে না কিছু। যা বলে তা শচীনকে। একা, অভিমানে তৃণার ঠোঁট ফোলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার কোঁচকানো শাড়িটা ঠিকঠাক করে নেয়, বেরোবে।

বেরোবার মুখে সে হলঘর পেরোতে গিয়ে দেখে শচীন টবে গাছগুলি ঝুঁকে দেখছে। তৃণার দিকে পিছন ফেরানো। চল্লিশের কিছু ওপরে ওর বয়স, স্বাস্থ্য ভাল। তবু ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে একজন বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি লক্ষ করা যায়। কিছু ধীরস্থির, চিন্তামগ্ন বিবেচকের মতো দেখতে, পাকা সংসারীর ছাপ চেহারায়।

তৃণা নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল। শচীনের টের পাওয়ার কথা নয়। তবু শচীন টের পেল। হঠাৎ ঝুঁকে কী একটা তুলে নিয়ে ফিরে সোজা তার দিকে তাকাল। হাতে একটা ছোট্ট রুমাল। তৃণার।

শচীন জিজ্ঞেস করে— এটা তোমার?

খুব সূক্ষ্ম কাপড় আর লেস দিয়ে তৈরি রুমালটা তারই। সোফায় বসে থাকার সময়ে পড়ে গিয়ে থাকবে।

তৃণা মাথা নাড়ল।

এখানে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল। বলে শচীন রুমালটা সোফার ওপর আলতোভাবে রেখে দিয়ে আবার গাছ দেখতে লাগল। জাপান থেকে বেঁটে গাছ আনাচ্ছে, শুনেছে তৃণা। সে গাছ কাচের বাক্সে হলঘরে রাখা হবে। বোধ হয় সে ব্যাপারেই কোনও প্ল্যান করছে।

রুমালটা তুলে নিতে গিয়ে তৃণাকে শচীনের খুব কাছে চলে যেতে হল। তার শ্বাস প্রশ্বাস, গায়ের গন্ধ ও উত্তাপের পরিমণ্ডলটির ভিতরেই বোধ হয় চলে যেতে হল তাকে। তৃণা নিজের শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ টের পায়। অবশ্য শচীন খুবই অন্যমনস্ক। সে মোটে লক্ষই করল না তাকে।

তৃণা রুমালটা তুলে নিল। চলে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ দাঁড়াল, তার কিছু হারাবার ভয় নেই, কিন্তু পাওয়ার আশাও নেই। তা হলে রেবা আর মনুর পর এ লোকটাকে একটু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? বেশ কিছুদিন আগে শচীন তাকে মেরেছিল। জীবনে ওই একবারই বোধহয় পদস্খলন হয়ে থাকবে লোকটার। তা ছাড়া আর কখনও তৃণার জন্য বোধ হয় কোনও আবেগ বোধ করেনি। শচীনের ওই মারটা একটা সুখস্মৃতির মতো কেন যে।

তৃণা আচমকা বলে, আমি যাচ্ছি।

শচীন শুনতে পেল না।

তৃণা মরিয়া হয়ে বলে, শুনছ!

অন্যমনস্ক শচীন দীর্ঘ উত্তর দেয়— উঁ...উঁ!

তারপর ধীরে ফিরে তাকায়। সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে মগ্ন চোখ!

আমি একটু বেরোচ্ছি। তৃণা হাঁফধরা গলায় বলে।

শচীন বড় অবাক হয় বুঝি! বিস্ফারিত চোখে তার রাঙা পোশাকপরা চেহারাটা দেখে। অনেকক্ষণ পরে বলে, ওঃ!

শচীনের উত্তেজনা কম, রাগ কম। কিন্তু একরকমের কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠার বর্ম পরে থাকে। স্ত্রী বিপথগামিনী বলে তার মনে নিশ্চয়ই কিছু প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু তা প্রকাশ করা তার রেওয়াজ নয়, এমন কী তৃণাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারলেও দেয়নি; চমৎকার সুখ-সুবিধের মধ্যে রেখে দিয়েছে। লোকলজ্জাকেও গায়ে মাখে না। এ কেমনতর লোক? এমন হতে পারে, সে তৃণাকে ভালবাসে না, কখনও বাসেনি। কিন্তু ভালবাসুক চাই না বাসুক, পুরুষের অধিকারবোধও কি থাকতে নেই? কিংবা আত্মসম্মানবোধ? তৃণার শরীর ভাল নয়, মাথার ভিতরটাও আজ গোলমেলে। নইলে সে এমন কাণ্ড করতে সাহসই পেত না। সে তো জানে, শচীনের তাকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে কোথায় যায় বা না যায় তার খোঁজ কখনও রাখে না।

তৃণা খুব অসম্ভব একটা চেষ্টায় শচীনের ওপর নিজের চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। শচীন খুব গম্ভীর। অন্যমনস্কতা কেটে গেছে। একটি চিন্তিত দেখাচ্ছে মাত্র।

শচীন মাথাটা নেড়ে বলল, যাবে যাও। বলার কী?

এই উত্তরই আশা করেছিল তৃণা। কিন্তু আজ তার একটা মরিয়া ভাব এসেছে। কেবলই মনে হয়েছে টানবাঁধা উদ্বেগ ও শঙ্কায় ভরা এইসব সম্পর্কের ভিতরের সত্যটা তার জেনে নেওয়া দরকার। যেন আর খুব বেশি সময় নেই।

তাই তৃণা বলে, এ ছাড়া তোমার আর কিছু বলার নেই?

শচীন অবাক হয়ে বলে, কী থাকবে? এখন বলা-কওয়ার স্টেজ পার হয়ে গেছে।

তৃণা তার শুকনো ঠোঁট বিশুষ্ক দাঁতে চেপে ধরল। মুখে জল নেই, পাপোশের মতো খসখসে লাগছে জিভটা। কিন্তু আশ্চর্য যে বহু দিন পরে শচীনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার বুক কাঁপছে না, ভয়ও হচ্ছে না তেমন।

তৃণা বলে, আমি যদি একেবারে চলে যাই, তা হলেও কিছু বলার নেই।

বলার অনেক কিছু মনে হয়। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করে না।

কেন?

বলা মানে কাউকে শোনানো, আমার তো শোনানোর কেউ নেই!

তৃণা চুপ করে থাকে। কান্না আসে, কিন্তু কাঁদে না। তার কান্নার মূল্যই বা কী?

শচীন টেবিল থেকে জলের জগটা তুলে নিয়ে আলগা করে একটু জল খেল। তারপর তৃণার দিকে তাকিয়ে তেমনি চিন্তিত গলায় বলে, তুমি কি একেবারেই যাচ্ছ?

তৃণা কিছু বলল না। দুঃসাহসভরে তাকিয়ে থাকল।

শচীন বলেএ সিদ্ধান্তটা আরও আগেই নিতে পারতে।

তা হলে কী হত?

তা হলে অন্তত উদ্বেগ আর মানসিক কষ্ট হত না। দেবাশিসবাবুও নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

তৃণা অধৈর্য হয়ে বলে, আমি সে-যাওয়ার কথা বলিনি।

তবে?

আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না।

ও। শচীন একটু চুপ করে থাকে। তারপর, যেন বুঝেছে, এমনভাবে মাথা নাড়ল। বলল, তাও মনে হওয়া সম্ভব। বহুকাল ধরেই তোমার নার্ভের ওপর চাপ যাচ্ছে। তার ওপর আছে নিজেকে ক্রমাগত অপরাধী ভেবে যাওয়ার হীনম্মন্যতা! এ অবস্থায় মরতে অনেকেই চাইবে।

তুমি কি সিমপ্যাথি দেখাচ্ছ?

না। কিন্তু তোমাকে সাহসী হতে বলছি। চোরের মতো.বেঁচে আছ কেন? যা করেছ তা আরও সাহস আর স্পষ্টতার সঙ্গে করা উচিত ছিল।

কী বলতে চাও তা আরও স্পষ্ট করে বলো।

শচীন তার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল, যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না তৃণার এই ব্যবহার। তারপর বলে, এ ঘরটা কথা বলার ঠিক জায়গা নয়। এসো।

বলে শচীন হলঘরের সামনের দিকের ঘরটায় ঢোকে। এই ঘরে পাতা রয়েছে সবুজ রঙের পিংপং টেবিল, ক্যারম, দাবা, দেয়ালে সাজানো টেনিস আর ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট। কাঠের ফ্রেমে গলফ্‌ কিট। একধারে জুতোর র‍্যাক, দেয়াল আলমারিতে সাজানো কয়েকটা বন্দুক, রাইফেল, কয়েকটা ভাল সোফা দেয়ালের সঙ্গে পাতা রয়েছে।

তৃণার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, শচীন তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে একটু আগ্রহ দেখাবে। ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে। কিন্তু জানে তৃণা, এত কথা বলে এ সমস্যার কোনও সুরাহা হওয়ার নয়।

ঘরটা একটু আবছায়া। শচীন ঢুকে তৃণার ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিংপং খেলার জন্য এ ঘরে কয়েকটা খুব বেশি পাওয়ারের আলো লাগানো আছে। শচীন আলো জ্বালে। চোখ ধাঁধানো আলো।

তৃণার মাথার মধ্যে একটা বিকারের ভাব। বন্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই তার মনে হয়, এ ঘরে একটা মিলনান্তক নাটক করার জন্যই শচীন তাকে ডেকে এনেছে। শেষমেশ জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরবে না তো! না না, তা হলে সহ্য করতে পারবে না তৃণা। বড় বিতৃষ্ণা হবে তা হলে।

শচীন পিংপং টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ার টেনে বসল, টেবিলের ওপরে সাবধানে নিজের হাত দু'খানার ভর রেখে তৃণার দিকে চেয়ে বলল, এবার বলো।

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে, আমি কী বলব?

বলাটা তুমিই শুরু করেছ।

তৃণা একটু থমকে থাকে।

সময় চলে যাচ্ছে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে দেবাশিস তার গাড়ি নিয়ে এসে বসে থাকবে। সেটা ভাবতেই তার শরীরে অসুস্থতাকে ভাসিয়ে দিয়ে একটা জোয়ার আসে তীব্র, তীক্ষ্ণ আনন্দের! শচীনের দিকে তাকিয়ে তার এ লোকটাকে সঙ্গ করতে অনিচ্ছা হতে থাকে।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে, আমি বোধ হয় বেশিদিন বাঁচব না।

সেটা হঠাৎ আজ বলছ কেন?

আজ বলছি, আজই মনে হচ্ছে বলে।

শচীন মাথা নেড়ে ধীর স্বরে বলে, যদি মনে হয় তা হলে তার জন্যে আমরা কী করতে পারি?

তৃণা অধৈর্যের গলায় বলে, আমি কিছু করতে বলিনি।

তবে?

তৃণা একটু ভাবে। ঠিকঠাক কথা মনে পড়ে না। হঠাৎ বলে, আমি এ বাড়িতে কী-রকমভাবে আছি তা কি তুমি জানো না?

শচীন চুপ করে চেয়ে রইল খানিক। তৃণার আজকের সাহসটা বোধহয় তারিফ করল মনে মনে।

তারপর বলল, বাইরে থেকে কেমন আছ তা জানি। কিন্তু মনের ভিতরে কেমন আছ তা কী করে জানব? প্রত্যেক মানুষই দুটো মানুষ।

সে কেমন?

বাইরেরটা আচার-আচরণ করে, সহবত রক্ষা করে, হাসে বা কাঁদে, ভালবাসে বা ঘেন্না করে। আর ভিতরের মানুষটা এক পাগল। বাইরের জনের সঙ্গে তার মিলমিশ নেই, বনিবনা নেই, একটা আপস-রফা হয়তো আছে। সেই ভিতরের মানুষটাকে জেনুইন অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারে না!

আমি তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।

শচীনকে খুব শান্ত ও নিরুদ্বেগ দেখাচ্ছে। এ মানুষটার এই শান্তভাবটা তৃণা কখনও ভাল মনে নিতে পারে না। শচীন শান্তমুখে বলে, তত্ত্বকথা মানেই তো আর পুঁথিপত্রের কথা নয়। জীবন থেকেই তত্ত্ব কিংবা দর্শন আসে। আমি তো স্পষ্ট করেই বলছি যে, তোমার জন্য আমরা কিছু আর করতে পারি না।

তা জানি। আমি তবু একটা কথা জানতে চাই। তোমার চোখে এখন আমি কীরকম?

শচীন হাসল না। তবু একটু দুর্বোধ্য কৌতুক চিকমিক করে গেল তার চোখে। বলল, অ্যাপারেন্টলি তুমি তো এখনও বেশ সুন্দরীই। ফিগার ভাল, ছেলেমেয়ের মা বলে বোঝা যায় না।

তৃণা রেগে লাল হয়ে গেল। বলল, সে কথা জিজ্ঞেস করিনি।

তবে?

আমি জানতে চাইছি, তুমি আমাকে কী চোখে দেখ!

ও। বলে শচীন তেমনই চুপ করে চেয়ে থাকে তার দিকে। চোখে কোনও ভাষা নেই, নীরব কৌতুক ছাড়া। বলে, তোমাকে আসলে আমি দেখিই না। অনেক চেষ্টা করে তবে এই না-দেখার অভ্যাস করেছি।

তৃণার এ সবই জানা। তবু বলল, এই যেমন এখন দেখছ! এখন কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না?'

হচ্ছে।

সেটা কেমন?

রাস্তার ভিখিরিদের আমরা লক্ষ করি না। আবার তাদের মধ্যে কেউ যখন সাহসী হয়ে, কিংবা মরিয়া হয়ে কাছে এসে তাদের দুঃখের কথা বলে তখন তাকে দেখি, মায়া হয়, করুণা বোধ করি। এও ঠিক তেমনি, তোমার জন্য মায়া এবং করুণা হচ্ছে। আবার যখন ভিখিরিটা দঙ্গলে মিশে যাবে, তখন আবার তাকে লক্ষ করব না। আমরা কেউ কাউকে কনস্ট্যান্ট মনে রাখতে পারি না, সে যত ভালবাসার বা ঘেন্নার লোক হোক না কেন। কখনও মনে রাখি আবার ভুলে যাই, ফের মনে করি— এমনিভাবেই সম্পর্ক রাখি। মানুষ দুভাবে থাকে।

সে কেমন?

এক, কেবলমাত্র শারীরিকভাবে থাকে। দুই, মানুষের মনের মধ্যে থাকে। আমার কাছে, তুমি কেবল শারীরিকভাবে আছ, আমার মনের মধ্যে নেই।

তৃণা ভ্রূ কোঁচকায়। বিরক্তিতে নয়, যখন সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে তখন ভ্রূ কোঁচকানো তার স্বভাব।

তৃণা শ্বাস ফেলে বলে, এটা সত্যি কথা নয়।

তা হলে কোনটা সত্যি কথা? তুমি কি আমার মনের মধ্যে আছ?

তৃণা মাথা নেড়ে বলে, আমি সে কথা বলিনি। আমি জানতে চাই আমাকে— আমার প্রতি তোমার প্রতিক্রিয়া কী?

শচীন মাথাটা নামিয়ে সবুজ টেবিলের ওপর তার দুহাতের আঙুল দেখল। তারপর মুখ না তুলেই বলল, আমি খুব সিমপ্যাথেটিক। তোমার সমস্যাটা আমি বুঝি, তাই তোমাকে সাহসী হতে বলেছিলাম।

আমাকে চলে যেতে বলছ?

শচীন মাথা নেড়ে বলল, না, তুমি এ বাড়িতে থেকেও যা খুশি করতে পারো। তাতে আমাদের যে কিছু আসে যায় না, তা তো তুমি বোঝোই, কিন্তু তোমার তাতে আসে যায়। তুমি কেবলই পাপবোধে কষ্ট পাচ্ছ, আমরা তোমাকে নিয়ে নানা জল্পনা করছি বলে সন্দেহ করছ। হয়তো একথাও ভাব যে, দেবাশিসবাবুর স্ত্রী তোমার জন্য আত্মহত্যা করেন। এ সব তোমার ভিতরে ক্ষয় ধরাচ্ছে। আমি তোমাকে চলে যেতে বলছি না, কিন্তু গেলে তোমার দিক থেকেই ভাল হবে।

আমি থাকি বা যাই, তাতে কি তোমাদের কিছু যায় আসে না?

না।

আর যদি মরে যাই?

সেটা স্বতন্ত্র কথা। অন্য মানুষকে মরতে দেখলে আমাদের নিজের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, তাই মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু, তুমি মরবে কেন?

আমি ইচ্ছে করে মরব, এমন কথা বলিনি। কিন্তু মনে হয়, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না।

তা হলে সেটা দুঃখের ব্যাপার হবে। যাতে মরতে না হয় এমন কিছু করাই ভাল। শরীর খারাপ হয়ে থাকলে ডাক্তার দেখাও।

তৃণা ঘুরে দরজার দিকে এগোয়। ছিটকিনি খুলতে হাত বাড়িয়ে বলে, দেখাব। কিন্তু দয়া করে মনে কোরো না যে, আমি তোমার বা তোমাদের করুণা পাওয়ার জন্য মরার কথা বলেছিলাম।

শচীন চেয়ার ঠেলে উঠল। কথা বলল না।

তৃণা আর একবারও ফিরে তাকাল না। দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল হলঘরে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে বাগানের রাস্তা ধরে চলে আসে ফুটপাথে। খুব জোরে হাঁটতে থাকে।

আপন মনেই বিড়বিড় করে কথা বলছিল তৃণা— যাব না কেন? আমি তো তোমাদের কেউ না।

কোনও লক্ষ্য স্থির ছিল না বলে তৃণা ভুল রাস্তায় এসে পড়ল। ঘড়িতে খুব বেশি সময় নেই। দেবাশিস আসবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে তাদের দেখা হবে। দেখা হলেই পৃথিবীর মরা রঙে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠবে।

তৃণা ঠিক করে ফেলল, আজ সে দেবাশিসকে বলবে, বরাবরের মতো চলে যাবে তৃণা, ওর কাছে।

সামনেই একটা থেমে-থাকা মোটর সাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে অল্পবয়সি একটা ছেলে। স্টার্টারে লাথি মারছে লাফিয়ে উঠে। স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়িটা, দু'-একবার গরগর করে থেমে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ রাস্তায় শব্দটা ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি হয়ে মস্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই শব্দটায় যেন তৃণা সংবিৎ ফিরে পেল। সে চারধারে তাকিয়ে দেখল এ তার রাস্তা নয়। ফাঁড়ি আরও উত্তরে।

সে ঘুরে হাঁটতে থাকে। পিছনে মোটরসাইকেলটা স্টার্ট নেয় এবং ভয়ঙ্কর একটা শব্দ তুলে মুখ ঘুরিয়ে তেড়ে আসে। ফুটপাথে উঠে যায় তৃণা। মোটর সাইকেলটা ঝোড়ো শব্দ তুলে তাকে পেরিয়ে চলে যায়।

## ॥ পাঁচ ॥

গাড়ির শব্দ পেয়েই ওপর থেকে ফুলি হাঁফাতে হাঁফাতে নেমে আসে। অল্পবয়সেই ফুলি বড় মোটা হয়ে গেছে। এক দঙ্গল ছেলেপুলের মা। তবু বোধ হয় সন্তানের তেষ্টা ওর মেটেনি। রবির জন্য একবুক ভালবাসা বয়ে বেড়ায়।

ফুলির আদর সোহাগ সবই সেকেলে ধাঁচের। রবি গাড়ি থেকে নামতে না-নামতেই ফুলি হাত বাড়িয়ে রাস্তাতেই ওকে বুকে টেনে নেয়। মৃদু সুখের ঘুনঘুনে শব্দ করতে করতে বলে, ধন আমার, মানিক আমার, গোপাল আমার...বলে মুখে বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয়। রবি প্রথমটায় লজ্জা পায়। হাত-পা দিয়ে আদরটা ঠেকায়। কিন্তু তারও দুর্বলতা আছে। সারা সপ্তাহ ধরে সে এই অদ্ভুত গ্রাম্য আদরটুকুর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দেখা যায়, রবি দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে তার মণিমাকে, কাঁধে মাথা রেখেছে। বলছে— রোজ রাতে আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখে মণিমা।

ফুলির বুকে বোধহয় এই কথায় একটা ঢেউ উঠে নতুন করে। সেই ঘুনঘুনে আদরের শব্দটা করতে করতে পিষে ফেলে রবিকে। আর রবি এবার নির্লজ্জের মতো আদর খায়।

ফুলির ছেলেপুলেরা সাড়া পেয়ে হইহই করে এসে ঘিরে ধরে রবিকে। রবি ওদের কাছে একটা বিরাট বিস্ময়। সে সাহেবদের মতো চমৎকার ইংরেজি বলে, অদ্ভুত সব দামি পোশাক পরে, নিখুঁত

সহবত মেনে চলে। ফুলির ছেলেমেয়েরা এ সব দেখে ভারী মজা পায়।

ফুলি তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে রবিকে ছেড়ে দিয়ে মুগ্ধচোখে একটু চেয়ে রইল, আপন মনেই বলল, রোগা হয়ে গেছে।

চাঁপা হটবক্স ফ্লাস্ক আর দই মিষ্টির ভাঁড় নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে, কিছু খেতে চায় না।

ফুলি মাথা নেড়ে বলে, খাবে কী? ওর ভিতরটা যে খাক হয়ে যায়। সে আমি বুঝি।

ফুলিদের আলাদা বসবার ঘর নেই। ঢুকতেই একটা লম্বাটে দরদালানের মতো আছে, সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা। ফুলির বর শিশির বি-এন-আর-এ চাকরি করে। বয়স বেশি নয়, কিন্তু ভারী প্রাচীনপন্থী। বছর বছর ছেলেপুলে হয় বলে দেবাশিস ওকে একবার বলেছিল— ভায়া, বউটাকে তো মেরে ফেলবে, ছেলেপুলেগুলোও মানুষ হবে না।

শিশির একটু ঘাড় তেড়া করে বলল, তা কী করব বলুন?

তখন দেবাশিস বলে, কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করো না কেন?

শুনে বড় রেগে গিয়েছিল শিশির, বলল, কেন, আমি কি নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি নাকি যে ও সব ব্যবহার করব?

এই হচ্ছে শিশির। আধুনিক জগতের কোনও খোঁজই সে রাখে না, তার ধারণা চাঁদে মানুষ যাওয়ার ঘটনাটা স্রেফ কারসাজি আর পাবলিসিটি। আজও সে বিশ্বাস করে না যে চাঁদে মানুষ গেছে। কথা উঠলেই বিজ্ঞের মতো একটা 'হুঁ' দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেবাশিসকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। দেবাশিসের অর্থকরী সাফল্যকে সে হয়তো ঈর্ষা করে, কিংবা তার আধুনিক ফ্যাশানদুরস্ত হাবভাব, চালাক চতুর কথাবার্তা অপছন্দ করে।

দেবাশিস দরদালানের চেয়ারে বসল একটু। ভিতরের ঘরে রবিকে ঘিরে ধরে পিসতুতো ভাইবোন হল্লা করছে। মুর্গ-মুসল্লমের প্যাকেট হটবক্স থেকে বের করা হয়েছে বোধ হয়। তাই দেখে চেঁচাচ্ছে ফুলির আনন্দিত ছেলেমেয়েরা। বাথরুমের দিক থেকে গামছা-পরা শিশির বের হয়ে এল। দেবাশিসকে দেখে একটু হাসল। বলল, কী খবর? হাসিটা তেমন খুলল না।

এই তো, চলে যাচ্ছে।

রবিকে এনেছেন?

হ্যাঁ, আওয়াজ পাচ্ছ না?

শিশির এবার সত্যিকারের হাসি হাসল। দেবাশিসকে যতই অপছন্দ করুক শিশির, রবির প্রতি তারও ভয়ঙ্কর টান আছে। রবি এলে সে রসগোল্লা কিনে আনে, টফি আনে, খেলনা। ডাকে রবিরাজ বলে।

ফুলি এক কাপ চা হাতে এল। শিশিরকে দেখে ঘোমটা দিল মাথায়। ওর চালচলনে এখনই কেমন গিন্নি-বান্নির ঠাট-ঠমক পাকা হয়ে গেছে। একগাল পান মুখে।

চা-টা একটা ছোট্ট টুলে দেবাশিসের সামনে রেখে হাঁসফাঁস করতে করতে বলে, সুজি করেছি, খাবে?

না।

পানের পিক ফেলতে বাথরুমে মুখ বাড়িয়ে আবার ফিরে এল ফুলি। চাঁপার দিকে চেয়ে বলল, তুই দিনমান থাকবি তো চাঁপা, না কি দাদার সঙ্গে চলে যাবি? আমি একহাতে আজকের দিনটা সামলাতে পারি না। খুদে ডাকাতরা সারা বাড়ি তছনছ করে, তার ওপর আজ আবার ওদের বাপ শনিঠাকুরটি বাড়িতে আছেন। আমি বলি বরং তুই থেকে যা।

চাঁপা ঘাড় নাড়ল। বলে, সোনাবাবুর কাছ-ছাড়া হতে ভাল লাগে না।

মুখটা খুশিতে ভরে ওঠে ফুলির, বলে, আহা, রোগা হয়ে গেছে।

দেবাশিস ভদ্রতাবশত চায়ে চুমুক দেয়। আসলে ফুলির বাসার চা সে খেতে পারে না। চায়ের সুঘ্রাণ নেই, আছে কেবল লিকার আর গুচ্ছের দুধ-চিনি। দুধ বেশি পড়ে গেছে, ফলে চা সাদা দেখাচ্ছে। ছেলেবেলায় বেশি দুধের চাকে তারা বলত সাহেব চা। সাহেবদের রং ফরসা বলেই বোধ হয় উপমাটা দিয়ে থাকবে।

ফুলি, এ যে সাহেব চা! দেবাশিস বলে।

ফুলি প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপর বুঝে লজ্জা পেয়ে বলে, তোমার তো আবার সব সাহেবি ব্যাপার। পাতলা লিকার অল্প দুধ-চিনি ও সব কি আর মনে থাকে! আমাদের বাঙালি বাড়িতে যেমনটি হয় তেমনটি করে দিয়েছি। আবার করে দিই।

থাকগে। খারাপ লাগছে না। দেবাশিস বলে।

ফুলি সামনে মোড়া পেতে বসল। গায়ে মোটা মোটা গয়না, আঁচলে চাবি, সব মিলিয়ে ওর নড়াচড়ায় এক ঝনৎকার শব্দ হয়। জোরে শ্বাস ফেলে, শ্বাসের সঙ্গে একটা শারীরিক কষ্টে ওঃ বা আঃ শব্দ করে। সম্ভবত কোনও মেয়েলি রোগ আছে। শরীরের নানা আধি-ব্যাধির কথা বলে, কিন্তু বসে শুয়ে থাকে না কখনও। সারাদিন কাজকর্ম করছে স্টিম-রোলারের মতো।

বসে ফুলি বলল, দাদা, এবার রবির ব্যাপারে একটা কিছু ঠিক করো।

কী ঠিক করব?

ওকে আর তোমার ফাঁকা ভুতুড়ে ফ্ল্যাটে রেখে লাভ কী? সারাদিন ওর মনের মধ্যে নানা ভয়-ভীতি খোঁড়ে। দেখছ না, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে। খাওয়ায় অরুচি, সারাদিন নাকি মুখ গোমড়া করে থাকে। সঙ্গী-সাথিও নেই।

সব সয়ে যাবে।

সইছে কোথায়! প্রায় সময়েই আমার কাছে এসে মায়ের কথা বলে। দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখি, ঘুমের মধ্যে দেখি খুব চমকে চমকে ওঠে। এ সব ভাল লক্ষণ নয়। মুখে কিছু বলে না, লজ্জায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁদে।

দেবাশিস একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে বলল, আমি তো ও যা চায় দিই।

আহা! বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে মা আর সঙ্গী। তা ও পায় কোথায়! আমি বলি, আমার কাছ থাক। মণিমা-মণিমা করে কেমন অস্থির হয় দেখনি?

দেবাশিস একটু হেসে বলে, তোরই তো অনেক ক'জন, তার ওপর আবার রবি এসে জুটলে—

ফুলি ধমকে ওঠে— ও সব অলক্ষুণে কথা বোলো না! ছেলেমেয়ে আবার বেশি হয় না কি?

দেবাশিস হাসে, বলে, তোর তা হলে এখনও ছেলেমেয়ের সাধ মেটেনি?

ফুলি কড়া গলায় বলে, না। মিটবেও না। আমি বাপু, ছেলেপুলে কখনও বাড়তি দেখি না। যত হবে তত চাইব। মা হয়েছি কীসের জন্য?

যদিও এটা কোনও যুক্তি নয়, তবু এর প্রতিবাদও হয় না। কারণ এ যুক্তির চেয়ে অনেক জোরালো জিনিস। এ হচ্ছে বিশ্বাস। শিশিরের সঙ্গে থেকেই বোধ হয় এইসব গ্রাম্যতা ওর মনে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তির লড়াই বোকামি। তাই দেবাশিস একটু চুপ করে থাকে। একটা সিগারেট ধরায়।

বলে, দেখি।

দেখবে আবার কী! রবিকে আমার কাছে দিয়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।

ওখান থেকে ওর ইস্কুলটা কাছে হয়, তা ছাড়া একভাবে থেকে থেকে সেট হয়ে গেছে, এখন তোর এখানে এসে থাকলে দেখবি ওর মন বসছে না।

কী কথা! এ বাড়িতে এলে ও কখনও যেতে চায় দেখেছ?

সে এক-দু দিনের জন্য, পাকাপাকিভাবে থাকতে হলেই গোলমাল করবে।

সে আমি বুঝব! তুমি বাপু ছেলেকে একেবারে সাহেব করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছ। আজকাল আমার সঙ্গেও ইংরিজি বলে ফেলে, কথায় কথায় 'সরি' আর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে।

শিশির গামছা ছেড়ে লুঙ্গি পরেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আসলে গরিবের বাড়িতে রাখতে দাদার ভয়। এখানে খারাপ সহবত শিখবে। খানা-পিনাও তেমন সায়েন্টিফিক হবে না।

দেবাশিস মনের মধ্যে এ সব কথাই ভাবে। এখানে দঙ্গলের মধ্যে পড়ে রবি তার আচার আচরণ ভুলে যাবে, স্মার্টনেস হারাবে। চিৎকার করতে শিখবে, খারাপ কথা বলতে শিখবে। এবং হয়তো বা দেবাশিসকে একটু একটু করে বিস্মৃত হবে।

দেবাশিস মৃদু গলায় বলে, না, সে সব নয়। আসলে ও আছে বলেই ফ্ল্যাটটায় ফিরতে ইচ্ছে করে।

ফুলি বলে, তুমি আর কতক্ষণের জন্যই বা ফেরো! রাতটুকু কেটে গেলেই তো আবার টো-টো কোম্পানি। ও যে একা সেই একা।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলে, ভেবে দেখি।

দাদা, আমি রবিকে বুক দিয়ে আগলে রাখব। একটুও চিন্তা কোরো না।

সে আমি জানি। তবু একটু ভেবে দেখতে দে।

ভাবতে ভাবতেই ওকে শেষ করে ফেলো না। এখানে থাকলে ও সব ভুলে থাকতে পারবে। ফাঁকা ঘরে থাকে বলেই ওর সব মনে পড়ে। আমার কাছে কত কথা এসে বলে!

দেবাশিস ফুলির দিকে একটু অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখছিল। ছেলেপুলের কী অপরিসীম সাধ ওর। গর্ভযন্ত্রণার কথা ভাবে না, ঝামেলার কথা ভাবে না। দুবার ওর পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে আজও দুঃখ করে। এই অভাব, দারিদ্র্য, দুঃসময়— এগুলো ওর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। দুটি বা তিনটি সন্তানের সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও কখনও বোধ হয় চোখ তুলে দেখে না। শুনলে বলে, ও সব শোনাও পাপ।

দেবাশিস একটু হেসে বলে, পারিসও তুই!

ভিখিরির মতো ফুলি বলে, রবিকে দেবে দাদা?

দেবাশিস মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, আজ উঠি রে।

সে উঠে দাঁড়ায়। চাঁপা দৌড়ে গিয়ে রবিকে বলে, সোনাবাবু, এসো। বাবা চলে যাচ্ছে। দেখা করে যাও।

কিন্তু রবি সহজে আসে না। দেবাশিস সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। চাঁপা রবিকে হাত ধরে নিয়ে আসে। দেবাশিস দেখতে পায়, ইতিমধ্যেই রবির চুল ঝাঁকড়া হয়ে গেছে। গায়ের টি-শার্ট বুক পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা। মুখে চোখে একটা আনন্দের বিভ্রান্তি। দেবাশিসের দিকে চেয়েই রবি দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, বাবা তুমি যাও।

দেবাশিস ক্লিষ্ট একটু হাসে। বলে, আচ্ছা।

ফুলি সিঁড়ি পর্যন্ত আসে। কয়েক ধাপ নামে দেবাশিসের সঙ্গে। গলা নিচু করে বলে, শোনো দাদা।

দেবাশিস অন্যমনস্কভাবে বলে, উঁ।

রবি তোমার কাছে থাকলে ক্ষতি হবে। ও বড় দুঃখী ছেলে। তুমি কেন বুঝতে পারছ না?

দেবাশিস হাসল। মড়ার মুখের মতো হাসি। তারপর ফুলিকে পিছনে ফেলে নেমে এল রাস্তায়।

গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে একটা কণ্ঠস্বর শুনে হঠাৎ ওপরে তাকাল। চমকে উঠল ভীষণ। দোতলার রেলিঙের ওপর দিয়ে আধখানা শরীর বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে রবি। আশেপাশে পিসতুতো ভাইবোনেরা। খুব উত্তেজিতভাবে কী যেন দেখছে দূরে। হাত তুলে আঙুল দিয়ে পরস্পরকে দেখাচ্ছে। হয়তো কাটা ঘুড়ি। কিংবা হেলিকপ্টার।

দেবাশিসের বুকের ভিতরটায় প্রবল একটা ঝাঁকুনি লাগে! গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলে যেমন হয়।

রবি! বলে একটা চিৎকার দেয় সে।

মস্ত ভুল হয়ে গেল চিৎকারটা দিয়ে। এমন অবস্থায় কাউকে ডাকতে নেই। রবির মা সাততলা ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়।

শরীরের আধখানা বাইরে ঝুলন্ত অবস্থায় রবি ডাকটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। দুলে উঠল শিশু-শরীর। শূন্য হাত বাড়িয়ে একটা অবলম্বনের জন্য অসহায়ভাবে হাত মুঠো করল। টালমাটাল ভয়ংকর কয়েকটি মুহূর্তের সন্ধিসময়। দেবাশিসের প্রায় সংজ্ঞাহীন শরীরটা টাল খেয়ে গাড়ির গায়ে ধাক্কা খায়। চোখ বুজে ফেলে সে। দাঁতে দাঁত চাপে।

রবি সামলে গেল। ওর ভাইবোনেরা ওকে ধরেছে। টেনে নামিয়ে নিচ্ছে রেলিং থেকে! ফুলি এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

দেবাশিস অবিশ্বাসভরে চেয়ে থাকে। রবি রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বাবার দিকে চেয়ে হাসে। তারপর হঠাৎ প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে আনে। বাপের দিকে তাক করে গুলি ছুড়তে

থাকে-ঠিসুং...ঠিসুং...

দেবাশিস একবার ভাবল ফিরে যাবে ফুলির বাসায়। তারপর ভাবল— থাক। ওরও তো ছেলেমেয়ে আছে। কেউ তো পড়ে মরেনি কখনও!

রবির দিকে চেয়ে দেবাশিস একটু হাসে। তার বুকে কোথায় যেন রবির খেলনা রিভলভারের মিথ্যে গুলি এসে লাগে। সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে কোনওক্রমে হুইলের পিছনে বসে পড়ে। তারপর গভীরভাবে কয়েকটা শ্বাস নেয়।

গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে কেবলই দোতলার রেলিং থেকে ঝুঁকে-থাকা রবির চেহারাটাকে দেখতে পায়। চমকে চমকে ওঠে। দাঁতে দাঁত চাপে। হুইলে তার মুঠো করা হাত প্রবল চাপে সাদা হয়ে যায়। পদে পদে ভুলভাবে গাড়ি চালাতে থাকে সে।...

রবির মা চন্দনা লাফিয়ে পড়েছিল সাততলা থেকে, কথাটা ভুলতে পারে না।

রবিও কি কিছু ভোলেনি? সব মনে রেখেছে!

তৃণার সঙ্গে দেখা হবে। ফাঁড়ির কাছের বাসস্টপে। দেবাশিস খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে থাকে।

## ॥ ছয় ॥

দুপুরের ফাঁকা রাস্তায় তৃণা একটু বেশি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল । পিছনে কে যেন আসছে! ফিরে দেখল। কেউ না। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে, পিছনে কে আসছে। কে যেন চুপিচুপি আসছে। কার চোখ তীব্রভাবে, গোয়েন্দার মতো নজর করছে তাকে। কেউ নয়। তবু তৃণা প্রাণপণে হাঁটে। বড় রাস্তায় তুখোড় রোদ। দোকান বাজার বন্ধ। রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা, তৃণা কি আজ খুন হবে? গোপন থেকে কোন আততায়ী কেবলই আসে তৃণার দিকে?

তৃণা চারধারে তাকায়। কেউ নয়। উল্টোবাগে চলে এসেছে অনেকখানি। বাসস্টপটা এখনও বেশ দূরে। তৃণা বেশি হাঁটতে পারে না। হাঁটা জিনিসটা বড্ড ক্লান্তিকর। রিকশাতেও সে কখনও ওঠে না। বড্ড মায়া হয়। দুপুরের পিচ-গলা রাস্তায়, এই চাবুক রোদে রোগা মানুষগুলো রিকশা টানে, তাতে সওয়ার হতে একদম ভাল লাগে না তার।

ল্যান্সডাউনের মোড়ে পেট্রল-পাম্পের কাছ ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিওলা হাঁটু তুলে বসে ছোট্ট একটা বই পড়ছে। সম্ভবত রেসের বই, কিংবা গীতাও হতে পারে। একা ট্যাক্সিতে তৃণা ওঠে না। ভয় করে । কিন্তু শরীরটা কেমন যেন কাঁপছে। ভয় করছে। উৎকণ্ঠা।

সাহস করে দু'পা এগোল তৃণা।

ভাই, ট্যাক্সি কি যাবে?

যাবে। ট্যাক্সিওলা গম্ভীরভাবে বলে।

ট্যাক্সিটা দক্ষিণদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। তৃণা উঠতেই ট্যাক্সিটা ওই দিকেই চলতে থাকে, তৃণা কিছু বলেনি। তখন সে সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল রেবার ঘরে সে বসে আছে, আর রেবা হৃদয়হীনা রেবা তার দিকে স্বচ্ছ শীতল চোখে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই সে তার ছেলেকে দেখতে পায়। মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান মনু তাকে কোলে করে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। কী সুন্দর মনুর গায়ের গন্ধটুকু। আবার দেখে শচীন পিং পং টেবিলের ওপাশে বসে আছে, বলছে— তোমাকে আজকাল আমি লক্ষ করি না...

ভ্রূ কোঁচকায় তৃণা। তার সংসারে সে আজকাল আর নেই। কেউ তাকে লক্ষ করে না। এ কেমন? সে ও বাড়ির কারও মা, কারও গৃহকর্ত্রী। তার অতবড় পতন, ওই কলঙ্ক, পরকীয়া ভালবাসা, এ সব ওদের একেবারেই কেন উত্তেজিত ও দুঃখিত করে না? কেন ওদের শান্তি ও স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ আছে? এ কি শচীনের ষড়যন্ত্র! শচীন কি ওদের শিখিয়ে রেখেছে— ওর দিকে তাকিয়ো না, কথা বোলো না, ওকে উপেক্ষা করো। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই!

ট্যাক্সিওলা আয়না দিয়ে তাকে দেখছিল। ছোট আয়না, তাতে শুধু মধ্যবয়স্ক ও জোয়ান চেহারার ট্যাক্সিওলার ক্রূর চোখদুটো দেখা যায়। ফট করে চোখ পড়তেই চমকে উঠল তৃণা। আতঙ্কিত একটা

শব্দ উঠে এসেছিল গলায়। অস্ফুট শব্দটা মুখে হাত চাপা দিয়ে আটকাল। বলল, থামুন।

এইখানে নামবেন? বলে ট্যাক্সিওলা গাড়ি আস্তে করল।

এইখানেই। বলে তৃণা অবাক হয়ে দেখে, সে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসেছে, এদিকে তার আসার কথা নয়। সে যাবে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে। বার বার সে কেন তবে সে-জায়গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অন্যমনস্কতায়, বিভ্রমে? তৃণা আস্তে করে বলল, এটা কোন জায়গা! দেশপ্রিয় পার্ক?

হ্যাঁ, এখানেই নামবেন? বলে মধ্যবয়স্ক জোয়ান লোকটা তার দিকে পরিপূর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। লোকটার মুখে ঘাম, অশিক্ষার ছাপ! বন্যজন্তুর মতো একটা কামস্পৃহা লক্ষ করে তৃণা। বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। গাড়ির দরজার হাতলটা কিছুতেই খুলতে পারছিল না তৃণা। খুব তাড়াহুড়ো করছিল। একবার মনে হল, লোকটা কোনও কৌশলে দরজাটা আটকে দেয়নি তো! যাতে তৃণা খুলতে না পারে! লোকটাই হঠাৎ তার প্রকাণ্ড ঘেমো হাতটা বাড়িয়ে তৃণার হাতটা ঠেলে লকটা খুলে দিল।

তৃণা নেমে চলে যাচ্ছিল। খুব তাড়া। লোকটা পিছনে থেকে খুব একটা ব্যঙ্গের গলায় বলল, ভাড়াটা কে দেবে?

তাড়াতাড়িতে আর ভয়ে কত ভুল হয়। তৃণা ব্যাগ খুলে ভাড়া দিয়ে দিল। লজ্জায় কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ট্যাক্সিওলার চোখের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি পালানোর জন্যই তৃণা এলোপাথাড়ি খানিক হাঁটল উদ্‌ভ্রান্তের মতো, চলে এল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ পর্যন্ত। কিছুতেই তার মনে পড়ছিল না এখান থেকে কোন রুটের বাস ফাঁড়ি পর্যন্ত যায়। মনটা বড় অশান্ত, বুকের মধ্যে কেবলই একটা পাখা ঝাপটানোর শব্দ, কাকাতুয়াটা ডাকছে...তৃণা...তৃণা...তৃণা...

আজ দুপুরের কলকাতাকে নিঝুমপুর নাম দেওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা হু-হু, মন-কেমন-করা রাস্তা, রোদ গড়াচ্ছে, তৃণা ফাঁড়ির কাছে বাসস্টপে যাবে, কিন্তু সে বড় অনেক দূরের রাস্তা বলে মনে হয়। সে বড় অফুরান পথ। কোনওদিনই বুঝি যাওয়া যাবে না। বেলা একটা বেজে গেছে। তৃণার গায়ের চ্যানেল নাম্বার সিক্সের গন্ধটা অল্প অল্প করে উবে যাচ্ছে হাওয়ায়, বাতাসে চুল এলোমেলো।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল তৃণা। কী করে যাবে! সেই বারোটায় যাওয়ার কথা ছিল । দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতেই আবার হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করে পিছু ফিরে চাইল তৃণা। কে তার পিছনে আসছে? কে তাকে লক্ষ করছে নিবিষ্টভাবে?

আতঙ্কিত তৃণা হঠাৎ দেখল, একটা বিয়াল্লিশ নম্বর বাস মোড় নিচ্ছে। মনে পড়ল, এই বাসটা ফাঁড়ি হয়ে যায়। চলন্ত বাসটার সামনে দিয়ে হরিণ-দৌড়ে রাস্তা পাব হয়ে গেল তৃণা। বিপন্নার মতো চিৎকার করে বলল, বেঁধে ভাই, বেঁধে...

প্রাইভেট বাস, যেখানে সেখানে থামে। এটাও থামল। তৃণা ভর্তি বাসটায় একটু কষ্ট করে উঠে পড়ে।

দেবাশিস যে উন্নতি করেছে তা এমনি নয়। কতগুলো অদ্ভুত গুণ আছে তার। একটা হল ধৈর্য। তৃণা বাস থেকে নামতে নামতেই দেখল, বাসস্টপে দেবাশিসের গাড়ি থেমে আছে। আর সামনের জানালা দিয়ে অবিরল সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত তৃণা হাতের তেলোয় চেপে চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে গেল। খুব ফ্যাকাশে একটু হাসল।

দেবাশিস কিন্তু গম্ভীর। দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, উঠে পড়ো। তৃণা ঝুপ করে সিটে বসে বলল, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ। আজ আমার বড় দেরি হয়ে গেল।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল, ঠিক উল্টো।

মানে?

দেরিটা আমারই হয়েছে। তুমি আসার দু'মিনিট আগে আমি এলাম। মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, তুমি এসে ফিরে গেছ। আমিও চলে যাব যাব করছিলাম, হঠাৎ দেখি তুমি বাস থেকে নামলে। তোমার দেরি হল কেন?

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলে, ঠিক বেরোবার মুখেই কতগুলো ইনসিডেন্ট হয়ে গেল। রেবির ঘরে গিয়েছিলাম, ও ছিল না। হঠাৎ এসে বিশ্রী ব্যবহার করল । আর শচীনবাবুর সঙ্গেও একটু কথা কাটাকাটি, সেই থেকে মনটা এমন বিচ্ছিরি, আর অন্যমনস্ক, রাস্তা ভুল করে অনেকদূর চলে

গিয়েছিলাম। তোমার দেরি হল কেন?

দেবাশিস গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, তোমার সঙ্গে মিল আছে। ফুলির বাসায় রবিকে পৌঁছে দিয়ে বেরোবার সময়ে দেখি দোতলার রেলিং ধরে রবি...উঃ! মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখে একবার শিউরে ওঠে দেবাশিস। তারপর আস্তে করে বলে, রবিকে ফুলি কেড়ে রাখতে চাইছে। রবিও আর আমার সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না!

তৃণা চুপ করে থাকে। একটা গভীর শ্বাস চাপতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কুয়োর মতো গভীর গর্ত হয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাদে সে বলল, কী ঠিক করলে, রবিকে ওখানেই রাখবে?

রাখতে চাইনি। তবু রয়েই গেল বোধ হয়। ওকে রেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ভীষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। দুটো ট্র্যাফিক সিগন্যাল ভায়োলেট করেছি, পুলিশ নাম্বার নিয়েছে। পার্ক সার্কাসে একটা বুড়ো লোককে ধাক্কাও দিয়েছি, তবে সে মরেনি। কিছুক্ষণ ওইরকম র‍্যাশ ড্রাইভ করে দেখলাম, আর গাড়ি চালানো উচিত হবে না। আস্তে আস্তে গাড়িটা নিয়ে অফিসে গেলাম। বন্ধ অফিস খুলে অনেকক্ষণ ফাঁকা ঘরে বসে রইলাম। ঠিক নরমাল ছিলাম না। সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল। রবি কেন আমাকে আর তেমন পছন্দ করছে না বলো তো! আমি তো ওকে সব দিই। তবু কেন? বুঝলে তৃণা, আজ ফাঁকা অফিস ঘরে বসে আমার মতো কেজো মানুষেরও চোখে জল এল।

আস্তে চালাও, তুমি বড় অন্যমনস্ক। গাড়ি টাল খাচ্ছে।

দেবাশিস সামলে গেল। গাড়ি চালাতে চালাতে বলে, অফিসে বসেই একটা ডিসিসন নিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে চলে গেলাম ফুলির বাড়িতে। তখন গাড়ি চালানোর মতো মনের অবস্থা নয়। গিয়ে বললাম— ফুলি, আজ থেকেই রবি তোর কাছে থাকল। ফুলির সে কী আনন্দ! ওই মোটা শরীর নিয়েও লাফ ঝাঁপ দৌড়োদৌড়ি লাগিয়ে দিল! রবি ঘুমোচ্ছিল, আমি আর ওকে ডাকিনি। ঘুমন্ত কপালে একটা চুমু রেখে চলে এসেছি। ছেলেটা বুঝি পর হয়ে গেল। যাকগে।

তৃণা কাঁদছিল। নীরবে, একটু ফোঁপানির শব্দ হচ্ছিল কেবল। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বলল, কেঁদো না। সব কিছু কি একসঙ্গে পাওয়া যায়?

তৃণা মুখ না তুলে কান্নায় যতিচিহ্ন দিয়ে দিয়ে বলে, আমিও চলে এসেছি। চিরকালের মতো, আর ফিরব না।

দেবাশিস একটু গম্ভীর হল। শান্ত গলায় বলে, ভালই করেছ। শচীন কিছু বলল না?

অনেক কথা বলল। তত্ত্বকথা। আমাকে সাহসের সঙ্গে তোমার কাছে চলে আসতে উপদেশ দিল।

দেবাশিস একটু ভ্রূ কুঁচকে বিষয়টা ভেবে দেখে। তারপর বলে, শচীন ভেবেছে ও আমাকে চান্স দিচ্ছে। আই অ্যাম রেডি ফর দি ক্যাচ তৃণা। শচীন ইজ আউট।

তৃণা ঝুঁকে বসে কাঁদতে লাগল।

দেবাশিস কাঁদতে দিল তৃণাকে। একবার কেবল বলল, তোমার খিদে পায়নি তৃণা? আমার কিন্তু পেয়েছে।

তৃণা সে কথার উত্তর দিল না। কেবল নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

কান্নাটা বড়ই বিরক্তিকর। একটা মেয়ে সামনের সিটে উপুড় হয়ে বসে কাঁদছে— এ একটা সিন। গাড়ির কাচ দিয়ে বাইরে থেকেই দেখা যায়। অনেকে দেখছেও। দেবাশিস একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। ইচ্ছে ছিল রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেবে। কিন্তু তৃণার এই বেসামাল অবস্থায় রেস্টুরেন্টে যাওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতেই যেতে হয়। আজ সকাল পর্যন্ত কী তীব্র পিপাসা ছিল তৃণার জন্য। এখনও কি নেই? কিন্তু কেবলই রবির কথা মনে পড়ছে, রবিকে ফুলির কাছে রেখে এল দেবাশিস। বদলে কি তৃণাকে পেল চিরকালের মতো? দুজনকে দুদিকের পাল্লায় বসিয়ে দেখবে নাকি কোনদিকটা ভারী?

কিছুতেই কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না যে তৃণা চলে এসেছে চিরকালের মতো। হাতের নাগালে বসে আছে। একই ফ্ল্যাটে এরপর থেকে তারা থাকবে। দেবাশিস ভেবেছিল, এ এক অসম্ভব প্রেম। দুটো নৌকো, স্রোত...আরও কী কী যেন।

তৃণা বাথরুমে স্নান করছে। দেবাশিস বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করে। বিকেল চারটে বাজে মোটে। প্রীতম একবার চা দিয়ে গেছে। তারপর দোকানে গেছে খাবার আনতে। তৃণা এলে তারা খাবে।

দেবাশিস সিগারেট ধরিয়ে তার ফ্ল্যাটের বিশাল জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। বহু নীচে ফুটপাথ। এই সেই খুনি জানলা। অত নীচে কী করে, কোন সাহসে লাফিয়ে পড়েছিল চন্দনা? হাত পা হঠাৎ নিশপিশিয়ে ওঠে তার।

ভাল করে পর্দা সরিয়ে পাল্লা খুলে ঝুঁকে দেখল দেবাশিস। ঝিম ঝিম করে ওঠে মাথা। অবলম্বনহীন শূন্যতা তাকে দু হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে, এসো এসো। সাততলার ওপর সারাদিন, সব ঋতুতেই প্রচণ্ড হাওয়া খেলা করে, কী বাতাস? মার মার করে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা, বুক জুড়োনো বাতাস। তবু অত হাওয়াতেও দেবাশিসের মুখে ঘাম ফুটে ওঠে। কত নীচে ফুটপাথ! কী তীব্র আকর্ষণ অধঃপাতের! সবসময়েই, অবিরল পৃথিবী তার বুকের কাছে সবাইকে টানছে। যখন জানলার চৌকাঠের অবলম্বন জীবনে শেষবারের মতো ছেড়ে দিয়েছিল চন্দনা, ফুটপাথ স্পর্শ করবার আগে এই যে অবলম্বনহীন দীর্ঘ শূন্যতা বেয়ে নেমে গিয়েছিল তার শরীর, এই শূন্যতাটুকু কীভাবে অতিক্রম করেছিল ও? বাঁচতে ইচ্ছে করেনি ফের? কারও কথা মনে পড়েনি? কেঁদেছিল? এই পথটুকু, এই শূন্যতাটুকুতে চন্দনা কি চন্দনা ছিল? খুব জানতে ইচ্ছে করে। দেবাশিস কোমর পর্যন্ত শরীরের ওপরের অংশ ঝুলিয়ে দিল জানলার বাইরে! চেয়ে রইল নীচের দিকে। পোকার মতো মানুষ হাঁটছে, গাড়ি যাচ্ছে, একটা-দুটো গাছ, কালো মিশমিশে রাস্তা। কী ভয়ংকর! মুখের সিগারেটটা বাতাসে পুড়ে গেল দ্রুত। শেষ অংশটা ছুড়ে দিল দেবাশিস। বাতাসে খানিকটা ভেসে গেল, তারপর অনেক অনেকক্ষণ ধরে পড়তে লাগল নীচে...নীচে...নীচে...।

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ। তৃণা বেরিয়ে এল।

দেবাশিস শরীরটা তুলে আনল ভিতরে। বাতাস লেগে চোখে জল এসে গেছে।

তৃণার কান্না আর বিষণ্ণতা স্নানের পর ধুয়ে গেছে। কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। শোওয়ার ঘরে দুটো একা খাট, বিছানা পাতা। তার পাশে একটা পর্দা-ঘেরা সাজবার ঘর। জানলার পাশেই লম্বা আয়না-লাগানো সাজবার টেবিল। তৃণা সেখানে গিয়ে বসল। চন্দনা এখানে বসে সাজত।

তৃণা নিজেকে আয়নায় দেখল। কিছু তেমন দেখবার নেই। একটু সামান্য সাজগোজ করল। চুলটা ফেরাল। কোনওদিনই সে খুব একটা সাজে না।

আয়নায় দেবাশিসের ছায়া পড়ল। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে একটু হাসি। চুলগুলো খুব এলোমেলো।

বলল, কেমন লাগছে তৃণা?

তৃণা বিষণ্ণ হেসে বলল, ভালই।

আজ থেকে...বলে চুপ করে দেবাশিস। কী বলবে?

তৃণা কথাটা পূরণ করে নিল মনে মনে। লজ্জায় মাথা নোয়াল। বলল, তুমি যাও দেব। স্নান করে এসো।

দেবাশিস আঙুলে ধরা সিগারেটটা তুলে দেখাল, বলল, যাচ্ছি। সিগারেটটা শেষ করে নিই।

অন্তত ও ঘরে যাও। পুরুষের সামনে আমি সাজতে পারি না।

ও। বলে দেবাশিস পর্দার ওপারে গেল। ওখান থেকেই বলল, শোনো তৃণা, তোমার যা যা দরকার প্রীতমকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আজ রোববার, দোকান অবশ্য সবই বন্ধ।

কী আনাব? আমার কিছু দরকার নেই।

এক কাপড়ে তো বেরিয়ে এসেছ।

চন্দনার শাড়ি টাড়ি কিছু নেই?

না। সব বিলিয়ে দিয়েছি।

কেন দিলে?

রবির জন্য। ও সব থাকলেই তো ওর মায়ের কথা মনে পড়ত।

তৃণা বেশ ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একথায় বুকে একটা ধাক্কা খেল। তবু হেসে বলে, তবু কি মনে পড়ে না?

পড়ে। সেটা চেপে রাখে। আমার ফ্ল্যাটটা কিন্তু আমি সাজাইনি, চন্দনা সাজিয়েছিল। সেইভাবেই

সব আছে। এক একবার ভাবতাম সাজানোর প্যাটার্ন পাল্টে দিই। কিন্তু সময় পাইনি, এত কাজ। সেই সাজানো ঘরে চন্দনার কথা ওর মনে তো পড়বেই। এবার তুমি সাজাও।

দূর বোকা। মনে পড়া কি ওভাবে হয়! তুমি জানো না।

দেবাশিস একটা শ্বাস ফেলে বলল, আর রবির জন্য আমার ভাবনা নেই। ফুলির বাড়ির দঙ্গলে মিশে গেলে আর কিছু ওর মনে থাকবে না।

সিগারেটটা শেষ হয়েছে?

হয়েছে।

এবার যাও। আমার এখন খুব খিদে পাচ্ছে।

তোমার কী কী দরকার বললে না?

অনেক কিছুই দরকার। কিছু তো আনিনি। সে পরে হলেও চলবে।

লজ্জা কোরো না। এ তো আর পরের বাড়ি নয়। তোমার নিজের।

তৃণা একটু শ্বাস ফেলে বলল, তাই বুঝি?

নয়?

তৃণা একটু হেসে বলে, এত সহজে কি নিজের হয়? অনেক সময় লাগবে। আমাকে একটু সময় দিয়ো, তাড়া দিয়ো না।

দেবাশিস একটু উষ্মাভরে পরদার ওপাশ থেকে বলে, কেন? সময় লাগবে কেন?

লাগবে না! গাছ উপড়ে দেখো তার শিকড়ের সবটা কি একবারে উঠে আসে? কত শিকড় বাকড়ের ছেঁড়া সুতো কিছু কিছু মাটির মধ্যে থেকে যায়।

তৃণা—

উঁ।

গাছ তো একটানে ওপড়ানো হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে তার শিকড়ের মাটি ক্ষয় হয়ে ছিল না কি!

আবার বলছি, তুমি বোকা।

কেন?

উপমা দিয়ে কি সব বোঝানো যায়? গাছের সঙ্গে মানুষের কিছু তফাত আছেই।

পরদা সরিয়ে উত্তেজিত দেবাশিস ও ঘরে চলে এল হঠাৎ। মেঝেতে তৃণার কাছে বসে উর্ধ্বমুখ হয়ে বলল, তৃণা, আমি বড় কাঙাল।

জানি তো।

আজ আমার কেউ নেই।

তৃণা তাকিয়ে রইল।

দেবাশিস বলল, আর আমাকে এখন ও সব ভয়ের কথা বোলো না। তোমারও যদি ছেঁড়া শেকড় অন্য জায়গায় থেকে থাকে তবে আমার কী হবে? আজ থেকে রবিও পর হয়ে গেল।

তৃণা স্নিগ্ধস্বরে বলল, রবির জন্য তোমার বুকের ভিতরটা কেমন করে দেব, তা বোঝো না।

ভীষণ বুঝি।

ওটুকু কি আমার হতে নেই?

দেবাশিস চুপ করে গেল। জোব্বা জামার পকেট থেকে ফের সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল। ধরাল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি।

তৃণা তেমনি স্নিগ্ধস্বরে বলল, আমরা তো আর ঠিক সকলের মতো হতে পারি না।

দেবাশিস বলল, তাও ঠিক। তবে আমরা কী রকম হব তৃণা।

খুব সুখী হব না, একটু কী যেন থেকে যাবে দুজনের মধ্যে!

তুমি কী ভীষণ স্পষ্ট কথা বলছ আজ তৃণা!

আজই বলে নেওয়া ভাল।

কেন? আজই কেন?

তৃণা চোখ মুছে হাসিমুখে বলে, আজ সপ্তাহের ছুটির দিন। তোমার সময় আছে। কাল থেকে তো

তুমি আবার ব্যস্ত মানুষ। তোমার কি আর সময় হবে?

তুমি কথাটা ঘোরালে তৃণা।

তুমি বাথরুমে যাও। আমার খিদে পেয়েছে!

দেবাশিস তবু বসে রইল। চুপচাপ। অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে বলে, তৃণা।

বলো।

মানুষকে তার সব সম্পর্ক থেকে ছিঁড়ে আনা যায় না। একজনকে ভাল না বাসলেই যে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এমন নয়। আবার কাউকে ভালবাসলেই যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল এও নয়। তবে ভালবাসা দিয়ে আমার কী করব?

তৃণা কপালটা টিপে ধরে বলল, ও, আবার সেই তত্ত্বকথা! জানো না মেয়েরা তত্ত্বকথা ভালবাসে না! মাথা ধরেছে, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে প্রীতম। বড় রেস্টুরেন্টের দামি সব খাবার। প্রীতমের মুখে খুব একটা হাসি নেই। কেবল বিনয় আছে।

দেবাশিস যখন খাওয়ার টেবিলের ধারে এসে বসল তখনও তৃণা নিজের কপাল টিপে আছে, বলল, তোমার চাকরকে পাঠিয়ে একটু মাথা ধরার বড়ি আনিয়ে দাও।

দেবাশিস মৃদুস্বরে বলে, ও তোমার চাকর। অবশ্য পাঠানোর দরকার নেই। মাথাধরার বড়িটড়ি আছে বোধ হয়। খুঁজতে হবে।

খিদে চেপে রাখলে, বা কাঁদলে আমার মাথা ধরে।

দেবাশিস চোখ তুলে ইঙ্গিতে প্রীতমকে সরিয়ে দিল। তারপর হাত বাড়িয়ে তৃণার একখানা হাত ধরে বলল, তুমি প্রস্তুত হয়ে আসোনি জানি। হুট করে চলে এসেছ। তাই কাঁদছ। কিন্তু আমি মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম তোমার জন্য।

তৃণা হেসে বলল, খুব প্রস্তুত! একখানা শাড়িও যদি কিনে রাখতে। কাল আমাকে বাসি কাপড়ে সকালবেলাটা কাটাতে হবে, যতক্ষণ শাড়ি কেনা না হয়।

একটা দিন সময় দাও! প্লিজ। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ দোকান বন্ধ।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল, সময়! সময়! দাঁড়াও, সময় নিয়ে কী একটা কবিতার লাইন মনে আসছে— এল না। মাথাটা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়!

দেবাশিস বলে, খেয়ে একটু রেস্ট নাও। শোওয়ার ঘরের পরদাগুলো টেনে দিচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকো একটু।

তুমি কোথায় যাবে?

কোথাও না। তোমার কাছেই বসে থাকব। বক বক করব।

তৃণা সস্নেহে হাসল।

পাঁচটা প্রায় বাজে। সাততলা ফ্ল্যাটের শার্শির গায়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল সোনালি রোদ এসে পড়েছে। এখনও অনেক বেলা আছে। অন্ধকার হতে এখনও অনেক বাকি। পরদায় ঢাকা শোওয়ার ঘরে শুয়ে আছে তৃণা। গায়ে খয়েরি পরদার আলোর আভা। দুটো বড়ি খাওয়ার পর আস্তে আস্তে মাথাধরাটা সেরে যাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। তবু কি ঘুম আসে! দেবাশিস অনেকক্ষণ মাথাটা টিপে দিল। ঝিম মেরে শুয়ে ছিল তৃণা, ঘুমের ভান করে। সে ঘুমিয়েছে মনে করে দেবাশিস উঠে গেছে পা টিপে টিপে।

ঘরটা ঠিক অন্ধকার হয়নি। আবার আলোও নেই। সাততলার ওপর খুবই নিরাপদ আশ্রয়। একা শুয়ে আছে তৃণা। মাথা ধরা সেরে গেছে। নরম বিছানায় এলিয়ে আছে ক্লান্ত শরীর। এ একরকমের আলস্য। সুন্দর আলসেমি। কিন্তু ঘুম হবে না। আরও কতকাল ঘুম হবে না তৃণার।

সে চোখ চেয়ে দেখল ছাদের মসৃণ রং, চৌকো দেয়াল। দেয়ালে রহস্যময় আলো। চেয়ে থাকতেই সেই সুড়সুড়ির মতো একটা অনুভব। কে যেন দেখছে। খুব নিবিষ্টভাবে দেখছে তাকে।

চমকে উঠল তৃণা। মাথাটা একবার তুলে চারদিকে তাকাল। আবার মাথাটা বালিশে রেখে চোখ বোজে! কিন্তু অবিরল তার ওই অনুভূতি হয়, কে যেন দেখছে। ভীষণ দেখছে। চন্দনার ভূত? নাকি

তার মনেরই প্রক্ষেপ? সে নিজেই হয়তো। ভাবতে ভাবতে মুখটা আস্তে ফেরাল তৃণা। চোখটা আপনা থেকেই খুলে গেল। আর ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠে বসে সে— কে? কে?

খাওয়ার ঘরের দিকটার দরজার পরদার ওপাশে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পরদাটা আস্তে সরিয়ে মুখ বাড়াল ভিতরে। ভার গলায় বলে, আমি, প্রীতম।

তৃণা অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থেকে বলে, কী চাও?

চাকরটা একটু ভয়ের হাসি হেসে বলে, সাহেব বলে গেলেন আপনি ঘুম থেকে উঠলে খবর দিতে, উনি একটু কোথায় বেরোলেন। এক্ষুনি আসবেন।

কোথায় গেছেন?

বলে যাননি। গাড়ি নিয়ে গেলেন দেখেছি।

ও।

তৃণার বুকের ভিতরটা এখনও ঠক ঠক করছে। শ্লথ আঁচল টেনে নিয়ে সে উঠল। বলল, দাঁড়াও। তোমাদের ঘরটরগুলো আমাকে একটু দেখিয়ে দাও। চিনে রাখি।

চাকরটা উত্তর করল না, খুশিও হয়নি। তবু এক রকম বিরক্তি বা ঘেন্না চেপে-রাখা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ও হয়তো ভাবছে, সাহেব রাস্তার মেয়েছেলে ধরে এনেছে, রাখবে। দেবাশিস তো ওকে বলেনি যে তৃণা আসলে কে! বললেও বুঝবে না। এমন অবস্থার দুটি মানুষের ভিতরকার প্রেমের সত্য কে কবে বুঝেছে! সবাই একটা কিছু ধরে নেয়।

শোওয়ার ঘর দুটো। একটা খাওয়ার ঘর। একটা বসবার। অনেকটা জায়গা নিয়ে খোলামেলা ফ্ল্যাট। দ্বিতীয় শোওয়ার ঘরটা রবির। সেখানে অনেক খেলনা, ট্রাইসাইকেল, ছবির বই, ছোট্ট ওয়ার্ডরোব। এই ঘরটায় একটু বেশিক্ষণ থাকল তৃণা। চাকরটাকে বলল, এককাপ কফি করে আনো।

ফোনটা বাজছে বসবার ঘরে। বাজছেই। চাকরটা রান্নাঘরে। ওখান থেকে শুনতে পাবে না। তৃণা ইতস্তত করছিল, ফোন কি সে ধরবে? পরমুহূর্তেই ভাবল অমূলক ভয়। এ বাড়িতে যদি তাকে থাকতেই হয় তবে এ সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। সে উঠে এল বসবার ঘরে। ফোন হাতে নিয়ে অলস গলায় বলে, হ্যালো।

একটা কচি গলা শোনা গেল— বাপি?...ওঃ...থেমে গেল স্বরটা। তারপর নম্বরটা বলে জিজ্ঞেস করল— এটা কি ওই নম্বর?

তৃণা বুঝে নিল, রবি। ফোনের গায়ে লেখা নম্বরটা তৃণারও তো মুখস্থ। বলল, কে বলছ?

তুমি কে? বলে কচি গলাটা অপেক্ষা করল। হঠাৎ ভয়ার্ত গলায় বলল, মা?

তৃণা এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ফোনটা কানে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। রবি ফোন করছে। যদি তৃণা রং নাম্বার বলে ফোন ছেড়ে দেয় তো রবি আবার ফোন করবে, শুধু আজ নয়, কালও করবে। হয়তো প্রায়ই বাবার সঙ্গে দরকার পড়বে তার, তৃণা কোথায় পালাবে? পালাবেই বা কেন? তবু প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর জন্য একটু সময় দরকার। সে চোখ বুজে বলল, রং নাম্বার।

ফোন রেখে দিল। ভেবে পেল না, রবি কেন মা কিনা জিজ্ঞেস করল।

প্রীতম কফি করে এনেছে। সেই সময়েই ফোনটা আবার বাজে। প্রীতম তার দিকে তাকায়। তৃণা ঘাড় হেলিয়ে বলে, রবি ফোন করছে। ওকে আমার কথা বোলো না।

প্রীতম ফোন তুলে নিয়ে বলে, হ্যালো। রবিবাবু?

— ...

— না তো। ফোন বাজেনি।

— ...

— সাহেব বাইরে গেছেন।

— ...

— না আমি একা। তুমি আর আসবে না?

— ...

— চাঁপাদি আসবে না? আচ্ছা বলে দেব। তোমার সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দেব।

— আচ্ছা তুমি আসবে না কেন?

...

— এলে বলব। ছাড়ছি।

ফোন রেখে প্রীতম একবার আড়চোখে তৃণার দিকে চেয়ে বাইরে চলে গেল।

সাড়ে পাঁচটা। দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

তৃণা ভেবেছিল দেবাশিস এসেছে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অপ্রস্তুত। দেবাশিস নয়। টেরিলিন পরা দিব্যি ঝকমকে একজন যুবা পুরুষ। সেও একটু অপ্রস্তুত। বলল, দেবাশিস নেই?

না। বেরিয়েছে।

ও। বলে খুব কৌতূহলভরে চেয়ে দেখল তৃণাকে।

তৃণা কি ওকে বসতে বলবে?

লোকটা নিজেই বলে, রবি নেই?

না।

লোকটার চোখে স্পষ্টই একটা প্রশ্ন— আপনি কে? কিন্তু লোকটা সে প্রশ্ন করে না, ভদ্রতায় বাধে। তাই বলল, আমি রবির মামা।

ও? আসুন।

বসে আর কী হবে! কেউ নেই যখন! বলতে বলতেও যুবকটি কিন্তু ঘরে আসে। একটু ইতস্তত করে বসে। একটা শ্বাস ফেলে হাতে হাত ঘসে বলে, আপনি ওর রিলেটিভ বোধ হয়।

তৃণা মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ।

চন্দনা আমার দিদি ছিল।

তৃণা তার এলো চুলের জট আঙুলে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, বুঝেছি, বুঝেছি। বসুন, ও এসে পড়বে।

যুবকটি ঘড়ি দেখে বলে, একটু বসতে পারি। আমি ভাবলাম--- বলে একটু কথা সাজিয়ে নিয়ে বলে, আসলে কাল আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। বলছিলাম কী দেবাশিসদা তো যাবেনই, সেইসঙ্গে আপনিও... যদিও ঠিক আচমকা এভাবে—

তৃণার ছেলেটির জন্য মায়া হয়। বুঝতে পারছে না, বুঝতে চাইছে। বলল, কফি খান। ও এসে পড়বে।

ছেলেটি প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখতে থাকে। চোখে চোখ পড়তেই সরিয়ে নেয়। কিন্তু দেখে। তৃণা কফি বানাতে বলবার ছল করে উঠে এল। রান্নাঘরে প্রীতমকে খবর দিয়ে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বসে রইল চুপচাপ। শুনল, ওঘরে প্রীতমের সঙ্গে কথা বলছে লোকটা। চাপা স্বর। এরকমই হবে এর পর থেকে। তৃণার জায়গাটা স্থির হতে অনেক সময় লাগবে। অনেক সময়। তৃণা শুষ্কমুখে বসে থাকে। চুলের জট ছাড়ায় অনামনে।

দেবাশিসের ফিরতে ছ'টা বেজে গেল। তখনও ছেলেটা বসে আছে সামনের ঘরে। আর দেবাশিসের হাতে কয়েকটা শাড়ির প্যাকেট, রজনীগন্ধার ডাঁটি, কসমেটিক্সের বাক্স, খাবারের বাক্স। চন্দনার ভাই সে সব দেখে অবাক। পর্দার ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখল তৃণা।

না, দেবাশিস খুব একটা ঘাবড়াল না। চালাক লোকরা এরকম বিপদে পড়লে খুব গম্ভীর হয়ে যায়। দেবাশিসও হল। দু'-চারটি কী কথা হল ওদের। ছেলেটা চলে গেল।

দেবাশিস বেশ হাঁক ছেড়ে ডাকল— তৃণা।

তৃণা ঘরের মাঝখানটায় না গিয়ে পরদা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, কী?

দেবাশিস একগাল হাসি হেসে বলল, সব এনেছি।

কোত্থেকে?

তোমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হঠাৎ মনে পড়ল যাদবপুরে যখন থাকতাম তখন দেখেছি ওই অঞ্চলে রবিবারে দোকান খোলা থাকে। গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, দেখো তো সব!

সব দেখে তৃণা হেসে কুটিপাটি। বলল, কী এনেছ এ সব?

কেন?
এ রংচঙে শাড়ি আমি পরি নাকি?
পরো না?
এসব তো রেবা পরে। আর অত কসমেটিক্স! হায় রে আমি কবে আবার ও সব আলট্রা মডার্ন লিপস্টিক মাখি, কিংবা কাজল!
দেবাশিস হেসে বলে, এবার মেখো। বুড়ি সাজা তোমার কবে ঘুচবে বলো তো!
মেয়ে বড় হয়েছে দেব, ক'দিন পরেই প্রেম করবে। এখনই করছে কি না কে জানে!
দেবাশিস হেসে বলে, বাঙালি মেয়েদের ওই হচ্ছে রোগ। তুমি সাজবে না কেন তৃণা?
তৃণা শুধু হাসল। স্নিগ্ধ হাসি। বলল, রবি ফোন করেছিল।
দেবাশিসের মুখের হাসিটা মরে গেল, বলল, কী বলল?
আমি ধরেছিলাম। রং নাম্বার বলে ছেড়ে দিয়েছি। পরে আবার ফোন করেছিল, তখন প্রীতম ধরে।
দেবাশিস একটু ভেবে বলল, থাকগে।
উঠে পোশাক পালটে এল দেবাশিস। চা খেল ফের।
ডাকল— তৃণা।
উঁ।
কীভাবে শুরু করা যায় বলো তো!
কী? কীসের কথা বলছ?
বুঝতে পারছ না?
না তো।
তোমার আর আমার এই জীবনটা।
শুরু আবার করবে কীভাবে?
ধরো, বিয়ে হলে পুরুতের মন্ত্র, ফুলশয্যা-টয্যা দিয়ে একটা শুরু করা যায়। রেজিস্ট্রি করলে তারও সরকারি মন্ত্র আছে। আমরা কী দিয়ে শুরু করব?
তৃণা লজ্জা পেয়ে বলে, ও সব বোলো না। কানে লাগে। আমরা কিছু শুরু করলাম, নাকি শেষ করে এলাম?
তোমার কি তাই মনে হয়? তার উত্তরে বলা যায় যে একটা শেষ না করলে অন্যটা শুরু করা যায় না তৃণা।
ফের তত্ত্বকথা।
তুমি যে শুরুটাকে শেষ বলছ!
শোনো দেব, আমি কিছু শেষ করে আসিনি। শুরুর কথাও ভাবিনি। আমি বাড়িতে ভূতের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এসেছি। আমি কী করছি আমি নিজেও জানি না। মাথার ভিতরটায় বড় গণ্ডগোল। আজ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু একটা জিনিস জানি।
কী তৃণা? আগ্রহে দেবাশিস ঝুঁকে বসে।
তোমাকে আমার ভীষণ দরকার এ সময়ে। আর কিছু না।
তৃণা, তবে আমরা সেই আদিমভাবে শুরু করব! যখন কোনও অনুষ্ঠান ছিল না, কেবল শরীর ছিল!
ছিঃ! ওভাবে বোলো না।
দেবাশিস হেলান দিয়ে বসে বলে, ছেলেবেলায় আমি ছিলাম বদমাশ। মেয়েদের হাতে চিঠি গুঁজে দিতাম। বসন্তবাবুর বাড়ির ছাদে প্রত্যেকদিন ঘুড়ি গোঁত্তা মেরে নামিয়ে দিতাম তাতে লেখা থাকত আই লাভ ইউ। বসন্তবাবুর মেয়ে রানিকে উদ্দেশ করে। তখন শুরু করার কোনও প্রবলেম ছিল না। ভাবতে শিখিনি, রচনা করতে শিখিনি, সাজাতে শিখিনি, ওই ভাবেই শুরু করতাম। চন্দনার সঙ্গেও হুট করে শুরু। প্রথমে শরীর, তারপর ভালবাসার চেষ্টা, যেন ফ্রাস্টেশন অ্যান্ড দি এন্ড, তোমাকে নিয়ে তো সেভাবে শুরু করা যায় না। আজ আমার মস্ত প্রবলেম।
আজকের দিনটা অত ভেবো না। মাথা ঠাণ্ডা করো।

দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলে, আজকের দিনটা অদ্ভুত। বুঝলে? আজ রবিকে পার্মানেন্টলি ওর পিসির বাড়িতে দিয়ে এলাম। আর তারপরই শুনলাম তুমি চলে আসছ। শচীন কিছু বলল না?

কী বলবে?

অধিকার ছেড়ে দিল এক কথায়? তুমিই বা কী বলে এলে?

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে বলে, কী বলব? আমি কিছু বলে আসিনি।

দেবাশিস চমকে উঠে বলে, বলে আসোনি?

না। আমি প্রায়ই যেমন বেরোই তেমনি বেরিয়ে এসেছি।

আমার কাছে এসেছ সে কথা কেউ জানে না?

না।

কাউকে বলোনি?

না।

বোকা।

কেন?

তুমি না ফিরলে ওরা তো থানা পুলিশ করবে। হাসপাতালে খোঁজ নেবে।

নেবে! বলছ?

নেবে না?

আমার তো মনে হয় না। ওরা কি জানে যে আমি আছি?

তুমি বোকা তৃণা। বলে আসলেই হয়। শচীনবাবু কি তোমাকে কামড়াত?

তা নয়। ওরা আমাকে নিয়ে বহুকাল ভাবে না। আজ একটু ভাবুক।

দেবাশিস মাথা নেড়ে বলে, তা হয় না।

বলেই উঠে গেল দেবাশিস। ডায়াল করতে লাগল। তৃণা ওর কাছে গিয়ে বলল, ফোন কোরো না। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে নিরুদ্দেশ থাকতে দাও। ওরা ভাবুক।

তা হয় না। মাথা নাড়ল দেবাশিস। ফোন কানে তুলে শুনে বলল, এনগেজড।

তৃণা একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলল।

দেবাশিস ঘুরে বলল, আমি যা করব তা পাকাপাকি। কোনও অনিশ্চয়তা থাকবে না, দ্বিধা থাকবে না।

## ॥ সাত ॥

পৌনে সাতটা বাজেনি এখনও। বাজছে প্রায়। সাততলার ঘরের শার্সি দিয়ে দেখা যায়, কলকাতার ওপরকার আকাশটা মস্ত বড়। আকাশে তারা ফুটছে। শহরটা অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, আলোয় আলোয় তিলোত্তমা।

বসবার ঘরটা অন্ধকার। কিংবা ঠিক অন্ধকার নয়। একটা রঙিন কাচের ঢাকনার ভিতরে শূন্য শক্তির আলো জ্বলছে। জানলার পর্দা সরানো। বাইরে চাঁদ। ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নার চৌকো চাঁপা রঙের আলো পড়ে আছে। আর ঝড়ের মতো বাতাস।

দেবাশিস একা ভূতের মতো বসে আছে। তার পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক। সামনে দুটো ঠ্যাং ছড়ানো, সোফার কাঁধে হেলানো মাথা। ছাদের দিকে মুখ। দুটো হাত অসহায়ভাবে দু'দিকে পড়ে আছে। সে তৃণার কথা ভাবছে। জলস্রোত উলটোপালটা, পালে পাগলা বাতাস, তবু বিপরীতগামী দুটি নৌকো একটা অন্যটার সঙ্গে জুড়ে গেল। বাঃ। বেশ।

তৃণা ও ঘরে সাজছে। তারা বেড়াতে যাবে। তৃণা যেতে চায়নি। শরীরটা আজ ভাল নেই। দেবাশিস বলেছে, বেড়ালে মনটা একটু হালকা হয়। তোমার তো শেকড়ের প্রবলেম আছে।

তৃণা বেড়াতে ভালবাসে না। তার প্রিয় অভ্যাস ঘরের কোণে একা থাকা। ছবি আঁকবে, কবিতা

লিখবে, বই পড়বে, গান শুনবে। কেউ কথা-টথা বলতে এলে বিরক্ত হয়। রোগে ভুগে ভুগে ছেলেবেলা থেকে ওর ওই অভ্যাস হয়ে গেছে।

ফোনটা বাজছে। দেবাশিস হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিল।

হেল্লো।

মহিলাকণ্ঠে কে বলল, দেবাশিস দাশগুপ্ত আছেন?

বলছি।

ওঃ। দাদা...

ফুলি। ফুলির গলা টেলিফোনে কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। ভীষণ ভয় খেয়ে গেল দেবাশিস। শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল বিদ্যুৎ স্পর্শে। রবির কোনও কিছু হয়নি তো!

ফুলি! কী হয়েছে?

তুমি ফিরেছ! বাঁচা গেল। রবি সেই থেকে বাবা-বাবা করছে। দু'বার ফোন করেছিল।

কী হয়েছে?

কিছু না। কী হবে? অত ভেবো না তো। রবি আছে আমার কাছে আর আমি অনেক ছেলেপুলের মা।

দেবাশিস বিরক্ত হয়ে বলে, কী ব্যাপার বলবি তো!

রবি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বলছে বাবা কেন দেরি করছে ফিরতে!

মন খারাপ নাকি!

না না। দস্যিপনা করছে সব সময়ে। বেশ আছে।

ওকে ফোনটা দে।

একটু পরেই রবির গলা শোনা গেল— বাবা।

বলো। ভারী স্নিগ্ধ হয়ে গেল দেবাশিসের গলা।

আমরা বেড়াচ্ছি।

কোথায়?

ট্যাক্সি করে বেরিয়েছি। এখন আছি শ্যামবাজারে।

সঙ্গে কে আছে?

মণিমা, পিসেমশাই, নিন্‌কু...

এনজয় ম্যান।

বাবা, আমার বই, জামা, প্যান্ট খেলনা, সব কবে পাঠাবে?

কাল প্রীতম দিয়ে আসবে।

এখান থেকেই স্কুলে যাব তো?

যেয়ো।

আর দিদি আমার কাছেই থাকবে তো বাবা? দিদি গল্প না বললে আমার খাওয়া হয় না। মণিমা বলেছে, চাঁপা থাকুক।

থাকুক।

তুমি রাগ করোনি তো বাবা?

রাগ? না রাগ করব কেন?

আমি যে মণিমার কাছে চলে এলাম!

তা বলে রাগ করব কেন?

তুমি যে আমাকে ছাড়া থাকতে পারো না।

দেবাশিস একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, পারি বাবা। পারতে তো হবেই।

নিন্‌কু বলছিল— তোর বাবা তোকে ছাড়া একা একা ভয় পাবে দেখিস। আমাদের বাড়িতে কি ভূত আছে বাবা?

ভূত? কে তোমাকে ভূতের কথা শেখাচ্ছে? ভূত-টুত আবার কী?

থাপি বলছিল।
কী বলছিল?
রবি বোধ হয় একটু লজ্জা পায়। একটু থেমে বলে, বাবা মানুষ মরে গেলে তো ভূত হয়। তাই—
তাই কী?
থাপি বলেছে। আমি না।
কী বলেছে?
বলেছে মা মরে গিয়ে নাকি ভূত হয়ে আছে ও বাড়িতে।
ও সব বাজে কথা রবি। ও সব বিশ্বাস করতে নেই।
বুড়োদাও বলেছে— ও বাড়িতে আর যাসনে রবি। গেলে তোর মা ঠিক তোর ঘাড় মটকে দেবে। ভূতেরা নাকি যাদের ভালবাসে তাদের মেরে নিজের কাছে নিয়ে যায়।
ছিঃ রবি। এ সব কথা শিখলে তোমাকে আমি ওখান থেকে নিয়ে আসব।
দিদিও আমাকে কত ভূতের গল্প বলে।
আমি চাঁপাকে বারণ করে দেব। ও সব গল্প শুনো না!
আচ্ছা। কিন্তু বাবা—
বলো। দেবাশিসের গলাটা গম্ভীর।
আমি যখন আফটারনুনে ফোন করেছিলাম তখন—
তখন কী?
আমার মনে হয়েছিল আমাদের বাড়িতে মা ফোন ধরেছে।
কী যা তা বলছ?
না না, ওটা রং নাম্বার ছিল। কিন্তু যে লেডি ফোনটা ধরেছিলেন তার গলা শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মার ভূত ঠিক ফোন ধরেছে?
এ রকম ভাবতে নেই। আর ভেবো না।
বাবা, কাল আমি ইস্কুলে যাব না।
কেন?
আমি তো স্কুল-ড্রেস আনিনি, বই খাতাও নয়।
দেবাশিস একটু ভেবে বলল, ঠিক আছে। পরশু থেকে যেয়ো। স্কুলে চিঠি লিখে দেব, বাস এবার ওখানে যাবে।
কাল তা হলে ছুটি বাবা?
ছুটি।
তা হলে কোথায় বেড়াতে যাবে বলো তো!
কোথায়?
রবি ফোনে হাসল। কী স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি। বলে, মণিমা বলেছে কাল আমরা তোমার ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাব।
দেবাশিস উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, এখানে! এখানে কাল এসে কী করবে? আমি তো থাকব না।
মণিমা বলছে কাল নিজে আমাকে নিয়ে যাবে, আমার সব জিনিস গুছিয়ে আনবে, আর আমাদের ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে দিয়ে আসবে!
না, না তার দরকার নেই।
যাব না?
দরকার কী রবি? আমিই পাঠিয়ে দেব।
দাঁড়াও তা হলে, মণিমাকে বলি।
ফোনের মাউথপিসে হাতচাপা দিয়ে রবি ফুলির সঙ্গে পরামর্শ করছে দৃশ্যটা স্পষ্টই দেখতে পায় দেবাশিস। খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করে। আর সেটুকু সময়ের মধ্যেই সে ভেবে দেখল তার মহিলা ভাগ্য ভাল নয়। প্রথমবার বিয়ে করেছিল চন্দনাকে। পেটে বাচ্চা সমেত। দ্বিতীয়বার যাকে আনছে তারও বড়

বড় ছেলেমেয়ে, স্বামী, সংসার সব থেকে ছিঁড়ে আনতে হবে। কোনওবারই তার সহজ সরল বিয়ে হল না। যেন চুপি চুপি পাপ কাজ সারছে।

রবি বলল, হ্যালো?

বলো।

আমরা কাল যাব না।

আচ্ছা।

রবিবারে যাব।

দেবাশিস হেসে বলে, রবিবারে আমিই যাব।

তা হলে?

তা হলে কি রবি?

আমি আমাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে যাব কবে?

আসবে। বেড়াতে আসবে কেন, এ তো তোমার নিজেরই ফ্ল্যাট। যখন খুশি আসতে পারবে। তবে এ সপ্তাহে নয়।

কাল তা হলে আমরা ট্যাক্সিতে করে দক্ষিণেশ্বরে যাব।

যেয়ো।

ছাড়ছি বাবা। গুডনাইট।

নাইট।

ফোন রেখে দিল দেবাশিস! ভ্রূ কোঁচকানো মুখটায় চিন্তার লেখা।

অন্ধকার ঘরে, পাশের ঘর থেকে আলো এসে লম্বা হয়ে পড়েছে। সেই আলো পিছনে নিয়ে ছায়ামূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তৃণা।

দেবাশিস অস্ফুট একটা যন্ত্রণার শব্দ করল। যন্ত্রণাটা কোথায় তা বুঝতে পারছিল না।

বলল, রেডি তৃণা?

হুঁ। কিন্তু আমার শরীরটা ভাল নেই।

কী হয়েছে?

কী করে বলব! আজ বড্ড টায়ার্ড।

গাড়িতে তো বসেই থাকবে। খোলা হাওয়ায় দেখো, ভাল লাগবে।

তোমার ফ্ল্যাটে খোলা বাতাসের অভাব নেই।

না, না। চলো প্লিজ। এই ফ্ল্যাটটায় আমার একদম ভাল লাগে না।

কেন, বেশ সুন্দর তো?

কী জানি কেন। বেশিক্ষণ ভাল লাগে না।

তৃণা একটু হাসির শব্দ করে বলে, আমারও কি খারাপ লাগবে দেব?

না। তোমার লাগবে না। আমার তো কতগুলো রিফ্লেক্স আছে। সবই তো তুমি জানো। দেয়ার আর বিটার মেমোরিজ, লোনলিনেস...সব মিলিয়ে একটা সাফোকেশনের মতো হয় মাঝে মাঝে। রবিটারও হত।

রবি ফোনে তোমাকে ভূতের কথা কী বলছিল দেব?

ছেলেমানুষ তো। কে যেন ভয় দেখিয়েছে, ওর মা নাকি ভূত হয়ে আছে এখানে।

তৃণা একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, যখন দুপুরের পরে ফোন করেছিল তখন রবি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল— তুমি কে? মা?

তুমি কী বললে?

কী বলব! মিথ্যে করে বললাম রং নাম্বার।

ঠিকই করেছ।

ও কি ভেবেছিল ওর মায়ের ভূত কথা বলছে?

শব্দ করে হাসল দেবাশিস। বলল, হ্যাঁ। আচ্ছা পাগল আমার ছেলেটা।

শোনো।
কী?
আর-একটু পরে বেরোও। আমি একটু বসি। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম করে উঠল।
দেবাশিস এগিয়ে তৃণার হাত ধরে এনে সোফায় বসায় যত্ন করে। নিজে তার পাশে বসে। হাতখানা ধরে থেকে বলে, তোমার নাড়ি বেশ দুর্বল।
তৃণা ঘাড় এলিয়ে রেখে বলল, আজকের দিনটা কেমন যেন ভাল নয়। বিশ্রী দিন।
উদ্বেগে দেবাশিস ঝুঁকে বলে, কেন তৃণা?
দেবাশিসের কাছে আসা মুখখানা হাত তুলে আটকায় তৃণা। বলে, এক একটা দিন আসে সকাল থেকেই কেবল সব কাজ ভুল হতে থাকে। যেন ভূতে পায় মানুষটাকে।
কীরকম?
দেখ না, কোনও দিনই তো আজকাল রেবার বা মনুর ঘরে যাই না! আজ যেন ভূতে পেল। গেলাম। রেবা হঠাৎ এসে পড়ল, চোরের মতো ধরা পড়ে গেলাম; কী বিশ্রী রকমের ব্যবহার যে করল ও!
তুমি রেবাকে বড্ড ভালবাসো তৃণা।
ভীষণ ভালবাসি। সেইজন্যই তো ও আমার বুক ভেঙে দেয়।
সাতটা কিন্তু বেজে গেছে তৃণা।
দাঁড়াও না। আজ কি একটা সাধারণ দিন! সকাল থেকেই সব অনিয়ম চলছে। অদ্ভুত দিনটি আজ। ঘড়ি-টড়ি দেখো না।
দেখব না। বলো।
তারপর মনু। ওকে বলেছিলাম, ঘরে পৌঁছে দে, শরীরটা ভাল না। তো ছেলে আমাকে জাপটে কোলে তুলে নিল। এমনিতে কথাও বলে না। তবে কেন আজ...? তারপর শচীনবাবু। সেও আজ অন্যরকম। রুমাল কুড়িয়ে দিল...অনেক কথা বলল...
শোনো তৃণা, শচীনকে ফোনটা কিন্তু করা হয়নি।
পরে কোরো।
এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা তোমার খোঁজ করছে। ওদের কেন অযথা ভাবতে দিচ্ছ?
ভাবুক। একটু ভাবুক। কোনওদিন তো ভাবে না।
না তৃণা। তুমি ভুল করছ। যা করছ তা আরও বলিষ্ঠভাবে করো। চুরি তো করোনি।
তৃণা দেবাশিসের হাতটা ধরে বলল, আঃ! তোমার কেবল ভয়। শোনো না।
দেবাশিস শ্বাস ছেড়ে বলল, বলো।
ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে আজ ভূতে পেল।
সে কী রকম?
ভুল রাস্তায় চলে গেলাম। ঠিক যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো একটা ছেলে মোটরসাইকেল চালিয়ে গেল, সেই শব্দে চেতনা হয়। তারপরও ফের ভুল। একটা ট্যাক্সিওলা নিয়ে গেল দেশপ্রিয় পার্কে। তাকে ডিরেকশন দিতে মনে ছিল না, রাস্তাটাও খেয়াল করিনি। তাই মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা খুব অদ্ভুত।
কী বলতে চাও তৃণা?
তৃণা অন্ধকারেই মুখ ফেরাল তার দিকে। বলল, এক একটা দিন আসে, ভুল দিয়ে শুরু হয়। ভুলে শেষ হয়। ভুতুড়ে দিন।
না তৃণা, ভুল দিয়ে শেষ হচ্ছে না। তুমি বড্ড সেকেলে।
না দেব। শোনো, আমি শুধু একটাই ঠিক কাজ করেছি আজ।
কী?
শচীনকে বলে আসিনি।
বলে আসা উচিত ছিল। এটাই ভুল করেছ।
তৃণা মাথা নেড়ে বলে, না। বলে আসলেই ভুল করতাম।

দেবাশিস অধৈর্যের গলায় বলে, আমি এক্ষুনি ফের শচীনকে ফোন করছি।

বলেই বাধা না মেনে উঠে গেল দেবাশিস। ফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ে অল্প আলোয় ঠাহর করে করে আস্তে আস্তে ডায়াল ঘোরাতে থাকে।

ফোনটা কানে তুলে অপেক্ষা করছে। তৃণা উঠে এল কাছে, ফোনটা নিয়ে নিল হাত থেকে। রেখে দিতে যাচ্ছিল, শুনল ওপাশ থেকে একটা মেয়ের গলার স্বর বলে উঠল, হ্যালো।

রেবা বোধ হয়! তৃণা তাই ফোনটা কানে লাগায়।

ওপাশে চঞ্চল ও ধৈর্যহীন গলায় রেবা বলছে, কে? হ্যালো! কে?

উত্তর দিতে সাহস হল না তৃণার। কেবল খানিকক্ষণ শুনল!

রেবা চেঁচিয়ে তার বাবাকে ডাকছে, বাপি, দেখো, ফোনটা বাজল, কেউ সাড়া দিচ্ছে না এখন।

পরমুহূর্তেই শচীনের গলা— হ্যালো।

তৃণা মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে রাখল।

শচীন রেবাকে ডেকে বলল, গোস্ট কল। আজকাল টেলিফোনে যত গোলমাল।

বলেই আবার, শেষবারের মতো বলল, হ্যালো! কে?

কেউ না। আমি কেউ না। এ কথা মনে মনে বলে তৃণা।

দেবাশিস কানের কাছে মুখ নামিয়ে নরম গলায় বলে, তৃণা, বলতে পারলে না?

শচীন ফোন রেখে দিল।

তৃণা মাথা নেড়ে বলল, না। আজকের দিনটা থাক। দিনটা ভাল নয় দেব।

খুব ভাল দিন তৃণা।

না দেব, আজ কোনও ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না।

তা হলে কী করবে তৃণা?

তা হলে...

তৃণা ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবে।

দেবাশিস অপেক্ষা করে উগ্র আগ্রহে।

## ॥ আট ॥

গাড়ি থামল। গাড়ি চলে গেল।

নিজের বাড়ির সামনে একা দাঁড়িয়ে তৃণা। বুকে একটা খাঁ খাঁ আকাশ। সেই আকাশে নানা ভয়ের শকুন উড়ছে।

রাত আটটা বেজে গেছে। তবু তেমন রাত হয়নি। এখনও স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ঢোকা যায়। কেউ ফিরেও তাকাবে না সে জন্য। দেবাশিসের গাড়িটা গড়িয়াহাটা রোডের মুখে গিয়ে বাঁ ধারে মোড় নিল।

তৃণা বাড়ির গেট দিয়ে ধীর পায়ে ঢোকে। মস্ত আলো জ্বলছে বাইরে। ছোট বাগানটার গাছপালার ওপর আলো পড়েছে। হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠেছে। ফুলের গন্ধ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছে বাতাস।

আজকের দিনটা দেবাশিসের কাছে ভিক্ষে নিল তৃণা। আজ দিনটা ভাল নয়। এই ভুতুড়ে দিনে এতবড় একটা সাহসের কাজ করতে তার ইচ্ছে করল না। আজকের দিনটি কেটে গেলে এরপর যে কোনওদিন সে চলে যাবে। কেন থাকবে এখানে? কেন থাকবে!

আস্তে ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। বাঁ ধারের ঘরটায় টেবিল-টেনিস খেলছে রেবা আর তার এক মাদ্রাজি মেয়ে-বন্ধু সরস্বতী। ছোটাছুটি করছে। হাসছে। তাকে কেউ দেখল না।

শচীনের কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে বলল, চোর এসেছে। চোর এসেছে। শচীন! শচীন!

তৃণা ধীরে তার ঘরে এসে দাঁড়ায়। আলো জ্বালে না। চুপ করে বিছানায় বসে থাকে কিছুক্ষণ, এবং বসে থাকতে থাকতেই টের পায়, বুকে আকাশ, আকাশে শকুন। মনটা ভাল থাকলে এই নিয়ে একটা কবিতা লিখত সে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তৃণা। অলক্ষ্যে এবং নিজেরও অজান্তে চাকর এসে ডাকল— মা, খাবেন না? সবাই বসে আছে।

তৃণা উঠল। চাকরের মুখের মা ডাকটা কানে বাজতে থাকে। বাথরুম সেরে এসে খাওয়ার টেবিলে চলে গেল সে। রাতের খাওয়ার সময়টায় সে প্রায়ই থাকে। নিয়ম। না থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু নিয়ম।

খাওয়ার টেবিলে আজ সবাই খুব হাসি খুশি।

শচীন ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলছে। কথামৃতের গল্প। সবাই শুনছে। এ সব গল্পের মধ্যে অবশ্য তৃণাকে ওরা রাখে না। টেবিলের একধারে তৃণা চুপ করে বসে থাকে। টেবিলে সাজানো খাবার। যে যার প্লেটে তুলে নিয়ে খায়।

শচীন গল্পের শেষে বলল, জাপানের চালানটা এলে দেখবি। বামন গাছের এমন একটা বাগান করব।

আমাদের স্কুলে ইকেবানা শেখায়। রেবা বলে।

মনু বলল, সে আবার কী?

ফুলদানি সাজানো। খুব মজার। জাপানিরা স্বর্গ, মানুষ আর পৃথিবী এই প্যাটার্নে ফুল সাজায়! অদ্ভুত।

মনু বলে, জাপানিরা খুব প্রগ্রেসিভ। না বাবা?

প্রগ্রেসিভ! শচীন বলে, তা ছাড়া ওদের মতো মাথা কারও নেই। শুধু দোষের মধ্যে বড্ড সেন্টিমেন্টাল, একটুতেই সুইসাইড করে।

হারিকিরি। রেবা বলে।

হারিকিরি নয়। মনু বলে, হারাকিরি!

এইরকম সব কথা।

রান্নার লোকটা নিঃশব্দে ঘরের একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রোজই থাকে। চমৎকার রাঁধে সে। কোনও ভুল হয় না।

আজ হঠাৎ চাইনিজ চপ সুয়ের একচামচ মুখে তুলেই রেবা চেঁচিয়ে বলে, চিত্ত, আজ এটাতে নুন দাওনি!

চিত্ত শশব্যস্তে— দিয়েছিলাম তো!

দাওনি। রেবা জোর গলায় বলে।

মনু একটু মুখে দিয়ে বলে, দিয়েছে। তবে কম হয়েছে।

শচীন বলল, টেস্ট কিন্তু দারুণ।

রেবা বিরক্ত হয়ে তার বাবার দিকে নুনের কৌটো এগিয়ে দেয়। কী ভেবে নিজেই নুন ছড়িয়ে দেয়। মনুর প্লেটেও দেয়।

তারপরই হঠাৎ তৃণার দিকে ফিরে বলে, মা, তোমাকে... ওঃ, তুমি তো এখনও খাওয়া শুরুই করোনি!

তৃণা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে রেবা তাকে মা বলে ডাকছে। গত এক বছর একবারও ডাকেনি। তার কানমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে রক্তের জোয়ারে। বুক ভেসে যায়, হৃদয় ক্ষরিত হয়। বহুকাল বাদে স্তনের ভিতরে যেন ঠেলে আসে দুধ। অস্থির তৃণা চেয়ারের হাতল চেপে ধরে। আনন্দ! আনন্দ! এত আনন্দ সে বুঝি জীবনে একবারও আর ভোগ করেনি। কেউ তার অবস্থা লক্ষ করছে না! ভাগ্যিস! শচীন ওদের বিদেশের একটা অভিজ্ঞতার গল্প করছে। ওরা কি জানে তৃণার ভিতরে একটা ট্যাপ কে যেন খুলে দিয়েছে! অবিরল নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে তার শরীর দিয়ে। সেই স্রোত তার চারধারে সব কিছুকেই অবগাহন করাচ্ছে, শব্দটা কান পেতে শোনে তৃণা স্রোতের শব্দ।

পরদিন সকালে তৃণা কবিতার খাতা নিয়ে বসল।

আজও দেবাশিস আসবে। বিকেলবেলায়। বাসস্টপে।

॥ নয় ॥

সারা বাড়িতে আজ চন্দনার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেবাশিস একা সিগারেট খেল অনেকক্ষণ। আবার উঠল। জানালাটা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল রাস্তার ওপর। বহু নীচে ফুটপাথ! মাঝখানে নিরালম্ব শূন্যতা! চন্দনা কী করে অত সাহস পেল?

দেবাশিস তো পারে না। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। ঘর সাজাবে বলে, ফুলশয্যা বলে ফুল এনেছিল সে। এখন এই নিশুতরাতে সেই গন্ধ ছড়াচ্ছে। কী গভীর সুগন্ধ! সুগন্ধটা টেনে রাখে তাকে।

দেবাশিস প্রেতের মতো একা এসে বসে সোফায়। মাথার চুল মুঠো করে ধরে! রবি নেই। রবি এখন মণিমার বুক ঘেঁষে অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

একবার রবির ঘরে এল দেবাশিস। রোজ রাতেই আসে। ছোট ছোট শ্বাস ফেলে রবি ঘুমোয়। চেয়ে দেখে। পাশ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আজ রবির ছোট্ট বিছানাটা ফাঁকা পড়ে আছে।

আজকের দিনটা কেমন যেন! হাতের মুঠো থেকে পয়সা হারিয়ে গেলে শিশু যেমন অবাক তেমনি লাগছিল দেবাশিসের।

রবি নেই! তৃণা নেই।

ভালই। এ একরকমের ভালই।

প্রেতের মতো ভয়ংকর শুকনো একটা হাসি হাসল দেবাশিস।

বুকে এখনও যেন রবির খেলনা পিস্তলের মিথ্যে গুলি বিঁধে আছে। বড় যন্ত্রণা।

অস্ফুট শব্দ করল দেবাশিস; যন্ত্রণাটার অর্থ বুঝতে পারল না।

কালই ইনডেক-এর একটা মস্ত কন্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে আসানসোলে। সকালের গাড়িতেই চলে যেতে হবে।

দেবাশিস শুল। ঘুম আসছে ভারী ক্লান্তির মতো। ঘুমচোখে মনে পড়ল, ভুল করে কাল বিকেলে বাসস্টপে আসতে বলেছে তৃণাকে। এসে ফিরে যাবে।

ফোন করবে? থাকগে! আজ একটা ভুলের দিন গেল। আজ আর ভুলগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করবে না। থাক। ভুলের দিনটা কেটে যাক।

দিন যায়

সীতাকে বহুকাল বাদে দেখল মনোরম।

দেখল, কিন্তু দেখা-হওয়া একে বলে না। দুপুরে উপর্ঝরণ বৃষ্টি গেছে। তারপর মেঘভাঙা রোদ উঠেছে। সমস্ত কলকাতা জলের আয়না হয়ে বেলা চারটের রোদকে ফেরত দিচ্ছে। ভবানীপুরের ট্রাম বন্ধ, চৌরঙ্গির মুখে জ্যাম। সবকিছু থেমে আছে, রোদ ঝলসাচ্ছে, ভ্যাপসা গরম। মনোরমের পেটে ঠাণ্ডা বিয়ার এখন দুর্গন্ধ ঘাম হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ের কাজ করা মোটা পাঞ্জাবি আর বিনির টেরিকটন স্ট্রাইপ বেলবটম প্যান্টের ভিতর মনোরম নিজের শরীরে কয়েকটা জলধারা টের পাচ্ছে। গরম, পচা, লালচে ঘাম তার। সীতা রাগ করত।

বিয়ারটা খাওয়াল বিশ্বাস। নতুন কারবার খুলেছে বিশ্বাস। ভারী নিরাপদ কারবার, ক্যাপিট্যাল প্রায় 'নিল'। কলকাতার বড় কোম্পানিগুলোর ক্যাশমেমো ব্লকসুদ্ধু ছাপিয়েছে, সিরিয়াল নম্বর-টম্বর সহ। ব্যবসাদার বা কন্ট্রাক্টররা আয়কর ফাঁকি দিতে বিস্তর পারচেজ দেখায়। সেইসব ভুয়ো পারচেজের জন্য এইসব ভুয়ো রসিদ। মাল যদি না কিনে থাক তবে 'কন্ট্যাক্ট বিশ্বাস। হি উইল ফিক্স এভরিথিং ফর ইউ।' যত টাকার পারচেজই হোক রসিদ পাবে, এন্ট্রি দেখাতে পারবে। সব বড় বড় কোম্পানির পারচেজ ভাউচার। বিশ্বাস এক পারসেন্ট কি দু' পারসেন্ট নেবে। তাতেই অঢেল, যদি ক্লায়েন্ট আসে ঠিকমতো।

কিন্তু কারবারটার অসুবিধে এই যে, বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। হাশ পাবলিসিটি। লোকে জানবে কী করে যে-কলকাতার কোন গাড্ডায় বিশ্বাস বরাভয় উঁচিয়ে বসে আছে উদ্বিগ্ন আয়করদাতাদের জন্য? যে-সব চেনা লোক কলকাতার বাজারে চালু আছে, তাদেরই বলে রাখছে সে। কমিশন দেবে।

দিস ইজ দি জিস্ট ব্যানার্জি! বিশ্বাস বলল, এবার ইন্টারেস্টেড মক্কেলদের টিপ্‌সটা দেবেন।

মনোরম কলকাতার ঘুঘু। শুনে-টুনে মৃদু একটু হাসল, বলল, বিশ্বাস, এর চেয়ে চিট ফাণ্ডের ব্যবসা করুন। এটা পুরনো হয়ে গেছে। কলকাতায় অন্তত ত্রিশটা রসিদ কোম্পানিকে আমি চিনি।

বহুকাল আগে একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েছিল মনোরম। শরীরের কাটাছেঁড়াগুলো মিলিয়ে গেছে, ভাঙা হাড় জুড়ে গেছে। কেবল জিভটাই এখনও ঠিক হয়নি। দাঁত বসে গিয়ে জিভটা অর্ধেক নেমে গিয়েছিল। জোড়া লেগেছে বটে, কিন্তু কথা বলার সময়ে থরথর করে কাঁপে। কথাগুলো একটু এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। কিন্তু তাতে আত্মবিশ্বাস এতটুকু কমেনি মনোরমের।

বিশাল থলথলে চেহারার বিশ্বাস উত্তেজনায় চেয়ারে নড়ে বসল। মোকাম্বোর মজবুত চেয়ার তাতে একটু নড়বড় করে। প্রকাণ্ড গরম শ্বাস ফেলে বিশ্বাস ঝুঁকে মুগুরের মতো দু'খানা হাতের কনুই দিয়ে ভর রাখল টেবিলের ওপর। বলল, ব্যানার্জি, আমার তিন মাসের ব্যবসাতে কত লাভ হয়েছে জানেন?

কত?

বিশ্বাস শুধু মুখটা গম্ভীরতর করে অবহেলায় বলে, হুঁ।

মনোরম বলল, কিন্তু কম্পিটিশন তো বাড়ছে এ-কারবারেও!

ট্যাক্স পেয়ার কি কমে যাচ্ছে? জোচ্চুরি কমেছে? যত দিন এদেশে প্রাইভেট সেক্টরে ব্যবসা থাকবে, তত দিন আমারও ব্যবসা থাকবে। এর মধ্যেই আমার ক্লায়েন্ট তিনশো ছাড়িয়ে গেছে, দু'-আড়াই লাখ টাকার রসিদ ইসু হয়েছে। অ্যান্ড উইদাউট মাচ পাবলিসিটি। আপনার স্বভাব হচ্ছে সব ব্যাপারের নৈরাশ্যের দিকটা দেখা। ভেরি ব্যাড।

বিশ্বাস ঠিক বলেনি। মনোরমের এটা স্বভাব নয়। নৈরাশ্যের দিকটা সে কখনও দেখে না।

বিশ্বাস বিয়ার খায় সরাসরি বোতল থেকে। বোতলের শেষ কয়েকটা ফোঁটা গলায় ঢেলে আবার

নতুন বোতলের অর্ডার দিল। তারপর তেমনি মনোরমের মুখে ঝোড়ো লু-বাতাসের মতো শ্বাস ফেলে বলল, দেন?

মনোরম কিছুক্ষণ এক ঢোঁক বিয়ার মুখে নিয়ে তিতকুটে স্বাদটায় জখম জিভটা ডুবিয়ে রাখল। মুখের ভিতরে ঠিক যেন একটা জিওল মাছ নড়ছে। গিলে ফেলল বিয়ারটা। আস্তে করে বলল, কত কমিশন?

আমার কমিশন থেকে টুয়েন্টি-ফাইভ পারসেন্ট দেব।

আর একটু উঠুন।

কত?

ফিফটি।

বিশ্বাস ভ্রূ তুলল না, বিস্ময় বা বিরক্তি দেখাল না। একটু হাসল কেবল। বিশ্বাস পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে। তবু ওর দাঁতগুলো এখনও ঝকঝকে। নতুন বোতলটা তুলে নীরবে অর্ধেক শেষ করল। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলল, ফিফটি! অ্যাঁ?

ফিফটি।

ব্যানার্জি, আমি যেমন প্রফিট করি তেমন রিস্কটা আমারই। ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে গভর্নমেন্ট কী রকম হুজ্জত করে আজকাল জানেন না? যদি ধরা পড়ি তো মোটা হাতে খাওয়াতে হবে নয়তো শ্বশুরাল ঘুরিয়ে আনবে। আমার প্রফিটের পারসেন্টেজ সবাই চায়, রিস্কের পারসেন্টেজ কেউ নেয় না। এটাই মুশকিল।

বিশ্বাস তেমনি ঝোড়ো শ্বাস ছাড়ে। ওর নাকের বড় বড় লোমের গুছি বের হয়ে আসে। গালের দাড়ি অসম্ভব কড়া, তাই রোজ কামালেও গালে দাড়ির গোড়া সব গোটার মতো ফুটে আছে। ঘন ভ্রূ। আকাশি রঙের বুশ শার্টের বুকের কাছ দিয়ে কালো রোমশ শরীর দেখা যায়। গলায় সোনার চেন-এ সাঁইবাবার ছবিওলা ছোট্ট লকেট।

মনোরম মুখে বিয়ার নিয়ে নড়ন্ত জিভটাকে ডুবিয়ে রাখে বিয়ারে। মুখের ভিতরে একটা চুকচুক শব্দ হতে থাকে। শালার জিভটা নড়ছে অবিকল ছোট্ট মাছের মতন।

রসিদের কারবারটা মনোরমের কাছে ছেলেমানুষির মতো লাগে। সে আস্তে করে বলল, আজকাল ফলস রসিদ টিকছে না। স্পটে গিয়ে এনকোয়ারি হয়, কোম্পানি নিজেদের সিরিয়াল নম্বর দেখে বলে দেয় যে, রিয়াল পারচেজ হয়নি। তখন মক্কেলরা ঝোলে।

বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে বলে, ঝুলবে কেন? আজকাল কেউ ঝোলে না। ধরা পড়লে খাওয়াবে কিছু।

মনোরম শ্বাস ছেড়ে বলে, খাওয়াবে আর খাওয়াবে। কত খাওয়াবে মশাই? এত খাওয়ালে নিজে খাবে কী? তার ওপর ফলস রসিদ ধরা পড়লে ক্রিমিনাল কেস হয়ে যায়।

বিশ্বাস ঝুঁকে বলল, আপনি আমার ইয়ে বোঝেন। আমি আরও তিনটে কোম্পানি চালাই ব্যানার্জি। সেগুলো অনেক বেশি টিস্কি। বলে উত্তেজিত বিশ্বাস ধবধবে সাদা রুমালে ঘেমো কপালটা মুছল। তারপর হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে বলল, আপনার ওই একটা বড় বদ স্বভাব। পেসিমিস্টিক অ্যাটিচুড। ভেরি ব্যাড।

মনোরম নিরুৎসাহের হাসি হাসে।

বিশ্বাস বলল, একটা কথা মনে রাখবেন। না সুন্দরী বউ যার, হয় না যার শালা, তার ঘরে অলক্ষ্মী অচলা।

মানে?

মানে হচ্ছে 'না' কথাটা যার সুন্দরী বউয়ের মতো প্রিয়, 'হয় না' কথাটাকে যে নিজের শালার মতো খাতির-যত্ন করে, সে কখনও সাকসেসফুল হতে পারে না।

মনোরম বালকের মতো হাসে। এমন সে অনেকদিন হাসেনি।

বিশ্বাস স্মিতমুখে বলে, এক মহাপুরুষের কথা। আমি অবশ্য বাজে ব্যাপারে প্রয়োগ করলাম।

ঠিক আছে। মনোরম বলল, আমি দেখব।

টুয়েন্টি ফাইভ?

টুয়েন্টি ফাইভ।

বিশ্বাস আত্মতৃপ্তিতে হাসল। বলল, এটা আমার সাইড বিজনেস। না টিকলেও ক্ষতি নেই। বন্ধুবান্ধবদের বলছি, যদি কাউকে কিছু টাকা পাইয়ে দিতে পারি। আপনার অবস্থা তো ভাল যাচ্ছে না ব্যানার্জি।

মনোরম মাথা নেড়ে বলল, না।

বিশ্বাস দুঃখিত গলায় বলল, দ্যাট উওম্যান?

মনোরম শ্বাস ছেড়ে বলে, দ্যাট উওম্যান।

বিশ্বাস গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলে, ব্যানার্জি, বউ বিশ্বাসী না হলে ভারী মুশকিল। আমাদের মতো বয়সে পুরুষ মানুষের বউ ছাড়া আর বিশ্বস্ত কেউ তেমন থাকে না। আমারও সবকিছু বউয়ের নামে। বাড়ি, গাড়ি এভরিথিং। বউটা দজ্জালও বটে, কিন্তু ফেইথফুল।

মনোরম টাকরা দিয়ে নড়ন্ত জিভটাকে চেপে ধরে থাকে। রক্তের ঝাপটা তার মুখে লাগে। কান দু'টো গরম হয়ে ওঠে।

বিশ্বাস সেটা খেয়াল করল না। বলল, দুপুরে বিজনেস পিক আওয়ার্স বলে বিয়ার বেশি খাই না। তারপর সন্ধে হলে স্কচ থেকে শুরু করে দেশি কত কী গিলব তার ঠিক নেই। রাত দশটায় যখন ফিরব বউ ফারনেস হয়ে আছে। কলিং বেল টিপে আধতলা সিঁড়ি নেমে রেলিঙের পাশে লুকিয়ে বসে থাকি। বউ দরজা হাট করে খুলে দেয়, তারপর উঁকিঝুঁকি না দিয়ে ভিতরে অপেক্ষা করে। আমি তখন আবার উঠে আসি। ভিতরে ঢুকি না। বাইরে থেকে এক পাটি জুতো পা থেকে খুলে ভিতরে ছুড়ে দিয়ে অপেক্ষা করি। যদি জুতোটা খুব জোরে ঘর থেকে ব্যাক করে আসে তবে বুঝি বউ আজ আপসে আসবে না, জোর খিচান হবে। যদি জুতো ব্যাক না করে তবে বুঝি বউ খুব খিচান করবে না, বউ বড় জোর বাপ-মা তুলে দু'-একটা গালাগাল দেবে।

মনোরম এক নাগাড়ে হাসছে। গাল ব্যথা হয়ে গেল। বলল, থামুন মশাই, বিষম খাব।

ব্যাপারটা কিন্তু একজ্যাক্টলি এ-রকম। বাড়িয়ে বলছি না। যেদিন খিচান হয় সেদিন বউ মারধরও করে। চুল ধরে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে যায়, তারপর দরজা বন্ধ করে...

বাথরুমে কেন?

বাঃ, ছেলেমেয়েরা রয়েছে না! বলে বিশ্বাস সুখী গৃহস্থের মতো হাসে। বিশ্বাসের চেহারাটা যদিও মা দুর্গার পায়ের তলাকার অসুরটার মতোই—কালো, প্রকাণ্ড রোমশ এবং বিপজ্জনক, তবু এখন তার মুখখানা একটা গার্হস্থ্য সুখের লাবণ্যে ভরে গেল। বলল, কিন্তু তবু আমার বউ ফেইথফুল। লাইক এ বিচ। নানা রকম মেয়েলি রোগে ভুগে শরীরটা শেষ করেছে। আমি আবার একটু বেশি সেক্সি, তাই আমাকে ঠিক এন্টারটেন করতে পারে না, অ্যান্ড আই গো টু আদার গার্লস।

বউ জানে?

বিশ্বাস মৃদুস্বরে বলে, জানে মানে আন্দাজ করে। তবে চুপচাপ থাকে। ভেরি কনসিডারেট। এটা তো ঠিক যে সে শরীরটা দিতে পারে না। তাই শরীর আমি বাইরে থেকে কিনি। কিন্তু তা ছাড়া আমিও ফেইথফুল।

বিশ্বাস মৃদুস্বরে বললেও ওর ফিসফাস কথা দশ হাত দূর থেকে শোনা যায়। মনোরম আশপাশের টেবিলে একটু চেয়ে দেখে নিল। তারপর বলল, আপনি সুখী?

খুব। আপনার কেসটা কী?

বনত না।

কেন?

বুঝতে পারতাম না। তবে আমাদের দু'জনেরই ছিল পরস্পরের প্রতি এক রকমের রিপালশান। সেটা বেড়ে বেড়ে একসময়ে কানেকশন কেটে গেল।

স্যাড।

মনোরম মৃদু একটু হাসল। বলল, আরও স্যাড যে, আমিও অন্য সকলের মতো বউয়ের নামে টাকা রাখতাম, জমি কিনেছিলাম, লকারেও কিছু ছিল। সেগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল।

কিছু রিয়ালাইজ করতে পারেননি?

না। আমি প্রায় ব্যাঙ্করাপ্ট। আমার সম্বন্ধী দুঁদে অ্যাডভোকেট। ডিভোর্সের সময়ে মাসোহারারও বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। বিশ্বাস, আমার একটা ওপেনিং দরকার। যে-কোনও একটা কাজ। আমি আবার দাঁড়াতে চাই।

বিশ্বাস গম্ভীর এবং সমবেদনার মুখ করে বলল, দেখব ব্যানার্জি, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

দেখবেন।

বিয়ার শেষ করে দু'জনেই উঠেছিল। বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেজা পার্ক স্ট্রিটটাকে কুচকুচে কালো দেখাচ্ছিল। জলে ছায়া ফেলে নিথর দাঁড়িয়ে ছিল বিশ্বাসের গাড়িখানা। পুরনো মরিস। তার সাদা রংটা থেকে মেঘভাঙা রোদ পিছলে আসছে।

বিশ্বাসের গাড়িতে একটা লিফট পেতে পারত মনোরম। কিন্তু রেস্তরাঁর দরজায় বিশ্বাস তার একজন চেনা লোক পেয়ে গেল হঠাৎ।

অবিকল টেলিফোনে কথা বলার মতো বিশ্বাস চেঁচিয়ে বলল, হ্যালো! অরোরা, ইজনট ইট? বিসোয়াস হিয়ার।

দু'জনে আবার ঢুকে যাচ্ছিল রেস্তরাঁয়। বিশ্বাস ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, আচ্ছা ব্যানার্জি, বাই।

মনোরম হাতটা তুলল। তারপর পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটতে লাগল পশ্চিমমুখো।

ময়দানের ধার ঘেঁষে দক্ষিণমুখো ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এতক্ষণ লোকজন বৃষ্টির জন্য আটকে ছিল গাড়ি-বারান্দায়, দোকানঘরে, বাস-স্টপের শেড-এ। এখন সব সরষেদানার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারধারে। ট্রাম বন্ধ, বাসে তাই লাদাই ভিড়। হাতে পায়ে চুম্বকওয়ালা কলকাত্তাই লোকেরা বাসের গায়ে সেঁটে আছে অবলীলায়। বাসের গা থেকে অন্তত তিন হাত বেরিয়ে আছে মানুষের নশ্বর শরীর।

মনোরমের ঠিক এক্ষুনি কোথাও যাওয়ার নেই। যতক্ষণ বিয়ারের গন্ধ শরীরে আছে ততক্ষণ গড়িয়াহাটার কাছে মামার কাঠগোলায় ফেরা যাবে না। বৃষ্টির পর এসপ্লানেড এখন ভারী ঝলমলে, রঙিন শো-উইনডোতে দোকানের হাজার জিনিস, রঙিন পোশাকের মানুষ, রঙিন বিজ্ঞাপন। টেকনিকালার ছবির মতো চার দিকের চেহারা এখন ধুলোটে ভাবটা ধুয়ে যাওয়ার পর। কাজ না-থাকলেও এসপ্লানেডে ঘুরলে সময় কেটে যায়।

রাস্তা পার হয়ে মেট্রোর উলটো দিকে ট্যাক্সির চাতালে তখন উঠে-যাওয়া পসারিরা দ্রুত ফুচকার ঝুড়ি, ভেলপুরির বাক্স, ছুরি কাঁচি কিংবা মনোহারি জিনিস সাজাচ্ছে। ট্রাম টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা ট্রাম। তারই একটাতে উঠে একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকবে ভেবেছিল মনোরম। ফুটপাথ ছেড়ে ইট-বাঁধানো চাতালটায় নামতে গিয়েও সে বাড়ানো পা টেনে নিল। সীতা না?

সীতাই। সোনা রঙের মুর্শিদাবাদি শাড়ি পরনে, ডান হাতে ধরা দু'-একটা কাগজের প্যাকেট বুকে চেপে সাবধানে হাঁটছে। বাঁ হাতে শাড়িটা একটু তুলে পা ফেলছে। মাথা নোয়ানো। পাতলা গড়ন, ছিপছিপে ছোট্ট সীতা। নরম মুখশ্রী, কাগজের মতো পাতলা ধারালো ছোট্ট নাক, লম্বাটে মুখখানা, ছোট্ট কপাল, চোখের তারা দুটি ঈষৎ তাম্রাভ, মাথার চুল বব করা। বেশ একটু দূরে সীতা, ওর মুখখানা সঠিক দেখতে পেল না মনোরম। কিন্তু দূর থেকে দেখেই সবটুকু সীতাকে মনে পড়ে গেল। ছয়-সাত বছর ধরে সীতার সবটুকু দেখার কিছুই তো বাকি ছিল না। আশ্চর্য কার্যকারণ! একটু আগে বিয়ারের বোতল সামনে নিয়ে সে হোঁতকা বিশ্বাসটার কাছে সীতার কথা বলছিল।

একটা রগ মাথার মধ্যে ঝিনন করে চিড়িক দেয়। মনোরম গাছের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দেখে, কী সুন্দর অপরূপ রোদে সীতা একটু ভেঙে নুয়ে মহার্ঘ মানুষের মতো হেঁটে চলেছে। সব জায়গা থেকে হঠাৎ সূর্যরশ্মিগুলি থিয়েটারের আলোর মতো এসে ওকে উদ্ভাসিত করে। পিছনে মরা গাছ, মেঘলা আকাশ, এসপ্লানেড ইস্টের বাড়ির আকাশরেখা, চার দিকে ফড়ে, দালাল, দোকানির আনাগোনা। কিন্তু আবহের আলো এই ভিড়ে কেবলমাত্র সীতাকেই উদ্ভাসিত করে। সোনালি শাড়িটা আগাগোড়া সোনালি, কোথাও কোনও কাজ নেই, আঁচল নেই, সোনালি ব্লাউজ, পায়ে কালো সরু স্ট্রাপের চপ্পল—সবটুকু ঝলসায় এই রোদে, কিংবা রোদই ঝলসে ওঠে ওকে পেয়ে? পেটে অঢেল বিয়ার, তাই ঠিক

বুঝতে পারে না মনোরম। তলপেটটা জলে ভারী হয়ে টনটন করছে, একটা কেমন গরমি ভাপ বেরোচ্ছে শরীর থেকে, আকণ্ঠ তেষ্টা। ভিখিরি যেমন ঐশ্বর্যের দিকে তাকায়, তেমনি অপলক তাকিয়ে থাকে মনোরম। মনে হয় এই সীতাকে সে কখনও স্পর্শ করেনি।

কোথায় যাচ্ছে সীতা? কোথায় এসেছিল? বোধহয় বেহালার ট্রাম ধরতেই যাচ্ছে। ও দিকের ট্রাম চালু আছে কি? চালু থাকলেও এই ভিড়ে উঠতে পারবে তো সীতা? ভাবল একটু মনোরম।

সীতা ট্রাম লাইন বরাবর হেঁটে গেল। একটু দাঁড়াল, চেয়ে দেখল দু'ধারে। তারপর দু'টো থেমে থাকা ট্রামের মাঝ দিয়ে সুন্দর পদক্ষেপের বিভঙ্গ তুলে ও-পাশে চলে গেল। দৃশ্যের শেষে যেমন মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়, নেমে আসে পরদা, তেমনই হয়ে গেল চারধার। কিছু আর দেখার রইল না।

মনোরম চলল চাতালটা পেরিয়ে গোলঘরের দিকে। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধের ভিতরে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করল। এবং বেরিয়ে আসার পর টের পেল, ভীষণ একা আর ক্লান্ত লাগছে। কোথাও একটু যাওয়া দরকার এক্ষুনি। কারও সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা দরকার। সীতাকে দেখার ধাক্কাটা সে ঠিক সামলাতে পারছে না। সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সে সত্যিই সীতাকে দেখেছে। এমন আচমকা হঠাৎ কেন যে দেখল। দেখল, কিন্তু দেখা হওয়া একে বলে না।

আকাশ আজ খেলছে। দ্রুত গুটিয়ে নিল রোদের চাদর। বৃষ্টিটা চেপে আসবে। দু'-চারটে চড়বড়ে ফোঁটা মনোরমের আশেপাশে যেন বা হেঁটে গেল। ততক্ষণে অবশ্য মনোরম লম্বা পা ফেলে জোহানসন অ্যান্ড রো-র অফিস বাড়িটায় পৌঁছে গেছে।

পুরনো সাহেবি অফিস। বাড়িখানা সেই সাহেব আমলের গথিক ধরনের। শ্বেতপাথরের মতো সাদা রং, বৃষ্টিতে ভিজেও শুভ্রতা হারায়নি। সামনে খানিকটা সবুজ সযত্নরচিত জমি, শেকল দিয়ে ঘেরা। বাঁকা হয়ে ড্রাইভওয়ে ঢুকে গেছে। সার সার গাড়ি দাঁড়ানো। তার মধ্যে সমীরের সাদা গাড়িটা দেখল মনোরম। অফিসেই আছে।

চমৎকার কয়েকটা থামে ঘেরা পোর্টিকো পেরিয়ে রিসেপশনের মুখোমুখি হওয়ার আগে মনোরম আকাশটা দেখল। গির্জার ওপর ক্রুশচিহ্ন, তার ওপাশে আকাশটা সাদা বৃষ্টির চাদরে ঢাকা। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। সীতা ট্রামে উঠেছে? না হলে ভিজবে। খুব ভিজবে।

রিসেপশনের বাঙালি ছেলেটা চমৎকার ইংরেজিতে বলে, সমীর রয়? অ্যাকাউন্টস। আপ ফার্স্ট ফ্লোর।

মনোরম মাথা নেড়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। শ্বেতপাথরের প্রাচীন এবং রাজসিক সিঁড়ি। বহুকাল ধরে পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গিয়ে ধাপগুলো নৌকোর খোলের মতো দেবে গেছে একটু। তবু সুন্দর দোতলার মেঝেতে পা দিলে মেঝেতে পারসিক কার্পেটের সূক্ষ্ম এবং রঙিন সুতোর মতো কারুকাজ দেখা যায়। কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে, তবু তেলতেল করছে পরিষ্কার। মোটা দেওয়ালের মাঝখানে নিঃশব্দ করিডোর, তাতে বদ্ধ বাতাসের গন্ধ। অফিসবাড়িটায় পা দিলেই একটা 'গুডউইলের' অলক্ষ্য অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। গুডউইল। বিশ্বস্ততা এবং সুনাম।

একটা বড় হলঘরের একধারে টিকপ্লাইয়ে ঘেরা চেম্বার। সেখানে সমীর রায় বসে। সামনে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার ওধারে সমীর। মনোরমের ভায়রাভাই। কিংবা ভূতপূর্ব ভায়রাভাই। লম্বা চেহারায় এখন একটু মেদ জমেছে, রংটা কালোই ছিল, এখন ইটচাপা ঘাসের মতো ফরসা হয়েছে। ভাল খায়-দায়, গাড়ি চড়ে বেড়ায়, গায়ে গলায় রোদ লাগে না। সরু টাই, চেয়ারের পিছনে কোট ঝুলছে। ঝুঁকে একটা কাগজ দেখছিল সমীর। চমৎকার একজোড়া মদরঙের ফ্রেমের চশমার ওপর ওর বড় কপাল, লালচে চুল, টিকোলো নাক, এবং গভীর খাঁজওলা থুতনিতে আভিজাত্য ফুটে আছে। সেই মুখশ্রীতে ওর চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সটা ধরা যায় না। অনেক কম বলে মনে হয়।

মনোরমের কোনও কাজ নেই। ব্যস্ত সমীরের কাছে দু'দণ্ড বসা কি সম্ভব হবে! দু'-চারটে কথা কি ও বলবে মনোরমের সাথে! একটু দ্বিধা ও অনিশ্চয়তায় ও টেবিলটার কাছাকাছি এল।

সমীর মুখ তুলে বলল, আরে, মনোরম! কী খবর?

তীক্ষ্ণ চোখে মনোরম সমীরের মুখখানা দেখে নিল। না, খুশি হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। চোখ দুটি সামান্য বিস্ফারিত হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। যারা অভিজাত তাদের একটা সুশিক্ষা আছেই,

মনোভাব তারা ঢেকে রাখতে পারে। বিস্ময় এবং বিরক্তিকে অনায়াসে চাপা দিয়ে সমীর হাসল।

একটু এলাম। খুব ব্যস্ত নাকি? মনোরম বলে।

একটু, বলে সমীর চেয়ারে হেলান দিয়ে আঙুলে মাথার চুল পাট করতে করতে বলল, সাড়ে চারটেয় কিক অফ। ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি কাজটাজ চুকিয়ে একটু মাঠে যাব। বলে ঘড়ি দেখে সমীর বলে, ঠিক আছে, তুমি বোসো। খানিকক্ষণ সময় আছে।

বিয়ারটা এখনও পেটে, ঘাম বা পেচ্ছাপের সঙ্গে এখনও পুরোটা বেরিয়ে যায়নি। মনোরম চেয়ার টেনে বসে হিসেব করে নিচ্ছিল, এতবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা পার হয়ে সমীরের নাকে অ্যালকোহলের গন্ধটা যাচ্ছে কি না। টেবিলের ওপর হেলাভরে পড়ে আছে এক প্যাকেট বেনসন আর হেজেস, ছোট্ট দেশলাই। মনোরম প্যাকেটটা টেনে সিগারেট ধরাল। সমীর লক্ষ না-করার ভান করে নিচু হয়ে একটা ড্রয়ার টেনে কী একটু দেখতে লাগল কাগজপত্র।

দামি সিগারেট, কিন্তু বিয়ারের পেটে কোনও ভাল গন্ধ পাওয়া মুশকিল। মনোরম যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিগ্যেস করল, গীতাদি ভাল?

ভালই। একটা বাচ্চা হয়েছে জানো তো! ছেলে।

না।

সাড়ে তিন কেজি। রুমি ভাই পেয়ে খুব খুশি। দিনরাত বেড়ালের মতো থাবা গেড়ে ভাইয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে বসে আছে।

বলে এবার সত্যিকারের খুশির হাসি হাসল সমীর। মেয়ে রুমির পর দশ বছর বাদে ওদের ছেলে হল। খুশি হওয়ারই কথা।

মনোরম যান্ত্রিক এবং অন্যমনস্ক গলায় বলে, কংগ্র্যাচুলেশনস।

সমীর মাথার চুলে মুদ্রাদোষবশত আঙুল চালাতে চালাতে বলে, একটু বেশি বয়সে হল, ঠিকমতো মানুষ করে যেতে পারব কি না কে জানে!

সমীরের গলার স্বরটা ভারী এবং পরিষ্কার। একেই কি বাস্ ভয়েস বলে? এত ভদ্র এবং মাজা গলা যেন মনে হয় খুব উঁচু থেকে আসছে। এত শিক্ষিত ও ভদ্র গলায় কখনও কোনও অশ্লীল কথা বলা যায় না। সমীর বোধহয় তার বউকেও কখনও কোনও অশ্লীল কথা বলেনি, যা সবাই বলে! সীতাকে অনেক অশ্লীল কথা শিখিয়েছিল মনোরম, সীতা শুনে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাসতে হাসতে বলত, মাগো! পরে দু'-একটা ওইসব খারাপ কথা সীতাও বলত। ঠিক সুরে বা উচ্চারণে বলতে পারত না। তখন মনোরম হাসত। এবং ঠিক উচ্চারণটা আর সুরটা শেখাত। সীতা শিখতে চাইত না। সমীর আর গীতা কি অন্তরঙ্গ প্রবল সব মুহূর্তে ও-রকম কিছু বলে? বোধহয় না। ওদের রক্ত অনেক উঁচু জাতের।

মনোরম সমীরের নম্র এবং সুন্দর কমনীয় মুখটির দিকে চেয়ে থেকে বলল, মানুষ করবার ভার আপনার ওপর নয়। টাকার ওপর। একটা হেভি ইন্সিওরেন্স করিয়ে রাখুন।

সামান্য একটু গম্ভীর হয়ে গেল সমীর। কিন্তু কথাটা গায়ে মাখল না। ডজ করে বেরিয়ে গেল। বলল, তার অবশ্য দরকার হবে না। যা আছে...বলে একটু দ্বিধাভরে থেমে থাকল। এত ভদ্র সমীর যে, টাকার কথাটা মুখে আনতে পারল না। মনোরমেরই ভুল। সমীররা তিন পুরুষের বড়লোক। ওর এক ভাই আমেরিকার হিউসটনে আছে, বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা ডলার পায়, অন্য ভাই ফিল্ম প্রোডিউসার। সমীর নিজে বিলেতফেরত অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সীতাদের পরিবারের উপযুক্ত জামাই। এ-সব প্রায় ভুলেই গিয়েছিল মনোরম। প্রায় এক বছর সীতাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তেমনি চুলে আঙুল চালিয়ে সমীর বলে, তবে ছেলেকে মানুষ হতে দেখে যাওয়াটা বাপের একটা স্যাটিসফ্যাকশন।

মুখে কোনও বিরক্তির চিহ্ন নেই, তবু সমীরের বিরক্তিটা টের পাচ্ছিল মনোরম। ওর চোখ মনোরমের লম্বা চুল, বড় জুলপি আর কাজ করা পাঞ্জাবির ওপর থেমে থেমে সরে গেল। বোধহয় মনে মনে পোশাকটাকে সমীর পছন্দ করল না। কিন্তু কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কথা বলা সমীরের স্বভাব নয়। অভিজাতদের এইসব সুশিক্ষা থাকেই।

সমীর চোরাচোখে ঘড়িটা একবার দেখে নিল, বলল, তোমার কি কিছু বলার ছিল?

মনোরম মাথা নেড়ে বলল, না। একটু বসব বলে এসেছিলাম। বাইরে যা বৃষ্টি!

বৃষ্টি! চোখ বড় করে বলে সমীর, তারপর একটু লাজুক হাসি হেসে বলে, বাইরের রোদ বা বৃষ্টি এখানে বসে কিচ্ছু বোঝা যায় না। তারপর একটু চিন্তিতভাবে বলে, খুব বৃষ্টি?

থেমেছিল। আবার বোধহয় শুরু হয়েছে।

অন্যমনস্কভাবে সমীর বলে, খেলাটা না ওয়াশড আউট হয়ে যায়!

কার খেলা?

ছোটবাঙাল আর বড়বাঙাল। উয়াড়ি ভারসাস ইস্টবেঙ্গল। সমীর তার সরু কিন্তু সুবিন্যস্ত দাঁত আর কোমল ঠোঁট দিয়ে আকর্ষক হাসিটা হাসে, তারপর ফোনটা তুলে নিতে নিতে বলে, দাঁড়াও, জেনে নিই।

ফোন করল। বোধহয় ক্লাবে। সমীর অনেক ক্লাবের মেম্বার। আই-এফ-এ, সি-এ-বি, ওয়াই-এম-সি-এ এবং আরও কয়েকটার। বোধহয় রোটারিয়ানও। বহুকাল ধরে মেম্বার। এতদিনে দু'-চারটে ক্লাবের কর্মকর্তাও হয়েছে বোধহয়।

ফোনটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে বলল, না, খেলা হচ্ছে। বৃষ্টিটা বোধহয় থেমে গেল। লিগের যা অবস্থা আজকের খেলাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

থুতনিই বোধহয় মানুষের মুখের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। অনেকক্ষণ সমীরকে লক্ষ করে এই সত্যটা উপলব্ধি করে মনোরম। থুতনির চমৎকার খাঁজটি সমীরের বংশগত, ওই খাঁজটিই ওর মুখটাকে এত উঁচুদরের মানুষের মুখের মতো করেছে। অনেক মানুষের মুখই সুন্দর কিন্তু সেই সৌন্দর্যে সব সময়ে ব্যক্তিত্ব থাকে না। সমীরকে দেখলেই যে সম্ভ্রান্ত এবং উঁচুদরের লোক বলে মনে হয় তা কি ওর চমৎকার খাঁজওলা ওই থুতনিটার জন্যই? মনোরম ভাবে। সমীর ঘড়ি দেখছে। বোধহয় প্রায় চারটে বাজে। ওর ওঠা দরকার। কিন্তু সে-কথাটা ভদ্রতাবশত মনোরমকে বলতে পারছে না।

মনোরম সংকোচটা ঝেড়ে ফেলে বলে, সীতার কোনও খবর জানেন?

আবার মদরঙের চশমার ভিতরে চোখটা সামান্য বিস্ফারিত হল। বিস্ময়ে। একটু অস্বস্তির সঙ্গে সমীর বলে, সীতা! ভালই আছে। একদিন কি দু'দিন নার্সিং হোম-এ গিয়েছিল ওর দিদিকে দেখতে।

সে খবর নয়, অন্য কোনও খবর?

আর কী? ওদের বাড়িতে বহুদিন যাই না, ঠিক কিছু বলতে পারব না। কীসের খবর চাও?

মনোরম টেবিলের ওপর কাচের ভিতরে চাপা একটা ছবি দেখল। রঙিন ফোটোগ্রাফ বলে মনে হয়েছিল প্রথমে। তা নয়, হাতে আঁকা রঙিন প্রিন্ট। বনভূমিতে বেলাশেষের সিঁদুরে আলো, কয়েকটা গোরুর গাড়ি ঝুঁকে আছে, মাঝখানে আদিবাসী কয়েকজন নারী ও পুরুষ রান্নাবান্না করছে। পথের ওপর গেরস্থালি। ছবিটার মধ্যে একটা গল্প আছে।

সে মুখ তুলে বলল, একটু আগে আমি সীতাকে দেখলাম।

সমীর অস্বস্তিতে চেয়ারের এক দিক থেকে আর-এক দিকে শরীরে ভর দিল। বলল, ও! কোথায়?

এসপ্লানেডে। বোধহয় মার্কেটিংয়ে এসেছিল। ফিরে যাচ্ছিল তখন।

চুলে তেমনি আঙুল চালায় সমীর। চোখ সরিয়ে নেয় মনোরমের চোখ থেকে, তারপর একটু হালকা গলায় বলে, কথাটথা বললে নাকি?

না। আমি কথা বললেও ও পাত্তা দিত না।

মনোরম ক্ষীণ একটু হাসে। সমীর চিন্তিতমুখে পার্টিশনটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে, আর কিছু বলবে? হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, এখনও একটু সময় আছে।

ক'টা বাজে?

চারটে প্রায়।

আমার কিছু বলার ছিল।

খুব কি জরুরি কথা?

খুব। অন্তত আমার কাছে।

খুব জরুরি হলে না হয় আজকের প্রোগ্রামটা...

না না। আমি...আমার খুব অল্প কথা।

সমীর একটু ঝুঁকে মুখখানা তুলে চেয়ে রইল।

মনোরম বলার আগে আর একবার বনভূমির ছবিটা দেখে নিল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কয়েকটা গোরুর গাড়ি। গাছের ছায়ায় গোধূলি, আদিবাসী নারী ও পুরুষ উনুন জ্বেলেছে।

আমি আজ সীতাকে দেখলাম।

বলেছ তো।

বলেছি। তবু বলতে ইচ্ছে করছে।

কী?

সীতা এরপর কী করবে কিছু জানেন?

ফ্র্যাঙ্কলি জানি না।

সমীর দুঃখিতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। মুখে সত্যিকারের সমবেদনা। রক্তাভ সুন্দর আঙুল দিয়ে থুতনির খাঁজটা মুছে নিল অকারণ। একটা পোখরাজ একটু ঝলসে যায়। মনোরম বুঝতে পারে, সমীরের কিছু বলার নেই।

কিন্তু তবু মনোরমের ইচ্ছে হয়, আরও একটুক্ষণ এই সফল সুপুরুষ ও উঁচু ধরনের লোকটির সঙ্গে কাটায়। আর একটু দেখতে ইচ্ছে করে, কী আছে লোকটার। সীতার কথা একটু শুনতে ইচ্ছে করছিল তার।

সে একটা মিছে কথা বলল। চেয়ারটা ঠেলে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, আমিও মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম।

যাবে? বলে একটু বিস্মিতভাবে তাকিয়েই সেই ভদ্র আন্তরিক হাসিটি হেসে বলে, ইউ আর ওয়েলকাম। আমার সঙ্গে চলো।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে মনোরম বলে, যাব?

যাবে না কেন?

মনোরম একটু বোকা-হাসি হেসে বলে, আমি কিন্তু একটু মদ্যপান করেছি। অবশ্য তেমন কিছু না, একটু বিয়ার...

তেমনি ভদ্র হাসি হেসে সমীর উঠতে উঠতে বলে, গন্ধ পাচ্ছিলাম। তাতে কী? আমিও তো মাঝে মাঝে খাই। ইটস অল ইন দ্য গেম।

টেবিল থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার আগে শেষবারের মতো মনোরম ছবিটা দেখছিল । রাঙা আলোর বনভূমিতে গো-গাড়ি থামিয়ে গেরস্থালি পেতেছে কয়েকজন আদিবাসী পুরুষ ও রমণী। কী চমৎকার বিষয়, যেন ঠিক একটা গল্প বলা আছে ছবির ভিতরে। ছবিটা দেখতে দেখতেই সমীরের শেষ বাক্যটির চমৎকার ইংরিজি ক'টা শব্দ শুনে সে চমকে গেল। এখনও ভাল ইংরিজি-বলা লোককে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়। আদিবাসীদের ছবি থেকে সে চোখ সরিয়ে কলকাতায় চলে এল এক পলকে। কিছুক্ষণের জন্য যেন বা সে ওই ছবির বনভূমিতে চলে গিয়েছিল।

আমার কার্ড নেই, লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে হবে।

টিকিট? লোকটা পরতে পরতে আবার সেই ভদ্র হাসি, কোমল লাবণ্য, ক্ষমা, সব বিকিরণ করে সমীর বলে, আরে কার্ড-ফার্ড লাগবে না। আমি...বলে আবার সেই ভদ্রতাসূচক স্তব্ধতা, থেমে বলল, গভর্নিং বডির মেম্বার।

আন্দাজ করেছিল। তাই হাসল মনোরম, মনে মনে বলল, জানতাম। ঘাড় দুটো উঁচু করে শ্রাগ করল। বলল, না। আমি সবুজ গ্যালারিতেই যাব।

চলো তো।

নিঃশব্দ গাড়ি। ছুটল, শব্দ হল না । কথা না বলে গাড়িটার জোরালো ইঞ্জিনের টান ও গতিটুকু উপভোগ করে মনোরম। কনভার্টিবল বুইক। একটু পুরনো। তবু ভাল। যে-কোনও ভাল জিনিস—এমনকী একটা গাড়ির চলাও—নিবিড়ভাবে উপভোগ করার আছে। মনোরম করে। মামার গাড়িটা ভাল নয়, সেই গাড়িতে সে আজকাল প্রায়ই বীরুর পিছু নেয়।

ইডেন গার্ডেনের উলটো দিকে গাড়িটা দাঁড় করায় সমীর। বৃষ্টি থেমেছে। পিঁপড়ের মতো ময়দান ভেদ করে লোক চলেছে। দূরে উড়ছে একটা লাল সোনালি পতাকা। মাঠে সমীর গাড়ির কাচ বন্ধ করে দরজা লক করে বলল, এখানেই থাকো। দূরে থাকাই সেফ।

হাঁটতে হাঁটতে মনোরম বলে, আপনি রোজ খেলা দেখেন?

আরে না, না। মাঝে-মধ্যে। তবে গভর্নিং বডিতে যাওয়ার পর প্রায়ই আসতে হচ্ছে। ওটা এটিকেট।

কখনও টিকিটের গ্যালারি থেকে খেলা দেখেননি?

একটু অস্বস্তি বোধ করে সমীর, দ্বিধাভরে বলে, সেই ছেলেবেলায়, দু'-একবার, ঠিক মনে নেই।

কেন যান না?

এমনিই! যেতে তো হয় না, তা ছাড়া ওদিকের ওরা একটু হস্টাইল।

সাধারণ দর্শকের গ্যালারি থেকে যখন মানুষ জামা প্যান্ট খুলে বাতাসে ওড়ায়, চেঁচিয়ে বাপ-মা তুলে গাল দেয় খেলোয়াড়কে, যখন ঘাড়ে লাফিয়ে ওঠে, মস্তিষ্কশূন্য খ্যা-খ্যা হাসে, কনুয়ের বা হাঁটুর গুঁতো দেয়, তখন তার মাঝখানে এই অতি সুকুমার ও ভদ্র মানুষটিকে কেমন দেখাবে? যখন ইট ছুড়ে মারবে, রেফারি, লাইনসম্যান আর ক্লাবের কর্মকর্তাদের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করবে তখন কেমন হবে ওই মুখখানার ভাব!

ওরা হস্টাইল কেন, তা কিন্তু একবার আপনার নিজের দেখে আসা উচিত। গভর্নিং বডির মেম্বারদের দর্শক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা ভাল।

সমীর দ্বিধাভরে বলে, মন্দ বলোনি। কিন্তু এ বয়সে একটা মোটামুটি ভদ্র জীবন যাপন করে, ওই ইট-ছোড়া আর খারাপ কথা ভাল লাগে না। হার্শনেসটা ঠিক সহ্য হয় না আমার।

মাঠের কাছাকাছি এসে মনোরম হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সমীরের কোমল, পরিষ্কার এবং রক্তাভ একখানা হাত ধরল, আসুন।

সমীর অবাক হয়ে বলে, কোথায়?

সবুজ গ্যালারিতে।

আরে পাগল, টিম মাঠে নামবে, মেম্বাররা খোঁজাখুঁজি করবে।

মনোরম মিনতি করে, আসুন না। একদিন আমার সঙ্গে দেখুন। ওদের বলবেন শরীর খারাপ ছিল।

সমীর হাত টানাটানি করল না, বিরক্তি দেখাল না। কেবল সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, আরে, আজ তুমি আমার গেস্ট। এসো এসো—

লড়াইটা মর্যাদার ছিল! সবুজ গ্যালারিতে লম্বা লাইনে সমীরকে দাঁড় করাবে, গ্যালারিতে খিস্তির সমুদ্রে দাঁড় করিয়ে পাশাপাশি খেলা দেখবে—এতটা আশা করেনি মনোরম। বড়লোকেরা যে কী জিনিস দিয়ে তৈরি! টপ করে হারিয়ে দেয়। মনোরম ওই মহার্ঘ গলার স্বরের প্রভুত্বের কাছে হেরে গেল। খুবই বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে।

সমীর তার কাঁধটা বন্ধুর মতো ধরে বলল, চলো।

মনোরম চলল। সসম্ভ্রমে গেট-এর পাহারাদাররা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মনোরম কে সে প্রশ্নই ওঠে না।

ভিতরে দু'-চারজন কর্তাব্যক্তি গোছের লোক সমীরকে ঘিরে ধরে। সমীর যে বড় 'ডোনার' এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, নইলে মনোরমের সন্দেহ ও কোনওকালে ফুটবলে লাথিই দেয়নি।

কথা বলতে বলতেই সমীর ব্যস্তভাবে চলে গেল টেন্ট-এর দিকে, মনোরম যে সঙ্গে আছে, খেয়ালই করল না। একা দাঁড়িয়ে থেকে মনোরম তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে। একা সে দাঁড়িয়ে, চার দিকে ব্যস্ত-সমস্ত লোকজন চলে যাচ্ছে। এখন কেউ তাকে সে কে জিগ্যেস করলে তার তেমন কিছু বলার নেই। চলাচলের রাস্তাটা ছেড়ে সে গ্যালারির তলদেশে আবছায়ায় এসে দাঁড়ায়। টেন্ট-এর খোলা জানালা দিয়ে ভিতরের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সমীর যে কোথায় গেল! বড্ড একা লাগে মনোরমের। আর সেই নিঃসঙ্গতায় কেবল টুক টুক করে মুখের ভিতরে নড়ে তার অসহায় জখমি জিভখানা।

ঝলসানো রঙের জার্সিপরা খেলোয়াড়রা সারিবদ্ধভাবে টেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছে। কী চমৎকার তাদের সতেজ ঊরু, নোয়ানো কিন্তু গর্বিত মাথা, চারদিককে অবহেলা করে তারা পলকে গ্যালারির ভিতরকার রাস্তা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় মাঠের দিকে। সামনে পেছনে পাশে কয়েকজন ভাল চেহারার লোকজন তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল। মনোরম ঈর্ষার চোখে এই তাজা বয়সি খেলোয়াড়দের চলে-যাওয়া দেখছিল। সে যদি খেলোয়াড় হত!

আলো থেকে চোখ সরিয়ে গ্যালারির তলার আবছায়ার দিকে তাকিয়ে মনোরম নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। পায়ে বুট, হোস আর রঙিন জার্সি। নোয়ানো মাথা, আত্মবিশ্বাসী সতেজ উরুদ্বয়ে মাংসল শক্তির পিচ্ছিলতা। হেঁটে যাচ্ছে মনোরম খেলার মাঠের দিকে । সেখানে হাড়ভাঙা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গ্যালারিতে সীতা বসে আছে, উদগ্রীব তার শুষ্ক উজ্জ্বল মুখখানা। মাঠে বাইশজনের একজন হয়ে মনোরম প্রচণ্ড শক্তিতে ফেটে পড়ে। কী খেলাই খেলছে মনোরম, কী খেলাই যে খেলছে! বাইশজনের মধ্যে ঠিক একজনকেই দেখছে সীতা। মনোরমকে।

হঠাৎ মাঠে চিৎকার ফেটে পড়ে। টিম মাঠে নামছে। কল্পনাটা ভেঙে যায়।

মাঠ থেকে চিৎকার আসছে। বলে বুটে লাগাবার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ। একজন চেঁচিয়ে উঠল—হেগো...হলদে চিনি দিয়ে খা। একা বিষণ্ণ এবং চুপচাপ দাঁড়িয়ে শোনে মনোরম। আজ বিকেলে সে সীতাকে দেখেছিল। ভুলতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত স্মৃতি ছাড়া মানুষের কিছুই থাকে না বুঝি! গ্যালারিতে ঝুঁকে মানুষ খেলা দেখছে, মাঠে রগ-ছেঁড়া লড়াই কত উত্তেজক, বলে পা লাগার শব্দ কী মাদকতাময় কত মানুষের কাছে! একাকী মনোরম দাঁড়িয়ে আছে গ্যালারির ছায়ায়, বিষণ্ণ, স্মৃতিতাড়িত, উদাসীন। এখনও, মানুষ পৃথিবীতে খেলা করে। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা। চার দিকে বৃষ্টিবিন্দুর মুক্তো আর মেঘভাঙা রোদের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর মাটিতেই হেঁটে গেছে সীতা। কোথা থেকে এসেছিল, কোথায় চলে গেল কে জানে! প্রায় এক বছরে সীতা কত দূরের হয়ে গেছে! সীতাকে চেনার চিহ্নগুলি কি শেষ পর্যন্ত মনোরমের থাকবে। ভুলে যাবে না তো! স্মৃতি ছাড়া তার আর কিছুই নেই। প্রবল বৃষ্টিতে যেমন গাছপালার ধুলোময়লা ধুয়ে যায় তেমনই কি সীতা মনোরমের সব স্মৃতি ধুয়ে-মুছে ফেলেছে? কিছু কি নেই?

মুখের ভিতরে জিভটা নড়ছে টুক টুক করে। চামচের মতো নড়ন্ত জিভটাই যেন তার স্মৃতিকে ঘুলিয়ে তোলে। সীতা তীব্র আশ্লেষের সময়ে কতবার তার সুন্দর দাঁতে মুখের ভিতরে মনোরমের জিভটাকে নরম করে চেপে ধরে রেখেছে। শ্বাসবায়ুর স্বরে বলেছে 'নোড়ো না জিভ, চুপ করো।' সীতার সুগন্ধী সুস্বাদু মুখের ভিতরে জিভটা নিথর হয়ে থাকত। এমন প্রবলভাবে সেই অনুভূতিটা আক্রমণ করে মনোরমকে যে তার চোখ বুজে আসে, মুখটা আস্তে একটু ফাঁক হয়, জিভটা লোভে-প্রত্যাশায় বেরিয়ে আসে। মুখে স্বেদবিন্দু ফুটে ওঠে মনোরমের, গায়ে কাঁটা দেয়, শ্বাস গাঢ় হয়ে আসে। সমস্ত শরীরটা এক অদৃশ্য সীতার ঝুঁকে-পড়া, কাছে আসা, আলিঙ্গন-আশ্লেষে বদ্ধ অস্তিত্বের স্বাদ নিতে থাকে। ইডিও-মোটর অ্যাকশন।

ঠিক এই অবস্থায় তাকে দেখল সমীর। টেন্ট-এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে সে অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কাছে এসে বলল, তোমার শরীর কি খারাপ মনোরম?

না, না। লজ্জা পেয়ে মনোরম বলে।

সমীরের অবাক ভাবটা কাটেনি, বলল, চোখ বুজে, জিভ বের করে এমনভাবে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে যে আমি চমকে উঠেছিলাম।

কী করবে মনোরম! মনে পড়ে, বড্ড যে মনে পড়ে! কিছু একটা প্রবলভাবে মনে পড়লেই তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। এই ইংরিজি শব্দটা সীতাই শিখিয়েছিল তাকে। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে সীতা, অখণ্ড মনোযোগে, খুব ধীর হাতে, চোখ ছোট, ঠোঁট দু'টো পাখির ঠোঁটের মতো ছুঁচোলো। দেখতে দেখতে মনোরমেরও চোখ ছোট হয়ে যেত, ঠোঁট ছুঁচোলো হয়ে আসত, দু'টো হাত আপনা থেকেই শূন্যে উঠে ছুঁচে সুতো পরানোর ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকত, হঠাৎ চোখ তুলে দৃশ্যটা দেখেই হেসে ফেলে সীতা একদিন বলেছিল, তোমার ইডিও-মোটর অ্যাকশন আছে। না বুঝে মনোরম বলেছিল, মানে? সীতা উত্তর দিয়েছিল, ওটা সাইকোলজিকাল একটা ব্যাপার। কখনও কখনও সেই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে মনোরমের। কোনও কারণ থাকে না, হঠাৎ মনে পড়ে। সেই ভয়ংকর শব্দ, অন্ধকার রাত, হঠাৎ ঘুম-ভাঙা আধো-চেতনায় টের পেত, চার দিকে ট্রেনের কামরা ভাঙার শব্দ, কে যেন তাকে বাতাসে ছুড়ে দিচ্ছে। মৃত্যুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল মনোরম। মনে পড়লেই তার হাত মুঠো পাকায়, শরীর কুঁকড়ে আসে, চোখ বুজে সে কাল্পনিক আঘাতে বিকট মুখভঙ্গি করতে থাকে। এ দৃশ্য দেখেও সীতা ওই ইংরিজি শব্দটা বলেছিল। ইডিও-মোটর অ্যাকশন । বলত,

তোমার যখন ছেলে হবে, আর ছেলেকে যখন আমি ঝিনুকে দুধ খাওয়াব তখন তা দেখে ঠিক তুমিও হাঁ করবে, ঢোক গিলবে, দেখো। ইডিও-মোটর অ্যাকশন থাকলে ও-রকম হয়।

দুর্ঘটনাটা এড়ানো গেছে। তাদের ছেলেপুলে হয়নি। সীতা তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের পর অবিকল বিয়ের আগের মতো কুমারী হয়ে গেছে। কিন্তু তা কি হয়? হতে পারে? স্মৃতি থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত স্মৃতিই থাকে। কুমারী সীতার বুকভরা বিবাহের স্মৃতি, মনোরম জানে।

এসো, বলে সমীর হাঁটতে থাকে। এবং মনোরম কেন সমীরের সঙ্গে এতক্ষণ লেগে আছে তা না-বুঝেই পিছু নেয়। গ্যালারির ফাঁক দিয়ে মাঠে রঙিন জার্সির ছোটাছুটি দেখা যায়। একটু এগোতেই মস্ত আকাশের নীচে সতেজ সবুজ মাঠ, গ্যালারিতে আনন্দিত ভিড়, সাদা উড়ন্ত বলখানা—সব মিলিয়ে সুন্দর দৃশ্যটা দেখে মনোরম। দেখে, কিন্তু তাকে কিছুই স্পর্শ করে না। বরং একটা খোলা বাতাস এসে ঝাপটা দিতেই তার গা শিরশির করে, একটু শীত করে। সে এই খেলার কিছুই মানে বুঝতে পারে না। তবু সমীরের পিছু পিছু সে যায়। লোহার ঘেরা-বেড়ার গেট দিয়ে মাঠের সাইড লাইনের ধারে গিয়ে বসে। একটা প্রবল চিৎকার উঠতে উঠতে হঠাৎ ফেটে পড়ে উল্লাসে। গোল। দু'হাতে কান ঢেকে মনোরম চোখ বুজে থাকে কিছুক্ষণ। এত কোলাহল তার সীতার হেঁটে-যাওয়ার ছবিটা ছিঁড়ে দেয় বুঝি!

সমীর গাঢ় একটা শ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল। মুখে হাসি। একটু ঝুঁকে বলল, বি পাল খেলছে না, আমাদের রেগুলার স্ট্রাইকার। খুব চিন্তা ছিল।

না-বুঝে মনোরম হাসল, যেন বা গোলটা হওয়ায় সেও নিশ্চিন্ত। খানিকটা অসহায়ভাবেই সে মাঠের দিকে চেয়ে খেলাটা বুঝবার চেষ্টা করে। সারা মাঠ জুড়ে রঙিন জার্সির ছোটাছুটি। মাঠে চোরা জল লাথি খেয়ে হঠাৎ ছিটকে ওঠে ফোয়ারার মতো। পিছলে পড়ে বহু দূর মাটিতে ঘষটে যায় চতুর খেলোয়াড়েরা। কী সুন্দর ভঙ্গিতে হরিণের মতো লাফিয়ে ওঠে শূন্যে গোলমুখে কয়েকজন হালকা শরীরের মানুষ। বলটা বাতাসে কেমন ধনুকের মতো বাঁক নেয়। দেখতে দেখতে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। পা শূন্যে ওঠে, মাথাটা হঠাৎ নড়ে, দু'হাত মুঠো পাকায়।

দু'টো গোলের পর সমীর হাসল, গেম ইজ ইন দি পকেট। তুমি কী বলবে বলেছিলে মনোরম!

মনোরম একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে, মানস লাহিড়িকে আপনি চেনেন?

সমীর একটু থমকায়। তারপর চিন্তা করে বলে, কোন মানস বলো তো!

জিমন্যাস্ট ছিল। রিং থেকে পড়ে গিয়ে যার কলারবোন ভেঙেছিল। এখন রেলের অফিসার, দু'-চারটে ক্লাবের কোচ। চেনেন না?

সমীর মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ, চিনি।

আমি খবর রাখি, সীতা ওকে বিয়ে করবে।

সমীর নীরবে কিছুক্ষণ খেলাটা দেখে যেতে থাকল। ভ্রূ কোঁচকাল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, মনোরম, ফ্র্যাঙ্কলি আমি কিছুই জানি না। কিন্তু যদি সীতা আবার বিয়ে করেই, তাতেই বা কী?

মনোরম সহজ উত্তর দিল না। বলল, ডিভোর্সের পর এক বছর পূর্ণ হতে আর মাস তিনেক বাকি। তারপর আইনত সীতা বিয়ে করতে পারে। কিন্তু—

কিন্তু কী?

আমার কয়েকটা কথা ছিল।

সমীরের ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, একটু অধৈর্যের গলায় বলে, আমাকে এ-সব ব্যাপারের মধ্যে টেনো না মনোরম। আমি ইনভলভড হতে চাই না। তা ছাড়া সীতার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক তো চুকেই গেছে। আবার কেন? লিভ হার অ্যালোন।

মনোরম মাথা নাড়ল। বলল, তা হয় না। সীতা এখনও আমার কাছ থেকে মাসোহারা পায়।

তাতে কী?

তাতে এটুকু প্রমাণ হয় যে, সে আমার ওপর এখনও কিছুটা নির্ভরশীল। নীতিগতভাবে তার সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা আমি বললে দোষ হয় না।

কিন্তু আমাকে কেন জড়াচ্ছ?

আপনাকে জড়াচ্ছি না। সীতার কোনও খবর পাওয়ার উপায় আমার নেই। আপনি ও-বাড়ির জামাই, আপনি খবর পান। তাই আপনাকে ছাড়া আর উপায় কী?

তুমি বরং সীতাকে চিঠি লেখো, কিংবা টেলিফোন করো।

টেলিফোন করলে ও ফোন রেখে দেবে। চিঠি ছিঁড়ে ফেলবে।

সমীরের ভদ্র ও সুকুমার মুখে ইতিমধ্যে অধৈর্যের ভাব ফুটে উঠেছে। মনোরম সেটা লক্ষ করে। তবু সমীর বলে, কী বলতে চাও?

গোলের সামনে একজন ফরোয়ার্ড ল্যাং খেয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে। চারদিক থেকে প্রবল একটা চিৎকার ওঠে। রেফারির বাঁশি বাজে। সমীর হঠাৎ দু'হাতে মাথাটা ধরে ধরা গলায় চেঁচিয়ে বলে, গড! পেনাল্টি!

স্পটে বল বসানো হয়েছে। কিন্তু কে কিক নেবে তা নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি হতে থাকে। কেউ এগোয় না। মাঠসুদ্ধ লোক ঝুঁকে আছে ব্যাপারটার দিকে। সমীর নিথর। কথাগুলো আটকে আছে মনোরমের গলায়। পেনাল্টি শটটা নিতে ওরা বড় দেরি করতে থাকে। মনোরমের ইচ্ছে করে, উঠে গিয়ে শটটা দিয়ে ফিরে এসে সমীরকে কথাগুলো বলে।

কালো লম্বা একটা ছেলে অবশেষে এগিয়ে যায়। কোমরে হাত দিয়ে হাত দশেক দূর থেকে বলটাকে দেখে। দৌড়োয়। ডান পায়ে কিকটা নেয়। কোমর সমান উঁচু হয়ে ভীমরুলের ডাক ডেকে বলটা গোলে ঢুকে যায়। মাঠ স্তব্ধ।

সেই স্তব্ধতার মধ্যেই মাঠের মাঝখানে বলটা চলে আসে। দু'পাশে খেলোয়াড়রা দাঁড়ায় যথাযথ। সমীর অস্ফুট গলায় বলে, গড!

তারপর সিগারেট ধরায়।

মোটে আর-একটা গোলের লিড থাকছে। হাফটাইম পর্যন্ত ব্যাপারটা যথেষ্ট নিরাপদ নয়। মনোরম সমীরের মুখ দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে নিল।

চিন্তিত সমীর মনোরমের দিকে মুখ ফেরায় এবং স্বয়ংক্রিয় হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই এগিয়ে দেয়।

কী বলছিলে যেন!

মনোরম একটা শ্বাস ফেলে বলে, সীতার কথা।

ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।

আসলে সীতার কথাও আমি বলতে চাইছি না।

তবে কী বলতে চাইছ?

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা।

বলো।

মানস লাহিড়ি আমার বন্ধু ছিল, আমাদের বাসায় আসত-টাসত। এবং নামকরা জিমন্যাস্ট বলে আমি তাকে যথেষ্ট খাতির করতাম। সে সীতার খুব প্রশংসা করত। ক্রমে সীতার ভাল লাগতে থাকে। মানস লাহিড়িকে তো আপনি জানেন, কী রকম পেটা প্রকাণ্ড শরীর, কাঁধের হাড় ভাঙা বলে বাঁ দিকটা একটু বেঁকে থাকে, তবু খুবই পুরুষালি চেহারা। অন্য দিকে সীতা একটা চড়াই পাখির মতো ছোট্ট আর নরম আর সুন্দর।

গুডনেস! সমীর আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে।

ও বিরক্ত হয়েছে মনে করে মনোরম থেমে যায়। কিন্তু তারপরই দেখে কর্নার ফ্লাগের কাছ পর্যন্ত গিয়ে সমীরের টিমের রাইট-আউট বলটা সেন্টার করতে পারেনি। বল লাইন পার হয়ে গেছে। গোল কিক।

কী বলছিলে যেন?

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা।

বলো।

কোনও অন্য পুরুষ যখন কোনও বিবাহিতা মহিলার প্রশংসা শুরু করে এবং সেই মহিলা যখন সেই প্রশংসা গ্রহণ করে খুশি হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে একটা যৌন ঋণ গড়ে ওঠে।

কীসের ঋণ।

যৌন ঋণ।

ওঃ গড!

পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে একজন খেলোয়াড় বলটা বাইরে মেরেছে। মনোরম গভীরভাবে সিগারেটে টান দেয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে।

কী বলছিলে মনোরম? কীসের ঋণ?

যৌন ঋণ।

সেটা কী ব্যাপার?

পরস্পরের কাছে তখন একটা না-বলা দাবি-দাওয়া তৈরি হতে থাকে। অপরিশোধ্য একটা ঋণ গড়ে ওঠে। ঠিক ভালবাসা এ নয়, এটুকুর জন্য কেউ ঘর-সংসার ভাঙে না, তবু এও এক ধরনের স্খলন বা পতন। পরস্পরকে যখনই ভাল লাগতে থাকে, তখনই ভিতরে ভিতরে একটা বাঁধ ভাঙার ইচ্ছে উঁকি দিতে থাকে। যেহেতু সেটা অবৈধ সেই জন্যই সেটা আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

ডিসগাস্টিং। বি পাল খেললে এ-রকমটা হত না।

কার কথা বলছেন?

বি পাল। আমাদের স্ট্রাইকার। গোল-লাইন থেকে বলটা ব্যাক করতে পারা ছেলেখেলা ছিল, মজুমদার পারল না দেখলে?

আমি মানস লাহিড়ির কথা বলছিলাম।

ওঃ হ্যাঁ, বলো।

আসলে মানস লাহিড়ির কথাও নয়।

তবে কার কথা।

স্বামী-স্ত্রীর কথা।

বলো।

বিয়ের ছয়-সাত বছর পর আর পরস্পরকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর তেমন উত্তেজনা থাকে না।

বটেই তো।

সীতার আর আমারও ছিল না।

হুঁ, হুঁ।

আর তখন মানস লাহিড়ি আসত।

ঠিক।

আর তখন আমরা যখন, অর্থাৎ আমি আর সীতা যখন শারীরিক দিক দিয়ে মিলিত হতাম, মানে—বুঝতেই পারছেন—

ও-গুড-নেস—

সমীরের টিম অন্য টিমের গোলপোস্ট ছেঁকে ধরেছে। পর পর চারজন গোলে মারল। পোস্ট, বার খেলোয়াড়ের গা থেকে ফিরে এল। শেষ শটটা গোলকিপার উড়িয়ে দিল বারের ওপর দিয়ে। কর্নার।

কর্নার কিকটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে মনোরম।

কিক থেকে একটা নিষ্ফলা হেড। তারপর গোল-কিক আবার।

শ্বাস ফেলে সমীর বলল, বলো।

যখন আমরা মিলিত হতাম—মানে শারীরিকভাবে, বুঝলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।

তখন আমার প্রায়ই মনে হত সীতা আমার কথা ভাবছে না।

তবে কার কথা?

মনে হত, সীতা চোখ বুজে আমার জায়গায় আর একজনকে ভেবে নিচ্ছে এবং তাতে তার সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। মনে মনে সে তখন সেই ঋণ শোধ দিচ্ছে।

মাই গুডনেস! সমীর চাপা তীব্র গলায় বলে।

মনোরম চমকে মাঠের দিকে তাকাল। না, মাঠে কোনও ঘটনা ঘটেনি। মাঝ-মাঠে একজন বল নিয়ে দুর্বল পায়ে দৌড়োচ্ছে। বেরোতে পারবে না।

সমীর তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনোরম লজ্জা পায়।

কী বলছ মনোরম?

আমার ও-রকম মনে হত।

কেন?

মনে হওয়াকে কেউ ঠেকাতে পারে না।

সমীর দ্রুত সিগারেটে টান দেয়। বলে, তারপর?

মনোরম দুঃখিত গলায় বলে, আমার একটা দোষ, আমি বড্ড বেশি কৌতূহলী। সব ব্যাপারটা আমি জানতে চাই। তাই সীতাকে আমি জিগ্যেস করি। মানস লাহিড়িকেও।

বলো কী?

মনোরম ম্লান একটু হাসল। বলল, দু'জনেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু আমি জানতাম ওরা মিছে কথা বলছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে কী বকম কঠিন হয়ে দাঁড়াল ভেবে দেখুন। আমি সীতার স্বামী, তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি, সম্পূর্ণ বৈধ ভাবে। অথচ জানছি, আমি নই, তার বুক জুড়ে আর একজনের কাছে ঋণ। আমি সেই আর একজনের প্রতিনিধি হয়ে সেই ঋণ শোধ নিচ্ছি মাত্র। এভাবেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্রমে অবৈধ হয়ে ওঠে।

সমীরের মুখের সুকুমার ভাবটুকু ভেদ করে একটা ঘেন্নার ভাব ফুটে ওঠে। সে বলল, ডিসগাস্টিং। এ-সব কী বলছ মনোরম!

আমি সীতা বা মানসের কথা বলতে চাইছি না। আমি আসলে জানতে চাইছি সব স্বামী-স্ত্রীরই কি এ-রকম হয়? এ-রকম হওয়াটাই কি স্বাভাবিক?

নিশ্চয়ই নয়।

আপনি কখনও গীতাদিকে জিগ্যেস করেছেন?

কী?

তিনি কখনও আর কাউকে...

পলকে ফণা তোলে সমীর। দু'খানা চোখ ধ্বক ধ্বক করে ওঠে। মনোরম মুখ আড়াল করে উদ্যত হাতে, যেন বা মার ঠেকাবে।

রিডিকুলাস মনোরম! ভেরি রিডিকুলাস! তুমি কি পাগল?

মনোরম অবাক হয়ে টের পায়, সমীরের টিম একটা গোল দিয়েছে। ৩-১। সমস্ত মাঠ ফেটে পড়ছে উল্লাসে। সবুজ গ্যালারির ওপর শূন্যে ভাসছে ছাতা, উড়ছে জুতো, জামা। সমীর এক পলক তাকিয়ে দেখল মাত্র। উত্তেজিত হল না।

মনোরম আস্তে আস্তে বলল, আমার যন্ত্রণাটা ঠিক এইভাবে শুরু হয়। অথচ কখনও সীতা বা মানস লাহিড়ি পরস্পরের দিকে এক পাও এগোয়নি। বৈঠকখানা ঘরে তারা বরাবরের মতো দু'টো দূরের চেয়ারে বসে থেকেছে, হেসেছে, স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু আমি কেন—আমারই কেন যে শান্তি ছিল না!

সমীর হঠাৎ উঠতে উঠতে বলে, মনোরম, তুমি কি খেলাটা আর দেখবে? দেখলে দেখো। আমি যাচ্ছি।

না। বলে মনোরম উঠে সমীরের পিছু নেয়।

গ্যালারির কলরোল তখনও থামেনি। উদ্দণ্ড নাচ নাচছে লোকজন। একজন বুড়ো মোটা মানুষ একসঙ্গে তিনটে সিগারেট ধরিয়ে টানছে, তাকে ঘিরে ভিড়। গ্যালারির সরু রাস্তাটা দিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। আগে সমীর, পিছনে মনোরম। সদর পার হয়ে তারা বড় রাস্তায় এসে পড়ে।

সমীর দ্রুত লম্বা পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছিল, যেন বা মনোরম তার সঙ্গে নেই। হঠাৎ থমকে সমীর মুখ ফিরিয়ে বলল, পুরুষমানুষের অনেক কাজ থাকে মনোরম। শুধু বউয়ের চিন্তা নিয়ে থাকলেই তার চলে না।

মনোরম দাঁড়িয়ে গেল। সমীর পিছন ফিরে আর তাকাল না, নিজের গাড়ির দিকে চলে গেল।

বিষণ্ণ মনোরম বড় রাস্তা ছেড়ে একা মাঠের মধ্যে নামল। তারপর প্রকাণ্ড মাঠ খানা-জল-কাদা ভেঙে পার হতে থাকল। প্রকাণ্ড আকাশের নীচে মস্ত মাঠখানা বড় অফুরান, ক্লান্তিকর লাগছিল তার।

## ॥ দুই ॥

ঝরঝর করে খানিকটা জল পড়ল কাঁধে। ব্লাউজের হাতটা ভিজে গেল। সীতা মুখ তুলে দেখে, ট্রামের জানালার খাঁজে জল জমে আছে। ময়দানের দিক সাদা করে আর এক ঝাঁক বৃষ্টি আসছে। নড়বড়ে জানালাটা বন্ধ করতে একবার চেষ্টা করল সীতা। পারল না। এক ভিড় লোক তাকে দেখছে। সকলের চোখের সামনে দ্বিতীয়বার জানালা বন্ধ করার চেষ্টা করতে তার লজ্জা করছিল। অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে বসে থাকে সীতা। ঝরঝর করে জল পড়তেই থাকে। সরে বসবে যে তার উপায় নেই, পাশে মুশকোমতো এক পুরুষমানুষ বসে আছে। লোভী মুখ-চোখ, আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখছে।

কেনাকাটা করাটা সীতার একটা নেশার মতো। দরকার থাক বা না-থাক, সীতা বরাবর দুপুরের দিকে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে। গড়িয়াহাটা বা নিউ মার্কেটে ঘুরে ঘুরে টুকটাক জিনিস কেনে, বেশি টাকার জিনিস নয়, সস্তা বাহারি চটি, হাতব্যাগ, স্টিলের ছাঁকনি বা চামচ, ডোনার কিংবা অন্য কোনও রূপটান। সংসারে কোনও জিনিস ফেলা যায় না। যখন সীতার সংসার ছিল তখন সব কিছুই কাজে লাগত। এখন তার নিজের সংসার বলে কিছু নেই। তবু নেশাটা রয়ে গেছে। দু' পিস ব্লাউজের লন কাপড় কিনেছে সে, একটা শাড়িতে লাগানোর ফলস পাড়, এক কৌটো কাজল, ফাউন্ডেশন, ভাইঝির জন্য স্টিলের চেন-এ একটা ঝকমকে লকেট, এ-রকম আরও কিছু কাজ বা অকাজের জিনিস। এ-সব তার কোলের ওপর জড়ো হয়ে আছে। তার ওপর ভ্যানিটি ব্যাগ আর ভাঁজ করা ছাতা। ব্যাগটা ছোট বলে সব জিনিস আঁটেনি। ব্লাউজপিসের প্যাকেটটা ভিজে যাচ্ছে। অস্বস্তিতে আবার চোখ তুলে জলের উৎসটা দেখে সীতা। বৃষ্টিও এসে গেল। ছাঁট আসছে।

পাশের লোকটা হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে, জানালাটা বন্ধ করে দেব!

সীতা ঘাড়টা একটু নাড়ল মাত্র।

লোকটা উঠে সীতার ওপর দিয়ে ঝুঁকে জানালাটা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। সীতা লোকটার বগলের ঘেমো গন্ধ পায়। বুক পেট গুলিয়ে ওঠে তার। লোকটা জানালা বন্ধ করতে বেশ সময় নিতে থাকে। ততক্ষণ দমবন্ধ করে বসে থাকে সীতা। এবং নির্ভুল ভাবে টের পায়, লোকটা তার নিজের বুকটা হালকাভাবে তার কপালে ছোঁয়াল। জানালাটা বন্ধ করে হাতটা টেনে নেওয়ার সময় খুব কৌশলে সেই হাতটা সীতার কাঁধ স্পর্শ করে গেল। সীতা দাঁতে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে নিজেকে সামলে নেয়। মেয়েদের শরীরের প্রতি পুরুষের দাবি-দাওয়ার শেষ নেই। হাঁটু, কনুই, হাত যা দিয়ে হোক একটু ছোঁয়ানো চাই।

জানলা বন্ধ করে লোকটা চেপে বসল। সীতা লোকটার প্রকাণ্ড ভারী উরুর ঘন স্পর্শ পেল। নিজের উরুতে। যতদূর সম্ভব জানালা ঘেঁষে বসল। ঘামতে লাগল। অস্বস্তি। জানালা বন্ধ, ফলে লোকের ঘামের গন্ধ, ভ্যাপসা গরম, পাশের লোকটার উরু, এবং ক্রমে কাঁধের স্পর্শও সীতাকে আক্রমণ করে। লোকটা বুঝে গেছে, সীতা কিছু বলবে না, সে লাজুক মুখচোরা মেয়ে। তাই লোকটা ট্রাম থেমে আবার চললেই ঝাঁকুনি লাগার ভান করে ঢলে পড়ছে সামান্য। আর-কেউ কিছু টের পায় না, কেবল সীতা পায়। সে ঘামে লাল হয়, আর দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। এ-সব নতুন নয়, তবু সীতার ঠিক সহ্য হয় না।

ট্রামটা থেমে গেল। রেসকোর্স পার হয়ে ব্রিজটায় উঠবার মুখে। সামনে একটা ট্রাম বোধ হয় খারাপ। সময় লাগবে। ট্রামের ভেতরটা ক্রমে ভেপে পচে ফুলে উঠছে। পচে যাচ্ছে মানুষের শরীর। চারদিক থেকে চোরাচোখের আক্রমণ। পাশের লোকটা ঘেঁষে আসে। ঘাম। গরম। চমকা বৃষ্টিটা থেমে আবার রোদ উঠেছে বাইরে। বড় উজ্জ্বল রাংতারোদ।

সীতা ছোট্ট রুমালে মুখ, গলা মুছল। আর তখনই আবার লোকটার হাতে তার কনুই লাগে। সীতা আড়ষ্ট হয়ে নিজের কোলে হাত দু'খানা ফেলে রাখে। অন্যমনস্ক থাকার জন্য সে একটা কোনও চিন্তা করার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ। কোনও সুন্দর চিন্তা এলই না।

কেবলই ভেঙে-যাওয়া সংসারের কথাই মনে পড়ছিল সীতার। দুটি ঘর ছিল তাদের। মাঝখানের দরজায় একটা হালকা আকাশি রঙের সার্টিনের পরদা। সন্ধেবেলা ঝোড়ো কলকাতার হাওয়া সেই পরদাটিকে ওড়াত বারবার। টিউবলাইটের আলোয় দু'ঘরের কোথাও কোনও অন্ধকার ছিল না। এ-ঘরে মেঝেয় উবু হয়ে বসে যত্নে পেয়ালায় চা ছাঁকতে ছাঁকতে সে দেখতে পেত ও-ঘরে ক্লান্ত মনোরম চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে। শুধু শার্ট ছেড়েছে আর জুতোজোড়া। পরনে ফুল প্যান্ট, আর স্যান্ডো গেঞ্জি! চোখ বোজা। যতখানি ক্লান্ত তার চেয়ে বেশি ভান করত, সীতার একটু আদর-সোহাগের জন্য। আদর-সোহাগের বড় কাঙাল ছিল মনোরম। রোগ-ভোগা মানুষ একটু নেই-আঁকড়ে আর মাথাভরা চিন্তা-দুশ্চিন্তার বাসা। চা করতে করতে সীতা মাঝে মাঝে তাকাত। মায়া-মমতায় ভরে উঠত বুক। সেটা ঠিক প্রেম নয়, গাঢ় মমতা। করুণাও। সে যাই হোক, একভাবে না একভাবে তাদের জোড় মিলেছিল তো। মনোরমের সেই চা আর সীতাব স্পর্শের জন্য অপেক্ষারত দৃশ্যটা মনে পড়ে।

দৃশ্যটা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করে সীতা। পারে না। কান্না পায়। কেবলই মনে পড়ে দু'ঘরের মাঝখানে পরদা উড়ছে হাওয়ায়, ধু ধু করে জ্বলছে নীলাভ আলো। কোনওখানে অন্ধকার নেই। ও-ঘরে তার ক্লান্ত কাঙাল স্বামী মনোরম। ভিতু খুঁতখুঁতে, অসম্ভব পরনির্ভরশীল।

সীতা শুনেছে এখন মনোরম বড় বড় চুল রাখে, লম্বা জুলপি, আর খুব আধুনিক পোশাক-টোশাক পরে। কেন এ-সব করে মনোরম তা সীতা জানে না, কিন্তু তখন মনোরম ভাল পোশাক পরত না। সীতা কখনও ঝকমকে শার্ট বা প্যান্ট করে দিলে রাগ করত। ক্রপ করে ছোট্ট চুল রাখত মনোরম। তারা খুব অদ্ভুতভাবে শুত, মনোরমের স্বভাব ছিল সীতার বুকে মুখ গুঁজে শোওয়ার। ওই কদমছাঁট চুল খোঁচা দিত সীতার শরীরে। প্রথমে বিরক্ত হত সীতা। তারপর বুঝেছিল মানুষটা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে, জেগেও নানা ভয়ের উদ্বেগের চিন্তা করে। মনে মনে বড্ড একা অসহায় ছিল তার মানুষটা। তাই সীতাকে আঁকড়ে ধরত অমন। বুকে মাথা গুঁজে শুত, এবং সেই শোওয়ার মধ্যে কোনও যৌনকাতরতা ছিল না। ছিল নির্ভরশীলতা। তাই সীতা ওই কদমছাঁট চুলওলা মাথাটা বুকের মধ্যে ধরে রাখতে শিখেছিল। খোঁচা টের পেত না। এবং এমনই অভ্যাসের গুণ যে, ক্রমে ওভাবে মনোরম না-শুলে তার অস্বস্তি হতে থাকত। ঘুমের মধ্যে কথা বলত মনোরম। কখনও চেঁচিয়ে উঠত ভয়ে। উঠে বসত। তারপর সীতাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা ছেলের মতো আকুলি-ব্যাকুলি করত। সীতা ঘুম ভেঙে বলত, আহা, ষাট ষাট। এই তো আমি রয়েছি, ভয় কী? ঠিক যেমন শিশুকে মা ভোলায়। গানের গলা ছিল না মনোরমের। কিন্তু প্রায়দিনই একটা গান সে গাইত। হঠাৎ হঠাৎ বাথরুমে, শোওয়ার ঘরে। কিংবা খেতে বসে গেয়ে উঠত—জয় জগদীশ হরে...। একটাই লাইন মাত্র। সীতা হাসত—মোটে আধখানা লাইন ছাড়া আর কিছু জানো না? মনোরম কেমন বিষণ্ণ হেসে একদিন বলেছিল, ছেলেবেলায় ইস্কুলে এই গানটা ছিল আমাদের প্রেয়ার। মনে আছে, ইস্কুলে খুব লম্বা সাত-আট ধাপ সিঁড়ি ছিল, সেখানে সারি দিয়ে তিনশো ছেলে দাঁড়িয়ে ওই গান গাইতাম। যন্ত্রের মতো। গানের অর্থ কিছু বুঝতাম না। একদিন কী যে হল! অনেক দিন টানা বর্ষার পর সেদিন রোদ উঠেছে। বাহান্ন দিন টাইফয়েডে ভুগে সেদিন সকালে আমার দাদা মনোময় মারা যায়। আগের রাতে দাদার বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমাকে প্রতিবেশীদের এক বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের বাড়ি থেকেই সকালে খেয়েদেয়ে ইস্কুলে যাব বলে বেরিয়েছি, রাস্তায় পা দিয়েই শুনলাম, আমাদের বাড়ির দিক থেকে কান্নার রোল উঠেছে। যেই শুনলাম অমনি ইস্কুলের দিকে দৌড়োতে শুরু করলাম। দু'কানে হাত চেপে দৌড়োচ্ছি, কাঁধের ঝোলানো বইয়ের ব্যাগটা টপাটপ ধাক্কা দিচ্ছে কোমরে, ঘেমে হাঁফিয়ে যাচ্ছি, তবু প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতার হাত থেকে আমি প্রাণপণে পালাতে লাগলাম। ইস্কুলে সেদিনও প্রার্থনার সারিতে দাঁড়িয়ে রোজকার মতো গাইছি—জয় জগদীশ হরে...। গাইতে গাইতে দেখি চোখ ভরে জল নেমেছে। চার দিকে আকাশ কী গভীর নীল, কত বড় সেই আকাশ! তার তলায় আমরা কতটুকু-টুকু সব মানুষ!

ছোট্ট মানুষ আমরা মস্ত আকাশের দিকে হাতজোড় করে গাইছি—জয় জগদীশ হরে...। সেইদিনই যেন গানটা মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এখনও অন্য মনে কেবলই মনে পড়ে ওই লাইন। আধখানা। সবটা মনে নেই। গাইলেই বহুকালের পুরনো একটা রোদভরা আকাশ ঝুঁকে পড়ে চোখের ওপরে, কোথা থেকে যেন একটা আনন্দের, বিষাদের গভীর ঢেউ এসে আমাকে তুলে নেয়। আমি যেন তখন পৃথিবীর ধুলোময়লা থেকে ওপরে উঠে ভাসতে থাকি। তাই গাই।

এক একদিন ঘুম ভেঙে অন্ধকারে উঠে ঝুম হয়ে বসে থাকত মনোরম। সীতা ঘুমের মধ্যে বুকের ভিতরে কদমছাঁট চুলওলা মাথাটা না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করে চোখ মেলে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে, অন্ধকারে মনোরমের হাত মুঠো পাকানো, শরীর শক্ত, চোয়াল দৃঢ়ভাবে লেগে আছে। সীতা জানত, ওর সেই ট্রেন দুর্ঘটনার কথা মনে পড়েছে।

তখন ও এক বিদেশি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি। ফার্স্ট ক্লাসে উড়িষ্যা-বিহার ঘুরে বেড়াত। রোগা হলেও সুন্দর মুখশ্রী আর চালাকচতুর হাবভাবের জন্য, চমৎকার ইংরিজি বলার জন্যই অত ভাল চাকরি পেয়েছিল মনোরম। প্রায় হাজার টাকা মাইনে পেত, তার ওপর টি এ ছিল অনেক। সেবার উড়িষ্যা যাওয়ার সময়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে মাঝরাতে। তখনও মনোরমের বিয়ে হয়নি সীতার সঙ্গে। কী হয়েছিল তা সঠিক জানত না সীতা। তবে মনোরম দীর্ঘদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ফিরে আসে। চাকরিটা যায়নি, তবে কোম্পানি তাকে প্রতিনিধির কাজ থেকে অফিসে নিয়ে আসে নিরাপদ একটু উঁচুদরের কেরানির চাকরিতে। মাইনে কমল না, কিন্তু টি এ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু মনোরম ছটফট করত অন্য কারণে। ওই যে কলকাতা ছেড়ে প্রায়ই বেরিয়ে পড়া রাতের গাড়িতে, ভোরের আবছা আলোয় গাড়ির জানালা খুলে দক্ষিণ বিহার আর উড়িষ্যার টিলা, উপত্যকা, নদী, পাহাড় আর জঙ্গল দেখে এক অবিশ্বাস্য, অসহ্য আনন্দ, সেইটাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে। কোম্পানির বম্বের অফিসে কিছুদিন কাজ করেছিল মনোরম। ভাল লাগল না। আবার বিহার-উড়িষ্যার শ্বাসরোধকারী প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াবে, সন্ধ্যার আবছায়ায় পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে উশ্রী নদীর ছোট্ট পোলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, ধারোয়ার তীরবর্তী টিলার গা বেয়ে উঠে যাবে আস্তে আস্তে, কয়লা খনির অঞ্চলগুলিতে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গভীর রাতে লরি ড্রাইভারের পাশে বসে দেখবে অন্ধকারের দ্রুতগামী সৌন্দর্য। অফিসের চাকরি সে সহ্য করতে পারত না। একটা নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি তখন অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ছিটকিনি, দরজার নব, নানা রকম অ্যাঙ্গেল আর গৃহস্থালীর জিনিস তৈরি করছিল। তাদের রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে আবার বিহার-উড়িষ্যা ঘুরে বেড়াতে লাগল মনোরম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না, ট্রেন খুব জোরে চললে বা আচমকা ঝাঁকুনি লাগলে সে ঘুম ভেঙে আতঙ্কে উঠে বসত, অনেকক্ষণ বুক কাঁপত তার, ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকত। তখন চাকরি ছেড়ে সেই কোম্পানিরই এজেন্সি নিল সে।

দেখা হয়েছিল শিমুলতলায়। পুজোর ছুটিতে। প্রবাসে বেড়াতে গেলে বাঙালিদের ভাব হয়। তেমনই হয়েছিল। সীতা তার আগে কখনও প্রেমে পড়েনি। সদ্য-যুবতী, তখনও কৈশোরের গন্ধ গায়ে, তখনও শরীরে সেই আশ্চর্য স্বেদগন্ধ। ফুলের পাপড়ি ঝরে গিয়ে সদ্য ফলের গুটি ধরেছে। মনোরম পিছনে বনভূমি রেখে ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছিল, একটু আনমনা, রুগ্‌ণ সুন্দর চিকন মুখশ্রী, বালকের মতো স্বভাব। তারা একসঙ্গে সকলের সাথে বনভোজন করতে গিয়েছিল। ইচ্ছে করে দলছুট হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তারা। বিহারের তীব্র শীত সবে দেখা দিচ্ছে। একটা তিরতিরে নদী বয়ে যাচ্ছিল, স্বচ্ছ জল, জলে তাদের ছায়া। ছায়ায় ঝুঁকে মনোরম ইংরিজিতে বলেছিল, মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েড...কী চমৎকার টনটনে উচ্চারণ সেই ইংরিজির! নিস্তব্ধপ্রায় সেই শাল জঙ্গলের ভিতরে বয়ে-যাওয়া নদীর শব্দের সঙ্গে কবিতার শব্দগুলিকে কী করে যে মিলিয়ে দিয়েছিল মনোরম! সামনেই পাহাড় ছিল, ওপরে নীল আকাশ, পাখিও কি ছিল না, আর প্রজাপতি! কী সব যে ছিল সেখানে কে জানে! ছিল বোধ হয় কবিতার সেই ঘণ্টাধ্বনিও তাদের মনে, আর ছিল শরীরের সুন্দর গন্ধ ও রোমহর্ষ, ছিল জলে ভেঙে-যাওয়া তাদের ছায়া। এ-সবই থাকে। থাকে না কি! নদীর জলে একটা পাথর ছুড়ে মনোরম বলল, তুমিও ছুড়ে দাও, ওইখানে। সীতা ছুড়েছিল। কী হয়েছিল তাতে? কিন্তু মনোরম হেসেছিল, সীতাও। বহু দূর থেকে বনভোজনের দলছুট মানুষজনের গলার স্বর আসছিল। পোড়া

পাতার গন্ধ। তবু নিস্তব্ধতাই ছিল। তাদের কথা বলে যাচ্ছিল সেই কুলুকুলুধ্বনিময় স্বচ্ছ জলের নদী, গাছের পাতায় বাতাস, পাখির স্বর।

ভালবাসা কি না কে জানে! তবে তারা কেউ কাউকে ছোঁয়নি, জাপটে ধরেনি, ওই নির্জনতা সত্ত্বেও। মনোরম শুধু বলেছিল, আমি এতদিন স্বপ্নের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতাম।

সে কেমন? সীতা তার তখনও না যাওয়া কৈশোরের কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করেছিল।

ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রেমের শখ। এত বেশি শখ যে, ছেলেবেলা থেকেই আমি কাল্পনিক মেয়েদের সঙ্গে একা একা কথা বলি। সেই সব মেয়েদের একজন ছিল রিনা। কিন্তু রিনা ঠিক কাল্পনিক ছিল না। আমার আট-দশ বছর বয়সে আমি সত্যিই এক রিনাকে দেখেছিলাম। তারও বয়স ছিল আমার মতোই। পরিচয় ছিল না, কখনও কথা হয়নি, একবারের বেশি দেখা হয়নি, তার মুখ এখন আর আমার মনেও নেই। শুধু মনে আছে, এক বিয়েবাড়ির সিঁড়ির রেলিংয়ে ঝুঁকে সে বর-বউয়ের কড়িখেলা দেখছিল। পরনে লাল ফ্রক, মুখখানা ঘিরে ফ্রিলের মতো চিনেছাঁটের চুল। বয়স্কা এক মহিলার গলা তলার হলঘর থেকে তার নাম ধরে ডেকে বলেছিল, রিনা নীচে আয় না, অত লজ্জা কীসের! রিনা তার সুন্দর ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচের ভিড়ের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। এতদিন আগেকার সে ঘটনা, আর আমিও এত ছোট ছিলাম যে, সেই স্মৃতি একটু সুগন্ধের মতো মাত্র অবশিষ্ট আছে। কখনও মনে হয় সে ঘটনা ঘটেইনি, আমার মাথা তা কল্পনা করে নিয়েছে, অথবা আমি কখনও স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওই উৎসবের বাড়ি আর ওই মেয়ের কথা আমি অনেক ভেবেছি, কখনও সত্য কখনও কাল্পনিক মনে হয়েছে। তবে সেই নামটা কী করে মনে রয়ে গেছে, মনে রয়ে গেছে যে মেয়েটি বড় সুন্দর ছিল, যার সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু তাতে আমার কোনও অসুবিধা হয় না। আমার মনে যে সব অচেনা মুখ ভেসে যায়, তাদের কাউকে কাউকে রিনা বলে মনে হয়। ওই নামে ডাকি, সাড়া পাই, ভালবাসা জেগে ওঠে, বিশ্বাস হয় কি?

না।

তবে তোমাকে বলি, আমার মেম-বউয়ের কথা?

বউ? বলে ভীষণ উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে থেকেছিল সীতা।

না না, আসলে সে কেউ না। আমাদের আলমারিতে ছিল পাথরের তৈরি এক মেমসাহেব পুতুল। তার গোলাপি গা, গোলাপি গাউন, হাঁটু পর্যন্ত সেই গাউনের ঝুল, চোখের তারা নীল। ছেলেবেলায় ঠাকুমা সেই পুতুলটা দেখিয়ে বলত, তোর বউ। আশ্চর্যের কথা, এখনও মাঝে মাঝে যখন কখনও আমার কাল্পনিক বউয়ের কথা ভাবি, তখন ঠিক সেই গোলাপি গা, সোনালি ফ্রক, নীল চোখ, মধুরঙের চুলওলা পুতুলটাই চোখে ভেসে ওঠে। হায়, তার বাস্তবতা নেই, তবু সে আমার মনের মধ্যে চলা ফেরা করে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আমার কাল্পনিক সন্তানের চুল আঁচড়ে দেয়, দিনশেষে জানালার ধারে বসে আমার অপেক্ষায় চেয়ে থাকে।

এখনও? আজও?

মিটমিট করে হেসে মনোরম বলেছিল, ছেলেবেলায় আমি খুব অদ্ভুত ছিলাম। দরজা, জানালা, দেয়ালের সঙ্গে কথা বলতাম। কত সব কথা! মানুষের সঙ্গেই আমার কথা হত কম। কিন্তু কথা হত কল্পনার মানুষদের সাথে। রোজ যাদের দেখতাম, তাদেরই কাউকে কাউকে মনে মনে কুড়িয়ে আনতাম, কল্পনায় খেলব বলে। আমাদের মফস্সল শহরের স্টেশনে একটা নির্জন সুন্দর ওভারব্রিজ আছে। সাধারণত লোকে হেঁটেই লাইন পার হয়, ওভারব্রিজ বড় একটা ব্যবহার করে না। আমাদের ওভারব্রিজটা তাই জনশূন্য পড়ে থাকত। আমি সন্ধেবেলায় ওখানে দাঁড়িয়ে প্রায়ই দূরের দিকে চেয়ে থাকতাম। আমি যে-স্বপ্নের জগতে বাস করতাম, সেখানে বাস করতে গেলে, চেনা লোক, বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ লোকজন এক বিষম বাধা। তাতে স্বপ্নের সুতো বারবার ছিঁড়ে যায়। আমারও তাই তেমন কেউ ছিল না, তাই আমারও অধিকাংশ বিকেল কাটত নিঃসঙ্গভাবে ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দূরের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে। কল্পনার ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যেত। সেদিন সন্ধে সাতটার শেষ ট্রেন আমাদের ছোট স্টেশন ছেড়ে গেছে। ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম শূন্য প্ল্যাটফর্মে কিছু ছড়ানো মালপত্রের মাঝখানে একটি তোরঙ্গের ওপর মেয়েটি বসে আছে। উদ্বিগ্ন তার মুখ চোখ। কাছাকাছি

সময়ে আর ট্রেন নেই, পরের গাড়ি ভোরবেলায়। মেয়েটি যে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে কে জানে? আমি মাত্র এইটুকু দেখেছিলাম। আর মনে হয়েছিল মেয়েটি যেন আমার আবছাভাবে চেনা। এর বেশি আর বাস্তবে কিছু ঘটেনি, ঘটেছিল বোধহয় কল্পনায়।

মনোরমের আবার সেই হাসি, শব্দহীন, অর্থময়।

বলুন না! বলে শরীরের সুগন্ধ নিয়ে কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছিল সীতা। উন্মুখ পানপাত্রের মতো।

তারপর তাকে আবার দেখি আমাদের ফুলবাগানে, শীতকালের ভোরবেলায়। পাড়ার বাচ্চা মেয়েরা রোজ সকালে আমাদের বাগান থেকে ফুল চুরি করে নিয়ে যায়। একদিন রাতে ঘুম হয়নি, সারারাত ভয়ংকর সব কল্পনার ছবি দেখেছি। সকালে তেষ্টা পেল আর খোলা বাতাসের জন্য আকুল ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে এলাম। বাগান তখন ঘন কুয়াশায় ঝিম মেরে আছে। আমি দেখলাম, বাগানের ফটকের কাছে একটি মেয়ে ভিখিরির মতো দাঁড়িয়ে। ও কি ফুলচোর? আমি সাড়া দিইনি, চেয়েছিলাম। সেও একদৃষ্টে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু হাসল। আমি ভয়ংকর চমকে উঠে চিনলাম, এ সেই মেয়ে যাকে আমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখেছিলাম এবং আরও আগে কবে থেকে যেন চেনা ছিল। সে হেসে এগিয়ে আসতে থাকে ফটক পার হয়ে। আমি হিম হয়ে দাঁড়িয়ে, তার পরনে নীল শাড়ি, গলায় কাশ্মীরি স্কার্ফ জড়ানো, ঠিক যে-রকম স্কার্ফ আমার মায়ের একটা আছে, নীল শাড়িটাও যেন চেনা। সে লাল সুরকির পথ দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসে মিহি গলায় জিগ্যেস করল—এ বাসায় তুমি থাকো? আমি মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ। সে হাসল—তোমাকে সেদিন দেখেছিলুম স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়েছিলে। বিড়বিড় করে কী বকো তুমি বলো তো? তোমার ঠোঁট নড়ছিল। আমি হেসে মাথা নেড়ে বললাম—কী জানি, হবে হয়তো। সে এবার কাছে এগিয়ে আসে, খুব কাছে। বলে, আমি সেই ছেলেবেলায় কবে তোমাকে দেখেছিলাম, আর এখন তুমি কত বড় হয়ে গেছ। তুমি কেমন মানুষ হয়েছ তা তো জানি না! কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি খুব সৎ আর তোমার মনে খুব মায়া। আমি হাসলাম—কী জানি! জানি না। সে বাগানের দিকে একবার ফিরে দেখে নিল, বলল, সৎ লোকেরা কখনও সুখী হয় না। তুমিও দুঃখী বোধ হয়। আর দেখছি তুমি তেমন সবল হওনি, দৃঢ়চেতা হওনি, তাই না? আমি মাথা নাড়ি—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে সুন্দর সকালের রোদের মতোই ফুটফুটে হাসি হাসল—ছেলেবেলার কবেকার এই পুরনো ভুলে-যাওয়া মফস্‌সল শহরে এতদিন পর আমি আবার কেন এসেছি জান? তোমার জন্যই। বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—আসব তোমার কাছে, মাঝে মাঝে আসব। শুধু এই খুব অসময়ে দেখা হবে, যখন মানুষ ঘুমোয় কিংবা কেউ থাকে না কোথাও। অসময়ে—মনে রেখো। বলতে বলতে সে পিছন ফিরল। আমাদের বাগানে গাছপালা ঘন, সারাদিন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে থাকে। সে এইসব গাছগাছালির মায়াময় ছায়াচ্ছন্নতার ভিতরে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না। আমি আবার ভোরবেলায় উঠলাম পরদিন। আমাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন বাগানে কেউ ছিল না। আমি সুরকির পথ ধরে বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ঝুম কুয়াশায় খুব ভোর-আলোর ভিতরে যতদূর চোখ যায় চেয়ে দেখলাম, সব শূন্য। সে নেই। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, এ ভুল। আমি আগের দিন ভোরে বাস্তবিক কাউকেই দেখিনি। সে আমার কল্পনা। ফিকে বিষাদে আমার মন ছেয়ে গেল। তবে আমার একটা সুবিধে এই যে আমার কিছু হারায় না। আমি কল্পনায় সব পেয়ে যাই। সেখানে সেও রয়ে গেল চিরদিনের মতো। ভাবতে ভাবতে আমি ভোর, শীতল, প্রায়ান্ধকার জনশূন্য রাস্তায় রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। স্বপ্নের সেই মেয়েটি আমাকে কথা দিয়েও ভুলে গেছে বলে কোনও ক্ষোভ রইল না।—ইচ্ছে থাকলেও আমি রোজ রাতে একই স্বপ্ন দেখতে পারি কি? তবে দুঃখ কীসের? ফিরে এসে দেখি ফটকের কাছে আমার ছোট বোন মাধবীলতার আর্চের কাছে দাঁড়িয়ে, মা বারান্দায়। শুধু আমি সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি, আমার বোনের পরনে চেনা নীল শাড়ি, আর মায়ের গলায় সেই কাশ্মীরি স্কার্ফ জড়ানো।

এ তো স্বপ্ন!

স্বপ্ন না থাকলে এই অতি সুকঠিন, বিবর্ণ বাস্তবতা নিয়ে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব? একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি, আমার মশারির এক ধার তুলে সে আমার দিকে ঝুঁকে চেয়ে আছে। আমার চেতনা জুড়ে তীব্র ভয় লাফিয়ে উঠল। বল-এর মতো লাফাতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ড! সে মৃদু হাসল—তুমি খুব দুর্বল? কেন? আমি জবাব দিলাম না। সেদিন তার পোশাক ছিল গোলাপি, তাতে

জরির কাজ। সে স্নেহের একটি হাত আমার বুকের ওপর ফেলে রেখে ধীরে ধীরে বসল। আমি দেখলাম, সে সালোয়ার আর কামিজ পরে আছে। আমার স্মৃতি তার টানে আমাকে একবার অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে কী যেন দেখে নিতে বলল। আমি কিছুই মনে করতে পারলাম না। সে আবার মৃদু হেসে বলল, ছেলেবেলা থেকেই তুমি দুর্বল। তোমার মাথায় স্বপ্নের বাসা, তোমার মনে একরত্তি বাস্তবতা নেই। বলতে বলতে সে আরও ঝুঁকে পড়ে সামান্য তীব্রস্বরে বলল, আমাকে মনে পড়ে না তোমার? একদিন আমরা বনভোজনে গিয়েছিলাম ছেলেমেয়েরা। দলছাড়া হয়ে তুমি আর আমি পালালাম নদীর ধারে! তুমি ছিলে ভিতু, আমি সব সময়ে তোমাকে সাহস দিতাম। সেই নদীর ধারে আমি তোমাকে কবিতা শুনিয়েছিলাম। তুমি ছিলে বোকা, আসলে কবিতার ভিতর দিয়েই আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম যে, আমি তোমাকে...। তুমি ভয়ংকর অস্বস্তি আর অস্থিরতায় তার মানে বুঝবার চেষ্টা করোনি। তুমি বলেছিলে, পায়ে পড়ি ফিরে চলো। মনে পড়ে? আমি বললাম—না। মনে পড়ে না! আবার সেই হাসি হাসল সে—দ্বিধামুক্ত, কোমল কিন্তু জীবনশক্তিতে ভরা। বলল, তুমি সব পেয়েও পেতে চাও না, কেবল পালাতে চাও স্বপ্নের ভিতরে। তাই আমাকে অনেক রাস্তা পার হতে হল। তার গলার স্বরে এবার আস্তে আস্তে আমার সামান্য সাহস ফিরে আসে। বললাম—কোথা থেকে এলে তুমি অত বাক্সবোঝা নিয়ে? রেল গাড়িতেই তুমি কি এসেছ? অনেক দূরে থাকো কি তুমি? না, ছেলেবেলার তোমাকে আমার মনে নেই। তুমি কি রিনা? কিংবা আর কেউ, যাকে আমার মনে নেই? সে আমার মাথার ঝুঁটি নেড়ে দিল, বলল, তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। হায়! আমাকে তোমার মনে পড়ল না? অথচ কতদূর থেকে আমি এলুম শুধু তোমার জন্যই। কথা বোলো না, আমার হাত ধরে চুপ করে শুয়ে থাকো। শোনো, আমি তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ির একটা গোপন কুঠুরির তালা খুলে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেই ঘরে ছিল কাঠের একটা পুরনো সিন্দুক। তার ভেতরে ছিল অনেক কাগজপত্র, রহস্যময় অনেক পুরনো দলিল, অনেক চিঠি। তুমি আর আমি আমাদের নিষেধের ছেলেবেলায় এক দুপুরে বসে অনেক চিঠি পড়েছিলুম একসঙ্গে। সেইসব চিঠি ছিল আমার মা আর বাবার মধ্যে লেখা প্রেমপত্র। না ভুল বললাম, শুধু প্রেমপত্র নয়, সেগুলো বিয়ের পরে লেখা। কিছু সাংসারিক কথাও তার মধ্যে ছিল। পড়তে পড়তে, হাসতে হাসতে আমরা এক সময়ে দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলুম। সেই কাঠের সিন্দুকের ওপর অনেক পুরনো কাগজের গন্ধের মধ্যে। মনে পড়ে? তোমার মনে নেই, কেননা সে-সবই অতি তুচ্ছ ঘটনা, খুব সামান্য, তাদের যত্ন করে আমিই মনে রেখেছি এতদিন। হায়! সে-সব তুচ্ছ ঘটনা ছাড়া আমার আর কিছু নেই। তোমাকে সেইসব ফিরিয়ে দিতে এসেছি। দিয়ে গেলুম। আমি তার হাত মুঠো করে ধরে রইলুম। সে অন্ধকার ঘরের চার দিকে চাইল। বলল, এই ঘরে আর কে থাকে? ওই বিছানায় তোমার বুড়ি ঠাকুমা আর ছোট ভাই বোন, না? আর পাশের ঘরে তোমার মা বাবা, তাই না? আর এই ছোট্ট বিছানায় তুমি! সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—সুন্দর সংসার তোমাদের। শান্ত পরিপাটি ভাল মানুষদের পরিবার। তোমাদের ঘরের আনাচে কানাচে সুন্দর সব স্বপ্নেরা ঘুরে বেড়ায়, প্রজাপতির মতো ওড়ে কল্পনা। এ রকম পরিবারই আমি ভালবাসি। এতদিন হয়ে গেছে, এখন আর বলাই যায় না যে, আমি তোমাকে...। সে থেমে শুধু আমার দিকে চেয়ে রইল। ঘরে কোথাও আলো ছিল না, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। কামিজের কলারে জরি তার ঘাড়ের সুন্দর রঙের ওপর জ্বলছে। তার মেরুন ঠোঁট থেকে শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে যাচ্ছে ঘরের বাতাস। তার নরম হাত ক্রমশ গলে যাচ্ছে আমার হাতের মৃদু উত্তাপে। সে অনেকক্ষণ ওইভাবে বসে রইল। আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর সে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে মৃদু গলায় বলল, ঘুমোও। যতক্ষণ ঘুমিয়ে না পড়ো ততক্ষণ বসে থাকব। তৎক্ষণাৎ আমি বললাম—তা হলে ঘুমোব না। এসো, দু'জনে জেগে থাকি। সে তার দু'টো আঙুল আমার চোখের ওপর রাখল, সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর জুড়ে নেমে এল সম্মোহন, ঘুমের এক ঢল।

নিথর হয়ে গল্পটা শুনেছিল সীতা। প্রায় কিশোরী-বয়সি সে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল, সেই বনভোজনে কী কবিতা সে শুনিয়েছিল?

মনোরম তৃপ্তির হাসি হেসে একটা নুড়ি ছুড়ে দিল জলে. বলল, মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েড...।

সীতা মুখ নিচু করে ছিল তারপর। নদীটা তট অতিক্রম করে তার বুকে উঠে এল। তারপর বুক জুড়ে বয়ে যেতে লাগল। তখন দূরে দু'-একটা কণ্ঠস্বর তাদের নাম ধরে ডাকছিল। তারা কেউ উত্তর দিল না। শুনতে পেল না।

সীতা মৃদুস্বরে বলল, এ-সবই গল্প।

গল্পই! তোমাকে বলি, চপলা ছাড়া কোনও অনাত্মীয়া মেয়ের গা আমি কখনও ছুঁইনি, ছোঁয়ার মতো করে। অনাত্মীয়াই বা বলি কী করে। চপলা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়াই ছিল। আমরা দেশের বাড়িতে যখন যেতাম, তখন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের একটা বেশ বড় দঙ্গল এক ঢালাও বিছানায় শুতাম। তখন প্রায়ই চপলা আমার মাথার বালিশে ভাগ বসাত। আমার অসতর্ক ঠোটে চুমু খেত, ভয়ে আমি কাঠ হয়ে থাকতাম। সঞ্জীবচন্দ্রের একটা উপন্যাসে ছেলেবেলায় আমি একটা প্রেমের ঘটনা পড়ি। নায়িকা তেলের প্রদীপ হাতে রাত্রিবেলায় নায়ককে দেয়ালের ছবি দেখাচ্ছে ঘুরে ঘুরে। ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ নায়ক মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সদগন্ধ। শুনে প্রদীপ ফেলে নায়িকা ছুটে পালিয়ে গেল। ওই কথা দীর্ঘকাল ধরে গুনগুন করে ওঠার মতো আমার মনে রয়ে গেছে, তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সদগন্ধ। চপলার শরীরের গন্ধ মনে নেই। বোধহয় সে ঘামের, তেলের, কচি ঠোঁটের মিলিত গন্ধ—কিশোরী বা বালিকার গায়ে বোধহয় ওই-রকম গন্ধ থাকে। তবু এখনও যখন গভীর রাতে কল্পনায় চপলা চুপি চুপি মশারি সরিয়ে সেই ছেলেবেলার দেশের রাত্রির মতো কাছে আসে, তখন এখনও আমি ফিসফিস করে বলে উঠি—তোমার গায়ে কী আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ! চপলা প্রদীপ ফেলে পালায়।

এটুকু বলে মনোরম প্রতীক্ষায় চেয়েছিল।

কী বলবে সীতা? তবে সে ইঙ্গিত বুঝেছিল। অবশেষে বলল, সে-সব তো স্বপ্নে!

স্বপ্নই। কিন্তু আর তো কখনও তাদের স্বপ্ন দেখব না।

কেন?

মনোরম তীব্র হাতে আবার নুড়ি ছুড়ে মারল জলে, বলল, সে-সব রেখে গেলাম ওইখানে। নদীতে। চপলা, রিনা, আর সব...

তবে কী থাকল?

তুমি বলো তো?

...

আমি কি আর কখনও সেই আশ্চর্য গন্ধ পাব? পাব না বোধহয়, না?

কৃত্রিম দুঃখে ভরা গলায় বলেছিল মনোরম।

কী জানি।

তুমি বলো।

মনোরম স্পর্শ করেছিল তাকে, কী সাহস! অনেকক্ষণ বুক ভরে টেনেছিল বাতাস, নতুন ফোটা ফুলের গন্ধ যেমন নেয় লোকে ঠিক তেমনি। সীতার সুন্দর গন্ধ নিয়েছিল মনোরম। বলেছিল, আমি আর স্বপ্ন চাই না।

প্রবাসে, বিদেশে ছুটিতে যায় যুবক-যুবতীরা। কাছাকাছি হয়, একটু রং ছোড়াছুড়ি করে। কলকাতায় পা দিয়ে সব ভুলে যায়। বাইরে থেকে ঘরে এসে যেমন বাইরের ধুলো হাত-পা থেকে ধুয়ে ফেলে লোক তেমনি ধুয়ে ফেলে সব স্মৃতি। কিন্তু সীতা ভোলেনি। কলকাতায় ফিরেও।

সীতার দেওয়া টেলিফোন নম্বরটা হারিয়ে ফেলেনি মনোরমও। টেলিফোন করেছিল।

আজ বহুকাল বাদে বৃষ্টিতে-ধোয়া ময়দান পেরিয়ে, ব্রিজ পেরিয়ে, ঢালু বেয়ে যখন নেমে যাচ্ছে ট্রামগাড়ি, তখন সীতা স্পষ্ট সেই বহুকালের পুরনো টেলিফোনটা কানে তুলে শুনছিল কাঁপা কাঁপা একটা ভিতু গলা, আমি মনোরম। তুমি কি সীতা?

গায়ে কাঁটা দেয়। এখনও।

কলকাতায় তো সেই বনভূমি নেই, স্বচ্ছ জলের নদীটিও নেই। তবু মানুষ ইচ্ছে করলে মনে মনে সেই বনভূমি আর সেই নদী সৃষ্টি করে নিতে পারে। তারা নিয়েছিল।

ভালবাসা? হবেও বা। তখন মনোরম বড় ছন্নছাড়া, চাকরি ছেড়ে এজেন্সি নেওয়ার কথা মাঝে মাঝে বলে। সীতার বাবা ব্যাপারটা আন্দাজ করে বলল, ও ছেলে এখনও লাইন পাচ্ছে না, ওর কি কোনও কেরিয়ার তৈরি হচ্ছে?

তবু বিয়ে হয়েছিল। যে-সব ছেলেরা নিজেরা যেচে মেয়েদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে, তাদের কেমন যেন পছন্দ হয় না সীতার। মনোরমও করেনি। সীতা করেছিল প্রস্তাব।

তারা সুখী হয়েছিল কি না তা ঠিক বুঝতে বা ভাবতে চেষ্টা করেনি সীতা। সে শুধু ধীরে ধীরে কদমছাঁট চুলওলা মাথাটাকে ক্রমে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে রাখতে শিখেছিল। ভালবাসা কি ওই-রকমই কিছু? আর একজনের ইচ্ছাকে নিজেরও ইচ্ছা করে নেওয়া? নাকি আরও বড় বিশাল কিছু?

সীতা ভেবে পায় না। আজও বড় মনে পড়ে, দু'ঘরের মাঝখানে নীল পরদাটা উড়ছে ঝোড়ো হাওয়ায়, দু'ঘর উদ্ভাসিত আলো। এ-ঘরে চা ছাঁকছে সীতা, ও-ঘরে ক্লান্ত মনোরম বসে আছে। অপেক্ষায়। কেবলই এই দৃশ্যটা মনে পড়ে। ঘরের আনাচে কানাচে সুখ তার অঙ্কুরের ডানা মেলেছিল কিনা কে জানে। তবু দৃশ্যটা বোধহয় আজ সুখী করে সীতাকে। দুঃখীও করে।

ট্রামগাড়ি অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে চলে। রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন। শেষ বেলার রোদ উঠেছে। খোলা জানালা দিয়ে উদাসীন চেয়েছিল সীতা। পাশে বসা পুরুষ কিংবা মানুষের লোভী চোখের আক্রমণ আর টের পাচ্ছিল না সীতা।

একটা মেঘের স্তরের ভেতর সূর্য ডুবে গেল। সীতা বাড়ির রাস্তায় এসে পড়ল যখন, তখন হালকা অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছে। একটু অন্যমনে হাঁটছিল, বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়ানো অপেক্ষারত মানুষটিকে সে প্রথমে লক্ষ করেনি। কাছাকাছি হতেই লোকটা তীব্র শ্বাসের শব্দ করে ডাকল, সীতা।

চমকে উঠে তাকিয়ে সে মজবুত কাঠামোর প্রকাণ্ড শরীরওলা মানসকে দেখতে পেল। মানস লাহিড়ি।

এক পা এগিয়ে এসে মানস বলে, এখন বাড়িতে ঢুকো না।

কেন?

তা হলে আর বেরোতে পারবে না, আবার পারমিশান-ফারমিশান নিতে হবে। তার দরকার কী? চলো কেটে পড়ি, ঘুরে-টুরে একেবারে ফিরবে।

সেই জন্যই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়?

সেই জন্যই। তোমাকে মাঝপথে ধরব বলে। চলো জিনিসগুলো আমাকে দাও—নিচ্ছি। কোথায় গিয়েছিলে?

মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়ি। এমনি ঘুরে এলাম একটু।

ট্যাক্সি নেব?

সীতা হাসল। বলল, ট্যাক্সি কেন? অনেক দূরের প্রোগ্রাম।

না, না। কোনও প্রোগ্রাম নেই। যেখানে খুশি একটু যাব। কত কথা জমে আছে।

দু'জনে আবার বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি।

খড়্গপুরে গিয়েছিলাম কদিনের জন্য। মানস বলে।

জানি তো! সীতা হাসল।

জানো তো বটেই। কিন্তু এ ক'দিন তোমাকে না দেখে কীরকম কেটেছিল খড়্গপুরে তা তো বলিনি!

সীতা মাথা নিচু করল একটু। কথা বলল না।

আমার শরীরে কোনও রোগ নেই, তবু এ ক'দিন আমার শরীর জ্বরজ্বর করেছে। মাথা ধরেছে। ইন্টার রেল ওয়েটলিফটিং-এ আমি ছিলাম একজন জাজ, কিন্তু জাজমেন্টও দিয়েছি আবোলতাবোল। কিছু ভাল করে লক্ষই করিনি। ভাবছি কী করে পাতিয়ালায় যাব। এই-রকম তোমাকে ছেড়ে।

সীতা তেমনি মুখ নিচু করে থাকে।
শুনছ?
হুঁ।
কিছু বলো।
কী বলব?
কীভাবে যাব পাতিয়ালায়? ওখানে কোচদের ট্রেনিং তো অনেক সময় নেবে আরও। খড়্গপুরে মাত্র ক'দিনেই যা অবস্থা হয়েছিল...!
সীতা একটা শ্বাস ফেলল। কিছু বলল না।
কিছু বলো।
সীতা একটু সংকোচ বোধ করছিল। তবু বলল, এক বছর হতে আরও তিন মাস বাকি আছে। তারপর তো...
ঝকঝক করে ওঠে মানসের চোখ, সীতার দিকে ঝুঁকে বলে, তারপর কী?
সীতা সুন্দর দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়াল।
মানস মুখটা সরিয়ে নিয়ে বলে, ও-সব কে আর মানছে? তিন মাস আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।
তাই কি হয়?
কেন হয় না?
তিনটে মাস চলে যাবে দেখতে দেখতে।
তিনটে মাস কিছু কম সময় নয় সীতা। আমরা ইচ্ছে করলে এই তিনটে মাস গেইন করতে পারি।
ও যদি বাধা দেয়?
কে?
ও। বলে মাথা নোয়ায় সীতা।
মনোরম?
হুঁ।
মনোরম! মনোরম কেন বাধা দেবে?
যদি দেয়?
কেন দেবে? ওর কোনও ইন্টারেস্ট তো আর নেই।
নেই? ঠিক জানেন?
মানস শব্দ করে হাসে।
নেই আমি জানি। তা ছাড়া মনোরম এখন ধ্বংসস্তূপ। জাস্ট এ হিপ অফ ডেব্রিস। বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ওর আর নেই।
সীতা চুপ করে থাকে।
আজকাল রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ায়।
থাকগে। আমি শুনতে চাই না। সীতা বলে।
থাক। আমিও ঠিক বলতে চাইনি। তবে এক সময়ে ও আমার বন্ধু ছিল। আই ফিল ফর হিম।
সহজেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। বড় রাস্তার মোড়েই সওয়ারি নামাচ্ছিল ট্যাক্সিটা। মানস 'চলো' বলে দৌড়ে গিয়ে ধরল। ড্রাইভার 'কোথায় যাবেন?' এবং তারপর, 'গাড়ি খারাপ আছে দাদা' বলে এড়াতে চেয়েছিল। মানস কোনও কথাই গ্রাহ্য করল না। শান্ত হাতে দরজা খুলে সীতাকে আগে উঠতে দিল, তারপর নিজে উঠল। দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারকে বলল, গোলমাল কোরো না, যেদিকে বলছি সেদিকে যাবে, নইলে...ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে এক পলক দেখে নিল মানসকে, তারপর স্টার্ট দিল।
সীতা জানে, এ অবস্থায় মনোরম হলে ট্যাক্সিওয়ালাই জিতে যেত। মনোরম কিছুতেই এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ট্যাক্সি ধরতে পারত না।
মানস একটু ঘন হয়ে বসল। ট্রামে সেই মুশকো লোকটার মতোই অবিকল। তবে সীতা এবার সরে গেল না। মানসের একটু ভাঙা চৌকো মুখ, মাথায় পাতলা চুল, চমৎকার দু'খানা হরিণ চোখে এক

ধরনের মারাত্মক সৌন্দর্য আছে। ওর শরীরটা যেমন কর্কশ আর প্রকাণ্ড আর জোরালো, চোখ দু'খানা তেমনই মায়াবী। কাজলের মতো টানা একটা রেখা আছে ওর চোখে, জন্মগত। কথা যখন বলে তখন বড় সুন্দর শোনায় ওর গলা, ঘোষণাকারীদের মতো।

হাত বাড়িয়ে নরম জোরালো পাঞ্জায় সীতার হাত ধরল মানস। সীতা কোনও সংকোচ বোধ করে না। কেবল একটা অস্বস্তি তার হয়। সেটা হাস্যকর অস্বস্তি। মনোরম খুব সিগারেট খেত। তাই যখনই মনোরমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হত সীতা, তখনই সিগারেটের গন্ধ পেত। সিগারেটের জন্য সে কম বকেনি মনোরমকে। কিন্তু গন্ধটা তার বুকে, শিরায়, সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। যেন পুরুষের গায়ে ওই গন্ধ থাকবেই। ওটাই বুঝি পুরুষের গন্ধ। মানস সিগারেট খায় না। ট্যাক্সিতে এত কাছাকাছি বসেও সীতা তাই পুরুষের সেই অমোঘ গন্ধটি পাচ্ছিল না। একটা কেমন অস্বস্তি হয় তার। পুরুষের সেই অমোঘ গন্ধটির জন্য সে উন্মুখ হয় বুঝি মনে মনে।

ব্যাপারটা কিছু নয়। সকলকেই যে এক রকমের হতে হবে তার কী মানে আছে! সীতার হাতখানা নিয়ে আঙুল আঙুলে আশ্লেষে খেলা করল মানস। সীতা বাধা দিল না। একজনের সঙ্গে বউ হয়ে থাকার অভ্যাস ছেড়ে আর-এক জনের বউ হওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা সহজ নয়। এই নতুন অভ্যাসকে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সীতা।

কোথায় যাচ্ছি আমরা?

আগে কিছু খাই। বড্ড খিদে।

জানি। খুব খিদে পায় আপনার।

মানস হাসল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলল, ঠিক ধরেছ। আমার শরীরটা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি আমার প্রকাণ্ড খিদে! সব রকম খিদে।

অর্থপূর্ণ হাসছিল মানস। সীতার খাটো ব্লাউজের তলায় পেট পিঠ খোলা। মানসের হাত সীতার করতল ছেড়ে উঠে এল কোমরে। নরম আঙুলে সে সীতার শরীরের মাংসে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। মানস এতকাল এ-সব করেনি। এখন বোধহয় ওর ধৈর্য ভেঙে যাচ্ছে। মুখের সামনে মাংস, তবু খাবে না, এ কী রকম! সীতা একটু হাসে। তার অনিচ্ছা হয় না। আর-একটু ঘন হয়ে বসে মানসের শরীরের সঙ্গে। পেটের কাছে মানসের হাতটা চেপে ধরে রাখে এক হাতে। তার অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। সে অভ্যাস করে নেবে। এই বড় চেহারার শক্ত মানুষটির কাছাকাছি বসে সে নির্ভরতা পাচ্ছিল।

মানস ফিসফিস করে বলল, আমাকে 'তুমি' করে বলো।

বলব।

এখনই।

তুমি।

ব্যস, হয়ে গেল। বলে হাসল মানস।

সীতা কিছু বুঝতে পারেনি, আচমকা খোঁপার নীচে তার ঘাড়টা চেপে ধরে মানস। অন্য হাতে থুতনি ধরে একপলকে মুখটা ফিরিয়ে নেয় তার দিকে। চুমু খায়। ছোট্ট চুমু, কয়েক সেকেন্ডের।

সীতা ছাড়া পেয়ে বলল, ট্যাক্সিতে? ওঃ মা!

ও দেখছে না।

সীতা খুব আস্তে বলে, ওর সামনে আয়না রয়েছে।

দেখলেই কী? আস্তে বলে মানস।

কী ভাববে?

কিছু ভাববে না। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের অভ্যাস আছে দেখে।

যাঃ! সীতা হাসল।

এবং মানস আর একবার কাণ্ডটা করল। এবার একটু বেশি সময় নিয়ে। তার মুখের লালাতে ঠোঁট ভিজে গেল সীতার। তবু ভালই লাগল। একটু কাঁটা হয়ে রইল সে, ট্যাক্সিওয়ালাটার জন্য। কিন্তু শরীরে এক ধরনের উত্তাপ ছড়িয়ে গেল। নতুন মানুষটিরই উত্তাপ। সীতা বুঝে যাচ্ছিল, সে পারবে। এ-রকম আত্মবিশ্বাসী, সাহসী, সরল ব্যবহারের মানুষ সে তো আগে দেখেনি। এর অভ্যাসকে নিজের অভ্যাস

করে নেওয়া শক্ত নয়। সীতা জানে ট্যাক্সিওয়ালাটা দেখছে সবই, ভয়ে কিছু বলছে না। নিখুঁত চালিয়ে নিচ্ছে গাড়ি।

বড় রেস্তরাঁয় যাব না, কেমন? মানস বলে, স্বরে গাঢ় ভালবাসা।

যা তোমার খুশি।

বড় রেস্তরাঁয় ভিড় কথা হয় না।

সীতা মৃদু প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে, কথা তো হয়েই গেল।

কী কথা হল।

এই যে, যা করলে, এটাও তো কথাই।

মানস হাসল খুব। একটু অন্ধকার এখন। তাই মানসের হরিণ চোখজোড়া দেখতে পাচ্ছে না সীতা। দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব।

গড়ের ময়দান ছেড়ে চৌরঙ্গিতে পড়তেই রাস্তার আলো অপসৃয়মাণ উজ্জ্বলতা ফেলছিল গাড়ির মধ্যে। এই আলো, সেই আলো, লাল-সবুজ-সাদা। সেইসব আলোতে পলকে পলকে মুখখানা পালটে যায়। মানসের মুখ খুব কাছে। ভাল দেখা যাচ্ছে না। ভালবাসায় স্নেহে ওর মাথায় হাত রাখল সীতা। ওর হরিণ চোখ একবার আলোকে স্পষ্ট, আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সীতা নিবিড় চোখে দেখে।

চুল উঠে যাচ্ছে বুঝি? মানসের মাথার চুল নেড়ে সীতা বলল।

প্রায়। টাক পড়ে যাবে শিগগির। তার আগে টোপর না পরলে...

টোপর? একটু অবাক গলায় সীতা বলে।

নয় কেন?

টোপর পরা মানে তো সামাজিক বিয়ে, তা কি হবে?

হবে না কেন? একটু অস্বস্তির গলায় মানস বলে।

সীতা হাসল একটু, বিষণ্ণ হাসিটি। বলল, তা কি হয়? কুমারী মেয়েরই সম্প্রদান হয়।

মানস হেলে পড়েছিল সীতার গায়ে, উঠে বসল।

না হয় রেজেস্ট্রিই হল। টোপর পরাটা না হয় এ-জন্মে বাদ দিলাম।

সীতা হঠাৎ তার চোখভরা জল টের পেয়ে আঁচল তুলল চোখে, বলল, টোপর পরার শখ থাকলে না হয় আমি সরে যাই...

কী বলে রে মেয়েটা? এঃ মা, কাঁদছ? বলে মানস দু'হাতে তাকে টেনে নেয় এবং তখন মানসের শরীরের মাখনের মতো নরম এবং লোহার মতো শক্ত দু' রকম পেশির অস্তিত্ব টের পায় সীতা।

কাঁদে না, কাঁদে না। টোপরটা তো ঠাট্টার কথা, আজকাল কেউ পরতেই চায় না। মানস আকুল গলায় বলে।

না। তা কেন? বিয়েতে আলো, সানাই, টোপর-সিঁথিমোর, কড়িখেলা এ-সবের একটা আলাদা স্বাদ। অনেকে বিয়ে বলতে এ-সব ভাবে। তুমিও ভাব।

কে বলল?

আমি জানি।

আমার বয়স কত জান?

কত?

একত্রিশ। এ-বয়সে যে রোমাঞ্চ-টোমাঞ্চ সব ঝরে যেতে থাকে। আমি স্বপ্ন দেখি না।

শুভদৃষ্টির কথাও কখনও ভাব না?

ও-সব নিয়ে ভাববার সময় কোথায়?

আর ফুলশয্যা?

তুমি ঠাট্টা করছ।

না গো।

শোনো, আমি বড্ড ব্যস্ত মানুষ। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াই। তিন-চার বার ইউরোপ, ফার ইস্ট

ঘুরেছি। অনেক দেখতে দেখতে আর অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমার ও-সব সংস্কার কেটে গেছে। লক্ষ্মীটি, একদম ভেবো না। আমি সত্যি ঠাট্টা করছিলাম।

আর তখন সীতার ভাল লাগছিল খুব, মস্ত বুকে হেলান দিয়ে বসে থাকতে। সে মনে মনে হিসেব করে দেখল, যদি মানসের একত্রিশ হয়, মনোরমের এখন ছত্রিশ এবং মানস তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। সীতা কলকাতার রাস্তায় একটা বিজ্ঞাপনের হেডিং দেখেছে প্রায়ই—গেট ইওরসেলফ এ ইয়ং হাজব্যান্ড। সে-কথাটা ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ আস্তে বলল, আই অ্যাম গেটিং...

কী?

এ ইয়ংগার হাজব্যান্ড। বলে হাসল সীতা, সম্মোহিতের হাসি।

মানসের সাহসী ও সরল হাত একটু ওপরে উঠেছে তখন। বুকে।

ট্যাক্সিওয়ালা পার্ক স্ট্রিটের ট্র্যাফিক সিগন্যাল পার হয়ে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কোথায় যাবেন?

চৌরঙ্গি মার্কেট। মানস ভেবে রেখেছিল জায়গাটা। চট করে বলল। ভাবল না। এবং যেখানে হাত ছিল সেখানেই রেখে দিল। সরাল না।

বড় অবাক-করা সাহস ওর। সীতা ঠিক এ-রকমই চেয়েছিল।

সুরেন ব্যানার্জি রোডে ট্যাক্সি ছেড়ে ওরা ঢুকল চৌরঙ্গি মার্কেটে। ছোট্ট ছিমছাম একটা রেস্তরাঁ। খদ্দের নেই।

অনেক খাবারের অর্ডার দিল মানস। দইবড়া, চপ, ঘুগনি।

আর কী খাবে?

আরও? চোখ কপালে তোলে সীতা।

খাও না বলেই তুমি রোগা।

সীতা মুখে রুমাল চেপে স্রোতস্বিনীর মতো হাসে—মেয়েরা অত খায় না মশাই।

কারও খাওয়া দেখলে তুমি ঘেন্না পাও না তো? অনেকে পায়।

যাঃ! যে খেতে পারে সে খাবে না কেন? ঘেন্নার কী?

আমার বাসায় তো বড় পরিবার। সেখানে অনেকে আছে যারা আমার খাওয়া দেখতে পারে না।

আমি পারব। ভয় নেই।

সেই তৃপ্তির হাসিটা আবার হাসে মানস। চৌকো থুতনি আর চোয়ালে হাসিটা খুব জোরালো দেখায়। ঝকঝকে সাজানো দাঁত। মুখে খুব সুন্দর একটা সুস্থতার গন্ধ পেয়েছিল সীতা, চুমুর সময়ে। হরিণ চোখ, তাতে দীর্ঘ পাতা। এত জোরালো মুখে চোখ দু'টো বড় বেমানান রকমের মায়াবী। 'বড় পরিবার' কথাটা সীতার মনের মধ্যে নড়ছিল। একটু সময় নিল সে, বলল, বিয়ের পর তোমার পরিবারের কে কী বলবে?

বললেই শুনছে কে? আমি তো গভর্নমেন্টের ফ্ল্যাট পেয়েই গেছি তাবাতলায়। অগাস্টে অ্যালটমেন্ট, তুমি তো জানো।

আলাদা থাকাটাই তো সব নয়। সম্পর্ক তো থাকবেই। আর যাতায়াতও।

সব সম্পর্ক কেটে দিচ্ছি।

কেন?

কেটে না দিয়ে উপায় কী?

সীতা আবার সংশয়ের যন্ত্রণা ভোগ করে বলে, কেন কেটে দিচ্ছ? আমার জন্যই তো।

ঠিক তা নয়। তবে তোমাকে নিয়ে আলাদা থাকতে চাই। একদম আলাদা আর একা।

কেন? প্রশ্ন করেই আবার সীতার ঠোঁট কেঁপে ওঠে। চোখে জল চলে আসতে থাকে। আজকাল তার এ-রকম হয়। ছন্নছাড়া, কারণহীন কান্না পায়। খুব কি বেশি অভিমানী হয়ে গেছে সে?

মানস তার হরিণ চোখ দু'খানা সম্পূর্ণ মেলে চেয়ে থাকে। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা সীতার একখানা হাত চেপে ধরে বলে, ও কী! সীতা!

মুখোমুখি বসে ছিল তারা। মানস উঠে সীতার পাশে এসে বসল, কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, কী হল হঠাৎ?

আমার জন্যই তুমি পরিবার ছাড়ছ তো।
কে বলল?
বলতে হয় না, টের পাওয়া যায়।
কিছু জানো না। আমরা কি সুখী পরিবারে বাস করি? ছোট্ট বাসা, জায়গা নেই, রোজ ঝগড়াঝাঁটি, সে এক বিচ্ছিরি পরিবেশ। আমার মা বাবা নেই, শুধু দুই ভাই, তিন কাকা কাকিমা আর খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে থাকি। পিছুটানও কিছুই না। ও সংসার তো একদিন ছাড়তে হতই। আমি অনেকদিন ধরে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, বিয়ের পরই আলাদা হব; বিশ্বাস করো।
সীতা সামলে গেল। হাসলও একটু। বলল, আমার সব সময়ে কেন যে কান্না পায়!
কেন কান্না পাবে? আমরা খুব সুখী হব, দেখো।
কী করে বুঝলে?
আবেগভরে মানস বলে, আমি তোমাকে সুখী করবই। প্রতিজ্ঞা।
হালকা হাসি হাসছিল সীতা, বলল, গায়ের জোরে?
সে কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথা বলে মানস—- শুধু তোমার নামটা পালটে দেব।
কেন?
ও নামে তোমাকে ডাকতে আমার ভাল লাগে না।
কেন গো?
মনোরম ডাকত।
তাতে কী? মানুষের তো একটাই নাম, সবাই ডাকে।
তাতে মজা নেই। আলাদা নামে ডাকলেই মজা।
নাম নিয়ে তুমি একটা কিছু ভেবেছ নিশ্চয়ই?
ভেবেছি।
কী?
'সীতা' নামটার জন্যই তুমি অত দুঃখী-দুঃখী ভাব করে থাক। যেন চারধারে তোমার অশোকবন, রাক্ষসের পাহারা, যেন নির্বাসনে আছ।
'অশোকবন' কথাটায় একটা বিস্মৃতপ্রায় বনভূমির ছায়া সীতার চোখের ওপর দুলে গেল বুঝি? এক পলকের অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সে বলল, ডেকো! যে-নামে খুশি।
আমি ভেবে রেখেছি।
কী?
মৌ।
সীতা একটু অবাক হয়ে আবার হেসে ফেলে, বেশ এক অক্ষরের নাম তো?
ভাল নয়?
তুমি যে নাম দেবে, তাই ভাল।
না। তোমার পছন্দ হয়নি?
হয়েছে। ডাকলে কেউ ভুল করে শুনবে 'বউ' বলে ডাকছ।
আসলে তো তাই ডাকা। মৌ মানে মধু।
জানি।
বাংলার বধূ, বুকে তার মধু, পড়নি?
জানি। সীতা স্মিতমুখে মুখ তুলে মানসের মুখে চেয়ে থাকে।
নিঃশব্দ পায়ে হঠাৎ বেয়ারা খাবার রেখে যায়।
খাও। মানস গাঢ় চোখে তাকিয়ে বলে।
আর কি খিদে থাকে?
কেন?
থাকে না গো। ভেতরটা আনন্দে ফেটে পড়ছে।

মানস খুব খুশি হয়। ভারী বোকার মতো হাসতেই থাকে। অকপট হাসি। একটু ঘন হয়ে আসে। সীতা ঘুগনির বাটিতে চামচ ডোবায়।

ঝাল। মানস বলল।

ঝালই তো ভাল।

আমি ঝাল খেতে পারি না।

তবে তোমাকে রোজ শুকতুনি রেঁধে দেব।

আমি খাই ফ্যানসুদ্ধু ভাত, লাল আটার রুটি, খোসাসুদ্ধু তরকারি, কাঁচা সবজি।

ভিটামিন?

ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ক্যালোরি। আমার কখনও অসুখ হয় না।

বলতে নেই।

কী?

'অসুখ হয় না' বলতে নেই।

বলব না তা হলে।

সীতা ঘুগনির সুন্দর স্বাদ জিভে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে মানসের দিকে তাকাল । সে সুখী হবে।

আমার শুধু একটা ভয়। সীতা মুখ টিপে বলল।

কীসের ভয়?

আমার একটা অতীত আছে।

তাতে কী?

কোনওদিন যদি ও কিছু করে? যদি পিছু নেয়, যদি প্রতিশোধ নেয়?

ভ্রূ কুঁচকে চেয়েছিল মানস। প্রবল হাতে হঠাৎ সীতার হাতটা চেপে ধরে বলল, তা হলে ও আমার হাতে শেষ হয়ে যাবে।

সীতা ততটা উদ্বেগে নয়, যতটা ঠাট্টার গলায় বলল, ভয় তোমাকেও।

কেন?

যদি কখনও তোমার মনে কিছু হয়?

তক্ষুনি আবেগে মানস প্রায় সীতাকে বুকে টেনে নিতে যাচ্ছিল। রেস্তোরাঁ বলে পারল না। কিন্তু তার মুখচোখ লাল হয়ে গেল উত্তেজনায়, আবেগে, ভালবাসায়। প্রায় বুজে-যাওয়া গলায় বলল, কোনওদিন না।। তুমি এ-সব কী বলছো? আমি তোমার জন্য—তোমার জন্য—বলতে বলতে কথা খুঁজে না পেয়ে মানস রুমাল বের করে মুখ মুছল।

পুরুষকে পাগল করার আয়ুধগুলি মেয়েদের প্রকৃতিদত্ত। এই প্রকাণ্ড মানুষটার শরীরে এখন আর হাড়গোড় নেই। একতাল পিণ্ডের মতো সীতার অভিমান, সংশয় আর ভালবাসার উত্তাপে গলে গলে যাচ্ছে। এখুনি সর্বস্ব দিয়ে দিতে প্রস্তুত। ও এখন সীতার জন্য দশ দিন উপোস করতে পারে, খুন করতে পারে, যা খুশি করতে পারে।

সীতা সতর্ক হয়ে গেল। ওকে পাগল করার ইচ্ছে তার নেই। বরং গভীর মায়ায় সীতা বলল, তোমার কথা আমাকে কখনও কিছু বলো না।

মানস আস্তে আস্তে সহজ হয়ে বসল। রেডিয়োর ঘোষণাকারীর মতো গম্ভীর ঘুমভাঙা সুন্দর গলায় বলল, কী বলব! আমার ছেলেবেলা সুন্দর ছিল না। অল্প বয়সে বাবা মারা গেছে, আমরা দু' ভাই আর মা কাকাদের কাছে ছিলাম। দুঃখে কষ্টেই। কাকারা খারাপ লোক নয়, কাকিমারাও ভাল ব্যবহার করেছে, কিন্তু মা আমাদের শান্তি দেয়নি। স্বামী হারিয়ে মা বড় অভিমানী, খুঁতখুঁতে হয়ে গিয়েছিল। কাকিমাদের বা কাকাদের সঙ্গে একটু কিছু হলেই কাঁদত, বিলাপ করত, আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে। এইভাবেই ক্রমে কাকাদের আর কাকিমাদের ধৈর্য ভেঙে গিয়েছিল। ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি। তাই মাকে নিয়ে আলাদা হব বলে ছেলেবেলা থেকেই চাকরির চেষ্টা করতাম। করেছিও চাকরি। খেলাধুলোয় ভাল ছিলাম বলে স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই চাকরি করেছি। আলাদা বাসা করার মতো টাকা পেতাম না, তবু কিছু টাকা আসত। এইভাবে বড় হয়েছি আর কী?

কখনও স্বপ্ন দেখনি তুমি?

কীসের স্বপ্ন?

অনেকে তো অনেক রকম স্বপ্ন-টপ্ন দেখে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মানস। ভেবে ভেবে বলল, স্বপ্ন ছাড়া বোধহয় মানুষ নেই। আমিও কি দেখিনি? অলিম্পিকে যাব, সোনা আনব—এ-সব খুব স্বপ্ন দেখতাম। হল না। ন্যাশনাল মিট-এ বার থেকে পড়ে যাই, তারপর আর জিমন্যাস্টিকসে ফিরে যাওয়া হল না।

কখনও মেয়েদের কথা ভাবনি?

ম্লান হাসে মানস, বলে, মেয়ে! তাদের কথা চিন্তা করতে সাহসই পেতাম না। মা আর ভাইকে নিয়ে আলাদা একটা বাসা হবে, শুধু সেই চিন্তাই করতাম। মাত্র তো কয়েক বছর আগে রেলে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু ততদিনে মা মরে গেছে। কাকাদের সংসারে কিছু টাকাপয়সা দিই বলে কাকারাও আর ছাড়েনি। রয়ে গেলাম। মেয়েদের চিন্তা প্রথম শুরু হয় তোমাকে দেখে। মনোরম তো একটা ক্রিপল, ওর মনও সুস্থ নয়। ওর ঘরে তোমাকে দেখে আমার কী যে হত!

বলে আবার গাঢ় চোখে তাকায় মানস। হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, তোমার কিছু হত না আমাকে দেখে?

সীতা অস্বস্তি বোধ করল একটু। না, হত না। মনোরম বড় ভুল করেছিল ওই একটা জায়গায়। মানসকে দেখে কেন কিছু মনে হবে সীতার? তখন তো সীতা সেই কদমছাঁট চুলওলা মাথাটাকে নিজের বুকের মধ্যে নিতে শিখে গিয়েছিল।

সীতা মৃদুস্বরে একটা মিথ্যে কথা বলল, হত।

বলে মুখ নামিয়ে নিল টেবিলের ওপর। টেবিলে গাঢ় সবুজ রঙের কাচ তাতে তার আবছা মুখচ্ছবি, ও কি নদীর জলে তার ছায়া?

কী হত?

কী জানি! অত কি বলা যায়?

বলো না। আমি বুঝে নিয়েছি।

সীতা হাসল।

চলো, কোথাও যাই।

কোথায়?

চলো না।

রাত হয়ে যাচ্ছে।

তাতে কী? তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

সীতা চুপ করে বসে থাকে। মাথা নোয়ানো।

ভয় পাচ্ছ? আমাকে? একটা জীবন আমার সঙ্গেই তো থাকতে হবে!

সীতা একটু চমকায়। ঠিকই তো? ভয়ের কী? বাধ্য মেয়ের মতো সে উঠল।

ট্যাক্সি ধরে তারা এল মস্ত একটা ক্লাব ঘরে। বহু পুরনো আমলের প্রকাণ্ড ক্লাব, সাহেবরা তৈরি করেছিল। সামনে লন, তারপর পোর্টিকো, রিশেপশন হল। মানস সীতার হাত ধরে নিয়ে গেল, কোথাও বাধা পেল না, কেউ চেয়েও দেখল না। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। ক্লাব ঘর প্রায় ফাঁকা। দু'-চারজন খুব দামি পোশাক পরা লোক গেলাস হাতে বসে আছে, চোখ নিমীলিত।

তারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। কেউ নেই। একটা ঘরে সারি সারি টেবিল টেনিসের টেবিল পাতা। সব খালি, কেবল একটা টেবিলে দু'জন ক্লান্ত ছেলে একনাগাড়ে খেলে যাচ্ছে। খুটখাট-টিং শব্দ হচ্ছে। ঘরটা পেরিয়ে তারা আর-একটা ঘরে এল। ফাঁকা, আলো জ্বলছে। সুন্দর সাজানো ঘর।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মুখ ঘোরাল মানস। আর তখনই সীতা হঠাৎ বুঝতে পারল, মানস প্রকৃতিস্থ নেই। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে, মুখে রক্তাভা, ঠোঁট নড়ছে। সীতার একটুও ভয় করল না।

মানস এগিয়ে এসে তার দু'কাঁধ ধরে বলল, একটা কথা...

বলো।

আমার কাছে মেয়েরা রহস্যই থেকে গেছে। মানসের গলা কাঁপল।

জানি।

আমি মেয়েদের কিছু জানি না। তাদের শরীর...তুমি আমাকে এই এক্সপিরিয়েন্সটা দেবে?

নির্দ্বিধায় সীতা বলে, দেব।

এখনই। দ্রুত দৌড়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে এল মানস।

পর মুহূর্তেই তারা পাগল হয়ে যাচ্ছিল। ডিভান না সোফা কে জানে, তার ওপর তারা ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ওলটপালট খাচ্ছিল।

প্রথম—কিন্তু সীতার এ তো প্রথম নয়। সে তো কুমারী নয়। তার রহস্য দেখেছিল প্রথম আর একজন। বনভূমি পিছনে রেখে একটা ঢালু বেয়ে নেমে এসেছিল এক কৃশ ও সুন্দর পুরুষ। বহুদিন, সে কি বহুদিন হয়ে গেল? সেই পুরুষ মনোরম না হয়ে মানস হতে পারত। হলে সে আজ কত সুখী হত!

ঝড়টা যখন তাকে ঘিরে ফেটে পড়ছে, তখন সীতা আকুল শ্বাস টানছিল বার বার। কোথাও...কোথাও...কোথাও সামান্য একটু সিগারেটের গন্ধ নেই। নেই কেন? তার পিপাসায় সীতা শুঁকছিল মানসের মুখ, গাল, গলা, শ্বাস। না নেই। কিন্তু একটু সিগারেটের কণামাত্র গন্ধের জন্য বড় পাগল পাগল লাগছিল সীতার। সে অস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে বলল, এ-রকম নয়। না, না...

বসন খোলার মুহূর্তেই থেমে গেল মানস! একটু উদভ্রান্ত সে। কিন্তু চট করে নিজেকে সংযত করার অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী। ঘোলাটে চোখে সে সীতার দিকে চেয়ে বলে, না?

সীতা কষ্টে হাসল একটু। মাথা নেড়ে জানাল, না।

কেন?

সীতা উত্তর দিল না।

মানস একপলকে গায়ের জ্বর ঝেড়ে ফেলল। হাসল। বলল, তা হলে থাক। আমার তাড়া নেই।

টিক-টক-টুং শব্দ আসছে। বলটা মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল। গড়াল। একটা অস্পষ্ট গলা শোনা গেল—নাইন সিক্স...সাইড আউট। আবার টিক্-ট্ক -টিক্ -টক্ শব্দ।

যখন বেরিয়ে আসছিল তারা তখনও পাশের ঘরে সেই দুটি ক্লান্ত ছেলে ফাঁকা ঘরে একনাগাড়ে টেবিল টেনিস খেলে যাচ্ছে। টিক্-টক্-টিক্-টক্-টিক্-টক্...

আবার ট্যাক্সি। আবছা অন্ধকার। বাইরের আলো নানা রং ফেলে যাচ্ছে তাদের ওপর।

আমার তাড়া নেই।

সীতা একটু হাসল, স্নায়ুবিকারের হাসি।

মানস রাগ করেনি, একটু হতাশ হয়েছে বোধহয়। কিন্তু সে কিছু না। আবার বলল, যখন নিমন্ত্রণ করে পাতপিঁড়ি পেড়ে খাওয়াবে, তখন খাব।

কী?

তোমাকে।

সীতা হাসে।

পাতিয়ালায় যাওয়ার আগে আমি বিয়ে করব সীতা।

আইন?

দূর হোক গে।

সীতা শ্বাস টানে, একটা সুন্দর সিগারেটের গন্ধ আসছে কোথা থেকে। সীতা চেয়ে দেখে, ড্রাইভারের পাশে বসা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছেলেটা একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বুক ভরে বাতাস টানল সীতা।

বাড়ির সামনে নেমে যাওয়ার আগে সীতা হঠাৎ জিগ্যেস করল, তুমি সিগারেট খাও না?

না। কেন?

খাও না কেন?

মানস বুঝতে না পেরে বলে, আমার কোনও নেশা নেই। সিগারেট খেলে দমের ক্ষতি হয়।

খুব ক্ষতি?

মানস হাসল, বলল, কেন, সিগারেট খাওয়া তুমি পছন্দ কর?

মাঝে মাঝে খেয়ো, যদি খুব ক্ষতি না হয়।
মানস সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল—খাব। আমার ঠিক সহ্য হয় না। তবে মাঝে মাঝে খাব, এবার থেকে। ঠিক আছে?
সীতা সুন্দর ভালবাসার হাসি হাসল। নেমে যেতে যেতে বলল, খেয়ো। মাঝে মাঝে।
কাল আসব যখন তোমার কাছে, তখন...
আচ্ছা।
যাই।

দাদার ঘরে তখনও মক্কেল আছে। আলো জ্বলছে। কথাবার্তা শুনতে পেল সীতা। সিঁড়িটা অন্ধকার। সীতা পা টিপে টিপে উঠে এল দোতলায়।
বারান্দায় আলো জ্বলছে। বউদি রেলিং থেকে ঝুঁকে আকাশ দেখছে। এ-সময়টায় বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে বউদি রোজই সিঁড়ির মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ দাদা উঠে না আসে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ, তাই এখনও স্বামীর জন্যে আগ্রহ শেষ হয়নি।
ঠাকুরঝি এলে?
হুঁ।
কত রাত হল! প্রায় সাড়ে দশটা।
একটু ঘুরে এলাম। ঘরে ভাল লাগে না।
কোথায়?
অনেক জায়গায়।
একা?
সীতা ভ্রূ কোঁচকাল। বউদির বয়স কম। কৌতূহল বড্ড বেশি।
সীতা বলল, না। দু'জন।
আর কে?
তুমি চিনবে না।
তোমার ভাই ভীষণ সাহস।
সীতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, বউদি, আমি সধবাও নই, কুমারীও নই, আমি হিসেবের বাইরের মানুষ। আমার জন্য কারও কিছু এসে যায় না।
তা অবশ্য ঠিক। বলে বউদি চুপ করে যায়। তারপরই হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে বলল, দেখো না, বৃষ্টি এসে গেল প্রায়, তবু মক্কেলগুলো যাচ্ছে না।
এই ছেলেমানুষিটুকুর জন্যই বউদিটাকে খারাপ লাগে না সীতার। দাদার আগের পক্ষের একটা ছেলে, বিলু। দার্জিলিঙে স্কুলে পড়ে। দাদা ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছে তাকে, যাতে সৎমায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকে। কিন্তু দরকার ছিল না। বিলুকে ভালই বাসে বউদি। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেয়। মা-মরা ছেলেটার জন্য কাঁদেও মাঝে মাঝে।
এ সময়ে বাড়িটা নিঝুম। বাবা তার ঘরে শুয়ে পড়েছে ন'টায়।
সীতার একটু ক্লান্তি লাগছিল। কিন্তু মনে কোনও অবসাদ নেই। সেখানে রঙিন আলো জ্বলছে।
ঘরে এসে টিউবলাইটটা জ্বালে সীতা। তার একার ঘর। ফাঁকা, নিঝুম চারদিক। কাপড় না-ছেড়েই বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। একটু শুয়ে থাকে চোখ বুজে। ঝোড়ো বিকেলটার কথা মনে করার চেষ্টা করে। মাথাটা টিপ-টিপ করছে। অনেকদিন বাদে এত চুমুতে ঠোঁট ফুলে আছে সীতার। ভারী লাগছে, ডান গালে কামড় দিয়েছিল মানস, তার জ্বালা। চোখ বুজে একটু হাসে সীতা। গা এলিয়ে দেয়। পুরুষের মতো একটা প্রবল বাতাস আসে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘরে। জলকণা মেশানো বাতাস। ঠান্ডা। আজ রাতে কিছু খাবে না সীতা, কাপড় ছাড়বে না, ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমোবে? না, ঘুম আসবে না ঠিক। আজ এতদিনের মধ্যে প্রথম মানস এতটা এগোল। শরীরের কাছে শরীরের কত কথা জমে থাকে। মুখ টিপে

সীতা আবার হাসে। হঠাৎ ঝড়ে একটা জানালার পাল্লা ঠাস করে শব্দ করে। একটু চমকায় সে। জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। ঘর ভিজে যাচ্ছে হ্যাঁচলায়, ভিজুক গে। চোখ বুজে একটা ঝিমঝিমানির মধ্যে চলে যাচ্ছিল সীতা। হঠাৎ শুনতে পেল ফাঁকা হলঘরে দু'জন ক্লান্ত ছেলে টেবিল টেনিস খেলছে। টিক-টক-টিক-টক...টিক-টক...

চমকে চোখ মেলে চায় সে। ধু-ধু আলো জ্বলছে ঘরে। নীল পরদা কি ওটা? নীলই তো! পরদাটা উড়ছে হাওয়ায়। সীতা সমস্তটা মন নিয়ে উঠে বসে। পরদার ওপাশে কী?

কিছু না। অন্ধকার। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে বারান্দা, তার রেলিং। অঝোর বৃষ্টি।

সীতা হাত-মুখ ধুয়ে এসে বাতি নেবাল। দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ল। নির্ঘুম চোখে তার মনে পড়ল, মনোরমের আর কিছুই নেই।

বিয়ের পরই চাকরি ছেড়ে সীতার নামে এজেন্সিটা নিয়েছিল মনোরম। হঠাৎ বাজারে নতুন ধরনের অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। বড়লোক না-হলেও ঢের টাকা রোজগার করেছিল সে। টাকা রাখত লকারে, আয়কর ফাঁকি দিতে সোনা কিনেছিল অনেক। জমি কিনেছিল। সবই সীতার নামে। ঠাট্টা করে বলত, আমি হচ্ছি সীতা ব্যানার্জির ম্যানেজার। সবাই তাই জানে।

সীতা কোনও খোঁজখবর রাখত না। মাঝেমধ্যে কাগজপত্র আর চেকে সই দিত, লকার খুলতে তাকেই নিয়ে যেত মনোরম। ব্যাঙ্কে তারা লকার খুলবার যে কোড ব্যবহার করত তা ছিল 'লাভ'। এখনও লকারটা সীতার নামেই আছে। মাঝে মাঝে সে যায় লকার খুলতে, এখনও। কোড বলে, 'লাভ'। বলবার সময়ে কিছু কি মনে হয়?

ডিভোর্সের সময়ে সে ব্যবসাটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল মনোরমকে। দাদা ছাড়তে দেয়নি। বলেছে, ও পুরুষমানুষ, ভবিষ্যতে আবার দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু তুই মেয়ে, তোর নামে কোম্পানি, ও কেউ না। এবং আইনমাফিক ম্যানেজারের চাকরি থেকে সীতা মনোরম ব্যানার্জিকে বরখাস্ত করে। তারপর থেকে দাদাই কোম্পানি দেখে, চালায়। লকারে টাকা, সোনা, যাদবপুরে সেন্ট্রাল রোড-এ জমি, সব নিয়ে সীতার কোনও ভাবনা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, এভাবে মনোরমকে নিংড়ে না নিলেও হত।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ হতে থাকে। আধোঘুমে সীতা শুনতে পায়, ফাঁকা ঘরে দুই ক্লান্ত খেলোয়াড়দের একটানা টেবিল টেনিস খেলার শব্দ। টিক-টক...টিক-টক...টিক-টক...

## ॥ তিন ॥

আমি এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব।

আমি উলটে রেখেছি বই, আলো নিবিয়ে দিয়েছি। এখন আর কাউকেই আমার কিছু বলার নেই। আমার মাথার নীচে একটিমাত্র শক্ত বালিশ, বিছানাটা একটু স্যাঁতসেঁতে, বেডকভারটা ময়লা। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি এই একটু ভেজা ভেজা বিছানায়, ময়লা চাদরে ঠিক ঘুমিয়ে পড়ব।

শুভরাত্রি হে আমার টেবিল-ল্যাম্প। হাতঘড়ি, বিদায়। বিদায় সিগারেট। কাল আবার দেখা হবে। বিদায়, জেমস বন্ড। কাল আবার দেখা হবে সমুদ্রের তীরে, বিকিনি-পরা ওই মেয়েটি—কী যেন নাম—তার পাশে। শুভরাত্রি হে আমার দেয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবি। শুভরাত্রি হে আমার জানালার পাশে বকুল গাছ। রাত্রির আকাশ, বিদায়। আমি মনোরম, তোমাদের মনোরম। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। না, ভুল...ভুল বললাম; ঘুমের আগে এই যে একটু সময়—যখন সমস্ত শরীরে রিমঝিম করে নেমে আসছে চেতনাহীনতা, যখন শ্রাবণ জুড়ে কেবল ঝিঁঝি পোকার ডাক—তখন এই সময়টুকুতে আমি আর মনোরম নই, তখন আমি এক শিশু ছেলে, যার ডাকনাম ছিল ঝুমু। মা আর বাবার সেই ছোট্ট ঝুমু। বারো মাস অসুখে ভুগে যার রক্তহীন, সাদা, রোগা ডিগডিগে চেহারা। ডান হাতে মাদুলি, গলায় কবচ। এখন আমি সেই ছোট্ট ঝুমু—একটু নির্বোধ, আর একটু অসহায়!...কেউ কিছু বলছ? না, আমার আর কিছুই দরকার হবে না। মানুষ ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে। ওই তো ঘুম আসছে ডাকপিয়োনের মতো! সে আমাদের

গলির মুখের ল্যাম্প-পোস্ট পার হয়ে এল। হাইড্র্যান্টের জল উপচে রাস্তা বুঝি একাকার! সে বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে জলময় জায়গাটুকু পার হয়। এখন সে সদরে, রাস্তার মৃদু আলো ঠিক জ্যোৎস্নার মতো পড়ল তার অস্পষ্ট মুখে। শেষ-হওয়া সিগারেটের অংশটুকু ছুড়ে ফেলে দিল সে। উঠে আসছে নিঃশব্দে। দরজার বাইরে পাপোষে সে তার জুতোয় লেগে থাকা অন্ধকারের কণাগুলি মুছে নিচ্ছে। হাঁসের মতো গা ঝাড়া দিয়ে সে শরীর থেকে জলকণার মতো ঝেড়ে ফেলছে অন্ধকার। এখন সে ঘরের মধ্যে। কবজি উলটে ঘড়ি দেখে সে বলল, ভাবনাচিন্তা করার সময় আর অল্পই আছে।

জানি, আমি তা জানি। আমার জানালার পাশে বকুলের ডালপালায় খেলছে বাতাস। কোন দূরের রাস্তায় ঠুন-ঠুন করে চলে যাচ্ছে একজন একা রিকশাওয়ালা। কোথায় যেন ট্যাক্সির মিটার জলতরঙ্গের মতো টুং-টাং ঘুরে গেল। বালিশের নীচে টিক টিক শব্দ করছে আমার হাতঘড়ি। বিদায় হে রাতের শব্দরা। হে কোমল অন্ধকার, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি হে আমার জানালার আলো। শুভরাত্রি হে দেয়ালের অচেনা ছায়ারা। বিদায় হাতঘড়ি, বিদায় ক্যালেন্ডারের ছবি, বিদায় শেষ সিগারেট। স্বপ্ন ও বাস্তবের মতো দিনশেষে এখন আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আসছে ঘুমের অন্ধকার তরঙ্গেরা। একের পর এক। বিদায় হে চিন্তাশক্তি। বিদায় বাস্তবতা। শুভরাত্রি হে স্বাবলম্বন। ওই আমার ঘুম, তার দীর্ঘ আঙুল বাড়িয়ে দিল আমার ভিতরে। সে বোতাম টিপে দিতে থাকে একে একে। আর আমার শরীরের ভিতরে যে অন্ধকার সেইখানে নীল লাল স্বপ্নের মৃদু আলোগুলি জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে দেখা যায়, এক জনশূন্য বিশাল প্রেক্ষাগৃহ, তার দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেস্কোতে আঁকা আমার শৈশবের ছবি। পরদার ও-পাশে মঞ্চে কারা যেন আসবাব টানাটানি করে দৃশ্যপট সাজাচ্ছে। পরদা অকস্মাৎ সরে যায়। দেখা যায়, ঘাটের পৈঠার মতো দীর্ঘ টানা কয়েকটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়িতে শ-তিনেক ছেলে দাঁড়িয়ে—গাইছে—জয় জগদীশ হরে...

বাইরে কি বৃষ্টি? বৃষ্টিই। ঝড়ের বাতাস দিচ্ছে। পাশ ফিরে শুল মনোরম। তার এলানো হাত পড়ে আছে বিছানায়। বিস্তৃত হাতখানা যতদূর যায় কিছুই স্পর্শ করে না। কেউ নেই। একটু ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে বিছানায় পড়ে আছে নিরুপায় হাতখানা। বাইরে ঝড়। কী অঝোর বৃষ্টি! মনোরম সেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল না। সে তখন তার শৈশবের স্বপ্ন দেখছিল।

কয়েকদিন বাদে মামার সঙ্গে কানোরিয়াদের বাড়িতে গিয়েছিল মনোরম। সেখানে কাঠের কাজ হচ্ছে। মনোরম কাঠ চেনে না, প্রতি সি এফটি কোনটার কত দাম তা জানে না। আসলে কাঠের ব্যবসায় তার মন নেই। এক-একটা ব্যবসা আছে যার নো-হাউ জানতে বিস্তর সময় লেগে যায়। কাঠ হচ্ছে সেই ব্যবসা। 'পুরাতন বাড়ি ভাঙা হইতেছে'—খবরের কাগজে এ-রকম বিজ্ঞাপন দেখলেই মামা সেখানে মনোরমকে নিয়ে যায়। কড়ি-বরগা দেখেই ধরে ফেলে কোনটা কী কাঠ। সত্তর, আশি, কি একশো, দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ির অভাব নেই কলকাতায়। বিস্তর জমি নিয়ে হাতির মতো পড়ে আছে। বড় বড় সব ঘর পুরনো আমলের। দু'-তিন তলা সব বাড়ি, এখনকার দশতলার কাছাকাছি উঁচু। সে-সব ভেঙে নতুন ধরনের মাল্টিস্টোরিড বাড়ি উঠছে, অফিস আর ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়ার জন্য। আটটা-দশটা ফ্লোর, নতুন ধরনের সব গ্যাজেটস, অ্যামেনিটিস। তাই পুরনো বাড়ি আর থাকছে না কলকাতায়। পুরনো বাড়ি, বিশেষ করে সাহেববাড়ি হলে তার কাঠ হবে আসল বার্মা-টিক, বাজারে পাওয়া যায় না। সত্তর থেকে দেড়শো বছরের কাঠ, রস মরে ঝুন হয়ে গেছে। চেরাইয়ের পর পালিশ করলে রঙিন কাচের মতো দেখায়। মামা বিস্তর নিলাম ডেকে গোলা ভরতি করেছে সেই দুর্লভ কাঠে। কাজেই বড়লোকদের বাড়ির কাজ হেসে-খেলে পায় মামা।

ওল্ড বালিগঞ্জে একটা নির্জন রাস্তায় বাড়ি। এখনও বাড়িটা শেষ হয়নি। কানোরিয়ারা বড়লোক সে তো জানা কথা। কিন্তু কতটা তা ঠিক জানা ছিল না মনোরমের। বাড়িটা দেখে তাক লেগে গেল। বেশি বড় নয়, বড়জোর পাঁচ সোয়া পাঁচ কাঠা জুড়ে একটা কংক্রিটের স্বপ্ন। সামনে একটা লন, একধারে টেনিস কোর্ট, সেটা পেরোলে থামহীন একটা গাড়ি-বারান্দা—একটা বৃত্তাকার প্রকাণ্ড সিমেন্টের চাকতি শূন্যে ঝুলে আছে। বৈঠকখানার কোনও দরজাই যেন নেই, এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল পর্যন্ত চওড়া-চওড়ি হাঁ হয়ে আছে। দরজা নেই নয়। আছে। সে দরজা দেয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। চারিদিকে কাচ আর কাচ। ঘরের একদিকে মেঝেয় একটা মস্ত চৌবাচ্চার মতো ডিপ্রেশন। সেখানে

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। সেই জায়গাটায় নিখুঁত মাপে ভারী 'কোজি' সোফাসেট তৈরি করে বসানো হচ্ছে। ভেতরের দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি একটা প্যাঁচ খাওয়া ঢাল হয়ে উঠে গেছে, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ আলাদা আলাদা কংক্রিটের স্ল্যাব, জাবদা সিঁড়ি নয়। তিনতলা বাড়ির জন্য বসানো হচ্ছে লিফট। ডান দিকে ঘুরে আরও একটু ভেতরে এগোলে দেখা যায়, ঘরের মধ্যেই ছোট্ট একটা মিনিয়েচার দীঘি—'লিলিপুল'। তার ওপরে একটা খেলাঘরের ব্রিজের মতো চমৎকার ব্রিজ। 'লিলিপুল'-এর উপরে ছাদটা কাচের, প্রাকৃতিক আলো আসবার জন্য।

দেখাশুনো করছেন এক মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ার, তার পরনে সাদা লুঙ্গির মতো কাপড়, সাদা জামা, কপালে তিলক, পায়ে চটি। গম্ভীর এবং শান্ত মানুষ। মুখে কথা প্রায় নেইই। মামার হেডমিস্ত্রি আজ কাজে আসেনি, তার জন্য মামা তাকে বিস্তর কৈফিয়ত দিচ্ছিল এখনও জলশূন্য লিলিপুলের ধারে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিনিয়ার লোকটা হাতে ব্লু-প্রিন্ট দেখছে, ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো, উত্তর দিচ্ছে না। উত্তর পেতে মামার সময় লাগবে বিবেচনা করে মনোরম উঠে এল উপরে, চমৎকার সিঁড়িটা বেয়ে। কোনটা ঘর, কোনটা প্যাসেজ, কোনটা বারান্দা কিছু বোঝা যায় না। সবটাই নিস্তব্ধ স্বপ্নদৃশ্যের মতো। এমনকী কত টাকা খরচ হচ্ছে বাড়িটায়, তারও কোনও হিসেব পায় না সে। চার-পাঁচ লাখ হতে পারে, বিশ-ত্রিশ লাখও হওয়া সম্ভব। আরও বেশি হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এখনও সর্বত্র মেঝেয় মার্বেল ঘষা হয়নি, দেয়ালে পলেস্তারা পড়েনি। কোণের দু'টো ঘর শেষ হয়েছে, সেখানে মিস্ত্রিরা কাঠের আসবাব বানাচ্ছে। মাঝারি বড়লোকেরা, বড় জোর প্রবর্তক বা আমকার থেকে আসবাব কিনে আনে। এরা বাজারি আসবাব কেনে না। ঘরের মাপজোক আর ডিজাইন অনুযায়ী আসবাব তৈরি করিয়ে নেয়। মামা মোটে তিনটে শোওয়ার ঘর আর দরজা জানালার খানিকটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছে। সেটাও বোধহয় বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার।

মনোরমকে দেখে মিস্ত্রিরা কাজ থেকে চোখ তুলে তাকাল। তাদের চোখে ভয়।

রাধু বলল, কী হবে বাবু, হেডমিস্ত্রি আজ এল না!

মনোরম বাড়িটায় ঘুরে সব দেখে কেমন একরকমের হয়ে গিয়েছিল। একটা ছোট্ট জায়গায় এত টাকার কারবার দেখে মাথাটা গরম। একটু ঝেঁঝে বলল, তাতে কী? তোমরা কাজ জানো না!

জানি তো, কিন্তু সকালে আজ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব খুব রাগ করেছে। ভয়ে আমাদের হাত চলছে না। যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়।

মনোরম কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে এল। তিনতলায় উঠল ধীরে ধীরে। অনেক মানুষ খাটছে। কেউ বিড়ি খাচ্ছে না, গল্প করছে না। সব চুপচাপ। চারিদিকে একটা সম্ভ্রম আর ভয়-ভয় ভাব। রাজমিস্ত্রিরা কাজ করতে করতে চোরা-চোখে তাকে দেখল, যেন একটু বেশি মন দিয়ে কাজ করতে লাগল। বাড়ির মালিক কে তারা জানে না। মনোরমের পরনে স্ট্রাইপওলা বেলবটস, গুরু পাঞ্জাবি, চোখে রোদ-চশমা ইস্পাতের ফ্রেমে। মিস্ত্রিরা বুঝতে পারছে না, এই লোকটা মালিকপক্ষের কেউ কি না। মনোরম খানিকটা মালিকপক্ষের মতোই অবহেলার ভঙ্গিতে একটু ঘুরে দেখল চারদিক। এ-তলায় ঘর বেশি নেই, যা আছে তার চারটে দেয়ালই ঘষা কাচের, মস্ত একটা রুফ-গার্ডেনের প্রস্তুতি চলছে।

লিফট এখনও বসানো হয়নি। কুয়োর মতো গহ্বরটা নেমে গেছে। চতুষ্কোণ, একটু অন্ধকার। দরজা নেই। মনোরম ফাঁকা জায়গাটায় মুখ বাড়িয়ে নীচে তাকাল। হাত-পা শিরশির করে উঠল তার। ভার্টিগো। এক পা পিছিয়ে এল। দেয়াল ধরে দাঁড়াল একটু। জিভটা নড়ছে মুখের ভিতরে। শরীরে একটা সংকোচন। একটা দুর্ঘটনাব স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার করে দিল মাথা।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে তাকাল। কাচের ঘর এবং ছাদের বাগানের সুন্দর বিস্তারটি দেখল। মানুষ কত বড়লোক হয়! তিনতলা বাড়ির জন্য লিফট লাগায়, ছাদে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাগান তৈরি করে, ঘরের মধ্যে বানায় পদ্মসরোবর। ছোকরারা কেন বিপ্লবের কথা শহরের দেয়াল জুড়ে লেখে, তার একটা অর্থ যেন খুঁজে পায় সে। ডিনামাইট সহজপ্রাপ্য হলে সেও একটা কিছু এক্ষুনি করত। পকেট হাতড়ে সে বের করল সস্তা সিগারেটের প্যাকেট। সীতা চলে যাওয়ার পর তার বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে এ পর্যন্ত মোট পাঁচ মাসের। দু'শো কুড়ি টাকাব দু'ঘরের ফ্ল্যাট পূর্ণ দাস রোডে। পুরনো বাড়িওলা একটা আশ্রমকে বাড়িটা দান করেছে। আশ্রমের লোকেরা দুঁদে বাড়িওলা নয়, তার ওপর ধর্মকর্ম করে, তাই ঠিক ঘাড়ে

ধাক্কা দিচ্ছে না। কিন্তু গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীরা প্রায়ই আসে আজকাল, দেখা করে যায়, মিষ্টি হেসে তার আর্থিক অবস্থার কথা জিগ্যেস করে। মনোরম তাদের ধর্মকথায় টেনে নিয়ে যায়। তারা অস্বস্তি বোধ করে।

পরিপূর্ণ ফুসফুসে সিগারেটের ধোঁয়া ভরে নিল মনোরম। মাথাটা ঝিম করে ওঠে। সমস্ত শরীর একটা রহস্যময় আনন্দে ভরে যায়। আকাশ টেরিলিনের মতো মসৃণ এবং নীল। শুধু এক কোণে ময়লা রুমালের মতো একখণ্ড বেমানান মেঘ। রুফ গার্ডেনের রেলিঙে হাত রেখে মনোরম একটু দাঁড়িয়ে থাকে। দমকা বাতাসে দ্রুত পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। সে একটু শ্বাস ফেলে নেমে এল।

অনেকক্ষণ চেষ্টায় মামা মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারটিকে কেবল মাথা নাড়ানোয় সফল হয়েছে। কথা ফোটেনি। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখল মনোরম, লিফটের কুয়োর মধ্যে ছুড়ে দিল সিগারেট। এগোল।

মাই নেফিউ। পরিচয় দিল মামা।

মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ার এক ঝলক তাকাল মাত্র, রিকগনাইজ করল না।

টুমরো দি হেডমিস্ত্রি উইল ডেফিনিটলি কাম। ময়মনসিংহের অ্যাকসেন্টে ইংরেজিটা বলল মামা।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক একটু ভ্রূ কোঁচকাল মাত্র।

অলরাইট? মামা জিগ্যেস করে।

ভদ্রলোক হাতের প্ল্যানটার দিকে নীরবে তাকিয়ে একটা শ্বাস ছাড়ল।

মামা রুমালে ঘাম মুছে মনোরমের দিকে তাকাল। মনোরম মামার মুখ দেখে বুঝতে পারে, এতক্ষণ মামার খুব খাটুনি গেছে।

লন ঘেঁষে মামার দিশি গাড়িটা দাঁড় করানো। তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘন নীল রঙের জাপানি ক্রাউন গাড়ি, তার নীলাভ কাচের ভেতর দিয়ে ভেতরে চমৎকার মেয়ে-শরীরের মতো নরম গদি দেখা যাচ্ছে। কী অ্যারিস্টোক্র্যাট তার ড্যাশবোর্ড আর হুইল। এয়ারকান্ডিশনড। মনোরম ঝুঁকে গাড়িটা একটু দেখল। ভারী পছন্দ হয়ে গেল তার।

মামা তার গাড়ির লক খুলতে খুলতে বলে, সাড়ে চারজন মানুষের জন্য এত ব্যাপার-স্যাপার।

কারা সাড়ে চারজন?

কানোরিয়ারা। বুড়োবুড়ি, ছেলে আর ছেলের বউ। আর বোধহয় একটা বাচ্চা।

মোটে?

তাও ছেলে আর ছেলের বউ চোদ্দোবার বিজনেস টুর আর হানিমুন করতে ইউরোপ আমেরিকা যাচ্ছে, বুড়োবুড়ির তীর্থ করাই বাই। থাকবেটা কে গুচ্ছের চাকরবাকর ছাড়া? ঝুমু, মাদ্রাজিরা কেমন লোক হয়?

ভালই। জেন্টল।

আমিও তো তাই জানি। কিন্তু এ-লোকটাকে ঠিক বোঝা যায় না। বিশ মিনিট ধরে বোঝালাম, কিছু বুঝেছে কিনা কে জানে। তোকে নিয়েই হয়েছে আমার মুশকিল, ইংরিজিটা ভালই বলিস, কিন্তু বিজনেসটা একদম বুঝিস না। তোকে দিয়ে যে আমার কী লাভ হবে। ভেবেছিলাম, ইংরিজিটা তোকে দিয়ে বলিয়ে যদি ইমপ্রেস করা যায়, কিন্তু তুই বলবি কি? শুধু ইংরিজিতে কি কিছু হয়? একটু যদি বুঝতিস।

দিশি গাড়িটা চলছে। ক্রাউন গাড়িটার ছায়া এখনও মনোরমের চোখে। ভাসে। দিশি গাড়িটায় বসে তার মনে হয় সে একটা ইঞ্জিন লাগানো মুড়ির টিনের মধ্যে বসে আছে।

মামার চেহারাটা লম্বা, সুড়ুঙ্গে, মাথা প্রায় গাড়ির ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। একটু কুঁজো হয়ে বসে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে। রোগা বলে গায়ের হাওয়াই শার্ট লটর পটর করে। প্যান্টে পাছার দিকটা টান হয় না মাংসের অভাবে। বছরখানেক আগে প্রথম স্ট্রোক হয়ে গেছে। এখন আর একা বেরোতে সাহস পায় না, মনোরমকে সঙ্গে নেয়।

কানোরিয়াদের নির্মীয়মাণ বাড়িটার কথা ভাবতে ভাবতে মনোরম হঠাৎ বলল, ওরা খুব বড়লোক।

কারা?

কানোরিয়ারা।

মামা মন দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে একটা গম্ভীর 'হুঁ' দিল।
তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।
হঠাৎ মামা তিক্ত গলায় বলে, বাঙালির ছেলে যে কবে ব্যবসা শিখবে!
মনোরম হাই তোলে। প্রসঙ্গটা আসছে।
কিছুই তো পারলি না। এজেন্সি পেয়েছিলি, তা সে পরের তৈরি মাল বেচে কমিশন পেতিস। কাঠের কারবার তো তা নয়, এ হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু তুই শিখছিস কোথায়?
শিখছি তো। সময় লাগবে।
নন্-বেঙ্গলিরা কলকাতায় ওইসব বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে, গাড়ি দাবড়াচ্ছে। আর তোদের কেবল আলোচনা গবেষণা আর মেয়েছেলেদের মতো ছিঁচকাঁদুনে সেন্টিমেন্ট।
নেতাজি এলে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। বাঙালি জাগবে।
কথাটা মামার প্রাণের কথা। কিন্তু মনোরমের মুখে শুনতে ঠিক প্রস্তুত ছিল না বলে, মামা রাস্তা থেকে চোখ টপ করে সরিয়ে একবার মনোরমের মুখ দেখে নেয়। ঠাট্টা কিনা তা বুঝতে চেষ্টা করে।
ঝুমু।
মনোরম মুখখানা স্বাভাবিক রেখেই বলে, উঁ!
অবিশ্বাসের কী? বিনা প্রমাণে তো এতগুলো লোক ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না!
কিন্তু কোনজন? শৌলমারির সন্ন্যাসী, না গোপবন্ধুনগরে যাকে দেখা গিয়েছিল সেই সাধু, নাকি রাশিয়াতে চিনা ডেলিগেটদের ছবিতে যে লোকটার আইডেন্টিফিকেশন নিয়ে কথা উঠেছিল, কিংবা নেহরুর অন্তিমশয্যার পাশে যাকে দেখা গিয়েছিল! কোনজন, সেইটেই প্রবলেম।
যে-ই হোক, তিনি আছেন। মামা একটু অধৈর্যের গলায় বলে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, আর তিনি আছেন সন্ন্যাস নিয়ে।
কী করে বুঝলে।
বার্মায় তখন তিনি খুব ব্যস্ত, সেই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর এক সঙ্গী তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এক মন্দিরে নিয়ে যায়। মন্দিরে গিয়েই তিনি কাঁদতে থাকেন, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন, সঙ্গীকে তিনি পরে বলেছিলেন—জানো না, মন্দির-টন্দির এখন আর আমি যাই না। হাতে অনেক কাজ, মন্দিরে গেলে আমার কাজ পড়ে থাকবে। কিছুই করতে পারব না। কাজ শেষ হোক, তারপর আমি তো সন্ন্যাস নেবই। সন্ন্যাস তাঁর রক্তে ছিল। আমার কাছে যে বই আর পত্রিকাগুলো আছে তা পড়ে দেখিস, প্রতি সপ্তাহে আমাদের একটা মিট হয়, যেতে পারিস।
আমি অবিশ্বাস করছি না।
তোমরা জাত-অবিশ্বাসী। তোমাদের জেনারেশন। অবিশ্বাসী বলেই তোমরা কোনও রিলেশন এস্টাব্লিশ করতে পার না। যে বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল ভালবাসা থাকার কথা, সে বয়সে তোমাদের বিয়ে ভেঙে যায়। দেশপ্রেম তোমাদের কাছে হাসিঠাট্টার ব্যাপার; ট্র্যাডিশন, মরালিটি এ-সব তোমরা ভেবেও দেখ না। ডিসগাসটিং।
মনোরম চুপ করেছিল।
একটা সিগারেটের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল মামা। মনোরমের দিকে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক নিয়ে আয়।
তোমার না সিগারেট বারণ?
গোল্ডফ্লেক বারণ নয়। যা। তুই আমাকে অ্যাজিটেট করেছিস।
মনোরম সিগারেট কিনে এনে দেখে মামা ড্রাইভিং সিট থেকে সরে বসেছে। মাথা এলানো, চোখ বোজা। সিগারেট প্যাকেট আর খুচরো টাকা-পয়সা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুই চালা। আমার নার্ভ ঠিক নেই।
মনোরম ক্ষীণ একটু হেসে ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলে, কেন?
মামা তেমনি ঘাড় এলিয়ে চোখ বুজে সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। আস্তে করে বলল, যা বুঝিস না তা নিয়ে কখনও ঠাট্টা করিস না।

মনোরম গাড়িটা চালাতে চালাতে বলে, মামা, যদি কেউ আসেই কোথাও থেকে, তবে সে এখনও আসছে না কেন? আমরা তো ঘোর বিপন্ন। যে-ই আসুক তার আসতে আর দেরি করা উচিত নয়।

আসবে দেখিস। একদিন ভারতবর্ষ শাসন করবে সন্ন্যাসীরা।

মনোরম ভিতরে হাসল। বাইরে মুখখানা স্বাভাবিক।

মামা আবার বলে, বাঙালি-বাঙালি করি, কারণ গত সাতাশ বছর কলকাতায় থেকে আমি কখনও এ শহরটাকে বাঙালির শহর বলে ভাবতে পারি না। এ-শহরটায় কয়েকটা বাঙালি পকেট আছে মাত্র। যে-সব জায়গায় ক্যাপিটাল আর বিজনেসের খেলা, সেখানে তারা কোথায়? ভাল বাড়ি, ভাল গাড়ি, ভাল ইন্ডাস্ট্রি, তাদের ক'টা? এ-সব তো নেই-ই, তার ওপর নেই আদর্শবোধ। খাওয়া-পরার ধান্ধায় ঘোর ক্ষতি নেই, তার সঙ্গে সমাজ সংসার নিয়ে একটু ভাববি তো! তুই কোন ভাষায় কথা বলিস, কোন দেশে বসত করিস, এগুলো নিয়ে ভাববি না? আমি তো জানি প্রতিটি মানুষ তার নিজের, পরিবারের, দেশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।

মনোরম চুপ করে থাকে। মামার বাঙালিপ্রেমটা পরিচিত মহলে বেশ বিখ্যাত ব্যাপার। দার্জিলিং যাওয়ার সময়ে একবার মামা স্টিমার পেরিয়ে মনিহারিঘাটে ট্রেনে উঠবার সময়ে পুরো একটা কম্পার্টমেন্টে কেবল বাঙালি বোঝাই করেছিল। ওই রোগা চেহারা, কিন্তু অসামান্য তেজ। দরজা জুড়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে মূর্তিমান দাঁড়িয়ে পথ আটকে ছিল মামা। কেউ উঠতে গেলেই প্রশ্ন—আপনি বাঙালি? 'না' বললে হটো, 'হ্যাঁ' বললে ওঠো। মনোরমের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, সে যে মামার কাঠগোলায় কাজ পেয়েছে, তা ভাগনে বলে ততটা নয়, যতটা বাঙালি বলে।

তোর কত টাকা বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে বলছিলি? মামা হঠাৎ জিগ্যেস করে।

পাঁচ মাস।

তাতে কত দাঁড়াচ্ছে?

দু'শো কুড়ি টাকা মাসে।

এগারো শো?

ও-রকম। তবে আপাতত অর্ধেকটা দিয়ে দিলে একটা আপস করে নেওয়া যায়।

তা তুই ওখানে আছিস কেন এখনও? আমার বাড়িতে নীচের তলায় অনেকগুলো ঘর ফাঁকা।

কেন, ফাঁকা কেন? বাঙালি ভাড়াটে পাচ্ছ না?

তা নয়। আগের ভাড়াটেরা এমনই গোলমাল ঝগড়াঝাঁটি পাকিয়েছিল যে সেই থেকে তোর মামির হার্ট খারাপ। ভাড়াটে বসাব না। প্রেস্টিজে না লাগলে চলে আয়।

দেখি।

দেখি কী? ভারী মালপত্রগুলো বেচে দে। একটা চৌকি আর দু'-চারটে বাক্স হলেই তো তোর ঢের। একা মানুষ। আবার যদি কখনও সংসার-টংসার করিস তো সে তখন দেখা যাবে।

মনোরম উত্তর দেয় না।

কী রে? ইচ্ছে নেই? তোর মামি একটু কচালে মানুষ বটে, কিন্তু লোক খারাপ নয়। বড় জোর তোর বউয়ের ব্যাপারে দু'-চারটে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করবে। তার বেশি কিছু না। একটা ঘরে পড়ে থাকবি নীচের তলায়, কেউ ডিসটার্ব করবে না। ছেলেটা তো মানুষ না, মডার্ন বাঙালি। পোশাক বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাবা মরলে গদিতে বসবে। মাথায় কোনও আদর্শ-ফাদর্শ নেই। খেলে বেড়ায়, জলসায় সিনেমায় যায়। তুই থাকলে তবু...

মামা চুপ করে কী একটু ভাবে। বলে, প্রেস্টিজে লাগলে গোলায় থাকতে পারিস। অফিস ঘরখানায় একজন অনায়াসে থাকতে পারে। অবাঙালিরা কত কষ্ট করে কলকাতায় থাকে। এক পশ্চিমা পানওয়ালাকে দেখেছিলাম, হ্যারিসন রোডে মোট বারো ইঞ্চি ডেপথের একটা খোঁদল ভাড়া নিতে পেরেছিল। দেয়ালের গায়ে সেই খোঁদলে কাঠ-ফাট লাগিয়ে ওপরে দোকান, নীচে গেরস্থালি। রাতে ফুটপাথে রান্না করে খেত, শোয়ার সময়ে সেই বারো ইঞ্চি জায়গায় কাত হয়ে শুয়ে সামনে কাঠের তক্তা লাগিয়ে নিত পড়ে যাওয়ার ভয়ে। ওই ভাবে দোতলা বাড়ি করেছিল। তো তুই কেন একা মানুষ দু' ঘরের অত ভাড়ার ফ্লাটে খামোখা থাকবি? টাকা নষ্ট। অন্য কারণেও ওই বাড়ি তোর ছাড়া উচিত।

কেন?

ওখানে থাকলেই পুরনো কথা মনে পড়বে, আর হা-হুতাশ করবি। বউমার কোনও খবর পাস?

না।

মামা একটা শ্বাস ফেলে বলে, বউ নিয়ে ভাবতে হবে, এ আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। আমাদের ধারণা ছিল, বিয়ে হলেই বউ আত্মীয় হয়ে গেল, এক মরা ছাড়া আর কোনও ছাড়ান কাটান নেই। গায়ের চামড়ার মতো হয়ে গেল। পাত কুড়িয়ে খায়, হামলে পড়ে সংসার করে, উচ্চুঙ্গে ঝগড়া করে, আবার মায়ের মতো ভালবাসে। বউ চলে যাবে, এ আবার কী কথা রে বাঙালির বাচ্চা?

দু'-চার জায়গায় ঘুরে কাঠগোলায় ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। মামার ছেলে বীরু বসে আছে। বাপের মতোই লম্বা তবে অতটা সুভুঙ্গে রোগা নয়। খেলাধুলো করে বলে ফিট চেহারা। মায়াদয়াহীন মুখ। মুখে হাসি নেই। গরম বলে জামা খুলে স্যান্ডো গেঞ্জি, ফুলপ্যান্ট পরে বসে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে। একমাত্র বংশধর আর গম্ভীর প্রকৃতির বলে মামা ছেলেকে বড্ড ভয় পায়। ছেলেতে বাপেতে বড় একটা কথাবার্তা নেই। বীরুর নিজস্ব একটা ফিয়াট গাড়ি আছে, যেটা নিয়ে মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায়। সে যাই করুক, ছেলেটির হিসেবি বুদ্ধি প্রখর। আর একটা প্রখর জিনিস হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। কর্মচারীরা মামাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, আবার মামার কাজে ফাঁকিও দেয়, চেয়েচিন্তে পাওনার বেশি টাকা আদায়ও করে। আর বীরুকে পায় ভয়।

মনোরমকে কী চোখে বীরু দেখে তা কে জানে! মনোরম তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। মনোরম যে বেশিদিন মামার কাঠগোলায় আড়াইশো টাকায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারি করবে না, এটা বীরু বোধহয় জানে। কাজেই সে মনোরমের প্রতি মনোযোগ দেয় না। কথাবার্তা হয়ই না বলতে গেলে। তারা যে মামাতো পিসতুতো ভাই, এ সম্পর্কটা বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই।

সামনের চালাঘরটাই আসলে অফিস। বুড়ো মানুষ ভূপতিচরণ ক্যাশ আগলে বসে থাকে। সামনে পিছনে কাঠ আর কাঠ। দাঁড় করানো, শোয়ানো তক্তা, বিম, টুকরো-টাকরা কাঠের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। চালা পেরিয়ে অফিসঘর। নামে মাত্র অফিসঘর, ওটা আসলে মামার জিরোবার জায়গা। ওপরে টিন, কাঠের বেড়া। একটা মজবুত চওড়া বেঞ্চ, তাতে ডানলোপিলোর গদি পাতা, তোয়ালে ঢাকা বালিশ। প্রথম স্ট্রোকের পর এ-সব ব্যবস্থা হয়েছে। পিছনে করাতকল থেকে ঘষটানো আওয়াজ আসছে। মিহিন, মিষ্টি শব্দটা মনোরমের বড় ভাল লাগে। ঘুম পেয়ে যায়!

মামা ভূপতিচরণের দিকে একবার তাকায়, ভূপতিচরণ হতাশার ভঙ্গিতে মাথাটা হেলায়। ইঙ্গিতটা মনোরম বুঝে গেছে আজকাল। তার মানে বীরু ক্যাশ থেকে আজও টাকা নিয়েছে। মামা ভিতরের ঘরে ঢুকে যাওয়ার আগে একবার মুখ ফিরিয়ে বলে, ঝুমু, তুই একটু ক্যাশ-এ বোস। ভূপতির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

মনোরমকে ক্যাশ বুঝিয়ে দিয়ে ভূপতিচরণ উঠে গেল। মনোরম বসল। মুখোমুখি বীরু। ভ্রূ কুঁচকে ফ্ল্যাট ফাইল খুলে কাগজপত্র দেখছে। একটা চূড়ান্ত অগ্রাহ্যের ভাব তার ভঙ্গিতে। চোখ তুলে তাকাল না। ভিতরের ঘরে এখন বীরুকে নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে মামার আর ভূপতিচরণের মধ্যে। বীরু বোধ হয় সেটা জানে। কাগজ দেখতে দেখতেই তার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সেই ও বুঝে গেছে, পৃথিবীটা ওর একার।

কপাল। মামার ছেলেটা এ-রকম না হলে মনোরম চাকরিটা পেত না। সীতা চলে যাওয়ার পর তখনই একটা চাকরি না হলে মনোরমের চলছিল না। ল্যাং ল্যাং করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনোরম। সেই সময়ে একদিন গ্র্যান্ড হোটেলের উলটো দিকে পার্ক করা গাড়িগুলো আস্তে, ধীরে হেঁটে হেঁটে দেখছিল সে। গাড়ি দেখা তার একটা পাস্টাইম। জেফির, অস্টিন, কেমব্রিজ, হিলম্যান, প্যাকার্ড কত গাড়ি! দেখে দেখে ফুরোয় না। দেখতে দেখতে প্রতিটি মেকারের গাড়ি তার চেনা হয়ে গেছে। যে কোনও ছুটন্ত গাড়ি দূর থেকেই দেখে সে বলে দিতে পারে কোন মেকারের। নতুন কোনও গাড়ি কলকাতায় এসেছে কিনা তা দেখার জন্যই সে পার্কিং লট-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঠিক সে-সময়ে একটা ভোঁতা মুখ, বৈশিষ্ট্যহীন দিশি গাড়ির ভিতর থেকে মামা ডাকল, ঝুমু।

চাকরি হয়ে গেল। আত্মীয়তা ঝরে গিয়েছিল অনেক আগেই। মা মারা গেছে বছর পনেরো, তারপর

থেকে আর তেমন দেখাশুনা ছিল না। বড়লোক মামাকে এড়িয়েই চলত মনোরম বরাবর। কাজেই মামা যখন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াল এক ছুটির দুপুরে, তারপর বলল, 'আমার কারখানায় ঢুকে পড়। কাজটাজ শেখ।' তখনই মনোরম বুঝে গিয়েছিল, এটা চাকরিই। মামা বস। তার আপত্তির কিছু ছিল না। ক'দিনের মধ্যেই সে বুঝে গিয়েছিল যে, সে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-ট্যানেজার কিছু নয়। সর্বসাকুল্যে জনা ত্রিশেক মিস্তিরি, একজন ক্যাশিয়ার আর একজন ম্যানেজার নিয়ে কাঠের কারবার। কোম্পানি মামির নামে, ম্যানেজার মামা। আর কোনও স্টাফের দরকার হয় না। তবু মনোরমকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করা হয়েছে কয়েকটি কারণে। প্রথমত প্রথম স্ট্রোকের পর মামা একা ঘোরাঘুরি করতে ভয় পায়। দু' নম্বর, মনোরমের চোস্ত ইংরিজি বলা। আর-একটা কারণ হল বীরু। মামার একমাত্র সন্তান, একটু বেশি বয়সে হয়েছিল।

মামা প্রায়ই বলে, বীরুর সঙ্গে তোর এখনও বন্ধুত্ব হয়নি ঝুমু?

বন্ধুত্ব! একটু অবাক হয়ে মনোরম বলে, না তো! হওয়ার কথাও নয়।

কেন?

কী করে হবে? আমার ছত্রিশ, ওর বড় জোর তেইশ। তা ছাড়া...

কী?

বন্ধুত্বের দরকারই বা কী?

মামা শ্বাস ফেলে বলে, কুমু, তুই ওর সঙ্গে একটু কথা-টথা বলিস। আমি চাই ওর সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হোক।

এটাও কি চাকরির মধ্যে?

তোর বড্ড খোঁচানো কথা। চাকরি আবার কী। মামাতো পিসতুতো ভাই তোরা, ভাবসাব থাকারই তো কথা!

সব কিছু কি জোর করে হয়? বীরু অন্য ধরনের, আমি অন্য ধরনের।

ও-সব কোনও বাধা নয়। বন্ধুত্ব চাইলেই হয়।

হয় না মামা।

তুই তো খুব চালাক চতুর ছিলি বরাবর। তুই ঠিক পারবি।

মনোরম তখনই অবাক হয়েছিল। মামা স্পষ্টই চায় বীরুর সঙ্গে তার মেলামেশা হোক।

আবার একদিন মামা প্রসঙ্গটা তোলে, ঝুমু, তুই যদি আমার ব্যবসাটা বুঝে নিতিস, তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। তুই শিখে নিয়ে ওকেও শেখাতে পারতিস।

কার কথা বলছ?

ওই হারামজাদা। ওকে আমি কিছু বুঝতে পারি না। কারবারটা আমার জলে যাবে।

বীরুর কথা বলছ? ও খুব চালাক, চিন্তা কোরো না।

চিন্তা করব না! বলিস কী?

ও শিখে নেবে।

অত সোজা নয় কুমু! এত ব্যাপারে ওর ইন্টারেস্ট ছড়ানো যে ও কনসেন্ট্রেট করতেই পারবে না। তাই তোকে বলি, তুই ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা কর। ওকে একটু বোঝ। দ্যাখ যদি ফেরাতে পারিস। আলটিমেটলি আমি ম্যানেজারিটা তোকে দেব, বীরু থাকবে প্রপাইটার। তোর মামির সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে।

ব্যস্ত হচ্ছ কেন! ওকে একটু সময় দাও। বয়স হলে ও ব্যবসায় মন দেবে।

ব্যস্ত হচ্ছি, আমার শরীরকে আমি ভয় পাই। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, আবার কখন কী হয়ে যায়! ওর জন্য চিন্তা করে করে আমি আরও শেষ হয়ে যাচ্ছি।

এত চিন্তার কী?

মাসে দু'-তিন হাজার টাকা ওর কীসে লাগে বল তো! কোথায় যায়, কী করে কিচ্ছু জানি না। সেইজন্যই চাইছিলাম তুই একটু দ্যাখ। তোর সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি আছে। বহু লোক দেখেছিস, মিশেছিস। বীরুকে বুঝতে পারবি না?

মনোরম ব্যাপারটা সেই প্রথম গায়ে মাখে। মাসে দু'-তিন হাজার টাকা একজন একা খরচ করে। আর সে নিজে ব্যাঙ্করাপ্ট। বীরুকে তখনই সে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিল।

মাসে থোক হাতখরচ পায়, তার ওপর মামিও কিছু লুকিয়ে দেয়। তবু বীরু এসে ক্যাশ থেকে টাকা নেয়। নির্দ্বিধায় নেয়, কারও কাছে জবাবদিহি করার কথা ভাবেই না। ছেলেটার এই দ্বিধাহীন ব্যবহারেই বোধহয় মামা ওকে ভয় পায়। চোখে চোখ রাখে না।

নিচ্ছে নিক, টাকাটা তো শেষ পর্যন্ত ওরই। এ-কথা একদিন বলেছিল মনোরম মামাকে।

দ্যাখ ঝুমু, টাকা কারও নয়। যে রাখতে পারে তার লক্ষ্মী, যে ওড়ায় তার বালাই। এই বিতিকিচ্ছিরি চেহারার কাঠগোলার পেছনে কত লাখ টাকার কাজ হচ্ছে তা তো তুই বুঝিস। এত টাকা তো এমনি এমনি হয়নি। এর পেছনে আমার যেমন পরিশ্রম আছে, তেমনই আদর্শবোধও। বাঙালি ব্যবসা জানে না—এ অপবাদ আমি আমার জীবনে ঘুচিয়েছি। আর ওই হারামজাদা 'বাঙালি' কথাটার অর্থই জানে না, ব্যবসার 'ব' বোঝে না।

তুমি বলো না ওকে!

বলব! আমি? ও আমাকে বাড়ির চাকরবাকরের বেশি কিছু মনে করে নাকি? আমার পারসোনালিটি নেই, আমি জানি। পারসোনালিটি ব্যাপারটা হচ্ছে স্ট্রং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস। আমি কী পছন্দ করি না, কী করি তা ওকে কোনওদিনই বোঝাতে পারিনি। ও যখন ছোট ছিল, তখন থেকেই ওর মুখের দিকে তাকালেই আমি বরাবর আত্মবিস্মৃত হয়েছি। অন্য ক্ষেত্রে আমার যাও-বা একটু ব্যক্তিত্ব আছে, এর কাছে কিচ্ছু নেই। আমারই দোষ। কিন্তু এখন কিছু আর করার নেই। যদি তুই কিছু করতে পারিস।

কী করব?

আমার ধারণা, ও খুব সেফ লাইফ কাটায় না। ওকে ওয়াচ করা দরকার, গার্ড করাও দরকার। কোনদিন কী বিপদ ঘটাবে!

কী বিপদ?

কে জানে! আমি কী করে বলব? কিছুই জানি না, বলেছি তো। হঠাৎ তিন-চার দিনের জন্য না বলে উধাও হয়ে যায়। কখনও-সখনও একমাস কোনও খবর পাই না। ভেবে ভেবে আমার একটা অসহ্য আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেছে। কেবলই মনে হয়, শিগগিরই হঠাৎ একদিন ওর বদলে ওর ডেডবডি লোকে ধরাধরি করে বয়ে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে...দুর্গা, দুর্গা...এ-সব মনে হয় বলেই আমার স্ট্রোকটা হয়েছিল।

মনোরম বুঝতে পেরেছিল, তার দায়িত্ব বাড়ছে। একটা শ্বাস ফেলে বলল, তুমি আমাকে কী করতে বলো?

তুই ওকে মাঝে মাঝে 'ফলো' কর।

'ফলো'? মাই গু-উ-ডনেস!

ঝুমু, ওকে ওয়াচ করা দরকার। অন্য উপায় নেই।

'ফলো' করে কী করব?

দেখবি ও কী করে। যদি বিপদে পড়ে তো সামলাস।

আমি?

নয় কেন?

আমি পারব না মামা।

কেন?

আমি ঠিক...ঠিক সুস্থ নই। সেই অ্যাকসিডেন্টের পর আমারও আর আত্মবিশ্বাস নেই। কী যেন একটা হারিয়ে গেছে। আমি ভয় পাই।

তবে বীরুর কী হবে ঝুমু? আমার যে তুই-ই সবচেয়ে ভরসা ছিলি।

ফলো-টলো করা খুব রিস্কি মামা। বীরু টের পেলে?

বীরু টের পাবে? মামা চোখ বড় বড় করল।

পাবে না?

তুই কি ভাবিস বীরু চারপাশটাকে লক্ষ করে? করলে আমি ভাবতাম নাকি? ও যখন গাড়ি চালায় তখন উন্মাদের মতো চালায়, আগুপিছু কিছু লক্ষ করে না। কারও তোয়াক্কা নেই, লক্ষ করবে কেন? তুই আমার গাড়িটা নিয়ে সেফলি ফলো করতে পারিস, ও কখনও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবেই না। গাড়ির নম্বর-প্লেট তো দূরের কথা, আস্ত গাড়িটাকেই ও নজর করবে না। আমি ওকে ফলো করে দেখেছি ঝুমু।

করেছ?

করেছি। কিন্তু পারি না। অত জোরে গাড়ি চালানোর নার্ভ আমার নেই। তা ছাড়া আফটার অল আমার ছেলে, তার সবকিছু ওয়াচ করতে আমার সংকোচ হয়। তোর তো তা নয়।

মনোরমের এই প্রথম মামার জন্য কষ্ট হয়েছিল খুব। যে লোকটা মনিহারিঘাটে একবার কামরার দরজা আটকে কেবল বাঙালি তুলেছিল গাড়িতে, তার সেই তেজ-টেজ বীরুর কাছে এসে কোথায় মিলিয়ে গেছে। নব্বই পারসেন্ট বাঙালির চাকরির জন্য যে লোকটা সব লড়াই করতে প্রস্তুত তার এ কেমন ব্যক্তিগত পরাজয়!

মনোরম নিমরাজি হয়েছিল। কাঠগোলায় বসে থাকার চেয়ে বরং একটু খোলা-আলো-বাতাসে একা একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া, ব্যাপারটা ভাবতে ভালই।

একদিন বীরু ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সামনেই দাঁড়ানো ওর ফিয়াটখানা। উঠল। গাড়িটা ছাড়তেই, মামা ভিতরঘর থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচাল, ঝুমু, ফলো হিম! এই যে গাড়ির চাবি...মামা ছুড়ে দিয়েছিল চাবিটা।

মনোরম লুফে নিল। দৌড়ে গিয়ে মামার গাড়িটায় উঠে পড়ল। তখন উত্তেজনায় তার শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। বুকে স্কুটারের শব্দের মতো হুড়হুড় শব্দ। মামার ভোঁতা মুখওলা দিশি গাড়িটা ছাড়ল মনোরম। এবং বুঝতে পারল এ-গাড়ি নিয়ে বীরুর বিদেশি ফিয়াট গাড়িটার পিছু নেওয়া বেশ শক্ত। তার ওপর বীরু তার ফিয়াট গাড়ির ইঞ্জিন মেকানিক দিয়ে হট্-আপ করিয়ে নিয়েছে। স্পিডের জন্য।

লেকের ভিতর দিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ হয়ে যাচ্ছে গাড়িখানা। ভোঁতা-মুখ দেশি গাড়িটায় বসে দাঁতে দাঁত চাপল মনোরম। জিভটা তখন ধড়াধড় ধাক্কা দিচ্ছে বন্ধ দাঁতে। ঘামছিল মনোরম। গাড়ির গতি বাড়তেই মনে পড়ল সেই দুর্ঘটনা...ছুটন্ত ট্রেন তার লাইন ছেড়ে অসহায় মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে—লোভী, কাণ্ডজ্ঞানহীন, লুঠেরা মানুষেরা ফিস-প্লেট খুলে রেখেছিল, অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে...একটা প্রলয় ঝড়ের মধ্যে ট্রেনের কামরার নিরাপদ প্রথম শ্রেণীর বার্থসুদ্ধ মনোরম হঠাৎ এরোপ্লেনের মতো উড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার হয়ে গেল মাথা। আবার ফিরে এল আলো। ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে বীরুর ফিয়াট।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল মনোরম। দাঁতে দাঁত চেপে ভেবেছিল, নো মোর স্পিড ফর মি। আমি এখন একটা স্লো-মোশান ম্যান। জোকার।

মামা হতাশ হয়নি। বলেছিল, লেগে থাক। তুই-ই পারবি।

প্রথম প্রথম কয়েকবারই ব্যর্থ হল মনোরম। অলীক ছায়াছবির মতো মিলিয়ে যায় বীরু আর তার ফিয়াট। কলকাতার ভিড়ে ঠিক জাদুকরের মতো বীরু তার অদৃশ্য রাস্তা করে নেয়। মনোরম হতাশ হয়। এক রাতে স্বপ্ন দেখল, বীরু তার গাড়ি নিয়ে আশি-নব্বই মাইল বেগে ছুটছে একটা দেয়ালের দিকে, সুইসাইড করবে। মামার দিশি গাড়িখানা ঝকাং ঝকাং করে মুড়ির টিনের শব্দ করতে করতে চলেছে। গাড়ির রেডিয়োতে মামার আকুল স্বর শোনা যাচ্ছে—ঝুমু, ওকে বাঁচা, ঝুমু-উ—। কিন্তু গাড়ি চলছে না। স্বপ্নের মধ্যেই ইডিও-মোটর অ্যাকশন হচ্ছিল মনোরমের। বীরুর গাড়িটা দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ছে...ঠিক এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে দেখল মনোরম, তার হাত দু'টো সামনে বাড়ানো, একটা পা তোলা। স্বপ্নের মধ্যে সে চিৎকার করেছিল, সেই চিৎকারের শব্দ এখনও তার কানে লেগে আছে। যেন বা নিজের স্বপ্নের চিৎকারেই তার ঘুম ভেঙেছে।

মামার কিছু টাকা খরচ হল। মেকানিক দিয়ে পুরনো গাড়িখানা একটু 'হট-আপ' করাতে হল। মেকানিক বলল, দিশি মেশিন, খুব বেশি স্পিড তুলবে না।

তারপর একদিন প্রাণপাত করল মনোরম। গাড়ি চালানোর অভ্যাস গেছে বহুদিন। গ্রেবালদের মোটর ট্রেনিং স্কুলে শিখেছিল। আশা ছিল, নিজের গাড়ি হবে একদিন। হয়নি। কাজেই অভ্যাসে মরচে

পড়ে গেছে। তার ওপর দুর্ঘটনার স্মৃতি, ইডিও-মোটর অ্যাকশন, নড়ন্ত জিভ, সীতা। এতগুলো বাধা তার সব গতি কেড়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে। তবু সে একদিন বীরুকে ধরল এক দুপুরে। মামাদের বাড়ির সামনে থেকেই ফিয়াটখানা ছাড়ল। দশ গজ দূরে মনোরম মামার গাড়ির হুইলের পিছনে প্রকাণ্ড গোগো চশমা পরে বসে। গাড়িটা চলেছিল সেদিন। মনোরমের বুকে স্কুটার ডেকেছিল, মনে পড়েছিল সেই দুর্ঘটনা, জিভ নড়েছিল, সীতার জন্য দুঃখিত ছিল হৃদয়। তবু বীরুর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সেদিন সে বুক দিয়ে চালিয়েছিল গাড়ি। ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল সে। বীরুর মায়াবী ফিয়াট মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। একটু অবহেলায় কাত হয়ে বসেছে বীরু, ডান হাতে আলতো ছুঁয়ে রেখেছে হুইল, ঠোঁটে সিগারেট। চেষ্টাহীন সেই চালানো। বিদেশি মসৃণ গাড়িখানা সিল্কের অলীক রাস্তায় পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিছনে দিশি গাড়িখানায় মনোরমের শ্বাস গাঢ় ও দ্রুত হয়ে উঠছে তখন, ধোঁয়াচ্ছে গোঙানো ইঞ্জিন, ঘাম, স্বপ্ন ও স্মৃতির কুয়াশায় আচ্ছন্ন সম্মুখ। সে কী প্রাণপণে দিক ঠিক রেখেছিল মনোরম। ইনট্যুইশনের ওপর ভর করে বাঁক নিয়েছিল, কারণ বীরু হারিয়ে যাচ্ছিল প্রায়ই। এসপ্ল্যানেডেই যাচ্ছে বীরু—এই আন্দাজে চালিয়ে অবশেষে লেনিন সরণির মোড়ে ট্রাফিকে সে বীরুর গাড়ির দশখানা গাড়ির পিছনে থামল।

সেদিন বীরু খুব বেশি দূর যায়নি। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ে ঢুকে একটা চওড়া সম্ভ্রান্ত গলিতে গাড়ি দাঁড় করাল। অবহেলার ভঙ্গিতে নামল, দরজা লক না করে এবং গাড়িটার দিকে একবারও পিছু ফিরে না তাকিয়ে ঢুকে গেল একটা মস্ত দোকানে। ধীরে ধীরে দিশি গাড়িটাকে দোকানের সামনে আনল মনোরম। দেখল, রেডিয়ো আর গ্রামোফোনের খুব বড় দোকান। সামনে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কাচ লাগানো দু'টো শো-কেসে অজস্র রেডিয়ো, গ্রামোফোনের ডিসপ্লে। ঠিক গোয়েন্দার মতো সতর্ক চোখে তাকিয়ে রইল মনোরম। বাইরে দিনের আলো। কাচের গায়ে নানা রকম প্রতিবিম্ব পড়েছে। ওই সব প্রতিবিম্বের জন্য ভিতরটা ভাল দেখা যায় না। তবু প্রাণপণে লক্ষ করল মনোরম। ভিতরের মৃদু আলোয় দেখল, দোকানের ভিতরে আর-একটা কাচের পার্টিশন আছে। সেই পার্টিশনের কাচের পাল্লা ঠেলে বীরুর লম্বা চেহারাটা ভিতরে ঢুকে গেল। ঝাঁয়-ঝিক ঝাঁয়-ঝিক ঝাঁয়-ঝিক করে একটা পপ মিউজিক বাজছে ভিতরে। রক্ত গরম করা বাদ্যযন্ত্র। শুনলেই হাত-পা নাচের জন্য দামাল হয়ে ওঠে। কাচের পাল্লাটা খুললেই গাঁক গাঁক করে শব্দটা বেরিয়ে আসছে। পাল্লাটা বন্ধ হলেই শব্দ মৃদু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবিরল শব্দটা হয়েই চলেছে।

মনোরম অনেকক্ষণ বসে সিগারেট পোড়াল। তারপর বীরু বেরিয়ে এল। একটা ধৈর্যহীন চাপা উত্তেজনাময় চেহারা তার, অসুখী, অতৃপ্ত। তার পিছনে কয়েকজন লোক ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এল একটা দামি সুন্দর স্টিরিও সিস্টেম। সেই জিনিসটা গাড়ির পিছনে তুলে আবার গাড়ি ছাড়ে বীরু। মনোরমের আবার সেই প্রাণান্তকর পিছু-নেওয়া। রিচি রোডের একটা চমৎকার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, তেমনি লক না করে, পিছু না ফিরে ঢুকে গেল ভিতরে। একটু পরে দু'জন দারোয়ান-চেহারার লোক এসে দু'টো বাক্সের মতো স্পিকার আর রেকর্ড প্লেয়ার সহ স্টিরিওটা নামিয়ে নিয়ে গেল। ধৈর্যশীল মনোরম ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইল। বীরুর গাড়িটা হিম হতে লাগল। মনোরম দু'বার পেচ্ছাপ করল, প্রায় দেড় প্যাকেট সিগারেট খেয়ে ফেলল। অনেক রাতে নেমে এল বীরু। শিস দিচ্ছে, একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বোধহয় কিছুটা মদ খেয়েছে। গাড়িতে উঠে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘুমের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল মনোরমের। চটকা ভেঙে সোজা হয়ে বসল। রাত হয়ে গেছে। এত রাতে পিছু নিলে বীরু টের পাবে। ভাবল মনোরম। কিন্তু বীরু কিছু লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িটা ছাড়ল। তেমন স্পিড দিল না এবার। আস্তে ধীরে বাড়ি ফিরে গেল। বীরু বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর মনোরম দিশি গাড়িটা গ্যারেজে তুলে মামার দারোয়ানের হাতে চাবি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল। সেই রাতে সাফল্যের আনন্দে তার ভাল ঘুম হয়।

পরদিন মামা সব শুনে ভ্রূ কুঁচকে বলল, অ্যাপার্টমেন্ট হাউস? ওখানে ও করে কী?

কে জানে! চেনাশোনা কেউ থাকতে পারে।

ভাড়া নেয়নি তো?

কে জানে।

খোঁজ নে।

আমি কি ডিটেকটিভ হয়ে যাচ্ছি মামা?

মামা চিন্তিত মুখ তুলে বলেছিল, তোকে এর জন্য না হয় কিছু বেশি টাকা দেব। ওকে দেখিস ঝুমু।

দেখেছে মনোরম। খোঁজ নিয়ে জেনেছে, অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটায় আটশো টাকা ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে বীরু। মাঝে মাঝে থাকে সেখানে। তার বেশি কিছু জানা যায়নি। মনোরম অনেক ভেবেছে, বুঝতে পারেনি, কেন বীরু নিজেদের অমন প্রকাণ্ড বাড়ি থাকতে এবং সেখানে অতগুলো খালি ঘর থাকতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে। মামাও ভেবে পায়নি। দু'জনে চিন্তিতভাবে দু'জনের দিকে চেয়ে থেকেছে। মামা শ্বাস ফেলে বলেছে—ঝুমু, লক্ষ রাখিস। আমার একটাই সন্তান।

বীরুর কলেজের সামনেও অপেক্ষা করেছে মনোরম। বিশাল ইউনিভার্সিটি কলেজ। অনেকগুলো বিল্ডিং, করিডোর, মাঠ, ছেলেমেয়ে, ঠিক থৈ পাওয়া মুশকিল। তবু মনোরম ঘাপটি মেরে ঘুরেছে কলেজের মাঠে, করিডোরে, দালানে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, বীরু তাকে লক্ষ করেনি। এক দঙ্গল মেয়ের সাথে করিডোরে প্রায়ই আড্ডা দেয় বীরু। সকলের প্রতি সমান মনোযোগ। ক্ষতিকর কিছু নয়, একদিন শুধু কলেজ ভেঙে যাওয়ার পর মনোরম দেখেছিল, একটা ফাঁকা ক্লাসঘরের দরজার চৌকাঠে বীরু দাঁড়িয়ে। লম্বা শরীরটা ঝুঁকে আছে, দরজায় কাঠের ওপর হাত তুলে ভর রেখেছে শরীরের। ওর দীর্ঘ শরীরের আড়ালে একটা চৌখস, সুন্দর, প্রায় কিশোরী মেয়ে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির বয়স এত কম, মুখে এমন একটা নিষ্পাপ ভাব যে, সহজেই যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে। মনোরম দেখছিল, বীরু কথা বলতে বলতে ডান হাতে মেয়েটির বাঁ বগলের শর্ট স্লিভসের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে। মেয়েটি হেসে বলছে, যাঃ, রীতা এ-কথা বলতেই পারে না।

সত্যিই বলেছে, গৌরী প্রেগন্যান্ট।

রীতাটা মিথ্যুক।

তা হলে সত্যিটা কী? তুমি প্রেগন্যান্ট নও?

যাঃ! বলে মেয়েটি একটুমাত্র লাজুক ভাব করে খিলখিল হাসল। বলল, একদম ফ্রি আছি বাবা। ভয় নেই।

এইটুকু শুনেছিল মনোরম, সেদিন। ধৈর্যহীন, অতৃপ্ত যুবা বীরু চট করে হাতের ভরটা তুলে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, চলি।

মামাকে এটা জানানো যায় না। জানায়নি সে। বীরু যে ওই মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছে না, সেটা বোঝা গেল আর একদিন। অপরাহ্নের ফাঁকা ক্লাসঘরে বসে সে অন্য এক মেয়ের সাথে দ্বৈত রবীন্দ্রসংগীত গাইছিল। একটা উঁচু ডেস্কের দু'ধারে দু'জন. ডেস্কের ওপর নামানো মাথা, থুঁতনিতে থুঁতনি ঠেকে আছে। অনুচ্চ স্বরে, আবেগভরে এবং সুন্দর গলায় দু'জনে গাইছিল, অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ...সারাক্ষণই গানের মধ্যে তারা পরস্পরকে চুম্বন করছিল। দেখে ভারী উত্তেজিত হয়েছিল মনোরম। আগের দিনের সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তা হলে বীরু প্রেম করছে না? কেন করছে না? কী সুন্দর মেয়ে, অনায়াসে মিস ক্যালকাটা জিতে যেতে পারে, অমন সুন্দর মেয়ে বীরু পাবে কোথায়! মেয়েটা ইচ্ছে করলে মনোরমকে সীতার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে, আর বীরু ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। হায় ঈশ্বর! প্রেম করবি না তো ওর বগলে তুই কেন হাত দিলি বীরু। কেন জিজ্ঞেস করলি, ও প্রেগন্যান্ট কিনা। ঠাট্টা নয় তো? ঠাট্টা! এ-রকম ঠাট্টা কোনও মেয়েকে করা যায়, আর এ-রকম ঠাট্টা শুনে কোনও মেয়ে হাসে, মনোরম জানত না। মাথা গরম হয়ে গেল মনোরমের। তার সামনে একটা উত্তেজক নতুন জগতের ছবি ফুটে উঠেছিল।

দক্ষিণ কলকাতার একটা নামকরা গানের স্কুল থেকে একদিন চমৎকার শরীরওলা একটি মেয়েকে গাড়িতে তুলল বীরু। মনোরমের দিশি গাড়িটা প্রায় বীরুর ফিয়াটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালায়। ইচ্ছে করলে ওভারটেকও করতে পারে। মনোরম লক্ষ করে, মেয়েটার নিজের প্রকাণ্ড একখানা হাম্বার গাড়ি আছে। বীরুর গাড়িতে ওঠার আগে মেয়েটি নিজের গাড়ির ড্রাইভারকে গিয়ে নিচু স্বরে কী বলল, গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটা জিভ দিয়ে ওপর ঠোঁট চেটে বীরুর পাশে উঠে বসল, খোঁপা ঠিক করল।

সহজ ভঙ্গি, বীরু তাকে নিয়ে এল তার অ্যাপার্টমেন্টে। দু'জনে নেমে এগিয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা হঠাৎ থেমে বলল, ওই যাঃ! ব্যাগটা ফেলে এসেছি।

তাতে কী হয়েছে?

দাঁড়াও না, নিয়ে আসি। ব্যাগটা না থাকলে বড্ড হেলপলেস লাগে।

দৌড়ে গাড়ির সিট থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে মেয়েটা বীরুর সঙ্গে বাড়িটায় ঢুকে গেল।

মাঝে মধ্যেই এটা হতে থাকে। মনোরম একান্তভাবে পিছু নেয়। এবং লক্ষ করে, মেয়েটার স্বভাবই হচ্ছে ব্যাগ ফেলে যাওয়া। ক'দিনই মেয়েটা ব্যাগ ফেলে গেল। দু'-একবার মনে পড়তে ফিরে এল। অন্য কয়েকবার ব্যাগটা পড়েই রইল গাড়িতে। ওরা বাড়ি থেকে বেরোত অন্তত তিন-চার ঘণ্টা পরে। ওরা কী করে এতক্ষণ তা জলের মতো পরিষ্কার। অথচ মেয়েটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ নয়। তার গাড়ি আছে, যে স্কুলে সে গান শেখে তা খুবই উঁচু জাতের, চেহারা বড়ঘরের মেয়ের মতো। তবে কি বীরু প্রেম করছে অবশেষে? মনোরম দিশি গাড়িটায় বসে ভাবত আর ঘামত।

সাহস বেড়েছিল মনোরমের। কৌতূহলও। মেয়েটা প্রায়ই ব্যাগ ফেলে যায়। একদিন মনোরম থাকতে না পেরে নেমে আসে। চারদিক চেয়ে দেখে। কেউ লক্ষ করে না। সোজা গিয়ে বীরুর লক-না-কবা গাড়ির দরজা খুলে গাড়ির ভিতরে ঢোকে। তুঁতে রঙের ব্যাগটা পড়ে আছে অবহেলায়। সে খোলে। প্রথমে কিছু সাধারণ জিনিস পায়। আইব্রো পেনসিল, লিপস্টিক, পাউডারের কেস, ফাউন্ডেশন, ক্লিপ, রাংতার প্যাকেটে মাথা ধরার বড়ি, কয়েকটা ট্র্যাংকুলাইজার ট্যাবলেট এবং তারপরই বেরিয়ে আসে কন্ট্রাসেপটিভ ট্যাবলেটের একটা প্রায় খালি প্যাকেট। একুশটা ট্যাবলেট থাকে। তার মধ্যে মোটে দু'টো অবশিষ্ট আছে। মনোরম সভয়ে নেমে আসে। দিশি গাড়িটায় বসে ক্রমান্বয়ে সিগারেট খায়।

গত শীতে পাঁচটা টেস্ট খেলাই দেখল বীরু। বাইরের টেস্ট খেলা দেখতে প্লেনে যাতায়াত করল কানপুর, মাদ্রাজ, দিল্লি, আর বম্বে। এলাহি টাকার কারবার। ক'জন ভারতীয় পাঁচটা টেস্ট খেলা দেখার ঝুঁকি নিতে পারে মনোরমের হিসেবে আসে না। শেষে টেস্ট খেলা দেখে ফেরার সময়ে একটা সিঙ্গি টিন-এজারকে পেয়ে গেল বীরু। ভারী সুন্দর, উগ্র এবং ছটফটে মেয়েটি। এক ঝলকে মেমসাহেব বলে ভুল হয়। পিঙ্গল চুল, মিনি স্কার্ট আর খয়েরি চোখের তারা। দমদমে বীরুকে আনতে গিয়েছিল মনোরম। মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল বীরু। মেয়েটির সঙ্গে তার বাবা ছিল। অ্যারিস্টোক্র্যাট চেহারা। বোঝা গেল মেয়েটির দানাপানির অভাব নেই। তিন-চার দিন পরেই বীরু তার অ্যাপার্টমেন্টে এনে তুলল তাকে। মেয়েটি খুব হাসছিল, মুখচোখ ঝলমল করছে খুশিতে। মনোরম বুঝতে পারে, এই মেয়েটিও জানে বীরু তাকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং সেখানে কী হবে। জেনেও বিন্দুমাত্র ভয় নেই। ঝনোরম হাই তোলে। তার বিস্ময়বোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিনেই মনোরম বুঝতে পারে, বীরু তার আটশো টাকার অ্যাপার্টমেন্টের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করে। এবং কোনও মেয়েই বেশ্যা নয়। বাছাই, চমৎকার মেয়ে সব। কেউই রোগা বা মোটা নয়, গরিবঘরের নয়, হাঘরে নয়, বীরুর চেয়েও ঢের বড়লোকের বাড়ির মেয়েও আছে তার মধ্যে। এবং কারও সঙ্গেই বীরুর প্রেম নেই। এক একদিন এক দঙ্গল পুরুষ আর মেয়ে বন্ধু নিয়েও ও ঢুকে যায় অ্যাপার্টমেন্টে। ক্রমশ সাহসী মনোরম দিশি গাড়ি ছেড়ে ঢুকে পড়ে বাড়িটায়। লিফটে উঠে আসে ওপরে। মোজেইক মেঝের ওপরে নিঃশব্দে হেঁটে এসে বীরুর চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টের ফ্লাশ-ডোরে কান রেখে শোনে ভিতরে ঝিক-ঝাঁই ঝিক-ঝাই ইও ইও ইও ইও টিরিকিটি টিরিকিটি টিরিকিটি ঝাঁই এ-রকম সব অদ্ভুত শব্দে স্টিরিও বাজছে। ঝনাৎ করে পড়ে ভেঙে গেল মদের গেলাস। উদ্দণ্ড নাচের শব্দ। হো-হো চিৎকার। কণ্টকিত হয়েছে মনোরম। হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকে যেতে ইচ্ছে হয়েছে উদ্দাম আনন্দিত ঘরখানার মধ্যে। পাপ হবে না, কেউ দোষ দেখবে না। ঢুকবে?

তক্ষুনি নড়ন্ত জিভটাকে টের পেয়েছে সে। মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনা। মনে পড়ে বয়স, সীতা। ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। নিঃশব্দে নেমে এসেছে মনোরম। দিশি গাড়িটায় বসে সিগারেট টেনেছে!

ছেলেটার কোনও ক্লান্তি নেই। সারা শীতকাল একনাগাড়ে টেনিস খেলল একটা ক্লাবে। একটু দূর

থেকে, পার্কের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মনোরম দেখে গেল টেনিস বলের এ-কোর্ট থেকে ও-কোর্ট যাতায়াত, আর পফ পফ শব্দ শুনল। ফার্স্ট ডিভিশন লিগে খেলে গেল ক্রিকেট। গ্রীষ্মে একটা দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবে খোলা মাঠে জলে কাদায় ভূত হয়ে ফুটবল লাথিয়ে গেল। কোনও খেলাই খুব মন্দ খেলে না। কিন্তু কেমন একটু নিরাসক্ত উদাসীন ভাব। যেন কোনও কিছুতেই গা নেই।

ও কি নিরাসক্ত, সন্ন্যাসী? না কি পাষণ্ড?

ইউ এস আই এস-এর সামনে ছাত্রদের একটা র‍্যালি ছিল, ভিয়েতনামের যুদ্ধের প্রতিবাদে। সেদিন একটা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের মাউথপিস মুখের কাছে টেনে বীরু বক্তৃতা করল। প্রথমে ধীরে ধীরে ভিয়েতনামের যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করল, মার্কিন ভূমিকার পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল, সিয়াটোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করল, প্রসঙ্গত ইয়োরোপ এবং এশিয়ায় মার্কিন দু'মুখো নীতির চমৎকার সমালোচনা করল, সমাজতন্ত্র কী এবং সমগ্র এশিয়ার অর্থনৈতিক মুক্তি কী ভাবে আসবে তা বলে গেল বিশুদ্ধ বাংলায়। বলতে বলতে থেমে গেল না, কিন্তু ভাবতে ভাবতে বলল, থেমে থেমে। ঝোড়ো আবেগ নেই, কিন্তু নিবেদনটি ভারী আন্তরিক। ও যে এত ভাল বাংলা জানে কে জানত তা? কিংবা রাজনীতির এত খবর রাখে, জানে ভূগোল ইতিহাস? দাঁড়াল ঠিক তরুণ এক বিদ্রোহীর মতো। এত সুন্দর ভঙ্গিটি!

সব রকমের জুয়া খেলে বীরু। সাট্টা থেকে ঘোড়দৌড়। ঘোড়দৌড়ের মাঠে একদিন মুখোমুখি পড়ে গেল মনোরম। অবিরল হারছিল বীরু। মুখে একটু বিরক্তির চিহ্ন দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু হতাশা বা ভেঙে-পড়া ভাব ছিল না। রেজাল্ট ওঠা মাত্র হাতের টিকিট দুমড়ে ফেলে দিচ্ছিল। আবার লম্বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল কাউন্টারের দিকে। বীরু কিছুই দেখে না—এই বিশ্বাসে মনোরম সেদিন তেমন আড়াল হয়নি। খোলাখুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘোড়াদের স্টার্টিং পয়েন্টে হাঁটিয়ে নেওয়া হচ্ছে পঞ্চম রেস-এর আগে। রেলিং ধরে বীরু দাঁড়িয়ে ঘোড়া দেখল, তারপর হঠাৎ কাউন্টারে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াতেই মুখোমুখি।

একটু অবাক হল বীরু, সামান্য কৌতূহল দেখা গেল চোখে। ঘাবড়ে গেল না একটুও। বরং মনোরম ঘাবড়ে যাচ্ছিল।

বীরু একটু এগিয়ে এসে বলে, তুমি খেল?

খেলি।

দেখিনে তো কখনও!

গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে আসি না তো!

আমি তো দুই স্ট্যান্ডেই খেলি। বলে মিষ্টি করে হাসল। বলল, কী খেলছ এটায়?

ঠিক করিনি।

আমি 'ডাকু'র ওপর অনেক টাকা খেলছি, কিন্তু হবে না, দিনটা খারাপ। কুড়িটা জ্যাকপট মিলিয়ে রেখেছিলাম। সবক'টা গেছে ফিফ্‌থ রেস-এর মধ্যে।

কত হেরেছিস?

হাজারের ওপর তো বটেই। এখনও হিসেব করিনি। তুমি?

গোটা পঞ্চাশ।

মোটে? তুমি তো লাকি। আবার হাসল বীরু।

আর খেলিস না।

কেন? বীরু ভ্রূ তোলে।

খামোকা খেলবি। এক-একটা দিন অনেকে কেবল হারে।

আমি রোজ হারি! হারজিত তো আছেই। তবে এ রেসটার পর কেটে পড়ব। ভাল লাগছে না।

আমিও।

কোথায় যাবে?

ঠিক নেই। মামার কাছে যেতে পারি।

ঠিক আছে। একসঙ্গে ফিরব। আমার গাড়ি নেই, গ্যারেজে দিয়েছি, ট্যাক্সিতে ফেরা যাবে।

সেটা জানত মনোরম। তাই একটু বিপদে পড়ল। তারও গাড়ি আছে। মামার দিশি গাড়িটা। বলল, আমার গাড়ি আছে।

অবাক হয়ে বীরু বলে, নিজের গাড়ি?

না না, মামার গাড়িটাই। কয়েক ঘণ্টার জন্য চেয়ে এনেছি।

বাবা দিল? কাউকে তো দেয় না।

আমি তো বিজনেস টুর-এ আছি।

তাই বলো। নইলে দিত না।

রেস-এর পর তারা গাড়িতে এসে উঠল। বীরু গাড়িতে বসে চার দিকে চেয়ে গাড়িটা একটু দেখে বলে, রদ্দি জিনিস।

কী?

এটা। গাড়িটা।

দিশি মাল, আর কত ভাল হবে।

তুমি তো ভালই চালাও।

অভ্যেস।

অভ্যেস কেন? বাবা তোমাকে দিয়েই সফারের কাজ করায় নাকি?

না, তা নয়। স্ট্রোকের পর নিজে চালাতে ভরসা পায় না, আমিই চালাই।

অঃ!

একটু চুপ।

বাবা তোমাকে কত দেয়?

দেয় কিছু। আমার চলে যায়।

তোমার একটা বিজনেস ছিল না?

ছিল। বেহাত হয়ে গেছে।

শুনেছি, খুব রোজগার করতে?

হত মন্দ না।

তা হলে এখন চলে যাচ্ছে কী করে? বাবা বেশি দেওয়ার লোক নয়।

একা মানুষ তো, চলে যায়।

একা তো আমিও।

তুই একা কেন? মামা মামি কি হিসেবের মধ্যে নয়?

হলেও তারা ডিপেন্ডেন্ট তো নয়। বরং আমিই ডিপেন্ডেন্ট। একা আমারই তো কত খরচ! গাড়িটা বাঁয়ে ঘুরিয়ে নাও, সামনের রাস্তায়।

কেন?

আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে রিচি রোডে, যাব।

একটু চমকে গিয়েছিল মনোরম। ওর যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে সেটা জানতে মনোরমকে কত কষ্ট করতে হয়েছে; আর সেই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য খবরটা ও কত সহজেই দিয়ে দিচ্ছে নিজে। বিন্দুমাত্র গোপন করবার চেষ্টা নেই। একটু হতাশ হয় মনোরম।

মনোরম গাড়ি ঘোরাল।

যাবে আমার অ্যাপার্টমেন্টে?

সেখানে তুই কী করিস?

অনেক কিছু। তবে বেশিরভাগ সময়ে বসে রেস্ট নিই, আর বই পড়ি। তুমি ড্রিঙ্ক করো?

কী বলছিস?

ড্রিঙ্ক করো তো?

একটু ভাবল মনোরম। বলল, করি।

আমাব ফ্ল্যাটে একটা ছোট্ট বার আছে। যাবে? রেস-এর পর তোমার টায়ার্ড লাগছে না?

লাগছে।
তা হলে চলো। ওল্ড স্মাগলার হুইস্কি খাওয়াব।
একটু চুপ।
মামা জানে?
কী?
তোর যে একটা ফ্ল্যাট আছে!
জানলে জানে। আমি তো লুকোইনি, আবার আগ বাড়িয়ে কিছু বলিওনি।
বলিসনি কেন?
ওটা আমার একার জায়গা। আমার মেয়েবন্ধুরা আসে। ছেলেবন্ধুরা আসে। গেট-টুগেদার হয়। নাচ-গানও হয়। বাবা মা জানলে ওখানে হানা দিতে থাকবে। ফ্ল্যাট নেওয়ার উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হবে তা হলে।
আমাকে তবে নিচ্ছিস কেন?
বীরু হাসে, বলে, এমনিই। রেস-এর মাঠে তোমাকে দেখে খুব মায়া হল। ভারী ছন্নছাড়া দেখাচ্ছিল তোমাকে। ভাবলাম হঠাৎ বিপাকে পড়ে বাবার চাকরি করছ, নিশ্চয় তুমি খুব সুখে নেই। তাই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একটু ড্রিঙ্ক করি।
মনোরম একটু হেসে বলল, তুই আমার ছোট ভাই, তা জানিস?
সম্পর্কটা এখন খুঁচিয়ে তুলবে নাকি?
না, না, এমনি বললাম।
আত্মীয়তা ব্যাপারটা আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। ওটার মধ্যে অনেক ভণ্ডামি আছে।
কীরকম?
আত্মীয় বলেই অনেকে অনেকের কাছ থেকে কিছু সম্মান বা সুবিধে পায়, যেটা তাদের পাওনা নয়। সম্মান বা সুবিধে পাওয়ার জন্য মিনিমাম কিছু যোগ্যতা থাকা দরকার। কেবল আত্মীয়তা কখনও সেই যোগ্যতা হতে পারে না। সেইজন্য আমি গুরুজনটন মানি না।
মনোরম বুঝেছে, মাথা নাড়ল।
বীরু কী সুন্দর নরম ব্যবহার করছিল সেদিন! ভাবা যায় না। বীরু যে এত নরম এবং বিষণ্ণ স্বরে কথা বলতে পারে, তা কে জানত?
গোপনে গোয়েন্দার মতো দিনের পর দিন যে-ফ্ল্যাটটার ওপর নজর রাখত মনোরম সেই ফ্ল্যাটে সেদিন সে অনায়াসে ঢুকল।
ফ্ল্যাটটা ভালই। এ-সব ফ্ল্যাট যেমন হয়, তেমনি। তিনখানা ঘর, ডাইনিং স্পেস-কাম-বৈঠকখানা, সবই আছে, কিন্তু আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। একটা বেশ বড় খাট, তাতে ফোম রবারের গদি, গদির ওপর মণিপুরি চাদরে ঢাকা বিছানা কুঁচকে আছে। চেয়ার টেবিলগুলো দামি কিন্তু যেখানে সেখানে ছড়ানো, মেঝে ভরতি সিগারেটের শেষ টুকরো সব পড়ে আছে, টেবিলের ওপর ডাব্বাই অ্যাশ-ট্রে উপচে পড়ছে ছাই, দেশলাইয়ের কাঠি আর সিগারেটের টুকরোয়। মেঝের ওপর পড়ে আছে স্টিরিওটা। রেকর্ডের গাদা দু'টো স্পিকারের ওপর রাখা। মেয়েলি হাতের স্পর্শ নেই। অজস্র বই চোখে পড়ে। সবই ইংরিজি। দর্শন, রাজনীতি থেকে ডিটেকটিভ বই পর্যন্ত। বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে বিল্ট-ইন ক্যাবিনেট খুলে গেলাস বের করে বীরু, আর হুইস্কির বোতল। বলে, ডাইলিউট করতে হলে ট্যাপ থেকে জল মিশিয়ে নাও। আমি নিট খাই, সোডা-ফোডার ঝামেলা নেই।
সন্ধে নাগাদ অনেকটাই মাতাল হয়ে গিয়েছিল মনোরম। কথা একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। পেটে পুরনো গ্যাসট্রিকের ব্যথা, খালি পেটে অ্যালকোহল পড়তে চিন চিন করে উঠছিল মাঝে মাঝে। ব্যথাটা কমাতেই বেশি খেল মনোরম।
তোর মেয়ে-বন্ধুরা এখানে আসে?
আসবে না কেন?
একা?

একাও।

আবার কিছুক্ষণ মদ খেল দু'জন।

বীরু।

উঁ।

মেয়েবন্ধুদের মধ্যে কাকে তোর ভাল লাগে সবচেয়ে?

সবাইকে। অদ্ভুত মদির হাসি হাসে বীরু, বলে, কে ভাল নয় বলো! মেয়েরা সবাই এত ভাল, এত সিমপ্যাথেটিক। আই লাভ দেম।

কাউকে বেশি ভাল লাগে না?

কাউকে অন্য কারও চেয়ে বেশি ভাল লাগতে পারে। তবে সকলেরই আলাদা রকমের ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে।

ধর, কারও সঙ্গে প্রেম করিস না?

প্রেমই তো। শুধু আন্ডারওয়্যার পরে বসে ছিল বীরু বেতের গোল চেয়ারে। লম্বা পা দু'খানা সামনে ছড়ানো। এমনভাবে 'প্রেমই তো' বলল, যেন ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির নিন্দে করছে।

তোর গার্ল ফ্রেন্ডদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে?

কে সুন্দর নয়! হাসল বীরুসবাই নিজের নিজের মতো করে সুন্দর। আমি একদম হারিয়ে যাই ওদের মধ্যে। আজকাল আমার এমন হয়েছে যে রাতে শুয়ে যদি কারও কথা ভাবি তা হলে ওর চোখ ওর মুখে এসে বসে, এর ঠোঁট তার মুখে চলে যায়। বিশেষ কাউকে মনে পড়ে না। সে এক ভারী ঝামেলা। শোওয়ার সময়ে বিশেষ একজনকে ভাবতে ইচ্ছে করে, পারি না।

কাকে?

রোজ তো একজনকে নয়!

তোর বন্ধুদের মধ্যে একজন আছে না, গৌরী! মাতাল মনোরম বলে ফেলল।

একটু স্থির হয়ে যায় বীরু, তারপর বলে, জানলে কী করে?

মনোরম মনে মনে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু ফেরার উপায় নেই।

খুব চালাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, গৌরী তো কমন নাম! আন্দাজে টোপ ফেললাম একটা।

আন্দাজে! বলে একটু হাসে বীরু, তারপর বিষণ্ণ মুখে বলে, আন্দাজে হলেও লাগিয়েছ ঠিক। গৌরী একজন আছে।

সে আসে?

আসবে কী, সে এখন নার্সিং হোমে!

কেন?

বড্ড বোকা মেয়ে। আজকাল কেউ যে অত বোকা আছে তা জানতাম না।

মনোরম ধৈর্যভরে পান করল আর একটুক্ষণ।

কী হয়েছে?

অ্যাকলেমশিয়া। তার ওপর ডানদিকটা পড়ে গেছে।

সে সব তো বাচ্চা-টাচ্চা হলে হয়।

তাই তো হয়েছে। প্রি-ম্যাচিওর বাচ্চা একটা।

কী করে হল?

যেমন করে হয়। আজকাল যে এমন বোকা মেয়ে আছে, কে জানত! প্রেগন্যান্সিটা কেবলই অস্বীকার করে যেত। অথচ আমরা জানতাম। আমার মতো ওর অনেক বিশ্বস্ত এবং সৎ বন্ধু ছিল। ও স্বীকার করলে আমরা খুব সেফলি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতাম, কেউ জানত না। ও লজ্জায় কোনওদিন স্বীকার করেনি।

বাঁচবে?

চান্স কম। প্রচুর হেমারেজ হয়েছে। 'কোমা'য় পড়ে আছে। কথা-টথা বলতে পারে না, জ্ঞানও ঠিক নেই। কাল থেকেই মনটা তাই খারাপ। মাঠ থেকেও সেজন্যই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।





তুই ওকে ভালবাসিস না বীরু?

বাসি। বিশেষ করে আজ তো ওকেই ভালবাসছি। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হওয়া তো ভালবাসাই, না?

ও যদি বাঁচে?

খুব ভাল হয় তা হলে। আমি একটা পার্টি দেব।

বিয়ে করবি ওকে বীরু?

বিয়ে? বীরু তাকায়। একটু ভাবে। তারপর বলে, ওকেই কেন করব?

বড় ভাল দেখতে মেয়েটা।

কোথায় দেখলে? একটুও বিস্মিত না হয়ে সাধারণভাবে প্রশ্ন করে বীরু।

দেখেছি।

হ্যাঁ, ভালই। বিয়ে ওকেও করতে পারি। কোনও প্রেজুডিস নেই।

কে ওকে প্রেগন্যান্ট করল?

কে জানে। যেই হোক, গৌরীর সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ওরই দোষ। মুঠো মুঠো ট্যাবলেট বাজারে বিক্রি হয়। কত মেয়ে নিজেরাই গিয়ে কেনে। ওরই কেবল লজ্জা আর লজ্জা।

তুই ওকে বিয়ে করিস বীরু।

আগে বাঁচুক তো! তুমি কি আরও খাবে? খেয়ো না। গাড়ি নিয়ে যাবে তো, না খাওয়াই ভাল। আমি আজ বাড়ি ফিরছি না। আর-একটু খেয়ে পড়ে থাকব।

বাড়িতে খবর দেব?

না না, কোনও দরকার নেই! মাঝে মাঝে আমি ফিরি না, সবাই জানে। তুমি যাও।

শূন্য গেলাস রেখে মনোরম উঠে এসেছিল।

সেই একটা সুদিন এসেছিল। তার পরদিন থেকেই বীরু আবার আলাদা মানুষ। গ্রাহ্য করে না, তাকায় না। কথা তো নেই-ই, আবার একজন অচেনা মানুষ হয়ে যায় বীরু।

খুঁজে খুঁজে নার্সিং হোমটা বের করেছিল মনোরম। মেয়েটা বেঁচে গেছে। বীরু আবার গাড়ি দাবড়াচ্ছে। মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টে। ওর ঘরে উদ্দাম বেজে যাচ্ছে স্টিরিওতে নাচের বাজনা। মনোরমের কথা কি মনে রেখেছে বীরু? না ভুলে গেছে?

ও কি উদাসীন সন্ন্যাসী? ও কি পাষণ্ড? ওকে ঠিক বুঝতে পারে না মনোরম। একেই কি জেনারেশন গ্যাপ বলে? বীরুর পিছু নিতে নিতেই মনোরম তার পোশাক পালটে ফেলল। রাখল বড় চুল, জুলফি। দিশি গাড়িটা নিয়ে সে যেমন বীরুর ফিয়াটের সঙ্গে তার দূরত্বটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, তেমনি জেনারেশন গ্যাপটাও অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে।

সেই মায়াদয়াহীন মুখখানা! বীরু বসে আছে টেবিলের উলটো দিকে। ফাইলপত্র ঘাঁটছে। মনোরম অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ে ছিল।

ফাইলটা বন্ধ করে বীরু মুখ তুলল। হঠাৎ আতঙ্কিত আনন্দে মনোরম দেখে ও হাসছে।

তোমার বউকে কাল দেখলাম।

কে! কার কথা বলছিস?

তোমার বউ সীতা।

সীতা! বউ! বউদি নয়? একটু অবাক হয় মনোরম।

কোথায়?

নিউ মার্কেটে। শি হ্যাড কোম্পানি।

ওঃ! তোকে চিনল?

এক-আধবারের দেখা, ঠিক চিনতে পারেনি। আমি চিনেছি। মেয়েদের মুখ আমার মনে থাকে।

কথা-টথা বললি?

হুঁ। সেইটেই একটা ভুল হয়ে গেল।

ভুল?

চিনতে পেরেই হঠাৎ 'বউদি' বলে ডেকে ফেলেছিলাম। খুব ঘাবড়ে গেল। তাই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। একটু কষ্টে চিনল। দু'-চারটে কথাবার্তা হল।

বউদি বলে ডাকলি?

তবে কী বলে? বউদিই তো হয়! ছাই সেটাও একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল।

কেন?

সঙ্গে যে লোকটা ছিল, ওয়েলবিল্ট কেভম্যান, সে লোকটা আমার দিকে ভীষণভাবে চেয়ে রইল। আমি বউদির সঙ্গে কথা বলছি, আর লোকটা অপলক চেয়ে আছে, যেন খেয়ে ফেলবে। যখন চলে আসছি তখন লোকটা আমাকে ডাকল, একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, আপনি ওকে বউদি ডাকলেন, কিন্তু ও এখন কারও বউ নয়, জানেন? আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক। ক্ষমা-টমা চেয়ে নিলাম। ও নিজেই বলল, বরং ওকে নাম ধরে ডাকতে পারেন, কিংবা মিস সান্যাল বলে। আমি সেটাও মেনে নিলাম। চলে আসবার সময়ে তোমার এক্স-বউকে ডেকে বললামসীতা চলি।

মনোরম কিছু শুনছিল না। শুধু বলল, হুঁ।

লোকটা রুস্তম টাইপের, আর খুব জেলাস। গায়ে অনেক মাংস, সাতটা বাঘে খেয়ে শেষ করতে পারে না।

কৌতুকভরে বীরু চেয়ে আছে মনোরমের মুখের দিকে। মনোরম মুখটা ফিরিয়ে নেয়। জিভটা সব সময়েই নড়ে, কিন্তু অভ্যাস বলে সবসময়ে মনোরম তা টের পায় না। এখন পেল। মুখের ভিতরে যেন একটা হৃৎপিণ্ড, অবিরল তার মৃদু শব্দ।

## ॥ চার ॥

দিন যায়। মাঝে মাঝে খুব মেঘ করে আসে। বৃষ্টি হয়। কখনও রোদ উঠে নীল জলের মতো আকাশ দেখা যায়। ঘরে ভাল লাগে না। স্পষ্টই বোঝে, বাড়িতে কুমারী-জীবনে যেমন ছিল সে, তেমনটি আর নেই। বিবাহিতা অবস্থায় যেমন ছিল, তেমনটাও নেই। দাদাই যা একটু সহজ। কিন্তু সীতার সঙ্গে দাদার দেখা হয় কতটুকু সময়! মক্কেল আর কোর্ট-কাছারি নিয়ে দাদা বড় ব্যস্ত।

মনোরম জামাই হিসেবে এ-বাড়ির কারও পছন্দের ছিল না। তবু সবাই এক রকম তাকেই ছোট জামাই হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সীতা ভুল করেছে, এ-কথা সবাই বুঝত। সীতাও বুঝেছে, একটু দেরিতে।

বাবা ইদানীং কানে বড় কম শোনে। একটা যন্ত্র আছে কানে পরবার। তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি। একটু চেঁচিয়ে বললে শোনে।

"মেয়ে, কখনও পরপুরুষের সঙ্গে একা রাস্তায় হেঁটো না।"

"মেয়ে, বাবা আর ভাই ছাড়া কোনও পুরুষের উপহার নিয়ো না।"

বিয়ের আগে এ-সব কথা একটা ক্ষুদে বই থেকে বাবা তাকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাত। বইটার নাম ছিল, নারীর নীতি। উপদেশ দু'টো সীতা মানেনি। শিমুলতলার প্রকৃতিতে কী একটা ছিল, মাদকতাময়, বাধা ছিন্ন করার নিমন্ত্রণ।

বিয়েটা পছন্দের না হোক, বাবা তবু বিয়ের পর সেই বইটা থেকেই আবার শোনাত স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের বিশ্রামের জায়গা। যখন খেটেখুটে সে ফিরে আসবে, তখনই তাকে অভাব-অভিযোগের কথা বোলো না। তাকে সেবা দিয়ো, সুস্থ করে তুলো, তারপর মৃদু নম্রভাবে যা বলার বলো। মনে রেখো, তুমি তাকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করে রাখার চেষ্টা করলে সে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসবে। সার্থক হবে না সে। বরং তাকে আদর্শের দিকে ঠেলে দিয়ো, সে পৃথিবী জয় করবে...ইত্যাদি। বয়সে অনেক বড় ছিল মনোরম, সীতার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। বাবাকে এ-ব্যাপারটা খুব খুশি করেছিল, স্বামীর সঙ্গে বয়সের বেশি তফাত থাকাই নাকি ভাল, এগুলো মনে রাখার কথা নয়। সীতা রাখেনি। উপদেশ হচ্ছে পেটেন্ট ওষুধের মতো। রোগ কী তা না জেনেই কিনে এনে খাও। সকলেরই তো একই

নয়। বিশেষ অসুখের জন্য বিশেষ ওষুধ দরকার। তার জীবনে উপদেশটা ঠিক খাটেনি। তবু বিয়ের পর বহুকাল বাবা তাকে নারীর নীতি পড়ে শুনিয়েছে। মনোরমকে কোনও আদর্শের দিকেই ঠেলে দিতে পারেনি সীতা। তারা প্রেম করেছে, রতিক্রিয়া করেছে, খেয়েছে, ঘুরেছে। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, আবার ভাবও। সন্দেহ এবং অবিশ্বাস এসেছে, আবার প্রেমও করেছে। এবং তারপর ক্লান্তি এসেছিল। এল. নিস্পৃহতা। যত বয়স বাড়ছিল, ততই মনোরম পুরোপুরি বাধ্য পরিচারিকা তৈরি করতে চেয়েছিল সীতাকে। প্রেমের কথা, ভালবাসার স্পর্শ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অনেক সময়ে শরীর ঘটিত না একনাগাড়ে সপ্তাহভর। কেবল বুকের মাঝখানে কামগন্ধহীন মাথাটা এগিয়ে দিত। সীতা মাঝে মাঝে সে মাথাটা সন্তর্পণে বালিশে তুলে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছে। মানস এসে বসত বাইরের ঘরে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসত, কিন্তু তার হাসি, আন্তরিকতাময় কথাবার্তা শরীরের দূরত্বটুকু অতিক্রম করত অনায়াসে। কিন্তু এগুলো কারণ নয়। আসল কারণ ওই সন্দেহ। মাঝেমধ্যে একটা অস্পষ্ট যৌনঋণ-এর কথা উল্লেখ করতে থাকে মনোরম। ক্বচিৎ কদাচিৎ যখন তারা শরীরে শরীর মেলাত, তখন মনোরমের ছিল শ্বাসকষ্টের মতো দম ফেলতে ফেলতে ওই প্রশ্ন, বলো তো, আমি কে?

তুমি! তুমি তো তুমিই! আবার কে?

না, না, ঠিক করে বলো। ঠিক করে বলো। আমি কে?

তা হলে জানি না।

তা হলে আমি বলি?

বলো।

রাগ করবে না?

কী এমন বলবে যে রাগ করব?

আমি এখন—আমি বোধ হয়—মানস লাহিড়ি!

কী বলছ?

নই?

তুমি অন্য লোক হতে যাবে কেন?

আমি অন্য লোক নই। কিন্তু তুমি যাকে ভাব?

ভাবব? ভাবব আবার কী? কেন ভাবব?

আমি তো পুরনো হয়ে গেছি। আমি তো আর উত্তেজক নই! এই বয়সেই স্বামী-স্ত্রী অন্য মানুষকে ভাবতে শুরু করে।

স্তব্ধ হয়ে থেকেছে সীতা। বুকের ওপর মানুষ, কত কাছের মানুষ, তবু কী অস্বস্তিকর জটিলতা!

কোনওদিন বা সুখকর ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে—

মানুষের মন, তার কোনও ছবি দেখা যায় না।

কী বলছ?

মানুষ মনে যে কে কাকে ভাবে!

সীতা ঝাঁকি দিয়ে জিগ্যেস করেছে, স্পষ্ট করে বলো।

আমি এখন তোমার মনের ভিতরটা দেখতে চাই।

কেন?

দেখতে চাই, সেখানে কে আছে!

তুমি কি পাগল?

কেন?

তুমি আমাকে সন্দেহ কর?

মনোরম চুপ।

সীতা দু'হাতে মনোরমের বাহু খামচে ধরে বলেছে, বলো, সন্দেহ করার মতো তুমি কী দেখেছ! কী করেছি আমি?

কিছু দেখিনি। শুধু দেখেছি, তোমরা বাইরের ঘরের টেবিলের দু'পাশে দু'জন বসে আছ। তুমি উল

বুনছ, মানস তোমার দিকে চেয়ে আছে। আর কিছু না।

তবে?

কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তোমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য সার্কল। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো কী একটা যাতায়াত করছে। একটা বলয়, সেটা শূন্য, অদৃশ্য, কিন্তু আছে। তোমরা ভালবাসার কথা বলো না। কিন্তু ও তোমাকে কমপ্লিমেন্ট দেয়, যা আমি আগে দিতাম তোমাকে, এখন আর দিতে পারি না। আমার স্টক ফুরিয়েছে। তোমাকে পেয়েছি যখন, তখনই হারিয়েছি। রহস্য শেষ হয়ে গেছে আমাদের। কিন্তু ও নতুন, বাইরে থেকে এসেছে। ওর দেওয়ার আছে অনেক। তুমিও নিচ্ছ। জমে উঠছে ঋণ। সে ঋণ কী ভাবে শোধ হবে?

সীতা কেঁদেছে, না বুঝে।

মনোরম তবু বলেছে, সেই ঋণ শোধ হয় কল্পনায়। আমার শরীরে চলে আসে মানস লাহিড়ি।

কাঁদতে কাঁদতেও সীতা রেগে গিয়ে বলেছে—কল্পনা। সে তো তোমারই! তুমি মেয়েদের নিয়ে কল্পনা করতে না?

এখনও করি। করি বলেই ধরতে পারি।

না, আমি তোমার মতো স্বপ্ন দেখি না। আমার অত কল্পনাশক্তি নেই। কারও ধার আমি ধারি না।

এইভাবে মাঝরাতে উঠে তাদের ঝগড়া হত। প্রচণ্ড ঝগড়া।

মনোরম ভুল করেছিল। তার নিজের কল্পনাশক্তিই খেয়ে ফেলেছে তাকে। নিজের দোষ সে সীতার ওপর আরোপ করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু মানস আসত। উল বুনত সীতা। মানস বসে থাকত। না, দূরত্বটা কখনও অতিক্রম করত না মানস। তার আছে নিজেকে ধরে রাখার অমানুষিক ক্ষমতা। কিন্তু থেমে-থাকা স্টার্ট-দেওয়া মোটরগাড়ি যেমন কাঁপে, তেমনই কি কেঁপেছে মানস! বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও সে সীতার শরীর আক্রমণ করেনি বহুদিন। অপেক্ষা করেছে। মাত্র সেদিন সে...

কিন্তু ঘুরেফিরে সেই মানসই এল। মনোরম ভুল বলেছিল বটে, তবু ভুলটাকে সত্যি করে দিল নাকি সীতা! এখন যদি মনোরম কখনও সামনে এসে দাঁড়ায়, যদি প্রশ্ন করে, তবে মূক হয়ে মাথা নত করে নেবে না কি সে?

বাবা সেই ক্ষুদে বইটা থেকে তাকে উপদেশ শুনিয়েছে কুমারী অবস্থায়। বিবাহিতা জীবনে। কিন্তু যখন এই তৃতীয় অবস্থায় সে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে, তখন আর বাবা সেই ক্ষুদে বইটা পড়ে তাকে শোনায় না। বেশির ভাগ সময়েই কানের যন্ত্রটা বাবা আজকাল খুলে রাখে।

গোপন কোনও কথা বলতে হলে দাদা বাবাকে ছাদে নিয়ে যায়। সেখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে। সীতা এবার এলেও দাদা ও-রকমভাবে বাবাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়েছে। বাবা সীতাকে কিছু বলেনি। কেবল তার দন্তহীন মুখে বার বার ঠোঁট জোড়া গিলে ফেলেছে বাবা। চার দিকে চেয়ে কী যেন খুঁজেছে। এ-সময়ে বোধহয় মৃতা স্ত্রীকেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল মানুষটার। ছেলেমেয়েদের কথা বাবা আর বুঝতে পারে না। স্ত্রী বেঁচে থাকলে একমাত্র তার কথাই মানুষটা বুঝতে পারত।

নীচে দাদার অফিসঘরে টেলিফোন আছে। ওপরের হলঘরে তার এক্সটেনশন। 'কল' এলে দু'টো ফোনই বাজে। নিয়ম হল টেলিফোনে রিং হলে নীচে দাদা ধরে, ওপরে সীতা, বাবা কিংবা বউদি। দাদার কল হলে ছেড়ে দেয়, নিজেদের 'কল' হলে দাদা ছেড়ে দেয়।

সেদিন বউদি কালীঘাট গেছে, সীতা বাথরুমে। বাবা হলঘরে বসে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছে। সে সময়ে টেলিফোন বাজছিল। বাবা ধরল না। সীতার গায়ে তখন সাবান। সে চেঁচিয়ে বলল, বাবা, ফোনটা ধরো। শোনার কথা নয় বাবার। বেজে বেজে টেলিফোন থেমে গেল। নীচে দাদা ধরেছে। একটু পরেই দাদা সিঁড়ির গোড়ায় এসে চেঁচিয়ে বলল, সীতা, ফোনটা ধর। তোর 'কল'।

কোনওক্রমে গায়ে কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল সীতা। ফোন কানে নিল। কোনও শব্দ হল না। হ্যালো, হ্যালো, অনেকবার করল সে। কোনও উত্তর নেই। বোধহয় ছেড়ে দিয়েছে। ফোনটা রেখে

দেওয়ার আগে তার অস্পষ্টভাবে মনে হল, ওপাশে যেন একটা দীর্ঘশ্বাসের অস্ফুট আওয়াজ হল। ভ্রূ কোঁচকাল সীতা। ভুলই হবে। রেখে দিল। বাবাকে বলল, ফোনটা ধরনি কেন বাবা, দেখ তো লাইনটা কেটে গেল।

বলেই লক্ষ করল, বাবার কানে যন্ত্রটা নেই। বাবার ঘর থেকে যন্ত্রটা নিয়ে এল সীতা। বাবার কানে লাগাতে লাগাতে বলল, কেন যে যন্ত্রটা পরে থাক না!

বাবা হঠাৎ মুখ তুলে আঁতকে উঠে বলে, না, না! ওটা লাগাস না।

সীতা অবাক হয়ে বলল, কেন?

বাবা সীতার ঠোঁট নড়া দেখে বলে, ওটার আর দরকার নেই।

বাঃ! তুমি যে এটা না হলে শুনতে পাও না!

বাবা চোখটা সরিয়ে নিয়ে বলে, অনেক শুনেছি। সারা জীবন। আর কিছু শুনতে চাই না। ঠাকুর করুন, যে ক'টা দিন বাঁচি, আর যেন কিছু শুনতে না হয়। এটা ফেলে দে।

এইভাবেই বাবা তার পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার জগতে চলে গেছে। স্বেচ্ছায় নির্বাসন। মাঝে মাঝে বাবার ঘরে যেতে ইচ্ছে করে সীতার। যায়। বাবা চোখ সরিয়ে নেয়। আর বারবার দন্তহীন মুখে নিজের ঠোঁটজোড়া গিলে ফেলতে থাকে। কচ্ছপের মুখের মতো। কথা বলে না। বলতে পারে না। বাঁধানো দাঁতের পাটিজোড়া বাবা ছেড়ে রেখেছে, খাওয়ার সময় ছাড়া পরে না। চশমাও খুলেই রেখে দেয় বেশির ভাগ সময়। একটু বুড়োটে, আর কুঁজো হয়ে বসে থাকে ঘরে। যেন বা নকল দাঁত, নকল চোখ, নকল কান, কিছুরই আর প্রয়োজন নেই বাবার। ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যই—এ-রকম বিশ্বাসে সব নির্মোক ঝেড়ে ফেলে প্রতীক্ষায় বসে আছে বাবা। কীসের? এক পরিপূর্ণতম নিস্তব্ধতার? নিশ্ছিদ্র এক অন্ধকারের? অন্তহীন ঘুমের? বাবা কিছুই শোনে না। চারধারে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ। সীতা মাঝে মাঝে যায়। বসে থাকে। ক্ষুদে বইটা থেকে উপদেশগুলো বাবা আর কোনওদিনই শোনাবে না, বুঝতে পারে। বাবার নিস্তব্ধতার কাছে ক্ষণেক বসে থাকে সে। ঠিক সহ্য করতে পারে না। অসহ্য হয়ে উঠে আসে।

নতুন কেনা একটা শাড়িতে 'ফলস' লাগাচ্ছিল সীতা। বউদি এসে একটু দাঁড়িয়ে দেখল।

নতুন শাড়ি?

হু।

কে দিল?

কে দেবে? নিজেই কিনলাম।

শাড়িটার অনেক দাম নিয়েছে?

মন্দ না।

আশি নব্বই?

ও-রকমই।

বউদি একটা শ্বাস ছাড়ে, বলে, ঠাকুরঝি, তোমার কত টাকা! তুমি কত স্বাধীন!

তুমি কি গরিব? পরাধীন?

তা নয়। তবে ইচ্ছেমতো কিছু কিনে আনব, তার তো উপায় নেই! যা করব, সব অনুমতি নিয়ে করতে হবে। তুমি বেশ আছ।

এ-রকম 'বেশ' থাকতে চাও নাকি?

চাই-ই তো।

কেন?

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সব সংসারটা হাটকে মাটকে দিয়ে চলে যাই। মেয়েমানুষ হওয়া একটা অভিশাপ।

ও-রকম সবাই বলে। আবার এ-সব নিয়েই থাকে।

তুমি তো থাকোনি!

সীতা দাঁতে ঠোঁট চাপে। আস্তে বলে, ও-সব কথা থাক বউদি। তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

বউদি চলে গেলে অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ফলসটার দিকে চেয়ে থাকে সীতা। ফুটপাতের দোকান থেকে কেনা ফলস মাপে অনেকটা ছোট হল, শাড়ির পুরো কুঁচিটা ঢাকা পড়বে না। খুব ঠকে সীতা। দেখেশুনে কেনে, তবু ঠিক ঠকে যায়। বরাবর। মনোরম খুব রাগ করত, বলত, মেয়েদের অভ্যাসই হচ্ছে সস্তা খোঁজা। সারা কলকাতা দু' নম্বর মালে ছেয়ে গেছে, আসল-নকল চিনবার উপায়ই নেই, কেন নিজে নিজে কিনতে যাও?

ফলসটায় ঠকে গেছে বলে সীতার মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। এতটাই খারাপ হল যে, উঠে বিছানায় গিয়ে শুল। এবং একটু পরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে সে মনে মনে প্রাণপণে তার কান্নার গূঢ় কারণটাও বোধহয় খুঁজে দেখছিল। কারণটা খুঁজে পেল একটু পরে। বউদি একটা কথা বলেছিল, তোমার কত টাকা! তুমি কত স্বাধীন! কথাটার মধ্যে কিছু নেই। তবু আছে। মনোরমের সর্বস্ব কেড়ে না-নিলেও পারত সে। বীরু সেদিন বলছিল, মনোরম তার কৃপণ মামার কাঠগোলায় চাকরি করছে। বীরু ছেলেটা মুখ-পলকা। হেসে বলেছিল, আমার বাবার কাছে কাজ করা মানে কিন্তু সুখে থাকা নয়। জানো তো! না জানলেও বোঝে সীতা। সুখে নেই।

মানস আবার কাল চলে যাবে দিল্লি। চার-পাঁচ দিন পরে ফিরবে। ফোন করল দুপুরে।

আজ বিকেলে ফ্রি থেকো মৌ।

আমি তো সব সময়ে ফ্রি।

একটু ঘুরব।

আচ্ছা।

দিল্লি যাচ্ছি।

জানি তো।

ভাল লাগে না।

সীতা হাসল। শব্দ করে। যাতে মানস ফোনে হাসিটা শোনে।

বেশি দিন তো নয়।

তা নয়। দুঃখিত গলায় মানস বলে, কিন্তু সারাজীবনই এ-রকম মাঝে মাঝে আমাকে চলে যেতে হবে। ছেড়ে থাকতে পারব তো?

সীতা শ্বাস ফেলল, এবং সেটাও শুনতে পেল মানস। আবেগের সঙ্গে বলল, মাঝে মাঝে তোমাকেও নিয়ে যাব।

যেয়ো।

আমি সেই ক্লাবটা থেকে ফোন করছি।

কোন ক্লাব?

সেই ক্লাবটা, যেখানে সেদিন...হাসিটা ফোনে শোনাল মানস।

সীতা একটু হাসল।

মানস বলল, ইচ্ছে করলে আজ আবার আমরা এখানে আসতে পারি।

সীতা উত্তর দিল না।

রেডি থেকো। পাঁচটায়।

কথা শেষ হয়ে যায়। তবু একটু ফোন ধরে থাকে দু'জন। পরস্পরের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনে।

ফোনে শ্বাসের শব্দ শুনলে সীতার কেমন একটু অন্যমনস্কতা আসে। ক'দিন আগে একটা ফোন কল কেটে গিয়েছিল। কেটে গিয়েছিল? নাকি কেউ সত্যি ছিল ওপাশে? একটা অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনেছিল সীতা। ভুল? তাই হবে। কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে।

ফোন রেখে দেয়।

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বার বার সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছিল মানস। হাওয়ায় দেশলাইয়ের কাঠি নিবে যাচ্ছে বার বার। সীতা হাসছিল।

ওভাবে নয়। হাত দু'টো 'কাপ' করে নাও। সীতা বলে।

কাপ? সেটাই তো হচ্ছে না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকছে।
থাক, খেতে হবে না।
খাবই। এই ড্রাইভার রোখ্‌কে।
ট্যাক্সি দাঁড়ালে সিগারেটটা ধরাতে চেষ্টা করে মানস। সীতা দেশলাই কেড়ে নেয়। নিজে যত্নে ধরিয়ে দেয়। ট্যাক্সি আবার চলে।
কেন যে ছাই লোকে খায় এটা। কী আছে সিগারেটের মধ্যে?
বোধহয় ভালবাসা। মনে মনে এই কথা বলে সীতা। মুখ টিপে হাসে। দেখে, ধোঁয়া লেগে মানসের দুই হরিণ-চোখ ভরা জল।
আর খেয়ো না।
কেন?
অভ্যেস নেই। কাশবে।
আমার মুখে কি কোনও দুর্গন্ধ আছে সীতা?
সীতা নয়, মৌ। তুমিই নাম দিয়েছিলে।
সিগারেটের ধোঁয়ায় মাথা আবছা হয়ে গেছে। কিছু ভাবতে পারছি না। গন্ধ নেই তো?
না তো! তোমার মুখের গন্ধ সুন্দর।
তবে কেন সিগারেট খেতে বললে আমাকে?
পুরুষেরা সিগারেট খায়, দেখতে আমার ভাল লাগে।
শুধু দেখার জন্য একজনের না-খাওয়ার অভ্যাস নষ্ট করছ?
খেয়ো না।
রাগ করে বলছ?
না, আমার অত সহজে রাগ হয় না।
সিগারেট তো আমি খাচ্ছিই। অভ্যাস করে নেব।
না। মাঝে মাঝে খেয়ো। পুরুষের মুখ কাছাকাছি এলে একটুখানি সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যায়, সেটা ভীষণ ভাল লাগে।
আচ্ছা! মনোরম খুব খেত না?
খেত। কিন্তু তার সঙ্গে এটার কোনও সম্পর্ক নেই।
জানি। সেদিনকার ওই লম্বা ছেলেটা কে?
বীরু। আমার মামাশ্বশুরের ছেলে।
তোমার মামাশ্বশুর? বলে মানস চেয়ে থাকে। খুব অবাক চোখ। সীতা অবাক হওয়ার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে বলে, কী হল?
মামাশ্বশুরের ছেলে?
হ্যাঁ। দেওর।
কী বলছ মৌ?
হঠাৎ খেয়াল হতে সীতা জিভ কাটে। ঠিক তো। তার আর কোনও মামাশ্বশুর নেই, দেওর নেই। মুখ নিচু করে একটু লাজুক ভঙ্গি করল সীতা।
ভুল হয়ে গিয়েছিল।
মানসকে একটু পাঁশুটে দেখায়। সিগারেটটা আধখাওয়া করে ফেলে দিয়ে বলে, ঠিক আছে।
না, ঠিক নেই। তুমি রাগ করেছ। সীতা একটু ঘন হয়ে বসে।
রাগ করিনি। তবে কেমন একটু লাগে। তুমি ঠিক ভুলতে পারছ না।
ভুলছি। এইমাত্র সব ভুলে গেলাম। দেখ, আর এ-রকম হবে না।
মানস একটু থমথমে মুখে বলে, ভুলবে কী করে, যদি কলকাতাময় মনোরমের আত্মীয়রা ছড়ানো থাকে!
ওর বেশি আত্মীয় নেই।

নেই?
না। ওর বুড়ো বাবা—বলে তাকিয়ে একটু হাসে সীতা, বলে, দেখ, শ্বশুর বলিনি কিন্তু।
মানস হাসে।
ওর বুড়ো বাবা ওর ছোটভাইয়ের কাছে থাকে দূরের এক মফস্বল শহরে। সে বাড়িতে আমি মোটে বার দুই গেছি। ও বেশি সম্পর্কও রাখত না। মা নেই। এখানে যারা আছে, তারা সব মামা, মাসি, পিসি গোছের। সে সব সম্পর্কও আলগা হয়ে গেছে।
তোমাকে আমি খুব দূরে নিয়ে গিয়ে থাকব।
কেন? ওর আত্মীয়দের ভয়ে?
হুঁ। আমার রেলের চাকরি। ইচ্ছে করলেই বদলি হতে পারি।
আমার কলকাতা ভাল লাগে।
কেন?
আমার লাগে। একটা শখ আছে আমার, ঘুরে ঘুরে এ-জায়গা সে-জায়গা থেকে জিনিসপত্র কেনা। কিনতে যে কী ভীষণ ভাল লাগে! কলকাতা ছাড়া এ-রকম দোকান আর দোকান তো কোথাও নেই!
আচ্ছা, তা হলে কলকাতাতেই থাকব। ফ্ল্যাট তো পেয়েছিই।
আমি কিন্তু খুব জিনিস কিনি, আর ঠকে আসি।
কিনো।
ঠকলে বকবে না তো?
না। মেয়েরা তো ঠকেই। কলকাতায় এই যে এত দোকান, এত ফিরিঅলা, এরা তো মেয়েদের ঠকিয়েই বেঁচে আছে।
তুমি কত মেয়ে চেনো!
একজনকে তো চিনি। তাকে চিনলেই সব চেনা হয়ে যায়।
আমি একটা গ্লাটন। সামনে আস্ত একটা মুরগির রোস্ট, নিচু হয়ে সেটার গন্ধ শুঁকে বলল মানস।
গ্লাটন মানে কী?
লোভী। পেটুক।
যাঃ। তুমি কি তাই?
নয়?
একদম নয়। তোমার শরীর আন্দাজে ওইটুকু আবার খাওয়া নাকি! একটা তো এইটুকুন মাত্র মুরগি!
আস্ত মুরগি।
হোকগে।
খাওয়া কমাব, বুঝলে মৌ?
কেন?
তুমি খাবে এইটুকুন, আমি খাব অ্যাতো, সেটা কি ভাল দেখাবে?
মোটেই তুমি অ্যাতো খাও না।
খাই।
খাও তো খাও।
তবে তুমি খাওয়া বাড়াও।
মেয়েরা বেশি খেতে পারে না।
কে বলেছে? এসপ্ল্যানেডে বিকেলের দিকে মেয়েরা যা গপাগপ ফুচকা খায় না, দারা সিং অত খেতে পারবে না।
সীতা মুখে আঁচল তুলে হাসল।
তুমি খাও না বলেই রোগা হয়ে অ্যানিমিক।
স্লিম থাকাই তো ভাল। মোটা মেয়েরা বেশি ভোগে। আমার কোনও অসুখ নেই।
তোমার ঠিক অ্যানিমিয়া আছে। ডাক্তারের কাছে গেলেই ধরা পড়বে।

থাকলে আছে।

থাকবে কেন?

থাকলে অপছন্দ নাকি? বিয়ে বাতিল করবে?

দু'জনে দু'পলক পরস্পরের দিকে চেয়ে থেকে হেসে ফেলে।

আইসক্রিমটা নাড়াচাড়া করছ মৌ, খাচ্ছ না।

ভীষণ ঠান্ডা, দাঁত শিরশির করে। গলা বসে যাবে।

তবে পকৌড়া খাও।

ভাল লাগছে না। তুমি খাও, আমি দেখি।

আস্তে ধীরে খাচ্ছিল মানস, মাঝে মাঝে তাকিয়ে হাসছিল। একদৃষ্টে চেয়েছিল সীতা। সুন্দর মেদহীন চৌকো পুরুষ মুখশ্রী। কাঁধ দু'টো কতদূর ছড়ানো। মস্ত হাত। দেখতে ভাল লাগে। অনেকদিন ধরে দেখছে সীতা। তবু এ নতুন করে দেখা। এভাবে দেখা হয়নি। এই ডবলডেকারের মতো মানুষটার কাছে সে পাখির মতো ছোট্ট। বোধহয় মানসের মাথা কোনওদিনই বুকে নিতে হবে না সীতার। এবার উলটো নিয়ম হবে। তাকেই পাখির মতো বুকে নিয়ে শুয়ে থাকবে লোকটা। সারা রাত।

হঠাৎ সীতা আস্তে করে বলে, তুমি স্বপ্ন দেখ না?

স্বপ্ন? একটু হাঁ করে চেয়ে থাকে মানস। তারপর অনেকক্ষণ বাদে হাসে, স্বপ্ন, মৌ? না, দেখি না। আমি খুব সাউন্ড স্লিপার। কেন?

এমনিই। অনেকে ঘুমের মধ্যে কথা বলে।

আগে থেকে সাবধান হচ্ছ? ভয় নেই, ও-সব হয় তাদের যারা স্নায়ুর রোগে ভোগে।

তাই!

আবার চুপ। দু'জনেই। সীতা সাদা আঙুলে কাচের টেবিলে একটা শূন্য আঁকল। তারপর মুখ তুলে হাসল।

ট্যাক্সিটা বাঁক ঘুরতেই অন্ধকারের মধ্যে স্টিমারের মতো ঝলমল করে ওঠে ক্লাব। চারধারে যেন বা কালো নদী। স্টিমার চলেছে।

গাছগাছালিতে বাতাস মর্মরধ্বনি তুলেছে। আলোকিত টেনিস লন। সাইটস্ক্রিনের আড়ালে বলে দেখা যায় না কিছু। হঠাৎ পক করে বলের শব্দ আসে।

আজও কেউ বড় একটা ফিরে তাকায় না। তারা সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। টেবল-টেনিসের টেবিলে খুব ভিড় আজ। বহু খেলোয়াড়। চার দিকে বেয়ারাদের দ্রুত আনাগোনা।

মানস মুখ ফিরিয়ে হাসল। বলল, আজ শনিবার।

তাতে কী?

ভিড়।

ও।

শনিবারে কলকাতার মানুষ পাগল হয়ে যায়।

আমরাও কি শনিবারের পাগল?

না। চিরকালের।

করিডোরে একজন লোক শ্লথ পায়ে আগে আগে হাঁটছিল। কথা শুনেই বোধহয় ফিরে তাকাল। অচেনা লোক। খুব ফরসা সুন্দর চেহারা, অবিকল সাহেবদের মতো। লালচে একজোড়া গোঁফ, লালচে চুল এলোমেলো হয়ে আছে মাথায়। মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ। একটু হাসল কি লোকটা?

সীতা সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, সে কিছু অন্যায় করছে না। সে কোনও অপরাধ করেনি।

পিঠে মানসের আলতো হাত তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু ভয় নেই।

ঘরটা খালিই ছিল। ঠিক আগের দিনের মতো। মানস দরজাটা আগেই বন্ধ করে দিল। ফিরে ইঙ্গিতময় হাসি হাসল একটু। ঠিক সেই মুহূর্তেই সীতার মনে পড়ে, ক'দিন আগে কেটে যাওয়া টেলিফোন কল। লাইনটা কি কেটে গিয়েছিল সত্যিই? না কি কেউ দীর্ঘশ্বাসই কেবল শুনিয়েছিল তাকে?

ভ্রূ আপনা থেকেই কুঁচকে গেল সীতার।
কী হল? কিছু ভাবছ? মানস প্রশ্ন করে।
সীতা উত্তর দেয় না। শুনতেই পায় না প্রশ্নটা।
ঘরের এক দিকে চমৎকার একটা পুরনো আমলের ড্রেসিং টেবিল। বেলজিয়ামের মসৃণ কাচ বসানো। সীতা ধীর পায়ে উঠে গিয়ে একটু দাঁড়াল আয়নার সামনে। অ্যানিমিক? বোধ হয়। তাকে খুব রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মিছে কথা বলেছিল সীতা মানসকে। তার আজকাল খুব অম্বল হয়, মাথা ধরে। হয়তো খুব শিগগিরই অসুখ হবে। আমার অসুখ নেই, এ-কথাটা খুব ভেবে বলেনি সে। একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মানস। এতক্ষণে ওর পোশাকটা লক্ষ করেনি সীতা তেমন করে। খুব ঝকঝকে একটা চেক প্যান্ট পরনে, গায়ে সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি। বুকের চৌকো পাটা ফুটে আছে গেঞ্জির ওপর। বাঁ কাঁধটা ভাঙা, একটু নোয়ানো। খুবই বড় শক্তিমানের চেহারা। ওর পাশে সে কি আধখানা, না সিকিভাগ?
মানস এগিয়ে আসে।
সীতা আস্তে করে বলে, তোমাদের দু'জনের খুব অদ্ভুত মিল।
কাদের দু'জনের কথা বলছ?
তোমার আর ওর।
ও কে?
মনোরম।
মিল?
দু'টো খুব অদ্ভুত মিল।
কী?
তোমাদের দু'জনের নামই 'ম' দিয়ে শুরু। আর...
আর?
তোমাদের দু'জনেরই একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।
মানস এগিয়ে এসেছিল অনেকটা, তবু দূরত্ব ছিল একটুখানি। সেই দূরত্বটা রয়েই গেল। মানসের মুখটা আস্তে আস্তে একটু গম্ভীর হয়ে যায়।
বলল, মৌ, আমাকে তুমি সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছ কেন?
এমনিই। ভাল লাগে।
না।
তবে কেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সীতা।
মনোরমের সঙ্গে আমার আরও মিল বের কবতে।
তার মানে?
তুমি কি আমার মধ্যে মনোরমকেই চাও?
সীতা মূক হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ঝুমু, তুই বাসাটা ছেড়ে দে। আমার বাড়িতে চলে আয়। যা বাকি বকেয়া পড়েছে তা আমি দিয়ে দেব।
কেন?
ওয়াচ হিম। ওয়াচ হিজ স্টেপস।
কোনও লাভ নেই।
কেন?
ওর ভিতরে কিছু সাহেবি ব্যাপার ঢুকে গেছে।

সেটা কী?
সব বুঝবার তোমার দরকার কী?
আমার ছেলে, আর আমার বুঝবার দরকার নেই?
জেনারেশন গ্যাপ বোঝো?
বুঝব না কেন? বুঝি কিন্তু মানি না। ও-সব বানানো কথা।
হবে।
ঝুমু, আমার কেবলই মনে হয় ও শিগগিরই নিজেকে শেষ করবে।
মনোরম চুপ করে থাকে।
তুই সব সময়ে আমার আর ওর কাছাকাছি থাক ঝুমু।
মানুষ তো আমি একটা, দু'জনের কাছে থাকব কী করে?
সময় ভাগ করে নে। না, বরং তুই ওর কাছে কাছেই থাক। ওরই বিপদ বেশি।
এ-কথা বলছ কেন? কীসের বিপদ?
ও তো কিছু বলে না, কিন্তু মনে হয়, ও একটা প্রবলেমের মধ্যে আছে।
প্রবলেমের মধ্যে সবাই থাকে।

কিন্তু বীরুর তো প্রবলেমের কোনও কারণ নেই। ভেবে পাই না, ওর প্রবলেমের কী থাকতে পারে! তাই মনে হয়, ওর বড় বিপদ।

বিপদ? না কিছুই খুঁজে পায় না, ভেবে পায় না মনোরম। ও খারাপ মেয়েমানুষের কাছে যায় না যে রোগ নিয়ে আসবে। ওর মেয়েবন্ধুরা অভিজাত পরিবারের। অবৈধ সন্তানের ভয় নেই, খোলা বাজারে বিক্রি হয় কন্ট্রাসেপটিভ। ওর প্রেমের কোনও ঝামেলা নেই, কারণ ঘুমের সময়ে ওর কারও মুখ মনে পড়ে না। জুয়ায় অনেক টাকা হেরে গেলেও ওর অনেক থাকবে।

প্রবলেমটা খুঁজে পায় না বটে মনোরম, কিন্তু খুঁজে ফেরে। দিশি গাড়িটা নিয়ে সে ক্লান্তিহীন ছোটে বীরুর পিছনে। বীরু মুহুর্মুহু পোশাক কেনে, কেনে গ্রামোফোনের উত্তেজক ডিস্ক, ভাল হোটেলে খায়, নাচে, খেলে বেড়ায় বড়-ছোট ক্লাবে, সাঁতরায়, মেয়েদের নিয়ে যায় অ্যাপার্টমেন্টে, মনোরম সারা কলকাতা বীরুর ফিয়াটটাকে তাড়া করে ফেরে। বীরু বিতর্কসভায় বক্তৃতা করে, ভিয়েতনামে মার্কিন বোমারু বিমানের কাণ্ডকারখানার হুবহু বর্ণনা দেয়, লাইফ ম্যাগাজিনের পাতা খুলে জনসাধারণকে দেখায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মর্মন্তুদ ছবি। কিন্তু কোথাও থেমে নেই বীরু। চলছে। চলবে।

অনেক রাতে যখন বাসায় ফেরে মনোরম, তখন ক্লান্ত লাগে। বড় ক্লান্ত লাগে। রাতে সে প্রায় কিছুই খায় না। দুধে পাঁউরুটি ভিজিয়ে বিস্বাদ দলাগুলি গিলে ফেলে। দু'ঘরেই জ্বেলে দেয় টিউবলাইটগুলি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। মাঝে মাঝে ওপরের দিকে চেয়ে দেখে।

কী দেখে মনোরম? দেখে নীলচে স্বপ্নের আলো। জানালার বুটিদার পরদাগুলি উড়ছে বাতাসে। ঠিক মনে হয়, ঘরের ভিতরে রয়েছে তার প্রিয় মেয়েমানুষটি। সে কে? রিনা? চপলা? না কি এক প্রাণহীন মেমসাহেব-পুতুল প্রাণ পেয়ে ঘুরছে তার শূন্য ঘরে? সীতা নয় তো?

রক্তমাংসময় একজনকেই পেয়েছিল মনোরম। সীতা। যতক্ষণ সিগারেট না শেষ হয়, ততক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করে সে। কখনও দু'টো-তিনটে সিগারেট ফুরিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে মনোরম। কাল্পনিক কথা, এক কাল্পনিক স্ত্রীর সঙ্গে। মাঝে মাঝে হাঁটতে হাঁটতে থেমে যায়! কল্পনাটা এমনই সত্যের মতো জোরালো হয়ে ওঠে যে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। গভীর রাতে নির্জন পূর্ণদাস রোডে কেউ তার সেই মূকাভিনয় দেখে না। দেখলে তারা দেখত, একজন প্রেমিক কেমন তার শূন্যনির্মিত নায়িকার সঙ্গে অবিকল আসল মানুষের মতো প্রেম করে।

রাত গভীর হলে সে তার ছয় বাই সাত খাটে গিয়ে শোয়। মস্ত খাট। বিছানাটা একটু স্যাঁতসেঁতে। ফুটপাথ থেকে দু' টাকা জমা রেখে আট আনা ভাড়ায় আনা ডিটেকটিভ বই খুলে বসে। হাই ওঠে। জল খায়। টেবিল ল্যাম্প নেবায়। শেষ সিগারেটটাকে পিষে মারে মেঝের ওপর। তারপর ঘুমোবার জন্য চোখ বোজে।

অমনি কল্পনায় ভিন্ন পৃথিবী জেগে উঠতে থাকে। শরীরের ভিতরে নিকষ কালো অন্ধকারে জ্বলে ওঠে নীল লাল স্বপ্নের আলো। অবিকল এক জনহীন প্রেক্ষাগৃহ। আসবাব টানাটানি করে কারা পরদার ওপাশে মঞ্চে দৃশ্যপট সাজাচ্ছে। পরদা সরে যায়। দীর্ঘ পৈঠার মতো ইস্কুলবাড়ির কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তাতে তিনশো ছেলে দাঁড়িয়ে গায়—জয় জগদীশ হরে...

শূন্য বিছানায় তার প্রসারিত হাতখানা পড়ে থাকে। কিছুই স্পর্শ করে না।

সকাল দশটা থেকে কাঠগোলা। মাঝখানে একটু লাঞ্চ ব্রেক। মামাবাড়ি থেকে ভাত আসে। মামা-ভাগনে খায়। খেতে খেতে মামা বলে, ঝুমু, ওয়াচ হিম।

আজকাল বাঙালির কথা মামা ভুলে যাচ্ছে। নেতাজির কথাও। নিরুদ্দেশ সেই মানুষটির জন্য আর অপেক্ষা করতে ভয় পায় মামা। ফার্স্ট স্ট্রোক হয়ে গেছে। বীরু থেকে যাচ্ছে বিপদসংকুল পৃথিবীতে।

ফিস ফিস করে একটা লোক কানের কাছে বলে, ব্যানার্জি না?

তখন বীরু তার গাড়িটা রেখে দ্রুতবেগে ঢুকে যাচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জে। অনুসরণ করতে করতে বাধা পেয়ে মনোরম থেমে ফিরে তাকায়। চিনতে পারে না। মস্ত একটা কাঠামোয় নড়বড় করে দুলদুলে মাংস আব চামড়া। চোখের নীচে কালি। ক্লান্ত মানুষ একটা।

টেলিফোনে যেমন শোনা যায় মানুষের গলা, তেমনি, ফিসফিসিয়ে বলে, বিসোয়াস্ হিয়ার।

বিশ্বাস! কী হয়েছে, চেনা যায় না?

বলছি। খুব ব্যস্ত?

মনোরম মুখটা একটু বাঁকা করে হাসেনা।—জাস্ট একজনকে চেজ করছিলাম।

চেজ?

অলমোস্ট ডিটেকশন জব। জিরো জিরো সেভেন।

কাকে?

এক বড়লোকের লক্কা ছেলেকে।

বিশ্বাস ক্ষীণ একটু হাসল—চা খাবেন?

চা? বিশ্বাস, চায়ের কথা বলছেন? আপনাকে দেখেই একটা তেষ্টা পেয়েছিল, উবে গেল। অফ অল থিংস গরমের দুপুরে চা কেন?

দি ওয়ার্ল্ড ইজ লস্ট ব্যানার্জি।

কী হয়েছে?

স্ট্রোক।

বিশ্বাস জোর করে চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। বসল দু'জন।

স্ট্রোক? মনোরম বলে।

স্ট্রোক।

ব্যাপারটা কী রকম হয় বিশ্বাস?

স্ট্যাবিং-এর মতো। বুকে। বিশ্বাস করবেন না। মনে হয় এতগুলো স্ট্যাবিং যদি বুকে হচ্ছেই, তবে মরছি না কেন?

হুঁ?

বিশ্বাস করবেন না। মৃত্যুযন্ত্রণা তবু মৃত্যু নয়। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! তার ওপর ডায়েবেটিসটাও ধরে ফেলল এই বয়সে। হাঁটাচলা ছিল না তো, কেবল গাড়ি দাবড়াতাম। ব্যানার্জি, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

শুনছি।

আপনি একটা ওপেনিং চেয়েছিলেন। ম্যানেজারি করবেন?

ম্যানেজারি, বিশ্বাস? এ নিয়ে গোটা দুই করেছি, কোনওটাতেই সুবিধে করতে পারিনি। আপনারটা থার্ড অফার।

আমাব ম্যানেজারিতে পারবেন। আমি বদ হলেও, কথা দিলে কথা রাখি।

টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন?

জানেন তো ব্যানার্জি, আমার বিজনেস খুব ক্লিন নয়। কিছু গোস্ট মানি খেলা করে। কাজেই—

কী?

ওয়াচ ইয়োর স্টেপস।

সেই রসিদের বিজনেসটাও কি এর মধ্যে?

এভরিথিং। আমার ব্যবসাগুলো ছোট, প্রত্যেকটার জন্য আলাদা ম্যানেজার রাখব কী করে? তবে টাকা দেব, ওভার অল প্রায় সাতশো। কিন্তু খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করবেন। কী, রাজি?

দেখি।

দেখি-টেখি নয়। আমি লোক খুঁজছি কতদিন ধরে। আজই কথা দিয়ে দিন।

বিশ্বাস, এখন আমি যে-চাকরিটা করছি তাতে আমি টায়ার্ড, একটা অল্পবয়সি ছেলেকে দিনরাত চেজ করা, ওর মতো স্পিড আমার নেই, হাঁফিয়ে পড়ি।

চেজ করেন কেন?

ওয়াচ করার জন্য, যাতে সে বিপদে না পড়ে। বিপদ কিছু নেই, তবু তার বাবার ধারণা সে বিপদে পড়বেই। তাই।

খুব ফাস্ট লাইফ লিড করে?

খুব। আমার এমপ্লয়ারের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।

আচ্ছা, কবে আসছেন?

শিগগিরই।

কিন্তু মনে রাখবেন, আমার ম্যানেজারি কিন্তু অন্ধকার জগতে। এভরিথিং ব্ল্যাক।

জানি বিশ্বাস। চলি।

শিগগিরই আসছেন?

হুঁ।

মনোরম বিদায় নেয়।

আবার একদিন বীরুর পিছু নিয়ে সে এসে পড়ে সমীরের অফিসের সামনে। জোহানসন অ্যান্ড রো-র সাদা সম্ভ্রান্ত অফিস বাড়িটা। বীরুকে কলকাতার ভিড়ে হারিয়ে যেতে দিয়ে মনোরম গাড়ি পার্ক করে। নামে। আঙুলে গাড়ির চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে ঢুকে যায় ভিতরে।

সমীর ঠিক সেদিনের মতোই সুকুমার কোমল মুখশ্রী তুলে বলে, আরে মনোরম।

মনোরম হাসে, কী খবর?

তোমার খবর কী?

একরকম।

বোসো। চা খাও।

না। আমি কাজে আছি।

বোসো, একটু কথা আছে।

কী?

সীতার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে।

কীসের?

তুমি তো জানই যে ও বিয়ে করছে।

আন্দাজ করেছিলাম। মানসকে?

মানসকে। সীতা চাইছে তোমার বিজনেস-টিজনেস যা আছে ওর নামে, সব তোমাকে ফিরিয়ে দেয়।

ফিরিয়ে দেবে? তবে নিল কেন?

মানুষ তো ভুল করেই! ও বলছিল, এ-সব যতদিন না ফেরত দিচ্ছে, ততদিন ও তোমাকে ভুলতে

পারছে না। কাজেই তোমাকে ও অনুরোধ জানাচ্ছে, তুমি নাও। অভিমান কোরো না।

মাথাটা নিচু হয়ে আসে মনোরমের। সে কাচের নীচে সেই ছবিটা দেখতে পায়। বনভূমি, তাতে শেষবেলার রাঙা রোদ, উপুড় হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা গোরুর গাড়ি। আদিবাসী পুরুষ ও রমণীরা বাঁধছে।

সে মুখ তুলে বলল, এ-সব জায়গায় আমি অনেকবার গেছি।

কোন জায়গার কথা বলছ?

এই যে ছবিতে। সাঁওতাল পরগনা, বিহার, উড়িষ্যায় এ-রকম সব অদ্ভুত বনে-জঙ্গলে আমি একসময়ে খুব ঘুরে বেড়াতাম।

সমীর করুণ চোখে চেয়ে থাকে।

বিয়েটা কবে?

ওরা খুব দেরি করবে না। মানস বোধহয় বদলি হয়ে যাচ্ছে আদ্রায়। বিয়ের পরেই সেখানে চলে যাবে। আমি সীতাকে কী বলব মনোরম? তুমি তো জানো, আমি কোনও ব্যাপারে নিজেকে জড়াই না। কিন্তু এ-ব্যাপারটা নিয়ে সীতা এত কান্নাকাটি করেছিল যে, আমি কথা দিয়েছি তোমাকে কমিউনিকেট করব। তুমি না এলে আমিই যেতাম।

কিছু ভাবিনি এখনও। দেখি।

ও খুব শান্তিতে নেই।

মনোরম মনে মনে বলে, যতদিন পৃথিবীতে বনভূমি থাকবে, নদীর জলে শব্দ হবে, তত দিন ভুলবে না। জ্বলবে।

বিদায় না-নিয়েই একটু অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে এল মনোরম।

ট্রাম কোম্পানির বুথ থেকে টেলিফোন করল সীতার বাড়িতে। রিং-এর শব্দ হচ্ছে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে মনোরমের। সীতা কি কথা বলবে তার সঙ্গে? এ-রকম ঘটনা ঘটবে কি?

মেয়েলি মিষ্টি গলায় ভেসে আসে 'হ্যালো।'

সীতা! দম বন্ধ হয়ে আসে মনোরমের। বুকে উতরোল ঢেউ।

ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।

একটু পরে সীতা বলল, হ্যালো।

মনোরম কিছু বলতে পারে না প্রথমে।

সীতার গলাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, কে?

মনোরম চোখ বুজে, আস্তে আস্তে বলে যায়, মেরিলি র‍্যাং দ্য বেল, অ্যান্ড দে ওয়্যার ওয়েড...

কে? চিৎকার করে ওঠে সীতা!

মনোরম ফোন রেখে দেয়।

ডিভোর্সের পর এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে কবে! সময় কত তাড়াতাড়ি যায়।

সীতা সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। খুশি হবারই কথা মনোরমের। মামার গাড়িটা নিয়ে বীরুকে তাড়া করতে করতে এক সময়ে ক্লান্তি লাগে তার। পিছু-নেওয়া ছেড়ে সে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় অন্য রাস্তায়। আপনমনে ঘুরে বেড়ায়।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে এল চাঁদনি চকে। তার দোকানটা এখানেই। নেমে সে দোকানঘরে উঠে এল। মনোরমের আমলে সাকুল্যে চারজন কর্মচারী ছিল। এখন বেড়েছে। পুরনোর কেউ নেই। চমৎকার সানমাইকা লাগানো কাউন্টার, দেয়াল ডিসটেম্পার করা, ডিসপ্লে বোর্ড, কাচের আলমারি। সীতার দাদা ব্যবসা ভালই বোঝে। অনেকটা বড় হয়েছে দোকান। রমরম করে চলছে। ভাল জামাকাপড় পরা একজন অল্পবয়সি ছোকরা কাউন্টারের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনোরমকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, বলুন।

মনোরম গ্রাহ্য করল না। চার দিকে চেয়ে দোকানঘরটা দেখল। দোকানের নাম এখনও এস ব্যানার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। সীতা এখনও ব্যানার্জি নামে সই করে। আপনমনে একটু হাসে মনোরম। কাউন্টারের ছেলেরা চেয়ে থাকে।

বাইরে একটা টেম্পো থেমেছে। কুলিরা মাল তুলে দিয়ে যাচ্ছে দোকানে। ছেলেটা ও-পাশটায় গেল।

একা দাঁড়িয়ে থাকে মনোরম। এই দোকান-টোকান সবই সে উপহার দিয়েছিল সীতাকে। কিছু আয়কর ফাঁকি দিয়েছিল বটে, তবু তার ব্যবসাটা ছিল পরিষ্কার, দাগহীন এবং সৎ। এ-সব আবার তাকে ফিরিয়ে দিলে সীতা তাকে ভুলে যেতে পারবে। পারবে কি?

কেন ভুলতে দেবে মনোরম? দেবে না। সে ফিরিয়ে নেবে না কিছুই। বিছানায় যখন মানস ঝুঁকে পড়বে সীতার ওপর, একদিন চুপি চুপি ঠিক মানসের শরীরে ভর করবে মনোরম। ভূতের মতো। থাক। মনোরম কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তার চেয়ে সে বিশ্বাসের অন্ধকার, বিপজ্জনক ব্যবসায় নেমে যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বেরিয়ে এসে গাড়ি ছাড়ে সে। মনটা হঠাৎ ভাল লাগে। আজ সে সম্পূর্ণ দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিতে পারল।

সমীরকে ফোন করল সে।

শুনুন, আমি বিজনেস ফেরত নেব না। কিছুই নেব না।

কেন মনোরম?

শুনুন, আপনি হয়তো ঠিক বুঝবেন না ব্যাপারটা। তবু বলছি। সীতা ব্যবসা কেড়ে নিয়ে আমার ক্ষতিই করতে চেয়েছিল। ম্যানেজারি থেকে বরখাস্ত করেছিল আমাকে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। আমি মরে যাইনি। সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা মানুষের হয় তা টাকাপয়সার নয়, বিষয়-সম্পত্তিরও নয়। মানুষ হারায় তার সময়।

কী বলছ, বুঝতে পারছি না।

আমার হারিয়েছে, ক্ষতি হয়েছে কেবলমাত্র সময়ের। সীতা আমার বিজনেস ফিরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু হারানো সময়টা কে ফিরিয়ে দেবে? এক বছরে আমার বয়স বেড়ে গেছে ঢের। কিছু শুরু করব আবার, তা হয় না। আমি পারব না। ওকে বলে দেবেন।

তুমি আর-একবার ভেবে দেখো।

একবার কেন? আমি আরও বহুবার ভাবব, সারাজীবন ধরে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। আমি আমার এক বন্ধুর ব্যবসায়ে নামছি। ব্যবসা বন্ধুর, আমি সেখানে চাকরি করব। অ্যান্ড দ্যাটস অল।

ফোনটা করে খুবই শান্তি পায় মনোরম।

তুই আমাকে ছেড়ে যেতে চাস ঝুমু? মামা একদিন ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বলে। মামার রোগা চেহারাটা আরও একটু ভেঙে গেছে। চোখের নীচে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম কালো রেখা সব ফুটে উঠেছে। সম্ভবত শিগগিরই আবার স্ট্রোক হবে মামার।

বীরুর সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি কি পারি মামা? ওর কত কম বয়েস, কত স্পিড ওর। কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে বীরু! আমি কি পারি পাল্লা দিতে? আমার বয়সও হল।

কিন্তু তুই-ই বীরুকে ফেরাতে পারিস। আমি দেখেছি ও তোর সঙ্গে কথা-টথা বলে, হাসে, ঠাট্টা করে। অবিশ্বাস্য। ও যে কারও সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে পারে তা জানতামই না। আমার বড় আশা ছিল, তুই কিছু একটা পারবি।

মনোরম একটু ভেবেচিন্তে বলে, মামা, বীরুর পিছু-নেওয়ার চাকরি একদিন তো শেষ হবেই। একদিন বীরু ঠিকই ব্যবসা-ট্যাবসা বুঝে নেবে। তখন আমার চাকরিও শেষ হয়ে যাবে।

না। তোকে আমি ম্যানেজার করব।

কেন করবে? আমি যে কাঠের কিছুই জানি না। কিছুই শিখলাম না। বীরু মালিক হলে যে আমাকে রাখবে তারও কিছু ঠিক নেই। বয়সও হয়ে যাবে ততদিনে। পথ বন্ধ হয়ে যাবে সব। তার চেয়ে এখনই আমাকে ছেড়ে দাও।

যেখানে যাচ্ছিস সেখানেও তো চাকরিই করবি।

প্রথমে তাই কথা ছিল। পরে আমি কষাকষি করে আমাকে ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে নিতে রাজি করিয়েছি। কমিশন পাব।

কীরকম ব্যবসা?

ব্ল্যাক। ভীষণ কালো। জাল-জোচ্চুরি-স্মাগলিং সবই আছে।

যাবি?

যাব না কেন? আমার এ বয়সে আর ভাল বা খারাপ কিছু হওয়ার নেই।

যাবিই? বীরুর একটা কিছু ব্যবস্থা করে যা। ওকে ফেরা।

কোথায় ফেরাব মামা? আমার তো ওকে কিছু শেখানোর নেই। ও আমার চেয়ে দশগুণ বেশি পড়াশুনো করেছে। অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ভয়ংকর আত্মবিশ্বাসী। ওকে আমি কোথায় ফেরাব? ও আমাকে উড়িয়ে বেরিয়ে যাবে। বরং ও-ই আমাকে টেনে নিচ্ছে ওর দিকে। দেখো, এই বয়সে আমি লম্বা চুল আর জুলফি রাখছি, পরছি বেলবটমের সঙ্গে পাঞ্জাবি। আর কিছুদিন বীরুর পিছু নিলে আমিই বীরু হয়ে যাব।

আর কিছুদিন থাক ঝুমু। আমার জন্যই থাক।

আমার বাড়িভাড়াটা এখনও বাকি পড়ে আছে মামা।

আজই নিয়ে যাস। ভূপতিকে বলে রাখছি। থাকবি? কিছুদিন?

দেখি। বিশ্বাসকে একটা খবর দিয়ে দিতে হবে। ওরও স্ট্রোক, খুব ভেঙে পড়েছে। সময় দিতে চাইছে না।

ওই বিপদের ব্যবসাতে কেন যাবি ঝুমু?

কিছু তো করতেই হবে মামা। ওপনিং কোথায়? বাজার তো দেখছ! তা ছাড়া বিপদই বা কী, সবাই করছে।

মামা খুব গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আস্তে করে বলে, তোর সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক ছিল না আমার। আজকাল আত্মীয়তার গিঁট তো আলগা হয়েই যাচ্ছে। কিন্তু এ ক'দিনে তোর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে ঝুমু। তুই চলে যাবি ভাবলে বুকটা কেমন করে। আমি কেবল তোকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলাম। তোর দিকটা ভাবিনি। ঝুমু, তোর জন্য কী করব বল তো?

কী করবে? আমার খুব অসময়ে তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

স্ট্রোক-ফোক হলে ওই সেন্টিমেন্টটা খুব বেড়ে যায়, জানিস? ভীষণ বেড়ে যায়। স্ট্রোক হচ্ছে গাড়ি ছাড়বার ফার্স্ট ওয়ার্নিং, তখনই মানুষ গাড়ির জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বেশি করে আত্মীয়দের মুখ দেখে নেয়।

চুপ করো। বিরক্ত হয়ে মনোরম উঠে যায়। কাঠগোলার পিছনে একটু পরিষ্কার জায়গায় গিয়ে সিগারেট ধরায়। করাত-কলের মিষ্টি ঘসটানো শব্দটা আসে।

বর্ষা যায়। শরৎ যায়। শীত আসি-আসি করে। বিশ্বাস ফোনে তার ফিসফিস স্বরে বলে, ব্যানার্জি, আর কত সময় নেবেন? আমি আর পারছি না।

আর ক'টা দিন, বিশ্বাস। মনোরম বলে, আর-একটু সময় দিন।

সময় কে কাকে দেয় মশাই! সময়ের কি ট্রানজাকশন হয়? সময় ফুরোয়। ব্যানার্জি, একটা ফাইনাল কিছু বলুন। অন্য লোক নিতে ভরসা হয় না। এ-ব্যবসাতে ফেইথফুল লোক না হলে...আমি আর কত অপেক্ষা করব ব্যানার্জি? টেল সামথিং।

একটু, আর একটু...

আজকাল প্রায় একটা জিনিস লক্ষ করে মনোরম। বীরু মাঝে মাঝে তার ফিয়াট দাঁড় করায় ওষুধের দোকানের সামনে। কী যেন কিনে আনে, তারপর আবার গাড়ি ছাড়ে। প্রায় দিনই, প্রতিদিনই বীরু আজকাল কাণ্ডটা করে।

কী কেনে ও? ঘুমের ওষুধ নয় তো!

মনোরম সতর্ক হতে থাকে। একদিন বীরু ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ি ছাড়ল। মনোরম গাড়ি থেকে নেমে ঢুকল দোকানটায়।

একটু আগে যে লম্বা ছেলেটা এসেছিল, ও কিছু কিনল?
কাউন্টারের আধবুড়ো লোকটা কাগজ পড়ছিল। মুখ তুলে একটু বিস্ময়ভরে বলে, হুঁ।
কী?
অনেকগুলো ট্র্যাংকুলাইজার, কয়েকটা ঘুমের ওষুধ, নিউরোসিসের জন্য কয়েক রকমের বড়ি।
প্রেসক্রিপশন?
ছিল না। এ-সব কিনতে আজকাল আর প্রেসক্রিপশন লাগে না। সবাই নিজের নিজের ডাক্তার।
অসুখটা কী?
লোকটা মাথা নাড়ল, কে জানে মশাই! জিগ্যেস করছেন কেন?
কারণ আছে। ও একটু ডিসব্যালান্সড।
লোকটা নিজের নাকটা মুঠোয় ধরে বলল, এ-সব ড্রাগই আজকাল মুড়িমুড়কির মতো বিক্রি হচ্ছে। রোগটা বোধহয় পাগলামি। দেশে পাগল বাড়ছে।
মনোরম বেরিয়ে আসে। আকাশ ভরা রোদ। এখন হেমন্তকাল। কলকাতা এখন পাখির বুকের মতো কবোষ্ণ। গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে তার কাঁধে ব্যথা, কোমর ধরে আছে, মাথা ভার। হেমন্তের সুন্দর আলোতে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়াতে পারলে বেশ হত। কিন্তু জগদ্দল গাড়িটা রয়েছে সঙ্গে আর সামনে উধাও বীরু।
ক্লান্তভাবে আবার গাড়িতে ওঠে সে। ছাড়ে। ক্লান্তিহীন বীরু কি ধরা পড়ল বয়সের হাতে? নাকি অসুখ? কিংবা কর্মফল? ওষুধ কিনছে। পাগলামির ওষুধ, নার্ভের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ। বড় অবাক কাণ্ড। মনোরমের ভ্রূ কুঁচকে যায়। চিন্তিতভাবে সে চেয়ে থাকে সামনের রাস্তায়। চলন্ত গাড়িটা গিলে ফেলছে রাস্তাকে।

রাতে খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে আজ। সেটা টের পাওয়ার কথা নয়। বীরুর পিছু পিছু অনেক রাত পর্যন্ত ধাওয়া করে করে অবশেষে প্রায় রাত সাড়ে বারোটায় বীরুর গাড়ি ঢুকল রিচি রোডে। তখন লোডশেডিং। সেই অন্ধকারে হঠাৎ বানডাকা জ্যোৎস্না দেখতে পেল মনোরম।
অ্যাপার্টমেন্টের সামনে বীরু গাড়ি দাঁড় করাল না আজ। একটু এগিয়ে গেল। বাঁ ধারে একটা মস্ত ফাঁকা পার্ক। হিম পড়েছে। কেউ কোথাও নেই। বীরু নামল। দুধের মতো সাদা পোশাক পরেছে বীরু। সাদা ঢিলে বুশশার্ট, সাদা প্যান্ট, সাদা জুতো। জ্যোৎস্নায় ওর লম্বা, সাদা অবয়বটা অপ্রাকৃত দেখায়।
গাড়ি ফেলে রেখে বীরু লম্বা পায়ে রেলিং ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল। খুব ধীরে হাঁটছে। মাঠের মাঝখানে চলে গেল। দাঁড়াল। আড়মোড়া ভাঙছে। স্লো-মোশন ছবির মতো নড়াচড়া করছে। জ্যোৎস্নায় এবং কুয়াশায় একটু আবছা। গাড়ির অন্ধকারে বসে মনোরম দেখতে থাকে। বীরু এক-পা এক-পা করে দৌড়ে ক্রিকেটের বোলারের মতো হাত ঘোরাল। ব্যাটসম্যানের মতো মারল বল। দু' পায়ে একটি জটিল দ্রুত নাচ নেচেই থেমে যায়। ডিসকাস ছোড়ার ভঙ্গি করে। তারপর ধীরে, খুব ধীরে হাঁটে, ঠিক যেমন চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং হেঁটেছিল। ঘুরে দাঁড়ায় আবার। স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয় যেন চেয়ে আছে মনোরমের গাড়ির দিকেই। দেখছে।
মনোরম গাড়ির দরজা খুলে নামল। গরম জামা পরেনি, একটু শীত করে। রেলিংটা টপকায় মনোরম। হাঁটতে থাকে। কী জ্যোৎস্না, কী জ্যোৎস্না! নীলাভ হলুদ কুয়াশায় মাখা স্বপ্নের আলো। সেই আলোতে ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা অপরিচিত মানুষের মতো লম্বা সাদা অবয়ব বীরুর। স্থির দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে মহাকাশের সাদা পোশাক।
বীরু।
এসো। ভাবছিলাম, তোমাকে ডাকব।
তুই জানিস যে আমি তোর পিছু নিই?
আগে জানতাম না। ক'দিন হয় জানি। জেনেও প্রথম ভেবেছিলাম অচেনা কেউ চেজ করছে। তাই একটু চমকে গিয়েছিলাম। তারপর লক্ষ করলাম, তুমি।
আমার দোষ নেই। মামার অর্ডার।

বাবা কিছু জানতে চায়?

চায়।

আমাকে জিগ্যেস করলেই বলে দিতাম। এত কষ্ট করতে হত না তোমাকে।

কষ্ট কী? এটাই আমার চাকরি।

বুঝতে পারছি। তোমার জন্য কষ্ট হয়।

মামা যেদিন তোর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবে, সেদিন আমার এ-চাকরিটা শেষ হবে। তখন হয়তো আমি কাঠগোলার ম্যানেজারি পাব। নয়তো একটা বাজে, বিপজ্জনক অসৎ ব্যবসাতে নেমে যাব। ও দু'টো চাকরির চেয়ে এটা বোধ হয় একটু বেটার ছিল। তবে ক্লান্তিকর। তুই বড্ড স্পিডি।

বীরু তেমনি ধীর ভঙ্গিতে একটু হাঁটছে এদিক ওদিক। অদ্ভুত প্রাকৃতিক আলোতে ও হাঁটছে বলে মনে হয় না। যেন একটু জমাট, লম্বাটে একটা কুয়াশায় তৈরি ভৌতিক মূর্তি দুলে দুলে যাচ্ছে।

বাবা কোনওদিনই আমার সব জানতে পারবে না।

সেটা মামা স্বীকার করে না। কিন্তু বোঝে। তাই আমাকে লাগিয়েছে মামা। তার বিশ্বাস, আমি তোমাকে বুঝব। তোর পিছু নিয়ে নিয়ে আমি এখন পাক্কা জেমস বন্ড হয়ে গেছি।

বীরু হাসল। মসৃণ কামানো গালে জ্যোৎস্না ঝিকিয়ে ওঠে একটু।

তুমি কী বুঝলে? শান্ত স্বরে জিগ্যেস করে বীরু।

কিছু না।

কী বুঝতে চাও?

তুই ওষুধ কিনছিস কেন? ও-সব ওষুধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া খুব ডেঞ্জারাস।

আজকাল সব ওষুধের পোটেন্সি এত কমিয়ে দেয় ওরা যে কাজ হয় না।

ধীরে ধীরে হেঁটে বীরু একটু দূরে যায়। আবার দুলে দুলে কাছে আসে। মনোরমের ভয় হয়, বুঝি বীরু জ্যোৎস্না আর কুয়াশায় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে।

বিয়ে করবি না বীরু?

করব হয়তো কখনও।

গৌরীকে করিস।

বীরু হাসল। বলল, তুমিই গৌরীর প্রেমে পড়ে গেছ।

বোধহয়। তুই বলেছিলি কষ্ট হওয়াকেই ভালবাসা বলে। আমারও কষ্ট হয় ওই মেয়েটার জন্য।

বিয়ে করে কী হবে?

আমি তোর অনেক কিছু নকল করেছি বীরু। পোশাক, চুল, জুলফি, গাড়ির স্পিড। তোর পিছু নিয়ে নিয়ে তোর কাছে শিখেছি অনেক। কেবল তোর ক্রুয়েলটিটা শিখতে পারছি না। তুই এ-মেয়েটাকে ভাল না বেসে পারিস কী করে?

টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকে বীরু। প্যান্টের পকেটে দুই হাত। একটুক্ষণ স্থির থাকে।

আমি খুব নিষ্ঠুর?

মনে হয়।

ইদানীং আমি খুব নেশা করছি। গাঁজা, আফিং, এল-এস-ডি, কিছু বাকি নেই। কিছু হয় না তাতে।

কেন করছিস?

টু ফরগেট সামথিং।

কী?

তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলছ? কেন? তুমি আমার কতটুকু জানো?

কিছুই না। বীরু, আমার মনে হচ্ছে দিনে দিনে তুই আমার আরও অচেনা হয়ে যাচ্ছিস। এখনই তোকে আমার পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, যেন বা তুই অন্য গ্রহের লোক। আমি তোর মতো হার্টলেস হতে চাই। আমাকে শিখিয়ে দে।

বীরু হাসে। যথারীতি কোমল জ্যোৎস্নার লাবণ্য ওর কেঠো মসৃণ গালে এক ফোঁটা মোমের মতো ঝরে পড়ল। বলল, কেন হার্টলেস হতে চাও?

মনোরম বলে, আমরা কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে পাগল হতাম। এখনও দ্যাখ, বউয়ের দুঃখ ভুলতে পারি না। তুই কত মেয়েকে ভুলে যাস, আমি একজনকেই পারি না।

আমি একটা জিনিস ভুলতে পারছি না।

কী?

যাদবপুর রেল স্টেশনে এক বান্ধবীকে তুলতে গিয়েছিলাম গাড়িতে, ট্রেনের দেরি ছিল, কথা বলছিলাম দু'জনে। ভালবাসার কথা। নকল কথা সব। লাইক কসমেটিকস। ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনের একদিকে শেড-এর তলায় গেছি, বান্ধবীটি হঠাৎ দু'পা সরে এসে বলল, মাগো, ওটা কী? দেখলাম, একটা বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে ভিখিরিদের বিছানায়। এত রোগা যে ভাল করে না নজর করলে দেখাই যায় না। ঠিক কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো দু'খানা হাত নোংরা কাঁথার স্তূপ থেকে শূন্যে উঠে একটু নড়ছে, অবিকল সেইরকমই দু'খানা পা। এত নির্জীব যে খুব ধীরে ধীরে একটু একটু নড়ে, আবার কাঁথায় লুকোয়। তার গায়ের চামড়া আশি-নব্বুই বছরের বুড়োর মতো কোঁচকানো, দুলদুল করছে। হিউম্যান ফর্ম, কিন্তু কী করে বেঁচে আছে বোঝা মুশকিল। চমকে যাই যখন দেখি, তার ঊরুর ফাঁকে রয়েছে পিউবিক হেয়ার, পুরুষাঙ্গ। বাচ্চা ছেলের তো পিউবিক হেয়ার থাকার কথা নয়। একটা উলোঝুলো বুড়ি বসে উকুন মারছিল, সে নিজে থেকেই ডেকে বলল, ষোলো বছর বয়স বাবু, রোগে ভুগে ওই দশা। ছেলেবেলা থেকেই বাড়ন নেই।—কিছুই না ব্যাপারটা, কিন্তু সেই থেকে ভুলতে পারি না।

কেন বীরু?

কী জানি! কলকাতায় ভিখিরি-টিকিরি তো কত দেখেছি! কত কুঠে, আধমড়া, ডিফর্মড। কিন্তু এটা কিছুতেই ভুলতে পারি না। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে, চমকে উঠি। পিউবিক হেয়ার সমেত একটা বাচ্চা তার কাঁকড়ার মতো হাত-পা নাড়ছে। ভীষণ ভয় করে। যত দিন যাচ্ছে, তত সেঁটে বসে যাচ্ছে ছবিটা মনের মধ্যে। কী যে করি!

মনোরম কী বলবে! চুপ করে থাকে।

বীরু মহাকাশচারীর মতোই চাঁদের মাটিতে হাঁটে। ভ্রূ কুঁচকে বলে, বুদ্ধদেব যেন কী কী দেখেছিল? বার্ধক্য, রোগ, মৃত্যু আর সন্ন্যাস, না?

বোধহয়।

পিউবিক হেয়ার সমেত বাচ্চা ছেলের ফর্ম দেখলে বুদ্ধদেব কী করত বলো তো?

কী জানি!

পাগল হয়ে যেত। কিন্তু আমি কী করি? কী করি বলো তো?

কী করবি?

ভাবছি। আস্তে আস্তে অপ্রাকৃত চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়ায় সাদা দীর্ঘ অবয়ব। আস্তে করে বলে, নিষ্ঠুর নই, বুঝেছ? বাড়ি যাও।

কেন?

আমি একটু একা থাকি।

পকেটে হাত, চিন্তিত মুখটা নোয়ানো, বীরু আস্তে আস্তে কুয়াশার শরীর নিয়ে ঘোরে। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময়ে দূর থেকে দৃশ্যটা অস্পষ্ট দেখে মনোরম।

## ॥ ছয় ॥

অনেক অসুখে ভুগে উঠল সীতা। টাইফয়েড হয়েছিল, তার সঙ্গে স্নায়বিক রোগ, জ্বর সেরে যাওয়ার পরও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারত না।

আজকাল বারান্দা পর্যন্ত যেতে পারে সে। গায়ে একটা পশমি চাদর জড়িয়ে রেলিং ধরে বসে থাকে চেয়ারে। কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করে দুর্বলতায়। হাতে-পায়ে শীত। সারা গায়ে খড়ি উঠছে। শরীরের সমস্ত

রক্ত কে যেন সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে। এত সাদা দেখায় তাকে। কাগজের মতো পাতলা হয়ে গেছে সে। যেন ওজন নেই।

বিয়েটা পিছিয়ে গেছে। আদ্রায় জয়েন করেছে মানস। কোয়ার্টার পেয়েছে। মাঝে মাঝে আসে। পাতিয়ালার কোচিং-এ সে যাচ্ছে না। যেতে ভয় পায়।

বলে, আমি চোখের আড়াল হলেই না জানি তুমি কী ঘটিয়ে বসবে।

কী ঘটাব!

কী জানি! ভয় করে। তোমাকে অসুখের সময়ে দেখে মনে হত পুটুস করে মরে যাবে বুঝি! সাদা হাতে নীল শিরা দেখা যাচ্ছে, চোখে কালি, শ্বাস ফেলছ না-ফেলার মতো। কী যে আপসেট করে দাও।

এক-এক সময়ে আদ্রার কথা ভাবতে ভালই লাগে সীতার। সেখানে বোধহয় নির্জনতা আছে। বনভূমি, একটা কলস্বরা নদী। কলকাতার মতো সেটা দোকানের শহর নয়। না হোক। তবু সেখানে ভুতুড়ে টেলিফোন যাবে না।

আবার মনে হয়, কলকাতা ছেড়ে যাবে? সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনা, সে যে কী ভাল! কাজের জিনিস, অকাজের জিনিস, ঠকে আসবে, তারপর দাঁতে ঠোঁট কামড়াবে, আবার পরদিন বেরোবে ঠকতে, কণ্টকিত শরীরে মাঝে মাঝে শুনবে সেই গোস্ট কল। গোস্ট? হবেও বা।

সেরে উঠছে সীতা, আজকাল এ-সব রোগ সহজেই সারে।

একটা ম্যাক্সি কিনেছিল সীতা শখ করে, বহুদিন আগে। সুটকেস ঘাঁটতে গিয়ে টেনে বের করল। ফুল ভয়েলের ওপর পিঙ্ক লাল আর কালো চমৎকার নকশা, হাতে সূক্ষ্ম লেসের ফ্রিল। ম্যাক্সি পরার কথা তার নয়। পরবার জন্য বা ব্যবহার করার জন্য নয়, শখ করে কত অকাজের জিনিসই সে যে কেনে?

ম্যাক্সিটা বুকে করে সে আয়নার সামনে এল। খুব রোগা হয়ে গেছে সে। সাদা। কিন্তু তার মুখে অসুখের ফলে কোনও বুড়োটে ছাপ পড়েনি। বরং যেন বা বয়স কমে গেছে তার। বালিকার মতো দেখাচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে আসে সীতা। শাড়ি ছেড়ে ম্যাক্সিটা পরে নেয়। পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুল। শরীরটা একটু আঁট বুঝি। ঘুরেফিরে আয়নায় দেখে সে নিজেকে। ওমা, সে তো আর যুবতী নেই। একদম না। ঠিক কিশোরী সীতা। পাতলা, ফরসা, ছোট্টটি। বুকটা দেখে হেসে ফেলে সে । স্তনভার নেই। বোঝাই যায় না বুকে কিছু আছে। শুধু দু'ধারে কুঁচির ওপর একটু একটু ঢেউ। ঠিক প্রথম যেমন হয়। আস্তে আস্তে পা ফেলে আয়না থেকে দূরে গেল সীতা। দেখল। কাছে এল। দেখল । কোনও ভুল নেই। সেইরকম অবিকল, যেমন সে ছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে ভাবতে বসল সীতা। পশ্চাৎগামী রেলগাড়ির মতো সে ফিরে যাচ্ছিল সেই বয়সে। নানা বয়সের স্মৃতি চলন্ত রেলগাড়ি থেকে আলোর চৌখুপি ফেলে যাচ্ছে।

একদিন দুপুরে টেলিফোন এল।

মিসেস লাহিড়ি আছেন?

লাহিড়ি! না তো! লাহিড়ি কেউ নেই। রং নাম্বার।

সীতা ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল।

ওপাশে কণ্ঠস্বরটা আঁতকে উঠে বলে, না, না, রং নাম্বার নয়! আপনি কে বলুন!

আমি! অবাক হয়ে সীতা বলে, আমি সীতা ব্যানার্জি!

ব্যানার্জি? কণ্ঠস্বরটা যেন বিষম খায়, বলে, মৌ, তুমি এখনও ব্যানার্জি?

ওঃ। বলে ভয় পেয়ে চুপ করে যায় সীতা।

কী?

ভুল হয়েছিল।

অধৈর্যের গলায় মানস বলে, মৌ, ডিসগাস্টিং।

ভুল তো মানুষ করেই। আমি ভাবলাম বোধহয় এজেন্সির ব্যাপারে কেউ কিছু জানতে চাইছে। এজেন্সিটা তো ওই নামেই।

ঠিক আছে। ক্ষমা করলাম।

কখন এসেছ কলকাতায়?

সকালে। কিন্তু এবার দেখা হচ্ছে না, এক্ষুনি বার্নপুরে যাচ্ছি। ফোন করছি হাওড়া থেকে। অল ইন্ডিয়া মিট, ভীষণ ব্যস্ত। কেমন আছ?

ভাল।

আমাকে ছেড়েও ভাল?

না, না, তা বলিনি। এমনি ভালই।

ভাল থাকো, ছেড়ে দিচ্ছি।

ম্যাক্সিটা মাঝে মাঝে বের করে পরে সীতা। বালিকা সেজে বসে থাকে। দু'টো বিনুনি ঝুলিয়ে দেয়। আয়নায় তাকিয়ে হাসে। একটা পশ্চাৎগামী রেলগাড়ি তাকে তখন তুলে নিয়ে যায়, আলোর চৌখুপিগুলি নানা রং ফেলে যেতে থাকে।

সীতা আস্তে আস্তে আবার রাস্তায় বেরোয়, একা একা চলে যায় গড়িয়াহাটা, এসপ্ল্যানেড, নিউমার্কেট, হাতিবাগান। ঘুরে ঘুরে কেনে কাজের জিনিস, অকাজের জিনিস। ভাল লাগে। বড় ভাল লাগে।

মাঝে মাঝে একটা চমকা ভয় বুক খামচে ধরে। চলে যেতে হবে কলকাতা ছেড়ে? সে কলকাতার বাইরে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না যেন। কলকাতার বাইরে গিয়ে তার কখনও ভাল লাগেনি। একবার লেগেছিল। শিমুলতলায়।

## ॥ সাত ॥

আজকাল ঘুমের মধ্যেও মনোরম একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পায়—ফলো হিম, ঝুমু, ওয়াচ হিম।

অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে মনোরম পাশ ফেরে। নিস্তব্ধ গলায় ঘুমের মধ্যেই বলে, আমি কি পারি মামা? ওর সঙ্গে আমি কি পারি?

ও যে মরবে ঝুমু! ও যে শীগগির মরবে! একদিন ওর ডেডবডি ধরাধরি করে নিয়ে আসবে রাস্তার লোক।

মরে যদি কে ঠেকাবে?

তুই ঠেকাবি ঝুমু। ফলো হিম।

আমার যৌবন বয়স শেষ হয়ে গেছে মামা। অত স্পিড আমি কোথায় পাব? আমি তত বড় নই যে ওকে ঢেকে রাখব, বা ওকে আড়াল করব।

দয়া কর ঝুমু, তুই পারবি। তোর মতো ওকে কেউ বোঝে না। আমিও না।

কী বুঝেছি মামা? কখনও মনে হয় ও চাঁদের মাটির ওপর হাঁটছে, ঠিক যেমন নীল আর্মস্ট্রং হেঁটেছিল চাঁদে। কখনও মনে হয়, ও এক অন্য গ্রহ থেকে আসা মানুষ, জ্যোৎস্নামাখা হলুদ কুয়াশায় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে। মামা, বীরু কি রিয়ালি?

কী বলছিস ঝুমু? রিয়াল নয়?

বীরু নামে সত্যিই কেউ আছে?

নেই! কী বলিস তুই! বীরু নেই?

আছে হয়তো। অন্য পৃথিবীতে।

তুই কি পাগল? অন্য পৃথিবী আবার কী?

জানো তো টেলিফোনের একটা তারে হাজার ফ্রিকোয়েন্সিতে হাজার মানুষের কথা ভেসে চলে। ধরো, একটাই তার, তাতে আমি কথা বলছি বিশ্বাসের সঙ্গে, তুমি সেই মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে।

বিশ্বাসের কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ না, আমিও শুনতে পাচ্ছি না সেই মাদ্রাজি ইঞ্জিনিয়ারের কথা। ঠিক তেমনি, এই আমরা যেখানে বাস করি, সেই পৃথিবীতেই বসবাস করে বীরু। কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা, পৃথিবী আলাদা।

তোর বড্ড হেঁয়ালি কথা! তবু যদি সত্যি হয়, ঝুমু, আমি তোর মাইনে বাড়িয়ে দেব, তোকে ম্যানেজার করব, তুই বীরুর ফ্রিকোয়েন্সিতে ঢুকে পড়।

চেষ্টা করছি মামা, পারছি না। বয়স হয়ে গেছে, তা ছাড়া আমারও কি দুঃখ-টুঃখ কিছু থাকতে নেই মামা? দেখো, নড়ন্ত জিভ, একটা অ্যাকসিডেন্টের স্মৃতি, সীতা, স্বপ্নের মেয়েরা ইডিও-মোটর অ্যাকশন—সব মিলিয়ে একটা জাল, এই জাল ছিঁড়ে সহজে কি বেরোনো যায়! চেষ্টা করছি।

কর। তুই যা চাস তোকে আমি সব দেব।

জানি মামা।

কী জানিস?

বীরুর জন্যই তুমি আমাকে ভালবাসো। কিন্তু এখন আমার ঘুমের সময়, তুমি আর স্বপ্নের মধ্যে আমাকে ডেকো না। আমি ঘুমোব, আমি উলটে রেখেছি বই, নিবিয়ে দিয়েছি বাতি। অন্ধকারে আমার শরীরের ভিতরে এক্ষুনি জ্বলে উঠবে নীল লাল স্বপ্নের আলোগুলি। ওই তো মোড়ের তে-মাথা পেরিয়ে হেঁটে আসছে আমার ঘুম, অবিকল মানুষের মতো, হাঁসের মতো গায়ের অন্ধকার কণাগুলি ঝেড়ে ফেলে সে আসবে কাছে। সম্মোহনের দীর্ঘ আঙুলগুলি নড়বে চোখের সামনে। তোমরা যাও...আমি ঘুমিয়ে পড়ব...

একটু স্যাঁতসেঁতে বিছানাটা। ফাঁকা। মনোরমের হাত এলিয়ে পড়ে থাকে। সেই হাত কিছুই স্পর্শ করে না।

ঠিক দুপুরবেলায় চোখের রোদ-চশমাটা খুলে মনোরম এসপ্ল্যানেডের ট্রামগুমটির টেলিফোন বুথে ঢুকে গেল। ডায়াল করল, পয়সা ফেলল।

হ্যালো। একটা চাপা সতর্ক গলা ভেসে আসে।

দিস ইজ জেমস বন্ড।

কে?

জিরো জিরো সেভেন।

গুডনেস। ব্যানার্জি?

ইয়াঃ।

বিসোয়াস হিয়ার। আমাকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে ব্যানার্জি? মানুষের আয়ুর তো শেষ আছে!

ফিসফিস করে একটা ভৌতিক গলায় কথা বলে বিশ্বাস।

জানি বিশ্বাস। আমি একটা ট্রাফিক জ্যাম-এ পড়ে গেছি। সামনে একটা ফিয়াট গাড়ি, সেটাকে পেরোতে পারছি না। সেটাকে পেরোতে পারলেই আপনার কাছে পৌঁছে যাব। আর কয়েকটা দিন।

ফিয়াট গাড়ি? কী বলছেন ব্যানার্জি? কার গাড়ি?

সেই ছেলেটার পিছু-নেওয়া এখনও শেষ হয়নি বিশ্বাস।

এখনও তাকে চেজ করছেন?

এখনও?

সে মরেনি তা হলে?

না।

তবে বোধহয় সে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকবে, কিন্তু আমি বোধহয় বাঁচব না ব্যানার্জি।

কেন?

আমার গলাটা কেমন বসে গেছে, লক্ষ করেছেন?

হুঁ।

ক্যানসার।

যাঃ।

বায়োপসি করিয়েছি। মাসখানেকের মধ্যেই হাসপাতালে বেড নেব।

মনোরম চুপ করে থাকে।

ব্যানার্জি!

উঁ।

সময় নেই। একদম না। আমার বাচ্চারা মাইনর, বউটা বুদ্ধি রাখে না। এত সব কে দেখবে? আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না। আপনি কথা দিয়েছিলেন।

মনোরম একটা শ্বাস ছাড়ল।

শুনছেন ব্যানার্জি?

শুনছি।

নতুন বিজনেস ওপেন করব ভাবছিলাম। ড্রাগ, নারকোটিকস। ম্যারিজুয়ানা থেকে হাশিস পর্যন্ত। খুব বাজার এখন। কিন্তু কী করে করব?

দেখছি বিশ্বাস। আর কয়েকটা দিন।

আপনাকে চাই-ই। ঠাট্টা নয় ব্যানার্জি, আপনি সত্যিকারের জিরো জিরো সেভেন হতে পারবেন। আমি একজন রিয়্যাল জিরো জিরো সেভেন চাই। হাত মেলান ভাই।

মনোরম হাসল।

হাসবেন না। হাতটা বাড়ান...বাড়িয়েছেন?

মনোরম শূন্যে তার হাতটা সত্যিই বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বাড়িয়েছি।

আমিও বাড়িয়েছি...এইবার ধরুন হাতটা...মুঠো করুন।

করেছি।

শূন্যেই হাত মুঠো করে মনোরম, শেকহ্যান্ডের ভঙ্গিতে।

দ্যাটস দ্য বন্ড। আমরা কিন্তু হাত মিলিয়েছি ব্যানার্জি।

ইয়াঃ।

টেলিফোনটা হুক-এ ঝুলিয়ে রাখে মনোরম।

এ-বছর কলকাতায় খুব শীত পড়ে গেল। উত্তুরে হু-হু হাওয়া দেয়। ময়দানের গাছগুলো থেকে পাতা খসে খসে পড়ে গেল সব। দেহাতিরা সেই পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বালে, হাত-পা সেঁকে নেয়। বেকার আর ভবঘুরেরা পার্কে পার্কে বেঞ্চে আর ঘাসে শুয়ে কবোষ্ণ রোদে ঘুমোয় সারা বেলা। এসপ্ল্যানেডের চাতালে তিব্বতি কিংবা ভুটিয়া মেয়েরা সস্তায় সোয়েটার বিক্রি করছে। তাদের ঘিরে এ বছর ভিড় বেড়েছে। শহরতলির দিকে আপ লোকাল ট্রেনগুলো ছুটির দিনে বোঝাই হয়ে যায়। শীতের পিকনিকে যাচ্ছে কলকাতার মানুষ। চিড়িয়াখানায় ভিড়, সিনেমা হলে লাইন। শীতের রোদ মাখাবার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ে লোকজন।

একটা তিব্বতি মেয়ের কাছ থেকে তার হলদে দাঁতের হাসি সমেত একটা পুলওভার কিনল মনোরম। সাদা। বুকে আর পেটে পাশাপাশি চারটে চারটে আটটা সবুজ বরফি। পুলওভারটা পরে বেরোলে যে কেউ মনোরমকে দু'বার ফিরে দেখে।

'বাটা' বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—'শীতকালেই তো সাজগোজ'। মনোরমও তাই ভাবে। এই শীতে সে একটু সাজবে। একজোড়া চমৎকার জুতো কিনে ফেলল সে। ক্রোকোডাইল প্যাটার্নের চামড়া। হাঁটুতে পকেটওলা একটা মার্কিনি কায়দার প্যান্ট করল, যার সেলাইগুলো দূর থেকে দেখা যায়। মামা টাকা দিচ্ছে। দেওয়ার হাত একটু একটু করে আসছে মামার।

পুরনো বন্ধুদের এক-আধজনের সঙ্গে দেখা হলে তারা জিগ্যেস করে, কী ব্যাপার? চিনতেই পারা যায় না যে!

মনোরম উত্তর দেয়, জেমস বন্ড হয়ে গেছি ভাই, কমপ্লিট জিরো জিরো সেভেন।

কাজ-কারবার?

নতুন ব্যবসা খুলছি ভাই! কর ফাঁকি দিতে চাও, কি নতুন ধরনের নেশা করতে চাও, যা চাও কন্ট্যাক্ট বিসোয়াস অ্যান্ড ব্যানার্জি। শিগগিরই স্টার্ট করব।

কিন্তু ঝোলাচ্ছে বীরুটা। আর মামা। বিশ্বাসকে কথা দেওয়া আছে। কিন্তু মামা ছাড়ে না কিছুতেই। প্রতি মাসে টাকা বাড়াচ্ছে আজকাল। বলে, আর ক'টা দিন একটু দ্যাখ।

এই শীতে বীরু নতুন পোশাক তেমন কিছু করল না। শীতের শুরুতে মাসখানেকের জন্য হিল্লি-দিল্লি কোথায় কোথায় ঘুরে এল। ততদিন মামা দিনরাত তাকে কাঠের তত্ত্ব বোঝাত। মনোরমের জন্য নয়। মামার ধারণা, মনোরম শিখে বীরুকে শেখাবে। যদি বীরু না-ই শেখে কোনওদিন, তবে মনোরম ম্যানেজার হয়ে চালিয়ে নেবে কারবার। বীরুর যেন কষ্ট না হয়।

তিন দিকে ঘেরা জালের মধ্যে বীরু দাঁড়িয়ে আছে। একটা দিক খোলা। সেই খোলা দিক দিয়ে ছুটে আসে রক্তাক্ত বল। বীরুর হাতে ব্যাটটা চমকায়। কিন্তু বলের লাইনটা ধরতে পারে না, স্ট্যাম্প ভেঙে জালে লাফিয়ে পড়ে বল। পরের পর এ-রকম হতে থাকে। বীরু বলের লাইন দেখতে পাচ্ছে না। যে-ছেলেটা বল করছে সে নতুন, স্কুল ক্রিকেটার। বল তেমন কিছু ভাল করে না। তবু বারবারই বীরু বল খেলতে পারল না। নেট প্র্যাকটিসের বাঁধা সময় পার হয়ে গেলে সে বেরিয়ে এল।

মনোরম বশংবদ দাঁড়িয়ে আছে মাঠের ধারে। বীরুর ওপর সতর্ক চোখ।

বীরু তাকে দেখে একটু হাসল। তারপর তার ফিয়াটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, বাবার চাকরিটা করে যাচ্ছ তা হলে এখনও?

করছি।

করো। কিন্তু কিছু জানার নেই। আমিই জানি না।

এখনও ভুলতে পারছিস না বীরু?

কী?

সেই স্টেশনে যেটা দেখেছিলি।

বীরু একটা শ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল, না।

কেন?

গেঁথে গেছে। অটো সাজেশানের মতো। মানুষের অনেক সময় হয়, খেতে বসলে সবচেয়ে ঘেন্নার কথা মনে পড়ে, একা ঘরে মনে পড়ে ভূতের গল্প। অনেকটা সেই রকমই। যত ভুলতে চাই, তত মনে পড়ে।

কী করবি?

ভাবছি।

তুই একটুও ভাবছিস না।

ভাবছি। তুমি অস্থির হয়ো না। চাকরিটা করে যাও।

বীরু, মামার বড় ভয়, তুই সুইসাইড-ফাইড করবি না তো কখনও?

সুইসাইড! বীরু একটু থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটি বিদ্যুৎ খেলে যায় ওর চোখে, বলে, ভাবিনি তো কখনও!

মনোরম ভীষণ হতাশ হয়ে বলে, ভাবিসনি! তবে কি আমিই তোকে মনে করিয়ে দিলাম?

দিলে। সুইসাইডের কথা ভাবতে বোধহয় মন্দ লাগে না কখনও কখনও। মাঝে মাঝে ভাবব।

কেন ভাববি বীরু? ভাবিস না। আমি কথাটা উইথড্র করে নিচ্ছি।

ভয় পেয়ো না। সুইসাইডের চিন্তা কখনও করিনি। চিন্তাটা করতে বোধহয় ভালই লাগবে।

যদি ওটাও অটো সাজেশানে দাঁড়িয়ে যায়?

বীরু ধীর পায়ে তার ফিয়াটের দিকে হেঁটে চলে গেল। আর ফিরে তাকাল না।

ক'দিনের মধ্যেই বীরু ছেঁটে ফেলল লম্বা চুল, জুলফি। শুধু ছোট একটু গোঁফ রেখে দিল। এই শীতে একটা আধময়লা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরতে লাগল। ফিয়াটটা গ্যারেজেই পড়ে থাকে। বীরু হাঁটে। এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তা। গলিঘুঁজিতে চলে যায়। দিশি গাড়িটা নিয়ে বড্ড বিপদে পড়ে গেল মনোরম। এখন আর গাড়িতে বীরুকে অনুসরণ করার মানেই হয় না। সব গলিতে গাড়ি ঢোকে না. তা ছাড়া মানুষের হাঁটার গতির সমান ধীর গতিতে গাড়ি চালানো যায় না সবসময়ে। অতএব গাড়ি ছেড়ে হাঁটা ধরে মনোরম। এবং প্রথম ধাক্কাতেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতদূর হাঁটার অভ্যাস ছিল না তার। তার ওপর লম্বা পায়ে বীরু জোরে হেঁটে যায়, তাল রাখতে গিয়ে দমসম হয়ে পড়ে সে। তবু তীব্র এক আকর্ষণে সে ঠিকই চলে। পিছু ছাড়ে না। বীরু টের পায়। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। কখনও হাসে একটু, ম্লান হাসি। কখনও চাপা গলায় বলে, বাক আপ।

বুধবার রাতে বীরুকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে যেতে দেখেছে মনোরম। তারপর ফিরে গেছে পূর্ণদাস রোডের ফ্ল্যাটে। পরদিন সকালে আবার এসেছে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দাঁড়িয়ে থেকেছে। সারাদিন বীরু নামল না। দারোয়ানের কাছে খোঁজ নিল মনোরম। না সাহেব নামেনি। অনেক রাত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। বীরু নামল না। পরদিনও না।

তৃতীয় দিন মনোরমের বুক কাঁপছিল। দারোয়ান মাথা নেড়ে বলল, কিছু জানি না। এত বড় ফ্ল্যাট বাড়ি, কে কখন আসে যায়!

সন্ধেবেলায় চাঁদ ওঠে। মনোরম হেঁটে গেল পার্ক পর্যন্ত। কুয়াশা আছে। হলুদ জ্যোৎস্না। দু'-চারজন লোক আছে পার্কে, সঙ্গে কারও কারও প্রেমিকা বা ভাড়াটে মেয়েছেলে। মনোরম পার্কটার একটা কোণে দাঁড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে চেয়ে রইল। বীরুর ঘরে যথারীতি অন্ধকার। তিন দিন ধরে আলো জ্বলছে না ওর ঘরে। মনোরম যখন সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল তখন দেখে তার হাত থরথর করে কাঁপছে। পেট ডাকছে কলকল করে। উদ্বেগে সে অনেকক্ষণ কিছু খাওয়ার কথা মনে করেনি।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করল মনোরম। পার্ক ক্রমে নির্জন হয়ে গেল। সে একা। হিম পড়ে তার গা ভিজছে, মাথা ভিজছে। ঠান্ডায় চোখে জল আসে। গলায় ব্যথা, একটু একটু কাশি। হাতে পায়ে খিল ধরা ভাব। ঝিঝি লেগেছে। এ কয় মাসে বীরুকে সে ভালবেসে ফেলেছিল, তা আজ বুঝতে পারল। ওই অ্যাপার্টমেন্টে কী হয়েছে তা এত রাতে জানতে যেতে সাহস হল না তার। কোত্থেকে একটা রাতচরা পুলিশ খেঁটে লাঠি দোলাতে দোলাতে কাছে এসে বলল, কেয়া?

মনোরম মাথা নেড়ে বলে, কুছ নহি।

তব?

মনোরম হাঁটতে থাকে। পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে রাস্তায় পড়ে। ফিরে আসে পূর্ণ দাস রোডের ফ্ল্যাটে। ঘুমোতে পারে না' স্বপ্ন দেখে না। তার কোনও ইডিও-মোটর অ্যাকশনও হয় না আজ। রোজ কয়েকবার যে-কথাটা তার মনে পড়ে সেই ট্রেন দুর্ঘটনাও মনে পড়ে না। ঘরের বাতি নিবিয়ে সে বসে থাকে জানালার পাশে। সিগারেট খায়। তার নিঃসঙ্গতায় কেবলমাত্র সঙ্গে দেয় নড়ন্ত জিভটা। টুক টুক করে নড়ছে। নড়ছেই। সে বড় মর্মান্তিকভাবে বুঝতে পারে, বীরুকে সে বড্ড ভালবেসে ফেলেছিল। বড্ড বেশি। বোধ হয় আর কিছু করার নেই।

খুব ভোরবেলা সে আর-এক বার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কুয়াশায় গাঢ় আকাশে বহু দূর উঠে গেছে বাড়িটা। অন্ধকার জানালা সব। কোলাপসিবল গেট বন্ধ। বীরুর জানালায় আলো নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে থাকে। শীতটা কি খুবই পড়ল এবার? হাত পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ভোর-আলোয় দু'টো হাত চোখের সামনে তুলে ধরে দেখে সে। হাত দু'টো রক্তহীন, সাদা, আঙুলের ডগায় চামড়া কুঁচকে আছে, অনেকক্ষণ জলে ভিজলে যেমন হয়। শরীরে একটা কাঁপুনি। শীতের জন্যই? নাকি অন্তর্নিহিত গূঢ় শোক থেকে উঠে আসছে শরীর জুড়ে এক নিস্তব্ধ ক্রন্দন? নাকি ভয়? অনিশ্চয়তা? হাঁটে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নয়। খানিকটা উদভ্রান্তের মতো।

তবু ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে সে হাজির হয় কাঠগোলায়। বীরুর ফিয়াটটা বাইরে দাঁড়ানো। আপাদমস্তক শিউরে ওঠে মনোরম।

মামা বাইরের চালায় বসে আছে। কী গভীর হয়ে চোখের কোলে কালি পড়েছে! ঘুমহীন জ্বালাভরা চোখ। কষ্টে শ্বাস টানছে।

তিন দিন তুই দেখাই দিসনি ঝুমু। বীরুর খবর কী?

একই খবর। বীরুর গাড়িটা দেখছি—সতর্ক গলায় বলে মনোরম।

গভীর ক্লান্তিতে মামা বলে, আমিই এনেছি ওটা। গ্যারেজে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে চালু না করলে ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাবে। ওর ঘরে গাড়ির চাবিটা পড়ে ছিল। ভাবলাম নিয়ে বেরোই। কখন হুট করে এসে হাজির হবে, তখন গাড়ি রেডি না-পেলেই তো মাথা গরম হবে। তাই ইঞ্জিনটা চালু রাখছি।

ও।

কী করছে এখন হারামজাদা?

মামা, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার সেই বন্ধুব গলায় হঠাৎ ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বেশি দিন নেই।

যাবি? বলে যেন হাতের ভর স্খলিত হয়ে যায় মামার। রোগা লম্বা শরীরটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

ঝুমু! মামা হাঁফানির শ্বাস টেনে বলে।

বলো মামা। মনোরম মামার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, কী হয়েছে তোমার?

শোন, ও যখনই ফিরুক, যবেই ফিরুক, ওর সব সাজানো রইল। ওর ঘর সাজানো আছে, ব্যবসাপত্র সব গুছিয়ে রাখা আছে, ওর গাড়ির ইঞ্জিন আমি চালু রাখছি। ওকে বলিস, আমার যা সাধ্য সব করে রেখেছি ওর জন্য।

বীরু তো সবই জানে মামা।

ভূপতিকে সব বুঝিয়ে গেলাম, তুইও দেখিস।

তোমার কী হয়েছে?

ঝুমু, প্রদীপ নিবে গেলে একটা তেলপোড়া গন্ধ পাওয়া যায় জানিস তো?

হ্যাঁ, বিচ্ছিরি গন্ধ।

সেই গন্ধটা মানুষ যখন আর পায় না, তখনই বুঝতে হবে তার আর মরার দেরি নেই।

তার মানে?

ও একটা তুক। মানুষ মরার আগে নেবানো প্রদীপের সামনে বসেও সেই গন্ধটা পায় না। আমি গতকাল সন্ধের সময়ে পুজোর পর প্রদীপটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে অনেকক্ষণ বসে গন্ধটা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। পেলাম না। ঝুমু, আমারও আর দেরি নেই।

এ-সব কথার কোনও মানে হয় না মামা।

তুই যেন কার সঙ্গে ব্যবসাতে নাবছিস?

বন্ধু।

যাবিই ঝুমু?

কথা দিয়েছি।

তা হলে যা। ফাঁকে ফাঁকে এসে একটু বীরুকে দেখে যাস। তোর মামিকেও।

দেখব মামা।

মনোরম কাঠগোলা থেকে বেরিয়ে আসে। মামা এখনও কিছুদিন টের পাবে না। বীরু তো এ-রকম কতদিন ডুব দিয়ে থেকেছে। সে-রকমই কিছু ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবে। মনোরম একটা সত্যিকারের দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সামনেই গোল পার্কের ওপর শীতের প্রকাণ্ড আকাশ রোদভরা হয়ে ঝুঁকে আছে। হঠাৎ কলকাতা মুছে যায়। আবছা স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে মনোরম দেখতে পায় ঘাটের পৈঠার মতো দীর্ঘ সব

সিঁড়ি। ইস্কুলবাড়ির তিনশো ছেলে সেই সিঁড়িতে সারি সারি দাঁড়িয়ে জোড়হাতে গাইছে—জয় জগদীশ হরে...

বহু দিনের পুরনো সেই আকাশ অতীত থেকে হঠাৎ আজ ঝুঁকে পড়ে মনোরমের চোখের ওপর। হাতের উলটো পিঠে সে চোখের জল মুছে নেয়।

কলকাতায় এবার কি খুব শীত পড়েছে! এত রোদ্দুরে হাঁটে মনোরম, তবুও শরীর তার কেঁপে ওঠে। হাত দু'টো সামনে সিঁটানো। হাঁটে মনোরম। শীত যায় না। গাড়ির শব্দ হয় চারপাশে, মানুষের পদশব্দ থেকে যায় পথে। মনোরম আর কারও পিছু নেয় না কখনও। রাতে সে তার ঠান্ডা বিছানায় এসে শোয়। একটু ওম-এর জন্য বড় খুঁতখুঁত করে তার শরীর। চোখ বুজতে না বুজতেই ফুলের পাপড়ির মতো স্বপ্নরা ঝরে পড়ে চোখে। মনে পড়ে সেই দুর্ঘটনা। চমকে উঠে বসে সে। ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে।

টেলিফোনে একদিন বিশ্বাসের নম্বর ডায়াল করল মনোরম অবশেষে।

গমগমে একটা গলা উত্তর দিল, হ্যালিও...

মনোরম ভাবে, তবে কি ক্যানসার সেরে গেছে বিশ্বাসের! আবার সেই রোগমুক্ত প্রকাণ্ড চেহারাটা লু-বাতাসের মতো মুখের ওপর শ্বাস ফেলে বলবে, ব্যানার্জি, বিসোয়াস হিয়ার।

হ্যালিও...

মনোরম জিগ্যেস করে, বিশ্বাস?

ও।

উনি তো হাসপাতালে আছেন।

কিছু বলার ছিল?

না। ঠিক আছে।

বাড়িভাড়া আবার বাকি পড়ে। জমে উঠেছে ঋণ। মনোরম হাঁটে। ওপেনিং খোঁজে। পায় না। বয়স হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। তবু হাঁটে মনোরম। এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তা। সেই অ্যাপার্টমেন্টের সামনে কখনও যায় না। যায় না মামার কাঠগোলাতেও। বিশ্বাসকে আর কখনও ফোন করেনি মনোরম। থাক, সে কিছুই জানতে চায় না। মনোময় যেদিন মারা যায়, সেদিন সকালে সে প্রতিবেশীর বাসা থেকে ইস্কুলে বেরিয়ে, বাড়ির দিক থেকে কান্নার রোল শুনে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ইস্কুলে। প্রার্থনার সারিতে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল। আজও পালায়, অবিকল সেইরকম। কল্পনা করে, মামা রোজ এসে কাঠগোলায় বসছে, নিবন্ত প্রদীপের গন্ধ আবার ফিরে পেয়েছে মামা। বীরু তাকে ফাঁকি দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বোধহয় পালিয়ে গিয়েছিল মাঝরাতে। তারপর বোধহয় গিয়েছিল গৌরীর কাছে। ওরা দূরে কোথাও আছে, একসঙ্গে। বিশ্বাস অপারেশনের পর ভাল হয়ে আবার দাবড়াচ্ছে তার পুরনো বিদেশি গাড়ি, মদ খাচ্ছে, ফুর্তি করছে, বেশি রাতে বাড়ি ফিরে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ছুড়ে দিচ্ছে এক পাটি জুতো...

কল্পনায় সবই থাক। সত্যি কী, তা জানতে চায় না মনোরম। এবারের শীতে কলকাতা বড় সুন্দর। এ-রকমই সুন্দর থাক সবকিছু। ভাবতে ভাবতে তার ইডিও-মোটর অ্যাকশন হতে থাকে। সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পায় বিশ্বাসকে, শোঁ করে গাড়িতে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল—'বাই...' গ্র্যান্ড হোটেলের উলটো দিকে পার্কিং লট-এ থেমে থাকা ভোঁতামুখ গাড়ি থেকে মামা যেন ডাক দেয়—ঝুমু! আর কখনও ভিড়ের মধ্যে সামনে লম্বা বীরু হাঁটতে থাকে। ভ্রূ কুঁচকে পিছু ফিরে চায়, হাসে কখনও বলে, বাক আপ।

অবিকল এইভাবে একদিন সীতাকে দেখতে পায় মনোরম। তখন দুপুর। নিউ মার্কেটের ছায়ায় ছায়ায় শীত গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনোরম। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন। গায়ে সাদার ওপর সবুজ বরফিওলা পুলওভার, মার্কিনি ছাঁটের প্যান্ট পরনে, পায়ে ক্রোকোডাইল মোকাসিন। ছায়া, তবু রোদ-চশমাটাও

ছিল চোখে, হঠাৎ দেখে, উলটো দিক থেকে সীতা হেঁটে হেঁটে আসছে। পুরনো স্বভাব সীতার, দোকানের সাজানো জিনিস দেখছে নিচু হয়ে। এক পা এক পা করে হেঁটে আসে সীতা।

স্বপ্নই। বিভ্রম। এক্ষুনি কল্পনার সীতা মিলিয়ে যাবে। তবু যতক্ষণ তাকে দেখা যায় ততক্ষণ দেখবে বলে চোখে পিপাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকে মনোরম। বহু দিন সীতাকে দেখেনি। সেই কতদিন আগে দেখেছিল এসপ্ল্যানেডের চাতালে, মেঘভাঙা রোদে। মহার্ঘ মানুষের মতো মাটি থেকে যেন একটু ওপরে শূন্যে পায়ের আলপনা ফেলে চলে গিয়েছিল। প্রাকৃতিক আলোগুলি রঙ্গমঞ্চের ফোকাসের মতো এসে পড়েছিল ওর গায়ে। তারপর বহুদিন বাদে আবার কল্পনায় দেখা হল । মনোরম চেয়ে থাকে।

সীতা হেঁটে আসছে। কাল্পনিক। তবু অপেক্ষা করে মনোরম। যদি তাকে না-দেখে এ-রকমই হেঁটে আসতে থাকে, তবে সোজা এসে মনোরমের বুকে ধাক্কা খাবে। ঠিক যেমন স্থবির গাড়িতে চলন্ত ইঞ্জিন এসে লেগে যায়। সেই বিভ্রম, সেই প্রবল কাল্পনিক সংঘর্ষের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে মনোরম। সীতা অনন্ত পথ পার হয়ে আসছে। একটু একটু করে। বড় একটা দোষ ছিল ওর, যা খুশি কিনে আনত। কলকাতার দোকান ছেয়ে গেছে নকল দু' নম্বর মালে। রোজ ঠকে আসত। বকত মনোরম। ঠিক সেই রকমই বালিকার মতো অপার কৌতূহলভরা চোখে দোকানের সাজানো জিনিস দেখছে আজও। মনোরমকে দেখেনি। সচেতন নয়। মনোরমের বিভ্রমের পথ ধরে আসছে সীতা, কল্পনা, স্বপ্ন।

মনোরম ভুল করেছিল।

সীতা তাকে দেখেছিল ঠিকই। দোকানের আয়নায় প্রতিবিম্বিত মনোরমকে। একটু চমক কি লেগেছিল? কে জানে! কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভুল হয়ে গেল বিচ্ছেদ, অন্য এক পুরুষ, বহুকালের অদর্শন। তীব্র অভিমানে ফুলে উঠল সীতার বালিকা-মুখের দুটি ঠোঁট, ভ্রূ কুঁচকে গেল।

একটুও ভাবল না সীতা, অপেক্ষা করল না, কোনও ভূমিকাও না। কিশোরীর মতো দ্রুত নৃত্য-ছন্দে কয়েক পা দৌড়ে গেল মনোরমের দিকে। বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কৃশ, সাদা মুখখানা তুলে ধরে বলল, আমার যে কী ভীষণ অসুখ করেছিল!

মনোরম তাকিয়েই থাকে। বিভ্রম?

সীতা তার রোগা, পাণ্ডুর ডান হাতখানা তুলে নিঃসংকোচে তাকে দেখাল, বলল, দেখো কত রোগা হয়ে গেছি!

পৃথিবীতে মানুষের আয়ু খুব বেশিদিন নয়। বয়ে যাচ্ছে সময়। দ্রুত, কলস্বরা। মনোরম তাই বিনা প্রশ্নে সীতার রোগা হাতখানা ছুঁল।

সেই মুহূর্তেই তাদের চারধার থেকে কলকাতা মুছে যাচ্ছিল। জেগে উঠল বনভূমি। অদূরে নদীর শব্দ।